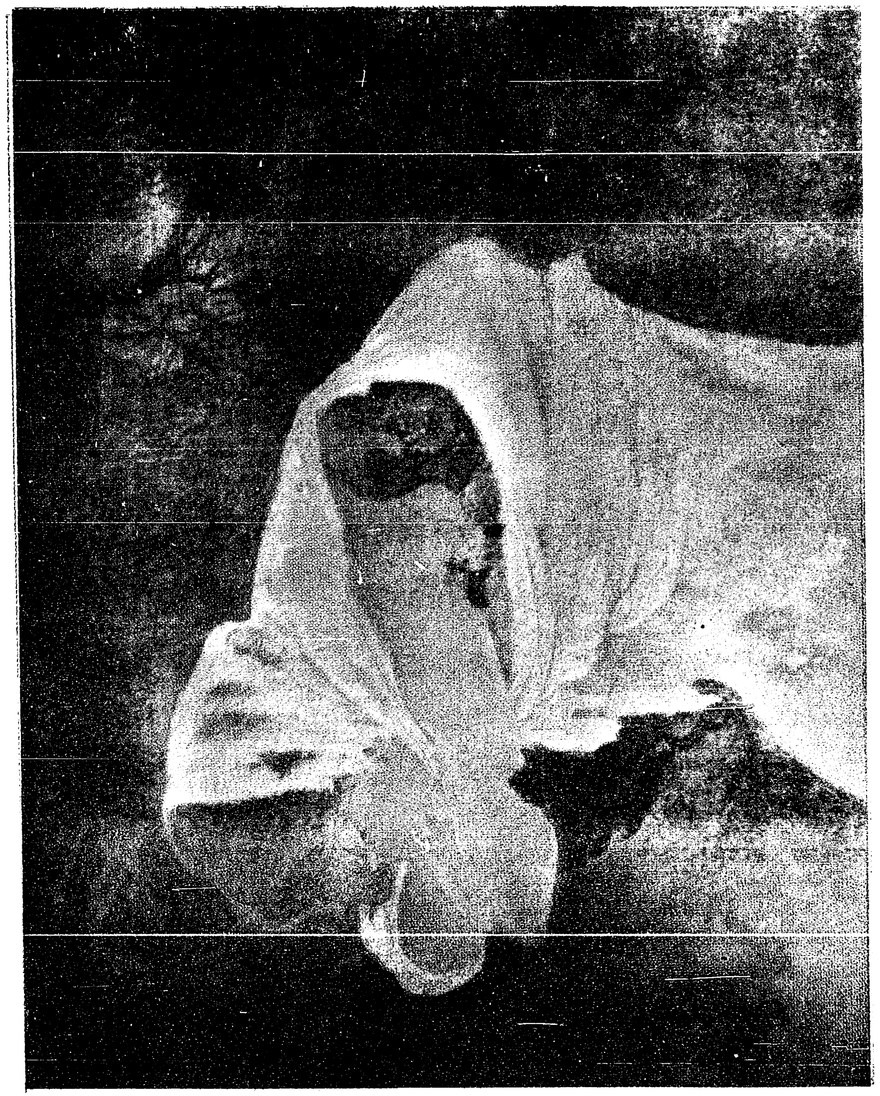

কলঙ্কের বোঝা

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২২ [১ম সংখ্যা

বিদায় গ্রহণ

পুরাতন চিরস্থায়ী নহে অথচ তাহার মৃত্যুও নাই। সে বর্ত্তমান নূতনে। পিতা-মাতা সন্তানে জীবিত, পূর্ব্বস্রোত পরবর্ত্তী স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত। ন লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের ত মৃত্যু।

পুরাতনের প্রধান ধর্ম্ম নূতনকে নুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অন্য কথায় নূতনকে গঠিত করিয়া তোলা। ইহাতে যে সফলতা লাভ করে তাহার জীবনই সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী সাহিত্যসেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে তবেই আমি ধন্য। কিন্তু সে বিচারের ভারও নূতনের হস্তে।

সংসারে কোন সংকল্পই, কোন সাধনাই প্রায় বাধাবিঘ্নহীন নহে। আমার পক্ষেও ভারতীর সম্পাদন কার্য্য নিষ্কণ্টক কর্ত্তব্য পালন ছিল না। পত্রিকা সম্পাদনের অর্থই, পাঁচজনকে লইয়া পাঁচজনের হইয়া কাজ করা; এই কাজের মধ্যে একটি সেরা কাজ শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের দ্বারস্থ হওয়া, অর্থাৎ ভিক্ষা করা। কোন পুরবালার পক্ষে এ কার্য্য কিরূপ অসম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভারতীর সৌভাগ্য এই যে—এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে তাহাকে মনোযোগ প্রদান করিতে হয় নাই। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, যেখানে অকুণ্ঠিত প্রার্থনায় বড় আশা করিয়া হাত পাতিয়াছি সেখানেও অধিকাংশ সময় হতাশ্বাসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে হইয়াছে। আবার আশাতীত স্থল হইতেও স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা লাভে হৃদয় কৃতজ্ঞতা-

দার।

পূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে! এইরূপেই বুঝি জীবনের তৌলদণ্ডে আশা নৈরাশ্যের পরিমাণ সমান থাকিয়া যায়।

সুরুচিসুশ্লীল সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল; আর আনুসঙ্গিক একটি কর্ত্তব্য ছিল, নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা। গুপ্ত প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে ভারতী কোন-দিন পরিশ্রমকাতর হয় নাই। যে লেখার মধ্যেই কোন একটু সার পদার্থ মিলিয়াছে তাহাই মার্জ্জিত সুশোভিত আকারে ভারতীর পত্রে স্থান লাভ করিয়াছে।

যখন এই সম্পাদন ব্রত গ্রহণ করিয়া-ছিলাম তখন ফলাফল লাভক্ষতি গণনা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। কর্ম্মের আনন্দই কর্ম্মে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়া-ছিল। আজ সে উৎসাহ-উত্তেজনার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়; আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন একান্তই নিবৃত্তিলোলুপ।

কিন্তু প্রবৃত্তিতে আনন্দ আছে নিবৃত্তিতে কি নাই? দানের তৃপ্তি কি গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অল্প? পূজার মাহাত্ম্য কি বিসর্জ্জনেই ঘনীভূত নহে? বস্তুতঃ ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত। ব্রত গ্রহণ করিয়া আমি যে উদ্‌যাপনে অবসর পাইলাম ইহাই আমার কর্ম্মের প্রকৃত পুরস্কার।

বিদায়ের দিনে আজ আমার নয়ন যদিও অশ্রুপূর্ণ কিন্তু হৃদয় নিষ্কাম-নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল। সযত্নপালিতা ভারতীকে নবীনের উৎসাহ যুক্ত, কার্য্যক্ষম, বলশালী হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক আজ আমি মাতার ন্যায়ই কৃতার্থ।

এই ব্রতসাধনে এতদিন যাঁহারা আমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছেন, কর্ম্মজীবনের সেই সহায় বন্ধুদিগকে আজ অবসর গ্রহণ কালে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা নমস্কার জ্ঞাপন করি।

পত্রিকা পাঠসূত্রে পাঠকগণও সম্পাদকের সহিত পরিচিত। তাঁহারাও আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন! ভারতীর প্রতি তাঁহারা যেরূপ প্রীতিপুর্ণ অনুরাগ দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মানিত জ্ঞান করি! তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই, সম্পাদক পদ ত্যাগ করিলাম বলিয়া ভারতীর সহিত আমার সম্বন্ধ একেবারেই যে ছিন্ন হইয়া গেল এমনটা যেন তাঁহারা মনে না করেন। লেখকরূপে ভারতীর পত্রে তাঁহাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবার আশা রাখি।

নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার স্নেহভাজন আত্মীয়;—তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ এই, বিধাতা এ কার্য্যে তাঁহাকে কৃতকার্য্য ও জয়যুক্ত করুন!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

আমার কথা

পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদনভার আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এ স্নেহের দান আমি পরম শ্রদ্ধার সহিত মাথায় তুলিয়া লইতেছি। এ ভার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমার আছে কি না জানি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে ভারতীর গৌরব যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য আমার মনপ্রাণ সর্ব্বদা সজাগ রাখিতে চেষ্টা পাইব।

ভারতীর গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকবর্গ—এতদিন যাঁহারা ভারতীকে স্নেহ এবং অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সেই স্নেহ ও আনুকূল্য হইতে আমি বঞ্চিত হইব না—এই ভরসায় ভারতীর ভারগ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যের যে-সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ এবং উদীয়মান নবীন লেখক এতদিন ভারতীর শ্রীসম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন ভবিষ্যতে তাঁহারা সে বিষয়ে কার্পণ্য প্রকাশ না করেন—ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। তাঁহাদের সাহায্য এবং অনুগ্রহের উপর ভরসা রাখিয়াই আমি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি

বহুকাল ধরিয়া ভারতীর সেবা করিয়া পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আজ অবসর লইতেছেন। এ অবসর তাঁর উচিতমতো প্রাপ্য হইলেও তাঁহাকে বিদায় দিতে আমাদের চিত্ত ব্যথিত ও কাতর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের মাসিক সাহিত্যের এখনো এমন সময় আসে নাই যে তাঁহার মতো এমন একজন নিপুণ সম্পাদককে এত অনায়াসে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। তাঁহার এই অবসরগ্রহণে মাসিক-সাহিত্য সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে আশার কথা এই যে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, ভারতীর সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলেও তিনি সাহিত্যসেবা এবং ভারতীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক একেবারে রহিত করিবেন না।

ভারতীর সেবায় তাঁহার যেরূপ অদম্য উৎসাহ, অসীম আনন্দ, উদার নিষ্ঠা এবং

দার।

অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়াছি এমন কোথাও দেখি নাই। যখনি তাঁহার কাছে গিয়াছি দেখিয়াছি পূজারিণীর মতো তিনি ভারতীর পুষ্পপাত্র সাজাইতেছেন। বাংলা দেশের একজন মহিলার পক্ষে ভারতীর মতো একখানা সুনিয়ন্ত্রিত মাসিক-পত্রিকার পরিচালনা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা যিনি নিজ চক্ষে উহা না দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না। এই দুরূহতার সহিত প্রতিদিন তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়াছি; বিপদ আপদেও কখনো তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। ভারতীর কাজে তাঁহার এমন একটি পরিপূর্ণ আনন্দ ছিল যাহার বলে তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং নৈরাশ্যকে দলিয়া যাইতে পারিতেন।

সাহিত্য সাধনাই তাঁহার চির-জীবনের সাধনা—ইহা কাহারো অবিদিত নাই। তাঁহার সে সাধনার ফলসম্বন্ধে আলোচনা করার উপযুক্ত স্থান ও কাল ইহা নহে। তবে সকলে এ কথায় আমার সহিত এক-মত হইবেন যে, তিনি বাংলা দেশের নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন; এবং বিশ্বনারীসভায় বাঙালী নারীকে বরেণ্য করিয়া তাঁহাদের গৌরব-আসন সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন।

বাংলার অনেক নবীন লেখক তাঁহার কাছে সবিশেষ ঋণী। নবীন লেখকগণ যাহাতে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য তাঁহার একটা আন্তরিক চেষ্টা ছিল। এতটুকু লেখা যাহার ভালো দেখিয়াছেন তাহাকেই মুক্তকণ্ঠে উৎসাহ দিয়াছেন;—কেমন করিয়া তাহার লেখা প্রকাশযোগ্য হইবে তজ্জন্য বিধিমত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুগ্রহ অনেক নবীন লেখক ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে না। আমিও সেই দলের একজন। তাঁহার নিকট হইতে সাহিত্য-সাধনায় নানা বিষয়ে আমি এত উৎসাহ পাইয়াছি যে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এ ঋণ শুধু কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পরিশোধ করিবার নহে।

পরিশেষে একটি কথা বলিতে চাই। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আমার সহিত একযোগে ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বন্ধুত্বের নানা ঋণে তিনি আমাকে পূর্ব্ব হইতেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এখন আবার নূতন ঋণপাশে বদ্ধ করিলেন।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

নববর্ষ

এস তুমি নিত্য নূতন! নিদাঘ-দীপ্ত সাজের জাঁকে,—
মিলিয়ে গেছে কালের বেলায় বর্ষ যেথা লাখে লাখে।
চল্‌ছে ঘুরে ঋতুর খেলা, প্রাচীন তোমায় দেখেনি কেউ;
স্রোতের উপর স্রোত চলেছে, ঢেউ-এর উপর চলেছে ঢেউ।

জন্ম জরা মৃত্যু ফোটে বুদ্‌বুদিয়ে তটে তটে,—
তোমার দীপ্ত মূর্ত্তি নিত্য বিম্বিত সে সিন্ধুপটে।
বিশ্ব ভাঙ্গে, বিশ্ব গড়ে, চূর্ণ আশার প্রতি অণু;
যৌবনেতে ফুল্ল তুমি, জীবন-রসে সিক্ত তনু।

লঙ্ঘি' তুমি অগণিত লক্ষ লক্ষ সাগর শিলা,
এলে নবীন! ভবের তটে দেখতে মোদের মর্ত্ত লীলা।
অর্ঘ্য দিয়ে সম্ভাষিতে অন্ধ আতুর সবাই হাজির;
ওগো নূতন! লওগো তুলে ফুল দুটি এই ভাঙ্গা সাজির।

রুধিরাক্ত ধরাখানি হিংসা দ্বেষের দ্বন্দ্বে রণে,
শান্তিজলে অভিষিক্ত কর তুমি শুভক্ষণে।
সাম্য মৈত্রীর নব নীতি আন তুমি ভবে এবার;
করাও অভিনব লীলা বিশ্বব্যাপী নরসেবার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নবাব

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দশের একজন

মে মাসের অপরাহ্ণ। অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান কিরণ-রেখা ডিউক মোরার উপরকার বসিবার ঘরের জানালায় সবুজ ভেলভেটের পরদার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। চারিধার স্তব্ধ। মন্ত্রিসভার সদস্যের দল আপনাদের কাজ সারিয়া তখন বিদায় লইয়াছে। পথে ডিউকের প্রাসাদের সম্মুখে ডাক্তার জেঙ্কিন্সের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

কাল হইতে ডিউকের শরীরটা খারাপ যাইতেছে। আজ আহারের পর হইতে আরও খারাপ বোধ হইতেছিল, তাই পার্ল-ডাক্তার জেঙ্কিন্সের তলব পড়িয়াছে। ডিউকের কাল হইতে ক্ষুধা নাই, চোখে নিদ্রাও নাই—শরীরটা অত্যন্ত ভার বোধ হইতেছিল।

জেঙ্কিন্স ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডিউকের খাস-কামরায় বসিয়া জেঙ্কিন্স ভাবিতেছিল, কি আবার নূতন উপসর্গ ঘটিল যে হঠাৎ এই অবেলায় ডাক পড়িয়াছে! ডিউক চারি-পৃষ্ঠা-লেখা একখানা চিঠি পড়িতে ছিলেন, সম্মুখে একজন অনুচর চোখে অধীর আগ্রহ লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চিঠিখানা পড়িবার সময় ডিউক নিজের মনেই অসম্বদ্ধ দুই-একটা কি কথা বকিতেছিলেন—মধ্যে মধ্যে কলমটা টানিয়া লইয়া চিঠির গায়ে দুই-চারিটা আঁচড়ও টানিতেছিলেন। বাহিরে মর্ম্মরে-রচা কৃত্রিম নির্ঝরের জলের উপর সোয়ালোর ঝাঁক মৃদু আনন্দ-ধ্বনি তুলিয়া ঘুরিতেছিল; এবং দূরে পুলের উপর বসিয়া কে ক্লারিয়োনেট বাজাইতেছিল, অপরাহ্নের স্নিগ্ধ-শীতল বায়ু-তরঙ্গে তাহারই উদাস সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

ডিউক মোরা হঠাৎ চিঠিখানা টেবিলে রাখিয়া অনুচরকে কহিলেন, "না, এ আজ আর দেখা হবে না—লার্ত্তিগ্। কাল নিয়ে এসো—আমার হাত-পাগুলো বড় ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। এই যে ডাক্তার, দেখ ত—আমার হাত যেন হিম হয়ে রয়েছে, ঠিক যেন বরফ-জলে হাত ধুয়েছি—। আজ দু'দিন ধরে শরীরটা এমনি খারাপ রয়েছে! অথচ, এমন গরম যাচ্ছে—নাঃ, কোথায় যে গোল হল, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

ডাক্তার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হুঁ—দেখলুম। একটা কথা,—এর ভিতর কোন অত্যাচার কিছু হয়েছিল?"

ডাক্তারের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু ঈর্ষাও! নূতন সেই বন্ধুটির সহিত ডিউকের অন্তরঙ্গতা ডাক্তার লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে ত ডাক্তার কোন একটা ইঙ্গিত করিতে পারে না—তাই আজ অবসর পাইয়া সেই বিষয়টার প্রতিই মৃদু ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার এই প্রশ্ন করিল। প্রশ্ন করিয়া অধীর চোখে আগ্রহ

ভরিয়া সে ডিউকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ডিউকের মুখে কোন ভাবান্তর ঘটিল না—ভ্রূদুইটাও অকুঞ্চিত রহিল। ডিউক বেশ শান্ত স্বরেই কহিলেন, "ঐটেই তোমার ভুল, ডাক্তার। আমি এখন এত বাঁধা নিয়মে রয়েছি যে ছেলেবেলাতেও বোধ করি এমন ছিলুম না।"

ডাক্তারের মনের মধ্যে ঈর্ষাটা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ডাক্তার কহিল, "তাই ত, তবে গোল হল কি করে?"

ডাক্তার দ্বিতীয়বার আর এ কৌতূহলটাকে পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ পাইল না—ইহার বেশী অগ্রসর হইবার সাহসও তাহার ছিল না—এবং সে বিষয়ে অধিকার আছে কি না, সে-সম্বন্ধেও ডাক্তারের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। ডাক্তার কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময় ডিউক কহিলেন, "শোন ডাক্তার, ভেবে যে তুমি কতকগুলো আবল-তাবল হেঁয়ালি বকবে, তার দরকার নেই—সে সব শুনতে আর ভালও লাগে না, আমার। সাফ জবাব দাও—এত ঠাণ্ডা আমি বোধ করছি কেন? কি এ? খুব অল্প কথায় বুঝিয়ে দাও—"

ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধায় পড়িল—তার পর কহিল, "শরীরে রক্ত নেই—তার উপর খাটুনি, মাথা-ঘামানো,—এই। এ ছাড়া আর ত কোন কারণ দেখছি না।"

"তাহলে এর প্রতিকার কি?"

"প্রতিকার, চুপ করে বসে থাকা—একদম্ জিরুনো। কোন রকমে মাথা-ঘামানো নয়, কোনরকম খাটুনি নয়। তার উপর যদি হপ্তাখানেকের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসতে পারেন—এই ধরুন, গ্রানবোয়ে— কি—"

ডিউক ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "থামো, থামো। বেড়াতে গেলে এই কৌন্সিলের মিটিং, তবে গে—না, না, সে ত হতেই পারে না—অসম্ভব!"

ডাক্তার কহিল, "কিন্তু মাথাটাকে একটু ছুটি না দিলে—"

ডাক্তারের কথা শেষ হইল না। এক জন ভৃত্য একখানা কার্ড আনিয়া ডিউকের হাতে দিল। ডিউকের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল! ডাক্তার কথা বন্ধ করিয়া কার্ডখানার দিকে চাহিয়া দেখিল—পরিচিত নাম! ডিউক কার্ড রাখিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "আচ্ছা, একটু বসতে বল।" ভৃত্য বিদায় লইল; পরে ডাক্তারের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "আসল কথা কি জানো, ডাক্তার, যেমন করেই হোক—অর্থাৎ বুঝেছ কি না—তোমার পার্লের মাত্রাটা না হয় কিছু বাড়িয়ে দাও, যা দিচ্ছ, তার ডবল দাও। মাথা থেকে নতুন আর কোন-একটা ওষুধ বার কর। এই রবিবারটা আমায় চাঙ্গা রাখো—বুঝতে পারছ, এই রবিবারটা আমার শরীর যেন খুব ভালো থাকে—!"

জেঙ্কিন্স একবার কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া বলিল, "আপনাকে কিন্তু ভারী সাবধানে থাকতে হবে, ডিউক বাহাদুর। আপনার শরীর যা হয়েছে, তাতে আমি আপনাকে খুব যে ভরসা দিতে পারি—এ বোধ হয় না। আপনাকে স্পষ্টই বলছি, জানবেন—আমার কর্ত্তব্য বলেই এত স্পষ্ট করে বলছি—"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "তোমার কর্ত্তব্য-টর্ত্তব্য ও-সব বাঁধা বুলি তুলে রাখো, ডাক্তার। আমি যাতে সুখে থাকি, যা করে সুখ পাই, তাতে তুমি বাধা দিতে এসো না—এ প্রাণটুকু যেমন ভাবেই জ্বলে শেষ হোক্ না কেন, সব থেকে বঞ্চিত করে রাখলে আমি আগেই এটুকু ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেব। সব ছেড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সব নিয়ে একটা ঝড় তুলে মরাও যে ঢের ভালো বোধ হয়, আমার।"

বাহিরে একটা শব্দ হইল। ডিউক চাহিয়া দেখিলেন, ডচেস। সুন্দর কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে সুন্দর মুখখানি লইয়া ডচেস্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডচেস্ ভৎর্সনার স্বরে কহিলেন, "এ কি—এখনও ঘরের কোণে বসে রয়েছ! বেড়াতে বেরোও নি? এই যে ডাক্তার জেঙ্কিন্স। ডাক্তার, আপনার রোগীকে বকুন ত—কিছুতেই ওঁকে পারা গেল না। এই দেখুন না, আপনাদের মানা সত্ত্বেও উনি এমন বিকেল বেলাটা বদ্ধ ঘরের কোণে বসে আছেন! কেবল কাজ, কাজ, কাজ! শরীর না থাকলে, কাজ করবে কে?"

ডিউক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "ঐ শোন, ডাক্তার।" পরে ডচেসের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি এখনও বড় বেড়াতে যাও নি যে!"

ডচেস্ কহিলেন, "আমি ত একলা যাব না। তোমায় আজ সঙ্গে নিয়ে যাব। কাকা আমায় এক-খাঁচা পাখী পাঠিয়েছেন, তোমায় দেখাব, এস। কত রঙ-বেরঙের পাখী—ছোট ছোট চোখগুলি! যেন কে একজোড়া করে' কালো মুক্তো এঁটে দিয়েছে। ভারী সুন্দর, দেখবে এস।"

"চল" বলিয়া ডিউক উঠিয়া দাঁড়াইলেন; যাইবার সময় ডাক্তারকে বলিয়া গেলেন, "তুমি বসো, ডাক্তার—আমি এখনই আসছি।"

ডিউক চলিয়া গেলে, জেঙ্কিন্স বসিয়া সমস্ত ঘরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইল। তাহার মনের ভিতর হইতে কিসের একটা জ্বালা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সহসা ডিউকের চেয়ারের সম্মুখে টেবিলের ড্রয়ারের উপর তাহার নজর পড়িল। ড্রয়ারটা একটু খোলা রহিয়াছে এবং কলের মুখে রিঙে করা চাবিটা লাগানো—চাবিটা সোনার। ডিউকের এতখানি অসতর্কতার কারণ আর কিছুই নহে—শুধু একটা গর্ব্বিত অবহেলা মাত্র! জেঙ্কিন্সের মনে হইল, চাবিটা যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'কাহার এমন সাহস হইবে যে আমায় স্পর্শ করে!'

কাহার এমন সাহস! হাঁ, এত স্পর্দ্ধা! সে সাহস জেঙ্কিন্সের বিলক্ষণ আছে! কিসের ভয়!

জেঙ্কিন্স ড্রয়ার টানিল। ভিতরে বিস্তর কাগজ-পত্র, কিন্তু সবার উপরে ঐ যে একখানা চিঠি, খামে মোড়া—খামের গোড়াটা ছেঁড়া রহিয়াছে, ওটা—! খামের উপর বড় বড় পরিচিত অক্ষরে ডিউকের শিরোনামা লেখা! জেঙ্কিন্সের প্রাণে কে যেন একটা তপ্ত লোহা ঠেকাইয়া দিল, প্রাণ তাহার জ্বলিয়া

উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া কম্পিত হস্তে সে খামখানা উঠাইয়া লইল। খাম খানার গায়ে তখনও একটা মিষ্ট গন্ধ মাখা রহিয়াছে—চারিধার যেন হাজার ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিল। জেঙ্কিন্স খামখানা হাতে লইয়া দেখিল, তবে সত্য—তাহার সন্দেহ সত্যই তবে! তাই আজকাল ফেলিসিয়া ডাক্তারকে এতখানি অবজ্ঞা দেখাইতেছে, তাই আজ ডাক্তারের সহিত কথা কহিবারও ফেলিসিয়ার এতটুকু অবসর মিলে না! বটে! ভিতরে ভিতরে এতখানি তোমরা গড়িয়া তুলিয়াছ! ফেলিসিয়া—রাক্ষসী!

জেঙ্কিন্সের প্রাণে কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল—সে বিষে সর্ব্বাঙ্গ তাহার জ্বলিয়া গেল। এই অপদার্থ ডিউক—এতটুকু যাহার প্রাণ নাই, মন নাই, ধনের গর্ব্বে দুনিয়াকে যে গ্রাহ্যও করে না—নারী যাহার কাছে ভোগের, বিলাসের খেলানা মাত্র—সেই ডিউকের কোন্ গুণে মুগ্ধ হইয়া ফেলিসিয়া এমন করিয়া আপনাকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে! আর জেঙ্কিন্স—যে তাহার জন্য মরে—সেই জেঙ্কিন্সকে এমন নিষ্ঠুর উপেক্ষায় জর্জ্জরিত করিয়া, দগ্ধাইয়াও তোমার তৃপ্তি হইল না, ফেলিসিয়া? তাহার চেয়ে শত গুণ অযোগ্য টাকায়-গড়া প্রাণহীন একটা পুতুলকে লইয়া, জেঙ্কিন্সের এত বড় প্রাণখানার পানে তুমি চাহিয়াও দেখিলে না! যে জেঙ্কিন্স তোমার মুখে এতটুকু হাসি দেখিতে পাইলে বর্ত্তাইয়া যায়—সেই জেঙ্কিন্সকে পরখ করিয়াও একবার দেখিলে না, নারী! হায়, রূপ, হায় যৌবন, এত অন্ধ তুমি! এমনই সহস্র চিন্তা শরের মত জেঙ্কিন্সের বুকে বিঁধিতে লাগিল। রাগে হিংসায় চোখ দুইটা তাহার জ্বলিয়া উঠিল, ভয়ে সে চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতেও পারিল না।

না জানি, চিঠিতে কত কি সে লেখা দেখিবে! প্রণয়ের কত না ললিত কাকলী, সোহাগের কত না মধুর বচন, কত না মান, কত অভিমান। এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইল। জেঙ্কিন্স চোরের মত শিহরিয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি চিঠি-সমেত খামখানা ড্রয়ারে ফেলিয়া ড্রয়ারটা সে ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া দিল। এক আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জেঙ্কিন্স টেবিলের উপরকার ছোট ঘড়িটার উপর হইতে নজর ফিরাইয়া কহিল, "নবাব বাহাদুর যে, আসুন। তারপর কি মনে করে?"

"ডিউক বাহাদুর কোথায় গেলেন—আমি বাইরে ছিলুম, আমায় বলে গেলেন, এই ঘরে এসে অপেক্ষা করতে—"কথা শেষ করিয়া নবাব গর্ব্বিত শিরে ঘরের মধ্যে চারিধারে একবার দেখিয়া লইলেন। খাস-কামরা! ডিউকের খাস-কামরা! এ ঘরে ডিউক তাঁহার কোন সাধারণ বন্ধুবান্ধবকে কখনও আনিয়া বসান না—এ ঘরে নবাব আজ এই প্রথম আসিবার অধিকার পাইয়াছেন। কৃতার্থতার গৌরব-গর্ব্বে নবাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

নবাবের উপর ডিউকের ইদানীং যথার্থই একটা আন্তরিক টান পড়িয়াছিল। তাহার কারণও ছিল,—নবাবের মত এই সাহস ও ভাগ্য গড়িবার শক্তিকে বরাবরই তিনি

পছন্দ করিতেন। আরও বিশেষ পারির এই কায়দা-মাফিক সম্ভ্রান্ত সমাজের পার্শ্বে নবাবের এই উগ্র প্রকৃতি, শিশু-সুলভ সারল্য ও সীমাহীন শ্রদ্ধা ডিউককে একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর নবাব তাস খেলিতে সিদ্ধহস্ত—বাজী হারিয়াও দমিতে জানে না; ডিউকের ছবি চড়া-দরে কিনিতেও অত্যন্ত আগ্রহান্বিত—এই সব কারণেও নবাবের উপর ডিউকের স্নেহ জন্মিয়াছিল। মায়াও পড়িল, যখন ডিউক দেখিলেন, এই নিরীহ নবাবের বিরুদ্ধে সমস্ত পারি একটা ভীষণ বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে প্রতি পদে লাঞ্ছিত করিবার জন্য দারুণ চক্রান্ত করিয়াছে। তাহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে কেহ দাঁড়ায় না! নবাব একা —কেহ তাহার সহায় নাই। ডিউক মোরা অবশ্য এ চক্রান্তকারীর দলে যোগ দিলেন না।

জেঙ্কিন্স ও নবাব দুইজনেই ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন। কে কি কথা কহিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া দুইজনেই বিপদে পড়িলেন। অথচ আলাপ-পরিচয়ও আছে—চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও ভাল দেখায় না। কাজেই দুইজনে নিতান্তই অবান্তর দুই-একটা কথা কহিলেন মাত্র। সম্প্রতি উভয়ের সৌহার্দ্দ্যও হ্রাস পাইয়াছিল—জাঁস্থলে জেঙ্কিন্সকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, বেথলিহাম আশ্রমে তিনি আর একটি পয়সাও দিবেন না। নবাব এখন স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি আজ ডিউককে যে কথা বলিতে আসিয়াছেন, সে কথাটা জেঙ্কিন্সের সম্মুখে তোলা সঙ্গত হইবে কি না! মেসেজার কাগজখানা কয়দিন ধরিয়া তাঁহাকে যে বিশ্রী গালি দিতে সুরু করিয়াছে, ডিউক তাহা দেখিয়াছেন কি না এবং দেখিয়া থাকিলে নবাবের প্রতি ডিউকের ধারণার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যই নবাব আজ এখানে আসিয়াছেন। জানিবার প্রয়োজনও ছিল। কারণ নির্ব্বাচন-মঞ্জুরির সময়টা একেবারে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন যে অভ্যর্থনা নবাবের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল, তাহা পর্য্যাপ্ত হইলেও নবাব আজ ডিউকের আশ্বাস-লাভের জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন।

এমন সময় ডিউক কক্ষে প্রবেশ করিলেন, নবাবের পানে সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আন্তরিকতার সহিত তাঁহার কর-কম্পন করিয়া কহিলেন, "জাঁস্থলে, আমার ভয় হচ্ছে, পারি তোমায় ঠিক উচিতমত আদর করছে না—দারুণ ঘৃণা আর কুৎসা নিয়ে পারি আজ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।"

নবাবের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কিন্তু যা বলছে, সব মিথ্যা! আপনি যদি দেখতেন—"

"আমি জানি—আমি সে নতুন গালাগালটা পড়েওছি।"

"আপনি কি ও-সব বিশ্বাস করেন? সেই কথাটাই আমি জানতে এসেছি। সে জানলে আমি ঠাণ্ডা হতে পারি—আমি তার প্রমাণও এনেছি, আজ।"

ফিতায় বাঁধা একটা কাগজের বাণ্ডিল নবাবের হাতে ছিল। ফিতা খুলিয়া সেই

বাণ্ডিলটা নবাব টেবিলের উপর ধরিলেন। ডিউক কহিলেন, "এ সব দলিল-প্রমাণের কোনই দরকার নেই, জাঁস্থলে। আমি ও গালাগালের কথা বিশ্বাসও করি না। আমি বুঝতে পারছি, অপর কোন লোকের সঙ্গে তোমাকে ওরা ভুল করে জড়িয়ে দিচ্ছে।"

ডিউক হাসিলেন, হাসিয়া আবার বলিলেন, "এ-সব খপর রাখার দরকার আমার আছে, তাই খোঁজও নিয়েছিলুম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার নির্ব্বাচন, কারও সাধ্য নেই, বন্ধ করে। তার পর একবার এটা কৌন্সিলের মঞ্জুর হয়ে যাক না—"

জাঁস্থলে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তিনি কহিলেন, "যদি আমার এ নির্ব্বাচন ঘটে, তবে সে আপনার দয়াতেই ঘটবে। আমার কিন্তু সব বিশ্বাস সরে যাচ্ছে। বিশেষ শত্রুর দল ক্রমেই বাড়ছে। তার উপর, লি মার্কারই আমার সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবে।"

"লি মার্কার! ঐ পাজীটা!"

"হাঁ, লি মার্কার—হেমারলিঙের চেলা। ব্যারণেস হেমারলিঙ্‌ ত আগে ওরই হাতে খেলার পুতুল ছিল। সে মুসলমান ছিল বলেই লি মার্কার তাকে প্রকাশ্যভাবে বিয়ে করতে পারেনি—নাহলে ওদের কথা টিউনিসের লোকের মুখে মুখে ফিরত। লি মার্কারের জোরেই ত হেমারলিঙের আজ এত জোর!"

"জাঁস্থলে—"

নবাব কহিলেন, "এ কথা তোলবার প্রয়োজনও ছিল না, আমার। এক হপ্তা আগেই ত আমার নির্ব্বাচন মঞ্জুর হবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ লি মার্কারের রিপোর্ট তোয়ের হয়নি বলেই দিন পেছিয়ে গেল। প্রতি মুহূর্ত্তেই এখন আমার ভয় বাড়ছে—আমার অবস্থাটা ভাবুন, একবার। আমার সমস্ত সম্পত্তি এই নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করছে। সে শুধু অপেক্ষা করে আছে, কি হয়! তাহলেই সে লুঠের উদ্যোগ করে! টিউনিসে আমার প্রায় আট লক্ষ টাকা পড়ে আছে—ডেপুটি হতে যদি না পারি ত সে তার সব হাত করবে। আমায় তখন পথের ভিখিরী হতে হবে।"

কথা শেষ করিয়া নবাব ললাটের ঘর্ম্ম মুছিলেন। ডিউক কহিলেন, "ডেপুটি তোমায় করবই, আমি। আমার চেষ্টায় যতদূর হয়, তার কোন ত্রুটি হবে না। আমি যদি সে সময় রোগে শয্যাগতও থাকি, তবুও আমি যেমন করে পারি, কৌন্সিলের সে মিটিংয়ে যাবই। আমায় দেখলে তোমার শত্রু-পক্ষ অনেকটা দমে যাবে, জাঁস্থলে, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।"

নবাব এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, "ডিউক বাহাদুরের শরীর কি ভালো যাচ্ছে না!"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে যখন এখানে দেখছ, তখন তা বুঝতে পাচ্ছ না? কি বল, ডাক্তার? নাঃ, তবে অসুখ এমন কিছু নয়, শুধু কিছু কাহিল বলে নিজেকে মনে হচ্ছে। রক্ত নেই—তা ডাক্তার খানিকটা তাজা রক্ত দেবে বলে ভরসা দিচ্ছে। কি বল ডাক্তার, দেবে ত?"

নবাব কহিলেন, "যদি আমার শরীর থেকে রক্ত দিলে আপনার কোন উপকার হয়—এমন কি আমার সব রক্ত দিলেও যদি আপনাকে—"

ডিউক নবাবের মুখের পানে চাহিলেন—সে মুখে অকপট আন্তরিকতা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। ডিউক তাহা দেখিয়া প্রীত হইলেন, মুগ্ধ হইলেন। ডিউক কহিলেন, "তা যদি নেওয়া যেত, জাঁসুলে, ত দুজনেরই ভাল হত। তুমি এই যে এ-সময় এতখানি উত্তেজিত হয়েছ, খানিকটা রক্ত দিলে তুমিও শান্ত হতে পারতে। কিন্তু সাবধান জাঁসুলে—রাগের সময় চট্ করে একটা বেফাঁস কিছু করে ফেলো না যেন। তারা এখন ঐটেই চায়। কিন্তু না, তোমায় খুব সাবধান হতে হবে। তুমি এখন দশের একজন—'পাব্লিকম্যান'! তোমার প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীটি অবধি লোকে এখন দূর থেকে লক্ষ্য করবে, তোমার চাউনিটি অবধি তারা বাদ দেবে না। আর ঐ খপরের কাগজে গালা-গাল! খপরের কাগজ পড়ো না, একেবারে পড়ো না। যদি পড়ে নিজেকে ঠিক রাখতে না পারো, চঞ্চল হও, তাহলে কাগজ পড়া বন্ধ করে দাও। অসভ্যগুলো আচ্ছা জব্দ হবে, দেখবে। জান, আমি কি করেছিলুম—ঐ কন্‌কর্দ্দ বলে লোকটাকে নিয়ে? সে ক্লারিওনেট বাজাত। দশ বছর আমার পিছনে তার সে বাঁশী নিয়ে সে বাজিয়ে বেড়িয়েছে। রাত নেই, দিন নেই, বাঁশীর আওয়াজ। জ্বালাতন হয়ে গেছলুম। তাকে বিদায় করবার জন্য তাকে কত টাকা দিয়েছি, ভয়ও দেখিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। পুলিশ? তাতে উল্টো উৎপত্তি হয়। শত্রুপক্ষ কাগজে অমনি বড় বড় প্যারা বার করতে থাকে। শেষে আমি একেবারে চুপ হয়ে গেলুম। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও নয়। বাজাক সে, যত পারে, চেঁচাক্ সে!—আমি এতটুকু টলব না—ব্যস্! শেষে তাকে পাত-তাড়ি গুটোতে হল। এই কাগজওলাদের সঙ্গেও ঠিক সেই চাল ধর। যতক্ষণ অবধি ওরা বুঝবে, যে ওদের এই সব লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরামিতে তুমি কাতর চঞ্চল হচ্ছ, ততক্ষণ ওরা পিছনে ঘেউ ঘেউ করে মরবে, কিছুতে ছাড়বে না। তার পর তুমি আমার চাল ধর দেখি,—ওরা যখন বুঝবে,—না, যত গালই দি, লোকটা ভ্রূক্ষেপও করে না, তখন আপনা-আপনিই সব থেমে যাবে। যাক্, এখন আমার এই কথা মেনে চলে দেখ দেখি! তারপর—হাঁ মনে আছে, কাল তিনটের সময় কমিটির মিটিং আছে? তাতে যেয়ো—নিশ্চয়।"

তারপর জেঙ্কিন্সের দিকে চাহিয়া ডিউক কহিলেন, "এখন ডাক্তার, তুমি শোন, আমার ওষুধের ভাল রকম ব্যবস্থা করে দাও। বেশ শক্ত গোছ কিছু—"

জেঙ্কিন্স সহসা চমকিয়া উঠিল—এতক্ষণ সে যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিল। জেঙ্কিন্স কহিল, "হাঁ আমি তাই ভাবছিলুমও। বেশ দেখে শুনে নতুন একটা ওষুধেরই ব্যবস্থা এবার করব।"

নবাব ও জেঙ্কিন্স উভয়েই বিদায় গ্রহণ করিলে ডিউক ড্রয়ার খুলিয়া ফেলিসিয়ার পত্রখানা বাহির করিলেন। ডিউকের মুখে হাসি দেখা দিল। ডিউক আবার চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন।

* * * *

পরদিন কমিটির মিটিং সারিয়া নবাব যখন বাহিরে আসিলেন, তখন রোদ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ-রশ্মিতে চারিধার রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে—বেশ শান্ত শীতল বাতাস বহিতেছিল। নবাব গাড়ী ঘোড়া বিদায় করিয়া পদব্রজেই চলিলেন। দুই-চারিটা পথ বাঁকিয়া পার্কের সম্মুখে আসিয়া নবাব শুনিলেন, ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে, "মেসেজার। আজ সন্ধ্যার মেসেজার!" নবাবকে দেখিয়া কাগজের প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে ফেলিয়া ফিরিওয়ালা তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল, একখানা কাগজ আগাইয়া ধরিয়া কহিল, "আজকের মেসেজার, সাহেব—"

নবাব একবার ইতস্তত করিলেন, না, কিনিবেন না। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, সে কি—তিনি না দশের একজন! একটা ক্ষুদ্রলোকের ক্ষুদ্র কুৎসাকে এতখানি ভয় করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নয় ত! এ দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে তাঁহাকে উঠিতেই হইবে! নবাব পয়সা দিয়া একখানা কাগজ কিনিলেন। নিকটে পার্কের রেলিঙের ধারে একখানা বেঞ্চ ছিল। সেই বেঞ্চে বসিয়া নবাব কাগজ খুলিলেন। প্রাপ্ত-পত্র-কলমে তাঁহার নজর পড়িল। ঐ যে আবার নূতন গালি বাহির হইয়াছে। নবাবের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তিনি পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। হাত দুইটা পৈশাচিক ক্রোধে নিষপিষ করিতে লাগিল। একবার, —একবার সে পাষণ্ডকে যদি হাতের কাছে পাওয়া যায় ত—

নবাব চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। পথে অনেক লোক চলিয়াছে—সকলেই নিজেদের লইয়া ব্যস্ত। নবাবের পানে চাহিবার কাহারও অবসর ছিল না। নবাব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পার্কের চারিধারে তখন অসংখ্য গাড়ী আসিয়া জমিতেছে—ভিক্টোরিয়া, ব্রুহাম মৃদু গতিতে চলিতেছে। ভিতরে আরোহীদের সস্মিত প্রসন্ন মুখ। নবাব ভাবিলেন, কি সুখী ইহারা! কি নিশ্চিন্ত আরামে সব গ্রীষ্মের এ মাধুরী উপভোগ করিতেছে! আহা!

নবাব একদিকে চলিতে লাগিলেন। ও কি! সম্মুখে একটা কেব্রিয়লেটে এক তরুণী—রঙ-করা বিশ্রী মুখ, আর তাহারই পাশে ঐ যে মশার্দ—মশার্দই ত!

নবাব ছুটিয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁকিলেন, "রোখো—"

নারীর হাতে ঘোড়ার রাশ ছিল। নারী সে হুঙ্কারে স্তম্ভিত হইল। গাড়ী থামিয়া পড়িল। মশার্দ কহিল, "চালাও।" নারী তখন আবার রাশ ধরিয়া টানিল। ঘোড়া চলিবার উপক্রম করিল। নবাব আসিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিলেন। ঘোড়া পা তুলিয়া পিছু হঠিবার চেষ্টা পাইল।

মশার্দ দেখিল, ব্যাপার সহজ নহে। তাহার ভয়ও হইল। সে কহিল, "ও নবাব। চালাও তুমি—আমি বলছি। চালাও—"

রাশে আবার টান পড়িল। ঘোড়া কিন্তু অগ্রসর হয় না—নবাব তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী

রুখিয়াছেন। মশার্দ কহিল, "লাগাও চাবুক—" নারী তখন দ্বিধামাত্র না করিয়া ঘোড়ার দীর্ঘ চাবুকটা লইয়া নবাবের মুখের উপর শপাৎ করিয়া এক ঘা বসাইয়া দিল। নবাবের মাথা হইতে টুপিটা ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। নবাব তখন পাগলের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়া ঘোড়াকে দুই হাতে পিছনে ঠেলিয়া ধরিলেন। গাড়ী উলটিয়া যাইবার মত হইল। পথে ভিড় জমিয়া গেল। নবাব তখন ঘোড়ার মুখ ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর উপর উঠিলেন। নারী রাশ ছাড়িয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িল। নবাব তখন মশার্দের মুখখানা কাগজে চাপিয়া ধরিয়া প্রবলভাবে তাহাকে নাড়া দিলেন। পরে হিঁচড়াইয়া টানিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লাফাইয়া পড়িলেন। মশার্দ উঠিবার চেষ্টা পাইতেছিল—নবাব বাঘের মতই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; অজস্র কিল-চড় বর্ষণ করিয়া শেষে পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নবাব হাঁকিলেন, "রাস্কেল, এবার তোমার আস্পর্দ্ধার শোধ হয়েছে ত?" মশার্দ কথা কহিতে পারিল না—ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। নবাব তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; নিশ্বাস সজোরে বহিতেছিল। একজন কনষ্টেবল আসিয়া নবাবের পার্শ্বে দাঁড়াইল। নবাব তাহার হাতে নিজের কার্ড দিয়া কহিলেন, "বাগার্ড জাঁসুলে—কর্সিকার ডেপুটি!"

উপস্থিত জনসঙ্ঘ বিচলিত হইয়া উঠিল। ডেপুটি! যে-সেলোক নহে তবে, দশের একজন!

জনতার সে বিস্ময়-কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য তিলার্দ্ধও সেখানে অপেক্ষা না করিয়া নবাব ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইলেন। মশার্দ তখন গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া সঙ্গিনীর সন্ধানে চোখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া গিয়াছে, নাক দিয়া গল্ গল্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে। পোষাক ছিঁড়িয়া কাদায় গা ভরিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাগর

ওগো অকূল অতল স্নিগ্ধ শীতল সুনীল সাগর-জল,
তোমায় মথিতে আসি নাই আজি
নাহি চাহে প্রাণ মণি-রত্নরাজী,
না করি গণনা জুটিলে কপালে অমিয়া বা হলাহল।
আমি কেবলি ডুবিব কেবলি ভুলিব,
দিবস রজনী কেবলি গলিব,
অতল হইতে অতলে তলাব, পাবনা কোথাও তল।
না রবে তপন, নাহি রবে শশী,
বিশ্ব পড়িবে প্রাণ হ'তে খসি,
তোমারি স্নিগ্ধ নীলিমা কেবল জাগি র'বে অচপল।
মাথার উপরে অগাধ সে তুমি,
সার দেহ মোর তুমি র'বে চুমি',
চরণের তলে যতদূর চাই নীল জল নিরমল।
নয়নে তোমারি নীলিমা রাজিবে,
তব কলতান শ্রবণে বাজিবে,
তোমারি শীতল রসের পরশে তনু মোর ঢলঢল।
অকূলের পারে কি আছে কি জানি,
অতলের তলে কার পুরীখানি,
তার লাগি মোর নাহি জাগে প্রাণে এক কণা কুতূহল।
যখনি দেখেছি ওই বুকখানি
ঝাঁপ দিতে হবে এই শুধু জানি,
ওই ডাকে মোরে আকুল ভাষায় ছলছল কলকল!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

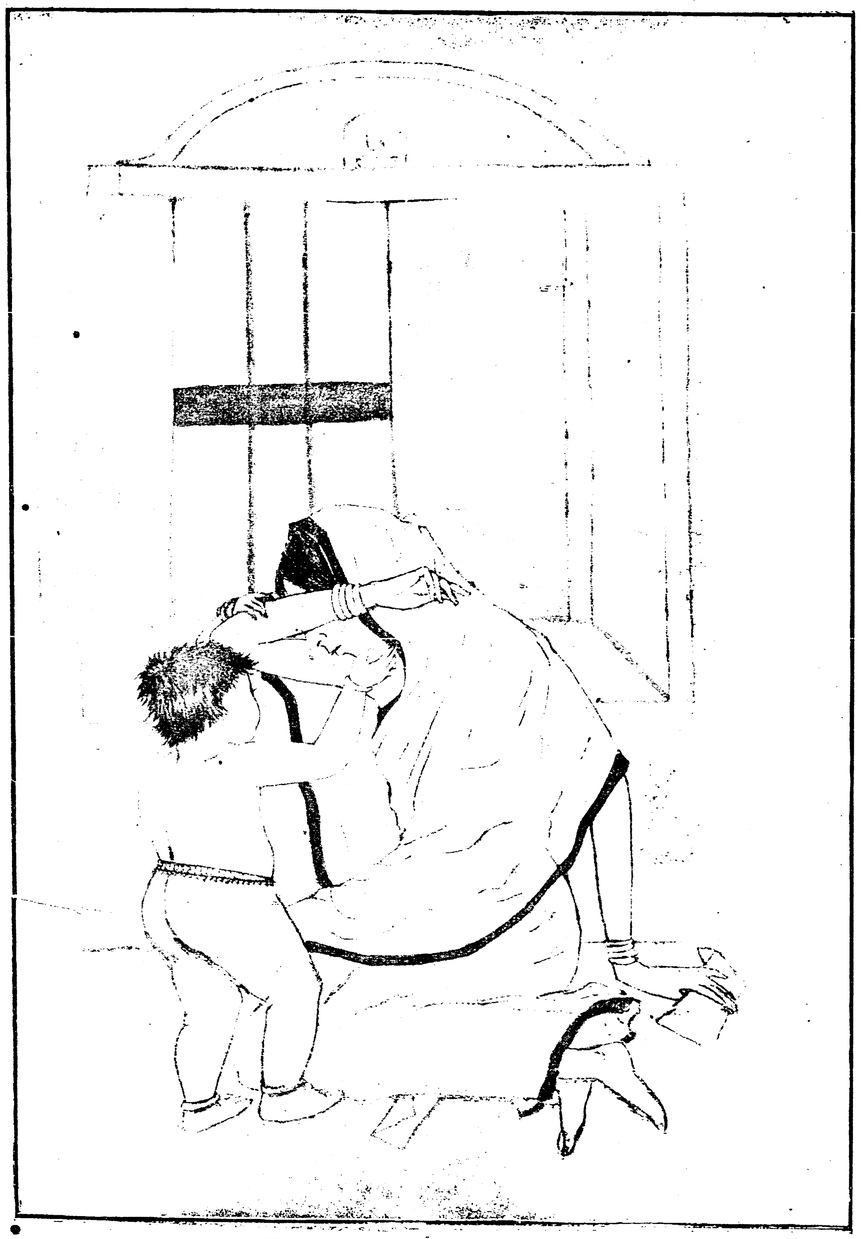

কান্নার সুখ
শ্রীরমা দেবী অঙ্কিত চিত্র হইতে

পাগল ?

(রুশ ঔপন্যাসিক লিওনিডাস আণ্ড্রীভ হইতে)

[১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বারে, ডাক্তার আণ্টনী ইগ্‌নাটিভিচ কার্জেণ্টজেফ, একজন লোককে খুন করেন। এই অপরাধের বিবরণ ও তাঁহার পরের কতগুলি ঘটনা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, হত্যাকারীর মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ !

কার্জেণ্টজেফ্‌কে "এলিজাবেথ মনোবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসালয়ে" পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। সেখানে কয়েকজন বহুদর্শী মস্তিষ্কবিশেষজ্ঞ তাঁহাকে যত্নসহকারে পরীক্ষা করেন।

হাসপাতালে একমাসকাল কাটিয়া গেলে, ডাক্তার কার্জেণ্টজেফ্‌ উক্ত বিশেষজ্ঞদের হাতে আপনার নোটবহিখানি দেন। তাহাতে আসল ঘটনার কথাগুলি খুলিয়া লিখা ছিল। আমরা নীচে তাহার কয়েকস্থান তুলিয়া দিলাম।]

(১)

মহাশয়গণ,

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সত্যগোপন করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু এখন আমাকে বাধ্য হইয়া সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল। যখন আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা জানিতে পারিবেন, তখন বুঝিবেন যে, এ ব্যাপারটা যতটা সহজ বলিয়া মনে হইতেছে, আসলে এটি তত সহজ নয়।

আলেক্‌ক্সিস,—যাকে আমি খুন করিয়াছি, আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী ছিল। সে উকীল আর আমি ডাক্তার হইলেও, আমরা বরাবর একসঙ্গে পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছি। আমি যে তাকে অপছন্দ করিতাম, তাও নয়। সে আমার দরদের দরদী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। কিন্তু তবু,—কেন জানি না,—তার উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না। তাহার বিনীত ও মধুর প্রকৃতি, তাহার সদা চঞ্চল ভাব ও কল্পনা, তাহার নানাবিষয়ের একগুঁয়ে মতামতের জন্য তাহাকে একটা শিশু বা রমণী বলিয়া মনে হইত। যে-সকল লোক তাহার মরমের মরমী ছিল, তাহারা সর্ব্বদাই তাহার স্বভাবের জন্য ব্যথা পাইত। কিন্তু সকলেই তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তাহারা বলিত, সে 'কলা-কুশল'। তাই তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কেহ আমোলে আনিত না। মানব-চরিত্র কি যুক্তিহীন !

সময়ে সময়ে আমিও সকলের 'রায়ে রায়' দিয়া এই 'কলা-কুশল' বন্ধুটির ছোট-খাটো দোষগুলিকে গ্রাহ্যের ভিতর আনিতাম না। 'ছোটখাটো দোষ' বলিলাম এইজন্য যে, আলেক্সিস বৃহৎ কোন কিছুর উপযুক্ত ছিল না ! এমন কি,—সে যা দোষ করিত, —তাও ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ! আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ আমি তাহার সাহিত্য-সাধনার কথা তুলিতে পারি। যে-সকল ম্লানদৃষ্টি সমালোচক চিরকাল ধরিয়া নূতন-কোন প্রতিভা আবিষ্কার করিবার ফিকিরে আছে,

আলেক্সিসের তুচ্ছ রচনা হইতে তাহারাও মহৎ কিছু বাহির করিতে পারিত না। আলেক্সিসের মত, তাহার লেখাতেও কোন একটা বিশেষ গুণ ছিল না।

আলেক্সিস বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু বিধবা হইয়া তাহার স্ত্রীর সকল রূপ-সৌন্দর্য্যই এখন মুছিয়া গিয়াছে। আগে যে তাকে দেখিয়াছে, এখন সে তাকে আর চিনিতে পারিবে না। স্বামীকে সে বড় ভালবাসিত। স্বামী হারাইয়া তার কপোলের গোলাপী আভা আর এখন নাই। অনেক-দিন-পরা দস্তানার মত, তার মুখে এখন কুঞ্চন-রেখা পড়িয়াছে। আর, তার সেই চোখ দুটি! আগে যে চোখ সর্ব্বদাই হাসিত, এখন সে চোখ হাসি-খুসি সব ভুলিয়াছে! আমি সেদিন পুলিশ-কোর্টে তাকে একটি-বারের জন্য দেখিয়া তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়া-ছিলাম। তার ভিতরে তখন এমন জোরও ছিল না যে, সে কুপিত-নেত্রে আমার দিকে চাহিতে পারে! এখন সে অতীতের কঙ্কাল! অভাগা রমণী!

আলেক্সিসের স্ত্রীর নাম তাসিয়ানা। পাঁচবছর আগে আমি তাসিয়ানার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এ কথা, আমি, তাসিয়ানা ও আলেক্সিস ছাড়া দুনিয়ার আর কেহ জানে না। কিন্তু তাসিয়ানা আমার প্রস্তাবে মত দেয় নাই।

আমার প্রস্তাবে তাসিয়ানা তখন হাসিয়াছিল। সে হাসি কি এখন তার মনে আছে? বোধ হয়—না। কারণ, তারপরে সে কতবার হাসিবার অবকাশ পাইয়াছে। এত হাসির মাঝে সেদিনকার সে হাসি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, আপনারা তাহাকে মনে করিয়া দিবেন যে, "৫ই সেপ্টেম্বারে সে হাসিয়াছিল!" যদি সে অস্বীকার করে,—এবং সে অস্বীকার করিবেই-করিবে—তবে তাকে আবার মনে করাইয়া দিবেন যে, সে হাসিয়াছিল!

যে-আমি এমন সবল পুরুষ, যে-আমি আর কখনও চোখের জল ফেলি নাই, সেই-আমি তাহার সুমুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম, তাসিয়ানা তাহার ওষ্ঠ দংশন করিল। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাতদুটি বাড়াইয়া দিলাম। সে তাহার চোখ তুলিয়া চাহিল—সে চোখদুটি হাসিয়া উঠিল। আমার দুহাত নিসাড় হইয়া আবার পড়িয়া গেল। সে হাসিতে লাগিল এবং অনেক—অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল। যতক্ষণ না তার সাধ মিটিল, ততক্ষণ তার হাসিও থামিল না। অবশ্য, তারপরে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"দয়া করে আমাকে মাপ কর!"—তার চোখ তখনও হাসিতেছিল।

আমি—এমন-কি আমিও মৃদু মৃদু হাসিলাম। তাহার হাস্যের জন্য যদিও আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম,—কিন্তু আমার সে মৃদু হাস্যের জন্য আমাকে আমি কখনও ক্ষমা করিতে পারিব না!

৫ই সেপ্টেম্বার এই ঘটনা ঘটে। সহরের ঘড়ীতে তখন বেলা ছয়টা। আমি

এখনও সেই প্রকাণ্ড ঘড়ীর বৃহৎ, কালো কাঁটাদুটি পর্য্যন্ত চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—একটি কাঁটা উপর দিকে, আর একটি নীচের দিকে। আলেক্সিসও ঠিক ছয়টার সময়ে খুন হয়। কোন তীক্ষ্ণদৃষ্টির লোক এই সাদৃশ্য হইতে অনেক ব্যাপারের সঙ্কেত পাইবেন।

আজ যে আমি পাগলা-গারদে আছি, তাহার একটি কারণ এই যে, আমার অপরাধের কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই। এতক্ষণে কি আপনারা আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন? না—ইহা হিংসা নয়। আমার মত বুদ্ধিমান লোক তুচ্ছ হিংসায় জন্য কোন কাজ করে না।

প্রতিহিংসা? হাঁ, একটি পুরানো কথা দিয়া একটি নূতন ও অজানা ভাবকে যদি কতকটা তবু ফুটাইতে হয়, তবে 'প্রতিহিংসা' বলিলেও বলা যায়।

তাসিয়ানা দ্বিতীয়বার আমাকে ঠকাইল। সে কথা ভাবিলেও আমার রাগ হয়। আলেক্সিসকে আমি খুব ভালরকমেই জানিতাম। আমি তাই ঠাওরাইয়াছিলাম যে, আলেক্সিসের সঙ্গে আমি যদি তাসি-য়ানার বিবাহ দিতে পারি, তবে সে অত্যন্ত অসুখী হইবে। আমাকে বিমুখ করিয়াছে বলিয়া তাসিয়ানা তখন অনুতাপ করিবে। এই কারণে আমি তাহাদিগকে বিবাহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তাহারা তখনই পর-স্পরকে ভালবাসিত। সুতরাং বিবাহ হইয়া গেল।

মৃত্যুর একমাসমাত্র আগে আলেক্সিস একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জন্যেই আজ আমি এত সুখী। না তাসিয়ানা?" বলিয়া, সে তার স্ত্রীর দিকে ফিরিল।

তাসিয়ানা আমার দিকে চাহিল। মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।" তার চোখদুটি হাসিয়া উঠিল। আমিও মৃদুহাস্য করিলাম। আলেক্সিসও হাসিল। তারপরে তাসিয়ানাকে আলিঙ্গন করিল। আমার সুমুখে তাদের লজ্জাসরম কিছুই ছিল না।

আলেক্সিস বলিল, "তুমি কিন্তু হেরে গেছ বন্ধু, হেরে গেছ!"

এই যে কৌতুক—ইহা স্থানকালের যেমন অনুপযোগী, তেমনি কৌশলশূন্য। এই কৌতুক তাহার জীবনকে মৃত্যুর দিকে এক সপ্তাহ অগ্রসর করিয়া দিল। কারণ, আমি তাহাকে ডিসেম্বার মাসের আঠারোই তারিখের আগে মারিব না ঠিক করিয়া-ছিলাম।

হাঁ, বিবাহ করিয়া তারা দুটিতে বড় সুখে দিনযাপন করিতেছিল। বিশেষ, তাসিয়ানার আনন্দের মাত্রাটাই যেন বেশী ছিল। আলেক্সিস কিন্তু ততটা আবেগ-ভরে তাকে ভালবাসিত না। সে কোনরূপ গভীর স্নেহপ্রকাশে একেবারেই অপারগ ছিল। তার একমাত্র বাতিক ছিল, সাহিত্য। তাই লইয়া সে ভুলিয়া থাকিত। সংসারের দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। কিন্তু তাসিয়ানা! স্বামী বৈ আর কিছু সে জানিত না—সে একেবারে তৎসমর্পিত প্রাণ! আলেক্সিসের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। সে প্রায়ই অসুখ-বিসুখে পড়িত। সে-সময়ে তাসিয়ানা

প্রাণপণে স্বামীসেবা করিয়া আপনাকে যেন ধন্যজ্ঞান করিত। কারণ, রমণী যখন ভালবাসে, তখন তাহার নিজত্ব সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যায়।

এমনি, প্রতিদিন আমি তার হাস্য-রঞ্জিত মুখ দেখিতাম,—তাহা যৌবনপুষ্ট, অযত্নশোভন, পরমসুন্দর! আমি দেখিতাম, আর ভাবিতাম, "এর কারণ হচ্ছি আমি! মাণিক ফেলে সে কাঁচ পেয়েচে, এটা তাকে বোঝাবার জন্যে তার সঙ্গে আলেক্সিসের বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সব উল্টো হল—আমার ধূলো-মুঠি তার কাছে সোনা-মুঠি হয়ে দাঁড়াল',—যাকে সে ভালবাস্‌ত, তাকেই সে পেয়েছে! চমৎকার!"

আলিক্সিসকে খুন করিবার মৎলোব আমার মাথায় কখন ঢুকিল, সে কথা আমার মনে নাই। আমার মনে হইত, এ ইচ্ছা জন্মাবধি আমার সঙ্গে আছে। তাসিয়ানাকে যাতনা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাই আমি প্রথম-প্রথম এমন-সব উপায় খুঁজিতাম, যাতে বেচারা আলেক্সিস যতটা-সম্ভব কম কষ্ট পাইয়া মরিতে পারে। আমি সর্ব্বদাই অনর্থক নিষ্ঠুরতার বিরোধী।

নিজের জন্য আমার কোন ভয়-ভাবনা ছিল না—এটা একটা মস্ত কথা। যে দোষী, যে খুনী, তার কাছে পুলিশের ভয়, বিচারকের ভয়, দণ্ডের ভয়ই বড় ভয় নয়! সকলের চেয়ে বড় ভয় তার নিজের জন্য, তার বিবেক-বুদ্ধির বিদ্রোহের জন্য। এ বিষয় নিয়া আমি নাড়াচাড়া করিয়াছি। খুনের পরে আমার মনের ভাবকে আমি তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

আমি যাতনা পাইয়াছি সত্য,—ভীষণ যাতনা! তেমন যাতনা পৃথিবীর আর কেহ কখনও পায় নাই। আমার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে হচ্ছে আলাদা জিনিষ। একেবারে আলাদা জিনিষ। সে যে কি, তা জানি না—একটা ভয়ানক, আশাতিরিক্ত, স্বাভাবিক অথচ অসম্ভব কিছু! তবু—আমি যাতনা পাইয়াছি বটে, কিন্তু একটুও অনুতপ্ত হই নাই।

২

আমাকে এখন এই সমস্যা সমাধান করিতে হইবে, আলেক্সিসকে কি করিয়া খুন করি? আমি তাসিয়ানাকে জানাতে চাই যে, তার স্বামীকে মারিয়াছি আমি। সেই সঙ্গে আমি আইনের হাতও এড়াইতে চাই। খুণ করিয়া আমি জেলে গেলে তাসিয়ানা বড় খুসি হইবে। বিশেষ, (অন্যান্য সকলের মত) জেলে পচিয়া মরিবার জন্য আমার কোনই আগ্রহ ছিল না। জীবনকে আমি ভালবাসি,—অত্যন্ত!

জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া সুরার মত রাঙা ঐযে নবীন রবিকর আসিতেছে, আমি উহা দেখিতে ভালবাসি। নরম বিছানার উপরে আমি আমার শ্রান্ত তনুকে বিছাইয়া দিতে ভালবাসি। বসন্ত-বাতাসের উষ্ণ শ্বাসকে আমি ভালবাসি, অস্তসূর্য্যের মহিমময় শোভার ভিতরে আপনাকে আমি ডুবাইয়া দিতে ভালবাসি, সুলিখিত চিত্তাকর্ষক পুস্তক পড়িতে আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি—আপনাকে, আমার এই মাংস-পেশীর দৃঢ়তাকে, আমার এই নির্ম্মল, নির্ভুল চিন্তাধারাকে! আমি আমার

নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করিতে ভালবাসি—আমার এই আত্মার গভীরতাকে (এই কৃষ্ণদহ, যাহার তটে মস্তিষ্কের কল্পনা নৃত্য করে) কোন কৌতূহলী দৃষ্টি যে স্পর্শ করিতে পারে না, আমি ইহা অনুভব করিতে ভালবাসি। জীবনে অবসাদ? লোকে কেন যে এ-কথা বলে, তা কে-জানে!

আইন এড়ানো, আমার পক্ষে খুব সহজ। লুকাইয়া লোক মারিবার হাজার রকম উপায় আছে। বিশেষ, তুমি যদি, ডাক্তার হও, তাহা হইলে ত' কথাই নাই। আমিও ডাক্তার। আমি অনেক ফন্দী আঁটিলাম। একবার ভাবিলাম, আলেক্সিসকে কোন লুকানো অসুখে অসুখী করিয়া মারিব। কথাটা লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিলাম। কিন্তু, তার অসুখের সময়ে সেবা করিয়াও তাসিয়ানা ত' কতকটা সুখী হইতে পারে! না, তা হইবে না। আমি তাসিয়ানাকে জানাইতে চাই, কে তার স্বামীকে মারিয়াছে। এটা যে বিশেষ দরকার!

বুদ্ধিমানের পরমবন্ধু—দৈব, আমার সহায় হইল। খবরের কাগজে একদিন আমি একটি ঘটনা পড়িলাম। কোন কারবারের কেসিয়ার মৃগীরোগের ভাণ করে। সেই সময়ে তার কাছ থেকে অফিসের টাকা চুরি যায়। কিন্তু, আসলে টাকা চুরি করিয়াছিল সে নিজেই। লোকটা কাপুরুষ। কারণ, পরে সে আপনার দোষ মানিয়াছিল। কিন্তু, এই দৈব ঘটনা আমাকে পথ দেখাইল।

পাগল সাজিয়া আলেক্সিসকে খুণ করিলে কেমন হয়? ঠিক কথা! আমি এক বৎসর ধরিয়া মনোবিজ্ঞান-সম্বন্ধে যত বই বাহির হইয়াছিল, সমস্ত পড়িয়া ফেলিলাম।

বিশেষজ্ঞের মতে উন্মাদ বংশানুক্রমিক। আমার পিতা মদে আসক্ত ছিলেন। আমার এক খুড়া পাগলা-গারদে মরেন। আমার এক ভগ্নী মৃগীরোগে মারা যায়।

দেখিলাম, পাগলামির অভিনয় করা আমার পক্ষে কিছু শক্ত নয়। বই থেকে আমি অনেক পাগলের লক্ষণ জানিয়াছিলাম। এগুলিকে আমি কাজে লাগাইব। আমি সুপটু অভিনেতার মত অভিনয় করিব।

আমার মাথায় এক দুর্ভাবনা আসিল,—কোন পাগলের মাথায় যাহা আসে না। আমার এই পরীক্ষার ভীষণ বিপদের কথা মনে হইল। আপনারা আমার কথার মানে বুঝিতেছেন? পাগলামি, আগুনের মত; তাহা নিয়া খেলা করিলে সর্ব্বনাশের ভয় আছে। গুহার ভিতরে বারুদ পূরিয়া তুমি যদি তাতে আগুন দাও, তাহা হইলে হয়ত তুমি নিরাপদে থাকিতেও পার; কিন্তু উন্মাদ-ভীতির এককণাও যদি তোমার মাথায় কোনগতিকে ঢুকিয়া পড়ে, তবে তুমি একেবারেই গিয়াছ। আমি ইহা জানিতাম! আমি ইহা জানিতাম! কিন্তু, বিপদভয়ে কোন সাহসীর বুক দমে?

৩

সেদিনকার নিমন্ত্রণ-সভায় আমি বদ্ধ পাগলের মত যে কেলেঙ্কারিটা করিয়াছিলাম, তার কারণ আর বোধ করি, খুলিয়া বলিতে হইবে না। কারগুয়ানফের

বাড়ীতে আমার প্রথম পরীক্ষাটা আশাতীত-রূপে সফল হইয়াছিল।

তাসিয়ানা ও আলেক্সিস সেদিনকার আসরে উপস্থিত ছিল না। আমি আগে থাকিতেই জানিতাম, তারা আসিবে না। তারা থাকিলে আমি পাগলামি করিতাম না। কারণ, তাসিয়ানা হয়ত' তাহা হইলে ভীত ও সন্দিগ্ধ হইত। পৃথিবীতে যদি কেহ এমন লোক থাকে, যে আমাকে চিনিয়াছে,—তবে সে তাসিয়ানা।

ঠিক করিয়াছিলাম, খাইতে বসিয়া আমি পাগলামি করিব—নিমন্ত্রিতেরা তখন সুরা পানে উত্তেজিত থাকিবে। টেবিলের যে দিকটায় ল্যাম্প ছিল, সেদিকটায় আমি বসিলাম না। কারণ, সেদিকে গোলমাল করিলে হঠাৎ একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া আমার নিজেরই পুড়িয়া মরিবার ভয় ছিল।

আমি পেট্রোভিচের পাশে গিয়া বসিলাম। এই মোটা ও ঘৃণিত জীবটাকে কিছু শিক্ষা দি,—আমার বরাবর এমন একটা সাধ ছিল। এ-লোকটা যখন খাইতে বসিত, বিশেষ করিয়া তখনই সে বিরক্তিকর হইয়া উঠিত। প্রথম যেদিন তাহাকে আহার করিতে দেখি, সেদিন আমার মনে হইয়াছিল যে, ভোজন করাটাও ব্যভিচাররূপে গণ্য হইতে পারে।

প্রথমে আমি হাত ঘুরাইয়া পেট্রোভিচের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা কহিতে কহিতে পাগলামি সুরু করিলাম। পেট্রোভিচ্ তার ছোট্ট কুৎকুতে চোখদুটো যতটা-পারা-যায় ডাগর করিয়া অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপরে আমি দুঃখিত ও হতাশের মত ভাবধারণ করিলাম।

শ্রীমতী প্যাভ্‌লোভনা, মিষ্টস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ আণ্টনি, তোমার কি হয়েচে? তুমি অমনধারা বিষণ্ণ হয়ে আছ কেন?"

যখন সকলের চোখ আমার উপরে পড়িল, আমি তখন একটু বিষাদের হাসি হাসিলাম।

"তোমার শরীর কি ভাল নেই?"

"না, বড় ভাল বোধ করছি না। আমার গা কেমন-কেমন করচে—মাথা ঘুরচে। কিন্তু আমার জন্যে তোমরা কেউ ব্যস্ত হয়ো না। আমি এখনি ভাল হয়ে উঠব।"

কিন্তু, গাধা পেট্রোভিচ্ আমার কথায় তেমন আশ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে ও অপছন্দের সহিত চোখের এক-কোণ-দিয়া ঘন ঘন আমার দিকে তাকাইতে লাগিল! একটু পরেই, যেমনি সে একান্ত পরি-তৃপ্তের মত এক গেলাস্ মদ ঠোঁটের কাছে তুলিয়া ধরিল, অমনি আমি তার নাকের ঠিক তলা থেকে ঘুসি মারিয়া গেলাসটি চুর্‌মার্ করিয়া দিলাম। তারপরে আমি মেজের উপরে সশব্দে আর এক ঘুসি মারিয়া কাঁচের থালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। পাছে কাঁচের টুক্‌রা লাগিয়া আমার হাত কাটিয়া যায়, সেই ভয়ে আমি মুখ মুছিবার তোয়ালেখানা আগে থালার উপরে রাখিয়া তবে ঘুসি মারিয়াছিলাম। আমার এ চালাকি কারুর নজরে ঠেকিল না।

ভাঙ্গা কাঁচগুলা চারিদিকে ছিট্‌কিয়া পড়িল। পেট্রোভিচ্ মহা খাপ্পা হইয়া,

শুয়ারের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতে করিতে বিষম গোলমাল বাধাইয়া দিল। স্ত্রীলোকেরা সরু গলায় চীৎকার সুরু করিল। আমি দাঁতে দাঁত লাগাইয়া মেজ-ঢাকা চাদরখানা সমস্ত জিনিষের সঙ্গে টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম। সে এক মজার ব্যাপার—একেবারে প্রহসনের দৃশ্য!

সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কেহ আমার জন্য জল আনিয়া দিল, কেহ আমাকে লইয়া গিয়া একখানা আরাম কেদারায় বসাইয়া দিল। আমি চোখ পাকাইয়া বাঘের মত গোঁ-গোঁ করিতে লাগিলাম। লোকগুলো এতটা নির্ব্বোধ যে, আমার ন্যাকামি তারা মোটে বুঝিতেই পারিল না। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, সেই বোকাগুলোর নাক ঘুসির চোটে থ্যাঁৎলাইয়া দি! কিন্তু এ প্রলোভন আমি সংবরণ করিলাম।

তারপর আমি ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলাম। প্রথমে আমি টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলাম, তারপর দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিলাম, তারপরে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। সব-শেষে অস্পষ্টস্বরে দস্তর-মাফিক জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কোথায়? কি হয়েচে?"

হাব্‌লা লোকগুলো আমার চালাকি টের্ পাইল না।

একমাস পরে, আমার দ্বিতীয় পাগলামির অভিনয় হইল। এবারে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু অনুকূল অবস্থা পাইয়া, সে সুযোগ ছাড়িয়া দিয়া আমি বোকামি করিলাম না। সেদিন যা যা ঘটেছিল, আমার সব ঠিক্‌ঠাক্ মনে আছে।

সেদিনও আমি এক বন্ধুর বাড়ীতে জম্‌কালো আসরে বসিয়াছিলাম।

একঘর লোক। বসিয়া বসিয়া সবাই গল্পগুজব করিতেছে। হঠাৎ আমার মনটা কেমন উদাস হইয়া গেল। আমার মনে হইল, দুনিয়ায় আমি একা—আমি একা। সকলের কাছে আমি অচেনা আগন্তুকমাত্র। একাকী আমি আপনার ভিতরে চিরকালের তরে বন্দী হইয়া আছি। তারপরে আমি আমার চারিদিককার লোকগুলার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলাম। আমার মনে ভয়ানক রাগ হইল। আমি মুঠা করিয়া হাত ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে অভদ্র ভাষায় চেঁচাইতে লাগিলাম। সকলের মুখে আতঙ্কের চিহ্ন দেখিয়া আমার প্রাণমন খুসি হইয়া উঠিল।

চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওরে অভাগার দল! ওরে আত্মতুষ্ট, পাপী পশুর দল! ওরে কলঙ্কী সব! আমি তোদের ঘৃণা করি! আমি তোদের ঘৃণা করি!"

আমি নির্দ্দয়ভাবে প্রথমে অতিথিদের, তারপরে তাদের কোচম্যান ও ভৃত্যদের উপরে কিল-চড়-ঘুসি চালাইতে লাগিলাম। তাদের মুখের উপরে তারা যে কি, স্পষ্টাস্পষ্টি সব খুলিয়া বলিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল।

যে সত্য বলে, সে কি পাগল?

সে রাতে একলা বাড়ীতে ফিরিয়া সমস্ত কথা মনে করিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

আপনা-আপনি বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য অভিনেতা আমি!"

তারপরে আমি একখানা বই হাতে করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাদ। সেখানা কি বই? আমি গ্রন্থকারের নাম বলিতে পারি—গী দে মোঁপাসা। মোঁপাসার লেখা আমার বড় ভাল লাগে।

গল্প শেষ করিয়া, শিশুর মত নিশ্চিন্ত ভাবে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। পাগলে কি বই পড়ে? বই পড়িয়া তারা কি আনন্দ পায়? পড়া শেষ হইলে তারা কি শিশুর মত ঘুমাইতে পারে?

পাগলে ঘুমায় না। তারা কষ্ট পায়। মস্তিষ্কের ভিতরেই তাদের যত গোলযোগ। হ্যাঁ, তাদের সুমুখে সব গোলমেলে, ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা ও টল্‌মলে। তারা চেঁচাইতে চায়, আঁচ্‌ড়াইতে চায়, হাত কামড়াইতে চায়। তারা চার হাতপায়ে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিতে চায় এবং তারপরে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে চায়, "হাঃ! হাঃ!"

এবং তারা হাসিতে চায়। আবার চেঁচাইতে চায়। তাহারা গর্জ্জন করিতে চায়,—দুঃখিতের মত, দুঃখিতের মত!

হাঁ,—হাঁ!

আমি শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িলাম। পাগলে কি ঘুমায়?

৪

আমার দ্বিতীয়বারের পাগলামির পরে লোকে আমাকে ভয় করিতে আরম্ভ করিল। তারা আর আমাকে নিমন্ত্রণ করিত না। দৈবাৎ কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, অর্থসূচক স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "কি বন্ধু, কেমন আছ?"

তখন অবস্থাটা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, আমি কোনরূপ অত্যাচার করিলে, সে জন্য আমাকে কেহ দোষী করিত না। কিন্তু আমার অতীত ও ভবিষ্য পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সরকারি হুকুম পাইলে ঢের্ সুবিধা হইবে। অতএব, আমি তখন সেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কোন ডাক্তারের অনুকূল অভিমত পাইলেই আমার চলিয়া যাইবে। আমি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলাম।

বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। তাসিয়ানা ও আলেক্সিসই সে সুবিধা করিয়া দিল।

তাসিয়ানা বলিল, "প্রিয় আণ্টনি, আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বলি।"

এর আগে তাসিয়ানা আমাকে কখনও "প্রিয়" ডাকে ডাকে নাই। এ-হেন অনুগ্রহ পাইবার জন্য আমাকে আগে পাগল বনিতে হইয়াছে!

"বেশ ত, আমি যাব অখন।"

তাসিয়ানা, আলেক্সিস ও আমি,—এই তিনজনে তখন পাঠগৃহে দাঁড়াইয়া ছিলাম। এই ঘরেই পরে হত্যার অভিনয় হইবে।

আলেক্সিস মুরুব্বিআনা চালে কহিল, "হ্যাঁ, তোমার আর কালবিলম্ব না করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। নইলে, তুমি যে কখন কি ফ্যাঁসাদ বাধিয়ে বস্‌বে, তা ভগবানই জানেন।"

দোষ থেকে আপনাকে খালাষ রাখিবার

জন্য আমি দুর্ব্বল ও বিনীত স্বরে কহিলাম, "আমি আর এমন কি করতে পারি?"

"কে জানে তুমি কি কর্ব্বে! হয় ত' কোনদিন কার মাথাই ভেঙ্গে দুফাঁক্ করে দেবে!"

আমি টেবিলের উপর হইতে একটা ধাতুনির্ম্মিত ভারি কাগজচাপা তুলিয়া লইলাম। একেবার আলেক্সিসের দিকে, আর একবার কাগজচাপার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কারুর মাথা ভাঙ্গব বল্‌চ'? মাথা?"

"হাঁ, তা নয়ত' আর কি! তুমি কোন দিন হঠাৎ ঐ কাগজ-চাপাটার মত একটা কিছু হাতে করে তুলে নেবে, আর কাজও তখনি ফর্সা হয়ে যাবে!"

ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিতেছে। আমি এই কাগজ-চাপাটা দিয়েই যে-মাথাটা ভাঙ্গব ঠিক করেচি, চূর্ণ হবার আগে ঠিক সেই মাথার ভেতরেই ঠিক্ সেই চিন্তাটাই ঢুকেচে! তথাপি, এমন লোকও আছে, যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে বিশ্বাস করে না! কি ভ্রম!

আমি বলিলাম, "এই কাগজ চাপাটা দিয়ে মার্‌লে কারুর বেশা কিছু লাগ্‌বে না।"

"ক্যানো, তুমি কি বলতে চাও এটা খুব হাস্‌কা?" বলিয়া, আলেক্সিস আমার হাত থেকে কাগজ চাপাটা নিয়া তার হাতল ধরিয়া দু'একবার দুলাইয়া দেখিল। তারপর কহিল, "আচ্ছা, তুমি একবার পরীক্ষা করে দেখ।"

আমি কহিলাম, "আমি বেশ ভাল করেই দেখেচি।"

৪

"না, না—একবার ছাখই না কেন! তাহলেই তুমি বুঝ্‌তে পারবে।"

অপ্রসন্ন ভাবে, অথচ মৃদুহাস্যের সহিত আমি তার হাত থেকে সেই ভারি কাগজ-চাপাটা লইলাম। এমন সময়ে তাসিয়ানা আসিয়া বাধা দিল। কম্পমান ওষ্ঠে, বিবর্ণ মুখে সে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল, "আলেক্সিস, থাম—থাম! ওসব কথায় কাজ নেই!"

আলেক্সিস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ক্যানো, হয়েচে কি?"

"তোমরা কি-সব ছাই কথা বল্‌চ? জান, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না!"

তখন আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। কাগজ চাপাটা যেখানে ছিল, সেইখানেই আবার রাখিয়া দেওয়া হইল।

প্রফেসর টি—র কাছে গেলাম।

আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। তিনি খোঁজ নিলেন যে, আমাকে যত্ন করিতে পারেন, আমার এমন আত্মীয় আছেন কিনা! তিনি উপদেশ দিলেন, আমি যেন এখন চুপচাপ বাড়ীতে বসিয়া বিশ্রাম করি। আমি নিজে ডাক্তার বলিয়া, অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিলাম। ফলে, আমার পাগলামির বিষয়ে তাঁহার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আমার আর কোন আশা নাই—আমি বদ্ধপাগল। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আলেক্সিসের জীবন আমার মুঠার ভিতরে আসিল।

আলেক্সিস নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি

অত্যন্ত অমনোযোগী ছিল। তাসিয়ানা একদিন আমার কাছে আসিল। আমি আলেক্সিসের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ভালই আছে। আমার মুঠার ভিতর হইতে পাছে যম তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়, আমার এই এক ভয় ছিল। তাসিয়ানা যাহাতে সন্দেহ না করিতে পারে, সেইজন্য এ-সময়টা আমি খুব সহজ-ভাবে ব্যবহার করিলাম। আলেক্সিস বা তাসিয়ানা,—কেহই আমার পাগলামির অভিনয় দেখে নাই। আমি যে পাগল, একথা মনে করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তাসিয়ানা যাইবার সময়ে বলিল, "আমাদের বাড়ীতে গিয়ে একবার দেখা কোরো।"

আমি বলিলাম, "সে ত আমি পার্‌ব না—ডাক্তারের নিষেধ যে!"

"বোকার মত কি তুমি বল্‌চ! না, তুমি আসতে চাও। তোমার আর আমাদের বাড়ীতে তফাৎ কি? বিশেষ, আলেক্সিস তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার্ জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেচে।"

কথা দিলাম, যাইব। আমি যে কথা রাখিব, তাহাত' নিশ্চয়! কথা-রাখা সম্বন্ধে এতটা নিঃসন্দেহ আমি এর আগে আর কখনও হই নাই।

১১ই ডিসেম্বার, সন্ধ্যা পাঁচটার সময়ে আমি যখন আলেক্সিসের পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম, তখন সেই কাগজচাপাটা ঠিক স্বস্থানেই ছিল। সেখানে আলেক্সিস ও তাসিয়ানা—দুজনেই বসিয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া তারা খুব খুসি হইল।

আলেক্সিস আমার হাত ধরিয়া বলিল, "তাসিয়ানার মুখে শুন্‌লাম, তুমি বেশ ভাল রকমেই সেরে উঠেচ। নইলে, আমি নিজেই তোমাকে দেখ্‌তে যেতাম। আজ আমরা থিয়েটারে যাব। তুমিও যাচ্চ ত?"

তারপর আমরা গল্পগুজবে মাতিয়া উঠিলাম। আমি দিব্য ভাল-মানুষের মত পরিষ্কার ভাষায় কথা কহিতে লাগিলাম। কিন্তু কথা কহিতে কহিতে আমি বরাবর ঘড়ির ছোট কাঁটাটির দিকে চাহিয়া ছিলাম। ঐ কাঁটা যখন ছ'য়ের ঘরে ঠেকিবে, আমি তখন হত্যাকারী হইব!

ছয়টা বাজিতে সাত মিনিট দেরি। আলেক্সিস, আলস্যভরে সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আমি এখনি ফিরে আস্‌চি।" বলিতে বলিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তাসিয়ানার সঙ্গে চোখোচোখি হয়, এ আমার ইচ্ছা নয়। আমি জানালার কাছে গেলাম। পর্দা সরাইয়া দিয়া, বাহিরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি দেখিতে না পাইলেও বুঝিলাম যে, তাসিয়ানা আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিলাম। এবং বুঝিলাম যে, সে জানালার দিকে তাকাইয়া নাই—সে চাহিয়া আছে, আমার দিকেই! আমি তবু চুপ করিয়া রহিলাম। তাসিয়ানা বলিল, "বাইরে বরফ কেমন চক্‌চক্ কর্‌চে!"

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

"আণ্টনি!" আমাকে ডাকিয়াই সে থামিয়া গেল।

আমি তখনও স্তব্ধ।

সে কম্পিতস্বরে আবার ডাকিল, "আণ্টনি!"

আমি তার দিকে চাহিলাম।

সে টলিতে টলিতে পড়িয়া যায়-যায় হইল—যেন আমার চক্ষু হইতে একটা তীব্র তেজ তাহাকে ধাক্কা মারিয়াছে। এমনি সময়ে আলেক্সিস ঘরে ঢুকিল। তাসিয়ানা এক লাফে তার স্বামীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

অস্ফুটস্বরে সে বলিল, "আলেক্সিস! আলেক্সিস! আণ্টনি—"

"একি?"

হাস্যহীন মুখে এবং মনের আনন্দকে ঢাকা দিবার জন্য আমার স্বরকে নীচু করিয়া বলিলাম, "তাসিয়ানার বিশ্বাস হয়েচে যে, এই জিনিষটা দিয়ে আমি তোমাকে খুণ কর্ত্তে চাই।"—বলিয়া, অত্যন্ত শান্ত ভাবে, আমি সোজাসুজি টেবিলের কাছে গিয়া কাগজচাপাটা তুলিয়া নিলাম এবং আলেক্সিসের নিকটস্থ হইলাম।

আলেক্সিস বিবর্ণ, নিস্পলকনেত্রে আমার দিকে চাহিল। আমার কথাকে আবৃত্তি করিয়া বলিল, "তাসিয়ানার বিশ্বাস—"

"হ্যাঁ, তার বিশ্বাস হয়েচে!"

আস্তে আস্তে সহজ ভঙ্গীতে আমি আমার হাত তুলিলাম,—সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সিসও তার হাত তুলিতে লাগিল। তখনও সে আমার মুখের দিকে, তেমনি চাহিয়া আছে।

কঠিন কণ্ঠে আমি বলিলাম, "নামাও হাত!"

তার হাত অবশ হইয়া পড়িয়া গেল। অপলক চোখে তখনও সে আমার দিকে চাহিয়া ছিল। তার ওষ্ঠে কেবল একটা পাণ্ডুর, সন্দেহপূর্ণ হাসির রেখা দেখা যাইতেছিল। তাসিয়ানা কি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—কিন্তু, তখন আর সময় ছিল না! কাগজচাপার তীক্ষ্ণ দিকটা দিয়া, আলেক্সিসের চোখের উপরে নহে—তার ভুরুর কাছে, রগ্ ঘেসিয়া আমি আঘাত করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি তাহাকে অনেকবার আঘাত করিয়াছি,—কারণ, তার মাথা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। ইহা সত্য নহে। আমি আলেক্সিসকে তিনবার আঘাত করিয়াছি,—তিনবার মাত্র! প্রথম আঘাত যখন সে দাঁড়াছিল, বাকী দুবার সে পড়িয়া গেলে পর মারিয়াছি।

একথা সত্য যে, আঘাত অতি সজোরে হইয়াছিল। কিন্তু, তিনবারের বেশী মারি নাই। সব কথা আমার বেশ মনে আছে। আলেক্সিসকে আমি তিনবার মারিয়াছি।

(৫)

রাত্রির অন্ধকার শ্রান্ত স্নায়ু-যন্ত্রকে অত্যন্ত অভিভূত করে। এইজন্য, সে সময়ে এমন-সব ভাবনা আমাদের মনে আসে, যাতে আমরা ভয় পাই। খুণের পরে যখন রাত আসিল, তখন আমার প্রাণমন স্বভাবতঃই অসাধারণ উত্তেজনার বশীভূত হইয়া পড়িল। আমার অবস্থায় পড়িলে খুব বেশী আত্ম-সংযম থাকা দরকার; একটা লোক খুণ করা ত বড় যে-সে কথা নয়!

কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া, পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন হইয়া আমি চা-পান করিতে বসিয়া, আমার দাসী মেরিয়াকে ডাকিলাম। তার সঙ্গে আমি বরাবর সদয় ব্যবহার করিতাম। আমার পাগলামির কথা সে কিছু জানিত না। তবু সে,—কেন জানিনা—আমাকে দেখিয়া ভয় পাইল। আমার কাছে আসিতে চাহিল না।

আমি মনে-মনে বলিলাম, "হু! তাহলে দেখ্‌চি আমার ভেতরে এমন-কিছু আছে, যা সাধারণের ভেতরে নেই—যার জন্যে লোকে আমাকে দেখে ভয় পায়।

পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া, আমি শুইয়া পড়িলাম। আমার তখন আদোপেই বই পড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আমার শ্রান্ত দেহ তখন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। আপনার ভূমিকা সুন্দররূপে অভিনয় করিবার পর কোন অভিনেতার যেমন দশা হয়,—আমার দশাটাও তখন অনেকটা সেই রকম।

আমার চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল। আমি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমার মস্তিষ্কে এক নূতন ভাবনা আসিয়া জুটিল। আমার অন্যান্য চিন্তার মত ইহাও পরিষ্কার, নিখুঁত, সরল! এ চিন্তা ধীরে ধীরে আমার ভিতর ঢুকিল। সে যেন কোন লোকের মত বলিল:—

"খুব সম্ভব, ডাক্তার কারজেণ্টযেফ সত্যই পাগল। তিনি পাগলামির অভিনয় করিতেছেন বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু আসলে তিনি নিজেই পাগল। এখনই তিনি পাগল।"

আমার মস্তিষ্কে এই চিন্তাটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হাসিতে লাগিলাম।

"তিনি পাগলামির অভিনয় করিতেছেন বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু তিনি সত্যই পাগল। এখন,—এই মুহূর্ত্তেই তিনি পাগল।"

প্রথমে ভাবিলাম, আমার দাসী মেরিয়া এই কথাগুলি বলিতেছে;—কারণ, আমি যেন একটা স্বর শুনিতে পাইতেছিলাম; আর, সে স্বর মেরিয়ার। তারপরে ভাবিলাম, সে স্বর আলেক্সিসের। 'হাঁ, নিহত আলেক্সিসের। শেষটা বুঝিলাম, না,—এ আমারই চিন্তা। কি ভয়ানক কল্পনা!

আমি মুঠা করিয়া আমার চুল চাপিয়া ধরিলাম—আমি লাফাইয়া উঠিলাম। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া—কেন জানি না—আমি বলিলাম:—

"বটে—এমনধারা! তাহলে সব শেষ! আমি যা ভয় কর্‌ছিলাম, তাই হল। আমি একেবারে সীমার কাছে সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিলাম,—এখন ভবিষ্যৎ আমাকে উন্মত্ততা দান কর্‌তে চাইচে!"

আমাকে যখন গ্রেপ্তার করিতে আসিল, আমার অবস্থা তখন ভয়ানক। আমার কাপড়চোপড় সব ছেঁড়াখোড়া; কিন্তু, ভগবান দোহাই, সেদিনকার মত সন্ধ্যা-কালটা তেমন অবস্থার ভিতরে কাটাইয়াও আমি যে পাগল হইয়া যাই নাই,—ইহাতেই কি আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা প্রমাণিত হইতেছে না? আমি সেদিন

কাপড়-চোপড় ছেঁড়া ও আয়নাগুলি ভাঙ্গা ছাড়া আর কোন অন্যায় কাজ করি নাই। কিন্তু, এই সঙ্গে তোমাদের আর একটা কথাও বলিয়া রাখি। সে রাতে আমাকে যে-রকম যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, যদি কখনও তোমাদের কারুকে সে-রকম যাতনা ভোগ করিতে হয়, তবে তোমার ঘরের আয়নাগুলিকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়ো। ঢাকিয়া রাখিয়ো—ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়ো!

তারপর, যতক্ষণ না পুলিশ আসিল, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত আর কি হইয়াছিল,সে সব কথা আমার কিছুই মনে নাই। আমি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, কটা বাজিয়াছে?

"বেলা ন'টা।"

আলেক্সিসের মৃত্যুর পরে যে সবে তিন ঘণ্টা কাটিয়াছে, একথা আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

কিন্তু, একটা ব্যাপার আমার বেশ মনে আছে। আমার সেই চিন্তা—কিংবা—সেই স্বর! অন্ততঃ,—সেটা সত্য।

"ডাক্তার কার্‌জেণ্টযেফ ভাবিয়াছেন যে, তিনি পাগলামির ভাণ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে তিনি পাগল।"

আমি এইমাত্র আমার নাড়ী পরীক্ষা করিলাম,—একশো আশীবার কাঁপিল। সেই স্বরের স্মৃতি মনে হইবামাত্র আমার হৃদয় এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে!

(৬)

মহাশয়গণ,

আপনারা সকলেই বৈজ্ঞানিক। অতএব, আপনাদের কাছেই আমি একটা উত্তর চাই। আপনারা স্বভাবতঃই পরস্পরের সঙ্গে একমত হইবেন না। কিন্তু আমি আপনাদের সকলকার কথাই বিশ্বাস করিব। কেবল, আমার এই প্রার্থনা যে, আপনারা আপনাদের মত প্রকাশ করুন! এখানে আমি আর একটি তুচ্ছ, কিন্তু চিত্তাকর্ষক ঘটনা বলিব। ইহাতে আপনাদের মতগঠনের সুবিধা হইতে পারিবে।

আমি এখন পাগলা-গারদে। এক শান্ত প্রভাতে, এখানে একদিন আমার শুশ্রূষা-কারিণী ধাত্রী হঠাৎ আমার কাছে থেকে সরিয়া গেল। তার ভাব দেখিলে মনে হয়, সে যেন হঠাৎ কি-একটা অজানা কারণে ভয় পাইয়াছে।

আমি তখন বিছানার উপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, অতঃপর, কি করা যায়! তারপরে দেখিলাম, আমি এক অদ্ভুত কাজ করিতে চাই। আমি,—ডাঃ কারজেণ্টযেফ্‌—কুকুরের মত চীৎকার করিতে চাই!

আমার সাধ হইতেছিল, কাপড়-জামা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ও আপনাকে আপনি আঁচ্‌ড়াইতে! জামার কলারে প্রথমটা আস্তে আস্তে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিয়া তারপর হঠাৎ একটানে কলার থেকে নীচে পর্য্যন্ত পড়্‌পড় করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছিল! আমার বাসনা হইল,—আমি ডাক্তার কার্‌জেণ্টযেফ্‌,—আমার বাসনা হইল, হাঁটু ও হাত পাতিয়া হামাগুড়ি দি!

চারিদিক তখন স্তব্ধ। জানালার সার্শিতে তুষার-কণা ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল।

অদূরেই আমার ধাত্রী নীরবে প্রার্থনারত। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা ভাবিলাম। আমি যদি ঘেউ-ঘেউ করি, তবে একটা শোর্‌গোল পড়িয়া যাইবে ও আমার দুর্ণাম রটিবে। যদি আমি জামা ছিঁড়ি, কাল সকলে তাহা টের্ পাইবে। আচ্ছা, তবে সুধু হামাগুড়িই দেওয়া যাক্! তাহাহইলে, কেহ কিছু শুনিতে পাইবে না। আর সে সময়ে যদি কেহ আমার ঘরের ভিতর আসিয়া পড়ে, তবে বলিলেই চলিবে যে, আমার একটা বোতাম হারাইয়া গিয়াছে, আমি তাহাই খুজিতেছি।

তারপরে ভাবিলাম, "আচ্ছা, সুধুসুধু আমি হামাগুড়িই বা দিতে চাই কেন? তবে, সত্যই কি আমি পাগল?"

ভয়ে আমার গায়ে কাটা দিয়া উঠিল। আমার প্রাণে একটা আকস্মিক দুর্দ্দম বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল যে, হাঁ—একসঙ্গে আমি তিনটা কাজই করিব,—আমি ঘেউ-ঘেউ করিব, হামাগুড়ি দিব, আপনাকে-আপনি আঁচ্‌ড়াইব। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি হামাগুড়ি দিতে চাও?"

কোন উত্তর নাই!

"তুমি হামাগুড়ি দিতে চাও?"

তখনও উত্তর নাই।

"দাও তবে হামাগুড়ি!"

জামার আস্তিন উল্টাইয়া আমি চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে লাগিলাম। ঘরের আধখানা-বরাবর এমনি হামাগুড়ি দিয়া আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া, যেখানে ছিলাম সেইখানেই বসিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম, হাসিতে লাগিলাম, হাসিতে লাগিলাম।

হঠাৎ আমার এমন নির্ব্বুদ্ধির মত ইচ্ছা হইল কেন, আমি বসিয়া-বসিয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। আমার কপট পাগলামির কল্পনা হইতেই এই উন্মত্তের মত ইচ্ছার উদয় হইয়াছে। এ ইচ্ছা যেই পূর্ণ হইল, অমনি বুঝিলাম যে, আমি পাগলা নৈ। আমি যে কারণ দেখাইলাম, তাহা অতি সরল ও যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু—

কিন্তু তবু আমি হামাগুড়ি দিয়াছি ত'! আমি কি পাগলের মত আত্মপ্রবোধ দিতেছি, না, বিচার-বুদ্ধিমান হইয়াও পাগল হইতে বসিয়াছি?

মহাশয়গণ, আমাকে সাহায্য করুন। এই ভীষণ, এই নির্দ্দয় সমস্যা পূরণ করুন। আপনাদের মত শুনিবার জন্য আমি অতি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছি। বলুন—আমি কি? পাগল?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল*

[টিকীন্দ্রজিদ্দেবতা। টিকি দাসো ঋষিঃ। টিক্‌টিক্ ছন্দঃ। টিট্‌কার্য্যাং বিনিয়োগঃ]

মূল গায়েন।—

ভো ভোঃ কারণ-সলিলে কুঁকুড়িসুকুড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা ছিল চইতন চুট্‌কি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ!
তারে 'চই' 'চই' করি আদিম আঁধারে
ডাকিল সপ্ত ঋষি গো,
তাই 'চইতন' নাম হইল তাহার
যে নামে ভরিল দিশি গো!
তারে ব্রহ্মা কহিলা "টিকিয়া থাকহ"
তাই তারে "টিকি" কয়,
আহা মগজ-আগুন-অঙ্গার টিকি
টিকি সামান্য নয়।

দোহার কী-গোহার।—
এ-রি-নুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ,—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

হাঁ হাঁ টিকির প্রভাবে টিকিয়া রয়েছি
টিকিতেই বাঁধা বিশ্ব,
আর টিকি না থাকিলে হইত দুনিয়া
টিক্‌টিকি চেয়ে নিঃস্ব!
ওগো টিকি যেই রাখে ধর্ম্ম মোক্ষ
পায় সেই হাতে হাতে,
দেখ বিপুল টিকির বহরে উড়িয়া
বেঁধেছে জগন্নাথে!

তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই,
টিকি মূলে ঢাল তৈল,
আহা যেতে ভবপার বিনা পয়সার
টিকিট যে টিকি হৈল!

দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-নুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

আহা কামনা-বহ্নি অন্তরে যার
প্রেমিক হইবে যেবা,
ওগো সেইজন জানে টিকির কদর,
সেই করে টিকি সেবা।
আর টিকি না রাখিলে প্রেমিকই হয় না
শাস্ত্রে রয়েছে লেখা,
যখন প্রেমে হাবুডুবু লোকে বলে "আহা
টিকিও না যায় দেখা!"
টিকি রোমিয়োরও ছিল, হোমিয়প্যাথিক
ইথে নাই কোনো ভুল,
পোড়ো মগজ-মহলে মাকোষা ঢুকিলে
বেরুবেই টিকি ঝুল।
ওগো মোক্ষ ও কাম পূরা হ'বে,—হও
থরকাটা প্রেমচাঁদ,
ওরে টিকি রাখ্ তোরা ভব-দরিয়ায়
টিকির জাঙাল বাঁধ।

---

* জঙ্গল মহলের অন্তর্গত রামটিকি পর্ব্বতের 'আঠারো ঘা' নামক গুহা হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং উক্ত ভদ্রমহোদয়ের অনুমত্যানুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-নুম্!--টেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—
ওগো টিকি রাখ যদি অর্থও পাবে
অর্থই যদি চাও,
তখন চোরাই চাল্‌তা টিকিতে বাঁধিয়া
হাত নাড়া দিয়া যাও।
আর টাকাটা সিকিটা দক্ষিণা পাবে
হজ্‌মী টিকির জোরে,
আর রাতের ফাউল্ প্রভাত না হতে
ফেলিবে হজম ক'রে।
কহ— কুড়ি দরে তুমি মুর্গী কিনিতে?
বয়স যখন কাঁচা?—
বাপু! অধম-তারণ টিকি রাখ মাথে
ভয় কি তোমার বাছা?
দেখ ধর্ম্ম মোক্ষ অর্থ ও কাম
সকলই টিকির ন্যাওটা
ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর
কে ধরে তখন ম্যাওটা?

দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-নুম্—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—
ওগো শুধু 'এক' লেখ অর্থ হবে না
এলেক্‌টি দাও দিকি,
তখন একের অর্থ হবে এক টাকা
অঙ্কে এলেক্—টিকি।
ওই এলেক্-টিকির দোহাই না দিলে
তারের খবর বন্ধ
তোমরা এলেক্-টিকি তো দিব্যি মান হে
টিকির বেলাই সন্দ'?
দেখ বৃক্ষের টিকি শিকড়,—সটিকি
ডিগ্‌বাজী খায় বৃক্ষ,
আর বৃত্তের টিকি 'ট্যাঙ্গেণ্ট',—কোথি
নাই টিকি দুর্ভিক্ষ।
ওগো আমরা টিকির, টিকি আমাদের
ঢাল তেল টিকিমূলে,
আর টাকে যদি টিকি নেহাৎ ঘোচায়
(টিকি) বানাইব পরচুলে।

দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-নুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—
দেখ দেবতার টিকি ছিল কিনা ছিল
শাস্ত্রে লেখে না তাহা,
তবে বিচারের মুখে সূক্ষ্ম টানিলে
বাহিরিবে টিকি ডাহা।
যথা ব্রহ্মার টিকি নাভির মৃণাল,
তৃতীয় চরণ বিষ্ণুর,
আর মহেশের টিকি জটাজালে ঢাকা,
টিকি প্রতি শিব নিষ্ঠুর।
আর গণেশদাদার শুঁড়ময়ী-টিকি
দাদার টিকিটি খাসা;
আর আদি বৈষ্ণব গরুড়ের টিকি
তার সে টিকল নাসা!
আর সূর্য্যের টিকি রাহুর মুঠায়
রাহুর টিকি সে কোথা গো?

বুঝি রাহুর টিকিটি অন্তঃশীলা
যেন ফল্গুর সোঁতা গো!
তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই
টিকি কভু নয় তুচ্ছ,
ওগো কানুর টিকি সে তৃতীয় চরণ
হনুর টিকি সে পুচ্ছ!

দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-নুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—
দেখ অসুরপুরের শুম্ভাসুরের
টিকি ছিল তাই রক্ষে,
হুঁহুঁ নহিলে তাহারে বাগানো কঠিন
হ'ত কালিকার পক্ষে।
আহা সুরাসুর হন টিকির বাহন
ত্রিলোক টিকি-ব্রত,
ওরে টিকি আছে ব'লে ট্রামগাড়ী চলে
নইলে অচল হ'ত।
জড়- বিজ্ঞানে যাহা মাধ্যাকর্ষ
টিকি সেই পৃথিবীর,
সেই টিকিটি ধরিয়া সূর্য্য তাহারে
শূন্যে রেখেছে থির।
তোরা টিকির মূল্য বুঝিতে নারিস্
এযে অতি অদ্‌ভুত,
আরে টিকি যদি হায় না থাকে মাথায়
কি ধরিবে যমদূত?

দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-নুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ আ!

মূল গায়েন।—
আহা! টিকি সে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ
টিকি সে মোক্ষ কাম,
ও চা মুর্গীর মাথে টিকি আছে ব'লে
রামপাখী তার নাম।
হায় ম্লেচ্ছেরা এরে 'পিগ্‌টেল' বলে
অহহ শূকর-পুচ্ছ,
ওগো! তোমরা আর্য্য মর্য্যাদা রেখো
টিকিরে ক'রো না তুচ্ছ।
দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি
রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছে,
তাই নরের মতন হ'তে সে পারেনি
উঠিতে পারেনি উচ্চে।
মোরা পুচ্ছেরে শিরোধার্য্য করেছি
মহৎ হ'য়েছি তাই,
আর ডারুইন ওই তত্ত্ব লিখিয়া
করিয়াছে একজাই।
এখন টিকি রেখে পায়া ভারি হ'ল ভায়া
আর কে মোদের পায় হে,
দেখ নরে ও বানরে তফাৎ যা' শুধু
টিকিরই মর্য্যাদায় হে!
তবে মিলি' কলু তেলি এস ভিড় ঠেলি'
(এই) টিকি মূলে ঢাল তৈল;
আহা যেতে সশরীরে স্বর্গেতে টিকি
রাবণের সিঁড়ি হৈল।

দোহার-কী-গোহার!
এ-রি-নুম্!- তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ আ!

মূল গায়েন।—
দেখ শ্রীশ্রীটিকির অপমান করি
চীনের কি দুর্গতি,

আহা বুড়া বয়সেতে আফিম ত্যজিল
হ'ল তার ভীমরতি।
যাঁহা টিকি গেল খোয়া রাজা হল ধোঁয়া
অরাজক হ'ল দেশ,
যত গোঁয়ারে মিলিয়া করিল দেখ না
খোয়ারের একশেষ!
দেখ আকাশের টিকি বিদ্যুৎ আর
পাতালের টিকি সর্প,
আর তোমরা ভেবেছ টিকি রাখিবে না
ভারি তোমাদের দর্প।

দোহার-কী-গোহার।—
এরি-নুম্!—টেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

কভু টাক-অসুরের কোপে তার টিকি
নাহি হয় তিরোধান।
যত টিকি-ঘেঁসা টাক সারিবে বেবাক
এ গান শুনিলে কানে,
আর টিকি-বর্জ্জিত বৃথা টাকে চুল
গজাবে টিকি-স্থানে।
ওগো টিকি-মঙ্গল গাহিবার কালে
যে ক'রে বাহির দন্ত,
ওগো দন্ত তাহার টিকিবে না,—ঠিক
বুড়াকালে হবে অন্ত।
ওগো জনমে জনমে পোকা হবে দাঁতে
যুগে যুগে হবে শাস্তি,
এই হাসির জন্য কাঁদিতে হইবে
মার্জ্জনা এর নাস্তি!

মূল গায়েন।—
ওগো যেই শোনে আর যে জন শোনায়
টিকি-মঙ্গল-গান,

দোহার-কী-গোহার।—
এরি-নুম!—তেরি না!
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

নালক

১

দেবল ঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক—সে একটি ছোটো ছেলে, ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্দ্ধনের বন, অন্ধকার বট গাছের তলা, অন্ধকার এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গা, নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না! এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুট্‌লো—ফুল যেমন কোরে ফোটে, চাঁদ যেমন কোরে ওঠে,—একটু একটু আরো একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠ্‌লো, —পদ্মপাতায় জল যেমন দুল্‌তে থাকে—এদিক্ ওদিক্ সেদিক্, এধার ওধার সেধার। ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন, আকাশে এক আশ্চর্য্য আলো!—চাঁদের আলো নয়, সূর্য্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি! আকাশ জুড়ে কে যেন

সাত-রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোন্ দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আলোর একটি একটি ধাপ গেঁথে গিয়েছে!

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বল্লেন—কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন্, আমি তাঁর দর্শন করতে চল্লেম, তুমি সাবধানে থেকো।

বনের মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তর-মুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি কোরে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে লাগলো—একটির পর একটি ছবি।

২

কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরাণী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সাম্‌নে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, সহর, মন্দির, মঠ। আরো ওধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্ব্বত—সাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওপারে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য্য এক সাদা আলো; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মত সূর্য্য উঠ্‌ছেন! রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন—মহারাজ কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মত কেমন একটি টিপ্ ছিল!

রাজারাণী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশী বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁকঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দর-মহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আন্‌ছে, মালিনীরা সোনার থালায় পূজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রাণীর পোষা মউর ছাদে এসে উড়ে বসলো, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্যে দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া সুরু করে দিলে, ভিখিরী এসে, জয় রাণীমা!—বলে দরজায় দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রাণীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি কোরতে লাগলো।

৩

কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথায় মাণিকের মুকুট, পরণে লাল চেলী, সকালে সূর্য্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর—শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল—ঢালখাঁড়া নিয়ে।

রাজার দুইদিকে দুই দালান;—একদিকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আর-এক দিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে যত দুয়ারী;—মোটা বায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল পাগড়ির ভিড়!

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার নীচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন; তারি

উপরে রাজার আট গণৎকার খড়ি-হাতে পুথি খুলে রাণীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারু মাথায় পাকা চুল, কারু মাথায় টাক্, কারু বা ঝুঁটি বাঁধা, কারু বা ঝাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে, রাণীর স্বপ্নের ফল গুণে বলছেন—

—সূর্য্য স্বপ্নে রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মহাতেজস্বী।
চন্দ্রে তথা রূপবান গুণবান রাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী।
শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎদুর্ল্লভ এবং
জীবের দুঃখহারী মহাধার্ম্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ।

—এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ কর।

চারিদিকে অমনি রব উঠলো আনন্দ কর, আনন্দ কর! অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান, ভূরিদান কর। কপিলবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে মাঠে ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠলো, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগলো, বাতাস আনন্দে বইতে লাগলো। রাজমুকুটের মাণিকের দুল রাজছত্তরের মুক্তোর ঝালোর, মন্ত্রীর গলায় রাজার দেওয়া কণ্ঠমালা, পণ্ডিতদের গায়ে রাণীর দান ভোটকম্বল, দাসদাসী দীনদুঃখী ছেলে বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলী আনন্দে দুলতে থাকলো।

৪

প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলি গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস, জলের হাওয়া, ঠাণ্ডা ছাওয়া, পাখীদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর! পদ্মপুকুরের ধারে আকাশপ্রমাণ এক শাল গাছ, তার ডালে ডালে পাতায় পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই ফুল, গাছের তলায় একটি শ্বেত পাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে।

সন্ধ্যা হোয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাকড়ি একদল মালিমালিনী শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে দিতে, ফুলের গাছে জল দিতে দিতে, বেলাশেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল;—সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে, গাছের তলায়, কোনোখানে, কোনো কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না।

রাত আস্‌ছে,—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য্য ডুবছেন, পুবে চাঁদ উঠি-উঠি করছেন। পৃথিবীর একপারে সোনার শিখা, আর-একপারে রূপার রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ লক্ষকোটী তারায় আর সন্ধিপূজোর শাঁখ ঘণ্টায় ভরে উঠ্‌ছে। এমন সময় মায়াদেবী রূপোর জালে ঘেরা সোনার পাল্কীতে সহচরী সঙ্গে বাগান-বেড়াতে এলেন;—রাণীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায় ছায়ায় চলে ফিরে, রাণী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন—বাঁ হাতখানি ফুলে ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, ডান হাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হলো, পাখীরা একবার কলরব করে উঠ্‌লো, বাতাসে, অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়লো। পূবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—যেন একটি সোনার পুতুল, যেন চাঁপাফুলে ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর-এক চাঁদ! চারিদিকে আলোয় আলো হয়ে গেল; —কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না, মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, —যেন পদ্মফুলের উপর একটি ফোঁটা শিশির,—নির্ম্মল সুন্দর এতটুকু। দেখতে দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো, পাত্র মিত্র অনুচর সভাসদ্ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন, রাজদাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগলো, উলু দিতে থাকলো।

স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজ্‌ছে, মর্ত্ত্যের ঘরে ঘরে শাঁখ ঘণ্টা, পাতালের তলে তলে জগঝম্প, জয়ডঙ্কা বেজে উঠছে। বুদ্ধদেব তিনলোক-জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর উপরে প্রথম সাত পা চলে যাচ্ছেন! সুন্দর পা দুখানি যেখানে যেখানে পড়লো, সেখানে সেখানে অতল সুতল রসাতল ভেদ করে একটি একটি সোনার পদ্ম আগুনের চরকার মত মাটির উপরে ফুটে উঠলো; আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত সমুদ্রের জল সেই সেই সাতটি পদ্মের উপরে ঝির্‌ঝির্ কোরে ঢাল্‌তে লাগলো!

নালক আশ্চর্য্য হয়ে দেখছে, দেব দানব মানবে মিলে সেই সাত-পদ্মের মাঝখানে বুদ্ধদেবকে অভিষেক করছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাক্‌লেন—দস্যি ছেলে ঋষি এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বসে রয়েছো! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখা পড়া,—কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই বয়েসে উনি আবার সন্ন্যাসী হয়েছেন! চল্ বাড়ি চল্।

মা নালকের হাত ধোরে টেনে নিয়ে চল্লেন, নালক মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌তে লাগলো—ছেড়ে দাও মা, তার পর কি হোলো দেখি। একটি বার ছাড়ো। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! সমস্ত বন নালকের দুঃখে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!

আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তালা বন্ধ!

৫

নালককে তারা জোর কোরে গুরু-মশায়ের পাঠশালে দিয়েছে। সেখানে গুরু বল্‌ছেন—ওকাস অহং ভন্তে। নালক পড়ে যাচ্ছে—ভন্তে। গুরু বল্‌ছেন লেখ্—অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। নালক বড় বড় কোরে তালপাতায় লিখে যাচ্ছে—সীলং দেথ মে ভন্তেঃ কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই। তার প্রাণ বর্দ্ধনের বনে সেই বটতলায় আর সেই কপিলবাস্তুর রাজধানীতে পড়ে আছে।

পাঠশালের খোড়ো ঘরের জান্‌লা দিয়ে

একটা তিন্তিড়ি গাছ, খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন একটা বাঁশঝাড় আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানটায় এসে পড়ে, একটা লাল-ঝুঁটি কুবোপাখী ঝুপ করে ডালে এসে বসে আর কুব্‌কুব্‌ কোরে ডাকতে থাকে কাঁটা গাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোম্‌রা ভন্‌-ভন্‌ কোরে করে উড়ে বেড়ায়, একবার জানলার কাছে আসে আবার উড়ে যায়, নালক সেইদিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—আহা, ওদের মত যদি ডানা পেতেম তবে আর কি মা আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন? একদৌড়ে বনে চলে যেতেম। এমন সময় গুরু বলে ওঠেন—লেখ্‌ রে লেখ্‌! অমনি বনের পাখী উড়ে পালায়, তাল-পাতার উপরে আবার খস্‌ খস্‌ কোরে ছেলেদের কলম চল্‌তে থাকে। নালক যে কি কষ্টে আছে তা সেই জানে! হাত চল্‌ছে না তবু পাতাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কান্না আসুক্‌ তবু পড়ে যেতে হবে—য র ল, শ ষ স—বাদলের দিনেও, গরমের দিনেও, সকালেও, দুপুরেও।

নালক পাঠশাল থেকে মায়ের হাত ধোরে যখন বাড়ী ফেরে হয়তো শালগাছের উপরে তখন কালো মেঘ আঁধার করে আসে, মাঠের উপরে তালগাছগুলোর মাথা দুলিয়ে পুবে হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা কা করে ডেকে ওঠে; নালক মনে মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালের খোড়ো চাল্‌টাসুদ্ধ একেবারে ভেঙে-চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাক্‌তেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না। রাতের বেলায় ঘরের বাইরে বাতাস্‌ শন্‌ শন্‌ বইতে থাকে, বিদ্যুতের আলো যতই ঝিক্‌মিক্‌ চম্‌কাতে থাকে, নালক ততই মনে মনে ডাক্‌তে থাকে—ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি! মাটির দেওয়াল গলে যাক্‌, কপাটের খিল ভেঙে যাক্‌! ঝড়ও আসে, বৃষ্টিও নামে, চারিদিক জলে জলময় হয়ে যায় কিন্তু হায় কোনদিন কপাটও খোলে না, দেওয়ালও পড়ে না, যে বন্ধ সেই বন্ধ! খোলা মাঠ খোলা আকাশে ঘেরা বর্দ্ধনের সেই তপোবনে নালক আর কেমন করে ফিরে যাবে?—যেখানে পাখীরা আনন্দে উড়ে বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলায় মাঠের বাতাসে যেখানে ধোরে রাখবার কেউ নেই, ধরা দেবারও কেউ নেই;—সবাই ইচ্ছামতো খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে। ঋষির আশাপথ চেয়ে, নালক দিন গুন্‌ছে, ওদিকে দেবল ঋষি কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে নাচতে পথে আস্‌ছেন আর গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন—"নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়, নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়, নমো অনন্তগুণার্ণবায়, নমো শাক্যনন্দনায়।"

শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠে মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে দলে ঘর ছেড়ে হাটে মাঠে ঘাটে কেউ পসরা মাথায়, কেউ ধানক্ষেত নিড়োতে,

কেউবা সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী-পারে বাণিজ্য কর্‌তে চলেছে। যাদের কোনো কাজ নেই তারাও দল-বেঁধে ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে—"নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়।"

সন্ধ্যাবেলা নীল আকাশে কোনখান্‌ে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশ-গঙ্গা একটুকরো আলোর জালের মত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত দেখা দিয়েছে, দেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন—"নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়।" মায়ের কোলে ছেলে শুন্‌ছে—"নমো গোতম চন্দ্রিমায়"; ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন—"নমো নমো"; বুড়িদিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনেছেন—"নমো"; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—"ওরে নোমো কর্‌, নোমো কর্‌।* গ্রামের ঠাকুরবাড়ীর শাঁখ ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠ্‌ছে—নমো নমো নমো। আকাশে বাতাসে শব্দ উঠ্‌ছে—নমো নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বল্‌ছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন বল্‌ছেন—নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে নালক উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন! আগড় খুলে গেছে! খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত এসে নালকের মাথার উপরে পড়েছে, নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীর্ব্বাদ করছেন—সুখী হও, মুক্ত হও!

ঋষর হাত ধোরে নালক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নালকের মা দুই চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঋষিকে বল্‌ছেন—নালক ছাড়া আমার কেউ নেই, ওকে নিয়ে যাবেন না।

ঋষি বল্‌ছেন—দুঃখ কোরোনা, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কোরোনা; এস তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও। ঋষি মন্ত্র পড়তে থাকলেন আর নালকের মা ছেলের দুই হাত ধোরে বল্‌তে লাগলেন—

কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগ্‌গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধ সেট্ঠং সবিত্বান আকাসেমপিপূজয়ে।—

—নির্ম্মল আকাশের নীচে বুদ্ধদেবের পূজা করি, সুন্দর আমার (নালক) ফুল তাকে দিয়ে পূজা করি।

ঋষি নালকের হাত ধোরে বনের দিকে চলে গেলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যুদ্ধ-সাহিত্য

যে য়ুরোপ খৃষ্টের প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছে, সেই য়ুরোপ আজ অদৃষ্টপূর্ব্ব হত্যাশালায় পরিণত। তাহার শিল্প, তাহার সাহিত্য, তাহার বিজ্ঞানও দর্শন হইতে সেই প্রেমের মধুর রাগিণীটি থামিয়া গিয়াছে, সমস্তই আজ হত্যার রুদ্র আনন্দে এবং বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। কলাবিদ্ ভাবের কল্পনা ভুলিয়া, কবি কবিতা-সাধনা ভুলিয়া, দার্শনিক জ্ঞানের ভাবনা ভুলিয়া আধুনিক কুরুক্ষেত্রের শোণিত-পাথারে ভাসিয়া চলিয়াছেন। একদা যে নগর শান্তশ্রী এবং সৌন্দর্য্যে ভরিয়া ছিল আজ তাহা বিরাট ধূলি-স্তূপ মাত্র। শান্তির আশ্রয় ধর্ম্মমন্দিরগুলি আজ হত্যাকারী সৈন্যগণের আশ্রয়স্থান; শিল্পবিচিত্র স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের বিবিধ কারুকার্য্য আজ পদদলিত ও ধূলিলুণ্ঠিত।

প্রতীচ্যের অসামরিক ব্যক্তিরাও এখন যুদ্ধের কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিতে চাহে না, আর কিছু পড়িতে চাহে না। সেখানকার লেখকেরাও জনসাধারণের মনের ক্ষুধা মিটাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাই অতি অল্পদিনের ভিতরেই য়ুরোপে রীতিমত একটি যুদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধসাহিত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বর্ত্তমান সমর-সূচনার পূর্ব্ব হইতেই! আমরা আবশ্যকবোধে তথাকথিত সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় দিলাম।

জার্ম্মেণীর বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিক-সৈনিক জেনারেল ফ্রেডারিক ভন্ বার্ণহার্ডি, তাঁহার "Britain as Germany's Vassal" নামক পুস্তকে য়ুরোপে জার্ম্মেণীর অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহার স্থানবিশেষ উদ্ধার করিলাম।:—

বার্ণহার্ডি

"রোম-সাম্রাজ্য যাহারা ধ্বংস করিয়াছে, তাহারা জার্ম্মান। প্রাচীন গল, স্পেন, আফ্রিকা ও বলক্যান উপদ্বীপে এবং বিশেষ করিয়া ইতালীতে তাহারা দুর্ব্বার বন্যাপ্রবাহের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সত্য বটে, তাহারা যে-সকল রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, সেগুলি বহুকালস্থায়ী হয় নাই; কারণ, পৃথিবীর সেই প্রাচীন যুগের অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিদের সংশ্রবে আসিয়া, তাহারা আপনাদের চারিত্রিক-বিশেষত্ব রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছিল। তথাপি তাহারা শ্রান্ত ও মরণোন্মুখ জাতিদের ধমনীতে এমন নূতন রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিয়াছিল যে, তাহার ফলে নব-শক্তিতে উৎসাহিত এবং নব-বলে বলীয়ান একশ্রেণীর মানব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখনকার নূতন জাতিদের ভিতরে, তাহারাই অধিক বলী, সক্ষম ও সভ্যতার উন্নতিকারক হইতে পারিয়াছিল,—যাহাদের ভিতরে 'জার্ম্মেনিক' রক্ত অধিক পরিমাণে ছিল। য়ুরোপের পশ্চিমভাগের জাতিরাই, এদিকে প্রধান। কারণ, তাহাদের ভিতরে সকলের চেয়ে-বেশী জার্ম্মান রক্ত আছে!

কিন্তু, য়ুরোপের পশ্চিমভাগে জার্ম্মানরা কখনও প্রবল হইতে পারে নাই। তাই

সেখানকার বাসিন্দারাও প্রথমতঃ ধ্বংসপ্রায় গ্রীক-সভ্যতার মহিমায় এবং তাহার পরে ইস্‌লামের বজ্রমুষ্টির ভিতরে পড়িয়া, অসভ্যতার গভীর পঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছিল।

সভ্যতা ও মানবের উন্নতি-বিধানে পশ্চিম-য়ুরোপই প্রধান হইল। সেখানে দুইটি পরস্পর-বিমুখ জাতি গাত্রোত্থান করিল। প্রথম হইতেছে লাতিন জাতি। ইতালিয়ান, গল ও আইবেরিয়ান জাতির সহিত জার্ম্মান জাতির মিলনে ইহার সৃষ্টি। দ্বিতীয় হইতেছে, জার্ম্মাণ জাতি। যে দেশে এই জাতি আপনাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা জার্ম্মেনী এবং স্কান্দিনেভিা নামে পরিচিত। কাল-পরিবর্ত্তনে এই জার্ম্মান ও লাতিন জাতিদের ভিতরে রাজনৈতিক এবং জাতীয় বিভেদের সূত্রপাত হইল। জার্ম্মানরা রোম্যানদের মত একটি পৃথ্বী-সাম্রাজ্য গঠন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্যদিকে রোমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ইতালীর শক্তিতে নির্ভর ও রোম সহরকে কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া এক ঈশ্বরশাসিত ও আধ্যাত্মিক পৃথ্বী-সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে, জার্ম্মানজাতির সহিত রোমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরূপে পৃথিবীর এক বিখ্যাত দ্বন্দ্বের আরম্ভ। কিন্তু, সে দ্বন্দ্ব বরাবর একটানা চলিল না। কারণ, আরম্ভেই জার্ম্মেনী পরাজিত হইল। কিন্তু সেই পরাজয়েই বিরোধ শেষ হইয়া গেল না।"

বার্ণহার্ডির কথা হইতে ইহাই বোঝা যায় যে, সসাগরা-পৃথিবী শাসন করাই জার্ম্মেনীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। প্রথমবারের চেষ্টায় তাহার সে আশা ফলবতী হয় নাই বলিয়া, সংপ্রতি সে দ্বিতীয়বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয়বারের চেষ্টার ভিতরে যে বহুযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে জার্ম্মেনীর দুর্ব্বলতার অনেক ইতিহাস আছে। সে সময়টায় জার্ম্মেনী পৃথিবী-শাসনের স্বপ্ন না দেখিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে মনোযোগী হইয়াছিল। মধ্যযুগে 'ফ্রেডারিক দি গ্রেটে'র সময়ে জার্ম্মেনী একবার কিছুদিনের জন্য মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। তাহার পর, প্রথম নেপোলিয়ানের হাতে গোলাম বানয়া জার্ম্মেনীর চোখ আবার খুলিয়া গেল। তৎফলে, দ্বিতীয় নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনী পুনরায় য়ুরোপে প্রধান হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ে আবার নূতন করিয়া পৃথিবী-শাসনের আশা জাগ্রৎ হইল।

বার্ণহার্ডি বলিতেছেন :—"১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জার্ম্মেনীর জন-সংখ্যা আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া আসিতেছে। জার্ম্মেনীর জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক চল্লিশবৎসরের ভিতরে চারি কোটি হইতে সাড়ে ছয় কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ জার্ম্মেনীতে ফি বৎসরে লোক বাড়িয়াছে প্রায় দশলক্ষ করিয়া। অন্যদিকে, অর্থশাস্ত্রসম্বন্ধীয় এবং মানসিক উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে।

সংপ্রতি জার্ম্মেনী একটি প্রথম-শ্রেণীর শ্রমশিল্পপ্রধান রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর বাণিজ্য-

নৌ-বহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না; কিন্তু আজ ঐ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মেনী দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মেনীর বৈদেশিক বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রেও সে দ্বিতীয় স্থানীয়।

জার্ম্মেনীর জনসংখ্যার অনুপাতে, অথবা তাহার প্রয়োজন-হিসাবে তাহার ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলিকে যথেষ্ট বলা চলে না। পরন্তু, উপনিবেশগুলির সহিত তাহার সম্বন্ধও তেমন দৃঢ় নহে,—যে-কোন-মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। জার্ম্মেনীকে তখন একান্ত অসহায় হইয়া থাকিতে হইবে। আমরা যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং—এমন কি—ক্ষুদ্র বেলজিয়মের ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর ভাল ভাল দেশগুলি ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া জার্ম্মেনীকে রদ্দী মাল দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মেনী যখনই তাহার ক্রম-বর্দ্ধমান প্রজাগণের জন্য কোন দেশ দখল করিতে গিয়াছে, তখনই তাহাকে সশস্ত্র প্রবল শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। হয় তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, নয় তাহাকে Triple Ententeর ইচ্ছাধীন থাকিতে হইবে! Triple Entente এখন সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতেছে। এবং ইংলণ্ড এখন উহার সর্ব্বেসর্ব্বা।"

বার্ণহার্ডি যাহা বলিতেছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই:—জার্ম্মেনীর লোক এত বাড়িয়াছে যে তাহার স্বরাজ্যে আর কুলাইতেছে না। অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। জার্ম্মেনীর বাণিজ্য ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহার জিনিষ বিক্রী করিবার জন্য নূতন জায়গা চাই। অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবীকে আপনার পায়ের তলায় চাপিয়া রাখাই তাহার সুখের স্বপ্ন। অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। "বিশ্বশক্তি অথবা অধঃপতন"—ইহাই তাহার মূলমন্ত্র।

ভন ডার গল্‌টজ্‌

জার্ম্মেনীর সেনাপতি ব্যারণ ভন্‌ ডার গল্‌টজ "Nation in Arms" নামে এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধসম্বন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, আমরা তাহার কয়েক জায়গা তুলিয়া দিলাম:—

"যতকাল মানবজাতি ইহ-লৌকিক সম্পদলাভের জন্য চেষ্টা করিবে, যতকাল তাহারা আপনাদের উত্তরাধিকারিগণের জন্য অবস্থান-ক্ষেত্র-বিস্তৃতি, শান্তি এবং সম্মান লাভের চেষ্টা করিবে, যতকাল তাহারা আপনাদের প্রতিদিনকার তুচ্ছ খুটি-নাটির সংকীর্ণতা পার হইয়া রাজনীতি এবং সভ্যতার যথার্থ আদর্শ অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর হইবে, ততকাল পৃথিবীতে যুদ্ধের মৃদঙ্গ বাজিবেই বাজিবে। যুদ্ধে মানবজাতির উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, এ কথা নিয়া আলোচনা করিবার দরকার কি? ত্রিশ বৎসরব্যাপী সমরে জার্ম্মেনী একবার অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার ভিতরে যেরূপ নীতিভ্রষ্টতা আসিয়াছিল, তাহার তুলনা মেলা ভার। আবার অন্য দিকে, অবনতির এত নিম্নস্তরে নামিয়া, প্রুসিয়া যখন স্বাধীনতালাভের জন্য অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিল, সেই যুগকে আমরা তাহার যথার্থ গৌরবের যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

যুগধর্ম্ম এবং শেষ পরিণাম অনুসারে যুদ্ধের নৈতিক ফল বিভিন্ন রূপধারণ করে। ভগবান যাহা দেন, আমরা অবশ্য তাহাকে লইব। তবে এটা ঠিক যে,—যুদ্ধ হইতেছে মানবজাতির নিয়তি,—জাতিসকলের অনিবার্য্য অদৃষ্টফল। এবং পৃথিবীর নশ্বরগণের অধিকারে অবিনশ্বর শান্তি কখনও থাকিতে পারে না।

এ যুগে কেবল রাজারা যুদ্ধবিদ্যা শিখিলেই চলিবে না। প্রজাদেরও যুদ্ধের জ্ঞান থাকা চাই। কিরূপে অস্ত্র চালাইতে হয়, শক্তির অনুশীলন করিয়া কিরূপে তাহা ব্যবহার করিতে হয় সে কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। পরন্তু, দেশের জন্য বিরোধ উপস্থিত হইলে, জাতিকে যে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়, তাহা সহ্য করিবার নিমিত্ত, সকলকে হৃদয় পাষাণে পরিণত করিয়া, প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

প্রশ্ন হয় যে:—"সাধারণ লোক যখন রণরত হইয়া বিপদে পড়ে এবং আপনার মরণ আপনি ডাকিয়া আনে, তখন তাহার পক্ষে যুদ্ধ-শিক্ষা কি এতই আবশ্যকীয়"?—নিশ্চয়ই!

যাহার ভিতরে সামরিক তেজ আছে, সে সুযোগের আহ্বান শুনিবামাত্র সকল সঙ্কোচ ভুলিয়া, সেনাপতির দণ্ডগ্রহণে ইতস্ততঃ করে না। কারণ, পরিণামে সে অমূল্য পুরস্কার পায়। তাহা অমরতা। এই যে অমরতা,—এ কথাটির ভিতরে একটা পরম লোভনীয় মোহিনী শক্তি আছে। ভাগ্যবান সৈনিক তাহার নামকে বিস্মৃতির অন্ধকার গুহা হইতে উদ্ধার করে। ফ্রেডারিক ও নেপোলিয়নের নাম ততদিন থাকিবে, যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে।

"কিন্তু একজনকে অমর করিবার জন্য সাধারণ জনগণের উপরে এমন কঠোর পরীক্ষার পাষাণ-ভার চাপানো কি উচিত? একজন বিখ্যাত সেনাপতির গৌরব-রক্ষার জন্য শত সহস্র মানব আপনাদের প্রাণ বলি দেয়,—কে তাহাদের নাম করে? তাহারা ত' কোন পুরস্কার পায় নাই!"—ইহা স্থূল-দৃষ্টি প্রজ্ঞার মত হইতে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারটাকে আমরা ভিন্ন চোখে দেখি। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি,—তাঁহারও সক্ষম, বিশ্বাসী ও সাহসী সহচরের দরকার! তাহারাও তাঁহার যশের অংশী হয়।

আলেকজান্দারের সঙ্গে গ্রেণিকাসে যাত্রা করিয়াছিল, এমন কোন সৈনিক বর্ত্তমান যুগে যদি কবর হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়,—তাহা হইলে আমরা তাহাকে সাধারণ সৈনিকের মত দেখিব না,—কিন্তু এমন কল্পনা করিব, যেন স্বয়ং আলেকজান্দারই আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।"

গোয়েন্দা ডাঃ গ্রেভস্‌

"জার্ম্মান গুপ্ত-কার্য্য-বিভাগ" পৃথিবীর সর্ব্বত্র গোয়েন্দা ছড়াইয়া দিয়াছে। পৃথিবীর

কোথায় রাজনৈতিক কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে জার্ম্মানজাতির উপকার না অপকার হইতেছে ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য জার্ম্মান গবর্মেণ্ট এই সকল ছদ্মবেশী গোয়েন্দাকে দেশবিদেশে প্রেরণ করেন। গোয়েন্দাদের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষ দুই আছে। এমন কি, অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, অনেক কাউণ্ট ও কাউণ্টেসও এই গোয়েন্দাদলভুক্ত। ডাক্তার আর্মগার্ড কার্ল গ্রেভস্ উক্ত গোয়েন্দাদলে কাজ করিয়া আজ বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাবলীর কথা The Secrets of the German War Office নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ উপন্যাস অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক। আমরা তাঁহার কাহিনীর অল্পস্বল্প পরিচয় দিলাম ঃ—

".৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন তারিখের সকালে সার্ভিয়ার রাজা, রাণী, মন্ত্রী ও রাজপরিষদবর্গ গুপ্তহন্তাদের চক্রান্তে নিহত হন। চক্রান্তকারীদের সর্দ্দার কে বা কাহারা, আমি তাহা জানিবার জন্য প্রেরিত হইলাম। আমাদের সন্দেহ কর্ণেল মাসিন ও ষষ্ঠসংখ্যক সৈন্যদলের জনকত উচ্চতন কর্ম্মচারীর উপরে পড়িয়াছিল। এই সকল রাজহন্তা, রুশদের অর্থে পুষ্ট হইয়া, চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল। সার্ভিয়ার রাজা, অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া রুষিয়ার বিষনজরে পড়িয়াছিলেন।

আমি ছদ্মবেশে এক আসল বোল্‌তার চাকের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এবং অবিলম্বেই আমার বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলাম। জাল দস্তক লইয়া ভ্রমণ করিবার অপরাধে, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল লিগলিট্‌স্‌জ্ আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। সার্ভিয়ার ভিতরকার অবস্থা তখন ভয়ানক। গ্রেপ্তার ও প্রাণদণ্ড তখনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার কাছে কোন সন্দেহ-জনক কাগজপত্র পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু অস্থায়ী গবর্মেণ্টের বিরোধী-পক্ষের সহিত সংস্রব রাখাতে, আমাকে কোর্ট-মার্শেলে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইল।

একদল সৈন্য আসিয়া আমাকে কফি-খানা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। পরদিন সকালে আমাকে কর্ণেলের পোষাক-পরা তিনজন লোকের সুমুখে হাজির করা হইল। আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল না। আমি একেবারেই শুনিলাম,

"তোমাকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশিতে দেখা গিয়াছে। তুমি জাল দস্তক ব্যবহার করিয়াছ। সূর্য্যাস্তের সময়ে তোমাকে গুলি করিয়া মারা হইবে।"

প্রথমটা আমি ভাবিলাম, বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হইতেছে। কিন্তু লোকগুলার মুখের দিকে তাকাইয়া ঠাট্টার কোন আঁচ দেখিতে পাইলাম না। তখন আপনার বিপদ বুঝিয়া এবং মনের উদ্বেগ মনেই চাপিয়া, আমি শান্তভাবে বলিলাম, "কাউণ্ট যোলেরাভিচ্‌কে (সমর-সচিব) আপনারা জানিয়ে আসুন যে, কাউণ্ট ওয়েরিংগ্রোড তাঁকে সেলাম দিয়েচেন।"

তাহারা অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। তারপর, এক ব্যক্তি আমার উপরে অশ্রান্ত প্রশ্ন বৃষ্টি করিতে লাগিল। আমি সে-সকল প্রশ্নের কোন

জবাব না দিয়া সুধু কহিলাম, "মশাই, আমার যা বলবার আছে, তা বলেচি।"

আমাকে আবার কারাগারে পাঠানো হইল। বেলা চারিটার সময়ে আমার বিচার-কর্ত্তাদের একজন আসিয়া আমাকে বলিল, "তোমার সংবাদ পাঠানো হয় নি। আমার সঙ্গীদের তা মত নয়। যোলেরাভিচের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে। যদি তুমি কারণ দেখাতে পার, তাহলে তোমার সংবাদ দেবার ভার আমি নেব।"

আমি তাহাকে কারণ দেখাইলাম। সে বিবর্ণমুখে, ব্যাকুলভাবে ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটা নিয়া আমি বড় বেশী মাথা ঘামাইলাম না। কিন্তু আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময়ে যখন আমার কারাগারের দরজা খুলিয়া গেল এবং দুইজন রক্ষী সঙ্গীণ খাড়া করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, আমাকে অঙ্গনে—যেখানে আরও কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল—লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল, তখন আমি চিন্তিত হইলাম। বুঝিলাম, এই হট্টগোলের দিনে আমার সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছায় নাই। দুর্গের পশ্চিমে একটি পাহাড়ের দিকে তাহারা আমাকে লইয়া গেল।

একটি পুরানো পাথরের বাড়ীর কাছে আমার বধ্যভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। একটা দেয়ালের পাশে গিয়া আমরা দাঁড়াইলাম। প্রধান কর্ম্মচারী একখানা দলিল বাহির করিয়া সার্ভিয়ান ভাষায় পড়িতে আরম্ভ করিল। দলিলের ভূমিকাটা আমার কাছে অনাবশ্যক দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল।

দলিল-পড়া শেষ হইয়া গেলে আমি বলিলাম যে, আমি সার্ব্বজাতীয় নই, সুতরাং দলিলের একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই।

কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল যে, সে আমাকে সার্ব্ব বলিয়াই জানে।

আমি জোরালো জার্ম্মাণ ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাহাকে জানাইলাম, এ ব্যাপারটায় নিশ্চয়ই কোথাও গলদ হইয়াছে, এর জন্যে পরে তাহাদের যথেষ্ট বিপদভয় আছে।

সে কিছু বিচলিত হইল বটে, কিন্তু বলিল, "আমি যে আদেশ পেয়েছি তা পালন কর্ব্বই।"

আমি বলিলাম, "আমি মন্ত্রীর কাছে খবর পাঠিয়েচি।"

তাহারা আমাকে মারিবার জন্য তেমন তাড়াহুড়া করিল না। পাঁচ মিনিট কাটিল। দশ মিনিট কাটিল। কর্ম্মচারী ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিল, আটটা বাজিতে আর পাঁচমিনিট আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছে।

কর্ম্মচারী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আর দেরি কর্ত্তে পারি না।"

একটা লোক আসিয়া আমাকে দেয়াল ঠেসাইয়া দাঁড় করাইয়া দিল। তারপর রুমাল দিয়া আমার চোখ বাঁধিতে আসিল। আমি বলিলাম আমার রুমালের দরকার নাই।

তখনই হুকুম দেওয়া হইল। বারোটা বন্দুকের কুৎসিত কালো নাক আমার দিকে ফিরিল।

সে-সময়টা আমার মনের ভিতরে যেরূপ উত্তেজনার উদয় হইয়াছিল, সে কথা বলিতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তখন কিছুই

আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিলাম না। তবে একটা কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। দ্বিতীয় সারির তৃতীয় লোকটা কিছু অসাবধানতার সহিত বন্দুক ধরিয়াছিল। প্রথমটা সে আমার পেট ও বুকের মাঝা-মাঝি জায়গায় লক্ষ্য করিল; তারপর আমার নাকের পানে টিপ্ করিল,—সেটা আমি একেবারেই পছন্দ করিলাম না, বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা কতক্ষণ যে এমনি দাঁড়াইয়াছিলাম, তা আমি জানিনা। তারপরে যা হইল, তা আমি ভুলি নাই। কিছুদূরে দুইজন কর্ম্মচারীকে আসিতে দেখা গেল। তাহারা হাত নাড়িয়া ঘাতকদের কি বলিতেছিল। হঠাৎ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা উঠিল।

তাহারা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন আমাকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করিয়া এক পাত্র মদ্য পান করিতে দিল। ইচ্ছা থাকিলেও, আমি তাহা পান করিলাম না। আমি বরাবর বুকের উপরে দুহাত রাখিয়া, সিধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। একজনকে আমি বলিতে শুনিলাম, "লোকটা কাপুরুষ নয়।"

* * *

গোয়েন্দার কাজে দায়িত্ব যথেষ্ট। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলে পুরস্কারের পরিমাণটাও খুব বেশী। কৃতকার্য্য না হইলে সাধারণ মাহিনা পাওয়া যায়। আমরা গভর্মেণ্টের কাজ করিলেও, বিপদে পড়িলে আমাদিগকে গবর্মেণ্ট কোনরকম সাহায্য করিতে অপারগ। যাহারা ঘটনাবহুল জীবন যাপন করিতে ভালবাসে, এ কাজটা তাহাদের ভাল লাগে। দুর্ব্বল-প্রকৃতি লোকের পক্ষে জীবিকাস্বরূপ গোয়েন্দার কার্য্য গ্রহণ করা উচিত নয়। যে-সকল স্ত্রী বা পুরুষ-গোয়েন্দা দুঃসাহসিক কার্য্য গ্রহণ করে,—সময়ে সময়ে তাহারা কি মানুষ কি সয়তান কাহাকেও ভয় করে না। একটু-কোন খুঁৎ হইলে স্বাধীনতা বা জীবনে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এ ভাবনা বড় যে-সে ভাবনা নয়। আমি এমন অনেক সাহসী লোককে জানি, যাহারা এই প্রবল উদ্যমের চাপে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি এমন জন-বারো নর-নারীকে জানি, যাহারা ভেল্কী বাজীর মত অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়াছে, ধরা পড়িয়াছে বা মরিয়াছে। তাহাদের এমন বিপদ অনেক সময়ে শত্রুর কবলে পড়িয়া হয় না। আমি দুইটি দৃষ্টান্ত দিব;—একটি রমণীর ও আর একটি পুরুষের।

ওল্গা ক্রুডার একজন মেয়ে-গোয়েন্দা। সে জার্ম্মেনীর তরফ হইতে ব্রুসেল্‌সে গোয়েন্দাগিরির কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কয়েক বৎসর আগে য়ুরোপীয় খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, রুষিয়া-সীমান্তে 'মেমেলের'র এক হোটেলে ওল্গা ক্রুডার নামে এক রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে। একটি রুষীয় কেল্লার নক্সার জন্য ক্রুডারকে পাঠানো হইয়াছিল। বার্লিনে বসিয়া কর্ত্তৃপক্ষ টের্ পাইলেন যে, সে নক্সা পাইয়াছে। কিন্তু একজন রুশ কর্ম্মচারীর প্রেমে পড়িয়া, নক্সাগুলি তাহাকে আবার সে ফিরাইয়া দিবার মৎলোব আঁটিতেছে। অতএব, ওল্গা ক্রুডার আত্মহত্যা করিল। অর্থাৎ—তাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করা হইল।

লেফ্‌টেনাণ্ট ভন য্যাস্‌ট্রভ, সৈন্যদল ছাড়িয়া গোয়েন্দাগিরির কার্য্যে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে। তিনি রুসিয়ান চরের সঙ্গে ভাব কয়িয়াছিলেন, এইরূপ সন্দেহ করা হইয়াছিল;—সন্দেহমাত্র! তাঁহাকে কয়েদ করা চলিল না,—কারণ, তিনি অনেক লুকানো খবর জানিতেন। তিনি অসামরিক কর্ম্মচারী, অতএব, জার্ম্মান আইন অনুসারে তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইলে, সাধারণ বিচারালয়ে সে কাজ করিতে হইত। সুতরাং য্যাস্‌ট্রভকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হইল। গোয়েন্দা-সর্দ্দার প্রথম যে লোকটিকে পাঠাইয়াছিলেন, য্যাস্‌ট্রভ দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে নিহত করিলেন। প্রথম লোকটি মারা যাইবামাত্র, আর একজন লোক আসিল। সেবারে য্যাস্‌ট্রভ নিজেই মরিলেন।"

আমরা ডাক্তার গ্রেভ্‌সের হৃদয়গ্রাহী ও চমকপ্রদ পুস্তক হইতে ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি স্থান উদ্ধার করিব।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

গুলবদন

[গুলবদন, ভারতের প্রথম মোগল বাদশাহ বাবরের কন্যা। আকবর আবুলফজলের "আকবরনামার" উপাদান-সংগ্রহের জন্য গুলবদনের সহায়তা গ্রহণ করেন। বাবর ও হুমায়ুনের জীবনবৃত্তের আখ্যায়িকাগুলি গুলবদনের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল;—"হুমায়ুননামা" তাহারই ফলস্বরূপ। আবুলফজল, সম্রাট কর্ত্তৃক বাবর ও হুমায়ুনের জীবন-চরিত সংগ্রহের আদেশ প্রচারের কথা (১) লিখিয়াছেন সত্য, তবে তাহা গুলবদনের উপর ছিল কি না, তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, "হুমায়ুননামা" ১৫৮৭ (৯৯৫ হিঃ) খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। গুলবদনের "হুমায়ুননামা" সম্বন্ধে আবুলফজল নীরব; তবে তিনি যে বেগমের পুস্তকের সাহায্য লইয়াছিলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

যে সমস্ত ইংরাজ-ঐতিহাসিক মোগল-রাজত্বের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা গুলবদন যে এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এ কথা কেহ কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ব্লকম্যান-সাহেবের "আইন-ই-আকবরীতে" গুলবদনসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গুলবদনকে তিনি একস্থলে (২) আকবরের বেগম বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাবরের "আত্মজীবন-চরিত"-সম্পাদক Erskine-সাহেবও "হুমায়ুননামা" দেখেন নাই। গুলবদনসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, "হুমায়ুন-নামাই" প্রধান অবলম্বন।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে-রক্ষিত হস্তলিখিত "হুমায়ুন-নামা"খানি লক্ষ্ণৌ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়াম হ্যামিলটনের বিধবার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। এই মহামূল্য গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া বেভারিজ-পত্নী আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

"হুমায়ুন-নামার" প্রথমাংশে বাবরের কথা। ইহার অধিকাংশই গুলবদন, বাবরের আত্মজীবন-চরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ পিতার মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৮ বৎসর ছিল; কাজেই তাঁহার নিকট হইতে বাবরের সময়ের কথাগুলি আমরা জানিবার আশা করিতে পারি না। "হুমায়ুন-নামায়" বাবরের পুত্র কন্যা, বেগম ও আত্মীয় স্বজনের বেশ একটী সঠিক বৃত্তান্ত আছে। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়মের এই পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের কয়েক পৃষ্ঠা ইহাতে নাই। হুমায়ুনের দ্বিতীয়বার ভারতবিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস ইহাতে আছে। এক্ষণে আমরা গুলবদনের জীবন-কাহিনী কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।]

(১) Akbar-nama—Bib. Indica. Vol. I, p. 29-30.
(২) Ain-i-Akbari—Blockmann, Vol. I, p. 48

গুলবদন আনুমানিক ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মসময়ে বাবর সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থান জয় করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। গুলবদনের মাতা—দিলদার বেগম। গুলবদন তাঁহাকে আজাম বলিয়া ডাকিতেন। দিলদারের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—

১। গুলরাং
২। গুলচিরা
৩। আবুনসির—ইতিহাসে ইনি হিন্দাল নামে অভিহিত।
৪। গুলবদন
৫। আলওয়ার

গুলবদন শৈশবে 'আতুনের' নিকট শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। মোগল-অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রীর নাম আতুন।

১৫২৫ খৃষ্টাব্দে বাবর পরিবারবর্গকে পুত্র কামরণের হস্তে সমর্পণ করিয়া সিন্ধু অতিক্রম করিবার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন। পিতার কাবুল ত্যাগ করিবার অনতিকাল পূর্ব্ব হইতেই গুলবদন তাঁহার বিমাতা হুমায়ুন-জননী মহমের হস্তে ন্যস্ত হন। অতি শৈশবেই মহমের তিনটী পুত্র ও একটী কন্যার মৃত্যু হওয়ায় তিনি গুলবদনের লালনপালন ও শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল বাবর পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন। পরবৎসর (১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ্চ) তিনি খানওয়ার (শিক্রী) যুদ্ধে রাণা সঙ্গকে পরাজিত করিয়া নিরাপদে রাজ্যলাভ করেন।

কাবুল ত্যাগ করিবার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি পরিবারবর্গের সহিত একত্র থাকিবার সুবিধা পান নাই। এক্ষণে (১৫২৮ খৃষ্টাব্দে) তাহাদিগকে হিন্দুস্থানে আসিবার আদেশ পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাবুল হইতে যাত্রা করিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। আলিগড়ের নিকট বাবরের লোকজনের সহিত মহমের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা সম্রাটের নিয়োগানুসারে বেগমকে মহা সমাদরে আগ্রায় আনয়ন করেন (১৫২৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন)। শিশু গুলবদন সে রাত্রে মহমের সহিত আগ্রায় গমন করেন সাই। তিনি পরদিন দিবাভাগে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সম্রাটের খলিফা মীর নিজামুদ্দিন আলি ও তাঁহার পত্নী সুলতানাম, কুলজালীতে (আলিগড়ে) গুলবদনকে বিশেষ আদর যত্ন করেন। গুলবদন আগ্রায় আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করেন।

বহুদিন পরে বাবর, পত্নী ও পুত্রকন্যার মুখ দেখিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পরিবারবর্গসহ ঢোলপুর ও শিক্রী যাত্রা করেন। শিক্রীতে গুলবদনের এক আকস্মিক বিপদ সংঘটিত হয়। মহম যখন প্রার্থনায় ব্যাপৃতা ও সম্রাট্ যখন অন্যতমা পত্নী বিবি মুবারিকার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় শিশুসুলভ চাপল্যবশতঃ গুলবদন মুবারিকাকে বহুবার তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে অনুযোগ করেন। বালিকার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, কিন্তু পার্ব্বত্য মুবারিকার বলপ্রয়োগে গুলবদনের হাতের হাড় স্থানান্তরিত হইয়া যায়। সুচিকিৎসার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই হাড় পুনরায় যথাস্থানে ন্যস্ত হয়। এই ঘটনার

পর তাঁহারা সকলে আগ্রা প্রত্যাগমন করেন।

বাবরের অদৃষ্টে বহুদিন সুখভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সন্তালে অবস্থানকালে হুমায়ুন পীড়িত হন। বাবর তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বলেন; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়। কোনরূপ ঔষধে ফললাভ না হওয়ায় মৌলবীদের পরামর্শে কিরূপে বাবর পুত্রের পীড়া স্বীয় শরীরে সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে নিরাময় করেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ইহার অল্পদিন পরেই ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাবরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীশোক-বিহ্বলা মহমেরও মৃত্যু হয়। গুলবদন তাঁহার মৃত্যুতে শোকাভিভূতা হইয়া লিখিয়াছেন,—"দিনের পর দিন আমি আকামের (মহম) জন্য ক্রন্দন করিতাম—শোকপ্রকাশ করিতাম ও শুকাইয়া যাইতাম। সম্রাট্ (হুমায়ুন) বহুবার সান্ত্বনা করিবার জন্য আমার নিকট আসিতেন। যখন আমার বয়স দুই বৎসর, তখন আকাম আমাকে স্বীয় সংসারে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন—আমার ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি আমাদের ফেলিয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় লন।"

মহমের মৃত্যুর পর গুলবদন আরও এক-বৎসর হুমায়ুনের সংসারে ছিলেন। পরে দিলদার স্বীয় কন্যা ও পুত্র হিন্দালের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট চোসা নামক স্থানে পরাজিত হন। হুমায়ুন পরাজিত হইয়া কোনক্রমে আগ্রায় ফিরিয়া আসেন; তথায় গুলবদনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন গুলবদনের বয়ঃক্রম সপ্তদশ। হুমায়ুন তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই; কারণ যখন তিনি ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে অভিযান করেন, সে সময়েও তিনি গুলবদনকে 'তাক্' (টুপি) পরিতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি তাঁহাকে বিবাহিতা রমণীর চিহ্ন 'লাচাক্' পরিতে দেখেন। ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে গুলবদন তখন বিবাহিতা। তবে কখন তিনি প্রথম বিবাহিতা হন, তাঁহার পুস্তকের কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। হুমায়ুন গুলবদনকে বলিলেন,—"হায় গুলবদন! অধিকাংশ সময়ই আমি তোমার কথা ভাবিতাম। তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভাগ্যে যখন পরাজয় ঘটিল তখন তোমাকে যে সঙ্গে লইয়া আসি নাই, এইজন্য ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছি। হায়! আকুইকাকে (হুমায়ুন-পত্নী হাজিবেগমের গর্ভজাত কন্যা) সঙ্গে লইয়া গিয়া কি ভুলই করিয়াছি! যদিও সে শিশু, তবুও তাহার অভাবে আমার প্রাণ কাতর হইতেছে।"

হুমায়ুন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কামরাণ আগ্রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। আগ্রা তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই তিনি লাহোরে ফিরিয়া গেলেন। লাহোরে পৌঁছিয়া তিনি হুমায়ুনকে বারংবার লিখিয়া পাঠাইতে

লাগিলেন—"আমি বড় অসুস্থ, আমাকে দেখিবার কেহ নাই; অতএব সত্বর গুলবদনকে পাঠাইয়া দিলে আমার প্রতি যথেষ্ট উপকার করা হইবে।" হুমায়ূন গুলবদনকে যাইতে বলিলেন। গুলবদনের কিন্তু কামরাণের নিকট যাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। হুমায়ূন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলে কি হয়, গুলবদন তাঁহাকে আপনার সহোদর অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। গুলবদন অভিমানপূর্ণ স্বরে হুমায়ূনকে বলিলেন,—"ভাই! ইহা আমার কখনও ধারণা ছিল না যে, তুমি কোন কালে আমাকে তোমার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া কামরাণের নিকট যাইতে বলিবে। আমি কখনও মাতা, ভগিনী বা আত্মীয়বর্গ—যাঁহাদের অঙ্কে প্রতিপালিতা হইয়াছি—তাঁহাদের ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিব না।" হুমায়ূন তাঁহাকে বুঝাইলেন,—"ভগিনী! তোমার সাহচর্য্য ত্যাগ করা আমারও আদৌ অভিপ্রেত নহে; তবে কামরাণ বিপন্ন—বার বার তোমাকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ-পত্র পাঠাইতেছে, আর আমিও বিপদগ্রস্ত—সিংহাসন লইয়া বিশেষ চিন্তান্বিত; এই বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেই পুনরায় আমি তোমাকে কামরাণের নিকট হইতে লইয়া আসিব।" অবশেষে হুমায়ূনের অনুরোধে গুলবদন কামরাণের নিকট গমন করেন।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কণৌজের যুদ্ধে হুমায়ূনের আশা-ভরসা সমস্ত নির্ম্মূল হইয়া যায়। তিনি পরিবারবর্গকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে হিন্দালের উপর তাহাদিগকে লাহোরে লইয়া যাইবার ভার প্রদান করেন। এই সময়ে, বিতাড়িত হুমায়ূন কয়েক বৎসর ধরিয়া মরুভূমির মধ্যে কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরসহ স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া যে কতদূর নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, ও কিরূপে মুলতানে শিবিরে দিলদার ও হিন্দালের নিকট হামিদাবাণুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয় (১৫৪১ খৃষ্টাব্দ), ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হুমায়ূন ভ্রাতাদের নিকট কোনরূপ সাহায্য বা সহানুভূতি পান নাই। তিনি কাবুলের দিকে গমন করিবার চেষ্টা করিলে, কামরাণ স্বয়ং অগ্রে কাবুলে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন; যাহা হউক, অনেক কষ্টের পর হুমায়ূনই প্রথমে কাবুলে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে গুলবদন কামরাণের সহিত কাবুলে গিয়াছিলেন কি না, গুলবদন কোথাও তাহার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে কাবুলে গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

গুলবদন কাবুলে তাঁহার পুত্রকন্যা লইয়া গৃহকর্ম্মে দিনগুলি বেশ মনের আনন্দে যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কয়টি পুত্রকন্যা ছিল, তাহা নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থে সদাৎ ইয়ার নামে এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কামরাণ যদিও অপরাপর আত্মীয়াদের উপর অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু গুলবদনের উপর কখন দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। তিনি গুলবদনকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

কামরাণ হিন্দালের হস্ত হইতে কান্দাহার কাড়িয়া লইলে, হিন্দাল নজরবন্দী হইয়া কাবুলে মাতার নিকট ফিরিয়া আসেন। সেই সময়ে (১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ) গুলবদনের সহিত হিন্দালের একবার সাক্ষাৎ হয়।

কিছুদিন পরে হুমায়ূন পারস্য হইতে শাহের সৈন্যদল লইয়া ভারতাভিমুখে লুপ্ত-রাজ্যের উদ্ধারের জন্য অভিযান করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি কামরাণের নিকট হইতে কাবুল অধিকার করিয়া লন। গুলবদন লিখিয়াছেন,—"পাঁচ বৎসর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার আমরা প্রিয়ভ্রাতা হুমায়ূনকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলাম।" ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কামরাণের নিকটেই ছিলেন।

পরাজিত কামরাণ অগত্যা হুমায়ূনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন বটে; কিন্তু ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন হুমায়ূন আস্কারীর সহিত কাবুল ত্যাগ করিয়া বাদাক্ষানাভিমুখে অভিযান করেন, সেই অবসরে তিনি কাবুলে উপস্থিত হইয়া বিমাতা দিলদারের গৃহ দখল করেন ও তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে বলেন। এই সময়েও কামরাণ গুলবদনের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। তিনি গুলবদনকে বলেন—"তুমি এখানে অবস্থান কর,—মনে করিও ইহা তোমার আপনার গৃহ।" উত্তরে গুলবদন বলিয়াছিলেন—"কেন আমি এখানে থাকিব? যেখানে আমার মা থাকিবেন আমিও সেখানে থাকিব।" তৎপরে কামরাণ স্বীয় সাহায্যের জন্য গুলবদনকে স্বামী খিজির খাঁকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করেন। গুলবদন তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এ যাবৎ তিনি স্বামীকে কোন পত্র লেখেন নাই; এক্ষণে যদি তিনি তাঁহাকে পত্র লেখেন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তাক্ষর না জানার দরুন তিনি এই পত্রকে জালপত্র ভাবিতে পারেন। আরও বলিলেন, "খাঁ যখন অন্যত্র অবস্থান করেন, তখন পুত্রের জবানীতে আমাকে পত্র লেখেন—স্বয়ং পত্র লেখেন না!" গুলবদন কামরাণকেই পত্র লিখিতে বলিলেন। এই সময় গুলবদনের বয়স ২৫ বৎসর ছিল। কামরাণ অবিলম্বে খিজিরের নিকট তাঁহার ভ্রাতা মেহেদীসুলতানকে পাঠাইলেন ও তাঁহাকে সসম্মানে কাবুলে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

গুলবদন চিরদিনই হুমায়ূনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তিনিও ইহার বহু পূর্ব্বে বহুবার স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"তোমার অপরাপর ভ্রাতারা কামরাণের স্বপক্ষে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু, ভগবান করুন, কামরাণের দলভুক্ত হইবার চিন্তা ঘূণাক্ষরেও যেন তোমার মনে উদয় না হয়। সাবধান! সহস্রবার সাবধান! কখনও যেন সম্রাট্ হুমায়ূনের সঙ্গ ত্যাগ করিও না।" খাঁর মনোমধ্যে পত্নীর অনুযোগ-বাণী জাগরূক থাকায় তিনি কামরাণের নিকট গমন করেন নাই।

হুমায়ূন বলসংগ্রহ করিয়া পুনরায় কামরাণের হস্ত হইতে কাবুল উদ্ধার করেন। ভীত কামরাণ হুমায়ূনের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সহায়তা

করিতে প্রতিশ্রুত হন। সরলহৃদয় হুমায়ুনও তাঁহাকে আন্তরিক ক্ষমা করিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৫৪৮ খৃঃ) তলিকান্ নামক স্থানে হুমায়ুন,—হিন্দাল, আস্কারী ও কামরাণের সহিত সৌভ্রাতৃত্ব স্থায়ী করিবার জন্য এক মিলন-উৎসবের আয়োজন করেন। সম্রাট্ ভ্রাতাদের বলেন—"লাহোরে গুলবদন প্রায়ই বলিত 'আমার বড় ইচ্ছা, আমি চারি ভ্রাতাকে একবার একত্রে দেখি,' আজ আমরা প্রাতঃকাল হইতে সকলে একত্রে রহিয়াছি এবং ভগবান করুন আমরা চির দিনই যেন এইরূপ আত্মীয়তা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারি।"

এই সময়ে বেগমদের আগ্রহাতিশয্যে হুমায়ুন,—গুলবদন, হামিদা, মাচুচাক্ বেগম প্রভৃতিকে লইয়া সুগন্ধী পার্ব্বত্যলতা 'রিয়াজ' দেখিবার জন্য কোইডামান্ উপত্যকায় গমন করিয়াছিলেন। বসন্তকালে পার্ব্বত্য প্রদেশে রিয়াজের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে। (৩)

দুর্ব্বৃত্ত কামরাণ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার জন্য গোপনে পুনরায় সৈন্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। হুমায়ুন এই সংবাদে হিন্দালকে লইয়া তাঁহাকে দমন করিবার মানসে পুনরায় অভিযান করেন। কামরাণ ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর রাত্রিযোগে জিরবর নামক স্থানে হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করেন। হিন্দাল স্বীয় প্রাণদান করিয়া হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করেন।

হিন্দালের এই আকস্মিক মৃত্যু গুলবদনের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়াছিল। তিনি শোকোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন,—"জানি না কোন্ নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই নিরপরাধ যুবককে তাহার তরবারি দিয়া হত্যা করিল। হায়! ভগবান যদি ইহার পরিবর্ত্তে আমাকে বা আমার পুত্র সদাৎ ইয়ার বা স্বামী খিজিরকে লইতেন!"

ইহার পর কামরাণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বন্দী হইয়া সম্রাটের নিকট আনীত হন। হিন্দালের মৃত্যু-যন্ত্রণা ও আপনার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ-স্পৃহা হুমায়ুনের মনোমধ্যে জাগরূক থাকিলেও তিনি কামরাণকে বন্দী রাখিবার পরামর্শ দেন; কিন্তু পারিষদ্‌বর্গের প্ররোচনায় স্বীয় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তিনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়ম-রক্ষিত এই "হুমায়ুন-নামা"-খানি হইতে গুলবদন সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর হুমায়ুন দ্বিতীয়বার হিন্দুস্থান অধিকার করিবার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন ও ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তিনি আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। শেরমণ্ডলের পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী হুমায়ুন প্রাণত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর আকবর সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। এক বৎসর ধরিয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি কাবুল হইতে পরিবারবর্গকে আনয়ন করেন।

(৩) Humayun-nama—P. 189-90.

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে সম্রাট্-জননী হামিদাবাণু, গুলবদন সলিমা, হাজি ও গুলচিরা বেগম মানকোটে রাজশিবিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। আকবর আত্মীয়-স্বজনের মুখদর্শনে আনন্দোৎফুল্ল হন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা সকলে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতে আগমন হইতে (১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে) তীর্থভ্রমণে বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত গুলবদনের কোন ঘটনা আমরা ইতিহাস সাহায্যে জানিতে পারি না!

গুলবদন এক্ষণে ৫০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মুসলমান রমণীর পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য মক্কা যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। আকবর প্রথমে এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। যে সমস্ত রমণী গুলবদনের সহিত তীর্থযাত্রা করেন, আবুলফজল তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। গুলবদনের সহিত যাঁহারা মক্কা গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার আত্মীয়ার সংখ্যাই অধিক। আমরা নিম্নে কয়েকজনের নাম উদ্ধার করিয়া দিলাম:—

১। আকবর-পত্নী সলিমা সুলতান বেগম

২। আস্করীর, বিধবা-পত্নী সুলতানাম্

৩। কামরাণের দুইকন্যা—হাজি ও গুলিজার বেগম

৪। উম্ কুলসম—গুলবদনের পৌত্রী

আকবর এই তীর্থযাত্রার সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান করেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত আমীর এই তীর্থযাত্রীদলের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ফতেপুর শিক্রী হইতে যাত্রা করেন। আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের উপর বেগমগণকে সুরাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবার ভার ন্যস্ত হয়; কিন্তু গুলবদন শিশু মুরাদকে নানারূপে বুঝাইয়া এই শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। যাত্রীদলের মধ্যে নানারূপ বাধা বিপত্তি ঘটায় সমুদ্র-যাত্রা করিতে তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাঁহারা যাত্রা করেন। আরবে পৌঁছিয়া (৪) গুলবদন তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং চারিবার 'হজ' করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। (৫)

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বদাউনীর বন্ধু খাজা ইহাহার উপর বেগমদিগকে ভারতে ফিরাইয়া আনিবার ভার অর্পিত হয়। ফিরিবার কালে তাঁহাদিগকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এডেনের নিকট তাঁহারা পোত-মগ্ন হওয়ায় ৭ মাস অতীব কষ্টে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু তথাকার শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগের সহিত

(৪) বদাউনী বলেন, তাঁহারা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (৯৮২ হিঃ) আগ্রা ত্যাগ করেন। গুজরাটে তাঁহাদের এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে (৯৮৩ হিঃ ৫ সাবান, অর্থাৎ অষ্টমা মাস) তাঁহারা মক্কা পৌঁছান।
Muntakhab-ut-Tawarikh—Al-Badaoni—W. H. Lowe, Vol. II. p. 216

(৫) লো সাহেব (Badaoni—Vol. II—217) বলেন, গুলবদন,—কারবেলা, কাম্, মাসাদ্ ও মক্কা এই চারি তীর্থস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

ভাল ব্যবহার করেন নাই। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ হইতে একখানি জাহাজ আসিতে দেখিয়া গুলবদন, গুলিজার ও খাজা সকলে পরামর্শ করিয়া একখানি নৌকা উহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত জাহাজখানি বায়াজিদ্ বায়াতের (৬) ছিল ;—তিনি মক্কা যাইতেছিলেন। বায়াজিদ্ বেগমদের নিকটে আসিয়া সমস্তই শুনিলেন। ইহা হইতে আমরা ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গুলবদন প্রভৃতির এডেনে থাকিবার সংবাদ পাইতেছি। সম্ভবতঃ বায়াজিদই বেগমদের ভারতে ফিরিবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কোন্ সময়ে বেগমেরা এডেন ত্যাগ করেন, অথবা কখন তাঁহারা সুরাটে পৌঁছান, তাহা নির্দ্ধারিতরূপে বলিবার উপায় নাই। সুরাটে তখন অতিরিক্ত বৃষ্টিপতন ও সম্রাটের কাবুলে অবস্থান দরুণ পুনরায় তাঁহাদের আগ্রায় আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। রাজধানীতে আসিবার মুখে বেগমেরা আজমীরে চিস্তি ফকীরদিগের পুণ্যপীঠ দেখিতে গিয়াছিলেন। কুমার সেলিমও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আজমীরে উপস্থিত হন। সম্রাট্ খানওয়া নামক স্থানে বেগমদের সহিত মিলিত হন। বদাউনীর মতে এক বৎসর গুলবদনকে এডনে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে (৯৯০ হিঃ) হিন্দুস্থানে পৌঁছান।

ফতেপুর শিক্রীতে পৌঁছিয়া গুলবদন দেখিলেন—মিশনরী পাদরী একোয়াভাইভা কুমার মুরাদকে খৃষ্টধর্ম্মের নানা নীতিকথা বুঝাইতেছেন। ইহাতে গুলবদন ও হামিদা বিরক্ত হইয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। (৭)

আগ্রায় উপনীত হইয়া গুলবদন প্রাগুক্ত "হুমায়ুন-নামা" রচনা করেন। ইহাতে তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন ও বিশ্বস্তসূত্রে যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা নহে। তিনি ইহা ব্যতীত বহু পারস্য কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। মীর মাদী সিরাজী "তাজখিরাতুল্-খাতীনে" তাঁহার একটী কবিতার এই দুইটী চরণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন :—

"হর পরী কি ও বা আশক্ খুদ ইয়ার নিস্ত।
তু ইয়াকীন মদান্ কি হেচ অজ উমর বর-খুর-দার নিস্ত।"

অর্থাৎ :—

"প্রেমাস্পদের প্রতি অনাসক্তা হে পরী! তুমি বড়ই মূর্খ—

"অভাগিনী! নিশ্চয় জানিও সারাজীবনে তুমি কখনও সুখী হইবে না।"

ইহার পর গুলবদনের জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা অতি সামান্য। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন—তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৭০ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার দৌহিত্র মহম্মদ-ইয়ার কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া সম্রাটের বিরাগভাজন হইলে বেগমের মধ্যস্থতায় তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। হুমায়ুনের ন্যায় আকবরও গুলবদনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। বাদশাহ বহুবার তাঁহাকে বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়াছিলেন। (৮) পরে গুলবদন ও সলিমা কুমার সেলিমের হইয়া বাদসাহের নিকট মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়াছিলেন সম্রাট্ যখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র শিবির সংস্থাপন করিতেন, তখনই স্বীয় জননী হামিদাবাণুর শিবিরের সন্নিকটেই গুলবদনের তাঁবু সন্নিবিষ্ট হইত।

গুলবদন বহু দানধান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুক্তহস্তে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এদিকে তাঁহার 'গণাদিন' ফুরাইয়া আসিল। ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকদিনের জ্বরে তিনি শয্যা গ্রহণ করেন।

হামিদা গুলবদনকে বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। গুলবদনের শেষ-সময় পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার পাশে ছিলেন। হামিদা আদর করিয়া ননদিনীকে "জিউ" (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা ভগিনী) বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি দেখিলেন—রোগিণীর চক্ষে মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি একবার স্নেহভরে ডাকিলেন,—'জিউ?' কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় ডাকিলেন,—'গুলবদন?' মুমূর্ষু গুলবদন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বহুকষ্টে বলিলেন,—"আমি মরিতেছি, তুমি চিরজীবিনী হও।" তারপর সমস্ত নিস্তব্ধ।

আকবর পিতৃস্বসার মৃত্যুতে অতীব সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য বহু সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬) বায়াজিদও গুলবদনের ন্যায় আকবরের আদেশে "হুমায়ুন-নামা" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের রন্ধনশালার পরিদর্শক ছিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট্ হুমায়ুন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য ঘটনা বায়াজিদের পুস্তকে আছে।

(৭) Father Goldie's "First Christian Mission to the Great Mughal." (Dublin : Gill & Co. 1897)

(৮) Al-Badaoni—Vol. II, p 332

সগুণ ঈশ্বরের বিকাশ ও প্রচার

বেদ ও উপনিষদে নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বই প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। বেদের দেব-বাদের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বের সূচনা থাকিলেও বেদের দেবতা ব্রহ্ম-ভাবেরই দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্বের বিকাশ, তন্ত্রে হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

বেদোপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্ম, জ্ঞানীরই বোধগম্য ও সাধনীয়—ইহা সাধারণের

অনধিগম্য। সাধারণের জ্ঞান ও সাধনার জন্যই সগুণ ঈশ্বরের বিকাশ। ব্রহ্মের সহিত বিশ্বের প্রত্যক্ষগোচর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই বিশ্বের সাক্ষাৎ নিয়ামকরূপে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হইয়াছে। তন্ত্রে নূতন ভাবে এই বিশ্বনিয়ন্তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে। 'তন্ত্র' শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ 'প্রধান।' নূতন ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়াতেই 'তন্ত্র' আপনার প্রাধান্য বাচক এই নাম ধারণ করিয়াছে। এই নামের দ্বারা 'তন্ত্র' বেদ হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্যই প্রখ্যাপন করিতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

'তন্ত্র' শিবেরই উক্তি। সুতরাং শিবই যে তন্ত্রের প্রধান দেবতা, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই শিবই সগুণ-ঈশ্বরের প্রথম বিকাশ। শিবের 'ঈশ্বর' 'ঈশ' 'ঈশান' (১) প্রভৃতি অনন্যসাধারণ নামেই ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেদের দেবতায় ঈশ্বরতত্ত্বের সূচনা দেখা যায় বলিয়া আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই দেবভাবের পূর্ণ পরিণতি যেমন শিবে হইয়াছে—তেমনই ইহার ঈশ্বরভাবের পূর্ণ পরিণতিও তাঁহাতেই হইয়াছে। তিনি যেমন একদিকে 'দেবদেব' বা 'মহাদেব'—তেমনই অপরদিকে 'মহেশ' বা 'মহেশ্বর'।

শিবের ধ্যানমন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্রের আলোচনা করিলে, বেদোপনিষদের ব্রহ্ম-ভাবকে মূল করিয়াই যে তাঁহার ঈশ্বর-ভাবের বিকাশ হইয়াছে—তাহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যায়। এস্থলে আমরা উক্ত মন্ত্র দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভম্।
চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গম্।
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্র
কৃত্তিংবসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজম্ নিখিলভয়
হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥"

ধ্যানমন্ত্রে 'বিশ্বাদ্যং' 'বিশ্ববীজং' স্বরূপে শিব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্বৈত মূলতত্ত্বরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। নমস্কার-মন্ত্রে 'কারণ-ত্রয়হেতবে' বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় তিনি বিশ্বের 'আদি-কারণ' রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। এইগুলি যে আদি-তত্ত্বরূপে তাঁহার নির্গুণ ভাবেরই বর্ণনা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ধ্যানে তিনি 'মহেশ' ও নমস্কার-মন্ত্রে 'পরমেশ্বর' নামে আখ্যাত হওয়ায় নির্গুণ ঈশ্বর-ভাবেব মধ্য হইতেই যে তাঁহার সগুণ ঈশ্বর-ভাবের বিকাশ হইয়াছে এবং এই সগুণ ঈশ্বর-ভাব যে চরম ঈশ্বর-ভাব, তাহা পরিষ্কারই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তদীয় 'বিশ্বেশ্বর', 'বিশ্বনাথ' 'বিশ্বম্ভর' প্রভৃতি নামে সেই চরম ঈশ্বর-ভাব আরও স্পষ্টরূপে প্রকটিত।

উপরে শিবকে আমরা সগুণ ঈশ্বরের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি—এক্ষণে ঈশ্বরের গুণ সকলের পূর্ণ

(১) শম্ভুরীশঃ পশুপতি শিবঃ শূলী মহেশ্বরঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ অমরকোষ।

সমাবেশ যে তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

শিবের আরাধনার উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ে তাঁহার যে, সমস্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথমতঃ আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব। তিনি যে 'মহেশ' ও 'পরমেশ্বর' নামে আখ্যাত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রমাণই পাওয়া যায়। কারণ 'মহেশ' ও 'পরমেশ্বর' শব্দের মূল ঈশ-ধাতু, প্রভাব ও শক্তির অর্থই প্রকাশিত করিয়া থাকে। তিনি যে 'ত্রিনেত্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি 'ত্রিকালদর্শী, অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী ইহাই বুঝাইতেছে (২)। 'শিব' বলিয়া উক্ত হওয়ায় তিনি যে মঙ্গলময়, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'বরাভীতিহস্ত' 'নিখিলভয়হর' 'প্রসন্ন' ও 'শান্ত' বলিয়া উক্ত হওয়ায় তিনি যে রক্ষাকর্ত্তা, করুণাময়, আনন্দ ও শান্তির আধার তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। 'পঞ্চবক্ত্র' বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় পঞ্চভূত যে তাঁহারই অভিব্যক্তি তাহাই সূচিত হইতেছে। ইহাতে তাঁহাকে সর্ব্ব-ব্যাপী বলিয়াই জানিতে পারা যায়। তাঁহার 'সর্ব্ব' বলিয়া যে একটী নাম আছে, তাহাতেও তাঁহাকে সর্ব্বময় বা বিশ্বময় বলিয়াই বুঝা যায়। তাঁহাকে 'কারণত্রয় হেতবে' বলিয়া বর্ণনা করায় তাঁহার বিশ্ব-কর্ত্তৃত্ব বিশেষরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে শিবেই যে বিশেষরূপে জগৎপিতৃত্ব আরোপিত, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই পিতৃত্বভাবের বন্দনা করিয়াই কালিদাস রঘুবংশের সূচনা করিয়াছেন; যথা—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

উপরে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বপালকত্ব প্রভৃতি সমস্ত ঐশ্বরিক গুণের বিকাশই যে শিবে হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম।

শিবে ঈশ্বরাদর্শের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে বলিয়াই কেবল তাঁহারই 'ঈশ্বর' 'মহেশ্বর' নাম হইয়াছে—আর কোনও দেবতার এই নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। শিবের ঈশ্বরাদর্শ কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই সগুণ ঈশ্বরের আদর্শ হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মের ঈশ্বরাদর্শেও ইহা প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহুদিদিগের ধর্ম্মে ঈশ্বর "জেহোভা" (Jehova) নামে আখ্যাত। Jehova শব্দ কোন কোন শাব্দিক, হিব্রু অস্ত্যর্থক হাওয়া hawah (to be) হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন। শিবের 'ভব' নামের মূলেও আমরা এইরূপ সত্ত্বাবাচক ভূ ধাতুরই যোগ দেখিতে পাই। Lord শব্দ বাইবেলে যেমন ইহুদিদিগের Jehovaকে বুঝায়, তেমনই খ্রীষ্টানদিগের পরমেশ্বরকেও বুঝায়। ইহা 'ঈশ্বর' শব্দেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ।

খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর যে পিতা (God the Father) রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে শিবের পিতৃভাবেরই অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেলের ঈশ্বর স্বর্গের সিংহাসনে সমাসীন, আর দেবগণ (Angels) চতুর্দ্দিকে অনবরত তাঁহার স্তুতি-গানে নিরত (Singing eternal; Hallelujah) এইরূপ

(২) শিবের 'সর্ব্বজ্ঞ' নামেও এই সর্ব্বদর্শীর অর্থই প্রকাশিত হয়।

যে বর্ণনা পাওয়া যায়, উহা 'পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈঃ' বলিয়া শিবের ধ্যানে শিবের যে বর্ণনা আমরা প্রাপ্ত হই, তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়।

বাইবেল-ধর্ম্মের আদর্শে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গঠিত। সুতরাং মহম্মদীয় ধর্ম্মেও যে শিবের ঈশ্বরাদর্শই অনুসৃত হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

শিব ও দুর্গাই তন্ত্রের প্রধান দেবতা। মহম্মদীয় ধর্ম্মের পরমেশ্বরের 'আল্লা' নাম যে দুর্গার নাম হইতেই গৃহীত, অনুসন্ধান করিলে তাহার বিশেষ প্রমাণই আমরা পাইতে পারি। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মেতিহাস-প্রণেতা অধ্যাপক টিল্ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আরবের প্রাথমিক ধর্ম্মে দেবতার নাম 'অল্লাৎ' ছিল। এই নাম ও আসিরীয় দেবতার অল্লাৎ নাম একই নাম।

"In Arabia her name, as Professor Tiele shows, was Allah (৩) where she became the lightmoon or the heavenly ship of light. This is the same name as that of the Assyrian goddess Allat, meaning the unwearied one." The Ruling Races of Prehistoric Times : by J. F. Hewitt Vol I. p 23.

দুর্গার এক নামও 'অল্লা' পাওয়া যায়। তাঁহার ধ্যানে তাঁহাকে "অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তিনি "শক্তিরূপিণী"। সুতরাং আরবদিগের আদি দেবী 'অল্লাৎ' যে "শুক্লপক্ষীয় চন্দ্র-রূপিণী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং আসিরীয় দেবী যে "অশ্রান্তিরূপা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে আমরা দুর্গারূপেরই প্রতিরূপ দেখিতে পাইতেছি। বিশেষতঃ "আসিরীয়" অসুর নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অথচ শিবদুর্গা অসুর দিগের পরম দেবতা বলিয়াই পরিজ্ঞাত। সুতরাং 'অল্লাৎ' যে দুর্গার অল্লা নামেরই অপভ্রংশ, তাহাতে অল্পই সন্দেহ থাকিতেছে।

ইজিপ্তের 'ঈশীশ' দেবতার নাম শিব এবং দুর্গার ঈশা ও ঈশ নামের যোগদ্বারা গঠিত বলিয়াই বোধ হয়। কালীমূর্ত্তিতে উভয়েরই সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। বৃষ দেবতা ওসিরিসেও আমরা শিবের বৃষবাহনেরই নিদর্শন দেখিতে পাই।

এই প্রকারে শিবে সগুণ ঈশ্বরভাবের বিকাশের প্রমাণ যে কেবল ভারতীয় ধর্ম্মেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, পরন্তু বাইবেল কোরাণ ও অন্য প্রধান প্রাচীন ধর্ম্মেও পাওয়া যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৩) Tiel—Outline of the History of Ancient Religions Primitive Arabian Religion. pp. 63-64.

অকূলে

(গল্প)

সেদিন কোর্টে পৌছিতেই সুশীলের সঙ্গে দেখা। সুশীল কহিল, "লাইব্রেরীতেই চলেছেন ত! একটি মক্কেল এনেছি—এক খানা দরখাস্ত করতে হবে।"

"এস" বলিয়া অগ্রসর হইলাম। সুশীল আমার অনুসরণ করিল।

লাইব্রেরীর সম্মুখেই একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। সুশীল তাহাকে কহিল, "এস গো, উঠে এস।" স্ত্রীলোকটি উঠিয়া আসিল।

চেয়ারে বসিয়া স্ত্রীলোকটির পানে চাহিলাম,—তাহার পরণে একখানি রঙ-করা মলিন বস্ত্র, মুখ ঘোমটায় ঈষৎ ঢাকা। স্ত্রীলোকটি সুন্দরী, বয়সে কিশোরী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি তোমার নালিশ, বল।"

সুশীল কহিল, "সারদা বাড়ী-উলির নামে নালিশ। কাল রাত্রে সে ওকে মেরেছে, তবে'গে ওর গহনা-পত্তর কেড়ে নিয়ে ওকে রাস্তায় বার করে দেছে।"

সুশীলকে চুপ করিতে বলিয়া স্ত্রীলোক-টিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি—?" সে কোন কথা কহিল না। সুশীল কহিল, সে পতিতা। আজ দুই বৎসরমাত্র সে এ পথে পা দিয়াছে; নহিলে পূর্ব্বে সে গৃহস্থ-ঘরেরই বধূ ছিল।

আমি সুশীলকে বাধা দিলাম, কহিলাম, "তুমি চুপ কর। ওর নালিশ আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই। তুমি ততক্ষণ যাও, একখানা আট আনার ষ্ট্যাম্প আর দরখাস্ত লেখবার কাগজ কিনে আনো। হ্যাঁ, তাহলে আমার ফীটা?

সুশীল কহিল, "ও বড় গরিব, মশায়। আপনার পুরো ফী দিতে পারবে না, একটু দয়া করবেন।"

তখন আমার জুনিয়ারির যুগ; ফীয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রা ছিল না। আট হইতে সুরু করিয়া একটা টাকাও হাত পাতিয়া লই। আমি কহিলাম, "চারটে টাকা চাই।"

সুশীল কহিল, "তা দেবে'খন। তবে টাকাটা এখন হাতে নেই! আমি এসে দিয়ে যাব'। আমি তার জামিনও রইলুম।"

সুশীলের জামিন মঞ্জুর করিলাম। প্রায়ই সে দুই-চারিটা 'কেশ্' আনিয়া দেয়; ফীয়ের টাকাও কখনও বাকী পড়িয়া থাকে না।

আমি কহিলাম, "আচ্ছা, তাহলে এর নালিশটা এখন শুনি।"

সুশীল চলিয়া গেল। আমি স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

বেশ শান্ত নম্র স্বরেই সে কহিল, "সরযু—"

"নালিশ তোমার সারদা বাড়ী-উলির নামে? তোমার গহনা-পত্তর কেড়ে নিয়েছে,

দিচ্ছে না—সেইগুলো তুমি উদ্ধার করতে চাও, কেমন ?”

সরযু কহিল, “সে আর আমি চাই না।”

আমি কহিলাম, “তার ঘরের ভাড়া-টাড়া কিছু ধারো ?”

নত মুখেই সে কহিল, “না।”

আমি কহিলাম, “তবে কি মেরেছে বলে নালিশ করতে চাও ?”

সরযু কহিল, “মেরেছে বটে, কিন্তু তার জন্যও আমি নালিশ করতে চাই না।”

বিরক্ত হইলাম। ভাল আপদ! কহিলাম, —স্বরে একটু ঝাঁজও ছিল—“এ নয়, ও নয়, তবে নালিশটা কিসের ? আদালতে এসেছ কেন ?”

আমার সে স্বরে সরযু কেমন দমিয়া গেল। আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম; একটু অপ্রতিভও হইলাম। তখন তাহাকে বুঝাইতে বসিলাম। নিজের পকেট-পূর্ত্তির সম্ভাবনায় নহে; মানুষের প্রতি মানুষের যে একটা স্বাভাবিক সহানুভূতির টান আছে, সেই টানে! আমি কহিলাম, “তোমায় মেরেছে সে, তবে গে গহনা-পত্তরও কেড়ে নিয়েছে, অথচ তার জন্য তুমি নালিশ করতে চাও না! তবে আমার কাছে এসেছ কেন ? আমি তোমায় কি সাহায্য করতে পারি, আর কি সাহায্যই বা চাও তুমি ?”

সরযু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, “আমায় সে ভয় দেখাচ্ছে, বলছে, মিথ্যে নালিশ করে সে আমায় জেল খাটাবে। তাই—”

সুশীল কাগজ ও ষ্ট্যাম্প লইয়া আসিল। সরযুর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সে কহিল, “সে সব গহনা-পত্তর ও আর চায় না। আদালতে এসে ঘটা করে সে মকর্দ্দমা চালাবার সামর্থ্যও ওর নেই। বাড়ী-উলি মাগী ভারী পাজী। সে ওকে শাসাচ্ছে, ওর ঘরে কোকেন ফেলে ওকে ধরিয়ে দেবে, তবে মিছে করে পুলিশে খপর দেবে, ও মদ বেচে, এই রকম কোন ফ্যাসাদে ফেলবে—বুঝেছেন ? পাছে সেই সব কিছু করে, তাই তারই একটা প্রতিকার আপনি করে দিন, মশায়।”

ব্যাপারটা জলের মতই সাফ বুঝিয়া ফেলিলাম। শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্! কহিলাম, “তাই বল। বেশ, এখনই দরখাস্ত লিখে ফেলছি। কিন্তু একটা কথা বল দেখি, আগে। এর সঙ্গে তোমার আলাপই বা হল কি করে, আর কেনই বা তোমায় কাল রাত্রে এমন ভাবে ও পথে তাড়িয়ে দিলে ? বল, সব খুলে বল—লজ্জা করলে চলবে না।”

এত কথা জানিবার আমার প্রয়োজনও ছিল না। তবে তাহার পরিচয়ে সুশীল যেটুকু ইঙ্গিত দিল, তাহা হইতেই আমার মনে একটা কৌতূহল জাগিয়াছিল,—এই দুর্ভাগিনী নারীর অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য একটা অধীর আগ্রহ!

নারী দ্বিধা করিতেছিল। সুশীল কহিল, “বল না, সব কথা খুলে। উকিলের কাছে, ডাক্তারের কাছে কোন কথা লুকোনো ঠিক নয়। বল সব। শুনে উনি বেশ গুছিয়ে দরখাস্তখানা লিখে দেবেন'খন।”

সরযু একবার আমার মুখের পানে

চাহিল—বেশ ডাগর দুটি চোখে করুণ কাতর দৃষ্টি, ব্যাকুল নিবেদনে ভরা!

তারপর সঙ্কোচ কাটাইয়া সে বলিতে লাগিল :—

২

“আমার বাপের বাড়ী ছিল, পাড়া-গাঁয়। তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর, বাবার মৃত্যু হইল। মা আমাকে লইয়া অকূল পাথারে পড়িলেন। বাপ ছিলেন, গাঁয়ের বাঙলা স্কুলের মাষ্টার। বড় বোনের বিবাহ দিতে ভিটাখানি বাঁধা পড়িয়াছিল—বাবার মৃত্যু হইলে পাওনা-দারেরা আসিয়া নালিশ করিয়া সে ভিটা কাড়িয়া লইল। আমায় লইয়া মা পথে বসিলেন।

কলিকাতায় দূর-সম্পর্কে মার এক মাতুল ছিলেন—তাঁহার স্ত্রীর শরীর ভাল ছিল না, মাতুল চাকুরি করিয়া মাসে পঞ্চাশটি মাত্র টাকা ঘরে আনিতেন। স্ত্রীর অসুখ, অথচ সচ্ছলতার অভাবে বামুন রাখিবারও তাঁহার সামর্থ্য ছিল না, কাজেই মাকে তিনি লইয়া গেলেন, রাঁধিবার জন্য। আমিও অগত্যা সেখানে আশ্রয় পাইলাম। মা রাঁধিতেন, বাড়িতেন, আমি তাঁহার মাতুলের ছেলেমেয়েদের সহিত খেলা করিতাম, গল্প করিতাম, ক্রমে পড়া-শুনাও সুরু করিলাম। তাহার পর চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হইল।

স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ—প্রথম পক্ষের তিন-চারিটি পুত্র-কন্যা ছিল; শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও ছিলেন। আমায় দেখিয়া পছন্দ করিয়া একশোখানি টাকা মাত্র লইয়া পরগৃহ-বাসিনী বিধবা মাকে তিনি কন্যাদায় হইতে মুক্তি দিলেন। এক পাটের অফিসে স্বামী কাজ করিতেন, রোজগার বেশই ছিল।

প্রথম বৎসরটা স্বামীর গৃহে মন্দ কাটিল না। তাঁহার পুত্র-কন্যার যত্ন করিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিয়া সহজেই সকলের মন পাইলাম। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ—সে সুখ সহিবে কেন ? এক বৎসর পরে শ্বশুরের মৃত্যু এবং আমারও দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। শাশুড়ী কিছুই দেখিতেন না, কাজেই সংসার এবং ছেলে-পিলে, সব দেখার ভার পড়িল, আমার উপর। আমার বয়স অল্প—সব দিক ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারিতাম না। ছেলেগুলাও ছিল তেমনই, কিছুতে বশ মানিবে না। অনর্থক বাজে আব্দার লইয়া তাহারা বিষম উৎপাত বাধাইয়া তুলিত—কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া দিত। আমার গায়ে হাত তুলিতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। কিন্তু তাহাতে আমি কোন দিনই রাগ করি নাই।

শাশুড়ীর কিন্তু অসহ্য বোধ হইল। একে সদ্য স্বামি-শোক, তাহার উপর পুত্রের ইদানীংকার ব্যবহার তাঁহাকে নিতান্তই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। আমার বিবাহের পূর্ব্বেই স্বামীর চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছিল। মদ্যপান ছিলই, তাহার উপর বাহিরের দোষগুলাও বিলক্ষণ বাড়িয়া গেল। শ্বশুর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন এ-সবগুলা তিনি সাধ্যপক্ষে গোপন করিয়া চলিতেন। এখন আর মাথার উপর কেহ নাই—কাজেই বাড়ীতে আসাও তাঁহার বড়-একটা ঘটিয়া উঠিত না। যদি-বা আসিতেন,

সহজ অবস্থায় নহে। আসিয়া গালি-গালাজ ও অন্য দুর্ব্যবহারেরও একশেষ করিতেন। একে পয়সা-কড়িতে টান ধরিয়াছে, তাহার উপর এই উপদ্রব, শাশুড়ীর যত রাগ পড়িল, আমার উপর। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কি শক্তি, কি সামর্থ্য আছে যে একটা বয়স্ক পুরুষের মতি ফিরাইব! একবার কথাটা পাড়িয়া ছিলাম। স্বামী লাথি মারিয়া উপদেশ দিলেন, গরিবের মেয়ের এত স্পর্দ্ধা কেন! গৃহে তাহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, এই যথেষ্ট! ছেলে-মেয়ের দাসীত্ব করিয়া, বাড়ীর কাজ সারিয়া ঘরের কোণে মুখ গুঁজিয়া সে দাসী পড়িয়া থাকুক! ছোট মুখে বড় কথার ধার তিনি ধারিবেন না—স্পষ্টই বলিয়া দিলেন। সে উপদেশের পর আবার আমি কথা কহিব, এত সাহস আমার ছিল না।

শাশুড়ীর বিরক্তি বাড়িল। ছেলের রাগ আমার উপর বাড়িয়া পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া একদিন তিনি বিদেশে এক আত্মীয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন। ঘরের কোণে কাঁদিয়াই আমি পড়িয়া রহিলাম। ছেলে-মেয়ে আসিয়া উপদ্রব জুড়িল, ভাত কৈ, খাবার কৈ! কোথা হইতে দিব? গৃহে একটা দারুণ রিক্ততা রি-রি করিতে ছিল। পয়সা কোথায় পাইব যে, তাহাদের খাবার কিনিয়া দিব? প্রাণে মায়াও হইল, আহা, ইহারা যে শিশু, বড় অসহায়! কিন্তু উপায় ছিল না। ছেলে-মেয়েরা কাঁদিল, আমায় গালি দিল, মারিল, আমি চুপ করিয়া কাঠের মত পড়িয়া রহিলাম। তারপর তাহারা চলিয়া গেল। কোথায় গেল, জানি না।

(দুইদিন পরে সন্ধ্যার সময় স্বামী আসিলেন—মত্ত অবস্থা। আসিয়াই তিনি হাঁকিলেন, "বাঁদী—")

আমি উঠিলাম, কাছে আসিলাম, জল-গামছা আগাইয়া দিলাম! তিনি দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কহিলেন, "ছেলেগুলো মরেছে না কি? সাড়া পাচ্ছি না যে—!" ভয়ে ভয়ে সব কথা আমি খুলিয়া বলিলাম! কথা সব শেষ করিবার পূর্ব্বেই পাঁজরায় প্রকাণ্ড লাথি পড়িল। দুই দিন আহার নাই, শরীরটাও বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল, সে লাথি সহ্য করিতে না পারিয়া রকের উপর আমি পড়িয়া গেলাম। সন্ধ্যার সমস্ত আলো আমার চোখে নিবিয়া গেল। আমি চোখ বুজিলাম।

যখন চোখ মেলিলাম, জ্যোৎস্নায় ছোট রক তখন ভরিয়া গিয়াছে! মাথা তুলিয়া দেখি, এক প্রৌঢ়া আমার পাশে বসিয়া আছে। সে সারদা—"

আমি বাধা দিলাম, কহিলাম, "এই বাড়ী-উলি সারদা না কি?" সরযু কহিল, "হাঁ, এই বাড়ী-উলি সারদাই। সে আমার শ্বশুর-বাড়ীর কাছেই কোথা থাকিত—প্রায়ই আমার শাশুড়ীর কাছে আসিত, আনাজটা তরকারীটা মাগিয়া লইয়া যাইত, আর সময়ে অসময়ে আমার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা দিত, সহানুভূতি জানাইত। সেদিন সন্ধ্যায় সে-ই আসিয়াছিল। আমি উঠিয়া বসিতে সারদা কহিল, "আবার কি সেই কাণ্ড না কি?" আমি মৃদু হাসিলাম, এ ত আর নূতন কথা নয়! আমার অদৃষ্টের ভোগ এ, কে খণ্ডাইবে? সারদার

তীক্ষ্ণ চক্ষু যেন আমার মনের ভিতরটা পাতি-পাতি করিয়া দেখিয়া লইল।

সে কহিল, "আহা, একেই বলে, বরাত! নইলে এমন লক্ষ্মী পিরতিমে তুমি—বড়লোকের ঘরে পড়বার সামিগ্রী—সোনা-রূপোয় গা অমনি জম্‌জম্ করবে, এই রূপে রাজার ঘর আলো করবে! তা না, কোথাকার এক হতভাগা বওয়াটের হাতে পড়ে চিরটা কাল মার খেয়েই কাটল!"

আমি কোন কথা বলিলাম না। আমার প্রাণের মধ্যে যেন অশ্রুর সাগর উথলিয়া উঠিয়াছিল। মার উপর রাগ ধরিল। আমার মেয়ে-জন্মের কোন সাধ পূর্ণ হইতে দিল না। এমন করিয়াই আমার জীবনটাকে নষ্ট করিয়া দিল! যে স্বামীকে শাস্ত্র দেবতা বলিয়া তাহার পূজা করিতে আদেশ দিয়াছে, আমার অদৃষ্টে সেই স্বামী কি এ রাক্ষস মূর্ত্তি ধরিয়া উদয় হইয়াছে! রূপ-কথায় শুনিয়াছিলাম, রাক্ষস রাজার মেয়েকে বন্দী করিয়া রাখিয়া ছিল। আমার সেদিন প্রথম মনে হইল, আমিই যেন সেই রাজার মেয়ে! কেন নই? এমন রূপ, এমন দেহ, এই যৌবন,—রাজার মেয়ের ইহার বেশী কি ছিল? এই রাক্ষসের তপ্ত নিশ্বাসে এমনই ভাবে এ-সব শুকাইয়া যাইবে? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই!)

সারদা নিজের মনেই বকিয়া চলিয়াছিল। একটা কথা আমার কানে গেল। সারদা বলিতেছিল, "ঐ ঘোষালদের বৌটো! মাগো, যেন কালপেঁচা! অত টাকার উপর রাজত্বি করা কি মানায়? যেমন রূপ, মুখের কথাও কি ছাই, তেমনি-! তা তার বরাতে হল কি না, অমন সোনার চাঁদ সোয়ামী, আর কুবেরের ঐশ্বয্যি! আর তোর এই এত রূপ, এত গুণ—দু'বেলা দু'মুঠো খেতেও পাস্‌নে, তার উপর এই হেনস্থা, এই মার ধোর! এতেই ত বলি, মা, পোড়া বিধেতা কি আছে—না, সে মরেছে!"

নাই, সত্যই নাই, বিধাতা নাই! কে বলে, বিশ্বের মাথার উপর একজন ভগবান আছেন! আমি ত কিছুই চাহি নাই—শুধু একটু স্নেহ, একটু আরাম! এই স্বামীই—অর্থ তাঁর নাই থাকিল,—যদি একটু হাসি-মুখে আমার সঙ্গে কথা কহিতেন, একটু স্নেহের চোখে চাহিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে—

সারদা নিজের মনে তখনও বকিতেছিল। সে কহিল, "এখন কি করবে? ছেলেমেয়ে-গুলোকে ত তাদের মামা এসে নিয়ে গেছে—তারা জুড়িয়েছে—এর ত এই দশা! উপোস্ করে এমন গুমরে থেকে কি করবি, বল্! তার চেয়ে চ', তোর মার কাছে তোকে রেখে আসিগে। মার বাছা, মার কাছে জুড়িয়ে বাঁচবি। নাহলে এই জন-হীন পুরীতে একলাটি থাকবি কি করে? বিশেষ তোর এই বয়স, এই রূপ নিয়ে—"

এ দুঃখেও হায় রূপ, আর বয়সের কথা! নাঃ, আমায় পাগল করিয়া দিবে! জ্যোৎস্নার আলোয় হাতখানার দিকে চাহিয়া দেখিলাম! মনে হইল, হাঁ, রূপ বটে! নখর নিটোল হাত! চাঁপার মত রঙ! সোনার চুড়ি কয় গাছা আঁটিয়া বসিয়াছে, সবুজ কাচের চুড়িগুলাতেও কি চমৎকার মানাইয়াছে! কিন্তু হায়, যাহার জন্য এ রূপ, সে তাহা

দেখিলও না। জানি না, বাহিরে কি লইয়া সে মজিয়া আছে! মনের কথা ছাড়িয়া দিই, এমন রূপও কি সে বাহিরে পাইয়াছে? না, পাইবার আশা রাখে!

সেই রাত্রেই নিজের যে দুই-চারিখানা গহনা-পত্র, কাপড়-চোপড় ছিল, পুঁটুলিতে বাঁধিয়া সারদার সহিত ঘরের বাহির হইলাম। সারদা কহিল, সে মার মাতুলের বাড়ী চিনে—ঐ যে ও-পাড়ায়। এখনই সে আমায় সেখানে পৌঁছাইয়া দিবে! মার কোলে গিয়া আমি জুড়াইয়া বাঁচিব!

পথে বাহির হইলাম। নির্জ্জন পথ। সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। পথে অত রাত্রেও একটা লোক শুধু "কুল্‌পী বরফ" হাঁকিয়া চলিয়াছিল। আমার পায়ে পায়ে কেবলই বাধিয়া যাইতেছিল। একটা খোয়ায় হুঁচট্ লাগিল—বুড়া আঙ্গুলের নখের কাছটা ছিঁড়িয়া গেল—রগ্ অবধি ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের হল্‌কা ছুটিয়া গেল—পা কাঁপিয়া টলিয়া উঠিল। আমি সবলে সারদার হাতটা চাপিয়া ধরিলাম।

৩

"সেই রাত্রে কত পথ ঘুরিলাম, কত মোড় বাঁকিলাম—কিন্তু একটুও ক্লান্তি বোধ হয় নাই। কেবলই মনে হইতেছিল, এখনই মাকে দেখিব—মার কোলে পড়িয়া মার মেয়ে জুড়াইয়া বাঁচিব!

সহসা একখানা একতালা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সারদা কহিল, "না বাছা, রাতে কেমন দিশে-হারা হয়ে পড়েছি। সে বাড়ী ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। বেশ মনে আছে, আবার নতুন কলি ফিরিয়েছে, সাদা ধব্‌ধব্ করছে অমনি বাড়ী—মা-লক্ষ্মী যেন দাঁতগুলি মেলে হাসছেন! তা রাতে আর কত ঘুরব, বল্ বাছা,—বিশেষ তোর মত সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে! শেষে কি একটা হাঙ্গামে পড়ব? তার চেয়ে আমার বাড়ীতে আজ থাকো। কাল দিনের বেলা তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে আসব'খন—তার পর মায়ে-ঝীয়ে একসঙ্গে যেয়ো। কেমন?"

আমি আপত্তি করিলাম। সারদা বক্তব্যের জের বাড়াইয়া কহিল, "তার উপর কদিন খাওয়া-দাওয়া নেই, আজ রাতে বরং খেয়ে-দেয়ে আমার বাড়ীতেই পড়ে থাকো—" সারদা দ্বারের কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে এক তরুণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা ভিতরে গেলাম। আমায় ঘরে বসাইয়া হাত-পা ধুইতে বলিয়া সারদা কোথায় বাহির হইয়া গেল। আমি হাত-পা ধুইলাম, কাপড় কাচিলাম—তরুণী একখানা শাড়ী দিল—পরিয়া ঘরে আসিয়া বসিলাম; তরুণীর সহিত আলাপ করিলাম। পরিচয়ে জানিলাম, সে সারদার সম্পর্কে বোনঝি।

তাহার সহিত গল্প-সল্প করিতেছি, এমন সময় সারদা একটা ঠোঙা হাতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "নাও, এত রাত্রে আর কোথায় কি পাব? দোকান থেকে গরম লুচি আর আলুর দম কিনে আনলুম, খেয়ে ফেলো, বাছা।" আমি কহিলাম, "দোকানের তরকারীটা?"

সারদা কহিল, "সধবা মানুষ—তোদের

আবার অত বাচ বিচার কেন? তা-ছাড়া এ বামুনের দোকান থেকে এনেছি।"

অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল। লুচি-গুলা নিঃশেষ করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া জুড়াইয়া বাঁচিলাম। সারদা কহিল, "বিন্দী, তোর ঘরে ওকে শুতে দে—তুই আজ আমার কাছে শুস্'খন।" পরে আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "যাও গো, শুয়ে পড় বাছা,—কাল তোমার ব্যবস্থা করব।"

আমি গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালেই সারদা বাহির হইয়া গেল। বিন্দু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তোমার মাকে আনতে গেছে।" সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই—পরে বুঝিলাম।

সারাদিন সারদা ফিরিল না। আমার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। খাঁচার পাখীর মতই সারাদিন ছট্‌ফট্ করিলাম। মনে একটা ভাবনাও হইল, কেন হায়, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম! যদি সারদা এখন মাকে খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে যে আমার সব গেল! দাঁড়াইবার এতটুকু ঠাঁইও রহিল না যে!

সন্ধ্যার সময় বিন্দু খোঁপা বাঁধিল, সাবান দিয়া মুখ-হাত ধুইল, আমাকেও টানিয়া মাথায় তেল ঢালিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিল। দীপের আলোয় সারদার পথ চাহিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। অনেক ক্ষণ কাটিল। পরে বাহিরে কে দ্বারে কড়া নাড়িল। বিন্দু গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমি উঁকি মারিয়া দেখি, সারদা ফিরিয়াছে, সঙ্গে একটি পুরুষ। আমি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সারদা পুরুষটিকে লইয়া সেই ঘরেরই দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "সে কোথা গেল?"

বিন্দু কহিল, "ঘরে।"

সারদা আমার ঘরে আসিল, কহিল, "এই যে। দেখ দেখি, এ মানুষটীকে চিন্‌তে পারো কি না? কৈ গো বাবু, এদিকে এস না।" পুরুষটা সটান্ অমনি ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। তখন সারদা অতি ইতরের মত কি একটা কথা বলিল। শুনিয়া আমার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে কে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। আমি দুই পা পিছাইয়া তক্তাপোষে বসিয়া পড়িলাম। সারদা বাহির হইতে শিকল টানিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। পুরুষটা তখন আমার দিকে আগাইয়া আসিল, তক্তা-পোষের কাছে আসিয়া কহিল, "তোমার নামটী কি,—সরযূ?"

সে ডাকে যেন হাজার বাজ হাঁকিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম, "সরে যান, আপনি।"

পুরুষটা ভড়কাইয়া সরিয়া গেল। আমি উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলাম। লোকটা তখন একটা তামাসা করিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিল। সবলে আমি হাত ছিনাইয়া লইলাম—কঠিন স্বরে কহিলাম, "খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবেন না। তাহলে—"

"তাহলে কি, শুনি"—বলিয়া লোকটা হাসিয়া উঠিল। দুই চোখে আগুন জ্বালাইয়া আমি তখন তাহার পানে চাহিলাম—তখনও তাহার মুখে সে দুষ্ট হাসি লাগিয়া ছিল! সে আমার কাছে আসিল, আমার আঁচল ধরিয়া টানিল। আঁচল

ছাড়াইয়া সবেগে আমি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম; দুই হাতে অজস্র কিল-চাপড় বর্ষণ করিলাম: লোকটা এক-কোণে সরিয়া গেল। আমি তখন সবলে দ্বারে আসিয়া ধাক্কা দিলাম—দ্বার ধরিয়া কত নাড়িলাম। দ্বার বন্ধ! আমার মনে হইল, পৃথিবীটা যেন ভূমিকম্পের বেগে সহসা প্রচণ্ড দুলিয়া উঠিয়াছে—পায়ের তলায় মেঝেটা যেন কোন্ পাতালে নামিয়া চলিয়াছে! কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, জানি না। দ্বারে সবলে ধাক্কা দিতে লাগিলাম। সারদা দ্বার ঠেলিয়া পশুর মতই আক্রোশে ঘরে ঢুকিল, আমাকে ধরিয়া দুই হাতে প্রবল-ভাবে ঝাঁকানি দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "মনে ঠাউরেছিস্ কি, বল্ ত দেখি! ঘর-দরজা সব ভেঙ্গে ফেলবি না কি, আমার?"

পুরুষটা ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে অপদার্থ বলিয়া গালি দিয়া সারদা তাহার দিকে আমায় ঠেলিয়া দিল। টাল সামলাইতে না পারিয়া আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম, লোকটা দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল। আমার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি তাহাকে সবলে দংশন করিলাম। চীৎকার করিয়া সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল। তার পর ছুটিয়া আমি বাহিরের দালানে আসিলাম—দালানের দ্বার খোলা ছিল—সেই খোলা দ্বার-পথে ছুটিয়া একেবারে পথে আসিয়া পড়িলাম। পিছনে চাহিবার অবসর ছিল না। দুই-চারিজন লোক নিজের মনে পথে চলিয়াছে—আমায় কেহ লক্ষ্যও করিল না। আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া একটা দিকে আমি চলিতে লাগিলাম!

কে যেন আমায় উড়াইয়া লইয়া চলিল। এ-পথ, ও-পথ ঘুরিয়া দেখি, এ কি, এ যে সেই পরিচিত ঘর—স্বামীর ঘর! গা-টা শিহরিয়া উঠিল। কে আমায় এখানে লইয়া আসিল? কে পথ দেখাইল? আনন্দে আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। বাড়ীর দ্বার খোলা ছিল। দ্বারের সম্মুখেই গাভীটা দাঁড়াইয়া ছিল—ফোঁস্ করিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। আমি উঠানে আসিয়া পড়িলাম। উঠানের দাহিনেই খোলার ঘর। এইটাই ছিল, বাহিরের বৈঠকখানা। অন্ধকারে বসিয়া কাহারা কথা কহিতেছিল—আমার চোখে পড়িল, কলিকার আগুনটুকু। সেদিকে না যাইয়া উড়িয়া যেন আমি অন্দরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। চৌকাটে পা বাধিয়া গেল। একজন কহিল, "কে?" এ যে পরিচিত স্বর! আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আমি ভিতরে ঢুকিয়া গেলাম—একেবারে সেই অন্দরের রকে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। পা দুইটা তখন ধূলায় ভরা, ঘামে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে!

বাহিরে একটা মহা-সোরগোল পড়িয়া গেল। "কে ও—কে যায়?" আমার তখন জ্ঞান ছিল না। ক্রমে সে কোলাহল কাছে আসিল। আমি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিলাম—চোখে একটা আলো লাগিল। আমি মুখ তুলিলাম। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে—স্বামী, আমার যম!

স্বামী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কোথা

থেকে আবার এখানে মরতে এলি? বেরো, বেরো বলছি, এখান থেকে।"

আমি কাঁদিয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিলাম; পায়ে মাথা ঘসিয়া, মুখ রগড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পিঠে দুই-চারিটা লাথি পড়িল। সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করিলাম না, শুধু কাতর স্বরে কহিলাম, "ওগো, আমায় রাখো, ঠাঁই দাও, তাড়িয়ে দিয়ো না—" কঠিন গালি দিয়া স্বামী কহিল, "হবে না—তা কিছুতেই হবে না—একরাত্তির যেখানে কাটিয়ে এলি, সেইখানে ফিরে যা। এখানে তোর ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই!" কাঁদিয়া মিনতি করিয়া কত বুঝাইলাম, ওগো, আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক—আমায় ঘরে ঠাঁই দিলে কোন দোষ হইবে না, কোন পাপ নয়! শুধু মুহূর্ত্তের ভুলে একবার পথে বাহির হইয়াছিমাত্র—শুধু সেই পাপ—তাহার কি মার্জ্জনা নাই? ওগো, মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর! নহিলে কোথায় দাঁড়াইব?

কিন্তু হায়, স্বামীর মন কিছুতেই গলিল না। চুলের মুঠি ধরিয়া সেই রাত্রে আবার সে আমায় পথে বাহির করিয়া দিল—দিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল। আমার মনে হইল, পাষাণ দিয়া কে যেন আমার সমস্ত পৃথিবীটাতে আড়াল তুলিয়া দিল: সব অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল।

সেই দ্বারের গোড়ায় পড়িয়া আমি মাথা খুঁড়িলাম—কত মিনতি করিলাম, কত কাঁদিলাম—মূক কাঠের দ্বার টলিল না, হেলিলও না। কঠিন অবজ্ঞায় নিশ্চল স্থির চক্ষে শুধু সে চাহিয়া রহিল।

কে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া দেখি, সারদা! আবার! সে যেন কি মন্ত্র পড়িল—আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কোন কথা না বলিয়া আবার তাহারই সঙ্গে আসিলাম। আবার সেই ঘর—সেই গারদ!

পতঙ্গকে যতই ফিরাও, আগুন লক্ষ্য করিয়াই সে ছুটিবে। আমার মনে কি ছিল, জানি না, আবার আমি সারদার ঘরে আসিয়া উঠিলাম।

ঘরে আমায় টানিয়া ফেলিয়া সারদা গালির বন্যা ছুটাইয়া দিল। পাথরের মতই আমি পড়িয়া রহিলাম। এ যেন কে কাহাকে কি-সব বলিতেছে! আমার কোন হুঁসও ছিল না। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কেবল থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

সারদা কথা শেষ করিয়া একটা লাথি মারিল। কিছু বলিলাম না। পদাহত কুকুরের মতই পড়িয়া রহিলাম। সারদা চলিয়া গেল—বাহির হইতে শিকলটা সে টানিয়া দিল।

তার পর কয়দিন ধরিয়া কি সে যুদ্ধ চলিল। প্রাণটা যেন শতখান্ হইয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। কখনও মনে হয়, আর পারি না, যাহা হয়, হোক্,—যে ঝড় আসে, আসুক—আর বাধা নয়! বাধা দিবার শক্তিও নাই! আবার মনে হয়, না, একবার সমস্ত তেজে জ্বলিয়া উঠি! নারীর সকল শক্তি জাগাইয়া তুলি! প্রাণপণ চেষ্টা করি! দেখি, কাহার সাধ্য, আমায় ধরিয়া রাখে! কিন্তু যাইব কোথায়? কোথায় ঘর—? কোথায় ঠাঁই? কে আমায় আশ্রয় দিয়া বাঁচাইবে?

সাত দিন অনাহারে পড়িয়া রহিলাম। শরীর দুর্ব্বল—মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে—কানের কাছে দিবারাত্র যেন প্রলয়ের হুঙ্কার ছুটিয়াছে! আমার মনে হইল, আমি মরিব। না খাইয়াই মরিব। মরিয়া ইহাদের সব দুরাশায় আগুন ধরাইয়া দিব—সব দুর্ব্যবহার, সব অপমানের শেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু অদৃষ্টে যাহার নরকের দাহ, সে মরিবে কি করিয়া! না খাইয়াও মরিলাম না। একদিন মনে হইল, এই কাপড়ের আঁচল গলায় বাঁধিয়া সব শেষ করিয়া দিই। গলায় আঁচল জড়াইলাম, ফাঁস কষিলাম, টানিলামও। কেমন আতঙ্ক হইল, আবার সে ফাঁস খুলিয়া ফেলিলাম—মরিতে পারিলাম না। মরিলে এ পাপের ভরা বহিয়া বেড়াইবে কে?

৪

"আকাশে সেদিন মেঘের বড় ঘন-ঘটা! খোলা জানালা দিয়া জলো হাওয়া হু-হু করিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। চোখ মেলিয়া আকাশের পানে আমি চাহিয়া ছিলাম। মেঘের পর মেঘ আসিয়া জমিতেছে—আকাশটার গায় কে যেন গাঢ় কালো কালি লেপিয়া দিতেছে। পৃথিবীর গায় যেটুকু আলো খেলিয়া বেড়াইতেছিল, সে আলোর রেখাটুকু এ কালির ঘন আঁধারে বুঝি সব মুছিয়া যায়! আমার প্রাণ যেন সে আঁধারে হাঁপাইয়া উঠিল! এমন সময় সারদা আসিল, ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কি গো ঠাকরুণ, কাল ত খুব ঘোড়-দৌড় করালে। বলি, এমন করে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, কিন্তু বাছা। তাহলে পথ দেখ।"

এ-ও বলে, পথ দেখ! কোথায় কি পথ দেখিব, আর? কখনও ঘরের বাহির হই নাই। নারী-জন্ম লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই চিরটা কাল সারা পৃথিবীকে বসাইয়া কল্পনা করিয়া আসিয়াছি! জানালার ধারে দাঁড়াইয়া, ছাদে দাঁড়াইয়া, বাহিরের যেটুকু দেখিতে পাইতাম—যে ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু—সেটুকু ত মুক্ত উদার আলোর উচ্ছ্বাসেই ভরা দেখিতাম—যেমন নিরালা, তেমনই উজ্জ্বল! জানিতাম না, সে ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে এমন নিষ্ঠুর বর্ব্বর জগৎ শুধু ধ্বংশ আর গ্রাসের ক্ষুধা লইয়া দারুণ ফুঁসিয়া বেড়াইতেছে! সে গণ্ডীর বাহিরে আসিলেই,—সর্ব্বনাশ!

সারদার কথায় ভয় পাইয়া দুই চোখে মিনতি ভরিয়া আমি তাহার পানে চাহিলাম। সারদা কহিল, "কিছু মুখে-টুখে দেবে না কি? এ ত ভাল আপদে পড়লুম, গা।" আমি ক্ষীণ স্বরে কহিলাম, "সে সব কথা আর আমায় বলো না, মাসী, তোমার পায়ে পড়ি—" আরও কি বলিতাম, জানি না। সারদা বাধা দিয়া কহিল, "মুখে কিছু দাও দেখি, বাছা! এমন করে কি মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিতে আছে? ছি—অবুঝ হয়ো না—"

পিপাসায় আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছিল। সারদাকে কহিলাম, "একটু জল দাও।"

সারদা কহিল, "খালি পেটে শুধু জলটা খাবে? তা আচ্ছা,—এনে দি, খাও। জিবটা গলাটা তবু ভিজুক। আজ সাত দিন ত দাঁতে কুটোটি কাটনি!"

সারদা জল আনিয়া দিল—পান করিলাম। বুকটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সজোরে পাত্রটা ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম,

"এ আমায় কি খাওয়ালে, তুমি?" সারদা হাসিয়া উঠিল, কহিল, "শুধু জলটা খাবে—তাই একটু সরবৎ—"

আমি কহিলাম, "কি এ সরবৎ! আমার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠছে—পুড়ে যাচ্ছে! এ আমায় কি খাওয়ালে, তুমি? কি এ?" মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, ঘুমে চোখ ঢুলিয়া আসিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন চোখ চাহিলাম, বাহিরে তখন প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। রুদ্ধ জানালার বাহিরে অধীর বায়ু ভীম গর্জ্জনে অট্টহাস্য করিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল। মুহুর্মুহু হাঁকিয়া বাজ উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। আমি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলাম। জলের ঝাট আসিয়া আমায় একেবারে ভিজাইয়া দিল। সমস্ত জ্বালা যেন সে শীতল স্পর্শে জুড়াইয়া গেল। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় মাথার চুল এলাইয়া দিয়া বসিয়া আমি প্রলয়ের সে তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে লাগিলাম।

আবার সারদা আসিয়া দেখা দিল। সে কহিল, "তোমার জন্য গরম লুচি ভেজেছি, এনে দি। খানকতক খাও। ছি মা, আমার কথা শোন দেখি।"

আমি আপত্তি করিলাম না—আপত্তি করিবার শক্তি ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। সারদা খাবারের থালা লইয়া আসিল। আমি খাইতে বসিলাম। সারদা বকিতে সুরু করিল, "আহা, তোমার জন্য মরে লোকটা! সেদিন অত মার-ধোর করলে, উপদ্রব করলে, তবুও মুখে অষ্টপ্রহর তোমারই কথা লেগে আছে! তারও এ ক'দিন খাওয়া-দাওয়া ঘুচে গেছে! অত টাকার মানুষ—মনে করলে কত ফ্যাসাদ বাধাতে পারত—তা কিছু নয়—! সে দিন থেকে তোমার নাম-জপ সার করে সে বসে আছে।" আমি কোন কথা কহিলাম না। খাওয়া শেষ হইলে সারদা উচ্ছিষ্ট পাড়িয়া বিদায় লইল। আমিও তখন বাহিরের সে উদ্দাম বাতাসে আমার মনের রাশ ছাড়িয়া দিয়া উদ্দাম গতিতে ভাসিয়া চলিলাম।

আমায় ভালবাসে! কেন, দোষ কি! আমার ত নারী-জন্মের কোন সাধ, কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। মনে কত-কি যে গড়িয়া রাখিয়াছিলাম! একটা বর্ব্বর পশুর হাতে পড়িয়া তাসের ঘরের মতই সে সব কোথায় উড়িয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল! নূতন করিয়া সে ঘরটাকে যদি আবার বাঁধিতে চাহি ত তাহাতে কি ক্ষতি! আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিয়াছিল। দাউ দাউ করিয়া তাহার রক্ত শিখা শিরায় শিরায় নাচিয়া ছুটিয়াছিল। আমার ভিতর হইতে কে যেন গর্জ্জন করিয়া কহিতেছিল, এ আগুনে প্রলয়-যজ্ঞ সাধিয়া তোল্! সমস্ত বিশ্ব আজ তোরই-জ্বালা এ আগুনে জ্বলিয়া যাক! আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। তাড়াতাড়ি এলো চুলটা জড়াইয়া লইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। নিকটেই কোথা প্রচণ্ড হুঙ্কারে বাজ পড়িল। সারদার জীর্ণ গৃহ সে শব্দে ঝন্‌ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

পিছনে কে ডাকিল, "সরযু—" চাহিয়া দেখি, সে রাত্রের পুরুষ-বেশী সেই পশুটা। আমি কিছু বলিলাম না। আমার মনে

হইল, বলিবার আজ কিছু নাই। এমন হেয় নির্লজ্জ পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেও ঘৃণা জন্মিল।

তার পর এক-নিশ্বাসে কম্পিত স্বরে অনেক কথা সে বলিয়া গেল! উপন্যাসে গল্পে কবিতায় নাটকে যে কথা কতবার পড়িয়াছি, বুঝিয়াও যে সব কথা বুঝিতে পারি নাই—ছায়ার মতই যে সব কথা গুলা মনের উপর দিয়া ভাসিয়া সরিয়া যাইত—হেঁয়ালির মতই সেই সব দুর্ব্বোধ অর্থহীন কথা! চুপ করিয়া সব আমি শুনিয়া গেলাম! গা ছম্‌-ছম্‌ করিতে লাগিল—প্রাণে একটা শিহরণ ছুটিয়া গেল। লোকটা বকিয়া শেষে কাঁদিয়া আমার পায়ে আসিয়া মাথা লুটাইল। আমি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আমার এই পদ্মের মত সুন্দর কোমল পায়ে কি এ একটা কদর্য্য সামগ্রী পড়িয়া আছে!

আমার মনে হইতেছিল, স্বপ্ন—এ যেন স্বপ্নে কি-একটা সুর ভাসিয়া আসিতেছে! আহা, সে সুর বড় করুণ! সহসা কণ্ঠে করস্পর্শ অনুভব করিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, সজোরে কহিলাম, "সরে যাও—"

সে সরিয়া গেল। তার পর বেদনার, মিনতির কি সে কাতর অনুনয় ঝরিয়া পড়িল। বাহিরে প্রলয়ের বিকট হুঙ্কার তাহার সে কাতর অনুনয়ের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গেল। পরে আমার সব গোল হইয়া গেল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

যখন জ্ঞান হইল, তখন বুঝিলাম, ভিতরটা আমার এক-নিমেষে পাথর হইয়া গিয়াছে। ছোট যে দীপটি জ্বালিয়া নিজের ছোট মনটিকে আলো করিয়া রাখিয়াছিলাম, নিজেরই অসতর্কতায় সে দীপ উল্‌টাইয়া দিয়া ভিতরটাকে পুড়াইয়া একেবারে ছাই করিয়া ফেলিয়াছি! আমার ভিতরে যে নারী তাহার সকল গর্ব্ব, সকল ঐশ্বর্য্য লইয়া রাণীর সাজে বসিয়াছিল, একদণ্ডে তাহার সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া তাহাকে একান্তই রিক্তা, পথের ভিখারিণী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। যে সরযু মার কোলে সহস্র আদরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সে সরযু স্বামীর গৃহে সহস্র অনাদরেও মরে নাই, গলা-টিপিয়া সে সরযুকে আমি মারিয়া ফেলিয়াছি। মানুষ সরযু মরিয়াছে, আর তাহার অস্থি-কঙ্কাল পরিয়া এ একটা প্রেতিনী আজ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

অনুশোচনা হইল। মনের মধ্যে তীব্র আক্রোশ জাগিল। ঘরের কোণে মাটির দীপ জ্বলিতেছিল—তাহারই ক্ষীণ আলোয় দেখিলাম, সেই নরপশুটা আমারই পাশে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! একটা হাত আমার গায়ে পড়িয়া আছে। অত্যন্ত কদর্য্য ঘৃণ্য পদার্থের মতই হাতটা তাহার আমার অঙ্গ হইতে সরাইয়া দিলাম। তখন বসিয়া আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। সমস্ত পৃথিবীর উপর বিকট রাগ ধরিয়াছিল। মনে হইল, এমন একটা অভিশাপ যদি দিতে পারি আজ—এমন শাপ—উঠুক, সারা বিশ্ব জ্বলিয়া উঠুক! যেখানে যত নর-নারী আছে, ঘর-দ্বার সমাজ-শ্মশান, পাপ-পুণ্য, আমার এই অবহেলিত অপমানিত নারীত্বের অভিশাপে সে সমস্ত জ্বলিয়া উঠুক—সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাক্‌। বাহিরে কড়কড় শব্দে বাজ গর্জ্জিয়া উঠিল। জীর্ণ

জানালার ফাটল দিয়া একটা আলোর ঢেউ ছুটিয়া ঘরে আসিয়া চকিতে নিবিয়া গেল। আমার মনে হইল, ঐ যে, বিশ্বের এক কোণে আগুন তবে লাগিয়াছে! আমার অভিশাপ ফলিয়াছে! এখনই সারা পৃথিবী ও আগুনে জ্বলিয়া উঠিবে—সঙ্গে সঙ্গে এই পশুটাও! আঃ, কি উল্লাস—কি আনন্দ! তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলাম। কিন্তু কোথায় কি—! চারিধারে নিবিড় অন্ধকার! আর ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে! হায়, নারীত্ব! তাহার আবার অপমান! ও-সব কথার কথা, পাগলের বচা উপকথা!"

৫

সরযু বলিতে লাগিল, "তার পর পা যখন একবার পিছলাইয়াছে, তখন এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে গড়াইতে বিলম্ব হইল না! আমারও তাই ঘটিল। সারদা তখন আমাকে আর বিন্দুকে আনিয়া একেবারে সহরের বুকে আসিয়া বসিল। ক্রমে আমার মত দুর্ভাগিনী সে আরও জড়ো করিল। আমার আর তখন চেতনা ছিল না। কোথায় চলিয়াছি, কোথায় গিয়া এ যাত্রার শেষ হইবে, পরিণামে কি হইবে, সে সব ভাবিবার অবসরও ছিল না। সারাদিন গল্প-গুজব, হাসি-তামাসা ও নিদ্রায় কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় সাজিয়া গুজিয়া দোকানের পণ্যের মতই খরিদদারের মন কাড়িবার চেষ্টায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সারদা দুই হাতে পয়সা লুটিতে লাগিল। এমনই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে আমার আক্রোশ জন্মিল। এই দেহ দিয়া, মন দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া যে পয়সা উপার্জ্জন করিতেছি, কিছুই তাহার ভোগে আসে না—আর একজন দিব্য আরামে সে সব কুড়াইয়া লয়! না, ইহা ঘটিতে দিব না। এ পথে যখন আসিয়াছিই, তখন ভোগের পূর্ণ তৃপ্তি সাধিয়া লই! সারদাকে একদিন কথাটা বলিলাম—গালি দিয়া প্রথমে সে তাহা উড়াইয়া দিল। পরে আমি কাজেও যখন আমার সঙ্কল্প হাড়ে হাড়ে তাহাকে জানাইয়া দিলাম, তখন সে আর কোন শাসন বাকী রাখিল না। অন্ন কাড়িয়া, প্রহার করিয়া শোধ তুলিতে লাগিল। কাল রাত্রে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। মারিয়া সে আমার সব কাড়িয়া দুপর রাত্রেই পথে তাড়াইয়া দিয়াছে। শাসাইয়াছে, যদি কখনও আমি গহনাপত্র আদায়ের চেষ্টা করি ত আমাকে সে সহজে ছাড়িবে না—মিথ্যা মামলা সাজাইয়া জেল অবধি ঘুরাইয়া আনিবে!

কাল সেই রাত্রে পথে দাঁড়াইয়া আমার ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। (কাল বুঝিয়াছি, আমি কোথায় ছিলাম, কি ছিলাম, আর আজ কি হইয়াছি! ঘরেই যাহার একমাত্র স্থান, ঘর ছাড়িয়া তাহার পক্ষে বাহির হওয়ার মত পাপ আর কিছু নাই! ঘরের মধ্যে লাথি খাইয়া পড়িয়া মরাতেও ঢের সুখ, ঢের গৌরব ছিল! কিন্তু বাহিরের এ বাতাস,—না, অসহ্য এ!) যাই হোক, আমি আমার গহনা চাহি না, কিছু চাহি না—পাছে সে আবার কোন ফ্যাসাদ বাঁধায়, ইহাই আমার ভয়। আপনি তাহারই একট

কিনারা করিয়া দিন। ভগবান আপনার ভাল করিবেন!"

আমি কেমন তন্ময়ভাবে সরযুর কাহিনী শুনিয়া চলিয়াছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, এ যেন একটা রচা গল্প শুনিতেছি! এ কি সত্য! নালিশ, মকর্দ্দমা, কাছারি, হাকিম, কোন কথাই আমার মনে ছিল না। শুধু কানের কাছে বাজিতেছিল, বেদনার এক গভীর সুর,—এক দুর্ভাগিনী নারীর করুণ আর্ত্তনাদ! অপমানিত নারীত্বের তীব্র হাহাকার!

সহসা বাহিরে কে হাঁকিল,—"কো-ই নালিশওয়ালা—" আমার চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি সরযুর দরখাস্ত লিখিয়া তাহাতে তাহার সহি করাইয়া হাকিমের এজলাসে ছুটিলাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পাখী বলে চোখ গেল

করুক রৌদ্র যতই ঝাঁঝাঁ, এমন খাসা নীলে মাজা
আকাশখানার ছাউনি তলে, সবুজকুঞ্জের কোমল তরুণ
পল্লবেতে আঁখি ঢেকে, সুরটি তুলে অতি করুণ,
পাখী বলে,—চোখ গেল।

বিলাপ-গাথায় বন-দূতীর নাড়ীগুলি অনুভূতির
মোচড় খেয়ে বুকে ঢালে অশ্রু-রক্ত ফোঁটা ফোঁটা;
দপ্‌দপিয়ে কেঁপে ওঠে স্নায়ু শিরা সরু মোটা।
পাখী বলে,—চোখ গেল।

পথের পানে চেয়ে বঁধুর চোখের কথাই, গীতি-চতুর!
গাইছ তুমি নিছক্ মধুর সুরটি ভেঁজে লতায় পাতায়।
অপার পারের পথটি চেয়ে, আমি কি গান গাইব গাথায়?
পাখী বলে,—চোখ গেল।

চোখের জ্বালার নীচে জলে প্রণটা; তা-ত কেউনা বলে!
মাটির কথাই ফুটুক গানে, খাঁটিটুকু সুরে ঢেকে।
মর্ম্ম-কথা বুঝবে বঁধু, গাওরে পাখী ডেকে ডেকে।
পাখী বলে,—চোখ গেল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

চয়ন

লিওনিডাস আণ্ড্রীভ্

বর্ত্তমান যুগে, রুষ-সাহিত্যের দুইজন বিখ্যাত রথী আছেন। লিওনিডাস আণ্ড্রীভ্ ও ম্যাক্সিম গোর্কি। এই দুই জনের ভিতরে, ম্যাক্সিম গোর্কির নাম এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে! কিন্তু, সমধিক শক্তিধর হইয়াও, আণ্ড্রীভের নাম এখনও দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইবার সুযোগলাভ করে নাই।

ওরেল্ নামক স্থানে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আণ্ড্রীভ্, এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন কলেজের ছাত্র, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ফলে, তাঁহার পরিবারবর্গ দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া উঠেন। আণ্ড্রীভ্, অতি অল্প মাহিনায় মাষ্টারি করিয়া আপনার লেখা-পড়া ও পেট চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই আপনার তখনকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন:—"সেণ্টপিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কয়-বৎসর, দারিদ্র্যের অন্ধকার যে কি জিনিষ, তাহা আমি ভাল করিয়াই টের্ পাইয়াছিলাম। আমি সর্ব্বদাই ক্ষুধার্ত্ত থাকিতাম এবং কখনও-কখনও আমার এমন সময়ও গিয়াছে, যখন আমি উপর-উপরি দুইদিন কিছুই খাইতে পাই নাই।"

তাঁহার প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনা ফলবতী হয় নাই। পরন্তু, দারিদ্র্যের পাষাণ-ভার ক্রমে তাঁহার উপরে এতটা চাপিয়া বসিল যে, জীবনে তাঁহার ধিক্কার জন্মিল। তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। আণ্ড্রীভ্ বলিতেছেন:—"১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, আমি নিজের মাথা টিপ্ করিয়া রিভলভার ছুড়িয়া নিস্ফল হইয়াছিলাম। আমি আহত হইলাম বটে, কিন্তু মরিলাম না। আরোগ্যলাভ করিবার সময়ে আমি আবার সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হইলাম, কিন্তু, তাহাও নিস্ফল হইল। আবাল্য আমি চিত্রাঙ্কন করিতে ভালবাসিতাম। চিত্রাঙ্কন করিয়া আমি যাহা রোজগার করিতে লাগিলাম,—তাহা তবু মন্দের ভাল। আমি কয়খানি মূর্ত্তি-চিত্র আঁকিলাম। সেগুলির প্রত্যেকখানি পাঁচ হইতে দশ রুবলে বিক্রী হইল।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মস্কো নগরে আইন-ব্যবসা অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভাগ্যদেবী সেখানেও তাঁহার প্রতি নির্দ্দয়তার পরিচয় দিলেন। তারপর, কিছুকাল ধরিয়া তিনি খবরের কাগজের রিপোর্টারের কাজ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তাঁহার লেখার উপরে সম্পাদকদের সদয় দৃষ্টি পড়িল। তিনি "Was He Mad?"* নামক গল্প প্রকাশ করিলেন। এই গল্পপ্রকাশ হইতেই তাঁহার দুঃখকষ্টের সমাপ্তি এবং যশের আরম্ভ।

---

* ভারতীর বর্ত্তমান সংখ্যায় এই গল্পটির অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

উক্ত গল্পটি, "Problem Story"। কঠোরতায় উহা এড্‌গার আলেন পো'র অপেক্ষা হীন নহে। এই অদ্ভুত গল্পটির জন্য সেণ্টপিটার্সবার্গের মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞগণ, একটি বিশেষ সভার অধিবেশন করেন। গল্পের প্রধান নায়কের মানসিক অবস্থা লইয়া তাঁহাদের ভিতরে দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা চলিয়াছিল। চিকিৎসক-সমাজের মধ্যে পরস্পরের মতামতে বিশেষ বিভেদ ছিল। অবশেষে, সাময়িক-পত্রাদিতেও ঐরূপ আলোচনার সূত্রপাত হইল। ফলে, তাহা হ্যামলেটের মানসিক অবস্থা আলোচনার মত সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

এমিল ভার্‌হারেণ্‌

যে বেলজিয়ম আজ প্রতীচ্যের কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার সন্তানগণ সুধু দেশভক্ত, সাহসী ও মহাবীর নহে; পরন্তু, তাহাদের উপরে কাব্য-লক্ষ্মীর করুণাও বড় অল্প নয়। ভার্‌হারেণ্‌, রোদেনবাচ্‌, চার্লস ভ্যান্‌ লার্বার্গ, মরিস্‌ মেটারলিঙ্ক ও গ্রিগর্‌ই লে রয় প্রভৃতির মত প্রতিভাবানের জন্মভূমি হইয়া বেলজিয়ম আজ বিশ্বের দৃষ্টিপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেটারলিঙ্কের নাম পৃথিবীর কে না জানে? আবার, আধুনিক কাব্যের যাহা-কিছু সুমহান, যাহা-কিছু সুন্দর, ভার্‌হারেণের কাব্যের ভিতরে তাহা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।

উপরে যাঁহাদের নাম করা গেল, তাঁহারা সকলেই ঘেণ্টের College of Sainte-Barleeতে শিক্ষিত হইয়াছেন। ভার্‌হারেণ্‌ ও রোদেনবাচ্‌ উক্ত বিদ্যালয়ে একই সময়ে পড়াশুনা করিয়াছেন। অন্যান্য সকলে তাঁহাদের পর-যুগের ছাত্র। ভার্‌হারেণের জন্ম হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। আন্ত-ওয়ার্পের পূর্ব্বে, স্কেল্‌ড্‌ নদীর তীরবর্ত্তী সেণ্ট আম্যাণ্ড নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান তিনি লুভেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-পড়া শেষ করিয়া ব্রুসেল্‌স্‌ নগরে কিছুদিন ওকালতির বৃথা-চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই আইনের মরুভূমি ভেদ করিয়া অবশেষে

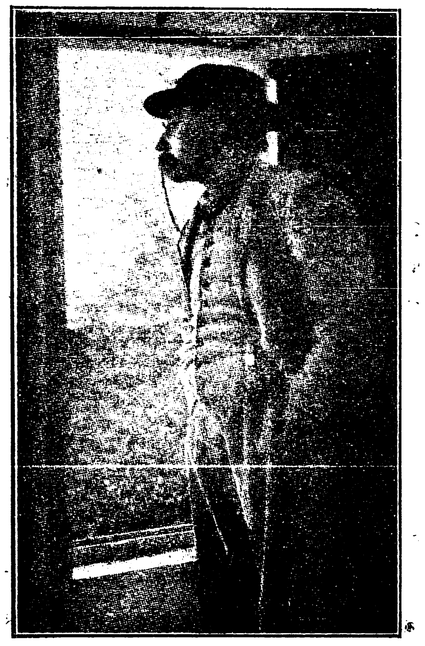

এমিল্‌ ভারহারেণ্‌

কাব্য-কমলের অমল শোভা ফুটিয়া উঠিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়।

ভার্‌হারেণের প্রতিভা যে কতটা উচ্চাদর্শের, তাহা লইয়া তাঁহার অনেক কবি-ভ্রাতা এবং বহু সমালোচক অনেক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাঁহাদের সকলকেই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাঁহারা এখন ফরাসী-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একজন সমালোচক এই বলিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি "অতীত ও বর্ত্তমান কালের তাবৎ ফরাসী কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" আর-একজন কহিয়াছেন যে, তিনি "আধুনিক মহাকাব্য-প্রণেতা কবির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।"

এমন কি টলষ্টয় পর্য্যন্ত,—তাঁহাকে মাতৃভাষা ত্যাগের জন্য উন্মার্গগামীদের দলে ফেলিয়া সাধারণের সুমুখে হাস্যাস্পদ করিবার সময়েও—"সম্মানিত নবীন কবি" বলিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন।

ভার্‌হারেণ্‌ বাল্যকালে স্বাস্থ্যকর 'ফ্লেমিস' মাঠ-ময়দানের ভিতরে জীবনযাপন করিয়াছিলেন; এবং একটা বলিষ্ঠ জাতির যে সকল গুণ থাকে তাহা তিনি জন্মকাল হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ও আজন্ম একটা প্রবল আবেগে পূর্ণ ছিল। যৌবনে তিনি অমিতাচারের বাসনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তিনি সকল দিকেই নিজেকে একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—সঙ্গীদের ভিতরে, পড়াশুনার ভিতরে, শিল্পের ভিতরে, এমন-কি কামিতা ও পানমত্ততার ভিতরেও তাঁহার একটা উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। তাঁহার দেহ ও মনের শক্তিকে তিনি একেবারে শেষসীমা পর্য্যন্ত টানিয়া না লইয়া গিয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু তাঁহার এমন একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল যাহাতে তিনি চরম উচ্ছৃঙ্খলতার সঙিন মুহূর্ত্তে নিজের স্বরূপের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিতে পারিতেন। আজ তাঁহার ভিতরে সঙ্গীতের যে স্বরমিল পাওয়া যায় তাহা তিনি অদৃষ্টগুণে বা আকস্মিক ভাবে লাভ করেন নাই। পরন্তু, নিজের এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি সে পুরস্কার আদায় করিয়া লইয়াছেন।

উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তিনি আপনার পরিবারিক-জীবনের প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি আরও গভীর এবং তাঁহার আদর্শ আরও উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের সর্ব্বকালের ঐহিক ও নিজস্ব আকাংক্ষকে ভার্‌হারেণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—শতাব্দী-পরিবর্ত্তনকালের য়ুরোপ, ভার্‌হারেণের কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহা আমাদিগকে ও আমাদের যুগকে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে; তাহা জীবনের সকল অংশের সমগ্র পরিধিকে সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে; তাহা আমাদের যুগের একটি গীতকাব্যময় 'বিশ্বকোষ' রচনা করিয়াছে। দর্শন কখনও কাহাকে কবি করিতে পারে না বটে, কিন্তু কাব্যের ভিতরে দর্শন থাকিতে পারে। ভার্‌হারেণের ভিতরেও তাহা আছে। আমরা কয়েকটি জায়গা তুলিলাম:—

"জানা ও দর্-কষার চেয়ে ভালবাসা ঢের্ ভালো। সব বিষয় জানিবার কৌতুহলের চেয়ে বিশ্বপ্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করার বেশী দাম। কারণ, সকলরকম জ্ঞানের মাঝে স্বার্থপরতা আছে, ব্যক্তিগত অভিমানের জাঁক্ আছে। কিন্তু প্রেমের মাঝে সে-সব কিছু নাই। আছে সুধু বিনয়—মহৎ বিনয়। অনেক জিনিষের সুমুখেই জ্ঞানকে একেবারে থামিয়া যাইতে হয়,—অন্ধকারে তাহার পথরোধ হয়। কিন্তু, প্রেম এবং আনন্দের ভিতরে থাকিলে আমাদের মানস-আদর্শ সীমার নাগপাশে বাঁধা পড়ে না। জ্ঞানের সাম্নে দরজা যার বন্ধ, প্রেমের সাম্নে তাহা একেবারে মুক্ত; এমন-কি, যাহা ক্ষুদ্র, প্রেম-গুণে তাহাও মহৎ হইয়া উঠে। এবং ক্ষুদ্রকে আমরা মহৎ হইবার যত অবকাশ দিব, আমাদের জীবন ততই অলঙ্কৃত হইয়া উঠিবে।"

ভাস্কর ট্রাউবেট্‌যকয়

প্রিন্স পল ট্রাউবেটযকয়ের পিতা স্লাভ জাতীয় এবং তাঁহার মাতা আমেরিকান। তিনি অতি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিল্প-বিদ্যালয়ে গমন করেন। আপনার প্রতিভাগুণে তিনি চিত্র ও ভাস্কর্য্য,—এই উভয়বিধ কলাতেই পারদর্শী হইয়া য়ুরোপের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

যদিও ভাস্কর্য্যের প্রতি তাঁহার অধিক অনুরাগ, তথাপি তিনি যে-কয়খানি ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা প্রথমশ্রেণীর কলাবিদের উপযুক্ত। চিত্রকলার প্রতি তিনি যদি বেশী মনোযোগ দিতেন, তাহাহইলে অনায়াসেই এ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি-চিত্রকর সার্‌জেণ্টের বিষম প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইতেন।

ট্রাউবেটযকয়ের হস্তগঠিত মূর্ত্তিগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা একেবারে জীবন্ত। তিনি কলিতকলার নির্দ্ধারিত রীতি-পদ্ধতির একান্ত বিরোধী। "এ-রকম করিতে হইবেই, নহিলে বে-নিয়ম কাজ করা হইবে"—এ-সব কথাকে তিনি কিছুতেই আমোল দেন না। যেমন করিয়াই হোক,—যথার্থ প্রাণ-জিনিষটিকে ফুটাইতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত!

আধুনিক য়ুরোপের বহু বিখ্যাত প্রতি-ভাবানের নশ্বর মূর্ত্তি তাঁহার ভাস্কর্য্য-কলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া অবিনশ্বর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার করগঠিত টলষ্টয়, রোদাঁ ও আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতির মূর্ত্তি, প্রস্তর-পটে চিরকাল জীবন্ত থাকিয়া আমাদের বংশধরগণকে আনন্দদান করিবে।

"The Moscow Academy of Fine Art's"এর জন্য একজন প্রফেসরের আবশ্যক হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে আহ্বান করেন। প্রথমটা তিনি এই অজুহাত দেখাইয়া নারাজ হন যে,—"যখন আমি নিজে কখনো শিক্ষকের সাহায্য পাই নাই, তখন আমি পরকে শিক্ষা দিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিনা।"

কিন্তু, পরে তিনি উক্ত শিল্পবিদ্যালয়ে



ট্রাউবেট্‌যকয় কর্ত্তৃক গঠিত তিনটি মূর্ত্তি
উপরে—নর্ত্তকী। মধ্যে—কামিনীমূর্ত্তি। নীচে—বার্ণার্ড শর প্রতিমূর্ত্তি।

কার্য্যগ্রহণ করিতে সম্মত হন। এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণও তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—"হঠাৎ আমার মনে হইল যে, বাঁধা আইনকানুনে ছেলেদের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়। আমি চেষ্টা করিলে, হয় ত তাহা নিবারণ করিতে পারি। শিল্পবিদ্যালয়ে গিয়া আমি দেখিলাম, প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতিতে শিল্পশালাটি এমন ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে যে, ছাত্রদের আর নড়িবার-চড়িবার ফাঁকটুকুও নাই। আমি তখনি সে-সমস্ত সরাইয়া ফেলিবার হুকুম দিলাম। ছাত্রদের বলিলাম, তাহারা যদি ক্ষমতার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে চায়, তবে আদর্শের জন্য একেবারে যেন প্রকৃতির কাছে যায়। প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতির বদলে, তাহাদিগকে আমি জীবন্ত আদর্শ দিলাম এবং তারপর তাহাদের কথা নিয়া আর আমার মাথা ঘামাইলাম না।"

পরিণামটা খুব চমৎকার হইল! ট্রাউবেটযকয় যখন প্রফেসরের পদলাভ করেন, তখন তাঁহার ছাত্রসংখ্যা ছিল, পঞ্চাশজন। একবৎসর পরে দেখা গেল, ক্লাশে তিনজন মাত্র ছাত্র আছে।

কিন্তু ট্রাউবেটযকয় ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া, আনন্দিতই হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন যে, নীর-ভাগ গিয়া ক্ষীরটুকুই অবশিষ্ট আছে!

রিম্‌সের মন্দির

রিম্‌সের মন্দির আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। য়ুরোপের মধ্যযুগের একটি অদ্বিতীয় শিল্পের নমুনা আজ ছদ্মবেশী বর্ব্বরতার কবলে পড়িয়া, কামানের গোলায় খণ্ডবিখণ্ড এবং অগ্নিশিখায় অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। অনেককে বলিতে শুনা যায় যে, রিম্‌সের মন্দির আবার মেরামত—এবং দরকার হয় ত, আবার নূতন করিয়া গড়া হইবে। হইতে পারে তাহা সম্ভব। কিন্তু, সে নূতন-গড়া মন্দির পুরাতনের একটি হুবহু নকল হইবে মাত্র। একালের কোন মিস্ত্রী, সেই নব সংস্করণের ভিতরে পুরাতনের প্রাণবস্তুটিকে ফুটাইতে পারিবে না। মধ্যযুগ যাহা দিতে পারিত, বিদ্যমান যুগ তাহা দিতে পারে না। পরন্তু, মধ্যযুগও আর আসিবে না।

এই মন্দিরের সঙ্গে ইতিহাসের অনেক অতীত-কাহিনী লূতাতন্তুর মত জড়ান আছে। ফরাসী-ইতিহাসের বহু বিচিত্র সমারোহ, ইহার খিলান-করা ছাদের তলায় অভিনীত হইয়াছিল। ফ্রান্সের রাজন্যবর্গ ইহারই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, মুকুটধারণ করিতেন।

অনেক সমালোচকের মতে, গোথিক মন্দিরগুলির মধ্যে রিম্‌সের মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রিম্‌সের কারুকার্য্যের ভিতর ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ণ-বিকসিত রচনা-ভঙ্গী পাওয়া যায়। মধ্যযুগের প্রধান গির্জ্জাগুলি সব একই-রকম দেখিতে। খৃষ্টিয় ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসারেই সেগুলি তৈয়ারি হইত। এ হিসাবে রিম্‌সের মন্দিরের বিশেষ কোনও নূতনত্ব নাই। কিন্তু, রিমসের সঙ্গে অন্যান্য

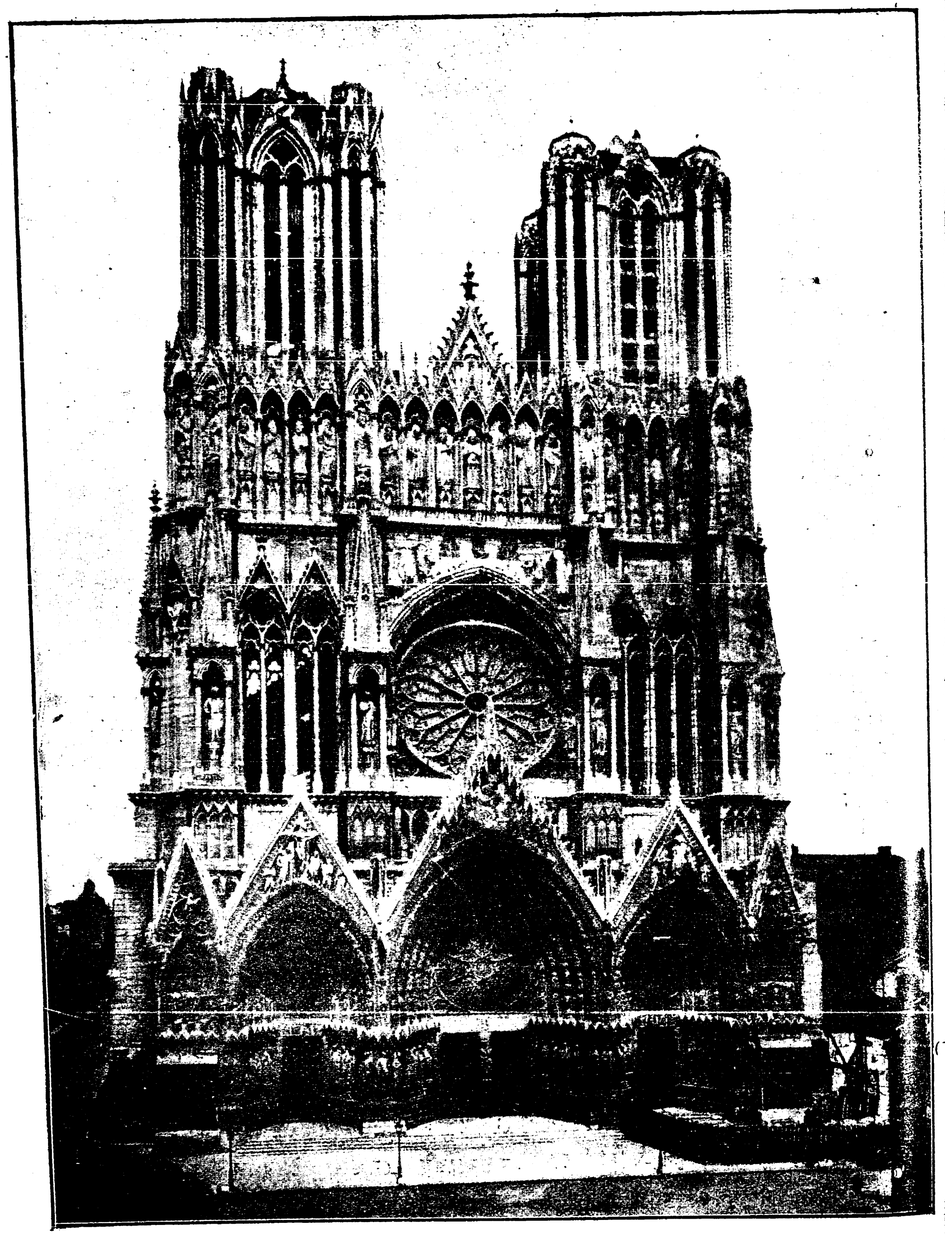

রিম্‌সের মন্দির

মন্দিরগুলির তুলনা চলে না। কারণ, মধ্যযুগের অন্যান্য মন্দির শতাব্দীব্যাপী পরিশ্রমের ফল। তাই তাহাদের ক্রমোন্নত দেহে নানাযুগের নানা রচনাভঙ্গীর লীলা দেখা যায়। আজকালকার মত, উক্ত মন্দিরগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট 'প্ল্যানে' গঠিত হয় নাই। শিল্পীরাও, এই পরিবর্ত্তনকে লুকাইতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু, রিম্‌সের মন্দিরে এরূপ বিভিন্ন রচনা-ভঙ্গীর ছাপ্ পাওয়া যায় না।

রিম্‌সের মন্দির বরাবর অসমাপ্ত আছে। মধ্যযুগে ইহার রচনাকার্য্য সমাপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই। যাহা অসমাপ্ত ছিল, তাহা সমাপ্ত করিবার জন্য পরযুগে কোন চেষ্টাও হয় নাই। বেশীর ভাগ, ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে আগুন লাগিয়া, ইহার চূড়াগুলির উচ্চতা গৌরব খর্ব্ব করিয়াছিল।

ভাল লেখার কায়দা

গদ্য-রচনার কারু-কৌশলে ব্যালজ্যাক্ অপেক্ষা ফ্লবেয়ার যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যালজ্যাক্ অত্যন্ত অমনোযোগী লেখক। তাঁহার গদ্য একেবারেই সুশ্রী নহে। ভাষান্তরিত হইলেও তাঁহার রচনার ক্ষতি হয় না।

কিন্তু ফ্লবেয়ার গদ্যের মাঝে গীতধ্বনি ফুটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানটিতে যেমন সাজে, অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তিনি ঠিক তেমনি শব্দটি বাছিয়া বসাইয়াছেন। পাঠকেরা ধরিতে-ছুঁইতে পারিবে না, এমন লুকানো তাল-লয়-ছন্দে তিনি তাঁহার গদ্যের সুর বাঁধিয়া দিতে চাহিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ বলা হইত যে, 'পদ্য হইবে কিরূপ? না, সুন্দর গদ্যের মত।' কিন্তু, ফ্লবেয়ার গদ্যকে তখনই সুন্দর বলিয়া মানিতেন, যখন তাহা কবিতা না হইয়াও, সুন্দর পদ্যের মত হইয়া উঠিত।

কবিতার মত গদ্য রচনার জন্য তাঁহার যে চমৎকার পদ্ধতি ছিল, লেখকমাত্রেরই তাহার অনুসরণ করা উচিত। তিনি যাহা লিখিতেন, আপনি উচ্চস্বরে তাহা পাঠ করিয়া আপনিই শুনিতেন—কোথাও ছন্দভঙ্গ, কিংবা নীরস ধ্বনির সমাবেশ, কিংবা শব্দদ্বারা শব্দ ব্যাহত হইয়াছে কিনা!

মোপাশা বলিয়াছেন, "ফ্লবেয়ার, লেখা কাগজগুলি চোখের সুমুখে দৃষ্টি-রেখায় তুলিয়া ধরিয়া, কনুয়ে ভর দিয়া, আস্তে আস্তে তীক্ষ্ণস্বরে পড়িতে সুরু করিতেন। তিনি কান পাতিয়া আপনার গদ্যের ছন্দলীলা শুনিতেন। পরস্পরের সহিত জড়িতধ্বনি বা এমনি অন্য-কোন খুঁৎ তাঁহার কান এড়াইয়া গেল কিনা, তাহা বুঝিবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি থামিয়া যাইতেন। অনুপ্রাস উঠাইয়া দিতেন। দীর্ঘ পংক্তির মধ্যে মধ্যে কমা বসাইতেন।"

ফ্লবেয়ার নিজে বলিয়াছেন যে, "শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুযায়ী হইতে পারিলে বাক্যের সার্থকতা। বাক্যের ধারা তখনই ভাল, যখন তাহা চেঁচাইয়া পড়িতে পারা

যায়। খারাপভাবে লেখা পদ এ পরীক্ষায় টিঁকিতে পারে না; তোমার বুকে তাহা পাথরের মত চাপ দিবে, তোমার বুকের স্পন্দনকে তাহা বাধা দিবে,—এবং, এইরূপে, তাহা প্রাণহীন হইয়া পড়িবে।"

সকল লেখকেরই মনে রাখা দরকার যে, যখন চেঁচাইয়া পড়া যায়, ভাল গদ্যকে তখনই ভালভাবে উপভোগ করা যায়। চার্লস ল্যাম্বও বলিয়াছেন, "তুমি নিজেকে শ্রোতারূপ কল্পনা করিয়া লইয়া, যাহা-কিছু উচ্চ, তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইবে।"

স্রোতের ফুল

(২৬)

কালীতারার খোকাকেও বাঁচাইয়া রাখা গেল না।

তাহার চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা ঔষধ পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া বিপিনকে অষ্টপ্রহর মালতীর কাছে-কাছেই থাকিতে হইতেছিল। খোকা মারা গেলে মালতী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাড়ীতে কেহ তাহাকে একটি সান্ত্বনাবাক্য বলিবে না জানিয়া বিপিন মালতীর কাছেকাছে থাকিয়া বই জোগাইয়া গল্প করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

গিন্নি বিপিনের এইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখিয়া একদিন হরিবিহারীকে বলিলেন—তুমি ত কিছু দেখবে শুনবে না। বিপিন ত ছোট বৌএর বোনঝির কাছ-ছাড়া একদণ্ড হয় না; এখনো তার বিয়ে না দেওয়া ভালো হচ্ছে না।

হরিবিহারী একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিলেন—ঝিনুকপোঁতার হরিশবাবু এই চিঠি লিখেছেন; মাঘ মাসেই মেয়ের বিয়ে দিতে চান। ৯ই একটা দিন আছে, সেই দিনই বিয়ে হয়ে যাক, কি বল?

—হ্যাঁ, তা আর বলতে, শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব করা নয়। ভালো এক আপদ এসে জুটেছে বাড়ীতে।

হরিবিহারী বলিলেন—কতবার ত বলছি দাও না ঐ আপদ ঝাড়ে মূলে দূর করে চুকিয়ে।

—বাপরে! তা কি হবার জো আছে, তা হলে ছেলেও দেশত্যাগী হবে।

—হ্যাঃ অমন সব বেটাই দেশত্যাগী হয়।

—না না, তুমি বিপিনকে জান না। দুরন্ত একগুঁয়ে। ওকে ঘেঁটিয়ে কাজ নেই। শিগগির বিয়েটা দিয়ে ফেল, তখন যার জিনিষ সে বুঝে নেবে এখন।

—একবার ডাকাও ত বিপিনকে, তাকে একবার সব বলি।

সেইখান দিয়া বিনোদ একটা খরগোশ কোলে করিয়া লাফাইতে লাফাইতে যাইতে-

ছিল। গিন্নি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—ওরে ও বিনো, তোর দাদাকে ডেকে দে ত।

বিনোদ খরগোশের মতন তিন লাফে গিয়া বিপিনকে ডাকিয়া আনিল।

বিপিন আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেহই কোনো কথা বলিলেন না। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিপিন বলিল—আমাকে কি ডেকেছিলেন।

তখন হরিবিহারী বলিলেন—হ্যাঁ, বলছিলাম কি সমস্ত দিন বাড়ীর মধ্যে বসে বসে কি কর, একটু আধটু জমি-দারীর কাজকর্ম্ম দেখলেও ত হয়।

বিপিন বলিল—আপনি বললেই দেখতে পারি। কিন্তু সে কি সুবিধা হবে? আমি কারো অন্যায় সহ্য করে চলতে পারব না। আমায় জমিদারীর ভার দিলে আমি দেওয়ান থেকে মুহুরী পর্য্যন্ত সব চোর-গুলোকে জব্দ করে তবে ছাড়ব। প্রজা-শাসনের নামে যে গরীবের ওপর অত্যাচার সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। এই সমস্ত ক্ষমতা আমায় দিলে, আমি জমিদারী হাতে নিতে পারি।

—সে পরে যখন যেমন হবে বোঝা যাবে। এখন সুরু ত কর। কাল থেকে কাছারীতে যেও।

বিপিন বলিল—যে আজ্ঞে;

বিপিন চলিয়া যাইতেছিল, হরিবিহারী বলিলেন—ঝিনুকপোঁতার হরিশবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছি। ৯ই মাঘ একটা দিন আছে, সেই দিনেই বিয়ে হবে। তোমার কি চাই না-চাই দেওয়ানজিকে একটা ফর্দ্দ করে দিয়ো।

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমার বিয়ে? এত শিগগির?

—হ্যাঁ! তাতে হয়েছে কি? তুমি এমন ভাব দেখালে যেন তোমায় ফাঁশির খবর শোনানো হল।

বিপিন বলিল—আমি ত এখন বিয়ে করতে পারব না।

—কেন? এর মধ্যে কঠিন ব্যাপারটা কি? পুরুষানুক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক যে কাজটা করে আসছে, তুমিই বা সেটা পারবে না কেন? তোমায় বিয়ে করতে হবে।

—বিয়ে আমি করব, কিন্তু ঝিনুকপোঁতায় নয়।

—কারণ?

—সে মেয়ে শুনেছি বড় ছোট।

—আরে ও কি চিরকালই ঐ রকম ছোট থাকবে নাকি? ছোট মেয়েই বড় হয়, না, একেবারেই বড় মেয়েই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়? আমি হরিশ বাবুকে কথা দিয়েছি। তোমাকে তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে।

বিপিন দৃঢ়স্বরে বলিল—তা আমি পারব না।

বিপিনের একবার মনে হইল বলিয়া ফেলে যে সে মালতীকে বিবাহ করিবে। কিন্তু তাহার প্রতি মালতীর মনের ভাব কিরূপ, মালতী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কি না, তাহা ত যাচাই করা হয় নাই। সুতরাং সে সঙ্কল্প তাহার দমন করিতে হইল এবং সেই সঙ্গে এ সঙ্কল্পও তাহার মনে উঠিল যে শীঘ্রই

মালতীর অভিমত জানিয়া লইতে হইবে। আর কোনো কথা না বলিয়া বিপিন সেখান হইতে প্রস্থান করিল। হরিবিহারী ও গিন্নি বিপিনের আচরণে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে গিন্নি বলিলেন—ও পাগলের কথা তুমি শুনো না, সব ঠিক করে ফেলগে। ঝকমেরে ওকে বিয়ে করতে হবে।

হরিবিহারীর আহত অভিমান মনের মধ্যে গর্জ্জন করিতেছিল। তিনি বলিলেন—হাঁ, যাই দেওয়ানজিকে বলিগে সব ঠিকঠাক করতে।

হরিবিহারী বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল ৯ই মাঘ বিপিনের বিয়ে।

আর ত সময় নাই। বিয়ের জোগাড়ের তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। কয় কাঠা চালের লাড়ু হইবে, কয় মণ হলুদ কোটা হইবে, কে পিঁড়িতে আলপনা দিবে, কে ছিরি গড়িবে, বিয়ের সময় কে কি বকশিশ পাইবে, ইহারই আলোচনায় অন্তঃপুর সরগরম হইয়া উঠিল। গিন্নি চীৎকার করিতে লাগিলেন—ওরে ডাক একবার ভুবন সরকারকে, জিনিষের ফর্দ্দ করে নিয়ে যাক। মটরা গয়লার বাড়ী দুধ দইয়ের বায়না করে আসুক। বংশী বাড়ীতে ক্ষীর করবে। মাছ কোটবার জন্যে পাটনী-পাড়ায় লোক ঠিক করে আসুক। বিদেশিয়া হাড়ীর বৌ যেন সমস্ত দিন ধরে এই কদিন এইখানে হাজির থাকে। দাতা হাড়িকে পাতার কথা বলে দে। দেওয়ানজিকে বলে আয় মহলে মহলে পাতা, লকড়ি, ডালা, টুকরির চিঠি করে দেবে। আর দিন নেই যে, চটপট চটপট। যা যা সব, দাঁড়িয়ে হাঁ করে কি শুনছিস··· কিন্তু বিয়ে দেবে কে? ভট্‌চায্যি বট্‌ঠাকুর যে একঘরে। ওঁকে বলতে হবে যদি এখন জাতের ঘোঁট মিটিয়ে ফেলতে পারেন। তিনি বিয়ে না দিলে মন খুঁতমুত করবে। যদি একান্তই না হয়, ভাটপাড়া থেকে পুরুত আনতে হবে। সেও ত আর সময় নেই, আজ-কালের মধ্যেই সব ঠিক করে ফেলতে হবে যে। আমি একা যে কদিক দেখি তার ঠিক নেই! কেউ যে দেখে শুনে করে কম্মে নেবে তা ত হবে না, সবই আমায় দেখতে হবে।··· ও ভাই ছোট বৌ, তুমি ভাই একটু দেখে শুনে করে কর্ম্মে নেও, তোমার কি পরের মতন আড়ষ্ট হয়ে থাকলে মানায়? যাও যাও।··· এমন দিনে কোথাকার একটা কুড়ুনে ছেলের শোকে মালতী ঘরে বন্ধ হয়ে রইল, সে বাইরের কাজকম্মগুনো ত করতে পারত।···

গিন্নির বকুনির বিশ্রাম নাই, ব্যস্ততার অন্ত নাই। তিনি দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঠাকুরঘরে গিয়া গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরের দিকে গদ্গদভাবে চাহিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে ঠাকুর, শুভ কর্ম্মটি সুভালা-ভালি হয়ে যাক, তোমাকে ঘৃতপরমান্ন দেবো, হে নক্ষীদনাদ্দন, ডবল ভোগ দেবো।

সকল আনন্দ-কোলাহলের উপরে বিনির কোমল কণ্ঠের বাঁশি বড় উচ্চরবে বাজিতেছিল—ওলে বলদার বিয়ে হবে লে, বৌ আচবে লে। ঢোল বাজবে লে। মজা হবে, মজা হবে!

বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া মায়ের হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া বলিল—মা বড়দার বিয়ে হচ্ছে, আমার কবে হবে?

গিন্নি হাসিয়া বলিলেন—এবার তুই মিতবর হবি, তারপর দাদার মতন ডাগর হলে বর হবি।

বিনোদের আনন্দ উপচিয়া পড়িতে লাগিল। সে লাফাইয়া লাফাইয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল—ওরে আমি মিতবর হব রে, বৌদিদিকে বিয়ে করতে যাব রে।

বিনি মুখ ফুলাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—আমালো বিয়ে হবে, বল আসবে ড্যাংড্যাংশো হেঁইও, ড্যাংড্যাংশো হেঁইও!

আজ সকলেই আনন্দ করিতেছে। কিন্তু যাহার বিবাহ তাহার মুখ বড় গম্ভীর, বড় কালো, আষাঢ় মাসের অমাবস্যার মতো। শুভবিবাহের আশঙ্কায় তাহার মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে। বিপিন পিতার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া লাইব্রেরীতে চলিয়া গেল, মালতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিল না। ইজি চেয়ারে শুইয়া হাতের কাছে যে একখানা বই পাইল তাহারই মধ্যস্থল খুলিয়া চোখের সম্মুখে ধরিল। সমস্ত বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি তাহার নিজেরই মনেরই মতো কালো কালো দাগে ভরা, সেখানে কোনো শৃঙ্খলা, কোনো অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না। বইয়ের পাতায় চোখ রাখিয়া এই দুর্দ্দৈব হইতে নিষ্কৃতিলাভের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু কোনোটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইতেছিল না। সে চিন্তা করিতে লাগিল—এখন কর্ত্তব্য কি? জীবন-মরণের সমস্যা যখন উপস্থিত তখন লজ্জা করিলে ত আর চলিবে না, বিলম্ব করিলেও চলিবে না। বলিতে হইবে মালতীকে—সে ছাড়া আমাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। সে যদি স্বীকৃত হয়, উত্তম। নয় ত? ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ আপনি করিয়া লইবে।··· নবকিশোর যদি এখন থাকিত।···লিখি একখানা চিঠি, সে যদি আসিয়া কোনো সদুপায় করিতে পারে।

বিপিন নবকিশোরকে চিঠি লিখিতে বসিল।

দাদাবাবুর বিয়ে—এতবড় সুখবরটা মালতীকে না শুনাইয়া রোহিণী কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিল না। আহা! সকলেই আনন্দ করিতেছে আর সেই বেচারী পরের একটা ছেলের শোকে এককোণে একলাটি পড়িয়া আছে, ইহা রোহিণীর স্বভাবসদয় হৃদয়ে সহ্য হইতে ছিল না। সে তাড়াতাড়ি মালতীর ঘরের কাছে আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল বিপিন আছে কিনা। যখন দেখিল বিপিন নাই তখন সে হাসিতে হাসিতে মালতীর ঘরের দ্বারদেশে হাত ছড়াইয়া চৌকাঠের দুদিক ধরিয়া দাঁড়াইল।

রোহিণীর এই আনন্দাতিশয্য দেখিয়া মালতীর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল। রোহিণীর বিকশিত দন্ত-পংক্তির অন্তরালে কি বিষ অপেক্ষা করিয়া

আছে শূন্যদৃষ্টিতে মালতী তাহাই খুঁজিতে লাগিল।

রোহিণী চাপা গলায় বলিল—শুনেছ দিদিমণি, সুখবর!

মালতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভয়কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

রোহিণী চোখ মিটমিট করিয়া ঘাড় দুলাইয়া বলিল—দাদাবাবুর বিয়ে!

মালতীর মুখ একেবারে রক্তহীন শাদা মৃত্যুবিবর্ণ হইয়া গেল। তথাপি চেষ্টা করিয়া হাসিয়া উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কবে রে? কোথায়?

—এই নউই। ঝিনুকপোঁতার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি তোমার চেয়েও সুন্দরী! দাদাবাবুর খুব পছন্দ হয়েছে।

মালতী একথার কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই আনন্দসংবাদে তাহার মন কেন যে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, চোখ ফাটিয়া কেন যে জল বাহির হইতে চাহিতেছিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—এমন আনন্দের দিনে আমিই শুধু আমোদ করতে পারব না। বিধাতা আমায় একলা থাকতেই পাঠিয়েছেন।

মালতীর গলা ধরিয়া আসিল। চোখ ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল—দূর হোক রোহিণী এখান থেকে, আমি একটু কাঁদিয়া বাঁচি।

এমন সময় বিপিনের পদশব্দ শোনা গেল। রোহিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মালতী চোখ মুছিয়া সংবৃত হইয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি একখানা বই খুলিয়া তাহারই উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিপিন ঘরের মধ্যে আসিল। তবু মালতী মাথা তুলিল না। বিপিন ডাকিল—মালতী!

আর রোধ মানিল না। মালতী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মালতী, তুমি কাঁদছ কেন?

একথার উত্তর সে কি দিবে? সে কাঁদে কেন সেই যে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না।

বিপিন মনে করিল কেহ বোধ হয় মালতীকে কোনো কটু কথা কহিয়াছে। তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া সে বলিল—দেখ মালতী, তোমায় যে লোকে বাক্যযন্ত্রণা দেয় তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এ নিবারণ করবার একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায় তোমারি হাতে।

মালতী অশ্রুজালের মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। বিপিন বলিতে লাগিল—আমি যা বলতে যাচ্ছি তা হয়ত আমার বলা উচিত হচ্ছে না, তবু না বলে থাকতে পারছিনে। যদি তোমার মনে হয় অন্যায় বলেছি, তবে আমায় ক্ষমা কোরো, আর এ কথা যে আমি বলেছি তা তুমিও ভুলে যেও, আমিও ভুলে যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব...

মালতী বুঝিতে পারিতেছিল না বিপিন এমনতর ভূমিকা করিয়া কি বলিতে চাহিতেছে। সে আবার মাথা তুলিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিল।

যখন আসল কথা বলিবার সময় আসিল তখন বিপিন খুঁজিয়া পাইতেছিল না কেমন করিয়া মালতীকে নিজের প্রণয় নিবেদন করিবে। মালতীর কেমন যেন একটা দূরত্ব আছে, তাহাকে কোনো কথা যেন অসঙ্কোচে বলা চলে না, তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—আমার বিয়ের কথা হচ্ছে.....

বলিয়াই বিপিন বুঝিল কথাটা বড় বেমানান বলা হইল।

মালতীর বুকে ঝাঁত করিয়া আঘাত লাগিল। শক্ত হইয়া বলিল—শুনেছি।

বিপিন উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—জান কি মালতী, আমি কাকে আমার সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত মনে করি?

মালতীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল; হৃদয় বুঝিবা ফাটিয়া পড়ে। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন ক্ষণেক থামিয়া মালতীর কোনো উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল—মালতী, তুমি কি আমার সহধর্ম্মিণী হবে?

মালতী নির্ব্বাক নিশ্চল। বিপিন মালতীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সাহস ও আশা পাইয়া মালতীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া মিনতির স্বরে বলিল—তবে মালতী, তুমি স্বীকার করছ?

আশায়, আনন্দে, প্রেয়সী রমণীর প্রথম করস্পর্শে বিপিনের অন্তরের রক্তপ্রবাহ চনচন করিয়া বহিতেছিল, মদের উত্তেজনায় যেন তাহার সমস্ত দেহযন্ত্র সজীব সজাগ হইয়া মালতীর একটি স্বীকারবাণী শুনিবার জন্য একাগ্র ব্যাকুলতায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বিপিনের আবেগমত্ত পীড়নে মালতীর করপল্লব আলোহিত হইয়া ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মালতী আস্তে আস্তে বিপিনের হাত হইতে নিজের হাত সরাইয়া লইয়া বলিল—না।

এই অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া বিপিন স্তম্ভিত অবাক হইয়া গেল। আজ এক নিমেষে একটি না তাহার এতদিনকার পলে পলে সঞ্চিত সমস্ত আশা ছারখার করিয়া দিয়া গেল।

বিপিন অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মালতী, আমার নিবেদনের নিষ্পত্তি কি এই চূড়ান্ত, না, আর-একবার ভেবে দেখবে?

মালতীর বোধ হইতে লাগিল যেন বিপিনের দৃষ্টি হইতে সকরুণ বেদনাভরা প্রণয় ক্ষরিত হইতেছে, যেন সে শুনিতে পাইতেছে বিপিনের কণ্ঠস্বরে তাহার অন্তরের অশ্রুগুলিই গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে এবং সে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার আর্দ্র স্পর্শ অনুভব করিতেছে।

মালতী তাহার বড় বড় চোখ দুটি নীরব সান্ত্বনায় ভরিয়া বিপিনের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—আমি ভেবেই বলেছি।

বিপিন আর কিছু বলিবার পাইল না। দুজনেই নিঃশব্দ। উভয়ের মধ্যে যে একটি নিস্তব্ধতার পর্দ্দা পড়িয়া গেল তাহা কেহই সরাইতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া বিপিন হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিপিন চলিয়া যাইবামাত্র মালতী বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় খুড়িমা সেখানে আসিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—মালতী, অমন করে কাঁদচিস কেন? তুই ত' পেটে ধরিসনি, তবে তার জন্যে এত কান্নাকাটি কেন? তোর সকলই কি বাড়াবাড়ি বাপু?

খুড়িমার সাড়া পাইয়া মালতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, যেন এ ব্যক্তি এখনি ক্রন্দনে লুণ্ঠিত হইতেছিল না। খুড়িমা বলিলেন—কার-না-কার ছেলে, তাকে দুদিন একটু নেড়েছিস বৈ ত না, তার জন্যে এত কেন রে বাপু! বিপিনের বিয়ে, চ কাজকর্ম্ম করবি, ঘরের কোণে বসে বসে আর রাতদিন কাঁদতে হবে না।

মালতী চুপ করিয়া রহিল, তাহার নড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া খুড়িমা বলিলেন—ভ্যালা একগুঁয়ে মেয়ে তুই যা হোক! এমন মেয়ে আমি বাপের জন্মেও দেখিনি!

এই বলিয়া খুড়িমা চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে মালতীর দুঃখের সমবেদনার আঘাতে যে দুঃখের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে তাঁহারও চক্ষু দিয়া অশ্রু-ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

(২৭)

এদিকে যখন এইরূপ কান্নাকাটি চলিতেছিল তখন বিপিন ম্লানমুখে দ্রুতপদ-ক্ষেপে নিবারণ মুখুয্যের বাড়ীর উদ্দেশে যাইতেছিল।

নিবারণ মুখুয্যে তখন চণ্ডীমণ্ডপে ছেঁড়া মাদুরখানি বিছাইয়া অতিমলিন একটি ছোট তাকিয়া কোলে করিয়া তাহারই উপর ঝুঁকিয়া তামাক খাইতেছিল এবং গোবর্দ্ধন নূতন চিলিমে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিতে-ছিল—হেঁঃ ভারি ত তোমার ক্ষ্যামতা! বিপনে আর কিশরে আমাদের কি নাকাল-টাই না করছে,—পথ চলতে গা ছঁমছম করে, ভয় হয় কখন মাথাটা ধরে গুঁড়িয়ে বা ফ্যালে। বাপ! সেদিন কি বাঁচনটাই বেঁচে গেছি!

নিবারণ বলিল—দাঁড়া না, এর শোধ তুলব তবে আমার নাম নিবারণ মুখুয্যে। ভটচায্যিদের একঘরে করেছি...

গোবর্দ্ধন বাধা দিয়া বলিল—হেঁঃ ভারি একঘরে করেছ! ভটচায্যি আর কিশরে দিব্যি জমিদারবাড়ী আনাগোনা করছে, এ আবার একঘরে কিসের?

নিবারণ বলিল—আহা দাঁড়ানা, সবুরে মেওয়া ফলে। বিপনেটা হল জমিদারের ছেলে, ওকে কি সহজে দাবানো যাবে। আগে এই বিয়েটিতে ভাঙচি দেবো, শিশু-পালের দশা করে ছাড়ব। বাছাধন বিয়ে করতে গিয়ে দেখবেন সে-মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায় হয়ে গেছে; আর অমনি মুখখানি আমসিপানা করে ফিরে আসতে হবে। আমি ঝিনুকপোঁতার হরিশবাবুকে চিঠি লিখব যে বিপনের জাত নেই, ও মোছলমানের ছোঁয়া মুরগী খায়; আরো দুচারটে মৃত্যুবাণ আজকে রাত্তিরে ভেবে ঠিক করতে হবে। হরিশচাটুয্যে যে হিঁদু, এ শুনে সে ককখনো মেয়ে দেবে না। তারপর এই সূত্র ধরে ওকে

একঘরে করা সহজ হবে। তখন বাপ কিছু আর ছেলের জন্যে সমাজে ঠেলা হয়ে থাকবে না, সে ছেলেকে দূর করে দেবে। এ আমি করব করব করব।

এমন সময় বিপিন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিবামাত্রই নিবারণের শরীর এমন কম্পিত হইয়া উঠিল যে হুকার আগুন ছড়াইয়া পড়িল। গোবর্দ্ধন চকমকিতে ঘা দিতে গিয়া লোহা দিয়া নিজের হাতেই নির্ম্মম আঘাত করিয়া ফেলিল। তাহাদের উভয়েরই মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কেহ কোনো কথা না বলিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল, আগুন পড়িয়া তাকিয়া মাদুর যে পুড়িতেছিল সে দিকেও কাহারো দৃষ্টি দিবার সাহসে কুলাইতেছিল না।

বিপিন তাহাদিগের ভয়বিহ্বল ভাব লক্ষ্য না করিয়াই উচ্চস্বরে বলিল—মুখুয্যে মশায়, আমাকে একঘরে করুন, আমি মোছলমানের ছোঁয়া খাই, আপনারা যাকে ধর্ম্ম বলেন তার কিছুই আমি মানিনে।

বিপিন মালতীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া অন্তরে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহার বেদনা সে কিছুতেই কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে পারে না, এমন কি সে নিজের কাছে পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল; এজন্য তাহার চিত্ত আর-একটা নূতন আঘাত পাইয়া নিজেকে বেদনায় প্রকাশ করিয়া ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই-জন্যই সে তাড়াতাড়ি নিবারণের কাছে আসিয়া এমন জোর করিয়া একঘরে হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। কিন্তু নিবারণ অতশত না বুঝিয়া মনে করিল, সর্ব্বনাশ! ছোঁড়াটা নিশ্চয় তাহার সব কথা শুনিয়াছে। তথাপি সাহস করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—হেঁহেঁহেঁহেঁ, তোমায় কি একঘরে করতে পারি ভায়া? তোমাদের নিয়েই ত আমাদের সমাজ! তা তা যৌবনকালে ওরকম একটু আধটু অনাচার সকলেরই ঘটে থাকে, সেটা—ওর নাম কি—বয়েসের দোষ—বুঝলে কিনা ভায়া। ওটা বয়েস হলে—বুঝলে কিনা—সেরে যাবে।

—কিছুতে সারবে না মুখুয্যে মশায়, সে আশা করবেন না। আর যৌবনের ধর্ম্ম বলে আমায় রেহাই দিচ্ছেন, কিন্তু কিশোরের ত বার্দ্ধক্যের লক্ষণ দেখা যায়নি। তাকে ত একঘরে করেছেন? আমাকেও করুন, দোহাই আপনার।

—এঁ এঁ এঁ তা তা বুঝেছ কিনা, তাতে আর তোমাতে কি সমান হল? হেঁ হেঁ সে হল—বুঝলে কিনা— খোলাকাটা বামুনের ছেলে, আর তুমি হলে—ওর নাম কি—রাজরাজেশ্বর। তা তা—ওর নাম কি—তুমি যদি বল, তা হলে ভটচায্যিদের—বুঝলে কিনা—আজই জাতে তুলে নি।

—না না না, অমন কাজ করবেন না, মুখুয্যে মশায়। বেশ করেছেন একঘরে করেছেন। আপনাদের সঙ্গে এক দলে থাকার চেয়ে একঘরে হয়ে থাকা ঢের ভালো। দোহাই আপনার, আমাকেও একঘরে করুন, বাবাকে বুঝিয়ে রাজি করুন—তিনি আমাকে বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিন। আর আমার এই বিয়েটা যাতে না হয় তার চেষ্টাও আপনাকে একটু করতে হবে। এই

দুটো কাজই আপনি অনায়াসে করতে পারবেন।

নিবারণ মনে মনে বলিল—এইরে সব শুনেছে! প্রকাশ্যে বলিল—রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! শুভকর্ম্মে হন্তারক—বুঝলে কিনা—আমি কি হতে পারি। ওর নাম কি—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি, তোমরা যতটা মনে কর আমি তত বড় পাপিষ্ঠ নই—বুঝলে কি না ভায়া! আর আমার ক্ষমতাই বা কি যে আমি তোমার বিয়ে রোধ করব। রামচন্দ্র! রামচন্দ্র!

—আপনার ক্ষমতা খুব আছে মুখুয্যে মশায়, খুব আছে। আপনি হয়ত কস্তুরী মৃগের মতো নিজের গুণ নিজে জানেন না, কিন্তু আপনার মহিমা ত আমাদের কাছে ছাপা নেই। আপনি একখানা চিঠি লিখে দিলেই ত তারা পিছিয়ে যাবে।

—রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! আমি তত বড় পাষণ্ড নই—বুঝলে কিনা ভায়া। এও কি একটা কথা হল? রামচন্দ্র! আমি এদিকে চিঠি লিখি, আর—বুঝলে কিনা—তার পর দিন—ওর নাম কি—তোমার বাবার লেঠেল এসে আমার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে দিয়ে যাক আর কি! এত বড় বোকা নই আমি, বুঝলে কিনা ভায়া!

—আহা! আপনি চিঠিতে নাম দেবেন কেন? বেনামী চিঠি চালানোটাও ত আপনার একেবারে অনভ্যাস নেই।

—হেঁহেঁহেঁ ওর নাম কি জান, ও সমস্ত লোকের রচা কথা, কেউ ত কারো ভালো দেখতে পারে না। বেনামী চিঠি! রামঃ, রামঃ!

—তা হলে আপনি আমাকে এই অনুগ্রহটুকু করচেন না কিছুতেই।

নিবারণ মনে মনে বলিল—তুমি যখন এত ব্যস্ত হয়েছ তখন কিছুতেই একাজ আমার করা হবে না। তোমার যখন ওখানে বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই তখন ঐখানেই তোমার বিয়ে দিইয়ে তোমায় নাকের জলে চোখের জলে করব। কিন্তু শ্বশুরের মস্ত জমিদারীটা পাবে সেইটে যা অসহ্য। আচ্ছা দেখা যাবে, হরিশচাটুয্যেকে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়াতে পারি কিনা। আমার ছোট ছেলেটাকে পুষ্যিপুত্তুর করে দিতে পারি তবে ঠিক রোগের মতন ওষুধ হয়।

নিবারণকে নিরুত্তর দেখিয়া বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল—ভাবছেন কি মুখুয্যে মশায়! যমের প্রাণীবধে সঙ্কোচ আজ এই নতুন দেখছি।

নিবারণ বলিল—না ভায়া, এমন অধর্ম্ম এ বুড়ো বয়সে আমা হতে হবে না, তা তুমি গালই দাও আর মন্দই বল—বুঝলে কিনা।

—আচ্ছা, তবে বসুন। আমি অন্য চেষ্টা দেখিগে—বলিয়া বিপন প্রস্থান করিল।

খানিকক্ষণ পিতাপুত্র উভয়েই আড়ষ্ট নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া যখন আর বিপিনের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন নিবারণ একটু নড়িয়া বসিল, গোবর্দ্ধন একটু কাশিল। নিবারণ হস্তসঙ্কেতের সহিত চাপা গলায় বলিল—দেখ ত, দেখ ত, ছোঁড়াটা গেল কি না।

গোবর্দ্ধন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—হ্যাঁ, আমি যাই আর আমায় ক্যাঁক করে ধরুক আর কি। তুমি উঠে গিয়ে দেখে এস না?

—আরে না না, ভয় নেই, ও কিছু বলবে না; বলত ত এসেই ধমাধম লাগিয়ে দিত।

এ কথার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গোবর্দ্ধন আস্তে আস্তে উঠানে নামিয়া দেখিতে লাগিল বিপিন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। তখন পিতাকে হস্ত সঙ্কেতে বিপিনের দূরে গমন জানাইয়া বলিল—ওঃ চলে গেছে।

তখন নিবারণ সাহস সঞ্চয় করিয়া কোমরের কাপড় একটু কষিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কাছাটা খুলিয়া গিয়াছিল, ঝুলিয়া পড়িল। তখন বাম পদের এক আঘাতে লম্বমান কাছাটিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দুই হাতে ধরিয়া লইল এবং যথাস্থানে গুঁজিতে গুঁজিতে উঠানে নামিয়া আসিল। যখন দেখিল বিপিন দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তখন নিজের মনেই প্রকাশ্যে চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিল—হুঁ, এখন একবার হরিবিহারীর কাছে যেতে হচ্ছে। সে যেন আবার ছেলের আব্দার শুনে বেঁকে না বসে।

তখন তাহার পুরাতন বন্ধু আধময়লা সুতো-সরা জ্যালজেলে চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া, ধনুকাকৃতি চটিজোড়া পায়ে দিয়া ও কালো চিরকুট গামোছা ও একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া নিবারণ যাত্রা করিল।

বাড়ীর বাহিরে নিবারণের ভৃত্য ছিরে একটা আগড় মেরামত করিতেছিল।

সে প্রভুকে দেখিয়া দন্তবিকাশ করিয়া বলিল—মুখুয্যে মশায়, কোয়ানে যাচ্ছ, দেখ ত ঠিক বাঁধেছি কি না?

নিবারণ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল—পাজি বেটা, নচ্ছার বেটা, শুভকাজে যাচ্ছি তুই পিছু ডাকলি। হারামজাদা, আজ তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন।

এই বলিয়া নিবারণ তাড়া করিয়া ছিরেকে মারিতে গেল। ছিরে দেয়ালের ধারে বসিয়া বেড়া বাঁধিতেছিল, পলায়নের উপায় না দেখিয়া আগড়খানা উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহার পাশে লুকাইল। নিবারণ অগ্রসর হইয়া তাহার লাঠি দিয়া ছিরেকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করিল। দু একটা খোঁচা খাইয়াই ছিরে 'আউ' করিয়া আগড়খানা ছাড়িয়া দিল এবং সেই আগড় সজোরে নিবারণের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। নিবারণ সে আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না, আগড়ের ধাক্কায় একেবারে চিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং আগড়খানা তাহার উপর চাপিয়া পড়িল। নিবারণ পড়িয়া পড়িয়া মহা চীৎকার সোরগোল আরম্ভ করিল, কিন্তু ছিরে প্রভুকে সাহায্য না করিয়া সেখান হইতে চোঁচা দৌড় দিল। সেই সময় হীরালাল ধোবা সেইখান দিয়া যাইতেছিল। সে মুখুয্যে মশায়কে তদবস্থ দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড়ের মোট ফেলিয়া আগড় তুলিয়া ধরিল। মুখুয্যে উঠিয়াই হীরালালের গালে এক চড়। হীরালাল থতমত খাইয়া আপনার অজ্ঞাত অপরাধ নির্দ্ধারণের জন্য মুখুয্যে মশায়ের

মুখের দিকে চাহিল। মুখুয্যে আস্ফালন করিয়া বলিল—ব্যাটা ধোবা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা তুই আমাকে ছুঁলি? আমি শুভকর্ম্মে যাত্রা করে বেরিয়েছি তুই বেটা কোন্ আক্কেলে আমার মুখ দেখালি!

হীরালাল অপ্রতিভ হইয়া অপরাধীর মতো হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিল—আজ্ঞে আমি জানতাম না যে আপনি কোথাও যাচ্ছেন। তাহলে কি কখনো আপনার সামনে আসি? ঘাট হয়েছে। মুখুয্যে মশায়, মাপ করুন।

নিবারণ অঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—যা বেটা যা। মাপ করলেম।

হীরালাল যেন নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল। বাপরে! ব্রহ্মকোপ কি সামান্য!

গোলমাল শুনিয়া গোবর্দ্ধন বাহির হইয়া আসিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিল—বাবা, একটু বসে যাও।

নিবারণ সেইখানেই একটু উবু হইয়া বসিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি শ্রীহরি বলিয়া উঠিয়া যাত্রা করিল।

বিপিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিতেছে, পথে হীরালালের সহিত দেখা হইল। বিপিন হাসিয়া বলিল—কি হীরে কাকা ভালো আছ? তোমার মুখ এমন শুকনো কেন?

হীরালাল তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া সমস্ত কথা বলিল। বিপিন চক্ষু অগ্নিবর্ণ করিয়া বলিল—তোমায় নিবারণ শুধুশুধু মারলে আর তুমি অমনি চুপটি করে ফিরে এলে? তুমিও তাকে এক চড় কষিয়ে দিতে পারলে না?

হীরালাল জিভ কাটিয়া বলিল—এঁজ্ঞে অমন কথা বোলো না বাবা, আমার অপরাধ হবে, তিনি হল বেরাহ্মোণ! আর আমি নীচ জাত। পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করে এজন্মে ময়লা সাফ করে মরছি। আবার?

বিপিন বলিল—এই ত তোমাদের ভুল হীরেকা। জাতের আবার উঁচু নীচু কি? কাজেরই আবার ছোট বড় কি? তোমরা সব নিজেরা মাথা হেঁট করে কথাটি না বলে লোকের লাথি ঝাঁটা খাবে ত নীচ হয়ে থাকবে না? একবার মাথা তুলে দাঁড়াও দেখি, অন্যায় সহ্য না করবার মতো বল একবার করে নাও দেখি, তখন দেখবে তোমরা নিবারণ গোবরার মতন বামুনের চেয়ে ভালো বই মন্দ নও। ব্রাহ্মণ ত ভটচায্যি জ্যাঠা, তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকতে হয়। আর ওগুলো কি বামুন—ওগুলো চণ্ডালেরও অধম।···চল তুমি ফিরে···আমি দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি নিবারণের চুলের টিকি ধরে এক চড় কষিয়ে দেবে। আগড়চাপা পড়েছিল, তুমি তুলে উপকার করলে, তার পুরস্কার হল কিনা গালাগালি আর চড়!···চল তুমি।

—না বাবা আমি বামুনের সঙ্গে কাজিয়া করতে পারব না।—বলিয়া হীরা ধোপা সেখান হইতে দৌড় দিল।

বিপিন রাগে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে যখন নিবারণের বাড়ীতে গেল, তখন বহু পুণ্যের জোরে নিবারণ হরিবিহারীর বৈঠকখানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

নিবারণকে সমাগত দেখিয়া হরিবিহারী

গড়গড়ার নল ফরাশের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—এস এস খুড়ো এস। এই আমি মনে করছিলাম তোমাকে ডেকে পাঠাই। তুমি বাঁচবে অনেক দিন।

নিবারণ উদাসীন ভাবে বলিল—না বাপু, এ কলিকালে সংসারে বেঁচে সুখ নেই। যেকালে লোকে জাত মানে না, ধর্ম্ম মানে না, সেকালে কি থাকতে আছে।

হরিবিহারী হাসিয়া বলিলেন—না থেকেই বা করছ কি বল? মরেও ত নিস্তার নেই?—যমালয় আছে, যমদূত আছে, নরক আছে; তার চেয়ে ভালো জায়গায় ভালো লোকের হেফাজতে ত থাকা তোমার আমার ভাগ্যে হবে না। তারপর পুনর্জ্জন্ম হলেও এই কলিকালেই ত জন্ম নিতে হবে! ফিরে জন্মে যে ব্রাহ্মণ হব, এমন কি মানুষই যে হব, তারই বা ঠিক কি? তার চেয়ে খুড়ো যে ক'টা দিন পারা যায় বেঁচে থাকাই ভালো, তাতে লাভ বৈ অলাভ নেই। এ জন্মটার সুখদুঃখ ওরই মধ্যে একরকম গা-সহা হয়ে অভ্যেস হয়ে এসেছে, আবার নতুন জীবনে নতুন ল্যাঠার কাজ কি?

নিবারণ দন্তবিকাশ করিয়া বলিল—হেঁহেঁহেঁ বলেছ ভালো বাবাজী, বলেছ ভালো। হাজার হোক রাজবুদ্ধি কি না! তবে ওর নাম কি ধর্ম্মের গ্লানি শুনলে বড় মনকষ্ট হয়—বুঝলে কি না, তাইতে বেদে মরণের কথা বেরোয়; নইলে বাঁচতে কার অসাধ বল। এই দেখ না এই অল্পক্ষণ আগে—ওর নাম কি—বিপিন ভায়া আমার বাড়ী গিয়ে—বুঝলে কি না—বড় গলা করে বলতে লাগলেন আমি মুরগি খাই, গরু খাই, মোছলমানের এঁটো খাই! রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! এসব শুনলে গায়ে জ্বর আসে কি না বল ত বাবাজী?

হরিবিহারী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—কেন কেন? বিপিন আজ হঠাৎ তোমার বাড়ী গিছল যে?

নিবারণ তুড়ি দিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল—আ হা হা হা—সে বাবাজী অনেক কথা, তাই বলতেই ত এসেছি। ভায়া আমায় গিয়ে ধরে বসেছিলেন যে দাদা মশায়, আমি ত বাবাকে বলতে পারব না, আপনি একবার বাবাকে বলবেন এ বিয়েতে আমার মত নেই। আমি মালতীকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।—আমি বললাম, আরে পাগল, তাও কি কখনো হয়, সব ঠিক-ঠাক, কর্ত্তা কথা দিয়েছেন, এখন কি পাগলামি করতে আছে? তখন ভায়া রেগে চটেই বললেন আপনি একবার বাবাকে বলবেন ত, তারপর বাবা না শোনেন ত আমি দেখে নেব। যে বিয়েতে—ওর নাম কি—ব্রজকিশোর স্মৃতিরত্ন পুরোহিত হবে না, ওর নাম কি নবকিশোর বরযাত্র যাবে না; সে বিয়ে আমি কখনো করব না। আমি ঝিনোকপোঁতায় হরিশ বাবুকে বেনামি করে লিখে দেবো যে আমি গরু খাই, মুছলমানের এঁটো খাই!... বল্লে না পেত্যয় যাবে বাবাজী, ভায়ার সে কুদ্দুনি কি? এই মারে ত এই মারে। তখন—বুঝলে কি না—আমি স্বীকার করলুম যে তোমার বাবাকে বলব। তখন—ওর নাম কি—একটু ঠাণ্ডা হয়ে ভটচায্যিদের বাড়ীর দিকে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তোমায় খবর দিতে

এসেছি, সাবধান, শুভকর্ম্ম পণ্ড করে না দেয়। এর ভেতরে নিশ্চয় ঐ ভটচায্যিদের টিপ আছে, আর ভায়ারও বোধ হয় মালতীর ওপর মন পড়েছে! দেখো বাবাজী শেষ কালটায় যেন তাকেই বিয়ে না করে ফেলে।

হরিবিহারী চিন্তিত হইয়া অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিলেন—আমি যার তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছিলাম তোমায় বলব বলে যে ভটচায্যিদের জাতে তুলে নেওয়া যাক। কিন্তু এ যে একটা কেমন খটকা লাগছে। ঐ গোঁয়ারগোবিন্দ কিশোর ছোঁড়া কি কাণ্ডখানাই না করছে বিপিনকে নিয়ে! তাহলে ভটচায্যিরা যেমন আছে তেমনি থাক, কি বল?

—হ্যাঁ সে আর বলতে? এখন কি ওদের জাতে তুলতে আছে?

—কিন্তু পুরুতের কি হবে?

—তার আর ভাবনা কি? ভাটপাড়ায় হাজার গণ্ডা পুরুত জিয়ানো রয়েছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বলেছ। তাহলে তুমিই যা হোক দেওয়ানজর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিকঠাক করে দিয়ো খুড়ো।

—এ আর অত করে বলতে হবে কেন? এ ত আমাদেরই কর্ত্তব্য।

নির্ঝঞ্ঝাটপ্রিয় হরিবিহারী নিজেকে কোনো চেষ্টা করিতে হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর বলিলেন—কিন্তু এদিকে বিপিনকে কি করা যায়?

নিবারণ বলিল—বিপিনকে ডেকে তুমি খুব কড়া করে ধমকে দাও। ছোটগিন্নি আর মালতীকে বাড়ী থেকে কোথাও সরিয়ে ফেল। ছোটগিন্নির টিপেই এই সব হচ্ছে। কিন্তু খবরদার বাবাজী আমি যে তোমায় কিছু বলেছি তা যেন সে টের না পায়, তাহলে আমার ধড়ে প্রাণ থাকবে না। হতভাগা ছোঁড়াগুলো বলে কি না যে, গোবধ হবে বলে আমায় কিছু বলে না। তা গরুও যা ব্রাহ্মণও ত তাই, শাস্ত্রেই আছে গোব্রাহ্মণ-হিতায়চ। কিন্তু গরুই যখন খেয়ে ফেলছে, তখন গো হয়েও ত এদের হাতে নিস্তার নেই। দোহাই বাবাজী আমার নাম কোরো না। আর এক কাজ কর, আমায় বরং ঝিনুকপোঁতায় পাঠিয়ে দাও, আমি সেখানে বসে বসে সে দিকটা আগলাব এখন।

হরিবিহারী উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—এ অতি উত্তম পরামর্শ। তুমি দেওয়ানজির কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে কালই রওনা হয়ে যাও। দেওয়ানজিকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

হরিবিহারী একটু চিরকুট লিখিয়া মনে 'হরি হে তোমারি ইচ্ছা' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া নিবারণ এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মারিয়া উৎফুল্ল মনে প্রস্থান করিল।

নিবারণ চলিয়া গেলে হরিবিহারী বলিলেন—রামধন, যা ত একবার ছোট বাবুকে ডেকে আন ত।

রামধন বিপিনকে ডাকিয়া আনিল।

বিপিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবা ডাকছেন?

—হ্যাঁ। এসব কি ছেলেমানুষী হচ্ছে, বিয়ে করব না, বিয়ে ভেঙে দেব, হাঁ ত্যান? এসব কি?



প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

বিপিন নীরব। হরিবিহারী বলিতে লাগিলেন—বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিয়েটা করে এস, তার পর যা খুসি কোরো না, তাতে ত তোমায় কেউ বারণ করবে না। একটা বিয়ে ত করতে হবে।

বিপিন বলিল—এ বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না।

হরিবিহারী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—শুনছি ছোট বৌএর বোনঝিকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিস। এ সমস্তই ছোট বৌএর কারসাজি! দিচ্ছি এখুনি ওদের বাড়ী থেকে খেদিয়ে.....

বিপিন বলিল—আপনি খুড়িমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন। আপনি তাঁদের প্রতিপালন করতে বাধ্য। আমি আপনাকে এ অন্যায় কখনো করতে দেবো না। আপনি তাঁদের তাড়িয়ে দিলে আমাকেও আপনার বাড়ী ছেড়ে ওঁদের সঙ্গেই যেতে হবে!

হরিবিহারী একেবারে উন্মত্তের মতো হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কী! আমার মুখের ওপর উত্তুর! যা না তুই হুদ্ধু, আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে! আমায় কী ভয় দেখাচ্ছিস! আজই দূর হয়ে যা!

অভিমানী বিপিনের চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, তাই হবে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সম্মিলন

[এবার বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস। উক্ত চারি বিভাগে চারিজন সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের মূল অধিবেশনের সভাপতি মহাশয়ের এবং শাখা বিভাগসমূহের সভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইল।]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন

আমাদের বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিব। পুরাণ কথা শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। সেই ভরসাতেই আমার এই সম্বোধনে আমি কেবল প্রাচীন গৌরবেরই আলোচনা করিব। কারণ, সুখের স্মৃতি সকল সময়ই মধুর।

হস্তি-চিকিৎসা

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। উদয়ন রাজার "নলাগিরি" নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার

নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার সখ হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে।' কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। খোজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম "শৈলরাজাশ্রিত", "পুণ্য" এবং সেখানে "লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।" সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে খবর দিল। রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন এবং হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। অনেক দিন খুজিয়া খুজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাতা, শিকড়, মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে, তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন,—তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। "আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তি-চিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" বা "পালকাপ্য"। উহা প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে, সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাঙ্গলা দেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—এ সমস্তই বাঙ্গলা দেশে হইয়াছিল।

ম্যাক্সমূলার যাহাকে "Suttra period" বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও

আগে বশিষ্ঠ ও গোতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

২। নানা ধর্ম্ম-মত

পূর্ব্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, আজীবক ধর্ম্ম এবং যে সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত, সে সকল ধর্ম্মই বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্য্য জাতির ধর্ম্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। এই সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি পূর্ব্ব-ভারতে বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে সকল দেশের সহিত আর্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে সকল দেশের বাহিরে। এ সকল ধর্ম্মই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের নাম গন্ধও নাই। অন্যান্য বেদেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্ম্মের কথা। কিন্তু আমরা যে সকল ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ কর। গৃহস্থ-আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা, মরণ—এই ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই ব্যবস্থা কর। এ সব ত গেল দর্শনের কথা, চিন্তা-শক্তির কথা, যোগের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্ম্মের ও আর্য্যধর্ম্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই।

ইহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ সকল নূতন জিনিস যখন আর্য্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্য্যদের নিকট হইতে সে সব পায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস পাইতে পারে না, কেননা উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত। হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐ সব জিনিস আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু উহারা পাইয়াছে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলেই আমরা এই সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই।

জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর পূর্ব্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বার বৎসরের পর তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া বৈশালিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারও পূর্ব্বের তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ নানা দেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন—সমেতগিরি

পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারও পূর্ব্বে যে ২২ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহ রক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্ম্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনেরা কেবলী হইতে চাহিত—কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আর্য্য-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্ব্বদেশে। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়ীও পূর্ব্বাঞ্চলে।

৩। রেসম

বাঙ্গলার তৃতীয় গৌরব রেসমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীন দেশ হইতে রেসমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেসমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার চীনই রেসমের জন্মস্থান, চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খৃষ্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে চীনের রাণী তুঁত গাছের চাস আরম্ভ করেন।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশে খৃষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রেসমের চাষ খুব হইত। রেসমের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে সেই পশমের কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ"। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের "পত্রোর্ণ" সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

মগধ—দক্ষিণ-বেহার আর পৌণ্ড—বারেন্দ্রভূম। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেসম এখন হয়, তাহা ভেরেণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটী সোণার মত রাঙ্গা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেসমের চাষ হয় এবং এখানকার রেসম খুব ভাল। কৌটিল্য যে ভাবে চীন দেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীন দেশের রেসমী কাপড় অপেক্ষা বাঙ্গলার রেসমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেসমী কাপড় যে চীন হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না! চীনের রেসম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাঙ্গলার রেসমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং বাঙ্গালী যে, রেসমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে একথা বলিবার যো নাই। রেসমের চাষ বাঙ্গলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে, রেসমের চাষ ছিল, একথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাঙ্গলায় ও মগধেই রেসমের চাষ ছিল। কারণ, পৌণ্ড্র ও বাঙ্গলায়, সুবর্ণকুড্যও বাঙ্গলায়। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেসমের চাষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের গৌরবের

সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্ব্বপ্রথম উহার চাষ আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

৪। বাকলের কাপড়

বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গল-মহলে এখনও দু এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর একখানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সূতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত; বাকল হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম "ক্ষৌম," উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম "দুকুল।"

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে "দুকুল" হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রেও দুকুল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে দুকুল হইত, তাহার বর্ণ সূর্য্যের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল।

৫। থিয়েটার

প্রাচীন বাঙ্গলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার। থিয়েটারের সেকালের নাম "প্রেক্ষাগৃহ" বা "পেক্‌খা ঘরঅ"।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারিরকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্‌মাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে নাটকে নৃত্য, গীত, বাদ্য বেশী বেশী দেখিতে ভালবাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভালবাসিত, কিন্তু তাহা চতুর, মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্‌মাগধী। ওড্‌মাগধী প্রবৃত্তি যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ষক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্ত এই যে, ইহারা প্রহসন ভালবাসিত, ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, পূর্ব্বরঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভালবাসিত, কথোপকথন ভালবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভালবাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ—এ সব ভালবাসিত না।

খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নয়।

৬। নৌকা ও জাহাজ

বাঙ্গলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই

নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোণা, ডুণি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূর-পঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা সকল দেশেই আছে। বাঙ্গলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বাঙ্গালী রাজা সিংহবাহু আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেক-গুলি ছেলেপিলে হইল। বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেল।" রাজা ৭০০ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল।

৭০০ লোক যে নৌকায় যায়—সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের একখানি ছবি অজন্তা-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল, পাল ছিল, ষ্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যে সব জিনিষ তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখনও আছে, তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এই ভাবে এইরূপ নৌকায় লঙ্কায় নামিয়াছিলেন।

দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত।

খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীনযাত্রা করিয়াছিলেন।

তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোকে যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ড্রসেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্ব্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিসপুরে ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, একথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, একথা রামচরিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুথিতেই আমরা বাঙ্গলা দেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই,—চৌদ্দ, পোনের, ষোল খানি জাহাজ একজন সদাগর একজন মাঝীর অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া

সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪।১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদসদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুথিতে লেখে যে, মধুকরের ১২০০ শত দাঁড় ছিল। এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূর দূরান্তরও যাইতেন।

৭। বৌদ্ধ শীলভদ্র

চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, য়ুয়াং চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। য়ুয়াং চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়া ছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। য়ুয়াং চুয়াং গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ-শাস্ত্রের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি য়ুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

য়ুয়াং চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার এবং তাহার ভাষা অতি সরল।

৮। বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকখানি খুব চলিত পুথি লিখিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা শান্তিদেব বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তারানাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শান্তিদেবের বাড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। তাঁহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা।

তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। নালন্দায় তাঁহার একটি 'কুটী' বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে বসিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত; যখন

শয়ন করিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত; যখন কুটীতে বসিয়া থাকিতেন তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত; সেইজন্য :—

"ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ
সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ
কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ।"

এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "ভুসুকু"। তিনি যখন মগধের রাজধানীতে থাকিতেন, তখন তিনি "রাউতের" কার্য্য করিতেন। এমন কতগুলি বাঙ্গলা গান আছে, যাহার ভণিতায় লেখা আছে "রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট।" এখন এই রাউতু, ভুসুকু ও শান্তিদেব একই ব্যক্তি কি না, ইহা ভাবিবার কথা। তিনজনই এক, ইহাই অধিক সম্ভব।

আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন :—

(১) সূত্র-সমুচ্চয়, (২) শিক্ষা-সমুচ্চয় ও (৩) বোধিচর্য্যাবতার। শেষ দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। প্রথম খানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভুসুকুর নামে আমরা আর একখানি বই পাইয়াছি, সেখানি ভুসুকুর লেখা। উপরের দুইখানির মত এইখানিও সংস্কৃতে লেখা, তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের দুইখানির মধ্যেও আবার শিক্ষা-সমুচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় লেখা।

বোধিচর্য্যাবতারে শান্তিদেব বার বার বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া গালি দিয়াছেন। সে গালিটি কিন্তু বাঙ্গলা ছাড়া আর কোথাও শুনি নাই—সে কথাটি 'গূথ-ভক্ষক'। আমাদের দেশে দিনরাত্রি এই গালিটি শুনা যায়।

আরও কথা, একটি ভুসুকুর গানে আছে :—

"আজ ভুসুকু তু ভেলি বাঙ্গালী।
নিজ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥"

আজ ভুসুকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয়াছিল ইত্যাদি।

এই সকল কারণে আমি শান্তিদেবকে আমাদের অষ্টম গৌরব মনে করি।

৯। নাথ-পন্থ

আমাদের দেশে এখন যে সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, "আমরা এদেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।" তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার-ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণালের পুরাণ-পর্য্যায়ে ১৬শ খণ্ডে হড্‌সন সাহেবের মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে নাথ-পন্থ (Nathism) নামে এক প্রবল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় এবং পূর্ব্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে।

নাথেরা যে বাঙ্গলা দেশের বা পূর্ব্ব ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ—মীন-নাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি

বাঙ্গলা। গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলা-তেই অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা আমাদের ময়নামতীর গানের নায়ক। মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়া দেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছন্দরনাথ বলে, অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার বাঙ্গলা দেশের লোক হওয়াই সম্ভব।

ক্রমে নাথ-পন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম গন্ধ না থাকিলেও, তিনিই এখন নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোনও দেবতার কোনও যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুসী না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

এই সকল কারণেই নাথ-পন্থকে আমি বাঙ্গলার নবম গৌরব বলিয়া মনে করি।

১০। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বাঙ্গলা দেশের দশম গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমণীপুর। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীলবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে।

দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বনপার দল খুব প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল বিহার হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর দুই একবার যাইতে অসম্মত হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার করেন। পশ্চিম-তিব্বতে যে সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। অতিশা যখন তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়-দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই।

১১। জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি

পুথি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন। তাহার মধ্যে শান্তিদেবের শিক্ষা-সমুচ্চয় নামে একখানি পুথি থাকে। পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই বাঙ্গলা। বেণ্ডল সাহেব যখন এই পুথিগুলির ক্যাটালগ করেন, তখন তিনি বলেন যে, এ পুথিখানি খৃষ্টের জন্মের ১৪শ বা ১৫শ বছর পরে লেখা।

পুথিখানির শেষে লেখা আছে:—"দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জাগদ্দল পণ্ডিত-বিভূতিচন্দ্রস্য" ইত্যাদি।

বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন, "মহাযান-পন্থী জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি না।" ১৯০৭ সালে আমি নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথিতে জগদ্দল-মহাবিহারের নাম পাই; বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই। তিনি "অমৃতকর্ণিকা" নামে "নামসংগীতির" একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়।

রামচরিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, "জাগদ্দল মহাবিহার" তাহারই কাছে ছিল। জগদ্দলের খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্কবিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদত্তম বিহার, সেইরূপ বাঙ্গলার মহাবিহার জগদ্দল।

এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া ছিলেন। যখন তিব্বত দেশে এই সকল বৌদ্ধ গ্রন্থের তর্জ্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও দুই-চারিখানি পুস্তক তর্জ্জমা করিয়াছেন। জগদ্দলের আর একজন মহাভিক্ষুর নাম দানশীল। তিনিও এইরূপ অনেক পুস্তক তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতওয়ালারা যে এক সমগ্র জগদ্দল-ভিক্ষুকের উপর অনেকটা নির্ভর করিত, সেটা বেশ বুঝা যায়।

সম্প্রতি শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে একখানি কেঙ্গুরের পুস্তক কিনিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, 'সোসাইটির' লামা বলেন, সে পুস্তকখানি হাতের লেখা, কাঠের ছাপা নয়, ১২২৬ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকখানি লেখা হয়, দানশীল উহা তর্জ্জমা করেন। এ দানশীল যদি জগদ্দলের দানশীল হন, তাহা হইলে জগদ্দল বিহারও পুরাণ, বিভূতিচন্দ্রও পুরাণ, আর বেণ্ডল সাহেবের পুথিও, তিনি যে সময় বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও তিন চারি শত বৎসর পুরাণ।

১২। লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ

বাঙ্গলার দ্বাদশ গৌরব লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ। তিনি আদি-সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার বাড়ী বাঙ্গলায় ছিল। রাঢ়দেশে এখনও তাঁহার নামে পূজা হয়, তাঁহার নামে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হয়। তিব্বতীরা তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা করে। তিনি অনেক বাঙ্গলা গান লিখিয়াছেন,

অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীও লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজযান হইবে, না হয় সহজযানেরই কোন ভাগ হইবে। সিদ্ধাচার্য্যগণ এককালে বাঙ্গলায় ও পূর্ব্ব-ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন।

সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুড়রী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্নু, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিন্তা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেণ্ঢন, দারিক, ভাদে, তাডক,—এই কয়জনের "চর্য্যাপদ" বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বেই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ঐ সকল দোহাকোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত টীকা ছিল। এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ভুটিয়া ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেঙ্গুর গ্রন্থ খুঁজিলে যে শুধু বাঙ্গালীদের ধর্ম্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

১৩। ভাস্করের কাজ

বাঙ্গলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর-শিল্প। মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব-পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারই নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল, কখন ক্রোধমূর্ত্তি, কখন শান্তমূর্ত্তি, কখন করুণামূর্ত্তি—নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে সকল মূর্ত্তির ও সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্ত্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেঙ্গুরে ১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ৩৬৬ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই সকল দেখিয়া মূর্ত্তি আঁকিয়া দিতে পারে। বাঙ্গলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্ত্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্ত্তিবিদ্যার ইংরাজী নাম "Iconography"। সেদিন একজন প্রসিদ্ধ Iconographist এক সভায় বলিয়াছেন যে মূর্ত্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাঙ্গলা। এখনও ভাস্করেরা নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দাঁইহাটের ভাস্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। পালরাজাদের সময়েই এই ভাস্করশিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখানকার ভাস্করেরা কার্য্য করিত। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙ্গালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে, তামায়, রূপায়,

সোণায়, অষ্টধাতুতে—যাহাতেই বল, মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব।

চৈতন্যদেবের পর গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটীর মূর্ত্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর দুই একটি কাঠের মূর্ত্তি দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন, ঠোঁট দুটি যেন নড়িতেছে। চৈতন্যের কীর্ত্তনমূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি সুন্দর! মাটীর মূর্ত্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধ হয় ভারতে অদ্বিতীয়। একজন ইউরোপের ওস্তাদ কতকগুলি মাটীর গড়া মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা সত্য সত্যই অনেক দিন ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে।"

১৪। বাঙ্গলায় সংস্কৃত

মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি চারিভাগের একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া আরও তাঁহার দশ বারখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়। সায়ণাচার্য্যের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণের বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। মুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণবিষ্ণু তাঁহার সম্প্রদায়ের। ইহাদের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও সুগম।

দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু চর্চ্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাদের টীকা এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত।

স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। কাশী, মিথিলা ও নেপাল দেশের প্রাচীন স্মৃতি নিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ যে স্মৃতিমঞ্জরী বলিয়া এক প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা উহার যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা খৃঃ ১১১৫ সালে কাপি করা। দায়ভাগকার জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-নিবন্ধকারের ও জোগ্লোক, অন্ধক, ভট্ট প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ত একটি অদ্ভুত জিনিস। সম্পত্তি পূর্ব্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিয়া গিয়াছেন, এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও ত নিজে দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, একখানি

দানসাগর ও আর একখানি অদ্ভুতসাগর। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুদ্ধির গ্রন্থও ত স্মৃতি ও ও জ্যোতিষের একখানি ভাল বই।

১৫। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন

ধর্ম্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বাঙ্গলা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান, ন্যায়-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান—সব ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গেল।

লাভ হইল মঙ্গলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব্ব-উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি হইল, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল; ক্ষতি যাহা হইবার তাহা বাঙ্গলারই হইয়া গেল!

দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে লাগিল। এই সময় দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দুই শত বৎসর নিরন্তর মারামারি কাটাকাটির পর একবার একজন হিন্দু বাঙ্গলার রাজা হইয়াছিলেন। অমনি আবার হিন্দুসমাজে সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ন ও দূরদর্শিতার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে, তাঁহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া একখানি স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া, আবার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির ন্যায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দুইজনে মিলিয়া অমরকোষের আর একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ পূরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দুসমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার বাঁধা সমাজ এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইঁহারা আমাদের পূজ্য, নমস্য এবং গৌরবের স্থল।

১৬। ন্যায়শাস্ত্র

মুসলমান-আক্রমণে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহার ফলে ন্যায়ের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এই চারি শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও,

যিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু না কিছু বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না। সুতরাং তাঁহাদের নবদ্বীপে আসিতেও হয়, বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেও হয়। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য ও নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী চলিতেছে। বাঙ্গলায় তাঁহার টীকাকার কেহ জন্মে নাই—তাঁহার টীকাকার একজন মারহাট্টি, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাঙ্গলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, বাঙ্গলার স্মার্ত্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাঙ্গলার নৈয়ায়িকদের মা চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

১৭। চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের কি দশা হইল? মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। বিহারগুলি শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ বাঙ্গলায় অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান।

বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর এক দলের নেতা গৌড়ীয় শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগম-বাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর একদল শাক্ত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলায় বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্ত্তি—কীর্ত্তনের পদ। বৌদ্ধদিগের চর্য্যাপদের অনুকরণে এই সকল পদাবলীর সৃষ্টি। পদাবলীর পদকর্ত্তা অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০।৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'প্রবৃত্তি' ছিল, এখনও কীর্ত্তনের সেইরূপ নানা রূপ 'প্রবৃত্তি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—মনোহরসাহী ও রেণেটি। ভক্তিরত্নাকরে

লেখা আছে যে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্ত্তন হয়, তখন স্বর্গ হইতে চৈতন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভাল কীর্ত্তন জমিলে সেখানে চৈতন্য সপরিকর আবির্ভূত হন। বাঙ্গলার কীর্ত্তন একটা সত্য সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য চৈতন্যদেবের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

১৮। তান্ত্রিকগণ

মূল তন্ত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত দুই চারিখানি মূল তন্ত্র ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় এই সকল সংগ্রহ-কর্ত্তাদের প্রথম ও প্রধান—গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। সংগ্রহকারেরা মূল তন্ত্র অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূল তন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে, যাহা সভ্য সমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা এই লোকায়ত তন্ত্রশাস্ত্রকে মার্জ্জিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা যে খুব দূরদর্শী ও সমাজনীতিকুশল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন।

তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তান্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গ-সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী। তাঁহাদের দলে বাঙ্গলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাঙ্গলার একটি শ্লাঘার বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজী মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়।

বাঙ্গালীরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেই জন্য যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। কিন্তু এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

১৯। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

এই যে এত বড় একটা অনার্য্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ

ধর্ম্মের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন, বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে,—চারিদিকের লোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্ম্মের দেশ—এটা কে করিল? বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন, মুসলমানেরা প্রাচীন সমাজ, বিশেষ প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ, একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলে, তাহার পর কিরূপে ব্রাহ্মণেরা আবার ধীরে ধীরে সেই সমাজ আবার গড়িয়া তুলিলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরবে অনেকটা দেখাইয়াছি। স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণবধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং দেশ মাতাইতে হইলে যে মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গলা করা আরম্ভ করিয়া দেন।

বাস্তবিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা এই সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমায় হিন্দু সমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ তর্জ্জমার মূলে ব্রাহ্মণ।

২০। কায়স্থ ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। গুণরাজ-খাঁর কৃষ্ণমঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। কাশীদাসের আরও দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক—বাঙ্গালী হিন্দু হউক। কায়স্থেরা শুধু বই লিখিয়াই সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এ দেশের অনেক জমীই তাঁহাদের হাতে ছিল, জমীদারভাবেও দেশের এবং সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার সন্তানসন্ততি বাঙ্গলার সুলতান না হইলে রায়মুকুট বড় কিছু করিতে পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিশিয়া মুসলমানসত্ত্বেও বাঙ্গলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন

আমাদের পদ্যের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূর দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে পুরাণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খৃষ্টের অষ্টম শতকে বাঙ্গলায় ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও সেই কালেরই লোক। তাঁহারা অনেক দোহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এ সকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী স্রোত রোধ করা যাইবে না। তাই তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। কাব্যের দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা ছিল, বাঙ্গলাতেও তাহাই রহিল, বেশীর মধ্যে বাঙ্গালীর মনে যাহা লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী হাস্যরসে পটু, তাই উহাতে হাসির জিনিষ বেশী করিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাটাকাটি ভালবাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশী আসিয়া ঢুকিল। এই জন্যই অঙ্গদ রায়বারে, লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙ্গালী বড় ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি বাঙ্গালী আকারে, বাঙ্গলা ভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মত করিয়া বাঙ্গলা করিয়া লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ, পাকা বৌদ্ধ যে ধর্ম্মঠাকুরের গান, তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব হইল। কাব্য ও নাটকই তাঁহার ধর্ম্মের প্রাণ। অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই তাঁহাদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন,

আর একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রসের সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ ও মিলন পর্য্যন্ত গানগুলি একটির পর একটি করিয়া সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাঙ্গিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাল্মীকি মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের পদ ভাঙ্গিয়া "রাধামাধবোদয়" নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের "রামরসায়ণ" লোকে পড়ে, কিন্তু "রাধামাধবোদয়" লোকে বড় পড়ে না। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যদি "রাধামাধবোদয়" পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কবি কিরূপ অদ্ভুত কারিকুরি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হয়, রাধামাধবোদয়ই বৈষ্ণবধর্ম্মের একখানা বড় মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কতকগুলি বাঙ্গলা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এই সকল কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প প্রধান। গল্পটি সোজা, উহাতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরাজী যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালীরা একটি বিষয় লইয়া অনেকে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেরই অনেক রূপ বাঙ্গলা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্ম্মঠাকুরের গানের ত কথাই নাই। সত্যপীরের পাঁচালী যে কত আছে, গণিয়া ঠিক করা যায় না। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যপীরের গান আছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই?

পদ্য ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহারথিগণ একে একে অস্তগত হইয়াছেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি লোকে যেন বেশী দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চান না।

নবেলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। বঙ্কিমবাবু দুই বৎসরের কমে একখানি নবেল লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুট্‌কীই অধিক। চুট্‌কী যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। অনেক চুট্‌কী অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুট্‌কীতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে। চুট্‌কীর একটি দোষ আছে—যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না। তাই চুট্‌কীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাঙ্গলায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা



মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্ সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে —এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য, অমূল্য; আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিনকতক বাঙ্গালীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবন-চরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দু চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কার্য্যকারণ-ভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদ্বারা সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। এরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না! যিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের "আদিত্যস্বরূপ" ছিলেন, তাঁহার একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবু ও ভূদেব বাবু এ বিষয়ে দু চারটি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোন কাব্যের কোন বিশেষ অংশ ধরিয়া। পূরা কাব্যখানি পড়িয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে হজম করিয়া, তাহার দোষ-গুণ দেখান এখনও হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর নবেলের দোষগুণ-পরীক্ষা দুই তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই একবার হইয়া গিয়াছে। দুই একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার একটা মস্ত অভাব আছে।

অনেকের সংস্কার বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠান্‌দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম "ছন্দস্"—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণ; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কত দিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার

চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্রভাষা; ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দু রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেল-দিগের শিলালেখের ভাষা। তারপর সাত-কর্ণিদের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওঢ্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। সংস্কৃতের গতি এক-রূপ ছিল, এতদিনে বাঙ্গলার গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেমন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গালার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনীর" অর্থ—উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনি" দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না "মস্যাধার" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। তাহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আবার এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।"

উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমি বলি, "সময় আর কাটে না", তাঁহারা বলেন, "কাটেনা, ছি! —ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্ত্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি, "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়", তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প", তাঁহারা বলেন, "স্বকপোলকল্পিত।" আমরা বলি, "ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল", তাঁহারা বলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয় তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরাজী, ভাবেন ইংরাজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলায়—সে এক রকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে।

মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে বাঙ্গলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখার দরকার, তবে ত বাঙ্গলা লেখক হইবে! নহিলে বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গলা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট নাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গলা বলিবেন?

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা মত পারসী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মুসলমানেরা বাঙ্গলা সাহিত্য লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাহা নয়, তাঁহারা আরও বলিতেছেন, তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার

করিব; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।" সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষার গতি" নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা কর যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা কি হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। "রেল্‌ওয়েকে" "লৌহবর্ত্ম" করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সে দিন বড়রাস্তাকে "রাজমার্গ" ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে "বংশপরিচালনা" লিখিয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে "শ্বশ্রূ মহাশয়" লিখিয়া বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়াছিলেন। এরূপ করা বড়ই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নহে। যে ভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাঙ্গলায় জুটিতেছে। যে সকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্বে দেশে "মিউজিয়ম" ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, "চিত্রশালিকা"। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় "মিউজিয়ম" শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট্ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে "যাদুঘর" বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে "আজবঘর" বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গালায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জ্জমা করিলেন "পর্য্যবেক্ষণিকা।" কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কি না সে বিষয়েও সন্দেহ।

হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না, —তাহারা উহার নাম রাখিল "তারা-ঘর", মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কি? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভাল, বাঙ্গলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী খুজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে "বাতাবী লেবু", "মর্ত্তমান কলা", "চাঁপা কলা" কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙ্গলায়, সোজা কথায় এই সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলা দাঁতভাঙ্গা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ

ইতিহাস-চর্চ্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা। দেশকালভেদে বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্য্যকর, এবং সর্ব্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি জাতীয়তার অভিমানে মত্ত হইয়া, এই প্রথা নব্য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি, তবে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। জগৎ অগ্রসর হইবে; শুধু আমরা মধ্যযুগে পড়িয়া থাকিব; আমাদের রচিত ইতিহাস বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ হইবে; এবং বিদেশীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেছেন, তাহাই সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া কিছুদিন পরে আমাদের প্রাচীন ধরণের ঐতিহাসিক জল্পনা কল্পনাকে পরাস্ত করিবেই করিবে।

ঐতিহাসিকের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিলে ইতিহাস লিখিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী জানিতে পারা যায়। প্রকৃত ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করিয়া চোখের সামনে উপস্থিত করে।

সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে।

সত্য-নির্দ্ধারণের প্রণালী কি? সর্ব্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তোলা।

সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।

প্রামাণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। এই জন্য ইউরোপে ইতিহাস রচনায় এক ক্রমোন্নতির ধারা দেখিতে পাই। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত



অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

পুরাতন মত, পুরাতন গ্রন্থ ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। আইনের পুস্তকের মত ইতিহাসেরও ক্রমাগত নূতন সংস্করণ কিনিতে হইতেছে। পিতামহদের সময় হইতে আগত বিশ্বাসের মূল পরীক্ষা করিয়া, সেই পুরাতন অট্টালিকাগুলি ক্রমাগত নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নূতন নূতন গৃহ রচিত হইতেছে।

সভ্যতা, সমাজ ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে বটে। ইহার মানবের লিখিত সাক্ষী না পাইলেও মানবের হাতের কাজ কত যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহার আরম্ভ প্রামাণিক ঘটনা হইতে। প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ঐতিহাসিকের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নানা প্রদেশে লিখিত আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম আমরা এখনও স্বীকার করি নাই।

সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন,—(১) সর্ব্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই first information-এর নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে ত? পুলিস ডায়েরীর গোপনীয় নকল কি করিয়া পাওয়া যায়? (২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে? (৩) মোকদ্দমার কোন পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত আছে কি?

প্রত্যেক ইতিহাস লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণী বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া, তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে এইরূপ তালিকা (critical bibliography) সংগ্রহ না করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যে কত ভ্রম তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি না।

বর্ণিত ঘটনার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান সাক্ষীর উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সমসাময়িক লেখক না থাকিলে, ঘটনার যত অদূরবর্ত্তী সাক্ষী পাওয়া যায় ততই ভাল। পুরাতন বিবরণ সংক্ষিপ্ত বা কর্কশভাষায় লিখিত হইলেও, আধুনিক সময়ের সুদীর্ঘ ও সুললিত বর্ণনার উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। আদি গ্রন্থ পাইলে অনুবাদ ব্যবহার করা অনুচিত।

আবার, সাক্ষীটি সত্য জানিবার কতটুকু সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদি সাক্ষীর অনুসন্ধান করায় বিপাতে ইতিহাসক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে থিয়র্ (Thiers) যে ইতিহাস লিখিয়া যান, এবং যাহা আমাদের দেশে আদৃত য়্যাবটের নেপোলিয়ন-চরিতের মূল, তাহা নানা দেশের সরকারী কাগজ পত্র ও গোপনীয় চিঠি অনুসন্ধানের ফলে এখন শিক্ষিত সমাজে কাব্য বলিয়া ঘৃণায় পরিত্যক্ত হয়।

আসল গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিতে অনুবাদের উপর নির্ভর করা যে কি ভুল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্র্যাণ্ট ডফের "মারাঠাজাতির ইতিহাস" এক উপাদেয় গ্রন্থ; অথচ ডফ্ সাহেবের পণ্ডিত ভুল করায় আফ্‌জল খাঁর দূতের নাম শিবাজীর দূতকে দেওয়া হইয়াছে। এটি নগণ্য বিষয় নহে; আফজল খাঁর দূত যদি শিবাজীর টাকা খাইয়া নিজ প্রভুকে বধ্যভূমিতে ভুলাইয়া আনিত তবে সে বিশ্বাসঘাতক হইত; শিবাজীর দূতের পক্ষে ঐ কাজ ততদূর নীতি-গর্হিত নহে।

যেখানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলে না, সেখানে সর্ব্বশেষে রচিত অথবা সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে।

কখন কখন বাধ্য হইয়া অনুবাদের অনুবাদ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কোটেসনের কোটেসন তস্য কোটেসন কেন ব্যবহার করিব? ইংরাজীতে একটি বড় কাজের কথা আছে, "Always verify your references", অর্থাৎ যাঁহার মত উল্লেখ করিলে, তিনি ঠিক সেই কথা গুলি বলিয়াছেন কি না তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, তাহা কাহার বচন এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা নির্দ্দেশ না করিলে সাহিত্যিক অসাধুতা হয়, এবং ভ্রম সংশোধনেও বাধা পড়ে।

ইতিহাস-লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণ-পঞ্জী দিতে বাধ্য। ইতিহাস বর্জ্জাইস অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যক; ইহা পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে; ইহা না থাকিলে গ্রন্থের মূল্যহানি হয়। প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া তাহাতে প্রামাণিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

এখন ইতিহাস রচনার আরও উচ্চতর সোপানে চড়া যাউক। ইতিহাস-লেখক ব্যক্তিগত ভ্রম সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রুপক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্রপক্ষ উহা বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে —এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্ সাক্ষীটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে এক তর্ফা ডিক্রী পান, তবে তাহা এক দিন আপসেট্ হইবেই হইবে, কারণ জগতের জ্ঞানের আদালতে আপীল কখন তমেয়াদি দোষে বারিত হয় না; শত শত বৎসর পরেও অন্যায় মতের বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে; আপীলের চূড়ান্ত সীমা সত্য নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত গিয়া তবে থামে।

ঘটনার সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ, তাহার গায়ের চামড়াটি, চক্ষুর সম্মুখে সহজে আনা যায়; কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে

প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজা রাজ্য পরিবর্ত্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদে পদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না।

আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের। সুতরাং ঐতিহাসিক চর্চ্চার অত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাঙ্গলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারিলে আমাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে। প্রাচীন লেখমালার উদাহরণ হিন্দীতে গ্রন্থকারে একত্র ছাপা হইয়াছে; বাঙ্গলায় হয় নাই। (নব প্রকাশিত "গৌড়লেখমালা" আংশিক গ্রন্থ।) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ম্যাকডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় অনুবাদ করা হয় নাই, ইহা আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে লজ্জার বিষয়। গুজরাতী ভাষা বাঙ্গলার চেয়ে কত কম লোক বলে, অথচ গুজরাতী ভাষার সেবকগণের আগ্রহ, শ্রমশীলতা ও দূরদর্শিতার ফলে সর্ব্ববিধ বিভাগের পুস্তকের অনুবাদে গুজরাত ছাইয়া গিয়াছে। আর আমরা বঙ্কিম রবীন্দ্রের মৌলিকতার গর্ব্ব করিয়া অলস হইয়া বসিয়া আছি! লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই।

ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রনেতার, সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক মহাবন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীত কালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্ত্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরবর্ত্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙ্গিল, সেই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাস চর্চ্চার চরম লাভ।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ

বিজ্ঞান কি তাহা বুঝা যাউক। অমর-কোষের টীকাকার রঘুনাথ বলেন, বিরূপং জ্ঞানং বিজ্ঞানং। বিভিন্ন রূপের যে জ্ঞান তাহা বিজ্ঞান। চিত্রশিল্পে বিভিন্ন মূর্ত্তি, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে শব্দের নানা রূপ প্রদর্শিত হয়। এই কারণে শিল্প ও ব্যাকরণ বিজ্ঞান। কিন্তু এই অর্থ আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানের নহে। নানারূপে প্রকৃতি কার্য্য করিতেছেন; প্রকৃতির এই যে অসংখ্য রূপ, রূপ-পরিবর্ত্তন-প্রবৃত্তি তাহার জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ক্ষিতি-অপ্ তেজাদি পঞ্চভূত আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়।

এই পাঁচভূতের জ্ঞান,—বিজ্ঞান, ভৌতিক বিজ্ঞান। প্রকৃতি বহুভেদবিশিষ্ট বিচিত্র। ইহার উপাদান জড় কল্পিত হইয়াছে; শক্তি জড়কে স্পন্দিত করিতেছে। এই জড়শক্তি-ময়ী জ্ঞান বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান। আমরা যে ভাবেই দেখি, সেই একেরই জ্ঞান; এই হেতু বিজ্ঞান সংজ্ঞা দ্বারা, প্রাকৃতিক, ভৌতিক বা জড়-বিজ্ঞান বুঝি।



রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

প্রকৃতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই দেন না; সব বুদ্ধিবলে কাড়িয়া লইতে হয়। আমি আহার বিনা পড়িয়া থাকি, প্রকৃতি বলেন কর কি! কিন্তু এই পর্য্যন্ত। তারপর আমাকে দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া খুজিয়া লইতে হইবে। কোথায় কোন্ দেশে কোন্ গাছে সুমিষ্ট ফল পাকিয়াছে, তাহা আমাকে খুজিয়া লইতে হইবে। তেমন ফল আমার দেশে আমার গ্রামে বাড়ীর কাছে ফলাইতে পারি কি না, এই এষণা আসিবে। এইরূপ এষণা হইতে বিজ্ঞানের জন্ম।

কিন্তু এত চেষ্টা এত গবেষণা কাহার নিমিত্ত? প্রকৃতি কার্য্য কারণের হেতু; পুরুষ সুখ দুঃখের হেতু। সেই পুরুষের সেই আমার নিমিত্ত, আমার বর্ত্তন নিমিত্ত বিজ্ঞান। আমাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান নহে। আমার সৌখ্যচিন্তা বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য না হইলে বিজ্ঞানে কি ফল? আজিকার কালিকার আমি নহে, এ গ্রামের সে গ্রামের স্বদেশের বিদেশের আমির সৌখ্য নহে, মানবের সৌখ্য, বিজ্ঞানের চিন্তা। ইহার দেশ বিস্তীর্ণ, কাল বিস্তীর্ণ,

পাত্র বিস্তীর্ণ। এই হেতু বিজ্ঞানের সমাদর, পূজা, বিজ্ঞানের মহত্ত্ব।

দেশে বিজ্ঞানের স্থিতি

কি কারণে এদেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, তাহার পর্য্যালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। ডাঃ বসু কিংবা ডাঃ রায় কিংবা তাঁহার দুই চারিজন ভাগ্যবান ছাত্রের দ্বারা দেশের দশা ফিরিতে পারে না। সকল বিষয়েই মধ্যম লইয়া বিচার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধানে ছাত্রের জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় হইতেছে। এখনও ইহার ফলভোগের সময় আসে নাই, কিন্তু অধিক প্রত্যাশার হেতুও দেখিতেছি না। অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্ম্মশালায় ছাত্রেরা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে, যে বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়াছে, যাহা ছাত্রেরা শুনিয়াছে দেখিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। ইহাতে তাহাদের হাত আসে, কিন্তু বুদ্ধি আসে না। তাহারা অনুকরণে দক্ষ হয়, প্রকরণে হয় না। বলা বাহুল্য, প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মে অভ্যাস জন্মিতে পারে। কলেজে প্রথম বর্ষ হইতে ছাত্রকে গবেষণায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে তাহার কর্ম্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয় জন্মে, শিক্ষায় উৎসাহ হয়। কখনও কোন ছেলেকে মন্ত্র করিতে ব্যগ্র দেখিয়াছেন কি? দেশের ছুতারের ছেলে কি বাটালি করাত লইয়া কিছুদিন হাত করে, না প্রথম হইতেই ছোট ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য গড়ে, কিংবা পিতার সাহায্য করে? চেষ্টা করিলে আমিও পারি, আমিও মানুষ; এই প্রত্যয় দৃঢ় হইলে আর কিছু দেখিতে হয় না। অন্ততঃ জ্ঞানান্বেষণা, গবেষণার নামে ভয় ঘুচিয়া যায়। অবশ্য, কথাটা বলা যত সোজা, কথার মতন কাজ করা তত সোজা নহে। তথাপি এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে চলিতে উপায়ও আসিতে পারিবে। আমরা যে বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ধনশালী ইয়ুরোপের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যয়সাধ্য; ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় যেখানে ছাত্রের শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা আছে, সেখানে আরও ব্যয়সাধ্য। অথচ আমরা সে দেশের সিদ্ধির সহিত এদেশের কৃত কর্ম্মের তুলনা করিতে যাই।

বিজ্ঞানার্থী ছাত্র নির্ধন, দেশও নির্ধন; ধনসাধ্য বিজ্ঞান তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানের উদ্দেশ্য—ছাত্রকে কেবল বিনয় ও জ্ঞানদান নহে। সে উদ্দেশ্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে আদ্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি দুইটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখিতেন না, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় শিখিবার, মনে রাখিবার পরীক্ষা করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে এক এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ করিতে অভিলাষী। বিলাতে যাহা সম্ভাবিত হইয়াছে, এদেশেও তাহা হইবে, এই আশায় বিলাতী বিশ্ব-বিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সে আশা সম্যক্ ফলবতী হইতেছে না। সাধারণের নিমিত্ত বিশেষ বিদ্যা বিশেষ বিজ্ঞান অনাবশ্যক মনে হইতেছে।

মূর্ত্ত-বিজ্ঞান সাহায্যে আজি কালি কি অভাবনীয় কাণ্ড সাধিত হইতেছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। বিলাতী দীপ-শলা হইতে তড়িৎদীপের উদ্ভাবনা পর্য্যন্ত

চিন্তা করিলেই মাথা ঘুরিয়া পড়ে। শস্ত্র-চিকিৎসায়, বিষের প্রতিষেধে, অনুজীব ধ্বংসের উপায়ে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিলাতী মূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিশেষতঃ মূর্ত্ত-রসায়ন ও চিকিৎসা-বার্ত্তার উন্নতি নিমিত্ত বহু বহু লোক অহোরাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন।

অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান হইতে মূর্ত্ত-বিজ্ঞানের জন্ম। কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া মূর্ত্ত বিজ্ঞানের প্রসার বাড়িয়াছে। প্রকৃতির শক্তি কাড়িয়া লইতে হইলে সে শক্তির পরিচয় প্রথমে চাই। গেলিলিও লণ্ঠন দুলিতে দেখিয়া দোলকের দোলনসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানভিক্ষু ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কারে সংসারের কি হিত হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই।

বিজ্ঞান দ্রব্য গড়ে না, কলা গড়ে। বিজ্ঞান কলা গড়িবার সন্ধান বলিয়া দেয়। বিজ্ঞান জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট, কলা-বিজ্ঞান (কলার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান) জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগ ঘটায়। কৃষি চিকিৎসা প্রভৃতির অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান বার্ত্তা-বিজ্ঞান। কলা বিজ্ঞান ও বার্ত্তা-বিজ্ঞান মূর্ত্ত-বিজ্ঞান। অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিস্তীর্ণ, জগৎ-ব্যাপী; আকাশের নাড়ী নক্ষত্র হইতে পাতা-লের নীচে কূর্ম্ম ছিল কি না তাহার অনুসন্ধান করে। এই বিশাল বিজ্ঞানের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। এই কারণে বিজ্ঞানের নানা শাখা-কল্পনা। ইহাদের মধ্যে কিমিতি-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অন্য শাখারও উপস্তম্ভ। এই দুই বিজ্ঞান অধিকাংশ মূর্ত্ত-বিজ্ঞানের আদি। মূর্ত্ত-বিজ্ঞান ক্ষুদ্র; আমার তোমার যাহাতে হিত হইতে পারিবে তাহার বিজ্ঞান। এই কারণে, খণ্ডিত। কিন্তু অধিকারী ভেদ ত আছে। যে জ্ঞান কেবল জ্ঞান না থাকিয়া ফলদায়ক হয় এবং যাহা লাভ করিতে ছাত্রের উৎসাহ হয়, তাহা মূর্ত্ত-বিজ্ঞান হউক, কলা-বিজ্ঞান হউক, তাহা হিতকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মেডিকাল কলেজ, টিচার-ট্রেনিং কলেজ, ল-কলেজ, এ সব কলেজের ছাত্রদিগের জ্ঞান ও বিনয় হয় না বলিতে পারি না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকাল কলেজ ধরুন। এখানে বার্ত্তার আবশ্যক নানা বিজ্ঞান শেখানা হয়, সবই খণ্ডিত; মেডিকাল কলেজে সুস্থ দেহের রক্ষা ও রুগ্ন দেহের আরোগ্য এই দুই বিষয় লইয়াই বিশাল বিজ্ঞান শেখানা হয়। কিন্তু এই দুই কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র ও অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান-কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রের তুলনা করুন। শেষোক্ত ছাত্র জীবন-সংগ্রামের যোগ্য নহে। বিশ বৎসরের যুবক বি, এ, বিস্‌সি পাশ করিয়া খণ্ডিত জ্ঞানের ফলে সংসার-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ থাকে।

অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান যিনি শিখিতে চান শিখুন, কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিবার আয়োজন আবশ্যক। মূর্ত্ত-বিজ্ঞান দ্বারা অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান-জাত বিনয় লাভ হইবে, লৌকিক জ্ঞান হইবে, আর সেই জ্ঞান প্রকৃত হইবে। ইহাতে পারগ ছাত্র হাকিম হউন, উকিল হউন, এই দেশের সম্পর্কে থাকিবেন, তাহাঁর অধীত বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগ পাইবেন, এবং যত্ন করিলে মূর্ত্ত মার্গ ধরিয়া

অমূর্ত্ত মার্গে উপস্থিত হইতে পারিবেন। ফলে দেশে বিজ্ঞান-বিস্তার হইবে। এত দিন অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিক্ষার ফল দেখা গেল; এখন মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিলে কি হয়, তাহাও ত দেখা কর্ত্তব্য।

দেশে বিজ্ঞানপ্রচারের তৃতীয় অন্তরায় বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা। এই বিদেশী ভাষা, ইংরেজী ভাষা এত কঠিন যে, শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত দশ বার বৎসরের যত্নে ও শ্রমে যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত হয়। মস্তিষ্কের শক্তি অফুরন্ত নহে, আমাদের বয়সও নহে। এই ভাষা শিখিতে আমাদের কত রক্ত জল হইতেছে, কত শক্তি তাপ হইতেছে, তাহা চিন্তা করুন। অথচ এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা আমাদের কাম্য নহে; কাম্য বিজ্ঞান। কাম্যের চতুর্দ্দিকের কণ্টকের প্রাকার ভেদ করিতেই শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় হইতেছে। ইহাও সহ্য হইত; মাতৃভাষায় না শেখাতে বিদেশী বিজ্ঞান বিদেশী থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলিতে কিছু লিখিতে হইলে বিদেশী ভাষায় বলিতে লিখিতে হইতেছে; চিন্তা করিতে হইলেও বিদেশী শব্দমূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইতেছে। কারণ, অন্য সাধন জানা নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে, সভাসমিতি আপিশ আদালতে যাইতে হইলে গৃহবেশ ত্যাগ করিয়া যেমন সভ্যবেশ পরিধান করি, এবং সেখান হইতে আসিয়াই সে বেশ ত্যাগে সুস্থ বোধ করি, আমাদের পক্ষে বিজ্ঞানও তেমন হইয়াছে। উহা দেশের ধাতুতে মিশিতেছে না, বাহিরে বাহিরে শোভা-সম্পাদনের নিমিত্ত থাকিতেছে। ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিতে ছাত্রের যত বৎসর লাগিতেছে, মাতৃভাষায় শিখিলে অর্দ্ধেক সময় লাগিত না।

* * *

কৃষিবার্ত্তা দ্বারা বিজ্ঞান প্রচার

কৃষিকর্ম্মে যে বিজ্ঞান আবশ্যক, অথবা কৃষিকর্ম্মের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহা মূর্ত্ত-বিজ্ঞান, এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ইহার অমূর্ত্ত আকার। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও অপর সমুদয় বিজ্ঞান আবশ্যক হয়। আকাশ হইতে পাতালের স্থাবর অস্থাবর সকল দ্রব্যের, কোন স্থলে গভীর কোন স্থলে অগভীর জ্ঞান আবশ্যক হয়। মৃত্তিকা-জল-বায়ুর ভৌতিক বিজ্ঞান, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের স্বভাব নির্ণয় প্রভৃতি হইতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান পৃথক্ করিতে পারা যায় না। বৃক্ষের জীবনধারণ, বর্দ্ধন, পোষণ, সন্তান-জনন প্রভৃতি ব্যাপার ভৌতিক জড়ধর্ম্ম বলিয়া অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই। বস্তুতঃ যখনই জন্মমরণ বলি তখনই এক অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট, বোধ হয় চির অজ্ঞেয়, সত্ত্ব স্মরণ হয়। বাহ্য-প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্র জীবকে কতদিকে নিয়মিত করিতেছে, তাহারই মধ্যে জীব জন্মিতেছে বাড়িতেছে মরিতেছে, কিছু রাখিয়াও যাইতেছে। ইহার তুলনায় ভানুমতী-বাজি কিছুই নয়। আচার্য্য বসুর জগৎবিখ্যাত আবিষ্কারে জঙ্গমের সহিত উদ্ভিদের বিলক্ষণ সাদৃশ্য স্পষ্ট হইতেছে। রাসায়নিকের গোটা দশ বার মূল পদার্থ পাইলে এক একটা বৃক্ষ জীবিত বর্দ্ধিত

ফলপ্রসূ হইতে পারে, কিন্তু রসায়নবিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু আছে।

সেটা কি, কে জানে। কিন্তু জানি সর্ষপবীজ ও বটবীজ একক্ষেত্রে উপ্ত হইলেও সর্ষপ ও বটবৃক্ষ এক হয় না। কৃষক ভূয়োদর্শনে ভর করিয়া শস্য জন্মাইতেছে, বীজ সংগ্রহ করিতেছে, মাটি বিচার করিতেছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতেছে, ক্ষেত্র বীজাঙ্কুরোৎপত্তির যোগ্য করিতেছে, বৃক্ষের শত্রু বিনাশ করিতেছে, নবজাত বৃক্ষশিশু পালন করিতেছে। মাটি জল বায়ু রবিকর তেজ অব্যাহত রাখিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতেছে, একটী বীজ হইতে বহু পাইতেছে। বীজের সেটা কি শক্তি যাহাতে তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াও পূর্ণ থাকিতেছে? যে সর্ষপ সে সর্ষপ, যে বট সে বট থাকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু হইতেছে। জীবন ত দ্রব্যগুণ বলিতে পারা যায় না। অথচ সরিষা ক্ষেতের দুইটি সরিষা গাছ অবিকল এক নহে, আম-বাগানের সব গাছের আম সমান বড়, সমান মিষ্ট নহে। তবে, বৃক্ষের আকার-প্রকার স্বভাব চরিত্র পরিবৃত্তিশীলও বটে। দেখিলে বোধ হয়, প্রকৃতি জাতিভেদ করেন নাই, আমরা করিয়াছি। আমাদের স্বল্প জ্ঞানে ভেদাভেদ আসিয়াছে। যাহা বিজ্ঞান বলি, বিজ্ঞানের সূত্র বলি, তন্ত্র বলি, তাহা মানুষের কল্পিত রচিত; প্রকৃতির তন্ত্র আমরা জানিতে চাই, জানিতে পারিতেছি না।

ফলোৎপত্তির পক্ষে বীজ প্রধান কি ক্ষেত্র প্রধান, তাহা লইয়া পূর্ব্বকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত বিলক্ষণ বিতর্ক চলিতেছে বৃক্ষের, ইহা ডালপালার ফুলফলের বীজের স্থিরতা আছে, নাই-ও। ইহা নিত্য দেখিতেছি। একের মধ্যে বহুরূপতার দৃষ্টান্ত জীবেই পাই। যখন ডাল হইতে গাছ হয়, এবং বহু বৃক্ষ বীজ বিনা অরণ্য হইয়া পড়ে, তখন বীজোৎপত্তির বিচিত্র ব্যবস্থা কেন হইয়াছে?

বস্তুতঃ—কৃষিকর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বীজকর্ম্ম ও ক্ষেত্রকর্ম্ম। বীজকর্ম্মে বীজ নির্ব্বাচন, বপন, অঙ্কুরোদ্গমন, জাত বৃক্ষের পালন, এবং শেষে বীজ রক্ষণ। ক্ষেত্রকর্ম্মে মাটির উৎপত্তি স্থিতি জলবায়ু ও রবি-তেজ নির্ব্বাহ, বৃক্ষের শত্রুর বিনাশ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ম্ম। ইহার এক এক কর্ম্মে প্রচুর বিজ্ঞান আছে, অনেক গবেষণা করিবার আছে।

বস্তুতঃ, কৃষি-বিজ্ঞান এত অজ্ঞাত যে ভূয়োদর্শন ব্যতীত কৃষি চলিতে পারে না। এ কারণ, জমি নূতন, বীজ নূতন হইলে অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বীজ দুইই অজ্ঞাত হইলে ভাবী ফলও অজ্ঞাত থাকে। মৃৎকুণ্ডে দুই চারিটা আখ্ গাছ যত্নে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিতে পারা যায়; কিন্তু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, এবং সেটা কাজের কথা, কৃষকের বর্ত্তমান সহায়-সম্পত্তি লইয়া পারা যায় কি না, সেটাই গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার পূরণ না হইলে কৃষি-বিজ্ঞান আর উদ্ভিদ-বিজ্ঞান প্রায় এক থাকিয়া যায়, কৃষি-বার্ত্তা দাঁড়াইতে পারে না। দেশের কৃষক জানে, গোবর জমির "সার", এ কারণ সারকুড়ে সারগাদা করিয়া রাখে। গোবরের উপাদান কি, তাহা জানে না; কিন্তু জানে কোন্ মাটিতে কোন্ ফসলের পক্ষে গোবর হিতকর, কিসের

পক্ষে খইল হিতকর। মাঠের মাটি পরীক্ষা করিয়া জানি, জমিতে নাইট্রোজেন ফস্‌ফরস্‌ ও পটাসিয়মের ন্যূনতা আশঙ্কা করিবার কথা। সব মাটিতেই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু একটার ন্যূনতায় বৃক্ষ-জীবন-ক্রিয়া আটকাইয়া যায়। নাইট্রোজেনের সদ্ভাব কদাচিৎ হয়, এ বৎসর সদ্ভাব হইলেও পর বৎসর হয় না। কারণ বৃক্ষকে যে সোরা আকারে নাইট্রোজেন লইতে হয়, তাহা জলে ধুইয়া চলিয়া যায়, জমিতে থাকে না, এ কারণ কৃষক গোবর, গোমূত্র, অন্য পশুর বিষ্ঠা মূত্র চর্ম্ম ও শৃঙ্গ চূর্ণ, গাছ-পচা প্রভৃতি দ্বারা নাইট্রোজেন নির্ব্বাহ করে। বরাহের বৃহৎ-সংহিতায়, অগ্নিপুরাণে শুক্রনীতিতে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ আছে। পূর্ব্বকালে দ্রব্যগুণ প্রচুর আলোচিত হইয়াছিল। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে যে দ্রব্যগুণ বর্ণিত আছে, তাহা যে কত ভূয়োদর্শনের ফল তাহা ভাবিলে এই বিজ্ঞানের দিনেও পূর্ব্ব-পিতামহদিগের প্রতি মস্তক আপনি নত হয়। দ্রব্যগুণ জানিলে লৌকিক কাজ চলে বটে বিজ্ঞান এষণা তৃপ্ত হয় না।

কৃষিবার্ত্তা দৃষ্টান্ত করিবার উদ্দেশ্য আছে। (১) দেখা যায় এই বার্ত্তা ধরিয়া দুরূহ বিজ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যে সকল ছাত্র মূর্ত্ত-বিজ্ঞান সহজ মনে করেন, তাঁহারা দেখিবেন কৃষিকর্ম্মের এক এক বিজ্ঞান অদ্যাপি অজ্ঞাত। (২) গবেষণা জাগ্রত করিবার পক্ষে কৃষি-বার্ত্তাও সুন্দর উপায়! গবেষণা শব্দের মূলার্থ নাকি গরু খোজা। গরু হারাইলে লোক খুজিতে বাহির হয়। কৃষি-বার্ত্তায় অসংখ্য গরু, মূল্যবান্ গরু খুজিবার আছে; যেগুলা পাইলে আমাদের বহু মঙ্গল হইবে। চাণক্য নাকি বলিয়াছেন,—

কৃষির্যস্য ন বাণিজ্যং গাবো যস্য ন ধেনবঃ।
দারিদ্র্যং সততং তস্য গৃহে তস্য কুভোজনম্॥

আমাদের গৃহে যে কুভোজন হইতেছে, তাহা পল্লীতে প্রবেশ করিলেই প্রত্যক্ষ হয়।

এই যে অভাব-বোধ হইতে গবেষণা তাহাই প্রকৃত; অন্যের দেখাদেখি যাহা তাহা কৃত্রিম। আরও দেখিতেছি কৃষি ধরিয়া প্রায় যাবতীয় বিজ্ঞান শিখাইতে পারা যায়। বিজ্ঞানের এমন শাখা মনে হইতেছে না যাহা ইহাতে কিছু না কিছু না লাগে। ইহাই ত প্রজাসাধারণের আবশ্যক। বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব প্রচারিত হউক, পরিচিত কৃষি-বার্ত্তার দৃষ্টান্তে প্রচারিত হউক। দেশের আপামর সাধারণে প্রচারিত হউক; পুস্তক দ্বারা হউক, কথা দ্বারা হউক। কিন্তু দেখিবেন যেন পুস্তক ও কথা দ্বারা পাঠক ও শ্রোতার মনে বিজ্ঞানের প্রতি আদর জন্মে। তাহাদের জ্ঞাত বিষয় লইয়া বিজ্ঞান প্রচার করিবেন; কেননা তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। উহ উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু তদ্‌দ্বারা অজ্ঞতা ঢাকিতে চেষ্টা করিবেন না। পাঠক ও শ্রোতা হাজার বিষয়ে অজ্ঞ হউন, তাঁহারা মানুষ, বুদ্ধিশালী মানুষ, এ কথা কদাপি ভুলিবেন না।

কিন্তু বিজ্ঞান প্রচারের কথা উঠিলেই ইহার ভাষা পরিভাষার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। গত বৎসর রামেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে বলিয়াছেন। আমারও মনে হয় আমরা পরিভাষা-সমস্যা যত কঠিন মনে করি, বস্তুতঃ তত নহে। এ বিষয়ে দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাকরণের শব্দের চারি প্রবৃত্তি বা অর্থ ধরিয়া শব্দসমূহ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জাতি শব্দ, গুণ শব্দ, দ্রব্য বা সংজ্ঞা শব্দ, এবং ক্রিয়া শব্দ।—এই চতুর্ব্বিধ শব্দের মধ্যে দ্রব্য শব্দ সম্বন্ধে সঙ্কট মনে হইয়াছে। কথাটা এই, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন বলিব, না অন্য নামে বলিব? এরূপ বিতর্ক উঠে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। গরুকে গরু বলিব, না অন্য কিছু বলিব, এই বিতর্ক যেমন, অক্সিজেনকে অক্সিজেন বলিব, না অম্লজান বলিব, সে বিতর্কও তেমন। নূতন দ্রব্য যাহার নিকট পাই, সে যে নাম বলে, সে নামেই তাহা পরিচিত হয়। সকল ভাষাতেই ইহা সাধারণ নিয়ম। ইয়ুরোপে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়; আমরা সে বিজ্ঞান ইংরেজীতে শিখিতেছি। সুধু বাঙ্গালী নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক শিখিতেছে। সকল প্রদেশের সহিত মিলিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত সংজ্ঞা শব্দ নির্ণয় করিতে পারিলে অন্ততঃ কিছু সুবিধা হইত। কোন্ প্রদেশে অক্সিজেনকে কি বলা হইতেছে তাহা জানা নাই। মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষে কেবল সংস্কৃতমূলক ভাষা নহে, মুসলমানী ভাষা ও দ্রবিড় ভাষা চলিত আছে। যদি বিভিন্ন প্রদেশে অক্সিজেনের বিভিন্ন নাম হয়, তাহা হইলে এক ইংরেজী নাম স্থানে পঁচিশ নাম আসিয়া জুটিবে। যদি অধিকাংশ প্রদেশে অক্সিজেন কিংবা ইহার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত নাম চলে, তাহাতে আমাদের সকলের সুবিধা। প্রদেশভেদে বিভিন্ন নাম না হইলে মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইংরেজী পড়িতে গেলে নূতন নাম শিখিতে হয় না। ইয়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নাম কিন্তু এক রহিয়াছে। যে নাম পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, সে নাম আছে, বৈজ্ঞানিক নামও আছে।

একটা কথা এই, কোন কোন ইংরেজী নাম আমাদের মুখে সহজে উচ্চারিত হয় না, আমাদের কানে ভাল শোনায় না। বড় বড় শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, ইংরেজী শব্দ, আরবী ফারসী শব্দ বাঙ্গলাতে কিছু কিছু বিকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিকারের সূত্র জানা আছে। সেই সূত্র ধরিয়া ইংরেজী নাম শব্দের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বাঙ্গলা ভাষায় স্বচ্ছন্দে মিশিয়া যাইবে।

দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিভাষণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—প্রথমেই তিনি দর্শন শব্দের নিরুক্ত নির্ণয়ের চেষ্টা পাইয়াছেন। মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" পনেরোটি দর্শনের পরিচয় দিয়া গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন, শাঙ্কর দর্শন সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি। মাধবাচার্য্য যে এস্থলে পারিভাষিক অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিলেন, হীরেন্দ্রবাবু প্রাচীন শাস্ত্রাদির মধ্যে তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়াছেন। আর্য্যজাতির আদিম গ্রন্থ বেদবেদাদির আলোচনা করিয়া তিনি

দেখাইয়াছেন, সেখানে 'দর্শন' শব্দের কোন পারিভাষিক অর্থ নাই—তথায় 'দর্শন' শব্দের অর্থ 'সম্যক দর্শন' মাত্র। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষদেও এরূপ পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ নাই। সূত্রাকারে ষেষড়দর্শন প্রচলিত আছে, তাহাতেও পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ নাই —ব্রহ্মসূত্রে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ আছে কিন্তু তাহাও Philosophy অর্থে নহে।



শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন

মাধবাচার্য্য যখন 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' রচনা করেন, তখন 'দর্শন' শব্দ নিষ্কপটে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহেও (যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত) 'দর্শন' শব্দের Philosophy অর্থ বিস্পষ্ট। এই সংগ্রহ-গ্রন্থ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিরচিত কিনা, সে বিষয়ে সংশয় থাকিলেও শঙ্করাচার্য্যের সময়ে 'দর্শন' শব্দ যে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইত, ইহা নিঃসংশয়। কারণ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তকে ঔপনিষদ দর্শন বলিয়াছেন।

২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কৌটিল্যের সময়েও 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কৌটিল্য মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন; অথচ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দর্শন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। হীরেন্দ্রবাবু বলেন, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ করা দুরূহ; সেইজন্য 'দর্শন' শব্দের এই প্রয়োগ সত্ত্বেও কোনরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত নির্দ্ধারণ করা যায় না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে উপসন্ন শিষ্যকে নির্জ্জনে গুরু যে রহস্য উপদেশ

দিতেন, তাহাকে প্রাচীনেরা উপনিষদ বলিতেন। ঐ সকল রহস্য উপদেশ (গুহ্যা আদেশাঃ) সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে রক্ষিত হইত। ইহাদিগের সাধারণ নাম ছিল, উপনিষদ। 'উপনিষদ' শব্দের এই নিরুক্তে সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত অসমাচ্ছন্ন; সে অন্ধকারে পথ নির্ণয় করিতে হইলে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়।

প্রাচীনেরা সত্যের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন। সত্যের সার্ব্বভৌম ভাবের যে অংশ যে ঋষি অনুভূতি করিয়াছেন, সত্যের সর্ব্বতোমুখ স্বরূপের যে মুখ যাঁহার মানস দৃষ্টির গোচর হইয়াছে, তাহাই তাঁহার 'দর্শন'। সত্য একরূপ। জ্ঞান বিজ্ঞানের উপরিতন যে প্রজ্ঞান, সত্য সেই প্রজ্ঞানলব্ধ। বাদী বিবাদী দর্শনসমূহ সেই সত্যকে অনেকরূপে দর্শন করে। কিন্তু দর্শন অনেক হইলেও যাহা দৃশ্য, যাহা সত্য, তাহা একই। তাহাই যদি হয় তবে দার্শনিকগণের এত বাদ-বিসম্বাদ কেন? সত্য সর্ব্বতোমুখ; সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখা যায়। সকল বাদীরই একথা স্মরণ রাখা উচিত। এক্ষেত্রে যিনি স্বমতকে প্রবদন করেন, যিনি নান্যদস্তি-বাদী—তিনি নিশ্চয়ই অবিপশ্চিৎ।

এই বিরোধী মতবাদের সমন্বয়সাধনের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ, ভগবদ্গীতা। গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্য চারিটি বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। সেই মার্গ চতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। গীতা ঐ সকল বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। এই সমন্বয়বাদ গীতার নিজস্ব। গীতা দেখাইয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল কর্ম্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ধ্যান, কেবল ভক্তি যথেষ্ট নহে। জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত করিতে হইলে, এ মার্গ-চতুষ্টয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা আত্মার আংশিক, ঐকদেশিক বিকাশমাত্র হইবে।

কেবল সাধনাসম্বন্ধে নহে, দার্শনিক বাদ বিবাদসম্বন্ধেও গীতাতে এই সমন্বয়ের ভাব অত্যুজ্জ্বল। তাহার ফলে সাংখ্য ও বেদান্ত, দ্বৈত ও অদ্বৈত, বিবর্ত্ত ও পরিণাম—সত্য দৃষ্টির মিলন ভূমিতে সমন্বিত হইয়া গীতারূপ কল্পবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

তাহার পর হীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, তত্ত্বদর্শনের কারণ বুদ্ধি নহে—বোধি। মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা তর্কবিচার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বোধি ভিন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না। উপনিষদ যাহাকে 'গুহা,' 'হৃদয়,' 'দহর' আখ্যা দিয়াছেন, তাহাই 'বোধি'। পাশ্চাত্য দর্শন ইহাকে বলিয়াছেন, "Gemuth"—"It is the core of personality. There God and man initially meet," বুদ্ধির কোলাহল নিবৃত্ত না হইলে বোধির বাণী শ্রুতিগোচর হয় না।

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতির জীবনে দুইটি যুগ পর্য্যায়ক্রমে ক্রীড়া করে; এক বোধির যুগ, অপর বুদ্ধির যুগ। বোধির যুগে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, এবং বুদ্ধির যুগে তত্ত্বের বিচার হয়, সত্যের বিতণ্ডা হয়। বোধির যুগ ঋষির যুগ, বুদ্ধির যুগ ভাষ্যকারের যুগ। ভারতবর্ষে

বোধির যুগ ঋষিদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলে তর্কযুগের আরম্ভ হইয়াছিল, সে যুগের এখনও অবসান হয় নাই। ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, নিবন্ধ, অনুবন্ধ ইত্যাদি এই যুগের কীর্ত্তি। বিতণ্ডার কিন্তু শেষ নাই। বিতণ্ডা ছাড়িয়া আমাদিগকে সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। অভেদে ভেদ না দেখিয়া ভেদে অভেদ দেখিতে হইবে।

এদেশের দার্শনিক সমাজে জীবের স্বরূপ লইয়া যথেষ্ট বাদ বিবাদ আছে। জীব কি অণু না বিভু? জীব কি ব্রহ্মের অংশ না ছায়া? জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? ইহা দর্শনের এক মূল সমস্যা। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। বাদ বিবাদ বিচিত্র নহে। কিন্তু সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখিলে ইহার সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব নহে। গীতার মতে পুরুষ তিন:—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষ=পরমাত্মা। অক্ষর পুরুষ=অধ্যাত্মা এবং ক্ষর পুরুষ=জীবাত্মা। উত্তম পুরুষকে শাস্ত্রে চিদাকাশ বলে; অক্ষর পুরুষ=চিন্মাত্র, যাহাকে কূটস্থ বলে; এবং ক্ষর পুরুষ=চিদাভাস। চিদাকাশ সিন্ধু, চিন্মাত্র যেন বিন্দু। এই ভাবে জীব ব্রহ্মের অংশ।

ইহার পর হীরেন্দ্রবাবু দর্শনালোচনার প্রকার ও প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বঙ্গদেশে সম্প্রতি যেভাবে দর্শনালোচনা হইতেছে তাহা সন্তোষজনক নহে। একপক্ষে প্রাচ্যদর্শনের আলোচনা মন্দীভূত, অপর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্যদর্শনের আলোচনাও আশানুরূপ হইতেছে না। এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদের একটি প্রধান কার্য্য দার্শনিক পরিভাষা-সংকলন। বাংলা ভাষায় দর্শনের পঠনপাঠন এবং রীতিমত দর্শনচর্চ্চা দেশ মধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেই সকল শব্দের মধ্যে যাহা যোগ্যতম, তাহাই টিঁকিয়া যাইবে। এই সঙ্গে আমাদিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শনসাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী সংকলন করিতে হইবে।

পরিভাষা রচনা ও শব্দসূচী সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামীয় দর্শনশাস্ত্রেরও অনুবাদ প্রয়োজন। পাশ্চাত্য ভাষায় যেমন নানা প্রকারের Philosophical Series প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বঙ্গভাষাতেও সেইরূপ চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রধান প্রধান দার্শনিকের দার্শনিক মতের পরিচায়ক নিবন্ধ এবং দার্শনিক মতবাদের ইতিহাস বঙ্গভাষায় রচনা করিবার ব্যবস্থা হৌক। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় Logic Ethics ও Psychology-র সার সঙ্কলন ও সমন্বয় করিয়া এক একখানি উৎকৃষ্ট তর্কবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবিজ্ঞান রচনা করিবার উদ্যোগ করা হৌক।

সম্প্রতি বঙ্গদেশে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন মৌলিক অনুসন্ধানসমিতি গঠিত হইয়াছে, দর্শন ক্ষেত্রেও তেমনই সমিতি গঠিত হৌক্। ভারতীয় দর্শনের বিবিধ

তবাদের আদি গ্রন্থের অনুসন্ধান চলুক। সূত্র, ভাষ্য প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া অনুসন্ধান হৌক! বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন এই সকল গুরুতর অথচ অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন। এ সম্মিলন উৎসবক্ষেত্র নহে, কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মের সফলতায় মণ্ডিত করিয়া সম্মিলনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

***

সেই একই সময়ে, ইংরাজ সরকার ওদিকে সংস্কৃত ফারসী ও আরবী ভাষায়, এদিকে ইংরাজি ভাষায়, পরিশেষে হিন্দী বাঙ্গালা তামুল প্রভৃতি লোক প্রচলিত ভাষায় শিক্ষাবিস্তার করিতে লাগিলেন; মুসলমান ও হিন্দু এবং নীচবর্ণের সকল লোকই সকল রূপের শিক্ষাই লাভ করিতে লাগিল। এই রূপে, লোকপ্রিয় লেখকেরা, বৈষ্ণব সংস্কারকেরা এবং মুসলমান অধিপতিরা যে বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইংরাজ সেই বিপ্লব সম্পূর্ণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, ব্রাহ্মণ শিক্ষালাভ করিত ও ব্রাহ্মণেতর লোকদিগের শিক্ষালাভের অধিকার পর্য্যন্ত ছিল না। এক্ষণে এই বৈষম্যের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

অবশ্য, এই শিক্ষার সংস্কারসাধন বহু বৎসর সাপেক্ষ। কেবলমাত্র ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি, এই শিক্ষাদানের কতকগুলি মূলসূত্র নির্দ্ধারিত হয়:—গৌণশিক্ষা ইংরাজি ভাষায় দেওয়া হইবে, মুখ্যশিক্ষা লৌকিক ভাষায় দেওয়া হইবে। অবশ্য, কৃষিজীবীদিগের অধিকাংশই এখনও অনক্ষর এবং লোকসংখ্যার মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা দশভাগের নয়-ভাগ। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী যুবকেরা এই শিক্ষার সুযোগ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল। ইংরাজি শিখিবার জন্য তাহারা যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ১৮৩৮ অব্দে Sir Charles Trevelyan লিখিয়াছিলেন যে, "পুস্তকের কাঙ্গাল বালকগণ, গঙ্গার নৌকাগুলাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।" ১৮৫৪ অব্দে স্কুলগ্রন্থ-সমিতি কর্ত্তৃক ৩১,৫০০ ইংরাজি গ্রন্থ এবং ৫২ খানা মাত্র আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থ বিক্রীত হয়। (১)

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন, ইংরাজি মুদ্রাযন্ত্রের ও দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করিল। বঙ্গদেশে, কতকগুলি সাময়িক পত্রের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি হইল; যথা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "সংবাদ প্রভাকর" ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা।"

এই শিক্ষার আন্দোলন হইতে কতকগুলি গুরুতর ফল প্রসূত হইল। ধর্ম্ম-বিভাগে, রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদ প্রচার

(১) ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজকর্ম্মে ফার্সিভাষার ব্যবহার রহিত হয়। আদালতে দেশের চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইত।

করিলেন, হিন্দুদিগের অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাষ্ট্রনীতি বিভাগে অনেকগুলি হিন্দু উদার প্রতিষ্ঠানাদির দাবী করিল; এবং আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কতকগুলি যুবক জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিল, য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিল, গোমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল, এবং স্ত্রীলোকদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল (কিন্তু উহারা এই প্রতিজ্ঞা খুব কমই পালন করিল!)

১৮৪০—১৮৫০ পর্য্যন্ত, যে কেহ একটু লেখাপড়া জানিত, সেই যাহা কিছু ইংরাজি তাহাই ভাল বলিত। মধুসূদন, যিনি কিয়ৎকাল পরে বাঙ্গলার একজন বড় কবি হইয়াছিলেন —তিনি এই ইংরাজি পদ্যটি রচনা করেন:—

"I sigh for Albion's distant shore
Its valleys green, its mountains high;
Though friends, relations I have none.
In that far clime! yet oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave.
For glory or a nameless grave."

দূর-শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস,
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ
নাহি সেথা আত্মজন, তবু, লজ্যি' অপার জলধি
সাধ যায় লভিবারে যশ কিম্বা অ-নামা সমাধি॥

***

যে দিগ্‌বিজয়ে সাময়িক অভিযান ও রাষ্ট্র-নৈতিক বন্দোবস্ত হয় আরম্ভ এবং শিক্ষার পরিপুষ্টি, মুদ্রাযন্ত্র ও গ্রন্থাদির উন্নতি সাধিত হয়, সেই বিজয়কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য ইংরাজেরা বুঝিলেন, বড়বড় সরকারী-পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। বহুব্যয় সাপেক্ষ পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ঋণগ্রস্ত হইবার ভয়ে কোম্পানী বহুকাল পর্য্যন্ত উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ভ্রমণের জন্য ভারতে ভাল রাস্তা ছিল না। বর্ষাকালে কেহ ভ্রমণে বাহির হইত না। গ্রীষ্মকালে লোকেরা মাঠ দিয়া চলিত; কখন গরুরগাড়ীতে কখন পাল্কীতে, কখন অশ্বপৃষ্ঠে, উষ্ট্রপৃষ্ঠে বা হস্তিপৃষ্ঠে যাতায়াত করিত। পক্ষান্তরে, Lord Dalhousie কতকগুলি রাস্তা নির্ম্মাণ করাইলেন, লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইলেন, বৈদ্যুতিক তারের পথ প্রস্তুত করাইলেন, গ্রীষ্মের প্রখরতাপে দগ্ধ বিস্তৃত ভূখণ্ডসমূহ যাহাতে কৃষিকর্ম্মের জন্য কর্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য খাল কাটাইলেন।

এই তৃতীয়যুগে ইংলণ্ড এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই যুগে ইংলণ্ড সমস্ত ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বাহুবলের প্রাধান্য। ভারতের সমস্ত খণ্ড-রাজ্য বিজিত হইল। দ্বিতীয়তঃ শাসন কার্য্যের প্রাধান্য। কোম্পানীর অধীনস্থ সমস্ত রাজ্যে য়ুরোপীয় শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ভারতীয় রাজারাও এই শাসন-প্রণালীর কতকগুলি মূলসূত্র গ্রহণ করিল। তৃতীয়তঃ নৈতিক প্রভাবের প্রাধান্য। শিক্ষার বিস্তার হইল, মুদ্রাযন্ত্র ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইল; শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরাজিতে কথা কহা, ইংরাজি লেখা, ইংরাজি আচার-ব্যবহার ও ইংরাজি মতামত গ্রহণ করা, সম্মানের বিষয় মনে করিতে লাগিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা, ২২ স্কুবিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



অশোকের রাণী ও তাঁহার সতিন বোধিদ্রুম
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

এই ছবির মালিক—শ্রীশ্রীমতী ভারত-সম্রাজ্ঞী মেরী।

Color Blocks & Printings By

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ [২য় সংখ্যা

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় যুগ

১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ

এই সমস্ত অনুষ্ঠান যতই চটকদার হউক না,—একটু যেন বেশী তাড়াতাড়ি, একটু যেন হঠাৎ আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই সমস্ত অনুষ্ঠান, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একটা মারাত্মক সংঘর্ষ আনিয়া উপস্থিত করিল। ভৌতিক ও নৈতিক বাধাসমূহ, এসিয়ার ক্রমবিকাশের গতিরোধ করায়, য়ুরোপ এই সমস্ত বাধা সত্বর অপসারিত করা আবশ্যক মনে করিল। তাছাড়া, ভারতবাসীরা স্বদেশের আবহাওয়া, ভূমি, আচার ব্যবহারের ইতিহাস, বিশেষ-বিশেষ প্রীতি ও ভক্তির জিনিষ—এই সমস্তের প্রতি দৃঢ়রূপে আসক্ত ছিল। য়ুরোপীয় সভ্যতা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে হইলেও, কত মতবিশ্বাস, কত আচার ব্যবহার উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে?

যে সকল সাক্ষাৎ কারণে এই সংঘর্ষ সত্বর উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নৈতিক কারণ, রাষ্ট্রিক কারণ ও আর্থিক কারণ—এই তিন ভেদের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

১

নৈতিক কারণ।—য়ুরোপের প্রভাবে ভারত-সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের উদারপন্থীদিগের সমাজসংস্কার, কতকগুলি হিন্দু সাদরে গ্রহণ করায়, এই সকল সংস্কার-কার্য্য এই বিক্ষোভকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। শিক্ষার প্রসার, বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্ম, য়ুরোপের সহিত বাণিজ্যবিস্তার—ইহাই গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত কার্য্যতালিকা ছিল। কোন কোন প্রদেশে, বিশেষত বঙ্গদেশে, শিক্ষিত যুবকেরা এই কার্য্যতালিকা উৎসাহের সহিত সাদরে গ্রহণ করিল।

উহারা পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিল, রেলগাড়ী ও বাষ্প-জাহাজ ব্যবহার

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

করিতে লাগিল, ইংরাজী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে লাগিল, য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় আহার করিতে লাগিল, য়ুরোপীয় পোষাক পরিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টের কাজ, ব্যাঙ্কের কাজ, বণিক কোম্পানীদিগের কাজ পাইবার জন্য আপনাদিগের মধ্যে রিষারিষি হইতে লাগিল। য়ুরোপে, এইরূপ আচরণ এত সাধারণ যে উহা উল্লেখযোগ্যই নহে। কিন্তু ভারতে এইরূপ প্রত্যেক কার্য্য, বিপ্লবের নিদর্শন বলিয়া উপলব্ধি হয়। গৃহের বন্ধন ছিন্ন হইল :—পৈত্রিক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুত্র দূরদেশে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। আর সে, বংশানুক্রমিক পরিচ্ছদ ধারণ করিল না, এমন জিনিস আহার করিতে লাগিল যাহা তাহার পিতা কখন স্পর্শ করিত না, এমন কাজ করিতে লাগিল যাহা তাহার পিতা কখন করিত না, এমন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, যাহা চিন্তা করাও তাহার পিতা, পাপ বলিয়া মনে করিত। জাত ভাঙ্গিয়া গেল :—যে বদ্ধ সমাজের মধ্যে কোন নূতন জিনিসের স্থান ছিল না, সেই সমাজে নূতন নূতন কাজ-কর্ম্ম, নূতন নূতন ব্যবসায় প্রবেশ করিল। গবর্ণমেণ্টের কাজে হাউসওয়ালাদের কাজে, সকল জাতের লোক আসিয়া একত্র মিলিত হইল; রেলগাড়িতে, বাষ্প-জাহাজে পরস্পরের সহিত মেশামিশি হইতে লাগিল। নীচু জাতের লোকেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত একই শিক্ষা পাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে লাগিল, পরীক্ষায় ব্রাহ্মণদিগকে ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তাহার পর গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হাকিম হইয়া ব্রাহ্মণকে হুকুম করিতে লাগিল। ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা হইল। নানাপ্রকারে এই আশঙ্কার উদ্রেক হইল। পারিবারিক বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘিত হইল। জাতিভেদের নিয়ম লঙ্ঘিত হইল। এই সকল বিধিব্যবস্থা ও নিয়ম অতীব পবিত্র বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। কেহ কেহ নিষিদ্ধ জিনিস আহার করিয়া তাহার উচ্ছিষ্ট নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের গৃহে নিক্ষেপ করিত। আবার কেহ কেহ, এরূপ য়ুরোপীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিত, যাহা অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত উপাদানে অপরিচিত লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। আবার সাক্ষাৎভাবেও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা ছিল। গভর্ণমেণ্ট, ইংরেজ-সমাজ, এবং রামমোহন রায়ের ন্যায় নব্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্থাপকগণ, য়ুরোপীয় মিশনারিদিগের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্ট আরও কিছু বেশী করিলেন। গবর্ণমেণ্ট লোকপ্রচলিত কতকগুলি প্রথা উঠাইয়া দিলেন। সতীদাহ উঠাইয়া দিলেন, স্বধর্ম্মোপদিষ্ট আত্মহত্যা ও ধর্ম্মোন্মত্ত সন্ন্যাসী-দিগের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত রহিত করিলেন। Lord Palmerston কোন এক বক্তৃতায় এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"মানবিক বিজ্ঞান অপেক্ষা আরও এক মহত্তর ও উন্নততর জিনিস দান করিয়া অসংখ্য ভারতবাসীদিগের হিতসাধন করা বোধ হয় আমাদেরি কার্য্য; কিন্তু এ কাজ কেবল কালের সাহায্যে এবং লোকের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংসাধিত হইবে।" সংবাদপত্র সমূহ আর একটু অসংযতভাবে এই মতই সমর্থন করিতে লাগিল। ইহা হইতেই মুসলমান ও হিন্দুদিগের ধারণা হইল যে, ইংরাজ বলপূর্ব্বক উহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সংকল্প করিয়াছে। উহাদের উৎকট কল্পনা ইংরাজের ষড়যন্ত্রের একটা চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত করিল :—সরকারী কাজকর্ম্ম, য়ুরোপীয়দিগের চাকরী, রেলগাড়ী, বাষ্প-জাহাজ, অস্পৃশ্য উপাদানে প্রস্তুত য়ুরোপীয় দ্রব্যসামগ্রী—এ সমস্তই সরলমতি নিরক্ষর ভারতবাসীদের জন্য যেন ফাঁদ পাতা হইয়াছে; যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মনাশ হয়, জাত যায়, তাহারি এই সমস্ত আয়োজন হইয়াছে।

***

রাষ্ট্রিক কারণ।—পাঁচ বৎসরের মধ্যে Lord Dalhousie ১৫ লক্ষ Kilometre square ভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সিন্ধু পঞ্জাব অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইলে, লোকের আশঙ্কা হইল বুঝি ইংলণ্ড সমস্ত ভারতকে গ্রাস করিবে। এবং ব্রহ্মদেশ ও পেশোয়ারবিজয়ে এবং আফ্‌গানিস্থানে হস্তক্ষেপ করায় লোকেরা ভাবিতে লাগিল, ইংলণ্ড এমন একটা বৃহৎ এসিয়িক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, যাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারত স্বকীয় শাসন-স্বাতন্ত্র্য হারাইবে।

এই চিত্তচাঞ্চল্য প্রথমে রাজাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইল। মোগলসম্রাটের অবস্থা অনির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মারাঠা-দিগের উৎপীড়ন অত্যাচার হইতে সম্রাটকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, ইংরাজেরা দিল্লি অধিকার করিয়াছিল। ইংরাজেরা সম্রাটের নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল, সম্রাটের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া নিজের মুদ্রা বাহির করিতে লাগিল। আরও কিছুকাল পরে, কোম্পানীর রাষ্ট্রনীতি বদলাইয়া গেল; কোম্পানী স্বয়ং ভারতের অধিপতি এইরূপ ঘোষণা করিলেন; উহাদের মুদ্রার উপর ইংলণ্ডেশ্বরের ছবি মুদ্রিত হইল। তথাপি, তৈমুরের বংশধর তখনও স্বকীয় উপাধি, স্বকীয় অবসরবৃত্তি, স্বকীয় প্রাসাদ বজায় রাখিয়াছিলেন। তখনও তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদত্ত হইত। Lord Dalhousie চাহিয়াছিলেন, মোগল সম্রাটকে দিল্লি হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহার উত্তরা-ধিকারীকে সম্রাট উপাধি আর না দেওয়া হয়। একটা কিছু নিশ্চিত স্থির করিতে না পারিয়া ডিরেক্টরগণ, সম্রাট বাহাদুর-শার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না, তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী স্বীকার করিলেন; কিন্তু মোগল-সম্রাট্ যাহাকে উত্তরাধিকারী করিতে চাহিলেন, তাহাকে তাঁহারা উত্তরা-ধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। উত্তরাধিকার পাইবা মাত্র ঐ উত্তরাধিকারীকে দিল্লি ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এইরূপ আদেশ হইল। কোম্পানীর এই আচরণ, মোগলসম্রাটকে শত্রু করিয়া তুলিল, অথচ মোগল সম্রাটের প্রভাব অক্ষত রহিল।

পেশোয়ার উত্তরাধিকারী নানা-সাহেবের সহিত ব্যবহারেও কোম্পানী একই প্রকার অ-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।(১) নানা

(১) নানা সাহেব নামে খ্যাত, ধুন্দুপন্থ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বাজিরাও (১৭৯৫-১৮১৮ তাঁহাকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ অব্দে বাজিরাওর মৃত্যু হয়।

সাহেব স্বকীয় পদ ও অবসর-বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকার বজায় রহিল। কানপুর ও লক্ষ্ণৌ-এর মধ্যে অবস্থিত তাঁহার বিথুর-রাজ্যে তিনি রাজার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দুইটি বড় বড় ভারতীয় উপাধি, সম্মানের উপাধি ছিল। কিন্তু ছোট, বড় এরূপ ৬০০ রাজা ছিল যাহারা ১৫ লক্ষ Kelometre square ভূমির অধিকারী। লর্ড ড্যালহৌসি দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার রহিত করায়, ঐ আইনে এই সকল রাজা ভীত হইয়া পড়িল। ঔরসপুত্রের অভাবে তাহাদের রাজ্য কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিবেন, এই আশঙ্কা হইল।

লর্ড ড্যালহৌসির রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে শুধু যে রাজারাই প্রতিবাদ করিল তাহা নহে, রাজাদিগের প্রজাবর্গও স্বরাজশাসন বজায় রাখিবার জন্য ইচ্ছুক ছিল। অযোধ্যার নবাব মুসলমান হইলেও, নবাবের স্বেচ্ছাচারিতা দুঃসহ হইলেও, নবাব সিংহাসনচ্যুত হওয়ায়, অযোধ্যাবাসী হিন্দুরা দুঃখিত হইয়াছিল।

তাছাড়া, কোম্পানীর শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ অভিযোগ ছিল। প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মুসলমানদিগের কষ্ট হইয়াছিল। মুসলমানেরা ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে,—বিশেষতঃ হিন্দুকর্ম্মচারীদিগকে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। আবার নিজেও শিক্ষালাভ করিবে না, সরকারী কাজকর্ম্মে প্রবেশ করিবে না, নূতন সভ্যতার সহিত বনিয়া চলিবে না। কোন প্রকার রাজবিদ্রোহ বাধিয়া উঠিলে, অথবা পারস্যের দ্বারা ভারত আক্রমণ হইলে তাহাদের হৃত আধিপত্য আবার তাহারা ফিরিয়া পাইবে,—ইহাই তাহাদের একমাত্র আশা ছিল।

পক্ষান্তরে, শিক্ষিত হিন্দুরা—বিশেষত শিক্ষিত বাঙ্গালী ও শিক্ষিত তামুলরা, সরকারী কাজকর্ম্ম পাইবার জন্য লালায়িত হইল। কিন্তু এই সকল কাজ যৎসামান্য, উহাতে যেরূপ খাটুনী তদনুরূপ লভ্য নাই। তাই তাহারা দাবী করিল যে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আইনের পাণ্ডুলিপি পূরাপূরি কার্য্যে পরিণত করা হয়; শাসন বিভাগের সকল পদের জন্য, এমন কি উচ্চতম পদের জন্যও যেন ভারতবাসীরা ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার লাভ করে।

ইংরাজের ভারত-অধিকারে এক শ্রেণীর লোক বিশেষরূপে কষ্ট অনুভব করিয়াছিল। তাহারা সামন্ততন্ত্রাধীন অভিজাতবর্গ—সেই সব আমীর, সেই সব মনসব্‌দার, সেই সব হিন্দু ও মুসলমান জমিদার যাহারা নিজ অধিকারে, রাজার ন্যায় প্রজাশাসন করিত এবং নিজ গিরি-দুর্গ সকলকে অবরোধ-সহ করিয়া রাখিত। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী অনেক সময় ভূস্বামিত্ব হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিত। Lord Cornwallis বঙ্গদেশের জমিদারদিগকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়া একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন,—ইহা কোম্পানী বুঝিতে পারায়, ভূমির স্বামীত্ব স্বয়ং চাষীদিগকে অর্পণ করিবার জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের একটা ঝোঁক হইল।

কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মনসব্‌দারের অবস্থা, বাঙ্গালী জমিদারের অবস্থা হইতে অনেকটা তফাৎ। মনসব্‌দারের ভূস্বামিত্ব রহিত করা একটা বিপ্লবের সামিল। উহাদের ভূস্বামিত্ব রহিত করা আর ভূমি বাজেয়াপ্ত করা—উহা একই কথা। যে প্রদেশ সম্প্রতি বিজিত হইয়াছিল সেই অযোধ্যায়, একটা অতীব গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। এই রাজ্যের সামন্ততন্ত্র অক্ষত ছিল। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা সকল অবস্থাতেই, তালুকদারদিগের বিরুদ্ধে রায়ৎদিগের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। তালুকদারদিগের বিশেষাধিকার হইতে, এমন কি কখন কখন তাহাদিগের সম্পত্তি হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করা হইতে লাগিল।

তা ছাড়া, ভারতে নিযুক্ত সমস্ত ইংরেজ-কর্ম্মচারীই, কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রবণতা ও টোরিদিগের পুরাতন মনোভাবটা বজায় রাখিয়াছিল। কেবল ইংরাজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ২৫ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করিতে হইবে—ইহাই টোরিদিগের মূলমন্ত্র ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখনও উদারনীতির পক্ষপাতী ছিল। অনেক সময় গভর্ণর জেনেরাল ও কতকগুলি উচ্চপদের রাজপুরুষ উদারমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু শাসনকার্য্যে, ধর্ম্ম ও জাতিগত অন্ধসংস্কারের ন্যায় চিরাগত পুরাতন প্রথাই কার্য্যতঃ বলবৎ থাকিত।

*
* *

আর্থিক কারণ।—অষ্টাদশ শতাব্দীতে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বিশেষবিশেষ ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কিন্তু ভারতীয় শ্রমশিল্পের যে অভ্যুদয় হইয়াছিল সে কৃত্রিম অভ্যুদয়। দৈন্যগ্রস্ত জনসাধারণ আপনআপন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিজেই প্রস্তুত করিত। অভিজাতবর্গ একমাত্র খরিদ্দার হওয়ায় কারিগরেরা অভিজাতবর্গের ভৃত্য—তাহার পর গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল মনসব্‌দারেরা ও বড় বড় দোকানদার মাল রপ্তানি করিয়া লাভ করিত। কার্পাস বস্ত্র ছাড়া ভারতীয় আর সমস্ত দ্রব্যজাত বিলাস-সামগ্রী ছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল সে অরাজকতার সময়, ভারতীয় শ্রমশিল্পের ধ্বংস আরম্ভ হয়, এবং ইংরেজের প্রতিযোগিতা সেই ধ্বংসকার্য্যটাকে সম্পূর্ণ করিল। শুল্কস্থাপনের অধিকার সত্ত্বেও অসমানরূপে পরিপুষ্ট এই দুই দেশের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া যুঝাযুঝি চলিতে পারিল না। একদিকে, ইংলণ্ড অতীব স্বাধীন জাতি, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ও যন্ত্রাদির দ্বারা সুসম্পন্ন। অন্য দিকে, মোগলের কর-ভারে ও মনসব্‌দারদিগের অতিরিক্ত অর্থশোষনের ফলে দৈন্যদশাগ্রস্ত ভারত;—সেই ভারত, যেখানে শ্রমজীবিরা জাতিভেদের বন্ধনে আবদ্ধ;—ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করা, এমন কি স্বকীয় ব্যবসায়ের যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাও যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় শ্রমশিল্প অন্তর্হিত হইল। নগরের লোকেরা কৃষিকর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এবং পল্লীগ্রাম

লোকাকীর্ণ হওয়ায় করিগরেরা অগত্যা নিকৃষ্ট ভূমিতে চাষ আরম্ভ করিল।

কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, কোম্পানী উহাদের দুর্দ্দশার লাঘব করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। "সমস্ত ভূমিই সরকারের"—এই নীতি বজায় রাখিয়াও কোম্পানী, বাস্তবপক্ষে কৃষকদিগকেই ভূমির স্বামিত্ব প্রদান করিলেন; কারণ কোম্পানী রাজস্ব ও ভূমি-কর এক সামিল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন কোন প্রদেশে কোম্পানী শুধু ষ্টেট্‌কে বঞ্চিত করিলেন না, স্বকীয় ন্যায্য অধিকার হইতে মনসব্‌দারদিগকেও বঞ্চিত করিলেন, অন্যায্য হইলেও জমিদারেরা যে সকল অধিকার বহুদিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছিল, কোম্পানী সেই সকল অধিকার হইতে জমিদারদিগকেও বঞ্চিত করিলেন। Bernier বর্ণনা করিয়াছেন, ঔরংজেবের আমলে, ভারতীয় কৃষকেরা গোলামের ন্যায় জমির সহিত অবদ্ধ থাকিত। কোন প্রকারে খাওয়াটা চলে, এই পরিমাণ ফসলের একটা অংশ, ভূস্বামী, কৃষককে ছাড়িয়া দিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই-অঞ্চলে, পঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন অংশে কৃষকই ভূমির, স্বগৃহের ও স্বকীয় গোমহিষাদির মালিক ছিল। কৃষক কোন কর দিত না, জমির খাজনা খুব কমই ছিল।

১৬ বৎসরের মধ্যে, ইংরাজেরা এমন এক আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব বাধাইলেন যাহাতে কৃষকের লাভ হইল কিন্তু জায়গীরদার অভিজাতবর্গের বিলক্ষণ ক্ষতি হইল। যে আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপানকে হঠাৎ রূপান্তরিত করে, ইহা কতকটা তাহারই অনুরূপ।

উভয় বিপ্লবই, প্রথমে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল, কিন্তু পরে,—মনে হয়, উহার দ্বারা উহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছিল। অজ্ঞ, অদূরদর্শী, জড়ভাবাপন্ন, প্রাচ্যদেশের কৃষক, আধুনিক রাষ্ট্রের নিয়মবদ্ধ কার্য্য-প্রণালীর সহিত কখনই বনিয়া চলিতে পারে না। ধনবৃদ্ধির হিসাব ধরিতে গেলে, এসিয়িক অধিপতিদিগের আদায়ের তুলনায়, এখনকার ভূমি-কর স্বল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে সেকালে রাজকর রেয়াৎ করা হইত, ছাড় দেওয়া হইত, এবং উহা ক্রমাগত অনিয়মিতরূপে নির্দ্ধারিত হইত। এখনকার রাজকর স্থিরনির্দ্দিষ্ট, একটা বিশেষ সময়ে পরিশোধ করিতে হয়, এবং কৃষকের যেরূপ অবস্থাই হউক, ফসলের মূল্য যাহাই হউক, এই রাজকর কৃষককে মুদ্রার আকারে দিতে হয়। অবশ্য প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইলে, তাহা হইতে কিয়দংশ কৃষকের সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতীয় কৃষকের মন নিতান্ত শিশুর ন্যায় লঘু। তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, খারাপ বৎসরে য়ুরোপীয় কৃষক যে সুখ ভোগ করে, ভারতীয় কৃষক খুব ভাল বৎসরেও সে সুখের মুখ দেখিতে পায় না! তাই সে দিন-মজুরের মত দিন আনে, দিন খায়; এবং হাজা-শুখা হইলে, খাজনা পরিশোধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া টাকা ধার করে। যে উত্তমর্ণ সৎপথাবলম্বী যে

নির্দ্দিষ্ট দিনে সুদের দাবী করে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসল টাকা ফিরিয়া চাহে; এই সমস্ত সর্ত্তের দায় এড়াইবার জন্য কৃষক, কুসীদজীবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কুসীদজীবী অতিরিক্ত পরিমাণ সুদ চাহে কিন্তু সুদের জন্য তাগিদ করে না। তাই কৃষক আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া, ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যায়। যেমন জাপানে, সেইরূপ আজকাল ভারতেও কুসীদজীবীরাই অধিকাংশ জমির স্বত্বাধিকারী। কেবল, মিতব্যয়িতা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টির শিক্ষা লাভ করিয়া এবং ঋণ-সমিতি ও সহযোগিতার সমিতিসমূহ স্থাপন করিয়াই, প্রাচ্যদেশের কৃষকেরা আধুনিক সভ্যতার উপকার লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তাহারা কেবল উহার কঠোরতারই পরিচয় পাইয়াছে।

১৮৫৭ অব্দে ভারতের কৃষক, রাজস্বের বাঁধাবাঁধি নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, কুসীদজীবী মহাজনের কবলে পতিত হইয়া, সে-কালের জন্য এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিল যে, তখন তাহার ততটা পরিশ্রম করিতে হইত না, ততটা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করিতে হইত না।

ভারত যে আর্থিক অশান্তি ভোগ করিতেছিল, এই সমস্তই তাহার কারণ।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সমস্ত য়ুরোপ যেরূপ নবসভ্যতার আবির্ভাবে দারুণ কষ্ট অনুভব করিয়াছিল, সেইরূপ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর, দিগ্‌বিজয়, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, সহসা অল্প কালের মধ্যেই টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে নির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতও দারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। এখন যেমন এই সকল ব্যাপারে চীনদেশে মধ্যে মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তখন ভারতে সেইরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল।

২

বিশেষত সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তখন কোম্পানী, একটি সামরিক শক্তিরূপেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। ড্যালহৌসির যুদ্ধ বিগ্রহে সিপাহীরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সেই সব যুদ্ধের গৌরব তাহারা আপনাদের উপরে আরোপ করিতে লাগিল। যাহারা পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটা সাম্রাজ্য জয় করিল, সেই সিপাহীদিগের মনোভাব পেশাদার সৈনিকের মনোভাব ছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যেমন একদিকে তাহারা দাবীদাওয়া করিতে লাগিল, আবার এই যুদ্ধজয়েই তাহারা ভীত হইয়া উঠিল। এই পেশাদার সৈন্য স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল; তাহাদের প্রতিও কি বিজিতের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে না? যে বঙ্গসৈন্যের অধিকাংশ লোক অযোধ্যা হইতে সংগৃহীত, অযোধ্যাকে ইংরেজ-অধিকার-ভুক্ত করা তাহাদের অভিমত ছিল না। সিপাহীরা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিকে বশীভূত করিবার জন্য ইংরেজকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু স্বজাতিকে বশীভূত করিবার জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের জাত, তাহাদের প্রথাদির উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা হইবে না কি? অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও রাজপুতই বঙ্গসৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সমস্ত কারণে তাহারা ভীত হইয়া

উঠিল। উহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠান হইল; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। উহাদিগকে নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী, যুদ্ধোপকরণ, ও আসবাবপত্র দেওয়া হইয়াছিল। একটু কিছু ভুল করিলেই, তাহাদের জাত যাইবার সম্ভাবনা; তাহা হইলে তাহারা ইহলোকে জাত্যন্তরিত হইবে এবং পরলোকেও নরকস্থ হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সৈন্যমণ্ডলী নূতন এক প্রকার বন্দুক প্রাপ্ত হইল। গরু ও শূকরের চর্ব্বি মাখানো এই বন্দুকের টোটাগুলা দমদমের কারখানা হইতে বাহির হয়। হিন্দুদিগের নিকট গরু আরাধ্য এবং মুসলমানদিগের নিকট শূকরের মাংস অস্পৃশ্য। সিপাহীরা এই ভুল বুঝিতে পারিল এবং প্রতিবাদ করিল। উহার বদলে অন্য টোটা দেওয়া হইল। কিন্তু সিপাহীদিগের মন হইতে সন্দেহ দূর হইল না; সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে উহারা বলিতে লাগিল, অস্পৃশ্য সামগ্রীর দ্বারা ঐ টোটার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে। নূতন বন্দুক উহাদের হাতে দিবার জন্য তখন উহাদের প্রতি কঠোর শাসন আবশ্যক হইল।

*
* *

এইরূপ ভুল বুঝা তখন অপরিহার্য্য ছিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দুই বিরুদ্ধ সমাজের মধ্যে কখনই মিলন ঘটান যাইতে পারে না। তাছাড়া সৈন্যমণ্ডলীর গঠন-প্রণালীর দোষে এই আন্দোলনটা বেশীদিন টিকিয়া ছিল।

দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা খুবই বেশী ছিল; ইংরেজ-সৈন্য ৪৫,৩২২; আর দেশীয় সৈন্য ২৩৩,০০০।

সৈন্যসংগ্রহের প্রণালীতেও একটু দোষ ছিল। সিপাহীরা সামরিক জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান—উহারা স্বকীয় পুত্রদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিবার জন্য দাবী করিত। ঐ সকল সামরিক জাতির বহির্ভূত কোন লোক, সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না; পাছে তাহারা সাদরে গৃহীত না হয়, ইহাই তাহাদের আশঙ্কা ছিল। স্বাধীনভাবে সৈন্য সংগ্রহের কাজটা যাহারা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সিপাহীরা কোম্পানীকে কোন প্রকারে রক্ষা করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল। কোম্পানীও তাহাদের মনে এই ভাবটি উদ্রেক করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন। এমন কোন বিশেষ অধিকার ছিল না যাহা কোম্পানী তাহাদিগকে প্রদান করেন নাই। এমন কোন অনুগ্রহ ছিল না যাহা তাহারা স্বকীয় ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইত না। ইংরেজ সৈন্যাধ্যকদিগেরও বিশ্বাস ছিল, সিপাহীরা তাহাদের একান্ত অনুরক্ত। তথাপি মৌখিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সিপাহীরা তাহাদের নেতাদিগকে আদৌ ভাল বাসিত না। জমাদার, হাবলদার প্রভৃতি দেশীয় সৈন্য-নায়কদিগকে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষেরা অবজ্ঞা করিত। যে সকল ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ দেশীয় ভাষা ভাল জানিতেন, তাঁহারা সৈনিকবৃত্তি ছাড়িয়া শাসনবিভাগের কোন পদ গ্রহণ করিয়া স্বকীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেন। লর্ড ডালহৌসি কর্ত্তৃক যে সকল প্রদেশ বিজিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি নূতন কর্ম্মচারী আবশ্যক হইয়াছিল।

*
* *

এইরূপে, অশান্তির যে সকল কারণ রাষ্ট্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, তৎসমস্তই পুনর্ব্বার সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশ পাইল। অনেকবার ভারতে সিপাহিবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। হয় ভারতীয় সৈন্যদলকে যথেচ্ছা করিতে দেওয়া, নয় ইংরেজ সৈন্যদলের দ্বারা উহাদিগকে একেবারে নিষ্পেষিত করা—এই দুয়ের মধ্যে একটা করা আবশ্যক হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, নিয়মশাসন ও বশ্যতার ভাব সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই সময়ে সৈন্যমণ্ডলী বিদ্রোহের পতাকা ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। (২)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) সিপাহী-বিদ্রোহের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—
ভেলোরে (মাদ্রাজের এক প্রদেশ) (১৮০৬)। ব্যারাকপুরে (লাট সাহেবের পল্লীনিবাস) (১৮২৪)। পঞ্জাব সৈন্যমণ্ডলীর দুই রেজিমেণ্টে (১৮৪৯)। যে দুর্গ, অমৃতসরকে দমনে রাখে সেই গোবিন্দগড়ে (১৮৫০)। এক রেজিমেণ্ট ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিতে অস্বীকার করে (১৮৫২)। ইত্যাদি।

নালক

৬

আবার সেই বর্দ্ধনের বন, সেই বট গাছের তলা! গাছের নীচে দেবল ঋষি আর সন্ন্যাসীর দল আগুনের চারিদিকে ঘিরে বসেছেন, আগুনের তেজে সন্ন্যাসীদের হাতের ত্রিশূল ঝক্-ঝক্ করছে! নিবিড় বন। চারিদিকে কাজল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা গোছা অশথ-পাতায়, মোটা মোটা গাছের শিকড়ে আর সন্ন্যাসীদের জটায়, তপ্ত সোনার মত রাঙা আলো ঝিক্ ঝিক্ করছে—যেন বাদলের বিদ্যুৎ!

এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে। মাথার উপরে নীলাম্বরী আকাশ, বনের তলায় স্থির অন্ধকার। কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কারো মুখে কোনো কথা নেই; কেবল এক একবার দেবল-ঋষি বল্‌ছেন—তারপরে? আর নালকের চোখের সামনে ছবি আস্‌ছে আর সে বোলে যাচ্ছে:—

রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছাল-ঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুই পাশে চার চার গণৎকার, রাজার ঠিক সাম্‌নে হোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান-দূর্ব্বা, শাঁক-ঘণ্টা, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো।

পূজো শেষ হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণদের

বল্‌ছেন—রাজপুত্রের নাম হলো কি? ব্রাহ্মণেরা বল্‌ছেন—এই রাজকুমার হ'তে পৃথিবীর লোক যত অর্থ, যত সিদ্ধি লাভ কর্‌বে—সেইজন্য এঁর নাম রইলো সিদ্ধার্থ। রাজা হলে এই রাজকুমার জীবনে সকল অর্থ আর রাজা না হলে বুদ্ধত্ব লাভ কোরে জগৎকে কৃতার্থ করবেন আর মরণের পরে নির্ব্বাণ পেয়ে নিজেও চরিতার্থ হবেন—সেইজন্যে এঁর নাম হল সিদ্ধার্থ।

রাজা বল্‌ছেন, কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে বুদ্ধত্ব পাবার জন্যে তপস্যা করবেন—সেই কথা আপনারা স্থির কোরে বলুন।

রাজার আট গণৎকার খড়ি পেতে গণনা কোরে বল্‌ছেন। প্রথম—শ্রীরাম আচার্য্য, তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, ইনি রাজাও হোতে পারেন, সন্ন্যাসীও হোতে পারেন, ঠিক বলা কঠিন, দুদিকেই সমান টান দেখছি। রামের ভাই লক্ষ্মণ অমনি দুই চোখ বুজে বল্‌ছেন—দাদা যা বলেছেন সেই ঠিক। জয়ধ্বজ দুই হাত ঘুরিয়ে বল্‌ছেন—হাঁও বটে, নাও বটে। শ্রীমন্তিন্ দুদিকেই ঘাড় নেড়ে বলছেন—আমারও ওই কথা। ভোজ দুই চোখ পাকুল কোরে বল্‌ছেন—এটাও দেখ্‌ছি ওটাও দেখছি। সুদত্ত বল্‌ছেন ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে—এদিকও দেখলেম, ওদিকও দেখলেম। সুদত্তের ভাই সুবাম দুই নাকে নস্যি টেনে বল্‌ছেন—দাদার দিক্‌টাই ঠিক্ দেখছি। কেবল সবার ছোট অথচ বিদ্যের সকলের বড় কৌণ্ডিন্য এক আঙুল রাজার দিকে দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ এদিক কি ওদিক, এটা কি ওটা নয়,—এই রাজকুমার বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো দিকেই যাবেন না স্থির নিশ্চয়। ইনি কিছুতেই ঘরে থাক্‌বেন না। যেদিন এঁর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগশীর্ণ দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ, আর এক সন্ন্যাসী ভিখারী পড়বে, সেদিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার কোরে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন,—সোনার শিকল কেটে পাখী যেমন উড়ে যায়।

সন্ন্যাসীর দল হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নালক চেয়ে দেখে সকাল হয়েছে।

৭

আর কিছু দেখা যায় না! সেদিন থেকে নালক যখনি ধ্যান করে তখনি দেখে সূর্য্যের আলোয় আগুনের মত ঝক্ ঝক্ করছে—আকাশের নীল ঢেকে, বাতাসের চলা বন্ধ করে—সোনার ইটে বাঁধানো প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেওয়াল। তার শেষ নাই, আরম্ভও দেখা যায় না। নালকের মন-পাখী উড়ে উড়ে চলে আর সেই দেওয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে ফিরে আসে। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাট্‌ছে। সোনার দেওয়ালের ওপারে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এপারে রয়েছে নালক;—যেন খাঁচার পাখী আর বনের পাখী!

ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার

স্বপন দিয়ে, হাসি আর বাঁশি, আমোদ আর আহ্লাদের মায়া দিয়ে সিদ্ধার্থকে বদ্ধ রেখেছেন—সোনার খাঁচায় পাখীটির মত। যখন গরমের দিনে রোদের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তপ্ত বাতাসে চারিদিক যেন জ্বল্‌তে থাকে; বর্ষায় যখন নতুন মেঘ দেখা দেয়, জলের ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে; শরতে আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, সাদা মেঘ পাতলা হাওয়ায় উড়ে চলে, নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া জেগে ওঠে; শীতে যখন বরফে আর কুয়াশায় চারিদিকে ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায়, আবার বসন্তে যখন ফুলে ফুলে পৃথিবী ছেয়ে যায় গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে, দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোয় পাখীর গানে আনন্দ ফুটে ফুটে পড়তে থাকে—তখন খাঁচার পাখীর মন যেমন করে, সোনার দেওয়ালে ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবেরও মন তেমনি করে—এই সোনার খাঁচা ভেঙে বাইরে আসতে। তিনি যেন শোনেন—সমস্ত জগৎ, সারা পৃথিবী গরমের দিনে বাদলা রাতে শরতের সন্ধ্যায় শীতের সকালে বসন্তের পহরে পহরে কখনো কোকিলের কুহু কখনো বাতাসের হু হু কখনো বা বিষ্টির ঝর ঝর শীতের থর থর পাতার মর্ম্মর দিয়ে কেঁদে কেঁদে মিনতি করে তাঁকে ডাক্‌ছে—বাহিরে এস, বাহিরে এস, নিস্তার কর, নিস্তার কর, ত্রিভুবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে, মরণের আগুন জ্বলছে, শোকে তাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে, দেখো চোখের জলে বুক ভেসে গেল, দুঃখের বান মনের বাঁধ ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল, আনন্দ,—সে তো আকাশের বিদ্যুতের মত, —এই আছে এই নেই, সুখ—সে তো শরতের মেঘের মত, ভেসে যায়, থাকে না, জীবন —সে তো শীতের শিশিরে শিউলি ফুলের মত ঝরে পড়ে, বসন্তকাল সুখের কাল সে ত চিরদিন থাকে না; হায়রে সারা পৃথিবীতে দুঃখের আগুন মরণের চিতা দিনরাত্রি জ্বলছে, সে আগুন, কে নেবায়? পৃথিবী থেকে ভয়কে দূর করে এমন আর কে আছে—তুমি ছাড়া? মায়ায় আর ভুলে থেকো না, ফুলের ফাঁস ছিঁড়ে ফেল, বাহিরে এস,—নিস্তার কর! জীবকে অভয় দাও!

নালকের প্রাণ, সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ, আকাশের প্রাণ, বাতাসের প্রাণ বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করছে। তাদের মনের দুঃখু কখন বিষ্টির মত ঝরে পড়ছে, কখন ঝড়ের মত এসে সোনার দেওয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে। আলো হয়ে ডাক্‌ছে—এসো! অন্ধকার হয়ে বলছে—নিস্তার কর! রাঙা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, আবার শুক্‌নো পাতা হয়ে ঝরে পড়ছে—সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সাম্‌নে জগৎ-সংসারের হাসি-কান্না জীবন-মরণ রাতে দিনে মাসে মাসে বছরে-বছরে নানা ভাবে নানা দিকে।

একদিন তিনি দেখছেন—নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মত একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে—কী তাদের আনন্দ! হাজার হাজার ডানা একসঙ্গে তালে তালে উঠছে পড়ছে, একসুরে হাজার হাঁস ডেকে চলেছে—চল্, চল্, চল্‌রে চল্!

আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। মেঘ চলছে সাদা পাল তুলে, বাতাস চলছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আস্‌ছে নদীর দিকে—পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে। আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার মাঝে কার হাতের তীর বিদ্যুতের মত গিয়ে একটি হাঁসের ডানায় বিঁধলো, অমনি যন্ত্রণার চীৎকারে দশদিক শিউরে উঠল্! রক্তের ছিটেয় সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া মালার ফুলের মত তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল—তীরে বেঁধা রাজহংস! কোথায় গেল তার এত আনন্দ, সেই বাতাস দিয়ে ভেসে চলা, নীল আকাশে ডেকে চলা! এক-নিমেষে ফুরিয়ে গেল পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ হয়ে গেল; সব বলা সব চলা সব খেলা শেষ হয়ে গেল—একটি তীরের ঘা পেয়ে! কেবল দূর থেকে—অনেক দূর থেকে—সিদ্ধার্থের কানের কাছে, প্রাণের কাছে বাজতে লাগল—কান্না আর কান্না! বুক ফেটে কান্না! থেকে থেকে কান্না, গুম্‌রে গুম্‌রে রয়ে রয়ে কান্না! দিনে রাতে, যেতে আস্‌তে, চলতে ফিরতে সুখের মাঝে শান্তির মাঝে কাজে কর্ম্মে আমোদে আহ্লাদে তিনি শুন্‌তে থাক্‌লেন—কান্না আর কান্না! জগৎ-জোড়া কান্না! ছোটর ছোট তাদের কান্না, বড়র বড় তাদেরও কান্না।

দিনরাত্রি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের পরে সেদিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের আলো পূব দিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে বইছে, মেঘের গায়ে গায়ে মধুপিঙ্গল আলো পড়েছে, বনে বনে পাখীরা, গ্রামে গ্রামে চাষীরা, ঘরে ঘরে ছেলেরা মেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান গাইছে। পূবের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছেন, আজ যেন কোথাও দুঃখু নেই, কান্না নেই! যতদূর দেখা যায় যতখানি শোনা যায় সকলি আনন্দ। মাঠের মাঝে আনন্দ সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে; বনে উপবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে ঘরে আনন্দ—ছেলেমেয়ের হাসিমুখে রঙিন কাপড়ে নতুন খেলেনায় ঝিক্‌ঝিক্ করছে, ঝুম্‌ঝুম বাজছে; আনন্দ—পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে—লতা থেকে পাতা থেকে; আনন্দ—সে সোনার ধূলো হয়ে উড়ে চলেছে পথে পথে—যেন আবির খেলে।

সিদ্ধার্থের মনোরথ সিদ্ধার্থের সোনার রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে পূবের পথ ধরে সকালের আলোর দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে—আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে—পৃথিবীতে আজ যেন দুঃখ নেই, শোক নেই, কান্না নেই;—রয়েছে কেবল আনন্দ, ঘুমের পরে জেগে ওঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মত ফুটে ওঠা, মালার মত দুলে ওঠা, গানে গানে বাঁশীর তানে জেগে ওঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু যেন আজ ঝড়ে পড়ছে না, ঝুরে মরছে না। এমন সময় সকালের এত আলো এত আনন্দ ঝড়ের মুখে যেন প্রদীপের মত নিভিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থের রথের আগে

কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল—অস্থিচর্ম্মসার দন্তহীন একটা বুড়ো মানুষ—লাঠিতে ভর দিয়ে। তার গায়ে একটু মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়! বয়েসের ভারে সে কুঁজো হয়ে পড়েছে, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপ্‌ছে, ঘাড় কাঁপ্‌ছে, কথা বলতে কথাও তার কেঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না;—কেবল দুখানা পোড়া কাঠের মত রোগা হাত সাম্‌নে বাড়িয়ে সে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে—গুটি গুটি, একা! তার শক্তি নেই সামর্থ্য নেই, তার আনন্দ নেই আরাম নেই, নেই তার একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারে ছেলে মেয়ে বন্ধুবান্ধব—সব মরে গেছে সব ঝরে গেছে—জীবনের সব রঙ্গ রস শুকিয়ে গেছে,—সব খেলা শেষ করে! আলো তার চোখে এখন দুঃখ দেয়, সুর তার কানে বেসুরো বাজে, আনন্দ তার কাছে নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারিদিকে অনেকখানি অন্ধকার, অনেক দুঃখ শোক অনেক জ্বালা যন্ত্রণা শতকুটি কাঁথার মত জড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—একা, একদিকে—আনন্দ থেকে দূরে, আলো থেকে দূরে। প্রাণ তার কাছ থেকে সরে পালাচ্ছে; গান তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, সুখ তার ত্রিসীমানায় আসছে না, সুন্দর তাকে দেখে ভয়ে মরছে! সকালের আলোর উপরে কালো ছায়া ফেলে অদন্তের বিকট হাসি হেসে পিশাচের মত সেই মূর্ত্তি সিদ্ধার্থের সাম্‌নে পথ আগ্‌লে বল্লে—আমাকে দেখ, আমি জরা, আমার হাতে কারো নিস্তার নেই,—আমি সব শুকিয়ে দিই, সব ঝরিয়ে দিই, সব শুষে নিই, সব লুটে নি! আমাকে চিনে রাখ হে রাজকুমার! তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে হবে—রাজপুত্র বোলে তুমি জরার হাত থেকে নিস্তার পাবে না! দশদিকে সে একবার বিকট হাসি হেসে চেয়ে দেখলে অমনি আকাশের আলো পৃথিবীর সবুজ তার দৃষ্টিতে একনিমেষে মুছে গেল, ক্ষেত জ্বলে গেল, নদী শুকিয়ে গেল;—নতুন যা কিছু পুরানো হয়ে গেল, টাট্‌কা যা কিছু বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন পাহাড় ধ্বসে পড়ছে গাছ ভেঙে পড়ছে সব ধূলো হয়ে যাচ্ছে সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—তার মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে সাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথা মাটিতে লুটিয়ে, পায়ে পায়ে গুটি গুটি অন্তহীন দন্তহীন বিকটমূর্ত্তি জরা—সংসারের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে সব আনন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে সব শুষে নিয়ে সব লুটে নিয়ে একলা হাড়ে হাড়ে কর্ত্তাল বাজিয়ে।

আর একদিন সে সিদ্ধার্থের মনোরথ সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদু মন্দ বাতাসে ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণ-দুয়ার দিয়ে আস্তে আস্তে বার্ হয়েছে। মলয় বাতাস কত ফুলের গন্ধ, কত চন্দনবনের শীতল পরশে ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগ্‌ছে—সব তাপ সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে। ফুল-ফুটানো মধুর বাতাস, প্রাণ-জুড়ানো দখিন বাতাস! কত দূরের মাঠে মাঠে রাখাল ছেলের বাঁশীর সুর, কত দূরের বনে বনে পাপিয়ার পিউ গান, সেই বাতাসে, ভেসে

আস্‌ছে—কানের কাছে প্রাণের কাছে। সবাই বার্ হয়েছে সবাই গেয়ে চলেছে খোলা হাওয়ার মাঝে তারার আলোর নীচে—দুয়ার খুলে, ঘর ছেড়ে! আকাশের উপরে ঠাণ্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলো, ছায়া তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস—ফুর ফুরে দখিন বাতাস—জলে স্থলে বনে উপবনে ঘরে বাহিরে সুখের পরশ দিয়ে আনন্দের বাঁশী বাজিয়ে। সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠ্‌ছে, মনের পাল ভরে উঠ্‌ছে;—মনোরথ আজ ভেসে চলেছে নেচে চলেছে—দুঃখের পারে সুখের ঘাটে, সারি-গানের তালে তালে সুখ-সাগরের থির জলে। স্বপ্নের ফুলের মত শুক তারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে—পৃথিবীর দিকে। সুখের আলো ঝরে পড়েছে সুখের বাতাস ধীরে বইছে—পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। মনে হচ্ছে—আজ অসুখ যেন দূরে পালিয়েছে অসোয়াস্তি যেন কোথাও নেই, জগৎসংসারে সবই যেন সবাই যেন আরামে রয়েছে সুখে রয়েছে শান্তিতে রয়েছে। এমন সময় আলোর পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে সুখের স্বপন ভেঙে দিয়ে সিদ্ধার্থের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল—একটা পাণ্ডাশ মূর্ত্তি—জ্বরে জর্জ্জর রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে পাচ্ছে না—ঘুরে পড়ছে। সে চলতে পাচ্ছে না—ধূলোর উপরে কাদার উপরে শুয়ে রয়েছে। কখনো সে শীতে কাঁপছে—কখনো বা গায়ের জ্বালায় সে জল জল করে চীৎকার করছে। তার সমস্ত গায়ের রক্ত তার চোখ দুটো দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে আকাশ আগুনের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। সমস্ত গায়ের রক্ত জল হয়ে তার কাগজের মত পাণ্ডাশ হিম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের মত হিম হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্বাস টান্‌ছে যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণকে শুষে নিতে চাচ্ছে। সে নিশ্বাস ছাড়ছে যেন নিজের প্রাণ নিজের জ্বালাযন্ত্রণা সারা সংসারে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধার্থ দেখলেন,সংসারের আলো নিভে গেছে, বাতাস মরে গেছে, সব কথা সব গান চুপ হয়ে গেছে। কেবল ধূলোকাদা-মাখা জ্বরের সেই পাণ্ডাশ মূর্ত্তির বুকের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে—কে যেন পাথরের দেওয়ালে হাতুড়ি পিট্‌ছে—ধ্বক্ ধ্বক্! তারি তালে তালে আকাশের সব তারা একবার নিভ্‌ছে একবার জ্বল্‌ছে; বাতাস একবার আস্‌ছে একবার যাচ্ছে।

জ্বরের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখে সিদ্ধার্থ ঘরে এসেছেন, রাজ-ঐশ্বর্য্যের মাঝে ফিরে এসেছেন, সুখসাগরের ঘাটে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তখনও তিনি শুন্‌ছেন যেন তাঁর বুকের ভিতরে পাঁজরায় পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠ্‌ছে—ধ্বক্ ধ্বক্!

এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিম মুখে মনোরথ চলেছে—সোণার রথ চলেছে, যেদিকে দিন শেষ হচ্ছে, যেদিকে সূর্য্যের আলো অস্তে যাচ্ছে। সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের নিজের ঘরের দিকে। পাখীরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়, গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাই সব ফিরে আস্‌ছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর

পার দিয়ে নিজের নিজের গোঠে, গোধূলির সোনার ধূলো মেখে। রাখাল-ছেলেরা ফিরে আস্‌ছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আস্‌ছে ভিন্ গাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকি-কিনির পরে। সবাই ঘরে আস্‌ছে—যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশ পিদিম্, যাদের ঘর নেই দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে। তুলসী তলায় দুগ্‌গো পিদিম—যারা কাজে ছিল কর্ম্মে ছিল, পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্যে আলো ধরেছে। সবাই আজ মায়ের দুই চোখের মত অনিমিষ্ দুটি আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ফিরে আসছে —মায়ের কোলে ভাইবোনের পাশে, বন্ধু বান্ধবের মাঝখানে। ভিখারী যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে "এল মা ওমা ঘরে এল মা।" মিলনের শাঁখ ঘরে ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা-ধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে খোলা দুয়োরে উঁকি মারছে। খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে শূন্য প্রাণ খালি বুক ভরে উঠছে আজ ফিরে-পাওয়া সুরে, বুকে-পাওয়া সুরে, হারানিধি খুঁজে পাওয়া সুরে। সিদ্ধার্থ দেখছেন সুখের আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের মাঝে এমন একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে দুঃখু আজ আসতে পারে, ভরা নদীর মত ভরপুর আনন্দ, পূর্ণিমার চাঁদের মত পরিপূর্ণ আনন্দ জগৎসংসার আলোয় ভাসিয়ে রসে ভরে দিয়েছে। আনন্দের বান এসেছে। আর কোথাও কিছু শুক্‌নো নেই, কোনো ঠাঁই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে দেখতে চলেছেন, মিলনের আনন্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে আনন্দ আজ জোর করে দোর ঠেলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গলা জড়িয়ে ধরছে;—কেউ আজ কাউকে ভুলে থাক্‌ছে না ছেড়ে থাকছে না ছেড়ে যাচ্ছে না ছেড়ে দিচ্ছে না! আনন্দ কার নেই, আনন্দ নেই কোন্‌খানে! কে আজ দুঃখে আছে, চোখের জল কে ফেল্‌ছে, মুখ শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর কথায় উত্তর দিয়ে কোন্ এক ভাঙা মন্দিরের ফাটা কাঁসরে খণ্ খণ্ করে তিনবার ঘা পড়ল—আছে আছে দুঃখু আছে! অমনি সমস্ত সংসারের ঘুম যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে একটা বুকফাটা কান্না উঠল—হায় হায় হাহা! আকাশ ফাটিয়ে সে কান্না, বাতাস চিরে সে কান্না বুকের ভিতরে বত্রিশ নাড়ি ধরে যেন টান্ দিতে থাক্‌ল—সে কান্না! সিদ্ধার্থ সুখের স্বপ্ন থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব কটি তারার আলো যেন মরা-মানুষের চোখের মত ঘোলা হয়ে গেছে! পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন রাত আড়াই-পহরে জলে স্থলে পাণ্ডাস কুয়াশার জাল পড়ে আসছে, কে যেন সাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে টেনে দিচ্ছে। ঘরে ঘরে যত পিদিম্ জ্বলছিল সবগুলো জ্বল্‌তে নিভ্‌তে, নিভ্‌তে জ্বলতে, হঠাৎ এক সময় দপ্ করে নিভে গেল, আর জ্বল্লো না,

কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না শব্দ করছে না—আকাশের আধখানা জুড়ে জলে-ভরা কালো মেঘ, কাঁদো-কাঁদো দুখানি চোখের পাতার মত নুয়ে পড়েছে। চোখের জলের মত বিষ্টির একএকটি ফোঁটা ঝরে পড়ছে,—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর, তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে সাদা চাদরে ঢাকা হাজার হাজার মরা-মানুষ কাঁধে নিয়ে কোলে করে বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোনো শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে ফুলে উঠছে বুকফাটা কান্নায়, কিন্তু কোন কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না! নদীর পারে—যেদিকে সূর্য্য ডোবে যেদিকে আলো নেভে দিন ফুরিয়ে যায়, সেই দিকে দুই উদাস চোখ মেলে হন্ হন্ করে তারা এগিয়ে চলেছে মহাশ্মশানের ঘাটের মুখে মুখে, দূরে দূরে, অনেক দূরে, ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে, ঘরে আসা ফিরে আসা বুকে আসা কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে,—চলে যাবার পথে ছেড়ে যাবার পথে ফেলে যাবার কাঁদিয়ে যাবার পথে।

এপারে ওপারে মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ—কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাবার পথ। থেকে থেকে গরম নিশ্বাসের মত এক একটা দম্‌কা বাতাসে রাশি রাশি ছাই উড়ে সেই মরণ-পথের যত যাত্রীর, শ্মশান-ঘাটের যত যাত্রীর মুখে লাগ্‌ছে, চোখে লাগ্‌ছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন, ছাই উড়ে এসে মাথার চুল সাদা করে দিচ্ছে, গায়ের বরণ পাণ্ডাস করে দিচ্ছে! ছাই উড়ছে—সব-জ্বালানো সব-পোড়ানো গরম ছাই! আগুন নিভে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, আলো নিভে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, জীবন ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, মরণ সেও ছাই হয়ে উড়ে চলেছে। সুখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, দুঃখু ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা কিছু যত কিছু সব ছাই-ভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে—দূরে দূরে, মাথার উপরে ঘোলা আকাশ দিয়ে পাণ্ডাস একখানা মেঘের মত। তারি তলায় বুদ্ধদেব দেখলেন—মরা ছেলেকে দুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন;—বাতাস চারিদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে হায় হায় হায় রে হায়। সেদিন ঘরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত পদ্ম ফুলটির জায়গায় রয়েছে—একমুঠো ছাই আর মরা-মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত রহস্য

ক্ষত্রিয় নামটী আমাদের নিকট যেরূপ সুপরিচিত ইহার অর্থ তেমন সুগম নহে। সেই জন্য ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত আমরা এইস্থলে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ক্ষত্রিয় নামের সহিত আমরা বলবীর্য্যেরই সাধারণতঃ সংযোগ দেখিতে পাই, কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারা বলবীর্য্য অপেক্ষাও মহত্তর গুণ ক্ষত্রিয় নামের সহিত সংযুক্ত থাকার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই।

ভারতীয় আর্য্যদিগের জাতিভেদ উৎপত্তির মূল রহস্য কর্ম্ম বলিয়াই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ হইতে জানিতে পারা যায় যথা "কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতঃ।" ইহা হইতেই অনেকে ভারতীয় জাতিভেদের অর্থ "কর্ম্মবিভাগ" (distribution of work) করিয়া থাকেন। সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতির আদি পুরুষদিগের মধ্যে প্রথম কর্ম্মের ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা তাহাদিগের জাতীয় নাম সম্বন্ধে আভাস পাওয়ার আশা করিতে পারি। এই প্রকারে বেদধর্ম্মের চর্চ্চা ও অনুষ্ঠান রূপ কর্ম্ম দ্বারা, ব্রাহ্মণ জাতির নাম বেদের "ব্রহ্ম" নামানুসারে "ব্রাহ্মণ" হইয়াছে।

বেদে আর্য্যদিগের পুরোহিত ও রাজা এই দুই প্রকারের কার্য্যই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় দেখা যায়। পুরোহিত যজ্ঞকার্য্য ও স্তোত্র দ্বারা যজমান রাজার হিতকামনা করিতেছেন এবং যজমান রাজা বাহুবলের দ্বারা শত্রুর উপর বিজয়সাধন করিয়া আর্য্যাধিকার বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে পুরোহিতের স্তোত্র বা 'ব্রহ্ম' হইতেই পুরোহিতের সম্প্রদায় 'ব্রাহ্মণ' নামে আর্য্যদিগের স্বতন্ত্র শাখারূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে পুরোহিত ও রাজারূপে আর্য্যদিগের মধ্যে প্রথম জাতি-ভেদের সূচনা হইল।

পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পূর্ব্বে যে ঋষিগণ একাধারেই পুরোহিত ও রাজা ছিলেন তাহাই অনুমান করা যাইতে পারে। মনু, বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে আমরা এইরূপ ঋষিরই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

আদিতে একাধারে সম্মিলিত পুরোহিত ও রাজার কর্ত্তব্য ব্যবচ্ছেদের দ্বারাই যে পুরোহিত সম্প্রদায় ও রাজ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় এবং ইহারাই যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মূল আদর্শ, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার মতই প্রকাশ করিয়াছেন:—

"The king and "purohita," orginally holders of a joint office,* stood apart and separate in their functions both a type of the class or caste division into nobles and priests of those who held power ever the labouring Community"† Literary History of India by R. W. Frazer L L B.

---

* Frazer, "Golden Bough," Vol. I P 224.

† Senart, Castes dans l' Inde," p 149

"রাজা ও তাহার পুরোহিতের কর্ত্তব্য আদিতে সম্মিলিত ছিল—কিন্তু এক্ষণে ইহারা পৃথগ্‌ভূত হইল ও উভয়ই সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিত শ্রেণী বা জাতির আদর্শ হইল। ইঁহারা শ্রমজীবিদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল।"

বলা বাহুল্য এস্থলে সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিত শ্রেণীর দ্বারা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং শ্রমজীবি শ্রেণী দ্বারা বৈশ্যগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইহা হইতে রাজসম্প্রদায়ই যে ক্ষত্রিয় জাতির প্রকৃত মূল তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্তে যে 'ক্ষত্রিয়' শব্দের পরিবর্ত্তে "রাজন্য" শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ-রূপে আমাদের বক্তব্যেরই সমর্থন করে। 'রাজন্য' শব্দটী 'রাজন্' শব্দের উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়াই সিদ্ধ হয়। ইহার প্রকৃতি-গত অর্থ 'রাজার সন্ততি।' সুতরাং 'রাজার জাতি' ইহাই রাজন্য শব্দের অর্থ হইতেছে। এই রাজার জাতি, বিশেষরূপে বল বা 'ক্ষত্রের' অধিকারী বলিয়াই 'ক্ষত্রিয়' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপেই 'রাজন্য' ও 'ক্ষত্রিয়' একার্থবাচক হইয়াছে।

রাজা হইতেই যে 'রাজন্য'রূপ ক্ষত্রিয় জাতি-বাচক নামের উৎপত্তি হইয়াছে—অথর্ব্ববেদের একটী স্থল হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায় যথা ঃ—

"প্রিয়ং মাকৃণু দেবেষু মাকৃণু প্রিয়ং রাজসু মাকৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উতশূদ্র উত আর্য্যে॥"

অথর্ব্ব বেদসংহিতা—১৯শ অধ্যায় ৬২।৩

এস্থলে দেব যে "ব্রাহ্মণ" বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং উদ্ধৃত স্থলের অনুবাদ এইরূপ হইবে ঃ—"ব্রাহ্মণদিগের প্রিয় করিবে, রাজাদিগের প্রিয় করিবে। শূদ্রই হউক আর আর্য্যই হউক সকলেরই প্রিয় দেখিবে।"

এখানে রাজা দ্বারা যে ক্ষত্রিয়ই উল্লিখিত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়।

কেবল বেদেই যে ক্ষত্রিয় বুঝাইতে রাজা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; অন্য শাস্ত্রেও ক্ষত্রিয় বুঝাইতে রাজা বা তদর্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যথা উপনয়ন-বিধানে ঃ—

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞঃ গর্ভাত্তু দ্বাদশেবিশঃ"

"ব্রাহ্মণের উপনয়ন গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে সম্পাদন করিবে—রাজা বা ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে এবং বৈশ্যের গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে সম্পাদন করিবে।"

"শুধ্যেদ্বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"

"ব্রাহ্মণ দশদিনে অশৌচ হইতে শুদ্ধ হয়—ভূমিল বা ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে শুদ্ধ হয় এবং বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে ও শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে রাজার বংশ হইতেই যে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ক্ষত্রিয় জাতির এই প্রকারে রাজার সহিত আদিতে সম্বন্ধ হইতে ক্ষত্রিয় শব্দের মূল 'ক্ষত্র'শব্দকে বিশেষ অর্থ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইতেই দেখা যায়। পূর্ব্বের 'বল' অর্থের স্থলে, 'ক্ষত্র' শব্দে রক্ষা অর্থেরই বিশেষ যোগ লক্ষিত হয়। শব্দকল্পদ্রুমে

'ক্ষত্রিয়' শব্দ যেরূপ ভাবে সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বক্তব্যেরই যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে—"ক্ষদতি রক্ষতি জনান্, ক্ষত্রঃ ক্ষদসংবৃতৌ সৌত্রঃ ততস্ত্রাসুসিতিত্রঃ। ক্ষত্র এব ক্ষত্রিয়ঃ স্বার্থে ইয়ঃ।"

অধ্যাপক মেক্‌ডনেল্ (Macdonell) কৃত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে (Sanskrit English Dictionary) যে, 'ক্ষত্র' শব্দ রাজ্য (dominion) ও 'ক্ষত্রিয়' শব্দ 'রাজ্যকারী' ও 'রাজা' (ruling, ruler) অর্থে ব্যাখ্যাত দেখা যায়—তাহাতেও 'ক্ষদ্' ধাতুর সহিত উল্লিখিত সংবরণ বা রক্ষা অর্থের বিশেষ সংযোগই প্রমাণিত হয়।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বেল্‌ফোর্ (Balfour) ও তদীয় "ভারতকল্পদ্রুম" (Cyclopædia of India) নামক গ্রন্থে ক্ষত্রিয় শব্দের মূল 'ক্ষত্র' শব্দে কেবল 'রাজত্ব' ও 'রাজ্য' অর্থ দেখিতে পাইয়াছেন তাহা নহে—কিন্তু এই 'ক্ষত্র' শব্দ উক্ত উভয় অর্থে বৈদিক সংস্কৃত জেন্দ ভাষায় ও পারসীক শিলালিপিতে প্রযুক্ত হওয়ার প্রমাণও তিনি পাইয়াছেন; যথা ঃ—

"The word is an adjective from the ancient noun Kshatra, which, as meaning rule, dominion. occurs in all the three languages of the Veda, the Avesta, and the Persian inscriptions; orginally it simply denoted possessed of authority and is so sometimes applied in the Veda even to the gods." Cyclopaedia of India by Edward Balfour.

"এই (ক্ষত্রিয়) শব্দটী ক্ষত্রশব্দেরই বিশেষরূপ। বেদ, আবেস্তা ও পারস্য শিলালিপি এই তিনের ভাষা ত্রিতয়েই রাজত্ব, রাজ্য অর্থে ইহার (ক্ষত্র শব্দের) প্রয়োগ পাওয়া যায়। আদিতে ইহা কেবল শক্তির (বলের) অধিকারীরূপ অর্থ প্রকাশ করিত এবং এই অর্থে বেদে দেবতাদিগের সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে।

এস্থলে আমরা 'ক্ষত্রিয়' শব্দ গঠনের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই প্রাপ্ত হইতেছি এবং মূল বল হইতেই যে রাজত্ব ও রাজ্য অর্থের বিকাশ হইয়াছে—তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি।

'ক্ষত্রিয়' শব্দের মধ্যে 'রাজত্ব' ও 'রাজ্য' অর্থের সম্প্রবেশ হইতে রাজন্ শব্দজাত 'রাজন্য' শব্দ হইতে যে ইহার পূর্ব্বোক্তার্থ গৃহীত হইয়াছে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। পূর্ব্বোল্লিখিত সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে অধ্যাপক মেক্‌ডনেল্ ক্ষত্রিয় জাতির বাচক শব্দ সকলের মধ্যে রাজন্য শব্দকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। 'রাজন্য' শব্দের অর্থ যোদ্ধ-জাতীয় লোক বলিয়া লিখিয়া ইহার সম্বন্ধে বন্ধনী মধ্যে তিনি এই শব্দ উক্ত জাতির প্রাচীনতম অভিধা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যথা ঃ—

"রাজন্য man of the warrior caste (of which this is the oldest designation.)

ইহা হইতে রাজবংশ হইতেই যে ক্ষত্রিয় জাতির প্রথম উদ্ভব এবং রাজন্য শব্দই যে ক্ষত্রিয় জাতিবাচক প্রথম শব্দ ইহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং ক্ষত্রিয় নামে যুদ্ধের উগ্রভাব অপেক্ষা রক্ষার মহিমাময় ভাবই যে অধিক প্রকটিত তাহাই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসও ক্ষত্রিয় শব্দের এই মহিমাময় ভাবই তদীয় অমর লেখনীতে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন :—

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্র ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষুরূঢ়ঃ।"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নবাব

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ছায়া

সেদিন রবিবার। ভোরের আলো ভাল করিয়া না ফুটিতেই বৃদ্ধ জুজের উল্লাস-চীৎকারে সারা গৃহে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। "ও হেনরিতা, ওরে ও এলিস্, আয়, তোরা শীগ্‌গির আয়। মারানের নাটক থিয়েটার-ওলারা নিয়েছে। আঁদ্রে নিজে খপর দিতে এসেছে। ওঠ্, ওঠ্, ওরে এদিকে আয়।"

আঁদ্রে কাল রাত্রেই এসংবাদ পাইয়াছিল। ন্যাভোঁ থিয়েটারের ম্যানেজার কার্দ্দিলাক কাল তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিয়াছে, নাটকখানি তাহাদের পছন্দ হইয়াছে; শীঘ্রই রিহার্সাল সুরু হইবে এবং এক মাসের মধ্যেই যাহাতে অভিনয় হয়, তাহারও বন্দোবস্ত চলিতেছে। তাহার পর দুইজনে বসিয়া কতক্ষণ ধরিয়া এই নাটক-অভিনয়েরই আলোচনা হইয়াছে। কি কি দৃশ্যপট নূতন করিয়া আঁকিতে হইবে, কাহাকে কি ভূমিকা দিলে ঠিক হয়, পোষাক-পরিচ্ছদই বা কেমন তৈয়ার করানো প্রয়োজন, এমনই সব প্রয়োজনীয় কথা। তাহার পর থিয়েটার হইতে আঁদ্রে যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কাজেই এত বড় সুখপরটা জুজের গৃহে আর দেওয়া ঘটে নাই। তবুও নিজের ঘরে যাইবার সময় আঁদ্রে জুজের দ্বারে কাণ পাতিয়া গিয়াছে, কেহ জাগিয়া আছে কি না! কিন্তু সে গৃহে জাগরণের কোনই সাড়া পাওয়া যায় নাই। কেহ জাগিয়া থাকিলে সেই রাত্রেই যে আঁদ্রে এখপরটুকু নিশ্চয় দিয়া ফেলিত, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। সারা রাত্রিটাই তাহার নিতান্ত অধীরভাবে কাটিয়া গিয়াছে। কখন্ ভোর হইবে, কখন সে গিয়া স্নেহশীল জুজের গৃহে এ সংবাদটুকু দিয়া বুকটা খালি করিবে! রাত্রে নিদ্রাও ভাল হয় নাই। কেবলই সে ভাবিয়াছে, এ আনন্দ একা আর ভোগ করা যাইতেছে না—এলিস, আলিন, জুজ, সকলের মধ্যে বাঁটিয়া না দিলেই নয়!

তাই সে প্রত্যূষে যে মুহূর্ত্তে শুনিল, নীচে জুজের গৃহের জানালা খোলা হইতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল। জুজ দাড়ি কামাইতেছিল। একটা গাল সাফ হইয়াছে, অপর গালে তখনও সাবান লাগিয়া রহিয়াছে—এমন সময় আঁদ্রে

আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ জুজ চমকিয়া উঠিল। এত ভোরে—আঁদ্রে? তাই ত? কি মনে করিয়া সে আসিল! কোন অসুখ করে নাই ত! আঁদ্রে কহিল, "না, না, অসুখ নয়। আমার নাটকখানা থিয়েটারওলারা নিয়েছে, ম্যসিয়ো—আর এক মাসের মধ্যেই তারা নাটকখানা প্লে করবে।" জুজ আনন্দে যেন শিহরিয়া উঠিল। এ্যাঁ, সত্য না কি! চীৎকার করিয়া সে তখন মেয়েদের ডাক দিল।

আঁদ্রের এতখানি আনন্দের যথেষ্ট কারণ ছিল। উপেক্ষিত যুবক নিভৃতে এককোণে পড়িয়া থাকিয়া আপনার প্রাণ ঢালিয়া এই নাটকখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছে। সাহিত্যের নেশা ভূতের মতই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহারই জন্য নিজের মাকে অবধি সে ছাড়িয়া আসিয়াছে—ইহারই জন্য জেঙ্কিন্সের বিলাস-প্রচুর সজ্জিত-সুন্দর গৃহ তাহার আজ আর স্থান নাই। ভক্ত যেমন সর্ব্বত্যাগী হইয়া আপনার দেবতার তপস্যা করে, তেমনই ভাবে আঁদ্রে এক কঠোর তপস্যায় আপনাকে মগ্ন তন্ময় রাখিয়াছিল! আজ মিলিয়াছে, সিদ্ধি মিলিয়াছে—দেবীর প্রসাদ আজ সে লাভ করিয়াছে। এইবার তাহার নাটকের অভিনয় হইবে! পারির লোক থিয়েটারে আসিয়া জড়ো হইয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করিবে—গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া সাদরে তাহাকে অভিনন্দন করিবে! কিন্তু শুধুই কি এ অভিনন্দনের জন্যই সে কাতর! না—এ নাটক-অভিনয়ের অর্থ, তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন। চপলা লক্ষ্মীও এবার তাহার জীর্ণ গৃহে আসিয়া দেখা দিবেন—তাঁহার সস্মিত মুখের হাসির ছটায় দারিদ্র্যের আঁধারে-ঘেরা ঘর আলোয় ভরিয়া উঠিবে। আর এলিস্—তাহার জীবনের ধ্রুবতারা, যাহার পানে চাহিয়া শত বিপদেও আপনাকে সে অটল অচপল রাখিয়াছে—সেই এলিসও এবার—

মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। আলিন আসিয়া কহিল, "কি হয়েছে, বাবা, ডাকছ কেন? এই যে ম্যসিয়ো আঁদ্রে—খপর কি?" আলিনের পিছনে এলিসও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—অধরের কোণে মৃদু হাসির রেখা, নয়নে সরমের কম্পিত দৃষ্টি!

জুজ কহিল, "আঁদ্রের নাটক বিদ্রোহ এবার থিয়েটারে প্লে হবে।"

আলিন কহিল, "বাঃ,—তা আমাদের কি দিচ্ছেন, ম্যসিয়ো আঁদ্রে? আমি ত গোড়া থেকেই বলছি, আপনার বই থিয়েটার-ওলারা নেবেই—কেমন, বলিনি?"

আলিনকে মৃদুস্বরে ধন্যবাদ দিয়া আঁদ্রে এলিসের পানে চকিতের জন্য একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখ সরমে রক্তিম, নয়ন-পল্লব সঘন কম্পিত, দৃষ্টি নত! আঁদ্রের শিরার মধ্য দিয়া বিদ্যুতের একটা মৃদু প্রবাহ ছুটিয়া গেল। আঁদ্রে জুজের পানে কোনমতে চোখ তুলিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে আর একটা কথা আছে, আমার—"

"গোপনীয়—?" জুজ কহিল, "তাই ত, আমায় যে ভাবিয়ে দিলে হে—" তাহার পর আঁদ্রের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে জুজ কহিল, "এদের যেতে বলব?"

আঁদ্রে কহিল, "সকলেরই সরবার

দরকার নেই। এলিস বোধ হয়, এর কিছু জানে। আলিন সঠিক না জানলেও কতক বোঝে। তবে এবা—"

জুজ কহিল, "বেশ, এলিস আর আলিন থাকুক। তোরা একবার যা ত মা—আবার ডাকলে আসিস্।"

সকলে কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেলে ঘর স্তব্ধ হইল। জুজ অধীর আগ্রহে আঁদ্রের পানে চাহিয়া রহিল। আঁদ্রে একবার চারিধারে চাহিয়া লইল—তারপর সে আপনার মনের গোপন কথাটি আজীবন-সঞ্চিত আশার কথা জুজের কাছে প্রকাশ করিল। আয়োজন দেখিয়া এলিসের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! বুঝি, সেই কথা! না জানি, শুনিয়া জুজ কি বলিবে,—কি মত দিবে? তাহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে শুনিল, আঁদ্রে আজ জুজের করুণার ভিখারী; তাহারই করুণার উপর আঁদ্রের সব—সব নির্ভর করিতেছে! আর কিছু নহে, সে শুধু এলিসের পাণিপ্রার্থী!

শুনিয়া জুজ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, "এ কি সম্ভব! আরে মাষ্টার আঁদ্রে—তাই ত, এ কথাটা স্বপ্নেও যে কোনদিন ভাবতে পারিনি। এ্যাঁ!" কিন্তু না, বৃদ্ধ রহস্য করিতেছে। জুজ কহিল, "আঁদ্রে, এ'ত খুব ভাল কথা! তোমার মত জামাই পাওয়া, বলতে কি,—এর কতকটা আভাষ আমি আগেই পেয়েছিলুম! তাহলে ত আমি ঠিকই আঁচ করেছিলুম—অবশ্য অপরের কাছে এ-সম্বন্ধে কিছু শুনেও ছিলুম—"

এলিসের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুজ তাহা হইলে সবই জানে! ছি, কি লজ্জা! সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহার লজ্জা হইতে লাগিল, অথচ চলিয়া যাইতেও শক্তি নাই। পা দুইটা সরিতে চাহে না! তবে কথাটা জুজকে বলিল কে? আলিন নয় ত!

আলিন হাসিয়া কহিল, "তাহলে আমি বলি। আমিই এ আভাষটুকু ঝাবার কাণে তুলেছিলুম। কেমন বাবা, নয় কি?" কথা শেষ করিয়া আলিন দুই হাতে এলিসকে জড়াইয়া ধরিল। আলিনের বুকে মুখ লুকাইবার আশ্রয় পাইয়া এলিস যেন বর্ত্তাইয়া গেল।

তাহার পর জুজের সহিত আঁদ্রের আরও দুই-চারিটা কথা হইল। বিবাহের পর আঁদ্রে ও এলিস উপরতলার ঐ ঘরটিতেই থাকিবে, এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না। আঁদ্রে ফটোগ্রাফির ব্যবসায় উঠাইয়া দিবে না—এবং 'বিদ্রোহের' অভিনয় হইতে যেরূপ লাভের আশা সে করিতেছে, তাহার যদি ব্যতিক্রম না হয়, তাহা হইলে সে কারবারটাকেও সে ঐ টাকায় আরও বাড়াইয়া ফেলিতে পারিবে। অর্থাৎ সংসার-সমুদ্রে তাহাদের দুইজনের জীবন-তরী দুইখানি দিব্য তাহারা বাহিয়া যাইবে—এই প্রসন্ন বায়ু ও অনুকূল স্রোত-টুকু সহায় থাকিলে কোনই ভয় নাই!

জুজের একটা ভাবনা হইল। সে কহিল, "কিন্তু তোমার মা-বাপ এ বিয়েতে মত দেবেন কি? ডাক্তার জেঙ্কিন্সের অত পয়সা, অমন মান-সম্ভ্রম!"

আঁদ্রের ললাটেও চিন্তার একটা রেখা

ফুটিল। সে কহিল, "ওঁর কথা আর তুলবেন না, মশায়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি—আমি তাঁর কি ধার ধারি যে তাঁকে ভয় করে চলতে হবে?" তাহার পর একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তবে আমার মা! তা মা আমায় মাঝে মাঝে এখানে দেখতে আসেন—যদিও ডাক্তার জেঙ্কিন্স তাঁকে এখানে আসতে মানা করেছে, তবুও মা সে মানা শোনেন নি। এলিসকে মা খুব পছন্দ করেন। আর আমার মা কেমন লোক, আপনিও দেখবেন পরে। এলিসকে বরং জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তবে আমার এই বড় দুঃখ হয় যে, ঐ পিশাচটা মার উপর এত অত্যাচার করে, আমি তার কোন প্রতিকার করতে পারি না—" আঁদ্রের মর্ম্মের ভিতর হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস উঠিল—তাহার প্রাণের মধ্যে যে জ্বালা, তাহা সে-ই জানে। সে জ্বালা জুড়াইতে পারে, শুধু এলিসের ঐ সুন্দর মুখের স্নিগ্ধ বাণী,—ঐ চপল নয়নের সস্মিত চাহনিটুকু!

আলিন কহিল, "বাবা, আজ তাহলে এক কাজ করা যাক, এস। এঁর নতুন নাটকের খাতিরে আজ আমরা লঙ্-সাম্পে বেড়াতে যাই, চল। কি বল? ওখানে চড়ি-ভাতি করব। আপনি কি বলেন, ম্যসিয়ো আঁদ্রে?"

হেনরিতা, ইয়া প্রভৃতিও ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিল। তাহারা কহিল, "আমরাও বেড়াতে যাব, দিদি। ও বাবা—"

জুজ কহিল, "বেশ মা—সবাই যাবে। তাহলে, আলিন, চড়ি-ভাতির গোছগাছ করে নাও। আঁদ্রের কোন অসুবিধা হবে না ত?"

এলিসের সঙ্গলাভ হইবে! অসুবিধা! আঁদ্রে কহিল, "কিছু না!"

জুজ কহিল, "তাহলে তুমি তৈরী হয়ে এস। আমরাও ঠিক হয়ে নি। তার পর একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব—রোদ ওঠবার আগেই।"

আঁদ্রে বিদায় লইল! মেয়েরাও আপনাদিগকে সজ্জিত করিয়া সমস্ত গুছাইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় পল আসিয়া উপস্থিত হইল। জুজ কহিল, "শুনেছ হে! একটা সুখপর আছে—কার্দ্দিলাকরা আঁদ্রের নাটক অভিনয় করতে নিয়েছে।"

এ সংবাদ সকলের পূর্ব্বে পলই প্রথম পাইয়াছে! এ বিষয়ে সে কি কম পরিশ্রম করিয়াছে। কার্দ্দিলাককে ধরিয়া পলই ত নাটকখানি আগাগোড়া পড়াইয়াছে! আবার পড়াইয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, অভিনয়-আয়োজনে অর্থ-সাহায্যও বিশেষরূপ করিবে বলিয়া আশা দিয়াছে! তাই কার্দ্দিলাক এই নূতন লেখকের প্রথম নাটক-অভিনয়ে এতখানি ব্যগ্রতা ও উৎসাহ দেখাইতে উদ্যত হইয়াছে!

কিন্তু এ কথা পল কাহারও কাছে ভাঙ্গে নাই; এখানেও সে ভাঙ্গিল না। কার্দ্দিলাককেও সে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে, এ কথা যেন আর তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ না করে! তাই পল জুজের কথায় সহর্ষ বিস্ময় মাত্র প্রকাশ করিয়া নূতন নাটক ও তাহার লেখকের শুভ কামনা

করিল। জুজ কহিল, "তুমি বসো, পল, আমি দু-একটা কাজ সেরে নি। আমরা আজ আঁদ্রের নতুন বইয়ের সম্মানের জন্য লঙ সাম্পে চড়ি-ভাতি করতে চলেছি। আলিনের সাধ, নতুন নাটকের খাতির করা। আসলে কিন্তু অন্য কারণ আছে। আজ আঁদ্রে আমার কাছে তার সঙ্গে এলিসের বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিল—আমিও তাতে মত দিয়েছি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কি, না, কোন অসুবিধা হবে?"

"অসুবিধা আর কি! বেশ, তাহলে আমিও যাব।" তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া পল কহিল, "তবে আমি শুধু বলতে এসেছিলুম, কিছু দিনের জন্য আপাততঃ আমি টিউনিসে চলেছি,—"

জুজ কহিল, "টিউনিসে,—হঠাৎ?"

পল কহিল, হাঁ, সে টিউনিসে চলিয়াছে। তাহাকে যাইতেই হইবে। নবাবকে এই ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রগুলার মুখের সম্মুখে রাখিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে—উপায় নাই! না গেলে নয়! এখানে ডিউক মোরা আছেন, তিনি নবাবকে ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, এ আশা বিলক্ষণ আছে।

এমন সময় আলিন আসিয়া ডাকিল, "বাবা—" পরে পলকে দেখিয়া থমকিয়া সে থামিয়া গেল। জুজ কহিল, "কি মা? এই যে পলও আমাদের সঙ্গে যাবে, চড়ি-ভাতিতে যোগ দেবে।" আলিন কোন কথা বলিল না—তাহার মুখে স্বর ফুটিল না। পল তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আমায় তোমাদের চড়ি ভাতির দলে নেবে, আলিন?"

আলিন কোনমতে কহিল, "বেশ ত।"

জুজ কহিল, "পল টিউনিস যাচ্ছে, আলিন। কতদিন বাদে যে ফিরবে—"

আলিনকে কে যেন অতর্কিতে নিষ্ঠুর আঘাত করিল। মনের সে বেদনা চাপিয়া আলিন একেবারে পলের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টিউনিসে?"

পল কহিল, "হাঁ, আলিন।"

আলিনের বুকের মধ্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল। টিউনিসে! তাহার অর্থ, কতদিনের অদর্শন! কতদিনের—!

জুজ কহিল, "হাঁ, ভাল কথা, তোমাদের টেরিটোরিয়েলের কি হল? কর্সিকার সে কারবার চলছে কেমন? এখনও যে নবাবের নাম দেখছি,—বোর্ডের চেয়ারম্যান আছেন। এই আলিবাবার গুহা থেকে নবাবকে টেনে বার করতে পারছ না? বার করা ভারী দরকার হয়ে পড়েছে, মোদ্দা—"

"আমি বুঝি, ম্যসিয়ো জুজ। কিন্তু মান নিয়ে ওখান থেকে এখন বেরুতে হলে ওতে অনেক টাকা ঢালতে হয়—প্রায় তিন লাখ! অত টাকা এখন হাতেও নেই। টিউনিসে তাই আমি যাচ্ছি ত—টাকার জোগাড় করতে শুধু। বে ত সর্ব্বস্ব গ্রাস করবার উদ্যোগ করেছে—দেখি, যদি তার গ্রাস থেকে কিছুও বার করে আনতে পারি! এখন তবু কিছু আদায়ের ভরসা আছে—নাহলে পরে—"

বাধা দিয়া জুজ কহিল, "না, তাহলে তুমি যাও, দু-একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, থলি ভরে টাকা আনো—আর সেই টাকায়

নবাব বেচারাকে ঐ জোচ্চোরদের আড়ৎ, পাগানেতিদের দল থেকে উদ্ধার কর। মোদ্দা, আমি ভাবছি, হেমারলিঙ যে তোমাদের অমন শত্রু, সে ওতে লুকিয়ে খানকতক শেয়ার কিনলে না যে—?"

আলিন এবার কথা কহিল, গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "বাবা—"

"কেন মা?"

আলিন কহিল, "আজ সকালে আমাদের এই আনন্দের মাঝখানে ও লোকটার নাম আর এনো না, বাবা।"

জুজ উত্তেজিতভাবে কহিল, "ঠিক বলেছিস মা। সে রাস্কেলটা,—তার কথা মনে হলে আমার যেন আর মোটেই জ্ঞান থাকে না। ভগবান এতও সইছেন ত! আশ্চর্য্য!"

সহরের শেষে নদীর বালুময় উপকূলে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এক ধারে গাড়ী চলিবার পাকা রাস্তা। বেলা পড়িলে এই পথে ধনী ও বিলাসীর শকটের সমারোহ লাগে—দলে দলে সব গাড়ী চড়িয়া এখানে বেড়াইতে আসে। পল এধারে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই।

একটা ঝোপের ধারে চড়ি-ভাতির আয়োজন হইয়াছিল। সে আনন্দ শেষ করিয়া সকলে এই পথেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পল ও আলিন সকলকে আগাইয়া আসিয়াছিল। এই বিচিত্র শোভায় দুইজনের প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব পুলক মুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল! এমন সুখের স্বাদ পল পূর্ব্বে আর কখনও পায় নাই। এত সুখ পৃথিবীতে আছে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। আলিনের কোমল হাতখানি পলের হাতে মালার মত বিছাইয়া পড়িয়াছিল—ফুলের মালার মতই তেমনই মৃদু স্পর্শটুকু! দুইজনে ধীরপদে চারিধারের বিচিত্র শোভার মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছিল। জুজ, এলিস, আঁদ্রে, হেনরিতা প্রভৃতি পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। এই দীর্ঘ সরল পথে বেড়াইতে বেড়াইতে পলের মনে হইল, তাহাদের সম্মুখে সংসারের দীর্ঘ পথটাও এমনই সরল পড়িয়া রহিয়াছে! কোথাও বাঁক নাই! সে পথে তাহারা দুইজনে এমনই শান্তি বুকে লইয়া, মিলনের নিবিড় বাহুপাশে পরস্পরকে এমনই বাঁধিয়া—দুইজনের প্রাণের সমস্ত প্রেমের ছায়ায় ঢাকা এমনই শ্যামল স্নিগ্ধ পথে চলিয়া যাইবে! আলিনের বুকের মধ্যে এক নূতন রাগিণী সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—এক নূতন আবেশ! তাহার মন হইতে সকল দুর্ভাবনা আজ দূর হইয়া গিয়াছিল।

সহসা চলিতে চলিতে দুইজনে দেখিল, দূরে ছায়া-মূর্ত্তির মত দুইজন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলিয়াছে। ক্রমে মূর্ত্তি একটু স্পষ্ট হইলে, উভয়েই বুঝিল, তাহাদের একজন পুরুষ অপরটি নারী। ঘোড়া ধীর পদে চলিয়াছে। ক্রমে মূর্ত্তি আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—অশ্বারোহী দুইজন ক্রমে আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া গাছের অন্তরাল দিয়া প্রান্তর-মধ্যে প্রবেশ করিল—তখন তাহাদের আর চিনিতে বাকী রহিল না। পুরুষটি ডিউক মোরা, আর নারী ফেলিসিয়া।

পলের মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। সে আলিনকে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "চিনতে পারলে?"

আলিন চিনিয়াছে—তাহার সমস্ত প্রাণ সুগভীর লজ্জায়, দারুণ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহাকে অন্যায় কিছু করিতে দেখিলে মনে যে ভাব হয়, আলিনেরও সেইরূপ হইল। সে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "বেচারী ফেলিসিয়া!"

ফেলিসিয়াকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইলেও কথাটা পলের মনে কাঁটার মতই বিঁধিল। এই ফেলিসিয়ার উপর কতখানি তাহার বিশ্বাস ছিল! সে বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, আজ! তবুও এ বেদনার মধ্যে একটা আরাম ইহাই ছিল যে দুর্ভাগিনী ফেলিসিয়ার জন্য আলিনের নির্ম্মল প্রাণ এতখানি কাতর, পীড়িত! এ সমবেদনায় পল আজ আলিনের প্রাণের যে পরিচয় পাইল, তাহাতে সে জুড়াইয়া গেল।

বেদনাময় এই স্তব্ধ ভাবটা কাটাইবার অভিপ্রায়ে পল নবাবের কথা ও সেই-প্রসঙ্গে তাহার নিজের টিউনিস যাইবার কথা পাড়িল। আলিন কহিল, "তুমি চিঠি লিখো কিন্তু, পল, বেশ বড় বড় চিঠি। যা দেখবে শুনবে, সব খুলে লিখো। আমরা এখানে বসে তোমার চিঠি থেকে সে দেশের পরিচয় নেব। বাবাকেই কিন্তু চিঠি লিখো।"

এই সতর্কতায় পল আর একটা গোপন বিষয়ের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইল। সে কথাটা স্পষ্ট করিয়া কোনদিন সে জানিতে পারে নাই। আজ এ সতর্কতার আয়োজন দেখিয়া তাহার অনেকখানি দ্বিধা অনেকখানি সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। সে সাহস পাইয়া অলিনের হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি কি ভাবছিলুম, জানো, আলিন? আমার মনে বড় অশান্তি। তুমিই শুধু তা ঘুচোতে পার। যদি তোমার দয়া হয়, যদি তুমি আমায় তোমার দয়ার অযোগ্য না ভাব, আলিন—তাহলে আরও একটা কথা বলি, শোন। আমি একটা গুরুতর অন্যায় করেছি। আমার বুক ভেঙ্গে যেত, কিন্তু একটা জিনিষ এ বুকটাকে ঠিক রেখেছে। সে কি জিনিষ, জানো—?"

পল বুকের পকেট হইতে ফ্রেমে বাঁধা ছোট একখানি ছবি বাহির করিল—পেন্সিলে আঁকা সুন্দর একখানি মুখের আভাষ! আলিন মুহূর্ত্তে সে মুখ চিনিতে পারিল। তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এ তাহারই মুখ! ফেলিসিয়া একদিন তাহাকে বসাইয়া পেন্সিল দিয়া আঁকিয়া লইয়া ছিল। আড়ম্বরহীন সারল্যে মণ্ডিত ছোট সুন্দর মুখখানি!

পল কহিল, "এ ছবি আমার—ফেলিসিয়া আমায় দিয়েছে। আজ আমি চলে যাচ্ছি, তাই বলছি, এ ছবি কাছে রাখতে আমার বড় আনন্দ হয়, যদি নিজের হাতে এ ছবি আমার বুকে তুমি তুলে দাও; অপরের কাছ থেকে এ ছবি পাবার কোন অধিকার নেই আমার। সে আমি চাই-ও না। নাও, আলিন—তোমায় আজ এ ছবি আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার অনুমতি না পেলে এ ছবি রাখবার অধিকার আমার থাকতেও পারে না। যদি তুমি আমার চেয়ে যোগ্যতর কোন বন্ধুকে এ ছবি দিলে সুখী হও, তাহলে এ ছবি তাকেই দিয়ো। আর, আর যদি তোমার মনে হয়—"

পল কথাটা শেষ করিতে পারিল না। আলিনেরও সব কেমন গোল হইয়া যাইতেছিল। গেরির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল, "যদি আমার মনের কথা জানতে, পল—তাহলে এর উত্তরের জন্য কখনই তোমায় এমন ভাবে অপেক্ষা করতে হত না। তুমি যদি আমায় ভাল বেসে থাক, যেমন তুমি বলছ, তাহলে আমিই বা তোমায় না ভালবেসে থাকি কি করে, পল? তবে তুমি ত জান, আমি স্বাধীন নই—আমাকে আর একটা সংসার মাথায় করে থাকতে হয়েছে। দেখ, চেয়ে দেখ—"

পিছনে অদূরে জুজ, এলিস, হেনরিতা প্রভৃতি আসিয়া পৌছিয়াছিল। আলিন তাহাদের পানে লক্ষ্য করিল।

পল কহিল, "আমিও স্বাধীন নই, আলিন। তোমার মত আমারও শত কাজ শত দায়িত্ব আছে। তোমার সংসার থেকে আমি তোমায় বিচ্যুত করতে চাই না, আলিন। তুমি যেমন আছ, তেমনই থেকো, তবে শুধু আমায়—আমায়—"

কৃতজ্ঞতায় আলিনের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "এ্যাঁ, এত দয়া! পল, আমি বড় ভাবনায় পড়েছিলুম, সে ভাবনার হাত থেকে আজ তুমি আমায় মুক্তি দিলে। তোমার আলিন তোমার কাছে আলিন, আর এ সংসারে সবার কর্ত্রী—তাই থাকবে? তবে ও ছবি তোমার কাছেই রাখো—আমি নিজের হাতে তোমায় দিচ্ছি। শুধু ছবি নয়—আমি নিজেকেও আজ তোমায় দিয়ে দিলুম—যদি তোমার নিতে কোন আপত্তি না থাকে! নাও পল, আমায় নাও। আমার সর্ব্বস্ব, আমার প্রাণ, আমার মন, সব আজ থেকে তোমার—তোমারই শুধু।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্রোতের ফুল

(২৮)

বিপিন পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরাবর লাইব্রেরীতে গেল। দেখিল সেখানে দুই হাঁটু হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া নিধিরাম ঘুমাইতেছে। বিপিন আসিয়া বেদনা-কাতর কণ্ঠে ডাকিল—নিধিদা।

নিধিরাম চমকিয়া জাগ্রত হইয়া বলিল—কেন ভাই?

বিপিন বলিল—আমি কলকাতায় যাব আমার জিনিষপত্তর গুছিয়ে দে।

নিধিরাম বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে কোনো কথা না

বলিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বিপিন আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সে কোথায় যাইবে, কি করিবে, কোথায় সে একটু সান্ত্বনা পাইবে? এই চিন্তার মধ্যে সে যতই ডুবিতে লাগিল দেখিল ইহার তল নাই, পার নাই। তাহার পিতা খুড়িমা ও মালতীকে শুদ্ধ তাড়াইতে চাহিয়াছেন, শুধু তাহারই জন্য। বিপিন ভাবিতেছিল সে চলিয়া গেলে তাঁহাদের বিপদ কাটিয়া যাইবে। অতএব তাহাকে যাইতেই হইবে।

নিধিরাম তাড়াতাড়ি গিয়া গিন্নিকে বলিল—মুনিবমা, ছোটবাবুর কি হয়েছে। মুখ একেবারে কালবৈশাখীর মতো আঁধার! আমায় বল্লে, নিধিদা আমি কলকাতায় যাব জিনিষপত্তর গুছিয়ে দে।

গিন্নি চিন্তিত হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে তুই কিছু জানিসনে?

—না। এখনি রামধন এসে মহারাজের কাছে ছোটবাবুকে ডেকে নিয়ে গিছল। সেখান থেকে ফিরে এসেই আমায় ঐ কথা বললে।

—ডাক দেখি একবার রামধনকে শুনি কি হয়েছে।

নিধিরাম রামধনকে ডাকিয়া আনিল। রামধন আসিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। তখন গিন্নি বলিলেন—আমি আর পারি না বাপু। আমারই হাড় ভাজা-ভাজা করে তুললে! কোথায় বেটার বিয়ে দিয়ে বরণ করে বৌ ঘরে তুলব, না, বেটাই চললেন বিবাগী হয়ে। কি কুক্ষণে মালতী ভিটেয় পা দিয়েছিল যে কোনো দিকে ভালাই নেই! চ দেখি, বিপিন কোথায়।

গিন্নি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—বাবা বিপিন।

বিপিন মাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার দুই চোখ দিয়া বড়বড় অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গিন্নি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বসিলেন। বিপিন মার বুকে মুখ লুকাইয়া দারুণ অভিমানে ও দুঃখে শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল। গিন্নিরও অশ্রুধারা বিপিনের মাথায় শুভাশীর্ব্বাদ ও পরম সান্ত্বনার রূপে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক ক্রন্দনের পর গিন্নি বলিলেন—বাবা বিপিন, কি ছেলেমানুষী করছিস বাবা। নিজেও কষ্ট পাচ্ছিস, সকলকেই কষ্ট দিচ্ছিস। তুই ত কখনো এমন ছিলিনে।

বিপিন বলিল—আর তোমাদের কষ্ট দেবো না মা, আমি এইবার জন্মের মত যাচ্ছি।

—বালাই ষাট, বংশের দুলাল তুই, তুই কোথায় যাবি বাবা? সবার আগে তোকেই যে আমি কোলে পেয়ে মা হয়েছিলাম; সে কোল তুই ইচ্ছে করে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে যেতে পারবি?

—কি করব মা, তোমায় ছেড়ে আমি কখনো বেশিদিন কোথাও থাকিনি, তবু থাকতে হবে। নিয়তি আমায় টানছে। বুক ভেঙে যাবে, তবু আমায় থাকতে হবে।

—ছি বাবা অমন কথা বলতে নেই। আমায় ছেড়ে তুই কোথায় যাবি?

—যেতেই হবে মা, বাবার হুকুম। আর থেকেও ত কোনো লাভ নেই, আমি ত পদে পদে তোমাদের জ্বালাতন করছি। আমি যে-অবধি এবার বাড়ীতে এসেছি সে-

অবধি ত আমার জন্যে তোমাদের সুখ নেই। আমার মত যখন তোমাদের মতের সঙ্গে শুধু বিরোধ বাধাতেই আছে, তখন আমার দূর হওয়াই ভালো।

—বালাই বালাই ষাট ষাট! শত্রু দূর হোক! অকল্যাণ দূর হোক। তুই চিরজীবী হয়ে আমায় বিরক্ত কর—তাইতেই আমার আনন্দ, তাইতেই আমার সুখ।

বিপিন এই স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতেছিল! কিন্তু তখনি তাহার মনে পড়িল এবাড়ীতে মালতী আছে। তখন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—না মা, এবাড়ীতে আমার আর থাকা হবে না, আমায় অন্যত্র যেতেই হবে।

গিন্নি পুত্রের দৃঢ়তায় স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—বিপিন, তোর মুখ চেয়েই আমি পুত্রশোক ভুলেছিলাম। আমি কাঁদলেই তুই কাঁদতিস বলে আমি প্রাণ খুলে কাঁদিনি। আমায় কাঁদিয়ে যদি তুই যেতে পারিস, যা। তুই যেখানেই থাক আমার আশীর্ব্বাদে তোর মঙ্গল হবে।...তোর যদি মন খারাপ হয়ে থাকে ত কিছুদিন না হয় অন্যত্রে গিয়ে থাক; কিন্তু এই পোষ মাসে বাড়ী থেকে কি বেরুতে আছে? লোকে কুকুর শেয়াল বাড়ীর বার করে না, ঝাঁটা কাড়ে না, আর তুই ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে যাবি?

—মা, যে নিজেই অলক্ষণ তার আবার লক্ষণ করে যাত্রার দরকার কি? আমি আর থাকতে পারব না মা।

—যা খুসি কর। তুই আমার পেটের ছেলে হলে কখনো আমায় এমন করে দুঃখ দিতে পারতিস নে।—বলিয়া গিন্নি পরিপূর্ণ বেদনায় চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন। বিপিন একাকী বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল বিপিন বিতাড়িত হইয়া কলিকাতা যাইতেছে। পুরস্ত্রীগণ অজ্ঞাত আশঙ্কায় অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া স্তম্ভিত হইয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল। গিন্নি যখন চোখ মুছিতে মুছিতে অসময়ে ঘরে গিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন, তখন খুড়িমা বিপিনের এবং রোহিণী মালতীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

খুড়িমা আসিয়া দেখিলেন বিপিন চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। খুড়িমা বলিলেন—বাবা বিপিন, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে বাবা?

বিপিন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এখানে আর থাকা পোষাল না খুড়িমা।

—সে কি বাবা? তোমার বাড়ী তোমার ঘর, তোমার পোষাল না, একি একটা কথা? তুমি গেলে আমরা কার ভরসায় থাকব? আমাদের মতন হতভাগিনীদের কথা একবার ভাবছ না বাবা?

—ভেবেছি খুড়িমা। আমি এসেই নানা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলেছি। আমি গেলেই সব আবার শান্ত হয়ে যাবে। যদি না হয় তবে তখন আমার কাছে যেয়ো। নিরাশ্রয় আমার আশ্রয় তোমাদের সুখে না রাখুক শান্তিতে রাখবে।

—কিন্তু বাবা, আমি শুধু নিজের

স্বার্থের জন্যে বলছিনে। দিদির যে তুমি-অন্ত প্রাণ! সৎমা এমন দেখিনি, দেখব না!

—খুড়িমা, আমার মার মন কি আমি জানি না। তবু যেতে হবে।

—থাকা কি এতই কঠিন বাবা?

—হ্যাঁ খুড়িমা। বাবা বলেছেন হয় ঝিনুকপোঁতায় বিয়ে করতে হবে, নয় এবাড়ী থেকে যেতে হবে।

—ঝিনুকপোঁতায় বিয়ে করাটা কি এতই শক্ত বাবা?

—হ্যাঁ খুড়িমা। যে কাজে মন প্রসন্ন হয়ে অগ্রসর না হয় সে কাজ করতে নেই। আমার বাপ মার জেদের জন্যে একটি শিশু বালিকার সর্ব্বনাশ করবার আমার কি অধিকার আছে?

—বড়ঠাকুরকে একটু বুঝিয়ে বল না, তোমার পছন্দ-মত পাত্রী সন্ধান করুন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—সে হবার জো নেই খুড়িমা। আমার যেমন পছন্দ আছে, পাত্রীরও ত তেমনি একটা পছন্দ আছে? আমি তাকে পছন্দ করলেই যে সে পছন্দ করবে তার ত কোনো মানে নেই। কাজেই ওসব চেষ্টা আমি ছেড়েই দিয়েছি।

খুড়িমা বলিলেন—মেয়েমানুষের আবার পছন্দ অপছন্দ কি?

বিপিন হাসিয়া বলিল—এই জন্যেই ত বরাবর আমার সঙ্গে বিরোধ বেধে আসছে। তোমরা মেয়েমানুষকে মানুষ মনে কর না। কিন্তু তাদেরও ভালো মন্দ বিচার আছে, পছন্দ অপছন্দ আছে, প্রাণ আছে।

—কি জানি বাবা! তোমাদের মতন ত আমরা পণ্ডিত নই। যা ভালো বোঝ কর।—বলিয়া খুড়িমা বিষণ্ণ মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পাশের ঘরে বসিয়া মালতী সব শুনিতেছিল।

এমন সময় রোহিণী আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া চাপা গলায় বলিল—দিদিমণি, শুনেছ? দাদাবাবু কলকাতা চলে যাচ্ছে!

মালতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রূঢ়ভাবে বলিল—হাঁ শুনেছি! তা যাচ্ছেন ত আমার কি?

রোহিণী গালে হাত দিয়া ন্যাকামির স্বরে বলিল—ওমা, এমন সুন্দর দাদাবাবু আমাদের, ঘড়বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল—না। তোমাদের দাদাবাবু, আমার কে? আমি তাঁকে বেশিদিন দেখেছি, না ভালো করে চিনি, যে, আমার কষ্ট হবে? একটা মানুষ ঝগড়া করে যাচ্ছে এই বলেই একটু যা খারাপ লাগছে।

রোহিণী একেবারে হতাশ হইয়া মুষড়িয়া পড়িল। সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে দেখিবে মালতী ফোঁস-ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছে, কাটা কইমাছের মতো অ-শেষ বেদনায় ছটফট করিতেছে। কিন্তু তাহার কোনো লক্ষণ ত দেখিলই না, অধিকন্তু তাহার উল্টাভাব দেখিয়া রোহিণীর এতকালের সব পোষা ধারণা-গুলা যেন ওলটপালট হইয়া গেল। সে নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে প্রস্থান করিল।

পাশের ঘরে যতই মোটমাটরি কথা হইতে লাগিল মালতীর মনের উপর ততই টান পড়িতে লাগিল। আজ সে পুনরায় নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করিতে লাগিল। আজ যে আর কিছুতেই অশ্রু রোধ করিয়া রাখা যায় না। সে ক্রমশ আসন্নবর্ষণ মেঘের মতন গম্ভীর থমথমে হইয়া উঠিল। চূড়া-বাঁধা সেতারের মতো তাহার সমস্ত হৃদয় বেদনায় ঝনঝন করিয়া উঠিতে লাগিল, কথা বলিতে গলা কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় যখন বিপিনের যাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন আর সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সে যতই চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করে অশ্রু ততই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার সময় রোহিণী ঘরে প্রদীপ দিতে আসিল। মালতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া, অধর দংশন করিয়া বসিয়া রহিল। রোহিণী দেখিল মালতীর মুখখানি সন্ধ্যার পদ্মের মতো আলোহিত ম্লানিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তাহার উপর প্রদীপের সোনালি আভা যেন অস্তসূর্য্যের করস্পর্শের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রোহিণীর নয়ন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, প্রদীপ রাখিতে সে ভুলিয়া গেল। খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাহার অত্যন্ত করুণা বোধ হইল, সে সান্ত্বনার স্বরে বলিল—দিদিমণি তুমি ভেবনি, দাদাবাবুর হয়ত যাওয়া হবে না, রাণীমা রাজাবাবুকে বলতে গেছেন।

মালতী আর নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রোহিণীর সম্মুখে তাহার এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়াতে সে যতই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল ততই তাহার কান্না রোধ করা দায় হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—পোড়ারমুখী তুই বেরো আমার সামনে থেকে। আমাকে তুই এমন করে কেন জ্বালাস, কেন দগ্ধাস? আমি তোর কি করেছি? আমি শুনতে চাইনে চাইনে তোর দাদাবাবুর কথা! আমায় অপমান করিসনে! তোর পায়ে পড়ি তুই যা! তুই যা!

রোহিণী অবাক হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া প্রদীপ রাখিয়া প্রস্থান করিল, সে বুঝিতেই পারিল না মালতীর এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? মালতীর এই কাণ্ড দেখিয়া তাহার হাসা উচিত, না, রাগ করা উচিত, না, কাঁদাই উচিত! এমন রহস্যময়ী জটিলচরিত্র নারী যে সে বাপের জন্মেও দেখে নাই ইহা সে অকপটেই স্বীকার করিল এবং ইহা তাহার সরলতা ও সত্যবাদিতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া বাড়ীর সকলেই তাহার কথায় বেশ জোরের সহিত সায় দিল।

মালতী যখন শুনিল যে বিপিনের যাওয়া সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে এবং সকলেই তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছে তখন তাহার অন্তরে একটি অস্বীকৃত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং আনন্দ উল্লাসের অনুভব যখন ক্রমশ অস্বীকার

করা অসম্ভব হইল তখন সে গলায় কাপড় দিয়া হাত জোড় করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিতে লাগিল—হে ঠাকুর, তাঁর যেন থাকা না হয়, তাঁর যেন থাকা না হয়। তাঁর মনে বল দাও, তিনি যেন সকল বাধা অতিক্রম করতে পারেন। আমার কাছে থেকে তাঁকে দূরে নিয়ে যাও হে ঠাকুর!

এমন সময় হরিবিহারীর খড়মের পশ্চাতে গিন্নির বাঁকমলের শব্দ শোনা গেল।

গিন্নি পুত্রের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বামীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে বলিলেন—আমার বিপিনকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমি এই শূন্য পুরীতে কি করে থাকব? আমাকে সুদ্ধ পাঠিয়ে দাও।

হরিবিহারী বলিলেন—আরে ক্ষেপছ কেন? বিপিন যাবে কোথায়? কোথাও যাবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকগে।

গিন্নি বলিলেন—তার মোট-মাটরি বাঁধা হয়ে গেল, তুমি বলছ সে যাবে না! তুমি নিষ্ঠুর পাষাণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কিন্তু মায়ের প্রাণ নিশ্চিন্ত হবে কি করে?

হরিবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—চল, আমি এক কথায় বিপিনের যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি। সে আর যাবার নামটি করবে না।

গিন্নি আশ্বস্ত হইয়া স্বামীর সহিত পুত্রের কক্ষদ্বারে আসিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে আশায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। পুত্র পিতার কথায় প্রতিনিবৃত্ত হইলে মাতা পুত্রকে কি কি স্নেহের অনুযোগ করিবেন গিন্নি তাহাই উৎফুল্ল মনে চিন্তা করিতেছিলেন।

হরিবিহারী বলিলেন—বিপিন, আমার ওপর রাগ করে ত চলে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমার জিনিষগুলির প্রতি ত যথেষ্ট অনুরাগ দেখছি। ঘর সর্ব্বস্বই ত বেঁধে জড়ো করেছ। আমার কোনো জিনিষ তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, বলে দিচ্ছি।

বিপিন অবাক হইয়া পিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—বেশ তাই হবে, আমি এক কাপড়েই যাব।

হরিবিহারী মনে করিয়াছিলেন তাঁর এই জমিদারী চালটি একেবারে অকাট্য, বিপিনকে জিনিষ লইয়া যাইতে বারণ করিলে বিপিন আর একপাও নড়িতে পারিবে না। কিন্তু বিপিনের দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহার সে ভুল একেবারে ভাঙিয়া গেল। এর পর আর পুত্রকে ঘরে থাকিতে অনুনয় করাও চলে না। সুতরাং পুত্রের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া এবং গৃহিণীর নিকট তিরস্কৃত হইবার ভয়ে হরিবিহারী সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে পলায়ন করিলেন।

গিন্নি তাড়াতাড়ি গিয়া বিপিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিপিনও কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অশ্রুবর্ষণের পর গিন্নি বলিলেন—কর্ত্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, কি বলেন কি করেন তার ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি এলেন, আমি মনে করলাম সান্ত্বনা করতেই আসছেন। পোড়া কপাল ওঁর বুদ্ধির!.....মাথা খাস বাবা

রাগ করিসনে। ও তোর বাপই ত, রাগের মাথায় যদি কিছু বলে থাকে ত কিছু মনে করিস নে। ওর হয়ে আমি তোর কাছে ঘাট মানছি।

বিপিন চোখ মুছিয়া বলিল—ওকি মা, ওতে আমার অকল্যাণ হবে। বাবা বলেছেন বলে আমি রাগ করছি নে; কিন্তু মা এবাড়ীর কোনো জিনিষই আমি আর ব্যবহার করতে পারব না। স্নেহের দান অযোগ্যকেও অধিকারী করে তোলে; শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে অযোগ্য অক্ষম, কিন্তু মায়ের অজস্র দান স্নেহে সহজ বলে তার নিতে লজ্জা নেই; কিন্তু দেওয়ার অহঙ্কারেই দান করে তবে সে দান মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে তোলে—দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই।

—তা তুই পৈতৃক বিষয় ছেড়ে দিবি?

—হলই বা মা পৈতৃক? আর হলই বা তা বিষয়? যেখানে স্নেহের সম্পর্ক দেনাপাওনার জমাখরচ কাটে সেখানে বিষয় বিষ হয়ে ওঠে। এ সম্পত্তিতে আমার আর অধিকার নেই। আমার অংশ আমি বিনিকে লেখাপড়া করে ছেড়ে দেবো।

—ছি বাবা, এসব কি পাগলামি করছিস। যা তুই কিছুদিন পশ্চিমে বেড়িয়ে আয়। পোষ মাস বলে আমি আর আপত্তি করব না। তবে কি তুই কালই যাবি? কি নিতে থুতে হবে বল জোগাড় করে দি।

—কালই যাব মা, কিন্তু জোগাড় কিছুই করতে হবে না। এক কাপড়েই যাব আমি। এবাড়ীর কোনো জিনিষ আমার অস্পৃশ্য।

—আবার পাগলামি করে। আচ্ছা তুই বাপের জিনিষ না নিস, আমার জিনিষ ত নিতে পারিস। এসমস্ত জিনিষ আমি তোকে আমার স্ত্রীধন থেকে দিয়েছি মনে কর। আর তোরও ত নিজের যৌতুক-পাওয়া জমিদারি আছে।

—সে মা, আমি কিশোরের পাঠশালার জন্যে দান করে দিয়েছি।

—কি সর্ব্বনাশ! তিন তিনখানা তালুক পাঠশালায় দান! যা খুসি তোর করগে যা। তোকে অলক্ষ্মীতে পেয়েছে, আমরা কি করব আপনার সর্ব্বনাশ যদি তুই আপনি ডেকে আনিস।

পুত্রের এতবড় অর্বাচীনতায় গিন্নি বিস্মিত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া হনহন করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—কালই যাওয়া ঠিক হল ভাই?

বিপিন বলিল—হাঁ নিধিদা।

নিধিরাম আবার পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিতে ব্যস্ত হইল। বিপিন বলিল—ওসব আর তোর বাঁধাবাঁধি করতে হবে না নিধিদা; আমার কিছুরই দরকার নেই।

নিধিরাম বোচকা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—তোমার না দরকার হতে পারে, কিন্তু আমার ত হবে।

বিপিন বলিল—না না, তোর যেতে হবে না। আমি একলাই যাব।

—আমার যেতে হবে কি হবে না, সেটা তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি। তোমাকে

এতবড়টা কর্‌লে কে? তোমার নিধিদা যেদিন মরবে সেদিনই তোমার কাছ ছাড়বে; তার আগে নয়।

বিপিন এই স্নেহশীল ভৃত্যের স্নেহের দাবী অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় বিনি ঘরে আসিয়া বিপিনের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বল্‌দা, মা বলথিল তুমি কলকাতায় পালিয়ে যাথ। মা কাঁদতে, আমি দেতে দেবো না।

এই বলিয়া বিনি বিপিনের গলা জড়াইয়া ধরিল। বিপিনও তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশু বাহিরে দেখিয়া আসিয়াছে মা কাঁদিতেছে, এখানে আসিয়া দেখিল দাদা কাঁদিতেছে, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অপরিস্ফুট বেদনায় ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন চোখ মুছিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বালিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

পাশের ঘরে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া বসিয়া মালতী যখন শুনিল যে বিপিনের যাওয়া স্থগিত হইল না, তখন দুঃখ ও আনন্দের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া শতখান হইবার উপক্রম হইল। সে সমস্ত রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া তুলিল। এখন তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার জন্যই বিপিন দেশত্যাগী হইতেছে।

সমস্ত রাত্রি দুর্ভাবনায় জাগিয়া থাকিয়া অতি প্রত্যুষে মালতী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনো দেবকন্যা উষা আসিয়া আকাশের আঙ্গিনা হইতে সমস্ত রাতের ঝরা বাসি তারার ফুল ঝাঁট দিয়া সোনার ছড়া দেয় নাই। অন্দরের পুকুর-পাড়ের ষষ্ঠীপূজার অশ্বত্থ-গাছে সবে মাত্র বুলবুল দোয়েল শ্যামা জাগিয়া উঠিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া প্রকৃতিকে জাগাইতেছিল; প্রকৃতি তখনো কোয়াসার চাদরে মুখ ঢাকা দিয়া নীরবে ঘুমাইতেছে; দীঘির শাদা জলের স্ফটিক মেঝের উপর লঘু চরণ ফেলিয়া বাতাস তখনো নাচিতে আরম্ভ করে নাই। সুবৃহৎ পুষ্করিণী যেন বনদেবীর দর্পণের মতো পড়িয়া রহিয়াছে,—ঘন সবুজ রঙের একখানি প্রকাণ্ড ফ্রেমে আঁটা। বেগুনী রঙের আকাশ তখনো নিদ্রায় অচেতন, তাহার হৃৎস্পন্দন নাড়ীর গতি গ্রহতারকায় দপদপ করিতেছিল। পশ্চিম দিগন্তে কমলা রঙের পাল মেলিয়া চন্দ্র তখনো অস্ত সাগরে পাড়ি দিতেছিল। কিন্তু তখনই বৃদ্ধ দুবেজী পুকুর-পাড়ের বাগানে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে মধুর উদাত্ত স্বরে ভজন গাহিতেছিল।—

আয় ইয়ার তুয়ে ন যায় ভুল!
পাত পাতমে তু-ই রঙিলে,
তু-ই রঙিলে ফুল!

মালতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিতে লাগিল, বিপিনও জাগ্রত হইয়া পাশের ঘরে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে। মালতী একপা একপা করিয়া বিপিনের ঘরের দিকে যায় আর থামে। অনেক ইতস্তত করিয়া মালতী বিপিনের ঘরের দরজার সামনে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিপিন তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

মালতী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল—আপনার যাওয়া কি একেবারে ঠিক?

বিপিন গম্ভীর ভাবে বলিল—হাঁ।

—কবে ফিরবেন?

—এ বাড়ীতে আর আমার ফেরবার জো নাই। এই আমার অগস্ত্য-যাত্রা।

মালতী মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুমি কোথায় যাবে মালতী?

—যেখানে নিয়ে যাবেন।

বিপিন মালতীর দিকে চাহিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—কবে কাল আমায় অমন করে দুঃখ দিলে বলেন মালতী?

মালতী মৃদুস্বরে বলিল—পাছে আপনাকে আবার জন্যে মা বাপকে ত্যাগ করতে হয়।

বিপিন বলিল—আজকে আমি সব ছেড়ে তবে তোমায় পেলাম। তোমার মূল্য এতদিন আমি বুঝিনি।

মালতী নত হইয়া বিপিনকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল। বিপিন তাহাকে বাহু বেষ্টনে তুলিয়া ধরিয়া ফুলের মতো তাহার মুখখানিতে চুম্বনের পর চুম্বন করিল। তখন লজ্জা আসিয়া মালতীর চোখ দুটি চাপিয়া ধরিল, যেন লজ্জাবতী লতা স্পর্শ পাইয়া ঢলিয়া পড়িল, যেন মুক্তাগর্ভ শুক্তি মুদ্রিত হইল, যেন অস্তরবির শেষ কিরণটি বুকে করিয়া কমলদল বন্ধ হইল! উষার অরুণরাগ তখন সমস্ত ঘরখানিকে নববিবাহের রক্তিম-চ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; মালতীর হাসির মতো সেই লালিমা বিপিনের অন্তর বাহিরের মতো সেই ঘরখানিকে বিবাহের রঙে রাঙাইয়া তুলিয়া বিপিনের অনির্ব্বচনীয় ভাবনায় বাসনায় সোনা মাখাইয়া দিতেছিল।

প্রণয়-বেদনার তাড়নায় উপযাচিকা হইয়া আপনাকে দান করার লজ্জায় মালতীর চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। দুর্লভ প্রার্থিতকে পাইয়া বিপিনের আনন্দ তাহাকে বিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের সুখের আবেশ ভাঙিয়া গেল—তাহারা দেখিল, গিন্নি ও খুড়িমা আসিয়া দরজার সামনে স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বিপিন মালতীর হাত ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে প্রণাম করিল।

গিন্নি চীৎকার করিয়া বলিলেন—ছোট বৌ, এমনি করেই কি শোধ তুলতে হয়?

খুড়িমা সে কথায় কান না দিয়া বিপিনকে কঠোর স্বরে বলিলেন—বিপিন, তোমার ওপরে আমার বড় বিশ্বাস ছিল। তোমরা বাপে বেটায় মিলে আমার ধন মান দু-ই নষ্ট করলে!

বিপিন বলিল—খুড়িমা, তুমি আমায় ভুল বুঝো না, মালতী আমার স্ত্রী, মালতীকে আমি বিয়ে করব।

খুড়িমা গিন্নির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দিদি, বড়ঠাকুরকে বলে আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর এ বাড়ীতে থাকব না।

গিন্নি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—মনস্কামনা সিদ্ধ হল, আর থাকবে কেন?

দেখিতে দেখিতে বাড়ীর সকল লোক আসিয়া সেখানে ভিড় জমাইয়া তুলিল।

হরিবিহারী দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন—পাল্কী এসেছে তোমরা সব এখনি দূর হও। তোমরা মনে করেছ এমনি ষড়যন্ত্র করে হরিবিহারী রায়কে জব্দ করবে? হরিবিহারী রায় জব্দ হবার পাত্র নয়। তোমরা শিগগির দূর হও।

সেই সময়ে প্রভু-পরিবারে বিপ্লবের সংবাদ না জানিয়া বৃদ্ধ দুবেজি তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছিল—

প্রমুদিত পুরনরনারী সব সজহিঁ সুমঙ্গলচার।
এক প্রবিসহিঁ এক নির্গমহিঁ ভীর ভূপদরবার॥

হরিবিহারী দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

—মা, এ বাড়ীতে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। তবে আমরা যাই।—বলিয়া বিপিন মালতীকে লইয়া গিন্নিকে আবার প্রণাম করিল। পরে খুড়িমাও প্রণাম করিয়া সরোদনে বলিলেন—দিদি, আমি জন্মের মতো তোমার চরণ ছেড়ে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে; জেনে হোক না জেনে হোক, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তোমার কাছে যে অপরাধ করেছি তা মার্জ্জনা করে আমায় বিদায় দাও।

গিন্নি সে কথার কোনো জবাব না দিয়া জনান্তিকে ধনুষ্টঙ্কারের মতো বাজিয়া বলিলেন—আমার যে সর্ব্বনাশ করে যাচ্ছে তারও যেন ভাল না হয়, ইহপরকাল নষ্ট হয়। ভগবান আছেন!

খুড়িমা বলিলেন—হাঁ দিদি ভগবান আছেন। আমি যদি কখনো তোমার অনিষ্ট-কামনা করে থাকি তবে আমার ইহকাল ত নেই-ই, পরকালেও যেন অশেষ দুর্গতি হয়,—এ কথা আমি তীর্থে যাত্রা করে তীর্থের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলছি, বাবা বিশ্বেশ্বর যেন আমায় চরণে স্থান না দেন।

গিন্নি আর কোনো কথাই বলিলেন না। পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মাতার চক্ষু অশ্রুসিক্তও হইল না, একটি নিষেধ বাণীও উচ্চারিত হইল না—পুত্রের বারবার বিদ্রোহাচরণে মাতার মনও এমনি প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছিল। বিধবার বিয়ে! এত-বড় অনাচার কেহ কখনো দেখে নাই শুনে নাই। আজ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখিয়া বাড়ী-সুদ্ধ সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় বিনি আসিয়া মালতীর হাত ধরিয়া তাহার কচি মুখ-খানি তুলিয়া আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—মাতীদি, তোল বিয়ে? বল্‌দার ছঙ্গে তুই ছছুল-বালী দাচ্ছিস? আমিও তোল ছঙ্গে ছছুলবালী দাবো!—বলিয়া ঘাড় কাত করিয়া সে মালতীর সম্মতির অপেক্ষা করিতে লাগিল। মালতী তাহাকে কোলে তুলিয়া অশ্রুসিক্ত চুম্বন করিল।

বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া—মালতীদি, তুমি আমার বৌদি! আমি বৌদির মিতবর!—বলিয়া বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মালতী ও বিপিনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

হায়! শিশুরা জানে না যে এই বিবাহ আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত নহে, ইহা দুঃখের দ্বারা অভিশপ্ত। এ বিবাহে মঙ্গলশঙ্খ বাজিল না, পুরাঙ্গনারা হুলুধ্বনি করিয়া বরবধূকে সম্বর্দ্ধনা করিল না, কেহ আশীর্ব্বাদ করিয়া

বরবধূকে বরণ করিল না। কিন্তু তবু ইহা বিবাহ!

পাল্কীর কাছে আসিয়া মালতী বিনিকে নামাইয়া পাল্কীতে উঠিল। বিনিও ছুটিয়া পাল্কীতে চড়িতে যাইতেছিল, রোহিণী ধরিয়া কোলে তুলিল। বিনোদকে হাবার মা গ্রেপ্তার করিল। বিনি বিনোদ দাসীদের কোলে বন্দী হইয়া মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল —আমি যাব! আমি যাব! দাদার বিয়ে দেখতে আমি যাব!

পাল্কীতে মালতী ও খুড়িমা চড়িয়াছেন। হাতীতে বিপিন চড়িবে; এমন সময় নব-কিশোর আসিয়া হাসিয়া বলিল—বিপিন ঠিক সময়ে এসে জুটে গেছি।

তাহারা যাত্রা করিল। এই দুপ্রহর সময়ে পৌষ মাসে অভুক্ত অবস্থায় তাহারা বাড়ী হইতে বিদায় লইল, কিন্তু ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া, বা গৃহস্থের অকল্যাণের ভয়ে কেহই ইহাদিগকে আহার করিয়া যাইতেও অনুরোধ করিল না। তাহারা শূন্য উদর ও ভরা দুঃখ লইয়া যাত্রা করিল। তাহারা সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ। তখন সমস্ত প্রকৃতি মধ্যাহ্ন-বিশ্রামে স্তব্ধ। শুধু বিনোদ আর বিনির তীক্ষ্ণ চীৎকারধ্বনি বিবাহ-উৎসবের সানাইয়ের শব্দের মতো দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্রমে তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া স্বজন-সম্পর্কের ক্ষীণ স্মৃতিটির মতো মিলাইয়া গেল। তখন বিপিন ও মালতী ভাবিতেছিল—এই আমাদের বিবাহ! কী ভীষণ সকরুণ এই উৎসব!

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলো

এ আলো কোথায় পেলে স্বজনি?
নয়নে বয়ানে ফুটে, শিরায় শিরায় ছুটে,
অলকে ঝলকে দিন রজনী!
এ আলো কিসের আলো স্বজনি?

দেখেছি রবির আলো আকাশে,
কোথা তাহে ঢল ঢল এ লাবণ্য সুকোমল
সে যে তীব্র উগ্র জ্যোতি বিকাশে।

শশীর তারার আলো আঁধারে সে লাগে ভালো
চোখে দেয় ঘুমঘোর লাগিয়ে
সকল ফুটায়ে তোলা এ যে নব বিশ্ব খোলা
সকল পরাণ দেয় জাগিয়ে।

মেঘে দামিনীর আলো সে ত নহে স্থির আলো
ক্ষণে আছে ক্ষণে নাই অমনি
এ আলো কোথায় পেলে রমণী?

শুনেছি মাণিক জ্বলে পাতালে।
সে আলো দেখিনি কভু, মনে মোর হয় তবু,
এই যে আলোর প্রাণ মাতালে,

মনের পাতাল তলে যে প্রেমমাণিক জ্বলে
তারি আলো ছুটে দিন রজনী।
এই সে প্রেমের আলো স্বজনি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

চয়ন

রাজ-ভাস্কর ষ্টিফ্যান্ সিণ্ডিং

ষ্টিফ্যান্ সিণ্ডিং যুবক নন,—তাঁহার বয়স এখন উনসত্তর বৎসর। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা এখন পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং, তাঁহাকে লইয়া দু-চারিটা কথা বলিবারও সময় আসিয়াছে। World's Work-এ তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; আমরা তার সার-সংকলন করিয়া দিলাম।

নরওয়ের ডোনথিম্ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অদৃষ্টে কলাবিদের পক্ষে সুদুর্লভ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের অবকাশ ঘটিয়াছিল। কলাবিদেরা প্রায়ই আপনাদের প্রতিভাকে শিশুকাল হইতেই কাজে লাগাইয়া দেন,—পুঁথিগত বিদ্যার দিকে তাঁহাদের মন বড় একটা যাইতে চাহে না। কিন্তু সিণ্ডিং আগে জীবনের জ্ঞান এবং চরিত্র অনুশীলনের দিকে মনোযোগ দিয়া পরে ললিতকলার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে অধিকাংশ শিল্পীরই জীবনের গতি স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়, ললিত কলাতেও তাঁহাদের হাত তখন নিপুণ হইয়া ওঠে, শিল্পক্ষেত্রে তাঁহাদের মক্স করিবার সময় আর থাকে না। কিন্তু সিণ্ডিং, এই পরিণত বয়সেই, পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করিয়া, ললিতকলাকে আপন জীবনের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন।

কিছুকাল তিনি নিজের ঘরে বসিয়াই শিল্পশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর, তিনি বার্লিনে গিয়া একজন ওস্তাদের ছাত্র হইলেন। এখানে তাঁহার প্রতিভা এত শীঘ্র বিকসিত হইয়া উঠিল যে, ছয়মাস কাল শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়াই তিনি পাকা হইয়া উঠিলেন এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইল। তখন তিনি আপনার জন্মভূমিতে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

তাহার পর, তিনি দশবৎসর কাল ফ্রান্স ও ইতালী দেশের প্রাচীন শিল্প দেখিবার জন্য বিখ্যাত স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিয়া আপনার কলাভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কোপেনহেগেন নগরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার বিকসিত প্রতিভার খ্যাতি শীঘ্রই দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। এখানে তিনি ডাঃ কার্ল জ্যাকবসন নামে একজন কলারসজ্ঞ ধনবানের সহিত পরিচিত হইলেন। সিণ্ডিং যে-সকল মূর্ত্তি তৈয়ারি করিতেন, এই ধনী বন্ধু সেগুলি যথোপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সিণ্ডিংও ডেনমার্কেই স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গেলেন।

সিণ্ডিংএর আর্টের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা অতীত যুগের অনুসারী হইয়াও বিদ্যমান যুগের এবং কলাবিদের নিজস্ব বিশেষত্বের পরিচয় দিতে পারে। গ্রীক ভাস্কর্য্যের অনুকরণ বা তাহার



বন্দিনী মা

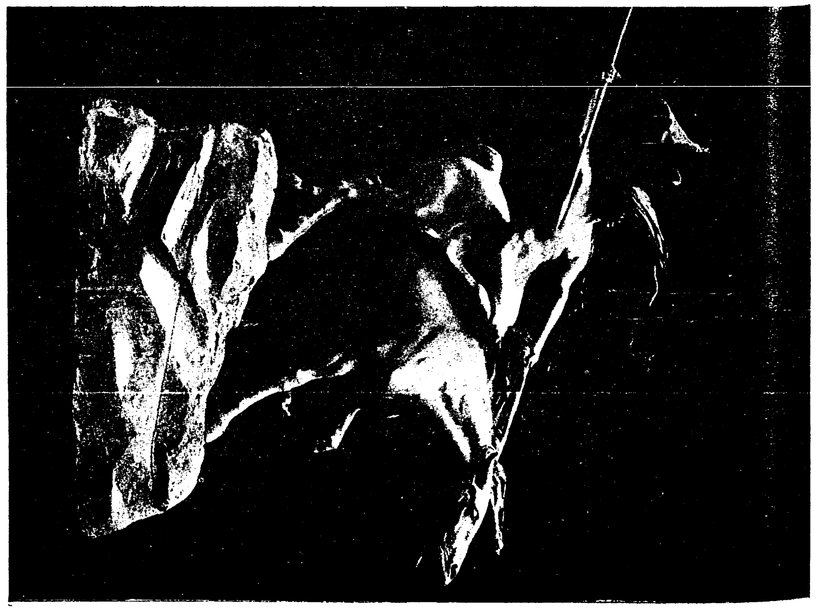

রণ-রঙ্গিণী

ভিতরে জীবনসঞ্চার করা এ যুগে অসম্ভব। কারণ, তাহার মূলে যে প্রাণটি ছিল, এখন তাহা নাই। সিণ্ডিংও সে ধার দিয়া যান নাই।

গ্রীক ভাস্করেরা মনে করিতেন যে, মানবের সগোত্রজ হইলেও প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, চির-নন্দিতা, চিরস্থিরা; প্রকৃতিতে দুঃখ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। গ্রীক ভাস্কর জীবন্তবৎ আকারের মধ্যে এই দুঃখজরামৃত্যুহীনা সুন্দরী প্রকৃতিকে ফুটাইতে চাহিতেন। সেইজন্য, যাহা-কিছু কুশ্রী, অস্থির, বিকৃতাঙ্গ বা মৃতবৎ, তাহা গ্রীক আদর্শের পরিপন্থক ছিল।

কিন্তু এ যুগের ললিতকলা মানবতার ভিতরে, অপূর্ব্বতার ভিতরে, রহস্যের ভিতরে, দুঃখ, মৃত্যু ও কুৎসিতের ভিতরেও আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। সিণ্ডিং এই শ্রেণীর ললিতকলাকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

সিণ্ডিংয়ের বিখ্যাত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে "অসভ্য মাতা" ও "বিপত্নীক"ই সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে তাঁহার "অসভ্য মাতা" এবং "মানব-মানবী" নামক কারুকার্য্যদুটির নমুনা সর্ব্বসাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্যারী-প্রদর্শনীতে তাঁহার "বন্দিনী মাতা" প্রদর্শিত হইয়া Grand Prix পুরস্কার লাভ করে। তাঁহার "বন্দিনী মাতা" রোমক যুগের একটি সাধারণ 'ট্রাজেডী'কে মূর্ত্তিমান করিয়াছে। যুদ্ধে পরাজিত পুরুষেরা নিহত হইলে, তখন রমণী ও শিশুদের ধরিয়া দাসরূপে বিক্রী করা হইত। সিণ্ডিংয়ের চিত্রবস্তু এই:—বিক্রীতা ও বন্দিনী মাতার সুমুখে তাঁহার শিশুপুত্র শায়িত। ছেলে মায়ের স্তন চায়। কিন্তু মার হাত বাঁধা। ছেলের কান্নায় তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু ছেলেকে তিনি আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া লইতে পারিতেছেন না। তাই তিনি অতি কষ্টে সামনে হেঁট হইয়া, কোনরকমে ছেলের মুখের কাছে আপনার বুকটি আগাইয়া দিতেছেন। জননীর মুখে একটি অসহায় কাতরতার ভাব, কলাবিদ অতি নিপুণতার সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন।

ইহার পর সিণ্ডিং "রণ রঙ্গিণী" "জননী বসুমতী" ও "প্রপিতামহী" নামে তিনটি অতি চমৎকার মূর্ত্তি গঠন করেন। এই সময়েই তিনি স্কান্দিনেভিয়ার "রাজ-ভাস্করে"র গৌরব লাভ করিলেন।

রণ-রঙ্গিণী নামক অদ্ভুত স্ত্রী-মূর্ত্তিতে, অচল পাষাণের মাঝে গতি কিরূপ ফুটিয়াছে, তাহা শিল্পরসজ্ঞগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঘোড়াটি পাহাড়ের উপর হইতে সগর্ব্বে ছুটিয়া নামিয়া আসিতেছে—মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ—এমন কি,—তাহার দেহের প্রতি রেখাটি পর্য্যন্ত যেন নড়িতেছে! হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে, এ যেন শরীরী বিদ্যুৎ!—তেমনি চপল, তেমনি গতিময়! পাথরের ভিতরে গতির এমন বিচিত্র লীলা সচরাচর চোখে পড়ে না।

সিণ্ডিংয়ের "প্রপিতামহী"র মূর্ত্তিটি চমৎকার।

জীবনের সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ প্রায়,—সম্মুখে অনন্ত রজনী ধীরে ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর কর্ম্মভার এখন

পৃথিবীতেই নামাইয়া রাখিবার সময় আসিয়াছে। এই শ্রান্ত অথচ শান্ত বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিলে মনে হয়, অতীতের দিকে পিছন ফিরিয়া তিনি যেন আপনার মনকে চারিদিক হইতে টানিয়া আনিয়া সেই পরমপুরুষের চরণে একাগ্র করিয়া বলিতেছেন, "বেলা গেল প্রভু! আমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া নাও, ডাকিয়া নাও!"

বই-পড়ার কথা

মার্কিন যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ থিয়োডোর রুজভেল্টের নাম, বোধ করি পাঠকদের কাছে অপরিচিত নহে। তাঁহার মত অনেক-বই-পড়া লোক সুধু যুক্তরাজ্যে নয়,—পৃথিবীতেও খুব বেশী দেখা যায় না। সংপ্রতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কখন্, কেমন করিয়া, তিনি কি-কি বই পড়েন? মিঃ রুজভেল্ট উত্তরে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা আমেরিকার The Ladies Home Journalএর এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

"যাঁহারা লঘু-সাহিত্যের ভক্ত, যাঁহারা কোন গভীর বিষয় পড়িতে ভালবাসেন না, যাঁহারা খালি বাজে ও খেলো লেখা নিয়া মাতিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ ভাল বই পড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। যুবজনের পক্ষে দুর্ব্বলতাজন্য শারীরিক অক্ষমতা যেমন অন্যায়, মনের পক্ষেও তেমনি মানসিক পরিশ্রমে অপারগতা থাকা উচিত নহে।

কোন পুরুষ বা স্ত্রী, যুবক বা যুবতী যদি ভাল পুস্তক উপভোগ করিবার জন্য আপনার মনকে প্রস্তুত রাখিতে চান, তবে প্রথমে গিবন বা মেকলে বা এমনি-কোন শক্তিশালী লেখকের লেখা পড়িতে সুরু করুন; যতদিন না তাঁহাদের রসবোধ হয়, ততদিন তাঁহারা উঁহাদের রচনাপাঠে যেন বিরত না হন। এই পরীক্ষা পার হইতে পারিলেই, তাঁহারা আপনাদের উপযোগী সারালো পুস্তক, আপনারাই বাছিয়া লইতে পারিবেন।

খাওয়ার মত পড়াতেও রুচি একটা মস্ত ব্যাপার। আমি 'অমুক' জিনিষটা খাইতে ভালবাসি, 'অমুক' জিনিষটা ভালবাসি না। এই ভাল বাসা না বাসার উপরে কারুর জোর খাটে না। পড়াতেও এইরূপ। Guy Mannering, The Antiquary, Pendennis, Vanity Fair, Our Mutual Friend ও Pickwick Papers আমি বারংবার পড়িয়াছি। কিন্তু Fortunes of Nigel, Esmond ও Old Curiosity Shopএর অধিকাংশ স্থান পড়িতে গিয়া আমাকে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছে। প্রথম ছয়খানি বইএর মত শেষের বই তিনখানিও যে খুব ভাল বই, তাতে আমার সন্দেহ নাই। কোন কোন লোক হয়ত' শেষের তিনখানিকেই বেশী ভাল বলিবেন; কিন্তু আমি যেমন 'অমুক' খাবার খাইতে ভালবাসি না, তেমনি ঐ বইগুলিকেও পছন্দ করি না।

কিন্তু আসলে যেগুলি সত্যসত্যই রদ্দী মাল, সে-গুলিকেও ভাল বলিলে ঠিক বলা হইবে না। Bel Ami নামক খেলো বইএর উপরে যদি কাহারো ভক্তি থাকে, তবে তাঁহার সাবধান হওয়া উচিত। যদি কেহ Anna Karenina, War and Peace, Sebastopol ও The Cossacks কে অপছন্দ করিয়া Krentzer Sonata পছন্দ করেন, তবে অনেক খাঁটি জিনিষ তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে। এমন-কি তাঁহার পক্ষে টলষ্টয়কে একেবারে ত্যাগ করাই উচিত। টলষ্টয় একজন চিত্তগ্রাহী ও হৃদয়োত্তেজক লেখক হইতে পারেন; কিন্তু নীতি-উপদেশকরূপে তাঁহাকে দেখাটা আদৌ নিরাপদ নহে।

কেবল আনন্দের জন্য যা-তা বাজে বই-পড়ার উৎসাহ কমাইতে হইবে। দুনিয়ায় বই আছে অগুন্তি,—তার-মাঝ-থেকে কতকগুলি বইমাত্র পড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাওয়া যায়। পড়ুয়ারা নিজেদের রুচিমত বই বাছিয়া লইয়া পড়িবেন। "অমুক এক-শো-খানা বই ভাল" বলিয়া অপর কোন লোক যদি পুস্তক-নির্ব্বাচন করিয়া দেন, তবে সে নির্ব্বাচন নিষ্ফল হইবে-ই-হইবে। এরূপ নির্ব্বাচন কোন বিশেষ অবস্থার ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ফল-দায়ক হওয়া সম্ভব; কিন্তু ইহাতে সার্ব্ব-জনীনতা নাই।"

প্রেম-ধর্ম্মে হিংসাবাদ

আমেরিকার Everybody's Magazine-এ "When Christians Fight, Are They Christians" নামে একটি যুক্তিসঙ্গত নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; তার সারমর্ম্ম এই ঃ—

পৃথিবীতে খৃষ্টের অনুসারী অনেক আছেন; কিন্তু, আমাদের ভিতরে ক্রীশ্চান কে?

খৃষ্টের আদেশে আছে যে, তোমার ডান গালে কেউ চড় মারিলে তুমি তখনি তার সাম্নে বাঁ গালটিও পাতিয়া দিবে। যদি কেউ তোমার জামাটি কাড়িয়া নিয়া যায়, তবে তুমি তাকে তোমার কাপড়-খানিও কাড়িয়া নিতে দিও। 'প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে ও শত্রুকে ঘৃণা করিবে'—এ কথা ভুল। তোমার যে শত্রু তাকেও ভালবাসিবে, তোমাকে যে অভিশাপ দিবে, তাকেও আশীর্ব্বাদ করিবে, তোমাকে যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, তার প্রতিও ভাল ব্যবহার করিবে।

এগুলি হইতেছে খৃষ্টধর্ম্মের নিয়ম।

আজ খৃষ্টানে খৃষ্টানে যে মহাযুদ্ধ বাধিয়াছে, আজ খৃষ্টানকে মারিবার জন্য সকলে যেরূপে অখৃষ্টানকে আপন আপন দলে টানিতেছে, আজ য়ুরোপের শতকরা পঁচানব্বই জন বাসিন্দা খৃষ্টান হইয়াও যেরূপ হিংসার রক্তস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তাহা যদি খৃষ্টধর্ম্মের আদি সাধুগণ দেখিতে পাইতেন, তবে বিংশ শতাব্দীর খৃষ্টান-ধর্ম্মকে তাঁহারা কি ভাবিতেন?

পৃথিবীতে খৃষ্টানের সংখ্যা ৪৯,৪২,৫০,০০০ জন। য়ুরোপের কোন দেশে কত খৃষ্টান আছে, তাহারও তালিকা দিতেছি। *

এই হিসাব ১৯০০ খৃষ্টাব্দের। গত কয় বৎসরে য়ুরোপের লোকসংখ্যা অবশ্য কিছু বাড়িয়াছে। এই কোটি কোটি মানব, যাহারা খৃষ্টের প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই আজ পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্য অস্ত্র তুলিয়াছে বা তুলিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে।

কথা উঠিয়াছে এই যে, একালে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়াছে বলিয়াই এত ঘৃণা, এত অশান্তি ও এত সংক্ষোভের অভিনয় দেখা যায়। য়ুরোপে খৃষ্টের প্রেম-ধর্ম্মের ব্যর্থতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, অনেকে এই কথাটাই তুলিবেন—"য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম্মের আধিপত্য অল্প"; কিন্তু Religious Statistics হইতে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব কমিয়াছে।

আসল কথা, য়ুরোপেই বল, বা অন্য কোথাও বল, আপনার সুযোগ-সুবিধার জন্য মানুষ যখন অপরের গলায় ছুরি বসাইবার ফিকির করিয়াছে, খৃষ্টধর্ম্ম তখন কিছুতেই শান্তি বজায় রাখিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ আছে।

১৫৭১ খৃষ্টাব্দে লেপ্যাণ্টোর যুদ্ধে খৃষ্টানদের হাতে তুর্কীরা পরাজিত হওয়ায় য়ুরোপের আকাশে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র উদয় হইবার আশা একরকম লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পঁচাশিটি বড় বড় যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, উহার ভিতর কেবল খৃষ্টানে-খৃষ্টানে বিয়াল্লিশটি যুদ্ধ হইয়াছে। খৃষ্টানে-অখৃষ্টানে যুদ্ধ হইয়াছে—আটাইস বার। এবং অখৃষ্টানে-অখৃষ্টানে যুদ্ধ হইয়াছে, মাত্র পনেরো বার!

ইতিহাসের আরও প্রাচীন যুগের যবনিকা সরাইলে দেখা যায়, তখন অখৃষ্টান ও পৌত্তলিকেরাই যুদ্ধে মাতিত বেশী, এবং খৃষ্টানেরা কম। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মমূলক প্রতীচ্য সভ্যতার উত্থানের পরে এখন দেখা যাইতেছে যে, অখৃষ্টান ও পৌত্তলিক অপেক্ষা খৃষ্টানেরই রণোন্মাদ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

*		মোট জন সংখ্যা	খৃষ্টান	পারসেণ্ট
যুক্তরাজ্যের	...	৪,২২,০০০০০	৪,২০,০০০০০	৯৯·৫
ফ্রান্স	...	৩,৯০,০০০০০	৩,৮৮,০০০০০০	৯৯·৪
জার্ম্মেনী	...	৫,৬৪,০০০০০	৫,৫৭,০০০০০	৯৮·৭
বেলজিয়ম	...	৬৭,২৪০০০	৬৭,২০০০০	৯৯·৯
অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী	...	৪,৭১,০০০০০	৪,৪৩,০০০০০	৯৩·০
ইটালী	...	৩,২৫,০০০০০	৩,২৫,০০০০০	১০০·০
রুসিয়া	...	১০,৯৭,০০০০০	১০,০২০০০০০	৯১·৩
রুমেনিয়া	...	৬২,০ ০০০	৫৯,০০০০০	৯৫·১
বলকান রাজ্য	...	৯০,০০০০০	৮৩,১০০০০	৯২·২

জার্ম্মেনীর বিষম ধ্বংসবাদী দার্শনিক ফ্রেডারিক নিট্‌যে তাই বলিয়াছেন— "যীশু যেমন উপদেশ দিয়াছেন, খৃষ্টান কখনই তেমন ভাবে জীবনযাপন করে নাই।"

নৃত্য-কলায় গীতিকাব্য

লিডিয়া কিয়াষ্‌ট্‌ য়ুরোপের বিখ্যাত নর্ত্তকী। অপূর্ব্ব নৃত্যকলাকুশল বলিয়া রুশ নর্ত্তকীরা আজকাল জগতে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। লিডিয়াও রুশজাতীয়া। Nash's and Pall Mall Magazineএ সংপ্রতি লিডিয়ার আত্ম-উক্তি বাহির হইয়াছে। তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

—রুশ নর্ত্তকীরা আজকাল অন্যজাতীয় নর্ত্তকীদের চেয়ে বেশী কলাকুশল। ইহাতে আমাদের অধিক শক্তি এবং অধিক নিপুণতা যে প্রমাণিত হয় তাহা নয়। শৈশব হইতেই ভঙ্গী-প্রধান নৃত্যকলায় একাগ্র প্রাণে ব্রতী হই বলিয়াই আমরা আর আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। রঙ্গমঞ্চে এখন ইতালীয় পদ্ধতির চলন বড় বেশী। কিন্তু, আমরা সে পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়াছি। ইতালীয় গীতিনাট্যের মত ইতালীয় নৃত্য-কলাতেও এখন কেবল কৃত্রিমতা ও বাঁধি গৎ দেখা যায়। গড়ন ও চেহারা ভাল হইলেই যে-কোন রমণী ইতালীয় নৃত্যকলায় সুনর্ত্তকী বলিয়া নাম কিনিতে পারে। কারণ, তাহাতে কেবল বাহিরের চেহারাকেই প্রধান বলিয়া ধরা হয়। সেখানে আগে রূপ, পরে নাচ। আমাদের কাছে কিন্তু, —আগে, পরে নাই,—সবসময়েই নৃত্য-নিপুণতাই প্রধান বিচার্য্য।

নাচ আছে দুরকম। এক হচ্ছে নাট্য-প্রধান। আনা প্যাভ্‌লোভা (পৃথিবীর ভিতরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রুশজাতীয়া নর্ত্তকী) এই নৃত্যে সুনিপুণ। আর এক নৃত্য রস-প্রধান—গীতি-কবিতার মত। এই শ্রেণীর নৃত্যে আমার কিঞ্চিৎ দক্ষতা জন্মিয়াছে। অবশ্য, নাটকীয় নৃত্যের ভিতরে রস-প্রধান নৃত্যকেও গণ্য করা যায়। দুই শ্রেণীর নৃত্যেরই মূলতত্ত্ব এক। দুইশ্রেণীর নটই আপনাকে সঙ্গীতের সঙ্গে অভেদাত্মা জানিয়া নৃত্যরত হন। কিন্তু, তবু এই দুইজনের ভিতরে একটু বিভেদ আছে। কোন মধুর গীতিকাব্য একাকী কেহ গান করিলে যেমন শুনিতে হয়, রস-প্রধান নৃত্য অনেকটা সেইরকম। বহুকণ্ঠে মহাকাব্য গীত হওয়ার সঙ্গে নাট্য-প্রধান নৃত্যের তুলনা হয়।

নির্দ্দোষ নৃত্যের নমুনা কেবল রুসিয়ায় পাওয়া যাইতে পারে। কেমন উপাদানে সেখানকার নটেরা প্রস্তুত, তাহা জানি বলিয়াই এ কথা বলিলাম। আমি অত্যুক্তি করিতেছি না। রুসিয়ার সকল বড় সহরেই নৃত্য-শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট স্কুল আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছয় কিংবা আট হাজারের কম হইবে না। পঁচিশ বৎসর অন্তর, ঐ হাজার-হাজার ছাত্রের ভিতর হইতে বড়-জোর বারো জন করিয়া যদি প্রথম শ্রেণীর নর্ত্তক পাওয়া যায়,

তাহা হইলেই আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

শ্রীযুত নিজিনিসকী, এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তক। খুব ভাল কবিতার মত, তাঁহার নাচের কথাও অমরতা লাভ করিবে। তাঁহার নিখুত দৈহিক ভঙ্গীমধুর অভিনয়ে কাব্য-সঙ্কেত ফুটিয়া ওঠে। সঙ্গীতের নানা রাগিনীর মধ্যে যেমন বিভিন্নতা থাকে, তাঁহার প্রত্যেক নাচের ভিতরেও সেইরূপ বিভিন্নতা আছে—একটির সহিত অপরটির মিল নাই এবং তাহার প্রত্যেকটিই নয়নমোহন ছবির মত সুন্দর।

রুসিয়ার গীত-বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, এখানে মনের ভিতর দিয়াই দেহকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সৎসঙ্গ ও সৎ-আলোচনা আমাদিগকে সেই ভাবটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়া দেয় যাহা পরে নৃত্যকলায় আমরা মূর্ত্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলি। সুতরাং একথা বলা বাহুল্য যে, শিক্ষাগুণে আমরা এমন একটা অবলম্বন লাভ করি, বৃদ্ধ অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর বয়সে, যাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমরা রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইতে পারি।

আমাদের পা কি সুন্দর ?

মানুষের পায়ের উপরে The Strand Magazine-এ একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ বাহির হইয়াছে।

মানুষের মুখের গড়ন যেমন নানান ধাঁজের, তার পায়ের গড়নও তেমনি। এটা বোধ হয়, আমাদের সকলের চোখে ঠেকে না।

পায়ের গড়ন সাধারণতঃ তিনরকম হয়। প্রথম শ্রেণীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী অন্য সকল আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা হয়। এ-রকম পায়ের 'কড়ে' আঙ্গুল থেকে 'বুড়ো' আঙ্গুলের ডগা পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিলে রেখাটি ঠিক সোজা থাকে। অতএব, এ-শ্রেণীর পদকে সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পায়ের দ্বিতীয় অঙ্গুলীটি বৃদ্ধাঙ্গুলীর চেয়ে দীর্ঘ হয়। এ-রকম পায়ের আঙ্গুলের ডগা ধরিয়া রেখা টানিয়া গেলে তাহা সোজা থাকে না। অতএব এ-শ্রেণীর পদকে অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ বলিতে পারি। তৃতীয় শ্রেণীর পায়ের প্রথম আঙ্গুল দুটি এক রকমের হয়। অতএব, এরূপ পদকে আমরা তুল্য-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ বলিয়া ডাকিব।

যে-সব জাতির রক্ত অবিকৃত, তাহাদের এক এক জাতির পদ এক এক বিশেষ গড়ন পায়। সেই বিশেষ, নিজস্ব ভঙ্গীটি জাতীয় বিশেষত্বকে ফুটাইয়া তোলে। যুলু ও কেফ্‌ প্রভৃতি জাতীয় লোকেদের সাধারণতঃ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ হয়। আফ্রিকার পাপুয়ান ও বোস্‌কমেন প্রভৃতি জাতির এবং প্রাচীন ও আধুনিক ঈজিপশিয়ানদের ভিতরে প্রধানতঃ অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ দেখা যায়। য়ুরোপের অনেক জাতির পায়ের গড়ন পাঁচমিশালী। তবে ইংরেজ এবং সম্ভবতঃ জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ ও গ্রীক জাতীয় লোকের মধ্যে সম অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদই আকচার নজরে পড়ে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইংরাজদের শতকরা উননব্বই জন পুরুষের ও এক-আশী জন স্ত্রীলোকের পদ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট; বাদবাকী শতকরা এগারো জন পুরুষের ও উনিশ জন স্ত্রীলোকের পদ অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট।

অপরিপক্ক পদ নিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গর্ভস্থ সন্তান ও এক বা দেড় বৎসর বয়সের শিশুর পা প্রায়ই অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট। শিশুরা যখন হাঁটিতে শেখে, তখন তাহাদের জাতীয় বিশেষত্বব্যঞ্জক পদের আদর্শ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

ভাল পায়ের গড়ন কি-রকম হওয়া উচিত, আমরা তাহা ঠিকমত জানি না। তাই আমাদের মনে কুসংস্কার আছে যে, শিশুদের পা ছাড়া আমাদের আর সকলকার পা কু-শ্রী; এবং সুশ্রী পা দেখা যায় কেবল গ্রীক ভাস্কর্য্যে।

গ্রীক ভাস্কর্য্যে, প্রস্তর-মূর্ত্তি সকলের পদ সাধারণতঃ অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট। ইহাকে আদর্শ পদ বলা চলে না। গ্রীক ভাস্কর্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতেই আদর্শ পদ সম্বন্ধে আমাদের মনে কুসংস্কার আসিয়াছে। ইজিপশিয়ান শিল্পে অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ দেখা যায়। গ্রীক শিল্প তাহারই অনুকারী। প্রাচীন গ্রীক শিল্পীগণ স্বজাতীয়-দের পদ-আদর্শকে শিল্পে ফুটাইতেন না। একালের অনেক কলাবিদও এমন করেন। যেমন, বার্ণ-জোন্স "Sibylia Delphica"র যেরূপ পা আঁকিয়াছেন তাহার আদর্শ কোন জাতির ভিতরে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন গ্রীকদের পদ যে অ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট ছিল, গ্রীক ভাস্কর্য্য দেখিয়াই তাহা প্রমাণিত করা চলে না। কারণ, ভাস্কর্য্যের পায়ের আদর্শ আধুনিক গ্রীক জাতির মধ্যে নাই। আধুনিক গ্রীকদের পদ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট।

"সাহসের জন্য !"

রণক্ষেত্রে কোন সৈনিক অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস দেখাইলে, পদক উপহার দিয়া তাহাকে সম্মানিত করা হয়। পৃথিবীর সকল স্বাধীন জাতির ভিতরে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আমাদের পরলোকগতা স্বর্গীয়া মহারাণী, Victoria Crossএর প্রচলন করেন। শত্রুর সম্মুখীন হইয়া স্বদেশের অনুরাগ ব্যঞ্জক কোন অসমসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে যে-কোন সৈনিক এই সম্মানের অধিকারী হয়। ইংরাজ-প্রজার কাছে এর চেয়ে বড় সম্মান আর নাই। বিপক্ষের নিকট হইতে ইংরাজেরা যে সকল কামান কাড়িয়া নেন, সেই কামানের ধাতু গলাইয়া এই পদক প্রস্তুত হয়। পদকের আসল দাম কয়েক আনা মাত্র। ইহার মূল্য অল্প বলিয়া ইহা অবহেলার সামগ্রী নহে।

এই পদক যিনি পান, তিনি সরকার হইতে দেড় শত টাকার বাৎসরিক বৃত্তিরও অধিকারী হন।

ইংরাজদের আর একটি বিখ্যাত মেডেল আছে, তাহার নাম—The Distinguished Service Order। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার সৃষ্টি করেন। সৈন্যদল ও নৌবিভাগে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারিগণ যুদ্ধকালে কোন প্রশংসনীয় বা উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিলে এই পদক লাভের অধিকারী হন।

ফরাসীদের জন্য প্রথম নেপোলিয়ন The Cross of the Order of the Legion of Honour নামক বিখ্যাত পদকের সৃষ্টি করেন। এ পদক কেবল যুদ্ধের মধ্যে বীরত্বের জন্য বা কেবল সৈনিকদিগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই; যে-কোন অসামরিক বা বিদেশীয় ব্যক্তি বীরোচিত কার্য্য করিয়া এই পদক পাইতে পারেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন Medaille Militaire নামক পদকের সৃষ্টি করেন। রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইলে যে-কোন সৈনিক ইহা পাইতে পারে। ইহা সামরিক পদক বলিয়া, সৈনিকদের কাছে The cross of the order of the Legion of Honour অপেক্ষাও ইহার অধিক আদর। কোন উচ্চপদস্থ সৈনিকের বুকে এই পদক দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রণক্ষেত্রে সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে, Legion of Honour তাঁহাকে উপযুক্ত গৌরব দান করিতে পারে না। গত সেপ্টেম্বর মাসে বেলজিয়মের রাজা এই পদক পাইয়াছেন।

রুষ-রাজ্যে যিনি The Cross of the Russian Order of St. George নামক পদক পান, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন দি গ্রেট নিজে এই পদক পান। ক্রিমিয়ান ও ককেশাস যুদ্ধের পরে গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেল নিকোলেইভিচ এই পদকের নিম্নশ্রেণীর সম্মান লাভ করেন। দেড়শত বৎসরের ভিতরে কেবল চারিজন মাত্র রুশ-বীর, উক্ত পদকের প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, এই সম্মান কিরূপ দুর্লভ।

বেলজিয়মে ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং রণক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য The Order of Leopold নামক পদক দেওয়া হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম প্রচলন হয়।

জাপানের সম্রাট যিমু তেলোর দুই হাজার পাঁচ শত পঞ্চান্ন বৎসরের রাজ্যাভিষেক উৎসবকে স্মরণীয় করিবার জন্য মিকাডো কর্ত্তৃক পঁচিশ বৎসর আগে The Order of the Golden Kite নামক পদকের সৃষ্টি হয়। বিপক্ষের সম্মুখে বীরত্ব দেখাইতে পারিলে সৈন্যদল ও নৌবিভাগের সকলেই এই সম্মানের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পদক অত্যন্ত দুর্লভ।

সার্ভিয়ায় সাহসের জন্য The Medal for Bravery দেওয়া হয়। ইহা সকল পদের কর্ম্মচারীই পাইতে পারে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার সৃষ্টি। এই পদকের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া ক্রশের মত কোন বৃত্তি নাই।

প্রুশিয়ার Iron Cross ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম সৃষ্টি করেন। জার্ম্মাণীতে সম্রাট হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই এই পদক লাভ করিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাট, যেরূপ মুক্তহস্তে এই পদক ছড়াইতেছেন, তাহাতে মনে হয় এই পদকের গৌরব শীঘ্রই একান্ত সাধারণ হইয়া পড়িবে।

জার্ম্মেণীতে ফ্রেডারিক দি গ্রেট কর্ত্তৃক আর একটি গৌরবকর পদক আছে। তাহার নাম "Pour le Me'rite"। ইহা কেবল নৌবিভাগ ও সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণকেই দেওয়া হয়।

অষ্ট্রিয়ায় বীরত্বের জন্য The Grand Cross of Maria Theresa নামক পদক দেওয়া হয়। এই পদকের সঙ্গে বাৎসরিক অনেক টাকার পুরস্কার আছে। কোলিনের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রুসিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে পরাজিত করায় অষ্ট্রীয়ার বীর সৈনিকগণকে সম্মানিত করিবার জন্য ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসাকর্ত্তৃক এই পদক প্রথম প্রচলিত হয়। গত আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কেবল আটান্ন জন অষ্ট্রিয়ান এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

রিকার্ডা হুক

জর্ম্মণীর লেখিকাগণের মধ্যে আমরা ক্লারা ভাইবীগের নামই সমধিক শুনিতে পাই। কিন্তু সম্প্রতি এক নূতন মহিলা কবি, উপন্যাসিক ও নাট্যকার ইংরাজি সাহিত্যের আসরে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জর্ম্মণ উপন্যাস-রচয়িতা হের কেলারকেও পরাজিত করিয়াছেন। এই শক্তিশালিনী লেখিকার আসল নাম মিসেস সিকনী; কিন্তু তিনি সাধারণে রিকার্ডা হুক বলিয়াই পরিচিত।

জর্ম্মণীর প্রধান প্রধান সমালোচক ও সাহিত্য-সেবীগণের বিশ্বাস, তাঁহার মত লেখিকা এ পর্য্যন্ত জর্ম্মণীতে আর হয় নাই।

রিকার্ডা হুক ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ব্রান্সউইক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তত্রত্য বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল মহিলা উক্ত উপাধি পাইয়াছেন, রিকার্ডা হুক তাঁহাদের অগ্রণী। তিনি যে কেবল পি, এইচ, ডি উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহা নহে, উক্ত উপাধির জন্য তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল, যে, তাঁহারা উপাধির সঙ্গে "Magna cum landa", এই কয়েটী প্রসংশাসূচক কথা যোগ করিয়া দেন। এরূপ প্রশংসা অতি অল্প পুরুষেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা শেষ

করিবার পর তিনি কিছুদিন জুরিচ সহরের সাধারণ পাঠাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন; তৎপরে ষ্ট্রীয়েষ্ট, মিউনিখ্, ব্রান্সউইক, ভিনিস ও ফ্লোরেন্স প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপের দর্শন ও সাহিত্য ক্রমাগত অধ্যয়ন করিতেন। মধ্যে মধ্যে কবিতাও লিখিতেন বটে, কিন্তু, তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সাহিত্য-সাধনা পূরাদস্তর আরম্ভ হয় নাই।

ভিনিসে অবস্থানকালে রিকার্ডা ভাবী পতির সাক্ষাৎলাভ করেন। পরে তাঁহার জন্মভূমি ব্রান্সউইকে আসিয়া তিনি তাঁহার সহিত বিবাহিত হন। এই বিবাহের মধ্যে একটি চমৎকার 'রোমান্স' আছে। রিকার্ডা হুকের সমস্ত জীবনটাই একটা রোমান্স বলিলে অত্যুক্তি হয় না; এই জন্য জর্ম্মণীতে তাঁহার নাম The living Romance বা জীবন্ত 'রোমান্স'। বাস্তবিক, তাঁহার জীবনের মধ্যে এত অধিক সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত, এত অসংখ্য ভাবের সমাবেশ হইয়াছে যে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রিকার্ডা হুক যে জর্ম্মণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'রোমান্স'রচয়িত্রী—ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

রোমিও সিক্কনীর সহিত তাঁহার প্রথম দেখা ভিনিসে। সে দিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। রিকার্ডা হুক তখন গণ্ডোলায় বসিয়া জলবিহার করিতেছিলেন। চারিদিকে অসংখ্য তরণী নাচিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের আরোহী অগণ্য নরনারী আনন্দে বিভোর হইয়া গীত-বাদ্যে চারিদিক



রিকার্ডা হুক

মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। মিস হুকের কিন্তু সে দিকে হুঁস ছিল না, তিনি সেই পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় কবিতা রচনায় বিভোর ছিলেন। হঠাৎ এক অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী বাঁশরী-তান তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত ভাব-হিল্লোল একেবারে নিস্তব্ধ করিয়া দিল। কবিতা লেখা বন্ধ হইয়া গেল, তিনি দেখিলেন, দূরে একখানি গণ্ডোলায় একটীমাত্র যুবক বসিয়া আপনার বাঁশীর তানে আপনিই বিভোর হইয়া আছে। সে কি করুণ রাগিণী! সমস্ত নৈশ আকাশ ভরিয়া যেন কোন্ চিরদুঃখিনীর বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রাণের সমস্ত সুপ্তবেদনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছিল। যুবকের কোনও খেয়াল ছিল না, তাহার দৃষ্টি উদাস, ঘন-

কৃষ্ণ কেশ আলুথালু। তখন সেখানকার সমস্ত আনন্দ কল্লোল থামিয়া গিয়াছিল, চঞ্চল নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে বসিয়াছিল। রিকার্ডা হুক শৈশব হইতেই সঙ্গীত প্রিয়া, বাঁশীর সেই অপূর্ব্ব স্বর-লহরী তাঁহাকে মর্ত্তলোক হইতে যেন বহুদূরে টানিয়া লইয়া গেল। তাঁহার নৌকা ধীরে ধীরে নিজের খেয়ালে এদিকে ওদিকে বহিয়া যাইতেছিল। কখন যে তাহা কেমন করিয়া যুবকের নৌকার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। তার পরে অতি নিকটে বাঁশীর সুর শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিতেই তিনি দেখিলেন, সম্মুখে নরবেশে যেন এক দেবকুমার বসিয়া আছেন! ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ ও চোখের তারা দেখিয়া চেনা গেল তিনি ইতালীয়। কেমন-একটা গভীর বিষাদের ছায়া, যুবকের চোখ দুইটি দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বাঁশীর করুণ তানে যুবকের প্রাণের সমস্ত সঞ্চিত হাহাকার যেন গলিয়া বাহির হইতেছিল। রিকার্ডা হুক মুগ্ধপ্রাণে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবকের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর গান থামিয়া গেল। রিকার্ডা হুকের প্রতিভামণ্ডিত মুখখানির উপরে তাঁহার বেদনাহত হৃদয়টি উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যকে অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। যুবকও দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। যুবতীর দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া যুবকও তন্ময় হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে আত্মসংবরণ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বাঁশীর পর্দ্দাগুলি আবার টিপিতে লাগিল, কিন্তু বাঁশী আর বাজিল না।

যৌবনের স্বপ্নময় অতীতে রিকার্ডা এক চঞ্চলমতি জর্ম্মণ যুবককে ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। এই প্রতিভাশালিনী কুমারীর প্রাণের কামনাকে উপেক্ষা করিয়া সে কোনও ধনী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। সে অবহেলা রিকার্ডার প্রাণকে এমন উদাস করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন জীবনে আর কখনও কাহারও চরণে আত্মসমর্পণ করিবেন না। কিন্তু আজ সে প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া যাইবার মত হইল। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া নৌকার মুখ ফিরাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। কিন্তু তবু মনের চাঞ্চল্য দূর হইল না। কয়েকদিন দিবা-রাত্রি মনের মধ্যে একটা ঝড় ও সংগ্রাম চলিতে লাগিল। হৃদয় কিছুতেই বশ মানিতে চাহিতেছিল না। তাঁহার কঠোর শাসনে সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

অনিদ্রায় কয়রাত্রি কাটিয়া গেল। তার পর, একদিন সকালে, পথে বাহির হইতেই তিনি দেখিলেন,—সম্মুখে সেই যুবক! তার কেশ তেমনি আলুথালু, তার বেশ তেমনি অসংযত, আর,—আর, তার হাতে সেই বাঁশীটি! যুবক তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিল, কি বিষাদ-মাখা করুণ সে হাসি! তাঁহার সমস্ত প্রাণটা তখন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া সকল বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। এই সময় হইতে প্রত্যহ সেই রহস্যময় যুবক রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, সমস্ত

দিন তাঁহার বাসস্থানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁশীটি হাতে করিয়া জানালার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, তিনি যখন বাহিরে যাইতেন তখন দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিত, কিন্তু কোনও দিন আলাপের চেষ্টা করিত না, কেবল দেখা হইলে একটু খানি বিষাদের ম্লান হাসি হাসিত মাত্র। তাহার রকম সকম দেখিয়া পুলিসের লোকে অনেকবার তাহ'কে তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে তাঁহার বাটীর সম্মুখ হইতে নড়ে নাই, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহাতে হুকের চিত্তের অবস্থাটা কেমনতর হইয়া উঠিত তাহার বর্ণনার আবশ্যক করে না। এই সময় তিনি মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে কখনও গ্রন্থকর্ত্রী হইবেন এ কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ একখানি নাটক—"ইভো" (Evol), ইতালীর 'রেনেসাঁস' যুগের কাহিনী। নাটকখানির মধ্যে তাঁহার প্রতিভার ছাপ যথেষ্ট থাকিলেও ইহা সেক্সপীয়রের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিলেও সুধী সমাজে বইখানি তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। এই পাগল যুবক তখনও ঠিক তেমনই ভাবে প্রত্যহ তাঁহার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকেও যেন পাগল করিয়া তুলিত। তিনি তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া অবশেষে ভিনিস ত্যাগ করিয়া ফ্লোরেন্সে আসিলেন। কিন্তু সেখানেও তাহার হাত এড়াইতে পারিলেন না। ফ্লোরেন্সে পৌঁছিবার পরদিনই উঠিয়া দেখিলেন, সেই যুবক হোটেলের বাগানে বসিয়া আপন মনে বাঁশীটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে হাসিল,—সেই বিষাদের হাসি!

এই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক রচিত হয়। এইখানিই তাঁহার প্রথম উপন্যাস। ইহাতে তাঁহার জীবনের সেই ঝড় ও ঘর্ষণ সংগ্রামের অনেক ছায়া পড়িয়াছিল। এই বইখানির নাম—"The Memories of Ludolf Urslev the Younger"

উপন্যাসের নায়ক লুডল্‌ফ্‌ উরস্‌লভ জর্ম্মণ অভিজাতবংশীয়, এক্ষণে অদৃষ্টের পীড়নে নিপীড়িত। সে সুইজ্জারল্যাণ্ডের কারাগারে বন্দী হইয়া আপনার দুঃখময় জীবনের মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী বর্ণনা করিতেছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র এলার্ড, গ্যালেড নাম্নী এক কুমারীকে ভালবাসে, কিন্তু দুইজনে বিবাহ হইবার উপায় নাই। তাহাদের উভয়ের ভীষণ মানসিক সংগ্রাম-কাহিনীর ভিতরে আমরা লেখিকার নিজ জীবনের অনেকটা আভাস পাই।

এই বইখানি প্রকাশিত হইতেই রিকার্ডা হুকের নাম সমস্ত জর্ম্মণীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার সঙ্গীতময়ী ভাষা, বর্ণনার কলা-নৈপুণ্য, নিখুঁত চরিত্র চিত্রণ, জটিল মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ দেখিয়া সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "রোমান্স" রচয়িত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। অবশ্য, তাঁহার প্রথম পুস্তকে কেলারের প্রভাব অনেক স্থানে দেখা যায়। তাহার

কারণ এই যে, তিনি জর্ম্মণীর এই সাহিত্য-সম্রাটের পরম ভক্ত এবং সর্ব্বদাই তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে সেই বংশীবাদক যুবকটির সহিত তাঁহার আলাপ হইয়া গিয়াছে। সে তাঁহার সহিত একই হোটেলে বাস করে। তিনি তাহাকে বহুদিন আপনার মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু নিজের সে অভিজ্ঞতা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। যুবকও এতাবৎ কাল তাঁহার সহিত অনুরাগের কোনও কথা কহে নাই। সে কেবল খালি তাঁহার সঙ্গ পাইলেই খুসী হইত। সে অবসর পাইলে তাঁহার পাশে আসিয়া বসিত, সেই বিষাদময় হাসি হাসিত, এবং মধ্যে মধ্যে বাঁশী বাজাইত; কিন্তু অধিকাংশ সময়টি চুপটি করিয়া বসিয়া বাঁশী নাড়া-চাড়া করিত, কোনও কথা কহিত না।

প্রথম উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইবর পর তিনি আবার ভিনিসে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে একদিন সন্ধ্যার সময় গণ্ডোলায় চাপিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ তিনি জলে পড়িয়া গেলেন। তিনি সাঁতার জানিতেন না, কাজেই তৎক্ষণাৎ তলাইয়া গেলেন। কিন্তু কোথা হইতে রোমিও সিক্কনী হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল। জল হইতে উঠিয়া পুনরায় তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইলে তিনি যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন আর প্রতিজ্ঞার কঠিন বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে জন্মস্থান ব্রান্স-উইকে রোমিও সিক্কনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

রোমিও সিক্কনী বাঁশী লইয়াই মত্ত থাকিত, সে কাহারও সহিত মিশিত না, সমাজ-সভ্যতার কোনও ধার ধারিত না, তাহার বেশভূষায় সামাজিক প্রথা বা পারিপাট্যের কোন চিহ্নই ছিল না। দুনিয়ার মধ্যে তাহার একমাত্র কার্য্য ছিল, বাঁশী বাজানো, সে কখনও আপনার বাঁশীটিকে কাছছাড়া করিত না, এই বাঁশীতেই শেষটা তাহার মৃত্যু হয়। রিকার্ডাকে সে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত, তিনি কাছে আসিলে তাহার মুখ এমন একটী উজ্জ্বলতায় ভরিয়া উঠিত যে, তাহার স্বাভাবিক সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইত।

বিবাহের পর রিকার্ডা অনেক দিন অবধি কোনও উপন্যাস লিখেন নাই, মধ্যে মধ্যে ছোট গল্প ও কবিতা লিখিতেন।

তাঁহার কবিতাগুলির প্রতি অক্ষরে যেন তাঁহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ছোট গল্পগুলিতে কল্পনা ও বাস্তব এমনই সুন্দরভাবে পুঞ্জীভূত ও এতটুকু স্থানের মধ্যে চরিত্রগুলি এমন নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট, যে তাহা পাঠককে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়। তাঁহার লিপি-কৌশল হৃদয়ের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি করিয়া গল্পগুলিকে একেকারে স্মৃতির মঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া যায়।

রিকার্ডা হুকের ভাষা যেন সঙ্গীতের মত। তাঁহার গদ্যের মধ্যে এমন একটা ঝঙ্কার আছে যে, তাহা পড়িতে বসিলে কবিতার মত শুনায়। মানব-চরিত্রে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। জটিল মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁহার রচনা সকলকে একেবারে অভিভূত

করে। তাঁহার রচনায় রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত, মোহন নন্দন হইতে নরকের বীভৎস দৃশ্য অবধি এমনই নির্দ্দোষভাবে বর্ণিত যে, সমস্ত যেন একেবারে বাস্তব বলিয়া মনে হয়। রিকার্ডা হুকের আর্টে কোথাও "Crudeness" বলিয়া কোনও জিনিস নাই। এই সকল শক্তি তাঁহার প্রথম বইখানিতেই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকে এই শক্তি যেন অধিকতর বিকসিত।

দ্বিতীয় পুস্তকখানির নাম, From out the Street of Triumph",—ইহা তাঁহার প্রথম পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক যখন লিখিত হইতেছিল, তখন রোমিও সিক্কনীর মৃত্যু হয়। প্রিয়তমের মৃত্যুতে রিকার্ডা যে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা পুস্তকের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিন ইতালীর সমুদ্রতীরে বসিয়া তিনি দিনান্তের নিসর্গ শোভা দর্শন করিতেছিলেন এবং রোমিও তাঁহার পাশে বসিয়া আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। রোমিও যখনই বাঁশী বাজাইত, তখনই একেবারে মাতিয়া উঠিত। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান আর থাকিত না! সেদিনও সে এমনই বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল যে, উত্তেজনার বশে হঠাৎ তাহার রগের শিরা ছিঁড়িয়া গেল। জীবনসঙ্গিনীর বুকের উপরে তাহার মরণাহত ললাট এলাইয়া পড়িল। আকাশ-সমুদ্রের চুম্বন-রেখায় দিনান্তের সূর্য্য ডুবিয়া গেল। সেই সঙ্গে রোমিওর সৌন্দর্য্যবিলাসী প্রাণের শিখাটি নিবিয়া গেল

প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইতেই রিকার্ডা হুকের নাম দেশব্যাপী হইয়া গিয়াছিল। এখন দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশবাসীর নয়নপুত্তলি হইয়া উঠিলেন।

ইহার এক বৎসর পরেই রিকার্ডার তৃতীয় উপন্যাস, "Vita Somnium Breve" প্রকাশিত হয়। তার পরের বৎসর রিকার্ডা হুকের বীরত্ব ও যুদ্ধের বর্ণনাপূর্ণ উপন্যাস গুলি প্রকাশিত হয়। রিকার্ডা হুক যেমন প্রেম, দারিদ্র, দুঃখ ও কষ্ট প্রভৃতির উপরেই অধিকাংশ পুস্তক লিখিয়াছেন, তেমনই বীরত্বের প্রতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার একটা আন্তরিক টান থাকাতে তিনি এ সম্বন্ধেও কয়েকখানি উপন্যাসও লিখিয়াছেন। সে গুলিও তাঁহার গার্হস্থ্য উপন্যাস-গুলির মত পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার চতুর্থ পুস্তক "Of Kings and Crowns" প্রকাশিত হইবার পরেই যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রথম উপন্যাস, "The Conquest of Rome" প্রকাশিত হয়। তিনি ইতালীকে বিশেষ ভালবাসেন, এবং গ্যারিবল্ডীকে দেবতার মত ভক্তি করেন। এই পুস্তকে ইতালীর কথা ও গ্যারিবল্ডীর কীর্ত্তি-কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। গ্যারি-বল্ডীর জীবন ও ইতালীর স্বাধীনতা লাভের কাহিনী তিনি যে তিনখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, The Conquest of Rome তাহার মধ্যে প্রথম। ইহা ছাড়া রিকার্ডা হুক জর্ম্মনীর যুদ্ধ সম্বন্ধেও উপন্যাস লিখিয়া-ছেন—তাহার নাম, "The Great German War!" এই বইখানি একসঙ্গে চিত্তকে উত্তেজিত ও মুগ্ধ করে। এই

সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই প্রশ্ন করিতে-ছেন যে, এখনকার এই মহাবিপ্লবের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী কি তাঁহার কল্পনাকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে?

পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রের রক্তপ্রবাহ যে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখন তাঁহার বয়স পূর্ণ পঞ্চাশ বৎসর। এই প্রাচীন বয়সেও তিনি জর্ম্মন রেডক্রস দলের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও আর্ত্তের সেবা করিতেছেন।

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত।

অন্ধ

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

কি বল্‌চেন?—হাস্‌চি কেন? হুঃ—হাস্‌চি কেন!—কে জানে! হয় ত' কাঁদ্‌তে পাচ্চি না বলেই হাস্‌চি! আমার বুকের ভিতরে বালির চড়া পড়ে গেছে কিনা! সব জল শুকিয়ে গেছে গো, শুকিয়ে গেছে। চোখ দিয়ে তাই আর জল আসে না। আমি কান্নার বদলে তাই সুধু হাস্‌চি আর হাস্‌চি!

—হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম। বাবা ত' কিছুতেই আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন না। আমার হয়ে বল্‌তে গিয়ে উল্টে মা তাঁর কাছে ধমক খেলেন।

বাবা বল্লেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি কখনো চোখেও দেখেনি। মেয়ে অন্ধ, তা হয়েচে কি! এতগুলো টাকা কি ছাড়া যায়?"

মেয়ে চোখে দেখ্‌তে পায় না, বাবাও পঞ্চাশ হাজার টাকা কখনো চোখে দেখেন নি। বিয়ে হলে মেয়ে যদিও চোখে দেখ্‌তে পাবে না, কিন্তু বাবাত' এতগুলো টাকা চোখে দেখ্‌তে পাবেন!—ব্যস, তাহলেই হল, তাহলেই হল! তাঁকে টাকা ছাপাবার জন্যে আমাকে বিয়ে কর্ত্তে হবে।

মা বড় অবুঝ; স্ত্রীলোক কিনা! বল্লেন, "তবু ছেলেটার দিকেও ত' একবার তাকাতে হয়!"

(বাবা রেগে বল্লেন, "ভগবান যাকে মেরেচেন, আগে তার দিকে তাকানো উচিত! জান সে অন্ধ!")

(হাঃ হাঃ—বাবার কি ধর্ম্মজ্ঞান! কিন্তু বাবা আমার এ সহজ কথাটা ইচ্ছে করেই বুঝলেন না যে, ভগবান যাকে মেরেচেন, দুনিয়ায় আমি ছাড়া তার দিকে তাকাবার জন্যে আরও ঢের্ লোক আছে। এ বাঙ্গলা যে দয়ায় ভরা! পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারলে এখানে অন্ধ হলেও বিয়ে বন্ধ থাকে না; বাঙ্গালী বরের বাপ টাকা পেলে চিতা থেকেও মরা মেয়েকে ছাঁদ্‌নাতলায় টেনে নিয়ে যেতে পারে!)

বাবা আবার বল্লেন, "আমার যদি বয়স থাক্‌তো, এ মেয়েকে তাহলে আমিই বিয়ে—"

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্লেন, "চুপ কর, চুপ কর! কি বল্‌চ তুমি!"

বাবা ঠিকই বল্‌চেন। তিনি যে পরম হিন্দু। দুবেলা সন্ধ্যাহ্নিক করেন, মাথায় টিকি, গলায় পৈতে রাখেন, ভগবান যাকে মেরেচেন তার দিকে তিনি তাকাবেন না?

হাহাঃ!—

আমারও,—তাতে আপত্তি ছিল না।

খ

দুঃখের কথা, পঞ্চাশ হাজার টাকা চোখে ছাখ্‌বার অবকাশ বাবা বেশীদিন পেলেন না। মৃত্যু এসে আমার এই অন্ধবধূর মত বাবাকেও অন্ধ করে অন্ধকারে নিয়ে গেল। জানিনা, ইহলোকের এই পঞ্চাশ হাজার টাকার আওয়াজ তিনি তাঁর বৈতরণীর পরপার থেকে শুনতে পাচ্চেন কিনা!

হাহাঃ!—আর, আর—আমার এই হাসির শব্দ! এও কি তাঁর কাণে যাচ্চে? এ হাসির শব্দ কি তাঁর বুকের হাড়ে-হাড়ে, তাঁর পাঁজরে-পাঁজরে গিয়ে ঘা মার্‌চে, মার্‌চে, মার্‌চে? আমি এটা জান্‌তে চাই। কেউ বল্‌তে পার?

বেণু সুধু অন্ধ নয়। ভগবান তাকে অন্ধকারের মত কালো করে, আমার মুখের সামনে বিষের পাত্র পূর্ণ করে রেখেচেন।

কিন্তু তার নাম রাখ্‌লে কে? নামের এমন সার্থকতা আমি আর কখনো দেখিনি! আশ্চর্য্য! তার সমস্ত রূপের অভাব, চোখের অভাব যেন এই মধুর, কোমল অথচ বিষাদমাখা স্বরের ভিতরে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

কিন্তু, সে অন্ধ। সে কালো। তার দিকে চাইতে আমার ঘৃণা হোত; আমার রাগ হোত। আপনার চির-অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে কেন সে আমার জীবনকেও অন্ধকার করে দিলে? কেন দিলে—কেন?

সে, বাড়ীর অন্য অন্য সকলকার পায়ের শব্দের ভিতর থেকে আমার পায়ের শব্দ ঠিক চিনে নিতে পারত। এটা আমি লক্ষ্য করে দেখেচি। আমার পদশব্দ শুন্‌লেই সে মুখ তুলে উৎকর্ণ হয়ে থাক্‌ত। কিন্তু, আমি যে তাকে ঘৃণা করি, এটা সে বুঝ্‌তে পার্‌ত। কারণ, আমি তার কাছে গেলে সে সরে যেত। নয় ত কেমন যেন জড়সড় হয়ে অপরাধীর মত বসে থাক্‌ত। আর এক আশ্চর্য্যের কথা, আমার সঙ্গে এতদিন সে একটাও কথা বলে নি। এক অন্ধ, অন্ধকার মৌনের মত সে আমার প্রাণমনের উপরে চেপে বসেছিল।

তাকে কথা কওয়াবার জন্যে আমিও কিছু ব্যস্ত ছিলাম না। আমিও তার সঙ্গে কথা কই নি।

এমনি ভাবে এক বছর গেল। এই এক বছর আমরা কেউ কারুর সঙ্গে একটাও কথা কই নি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন নীরবতা যে থাক্‌তে পারে, আগে আমার এ জ্ঞান ছিল না। ওঃ! তোমরা এ কল্পনা কর্‌তে পার্‌বে না। এ নীরবতা অসহ্য—অসহ্য—অসহ্য!—হ্যাঁ, অসহ্য বটে,

—তবু এ নীরবতা ভঙ্গ কর্‌বার সাহস আমাদের কারুর ছিল না।

গ

আমি জীবনটাকে উপভোগ কর্‌ছিলাম।

আমার যৌবনের ভিতরে অনেকখানি ফাঁক্ থেকে গিয়েছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যার পূর্ণ যৌবনের তপ্ত রক্তধারা অপব্যয় হয়, তার কষ্ট সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, ক্ষতিপূরণ কর। লোহার সিন্ধুকে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ মজুৎ রেখে, বাবা (অনিচ্ছাসত্ত্বে কিনা, জানি না!) পরলোকে প্রস্থান করেছিলেন।—কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিন্ধুকের চাবীটি তিনি ট্যাঁকে করে নিয়ে যেতে পারেন নি।

সেই পঞ্চাশ হাজার টাকায় আমি আমার জীবনের ফাঁক্‌টুকু ভরিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম। প্রায়ই আমার বৈঠকখানায় বাইজীর "হিলি-মিলি-পানিয়া"র সঙ্গে মদের পিয়ালায় ঠিনি-ঠিনি সুর বেজে উঠ্‌তে সুরু হোল। ফলে, আমার জীবনের ফাঁক্‌টুকু যতই ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বাবার লোহার সিন্ধুকও ক্রমে ততই খালি হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

বেণুর চোখ ছিল না, কিন্তু কাণ ছিল। সে কিছু দেখ্‌তে না পেলেও শুনতে পেত সব। আমাকে মুখ ফুটে কিছু না বল্লেও, তার মনে যে ঝড় উঠেচে, এটা আমি তার মুখ দেখে বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু, বুঝেও আমার প্রাণে দয়া হোত না,—বরং একটা নিষ্ঠুর আনন্দের ভাব জেগে উঠ্‌ত।

রাত্রে আমি প্রায়ই বাড়ীতে থাক্‌তাম না। বাড়ীতে থাক্‌লেও বেণুর কাছে যেতাম না। তার প্রতি আমার ঘৃণা ও রাগ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছিল।

সেদিন হঠাৎ আমার জ্বর হোল। বাইরের ঘরে জ্বরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর, কখন যে আমার প্রাণের ইয়ারেরা আমার কাছে থাকাটা অনাবশ্যক মনে করে আস্তে আস্তে সরে পড়েছিল, আর কখন যে চাকরেরা আমাকে ধরাধরি করে অন্দরে শুইয়ে দিয়ে এসেছিল, সে খেয়াল আমার আদোপেই ছিল না।

* * *

স্তব্ধ রাত্রে, ঘরের ঘড়ীটা হঠাৎ বেজে উঠ্‌ল। সেই শব্দে আমার জ্ঞান হোল। আমি গুন্‌লাম একটা, দুটো, তিনটে, চারটে! শেষ রাতের থম্‌থমে নিস্তব্ধতাকে অকস্মাৎ জাগ্রৎ করে দিয়ে ঘড়ীটা আবার থেমে গেল। কেবল, রজনীর হৃৎপিণ্ডের শব্দের মত, সেই চির-জাগ্রত ঘড়ীটা ক্রমাগত মৃদুস্বরে কর্‌তে লাগ্‌ল টিক্-টিক্-টিক্!

মনে হোল, কে-যেন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে,—খুব আল্‌তভাবে। আমার মাথার ভিতরটা তখন জ্বলে-পুড়ে যেন খাক্ হয়ে যাচ্ছিল,—কে আমার সেবা কর্‌চে সে কথা আমি বুঝতেও পার্‌লাম না, বুঝবার চেষ্টাও কর্‌লাম না।

"বড় তেষ্টা—একটু জল।"

আমার মুখের কাছে কে জলের গেলাস ধর্‌লে।

জল পান করে আমি অনেকক্ষণ শুয়ে রৈলাম। অন্ধকারে দেখতে পেলাম না,—কিন্তু, কে আমাকে পাখার বাতাস কর্‌ছিল।

* * *

হঠাৎ আমার কপালে দু ফোঁটা জল পড়্‌ল। এ কিসের জল? আবার,—এক, দুই, তিন ফোঁটা! এক ফোঁটা আমার ঠোঁটে পড়্‌ল,—বুঝলাম, সে চোখের জল! এই রাতে আমার শিয়রে বসে কাঁদে কে?

তখন, একজনকে মনে হোল। হ্যাঁ,—একজনকে! কিন্তু—কিন্তু, কেন কাঁদে সে?

পীড়ায় বোধ করি, মানুষের মনকে পল্‌কা করে ফেলে। নইলে, ক-ফোঁটা অশ্রুজলে আমার অমন পাথরের মত মন ভিজে নরম হয়ে গেল কেন?

আস্তে আস্তে ডাক্‌লাম, "বেণু?"

উত্তর পেলাম না।

"বেণু?"

পাখার হাওয়া থেমে গেল।

"বেণু, কথা কও!"

অতি মৃদু—কম্পিত স্বরে উত্তর পেলাম, "কি বল্‌চ?"

"তুমি কাঁদ্‌চ কেন?"

"কাঁদি নি।"

"মিছে কথা বোল না।"

ভয়ে ভয়ে বাধো-বাধো গলায় বেণু বল্‌লে, "আর,—আর কাঁদ্‌ব না।"

আমি চুপ করে রৈলাম। তখন কি ভাবছিলাম, তা আর আমার মনে নেই।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "এত রাত পর্য্যন্ত তুমি জেগে আছ কেন?"

"তোমার যে জ্বর হয়েছে!"

"আমার জ্বর, তাতে তোমার কি?"

উত্তর পেলাম না। তার বদলে আমার কপালে আবার দু-ফোঁটা জল পড়্‌ল। যে চোখে দৃষ্টি নেই, সে চোখেও ব্যথার অশ্রু থাকে! ভগবান! দু-বিন্দু অশ্রু মনের কথা এমন করে খুলে বল্‌তে পারে?

আমার মনটা কি-রকম হয়ে গেল,—আমি দুহাত বাড়িয়ে বেণুকে আমার বুকের উপরে টেনে নিলাম। তার মুখে আমার মুখ রেখে চুম্বন কর্‌লাম। বেণু অস্ফুটস্বরে কি বল্‌লে। তার সারা দেহ থর্‌ থর্‌ করে একবার কেঁপে উঠল। তার মাথাটি আমার কাঁধের উপরে এলিয়ে পড়্‌ল। তারপর, প্রাণপণে আমার বুক দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে স্থির হয়ে পড়ে রৈল।

* * *

প্রাতঃসন্ধ্যার স্তব্ধ চিতা যখন পূর্ব্বমেঘে জ্বলে উঠল, তখন তার আলো বেণুর অন্ধনেত্রে, কৃষ্ণ দেহের উপরে এসে পড়্‌ল।

অন্ধ বেণু—কালো বেণু!

তখনও সে আমার বুকের উপরে তেমনি নিসাড় হয়ে পড়ে ছিল। ভোরের আধা আলোয়, আধা ছায়ায় বেণুর অন্ধ চোখ ও কালো দেহের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লাম। তেমন করে আগে কখন' তাকে দেখি-নি, পরেও কখন' দেখ্‌বার সময় পাইনি।

তার চোখের পাতাদুটির উপরে আস্তে

আস্তে হাত বুলিয়ে দিলাম। পদ্মপুটে বন্দী বৃষ্টিবিন্দু নাড়া পেলে যেমন ঝরে পড়ে, বেণুর চোখ থেকেও তেমনি ঝর-ঝর করে আবার অশ্রু ঝরে পড়্‌ল।

"বেণু!"

"ওগো নাগো না, আর অমন কর্‌ব না!"

"কি কর্‌বে না?"

"আর কাঁদ্‌ব না!"

আমার অবরুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করে বলে উঠলুম—"না,—কাঁদ তুমি। আমিও কাঁদি।"

ঘ

তারপর? তারপর আমার জ্বর বসন্ত রোগে দাঁড়াল। বসন্ত আমাকে প্রাণে মার্‌লে না, কিন্তু আমার চোখদুটো উপড়ে নিয়ে গেল।

বেণুর মত আমিও অন্ধ!

বেণুকে জীবনে সেই একবার মাত্র দেখেছিলুম। তাকে দেখার আশা মিটল কৈ? এই ঘন অন্ধকার ঠেলে তার একটা ছায়ামূর্ত্তি বিদ্যুতের মত এক একবার চম্‌কে ওঠে বটে, কিন্তু তাতে যে তৃপ্তি হয়না গো, তৃপ্তি হয় না!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পথে পথে

নালাটি হচ্ছে মানুষের হাতে কাটা, সুতরাং নালার জল সোজা পথটি বেয়ে গাছের গোড়ায় বা ধানের ক্ষেতে এসে পড়তে বাধ্য। কিন্তু নদী—যেটা সৃষ্টি হচ্ছে—তার জন্যে কেউ পথ কেটে রাখে না; সে নিজের পথ নিজেই করে নেয়। দিনে দিনে তিলে তিলে সে শক্তি সঞ্চয় কোরে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন গতিতে পথের বাধা অতিক্রম করে ক্রমশঃ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

স্বাধীন যে পথ, স্বাভাবিক যে পথ, তাতে প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে, শক্তি আছে, গতি-স্থিতির ছন্দ আছে; আর মানুষের হাতে-বাঁধা পথটিতে এ সকলের একটাও নাই—স্থিতিটুকু ছাড়া। বাঁধা জল সে এক জায়গায় বাঁধা পোড়ে মরে; আর পাষাণের কোলে যে জলটুকুর সৃষ্টি—সে বাঁধ ভেঙে জীবন-প্রবাহে দুই কূল ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায়।

কোন্ পথে যাবে—কোন্ পথে যাবে—আমাদের শিল্প কোন পথে যাবে? বাঁধের পথে কি বাঁধ-ভাঙা স্বাভাবিক পথে?—এই প্রশ্নই চারিদিকে শুন্‌তে পাচ্ছি। মহাজনদের পদাঙ্কচিহ্নিত বাঁধা পথটি আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে—এবং নীতি ও শিল্প-শাস্ত্রের সাইন্‌বোর্ডখানি সেই পথের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে বল্‌ছে—'নান্যেন মার্গেন। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'।

পথ যখন সম্মুখে পরিষ্কার পড়ে রয়েছে

তখন শিল্পটাকে এই পথেই চালাও—এই কথা হচ্ছে যারা প্রাচীন তাদের কথা, যারা পাণ্ডা তাদের কথা আর তাদের সঙ্গে যে যাত্রীরা দারু-ব্রহ্মের ঝাঁকি দর্শনে দল বেঁধে যাচ্ছে-আস্‌ছে তাদের কথা। তাদের মধ্যে কেউ তোমাকে স্বাধীন পথে যথা-সুখে নিজের বাঞ্ছিতের উদ্দেশে যাত্রা করতে উপদেশ দেবে না।

তারা বলবে, পণ্ডিতদের অভিমত যে শিল্প, তাই শিল্প; এবং মনুসংহিতার মতো শিল্পসংহিতার বচনগুলোই পালন করে চলাই প্রশস্ত। পণ্ডিতেরা লিখছেন দেবতার ধ্যান, আর পণ্ডিতদের চেয়ে জাত্যংশে খাটো শিল্পীগুলো সেই ধ্যানমূর্ত্তিসকল ফুটিয়ে তুল্‌ছে পাষাণের অক্ষরে;—এমন কি, লেখার ছাঁদটুকুর সম্বন্ধেও শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, পণ্ডিতের দেওয়া মান-পরিমাণের নাগ-পাশে শিল্পীর সমস্ত শক্তি এবং স্ফূর্ত্তি মূর্চ্ছাহত! প্রাচীন ভারতের লক্ষকোটী শিল্পী, যাদের প্রাণের অভাব ছিল না, পণ্ডিতদের অপেক্ষা সুকুমার মনোবৃত্তি-সকলেরও অভাব ছিল না, তারা একাসনে একমনে বসে শুক্র-নীতি ও মানসারের পুঁথির রেখাগণিত ও অগণিত সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাসকল পূর্ণ করছে এবং তারি ফলগুলি স্তূপাকার করে সাজিয়ে যাচ্ছে—কখনো রাজমন্দিরের মতো, কখনো বা তেত্রিশ কোটী মূর্ত্তির বত্রিশ-সিংহাসনের মতো। এই মন্দিরে এই সিংহাসনে ভারত-শিল্পীরা তাদের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে বল্লে ভুল হয়, কেন না, সিংহাসন কি মন্দির, যা-কিছু তারা গড়েছে, সে তাদের হৃদয়-দেবতার জন্য, নিজের মনোমত করে গড়তে তাদের অনুমতি ছিল না। গড়েছে তারা অনুশাসন এবং হুকুমের চাকর, দেশের বিক্রমাদিত্যসকলের জন্য—যারা প্রাচীনের ছদ্মবেশে আজও সমান-বিক্রমে রাজত্ব করছে—আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে শিক্ষা দীক্ষায়।

প্রাচীন ভারতে শিল্পীও ছিল, শিল্পসামগ্রীর আদর করবার মানুষও ছিল। যদি কেবল এই দুই দলই থাকতো তবে আমাদের শিল্প হয়তো পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে যথার্থরূপে দেখা দিত—যেমন দেখা দিয়েছে চীন-শিল্প, জাপান-শিল্প। কিন্তু তা হয়নি। এই দুই জাতিকে দুই পায়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছে দেখি আর এক বলবান জাতি, বুক ফুলিয়ে যে বল্‌ছে, 'নান্যেন মার্গেন'—আমরা যে পথ বেঁধে দিলেম শিল্পের জন্য এই পথই একমাত্র বাঞ্ছনীয়, তোমার নিজের যদি কোন বাঞ্ছা কি বাঞ্ছিত থাকে থাক্, আমরা যা চাই, যে রূপটা চাই, সেইটাই দাও; তোমরা তো শিল্পী আর আমরা পণ্ডিত, আমরা কুলপুত্র, দুকুল থেকে স্ত্রী-রত্নের মতো শিল্পলক্ষ্মীকে আমরা জাতে তুল্লে তবেই সে কৃতকৃতার্থ হবে।

ভারতবর্ষে শিল্প, শিল্প-আচার্য্যগণের শাস্ত্রসংহিতার তুলসীমঞ্চে বাঁধা পড়ে কৃতকৃতার্থ হল কিনা সেটা তর্কের বিষয় কিন্তু এটা ঠিক যে, সেটা সম্পূর্ণ বাড়তে পারেনি। তাতে পাতাও ধরেছে, ফুলও ফুটেছে কিন্তু মঞ্চে-বাঁধা পঞ্চবটির মতো সে যে কোনদিন অনেকখানি ছায়া দেই নি বা দেশের অন্তরের অন্তরেও শিকড় গাড়েনি একথা কে না স্বীকার করবে?

জাপানের মালীরা যে কৌশলে তাল-প্রমাণ গাছকে তিল-প্রমাণের 'ক্ষুপ' বা বামন-রূপে বর্ত্তমান রাখে, আমাদের দেশের শিল্পটাকে তেমনি কৌশলেই আচার্য্য উপাচার্য্য দেবতা উপদেবতা মিলে মুঠোম হাতের তুলসীমঞ্চে যাদুকরের ফুস্‌মন্তরের আম গাছের মতো রেখে গেছেন। সেটাথেকে আমরা শিল্পাচার্য্যের কলাবিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করি; আর লাভ করি—শিল্পীর স্বাধীনতার উপরে শিল্পাচার্য্যগণের হস্তক্ষেপ করার আদ্যন্ত একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস!

পণ্ডিতগণের অভিমত ভারতশিল্পের এই ধ্যানী মূর্ত্তি, আচার-বিচার মান-পরিমাণের যজ্ঞসূত্র গলায় বেঁধে জাত্যভিমানের গর্ব্বে যতই স্ফীত হয়ে উঠে থাক-না কেন এবং যতই আমাদের গৌরবের সামগ্রী বলে আমরা তাকে পূজা দিই-না-কেন, সেগুলো যে আমাদের শিল্পের নিজস্ব নয়,—পণ্ডিতানাং সর্ব্বস্ব, সেটা আমরা কিছুতে ভুল্‌তে পারি না। পণ্ডিতগণের দিক থেকে দেখতে গেলে যেটা 'পণ্ডিতানাং মতম্' সেটারই গুরুত্ব অধিক; কিন্তু শিল্প এবং শিল্পীর দিক দিয়ে দেখলে বলতেই হবে যে, শিল্পের পক্ষে শিল্পীর অভিমত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত এবং সেই পথই শ্রেষ্ঠপথ, যে পথ শিল্পের জন্যে শিল্পী নিজে আবিষ্কার করে।

"নাধিকাঙ্গা ন হীনাঙ্গা কর্ত্তব্যা দেবতা কচ্চিৎ"—এই বচনটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-পালিত হয়ে শিল্প-দেবতা যে মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছেন সে মূর্ত্তি দর্জ্জির দোকানের কাটা-ছাঁটা মানান-সই কোট্‌টার মত দরবারি কিংবা পোষাকি; —একেবারেই আট্‌পহুরে নয়। সে এক জাতীয় শিল্প কিন্তু আমাদের জাতীয় শিল্প বোলে সেটাকে ভ্রম করলে চলবে না। কৃতদাসের কাজগুলোকে ভক্তের সেবার সঙ্গে তুলনা কল্লে যে ভুলটি করা হয়, আমাদের হ্যাট্‌কোটের ফ্যাসন্‌টাকে মায়ের হাতের কাঁথাখানি বলে ভুল কল্লে যে মূর্খতাটা করা হয়, পণ্ডিতানাং মতম্ যেটা সেটাকে শিল্পীরও অভিমত বল্লে ঠিক সেই ভুল আমাদের করা হবে। পণ্ডিতেরা খুব উচ্চজাতি হতে পারেন এবং তাঁদের অভিমত শিল্পটাও খুব বড়-দরেরও হতে পারে কিন্তু সে বা সে জাতির শিল্প এত বড় নয় যে আমাদের বোলে, শিল্পীর নিজস্ব বোলে পরিচয় দেওয়া চলে। প্রাচীন ভারতে পণ্ডিতেরা—আচার্য্যেরা ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা এবং তাঁদের বচনই ছিল সব। শিল্পটাও তাঁদেরই বচনগুলির তেত্রিশ-কোটী পাষাণ মূর্ত্তি,—দুই পায়ে শিল্পীর হৃদ্‌পদ্ম দলিত করে বরাভয়ের অভিনয় করছে। প্রাচীন ভারত শিল্পে এই করুণ রসটুকুই সত্যকার, কেন না এইটুকুর সঙ্গেই শিল্পীর প্রাণের যোগ ছিল; আর যে রসগুলো পাষাণের ভাণে ধরা যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে শাস্ত্র-বচনের যোগ, শাস্ত্রীগণের যোগ;—যথার্থ রসের উৎপত্তির যোগাযোগ সেখানে নাই। নদীর সব জল—সমস্ত প্রবাহ একটিমাত্র গণ্ডুষে বাঁধা পড়েছে, আর একুল ওকুল দুকুল জুড়ে নদীর বুকে বালির চর ধূ-ধূ করছে। প্রাচীনেরা মিলে ভারতশিল্পের উর্ব্বরতার শক্তি হরণ করে নিয়ে, দিয়ে গেলেন তাকে উষরতার বিরাট অবকাশ!

আমরা যখন চলতে চাচ্ছি, পথ চাচ্ছি, তখন গোড়া-থেকেই প্রাচীনের এই ভয়ঙ্কর বোঝাটাকে আমাদের কাঁধ থেকে নামাতে হবেই হবে, গণ্ডুষের বাঁধ ভাঙতে হবে, প্রবীণতার কুক্ষী ভেদ করে আমাদের আর-একবার আমাদের সেইখানে বেরিয়ে দাঁড়াতে হবে যেখানে আমরা শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেখানে আমাদের পুরাতনটা আমাদের বাধা দেবে না, অন্যের নতুনটাও আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারবে না ;—এক-কথায় প্রাচ্য প্রবীনতার তৈলকটাহ এবং পাশ্চাত্য নূতনতার অগ্নিকুণ্ড এ দুই থেকেই দূরে এমন একমুখে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে, যে-মুখে আমাদের চোখের দৃষ্টি মনের প্রসার আনন্দের প্রবাহ অপ্রতিহত। নিজের মনের নবীনতা সজীবতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলাই হচ্ছে চলবার শ্রেষ্ঠ উপায় এবং নিজের দুখানা পা সুখ-দুঃখ আলো আঁধারের তালে-তালে যেখান দিয়ে উঠে-পড়ে চলে যায় সেই পথই হচ্ছে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ। শাস্ত্রগড়া শিল্প নয়, শিল্পীর মনগড়া শিল্পই হচ্ছে উত্তম শিল্প—একথা সপ্রমাণ করতে আমরাই যে নতুন করে উদ্যত হয়েছি তা নয়, প্রাচীন কালেও শিল্পীরা প্রাচীনতার বোঝা বারবার নামিয়েছেন এবং পণ্ডিতানাং মতম্ ঠেলে নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্প-শাস্ত্রকার শুক্রাচার্য্য সেটাকে 'একেষাং মতম্' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও পারেন নি। এই যে 'একেষাং মতম্'—যার মূল মন্ত্র হচ্ছে 'লগ্নং যত্র চ যস্য হৃদ্' বা মনোমত পথে যাওয়া—তাকে ঠেলে রাখা পণ্ডিতদের সাধ্য হয় নি, হবেও না। মনের সোনার কাঠি, শাস্ত্রকারের রূপোর কাঠিকে জয় করে প্রাচীনকালেও এতটা কাজ করেছিল যে, পণ্ডিতকেও সেটার জন্য দুই ছত্র শ্লোক রচনা করতে হয়েছে এবং সেই শ্লোকটাকে শিল্পশাস্ত্রের ভিতরে স্থান দিতে হয়েছে।

হৃদয় হৃদয়, যে পথে সে চলে সেইই পথ, যাকে সে চায় তাকেই পাওয়া, যা সে দেয় সেই দানই শিল্পে শ্রেষ্ঠদান। মন্দিরের বাহিরে যেখানে শিল্পীর আনন্দ, মৃদঙ্গ বাজিয়ে মহা রাসলীলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সেইখানেই যথার্থ পথের সন্ধান আমরা পাবো, আর মন্দিরের ভিতরে—সেখানে মূর্ত্তিমান শাস্ত্র বরাভয়ের অভিনয় দেখাচ্ছে, সেখানে অন্ধকারে প্রদক্ষিণের একটি আবর্ত্ত ছাড়া অন্য পথ পণ্ডিতেরা রাখেননি। "কহহিঁ কবীর তেঈভো দুখিয়া, যিন যহ রাহ চলাঈ।' —এ পথে চিরদুঃখী ঘানির বলদেরাই ঘুরে মরে!

এই যে 'পণ্ডিতানাং মতম্' ঠেলে আমরা শিল্পীর মনোমত শিল্পকে বরণ করতে চাচ্ছি এর জন্য বিজ্ঞদের কাছ থেকে, প্রাচীন দের কাছ থেকে, এবং দেখতে নবীন হলেও সমস্ত মনটি যাদের জরায় সাদা হয়ে গেছে—কোন রং যাতে নেই—এমন সব মানবকদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কথা শুনতে হবে। সমভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ, উরুভঙ্গ ইত্যাদির একটিকেও পছন্দ না করে আমরা যে নিজেদের সহজ ভঙ্গীতে বলতে চলতে এবং লিখতে চাই এটা

দের প্রাণে সইবে না। আমরা যে গণপতির শুঁড়টিতে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে শুঁড়টির আধ্যাত্মিক অর্থের চিন্তা করতে ব্যস্ত নই, কিন্তু সেটাকে দিয়ে আঁক্সীর কাজ করিয়ে নিতে চাচ্ছি এই সব ছেলেমানুষির জন্য, এই লতার মতো মনোমত পথে লতিয়ে ওঠার জন্য, এই আমাদের টেরছা চোখের ইঙ্গিত আভাষ পণ্ডিতগণের উপরে নিক্ষেপ করার জন্য ওঁরা আমাদের কিছুতে ক্ষমা করবেন না। আমরা যে শাস্ত্রকারকে জানি না, শাস্ত্রকে মানি না, চাইনা যে আমরা anatomical accuracy বা Law of perspective! আমরা আমাদের নিজস্বটা,—তা সে যতটাই হোকনা—বিশ্বমানবের পাদপীঠরূপ খুব একটা বড় এবং পণ্ডিতগণের অভিমত জায়গায় সযত্নে হাজির না করে দিয়ে এই যে অবাধে ফুটে উঠতে চাচ্ছি, আনন্দের বীজ মুঠো মুঠো আবীরের মত যথা-তথা বিকীর্ণ করে মরতে চাচ্ছি, আমরা বাবাজীদের তুলসীমঞ্চে বাবুদের সখের মালঞ্চে যে বাঁধা পড়তে চাচ্ছিনে, এই যে আমাদের যা-তা নিয়ে আমরা যা-খুসি-তাই করতে চাচ্ছি এর জন্য কথা আমাদের অনেক শুনতে হবে ;—শিল্পাচার-ভ্রষ্টতা মুর্খতা ইত্যাদি অনেক কথার ইট-পাট্‌কেল এবং আরো কত কি তার ঠিকানা কি! কিন্তু আমরা যেন ভুলি না যে আমাদের প্রাণের একতারা প্রাণেশের হাতে দিলে তবেই তাতে নিত্যসুরের ঝঙ্কারটি উঠবে, নইলে কেবলি ওস্তাদি হুঙ্কার। "প্রেম হদ্দ তজী জব ভাই, সত্তলোক কী হদ্দ পুর্ণি আই।"—প্রেম যখন সীমাকে ত্যাগ করে তখন সে সত্যলোকের সীমায় আসে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোয়েন্দা গ্রেভস্

"জার্ম্মাণ-গুপ্ত-কার্য্য-বিভাগের" বিখ্যাত গোয়েন্দা আর্মগার্ড কার্ল গ্রেভসের চমকপ্রদ গুপ্ত কার্য্যাবলীর একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত মাসের "ভারতীতে" দেওয়া হইয়াছে। এই সংখ্যায় আমরা গ্রেভসের নবপ্রকাশিত পুস্তক হইতে তাঁহার আর একটী গোয়েন্দা-গিরির বিবরণ দিতেছি।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ফ্রান্সের উপনিবেশ মরক্কো লইয়া জার্ম্মাণ ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য এবং সেই সূত্রে ইংলণ্ডেরও সহিত জার্ম্মাণির যুদ্ধ-সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু কাইসার উইলিয়মের আদেশে এবং গোয়েন্দা গ্রেভসের কার্য্য-তৎপরতায় কি করিয়া এই বিষম যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়—এই প্রবন্ধটী তাহারই বিবরণ। গ্রেভস্ লিখিতেছেন :—

আজ কয়েকদিন হইল বার্লিনে আসিয়াছি। খাটিয়া খাটিয়া জানটাও যায়-যায় হইয়া

উঠিয়াছে। এখন আর অন্য কোন কাজকর্ম্ম নয়—দিনকয়েক খুব ফুর্ত্তিতে আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া ভারগ্রস্ত মনটাকে হাল্‌কা করিয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু সেদিন একটা ভোজনালয়ে আহার করিয়া বাড়ীর সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে আমার 'বয়'টী তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়াই বলিল, "অনেকক্ষণ হ'ল টেলিফোনে আপনার ডাক পড়েছে—১১ নম্বর থেকে ক্রমাগত ডাক আসচে।"

১১ নম্বর! আমি চমকিয়া উঠিলাম—সে যে Foreign Officeএর টেলিফোন নম্বর! নিমেষে আমার মাথা হইতে আমোদ প্রমোদের সুখস্বপ্ন কর্পূরের মত উবিয়া গেল—পৃথিবীর কোন্ অংশে আমাকে যাইতে হইবে, সেই চিন্তাই তখন আমার মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তখন ১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুন মাস—ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন—জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ একেবারে আসন্ন; 'জনবুল'ও নিশ্চেষ্ট হইয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া নাই। এদিকে জার্ম্মাণিতেও মরক্কো লইয়া দিনরাত তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। চারিদিকে সকলেই যুদ্ধং দেহি বলিয়া ক্ষেপিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমি Foreign Officeএর দিকে চলিলাম; সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রিভিকাউন-সিলের সভ্য কাউণ্ট ওয়েডেলের সম্মুখে লইয়া গিয়া আমাকে হাজির করা হইল।

নমস্কারের পর কাউণ্ট বলিলেন—"সাড়ে ১১ টার সময় তোমাকে আর একটী ঘরে লইয়া যাওয়া হইবে—সেখানে তোমাকে যে সকল প্রশ্ন করা হইবে তুমি তাহার উত্তর দিবে,—কিন্তু সাবধান, নিজে যেন কোন প্রশ্ন করিয়া বসিওনা—এখন বুঝিতে পারিতেছ?"

'হাঁ" বলিয়া আমি কাউণ্টকে পুনর্ব্বার নমস্কার করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর একটি লোকের সঙ্গে আমি সিঁড়ি ও দরদালান পার হইয়া এক সশস্ত্র প্রহরীরক্ষিত বৃহৎ কক্ষের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরটি দুইভাগে বিভক্ত। তাহার একদিকটা উজ্জ্বল-ভাবে আলোকিত,—আমরা সেই দিকেই দাঁড়াইয়াছিলাম। অন্যদিকটা প্রায় অন্ধকার। কেবল একটা প্রকাণ্ড টেবিলের উপরে একটি দীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল মাত্র। আমার সঙ্গী টেবিলের দিকে চাহিল। এবং চাহিয়াই, সচকিত হইয়া যেন শ্বাসরোধ করিয়া সে জড়সড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনার কোন সঙ্গত কারণ না পাইয়া আমিও ফিরিয়া দেখিলাম। একি! সেই প্রকাণ্ড টেবিলের পিছনে স্তিমিত দীপালোকে স্বয়ং জার্ম্মাণ-সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেল্‌ম্ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন!

পাঁচমিনিট কাটিয়া গেল—তথাপি সেই নিস্তব্ধ-গম্ভীর মূর্ত্তিটী একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত কি লিখিয়া যাইতেছিল। আমাদের দিকে সম্রাট একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। আমি ভীরু নই! যে কাজ আমি করি, সে কাজে লোহার মত শক্ত বুকের দরকার। কিন্তু আমার জান্ কড়া হইলেও, আজ পৃথিবীর

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের নীরব অবহেলার সুমুখে এইরূপ একা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আমার মনেও কেমন একটা অজানা ভয়ের সঞ্চার হইল।

চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ সম্রাট তাঁহার চেয়ারের উপরে ঘুরিয়া বসিলেন এবং উগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আমি তোমাকে দেখ্‌তে চাই।"

আমার সঙ্গীকে ঘর থেকে সরাইয়া দেওয়া হইল। আমি একেবারে সম্রাটের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। য়ুরোপের এই যুদ্ধ-বিধাতাকে এর আগে এত কাছে আমি আর কখনও পাই নাই। তিনি যেন তখন অত্যন্ত চিন্তান্বিত। তাঁহার দেহ বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ হইলেও, তাঁহার ফটোর চেহারার চেয়েও তাঁহাকে যেন বৃদ্ধ দেখাইতেছিল। তাহার আকৃতির সহিত ফ্রেডারিক দি গ্রেটের একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাইলাম। সম্রাটের যে চোখ আমি আজ দেখিলাম, তাহার কোন তস্‌বিরে আমি তাহা দেখি নাই। সেই নীলাভ ধূসর চক্ষের শীতল দৃষ্টিতে একটা গাম্ভীর্য্য, একটা হৃদয়স্পর্শী ভাব ছিল। লর্ড কিচেনার ও লি হাং চাং প্রভৃতি যাঁহারা পৃথিবী-শাসনে সুপটু, তাঁহাদেরও চোখ এই রকম।

ইতিমধ্যে সম্রাট মুখ তুলিয়া চাহিলেন ও কিঞ্চিৎ কর্কশ স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বিভাগে তুমি কতদিন হইল, কাজ করিতেছ?

"আজ্ঞে, তিন বৎসর।"

"তুমি "মরক্কো" জান?"

"আজ্ঞে, হাঁ হুজুর!"

"সেখানে কতদিন ছিলে?"

"তিন বৎসর।"

ইহার পর সম্রাট কাউণ্ট ওয়েডেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা একে দিয়াই কাজ চলিবে, চিঠিপত্র প্রস্তুত কর।" সম্রাট তাঁহার স্বভাবগত আকস্মিকতার সহিত হঠাৎ চেয়ারের পিছনে হেলিয়া পড়িয়া আমার দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন—"কাগজে যা লেখা আছে মুখস্থ কর—অন্যান্য চিঠিপত্র ছাড়া, এই মৌখিক সংবাদটী তোমার যুদ্ধজাহাজ Pantherএর কাপ্তেনকে দিতে হইবে।" সম্রাট আমার হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিলেন।

Panther—জার্ম্মাণির বিখ্যাত যুদ্ধ-জাহাজ—স্পেনের উপকূলে অবস্থান করিতে ছিল—এবং ঠিক ছিল, এই Panther মরক্কোয় গিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে।

আমি আর কোন কথা না বলিয়া প্রাণপণে সম্রাটের লিখিত আদেশ মুখস্থ করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট বলিলেন—

"মুখস্থ হইয়াছে?"

আমি বলিলাম—"হাঁ।"

সম্রাট তখন আমার হাত হইতে কাগজখানি লইয়া দিয়াশলায়ের শিখায় ধরিলেন; নিমেষের মধ্যে কাগজখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

সম্রাটকে নমস্কার করিয়া আমি কাউণ্ট ওয়েডেলের কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি আমার হাতে শিলমোহর করা এক-তাড়া কাগজ দিয়া বলিলেন, "গ্রেভস্, আজ

তুমি এক অতি গুরুতর ব্যাপারে হাত দিয়াছ। চারিদিকে এখন যুদ্ধের কিরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছে সে কথা বোধ করি তোমাকে আর বেশী বুঝাইতে হইবে না; যে কাগজ দিলাম, তা তুমি আস্‌চে কাল বেলা ১২ টার সময় প্যারির জার্ম্মাণ রাজদূতকে দিবে। সেখান থেকে আবার অন্য কাগজ লইয়া মাদ্রিদের জার্ম্মাণ-রাজদূতকে দিতে হইবে—তারপর একেবারে বার্সিলোনা;—বার্সিলোনার কিছুদূরে আমাদের যুদ্ধজাহাজ Panther আছে—জাহাজের কাপ্তেনকে সম্রাটের মৌখিক খবরটী দিবে। সেখান হইতে তোমাকে জিব্রালটার গিয়া ইংরাজের নৌশক্তির খবর আনিতে হইবে। এখনি তোমাকে টাকা পাঠাইয়া দিতেছি—মনে থাকে যেন, এ টাকা সম্রাট নিজে দিতেছেন—গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে দেওয়া হইতেছে না।"

আমি বাড়ীতে আসিয়া দেখি, আমার চালাক চাকরটী চট্‌পট্ সব ঠিকঠাক্ করিয়া রাখিয়াছে—মোটবহর সমস্ত প্রস্তুত; গাড়ীতে উঠিলেই হয়। সঙ্গে cayenne pepper-এর গুঁড়া ও আর দুই একটী রাসায়নিক পদার্থ লইতেও ভুলিলাম না। কারণ, বিপদে পড়িলে আমি কখনও পিস্তল ব্যবহার করি না—লোকের চোখে-মুখে আচ্ছা করিয়া এই গুঁড়া ঝাড়িয়া দিয়া লোককে মুহূর্ত্তের মধ্যে অজ্ঞান করিয়া ফেলি।

আমি যে কামরায় উঠিলাম, সেই কামরায় একটী মহিলা ও দুটী ভদ্রলোকও উঠিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে কিছুক্ষণ পরে মহিলাটী কাতর স্বরে হঠাৎ আমাকে বলিলেন যে, একজন ভদ্রলোক তাহাকে অনেকক্ষণ হইতে অপমান করিতেছে। মহিলাটীর মান রক্ষা করিবার জন্য আমি তাহার জিনিষপত্র আমার নিকটে লইয়া আসিলাম। কিন্তু ভদ্রলোকটী হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া বলিল, "কিহে বাপু, আমার স্ত্রীর জিনিষপত্র কার হুকুমে তুমি সরিয়ে এনেছ?" মহিলাটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দুষ্টামির হাসি হাসিতেছে। আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবার মৎলোবে আছে! তাইত! তবে কি ইতিমধ্যেই এরা আমার গুপ্তকার্য্যের খবর পাইয়াছে!

এমন সময়ে "গার্ড" আসিয়া উপস্থিত হইল। ভদ্রলোকটীর কাছে সব কথা শুনিয়া সে আমাকে একটী কামরায় বন্দী করিয়া রাখিল এবং সিধা ভাষায় স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই সে আমাকে ষ্টেশনমাষ্টারের হাতে সঁপিয়া দিতে কিছুতেই ভুলিবে না!

আমি ত' মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। যেমন করিয়া হউক, আমাকে প্যারিতে যে পৌঁছিতেই হইবে! তারপর, Pantherএর কাপ্তেনের নিকট সংবাদ না লইয়া গেলে, যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী। পথে যদি পাঁচ ছয় ঘণ্টা দেরী হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ বন্ধ করিবার আর কোন উপায় থাকিবেনা।

ট্রেন কোলনে আসিলে আমি ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিলাম, "আমাকে আটক করিয়া রাখুন, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মনে থাকে যেন জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ দরকারি রাজকার্য্যে আমি যাইতেছি—ক্ষতি হইলে আপনি দায়ী।"

ষ্টেশনমাষ্টার আমার কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে মুক্তি দিলেন। পথিমধ্যে আর কোন বিপদ হয় নাই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, সেই লোক-গুলা কেমন করিয়া আমার গতিবিধির সন্ধান পাইয়াছিল!

যাহা হউক, প্যারি এবং মাদ্রিদের কার্য্য শেষ করিয়া আমি বার্সিলোনায় উপস্থিত হইলাম। তাহার পর অনেক কষ্টে Pantherএর কাপ্তেনের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সম্রাটের আদেশ জানাইলাম। সে আদেশ এই:—"পান্থার যখন মরক্কোয় গমন করিবে, তখন যেন সে কোন কারণেই ইংরাজ কিম্বা ফ্রান্সের সহিত অসদ্ব্যবহার না করে। ইংরাজ কিম্বা ফরাসীরা অপমান করিলেও তাহাকে তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। কোনমতেই 'পান্থার' যেন যুদ্ধঘোষণা না করে।"

'পান্থারে'র কাপ্তেন এ আদেশ পাইয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। কারণ, পূর্ব্বের আদেশের সহিত বর্ত্তমান আদেশের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আগে হুকুম ছিল যুদ্ধঘোষণা করা, আর এখনকার হুকুম হইতেছে যুদ্ধ থামাইয়া দেওয়া।

ইহার পরের ঘটনা ইতিহাস-পাঠকের জানা আছে। ৭ই জুলাই 'পান্থার' মরক্কোর Agadirএ আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আগুন জ্বলিয়া উঠিল —জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতেই হইবে। 'পান্থারে'র সম্মুখে একখানা ইংরাজ ও আর একখানা ফরাসী যুদ্ধজাহাজ আসিয়া তাহাকে আদেশ করিল, "এই মুহূর্ত্তে 'আগাডির' ত্যাগ কর, নতুবা বল-প্রয়োগ করা হইবে।"

'পান্থার' যদি তাহাদের হুকুম না মানিত! তাহা হইলে 'আগাডিরে' যে আগুন জ্বলিত, তাহা সমস্ত ইউরোপকে একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিত। কিন্তু 'পান্থার' ভালমানুষের মত 'আগাডির' হইতে তৎক্ষণাৎ বিদায়গ্রহণ করিল।

এই বিরাট যুদ্ধ বন্ধ করা জার্ম্মাণ সম্রাটের পক্ষে এক বহুদর্শিতার কার্য্য বলিতে হইবে। আর, এই গুরুতর কার্য্যের প্রধান সহায়ক ছিলাম আমি! সম্রাট সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, ফরাসীর সহিত ইংরাজেরা কোন গুপ্ত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ আছে। কিন্তু, সেই সন্ধির বন্ধন কতটা দৃঢ়, এবং ফরাসীরা বিপদে পড়িলে ইংরাজেরা বাস্তবিকই তাহা-দিগকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিবে কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। জার্ম্মাণ-সম্রাট মরক্কোতে 'পান্থার'কে পাঠাইয়া এক চালেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। জানা গেল যে, ইংরাজেরা সত্যসত্যই ফরাসীদের সহিত লুকাইয়া সন্ধি করিয়াছেন। এবং ফরাসীরা বিপাকে পড়িলে ইংরাজেরা কায়-মনোবাক্যে সাহায্য করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

রাজা ভড়ং

(সুর—"I am a marvellous eastern king").

পায়েতে লপেটা, শিরেতে তাজ
অধুনা শ্রীশ্রী—শ্রীমহারাজ—হম্!
রাজা ভড়ং!

গদি পাওয়াবধি খুব কড়া
নিছি নিজহাতে—গড়গড়া—হম্!
রাজা ভড়ং!

মম কুল বুঝি সূর্য্যকুল্—
তাই তো গোলালো—নাইক ভুল—ভ্রম্
রাজা ভড়ং!

ঘোম্‌টা-পুঁটুলি রাণীরা মোর
চলে দাপটিয়া ঝম্ ঝমর—ঝম্
রাজা ভড়ং!

বিষম-সমর-জবর-জং
ইদুর নড়িলে গা করে ছম্—ছম্!
রাজা ভড়ং!

তাকিয়াটি ভারি দরকারী
আমি চ্যাঁড়সের তরকারীর—যম
রাজা ভড়ং!

সফরে যখনি চলি স্বয়ং
ফটাফট্ ফোটে পটকা চম্—চম্!
রাজা ভড়ং!

হাতী চ'ড়ে ফিরি পাই খাতির
আমাতে ছেলেরা দেখে হাতীর—চং
রাজা ভড়ং!

জঙ্গলে থাকি জংলী নই
চাঁদা সই করে দিতে না হই—গম্
রাজা ভড়ং!

বাজাতে জানি মাদল অহং
হাঁকাইতে আমি পারি গো টম্—টম্
রাজা ভড়ং!

বিদ্যে "কুড়ো বা লিজ্যে" গো
হুনর দেখাতে ইচ্ছে গো,—কম্?
রাজা ভড়ং!

ভুঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাবু
পাশ ফিরে শুতে যায় বাপু—দম্!
রাজা ভড়ং!

লাগিনে কোনো প্রয়োজনেই
বাড়িয়া চলেছি ওজনেই—হম্!
রাজা ভড়ং।

মির্চ্চা ছাতুতে কচরকুট
শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—সং।
রাজা ভড়ং!

ভাংচিতে ভুলে ছাড়িনি ভাং
না চ'লে চলেছি সোজা জাহান্—নম্
রাজা ভড়ং!

আমি স্বয়ং রাজা ভড়ং
ভাড়াটে ভড়ঙ্ ও ভাঙেতে ভম্
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি
বেশকই পোসাকী—রাজা ভড়ং!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।



—"মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য,—" রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

গান্ধী-পত্নীর সম্বর্দ্ধনা

গান্ধীপত্নী শ্রীযুক্তা কস্তুরাবাই দেবীর সম্বর্দ্ধনার জন্য বেথ কার্পেন্টার হলে বিগত চৈত্র মাসে বঙ্গরমণী-গণের যে সভা হয়, সেই সভায় শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ইংরাজী অভিভাষণের পর শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নিম্নলিখিত অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন।— *

আমরা অভ্যর্থনা করিতে, যাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আজ এই নারীমণ্ডলী এখানে সমবেত, এই ভারত-রমণী কস্তুরাবাই দেবী, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; আত্মোৎসর্গের আদর্শে ইনি সমগ্র জগতের বরণীয়া। ইঁহাকে অভিনন্দনের সুযোগ পাইয়া আজ আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

ইঁহার স্বামী ভারতগৌরব শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী, গান্ধী নামেই বিশ্ববিখ্যাত!

দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশবাসীর সম্মান রক্ষা এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার সমর্থন উদ্দেশ্যে ইনি যেরূপ অসহ্য কষ্টদুঃখ অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, তাহা যেন কল্পনা-চিত্রেও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। অথচ তাহার এক কণাও কল্পিত নহে, সকলি সত্য।

আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ভারত-সম্রাটের প্রজা হইয়াও, জাতি-বিদ্বেষ এবং শাদা কালোর পার্থক্যবিচারে ভারতবাসীর কষ্ট দুঃখের সীমা ছিল না। সেখানে বসবাসের জন্য আফ্রিকানিবাসী ভারতসন্তানকে প্রতি পদে লাঞ্ছিত অপমানিত হইতে হইত। গোরা প্রজার প্রতি সেখানে আইন আদালতের ব্যবস্থা ছিল এক রকম, আর কালো ভারতবাসীর প্রতি অন্য রকম,—লগুড়াঘাতই তাহার পক্ষে ছিল বৈধ ব্যবস্থা।

এই অবিচারের বিরুদ্ধে গান্ধী ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এ যুদ্ধে অস্ত্র নাই শস্ত্র নাই, বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন বা অত্যাচার নাই,—ইহাতে যত কষ্ট দুঃখ কেবল নিজের। 'আমি এই অন্যায় আইন মতে চলিব না, আমাকে তোমরা মার ধর যাহা ইচ্ছা কর, তথাপি এ অন্যায় আইন মানিব না; আইন বদল হোক এই আমার প্রার্থনা।—' এই তাঁহার যুদ্ধের মূলমন্ত্র। ভারতবাসী অনেকেই সেদেশে তাঁহার পথ অনুসরণ করিল—তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।—কতিপয় সদাশয় বিদেশীও তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে সহায় হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে পুণ্যপ্রাণ পোলক মহোদয়ের সহিত আমরা সুপরিচিত। তিনি একাধিকবার এই বিষয়ে সহানুভূতি লাভ উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় গোখলেও গান্ধীকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। গান্ধী গোখলে প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সন্তানগণ আত্মোৎসর্গের মহত্বে ভারতের শীর্ষস্থানীয়।

গোখলে বলিয়া গিয়াছেন, 'বঙ্গদেশ ধন্য কেননা, জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।' আমরা বলিব, মহারাষ্ট্র ধন্য; কেননা গান্ধী, গোখলে, রাণাডে প্রভৃতি মহাত্মাগণের জন্মভূমি মহারাষ্ট্র দেশ। ইঁহারা আত্মোৎসর্গের মহিমায় সমগ্র ভারতভূমিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। যেদিন দেখিব বঙ্গবালকগণ, বঙ্গযুবকগণ, হত্যা-মন্ত্র ভুলিয়া, অত্যাচারব্রত ত্যাগ করিয়া গান্ধীর আদর্শে নির্ভীকভাবে সহিষ্ণু ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়াছে; সেইদিন বুঝিব বঙ্গদেশের কল্যাণদ্বার সত্যই আমাদের নিকট উন্মুক্ত।

গান্ধীর সাধনা প্রকৃতই ঋষিজনোচিত। তাঁহার সংকল্পের ফলে অসংখ্যবার তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে, বন্দীরূপে রাজপথে ধাঙ্গড় মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু কোন কষ্টই কোন অপমানই এই সাহসী পুরুষকে তাঁহার দৃঢ় সংকল্পে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। গান্ধী-প্রমুখ ভারতবাসীর নিরত্যাচার সাধনার বলে অবশেষে

* স্থানাভাবে বৈশাখের ভারতীতে ইহা প্রকাশের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই।—ভাঃ সঃ।

এখন আফ্রিকা-গভর্ণমেণ্ট অনেকাংশে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। স্বদেশবাসীর দুঃখ হরণে তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট আজি সার্থক; তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ আজি সমগ্র ভারতের আনন্দের কারণ।

কিন্তু গান্ধীর সেই দুঃখের দিনে, অসম-সংকল্পে, সহিষ্ণুতাব্রতে কে তখন তাঁহাকে অটল বল দিয়াছিলেন! অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সাহায্য করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সহজ-পালনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন যিনি, তিনি কে? তিনি তাঁহার এই সাধ্বী পত্নী, সুখ দুঃখের, ব্রত সংকল্পের ভাগী, জীবনের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, মহারমণী কস্তুরাবাই। স্ত্রী যদি স্বামীর সৎসাহস ও সৎকার্য্যের সহায় হন তবেই পুরুষের জীবন সর্ব্বতোভাবে সার্থক হয়। শিক্ষার অভাবে চরিত্রবলের অভাবে স্ত্রী কত সময় স্বামীর সহায় না হইয়া তাঁহার সদনুষ্ঠানে বাধাপ্রদান করেন—এ দৃষ্টান্ত এদেশে কেন, সকল দেশেই বিদ্যমান। শ্রীমতী কস্তুরাবাই সুযোগ্য স্বামীর সুযোগ্যা পত্নী। ইনি সেই সুদূর প্রবাসে নিরন্তর অত্যাচার কারাবাস লাঞ্ছনা প্রভৃতি সহ্য করিয়াও স্বদেশবাসীর হিতসাধনায় স্বামীর সহিত কায়মনে এক হইয়া কাজ করিয়াছেন। এই সকল ক্ষণজন্মা নর নারী কোন দেশের বা কালের বিশেষ সম্পত্তি নহেন, ইঁহারা জগৎগৌরব। তবে ইঁহাদিগকে আমরা জ্ঞানে দেশবাসী ক্ষুদ্র আমরাও গৌরব অনুভব করি। এই মহারমণী জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় যেরূপ অটল ধৈর্য্যের সহিত কষ্টে দুঃখে, অভাব-দৈন্যে আপনার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া প্রসন্ন অন্তঃকরণে স্বামীর অনুবর্ত্তী হইয়াছেন তাহা পুরাতন দিনের গল্পের কথা নহে, আফ্রিকার দিনের সত্য ঘটনা, সত্য চিত্র।

সেই মহিমময়ী রমণীকে মুগ্ধ অভিভূতচিত্তে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে বারবার অভিবাদন করি।

হে বরনারি, তোমার দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত কর। তোমার আদর্শ মহিমায় ভারতের প্রত্যেক গৃহ ক্ষুদ্রতর এবং উচ্চতর কর্ত্তব্য পালনে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

দৈব-পরীক্ষা

ব্যবহার-শাস্ত্রই সভ্যতার প্রধান পরিমাপক। অপরাধ নিরূপণ করিয়া দোষীকে শাস্তিপ্রদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, যে সমাজে আছে, সেই সমাজের লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি নিরাপদ। এবং ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির প্রচুর অবসরও সেখানেই বর্ত্তমান। কেবল তাহাই নহে, সমাজের অস্তিত্বও ঐ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি সমাজস্থ ব্যক্তিগণ অসঙ্গত উপায়ে পরস্পরের ধন প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, তবে অল্পকালের মধ্যেই সমাজশরীর ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই মনুষ্যসমাজে দোষনিরূপণ করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দিবার বহুবিধ নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু অনেক সময় দোষ নির্দ্দেশ করা এত কঠিন হয় যে, মনুষ্যবুদ্ধি উহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে না। এমন কি, অনেক বিষয়ে আধুনিক ব্যবহারবিদ্ মনীষীগণকেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিতে হয়; অতএব, যখন একালের মত বিস্তৃত ও নির্দ্দোষ ব্যবহার-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, অনুসন্ধেয় বিষয়ের জটিলতা যখন সহজে লোকের বোধগম্য হইত না, তখন অপরাধী নির্ণয় যে কত দুষ্কর ছিল তাহা

সহজেই অনুমেয়। যে জাতি এই বিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, সভ্যতার গৌরবলাভে তাহার ততই অধিকার।

প্রাচীন অনেক জাতির মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষগুণ পরীক্ষা করিবার কতকগুলি অদ্ভুত এবং অতিকঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল। বিচারকেরা যখন কোন মতেই অপরাধের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারিতেন না, তখন উহার মীমাংসার ভার দৈবসহায়ের উপর ছাড়িয়া দিতেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষ হয়, তবে তাহাকে বিপদে ফেলিয়া দিলে দৈবই রক্ষা করিবেন, নতুবা করিবেন না—এই বিশ্বাসই তখন বিচারকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিত। এই শ্রেণীর অপরাধ-পরীক্ষাকে দৈবপরীক্ষা বলা যাইতে পারে। বোধ হয় তখন মানুষের এ জ্ঞান জন্মায় নাই যে প্রাকৃতিক নিয়মের কোথাও নড়চড় নাই। অগ্নির দাহিকাশক্তি, বিষপ্রয়োগের শোচনীয় পরিণাম প্রভৃতি যে সকল নিয়ম আমরা এখন অনিবার্য্য বলিয়া জানি, মানবসমাজের বাল্যকালে, ঐ নিয়মগুলি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ব্যর্থ হইতে পারে এই ধারণা প্রবল ছিল।

প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল, কেহ কেহ এমন অনুমান করেন। তাঁহারা বলেন যে সফোক্লীসের (Sophocles) Antigone নামক গ্রন্থে উহার আভাস আছে। (Chamber's Encyclopædia।) প্রাচীন ইহুদিদিগের মধ্যেও যে দৈবপরীক্ষায় বিশ্বাস ছিল তাহা বাইবেলের 'Number, V' অধ্যায়ে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে ব্যভিচারে অভিযুক্ত একটী স্ত্রীলোককে মন্ত্রপূত জলদান করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে বলা হইয়াছে। Livingstone বলেন যে, আফ্রিকার নিগ্রোজাতির মধ্যে ঐরূপ এক নিয়ম প্রচলিত আছে। কোন নিগ্রো নিজের পত্নীর সতীত্বে সন্দিহান হইলে, তাহাকে একপ্রকার ভেষজরস পান করিতে দেওয়া হয়। যে স্ত্রী দোষী, ঐ রস পান করিলে তাহার রক্তবমন হইবে, যে নির্দ্দোষ তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না। নিগ্রোদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন রকমে ঐ প্রথা লক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর লোকেরা কুক্কুট বা সারমেয়কে ঐ রস পান ও তাহাকে বমন করাইয়া অপরাধী নির্ণয় করে। ইউরোপের মধ্যযুগে অনেক প্রকারের দৈব পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ অগ্নি পরীক্ষা। ইহা কেবল সম্ভ্রান্ত অভিজাতগণের প্রতি প্রযুক্ত হইত। সন্দেহ-যুক্ত ব্যক্তিকে উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহখণ্ড করতলে রাখিয়া কিয়দ্দূর অতিক্রম করিতে হইত; অথবা উত্তপ্ত লাঙলের ফলক কতকগুলি মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় উত্তমরূপে বাঁধিয়া উহার উপর দিয়া তাহাকে নগ্নপদে হাঁটিয়া যাইতে বলা হইত। তাহার পর তাহার হস্ত অথবা পদ বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া তিনদিন পরে খোলা হইত। Hume বলেন যে, হাত পা বাঁধিয়া শীলমোহর করিয়া রাখা হইত (History of England vol I, p 175)। অতঃপর বন্ধন খুলিলে যদি ক্ষত বা কোন পোড়াদাগ না দেখা যাইত তবে আসামী নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। কাহারও

কাহারও মতে আসামীকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে হইত। (Brand's Popular Antiquities, Vol. I. p. 309) লোকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে অগ্নির গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন।

তারপর জল-পরীক্ষা। ইহা সাধারণ লোকের জন্য। ইহা দুই প্রকার। ফুটন্ত জলের মধ্যে একখণ্ড পাথর রাখিয়া আসামীকে অনাবৃত হস্তে উহা তুলিতে বলা হইত। সময় সময় কনুই পর্য্যন্ত ডুবাইতে বাধ্য করা হইত। ইহাতে হাতের কোন অনিষ্ট না হইলে তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইত।

আর একপ্রকার পরীক্ষা শীতল জলে হইত। আসামীকে কোন জলাশয়ের মধ্যে ফেলিয়া দিলে, যদি ভাসিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে হাত পা নাড়িতে দেখা যাইত, তবে সে দোষী; আর বিনাচেষ্টায় ভাসিলে সে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইত। এই পরীক্ষার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বড় কেহ নিস্তার পাইত না। কারণ জলে পড়িলে কেহ হাত-পা না নাড়িয়া থাকিতে পারে না। কোন কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিলে দোষী ও ডুবিয়া গেলে নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি পাইত। কিন্তু অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেও ডুবিয়া মরার হাত হইতে নিস্তার ছিল না। ব্যাপারটা অনেকটা আগে ফাঁসি দিয়া পরে প্রাণদানের পরিহাসের মত!

ডাইনীদের বিচার জলপরীক্ষা দ্বারাও হইত। যাহার উপর লোকের সন্দেহ হইত, তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহিত এবং বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। (Brand's Popular Antiquities Vol. III) বলাবাহুল্য এরূপ অবস্থায় ডাইনীর আর বাঁচোয়া ছিলনা। ভাসিলে নিশ্চয়ই ডাইনী বলিয়া তাহাকে পুড়াইয়া মারা হইত, এবং ডুবিয়া গেলে আর তাহাকে উঠিতে হইত না; কারণ অনেকদূর না ডুবিলে লোকে মনে করিত সে ডুবিবার ভাণ করিতেছে। সাধারণের বিশ্বাস ছিল, ডাইনীরা সোলার মত জলে ভাসে, কিছুতেই ডুবিতে পারে না। ডাইনী পরীক্ষার আরও কতকগুলি বিচিত্র উপায় ছিল। নিকটস্থ কোন গির্জ্জার বাইবেল একদিকে আর তাহাকে একদিকে রাখিয়া ওজন করিলে যদি বাইবেল ভারী হইত তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত। আবার ডাইনী সন্দেহে ধৃত স্ত্রীলোককে কাঁদাইয়া পরীক্ষা করা হইত। কারণ, লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ডাইনীরা তিন ফোঁটার বেশী চক্ষের জল ফেলিতে পারে না; তাহাও আবার বামচক্ষে, ডাইনীর ডান চক্ষে জল থাকে না! (Brand's Popular Antiquities Vol III).

যাহা হউক, সাধারণ অপরাধ বিচারের আরও অনেকপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইত। নরহত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই মৃতদেহ স্পর্শ করিতে হইত। লোকে বিশ্বাস করিত গুপ্তঘাতক স্পর্শ করিবামাত্র মৃতদেহের ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইবে। ক্রশচিহ্ন

দ্বারা একপ্রকার পরীক্ষা হইত। বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ে ক্রশের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। যে আগে নড়িত অথবা পড়িয়া যাইত, সেই দোষী বিবেচিত হইত। ক্রশের আর এক প্রকার পরীক্ষাও ছিল। দুইখণ্ড কাঠ লইয়া একখানিতে ক্রশচিহ্ন অঙ্কিত করা হইত; পরে দুইখানিই পশমের মধ্যে জড়াইয়া গির্জ্জার বেদীর উপর রাখা হইত; তাহার পর পুরোহিত অথবা কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক একখণ্ড কাষ্ঠ উঠাইয়া লইত; যদি ক্রশাঙ্কিত কাষ্ঠখণ্ড উঠিত, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইত। নচেৎ সেই দোষী। (Hume's History of England).

মন্ত্রপূত পিষ্টক খাইতে দিয়া আর এক প্রকার পরীক্ষা হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হইলে পিষ্টক তাহার গলায় আটকাইয়া যাইত। কথিত আছে, কেণ্ট প্রদেশের এক ভূম্যধিকারী (Godwin, Earl of Kent) রাজভ্রাতাকে গোয়ালের ভিতরে হত্যা করিয়াছেন এই সন্দেহে ধৃত হইলে মন্ত্রপূত পিষ্টকদ্বারা তাঁহার পরীক্ষা হয়। ফলে উহা গলায় আটকাইয়া যাওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তিনি মারা যান।

এই সকল অদ্ভুত প্রথাদ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অনেক লোকের জীবন-মরণ নির্ণীত হইত। তৎপরে ক্রমে ক্রমে উহার লোপ হয়। ইউরোপের অন্যত্র ঐ প্রথা আগেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগে এই প্রথাদ্বারা অপরাধ নির্ণয় হইত। আসামীকে আনিয়া, উত্তপ্ত কুঠার হাতদিয়া ধরিয়া থাকিতে বলা হইত। সে নির্দ্দোষ হইলে তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না, আর অপরাধী হইলে হাত পুড়িয়া যাইবে। (R. C. Dutt's History of Indian Civilisation. p. 187.)

রামায়ণ মহাভারতেও তখনকার লোকের দৈবপরীক্ষায় বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দুইটী প্রধান দৃষ্টান্ত ঐ দুই গ্রন্থে আছে। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহাভারতে দেখিতে পাইবেন, পাণ্ডবগণ যখন কাম্যকবনে ছিলেন, তখন অর্জ্জুন একটি গাছের ফল মাটিতে ফেলিয়া দেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন যে, ঐ ফল আবার বৃন্তলগ্ন না হইলে সকলের অমঙ্গল হইবে। প্রত্যেকে মনের কথা সত্য করিয়া ব্যক্ত করিলেই উহা যথাস্থানে গিয়া উঠিবে, নতুবা নহে। তখন সকলে তাহাই করিলেন। দ্রৌপদীর প্রথমে মিথ্যাকথার জন্য ফলটী বৃন্তের কিছু নিম্নে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু পরে সমস্ত সত্য বলিলে উহা আবার যথাস্থানে সংলগ্ন হইল। এইরূপ অলৌকিক উপায়েও ধার্ম্মিক লোকের নির্ম্মলতা প্রমাণিত হইতে পারে, সেকালে লোকের এই বিশ্বাস ছিল; উপাখ্যানটী বোধ হয় তাহারই প্রমাণ।

মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে জল ও অগ্নি পরীক্ষার বিধান আছে:—

"পঞ্চাশৎ পলপরিমিত এবং অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ অগ্নিসন্নিভ উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সপ্তপদ গমন করাইবে। উহাতে হস্ত দগ্ধ না হইলে

এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জল যদি তাহাকে ভাসাইয়া না তোলে, তবে সে নির্দ্দোষ জানিবে।" কিন্তু এই বিধান কেবল শূদ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইত। Vincent Smithএর মতে মনুসংহিতা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সময়েই যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপ বুদ্ধির গল্পেও আধিদৈবিক উপায়ে ন্যায় বিচার সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। পাপবুদ্ধি ধনাপহারক স্থির করিবার জন্য অরণ্য-দেবতাকে সাক্ষ্য মানিয়াছিল এবং রাজ-পুরুষেরা উহাতে বিশ্বাস করিয়া দেবতার বাণী শুনিবার জন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের বিবরণ পাঠ করিলে দৈবপরীক্ষার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু তাহার পরে এই বিষয় বৈদেশিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এক গ্রীক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য এক হ্রদ আছে। উহার জল সর্ব্বত্র জানু পর্য্যন্ত গভীর! বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ে ঐ জলে নামিয়া এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। যে নির্দ্দোষ তাহার জানুর উপর জল উঠে না, কিন্তু যে প্রকৃত দোষী সে কিছুদূর গেলেই তাহার মাথা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে এক পর্ব্বতের মধ্যে এক প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। উহার অভ্যন্তরে দ্বাদশহস্ত উচ্চ এক দেবমূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির অর্দ্ধভাগ স্ত্রী ও অপরার্দ্ধ পুরুষের মত। উহার পশ্চাতে বহুদূর পর্য্যন্ত অন্ধকারময় পথ। তাহার পর এক দ্বার; তাহার মধ্য দিয়া নির্ম্মল জল-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যাহারা ন্যায়ান্যায় পরীক্ষা করিতে আসে, তাহারা মশাল লইয়া ঐ অন্ধকার পথ দিয়া দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। যে নিষ্পাপ সে অনায়াসে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে, আর যে পাপী সে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেই দ্বার আপনা-আপনি রুদ্ধ হইয়া যায়। এই প্রকারে পাপ-পুণ্যের মীমাংসা হয় এবং অপরাধী ধরা পড়ে (M'crindle's Ancient India p. 173)। উক্ত গ্রন্থকার খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বটে, কিন্তু তিনি যে গ্রন্থ হইতে আপনার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

য়ুয়ন্‌চুয়াঙ চারিপ্রকার দৈবপরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম পরীক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থলির মধ্যে পুরিয়া একটি ভারি প্রস্তর-পাত্রের সহিত ঐ থলিটি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। যদি থলিটি ভাসে এবং পাথর ডুবিয়া যায় তবে আসামী নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। যদি পাথর ভাসে আর লোকটী ডুবিয়া যায়, তবে সে-ই দোষী।

দ্বিতীয়তঃ অগ্নিদ্বারা পরীক্ষা। আসামীকে উত্তপ্ত লৌহাসনে বসান হইবে, উত্তপ্ত লৌহখণ্ড তাহার পায়ে এবং হাতের তলায় লাগাইয়া দেওয়া হইবে, অধিকন্তু তাহাকে জিহ্বাদ্বারা ঐ লৌহখণ্ড চাটিতে

হইবে, ইহাতে যদি শরীরের কোন স্থানে কোন দাগ বা ক্ষত হয় তবে সে দোষী সাব্যস্ত হইবে, নচেৎ নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি রুগ্ন হইলে একটি ফুলের কুঁড়ি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যদি উহা ফুটিয়া ফুল হয়, তবে আসামী নির্দ্দোষ; পুড়িয়া গেলে সে দোষী।

তৃতীয় পরীক্ষা তুলাদণ্ডের সহায়তায়। আসামীকে একদিকে ও অপর দিকে একখণ্ড প্রস্তর দিয়া তুলাদণ্ড সমান করিয়া ওজন করিলে যদি আসামী নির্দ্দোষ হয় তবে তাহার দিক ঝুলিয়া পড়িবে, অন্যথায় বিপরীত হইবে।

চতুর্থ উপায় বিষপ্রয়োগ। একটী মেষের দক্ষিণ উরুতে ক্ষত করিয়া উহার মধ্যে নানাবিধ বিষ ও আসামীর খাদ্য একত্র করিয়া মিশাইয়া রাখা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি নিরপরাধ হয়, তবে ঐ মেষের কোন অনিষ্ট হইবে না, নতুবা তাহার মৃত্যু হইবে। (Beal, Western Records. Vol. II)

এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের নিকট উল্লিখিত বিচার-প্রণালী অদ্ভুত এবং বর্ব্বরোচিত বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর হিন্দুগণ এবং য়ুয়ন্‌চুয়াঙ নিজেও উহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখিতে পান নাই। কিন্তু, প্রাচীন সাক্সণ-দিগের মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা ও তৎপ্রকার অন্যান্য ব্যাপারে সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুরোহিতগণ যেরূপ নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিতেন, সেইরূপ এদেশেও হইত কি না তাহা বিবেচনার বিষয়।

য়ুয়ন্‌চুয়াঙের চারিশত বৎসর পরে আর এক বিদেশীর মুখে দৈবপরীক্ষার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। আলবেরুণী একাদশ শতাব্দীতে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের সপ্ততীতম অধ্যায়ে ছয় প্রকার কঠোর পরীক্ষার বর্ণনা আছে। (Sachace's Translation P 159.)

প্রথম উপায় এই। আসামীকে এক প্রকার বিষ পান করিতে দেওয়া হয়। তাহার কোন দোষ না থাকিলে, উহাতে অনিষ্ট হইবে না। আলবেরুণী বলেন, ঐ বিষের নাম "ব্রাহ্মণ" এবং উহা প্রাণ-নাশক। নামসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু বিষের গুণবিষয়ে ভ্রম না হওয়াই সম্ভব।

দ্বিতীয় উপায় পূর্ব্বকথিত জলে ডুবাইয়া মারারই রূপান্তর। আসামী কোন গভীর নদী অথবা কূপের নিকট গিয়া জলকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "হে জল, তুমি দেবতাদিগের অধিকারস্থ। গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল বিষয় তুমি অবগত আছ। অতএব আমি নিষ্পাপ হইলে আমার জীবন রক্ষা করিও, আর দোষী হইলে আমাকে সংহার করিও।" অতঃপর পাঁচজন লোকে তাহাকে ধরিয়া সবলে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পুণ্যবল থাকিলে তাহার রক্ষা, নচেৎ জল আর কোন কথা শুনিবে না।

এইরকম পরীক্ষায় নিরপরাধ লোকে কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাইত তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর; পক্ষান্তরে প্রকৃত অপরাধীর অব্যাহতি লাভের অতি সহজ উপায় ছিল।

একটু সাহস দেখাইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইত। আলবেরুণী অপরাধী সাব্যস্ত করিবার তৃতীয় উপায় এইরূপ বলিয়াছেন।

বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই এক দেবমন্দিরে লইয়া যাওয়া হইত। প্রতিবাদী পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া বাদীর সহিত দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইত। তাহার পর পুরোহিত দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া সেই জল উভয়কে পান করিতে দিতেন। সে অপরাধী হইলে রক্তবমন হইত, নচেৎ কিছুই হইত না।

চতুর্থ পরীক্ষা অতি বিচিত্র। আসামীকে দাঁড়িপাল্লায় বসাইয়া ওজন করিবে। তারপর সে নামিয়া আসিয়া তেত্রিশকোটী দেবতার মধ্য হইতে যত জনের ইচ্ছা দোহাই দিবে এবং তাঁহাদের নাম একখণ্ড কাগজে লিখিয়া মাথায় বাঁধিবে। পুনরায় ওজন করিয়া যদি সে পূর্ব্বাপেক্ষা ভারী হয়, তবে সসম্মানে মুক্তিলাভ করিত তাহা না হইলে সে দোষী।

পঞ্চম পরীক্ষায় যে পড়িত তাহাকেই দাগী হইতে হইত। মাখন ও তিলের তৈল সমপরিমাণে লইয়া এক কটাহে রাখিয়া আগুনে ফুটাইবে। পরে একটী টাট্‌কা পাতা উহাতে ফেলিয়া দিলে যদি দেখা যায় যে উহা তৎক্ষণাৎ তৈল মধ্যে পুড়িয়া গিয়াছে, তবে পরীক্ষার সময় হইয়াছে জানিবে এবং একখণ্ড স্বর্ণ উহাতে ফেলিয়া দিয়া আসামীকে হাত দিয়া তুলিতে বলিবে। হাত যদি পোড়ে তবে তাহাকে অপরাধের শাস্তিগ্রহণ করিতেই হইবে।

আলবেরুণী ষষ্ঠ পরীক্ষাকেই কঠোরতম বলিয়াছেন। একখণ্ড লৌহকে এত উত্তপ্ত করা হইবে যে, উহা প্রায় গলিয়া যাইবার উপক্রম করিবে। তখন আসামীর হাতে কয়েকটী ধান রাখিয়া তদুপরি একটি বৃক্ষপত্র রাখিবে এবং তাহার উপরে ঐ অগ্নিবর্ণ লৌহ স্থাপন করিবে। আসামী উহা লইয়া সাত পা চলিলে যদি তাহার হাতের কোন অনিষ্ট না হয়, তবে সে নিরপরাধ। এই পরীক্ষা মনুতে বর্ণিত আছে। কিন্তু তখন শূদ্রের জন্যই ইহার ব্যবস্থা ছিল।

আবুলফজেলের মতে হিন্দুদিগের মধ্যে আট প্রকার দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। (Gladwin's Ain-i-Akbari P. 740)। কাহারও কাহারও মতে বাদীই উক্ত পরীক্ষাদ্বারা নিজের অভিযোগের সত্যাসত্য নিরূপণ করিবে। প্রথম পরীক্ষা ব্রাহ্মণদিগের জন্য। আসামীকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া নামাইয়া দিবে এবং কতিপয় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তাহাকে পুনরায় ওজন করিবে। যদি সে পূর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা হয় তবে সে নির্দ্দোষ, আর যদি ভারী হয় অথবা তুলাদণ্ড সমান থাকে, তবে সেই প্রকৃত অপরাধী।

দ্বিতীয় পরীক্ষা তপ্ত লৌহের, কিন্তু একটু নূতন রকমের। ষোল আঙ্গুল অন্তর রাখিয়া ৭টী বা ৯টী বৃত্ত মাটিতে অঙ্কিত করা হয়। যাহাকে পরীক্ষা করা হইবে সে স্নাত হইয়া আচারানুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিলে তাহার দুই হাতের তালু একত্র করিয়া ৭টী অশ্বত্থ পত্র রাখিয়া রেশম দ্বারা ভাল করিয়া হাতদুটি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সেই অবস্থায় সাড়ে তিন সের ওজনের অগ্নিবর্ণ লৌহখণ্ড হাতে লইয়া আসামী একে একে

ঐ বৃত্তগুলির মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইবে। শেষবৃত্তে আসিলে লৌহদণ্ড ফেলিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু যদি সে কিছুদূর আসিয়াই ফেলিয়া দেয়, তবে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ইহাতে কোন অনিষ্ট না হইলে বিচারে তাহারই জয় হইল।

আবুলফজলের তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাখার অভ্যাস দরকার। যে এই পরীক্ষায় পড়িবে, তাহাকে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নাভি পর্য্যন্ত জলে নামিয়া ডুব দিয়া থাকিতে হইবে। এদিকে এক ব্যক্তি ১০৬ আঙ্গুল দীর্ঘ এক ধনুকে তীর যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিবে এবং আর এক ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া উহা লইয়া আসিবে। এই সময় পর্য্যন্ত যে ডুব দিয়া থাকিতে পারিবে, বিচারে তাহারই জয় লাভ হইবে। এই পরীক্ষা কেবল বৈশ্যদের জন্য।

চতুর্থ পরীক্ষা বিষপ্রয়োগ, শূদ্রের প্রতি প্রযুজ্য। ঋতুবিশেষে বিষের পরিমাণের তারতম্য আছে। বিষের সহিত ত্রিশগুণ পরিমাণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আসামীকে দক্ষিণমুখে দাঁড় করাইয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা হইলে অপর একব্যক্তি পূর্ব্ব অথবা উত্তরমুখী হইয়া তাহাকে উহা খাওয়াইয়া দিবে। দর্শকেরা পাঁচশতবার করতালি দিবার মধ্যে যদি বিষের কোন ক্রিয়া না হয় তবে আসামী মুক্তি পাইবে এবং বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করা হইবে।

পঞ্চম উপায় দেবমূর্ত্তির স্নানের জলপান। চৌদ্দ দিনের মধ্যে কোন অপকার না হইলে আসামী নির্দ্দোষ জানিবে।

ষষ্ঠ পরীক্ষা এই প্রকার। মাটীর পাত্রে যাটী (বা আশু) ধানের চাউল একরাত্রি রাখিয়া প্রভাতে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বমুখী করিয়া দাঁড় করাইয়া উহা খাওয়াইয়া দিবে। পরে অশ্বত্থ বা ভূর্জ্জপত্রে নিষ্ঠীবন ফেলিলে যদি তাহাতে রক্ত দেখা যায়, অথবা যদি তাহার মুখ ফোলে কিংবা দেহাদি কাঁপে তবে প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িয়াছে বলিয়া জানিবে। এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এইপ্রকার চালপড়ার ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়।

সপ্তম পরীক্ষা ফুটন্ত তৈল হইতে এক খণ্ড স্বর্ণ তুলিয়া লওয়া, আলবেরুণী ও আবুলফজলের বর্ণনারই মত।

অষ্টম পরীক্ষা অতি সহজ। বাদী প্রতিবাদী উভয়ে দুইখানা রূপার বা সীসার পাতের উপর অথবা ভূর্জ্জপত্রে "ধর্ম্ম" ও "অধর্ম্ম" এই দুইটী লিখিয়া পূর্ব্বে জল রাখা হয় নাই এমন একটি পাত্রে রাখিবে। তাহার পর যাহার ভাগ্যে "ধর্ম্ম" কথাটী উঠিল সেই জয়ী হইবে। এই প্রকার মূর্ত্তিখেলা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় বিলাতেও প্রচলিত ছিল। George Eliot এর Silas Marner নামক উপন্যাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মিল্ তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, নয়প্রকার দৈবপরীক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তুলাদণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, জলে নিমজ্জন, বিষপ্রয়োগ, দেবমূর্ত্তির স্নানের জল, চালপড়া, ফুটন্ততৈল,

তপ্তলৌহ এবং দুইখানি ক্ষুদ্র দেববিগ্রহ লইয়া পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইত (Mill's History of India p. 195)। অন্য সব গুলিই আবুলফজলের বর্ণিত পরীক্ষার অনুরূপ; কেবল তিনটীর বর্ণনা অন্য রকমের।

মিল্-বর্ণিত অগ্নিপরীক্ষা এই প্রকার। নয় হস্ত দীর্ঘে, দুই বিঘত প্রস্থে এবং এক বিঘত গভীর এক গর্ত্ত করিয়া উহা অগ্নিপূর্ণ করিবে। অতঃপর অভিযুক্ত ব্যক্তি নগ্নপদে ঐ অগ্নির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবে। ইহাতে তাহার কোন অপকার না হইলে সে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইবে।

বিষ-পরীক্ষা দুই প্রকার—এক,আসামীকে বিষ খাওয়ানো। অপর পরীক্ষায় একটী বিষধর সর্পকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া একটী অঙ্গুরী বা মুদ্রা উহাতে ফেলিয়া দিবে। আসামী যদি নির্ব্বিঘ্নে হাঁড়ীর মধ্য হইতে উহা তুলিয়া লইতে পারে, তবে তাহার কোন দোষ নাই মনে করিতে হইবে।

শেষ পরীক্ষা দেবমূর্ত্তি লইয়া। একটী রূপার ও আর একটী সীসার ছোট মূর্ত্তি কোন গভীর পাত্রে রাখিবে; অথবা একখণ্ড সাদা আর একখণ্ড কাল কাপড়ে দুইটী বিগ্রহ অঙ্কিত করিয়া গোবরে পূরিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিবে। যদি আসামী রৌপ্যমূর্ত্তি বা শ্বেত বস্ত্রখণ্ড সহজেই তুলিয়া লইতে পারে, তবে সে নিরপরাধ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে মাত্র এক প্রকার; মনুর সময়ে দুইপ্রকার, (তাহাও শূদ্রের জন্য), কিন্তু ক্রমে সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া আট নয় প্রকার হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ন্যায় বিচারের নামে যে কেবল নৃশংসতারই অনুষ্ঠান হইত তাহা নহে, সময় সময় অতি বীভৎস ব্যাপারও উহার সহিত মিশ্রিত থাকিত। ডাঃ বুকানন নামক একজন ইংরাজ লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সময় দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখিতে পান। তিনি বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে যদি এক বর্ণের পুরুষ অন্য বর্ণের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়া পাপ গোপন করিত, তবে তাহার পরীক্ষার জন্য স্ত্রীলোকের শরীরে গলিত সীসা এবং পুরুষের শরীরে উত্তপ্ত লৌহ অতি কুৎসিত উপায়ে প্রযুক্ত হইত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, নির্দ্দোষ ব্যক্তির উহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না। (Mill's History of India, p. 195, note.) মিল্ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এ কথা লিখেন নাই, ইহা সম্ভব; তিনি বুকাননের পুস্তকের পত্রাঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন এবং সমালোচক উইলসনও তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

ইউরোপে দৈব-পরীক্ষা যত শীঘ্র উঠিয়া গিয়াছিল, এখানে তত শীঘ্র যায় নাই। মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে কমিয়া আসে এবং বোধ হয় ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বেই অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। তবে স্থানে স্থানে পরেও লোকের উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আজিও চালপড়া, বাটি চালান, হাতচালান, নলচালান প্রভৃতি ব্যাপার নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। মানুষের মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে সহজে তাহা উৎপাটিত হয় না। তাহার উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, সুসভ্য ইংলণ্ডেও নরহত্যা হইলে কৃষকদের মধ্যে মৃতদেহ স্পর্শ করিবার প্রথা আজিও বিদ্যমান আছে। স্পর্শ করিলে মৃতব্যক্তির প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই, ইহা প্রমাণিত হইবে। আততায়ীর স্পর্শ মৃতদেহের লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইবে, এই প্রাচীন বিশ্বাসের আভাস ঐ প্রথায় পাওয়া যায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠাকুরঝি

গল্প

নীরজা রান্নাঘরে ঝোল সাঁৎলাইতেছিল,—শিবপ্রিয়া পা টিপিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া তাহার মুখে খানিকটা মোহনভোগ পূরিয়া দিল। নীরজা ঘাড় ফিরাইয়া অনুযোগের সুরে কহিল, "ও কি ভাই, ঠাকুরঝি!"

শিবপ্রিয়া হাসিয়া কহিল, "কিছু মুখে দাও দেখি। নিজে থেকে ত খাবার কখনও ফুরসৎ দেখলুম না!"

নীরজা হাত ধুইয়া ধোয়া জল কড়ায় ঢালিয়া সরিয়া আসিল, কহিল, "এই যে ঝোলটা নাবিয়ে রেখেই খেয়ে নিচ্ছি।"

"বাসি রুটি ত! সে আর তোমায় খেতে দিচ্ছি না। কেন বল তো,—আমি খাব লুচি মোহনভোগ, আর তুমি বাড়ীর বৌ, একটি বৌ, তুমি কতকগুলো বাসি রুটি গিলবে! কেন? মার সঙ্গে এই নিয়ে আজ খুব একচোট হয়ে গেছে, আমার।"

নীরজা ম্লান নেত্রে শিবপ্রিয়ার পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে করুণ মিনতি যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। কেন, তুমি আমার হইয়া ঝগড়া কর, ভাই? সে তাল সামলাইতে আমার যে প্রাণ বাহির হইয়া যায়! শিবপ্রিয়া তাহা বুঝিত, তাই সে কহিল, "আমি এবার তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। দেখি, মা তোমায় কেমন কিছু বলে!"

নীরজা শিহরিয়া উঠিল, কহিল, "না ভাই, না ঠাকুরঝি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শিবপ্রিয়া একদৃষ্টে নীরজার পানে চাহিয়া রহিল। নীরজার সুন্দর মুখে ঘামের বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে; কপালের উপর মুক্ত কেশগুলা সে ঘামে ভিজিয়া বসিয়া গিয়াছে; আগুনের তাপে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে! শিবপ্রিয়া কহিল, "আজ থেকে আর একলা তোমায় রাঁধতে দিচ্ছি না। আমিও রান্নায় যোগ দেব।" বলিয়া শিবপ্রিয়া উনানের দিকে অগ্রসর হইল।

নীরজা বাধা দিয়া কহিল, "না ভাই, তোমার সহ্য হবে না; অসুখ করবে।"

শিবপ্রিয়া সজোরে কহিল, "ওগো, না গো না, আমি মোমের পুতুল নই যে আগুন-তাতে গলে যাব!"

নীরজা কহিল, "তুমি দুদিনের জন্যে এখানে জিরুতে এসেছ—"

শিবপ্রিয়া কোপের ভাণ করিয়া কহিল, "বটে, আমার বাপের বাড়ী আমি এসেছি, কুটুম! তাই আমি সিংহাসনে দিবা-রাত্তির বসে থাকব, কুটোটি অবধি নাড়তে পাব না! ইস্ লো! না, আমার হাতের রান্না খেলে তোমাদের জাত যাবে? ওগো, তোমার ঠাকুরজামাই অখাদ্যি খেলেও সে মোছলমান নয়—বুঝলে?"

নীরজা জানিত, শিবপ্রিয়াকে ঠেকাইয়া রাখা দায়! সে যাহা ধরিবে, তাহা সে করিবেই। বিশেষ নীরজার কষ্ট এতটুকুও লাঘব করিবার জন্য শিবপ্রিয়া মায়ের উগ্র রোষানল হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে। বড়লোকের ঘরে সে পড়িয়াছে,—বাপের বাড়ী বড় একটা আসিবার তাহার সুবিধা ঘটে না। এক বৎসর পরে কয়দিনের কড়ারে এবার সে বাপের বাড়ী আসিবার অনুমতি পাইয়াছে। মা মেয়েকে পাইয়া কোথায় রাখিবেন, কি তাহাকে পাঁচটা ভাল জিনিস খাওয়াইবেন, তাহা ভাবিয়া অস্থির আকুল হইয়া উঠিয়াছেন! পূর্ব্বে যেখানে শুধু স্নেহ ছিল, এখন সেখানে মন জোগাইবার পালা পড়িয়াছে। হোক পেটের মেয়ে, তবু সে আজ বড়লোকের বৌ! এই কথাটাই মায়ের মনে সকলের চেয়ে বেশী জাগিতেছিল। তাই মা মেয়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মেয়ে কিন্তু দেখিতে পাইল, তাহার আদরের ঘটায় বেচারী নীরজার পরিশ্রমের সীমা নাই। আবার শুধু তাহাই নহে। মুখ টিপিয়া এতখানি যে খাটিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, তাহার উপর জুলুমেরও কি অন্ত আছে! আবার শুধুই জুলুম? শিবপ্রিয়া নারী—সে জানে, সংসারের কাজে নারী যতই খাটিয়া সারা হোক না কেন, সে খাটুনি কিছুই তাহার গায়ে লাগে না, যদি এ সকল খাটুনির পিছনে স্বামীর ভালবাসায় জুড়াইবার একটা আশ্রয় থাকে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে নীরজার ভাগ্যে তাহারও অভাব। প্রবল-প্রতাপ ভাই তাহার স্ত্রীর ভালবাসার ধার মোটেই ধারিত না। বৌ যখন গভীর রাত্রে পরিশ্রমান্তে জুড়াইবার জন্য ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লয়, ভাই শ্রীপতি তখন নীচ ও জঘন্য আমোদ-প্রমোদের চেষ্টায় বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। মার সেদিকে শাসন ত মোটেই নাই, বরং তিনি ছেলেকে এ বিষয়ে একরূপ প্রশ্রয়ই দিয়া আসিতেছেন!

বহুদিন পরে ভাইয়ের সংসারে আসিয়া এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া শিবপ্রিয়ার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, দূর হোক, এখনই চলিয়া যাই! কিন্তু না, বেচারী নীরজা! নীরজার প্রতি সুগভীর মমতাই তাহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিল। সে ভাবিল, নীরজার সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া তবে সে এখান হইতে নড়িবে! এমন লক্ষ্মী বৌ—তাহার এমন দুর্দ্দশা! ঘরের লক্ষ্মী যেখানে কাঁদিয়া দিন কাটায়, সে সংসারের উচ্ছেদ হইতে কতক্ষণ!

তাই বৌয়ের পক্ষ লইয়া মায়ের সহিত সে ঝগড়া সুরু করিল। স্বামি-সৌভাগ্যের দুর্জ্জয় বর্ম্ম তাহাকে বিপুল শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মাকে সে স্পষ্টই বলিল, "তোমার আস্কারাতেই ত দাদার এতখানি বাড় হয়েছে!"

মা বলিলেন, "তা যা বল, বাপু, শ্রীপতি আমার এ-কালের ছেলেদের মত বেহায়া নয়—যে, বৌকে মাথায় তুলে নাচবে!"

শিবপ্রিয়া রাগিয়া বলিল, "নাঃ, বৌকে দু'পায়ে থেঁৎলানোটাই ভারী পৌরুষের লক্ষণ!"

মা বলিলেন, "বৌ বৌই আছে, খাচ্ছে পরছে—ব্যস! আবার কি। কিসের তার আর অভাব রইল, শুনি! মেমেদের মত সোয়ামীর হাত ধরে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে না কি! না, পাঁচটা মজলিশে ধেই ধেই করে নাচতে ছুটবে?"

বৌ-সম্বন্ধে মাতার এই আশ্চর্য্য ধারণার কথা শুনিয়া শিবপ্রিয়া অবাক হইয়া গেল, কিন্তু দমিল না। সে ভাবিল, কিছুতেই ছাড়া হইবে না—এ গাঙ্গে তরী যখন ভাসাইয়াছে, তখন শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া কূলে সে পৌঁছিবেই! ভাইকেও একদিন কাছে পাইয়া সে বেশ চড়া রকমের দশটা কথা শুনাইয়া দিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, শ্রীপতি পূর্ব্বে দুই বেলা দুই মুঠা ভোজন করিবার জন্যও অন্দরে আসিতেছিল, এখন ভগ্নীর কড়া কথা শুনার পর হইতে সে পুরে সে একান্তই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল।

এই ঘটনায় মায়ের যত রাগ পড়িল, নীরজার উপর! সে-ই ত এ ব্যাপারের মূল! তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ত শিবপ্রিয়া কঠিন বচনের চাকাখানা ঘুরাইয়া দিয়াছে! আর সেই চাকা তাঁহাকে ও শ্রীপতিকে মাড়াইয়া পিষিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! কতদিন পরে মেয়ে আসিল—কোথায় দুই দণ্ড তাহাকে কাছে রাখিয়া সুখ-দুঃখের দুইটা কথা কহিবেন, তাহার অবকাশমাত্র না দিয়া মেয়েটা বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিতেছে! পাঁচটা বাজে ছুতা খুঁজিয়া মার সঙ্গে কোঁদল বাধাইতেছে! মুখ টিপিয়া থাকিলে কি হয়, বৌয়ের হাড়ে ভেল্‌কি খেলে! তাই বৌয়ের উপর তাঁহার আক্রোশ সীমা ছাপাইয়া উঠিল। বৌকে অন্তরালে পাইলেই মনের জ্বালার বেশ দুই-চারিটা তীব্র ছিটা তিনি তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না।

নীরজা চোখের জল মুছিয়া ভাবিল, হায়, ঠাকুরঝি এ করিল কি! মধু পাইবার প্রত্যাশায় মধু-চক্রে খোঁচা দিয়া মধু ত পাওয়া গেলই না, এখন হুলের বিষে তাহার যে প্রাণ যাইবার জো হইয়াছে! মনে সুখ ত তাহার ছিলই না; স্বস্তি একটু ছিল! সে স্বস্তিটুকুও ঠাকুরঝি আজ দূর করিয়া দিতেছে! হায়, সে দুই দিনের লোক, দুই দিন পরেই দূরে চলিয়া যাইবে; কিন্তু সে বুঝিতেছে না, এ দুইদিনে সংসারটায় যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া গেল, সে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া নীরজার পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কতখানি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে!

২

রান্নাঘরে মেয়ের গলার সাড়া পাইয়া

মা পা টিপিয়া তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৌয়ের পানে রক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ননদের সঙ্গে গানে-গল্পে ঝোল্‌টা শেষ পুড়িয়ে ফেলো না যেন! কোথায় ও দু দিনের জন্য এল, বাপের বাড়ীতে জিরুতে, না, দিবা-রাত্তির ওকে ধরে ফুসলোনো হচ্ছে! শেষে রান্নাঘরে এই উনোনের পাশে আগুন-তাতে অবধি ওকে টেনে আনা হয়েছে!"

নীরজা মাটীর পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, "ও কেন ডাকতে যাবে? আমি নিজে এসেছি। সকাল থেকে মানুষটা কিছু না খেয়ে রেঁধে সারা হচ্ছে,—কি খেলে না খেলে, সেদিকে কারও নজর নেই! তাই ওর মুখে জোর করে একটু মোহনভোগ পুরে দিলুম।"

মা বলিলেন, "বড়লোকের মেয়ের মুখে বুঝি রুটী আর রোচে না!"

শিবপ্রিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা—।" সে স্বরে মা চমকিয়া থামিয়া গেলেন। শিবপ্রিয়া বলিল, "তুমি ওকে যা খুসী বকতে পারো, কেন না ও তোমার বৌ। এখন ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছ। কিন্তু তাই বলে ওর বাপের নামে খোঁটা দিয়ো না। ও ভাল মানুষ, তাই চুপ করে সহ্য করছে! আমায় যদি কেউ এমনি করে আমার মরা বাপের নামে খোঁটা দিত, তাহলে আমি কি করতুম, জানো? নখে করে তাকে ছিঁড়ে ফেলতুম—তা সে আমার যত-বড় গুরুজনই হোক না কেন! সোয়ামী হলেও তাকে আমি রেহাই দিতুম না।"

মেয়ের কথায় মা ভড়কাইয়া গেলেন। শিবপ্রিয়ার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল—রাগে সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মা বলিলেন, "এখন আয় বাপু—রান্নাঘর থেকে চলে আয়—তোর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এখনই আবার ফিট্-টিট হয়ে পড়বে! কত করে ত ফিট বন্ধ হয়েছে। আয়, চলে আয়।" মা মেয়ের হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিলেন।

শিবপ্রিয়া কহিল, "না, আমি যাব না। ছাড়ো আমায়। আমি আজ রাঁধব—বৌকে রাঁধতে দেব না। তুমি যাও। আমায় রাগিয়ো না, বলছি,—তাহলে অনর্থ বাধবে!"

মা ভয়ে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বৌয়ের পানে যে দৃষ্টি হানিয়া গেলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল।

নীরজা কাঠের পুতুলের মতই নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন চেতনা ছিল না। চোখের সামনে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য! যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখে, শিবপ্রিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কানি দিয়া কড়ার আংটা ধরিয়া উনান হইতে ঝোলের কড়া নামাইতেছে। সে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া তখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সহজভাবেই সে বলিল, "দে ত ভাই, ঐ কাঁশিখানা—ঝোলটা ঢেলে রাখি। কেমন, এই হয়েছে ত? আর থাকলে ঝোল মরে একেবারে কাই হয়ে যাবে, না?"

যন্ত্র-চালিতের মত নীরজা কাঁশি আগাইয়া দিল। শিবপ্রিয়া কাঁশিতে ঝোল ঢালিয়া রাখিয়া খুন্তি দিয়া কড়া চাঁচিয়া ফেলিল। পরে কড়ায় জল ঢালিয়া ভিজা ন্যাতা দিয়া কড়ার গা রগড়াইয়া জলটা বাহিরে নর্দ্দামার ধারে ঢালিয়া আসিয়া কহিল, "এই কড়াতেই অম্বলটা চড়িয়ে দি, তাহলে। তুই ভাই মশলাটা ঠিক করে দে। আমি ততক্ষণে চাল্‌তা কটা ছেঁচে নি।"

৩

কড়ারের তখনও কয়দিন বাকী ছিল, শিবপ্রিয়ার শাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে তাঁহার এক দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপস্থিত; বীরেন যাইয়া শিবপ্রিয়াকে লইয়া আসিবে। শিবপ্রিয়ার মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। সে নীরজার পানে চাহিল। নীরজার মুখে-চোখে করুণ বেদনার একটা ছায়া পড়িয়াছিল। ঠাকুরঝি চলিয়া যাইবে! হায়, স্নেহের দেওয়াল তুলিয়া এই যে কঠিন বাক্য ও মিথ্যা তিরস্কারের হাত হইতে এতদিন তাহাকে সে আগুলিয়া রাখিয়াছিল—সে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সে চলিয়া গেলে বাহিরের রুদ্র গর্জ্জন নিমেষে যে তাহাকে দ্বিগুণ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিবে। এখন সেগুলার আক্রোশ যে ভীষণতর হইবে, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র ছিল না! হায়, কেন সে আসিল,—কেন সে এমন ভাবে ঘাঁটাইয়া শাশুড়ীর চিত্তের আগুনটাকে আরও গাঢ় তীব্র করিয়া দিল! এখন তাহার উপায়!

শিবপ্রিয়াও ঠিক এই কথাটা ভাবিতেছিল। সে ভাবিল, রুদ্র ভাব ধরিয়া সে ভাল করে নাই; শান্তভাবে কথাগুলা পাড়িয়া শান্তি আনিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কিছু ফল হইত। তাহার অনুপস্থিতিতে নীরজার অসহায় ভাব কল্পনা করিয়া সে ব্যথিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল,—দাদাকে একবার পাইলে হয়, নরম কথায় তাহাকে সে একবার বুঝাইবে! কিন্তু শ্রীপতি আজ কয়দিন আর বাড়ীর চৌকাট মাড়াইবারও অবকাশ পায় নাই!

কাল সকালে বীরেন আসিয়া শিবপ্রিয়াকে লইয়া যাইবে। কন্যা চলিয়া যাইবে, মা তাই পূর্ব্বরাত্রে তাহার ভোজনের জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে সংসারের লেঠা চুকাইয়া নীরজা যখন শুইতে আসিল, তখন তাহার মাথাটা খুবই ধরিয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া আসিয়া কহিল, "আজ আমি তোর কাছে শোব, ভাই—" শিবপ্রিয়া বিছানায় পড়িয়া নীরজাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। সে চমকিয়া উঠিল। এ কি, গা যে তাহার পুড়িয়া যাইতেছে! শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া কহিল, "তোর যে জ্বর হয়েছে, বৌ!" পরে তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল, "নাঃ—বেশ জ্বর! গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! আর এই জ্বরে আগুন-তাতে সারাক্ষণ বসে সব করলি কর্ম্মালি! তাই বুঝি আমাকে আজ ওধারে ঘেঁসতেও দিলিনে? বললি, না ভাই, কাল চলে যাবে, মার কাছে আজ থাকগে! আমিও যেমন নেকী, কিছু বুঝলুম না।"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া মার ঘরে গেল, ডাকিল, "মা—"

মা তখন মনে মনে জ্বলিতেছিলেন।

আহারের এই এতখানি আয়োজন করা গেল, তা শ্রীপতি তাহার কিছুই মুখে দিল না! সাধে কি শিবপ্রিয়া এত কথা শুনাইয়া দেয়! কেন বাপু, তুই ঘরের ছেলে,—তোর এ রাগ করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকা কেন! যুক্তি-তর্কের পর রাগটা পড়িল, বধূর উপর! সেই সর্ব্বনাশীই ত যত নষ্টের মূল! এমন বৌকে বিদায় করিলেই না হাড়ে বাতাস লাগে!

মেয়ের ডাক শুনিয়া মা কহিলেন, "আয়, শুবি আয়।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "শোবার কথা হচ্ছে না। বৌয়ের খুব জ্বর হয়েছে! কাওকে এখনই একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।"

আবার সেই বৌয়ের হইয়া ওকালতি! মা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হাঁ, দেউড়ীতে আমার পাঁচটা পাইক-বরকন্দাজ বসে আছে —এই যে এতেলা পাঠাই।"

শিবপ্রিয়া মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া উঠিল। এই সে একটু পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কঠিন হইবে না। কিন্তু উপায় নাই! সে কহিল, "আর তোমার ছেলের কি মেয়ের যদি অসুখ করত— ?"

সে কথার জবাব না দিয়া মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, কহিলেন, "যা তোর খুসী হয়, কর্‌গে না, বাছা। সারাদিন পরে ঘুমিয়ে যে একটু আরাম পাব, তারও জো নেই!"

শিবপ্রিয়া নিরাশ নিরুপায় চিত্তে নীরজার ঘরে ফিরিয়া আসিল; বাক্স হইতে অডি-কলোনের শিশি বাহির করিয়া তাহাতে রুমাল ভিজাইয়া নীরজার কপালে পটি আঁটিয়া দিল। সারা রাত্রি জাগিয়া বসিয়া সে নীরজার শুশ্রূষা করিল। নীরজা কতবার কহিল, "ও কি ভাই, ঠাকুরঝি, অত কেন? আমি ত বেশ আছি, তুমি ঘুমোও—"

ভোরের দিকে নীরজা জ্বরের ঘোরে কেমন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শিবপ্রিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। এ বাড়ীতে কাহারও কাছে কোন সাহায্য পাইবে না, সে। বীরেন আসিলে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে ভাবিয়া বীরেনের আশা-পথ চাহিয়াই সে নীরজার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সকালে মা আসিয়া ঘরের দ্বারে উঁকি পাড়িলেন। মা হাঁকিলেন, "এখনও নবাব-পুত্রীর ঘুম ভাঙ্‌ল না! আজ বীরেন আসছে, খাবার-দাবারের একটু উদ্‌যোগ-সুদ্‌যোগ করতে হবে না?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার ভয় নেই মা। এ বাড়ীতে সে জলগ্রহণও করবে না—সে ব্যবস্থা আমি করব'খন। তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি ঘুমোওগে যাও।"

মেয়ের মুখের কাছে মা দাঁড়াইতে পারিতেন না। অগত্যা তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

৪

যথাসময়ে বীরেন আসিয়া বহির্দ্বারে হাঁকিল, "দাদা—" শিবপ্রিয়া ঝীকে কহিল, "তোর জামাইবাবু এসেছে রে। এইখানে ডেকে নিয়ে আয় ত—"

বীরেন আসিলে শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার গাড়ী আছে, এখনই একজন ডাক্তার ডেকে আনো। বৌয়ের কাল রাত্তির থেকে খুব জ্বর!"

বীরেন আসিয়াই এ ভাব দেখিয়া কেমন

ভড়কাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বড় সুবিধে মনে হচ্ছে না। টাইফয়েড হতে পারে বলেই আশঙ্কা হচ্ছে! আজ কি চারদিন থেকে বোধ হয় জ্বরটা হয়েছে?" ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীরেনের পানে চাহিল।

শিবপ্রিয়ার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বোমটার অন্তরাল হইতে মৃদু স্বরে সে কহিল, "কাল রাত্রে আমরা জ্বর জানতে পেরেছি।"

প্রেসক্রিপসন লিখিয়া ভিজিটের টাকা পকেটে পুরিয়া ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলে শিবপ্রিয়া কহিল, "আমায় নিতে এসেছ, বুঝি?"

বীরেন কহিল, "হাঁ। সরোর ছেলের ভাত হবে, কাল। মা লেখেন নি?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "লিখেছেন, কিন্তু কি করে যাই, বল! আমি গেলে বৌটো বিনা চিকিৎসাতেই মারা যাবে। যা ওর যত্ন-আত্তি! এ জানলে এ বাড়ীতে আমি এবার পা দিতুম না।"

বীরেন কহিল, "তোমার দাদা কোথায়?"

শিবপ্রিয়া কিছু বলিতে পারিল না। বলিতে লজ্জা হইল যে, দাদার গুণের সীমা নাই! স্বামি-সৌভাগ্য পূর্ণ মাত্রায় যে লাভ করিয়াছে, সে-ই জানে, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও কতখানি বাধে! অনুমানে বীরেন ব্যাপার কতক বুঝিল। সে কহিল, "বাড়ীতে সে ফিরবে কখন?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "সে-ই জানে। আজ ক'দিন ত চুলের টিকিও দেখতে পাচ্ছি না; তা যাক্, তুমি ত সব দেখলে। গিয়ে মাকে বলো, এ অবস্থায় আমি কেমন করে যাই! ঠাকুরঝিকেও দুঃখ করতে বারণ করো। দেখে ত যাচ্ছ! বলো, নেহাৎ নিরুপায়!"

বীরেন কহিল, "তা ত দেখছিই। এ অবস্থায় কেমন করেই বা তোমায় নিয়ে যাই! মোদ্দা ডাক্তার ডাকা, হাঙ্গাম পোহানো, তুমি এ সব পারবে কি? রোগটাও ত সহজ নয়, বিশেষ তোমার শরীরে না যদি সহ্য হয়—"

শিবপ্রিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল, "সে ভাবনা তোমার নেই। তোমায় আবার ফিরে লগ্ন দেখতে হবে না।"

বীরেন কহিল, "তা বুঝি। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। তুমি মেয়েমানুষ, সামলাতে পারবে কেন? তার চেয়ে আমি গিয়ে বরং সনাতনকে পাঠিয়ে দি।"

শিবপ্রিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "তাহলে ত ভালই হয়। তবে এ রোগের বাড়ীতে তার খাওয়া-দাওয়া দেখবার সুবিধে হবে না কিন্তু!"

বীরেন কহিল, "সে সে করে নেবে'খন। সে ত আর এখানে কুটুম্বিতে করতে আসছে না। আমি তার ব্যবস্থাও করে দেব।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তাহলে তুমি যাও। গিয়ে যা দেখলে, মাকে বলো।"

বীরেন কহিল, "মার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "দেখা করতে চাও, দেখা করগে। আমায় আর বকিয়ো না।"

বীরেন গিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শাশুড়ী আনন্দে সারা হইয়া উঠিলেন। বড়মানুষ জামাই মা

বলিয়া ডাকিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট! তাহার উপর আবার প্রণাম! শাশুড়ী কহিলেন, "রান্না চাপিয়ে দি। দুটি খেয়ে যাও, বাবা।"

বীরেন কহিল, "না মা, তার জন্য ভাববেন না। বৌ সারুক, এসে ওরই হাতে একদিন তখন খেয়ে যাব। আমার এখন ঢের কাজ, দাঁড়াবার সময় নেই।"

বীরেন চলিয়া গেল। শাশুড়ী বুঝিলেন, এ শিবপ্রিয়ারই কাজ! সেই জামাতাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, এখানে আহার করিয়ো না! কিন্তু কেন এ নিষেধ! ইহারও মূলে ঐ বৌ! তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন সর্ব্বনাশীকেও তিনি ঘরে আনিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্ত শান্তি নাই! ইহারই জন্য ছেলে তাঁহার ঘর ছাড়িয়া গেল, মেয়ের মুখ সদাই অপ্রসন্ন! শুধু অপ্রসন্ন! মার উপর মেয়ের মন একেবারে তাতিয়া রহিয়াছে। তিনি ফুঁসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, বৌয়ের যদি এখন ঘটনাক্রমে একটা ভাল-মন্দ কিছু হইয়া যায়, তবেই মঙ্গল! নিজের ছেলে ও মেয়েকে আবার তিনি ফিরাইয়া পাইবেন! আহা, তেমন দিন কি হইবে!

বিশ্বের ভগবান বুঝি এ প্রার্থনা শুনিয়া সে দিন শিহরিয়া উঠিয়া ছিলেন!

৫

চারদিন জ্বর-ভোগের পর সেদিন দুপুর বেলায় নীরজা চোখ মেলিল, ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

তাহার হাত দুইটা শিবপ্রিয়ার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। সনাতন আসিয়া ঘরের বাহিরে ডাকিল, "বৌমা—"

শিবপ্রিয়া কহিল, "কেন বাবা?"

"হোয়েটুকু এনেছি মা। খাওয়াতে পারবে?"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া গিয়া কাপ্ লইয়া আসিল, নীরজাকে ডাকিল, "বৌ—"

নীরজা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল, "কেন, ভাই?"

"এইটুকু খেয়ে নাও—"

"আর কেন, ঠাকুরঝি?" নীরজার চোখের কোলে অশ্রুর বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

শিবপ্রিয়া আঁচল দিয়া সে অশ্রু মুছিয়া লইল। পরে হোয়ের কাপ্ নীরজার মুখে ধরিয়া কহিল, "এটুকু খাও, ভাই।"

নীরজা আপত্তি না করিয়া পান করিল; কহিল, "ঠাকুরঝি, তোমার ভাই বড় কষ্ট হচ্ছে।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "এখন সে কষ্টটুকু সার্থক কর দেখি—"

নীরজা কিছু বলিল না, উদাস ম্লান নেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছিল। দৃষ্টি তাহার নীরজার মুখের পানে। যে মুখ এত দুঃখেও সর্ব্বক্ষণ সে হাস্যময় দেখিত, সে মুখ আজ বাসি ফুলের মতই শুষ্ক মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার কপালের উপর দুই-চারিগাছি কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িয়াছিল। রেশমের মতই কোমল কেশ! সেগুলা হাত দিয়া সরাইয়া নীরজার মুখের কাছে মুখ আনিয়া শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ, বৌ?"

নীরজার চোখ জলে ভরিয়া ছিল; বাহিরের এই করুণ সমবেদন-মাখা প্রশ্নের ঘা খাইয়া মুহূর্ত্তে তাহা ঝরিয়া পড়িল। নীরজা বালিশে চোখ মুছিয়া কহিল,



সন্ধ্যা

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

"ঠাকুরঝি—" তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ, বল।"

একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা কহিল, "আজও বাড়ী আসেননি? আমার জন্যে সেই বাড়ী আসা ছেড়ে দিলেন?"

শিবপ্রিয়ার বুকের ভিতরে একটা ভীষণ বেদনা ঠেলিয়া উঠিল। সে কহিল, "দাদা তোর বুঝি ভাগ্যি ফিরেছে। একটু আগে দাদার গলার সাড়া পেলুম।"

নীরজাও সেই সাড়াই পাইয়া ছিল—তাই সে দ্বার খুলিয়াছে!

শিবপ্রিয়া বাহিরে গেল। দালানে বসিয়া শ্রীপতি তেল মাখিতেছিল। মা নিকটে দাঁড়াইয়া। শিবপ্রিয়া গিয়া সহজ স্বরে ডাকিল, "দাদা—"

ভ্রাতা ভগ্নীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু গলার স্বরে আশ্বস্ত হইল। সে কহিল, "কি হয়েছিস, শিবু?"

শিবপ্রিয়া কহিল, "তোমার চান হয়ে গেলে একবার এ ঘরে এসো। বৌয়ের বড় অসুখ—"

মা কহিলেন, "অসুখ, তা ও গিয়ে কি করবে? ও কি ডাক্তার?"

শিবপ্রিয়া সে কথা কানে না তুলিয়াই কহিল, "তোমায় একবার সে দেখতে চায়। মেয়েমানুষের মন, বোঝে না, কি করবে বল! তবে ভয় নেই, তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগবে শীগ্‌গির—তারই সে বন্দোবস্ত করেছে, এবার!"

মা বলিলেন, "তোর আস্কারাতেই ত ওর এত বাড় হয়েছে! নাহলে অসুখের ভাণ করে এতখানি ঘটা বাধায়!"

শিবপ্রিয়া কোন কথা বলিল না। তাহার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছিল, ইচ্ছা থাকিলে সে আগুনে এখনই সে সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে ইচ্ছাও আর আজ তাহার ছিল না। তাই সে আবার শ্রীপতিকে কহিল, "চান করে এসো একবার—লক্ষ্মী দাদা। নাহলে একটা মানুষকে চিরদিনের মনস্তাপ নিয়ে চলে যেতে হয়। তুমিও মানুষ ত, এটুকু মনে রেখো!"

শিবপ্রিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কথার যে প্রচ্ছন্ন হুলটুকু সে শ্রীপতির মনে ফুটাইয়া দিয়া গেল, বহুক্ষণ ধরিয়াই তাহা শ্রীপতির মনে খচ্-খচ্ করিতে লাগিল। স্নান সারিয়া সে আহারে বসিল। মা সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। মা কহিলেন, "এবার শিবুকে পেয়ে এমন সোহাগ হয়েছে যে, দেখে আর বাঁচি না। মেয়েটাকে একেবারেই পর করে দিলে। ছেলের শোধ মেয়ের উপর দিয়ে নিলে! কি অশুভ ক্ষণেই যে শিবু মা আমার এবার শ্বশুরবাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে ছিল!"

আহার করিতে করিতে শ্রীপতি ভাবিল, আহার সারিয়া একবার সে নীরজাকে দেখিয়া আসিবে! তবে দেখা করিয়া কি যে বলিবে, ইহাই মহা ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সে দায় হইতে খুব রক্ষা করিলেন! আহার সারিয়া সে মুখ ধুইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, যতীশ বাবু গাড়ী লইয়া আসিয়া হাজির—

তাঁহার বাগানে আজ মাছ ধরিবার ভারী ঘটা! কাজেই আর বসা বা নীরজার সহিত দেখা করা ঘটিয়া উঠিল না। ডিপা-ভরা পান পকেটে ফেলিয়া সাজিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দাদার কাণ্ড দেখিয়া শিবপ্রিয়া ঘরের মধ্যে গর্জ্জাইতেছিল। এই ভাইয়ের বোন্ সে! ধিক তাহাকে!

মা আসিয়া ডাকিলেন,"শিবু, খাবি আয়।"

শিবপ্রিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। মনের ঝাল কতকটা সে এবার মিটাইতে পাইবে! মার উপর তর্জ্জন করিয়া সে কহিল, "আমার ভাত একধারে ঠেলে রেখে তুমি ক্ষুধা নিবৃত্তি কর গে। আমার জন্য এ-বাড়ীর কাকেও ভাবতে হবে না।"

"পরের বৌকে ঘরে এনে এ কি দায়ে পড়লুম গা—" বলিতে বলিতে মা চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, বৌটাকে ধরিয়া দুই হাতে যদি তাহাকে একবার পিটিতে পারিতেন, তবেই বুঝি প্রাণের এ জ্বালা কতক জুড়াইত!

শাশুড়ী ও ননদের কথা নীরজা সকলই শুনিল। শাশুড়ী চলিয়া গেলে শিবপ্রিয়াকে সে কহিল, "তুমি যাও ঠাকুরঝি, খেয়ে নাওগে। আমি ত বেশ আছি, এখন। যাও ভাই।"

শিবপ্রিয়া কিছু বলিল না। রাগে সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। নীরজা আবার কহিল, "যাও না ভাই, খেয়ে এসোগে না—"

নীরজার মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপিয়া শিবপ্রিয়া কহিল, "এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করতে বল, তুমি—?"

নীরজা এ কথায় বড় আরাম বোধ করিল না। সে কহিল, "যে কটা দিন আর আছি ভাই, একটু শান্তিতে কাটতে দাও! আমাকে নিয়ে এ খেচাখেচি—"

শিবপ্রিয়া বুঝিল, নীরজার প্রাণের কোন্‌খান্‌টায় কি ব্যথা বাজিতেছে। সে কহিল, "তুই সেরে ওঠ্ ভাই, প্রাণভরে কামনা করছি, তুই সেরে ওঠ্! তার পর আমি তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখি, কে তাতে বাধা দেয়! যদি আজ তোর মা বেঁচে থাকতেন ত যেমন করে পারতুম, তোকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম—"

"তাই দাও ভাই—আমার মার হাতেই আমাকে তুলে দাও। আমারও আর সহ্য হয় না।"

শিবপ্রিয়া দেখিল, এ কথাগুলা তোলা ঠিক হয় নাই। রোগীর উত্তেজনা হয়তে বাড়িতে পারে! তাই সে কহিল, "তুমি তা হলে চুপ করে শুয়ে থাকো। বরফের ব্যাগ মাথায় চাপানো থাক্—আমি চট্ করে মুখে কিছু দিয়ে আসিগে—"

"হাঁ, তুমি যাও। এর মধ্যে আমি মরে যাব না।" বলিয়া নীরজা হাসিল। শিবপ্রিয়া চোখ চাহিয়া সে হাসি দেখিল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এ হাসি সেই দীপ নিবিবার পূর্ব্বে যেমন একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই যে! মনে মনে মা-কালীকে ডাকিয়া নীরজার রোগ-পাণ্ডু মুখে সে একবার হাত বুলাইল। এ স্পর্শে সব জ্বালা সব গ্লানি তোর মুছিয়া যাক্! তারপর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

সেদিন শেষরাত্রে নীরজা কেমন অস্থির হইয়া পড়িল। চোখের চাহনিও কেমন এলো-মেলো। বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল। ভিতর হইতে কেমন একটা জ্বালা ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে! প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে!

শিবপ্রিয়া তাহারই বালিশে মাথা রাখিয়া সবে-মাত্র একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কাতর কণ্ঠে নীরজা ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ঘরের কোণে বাতিটা জ্বলিয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে ক্ষীণ আলোকে শিবপ্রিয়া চাহিয়া দেখে, নীরজার মুখে কে যেন কালি মাখিয়া দিয়াছে! বুঝি এ মৃত্যুর করাল ছায়া! তাড়াতাড়ি আর একটা বাতি জ্বালিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল, ডাকিল, "সনাতন—"

সনাতন বাহিরের দালানে পড়িয়া একটু গড়াইয়া লইতেছিল; কহিল, "কেন মা?"

"শীগ্‌গির একবার ডাক্তার বাবুর কাছে যাও, তাঁকে ডেকে আনো, বাবা—অবস্থা ভাল বুঝছি না।" সনাতন উঠিয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

শিবপ্রিয়া আসিয়া মালিশ, পথ্য প্রভৃতির নানা আয়োজন বাধাইয়া তুলিল। কিন্তু হায়, নিবানো দীপে তৈল-দানে কি ফল! ভিতর হইতে পুড়িয়া জীবনটা ত তাহার পূর্ব্ব হইতেই ছাই হইয়া গিয়াছে, বাহিরের কাঠামোটা কোনমতে খাড়া আছে বৈ ত না! আজ এ রোগের প্রবল ধাক্কায় বুঝি সে কাঠামো-খানাকেও আর বজায় রাখা যায় না! শিব-প্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অসহায় দুর্ব্বল নারী সে,—তাহার কি সাধ্য যে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই অবহেলিতা উপেক্ষিতা প্রাণীটিকে তাহার গ্রাস হইতে সে ছিনাইয়া লয়!

সহসা রোগীর ঠোঁট নড়িল—ভিতর হইতে মিনতির সে যেন এক করুণ অস্ফুট আবেদন! নীরজার শুষ্ক ওষ্ঠে শিবপ্রিয়া এক চামচ্ বেদানার রস ঢালিয়া দিল—নীরজা সাগ্রহে তাহা পান করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে অতি ধীরে সে চোখের পাতা মেলিল; দুই হাতে হাতড়াইয়া কিসের যেন সন্ধান করিল! হায় রে, পাথেয় যে তাহার বহুকাল হারাইয়া গিয়াছে! কি সম্বল লইয়া এখন এ দীর্ঘ পথে সে যাত্রা করে!

শিবপ্রিয়া ঔষধ ঢালিয়া নীরজাকে পান করাইল। নীরজা কহিল, "আঃ—" পরে শিবপ্রিয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিল। শিবপ্রিয়া আদর করিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিল, কহিল, "কি চাচ্ছ, বৌ?"

নীরজা কোন কথা বলিতে পারিল না—তাহার দুই চোখ বহিয়া শুধু ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সারা জীবনের উপেক্ষার বেদনা আজ এ কাতর অশ্রুর মধ্য দিয়া অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে! শিবপ্রিয়া ভাবিল, হায় বোন, এতদিন যদি নীরবে সব সহিয়া আসিলি,—আপনার তেজে এ উপেক্ষা গ্রাহ্যও করিলি না, তবে এ নিদান-সময়ে কিসের জন্য এ দুর্ব্বলতা! সে দুর্ব্বলতা আর কেনই বা দেখাস! তোর পানে কেহই যখন চাহিয়া দেখিল না, তখন তুইই বা

কাহার জন্য আজ এতখানি কাতর হইতেছিস্!

ডাক্তার আসিয়া ইঞ্জেক্সন দিলেন—কিছুক্ষণ পরে রোগী যেন একটু শক্তি পাইল। ডাক্তার বাহিরে বসিয়া রহিলেন—শিবপ্রিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "আপনি আজ দয়া করে থাকুন—যত টাকা চান দেব—" তারপর সে সনাতনকে কহিল, "তোমার বাবুকে একবার শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এসো, সনাতন। গাড়ী করে ছুটে যাও। বলগে, বড় বিপদ এখানে!" সনাতন বীরেনের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

নীরজা আর একবার কথা কহিল, "ঠাকুরঝি—"

শিবপ্রিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। তবে এ ধাক্কা কাটিল, বুঝি! সে কহিল, "বল্, তোর যা কিছু বলবার আছে, সব খুলে বল্। আমি এই তোকে আগ্‌লে বসে রইলুম। দেখি, আমার কাছ থেকে কে আজ তোকে ছিনিয়ে নেয়!"

সতীর মুখে তেজের একটা দৃপ্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল। একবার সে কোন্ যুগে সতীর মুখে এমনই তেজ দেখিয়া যমের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল! আজও এ যেন রাজেন্দ্রাণী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে সে নীরজাকে রক্ষা করিবার জন্য বুক দিয়া দাঁড়াইল। দুর্জ্জয় তেজে প্রাণ তাহার বলীয়ান হইয়া উঠিল। নীরজা অতি-কষ্টে থামিয়া থামিয়া কহিল, "সতী-লক্ষ্মী তুমি, আশীর্ব্বাদ কর, ফিরে জন্মে যেন তোমার মত বরাত নিয়ে পৃথিবীতে আসি—এ বড় কষ্ট! সওয়া যায় না।"

হায়রে, তবু সে সকলই সহিয়া আসিয়াছে! আর কাহারও প্রাণ হইলে কবে বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইত—কিন্তু এ নারীর প্রাণ, বড় কঠিন! সকলই সয়, ভাঙ্গিতে জানে না!

কিন্তু তবুও সহ্যের একটা সীমা আছে। নীরজার প্রাণ সে সীমার একেবারে কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকেও আর ধরিয়া রাখা গেল না। সেদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে যখন মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময় তাহার সকল অকল্যাণ হইতে নীরজা মুক্ত লাভ করিল। সংসার তাহাকে বিদায় দিয়া আঁধারে ভরিয়া গেল।

৭

শাশুড়ী জামাতার কাছে মিনতি জানাইয়া শিবপ্রিয়াকে আরও কয়দিন আপনার গৃহে ধরিয়া রাখিল, কিন্তু মা ও মেয়ের মধ্যে কথা ছিল না। অত সাধ্য সাধনা করিয়াও মেয়েকে মা একটু জল অবধি মুখে দেওয়াইতে পারিলেন না। তাঁহার তখন আশঙ্কা হইল, পরের মেয়ের প্রতি যে পাপ করিয়াছেন, বুঝি তাহারই ফলে নিজের মেয়েটিকে আজ হারাইতে হয়! তাই তিনি সনাতনকে কহিলেন, "তুমি ভাই বীরেনকে খবর দাও—সে এসে ওকে নিয়ে যাক্। না হলে দেখছ ত, ওকে বাঁচানো যাবে না।"

সনাতন অগত্যা বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

বহুদিন পরে শ্রীপতিও আজ ঘরে ফিরিয়াছিল। বাড়ীতে পা দিয়াই সে বুঝিল, সেখানে মস্ত একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। সারা বাড়ীটা যেন আ

তাহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে! নীরজার প্রতি তাহার একটা আন্তরিক টান না থাকিলেও বাড়ীটা আজ তাহার কাছে নিতান্তই শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সব থাকিলেও যেন আর কিছু নাই, এমনই ভাবখানা বাড়ীটার প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ডে, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটুকে অবধি লাগিয়া রহিয়াছে। বাড়ী যেন নিতান্তই অতিথের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

তবে, বাড়ীর প্রতি কোন দিনই তাহার মায়া ছিল না—আজও নূতন করিয়া মায়া পড়িল না। তবে আজ মার কাছে প্রয়োজন ছিল; গোটাকয়েক টাকা চাই—বাগানের আমোদে এ-দফায় তাহারই উপর খরচের ভার পড়িয়াছে। না দিলে মান থাকে না। সেই টাকা কয়টা লইয়া কোনমতে এখন সরিয়া পড়িতে পারিলেই সে বাঁচিয়া যায়!

ভিতরে পা দিতেই মা ছেলেকে দেখিয়া শোকে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ছেলে আসিয়া মার কাছে বসিল—মা তখন সপ্তমে সুর চড়াইলেন! শিবপ্রিয়া ব্যাপার বুঝিবার জন্য সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে আজ কোন কথা নাই, দৃষ্টি স্থির, মূর্ত্তি রুক্ষ! কে যেন পাথরে খোদা প্রাণহীন একটা পুতুলকে আনিয়া সেখানে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে! উপেক্ষিতা নীরজার স্মৃতির মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তপশ্চারিণী সর্ব্বত্যাগিনীর মতই একটা ভাব তাহার মুখে-চোখে আঁটিয়া গিয়াছে!

কাঁদিতে কাঁদিতে ইনাইয়া বিনাইয়া মা কহিলেন, শূন্য গৃহ পাষাণের মতই তাঁহার বুকে বসিতেছে! পুত্রের এ লক্ষ্মীছাড়া দীন বেশও তিনি আর চক্ষে দেখিতে পারেন না। ও-পাড়ার পার্ব্বতী একটি মেয়ের কথা বলিতেছিল—পুত্রের কোন আপত্তিই তিনি কানে তুলিবেন না!

শিবপ্রিয়ার সারা অঙ্গ বহিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র দাহ ছুটিল। আপাদ-মস্তক তাহার জ্বলিয়া উঠিল। তবুও জীর্ণ গৃহের অধিবাসী ঝড় আসন্ন দেখিয়াও আকাশের পানে যেমন হতবুদ্ধিভাবে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে মা ও ভাইয়ের পানে সে চাহিয়া রহিল—চোখ তাহার পলক-হীন, অচঞ্চল!

শ্রীপতি বুঝিল, টাকা আদায়ের চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে। নত মুখে গাঢ়স্বরে সে কহিল, "তোমার কথা কবে আমি ঠেলেছি মা—"

দুইখানা চঞ্চল মেঘে ঠোকাঠুকি হইলে অশনি যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, শিবপ্রিয়া ঠিক তেমনই ভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল। সে ডাকিল, "সনাতন—"

কয়দিনের রুদ্ধ বাণী নিমেষে যেন এক প্রলয়-হুঙ্কারে মুক্ত হইয়া গেল। মাতা-পুত্র উভয়েই সে স্বরে শিহরিয়া শিবপ্রিয়ার পানে চাহিলেন।

সে স্বরে চমকিয়া প্রভু-গৃহ-গমনোদ্যত সনাতন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল—চাহিয়া দেখিল, মার এ কি এ করালিনী মূর্ত্তি! চোখে যেন প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে!

শিবপ্রিয়া কহিল, "সনাতন, এখনই গাড়ী নিয়ে এসো। আমি চলে যাব,

এখনই। এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে চাই না। এ বাড়ীতে যদি আর কখনও জলগ্রহণ করি ত আমি বাপের বেটী নই!”

কথাটা বলিয়া বিদ্যুতের মতই সেখান হইতে সে সরিয়া গেল। মা ও শ্রীপতি বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

ভূপরিচয়। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, এম-এ ও শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস। এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। ‘নিবেদনে’ লিখিত হইয়াছে, “যাহারা ভারতবর্ষের ভূগোল পাঠ সমাপ্ত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর বিবরণ অধ্যয়ন করিবে এইরূপ পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের বালকগণের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সূচী অনুসারে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেশ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির নাম কণ্ঠস্থ করিয়া ছাত্রগণ সময়ের অযথা অপব্যবহার করিয়া থাকে। এই গ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে কার্য্য-কারণের নিয়ম অনুসরণ করিয়া মহাদেশগুলির অবস্থান ভূপ্রকৃতি সমুদ্রোপকূল প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদেরই ফলে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর কি বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।” আমরা সানন্দে বলিতে পারি, গ্রন্থকারদ্বয়ের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এমন নিপুণ সহজ ভাষায়, আশ্চর্য্য নূতন ও সরল ভঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে যে বিনা-আপত্তিতে, আপনা হইতেই ছাত্রগণের এ গ্রন্থ-পাঠে কৌতূহল জন্মিবে। গ্রন্থখানিতে সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিকভাবে ভূপ্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তোতাপাখীর মত কতকগুলা উৎকট নাম মুখস্থ করাইয়া ছাত্রগণকে কাতর ও পীড়িত করিবার পক্ষে ইহাতে কোনই আয়োজন নাই। ছাত্রগণের কল্পনা-শক্তি জাগ্রত করিবার জন্য নানাস্থানের সরস হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এবং কৌতুককর কাহিনীরও এ গ্রন্থে প্রচুর সমাবেশ আছে। ফলতঃ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় ভূবৃত্তান্ত-বিষয়ক গ্রন্থরাজির আদর্শস্থানীয় হইয়াছে, এ কথা অসঙ্কোচে আমরা বলিতে পারি। গ্রন্থের ছাপা কাগজ চমৎকার—এবং বর্ণনাভ্যোতক অনেক চিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নানা দিক দিয়াই গ্রন্থখানি নীরস বিভীষিকাময় পাঠ্যমাত্র না হইয়া উপভোগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালার ছাত্র-সম্প্রদায় এ গ্রন্থ-পাঠে আনন্দের সহিত যে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিবে, যে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

কৈশোরক। রবি দত্ত বিরচিত। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, প্রকাশক, ৪৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯১৫। মূল্য দুই আনা। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থ। কবিতাগুলি প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে লেখকের ছাত্রাবস্থায় লিখিত হইয়াছিল। পুরাতনের প্রতি এ মমতা ত্যাগ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। কবিতাগুলিতে কোন বিশেষত্ব নাই।

প্রভাবতী। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বি-এ প্রণীত। ১০।১ নং রামমোহন দত্তের লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভবানীপুর ডায়না প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য সাত আনা। গ্রন্থখানিতে সাহিত্য-রসের নিতান্ত অভাব।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ভারতী

৩৬শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২২ [৩য় সংখ্যা

নালক

আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মত বহে যাচ্ছিল। শীতের কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, পৃথিবীর উপরে আজ সূর্য্যের আলোও পড়ছেনা—তারার আলোও আস্‌ছেনা,—দিন রাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রং বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে দেখছি—অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!

উত্তর মুখে খোলাদরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে, বরফের চাপনে পথঘাট উঁচুনীচু ছোটবড় সব সমান হয়ে গেছে! আকাশ দিয়ে আর একটি পাখী উড়ে চলছেনা, গেয়ে যাচ্ছে না; বাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের গন্ধ, একটুখানি সুখের পরশ কি আনন্দের সুর ভেসে আসছেনা;—সাদা বরফে, হিম কুয়াশায়, নিঝুম শীতে, সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে;—পৃথিবী যেন মূর্চ্ছা গেছে। সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম কুয়াশায় সাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রং'এ রং'এ ভরে দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর দেখা দেবেনা? চারিদিক নিরুত্তর ছিল। সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ আসছিল না। সেই না-রাত্রি-না-দিন, না-আলো-না-অন্ধকারের মাঝে কোনো সাড়া মিল্‌ছিল না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যত দূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেখছিলেন বরফের দেওয়াল আর কুয়াশার পর্দ্দা, তারি ভিতর দিয়ে জরা উঁকি মারছে—সাদা চুল

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

নিয়ে; জ্বর কাঁপছে—পাঙাশ মুখে শূন্যে চেয়ে; মরণ দেখা যাচ্ছে—বরফের মত হিম সাদা চাদরে ঢাকা! আয়নায় নিজের ছাওয়া দেখার মত, সাদা কাগজের উপরে নানা রকমের ছবি দেখার মত, সেই ঘন কুয়াশার উপরে সেই জমাট বরফের দেওয়ালে সিদ্ধার্থ নিজেকে আর জগৎসংসারে সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন—জন্মাতে, বুড়ো হতে, মরে যেতে; মহাভয় তাঁদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে রক্তমাখা ত্রিশূল হাতে! জ্বর জরা আর মরা তিনটে শিকারী কুকুরের মত ছুটে চলেছে মহাভয়ের সঙ্গে সঙ্গে, দাঁতে নখে যা কিছু সব চিরে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে পার্‌ছেনা, কেউ তাদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে না! নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভয়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে; পর্ব্বতে এসে তারা ধাক্কা দিচ্ছে, পাথর চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা মায়ের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঘরের মাঝ থেকে ঘরের লোককে টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—আগড় ভেঙে শিকল ছিঁড়ে। মহাভয়ের আগে রাজা-প্রজা ছোট-বড় সব উড়ে চলছে—ধূলোর উপর দিয়ে শুকনো পাতার মত। সবাই কাঁপছে ভয়ে, সব নুয়ে পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে, সব নিভে যাচ্ছে—ঝড়ের আগে বাতাসের মুখে আলোর মত। একদণ্ড কিছু স্থির থাকতে পারছেনা! আকাশ দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আস্‌ছে ভয়, বাতাস দিয়ে মার-মার করে ছুটে আসছে ভয়!—জলে স্থলে ঘরে বাহিরে হানা দিচ্ছে ভয়—জ্বরের ভয়, জরার ভয়, মরণের ভয়! কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি? কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর দেখছেন ভয়, চোখের উপর দেখছেন ভয়, মাথার উপর বজ্রাঘাতের মত ডেকে চলেছে ভয়, পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মত পৃথিবী ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মত চারিদিক ঘিরে নিয়েছে ভয়। সারা সংসার তার ভিতরে আকুলি-ব্যাকুলি করছে, হাজার হাজার হাত ভয়ে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলি শব্দ উঠছে—রক্ষে কর! নিস্তার কর! কিন্তু কে রক্ষে করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে সারা সংসারকে ঘিরে নিয়েছে! এমন কে আছে যার ভয় নেই, কে এমন যার দুঃখ নেই, শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভয়ের হাত থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে—এই অটুট মায়াজাল ছিঁড়ে? সিদ্ধার্থের কথায় যেন উত্তর দিয়ে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে শব্দ উঠল—'বুদ্ধা মহিদ্ধিকা'—'মহাশক্তি বুদ্ধগণ'—'সদেবকস্‌স লোকস্‌স সবেব এতে পরায়না।' দীপা, নাথা, পতিষ্ঠা, চ তাণা লেনা চ পাণীনং। গতি, বন্ধু, মহাস্‌সাসা, সরণা চ হিতেসিনো॥ মহাপ্পভা, মহাতেজা, মহাপঞ্ঞা, মহাব্বলা। মহা কারুণিকা ধীরা সব্বেসানং সুখাবহা॥

—বুদ্ধগণই ত্রিলোকের লোককে পরম পথে নিয়ে চলেন। মহাপ্রভ মহাতেজ মহাজ্ঞানী মহাবল ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই সুখ দেন। জগতের হিতৈষী তাঁরা অকূলের কূল, অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নাই তার বন্ধু, যে হতাশ তার আশা, অশরণ যে তার শরণ।

দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—মনের উপর থেকে জগৎজোড়া মহা-ভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মত মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফ গলে চলেছে—পৃথিবীকে সবুজে সবুজে পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জেগে উঠেছে। পাখীদের গানে গানে বনে উপবনে সেই আলো। ঘরের মাঝে হাসি হয়ে ফুটে উঠেছে সেই আলো। বাহিরে বাঁশী হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়েছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো। ত্রিভুবনে—স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শান্তির সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে, সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন এক ভিক্ষু,—যারা ভয় পেয়েছে তাদের অভয় দিয়ে, যে দুঃখ পাচ্ছে তাকেই সান্ত্বনা দিয়ে—মূর্ত্তিমন্ত আনন্দের মত। তাঁর আগে আগে চলেছেন—বুদ্ধ যাঁরা এসেছিলেন, তাঁর পিছে পিছে চলেছেন—বুদ্ধ যাঁরা পরে আস্‌বেন। সিদ্ধার্থ আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, যে-ভিক্ষু মাঝে চলেছেন সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি পা, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, দুঃখু নেই, শোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন—সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মত! মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়—যেন খণ্ড খণ্ড মেঘ!

যেমন আর দিন, সেদিনও তেমনি—রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে সেই মায়া-জালে-ঘেরা সোনার-স্বপনে-মোড়া ঘরখানিতে আর বাঁধা রইল না। সে উদাসী হয়ে চলে গেল,—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর ধারে ধারে, কত অজানা দেশের পথে পথে,—একা নির্ভয়।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মত নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা হয়েছেন সিদ্ধার্থের রাণী যশোধরা—তাঁর সুন্দর মুখের মধুর হাসি, সহচরীদের আনন্দ গান, কপিলবাস্তুর ঘরে ঘরে সাত রঙের আলোর মালা—কিছুতে আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারলে না;—সে রইল না—সে রইল না।

ছেলে হয়েছে; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেতে ঘরে রইলেন—এই ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন "রাহুল।" কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারে রইল কই? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল ঘরবাড়ি বন্ধুবান্ধব, আর সব আঁকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ,—তাঁর মন যে-দিকে গেছে।

সে দিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন,—ছন্দক্, আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্দ্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে

মিলিয়ে গেল—কপিলবাস্তুর রাজপুরী; সামনে দেখা গেল—পূর্ণিমার আলোয় আলোময় পথ!

(৮)

ছন্দক চলেছে কপিলবাস্তুর দিকে,—সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বালা, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে। আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে, বনের দিকে তপস্যা করতে,—দুঃখের কোথা শেষ তাই জান্‌তে।

ছোট নদী দেখতে এতটুকু, নামটিও তার 'নমা,—'কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনামা। সিদ্ধার্থ নদীর যে পার থেকে নাম্‌লেন সে পারে ভাঙন জমী,—সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কাঁটা। আর যে পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একবারে জলের ধারে নেমে এসেছে; গাছে গাছে ছাওয়াকরা পথ। সবুজ ঘাস, বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল, বালি ধুয়ে ঝির-ঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোট একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানি নিজে পোরে চলেছেন। নদী—সে ঘুরে ঘুরে চলেছে আম কাঁটালের বনের ধার দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁসে—কখনো পুব মুখে কখনো দক্ষিণ মুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে ধারে ছাওয়ায় ছাওয়ায়, মনের আনন্দে। এমন সে সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এইখানেই থাকি। ফলে ভরা পাতায় ঢাকা জাম গাছ একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে, তারি তলায় ঋষিদের আশ্রম। সেখানে সাত দিন সাত রাত্রি কাটিয়ে সিদ্ধার্থ বৈশালি নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আরাড় কালাম, নগরের বাইরে তিনশ চেলা নিয়ে আস্তানা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তার কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-যাগ, মন্তর-তন্তর কতই শিখলেন কিন্তু দুঃখুকে কিসে জয় করা যায় তার সন্ধান পেলেন না। তিনি আবার চল্লেন। চারিদিকে বিন্ধ্যাচল পাহাড়; তার মাঝে 'রাজগেহ' নগর। মগধের রাজা বিম্বিসার সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে—ভিক্ষে দাও বলে এসে দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে—চোখ মেলেই দেখছে নবীন সন্ন্যাসী! এত রূপ এমন করুণামাখা হাসি-মুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে দিয়ে কেউতো কোনো দিন সে নগরে আসেনি। যারা চলেছিল, তাঁকে দেখে তারা ফিরে আসছে; যারা ঘরে ছিল তারা তাঁকে দেখতে বাইরে আস্‌ছে; ছেলে খেলা ফেলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে! তাঁকে দেখে কারু ভয় হচ্ছেনা, লজ্জা করছেনা। রাজা বিম্বিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে দেখতে! কত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে

আসে কিন্তু এমনটিতো কেউ আসে না। রাজপথের এপার-থেকে-ওপার লোক দাঁড়িয়েছে—তাঁকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষে দিতে। ধনী চাচ্ছে ভাণ্ডার শূন্য করে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, দোকানী চাচ্ছে দোকানে লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, পসারি চাচ্ছে পসরা খালি করে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে! যে নিজে ভিখারী সেও তার ভিক্ষার ঝুলি শূন্য করে তাঁকে বলছে,—ভিক্ষে নাও গো ভিক্ষে নাও! ভিক্ষেয় সিদ্ধার্থের দুই হাত ভরে গেছে কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তখনও লোকের মন ভরে নি! তারা মণিমুক্তো সোনারূপো ফুলফল চালডাল স্তূপাকারে এনে সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে রাখ্‌ছে, তারা নিষেধ মান্‌বে না, মানা শুন্‌বে না।

রাজা প্রজা ছোট বড় সকলের মনের সাধ পূরিয়ে সিদ্ধার্থ সেদিন রাজ-গেহের দ্বারে দ্বারে পথে পথে এমন করে ভিক্ষে নিলেন যে তেমন ভিক্ষে কেউ কোনো দিন দেবেও না, পাবেও না। এত মণি মুক্তো সোনা রূপো বসন ভূষণ সিদ্ধার্থের দুই হাত ছাপিয়ে রাজগেহের রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল যে তত ঐশ্বর্য্য কোনো রাজা কোন দিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের জন্যে কেবল এক মুঠো শুক্‌নো ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য্য মগধের যত দীনদুঃখীকে বিতরণ করে চলে গেলেন।

'উদ্দরক' পণ্ডিত সাতশো চেলা নিয়ে গয়ালী-পাড়ায় চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্র শিখতে লাগলেন। উদ্দরকের মত পণ্ডিত তখন ভুভারতে কেউ ছিল না। লোকে বোল্‌তো ব্যাসদেবের মাথা আর গণেশের পেট—এই দুইটি এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদ্দরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ কিছুদিনেই সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনো ধর্ম্ম কোনো শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন তিনি গুরুকে প্রশ্ন কল্লেন—দুঃখ যায় কিসে? উদ্দরক সিদ্ধার্থকে বল্লেন—এস, তুমি আমি দুজনে একটা বড়গোছের চৌপাটি খুলে চারিদিকে সংবাদ পাঠাই, দেশ বিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক্, বেশ সুখেসচ্ছন্দে দিন কাট্‌বে। এই পেটই হচ্ছে দুঃখের মূল, একে শান্ত রাখ, দেখবে দুঃখু তোমার ত্রিসীমানায় আসবে না। উদ্দরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদ্দরকের সাতশো চেলা ভারে ভারে মোণ্ডা নিয়ে আসছে—গুরুর পেট্‌টি শান্ত রাখতে। সিদ্ধার্থ গ্রামের পথ ছেড়ে বনের ভিতর দিয়ে চল্লেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। ইনিই একদিন শুদ্ধোদন রাজার সভায় গুনে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হবেন। কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলবাস্তু থেকে চলে এসেছেন।

অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসলেন—

দুঃখের শেষ কোথা তাই জান্‌তে। শাস্ত্রে যেমন লিখেছে, গুরুরা যেমন বলেছেন, তেমনি করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা কচ্চেন। কঠোর তপস্যা—ঘোরতর তপস্যা, —শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাদলে অনশনে একাসনে এমন তপস্যা কেউ কখনো করেনি! কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মত হয়ে গেল, গায়ে আর একবিন্দু রক্ত রইল না—দেখে বোঝা যায় না আর তিনি বেঁচে আছেন কি না!

সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ কত তেজ ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না;—যেন একটা শুক্‌নো গাছের মত তিনি দাঁড়িয়ে আছেন! এমনি করে ছয় বছর কেটে গেছে। সে দিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে গাছে নতুন পাতা নতুন ফল নতুন ফুল। উরাইল বনে যত পাখী যত প্রজাপতি যত হরিণ যত ময়ূর সব যেন আজ কিসের আনন্দে জেগে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে গেয়ে গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য শুনতে পাচ্চেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে এক-জন একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সারাবেলা ধরে আজ অনেকদিন পরে শিষ্যরা দেখছেন সিদ্ধার্থের স্থির দুটি চোখের পাতা একটু একটু কাঁপছে,—বাতাসে যেন শুক্‌নো ফুলের পাপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে, গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ-বেলার সিঁদুর-আলো নদীর ঘাট থেকে বনের পথ পর্য্যন্ত বিছিয়ে গেছে —গেরুয়া-বসনের মত।

একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে নেমেছে, গাছের তলায় একটা ময়ূর ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণ ভরে একবার নেচে নিচ্ছে, সেই সময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন,—দুবছর পরে আজ প্রথম তিনি যোগাসন ছেড়ে নদীর দিকে চল্লেন। শিষ্যরা দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্ব্বল যে তিনি চলতে পাচ্ছেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, সিদ্ধার্থ তারি একটা ডাল ধরে আস্তে আস্তে জলে নাম্‌লেন। তার পর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটাকয়েক আমলকী ভেঙে নিয়ে বনের দিকে চল্‌লেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এল। অনেক যত্নে সিদ্ধার্থ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কুণ্ডিন্য প্রশ্ন কল্লেন—প্রভু, দুঃখের শেষ হয় কিসে জানতে পাল্লেন কি? সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"না"—"এখনো না"। অন্য চার শিষ্য তাঁরা বল্লেন—"প্রভু, তবে আর একবার যোগাসনে বসুন, জান্‌তে চেষ্টা করুন, দুঃখের শেষ আছে কি না।"

সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল—নারে! নারে! নাইরে নাই! কুণ্ডিণ্য বল্লেন,—জানবার কি কোনো পথ নেই প্রভু? সিদ্ধার্থ বল্লেন —পথের সন্ধান এখনও পাইনি কিন্তু দেখ তার আগেই এই শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগেযাগে নষ্ট হবার মত হল।

এখন এই শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আন্‌তে হবে, তবে যদি পথের সন্ধান করে উঠা যায়। নিস্তেজ মন দুর্ব্বল শরীর নিয়ে কোনো কাজ অসম্ভব। শরীরকে সবল রাখ, মনকে সতেজ রাখ। বিলাসীও হবে না উদাসীও হবে না, শরীর মনকে বেশি আরামও দেবে না বেশি কষ্টও সহাবে না তবেই সে সবল থাকবে কাজে লাগবে পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তার যেমন জোরে টেনে বাঁধলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর মন ভেঙে পড়ে। যেমন তারকে একবার ঢিলে করে দিলে তাতে কোনো সুরই বাজেনা তেমনি শরীর মনকে আরামে আলস্যে ঢিলে করে রাখলে সে নিষ্কর্ম্মা হয়ে থাকে। বৃথা যোগেযাগে শরীর মনকে নিস্তেজ করেও লাভ নেই, বৃথা আলস্যে বিলাসে তাকে নিষ্কর্ম্মা বসিয়ে রেখেও লাভ নেই, —মাঝের পথ ধরে চলাই ঠিক।

সেদিন থেকে শিষ্যেরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মত ছাইমাখা আসন বেঁধে বসা, ন্যাস কুম্ভক তপ জপ ধুনি ধুনুচি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মত আবার গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নতুন কাপড় দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভালো খাবার দিলে তিনি তাও খান্‌। শিষ্যদের সেটা মনোমত হল না। তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে শীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে কখনো উর্দ্ধবাহু হয়ে দুই হাত আকাশে তুলে কখনো হেঁটমুণ্ডু হয়ে দুই পা গাছের ডালে বেঁধে থাক্‌তে হয়। প্রথমে, দিনের মধ্যে একটি কুল, তার পর সারা দিনে একটি বেলপাতা, ক্রমে এক ফোঁটা জল তার পর তাও নয়, এমনি করে যোগসাধন না করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাত্রে তারা কাশীর ঋষিপত্তনের দিকে চলে গেল—সিদ্ধার্থের চেয়ে বড় ঋষির সন্ধানে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সিপাহী-বিদ্রোহ।

সংবাদপত্রাদিতে সমালোচিত ক্রিমিয়ার ঘটনাবলী, রুশ কর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা—লোকের মনকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। ইংলণ্ড এতদিন বাহুবলের সাহায্যে রাজত্ব করিতেছিলেন; ভারতবাসীরা মনে করিল এইবার ইংলণ্ডের সিংহাসন টলিয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে, ইংরাজ

সেনা-নায়কেরা বেশ অনুভব করিতে লাগিল, সিপাহীরা তাহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে; প্রায় প্রত্যেক ছাউনীর মধ্যেই পুনঃপুনঃ অগ্নিদাহ হইতে লাগিল, গুরুতর অবাধ্যতা লক্ষিত হইতে লাগিল। কতকগুলি রেজিমেণ্টকে বিদায় দেওয়া হইল। ১০ই মে তারিখে মিরাট-ছাউনীর মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। কঠোর দণ্ডপ্রয়োগে সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিল। তিন ইংরেজ রেজিমেণ্টের সাহায্যে সেনাপতি, বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিতেন; কিন্তু সেনাপতির সেরূপ উদ্যমবীর্য্য ছিল না। সিপাহীরা দিল্লীতে উপনীত হইল এবং সেখানকার সিপাহীদিগকে আপন দলে টানিয়া লইল। মুসলমানগণকর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে আহূত হইয়া, মৌনসম্মতিক্রমে হিন্দুগণকর্ত্তৃক পরিপোষিত হইয়া, বিদ্রোহীরা ইংরাজদিগকে পলাইতে বাধ্য করিল; পরে, প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বতন সমস্ত রাজ-অধিকার প্রত্যর্পণপূর্ব্বক মোগল-সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। অবশ্য এই অধিকারগুলা স্থায়ী অধিকার নহে; কেননা, কিয়ৎকাল পরেই দেখিতে পাই, এই বৃদ্ধ সম্রাট্ ভাগ্যের দারুণ কশাঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া মেক্কা যাত্রা করিবার জন্য বৃথা অনুমতি চাহিতেছেন। তাই বিদ্রোহের প্রথম-কেন্দ্রস্থলটিতে আমরা একটি মুসলমানী আন্দোলন এবং একটি রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দেখিতে পাই। বিদ্রোহীরা মোগল-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল।

বিদ্রোহের দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল কানপুরের একটা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল—কিন্তু ইহা হিন্দু-প্রধান। দিল্লীর ঘটনাবলী, সেখানকার সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজিত করিল। তাহারা নানাসাহেবকে প্রধান বলিয়া বরণ করিল। পেশোয়ার উত্তরাধিকারীর পতাকাতলে নগরের সমস্ত অধিবাসী সমবেত হইল। একটা প্রচণ্ড "ওৎপাতা" স্থানে আকৃষ্ট হইয়া ইংরাজ অধিবাসীরা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

বিদ্রোহের তৃতীয় কেন্দ্রস্থল অযোধ্যা। কোম্পানী কর্ত্তৃক স্বকীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়ায় সেখানকার তালুকদারেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং স্বকীয় অধীন পুরাতন প্রজাবৃন্দকে আপন দলে টানিয়া আনিল। সমস্ত প্রদেশটা ইংলণ্ডের হস্ত-বিচ্যুত হইল। লক্ষ্ণৌয়ের ইংরেজ দুর্গ-সৈন্য অবরুদ্ধ অবস্থায় ছয়মাস ধরিয়া বীরত্ব- সহকারে আত্মরক্ষা করিল।

মধ্য-প্রদেশগুলা বিদ্রোহের চতুর্থ কেন্দ্রস্থল। দত্তক-পুত্র-গ্রহণসম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসির আইনের বিরুদ্ধে বহুল প্রতিবাদ সমুত্থিত হয়। স্বরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া তরুণবয়স্কা ঝাঁশীর রাণী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং স্বকীয় সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতের এইরূপ অবস্থা ছিল। তখন মনে হইয়াছিল, যেন ইংরেজ-শাসনের অন্তিম দশা উপস্থিত। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বিদ্রোহীরা অন্য বিদ্রোহী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্‌ভাবে ছিল। অবশ্য,

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ও কানপুরের অন্তর্বর্ত্তী সমস্ত দেশটাই বিদ্রোহীদের দখলে আসিয়াছিল। রাজাদিগের অপক্ষপাতিতা সত্ত্বেও, হোলকার ও সিন্ধিয়ার সৈন্যমণ্ডলী বিদ্রোহীর দলে মিশিয়াছিল। বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগে, বিদ্রোহের আশঙ্কা—বিশেষতঃ সিপাহী-বিদ্রোহের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রদেশে সৈন্য-মণ্ডলী ও সাধারণ প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হয় নাই। ভারতের স্বাধীন রাজারা ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। মোগল সম্রাট, ও নানাসাহেবও অযোধ্যার মুসলমানদিগের সহিত মিলিবার জন্য একটা বোঝাপড়া করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ভারতের সর্ব্বত্রই অসন্তোষের একই হেতু সমূহ হইতে বিদ্রোহ কিংবা বিদ্রোহের আশঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছিল। কোথাও ভারতবাসীর আন্তরিক রাজভক্তি প্রকাশ পায় নাই।

*
* *

ইংরাজেরা এই রাজভক্তি ভারতবাসীর মনে উদ্রেক করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহী-দিগের অপকর্ম্মে ক্রোধান্ধ হইয়া ইংরাজেরা জলন্ত প্রতিশোধের আকাঙ্খা করিল; দিল্লী ভূমিসাৎ করিবে এইরূপ বলিতে লাগিল; খৃষ্টান ছাড়া আর সকলকেই সন্দিগ্ধ শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য দাবী করিতে লাগিল। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা, বিশেষতঃ লর্ড-ক্যানিং মনের স্থৈর্য্য কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। যাহারা সমস্ত দেশে প্রাণদণ্ডরূপ কঠোর দণ্ডনীতি প্রতিষ্ঠার দাবী করিতেছিল, যাহারা লর্ড ক্যানিংকে দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া দোষারোপ করিতেছিল, যাহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে অবমাননা করিতেছিল,—লর্ড গ্র্যান্‌ভিলের নামে লিখিত পত্রে তিনি তাহাদিগকে ধীর গম্ভীরভাবে এই উত্তর দিয়াছিলেন:—

"মনে করুন যদি, যুদ্ধটা আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, অযোধ্যা কিম্বা অন্যান্য বিদ্রোহী প্রদেশের ত্রিসীমাতেও যদি আমরা পদার্পণ করিতে আর না পারি, আমাদের বাহুবল সম্বন্ধে তখনও যদি লোকের অবিশ্বাস থাকে—তথাপি বড় বড় তিনটি প্রদেশের রাজভক্তি বজায় রাখা, দূরদর্শী বিচক্ষণ গভর্ণমেণ্টের উচিত নহে কি? সমস্ত শ্রেণীর লোককে দণ্ডার্হ বলিয়া, অসাধু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা—ইহা কি কখন সম্ভবপর? ঈশ্বরের দোহাই, উচ্চকণ্ঠে এই কথা আপনি ঘোষণা করুন, এই সমস্ত ব্যাপার আপনি থামাইয়া দিন। আর আমার কথা যদি বলেন,—যত দিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে,—যে নীতি আমরা অবলম্বন করিয়াছি তাহা ছাড়া অন্য নীতি আমি কখনই অনুসরণ করিব না। শুধু সময়োপযোগী ও আশুফলপ্রদ বলিয়া নহে,—ধ্রুব সনাতন ন্যায়ধর্ম্মের অনুগত বলিয়াই আমি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছি। আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজাশাসন করিতে চাহি না। আমি সুবিচার করিব, আমি অকাট্য কঠোর ন্যায়ধর্ম্মানুসারে সুবিচার করিব—আইন ও রাজশক্তি বজায় রাখিয়া সুবিচার করিব। কিন্তু আমার উপর যতদিন ভারত-শাসনের দায়িত্ব থাকিবে, ততদিন আমি কাহাকেও এমন একটি কাজও করিতে দিব না, একটি কথাও উচ্চারণ করিতে দিব না যাহাতে ক্রোধের ভাব প্রকাশ পায়, কিংবা অবিবেচনা ও হঠকারিতা প্রকাশ পায়।"

লর্ড ক্যানিং যাহা বলিয়াছিলেন—বস্তুতই এই রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানীজনোচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রনীতি। এই যুদ্ধ জাতিসংঘর্ষজনিত যুদ্ধ নহে, এই বিদ্রোহ জনসাধারণের বিদ্রোহ নহে,—কেবল আংশিক সিপাহী-বিদ্রোহ

মাত্র। তাই পৃথকভাবে এই সকল বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। ১৫ই জুলাই তারিখে কানপুর, ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী, এবং ১৬ই নভেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌ পুনর্ব্বার দখল করা হয়। অযোধ্যা ও মধ্য-ভারতের প্রদেশ সমূহে সম্পূর্ণরূপে শান্তিস্থাপন করিতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। যদিও সংগ্রামের আগ্রহ ও উত্তেজনা, কতকগুলি রাজপুরুষকে গর্হিত কর্ম্মের আবর্ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু মোটের উপর ইংরেজ সরকার, যেমন মিতাচারিতা—তেমনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ হইতে অনেকগুলি শিক্ষালাভ হয়। (১)

---

(১) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ।—লর্ড ড্যালহৌসির পদত্যাগ (মার্চ ১৮৫৬)। লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্ণর জেনারেল (১ আগষ্ট ১৮৫৫)। বম্বে আগমন (২৬ জানুয়ারী ১৮৫৬); কলিকাতায় আগমন (২৮ ফেব্রুয়ারী)। আফগানিস্থানের সহিত সন্ধিস্থাপন (১৮৫৭-র প্রারম্ভে)। পারস্যের সহিত যুদ্ধ (১৮৫৭)। বন্দুকের টোটার ব্যাপার। বারাকপুর ও মুর্শিদাবাদে আন্দোলন। (১৮৫৭-র প্রারম্ভে)। বারাকপুরে নূতন বিদ্রোহ (মার্চ)। মিরট-ছাউনীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় (১০ মে, ১৮৫৭); উহারা দিল্লী দখল করে, তত্রস্থ সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করে, মোগল-বাদশাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে (১১ মে)। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সর্-জন্-লরেন্স্, পঞ্জাবের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করেন এবং শিখদিগের রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন।

দিল্লী।—দিল্লীর সিপাহীবিদ্রোহ (১১ মে)। ইংরেজরা দিল্লী অবরোধ করে (৮ জুন)। পঞ্জাব হইতে সৈন্য লইয়া নিখলসনের আগমন (আগষ্ট)। দিল্লী আক্রমণ (১৪ সেপ্টেম্বর)। দিল্লীর রাজপথে যুদ্ধ (১৪-২০ সেপ্টেম্বর)। হড্সন্ কর্ত্তৃক দিল্লীর সাজাদাদিগের হত্যা। বাদ্শাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া রেঙ্গুনে চালান করা হইল—সেইখানেই বাদ্সার মৃত্যু হয় (১৮৬২)

কানপুর।—সিপাহীদিগের সমুত্থান (৬ জুন)। নানাসাহেব (ধুন্ধু-পন্থ) তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইংরাজেরা (স্ত্রী, পুরুষ, শিশু) যে পরিখার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই পরিখা অবরোধ। ২৭ জুনে ইংরাজেরা নানা-সাহেবের সহিত সন্ধি করিল, এবং এলাহাবাদে যাত্রা করিবার জন্য গঙ্গার নৌকায় আরোহণ করিল। সংখ্যায় তাহারা ৪৫০ জন। নানাসাহেব নদীতটে অবস্থিত সৈন্যের দ্বারা তাহাদের উপর গুলি গোলা বর্ষণ করিল; কেবল ৪ জন মাত্র বাঁচিয়া যায়। ১২৫ জন রমণী ও শিশুকে কারাবদ্ধ করা হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণা প্রয়োগ সহকারে ১৫ জুলাই তারিখে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। সেই দিনই হ্যাভ্লকের নেতৃত্বাধীনে ইংরাজেরা কানপুর দখল করে। অযোধ্যার বিদ্রোহীদের সহযোগে যুদ্ধ করিয়া নানাসাহেব ১৮৫৮ অক্টোবরে নেপালে পলায়ন করে।

লক্ষ্ণৌ।—অযোধ্যার Chief Commissioner. Sir Henry Lawrence সমস্ত য়ুরোপীয় অধিবাসী-দিগকে লইয়া দুর্গ-পরিণত রেসিডেন্সি-নিবাসে অগ্রেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। ৪ জুলাই তারিখে, এক গুলির আঘাতে নিহত হন। Havelock ও Outram কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির প্রথম উদ্ধার। ইঁহারাও আবার বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি Sir Colin Campbell (পরে Lord Clyde) কর্ত্তৃক দ্বিতীয়-উদ্ধার (১৬ নভেম্বর ১৮৫৭)। নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া-টোপির উপর বিজয় লাভ। নিশ্চিতভাবে লক্ষ্ণৌ অধিকার (মার্চ্চ ১৮৫৮)। অযোধ্যায় সম্পূর্ণরূপে শান্তি-স্থাপন (জানুয়ারী ১৮৫৯)।

দুই সভ্যতার সংঘর্ষ হইতে যে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী, লর্ড ড্যালহৌসী-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত দিগ্বিজয়-নীতি ও ভারতের আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নতি-চেষ্টা, ঐ সংগ্রামকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল—এই মাত্র। শুধু অগ্রসর করিয়া দেওয়া নহে, হয় ত বাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু উহাতে ভারত ও ইংলণ্ড উভয়েরই লাভ হইয়াছিল। এই শোণিত-প্লাবী সংগ্রাম না ঘটিলে, উভয়েই বধিরভাবে পরস্পরের বৈরসাধনে রত থাকিত, পরস্পরের দুঃখ-অভিযোগ বুঝিতে পারিত না। এই সিপাহী-বিদ্রোহ, ইংলণ্ডের নিকট ইংলণ্ডের দোষগুলি উদ্ঘাটিত করিল, ভারতের নিকট প্রতিরোধচেষ্টার ব্যর্থতা প্রকাশ করিয়া দিল। যে-ভারত-বিজয় য়ুরোপীয় সভ্যতা-কর্ত্তৃক বিলম্বে ও যেন কতকটা অজ্ঞাতসারে সাধিত হইয়াছিল, সেই বিজয়-ব্যাপারের অন্তর্ভূত এই সিপাহী-বিদ্রোহরূপ একটিমাত্র ঘটনা, প্রকটভাবে দেখাইয়া দিল,—কতটা পথ অতিক্রম করা হইয়াছে, আরও কতটা পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

কতকগুলি সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলেও ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ আংশিক বিদ্রোহে পরিণত হয়। উহার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সামাজিক বা রাষ্ট্রিক মতামতের অস্তিত্ব ছিল না। মোগল বাদশাকে ভারত-রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার জন্য দিল্লীর মুসলমানেরা কিছুই করে নাই। অথবা কানপুরের হিন্দুরা, পেশোয়াকে উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই। কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করে নাই এবং ব্রাহ্মণেরাও সতীপ্রথা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বা য়ুরোপীয় দ্রব্য জাত দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্যও কোন দাবী করে নাই।

পূর্ব্ব হইতে-বিজিত লোকদিগের মনোভাব যেরূপ হইয়া থাকে সেই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণ হিন্দুরা স্বভাবতই এই বিদ্রোহের প্রতি বিমুখ হইয়াছিল এবং কার্য্য-সিদ্ধি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকায়, তাহারা ভবিষ্যতের জন্য কোনপ্রকার মতলবও আঁটে নাই। পোলণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে এখনও যাহা টিঁকিয়া আছে—সেই রাষ্ট্র-সাধারণ প্রতিবাদ বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্রোহভাব সিপাহী-বিদ্রোহ নির্মূলিত হইবার পর, ভারত হইতে একে-বারেই অন্তর্হিত হইল। ভারতে, সকল লোকেরই এইরূপ ধারণা হইল যে, হিন্দু-সভ্যতার অন্তিম দশা উপস্থিত—এখন নব-যুগের হস্তে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গতি নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধ্যভারত-প্রদেশসমূহ।—ঝাঁসির রাণী (২০ বৎসর বয়স্কা) ও তাঁতিয়া টোপীর সহিত Sir Hugh Rose এর (পরে Lord Strathnairn) যুদ্ধ বিগ্রহ। ঝাঁসি ও কাল্পী ইংরাজের দখলে আসিবার পর, মনে হইল বুঝি মধ্যভারতে যুদ্ধের অবসান হইল, কিন্তু সেই সময়েই সিন্ধিয়ার সৈন্যমণ্ডলী বিদ্রোহীর হস্তে গোয়ালিয়র সমর্পণ করিল। পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিজ সৈন্যের নেত্রী ঝাসির রাণী নিহত হইলেন (জুন ১৮৫৮)। গোয়ালিয়র অধিকার (২০ জুন)। আরও দীর্ঘকাল তাঁতিয়া টোপীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৮৫৯ খষ্টাব্দে তাঁতিয়া-টোপী ধৃত হয়, ১৮ এপ্রিলে তাহার ফাসী হয়।

ভারতবর্ষে অর্থনীতি-অধ্যয়ন

(অধ্যাপক রাসেল ও সমাদ্দার লিখিত)

মনোবিজ্ঞান ও দর্শন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেই প্রাচীন ভারতবাসিগণ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই ; অথবা অর্থোৎপাদন বা মনুষ্যের আর্থিক উন্নতি-কামনায় সময়াতিপাত করেন নাই, এরূপ জনশ্রুতি ও প্রবাদ আবহমানকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ যে কেবল এক পক্ষেরই কথা, সংস্কৃত-সাহিত্য পাঠ করিলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও নানা-বিদ্যা-অনুশীলনের উৎকর্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, সেই সকল পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ অর্থবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়-পর্য্যালোচনাতেও বিরত ছিলেন না এবং ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন পাটলিপুত্রে বা বর্ত্তমান পাটনায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক-পাঠ শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল। চাণক্যের অর্থ-শাস্ত্র নামক শিক্ষাপ্রদ পুস্তক-পাঠে জানিতে পারা যায় যে, বার্ত্তা চতুর্ব্বিদ্যার অংশভূত ছিল এবং উপবীতধারী ছাত্রগণ, অর্থশাস্ত্রবিৎ রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের নিকট এই অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আদিষ্ট হইতেন।

প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে এই বিষয়টীর আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ; অথবা, রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের কাল হইতে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর রাজ-রাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অর্থনীতির কিরূপ চর্চ্চা হইয়াছে, তাহারও হিসাব দিতে আসি নাই। এস্থলে আমরা অতীতের স্মৃতি জাগাইতে চাহি না—আমরা শুধু বর্ত্তমান ও নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বলিবার প্রয়াস পাইব। অবশ্য ইহা বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যে অর্থনীতির চর্চ্চা বর্ত্তমান ভারতে অত্যাবশ্যক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও আজিকালি যাহার চর্চ্চাও হইতেছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে,—এবং আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে এরূপ চর্চ্চায় নূতনত্ব কিছুই নাই। ইহা ভারতবাসীর নিজস্বই।

তবে, ইহাও সহজে প্রণিধান হইবে যে, চাণক্যের সময় যেরূপে ও যে-ভাবে অর্থনীতির আলোচনা হইত, এক্ষণে সেরূপ ভাবে উহার আলোচনা করিলে সুফল ফলিবে না। কারণ এ কথা বলাই বাহুল্য যে, চাণক্য ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাঁহারা যেরূপ ভাবে অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেরূপভাবে আলোচনা বর্ত্তমানকালে সম্ভবপরও নহে। দ্বিসহস্র বৎসরের কথা দূরে থাকুক, এক শত বৎসরের

কথা ধরিলেও দেখা যায় যে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রথা—উভয়েরই যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে এই পরিবর্ত্তন আরও দ্রুতবেগে হইতেছে। পরলোকগত জষ্টিস রাণাডে ও সার থিওডর মরিসন এই বিষয়টী আমাদের সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং যদিও এই উভয় লেখকের সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ মিল হইবে না, তথাপি মোটের পর তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষে অর্থ-নীতির বিষয় ও আলোচনার প্রচারে এত পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়াই এখানে অর্থ-নীতির অধ্যয়নে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ও সেইজন্যই ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহা অপর দেশের অর্থনীতিতে দেখা যায় না।

প্রতিবন্ধক

অর্থনীতির আলোচনায় প্রতিবন্ধক যে যথেষ্ট আছে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বিশেষতঃ ঔপপত্তিক ও কার্য্যকরী বিভাগের সামঞ্জস্য করা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাহার উপর, অন্যান্য দেশে অর্থনীতির অনেকগুলি সূত্র যেভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষে তাহা আদৌ পারে না। ইহাও কম অসুবিধার কথা নহে। এই সকল অসুবিধা থাকার জন্যই ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানে করিতে হইবে। খুব কম বিজ্ঞানই অর্থনীতির ন্যায় আমাদের কার্য্যকরী শিক্ষা দেয়, কিন্তু, অসতর্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে অর্থনীতির আলোচনা করিতে যাওয়ায় পদস্খলনের সম্ভাবনাও তদ্রূপ অধিক। অর্থনীতির নাম করিয়া অনেক সময় অনেক বাচালতা প্রকাশ করা হয়! হিতোপদেশে কথিত হইয়াছে যে 'পল্লবগ্রাহিতা'র ন্যায় ভীষণ রোগ আর নাই! অর্থনীতি সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে এক্ষেত্রে পল্লবগ্রাহিতা অত্যন্ত সহজসাধ্য এবং তজ্জন্য পথও অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। কিন্তু, ইহা হইতে যেন কেহ মনে না করেন যে, এজন্য এ শাস্ত্রের আলোচনা না করাই যুক্তি-সঙ্গত। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। যদিও অর্থনীতিতে অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী বটে, কিন্তু তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই সমীচীন হইবে না যে ইহা হইতে দূরে থাকাই সঙ্গত। তৎপরিবর্ত্তে, অর্থনীতি সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা এবং আমাদের ক্ষমতানুযায়ী ইহার সম্যক আলোচনা করা কর্ত্তব্য, এইরূপ সিদ্ধান্তই বাঞ্ছনীয়। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য যে ব্যাঘাত হয়, তাহা দূরীভূত করাই শ্রেয়ঃ।

এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যে সকল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে সংক্ষেপে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ; প্রথম—শাস্ত্র-সংক্রান্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত জটিল এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল ঘটনা-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ববশতঃ উচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এখন প্রথমটীর বিষয় অগ্রে আলোচনা করা যাউক।

অর্থনীতি-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর জটিলতা

প্রত্যেক সমাজেই অর্থোৎপাদনে ও বণ্টনে অনেকগুলি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়

এবং এই সকল প্রক্রিয়াগুলির সহিতই উৎপাদন ও বণ্টনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন এক সমাজের যে কোন ব্যক্তির কথা আলোচনা করা যাউক। রাজা বা প্রজা, কোটীপতি বা দরিদ্র যে-কাহারও হৌক, এক জনের জীবনের এক মাসের ঘটনা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এই ব্যক্তি এক মাসে যাহা উপার্জ্জন করে বা ব্যয় করে, তাহার প্রত্যেক কারণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ পরীক্ষার আদি বা অন্ত নাই। অর্থনীতির হিসাবে সেই মাসে সেই ব্যক্তি অর্থোৎপাদনে ও বণ্টনের জন্য যে সকল প্রক্রিয়ার আশ্রয় লয় এবং যে যে কারণে সে সেই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, তাহার বর্ণনা করিতে হইলে তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, তাহার বংশাবলীর বিষয় ত আলোচনা করিতেই হইবে, তদ্ব্যতীত সে ব্যক্তি যে সমাজের অন্তঃভূর্ত, সে সমাজের রীতি-নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিতে হয়। তৎপরে, আরও কতকগুলি বাহ্যিক কারণ আছে। এ কারণগুলি প্রথম দৃষ্টিতে গুরুতর বলিয়া বোধ না হইলেও অর্থনীতির হিসাবে উহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। মনে করুন, সেই ব্যক্তি বেহার প্রদেশের কোন স্থানে শস্যাদি ক্রয় বা বিক্রয় করে। দ্রব্যাদির জন্য সে যে মূল্য প্রদান করে বা বিনিময়ে সে যে দ্রব্য লাভ করে, সেই দ্রব্যের পরিমাণ জলবায়ুর দোষে (Climatic condition) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হইতে পারে। রুসিয়া বা আমেরিকার ত কথাই নাই। তদ্রূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা, পরিধের বস্ত্র বা কেরোসিন তৈলের জন্য সেই ব্যক্তিকে যে মূল্য প্রদান করিতে হয়, অনেকগুলি কারণে সেই মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। ইংলণ্ডের মন্ত্রীপরিবর্ত্তন বা আমেরিকার কর্পোরেশনদের বাই-ল (Bye-law) পরিবর্ত্তনের জন্য ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হইতে পারে। অর্থাৎ, আমরা যে বিষয়টীই আলোচনা করি না কেন, তাহাতেই দেখিতে পাই যে বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য্য করিতেছে এবং এই সকল কার্য্যের প্রত্যেকটীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা কিছু সহজ ব্যাপার নহে।

এই প্রকার কতকগুলি কারণেই অনেক সময়ে কেহ কেহ অর্থনীতির পুরাতন পদ্ধতিগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমাদের মতে এরূপ করা কদাপি যুক্তি সঙ্গত নহে। এই বিষয়টির আলোচনা আমরা পুনরায় যথাস্থানে করিব। বর্ত্তমানে আমরা এইমাত্র বলিতে চাহি যে, কোন একটি স্থূল বিষয়ের আলোচনা-কল্পে প্রাসঙ্গিক অবস্থাগুলির কথা না ধরিয়া, সাধারণে যে মিথ্যা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন এবং সকল অবস্থাতেই একবিধ সমতার (Uniformity) কথা মনে করিয়া কার্য্য করেন, তাহা ঠিক নহে। পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে যে সকল অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থূল বিষয়াদির আলোচনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন, তাঁহাদের সমালোচকগণও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণভাবে কোন বিষয় আলোচনা করায় যেমন দোষ, অনিশ্চিত ও শিথিলভাবে তাহার আলোচনাতেও ঠিক সেই দোষ ঘটিয়া থাকে। সোজা পথে (Short cut) একদিকে সত্যানুসন্ধান করিলে হয়ত কোন সত্যের আবিষ্কার করা যায় না, কিন্তু তাহা হইতে এরূপ অনুমানও সঙ্গত হইবে না যে অপরদিকে এইরূপ ভাবে সংক্ষেপে কার্য্য করিলেও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না। অথচ অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে ঠিক এই প্রকার তর্কেরই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়! দৃষ্টান্তস্বরূপ, রক্ষণীয় নীতির স্বপক্ষে যে সকল কথা বলা হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটা কথা শুনা যায় যে (Laissez Faire) ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান সময়ে আর প্রযুজ্য হইতে পারে না; যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তিদ্বারা এই কথা প্রমাণ করা হইত, সেগুলি এখনকার দিনে আর খাটে না সত্য, কিন্তু এইরূপ (Negative premises) বিয়োগান্ত প্রতিজ্ঞা হইতে (Negative conclusions) বিয়োগান্ত সিদ্ধান্ত মাত্রই পাওয়া যায়। অবাধ বাণিজ্যের গতি প্রতিহত করিবার স্বপক্ষে কোন মন্তব্য সম্বন্ধে ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত মত আজিকার দিনে খাটে না বলিয়া ঐ মন্তব্যও প্রযুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু ইহা বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইবে না। স্থান ও সময় ও প্রাসঙ্গিক কারণাদির আলোচনা করিয়া তবে ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা সমীচীন হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়াই যে কোন-একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই আজি-কালিকার প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

পক্ষপাতিত্ব দোষ

ঐতিহাসিকগণও ঘটনার জটিলতার বিষয় আমলে না আনিয়া কোনরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বে যে ভ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রকার ভ্রমকে তাহারই অন্তর্গত দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রম বলিয়া পক্ষপাতিত্ব-দোষ বলিব। অর্থনীতির আলোচনায় সম্পাদ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, কেবল সত্যের চক্ষেই সকল বিষয় দেখিতে হইবে এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হিসাবেই সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইবে। এই বিষয়টি সহজেই দৃষ্ট হয়, এবং এই বিষয়ে কিছু বলাও সহজ; কিন্তু এই বিষয়ে কার্য্য করাই প্রকৃত পক্ষে কঠিন।

প্রধানত অর্থনীতি-অধ্যয়নের যে প্রথম আকর্ষণ তাহা কেবল বিজ্ঞান-শিক্ষার খাতিরেই নহে। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সুখ-দুঃখের কারণ, যাহাতে মনুষ্যের উন্নতি বা অবনতি হয়, সেই সকল বিষয় অনুষ্ঠানের জন্যই আমরা এই বিজ্ঞান শিখিতে আকৃষ্ট হই। এই সকল কারণ, অবস্থা ও শক্তি হইতে আমরা নিজেরা বিচ্ছিন্ন বা উদাসীন থাকিতে পারি না। উন্নতি ও অবনতি, সুখ ও দুঃখ এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বা ক্রিয়া আমরা দেখিতেছি এবং উন্নতি ও সুখের প্রতি আমাদের যেরূপ আকর্ষণ, অবনতি ও দুঃখের প্রতিও আমাদের ঠিক ততখানি বিতৃষ্ণা। প্রথমোক্তকে আমরা স্থায়ী এবং দ্বিতীয়কে দূরীভূত করিতে প্রয়াস পাই এবং

তজ্জন্য প্রকৃত ন্যায় ও অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহা ত্যাগ করিয়া উন্নতি ও সুখের আনুকূল্যে মত পোষণ করি।

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বাস্তব জগতে অর্থনীতি সংক্রান্ত সম্পাদ্য বিষয়গুলি পৃথক করিয়া অন্য সকল প্রকার বিষয় হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। যখনই আমরা অর্থনীতি সংক্রান্ত কোন বিষয় আলোচনা করিতে অগ্রসর হই, বা কার্য্যক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত শিক্ষানুযায়ী কোন পন্থা অবলম্বন করি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকগুলি বিষয় আছে, যাহা আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি বিষয়ক প্রশ্নগুলি, রাজনৈতিক, সামাজিক, ও ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ই পরস্পর-হিসাবে অল্প-বিস্তর জড়িত এবং এই জন্যই তত্ত্বসংক্রান্ত বা ব্যবহারিক কোন প্রশ্ন উঠিলে ইহার জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। কখনও কখনও ইহা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানকারীর নিকটে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে গেলে, অনেক সময়ে আমাদের ব্যবস্থা কিছু অস্পষ্ট হইয়া পড়িতে পারে।

যতই আমরা এই প্রকার সূক্ষ্ম বিচার হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা পাইয়া স্থূলভাবে আলোচনা করি, ততই এই সকল পক্ষপাতিত্ব-দোষ বৃদ্ধি পায়। যদি আমরা সূক্ষ্ম মূলতত্ত্বগুলি একেবারে পরিত্যাগ করি এবং প্রত্যেক প্রাসঙ্গিক বিষয় বিচারের জন্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের এক বিপদ হইতে অন্য বিপদে পড়িতে হইবে—সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিলে ন্যায়-সঙ্গতি এবং নিশ্চয়তাও বর্জ্জিত হইবে। তাহা হইলে তখন ইহারা গন্তব্য পথ হইতেও বিচ্যুত হইবে। দেখিতে নয়নরঞ্জন হইতে পারে; কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটিবে।

অর্থনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে অনেক পক্ষপাতিত্ব-দোষ আসিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এগুলি পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার পদ্ধতি

বিষয়ের জটিলতা উপলব্ধি করিয়া এবং আমাদের পক্ষপাতিত্বের কথা মনে করিয়া অর্থনীতির আলোচনায় দুইটী প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইবে। এই সকল প্রতিবন্ধকের গুরুত্ব হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগকে একেবারে দূরীভূত করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিয়া —ইহাদের অস্তিত্ব মনে করিয়া, অগ্রসর হওয়া। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইতেছে, এইগুলি স্মরণ-পথে রাখিয়া এমন শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে এইগুলি অনায়াসে আমরা অতিক্রম করিতে পারি।

অর্থনীতি শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে কিরূপ শিক্ষা আবশ্যক—সেই প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে চাহি না। ইতিহাস, ভূগোল এবং

বর্ত্তমান ঘটনা সম্বন্ধে কিছু-কিছু জ্ঞান থাকা ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছু শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য একটি বিষয় আবশ্যক—যাহা মন-মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা অত্যুত্তমরূপে সমীকরণ করা। কতকগুলি বিষয় যা তা করিয়া শিখিয়া এবং তাহাদের অর্থের প্রতি সম্যক দৃষ্টি না রাখিয়া কলের মত সেগুলি আওড়াইলে শিক্ষার পক্ষে তাহা অতীব হানিকর হইবে।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত আপত্তি

দ্বিতীয় দফার আপত্তিগুলি এই স্থলেই উঠিবে এবং এই স্থলেই সেগুলির বিচার করিতে হইবে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য দেশের পক্ষে যাহা প্রযুক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওয়াল্টার বাজহট যাহা বলিয়াছেন, তাহারই প্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাজহট বলিয়াছেন যে, অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সকল দেশের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না—কেবল যে সকল দেশের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে সেই সকল দেশের প্রতিই ব্যবহৃত হইতে পারে। ইংলণ্ডের ন্যায় যে দেশে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা প্রচলিত সেই দেশে এরূপ সম্ভবপর। সেই হিসাবে, ভারতবর্ষের প্রতি ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে না—কারণ ভারতবর্ষে অনেক স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব। ভারতবর্ষের শিল্পবিষয়ক গঠন সম্পূর্ণ হইতে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব রহিয়াছে এবং অনেকে এরূপও বলেন যে, এতদ্দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্বও নাই এবং দেশাচারই সকল বিষয়ে প্রভুত্ব প্রকাশ করে। ভারতীয় অর্থনীতির মূলাধার পরলোকগত জষ্টিস রানাডে বলিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষে জাতি ও পরিবার সকল বিষয়েই আধিপত্য বিস্তার করে। স্বাধীন ও অসীমাবদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতি ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, সামান্য কয়েকটি নির্দ্ধারিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। দেশাচার ও আইনেরই প্রভাব অধিক এবং যুক্তি অপেক্ষা পদগৌরবই অধিক নিষ্পত্তিকরণক্ষম হইয়া থাকে। মূলধন বা পরিশ্রম চলনশীল নহে এবং একস্থান হইতে অন্য স্থানেও পরিচালনীয় নয়। বেতন ও লাভ নির্দ্ধারিত অবস্থায় থাকে এবং ঘটনানুসারে তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। যে সমাজ এইরূপে গঠিত, সে সমাজের অভিপ্রায়গুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া কার্য্যকরী হইতে পারে না; অধিকন্তু, তাহারা তাহাদের প্রকৃত পথ হইতে অপসৃত হয়।"

উপর্য্যুক্ত মতামতগুলি যে বিচারশক্তি এবং বহুদর্শিতার উপরে ন্যস্ত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি ইহা বলিতে হইবে যে অর্থনীতি বিষয়ক সাবেক মতগুলি ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারেই প্রযুক্ত হইতে পারে না এবং ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত সম্পাদ্য বিষয় গুলির আলোচনার জন্য সেই প্রাচীন মতগুলি অধ্যয়ন করা ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র? আমরা এই প্রকার

সিদ্ধান্তের অনুকূলে আদৌ মত দিতে পারি না—বরং এ প্রকার সিদ্ধান্তের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী এবং আমাদের বিশ্বাস যে মহামতি রাণাডে যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও স্বীকার করিতেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মতামতের পরিবর্ত্তনের সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। সাবেক মতের বর্ত্তমান স্বপক্ষীয়গণ তাহাকে অনেক পরিমাণে নমনীয় করিয়াছে এবং "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের" পার্থক্যও অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের উপযোগী পন্থা

ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী, তিনটী পন্থা বিবেচিত হইতে পারে।

(১) আমরা এরূপ ধরিয়া লইতে পারি যে, ভারতবর্ষের অবস্থা এমন নিয়ম-বিরহিত যে সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ যুক্তিগুলির কোনই মূল্য নাই এবং তজ্জন্য অমানুষিক পদ্ধতিগুলিতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকি। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা ঘটনা-সংগ্রহ এবং তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিব ও এই সকল ঘটনা যে সকল মত নির্দ্দেশ অথবা সপ্রমাণ করে তাহাই মাত্র নির্দ্ধারণ করিব। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থনীতির এইরূপ মালমসলা সংগ্রহ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে এই মত গ্রহণীয় হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ এই পথে অগ্রসর হইয়া কার্য্য করিলে সুফলও ফলিতে পারে। তবে আমরা এরূপ বলি না যে অন্য পথে অগ্রসর হইলে ফল পাইব না।

(২) ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, যদি আমরা সুচারু ও সঙ্গত জ্ঞানলাভ করিতে চাই, তবে আমরা—ভারতবর্ষ ও ইউরোপ উভয় স্থানেই—আমাদের সম্পাদ্য বিষয়গুলি সিদ্ধ করিবার জন্য পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। তবে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, অবলম্বিত পন্থাগুলি স্বদেশীয় হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ ভিন্ন-দেশীয় না হয়। ভারতবর্ষের জন্য অবলম্বিত পন্থাগুলি ভারতীয় অবস্থা হইতেই উদ্ভূত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ইউরোপের জন্য যে পন্থা হওয়া উচিত, ভারতবর্ষের জন্য তাহা হইতে ভিন্ন পন্থাবলম্বন শ্রেয়। এরূপ কথা সরাসরি ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রস্তাবিত প্রণালী প্রত্যয়যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহার একটী নক্সা উপস্থিত করা উচিত এবং সেই নক্সায় নূতন মত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলির কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া অত্যাবশ্যক। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এ পর্য্যন্ত কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে, এরূপ অর্থনীতি প্রস্তাবিত হয় নাই!

(৩) তৃতীয় পন্থা এই যে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক মতের যতগুলি ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইগুলিই গ্রহণ করা। বর্ত্তমানে কেহই এরূপ স্বীকার করিবেন না যে, অর্থনীতি-সংক্রান্ত সকল মতগুলি সকল দেশে এবং সকল সময়ে একই ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে, স্থলবিশেষে যে কতকগুলি মত প্রযুক্ত হইতে পারে ইহা স্বীকার করা যায় এবং এক দেশীয় এক সময়ের মত অন্য সময়ে কিয়দংশে নিশ্চয়ই প্রযুক্ত হইতে পারে।

যে সমস্ত প্রশ্ন আমরা উপরে উত্থাপন করিয়াছি তাহা সংখ্যায় অনেক এবং সেই সকলগুলিই সরাসরি ভাবে বিচার করা যাইতে পারে না। অর্থনীতি বিষয়ক মত গুলির বহু শাখা-প্রশাখা আছে। বিশেষতঃ, ভারতীয় ব্যবসায় ও শিল্প বহু বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। ইউরোপীয় মত ভারতীয় আচারের প্রতি প্রয়োগ করিলে সহস্র সহস্র সমস্যার উৎপত্তি হয়। এবং শেষোক্তের মধ্যে হয়ত এত অল্প সংখ্যক আছে যে প্রত্যেকটী নিজ নিজ পৃথক অবস্থানুসারে বিচার করিতে হইবে। হয়ত, কথা উঠিবে যে ভারতবর্ষে ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিবেচ্য অনেকগুলি বিষয়ই বৈদেশিক এবং তাহারা প্রকৃত ভারতীয় অর্থনীতির অঙ্গীভূত নহে। অবশ্য এ উক্তিতে কিছু সত্য নিহিত আছে; তবে এরূপ উক্তি অধিকস্থলেই অতিরঞ্জিত। ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ত্তমান ব্যবসায়িক পদ্ধতি বৈদেশিক হইলেও অদূর ভবিষ্যতে ইহাদের বৃদ্ধি অথবা ইতিমধ্যেই ইহা সকল দেশের উপর যে ফল উৎপাদন করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট অফিস এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষা পুরাতন রক্ষণশীলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং চির-প্রবাদভূত ভারতীয় গ্রাম-সমূহের বিচ্ছিন্নতাও ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতেছে।

উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিশেষ আবশ্যক হইতেছে ছাত্র ও কাযের লোকের প্রণালী-বদ্ধ সহযোগিতা—উভয়ের একত্র সমাবেশ ও কার্য্য না হইলে ফল পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় অবস্থার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে হইলে তিনটী কার্য্য অত্যাবশ্যক এবং এই তিনটীর মধ্যে বহুদর্শিতা ও কার্য্যোপযোগী জ্ঞান ঔপপত্তিক শিক্ষাপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

উপর্য্যুক্ত তিনটী বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা এই:—

(১) প্রথমে কার্য্য-ঘটনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। বর্ত্তমানে ইহাই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া আমাদের মনে হয় এবং ইহার ক্ষেত্রও সুবৃহৎ। সত্য বটে, অনেক প্রকার ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিবরণ কতক পরিমাণে প্রণালীবদ্ধভাবে আমাদের হস্তে পতিত হইয়াছে। সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট, গেজেটীয়র, কমিশনের রিপোর্ট এবং গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত অন্যান্য কাগজে অনেক মূল্যবান বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ সংবাদ বহুজ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হইলেও কোন কার্য্য-বিশেষের জন্য সংগৃহীত হয় এবং কোন মত বিশেষের সাপক্ষের জন্যই প্রধানতঃ উপস্থিত করা হয়। এই সকল সংবাদ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এবং গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনের জন্যই সাধারণতঃ সংগৃহীত হয়। কিন্তু ইহাতে ইহার মূল্যের হ্রাস হয় না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয় বলিয়া এই সকল সংবাদের মূল্য অধিক। ব্যক্তিগতভাবে লোকে যে সকল সংবাদ গ্রহণ করিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও অধিকতর মূল্যবান সংবাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা

রহিয়াছে এবং যখন এই সকল সংবাদ শাসন-সৌকর্য্যার্থে সংগৃহীত হয়, তখন সে গুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকে না। পক্ষান্তরে, এগুলি যে একেবারে ভ্রমপূর্ণ নহে তাহাও বলা যায় না এবং ইহাতে যে সকল ভ্রম থাকে তাহা ধারাবাহিক; ব্যক্তিগত অনুসন্ধানেই তাহার সংশোধন হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের "ব্লু" পুস্তকসমূহে যে উপাদান থাকে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান এবং এই মূল্যবান উপাদানসমূহ সাধারণ ব্যক্তিগণের অধ্যয়নের বিষয়ীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহার সহিত আরও সূক্ষ্ম উপাদা একত্র করা প্রয়োজন। সকল সংবাদই ঘটনার উপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজনীয় এবং ভারতীয় অর্থনীতি-সংক্রান্ত ঘটনাগুলি যে গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন ও তৎসংক্রান্ত ঘটনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাহা বেশ মনে রাখা উচিত। অবশ্য, একমাত্র গবর্ণমেণ্টই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারেন; কিন্তু যে উপায়ে এ তথ্য সংগৃহীত হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ও তাহার উত্তর কতকাংশে সীমাবদ্ধ হয়। আমাদের মনে হয় যে, এই সকল সংবাদের মূল হইতেছে গ্রাম্য চৌকিদার। এ প্রকারে সংগৃহীত সংবাদ সংশোধিত হইলেও যে কতকাংশে অসম্পূর্ণ থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ধীর ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ঘটনা এত বিভিন্ন প্রকারের যে, এই ভাবে অনুসন্ধান ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাধারণ ভাবে মত প্রকাশ অর্থাৎ এক গ্রামে যাহা ঘটিতেছে, ভারতবর্ষের সকল গ্রামেই তাহা ঘটিতেছে এরূপ ধারণা অত্যন্ত দূষণীয়। গ্রামের কথা দূরে থাকুক, এক প্রদেশের সহিতই অন্য প্রদেশের সামঞ্জস্য নাই।

আমাদের এই পাটনা কলেজে "চাণক্য সমিতি" নামক ছাত্রদিগের একটী সমিতি আছে। এই সমিতি-সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। আমরা উপরে যে প্রকার ঘটনা-অনুসন্ধানের কথা বলিয়াছি, এই সমিতি কতক পরিমাণে সেইরূপ ঘটনা-নিচয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। সমিতির সদস্যগণ প্রায় সকলেই বেহার-প্রদেশীয়; কিন্তু এক গ্রামের এক সদস্য যে বিবরণ দাখিল করেন, অন্য গ্রামের অন্য সদস্যের সহিত সব স্থানে তাহার মিল হয় না। ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে একস্থানের ঘটনার সহিত অন্য স্থানের ঘটনার সামঞ্জস্য নাই—বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে প্রত্যেক স্বতন্ত্র গ্রামের বিষয় সকল অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

(২) দ্বিতীয় কার্য্য হইতেছে যে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাদের পর্য্যালোচনা ও বিশিষ্ট বিশ্লেষণ। এরূপ কার্য্যে পারদর্শী হইতে হইলে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কতক ঔপপত্তিক শিক্ষা এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদের মতে প্রথম দফা দ্বিতীয় দফা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

উপাদান-সংগ্রহের কার্য্য আরও অধিকদূর অগ্রসর হইলে এই কার্য্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। তবে ইহা একেবারে স্থগিত রাখিলে চলিবে না। উপাদান-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ একত্রেই করিতে হইবে। এবং একটী হইতে অন্যটী পৃথকভাবে করিলে কার্য্যের ক্ষতি হইবে। বিশ্লেষণ ও তুলনা দ্বারা আমরা যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে যে কেবল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব এমন নহে, ইহাও জানিতে পারিব যে কোন্ বিষয়ে আরও উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক এবং কি ভাবে প্রশ্ন করিলে উত্তম উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিবে। পুনশ্চ, যদিও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতীয় অর্থনীতি এখনও ধারাবাহিক শিক্ষার উপযোগী হয় নাই, তাহা হইলেও ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে ইউরোপীয় মতামত ও বহুদর্শিতা ভারতীয় অনেক প্রশ্নের সমাধানের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ-আনয়নের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক জানিতে চান, তাঁহারা রানাডের রচনাগুলি, অথবা স্যার থিওডোর মরিসনের পুস্তক পাঠ করিতে পারেন কিংবা ডাক্তার মার্শাল ইণ্ডিয়ান করেন্সী কমিটীতে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করিবেন।

(৩) তৃতীয় কার্য্য হইতেছে কার্য্যোপযোগী ফল পর্য্যালোচনা করা। আমাদের মনে হয় যে প্রথমোক্ত দুই দফা এই শেষোক্ত দফারই অধীন। কেবল জ্ঞান লাভ করিতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা না বিশ্বাস করিতে পারি যে, এই জ্ঞানলাভ কার্য্যকরী, ভ্রম-সংশোধনে সক্ষম এবং উন্নতির সহায় হইবে। কেহ কেহ এমন আছেন যাঁহারা মনে করেন যে এই বিশ্বাস কেবল ভ্রান্তি মাত্র। তাঁহারা মনে করেন কার্য্যের জন্য ঔপপত্তিক শিক্ষার কোনই আবশ্যকতা নাই—কেবল বহুদর্শিতারই প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হয় নাই বা যে সকল সংস্করণ বৃথা হইয়াছে তাহাই উল্লেখ করিবেন। কিন্তু, সুখের বিষয় এই, অন্যদিকেও দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। যৌথ মহাজনীর কথা ধরুন। ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ইহার সফলতার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ইহার ফল স্বপ্নেরও অগোচর ছিল—অলীক স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ইহার সফলতা যে কল্পনা ও বহুদর্শিতা উভয়ের সংমিশ্রণে হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। কল্পনার যে কোনই আবশ্যকতা নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এমন কি যিনি মুখে "কল্পনার আশ্রয় লইব না, কেবল কার্য্য করিব" বলেন, তিনিও কিছু না কিছু কল্পনার আশ্রয় না লইয়া পারেন না। কল্পনার উপরে কার্য্যকে ন্যস্ত করিতে হইবে এবং প্রকৃত কাজের লোক হইতে হইলে কল্পনাকে হস্তগত করিতে হইবে। যে শিক্ষায় কল্পনা ও বহুদর্শিতা সম্মিলিত হয়, সেই শিক্ষার ফলই প্রকৃত কার্য্যকরী হয়। এরূপ শিক্ষা হইলে দুই প্রকার ভ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এক প্রকার হইতেছে এক

দলের ভ্রম, যাঁহারা কেবল কার্য্য করিতেই উপদেশ দেন। অন্যপ্রকার হইতেছে অপর দলের, যাঁহারা কেবল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, মনে করেন যে সকল জিনিষেরই একটী "রাজকীয় পন্থা" আছে—যেমন স্বদেশী প্রতিজ্ঞা বা প্রকাশ্য সভায় "রেজলিউসন পাস" করিলেই অর্থনীতির উন্নতি হইতে দেরী লাগে না। একদল মনে করেন যে উৎসাহেই সব কাজ হয়, অপর দল মনে করেন যে গবর্ণমেণ্টই সব করিবেন। অর্থনীতিতে শিক্ষালাভ হইলে এই উভয় প্রকার ভ্রমই দূর হয়।

ভারতবর্ষে এক্ষণে কি কি সমস্যা উপস্থিত, তাহার এক ফর্দ্দ দেওয়া অনেক সময় আবশ্যক। ইহার মধ্যে কয়েকটী খুব বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে দুর্ভিক্ষ-সমস্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষির উন্নতি, জমিদার ও প্রজার সম্পর্কের উন্নতি, কার্য্যে অধিক মূলধন প্রয়োগ এই সকল গুলিও সমধিক উল্লেখযোগ্য।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা ছাত্ররূপে বলিয়াছি এবং আমাদের এত কথা বলিবার সার্থকতা এই যে অর্থনীতি শিক্ষার দুইটী দিকই—ঔপপত্তিক ও কার্য্যকরী—আছে এবং এই শিক্ষাকে প্রকৃত কার্য্যে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে। তিনদিক হইতে এই সকল সমস্যাগুলি বিবেচিত হইতে পারে এবং তিনপ্রকারের লোক ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট;—অর্থনীতি শিক্ষায় ব্রতী ছাত্র, কাষের লোক এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ। কেহই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে এ-যাবৎ শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণই অধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের ন্যায় অধ্যয়নে ব্রতী ছাত্রগণ ও কার্য্যকরী ব্যক্তিগণের স্ব স্ব দিকটায় দৃষ্টিপাত করা উচিত। বলা বাহুল্য যে তিনদলের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক এবং একত্রে মিলিয়া কার্য্য করিলে যে প্রভূত ফললাভ হইবে তাহা সুনিশ্চিত। যে সকল সমস্যা সমাধান করিতে হইবে তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুরূহ এবং সেই জন্য যত দিক হইতে পারা যায় ততদিক হইতেই উহার আলোচনা আবশ্যক। যাহাতে জ্ঞান ও পারদর্শিতা যতখানি পাওয়া যায়—উভয়ই ইহার আলোচনায় সাহায্য করিতে পারে তাহা করার প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে কার্য্য করিয়া ইহার সমাধান করা অসাধ্য। সম্ভবতঃ এ সকল সমস্যার দুই-একটীর কোন দিনই সমাধান হইবে না এবং সমবেত শক্তিতে অংশবিশেষমাত্র সমাধান হইতে পারে। তথাপি এরূপ ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিশ্রম যে অত্যাবশ্যক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমাদের মনে হয় না যে, আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন রাজরাজেশ্বর যে সঙ্কেত-বাক্য (watch word) ভারতবর্ষে আসিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আর কোন দিকে এরূপ পরিষ্কারভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে! ভারতবর্ষ যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইতে

রেন না। তবে বর্ত্তমান যে অতি উজ্জ্বল, তি আশাপ্রদ, তাহা সকলেই বলিবেন। পিচ, সকল দিকেই সকল প্রকারে এক সার্ব্বজনীন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং তাহা হইতেই ভবিষ্যৎ অনুমিত হইতে পারে।

তেহাই

(সাহিত্য-রসাশ্রিত দার্শনিক-দানাদার নাট্যরঙ্গ)

নাটকীয় পাত্র-পাত্রী

আমি
মগজ
কাগজ
গজকাঠি
বর্গীয় জ (ওরফে জগন্নাথ, ওরফে জগৎ-পিতামহ)
উড়ে পাণ্ডা
কামার
কুমার
দালাল
তাঁতি
ঢাকী
টিক্‌টিকি

[দৃশ্য—চুরোটের ধোঁয়া, চিম্‌নীর ধোঁয়া ও চুলার ধোঁয়ার ত্রিবেণী-সঙ্গম]

আমি

দিনে আলো আছে, নিশীথে কালো আছে, শ্মশানে ধূ আছে, জমিনে সবুজ আছে, আসমানে কমলা আছে, হলুদে হলুদে আছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে নীল আছে, ইউরোপে সেই উদ্যানে ভায়োলেট্ আছে, লঙ্কায় তা আছে আবার লাল আছে, কিন্তু বেগুনি কই? সে যে স্বর্গে ছিল, স্বর্গের রাজার রামধনুটিকে সে যে সুনিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, সে গেল কোথায়? সে যে স্বর্গের জিনিস, মর্ত্ত্যের পথে কোথায় পথহারা হইল? সে কোথায় গেল? আমার বেগুনি কোথায় গেল?

মগজ

হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি, সে বোধ হয় হদিস্ দিতে পারিবে। অনেক সময়ে আমি যে-কথার জবাব দিতে পারি না হৃদয় অতি সহজেই তাহার একটা হেস্ত-নেস্ত করিয়া ফেলে। বলিতে কি স্বয়ং হৃদয়েশ্বর যাহা না জানেন হৃদয় তাহাও জানে।

আমি

বটে বটে, আমি হৃদয়কে ডাকিতেছি। হৃদয়! ও হৃদয়! ও আমার হৃদয়বন্ধু হৃদয়! জবাব দাও, বল আমার বেগুনি কোথায়?

মগজ

রোস রোস আমি ভুল করিয়াছি। তোমার হিদে জোলার নাতি হৃদয়ের আর

তুমি সাড়া পাইবে না। বর্ত্তমান জ্ঞান-গরীয়ান যুগে হৃদয় বেচারা বয়ঃপ্রাপ্ত বেঙাচির লেজের মত খসিব খসিব হইয়া আছে। বেচারা বড় কাবু হইয়া মনস্তত্ত্ববিদের হাসপাতালে পড়িয়া অসার অচৈতন্য অবস্থায় আছে। উহাকে ডাকিলেও সাড়া পাইবে না। এখন হৃদয়ের শূন্য জায়গাটাতে খানিকটা কাগজ পূরিয়া রাখা হইয়াছে। কাগজ এখন হৃদয়ের এক্‌টিনি করিতেছে। সুতরাং মগজ ও কাগজে মিলিয়া যে জুড়ি হইয়াছে বর্ত্তমান সভ্যতা সেই জুড়ি হাঁকাইয়া মানুষকে তাহার ঈপ্সিত অর্থাৎ তুমি যাহাকে বেগুনি বলিলে, বোধ হয় তাহারই অভিমুখে লইয়া যাইতেছে।

আমি

এখন উপায়? বেগুনির সন্ধান আমায় কে বলিয়া দিবে।

মগজ

কাগজের কাছে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

কাগজ

বেগুনি? বেগুনির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? এ ভারি কঠিন প্রশ্ন। বিশেষতঃ এই ত্রি-ধোঁয়ার রাজ্যে। দেখ, আমি একজন উড়িয়াকে বেগুনি খাইতে দেখিয়াছি। উহার পেটের মধ্যে বেগুনি পাওয়া যাইতে পারে। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর। চট্ করিয়া ঐ উড়ে পাণ্ডাটিকে ধরিয়া আন ত। উহার কাছে সমস্ত সমাচার পাওয়া যাইবে। আমি যদিও কাগজ অর্থাৎ সমাচার-পত্রিকা অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের হৃদয়ের নাড়ী, তথাপি রিপোর্টার ভিন্ন আমার গতি নাই। ঐ উড়ে পাণ্ডার বাক্য আজকে আমার রিপোর্টারের কা হইবে। ডাক, ডাক, উহাকে ডাকি আন।

আমি

পাণ্ডা ঠাকুর! ও পাণ্ডা ঠাকুর! উড়ে!

উড়ে পাণ্ডা

আরে কাঁই কি এম্‌তি হউছ?

আমি

বলি, আমার বেগুনি কোথায়?

উড়ে পাণ্ডা

কঁড়? বেগ্‌গুনি? বেগ্‌গুনিরে কথা কউছ? সিয়ে আহ্ম ওড়িয়া সব্ব্‌ সোরিং ত্যালেরে ভাজি কীরি বেস্‌ম্ম দেই কীরি মজা করি কীরি কাড়ি রাত্তিকু খাইথিলো বেগ্‌গুনি আর কুথা?

আমি

হায় মগজ! হায় কাগজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই উড়িয়া আমার বেগুনি প্রাণ সংহার করিয়াছে। নববর্ষায় রাঙ্গ ধনুকের একটা গুঁড় যখন একাগ্রভাবে ধরণীতে মুখ জোবড়াইয়া শিলীন্ধ্র অর্থাৎ বেঙের ছাতা ভোজন করিতেছিল আমার বেগুনিও সেই সঙ্গে মর্ত্ত্যে নামিয়াছিল, এবং নামিবামাত্র কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বেগুন বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই উড়ে বোধ হয় তাহাকে নামিতে দেখিয়াছিল এবং বেগুনের অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া একীভূত হইতে—অভেদাত্মা হরিহর হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।—সবুজ ফলে যে মুহূর্ত্তে বেগুনি আভার সঞ্চার হো



প্রতীক্ষা

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

মুহূর্ত্তে এই হতভাগা উড়ে তাহাকে ভাজিয়া খাইয়াছে। হায় বেগুনি আমার বেগুনি!

মগজ

তুমি কাগজের শরণাপন্ন হও। এ বিষয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত।

টিক্‌টিকি

সাহিত্য-গঞ্জে Smoke-Nuisance সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল—তাহার কি হইল? টিক্ টিক্।

কাগজ

সে আন্দোলনের ফল কিরূপ হইয়াছে বলিতে পারি না, কারণ টিক্‌টিকি ডাকিয়াছে।

আমি

আমি টিক্‌টিকি বিশ্বাস করি না। আমি টিক্‌টিকি নাস্তিক।

মগজ

জগন্নাথীরা জগন্নাস্তিক; কিন্তু তাতে কি? আড়ি মারিলে ধোকড় হয়। দেখ আমার এই মহলে একজন বুড়া রাইয়ৎ আছে, তাহার নাম সংস্কার। সে বলে হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা যে না মানে সে গাধা। অনেকে বলেন, অমন কুসংস্কারাপন্ন প্রজার চাল কাটিয়া উঠাইয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু ও তাড়াইলেও যায় না। দিনের বেলা তাড়াইয়া দিলাম। রাত্রে দেখি আবার সেই সব ঝুলি কাঁথা পাতিয়া দিব্য আসর জমাইয়া বসিয়াছে। সদর দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিই, খিড়কীর দরজা দিয়া একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া বসে। আর তা ছাড়া আজকাল বড় একটা তাড়া হুড়াও করি না। কারণ, পণ্ডিতেরা, এমন কি বড় বড় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদেরা, বলিতেছেন, যাহা আছে তাহাকে থাকিতে দাও। প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্বের একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে কেহ কখনও কোন দিন বিশেষ কোন আচার বা সংস্কার বা আর কিছু মানিয়া লইতে পারে না। বিশেষ ধূমধামের সহিত আজকাল এইপ্রকার ধূম উদ্গিরিত হইতেছে। আমার তো Asphyxia হইবার জোগাড়।

আমি

তা হউক। তোমাকে পরে আপীলে বাঁচাইব। আমি নিজে এ কথায় বিশ্বাস করি। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াই আমাদের শরীর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ডেঙ্গু ডিসেণ্টী প্রভৃতিকে গ্রহণ করে। উহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে যাওয়ার মানে ইতিহাসের বিরুদ্ধাচরণ করা, কেবল ডাক্তারের পেট ভরানো। এখন টিক্‌টিকির টিক্‌টিকের ভয়ে কাগজে আন্দোলন ত বন্ধ করিলাম, কিন্তু বেগুনির উদ্ধারের কি হইবে?

মগজ

দেখ, কাগজে যখন আন্দোলনে বাধা পড়িল তখন এক কাজ কর। দেখিতেছি এই ব্যক্তি উড়ে। উড়েরা জগন্নাথের প্রজা, জগন্নাথকে খুবই মানে। সুতরাং তুমি জগন্নাথের দরবারে নালিশ রুজু কর।

আমি

কিন্তু আমি ত জগন্নাথকে মানি না। আমি যে নেতি নেতি করিয়া বেদান্তের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; জগন্নাথ আমি মানি না।

মগজ

জগন্নাথ মান না? অর্থাৎ বলরামের কনিষ্ঠ সুভদ্রার জ্যেষ্ঠ যে জগন্নাথ তাঁহাকে মান না। কিন্তু—

আমি

না না, আমি ঠিক ওরূপ বলিতে চাহি নাই, বরং ঐরূপ মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই তো আমি জগন্নাথকে মানি। আমি যে বৈষ্ণব Philosophy পড়িয়াছি। অক্ষর-মূর্ত্তি বর্গীয় জ, আমাদের বাক্য মনের অতীত। তাঁহাকে দাদা, চাচা, না বলিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইব কিরূপে। স্বর্গ-রাজ্য পাইব কিরূপে। আমি জগন্নাথকে মানি। তবে একবার তাঁহার কাছেই অভিযোগ উপস্থিত করি। (করজোড়ে) প্রভু, জগন্নাথ! স্বামী!

উড়ে পাণ্ডা

নইয়ন—পথ-গা—আমী ভবতু মেএঁ এঁ—

জগন্নাথ

নাথ্‌নী! আমায় ডাকিতেছ?

আমি

আপনি আমায় নাত্‌নী বলিলেন?

জগন্নাথ

না না তুমি ভুল শুনিয়াছ। আমি তোমায় নাথ্‌নী বলিয়াছি। তুমি যখন আমায় জগতের জবানী নাথ বলিয়াছ তখন আমি তোমাকে নাথ্‌নী তো বলিবই। ইহাতে সম্পর্কবিরুদ্ধ কিছুই বলা হয় নাই। আর যদি নাত্‌নী বলিতাম তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি জগৎ-পিতামহ, সুতরাং জীব মাত্রই আমার নাত্‌নী। কেন জান? আমি পুরুষোত্তম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমিই এক-মাত্র পুরুষ! সুতরাং জীবমাত্রই আমার নাত্‌নী। স্ত্রীলোক ও নাত্‌নী, পুরুষও নাতনী। আর নাতনীরা যখন পিতামহদের প্রভু অর্থাৎ হুকুম করিবার মালিক, তখন নাত্‌নী ও নাথ্‌নী ত একই। তুমি বৈষ্ণব Philosophy পাঠ কর নাই?

আমি

পাঠ করি নাই? আমি পাঠ করি নাই? এমন কি গ্রন্থ পৃথিবীতে আছে যাহা আমি পাঠ করি নাই। কাগজে যাহা ছিল তা সমস্তই মগজে পুরিয়াছি। তবুও আমার মগজ Tabula Rasa অর্থাৎ সাদা কাগজ। আর হৃদ্‌পিণ্ডের জায়গায় ছাপার কাগজ গুঁজিয়াছি। অত্যধিক পড়া-শুনায় ঊর্দ্ধবাহুর বাহুর মত চর্চ্চা অভাবে হৃদয়টা শুকাইয়া গিয়াছিল। সেটা কাটিয়া করিয়াছি। শূন্য স্থান কাগজে পূর্ণ করিয়াছি। কাগজে কাগজে কাগজী-রাঙ্গ হইয়াছি। আমি পড়ি নাই? ক বলিব আপনি জগৎ-পিতামহ, বৃদ্ধ হইয়াছেন, নহিলে একবার দেখিতাম। এই যে নিম-কাঠের কুঁদো বসিয়া আছেন, আপনি যে আপনি নন্ তাহা জানেন? আপনার কতটুকু অসিরিস্, কতটুকু ইসিস্, কতটুকু জিহোভা, কতটুকু ওডিন, কতটুকু ব্রহ্মা, কতটুকু জুপিটার, কতটুকু শক্তি, কতটুকু ভক্তি, কতটুকু কাষ্ঠ, কতটুকু তৈল, কতটুকু রঙ, কতটুকু রাইট তাহা আমি সমস্তই একটি দেড়গজি Thesis এ Cosine Thetaর সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিয়া আপনার জগমন্দিরের পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণে সভা আহ্বান করিয়া পাঠ করিয়া শুনাইতাম।

সলমান পণ্ডিতেরা কবি আমির-খস্রুকে তুতী-হি-হিন্দ্ অর্থাৎ হিন্দুস্থানের তোতাপাখী বলিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুস্থানের একমাত্র তোতাপাখী যে আমি তাহা আমি আপনাকে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই দণ্ডেই বুঝাইয়া দিতে পারি।

জগন্নাথ

জা বুঝাইয়া দাও। আমার পা নাই পলাইব করিব না, কাজেই শুনিতে হইবে।

আমি

আ বিদ্যার অধিক পরিচয় আমি দিতে না। আমি আপনার সম্বন্ধে যেটুকু গ্রন্থ কেতাবাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া জের মধ্যে জগা-খিচুড়ি অর্থাৎ ভবদীয় খিচুড়ি পাকাইয়াছি, শুধু তাহাই উদ্‌গিরণ করি, অবধারণ করুন। হে জগন্নাথ! আদিতে আপনার বর্গীয় জ সুতরাং আপনি জবরদস্ত জবরজং; তৎপরে গ, অর্থাৎ আপনি গদাধর; আপনাকে নাথ বলা হইয়া থাকে, অথচ আপনি পিতামহ এ দুইএর সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে শ্রবণ করুন। হিন্দুর দেশে পিতামহেরা ঠাট্টা করিয়া নাত্‌নীদিগকে পত্নী-সম্বোধন করিয়া থাকেন। সেইজন্য আপনি পিতামহ হইয়াও নাথ। এইখানে আপনাতে ও আমাতে রসের সম্বন্ধ। আপনি শূন্যবাদীর শূন্য। অজ্ঞেয়বাদীর X। শূন্যবাদীর শূন্যের সহিত অজ্ঞেয়বাদীর X জুড়িয়া মহাসমন্বয় করিয়া আমরা আপনার মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছি। Xএর স্কন্ধে শূন্য চাপাইলে ঠিক আপনার মূর্ত্তিটি হয়। ঐ শূন্যের গর্ভে সত্ত্ব তমঃ ও রজঃ গুণের প্রতিভূস্বরূপ তিনটি বিন্দু বসাইয়া দিলেই আপনার দুই নেত্র ও শ্রী হাঁ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শূন্যের ভিতর অর্থাৎ নির্গুণের ভিতর ত্রিগুণের বিন্দুপাত হইয়াছে। কথায় বলে নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ বাড়া। এই সামান্য প্রবাদবাক্যের মধ্যে আর্য্যজাতি গূঢ় ভাবে ভবদীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। উহাতে আমাদের জাতির আধ্যাত্মিক দৌড়ধাপের পরিচয় বিদ্যমান। এক্ষণে আপনার বিষয়ে আমার বক্তব্য ইঙ্গিতে কিঞ্চিৎ বলিলাম। সুতরাং আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার অভিযোগ শ্রবণ করুন। আপনার খাস-মহলের প্রজা বর্ত্তমান উড়ে পাণ্ডা স্বর্গীয় বেগুনিকে মর্ত্ত্যে পাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার শাস্তিবিধান করুন এবং অগস্ত্য যেমন ইল্বল বাতাপির পেট চিরিয়া বাহির হইয়াছিলেন, বিশ্বসংসারের চিরপ্রিয় বেগুনি রামধনু-রঞ্জিকা বেগুনিও সেইরূপ উড়িয়ার উদর চিরিয়া বাহির হইয়া পড়ুন।

জগন্নাথ

কি ভয়ানক! ইহার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমার তো হাত নাই।

আমি

হাঁ, তাই তো, আপনার যে হাত নাই!

উড়ে পাণ্ডা

হাত অচ্ছে, আঙ্গুড়—অ নাই।

আমি

চুপ্ রাও বেয়াদব। আমার মগজে জগবন্ধুর এই হাত না থাকার বেশ একটি Philosophy গজাইয়া উঠিতেছিল। তোর

চীৎকারে ভাবের ডিম্ব একেবারে গাঁজিয়া গেল। হতভাগা বদ্‌মায়েস্! বাজে বকিয়া আমার idea ওলট্ পালট্ করিয়া দিতে এলি। জানিস্ তুই বেগুনি খাইয়াছিস্!

কাগজ

এ বিষয়ে কাগজে একটু লেখালেখি হোক্।

মগজ

কাগজ হতে মগজে যায়
মগজ হতে কাগজে,
গজ্‌কাঠিটা গেল কোথায়
রফা হত সহজে।

গজকাঠি

চেঁচিও না, চেঁচিও না। গজকাঠি কখনও গরহাজির হয় না। সম্প্রতি কিন্তু একটু ব্যস্ত আছি। রোস, রোস। তিন যবোদরে এক ইঞ্চি, ঊনচল্লিশ ইঞ্চিতে এক মিটার; কিন্তু ক মিটারে এক যোজন? (চিন্তা) যবোদর হিন্দু, ইঞ্চি ইংরেজি, মিটার ফরাসী, আবার যোজন হিন্দু। গোড়ায় যবোদর শেষে যোজন। গোড়ায় হিন্দু চংমেও হিন্দু। পাশ্চাত্যেরা কেবল মাঝের কটা ধাপ। হুঁঃ, পাশ্চাত্যেরা পিছনে পড়িয়া আছে। থাকিবারই ত কথা। পশ্চাতে অস্তি ইতি পাশ্চাত্য। নামেই পরিচয়। হুঁঃ তুমিও যেমন।

আমি

গজকাঠি তুমি ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু হায়, কিন্তু হায়, জগন্নাথ, জগবন্ধু, জগৎ-পিতামহ, আপনার হাত নাই। হায় তবে বিশ্বসৃষ্টি হইল কি করিয়া?

মগজ

হুঁঃ এই না তোমার মগজের মধ্যে এখনি হাত না থাকার Philosophy তৈয়ারি হইতেছিল।

আমি

হাঁ, হইতেছিল তো। কিন্তু এখন মনে হইতেছে ধোঁয়া, ধোঁয়া, সব ধোঁয়া। সৃজন-কার্য্য চলিতেছে। তবু সমস্তই যেন ধোঁয়ার অবস্থায় রহিয়াছে। সব যেন নীহারিকা।

মগজ

নীহারিকা থেকেই ত বিশ্বের সৃষ্টি। ঐ দেখ। ধোঁয়াটে ভাবের ক্রমশঃ জমাট চেহারা ফুটিয়া উঠিতেছে। আচ্ছা ধর, জগন্নাথের হাত নাই। অর্থাৎ জগৎ-পিতামহের হাত নাই; সেইজন্য তাঁহার কন্যা জগৎ অর্থাৎ পৃথিবীরও হাত নাই। পৃথিবী ভাঁটার মতন গোলাকার, সেইজন্য সূর্য্য গোলাকার, চন্দ্র গোলাকার, গ্রহনক্ষত্রও সব গোলাকার। যেন রাশি রাশি ধোঁয়া তাল গোল পাকাইয়া রহিয়াছে।

আমি

জগৎ-পিতামহের যে হাত নাই তাহা তো জগন্নাথকে দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। আর তাঁহার পুত্র কন্যা চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীও যে গোলাকার, ভূ-গোলে তাহার প্রমাণ আছে দেখিয়াছি। কিন্তু আমার জগৎ-পিতামহী কই? তিনি দেখিতে কেমন? তাঁহার নাম কি?

কাগজ

আমার পুরানো File উল্টাইয়া Domestic Occurences এর স্তম্ভ খুঁজিয়া

দেখ। যদি বিবাহ হইয়া থাকে নিশ্চয়ই নাম পাইবে।

মগজ

তুমি যখন বলিতেছি। আদিতে জগৎ-পিতামহ হাই তুলিয়াছিলেন।

আমি

বটে! কিন্তু কেন হাই তুলিয়াছিলেন? হাই তুলিবার নিশ্চয়ই কারণ ছিল! সে কারণ কি?

মগজ

কেন হাই তুলিলেন? হাই উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? নেহাৎ শুনিবে? তিনি নিজের চক্ষে ভবিষ্যৎ-তোমার ভাবী প্রবন্ধ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমি ধন্য! আমি ধন্য হইলাম! আমার জন্ম ধন্য! আমার প্রবন্ধ নিবন্ধ ধন্য! তাহার পর? তাহার পর?

মগজ

তাহার পর সেই হাই-হাওয়া জমিয়া ধোঁয়া হইল। সেই ধোঁয়া ত্রিধারা হইল। একটি ধারায় নীহারিকার উৎপত্তি, একটি ধারায় চিত্তকুজ্ঝটিকার জন্ম এবং তৃতীয় ধারায় জগৎবিখ্যাত সাধনাসহায় শ্রীশ্রী গঞ্জিকার আবির্ভাব। এই হইল হাই-এ-আওয়ল্ অর্থাৎ আদিম হাই।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! তাহার পর?

মগজ

তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টা আকাশময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া সূর্য্য একদিন পবনের গায়ে হাই তুলিয়া দিলেন। সূর্য্যের আর একটি নাম আদিত্য। ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রে আদিত্যকে আদম বলা হইয়াছে। এবং হাই হইলেন শ্রীমতী হবা। ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের কাহিনীটা একটু খাপ্‌ছাড়া। আমি পূর্ব্বাপর বলিতেছি শ্রবণ কর। হাই Highly ছোঁয়াচে। তাহাতে পবনেরও হাই উঠিতে লাগিল। সে ঢুলিতে ঢুলিতে পৃথিবীর গায়ের উপর হাই ছাড়িয়া দিল। তাহাতে পৃথিবী বলিলেন "তুমি একি করিলে? আমার গা মাটি-মাটি করিতেছে।" এইরূপে পৃথিবীতে মাটির সৃষ্টি হইল এবং ঐ মাটি হইতে মটর, মর্কট, মনুষ্য পক্ষী, এবং মনুষ্য জন্মিল।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! আচ্ছা, সব ত বুঝিলাম, কিন্তু হাই-হাওয়া হইতে সন্তান হইল কিরূপে তাহা তো বুঝিলাম না।

মগজ

পারিলে না? মুক্তোপাতির গাছ দেখিয়াছ? উহার পাতায় পাতায় যখন মুক্তোর মত কুঁড়ি ধরে তখন প্রত্যেক পাতাটি মুক্তো-ঘেরা ইয়ারীংএর মতন দেখায়! ঐসব কুঁড়িতে ফুল হয়। ঐ ফুলে আবার সরিষার মত ছোট ছোট ফল হয়; ঐ ফলের ভিতর বীজ থাকে; ঐ বীজেও গাছ হয়।

আমি

উদ্ভিদবিদ্যার কেতাবে পড়িয়াছি বটে, দেখি নাই।

মগজ

পাতার গায়ে ফুল ফল হইতে পারে, আর হাইয়ের হাওয়ায় সন্তান হইতে পারে না।

আমি

ঠিক বলিয়াছ। এখন বুঝিলাম। পরিষ্কার বুঝিলাম। কি আনন্দ! তাহার পর?

মগজ

তাহার পর? হাঁ হাঁ ভাল কথা মনে পড়িল। বলিতে ভুলিয়াছি যে জগৎ-পিতামহের হাত না থাকায় তদীয় হাই হইতে যে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সৃষ্ট হইল তাহাদেরও হাত হইল না।

আমি

বেশ বুঝিলাম। কিন্তু পৃথিবীর পুত্র মানবের হাত হইল কেন?

কাগজ

হাতাহাতি করিবার জন্য।

মগজ

ফের তুমি বক্‌বক্ করিতেছ? চুপ কর। আমরা যাহাকে হাত মনে করি উহা ঠিক হাত নয়। অজা-গল-স্তন যেমন স্তন নয় সেইরূপ।

আমি

যদি মানুষের হাত অজা-গল-স্তনের মতন হইবে তবে তিন হইতে দুই বাদ দিলে হাতে এক থাকে কি করিয়া? আর ডাক্তারেরাই বা হাতে রাখিয়া চিকিৎসা করেন কি করিয়া?

মগজ

তুমি ঠিক ধরিয়াছ। হাত না থাকিলে হাতে রাখা অসম্ভব বটে। কিন্তু উহারও প্রতীকার হইবে। ভবিষ্যতে হাত-বিষয়ক আইন হইবে। যাহাকে তোমরা এখন হাতিয়ার-বিষয়ক আইন বলিয়া জান একজন প্রেরিত-পুরুষ জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া উহার নূতন ব্যাখ্যা করিবেন। তখন মনুষ্য মাত্রেই বৈষ্ণব ভাবেই মশগুল হইয়া নিজ নিজ হাতে বেহাত করিবেন। এবং জম্বুদ্বীপের এই আদর্শ সমস্ত জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সেই প্রেরিত-পুরুষের গুম্ফমাত্র মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাকে লোকে ধূমকেতু বলিয়া ভুল করে।

আমি

তবে বেগুনি কি চিরতরে বেহাত হইবে?

মগজ

না না। তুমি এই উড়িয়ার সাহায্যে স্বদেশে একটি উড়ের দোকান প্রতিষ্ঠা কর। এইরূপ করিলে হাজার হাজার বেগুনি অচিরে তোমার হস্তামলকবৎ হইবে। যাহা স্বর্গে ছিল তাহা যুগপৎ স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অধিষ্ঠান করিবে। তখন রামধনুকের সেই বেগুনি আকাশের মেঘ বেগুনের ক্ষেত এবং উড়িয়ার দোকান এই তিন স্থানে ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইবে। ইহাকেই বলে True to the kindred points of sky and shop! তখন চন্দ্রের দ্রেক্কাণ এবং উড়িয়ার দোকান একাকার ধারণ করিবে।

আমি

চমৎকার! চমৎকার! শূন্যবাদীর শূন্য—

সকলে

গোল!

আমি

জগৎ-পিতামহের হাত নাই, সুতরাং একরকম—

সকলে

গোল!

আমি

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, হাঁড়ি, কুঁড়ি, মালসা—

সকলে

গোল!

আমি

জগৎ-পিতামহের কন্যা জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী—

সকলে

গোল!

আমি

আমরা মনুষ্যেরা ভবিষ্যতে অর্থাৎ হাত-বিষয়ক আইনের আমলে—

সকলে

গোল!

আমি

তখন পাব্‌লিক্ কাগজে মিটিয়া যাইবে—

সকলে

গোল!

আমি

তখন Private মগজের ঘুচিয়া যাইবে—

সকলে

গোল!

আমি

তখন ভূলোকে গড়ের মাঠে মোহন-বাগানের—

সকলে

গোল!

আমি

ভোজন-লোকে দীনু ময়রার রসগোল্লার মধ্যে—

সকলে

গোল!

আমি

স্বর্লোকস্থ গোলকের Two thirds—

সকলে

গোল!

আমি

তোমরা আনন্দে রক্তপাগল মোগলদের মতন তাল গোল পাকাইয়া হট্টগোল গণ্ডগোল এবং সোরগোল করিতে থাক। আমি ততক্ষণ একখানা খোল লইয়া আসি।

টিক্‌টিকি

ঠিক্ ঠিক্। (স্বগত) বুদ্ধিবৃত্তির গঙ্গাযাত্রার সময় হইয়াছে।

গজকাঠি

টিক্‌টিকি তোমার বাক্য সত্য হউক। ইহা কাকতালীয় কি না জানি না, কিন্তু তুমি ঠিক্ সময়েই ঠিকঠিক বলিয়াছ। আমি সাংখ্যের মত ইঞ্চি ফুটের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছি। পাতঞ্জল জল করিয়া তাহার মধ্যে ডুবুরী-ওলোন হইয়া ডুব দিয়াছি। মীমাংসা-দর্শনের মাংস ওজন করিয়াছি, কিঞ্চিৎ ভোজনও করিয়াছি। বেদান্তের দন্ত গুণিয়াছি, ন্যায়দর্শনের ল্যাজ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এ প্রকার দেখি নাই। এ যে হাই Philosophy অর্থাৎ জৃম্ভ-দর্শন। ইহাতে জগৎ-পিতামহ হইতে টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত কাহারও হাই উঠিতে বাকী নাই। বিগত অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহার তুলনা নাই। ইহা রসে এবং কষে, মগজে এবং কাগজে সমান শোভা পাইতেছে। ইহা অতুলনীয় অবর্ণনীয় অভাবনীয়। হিন্দু

তোমার মরা হাড়ে এখনও কেমন ভেল্কি খেলে তাহা দেখিলে? নিত্য প্রত্যহ দধি ইচ্ছা করিয়া দধীচির হাড়ে একবার ভেল্কি খেলিয়াছিল। হিন্দু আবার দধি পান সুরু করিয়াছে, অর্থাৎ পাকস্থলীর মাথায় ঘোল ঢালিতে শিখিয়াছে। সুতরাং হাড়ে যে ভেল্কি খেলিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু তুমি হাতী। লোকে তোমায় মরা বলে। সে কথা স্বীকার করিলেও তোমার মূল্য লাখ টাকা। জগৎ-পিতামহ একবার হাই তুলিয়াছিলেন। সে একহারা হাই। তাহাতে জগৎ জুড়িয়া কি কাণ্ডই না হইয়াছিল। তাহার পর সূর্য্য এবং পবন যুগপৎ হাই তুলিলেন। সে হইল জোড়-হাই, অর্থাৎ দো-হাই। আর অধুনা আর্য্য ইস্‌লামীয় ও ইউরোপীয় উনুন বিড়ি ও চিম্‌নীর ধোঁয়ায় ধূম্রলোচন হইয়া জম্বুদ্বীপের যে প্রকাণ্ড হাই উঠিয়াছে তাহাই হইল—

সকলে

তে-হাই।

টিক্‌টিকি

ফিক্ ফিক্।

কল্লে ভারি কারখানা,
তিন ঝুড়ি তার ব্যাখ্যানা।

আমি।

কই? তোমরা ভাল করিয়া সোরগোল করিতেছ কই? মগজে এখনো গোলমাল বাধে নাই? আমি যে খোল আনিলাম, বাজাইব।

ঢাকী

আমি ঢাক আনিয়াছি, বাজাইব।

কামার

আমি হাতুড়ী আনিয়াছি, বাজাইব।

কুমার

হুঁ, হুঁ, আমি হাঁড়ি বাজাইব।

দালাল।

আমি ওসব বুঝিনা। আমি কাজ বাজাইব।

তাঁতি

আমি বগল বাজাইব।

টিক্‌টিকি

ধিক্ ধিক্। তুমি কি হনুমান? তুমি কি সূর্য্যি ঠাকুরকে বগলে পূরিয়াছ? যে বগল বাজাইবে? ধিক্ ধিক্।

সকলে (গীত)

লাক্ চড়া চড়্ লাক্ চড়া চড়্,
গিজদা গিজম।
নেই ধরাপর মোর বরাবর,
বিদ্যা কি কম?
বাক্য বকম মগজ জখম
ভাবনা কিবা,
সরগরমে সরদ গরম
হয় বুঝি বা।
আসমানে কি হাই উঠেছে
ভাইরে ও ভাই
সেই হাইএ ব্রহ্মাণ্ড হল
কি হাই দোহাই।
হাই তুলেছে সূয্যি ঠাকুর
বল্‌ছি খাঁটি,
সেই হাইয়ে হায় পির্‌থিমির গা
মাটি মাটি।
তাতেই মাটির সৃষ্টি হল,—
নাইরে রেহাই,—

মানুষ হনু মর্কটাদি
বরণ সেহাই।
সেই মানুষের মগজে আজ
উঠলো কি হাই
তিন তালে এক ফাঁক পেয়েছে
পড়ল তেহাই।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বজবজিয়ে
উঠল মগজ—
বুদ্ধি গেল নজ্ গজিয়ে,—
বেজায় হরজ!

হাই তুলে তাই হালকা হলাম;
হাই কি সোজা?
হাইয়ের হাওয়ায় যায় উড়ে
ব্রহ্মাণ্ড-বোঝা।
তিনটি হাইয়ে তিন ভুবনের
ব্যক্ত নিয়ম,
তোমার নেহাই আমার তেহাই
গিজদা গিজম।
(এই সময়ে পুঞ্জ পুঞ্জ সাঁজালের ধোঁয়া ঢুকিয়া যবনিকার কার্য্য হাসিল করিল।)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে

কবিবর,

আজি তব শুভ জন্মদিনে
মনে হয় কতদিনে কি জীবন সঞ্চারিলে
জগৎ বাঁধিলে কোন্ ঋণে।
অজানা সে অচেনা সুদূর—
বুঝিলে কি তার ভাষা জানিলে কি তার আশা
সেথাও পশ্চিম তব সুর।
প্রাণভরা ক্ষুধা তৃষা নিয়ে
দাঁড়াল দুয়ারে এসে দীন অতিথির বেশে
ধন্য হ'ল সুধাধারা পিয়ে।
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ;
তারো অন্ধ অন্ধকার শিহরিছে অনিবার
পশিছে তোমার জয়রথ।
মন্দারের মালার মতন
কালে কালে দেশে দেশে তব গান ভালবেসে
প্রাণে প্রাণে রচিছে মিলন।

বিশ্বের সে মহাঋণভার
ব্যথিছে পরাণ মোর নয়নে ঝরিছে লোর,
কিসে শুধি এ আনন্দ-ধার?
ওরে মুগ্ধ মুছ্ আঁখিজল,
দেখ্ শুধু ভাল ক'রে পরম মরম ভ'রে
আনন্দ রাজে কি ঢল ঢল?
কি দিবি সে শোক আজি মিছে!
কবির অজস্র দান অফুরন্ত মহাপ্রাণ
রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিত্ত কি ভরিছে?
দেওয়া! ভুলে' যারে তার কথা,
নেওয়া কি হ'য়েছে শেষ? নাহি কিরে দৈন্যলেশ
কোনও খানে কোনও বা রিক্ততা?
যতটুকু পেরেছিস্ নিতে
মিটেছে হিসাব তার কেটে গেছে ঋণভার
অমর সে হ'বে চিতে চিতে।
আনন্দের এ মহা উৎসব;
কেবা দাতা দীন আর দেওয়া নেওয়া একাকার
আনন্দে অসীম আজি সব।

২৫ বৈশাখ, ১৩২২। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

রুষ-সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রও নাই, সঞ্জয়ও নাই,—কৌতূহলও নাই সংবাদ-দাতাও নাই; নহিলে এই ইউরোপীয় মহাসমর-প্রসঙ্গে অনেক শিখিতাম। জর্ম্মাণির অতিবৃদ্ধি এবং অতিদর্প বিনাশের জন্য যাহারা ত্যক্ত-জীবিত, তাহাদের মধ্যে রুষের সহিত আমাদের পরিচয় অল্প। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরাই যখন রুষরাজ্যকে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে করিতেন, তখন আমাদের অজ্ঞতা তেমন দোষের বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে।

গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার দিনে, গ্রীক্ ইতিহাসে অনেক জাতির যথার্থ বিবরণ লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু রুষিয়ার সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রীক কবিরা রুষিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদিগের বর্ণনায় কবিত্বের রং ফলাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, উহারা নির্ব্বিরোধী, সুন্দর, চিরজীবী জাতি, কেবল সরলভাবে প্রেম বিনিময় করিয়াই প্রকৃতির রাজ্যে বিচরণ করে। পরে যখন রোমকেরা কথঞ্চিৎ সন্ধান লইয়াছিলেন; তখন গ্রীক্ কবির কাল্পনিক চিত্র উপহাসের সহিত উপেক্ষিত হইয়াছিল। লাটিন্ এবং ইতালীয় সাহিত্যের বর্ণনা এই, যে রুষিয়াবাসীরা বর্ব্বরের অধম, উহারা হিংস্র পশুর মত নিষ্ঠুরভাবে নরহত্যা করে, পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে একেবারেই জানে না, মড়ার মাথার খুলিতে জল পান করে, এবং যাহা কিছু ভীষণ, যাহা কিছু ঘৃণ্য, তাহাই তাহাদিগের অঙ্গের ভূষণ। প্রাচীন সময়ের কথা আমরা জানি আর নাই জানি, এই সকল বর্ণনা যে কল্পিত, এবং অতিরঞ্জিত, তাহা নৃতত্ত্ব বিদ্যার প্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে ধরিতে পারা গিয়াছে।

রুষিয়ার জাতিতত্ত্বের অতি প্রাচীন কথা পাঠকদের তৃপ্তিকর হইবে না। এখন রুষিয়ায় যাহাদের প্রাদুর্ভাব, কেবল তাহাদের প্রসঙ্গে বলিতে পারি, যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, জর্ম্মাণ সীমান্ত হইতে বেরিয়াগ্ বা বেরাঙ্গিয়ান্ (Variags or Varangians) নামক জাতি রুষিয়ায় প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্ব অধিবাসীদিগকে শাসনাধীনে রাখিয়া, আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বেরিয়াগেরা স্লাব্ (Slavs) জাতির একটি শাখা, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রুষ্ (Rus) নামক বংশ বা গোত্রের লোক। ইহারা সর্ব্বপ্রথম যখন ৮৬২ খৃষ্টাব্দে রুরিক্ (Rurik) নামক দলপতির অধীনে রুষিয়ায় প্রবেশ করে; তখন নবগরড্ (Novgarod) কিয়েব্ (Kiev) প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরে পূর্ব্ব অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। রুরিকের রাজত্বের পর দশম শতাব্দীতে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক আইগরের মাতা বীর রমণী ওল্গা (olga) একটি ক্ষুদ্র জৈত্র যাত্রার পর, কৃষ্ণসাগর পথে দেশ লুট করিতে গিয়া, কনস্তান্তিনোপলে খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মে দীক্ষিতা হয়েন;

এবং ধর্ম্মদীক্ষার পরিচয়ে হেলেন্ নাম গ্রহণ করেন। রুষিয়ায় খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মের এই প্রথম সূত্রপাত। প্রথমতঃ দেশের লোকে যাহারা খৃষ্টিয়ান্ হইতে চাহে নাই, বল্গা (Volga) নদী তাহাদের শবরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই ভীষণ শিক্ষার পরে, দেশের লোক দলে দলে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিঙ্গিজ্ খাঁ রুষিয়া রাজ্যটিকে বিধ্বস্ত করিয়া, দেশটিকে আপনার পদতলে আনিয়াছিল। চিঙ্গিজের পৌত্র বাটু খাঁ লুট-তরাজ এবং নরহত্যার একশেষ করিয়া, যে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল; আড়াই শত বৎসর তাহা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাতারের অধীনতা এড়াইয়া, গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। মোঙ্গল জাতির বিরুদ্ধে, গ্রীক্ এবং রোমকদিগের সাহায্যের প্রত্যাশায়, অলেক্জন্দর নেব্স্কি কনস্তান্তিনোপলে ধর্ম্ম দীক্ষা এবং অভিষেক লইয়া, সীজার শব্দের অনুরূপ জার শব্দে ভূষিত হইয়া আসিয়াছিলেন; (১২৪০) কিন্তু বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য তখন টলমল করিতেছিল, আপনাকে না বাঁচাইয়া, পরকে সাহায্য দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাই মুর বা তামারলেনের সময়ের পর, যখন আত্মবিদ্রোহে তাতার রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই রুষিয়া মাথা তুলিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

তৃতীয় আইবান্ বা আইবান্ দি গ্রেট্‌কে, নূতন যুগের বা স্বাধীন রুষিয়ার প্রথম নরপতি বলা যাইতে পারে! পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত; এই রাজার অকাতর পরিশ্রমে, বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষীণবল মোঙ্গল সঙ্ঘ রুষিয়া হইতে তাড়িত হইয়াছিল। রাজা আইবান্ কনস্তান্তিনোপলের এক গ্রীক্ রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং এই নব সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার জন্য রাজ ধ্বজায় দ্বি-শির একটি ঈগল্ পক্ষীর প্রতিরূপ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাজধ্বজা, সেণ্ট্ জর্জ্জ এবং ড্রেগন-মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত ছিল। আইবান্ দি গ্রেট্ ক্ষমতাশালী বড় রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তখনও রুষিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নৃপতিগণের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই, এবং সমগ্র রুষ রাজ্য সমষ্টির জাররূপে তিনি বিখ্যাত হয়েন নাই। তিনি যখন গ্রীক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কনস্তান্তিনোপলে খৃষ্টিয়ান রাজ্য শেষ হইয়া গিয়াছিল; এবং কনস্তান্তিনোপলে ওৎমানের বিজয়ী পুত্র নব তুরস্ক রাজ্যের রাজলক্ষ্মীকে স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রীক্ ও রোমানদিগের সহিত যোগ দিয়া, তুরস্ককে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়েই আইবান্ দি গ্রেট্ পতিত রাজবংশে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুসলমান জাতির প্রতি যে রুষিয়ার ক্রোধ এবং বিদ্বেষ সহজাত, তাহা বুঝিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য কারণেও, যে কনস্তান্তিনোপল্ লাভের জন্য রুষিয়া চিরকালই উৎসুক ছিল, তাহা এই মহাসমরের সময়ে একটু বলিবার প্রয়োজন। ঠিক যে দিন যে মুহূর্ত্তে, রুষ রাজ্যের জন্মদাতা

রুষিক্, পোলাণ্ড্ এবং কার্‌পেথিয়ান্ পর্ব্বত-প্রস্থ হইতে গিয়া রুষিয়ায় রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন; সেই দিনও রুরিক্ কনস্তান্তিনোপলের কথা ভুলেন নাই। নূতন রাজ্য স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই তিনি দস্যুবৃত্তি করিবার সময়ে, কনস্তান্তিনোপলের দিকে লোলুপ্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রুরিক্ ৮৬২ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, আর ৮৬৪ খৃষ্টাব্দেই জলপথে কনস্তান্তিনোপল লুট করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যই কনস্তান্তিনোপলের কাল হইয়াছে।

রুরিক্ বিফল-মনোরথ হইবার পরে, ৯০৬ খৃষ্টাব্দে বালক রাজা আইগরের মাতা বীর নারী ওল্‌গা কৃষ্ণসাগর-কূলে অনেক নরহত্যা, এবং লুণ্ঠনের পর কনস্তান্তিনোপলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কনস্তান্তিনোপল্ লুট করা অসম্ভব দেখিয়া, তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন; এবং হেলেন্ নাম লইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু ফিরিবার সময় লোলুপ দৃষ্টিতে নগরীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন যে, একদিন কি ঐ নগরীর অতুল সম্পদ তাঁহার ভোগে আসিবে না? কনস্তান্তিনোপল্ হইল রুষিযার গুরু পাট; কিন্তু ক্ষুধিত ভল্লুক গুরুর ভাণ্ডার আত্মসাৎ করা পাপ মনে করে নাই। রাণী ওল্‌গা বা হেলেনের পুত্র আইগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্রেই বিপুল আয়োজনে কনস্তান্তিনোপল্ অবরোধ করিয়াছিলেন। আইগর পরাভূত হইবার পর আবার ৯৭২ খৃষ্টাব্দে বেটস্লাব্ (Svataslav) গুরুপাট দখল করিতে ছুটিয়াছিলেন। বেটস্লাবের মৃত্যুর পর প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত রুষিয়া আর কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পরেই ক্রমাগত ২৫০—৩০০ বৎসর রুষিয়া মোঙ্গল বিজেতার পদতলে দিন কাটাইতেছিল। রুষিয়া যখন ইহার পর স্বাধীনতা লাভ করিল (১৪৯২—১৫০৫); তখন কনস্তান্তিনোপলে তুরস্কের রাজত্ব চলিতেছিল। কনস্তান্তিনোপলের লোভে যাহারা গুরুর বক্ষে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহারা যে ঐ নগরীর মুসলমান অধিকার সহিতে পারিবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার রাজা-সম্রাটের প্রথম জাররূপে চতুর্থ আইবান্ যখন উন্নীত হইলেন, তখনও রুষিয়া বড় দুর্ব্বল। ডন্ এবং বলগার পথে খাল কাটিয়া, তুরস্কের সুলতান যখন বাণিজ্যের পথ খুলিলেন; তখনও তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত, রুষিয়ার সীমান্ত কৃষ্ণ সাগরকূল পর্য্যন্ত; তাতার জাতীয়েরা প্রবল ছিল।

রুষিয়ার জার পিটার ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে আজব (Azov) অধিকার করিবার পর স্বদেশের সুব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, তুরস্কের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, রুষিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে ত্রিশ বৎসরের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। সে কালে রুষিয়ার সন্ধি ছলনামাত্র ছিল। সন্ধি-সত্ত্বেও ১৭১০ খৃষ্টাব্দে পিটার মহোদয় তুরস্কের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া, প্রুথ (Pruth) নদীর তীরে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাণী বা কেথেরিণের কৌশলে ও অর্থব্যয়ে কোন রূপে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর, বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ, এবং সন্ধির পর সন্ধি ক্রমাগতই চলিতেছিল। তুরস্ককে পূর্ব্বে ইউরোপের সকল জাতিই ভয় করিত; কিন্তু ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পর চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া ছিল যে, তুরস্ক হীন বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং যখন তখন তাহাকে বিপদগ্রস্ত করা যাইতে পারে। এই জন্যই রুষিয়া ক্রমাগত সকল সন্ধি উপেক্ষা করিয়া, বিনা কারণে তুরস্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে রুষিয়া যখন রণতরী সাজাইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল, তখন রুষিয়ার রণপোতে অনেক ইংরেজ, চালক এবং কর্ম্মচারীরূপে ছিলেন।

নবম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত; রুষ রাজ্যের যে সংক্ষিপ্ত কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে যথার্থ গৌরবের কাহিনী বড় অধিক নাই। প্রথম চারিশত বৎসর ধরিয়া বর্ব্বর রাজ্য সন্নিবেশের পর, তিনশত বৎসরের পরাধীনতার ইতিহাস পাই; এবং প্রথম হইতে এই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি যে, কেবল সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ বলিয়া, রুষিয়া ক্রমাগত কনস্তান্তিনোপল-লাভের জন্য ছটফট করিয়া আসিতেছে। রুষিয়ার জাতীয় জীবনের যেন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য, কনস্তান্তিনোপল লাভ। প্রুথ নদী তীরের কলঙ্ক ক্ষালনের জন্যই ১৭৬৬ এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ-যাত্রা, অথচ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রুষিয়াকে বাধ্য হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে হইয়াছিল। কাঁঠাল যতই উচ্চ গাছে থাকুক; রুষিয়ার জার স্বীয় গুম্ফ তৈলসিক্ত করিতে ছাড়েন নাই। রাজবংশের একটি সন্তানকে কনস্তান্তাইন্ (Constantine) নাম দেওয়া হইয়াছিল; এবং মস্কাউ নগরের নূতন নির্ম্মিত রাজ প্রাসাদের একটি প্রবেশ-দ্বারের নাম রাখা হইয়াছিল—কনস্তান্তিনোপল্ প্রবেশের পথ।

ইহার পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস, রুষিয়ার আধুনিক ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসের সহিত সকলেই সুপরিচিত। জগৎ-বিখ্যাত সুচতুর নেপোলিয়ান সন্ধির ছল করিয়া; রুষিয়ার জারকে ভুলাইয়া, রুষিয়ার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু উহা ঘটিয়া উঠে নাই। রুষিয়ার দুর্ব্বলতা কোথায়, নেপোলিয়ান তাহা জানিতেন; এবং সেই জন্যই তাহাকে তুরস্ক জয়ের লোভ দেখাইয়া, হীনবল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জর্ম্মাণিও অনেকবার ছলনাপূর্ব্বক, তুরস্কের লোভ দেখাইয়া, রুষিয়াকে বাঁদর নাচাইয়াছে। কিন্তু উপস্থিত ইউরোপীয় সমরে, রুষিয়া ন্যায় এবং সাধুতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছে; এবং সেই যুদ্ধে রুষিয়ার বীরদর্প এবং ধীরতা দেখিয়া, এই সর্ব্ব প্রথম আমরা রুষিয়াকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতেছি। জর্ম্মান দস্যুকে পরাভূত করিয়া, প্রকৃতস্থ করাই সমবেত যুক্তদলের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, রুষিয়া

তাহার চিরকালের আকাঙ্খিত ফল লাভ করিবে, কিংবা সন্ধির নিয়মে অন্য কোন ব্যবস্থা হইবে; তাহা এখনও অজ্ঞাত।

উপস্থিত যুদ্ধের সময়ে যাহা নিতান্ত জ্ঞাতব্য, রুষিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাই অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি। রুষিয়া এখন যুদ্ধ করিতেছে খাসা; কাজেই পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—এ দিকে তো বেশ, তবে লেখাপড়ায় কেমন? বিদ্বেষ বুদ্ধিশূন্য সুবুদ্ধি ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, যে রুষিয়ার খুব উচ্চ শ্রেণীর অল্প জনকতক ভদ্রলোক ছাড়া, বাদ বাকী লোকেরা ডাহা মূর্খ বলিলেও ক্ষতি হয় না। বেশী পয়সা-কড়িওয়ালা ভদ্রলোক ছাড়া কেহ লেখা-পড়াই জানে না। রুষিয়ার সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা যেমন বর্ব্বর, আকাঠ মূর্খ—এমন আর পৃথিবীর কুত্রাপি দেখা যায় না। রুষিয়ার সৃষ্টি হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, লেখা-পড়ার এক রকম চর্চ্চাই ছিল না। দেশের কলঙ্ক মোচনের জন্য, পিটার দি গ্রেট ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিত মালী আনাইয়া ফরাসী ও জর্ম্মান সভ্যতার বড় বড় ফলন্ত গাছ, একেবারে রুষিয়ার মাটিতে পুঁতিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহার ফল কি হইয়াছিল বলিতে হইবে না। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে মস্কাউ নগরে বিশ্ববিদ্যালয় বসিয়াছিল, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয় অল্পসংখ্যক ভদ্র লোকের শিক্ষার জন্যই আবদ্ধ আছে। আমরা যাহাকে নিম্ন শ্রেণী বা চাষাভূষা বলি, রুষিয়ায় তাহাদের নাম মোয়াজিক্ (Moujiks); বর্ব্বর মোয়াজিকের সহিত শিক্ষিতের প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

একেই তো চিরকাল দুয়ার বন্ধ করিয়া এবং চোখ বুঁজিয়া, রুষিয়াবাসীরা ইউরোপের সভ্যতা এবং আলোক দেশে প্রবেশ করিতে দেয় নাই; তাহার উপর আবার কেহ লেখা পড়া শিখিয়া, নূতন ধরণের মত প্রচার করিলেই, তাহাকে তাড়িত হইতে হয়। একজন রুষ প্রেমিক ইতিহাস-লেখক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিখিয়াছেন—

The history of Russian thinkers is a long list of martyrs and a register of convicts. সাহিত্য-চর্চ্চার যে ভাল লেখকটি নূতন ধরণের কথা লেখেন, তাঁহাকেই নির্ব্বাসিত হইতে হয় অথবা অন্য দণ্ড ভোগ করিতে হয়। টলষ্টয় প্রভৃতি জনকয়েক লোকের নাম বাদে, রুষিয়ার সুশিক্ষিত লোকেরা হয় জিহুদা, না হয় আরমানিয়ান; না হয় আর কোন রুষিয়াবাসী বিদেশী। বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা এতই কম হইয়াছে, যে রুষিয়াকে সুসভ্য ইউরোপের একটা দেশ বলিয়া পণ্ডিতেরা গণনা করেন না। সে যাহাই হউক কারপেথিয়ান্ প্রস্থে ইহারা লড়িতেছে ভাল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্রোতের ফুল

(২৯)

রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া বিপিন খুড়িমাকে বলিল—খুড়িমা আমাদের সঙ্গে তুমিও কলকাতা চল। আমাদের ঘরকন্না গুছিয়ে আমাদের স্থিতি করে দিয়ে তারপর কাশী যেও।

খুড়িমা রূঢ় স্বরে বলিলেন—সংসারে আর আমি থাকছিনে। কাশী না গিয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।

নবকিশোর বলিল—তবে খুড়িমা ওপারের প্লাটফর্ম্মে চল; কাশীর গাড়ী আসবার সময় হয়েছে।

খুড়িমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিপিন ও মালতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

এই বিদায়ের ক্ষণে খুড়িমার সকল কঠোরতা চোখের জলে ভাসিয়া গেল। তিনি বিপিন ও মালতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন; তারপর বিপিনের হাতে মালতীর হাত রাখিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—আমার মান ইজ্জত, আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে দিয়ে গেলাম বাবা; তুমি তার মর্য্যাদা রেখো।

বিপিন ও মালতীর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। বিপিন বলিল—খুড়িমা, মা ত আমাদের আশীর্ব্বাদ করলেন না; তুমিও আমাদের ছেড়ে যাবার সময় আশীর্ব্বাদ করে যাবে না।

খুড়িমা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করছি আমি যেমন দুঃখ পেয়েছি তোমরা তেমনি সুখী হয়ো।

খুড়িমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে নবকিশোরের সহিত প্রস্থান করিলেন। বিপিন ও মালতী স্তম্ভিত হইয়া খুড়িমার এই অভিসম্পাতের মতন ভীষণ আশীর্ব্বাদের কথা ভাবিতে লাগিল।

(৩০)

বিপিন ও মালতী কলিকাতায় আসিয়া তারকের বাড়ীতে উঠিয়াছে। নবকিশোরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এখানে মালতী পরের অন্তঃপুরে আছে, সেখানে গিয়া বিপিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছে না, নবকিশোরও কাছে নাই। তাহার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা থাকিয়া থাকিয়া কেবলি আঘাত দিতেছে, তাহাকে ব্যাকুল ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, এ অবস্থায় মালতী ও নবকিশোর উভয়েরই সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপিনের কিছুই ভালো লাগিতেছে না। তাহার উপর সমস্তদিন তারকের সহিত তর্ক করিয়া করিয়া তাহার মন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তারক তাহার প্রাণপণ চেষ্টায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে বিধবা-বিবাহ আমাদের দেশের জিনিষ নয়, —ইহা বিলাতী আমদানি। যে দেশে বিধবার চরম আদর্শ পুড়িয়া মরা, যে দেশে বিধবা

মানে পুণ্যশীলা ব্রহ্মচারিণী, সে দেশে এরূপ অনাচার ব্যভিচারেরই নামান্তর।

বিপিন বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া একদিন তাহাকে বলিল—মাপ কোরো ভাই, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করছিনে, তর্কটা তোমার কিশোরের জন্যেই তোলা থাক, তার সঙ্গেই তোমার বনবে ভালো। আমি শুধু বলতে চাই কি, তোমরা শুধু স্ত্রীলোকের বেলাই এতটা কঠিন নজর রাখ কেন? আর পুরুষের বেলাই বা রাখ না কেন? পুরুষের চোদ্দটা বিয়ে করলেও দোষ নেই, আর যত দোষ বিধবার বেলা?

তর্কের সুযোগ পাইয়া তারক পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিল; সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—পুরুষ আর স্ত্রী সমান হল। প্রকৃতিই যে তাদের ভিন্ন ছাঁচে গড়েছে। যে নারী সন্তানের জননী হবে, তার কি একনিষ্ঠতা আবশ্যক নয়।

—মানি। কিন্তু বিধবা যে, তার বিবাহ হলে একনিষ্ঠতা নষ্ট হয় না। বিশেষত যে বিধবা কুমারীরই সমান আপনার সমস্ত প্রাণের অনিবেদিত ভালোবাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে সার্থকতার জন্যে একজন কারুর অপেক্ষা করে আছে, তার বেলাও কি ঐ ব্যবস্থা?

—হাঁ নিশ্চয়। প্রকৃতির নিয়ম কখনো কি স্বতন্ত্র লোকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। নিয়ম নিয়মই। ওরকম ক্ষেত্রে সেই নিয়মের অনুকূল করে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। সে দুর্ব্বল বলে ত আদর্শ খাটো হতে পারে না। আদর্শ চিরকালই উচ্চ; মানুষের মন চিরকালই খাটো;—তাকে সংগ্রাম করে সেই উচ্চ স্থানে পৌঁছতে হবে; এইতেই ত তার গৌরব।

—এ ত প্রকৃতির নিয়ম নয়; এ ত সমাজের শাসন। সকলকেই জোর করে আদর্শে পৌঁছে দিতে গেলে কি ফল হয় তা ত সমাজের মধ্যে আমরা নিত্যই দেখছি। তার ওপর, মনে কর, যারা অসহায় নিরাশ্রয়, যাদের ভালো থাকবার ইচ্ছা আছে কিন্তু সুবিধা নেই, তাদের উপায়?

তারক জোর দিয়া বলিল—নিরাশ্রয় হলেই নিরুপায় হবে তার কি মানে আছে! আমাদের দেশের সন্ন্যাসিনীরা কি একেবারে নিরাশ্রয় কিন্তু কত বড় সাধ্বী! তোমায় আমি দেখাব দেখাব, প্রত্যক্ষ দেখাব, বিধবা সাধ্বী সন্ন্যাসিনী কারে বলে।··· শুনেছ ত শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ স্বামীর নাম! সাক্ষাৎ দেবতা! শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার! নিয়ে যাব তোমাকে আজই দর্শন করাতে। দেখবে দেখবে তিনি নরনারীর কি চমৎকার আদর্শ প্রচার করছেন। তিনি আমার গুরুজী।

এই বলিয়া তারক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার মাংসশূন্য কঙ্কালসার হাত দুটি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। গুরুজীর স্মরণে বিভোর হইয়া তাহার তর্ক থামিয়া গেল।

তারক বলিল—গুরুজীকে দর্শন করতে যাবে?

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় তিনি থাকেন?

—তাঁর আশ্রম এখন খড়দহে। গঙ্গার

ধারেই আশ্রম, নামেও আনন্দাশ্রম কাজেও আনন্দাশ্রম, কি মনোরম পবিত্র সে স্থান। গেলেই ইচ্ছে করে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে গুরুজীর চরণতলে পড়ে থাকি।

বিপিন হাসিয়া বলিল—এ রকম মনের অবস্থা যখন হয় তখন ত সে রকম জায়গায় যাওয়া ঠিক উচিত হবে না।

তারক গম্ভীরভাবে বলিল—সংসারে মায়া কি অত শিগগির কাটে হে ভায়া? মুক্তির পথ অত সহজ নয়। শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপা না হলে তাঁর চরণে আশ্রয় মেলে না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—যদি তাঁর এই অধমের প্রতি বিশেষ কৃপাই হয়ে পড়ে, তখন?

—সে সৌভাগ্য তোমার হবে না, ভয় নেই!

—ঠিক বলছ ত হবে না! হলে কিন্তু তুমি তার জন্যে দায়ী!

—হাঁ হাঁ, এখন চল।—বলিয়া তারক বিপিনের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

বিপিন হাসিতে হাসিতে প্রস্তুত হইয়া তারকের গুরুজীকে দেখিতে যাত্রা করিল। তারকের তর্ক খোঁচা দিয়া দিয়া বিপিনের আবাল্যের সমস্ত সংস্কারকে উস্কাইয়া তুলিয়া তাহাকে বড় দ্বিধার মধ্যে ফেলিতেছিল। সে নিজের বিক্ষিপ্ত মনটাকে নূতন দৃশ্য দেখিয়া গুছাইয়া লইবার জন্য সানন্দেই তারকের আহ্বান স্বীকার করিল।

আহিরীটোলা ঘাট হইতে একখানি পান্সি ভাড়া করিয়া তারক ও বিপিন খড়দহে আনন্দাশ্রমের ঘাটে আসিয়া নামিল। প্রশস্ত ঘাটটি আগাগোড়া মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো। জলের তল পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণী নামিয়া গিয়াছে। বরফের মতো শুভ্র সুন্দর ঘাটের শিলায় গঙ্গার জল ছলছল তরতর করিয়া খেলা করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়াই বিপিন দেখিল একটি চমৎকার সুরম্য সুসজ্জিত পরিষ্কার পরিপাটী প্রকাণ্ড উদ্যান। কোথাও কদম্বকুঞ্জ, কোথাও বকুলবীথি, কোথাও কুরবকের কেয়ারি; মাঝে মাঝে গোলাপ বেল মল্লিকা মালতী সুরভিপুষ্পের ক্ষেত; কেয়াফুলের বেড়া; একপ্রান্তে একটি লতাবিতান, তাহার প্রবেশপথে একটি মার্ব্বেলের খিলান, তাহার মাথায় সোনালি পাথর বসাইয়া লেখা আছে—কেলিকুঞ্জ। মাঝে মাঝে শষ্পক্ষেত্র চোখের উপর মাধুর্য্যের শ্যাম-অঞ্জন বুলাইয়া দিতেছে। পায়ে ঝাঁঝ আর গলায় ঘুঙুর পরিয়া দুটি হরিণ চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; তালতমাল কুঞ্জের তলায় তলায় গুটিকয়েক ময়ূর চরিয়া বেড়াইতেছে; শান্ত নীরব আশ্রম-বাটিকাটি কত শত পক্ষীর আনন্দ-সঙ্গীতে থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কৃত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। স্থানে স্থানে শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে ফোয়ারার উচ্ছ্বসিত ধারা হীরার শতনরী হারের মতো উৎসারিত হইতেছে। এত বড় বাগানের কোথাও অনাবশ্যক ঘাস জন্মে নাই, কোথাও একটি শুষ্কপত্র পড়িয়া নাই, যেন একখানি নিরুপম চিত্রপট। এই বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যস্থলে একখানি ছবির মতো বাড়ী, আগাগোড়া আইভি-

লতায় ঢাকা; এই বাড়ীটিও প্রকাণ্ড। বাড়ীর তোরণে লেখা আছে গোলোকধাম। বাড়ীর প্রবেশপথেই একটি ঘর আছে, সেইখানে জুতা রাখিয়া যাইতে হয়। জুতা রাখার ঘরের পাশেই একটি জলের চৌবাচ্চা, একটি পাথরের মাছের মুখবিবর দিয়া জল নির্গত হইয়া পড়ে; তাহার উপরে সোনার পাথরে লেখা—বৈতরণী। বাড়ীতে আরো অনেক চৌবাচ্চা আছে; তাহা হইতে জল বাহির হইবার নালি কোনোটি বা গোমুখী, কোনোটি বা মকরমুখী, কোনোটি বা শতধারা; কোনোটির নাম ভোগবতী, কোনোটির নাম মন্দাকিনী, কোনোটির নাম অলকনন্দা।

বিপিন ও তারক জুতা খুলিয়া, বৈতরণীতে পা ধুইয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। অট্টালিকার মেঝে পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মরে মণ্ডিত, তাহাতে মধ্যে মধ্যে শতদল পদ্মের আকার হইয়াছে; স্তম্ভগুলি বিচিত্র বর্ণের মার্বেলের; কড়িকাঠ হইতে বিচিত্র সুন্দর আলোর ঝাড়, লণ্ঠন, বেল, ঝুলিতেছে। কক্ষে কক্ষে গৈরিকধারী শিষ্যমণ্ডলী ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে রত। কেহ পীড়িতের সেবা করিতেছে। কেহ কেহ বা ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছে, কিন্তু তাহা উদ্ধতভাবে তর্ক করিয়া নয়, শান্তভাবে ধীরস্বরে।

বিপিন ও তারক মর্ম্মর সোপান বাহিয়া দ্বিতলে উঠিল। দ্বিতলের একাংশে ঠাকুরঘর, ঠাকুরঘরটি গঙ্গার দিকে। বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার উন্মুক্ত বক্ষ চমৎকার দেখা যায়। ঠাকুরঘরের সম্মুখে লেখা আছে—বৈকুণ্ঠ! ভিতরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, নাম রাধাকান্ত। কয়েকজন শিষ্যা ঠাকুরের পূজা আরতি ভোগের আয়োজন করিতেছে, তাহারাও নীরব, অথচ প্রসন্ন। তারক বিগ্রহকে প্রণাম করিল; বিপিনও দেখাদেখি করিল, সে এই শান্ত নীরব সুন্দর আশ্রমে আপনার বিরোধকে বড় করিয়া রাখিতে পারিল না।

সেখান হইতে তারক বিপিনকে গুরুসন্দর্শনে লইয়া চলিল। একে গুরু তায় সন্ন্যাসী, তাঁহার গৃহে সকলেরই অবাধ গতি; এ জন্য এ গৃহের কোনো দ্বারে অর্গল পর্য্যন্ত নাই। বিপিন গিয়া দেখিল একটি প্রশস্ত কক্ষ; বহুমূল্য পুরু নরম গালিচায় একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঢাকা। ছাদ হইতে বিবিধবর্ণের সুন্দর সুন্দর বেলোয়ারি ঝাড় প্রলম্বিত; দেয়ালে বিচিত্র পুষ্পপত্র অঙ্কিত তাহার মাঝে মাঝে দেশী বিদেশী পুরাণের চিত্র, গোপালজননী যশোদার পাশে যিশুজননী মেরীর ছবি, মহাভারত রামায়ণ পুরাণের দৃশ্যের পাশে পাশে য়ুরোপীয় শিল্পগুরুগণের অঙ্কিত চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ছবির উপরে দেয়ালের গায়ে বিচিত্র ছাঁদের লেখায় ইংরেজি, সংস্কৃত, ফার্সী বচন চিত্রিত। ঘরের মধ্যস্থলে আর-একখানি ছোট কার্পেটের উপর বসিয়া আছেন গুরুজী; আর তাঁহার সম্মুখে কতিপয় আগন্তুক।

ঘরের একপ্রান্তে একখানি প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের সুন্দর খাট; তাহার শয্যা, মশারি সমস্তই রেশমী; দরজায় দরজায় চওড়া হাশিয়াদার শালের পর্দ্দা; পাশের ঘরে একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী বিভিন্ন ভাষার

পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথির সুশৃঙ্খল সন্নিবেশে সম্পদশালী।

আগন্তুকদের মধ্যে কেহ শোকাতুর, কেহ জগতের কৃতঘ্ন আচরণে আহত, কেহ দরিদ্র,—তাহারা সান্ত্বনার সন্ধানে এখানে আসিয়াছে। কেহ বা আত্মা, ইহকাল পরকাল, পুনর্জ্জন্ম প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের মীমাংসা করিতে আসিয়াছে। গুরুজী হাসিয়া হাসিয়া সকলের সহিতই শান্ত ধীর ভাবে আলোচনা করিতেছেন। কত লোক কত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছে তবু তাঁহার বিরক্তি নাই। তাঁহার বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রসন্ন, হাস্যদীপ্ত।

গুরুজীর বয়স চল্লিশের নীচেই। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুকোমল সুশ্রী শান্ত মূর্ত্তি, চুল দাড়ি গোঁফ কামানো, মুখভাবে মেয়েলি ভাবের উজ্জ্বল লাবণ্য। গায়ে একটি রেশমী গেরুয়া রঙের আলখেল্লা, মাথায় একটি রেশমী গেরুয়া পাগড়ী। গুরুজীর চোখ দুটি চমৎকার সুন্দর, বুদ্ধিতে ঝলমল করিতেছে, তাঁহার অন্তরের দর্পণের মতো প্রশান্ত নির্ম্মল; মুখখানি সংযম-নিষ্ঠার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, দৃঢ়তা-মাখানো অথচ সদাই হাস্যমধুর। এই অপরূপ পুরুষকে দেখিয়া বিপিন মনে মনে বলিল—হাঁ মানুষ বটে! গুরু হবার উপযুক্ত! শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বিপিন প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিল।

এত সব বিলাসসজ্জা বিপিনের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উদ্বোধিত করিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল এই অদ্ভুত পুরুষের চারিদিকে এইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পদের সমাবেশ না হইলে যেন ঠিক মানাইত না।

গুরুজী স্মিত হাস্যে মাথা নত করিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং হাসিমুখে তারককে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিহে সংসারানন্দ! ইনি?

তারক কৃতাঞ্জলিপুটে পরম বিনয়ের সঙ্গে বলিল—উনি আমার একটি বন্ধু। নাম বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী। উনি এম-এ পাশ। আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

গুরুজী হাসিয়া বলিলেন—আমি এম-এ-ওয়ালাদের বড় ডরাই, তাঁরা শুধু তর্ক করতেই আসেন।... বিপিন বাবু, আপনাকে আগেই বলে রাখি, এঁরা সবাই আপনাকে বলবেন যে আমি একটা মস্ত রকমের অবতার, বরাহ কূর্ম্ম দলের ঢের ঊর্দ্ধে, চাইকি আমি স্বয়ং ভগবানই। তবে আমি যে সে কথা অস্বীকার করি সে হচ্ছে আমার লীলা!... এসব কথা আপনি কিছু বিশ্বাস করবেন না; আমি আপনাদের মতনই একজন অতি সাধারণ মানুষ, পাপে পুণ্যে লালসা বৈরাগ্যে জড়ানো অতি সাধারণ।... তবে প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তা-প্রণালীর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে; আমার যেটা সত্য ও মঙ্গল বলে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, তাই আমি লোককে বলি, কেউ বা সে মত গ্রহণ করে, কেউ বা করে না! মহাপ্রভু ঈশা বলেছেন—You shall know the truth and the truth shall make you free. এ সত্য কি রকম সত্য? সে কথাও মহাপ্রভু ঈশা

স্পষ্ট করেই বলে গেছেন—Then shall ye know, that I do nothing of myself; but as my father hath taught me, I speak these things. And He that sent me is with me; the Father hath not left me alone. এই বোধের যে ভরপূর আনন্দ, যে আনন্দে আমার অন্তর ফুলে ফুলে ওঠে তা আমি নিজে সম্ভোগ করতে না পেরে আমার ভাই ভগিনীদের বণ্টন করে দি। এই অপার আনন্দ প্রচার করা ভিন্ন আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি সংসারত্যাগী নই, আমি ঘোর কৃপণ সংসারী! এই বুঝে তর্ক করবেন।

গুরুজীর চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। বিপিন জন্মে তেমন মোহন চরিত্রদ্যোতক মুখভাব দেখে নাই; মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন তাঁহার চিত্তের গভীর জ্ঞান, মনের সরলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা চরিত্রের দৃঢ়তা ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল। বিপিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া বলিল—প্রভু, আমি মূর্খ! কতকগুলো কেতাব পড়ার ছাপ বিশ্ববিদ্যালয় আমার নামের গায়ে মেরে দিয়েছে মাত্র। জ্ঞান আমার কিছুমাত্র হয়নি। আমি তর্ক করতে আসিনি, শিষ্যের মতো জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছি। আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দিন, মানুষের কর্ত্তব্য কি, ধর্ম্ম কি, কি ব্রত পালন করলে আমি প্রকৃত মানুষ হতে পারব।... আর দয়া করে আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না।

গুরুজী হাসিয়া হাসিয়া মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ভাষার সে কি প্রচণ্ড শক্তি, কি ওজস্বী প্রকাশ; বলিবার সে কি অপূর্ব্ব মনোহর ভঙ্গি; স্বরের কি গম্ভীর মাধুর্য্য; জটিল কথাকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া সরল করিবার সে কি চমৎকার নিপুণতা! কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা সঙ্গীতের মতো সুমধুর একটি তাললয়ছন্দে গাঁথা সুরে অনুপ্রাণিত, হাসির মতো স্বচ্ছ ও মনোহর। বিপিন মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, আবিষ্টের মতো শুনিতেছিল। গুরু কি বলিতেছেন সে ভালো করিয়া শুনিতে পারিতেছিল না, বুঝিতে পারিতেছিল না, শুনিতেছিল শুধু তাঁহার বাক্যের প্রবল প্রবাহের ঝঙ্কৃত সঙ্গীত, দেখিতেছিল শুধু তাঁহার অপরূপ সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল মূর্ত্তি!

আরতি আরম্ভের শঙ্খধ্বনি হইল। গুরু নীরব হইলেন। সকলকে লইয়া তিনি রাধাকান্তের আরতি দেখিতে গেলেন। বিপিনের চোখের সামনে আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলো যেন গুরুর চোখের আলোর কাছে ম্লান বোধ হইতে লাগিল। আলোকে গন্ধে আনন্দে আরতি হইয়া গেল। স্বামীজী তখন যুক্ত করে ঊর্দ্ধনেত্রে পরম পুলকিত ভাবে গান ধরিলেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

বিপিন তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল সে স্বর কি তীক্ষ্ণ, কি মধুর! ছন্দে ছন্দে

পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাবের হিল্লোলে সুর তরঙ্গিত হইতেছিল—সে সুর কোথাও আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বে পুলকিত, কোথাও বেদনায় আপ্লুত, কোথাও মিনতিতে একেবারে বিগলিত; সঙ্গীতরসধারা মন্দির ছাপাইয়া অট্টালিকা ভেদ করিয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, গঙ্গা সেই সন্ধ্যারতির বন্দনা-গানে তাল দিয়া তেমনি হিল্লোলে গলিয়া পড়িয়া যুগল-সম্মিলনে ছুটিতেছিল।

স্বামীজী গান সমাপ্ত করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বিপিনের মনে হইতেছিল এ প্রণাম যেন যথেষ্ট প্রণাম হইল না, সমস্ত হৃদয় লুটাইয়া দিলে যেন ঠিক হয়। তার পর গুরুজী নিজের হাতে সকলকে প্রসাদ পরিবেষণ করিলেন, বিপিন ভক্তিতে একেবারে গলিয়া অশ্রুজলে পরিণত হইবার মতন হইতে লাগিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতন তাহাকে তারক একরকম টানিয়া আনিয়া বাড়ীতে ফেলিল। সে বাড়ীতে আসিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল গুরুজী কি বলিয়াছেন। স্বপ্নভঙ্গের পর কিছুই যেমন স্পষ্ট মনে হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা আবছায়া রকমে অনুভবেই থাকে, স্মৃতিতে ফুটিয়া ওঠে না, চেষ্টা করিয়া তাহা স্মরণ করিলেও সঞ্চরমান চিত্রের মতো পশ্চাতের দৃশ্য যখন উপস্থিত হয় পূর্ব্বের দৃশ্য তখন অন্তর্হিত, বিপিনেরও তেমনি কিছুই বেশ একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলায় স্মরণ হইতেছিল না; টুকরা টুকরা তালি জুড়িয়া সে এইটুকু বুঝিল যে স্বামীজী বলিয়াছেন—বৈরাগ্যমূলক প্রেমই ধর্ম্ম। মানুষ নিজেকে কোনো বিশেষ দেশকালের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিবে না, সে আপনাকে বিশ্ববাসী মনে করিবে, অতীত অনাগত সকল কালের সকল লোকের সহিত প্রেমযোগ স্থাপন করিতে হইবে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মমতা নষ্ট হইয়া শান্ত বৈরাগ্য হৃদয় পরিপূর্ণ করিবে। মানুষে মানুষে ভেদ নাই,—সকল জাতি সকল বর্ণ সেই এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষেরই বিচিত্র প্রকাশ। অহঙ্কার এই মোহ উৎপাদন করে, প্রবৃত্তিই এই ভেদ সংঘটিত করায়; নারী স্বর্গীয় জিনিষ, ইহাদিগকে পূজা করিতে হয়, ভোগে কলুষিত করিতে নাই। ইহারা দেবতা; যিনি সৌন্দর্য্যের আদিপ্রস্রবণ পরমসুন্দর, নারী সেই সৌন্দর্য্যসূর্য্যের সমুজ্জ্বল রশ্মি; আমরা আমাদের হৃদয় পরকলার ভিতর দিয়া দেখি বলিয়া নারীকে লালসায় রঙিন করিয়া দেখি, কিন্তু বস্তুত নারী শুভ্র উজ্জ্বল পবিত্র। প্রেমের পাত্র স্ত্রীপুরুষ সকলেই সমান; স্ত্রীপুরুষ ভেদে যদি ভাবের তারতম্য ঘটে তবে সেখানে নিজের চিত্ত নির্ম্মল নাই বুঝিতে হইবে। আসল প্রেম জীবাত্মায় পরমাত্মায়! জীবাত্মা রাধা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধাকান্ত। হৃদ্‌কমল-মঞ্চে ইহাদের নিত্য নিরন্তর মিলনোৎসব চলিতেছে বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ভঙ্গিতে; প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ সুন্দর দিনে সেই আনন্দের আভাস পাওয়া যায়। যাঁহারা আত্মক্রীড় আত্মরতি তাঁহারা বুঝিতে পারেন ঝুলন রাস দোল বাহিরের কোনো সাময়িক উৎসব নয়, অন্তরে অহরহ নিত্য

নিরন্তর জীবাত্মা পরমাত্মার মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে! জীবাত্মা পরমাত্মার এই যে প্রেমযোগ তাহা মানুষ বিশ্ববোধ ও আত্মবোধের ভিতর দিয়াই লাভ করে।

বিপিন ভাবিতে লাগিল, তবে কি এই-সব সংসার-মায়া মিথ্যা! মালতী আমার কেহ নহে, আমরা বিশ্বের সম্পত্তি, বিশ্ব আমাদের বিরহে ক্রন্দন করিতেছে! নবকিশোর ফিরিবার আগে স্বামীজীকে একবার সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিতে হইবে, দেখি তিনি কি বলেন। নবকিশোরটা গায়ের জোরে সমস্ত মানাইতে চায়, স্বামীজী কি শান্ত যুক্তিতে সব বুঝাইয়া দেন! নবকিশোরকে কিন্তু এখন শীঘ্র স্বামীজীর কথা বলা হইবে না, তাহা হইলে সে তর্কের ধূলা উড়াইয়া কোনো পথই ভালো করিয়া দেখিতে দিবে না।

চারিদিকের আঘাত সংঘাতে জমিদারের ছেলে বিপিন যখন নিতান্ত মুহ্যমান বোধ করিতেছিল; কাঙারু শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, চিরকাল পরের উপর নির্ভর করাই যাহার অভ্যাস, পরের সাহায্য ব্যতীত যাহার আহার বিহার আরাম বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না, তাহাকে যখন নিজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে দিশাহারা হইতে হইতে-ছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার শেষ দুটি অবলম্বন নবকিশোর ও মালতীর সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপিন নিজেকে নিতান্তই অসহায় ও একাকী বোধ করিতেছিল। এমন অবস্থায় প্রেমানন্দ স্বামীর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাহার মনের উপর পড়াতে বিপিন যেন একটা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। সেই দিন হইতে সে প্রায়ই স্বামীজীর আশ্রমে যাইতে লাগিল; স্বামীজী আজ বিডন গার্ডেনে, কাল টাউন হলে, পরশু কোনো থিয়েটার-ঘরে বক্তৃতা দিয়া ফিরেন, আর শত সহস্র মুগ্ধ দৃষ্টির ঈর্ষার পাত্র হইয়া বিপিন ছায়ার মতো স্বামীজীর পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরে।

একদিন স্বামীজীকে নির্জ্জনে পাইয়া বিপিন নিজের সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে নিবেদন করিল। স্বামীজী চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সমস্ত শুনিলেন। কিছুক্ষণ পরে 'রাধাকান্ত!' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিলেন। বিপিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বৎস, তোমায় ত আমি বলেছি প্রেমই ধর্ম্ম! তুমি মহা ভাগ্যবান তাই রাধাকান্ত তোমার হৃদয়ে এমন প্রবল প্রেম দিয়েছেন। তুমি সেই প্রেমকে একধারায় ভোগের মরুভূমিতে কেন বইয়ে দেবে, তাতে তোমারই বা লাভ কি, জগতেরই বা লাভ কি? সেই প্রেমকে তোমার হৃদয়হিমাচল থেকে জাহ্নবী-ধারার মতো সহস্রধারায় বইয়ে দাও, যাক সে বিশ্বমানবের মহাসাগরে মিশে, সে সার্থক হোক, সে ধন্য করুক! আমি যতদূর দেখছি মালতী সাক্ষাৎ রাধারাণীর বিকাশ, সে সকল কলঙ্ক মাথায় করে তোমায় যে বরণ করেছে, তার সেই অপূর্ব্ব অমল প্রেম সে কি শুধু তোমার নিজের ভোগে কলুষিত করবার জন্যে! না না, তা

কখনো নয়। তোমরা আধ্যাত্মিক যোগে ঘনিষ্ঠ হবে, বিশ্ব তোমাদের প্রেমের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে। এই তোমাদের পথ। আত্মা শুধু যে কেবলমাত্র আছে তা ত নয়—আত্মা জ্ঞান প্রেম ও আনন্দের খনি। পৃথিবী কত যুগযুগান্তর তপস্যা করে আত্মাকে পেয়েছে। আত্মা পৃথিবীর অন্ধকারের আলো, মরুভূমির ওয়েসিস! আত্মাকে পেয়ে পৃথিবীর শ্রী ফিরে গেছে। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন ভোগ একদিকে আর আত্মা একদিকে,—আত্মার তুলনায় ভোগ অকিঞ্চিৎকর ছাই ভস্ম! বেদান্তকার বলেন যে, আত্মা, অস্তি ভাতি এবং প্রিয়—এই তিন সাধনের ধন একাধারে। অস্তি কিনা আত্মার স্থিরপ্রতিষ্ঠা, ভাতি কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয় কিনা আত্মার প্রেমামৃত। তাই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্ব আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে জানো, তারপর আত্মাকে প্রেম কর, দেহকে নয়, নিজের ভোগের লালসাকে নয়। পুষ্করিণীতে পাঁকশ্যাওলা জমে' যেমন তার জল অব্যবহার্য্য হয়, তেমনি প্রবৃত্তির প্রলেপ লেগে আত্মার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়; নষ্ট পুষ্করিণীকে ঝালিয়ে যেমন আবার কাকচক্ষু জল পাওয়া যায়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযমের দ্বারা আত্মার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক, তা নইলে আত্মা সাধকের ভোগে আসতে পারে না।—আত্মরতিই রতির চরম বলেই জেনো। ভাষার মধ্যে যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার কাব্য সাহিত্য সবই অন্তর্ভূত, তেমনি সমগ্র আত্মাতে জ্ঞান বীর্য্য প্রেম আনন্দ সবই অন্তর্ভূত আছে; ভাষা আয়ত্ত করতে হলে যেমন প্রথমে ব্যাকরণজ্ঞানকে আয়ত্ত করা চাই, ব্যাকরণ শুষ্ক নীরস বলে ছেড়ে দিয়ে একেবারেই কাব্য ধরলে সকল দিকই পণ্ড হয়ে যায়, কাব্যের রস কিছুতেই আয়ত্ত হয় না, তেমনি সাধনের ভিতর দিয়ে প্রকৃত আত্মার প্রেম আয়ত্ত না করলে প্রেম ব্যর্থ হয়ে পড়ে।...তুমি যদি মালতীকে প্রকৃত ভালোবাসতে চাও তার আত্মার সঙ্গে তোমার আত্মার যোগ স্থাপন কর; আপনাদের ভোগলালসাকে খর্ব্ব কর।... তুমি ভাগ্যবান, তুমি ভাগ্যবান। এমন সর্ব্বস্ব-খোয়ানো প্রেম রাধাকান্তকে নিবেদন করে দিয়ে তোমরা ধন্য হও!

গুরুজী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বিপিন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজীর তত্ত্বকথা তাহার চোখের সামনে আকাশ পাতাল উলটপালট করিয়া দিয়া বনবন করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

গুরুজী চোখ মেলিয়া বলিলেন—বৎস, তুমি অবসর-মতো কথাগুলি ভেবে দেখো।

বিপিন স্বামীজীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া নীরবে প্রস্থান করিল। বিপিনের মনের উপর স্বামীজীর কথাগুলি কাটিয়া কাটিয়া বসিতে লাগিল—স্বামীজী যে মালতীকে ত্যাগ করিতে বলিলেন না, আরো গভীর ভাবে প্রকৃত ভাবে ভালো বাসিবার পথনির্দ্দেশ করিলেন, এই কথা-টাতেই তাহাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইতে লাগিল বাস্তবিকই ত দেশবিদেশের ইতিহাসে কাব্যে এই কথাই দেখা যায়—সৌন্দর্য্য ও প্রেম

যেখানেই সমগ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া বাসনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘুরিয়া মরিয়াছে, যেখানে মঙ্গল কর্ম্মে বৃহৎকর্ম্মে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে নাই, সেখানেই ত অবশেষে নিদারুণ দুঃখের প্রলয়াঘাতে সেই ভীষণ প্রেমের নাগপাশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নিজের ভোগের সুর বিশ্বসঙ্গীতের সুরকে অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়া নিজেকেই যদি একান্ত প্রবল করিয়া তোলে তবে সেই ভোগ ত মৃত্যুরই নামান্তর! বিপিনের মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই যদি সে মালতীকে ভালোবাসিয়া থাকে তবে তাহাকে পবিত্র রাখিয়া সুন্দর রাখিয়াই ভালোবাসিতে হইবে, নিজেদের বাসনার পঙ্কে আত্মাকে আচ্ছন্ন বিমলিন করিয়া নহে।...কিন্তু মালতী বড় সুন্দর! এই 'অষ্টাদশ বসন্তের একগাছি মালা' কি একদিনের জন্যও বুকে তুলিয়া লওয়া অন্যায় হইবে? 'যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন!' তাহার কি ক্ষুধা মিটিবে না? জীবনসূত্রে যে জট বাঁধিয়া যাইতেছে, তাহা কি খুলিবে না?...না না, ও বিষয়ে আর ভাবনা বৃথা—

'একি দুরাশার স্বপ্ন হায়গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে!'

বিপিন পথ চলিতে চলিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিতে লাগিল—গুরুদেব, গুরুদেব, অজ্ঞানতিমিরান্ধকে পথ দেখাও, পথ দেখাও।

তারপর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ক্রমশঃ

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

নবাব

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মেঘ-সঞ্চার

মশার্দের সহিত পথে সেদিন সে কাণ্ডটা ঘটিয়া যাইবার প্রায় সাত দিন পরে নবাব ডিউকের প্রাসাদে চলিলেন। সেদিন বৃহস্পতিবার। এ কয়দিন ইচ্ছা থাকিলেও নবাব ডিউকের দ্বারে হাজিরা দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন। সে ঘটনা পল্লবিত হইয়া ডিউকের কানে নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছে। ডিউক অত করিয়া নিষেধ করিয়া দিবার পরও নবাবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা ঠিক হয় নাই। ডিউক ইহাতে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষের মাত্রাটা টাট্‌কা থাকিতেই ডিউকের সঙ্গে দেখা করিতে নবাবের সাহস হইল না। অথচ না দেখা করিলেও নয়! লি-মার্কার তাহার রিপোর্ট লিখিয়া শেষ করিয়াছে, লোকের মুখে এ সংবাদটাও রাষ্ট্র হইয়াছে। সে রিপোর্টে যুক্তি যত না থাকুক, নবাবের বিরুদ্ধে তীব্র অপবাদের ভাষা যে প্রচুর সঞ্চিত আছে, এ খপরটুকুও নবাবের কানে তাঁহার দুই চারিজন

তথাকথিত হিতৈষী বন্ধু অনুগ্রহপূর্ব্বক তুলিয়া যাইতে ভুলেন নাই! এখন নবাবের পক্ষে ডেপুটি নির্ব্বাচিত হওয়ার আশা খুবই কম—তবে ডিউক মোরা তাঁহার সহায়! কাজেই নবাব হাল ছাড়িতে পারেন নাই। আজ তাই সব দ্বিধা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নবাব ডিউকের প্রাসাদে চলিয়া ছিলেন।

প্রাসাদের অদূরে পথে অসংখ্য গাড়ী! গাড়ীর সারি প্রাসাদ পর্য্যন্ত লাইন-বন্দী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সে গাড়ীর ভিড়ে নবাবের গাড়ীর গতি মন্থর হইয়া পড়িল; নবাব বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। তাই ত! এ যে অসংখ্য গাড়ী! ব্যাপার কি! কোন মজলিসের আয়োজন হইয়াছে না কি! কৈ, নবাব ত কোন সংবাদ পান নাই! তবে কি তাঁহাকে—? না, তাহা হইলে আজ আর যাওয়াটা ঠিক হয় না। গাড়ী ফিরানো যাক্! একটা উদ্বেগে নবাবের বুক কাঁপিয়া উঠিল। নিজের উপর রাগও ধরিল। সেদিন মশার্দকে উপেক্ষা করিলে কি ক্ষতি ছিল! তাহাকে চাব্‌কাইয়াও ত বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। ক্ষতি যেটুকু করিবার তাহা ত সে করিয়াছেই। লি-মার্কারের কলমের একটি খোঁচায় নবাবের সমস্ত জীবনটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে! তবু ডিউক তাঁহার সহায় ছিলেন! মশার্দকে সেদিন চাবকাইবার ফলে সেই ডিউক আজ তাঁহার উপর বিরূপ হইলেন—এতখানি বিরূপ যে, মজলিসে তাঁহাকে একটা ডাক দিতেও ভুলিয়া গেলেন! অনুশোচনায় নবাবের সমস্ত প্রাণটা হায়-হায় করিতে লাগিল।

তিনি কোচম্যানকে গাড়ী ফিরাইতে বলিবেন, এমন সময় দুইজন পথিকের কথা তাঁহার কানে গেল। দুইজনেরই মুখের ভাব বিশেষ উদ্বিগ্ন। একজন কহিল, "এ যাত্রা তাহলে রক্ষা পাওয়া দায়!" অপর জন কহিল, "তা আর বলতে! কিন্তু হঠাৎ এমনটা হবে, কে ভেবেছিল!"

প্রথম পথিক কহিল, "দোষে-গুণে ডিউক একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, কিন্তু।"

এ কি কথা! কাহার অসুখ—এমন অবস্থা! ডিউকের না কি! পথিক দুইজন ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, নবাবের গাড়ীও ডিউকের ফটকের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। নবাব মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, ফটক হইতে বাহির হইয়া ডিউকেরই এক ভৃত্য শশব্যস্তে ছুটিয়াছে। নবাব তাহাকে ডাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "ডিউকের অসুখ না কি!"

ভৃত্যটা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "বাঁচেন কি না সন্দেহ! ডাক্তারে বাড়ী অমনি গিস্-গিস্ করছে। কত ডাক্তারই আসছে-যাচ্ছে! দু-একজন স্পষ্ট জবাবও দিয়ে গেছে।"

সমস্ত প্রাসাদটা যদি সেই মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া নবাবের মাথায় পড়িত, তাহার আঘাতও বুঝি তাঁহার এত তীব্র ঠেকিত না। নবাবের চোখের সম্মুখে কে যেন প্রকাণ্ড একখানা ঘসা কাচের পরদা তুলিয়া ধরিল—সমস্ত বাহ্যদৃশ্য চকিতে মিলাইয়া গেল।

বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। নবাব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। পা তাঁহার টলিতেছিল —মাথার মধ্যে যেন একখানা চাকা ঘুরিতেছিল। কোনমতে পা-দুইখানাকে টানিয়া প্রাসাদের হলে আসিয়া হতাশভাবে নবাব একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছে! রুমালে ঘাম মুছিয়া নবাব ভাবিলেন, "তাহলে আমারও সব আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল! সব শেষ!"

মৃত্যু আজ ডিউকের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত অতর্কিতভাবেই সে আসিয়া দেখা দিয়াছে। রবিবার ডিউক যখন বেড়াইয়া ফিরিলেন, তখন তাঁহার মাথাটা অল্প ভার বোধ হইতেছিল। ক্রমে নাড়ী-গুলাও অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল। সমস্ত শরীরের মধ্যে কে যেন তপ্ত লৌহ ফুটাইয়া দিতেছে, এমনই বেদনা! রাত্রে নিদ্রা নাই—বিছানায় পড়িয়া সারা রাত্রি ডিউক ছটফট করিলেন। ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে তখনই খপর পাঠানো হইল। ডাক্তার আসিয়া ঘুমের ঔষধ দিলেন; তাহার ফলে শেষ-রাত্রিটা ডিউকের কেমন ঘোর আসিল। পরদিন সকালে আবার রুদ্ধ যন্ত্রণা দ্বিগুণ আক্রোশে ফুঁসিয়া উঠিল। বরফ আনো—বরফ! সারাদিন মাথায় গায়ে বরফ চাপাইয়া সে জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টায় ভৃত্যের দল হিম্‌সিম্ খাইয়া গেল। তবুও সে জ্বালা জুড়াইতে জানে না। ডিউকের প্রাণখানা যেন তাতিয়া গলিয়া বাহির হইবে। জেঙ্কিন্স হর-ঘড়ি ঔষধ বদলাইতে লাগিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না।

বাহিরে সংবাদটা তত রাষ্ট্র হয় নাই। জেঙ্কিন্স ইচ্ছা করিয়াই ব্যাপারটাকে লঘু বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। ডিউকের বন্ধুর দল জেঙ্কিন্সের সে আশ্বাসে একরূপ স্থির হইয়াই বসিয়া ছিল। পরে তৃতীয় দিন সকালে যখন ডিউকের ঘুম ভাঙ্গিল, চোখ চাহিয়া ডিউক দেখিলেন, মাথার বালিশে রক্তের একটা রেখা সুতার মতই জমিয়া রহিয়াছে! দাড়িতে ও ঠোঁটে শুকানো রক্ত! তিনি চমকিয়া উঠিলেন। মানব-জীবনের এই চরমতম দুর্ভাগ্য, রোগের এই বীভৎসতা লক্ষ্য করিয়া ডিউকের হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মপার্ভ জেঙ্কিন্সের পিছনে দাঁড়াইয়া এই রক্ত লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল; ডিউকের মুখের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহার অলক্ষ্যে জেঙ্কিন্সকে বাহিরে আসিবার জন্য সে ইঙ্গিত করিল।

জেঙ্কিন্স বাহিরে আসিলে মপার্ভ কহিল, "ডিউকের অসুখটা ত এবার বড় গুরুতর দেখছি, ডাক্তার!"

জেঙ্কিন্স মৃদুস্বরেই কহিল, "আমারও আজ ভয় হচ্ছে।"

"এ রোগটা হঠাৎ দাঁড়াল কি করে?"

ডাক্তার ঈষৎ কুপিত স্বরে কহিল, "এরই জন্য আজীবন সাধনা করে আসছেন যে! তাহলেও বয়স যখন অল্প ছিল, তখন এ সব অত্যাচার সইত, এখন সইবে কেন? এই বদখেয়ালির জন্যই প্রাণটা দিতে বসেছেন।"

দারুণ হিংসায় ডাক্তারের প্রাণ জ্বলিতেছিল। কথাটার মধ্যে জেঙ্কিন্স

প্রাণের সেই সমস্ত জ্বালা মিশাইয়া দিয়াছিল। জেঙ্কিন্সের প্রাণে যেমন ঘা দিয়াছে, তেমনই তাহার ফল ফলিয়াছে ত!

পরক্ষণেই কিন্তু সুর বদলাইয়া ক্ষুব্ধভাবে জেঙ্কিন্স কহিল, "বেচারা—বেচারা ডিউক! ওঃ, আমি ত কোনই আশা দেখছি না—মঁসিয়ো—"

এই কথায় মপার্ভর প্রকৃতই বেদনা লাগিয়াছিল, সে কহিল, "শোন, এত বড় দায়িত্বের ব্যাপার নিজের হাতে রেখে তুমি ভাল করছ না, ডাক্তার জেঙ্কিন্স এত বাড়াবাড়ি অসুখ—অথচ দ্বিতীয় একজন ডাক্তার ডাকা হয়নি—একটা পরামর্শ করবারও কারও সঙ্গে দরকার বোধ করছ না।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার কহিল, "বিশেষ ফল যে তাতে পাওয়া যাবে—"

সে কথায় বাধা দিয়া মপার্ভ কহিল, "তবু আমাদের মনের একটা সান্ত্বনা চাই ত! ব্রিসে, জুসলিন, বুশাঁর এদের একবার এখনই ডাকা হোক!

জেঙ্কিন্স কহিল, "কিন্তু ডিউক তাতে ভয় পাবেন, না?"

মপার্ভ বিরক্ত হইল, চড়া গলায় কহিল, "ভয়! ডাক্তার, তুমি জান না, ডিউক মোরা আর আমি, দুজনে ভয় কাকে বলে কখনও জানিনি। যাক্—মোদ্দা ভয় পাবে ভেবে একটা চেষ্টা-চরিত্র অবধি আমরা করব না! আশ্চর্য্য! না, না, ব্রিসে, জুসলিন—এঁদের এখনই ডাকাও। আমি নিজে ডিউককে বলছি, যে আমরা আরও পাঁচজন ডাক্তার ডাকাচ্ছি। রোগটা কি, সকলে মিলে দেখে ধরে দিন—তারপর সকলের পরামর্শ-মত চিকিৎসা চলুক।"

সন্ধ্যার সময় প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে ডাক্তারদের কমিটি বসিল। পরামর্শ গোপনেই চলিল। সেখানে একটী প্রাণীরও প্রবেশাধিকার ছিল না। ডিউক নিজে ডাক্তার আনাইতে মত দিয়াছিলেন। রোগের যন্ত্রণা তাঁহার সহ্য হয়, তবে এই রোগ যে সাধারণ মানুষের সহিত এক পংক্তিতে তাঁহাকে বসাইতে চাহে, এই দুঃখই সব চেয়ে অসহ্য!

তাই ডাক্তারী বৈঠকে পরামর্শের আজ এত ধুম! ডাক্তারদিগের মুখ গম্ভীর—মুখে কথাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত! কিন্তু হায়; এতখানি গাম্ভীর্য্যও ডিউকের যন্ত্রণা লাঘব করিতে সক্ষম নহে, আরোগ্য দান ত দূরের কথা!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তারের দল গম্ভীরতর মুখে ডিউকের কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। বিচার-প্রার্থী অপরাধীর মতই ডিউক করুণভাবে তাঁহাদের পানে চাহিলেন। না জানি, ইঁহারা কি কথা বলিবেন! অবাধ মুক্ত আরোগ্যের আভাষ, না, কঠোর কঠিন মৃত্যুদণ্ড! ডাক্তারদের নীরব গম্ভীর দেখিয়া ডিউক কহিলেন, "আপনাদের শাস্ত্র কি বলে, বলুন।"

ডাক্তারের দল অস্পষ্ট জড়িতভাবে উৎসাহ-আশ্বাসের দুইটা মৃদু বাণী বলিলেন —টাকা খাইয়াছেন বিস্তর, তাহার বিনিময়ে এটুকু না দিলে অধর্ম্ম হইবে! তাহার পর তাঁহারা ডিউকের করকম্পন করিয়া সিগার ধরাইয়া বিদায় লইলেন। মপার্ভ ছুটিয়া বাহির

হইয়া গেল। জেঙ্কিন্স ও পুরাতন ভৃত্য লুই ডিউকের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। ডিউক জেঙ্কিন্সকে ডাকিয়া একটা কথাও কহিলেন না। তিনি জানিতেন, প্রশ্ন করিলেও সত্য কথাটা এই ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে কিছুতেই আদায় হইবে না। তাই আর বৃথা কথা বাড়াইতে তাঁহার এতটুকু আগ্রহ বা ইচ্ছা ছিল না। মপাভঁ ফিরিয়া আসিলে ডিউক তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরি করবে না, জানি ভাই! যত কঠোর হোক্, সত্য কথাটা বল দেখি। ডাক্তারেরা কি বলে গেল! আমার আর কোন আশা নেই,—না?"

মপাভঁ মুহূর্ত্তের জন্য স্থিরভাবে ডিউকের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "কোন আশা দেয় না, ওরা, মোরা।"

ডিউক অবিচলিতভাবেই এ কথা শুনিলেন, শুধু কহিলেন"—হুঁ—"তারপর চেষ্টাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার বুকের মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আশা নাই! তাহা হইলে প্রস্তুত হইয়া লও!

তারপর চকিতে ডিউক দেখিলেন, জীবনে যাহা কিছু তাঁহার প্রিয় ছিল,—ক্ষমতা, সম্মান, ঐশ্বর্য্য—এই বিপুল সমারোহ, সব কোথায় সরিয়া গিয়াছে! সেগুলা আর তাঁহার আয়ত্তে নাই—অতীতের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে! এত বড় আঘাতের বেদনা এড়াইতে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন। সে শক্তি যেন সকলই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এত ঐশ্বর্য্য, এত ক্ষমতা কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না! হায়রে মানুষের অক্ষম দুর্ব্বলতা! ভিতরটা তাঁহার অশ্রুর সাগরে ডুবিয়া গেল। কিন্তু না, এ শেষ মুহূর্ত্তে কেন এ কান্না অশ্রু! যে দর্প লইয়া আজীবন তিনি কাটাইয়া দিয়াছেন, আজ কেন সে দর্পকে দূর করিয়া দিবেন! লোকে দেখিবে, ডিউক কান্নায় হইয়াছেন! না, তাহারা হাসিবে। ডিউক তবে সাধারণ মানুষের মত মৃত্যুর নামে ভয় পায়! না, কখনই নহে! জীবনে যে ডঙ্কা সমানে বাজাইয়া আসিয়াছেন, এখনও সেই ডঙ্কা বাজাইয়া মৃত্যুর হাতে তিনি আত্ম-সমর্পন করিবেন! মৃত্যু ত আসিবেই—ঐ বাগানের অসংখ্য গাছের একটি পাতা, একটি পল্লবও না ভাঙ্গিয়া, মক্ষর-সোপানে সুরক্ষিত ফুলগাছগুলার ফুলের একটি দলও ছিন্ন না করিয়া মৃত্যু তাহার কর্ত্তব্যের কর বাড়াইয়া আসিবেই! নীরবে চরণ ফেলিয়া, কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা না ঘটাইয়া সে আসিয়া ডিউকের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিবে, 'এস।" তখন যাইতেই হইবে! কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না! সর্ব্বস্ব দিয়াও নহে। ডিউক তখন চোখের জল ফেলিবেন? না। ডিউক বালিশে চোখ মুছিলেন, একবার শিয়রের পানে চাহিলেন, মনে মনে বলিলেন, আমি প্রস্তুত—ওগো মৃত্যু, প্রস্তুত—চল, কোথায় লইয়া যাইবে। তাঁহার মত মানুষের পক্ষে ইহাই ত যোগ্য তিরোধান—ক্ষিপ্র, অবিচল, অতর্কিত!

ডিউক মপাভঁকে ডাকিয়া কতকগুলা নামের তালিকা দিলেন, ইঁহাদিগের সহিত

তিনি একবার শেষ দেখা করিতে চাহেন। তখনই তাহাদের কাছে লোক ছুটিল। তারপর জেঙ্কিন্সকে তিনি কহিলেন, "কালকের দিনটা বেঁচে থাকব কি না, বলতে পার, ডাক্তার? একটু যেন বল পাচ্ছি। কিন্তু এ বলটুকু কতক্ষণের জন্য?"

লুই একবার অগ্রসর হইয়া কহিল, "ডচেস্ একবার আসতে চান—তিনি বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন।"

ডিউক কহিলেন, "দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর তুমি বল। এ-দিককার কাজ-গুলো একরকম গুছিয়ে নি, আগে—" তারপর ডিউক কহিলেন, "মপাভঁ, ঐ ড্রয়ারটা খোল। ওতে যত চিঠি-পত্র আছে, সব বার করে আমার সামনে পুড়িয়ে ফেলো। না, ওখানে হবে না—অনেক চিঠি। বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলো; তুমি হাজির থেকো, দেখো, সমস্তগুলো যেন ঠিক পোড়ানো হয়—"

জেঙ্কিন্স দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, "চলুন, আমিও নয় সাহায্য করছি। চট্‌পট্ হয়ে যাবে এখন।"

ড্রয়ার খুলিয়া চিঠির একটা প্রকাণ্ড তাড়া লইয়া মপাভঁ ও জেঙ্কিন্স বাহিরে আসিল। রঙ বেরঙের খামে মোড়া অসংখ্য চিঠি! এখনও মধুর পুষ্প-সুরভি তাহাদের অঙ্গে মাখানো রহিয়াছে—সবগুলাই প্রেম-পত্র! কোনটাতে কোন সাহসিকা আপনার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদন ঢালিয়া দিয়াছে, কোন্‌টা-বা উপেক্ষিতা অভিমানিনীর মৃদু ভর্ৎসনার সুরে ভরা! জেঙ্কিন্স চিঠি বাছিতেছিল—এবং মপাভঁ আগুনে ধরিয়া তাহার সৎকার করিতেছিল। সেই অবসরে ঈষৎ সতর্কভাবে দুই-চারিখানা চিঠির উপর চোখ বুলাইয়া লইতে জেঙ্কিন্স ভুলিয়া যায় নাই। যেন পুষ্প-সুরভির মধ্যে ভাষার কি স্নিগ্ধ সুর ভাসিয়া উঠিয়াছে! যেন এ গোলাপ-কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া বিচিত্র পাখীর দল করুণ কাকলী তুলিয়াছে! হঠাৎ দুই খানা চিঠি হাতে করিয়া জেঙ্কিন্স চমকিয়া উঠিল। বড় পরিচিত হস্তাক্ষর! মপাভঁর পানে মৃদু কটাক্ষপাত করিয়া তাহার অলক্ষ্যে চিঠি দুইখানা সে পড়িতে আরম্ভ করিল। মপাভঁর সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। মপাভঁ কহিল, "ওহে ডাক্তার, তুমি যদি এমন করে সব চিঠি পড়তে বসো, তাহলে এক মাসেও চিঠি পোড়ানো শেষ হবে না।"

জেঙ্কিন্সের গাল দুইটা লাল হইয়া উঠিল। চিঠি দুইখানা আগাগোড়া পড়িয়া লইবার উৎকট বাসনা তাহার মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। তবু মপাভঁর এ কথার পর আর তাহা পড়া ভাল দেখায় না! মপাভঁর মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে! না জানি, জেঙ্কিন্স কোন্ হারামণির সন্ধান করিতেছে! সে তখন সে চিঠি দুইখানা একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া আবার অন্য চিঠি বাছিয়া মপাভঁর হাতে আগাইয়া দিতে লাগিল। মপাভঁ সেগুলা আগুনে ধরিতে লাগিল—দাউ দাউ করিয়া চিঠির গোছা পুড়িতে-ছিল। তাহার সহিত কত প্রাণের কত গোপন কথা, কত মর্ম্ম-ব্যাকুলতা, প্রেমের কত মান, কত অভিমান, বিরহের কত বেদনা,—কত পাপ, কত অভিসার, সব আজ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

জেঙ্কিন্স হঠাৎ একটা চিঠি হাতে লইয়া কহিল, "এটা ত ভালবাসার ব্যাপার নয়। এই যে কি লেখা—প্রিয় ডিউক, আমি ত ডুবিতে বসিয়াছি। দেনার দায়ে বুঝি সব যায়। মান-সম্ভ্রম ধূলায় লুটায়। তুমি যদি—"

মপার্ভ কান খাড়া করিয়া শুনিল, সহসা সবলে চিঠিখানা ডাক্তারের হাত হইতে টানিয়া লইয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। এ যে তাহারই লেখা! ডিউকের অসতর্কতায় সেখানাও এগুলার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে! চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িবার ইচ্ছায় সেখানা হাতে লইয়া সে জানালার ধারে আসিল, আসিবার সময় ডাক্তারের পানে একটা তীব্র দৃষ্টি সে হানিয়া আসিল।

জেঙ্কিন্সও এমনই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে সে চিঠি দুইখানা ক্ষিপ্র সে আপনার পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। এমন সময় হঠাৎ লুইয়ের স্বর শুনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডিউকের তীব্র ভৎর্সনার সুর—"নে, নে, বাপু, যা পারিস্ নে—মোদ্দা, শব্দ করিস্‌নে! আমায় একটু ঘুমোতে দে।"

মপার্ভ ও জেঙ্কিন্স তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ডিউকের ঘরে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখে, ডিউকের ড্রয়ার খোলা—কতকগুলা মুদ্রা ছড়ানো রহিয়াছে—এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া লুই, তাহার মুঠি মুদ্রায় ভরা! ডিউককে নিদ্রালু দেখিয়া সে টাকা সরাইতে সুরু করিয়াছিল, ডিউক তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছেন!

সে রাত্রিটা ডিউকের অস্বস্তিভাবেই কাটিল। একটু তন্দ্রা আসে, আবার তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তারের ঔষধে রোগ সারিবার এতটুকু সম্ভাবনা নাই। তবুও ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়ানো চলিতে লাগিল—মরণ-পথে ডিউক যাত্রা ত করিয়াছেনই—যতটা তবু তাঁহার যাতনার লাঘব করা যায়!

তারপর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ঘুম ভাঙ্গিলে মপার্ভ, কার্দ্দিলাক ও আরও দুই-চারিটা নিতান্ত পরিচিত মুখ দেখিয়া ডিউক মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহরে লোকে সব কি বলে?"

সহরে অনেক কথারই আলোচনা চলিতেছিল। তবে তাঁহার কথাটাই লোকের মুখে বেশী করিয়া ফিরিতেছিল। ডিউকের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন—বুঝি আর বাঁচেন না, এইটাই ছিল, সব-চেয়ে উত্তেজক সংবাদ! আর নবাব! ডিউকের মৃত্যু,—তাহার অর্থ, তাঁহার সর্ব্বনাশ, ধ্বংশ, তাঁহারও মৃত্যু! নবাব এ সংবাদ শুনিয়া বাহিরে কোন কাতরতা দেখাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইল, বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁহার শূন্য মনে হইতেছিল। যেন দারিদ্র্য, ধ্বংশ তাহাদের বিকট মূর্ত্তি লইয়া নবাবের চোখের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য লাগাইয়া দিয়াছে!

ডিউক আজ আপনাকে একটু সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। নানা লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছিল—ডিউক তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে একবার শেষ দেখা!

একে একে সকলে দেখা করিয়া চলিয়া গেলে ক্রমে জাঁসুলের পালা আসিল। ডিউক তখন কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন—চোখ তাঁহার মুদিয়া আসিল। জাঁসুলে ঘরে ঢুকিতে জেঙ্কিন্স কহিল, "আঃ, কি লোক! আরুকে এ শেষ মুহূর্ত্তে ভোলেন নি! ক্রমাগত আপনারই কথা কচ্ছিলেন। এখন একটু ঝিমিয়ে পড়লেন।"

"আমার কথা বলছিলেন?" নবাবের স্বরে কি যেন কৃতজ্ঞতার সুর মিশানো ছিল। জেঙ্কিন্স কহিল, "হাঁ, আপনার নির্ব্বাসনের কি হল, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন।"

ডিউকের কৃতজ্ঞতায় শির নত করিলেন। এমন সময় মৃত্যু-লোকের দ্বারে দাঁড়াইয়াও ডিউক তাঁহার কথা ভুলেন নাই। হায়, তাঁহারই ভাগ্যদোষে আজ এত বড় বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিতে বসিয়াছে।

ডিউকের সহিত দেখা করিতে আসিয়া জাঁসুলের একটা কথা কহিবারও সুযোগ মিলিল না—ইহাও কি অল্প দুর্ভাগ্য!

নবাব সে ঘরে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। মহত্ত্বের এমন ধ্বংশ চোখে দেখা যায় না! হৃদয়-হীন পারির মধ্যে একমাত্র তিনি হৃদয়-বান, তাঁহার এ যাতনা দেখিলে পাষাণও বুঝি ফাটিয়া যায়, নবাব ত মানুষ! নবাব ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। সিঁড়ির কাছে ভৃত্যের দল নানা কথা কহিতেছিল। কেহ বলিল, "ঢের টাকা পেয়ে গেছি। আর আমি চাকরি করছি না।" আর একজন কহিল, "আমি ডচেসের কাছে থাকব।"

নবাব সে কথা কানে না তুলিয়াই হল-ঘরে দর্শক ও বন্ধুবর্গের জন্য যে খাতা ছিল, তাহাতে নিজের নাম লিখিলেন। লিখিয়াই তাঁহার নজর পড়িল, ঠিক পূর্ব্বেকার নামটির উপর—এ কি—এ যে হেমারলিঙ্! তাহার চির-শত্রু হেমারলিঙ! নবাব শিহরিয়া উঠিলেন—অদৃষ্টের কি ক্রূর পরিহাস, এ! তাঁহার নামের উপরই হেমারলিঙের নাম? সে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে!

নবাব আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এখন তিনি কোথায় যাইবেন! ক্লাবে? বাড়ীতে? না। নবাব হোটেলের অভিমুখে চলিলেন। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল।

হোটেলে লোকের মুখে আর অন্য কথা নাই; কেবলই ডিউকের কথা! ভোজনে বসিয়া একটা কথা ডিউকের কানে গেল—কে বলিতেছিল, "আশা আছে বৈ কি! এর চেয়ে বড় বড় রোগ লোকের সারছে—এ'ত কি! চিকিৎসার অত ধুম!"

নবাবের প্রাণখানা আশার উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। আহার অসমাপ্ত রাখিয়াই বিলের টাকা সম্পূর্ণ চুকাইয়া দিয়া আবার তিনি ডিউকের প্রাসাদের অভিমুখে গাড়ী হাঁকাইবার আদেশ দিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ডিউকের প্রাসাদ উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করিতেছে! সে যেন আশারই হর্ষোজ্জ্বল হাসির দীপ্তি! ভৃত্য-পরিজন এধারে ওধারে নিত্যকার মতই চলা-ফেরা করিতেছে। দেখিলে মনে হয় না, এ গৃহে কোন ভীষণ মর্ম্ম-ঘাতী নাটকের অভিনয় চলিতে পারে!

নবাবের বিষণ্ণ চিত্তে আশার আনন্দ-কিরণ ফুটিয়া উঠিল। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই চেয়ারে বসিয়া মপাভ এবং আরও কয়-জন লোক—আচার্য্যও বসিয়া রহিয়াছেন যে! তবে কি—তবে—!

নবাব বিস্ফারিত নেত্রে সকলের পানে চাহিয়া দেখিলেন। মপাভঁ কহিল, "ঠিক খাপ খাবে কি না, এই হচ্ছে কথা! ভাবুন, মোরার যে-সবে বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ বুঝলেন কি না—তাঁর মত লোকের যোগ্য আয়োজন—"

জাঁসুলের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তাহা হইলে সব শেষ! মপাভঁ কহিল, "এই যে নবাব বাহাদুর। আমাদের এখনই সকলকে খপর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। দেরী করা ঠিক হবে না। কাল সকালেই কবরের ব্যবস্থা হয়েছে। ডিউকের ইচ্ছাও তাই ছিল। ডিউকের যোগ্য আড়ম্বর-সমারোহ চাই—সেই কথাই হচ্ছে! কত গাড়ী, কত লোকজন সঙ্গে যাবে—"

নবাবের কানে আর কোন কথাই প্রবেশ করিল না। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চোখের সম্মুখে একটা নীল গোলকখণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া গেল। নবাব মাথায় হাত দিয়া নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ভিতর হইতে একটা তীব্র দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলিয়া বাহির হইল—সে নিশ্বাসের শব্দে মপাভঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—তাহার মনে হইল, নবাবের প্রাণবায়ুটুকুও যেন সে নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে! নবাব মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চয়ন

নাট্যকার ব্রাঁয়ো

অধুনিক ফরাসী মনীষিদিগের মধ্যে নাট্যকার ও সমাজতত্ত্ববিদ্ ইউজিন ব্রাঁয়োর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি Ibsen, Heyenmans, Echegaray, Shaw এবং Galesworthyর ন্যায় বাস্তবদর্শী। ইনি একাধারে ডাক্তার, জননায়ক এবং উপদেষ্টা। ইনি সমাজদেহের ব্যাধি আবিষ্কার ও তাহার প্রতিকার-সাধনে সর্ব্বদাই যত্নশীল বটে—কিন্তু উহা লইয়া তিনি কখনও নীচ বিদ্রূপ বা যা-খুসি-তাই করেন নাই।

ব্রাঁয়োর রচনায় ইবসেনের রচনা অপেক্ষা অধিক হাস্য-রসিকতা এবং বার্ণার্ড শ'র অপেক্ষা অধিক কোমলতা আছে। Hauptmannএর তুলনায় কবিত্বে তিনি নিকৃষ্ট বটে,—কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-চিত্রনে তাঁহার শক্তি অধিক।

Adolphe Brisson সম্প্রতি ইহাঁর

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"জগতের ব্যাধি ও দুষ্কার্য্য প্রভৃতির ভিতরে ইনি মিশিয়াছেন বটে—কিন্তু নিজে তাহাতে মিশ্রিত হইয়া পড়েন নাই। শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ইহাঁর রচনায় পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান।"

ব্রাঁয়ে প্রায় ২০ খানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম নাটক Blanchette আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। শক্তিমান্ নাটককার বলিয়া এখন তাঁহার খ্যাতি ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লরেন্স আরভিন তাঁহার "Three Daughters of M. Dupont" নাটক অভিনয় করাইয়া-ছেন। ইহার রচিত করুণরসাত্মক উৎকৃষ্ট নাটক 'The Avaries' বার্নার্ড শ' কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া 'Damaged Good' নামে অভিনীত হইয়াছে।

এই ধরণের নাটকে ব্রাঁয়ো সমাজ-ব্যাধি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন;—উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তিনি ইহা করিয়াছেন —যাহাতে রোগের প্রতিকার হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা।

নারীজাতির উপর ব্রাঁয়োর সমধিক সদাশয়তা দেখা যায়। পুরুষের দুর্ব্যবহার ও স্বার্থপরতার জন্য নারীর কষ্ট দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া, যাহাতে এই অত্যাচারের উপশম হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই যত্নশীল। তাঁহার আধুনিক নাটক 'La Femme Seule' পারির 'Theatre Du Gymnase'এ অভিনীত হইয়াছে। ইহাতে আধুনিক নারীদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহাদের দৈনন্দিন কষ্ট ও যাতনা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনা এইরূপ:—

নাটকের নায়িকা আর্সির বয়স তেইশ বৎসর। সে সুন্দরী, সুচতুরা ও উচ্চশিক্ষিতা; তাহার অবস্থাও স্বচ্ছল। রেনী নামক যুবকের সে বাক্‌দত্তা! যুবক আর্সিকে খুব ভালবাসিত—আর্সিও যুবককে ভাল-বাসিত। আর্সির বাপ-মা ছিল না বলিয়া সে তাহার ধর্ম্মপিতার সহিত বাস করিত।

হঠাৎ এই সৌভাগ্য হইতে আর্সি দারিদ্র্যে পতিত হইল—ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতেই তাহার এই দুর্দ্দশা। কন্যা দরিদ্র বলিয়া রেনীর পিতামাতা সন্তানের এ বিবাহে আপত্তি করিলেন। যৌতুকহীনা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া কি লাভ? রেনী নিজেও উপার্জ্জনক্ষম নহে—বিবাহ করিয়া কোথা হইতে সে খরচ চালাইবে?—শুধু ভালবাসিয়া তো আর পেটের ক্ষুধা মিটিবে না!

আর্সির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—সে উপার্জ্জনে সক্ষম, নিজের জীবিকা স্বচ্ছন্দেই সে সংগ্রহ করিতে পারিবে। তাহার আশ্রয়-দাতারা নিজেদের পল্লী-ভবনে উঠিয়া গেলেন। আর্সি তাহাদের ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিল। সে স্থির করিল, পারিতে থাকিয়াই তাহার জীবিকা সংগ্রহ করিবে। যে দৃশ্যে সে আশ্রয়দাতার নিকট এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া বলিতেছে—নাটকের সে দৃশ্যটি অতি সুন্দর।

আত্মবিশ্বাস ও উচ্চ সঙ্কল্পে হৃদয় তাহার পূর্ণ—সাহিত্য ও ইতিহাসের জ্ঞান তাহার প্রচুর। তাহার ইচ্ছা, সে তাহার বন্ধুর পরিচালিত "La Femme Libre" পত্রিকার

একজন নিয়মিত লেখক হয়। কারণ, পত্রিকার সম্পাদক তাহার পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

কিন্তু আর্সি ক্রমে দেখিল, সম্পাদকেরা সখের লেখকদের প্রতি এবং অর্থপ্রয়াসী লেখকদের প্রতি একরূপ ব্যবহার করেন না। আরও দেখিল, সম্পাদকের চক্ষু কি নির্ম্মমভাবেই অন্যের হৃদয়ের আঁচড়গুলিকে পরখ্ করিয়া থাকে! যা হোক, কোনরূপে দিন চলে এমনি সামান্য একটি কাজ সে জোগাড় করিয়া লইল।

ব্রাঁয়োর সজীব রসিকতা, আর্সির সহকর্ম্মীদের চরিত্র-চিত্রনে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। Mlle Mewicrtr চরিত্রে মহত্বের ধারা নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে।

ক্যারোলাইন লিগ্রাণ্ড একজন সাফ্রাজিট্ রমণী;—পুরুষকে তিনি ভয়ানক ঘৃণা করেন। কিন্তু তিনি তাহাদের পরিচ্ছদ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অত্যন্ত প্রিয় চক্ষে দেখেন। এটা লইয়া হাসির ফোয়ারা ছোটানো এবং তিলকে তাল বানানো নাট্যকারের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু ইহাদের অতিবাদ ও দুর্দ্ধর্ষতার মধ্যে চরিত্রকে সহানুভূতি-সিক্ত করিয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। দু'এক লাইনে ক্যারোলাইনের পুরুষ-বিদ্বেষ কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"আর্সি—ক্যারোলাইন লিগ্রাণ্ড!—খুব একটা ভাল খবর আছে—শুনলে তুমি ভারী খুসী হবে।

ক্যারোলাইন।—কি, সব পুরুষগুলো একেবারে নিঝাড় হয়ে মরে গেছে নাকি?"

আর্সি যে সংবাদপত্রের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে ভাল ভাল লেখা থাকা সত্ত্বেও কাগজখানি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছিল না। পরিচালকগণ ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

আর্সি কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প করিল; কারণ এ বেতনে যেমন-তেমন ভাবেও তার পেট চলিবে না। তাহার সংকল্পের কথা শুনিয়া সম্পাদক আর্সির প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া তাহাকে পূর্ব্ববেতনে রাখিতে মঞ্জুর করিলেন।

তাহার প্রতি এই অনুগ্রহে আর্সি মোটেই সন্তুষ্ট হইল না। সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাহার প্রতি এ অনুগ্রহ কেন? এইখানে নাটকীয় ঘটনা সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, আর্সি বেশ ভাল কাজ পাইয়াছে। রেনীও এখন কাজের জোগাড় করিয়াছে। কিন্তু আর্সির দুর্ভাগ্য তখনও শেষ হয় নাই। শ্রমজীবী সম্প্রদায় সহসা নারীজাতির উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করিল,—নারীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবে।

শেষ অঙ্কে নাটকীয় ঘটনার বিকাশ অল্পই হইয়াছে। কিন্তু কথোপকথনে ব্রাঁয়ো তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নারী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে—পুরুষের তাহা সহ্য হইবে কেন? নাট্যকার এই সমস্যা-সমাধানের সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন।

আর্সি কার্য্য ত্যাগ করিয়া পারিতে রেনীর সঙ্গে যোগ দিতে গেল। তাহার

শেষ কথায় নাট্যকারের নিজেরই মত বিবৃত হইয়াছে:—নরনারীর এই যুদ্ধে পুরুষেরই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; কারণ পুরুষের চেয়ে নারী অল্পেই তুষ্ট, পুরুষের মত বাজে খরচ তাহাদের নাই—অতিরিক্ত বেতন পাইলে মদের দোকানে শুঁড়ির পেট মোটা করিবার আগ্রহও তাহাদের নাই। নগরের [illegible]-সম্প্রদায় যাহারা বিনা পণে বিবাহে নারাজ, তাহারা পরে এজন্য অনুতপ্ত হইবে; কারণ তাহারাই নারী-জাতিকে [illegible]রে কষ্টে চালিত করিয়াছে।

যে সকল পুরুষ মদের খোরাক যোগাইতে যোগাইতে এবং নিজেদের বাজে ব্যয়ে বিবাহের সামর্থ্য হারাইতেছে, তাহাদের হইয়া নারীদেরও জীবিকার সংগ্রহ করিতে হইবে; কল-কারখানা, দোকান, অফিস সর্ব্বস্থলেই তাহাদের কর্ম্ম-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পুরুষ তাহাদিগকে গৃহিণী করিবে না। অতএব, নারীরাও শ্রমজীবী হইবে। এ স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী।

এই নাটকে আর্সি ও রেনীর ভূমিকাই প্রধান বিষয় নহে—নারী ও শ্রমজীবী-সমস্যা এই নাটকের মূল ভিত্তি। এই নাটকের ঘটনা-প্রবাহ—বাস্তব জীবনে দুষ্প্রাপ্য নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

হুগোর প্রণয়-কাহিনী

অমর [illegible] ভিক্টর হুগোর সহিত জুলিয়েত ড্রুয়েটের প্রেমের কাহিনী সাহিত্য-রসিকের [illegible]ছে পরিচিত। সংপ্রতি জুলিয়েত ড্রুয়েটের লেখা কয়খানি প্রেম-পত্র বাহির হইয়া সেই প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে আরও গুটিকয়েক নূতন পরিচ্ছেদ জুড়িয়া দিয়াছে।

১৮২৯ ও ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আঁকা, ভিক্টর হুগোর দুখানি তৈল-চিত্র আছে। ঐ ছবি দুখানি দেখিলে, হুগোর চেহারা তিনটি-মাত্র বছরের ভিতরে বদলাইয়া কি-রকম খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কারণ,—তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাসঘাতকতা। চিত্ত-বেদনায় অস্থির এবং প্রেম ও বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ভিক্টর হুগো এই সময়ের একখানি চিঠিতে লিখিয়া ছিলেন:—"আমি আমার মনের আবেগেই বেঁচে আছি। সুখে-দুঃখে, প্রকাশ্যে-নিভৃতে আমার জীবনের আসল কামনা হচ্ছে, ভালবাসা।.....যাকে আমি আমার সমস্ত প্রেম সমর্পণ করেছি, সে যে আমার দিকে ফিরে না-তাকালেও না-তাকাতে পারে, এটা আমি এতদিনে খুব-সম্ভব বলে বুঝতে পেরেচি।"

হুগোর স্ত্রী দেখিতে পরমা সুন্দরী হইলেও তাঁহার কোনরূপ রুচি বা সজ্জা-নৈপুণ্য ছিল না। তিনি তাঁহার প্রতিভাবান স্বামীর মরমের মরমী বা দরদের দরদী ছিলেন

না। "যুগল আত্মায় অনুরাগের যে বিমল মিলন মর্ত্ত্যে আরম্ভ হয়, স্বর্গেও তাহার অবসান নাই।"—এই যে প্রেমের একটা মহৎ আদর্শ হুগো তাঁহার প্রাণের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে আদর্শ হইতে তাঁহার স্ত্রী দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন শুধু টাকা—চাহিতেন শুধু টাকা! হুগোর স্ত্রী, কবির এক বন্ধুর সঙ্গে এক-যোট হইয়া তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকের ব্যবহার করিয়াছিলেন, কবি তাহা ঘৃণা-ভরে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। এইসকল নানা কারণে হুগো শেষে বাধ্য হইয়া অপর রমণীর আলিঙ্গনের মধ্যে তাঁহার চিরকাম্য প্রেমকে খুঁজিতে লাগিলেন। প্রাণে চিতার আগুন জ্বালিয়া কোন্ কবি নিয়তির অন্ধকার কারাগারে কয়েদী হইয়া থাকিতে পারেন?



ভিক্টর হুগো
(১৮২৯)

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে, এক নৃত্য-অভিনয়ে হুগোর সঙ্গে জুলিয়েত দ্রুউয়ের প্রথম দেখা। জুলিয়েতের রূপের শিখা ছিল এমনি উজ্জ্বল ও প্রখর, যে হুগো তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ভরসা পাইলেন না। ছয়মাস পরে হুগো আবার অভিনেত্রী-রূপে জুলিয়েতের দর্শন লাভ করিলেন। হুগোর একজন চেনা লোক তাহাকে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহার নাটক Lucrice Borgia হইতে জুলিয়েতকে একটা ভূমিকা দেওয়া হউক। হুগোর পক্ষে এই

পরামর্শ 'পেটুককে ভাত খাইতে বলা'র মত দাঁড়াইল। তিনি তখনি স্বীকার পাইয়া জুলিয়েতকে একটি ছোট ভূমিকা দিলেন।

এই পরিচয়ের সূত্রপাত হইতে তাঁহারা দুইজনে যে প্রেম-বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন, পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও সে বাঁধন ঢিলা হয় নাই। জুলিয়েতের মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত হুগো তাহাকে ভুলিয়া তাঁহাকে কায়মনো-বাক্যে ভালবাসিয়া ছিলেন, জুলিয়েত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভাবনা তিনি ভাবিতেন না। জগতের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে এমন অক্ষয় প্রেমের স্বপ্ন, আর কাহারো চক্ষে বোধ করি, সফল হইবার অবকাশ পায় নাই—ইহা মধুর, অপূর্ব্ব, অতুলনীয়।

পরিচয়ের প্রথমেই জুলিয়েত কবির কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, "আমি



জুলিয়েত দ্রুউতে

জানি, শুধু তোমাকেই ভালবাসিতে; তা-ছাড়া আর সবদিকে আমি একেবারে অপদার্থ!"

রুই সেণ্ট ডেনিসে ছিল জুলিয়েতের বাস। তাঁহার বাড়ী হইতে ফিরিবার মুখে, গলির মোড়ে আসিয়া হুগো থমকিয়া পিছনপানে চাহিতেন; জুলিয়েতও তখন জানালার কাছে আসিয়া কবির দিকে পলকহীন নেত্রে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। চারি চোখ এক হইবামাত্র, দুজনে দুজনকে ইঙ্গিতে চুম্বনের পর চুম্বন বিনিময় করিতেন। পরে, কবিকে যখন আর দেখা যাইত না, জুলিয়েত তখন বিশ্বমাঝে আপনাকে একাকী—বড়ই একাকী—মনে করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেন এবং নিদ্রাচর যেমন স্বপ্নে ঘুরিয়া বেড়ায়, স্বপ্নে কথা কয়, তাঁহারও বোধ হইত, তিনিও যেন ঠিক তেমনি স্বপ্নচালিতের মত স্বপ্ন-জগতে বাস করিতেছেন! তাঁহার চারিদিকে তখন যেন এক সীমাহীন শূন্যতা হা-হা করিতে থাকিত এবং তাঁহার হৃদয়ে একটিমাত্র কামনা বারবার জাগিয়া উঠিত; সে কামনা—কবিকে আবার দেখিবার কামনা—অবিচ্ছেদ মিলনের একান্ত বাসনা! এই দুঃসহ শূন্যতা হইতে নিস্তার পাইয়া চিত্তবিনোদ করিবার জন্য, জুলিয়েত

অবশেষে কবির সহিত নিয়মিত পত্র-ব্যবহারে ব্রতী হইলেন।

তাঁহার নিজের বাড়ী হইতে, তাঁহার কোন বন্ধুর বাড়ী হইতে, রঙ্গালয় হইতে, হোটেল হইতে—জুলিয়েত যখন যেখানে থাকিতেন, তখন সেইখান হইতেই তাঁহার প্রিয়তমকে তিনি পত্র লিখিতেন। তাঁহার পত্রের উপাদানও ছিল বিচিত্র! যে-রকমেরই হৌক না কেন, একটুক্‌রা কাগজ হইলেই তাঁহার চিঠি লেখার কাজ চলিয়া যাইত; অনেক সময়ে আর কিছু না পাইয়া একখানা খামের উপরে বা খবরের কাগজের সাদা অংশে দু-চারটি কথা লিখিয়া পাঠাইতেন। কলম বা পেন্সিল না পাইলেও তাঁহার পত্র-রচনার ঝোঁক্ একটুও দমিয়া যাইত না,—একটি কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত 'পিনে'র সাহায্যেই তিনি মনের কথা কাগজে ফুটাইয়া তুলিতেন। প্রেম ও প্রতিভা,—দুই উদ্দাম। তাহারা কোনই মানা মানে না।

পত্রের ভাষার প্রতি জুলিয়েত বড় একটা নজর দিতেন না। ভাব জাহির করিবার জন্য ভালবাসা কি কখনও অভিধান খুঁজিয়া মরে? প্রাণে যখন আবেগ-সায়র দোদুল দুলিয়া উঠে, কোন্ রমণী তখন ব্যাকরণ লইয়া মাথা ঘামাইতে বসে? জুলিয়েত নিজেই বলিয়াছেন, তিনি এ-সব ঝঞ্ঝাটের ধার ধারিতেন না বলিয়াই তাঁহার প্রথম জীবনের প্রেমপত্রগুলি এতটা মনোরম হইবার অবকাশ পাইয়াছে। তাহারা সহজ সরল প্রেমের সুরভি-সঙ্কোচে ভরা।

আমরা এখানে জুলিয়েতের নব-প্রকাশিত অসংখ্য প্রেমপত্রের ভিতর হইতে দু-চার-খানি বাছিয়া দিলাম।

১

রবিবার। রাত সাড়ে আটটা। (১৮৩৩)

ওগো আমার ক্ষুদে পাগল,

তোমার লেখা নকল বা তার কথা গুণবার আগে (জুলিয়েট মাঝে মাঝে কবির সেক্রেটারির কাজ করিতেন) আমি এক লাইন প্রেমের কথা লিখ্‌ব। আমি তোমাকে ভালবাসি—বুঝ্‌চ প্রিয়তম!—আমি তোমাকে ভালবাসি! ভালবাসা হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যবসা, আমার সব নির্ম্মলতা ও কর্ত্তব্য নিয়েই তার কারবার! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার বিশ্বস্ত সখি, আমি শুধু তোমাকে দেখি, শুধু তোমার কথা ভাবি, শুধু তোমাকেই কথা বলি, শুধু তোমাকেই স্পর্শ করি, শুধু তোমাকেই স্বপনে দেখি, আমার নিশ্বাসে তুমি, আমার কামনায় তুমি,—এক কথায়, আমি তোমাকে ভালবাসি; এই এক কথায় সব কথা আছে।

অতএব, আর বেদনার টানে টলে পড়ো না। তুমি আপনাকে ভালবাসতে দাও, সুখী হতে দাও। আমাকে ভয় করো না, আমাকে কখনো সন্দেহ করো না,—দেখবে, আমরা এমন নন্দনানন্দে নন্দিত হব, 'বাক্যে যা কথন না যায়'।

তুমি শীঘ্র আস্‌বে বলে আমি তোমার আশা-পথ চেয়ে বসে আছি। বোধ হয়, আমার যত্নের উত্তাপে ও কোমলতায় তুমি উল্লসিত হয়ে উঠ্‌তে পারবে।

তোমার 'জুজু' (১৮৩৩)

২

"তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি বুকের মধ্যে যেন মৃত্যুকে পুষে রেখেচি। আজ রাতে তুমি যদি বল-নাচে যোগ দাও, তাহলে আমাদের মাঝে নিশ্চিত বিচ্ছেদ হবে বলে জেনো। তুমি যদি একদল মনভুলানো সুন্দরী রমণীর সঙ্গে ঘুরে-ফিরে বেড়াও, তাহলে আমার উপরে অন্যায় করা হয়; তুমি ভাবলেই আমি কষ্ট পাই। আমার ঠিক [illegible] "কেয়ার-অফ মাদাম কে ০০"। চিঠি লিখ[illegible] মাঝরাতের আগে তোমার চিঠি না [illegible] বুঝব, তুমি আমাকে 'থোড়াই কেয়ার' [illegible] আরো বুঝবো, তোমার আমার [illegible] সকল সম্বন্ধ ঘুচে গেল... ..... হাঁ, চির[illegible] মত।—জে।"

৩

বেলা দুইটা (১৮৩৩)

আমার [illegible],

আমি তোমাকে সত্যই ভালবাসি এবং আমার [illegible] তোমার চেয়ে ভক্তির পাত্র অন্য কোন ব্যক্তির কথা কল্পনাতেও আসে না।

আমি তোমাকে একজন বিশ্বাসী, নির্ভরযোগ্য বন্ধুর মত দেখি। এত নম্র ও এমন মাননীয়, আমি আর কোন লোককে জানি না।

আমার অতীত জীবন যে তোমার বিশ্বাসকে আহত করেছে, এ অনুভব করে আমি আঘাত পেয়েছি। তোমাকে জানবার আগে আমি যা করেছি, সেজন্যে আমি একটুও লজ্জিত নই; সে কথাকে আমি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বল্‌তে বা লুকোতেও চাই না। কিন্তু, যেদিন থেকে আমি তোমাকে জেনেছি, সেদিন থেকেই আমার মনের গতি সব দিকেই বদ্‌লে গেছে। আমার প্রেম যে অতীতের দাগকে মুছতে অক্ষম, এ কথা ভেবে আমি লজ্জা-ভয়ে গুম্‌রে মরি। কিন্তু আমার ভয় তখনি বেশী হয়ে ওঠে, যখন তুমি আমাকে অন্যায় সন্দেহ কর।

আমার ভিক্টর, তোমার প্রেম আমাকে পবিত্র কর্‌বে, আমার মাঝে একদিন যাহা সৎ ও শুদ্ধ ছিল, তোমার ভালবাসা আবার তাকে নূতন তেজ দেবে।

আমি এমন একান্তভাবে তোমাকে প্রাণ সঁপেছি যে, যা বল্‌লুম তা সব সম্ভব হতে পারে। যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর, তবে আমি তোমার যোগ্য হব।

বিদায়। তুমি আমার আত্মা, আমার প্রাণ, আমার ধর্ম্ম। আমি তোমাকে ভালবাসি।

জুলিয়েত।"

—Vanity Fair and Hearth & Home হইতে

রুশ-প্রতিভার নব-পরিচয়

বিশ্বসাহিত্যে রুশ-প্রতিভার প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। জগতে মানুষের জীবন-যাত্রার ভিতরে রুশ-সাহিত্য নূতন চিন্তা, নূতন কাম্য, নূতন প্রশ্ন জাগাইয়া

তুলিয়াছে। রুশিয়ার শক্তিধর ঔপন্যাসিকগণ আপনাদের সমাজের ভিতরের রূপটি এমন সুকৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাহা আর সংকীর্ণতার অন্ধকার কারাগারে বন্ধ হইয়া নাই; পরন্তু, বিশ্বের সঙ্গে ছন্দ তাল ও লয় বজায় রাখিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহা ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুদূর বাঙ্গলার নিরীহ সন্তানেরাও রুশিয়ার রণপ্রিয় কসাক-যুবকের সরল সুখ-দুঃখের কথা পড়িয়া এবং অপরিচিত বিদেশী কৃষক পরিবারের নিরাশা ও নির্য্যাতন দেখিয়া চোখের জলে বুক না ভাসাইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু রুশ-সাহিত্যের পরিচয় কতটুকু আমরা রাখি? গোগোল, টুর্গেনিভ, ডোষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয় ও ম্যাক্সিম গোর্কির পুস্তক লইয়া আমরা আলোচনা ও আন্দোলন করি বটে, কিন্তু প্রধানতঃ ইঁহাদের সাধনার মধ্যেই সমগ্র রুশ-সাহিত্য সীমাবদ্ধ নহে। আগে আমরা জানিতাম, টলষ্টয়ই রুশ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। পরে জানিলাম, টুর্গেনিভের ঔপন্যাসিক-প্রতিভা টলষ্টয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তারপর ম্যাক্সিম গোর্কি শ্রেষ্ঠত্বের মান্য লাভ করিয়াছেন। সংপ্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, রুশদেশে গোর্কির অপেক্ষা বড় লেখকেরও অভাব নাই। যেমন, লিওনিডাস আণ্ড্রীভ। বৈশাখের "ভারতীতে" তাঁহার জীবন ও রচনার যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

আজ আমরা আর একজন প্রতিভাবান রুশ-লেখকের পরিচয় দিব। তাঁহার নাম, ভাসিলি নেমিরোভিচ ডান্‌চেঙ্কো। সকল দিকেই তিনি এখনকার জীবিত রুশ লেখক-দের মধ্যে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। এক-ধারে তিনি ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, কবি, ঐতিহাসিক, ভ্রমণকারী, জীবনচরিতকার এবং যুদ্ধসংবাদদাতা। অথচ, এতদিন তাঁহার নাম আমরা একেবারেই জানিতাম না।

ডান্‌চেঙ্কোর জন্ম হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। ডাঘেষ্টান ও জর্জ্জিয়া নামক দুর্গরক্ষিত নগরদ্বয়ে তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তারপর, মস্কো নগরের "আলেক-জান্দ্রভস্কি সামরিক বিদ্যালয়ে" তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিন্তু সৈনিকজীবন অপেক্ষা সাহিত্য-জীবনের দিকেই তাঁহার প্রাণ অধিক আকৃষ্ট হইল। ফলে, কুড়ি বৎসর বয়সের ভিতরেই তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে 'জাত-লিখিয়ে', ঐ লেখা-গুলি প্রকাশিত হইয়া তাহাই প্রমাণিত করিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুরুস্কে যুদ্ধ বাধিল। সেই ভীষণ সংগ্রামের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার বন্ধু স্কোবেলেভের সঙ্গে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ব্যক্তিগত সাহসের জন্য তিনি "Cross of St. George" নামক পদক পুরস্কার পান। রণক্ষেত্র হইতে তিনি স্বদেশে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে একেবারে বিখ্যাত করিয়া দিয়াছিল। "White General" নামক সে পুস্তকে তাঁহার যুদ্ধের পত্রগুলি বাহির হইয়াছিল, সে বইখানি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতে পারিয়াছিল। আজ তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনও যুবার মত কার্য্যক্ষম ও সবল। বার্দ্ধক্যের ভারে তিনি জড়ের মত বসিয়া নাই। বর্ত্তমান

পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রে তিনি একখানি রুশ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছেন।

ডান্‌চেঙ্কো যদিও চল্লিশখানিরও বেশী সর্ব্বজনপ্রিয় উপন্যাস লিখিয়াছেন, তথাপি ছোটগল্পেই বোধ হয় তাঁহার হাত খেলিয়াছে ভাল। সামরিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহার যতটা জানাশুনা ততটা খুব কম লোকেরই আছে। এই পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত সাহিত্য-শক্তির সমাহার ঘটাতে তাঁহার যুদ্ধের গল্পগুলি বস্তুতন্ত্রতায়, একেবারে জীবন্তের মত নির্দ্দোষ হইয়া উঠিয়াছে।

—Strand Magazine হইতে

প্রতীচ্যের কুরুক্ষেত্র এবং 'জার্ম্মাণ আর্ট'

এখনকার একটি প্রধান প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ললিত কলার লোক্‌সান, না লাভ হইবে? মিঃ উইলিয়ম ডি, হওয়েল্‌সের মত সুপণ্ডিত ও সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির মতে, বর্ত্তমান যুদ্ধ সাহিত্য-কলার গাঁথুনি একেবারে চুরমার করিয়া দিবে। কিন্তু, জার্ম্মান সমালোচক রবার্ট ওয়েষ্ট বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে ললিত কলার এখন যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে কালোয়াতের ওস্তাদী কসরৎ থাকে নানা-রকম। বাস্তবকে এখানে খুব বাহাদুরির সহিত ঠিক্‌ঠাক ফলাইয়া তোলা হইয়াছে। একালের কলাবৎ শিক্ষাপটুতা দেখাইতে মজবুৎ হইলেও চিন্তা এবং কল্পনায় তিনি একান্ত দরিদ্র।

হয়ত' এই কারণেই এখন নিসর্গ-চিত্র ও জড়-চিত্রের ছড়াছড়ি যেমন বেশী, ঐতিহাসিক চিত্র প্রভৃতির পরিকল্পনা তেমনি কমিয়া যাইতেছে। আজকালকার শিল্পী লাগসৈ উপাদান আবিষ্কার ও তাহা পরিপুষ্ট করিবার শক্তি হইতে ক্রমেই বঞ্চিত হইতেছে। পরন্তু একালের সমালোচক, কলাবিদ এবং জনসাধারণ, ললিত কলার আলোচ্য বিষয়ে আর মনোযোগ দেয় না। চিত্রার্পিত বিষয়ে ভিতরের প্রাণটি ফুটাইতে না পারিলে সকলি যে বিফল, এ-সত্যও কেহ স্মরণ করে না। কেবল রেখাপাত, বর্ণরঞ্জন, তুলির লিখন, impressionism ও pointillism লইয়াই যে কলার কারবার নয়, এ কথাটাও কেহ খুলিয়া বলে না। ললিত কলার এই অবনতির সহিত বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আধুনিক কলায় ব্যক্তিগত কোন-কিছুর মূল্য বড় অল্প; একালের সমগ্র জীবন-ধারার ভিতরেও ব্যক্তিত্বকে খুব কম আমোল দেওয়া হইয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অমনোযোগ আর কখনও দেখা যায় নাই। মানব-জীবনের বাহিরের দিক লইয়া এত নাড়াচাড়া এবং সেই তুলনায় তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি এত অবহেলা আর

কখনও হয় নাই। ইহার স্বাভাবিক ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, সাধারণ নর-ভাগ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি আমরা সহমর্ম্মিতা হারাইয়াছি। এমন-কি, এ-কালের শিল্পী যখন কাহারও প্রতিমূর্ত্তি আঁকিতে বসেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি অতি সামান্য দৃষ্টি দেন।

প্রতীচ্য কুরুক্ষেত্রের আজিকার এই জীবন-যুদ্ধ, জার্ম্মান আত্মাকে ধার-করা কৃত্রিমতা হইতে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে। মিথ্যা সভ্যতার বিষাক্ত বীজ যুদ্ধের ঝড়ে উড়িয়া যাইবে। জার্ম্মান জাতির ভিতরে আজিও যে এই দৈব-প্রেরণার সামর্থ্য, এই আত্মত্যাগের সাহস, এই কর্ত্তব্যের জ্ঞান, এই নির্ভীকতা, এই বিশ্বস্ততা এবং পিতৃভূমির প্রতি এই ভালবাসা সুপ্ত ছিল, এ-কথা এতদিন স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

ফরাসীরা আমাদের ওস্তাদ। আমাদের শিল্পীরা ফ্রান্স হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিত। সে ভাল কথা। জার্ম্মান শিল্পের পক্ষে এই শিক্ষাকাল বাস্তবিক দরকারী ও উপকারী ছিল। কিন্তু সে কাল গিয়াছে। জার্ম্মান শিল্পের জন্য আর ফরাসী আদর্শের প্রয়োজন নাই।

ফরাসী শিক্ষার শান্ত অনুসরণের ভিতরে আমাদের শিল্পধারা প্রায় বদ্ধ হইয়া যাইবার জো হইয়াছিল। কারণ, শিল্পে আমাদের হাত যখন পাকিয়াছিল, আমরা তখন নকল ছাড়িয়া নিজেদের আসল পথটি চিনিয়া লই নাই। সুমুখে পথের কোন চিহ্ন না পাওয়ার দরুণই কি আমাদের এই দশা ঘটিয়াছিল? জাগাইয়া দিবার সোনার কাঠি ছিল না বলিয়াই কি আমাদের প্রাণ সাড়া দিতে পারে নাই! .....আমাদের শিল্প ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ, দরিদ্র ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সঙ্কীর্ণতা, দরিদ্রতা ও বিবর্ণতার মধ্যে সহসা সহস্র হৃদয়ে মহৎ ভাবের প্রবাহ গর্জ্জিয়া উঠিল। আমাদের ভিতরে জীবন ও মৃত্যুর গমনাগমন চলিতে লাগিল।.....—জার্ম্মান কবি এবং পটুয়ার জন্য অসংখ্য উপাদান সৃজিত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমানের ইতিহাস, আমাদের ভবিষ্য শিল্পের সূচীপত্র হইবে। এখন আমাদের ঘরে কোন দামী যুদ্ধ-ছবি নাই। হয়ত' এইবারে আমরা একখানি ভাল ছবি আঁকিতে পারিব। .....হয়ত' যুদ্ধের, ফৌজের, ও সৈনিকের ছবি এইবারে আঁকা হইবে। নয়নমোহন সমরাবেশ এবং সেনাদলের ছন্দ তাল ও লয়ের ভিতরে ললিত কলা এতদিন কোন কারণ খুঁজিয়া পায় নাই; হয়ত' এবারে তাহার সন্ধান পাইবে ..... সে সকল পটের ক্ষেত্রভূমি হইবে জ্বলন্ত গ্রামের পর গ্রাম, ধ্বংশ-স্তূপ দুর্গের পর দুর্গ, পদদলিত শস্যক্ষেত্রের পর শস্যক্ষেত্র এবং হাসপাতালের করুণ দৃশ্য! দুঃখ ও তিক্ত অভাব এবং বিজয়োল্লাস অপেক্ষা গভীরতর আনন্দ, এক মহৎ ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইবে।

পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার অধিবাসীরা এখন অপূর্ব্ব বর্ব্বরতার মুখে পলায়ন করিতেছে এবং আমাদের পশ্চিম সীমান্তভাগে এখন রক্তের তুফান বহিয়া ফরাসী আক্রমণকে ব্যাহত

করিতেছে; আজ আমাদের পিতৃভূমিকে যেমন শ্রীমণ্ডিত দেখিতে হইয়াছে, এমন আর কখনও হয় নাই। ইহার ফলে জার্ম্মান জাতির ব্যক্তিত্ব আবার আমাদের সুমুখে শ্রী-ছাঁদে কমনীয় হইয়া উঠিবে।

The American Review of Reviews হইতে

যুদ্ধের পরে জীবন ও সাহিত্য

*

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস গার্ভিস বলিতেছেন, "সাহিত্য পেলব বলিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহার উপর সহজে রেখাপাত করিতে পারিবে। যুদ্ধ যখন প্রথম সুরু হয়, লেখকদের কলম তখন বেজায় কাহিল। যুদ্ধসংক্রান্ত পুস্তক ভিন্ন আর সমস্ত পুস্তকের বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পড়ুয়াদের মতিগতি প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের দিক হইতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারপর, প্রথমকার উত্তেজনা ধীরে ধীরে থিতাইয়া আসাতে জনসাধারণ আবার ক্রমে ক্রমে পড়া সুরু করিয়াছে। শুনিতেছি, বইয়ের ব্যবসায় আবার চাগিয়া উঠিতেছে এবং কতকগুলি বই আবার পূর্ব্বকার মতই বিকাইতেছে।

খাঁটি সাহিত্যের দিক হইতে দেখিলে বলিতে হয় যে, এখন ও পরের দুতিন বছর ধরিয়া যে-সব বই লেখা হইবে, যুদ্ধের ফলে তাহাদের সুর ও গুণ বদলাইয়া যাইবে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এবং অতীতের কিছুকাল হইতে যে-সকল উপন্যাস লেখা হইতেছিল, তাহাদের প্রতি খুঁটিনাটিটি অবধি লেখকের চোখ এড়াইয়া যায় নাই; জীবনের তুচ্ছ ও ক্ষণিক ব্যাপারটি লইয়াও সে-সকল উপন্যাসে তন্নতন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে।

এমন সময় সহসা অসিতে অসিতে ঝঞ্ঝনা বাজিল, আহতের আর্ত্তনাদ উঠিল এবং মরণ আসিয়া কালো ছায়ার আঁধার ঢালিয়া দিল। পৃথিবী এখন তাহার ঔদাস্য পরিহার করিয়াছে। এ-সময় ছোট-কিছুতে কাহারো মন মজিতে পারে না।

লড়াইয়ের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লোকে আবার কথা-সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে বটে,—কিন্তু আমার বিবেচনায় ভবিষ্য কথা-সাহিত্যের ধরণ-ধারণ হইবে আলাহিদা রকমের। বাজে যা তা গল্প, সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া তিলকে তাল করিয়া বিরক্তিকর আলোচনা, ভবিষ্যতে কেহ চাহিবে না। আমাদের উপন্যাসে আমরা তখন একটা মেরুদণ্ড চাহিব। নিছক প্রেম আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারিবে না। আকাশে-বাতাসে অশান্তি;—মানুষের পর-সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য চেষ্টার কাহিনী এবং উচ্চতর জীবনের জন্য তাহার অন্ধ অথচ উদ্দেশ্যমূলক হৃদয়-সংগ্রামের কথা শুনিবার জন্য তখন আমরা আগ্রহ প্রকাশ করিব। অবশ্য, আমি আমার মন-গড়া কথাই বলিতেছি; কিন্তু, একটি মতে অনেকটা বিশ্বাস করা যায়:—উপন্যাসে

কেহ যুদ্ধ জিনিষটাকে দেখিবার দাবি করিবে না। এই মতের গোড়াপত্তন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার উপরে; বুয়র যুদ্ধের পরে সকল ঔপন্যাসিকই বুঝিয়াছিলেন যে,—অন্য যাহা-কিছু লেখা হোক না কেন,—বুয়র যুদ্ধ লইয়া কোনকিছু লেখা ঠিক নহে।

আজিকার এই মৃত্যুলীলার ভয়ানক আঘাত হইতে যখন আমরা মুক্তি পাইব, আমাদের অন্যায় কাজগুলি যখন আমরা ন্যায়ের দ্বারা যথাসাধ্য সংশোধন করিব, পাপী ও অত্যাচারীকে যখন আমরা দণ্ড দিতে পারিব, তখন যে মহাভীতির ভিতর দিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি এবং যে যন্ত্রণা আমরা সহ্য করিয়াছি, তাহার কথা আমরা যত-কম-পারি শুনিতে চাহিব,—যত-কম-পারি পড়িতে চাহিব!"

ডব্লু, এল, জর্জ্জ বলিতেছেন:—

"যুদ্ধের পূর্ব্বে যে-সকল উপন্যাস লেখা হইয়াছে, তাহাদের একেবারে আমোল না দেওয়া সমালোচকদের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অনেকে বোধ করি ভাবিতেছেন যে, যুদ্ধের পর আমাদের ধাত্ একেবারে বদলাইয়া যাইবে, আমরা একেবারে নূতন মানুষ বনিয়া যাইব। মানুষ নম্র, কঠোর ও সাহসী হইবে, ভোট-ভিখারিণীর দল একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহারা আর ভোট চাহিবে না, কম মাহিনার জন্য আর ধর্ম্মঘট হইবে না, নিরামিষাশীর দল অদৃশ্য হইবে, রুশ নর্ত্তক-নর্ত্তকীর কথা আর আমরা শুনিতে পাইব না, এবং কাল্পনিক চিত্র আর আঁকা হইবে না।

এসব নিরেট বোকার কথা। এ কথা শুনিলে বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে য়ুরোপে যেন আর লড়াই হয় নাই। পূর্ব্বে আমরা যে-সব আন্দোলন করিতাম, যুদ্ধের পরে আমাদের সাহিত্যে যে আবার তাহার সূত্রপাত হইবে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমরা এখন পাগল নায়ক ও নায়িকার পথ চাহিয়া বসি নাই। সমরোন্মাদ ঘুচিয়া গেলে পর, সাহিত্যের সুর আমরা আরও উঁচু-পর্দ্দায় বাঁধিয়া লইব। আমাদের জাতি কখনও পবিত্র, সরল, গম্ভীর ও নির্ব্বোধ হইবে না। (ইতিমধ্যেই ভোট-ভিখারিণীরা জ্বালাতন সুরু করিয়াছে এবং খনিমজুর গোড়োয়ানেরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।) সাহিত্যরসিকের দলও যেমন ছিল, ঠিক তেমনই থাকিবে।"

ষ্টিফেন ফিলিপ্‌স্ বলিতেছেন:—

"আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তাহাতে আমি বিশ্বাস করি যে, যুদ্ধের পরে আমরা কল্পনাবাদী হইব। জার্ম্মানী যে হারিবে, তাহা নিশ্চয়; কিন্তু, Might is Right এই উক্তির জন্য, জোর যার মুলুক তার এই বিশ্বাসের জন্য যে একটা প্রতাপশালী জাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, ইতিহাসে এমন দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। সত্য বটে, নেপোলিয়ন এমনি কল্পনারই অবতার; কিন্তু নেপোলিয়ন একজন দুর্দ্দম প্রভুত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ মাত্র। এখানে আমরা কেবল একজন রাজা বা জনকয়েক রাজপুরুষকেই দেখিতেছি না; পরন্তু, একটি কল্পনার জন্য একটা সমগ্র জাতি তাহার জাতীয়-



অবজ্ঞা

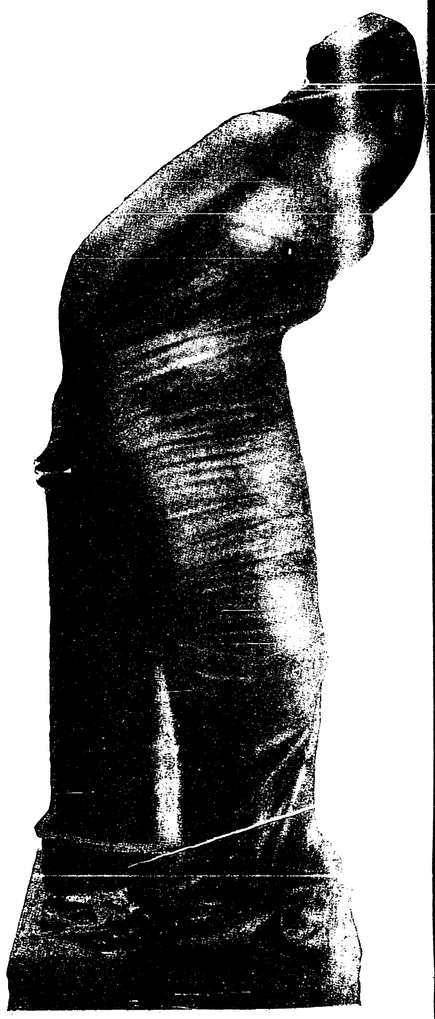

বাঁদী

জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মঙ্গলকে ছাড়িয়া অমঙ্গলকেই বরণ ইহাতে এই বুঝায় যে, প্রবল শক্তি করে।"

—"The Bookman"

আলোক-চিত্রে ভাস্কর্য্যের নকল

আলোক-চিত্র বাস্তবকে হুবহু ফুটাইয়া তোলে বটে, কিন্তু সে যেমন মানুষের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। একালের 'ছায়াবাজী'তে তালগাছের সমান উঁচু, আসল জীবন্ত মানুষের চেয়ে বড়ন্ত মানুষের কাণ্ডকারখানা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। দেখিয়া অবাক হই, কিন্তু ভিতরের লুকাচুরি কিছুতেই ধরিতে পারি না। এগুলি হইতেছে আলোক-চিত্রের জুয়াচুরি।

কিন্তু এখন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য-কলার উপরও নকল হইতেছে। এসকল নকল-করা ছবিতে 'আলোক-চিত্রের কবিত্ব-শূন্য প্রখরতা বা বাস্তবতার কঠোরতা থাকে না; কল্পনার বিচিত্র রং তাহাদের সঙ্গে এমন মিশিয়া যায় যে, ধরিবার-ছুঁইবার আদোপেই যো থাকে না—এমন-কি কলা-রসজ্ঞের তীক্ষ্ণ চোখও এখানে একেবারে হার মানিয়া যায়।

আমরা এখানে ভাস্কর্য্যের দুখানি নকল-পট দিলাম। প্রথম খানি,—মর্ম্মর-মূর্ত্তি এবং দ্বিতীয়খানি—পিতল-মূর্ত্তির অনুকরণ।

মর্ম্মর-মূর্ত্তি নকলের সময়ে, যাহার ছবি লওয়া হইবে, সেই লোকটীর মুখে, গলায় ও হাতে আগে পাউডার ও শাদা চর্ব্বি মাখাইয়া লইতে হয়। মাথায় শাদা পরচুল পরাইতে বা চুলেও পাউডার মাখাইতে হয়। পোষাক একেবারে শাদা হওয়া ঠিক নয়, তাহা ফিকে নীল বা পাটল রঙের হইলে জলজ্বলে শাদা রঙের চেয়ে তাহাতে ছায়ার লীলা ও অন্য সব খুঁটিনাটি বেশ মানান সই দেখাইবে। 'নেগেটিভ' শেষ হইলে, মূর্ত্তির চারিপাশ হইতে 'ক্ষেত্রপৃষ্ঠ' (back-ground) কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহা কোন কালো জমির উপরে বসাইয়া দিতে হইবে।

পিতলের মূর্ত্তি নকলের সময়ে 'মডেলে'র কাপড়চোপড় বেশ সাধারণ ও সাদাসিধা ভাবে রাখা দরকার। দেহে ঘন পিঙ্গল রঙের চর্ব্বি মাখাইতে হইবে। বস্ত্রাদি সাটিনে তৈয়ারি হইলেই ভাল হয়।

এরূপ অনুকৃতি-কৌতুক কাজে খাটাইতে হইলে আরও কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। কিন্তু এখানে সে-সব কথা সবিস্তারে বলিয়া লাভ নাই।

—Pearson's Magazine হইতে

রিম্‌স্ গির্জ্জার ঐশ্বর্য্য

রিম্‌সের গির্জ্জা-তৈয়ারী সুরু হয় ১২১২ খৃষ্টাব্দে। গত সাত শত দুই বৎসরকাল ইহা ফরাসীজাতির ধর্ম্ম-প্রতিভার এবং ললিতকলার অপূর্ব্ব নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান ছিল; সংপ্রতি আধুনিক হুণজাতি ইহাকে ইতিহাসের স্মৃতিতে পরিণত করিয়াছে। বৈশাখের 'ভারতী'তে আমরা রিমসের গির্জ্জার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি; আজ তাহার সহিত আর গোটাকয়েক কথা যোগ করিয়া দিব।

ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও উত্তর জার্ম্মানীতে যখন গথিক ভঙ্গীর অভিব্যক্তি হয় নাই, তখন রোমীয় রচনা-পদ্ধতি অনুসারে সেখানকার গির্জ্জাগুলি তৈয়ার হইত। তাহার পর, সাধারণের সরল কিন্তু গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস যখন প্রকৃতির দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহিল, তখন সেই বিশ্বাসকে বাহিরে ফুটাইবার জন্য গথিক রচনা-ভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার উচ্চ ও বঙ্কিম রেখাবিন্যাস, ইহার কঠিন সংলগ্নতা ইহাকে এমন একটি রূপ ও সম্পূর্ণতা দান করিয়াছিল, কোন কৃত্রিম রচনা-ভঙ্গী যাহা দিতে পারে না। প্রকৃতির দৃশ্যমান ব্যোমচুম্বী অরণ্যপাদপশ্রেণীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, তাহার ধনুকাকৃতি শাখা-প্রশাখা গথিক গির্জ্জাগুলির শ্রেণীবদ্ধ খিলানে সুকৌশলে অনুকৃত হইয়াছে; বনপাদপগুলির মাঝে মাঝে যে অবকাশ থাকে, গির্জ্জার গবাক্ষ-শ্রেণীতে তাহারই অনুকরণ দেখা যায়। উক্ত রচনা-ভঙ্গীর ভিতর কেবল আড়ম্বর দেখাইবার জন্য কোন-কিছুর সমাবেশ নাই। তাহার ভিতরে অপ্রয়োজনীয় কিছুও নজরে পড়ে না। তাহার প্রতি ডিনিয়টিতেই অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে। রচনা-ভঙ্গীর পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তন্মধ্যে ক্রমে ক্রমে ভাস্কর্য্য ও অলঙ্কৃত শিল্পের সমাবেশ ঘটিতে লাগিল। রিম্‌সের গির্জ্জায় এই বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। ভগবানের মহিমা ও মানবের আনন্দ এখানে এক হইয়াছিল; তাই, সর্ব্বযুগের, সর্ব্বকালের ললিতকলার ভিতরেই ইহা উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে।

ফ্রান্সে ও ফরাসী জাতির নিকটে রিমসের গির্জ্জা কতটা মহিমময়, তাহা বুঝিতে গেলে, ইহার নির্ম্মাণকালের সাড়ে তিন শত বৎসর আগেকার ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে। সেই সময়ে রিম্‌সের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন সাধু রেমি। ক্রিশ্চান রাজরূপে রাজা ক্লেভিস, তাঁহার মুকুট-ধারণের স্মরণীয় উৎসব-দিনে সাধু রেমির নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, "তিনি যাহা পূজা করিয়াছেন, তাহা পুড়াইয়া ফেলিবেন এবং তিনি যাহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন তাহা পূজা করিবেন।" রিম্‌সের গৌরব সেইদিন হইতে।

কথিত আছে, যে পবিত্র তৈলে ক্লভিস অভিষিক্ত হন, একটি ঘুঘু তাহা স্বর্গ হইতে সাধু রেমিকে আনিয়া দেয়। ইহার পর ফ্রান্সের অধিকাংশ রাজাই রিম্‌সের গির্জ্জায় এই পবিত্র তৈলদ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছেন। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে যখন Charles VII, রিম্‌সের গির্জ্জায় অভিষিক্ত হন, তখন বীরবালা জোয়ান অফ আর্ক তাঁহার অপূর্ব্ব স্বপ্নের সফলতা দর্শন করেন। রিম্‌সের গির্জ্জায় এই রাজ্যাভিষেক উৎসবটি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। স্বর্গীয় তৈলাধারটি বিদ্রোহ-কালে এক উন্মাদ ভাঙ্গিয়া দেয়; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার তৈলসিক্ত একখণ্ড ভগ্নাংশ রক্ষা পাইয়াছিল! একটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় রত্নখচিত পবিত্র আধারের ভিতর পরে সেই ভগ্নাংশ রক্ষিত হয়। Charles Xএর অভিষেক-ক্রিয়া আবার এই স্বর্গীয় তৈলদ্বারা সম্পন্ন হইল। ফ্রান্সে একটা প্রচলিত কথা আছে যে, কোনরূপ দুর্ঘটনাতেই এই স্বর্গীয় তৈল একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার নহে।

মধ্যযুগে গির্জ্জা কিরূপে যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত বিষয়। পুরোহিতেরা ইহা একটি ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া প্রচার করিলেন, রাজগণ ইহার জন্য সকলকে উৎসাহ দান করিলেন, এবং সাধারণে একাগ্র চিত্তে আপনাদের অর্থদান করিল। রিম্‌সের নাগরিকেরা তাহাদের অপূর্ব্ব গির্জ্জার কথা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, তাহার কারুকার্য্য লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল এবং তাহার ক্রমবর্দ্ধমান সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনাদের মনে গর্ব্বানুভব করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যত বাক্যব্যয় করিয়াছিল, তার চেয়ে কাজ করিয়াছিল ঢের বেশী। তাহারা সাধারণ মাহিনা-করা কারিকরের মত এই ধর্ম্ম-মন্দিরের গঠনে হস্তার্পণ করে নাই। তাহারা হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি, প্রাণের সমস্ত কামনা, হস্তের সমস্ত নিপুণতা দিয়া এই ধর্ম্ম-ভবনকে ক্রমেই পৃথিবী হইতে স্বর্গের দিকে টানিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যাহা করিয়াছিল, একালের কোন কারিকরই ঘড়ী ও মাহিনার দিকে চোখ রাখিয়া তাহা করিতে পারিবে না।

রিম্‌সের গির্জ্জার সম্মুখাংশ যেন পাথরের একখানি বাইবেল! সেকালে পুঁথির লেখা পাতা পড়িতে পারে, এমন লোক সংখ্যায় বড় বেশী ছিল না। অতএব, পাথর বা কাঠের ফলকের উপর বাইবেলের গল্প-গুলিকে ছবিতে খুদিয়া খুদিয়া এমন পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইত যে, চোখে পড়িলেই লোকের তাহার মানে বুঝিতে দেরি হইত না।

তবে, এই খোদাই-করা গল্প-চিত্রগুলি যে একেবারেই ধর্ম্মমূলক ছিল, তাহা নহে। সেকালে খবরের কাগজ ও মাসিক কাগজ ছিল না ত! সুতরাং যে-সব শিল্পী ছিলেন হাস্য-রসিক, তাঁহারা মনের কথা জাহির করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইয়া এই ধর্ম্মালয়ের দেয়ালে দেয়ালেই হাসির ছবি খুদিতেন ও লোক হাসাইতেন! তাঁহাদের তীক্ষ্ণ চোখ হইতে রাজা বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ বা সন্ন্যাসী বা নাগরিক—কাহারও ছাড়ান্ ছিল না,—তাঁহাদের আঁকা ব্যঙ্গ-পট সকলেরই প্রতি সমান নিষ্ঠুর!

রিম্‌সের একটি প্রবাদ আছে যে, সাধু রেমি সহর হইতে মানুষের অনিষ্টকারী ভূতের দলের আড্ডা ভাঙ্গিয়া সকলকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। খোদাইকার এক যায়গায় সেই গল্পের

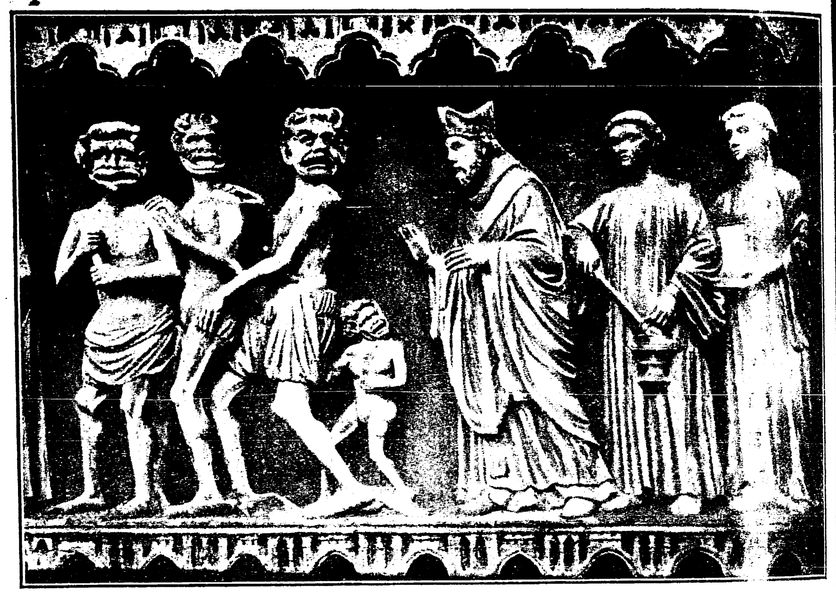

সাধু রেমি ভূত তাড়াইতেছেন

ছবিটি খুদিয়াছেন। যে ভূতটি পালের একটা বাচ্ছা ভূত লইয়া দাঁত খিঁচাইয়া গোদা, সেটা ভারি বদমায়েস; সে তার সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, কিছুতেই এ পা নড়িতে

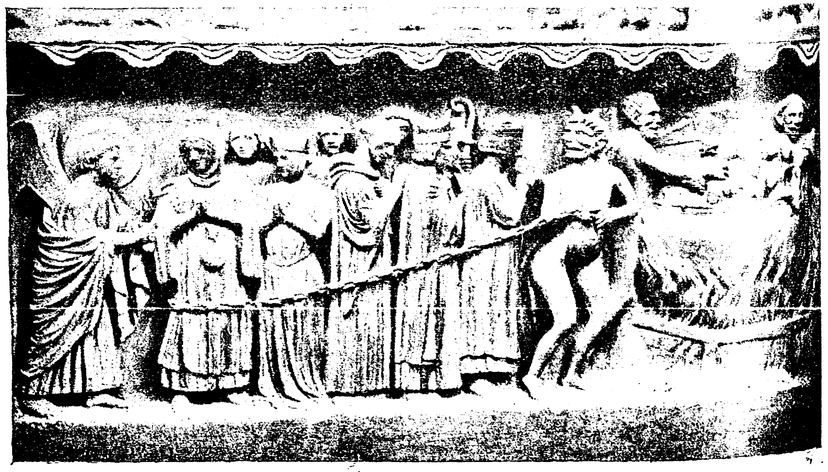

নরকে পাপীর সাজা

রাজি নয়! সাধু অনেক ঝাড়্‌ফুক্ করিয়া ও মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াইয়া তবে তাহাকে তাড়াইতেছেন। আর দুইটা ভূতের একটা, সাধুকে জিভ্ বাহির করিয়া বেজায় ভ্যাংচাইতেছে ও আর একটা এ-সব খুব মস্ত-রকমের ঠাট্টা ঠাওরাইয়া হা হা করিয়া হাসিতেছে! ইহাই হইল ছবির বিষয়।

আর এক জায়গায় নরকের কাণ্ড-কারখানা। আগুনের উপরে একখানা কড়া এবং তাহার ভিতরে পাপীদের ফেলিয়া যমদূতেরা আচ্ছা করিয়া ভাজিতেছে! আর একদিকে আর এক দল পাপীকে লোহার শিকলে বাঁধিয়া আনা হইতেছে। দলের প্রথমেই আসিতেছেন, একজন রাজা, তারপর এক ধর্ম্মাধ্যক্ষ, তারপর এক সন্ন্যাসী! এ ছবি যে খুদিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার বুকের পাটা খুব শক্ত ছিল!

—Munsey's Magazine হইতে

শ্রীপ্রসাদদাস রায়

দেববর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা

ব্রাহ্মণের 'দেবশর্ম্মা' ও ক্ষত্রিয়ের 'দেববর্ম্মা' যে সাধারণ উপাধি তাহা সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত মূল ও তাৎপর্য্য আমাদের নিকট তেমন সুস্পষ্ট নহে। আলোচনাদ্বারা এতৎসম্বন্ধে কিরূপ তথ্য লাভ করা যাইতে পারে—তাহা দেখিবার জন্যই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

'দেব' শব্দের অর্থ আমাদের সকলেরই নিকট সুগম। সুতরাং প্রথমে আমরা 'শর্ম্ম' ও 'বর্ম্ম' শব্দের অর্থেরই আলোচনা করিব। 'শর্ম্ম' শব্দ আমরা অভিধানে সুখার্থক দেখিতে পাই। যথা—'শর্ম্মশাত সুখানিচ।' রঘুবংশে কালিদাস শর্ম্ম শব্দের ব্যবহার এই অর্থেই করিয়াছেন। যথা—"সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যাহি পরত্রেহচ শর্ম্মণে॥" 'বর্ম্ম' শব্দটী বৃধাতু হইতে উৎপন্ন। বৃধাতুর অর্থ আবরণ। ইহা হইতে 'বর্ম্ম' শব্দটীর অর্থ আবরণ ও রক্ষা হয়। বীর পুরুষেরা শরীরে যে 'বর্ম্ম' ধারণ করে তাহাতে আবরণ ও রক্ষা উভয়ার্থই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে 'দেব' শব্দ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নামের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইয়াছে তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। অভিধানে সন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ 'ভূদেব' নামে আখ্যাত ও রাজা 'নরদেব' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। রাজাকে আমরা শুধু 'দেব' নামেও আখ্যাত দেখিতে পাই। যথা—"রাজা ভট্টারকো দেবঃ॥" ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা দেবকার্য্যে নিরত থাকিতেন বলিয়া অধিক আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বিশিষ্ট হওয়াতেই যে 'দেবতুল্য' অর্থেই 'দেব' বলিয়া আখ্যাত হইবেন এবং ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হওয়াতেই দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই যে

'দেব' নামে কথিত হইবেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মহর্ষি মনু রাজার শক্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও আমরা ইহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হই। যথা—

"অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি র্নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষঃ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥"
"বালোঽপি নাবমন্তব্যঃ পার্থিবইতি ভূমিপঃ।
মহতীদেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥"

এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও রাজার পূর্ব্বোক্ত 'দেব' আখ্যার সহিত যথাক্রমে 'শর্ম্ম' ও 'বর্ম্ম' শব্দের যোগ হইলা কি অর্থ হয় তাহাই আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব। এই যোগে 'দেবশর্ম্মা' শব্দের অর্থ ইহাই হয় যে যিনি দেবরূপে শর্ম্ম অর্থাৎ সুখ বিধান করেন এবং 'দেবশর্ম্মা' শব্দের অর্থ ইহাই হয় যে যিনি দেবরূপে বর্ম্ম অর্থাৎ রক্ষা বিধান করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রথম এই 'দেবশর্ম্মা' নাম হইতে কালে ব্রাহ্মণ জাতি মাত্রেই 'দেবশর্ম্মা' নামের অধিকারী হইয়াছেন এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন রাজার প্রথম এই 'দেববর্ম্মা' নাম হইতে রাজার জাতি বা ক্ষত্রিয় মাত্রেই 'দেববর্ম্মা' নামের অধিকারী হইয়াছেন।

শর্ম্ম বা সুখবিধানের মুর্য্যার্থতা হইতে আমরা দেবশর্ম্মার পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে কেবল 'শর্ম্মাও' ব্রাহ্মণের নামের অন্তে সংযুক্ত দেখিতে পাই এবং বর্ম্ম বা রক্ষার মুর্য্যার্থতা হইতে আমরা দেববর্ম্মার পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে কেবল 'বর্ম্মাও' ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে সংযুক্ত দেখিতে পাই। এখানে আমরা কয়েকটী শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতেছি—তাহা হইতে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য বিশেষরূপেই উপলব্ধি হইবে:—

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমে হনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত বিষ্ণুপুরাণ।
"শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্ম ত্রাতাচ ভূভুজঃ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত যমবচন।
"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত শাতাতপ বচন।

জগতের হিতসাধন ব্রাহ্মণের ব্রত ও রক্ষাসাধন ক্ষত্রিয়ের ব্রত। তাহাতেই পুরাণাদিতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ জগতের শ্রেয়ঃ সাধন জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন আর ক্ষত্রিয় সমস্ত উৎপাত উপদ্রব নিবারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সাহায্য করিতেছেন। বিশ্বামিত্র ঋষি এই সাহায্যের জন্য দশরথের নিকট হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অতি পুরাকালেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এইরূপে এক স্বাভাবিক সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা শাস্ত্রের মধ্যেও ইহার অনুমোদন দেখিতে পাই। যথা—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রেতু সম্পক্তে ইহচামুত্র ঋধ্নুতঃ॥"

ভট্টিকাব্যে ইহারই অনুবাদে লিখিত হইয়াছে:—

"ময়াত্বমাপ্সথাঃ শরণং ভয়েষু
বরং ত্বয়াপ্যাপ্স্যহি ধর্ম্মবৃদ্ধে।
ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থম্
শঙ্কাং কৃথা মা প্রহিনু স্বমূনুম্॥" ২১
১ম অধ্যায়।

ইহা হইতে পৃথিবীর শর্ম্ম ও বর্ম্মরূপ দেবোচিত কার্য্যে পরস্পর সহকারিতা হইতেই যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সাধারণ একই 'দেব' নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

দৈবকার্য্যে পরস্পর সহযোগিতা করিয়া যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পৃথিবীতে ও সমাজে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তদ্রূপ জগতের অন্যান্য সাধারণ কার্য্যেও তাঁহারা দেবভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লিখিত দেবযোগ্য শর্ম্ম ও বর্ম্মভাব সম্বন্ধে অতি সুন্দর চিত্রই প্রাপ্ত হই। এখানে আমরা তাহার একটু আভাস প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের প্রকৃতি কিরূপে সাধারণভাবে জগতের হিতাভিমুখী করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন—

"জপোনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" ৮৭
২য় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কেবল জপদ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিবেন তাহাতে আর সংশয় নাই। বৈদিক যাগাদি অন্য কর্ম্ম করুন্ না করুন্ মৈত্র অর্থাৎ পশু জীবাদির প্রতিহিংসা শূন্য হইয়া জপপরায়ণ হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।

"অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্প দ্রোহেণবা পুনঃ।
যাবৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রোজীবেদনাপদি॥" ২
১ম অধ্যায়।

"বিপৎ উপস্থিত না হইলে বিপ্র ভূতহিংসা না করিয়া বা সামান্য হিংসা করিয়া যাহাতে জীবন যাপন করিতে পারে তাহাই করিবেন।

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের রক্ষারূপ লক্ষ্য লইয়াই যে রাজা জন্মগ্রহণ করেন তৎসম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন:—

"স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা॥" ৩৫
৭ম অধ্যায়।

"স্বধর্ম্মনিরত আনুপূর্ব্বিক সকলবর্ণ ও আশ্রমের সম্যক্ অভিরক্ষকরূপে রাজা সৃষ্ট হইয়াছেন।"

উল্লিখিত মঙ্গল ও রক্ষাভাবকে জীবনে চির উদ্বোধিত রাখিবার জন্য নামকরণের মধ্যেই যেমন তত্তৎভাব সন্নিবেশ করার বিধান মহর্ষি মনু করিয়াছেন—তেমনই নামের অন্তে তত্তৎভাবের স্পষ্টবোধক শর্ম্ম ও বর্ম্ম শব্দ সংযোগের বিধানও তিনি করিয়াছেন। যথা—

"নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ॥ ৩০
মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্॥ ৩১
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্॥ ৩২
২য় অধ্যায়।

"দশম বা দ্বাদশ দিবসে জাত বালকের নামকরণ করিবে॥" ৩০

"ব্রাহ্মণের মঙ্গল বাচক ও ক্ষত্রিয়ের বল বাচক নাম রাখিবে॥" ৩১

ব্রাহ্মণের শর্ম্মযুক্ত ও ক্ষত্রিয়ের রক্ষাসূচক বর্ম্ম, উপপদযুক্ত করিবে॥" ৩২

প্রাপ্তপ্ত শর্ম্ম ও বর্ম্মভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সাহচর্য্যের স্পষ্ট বিধিও মনু এইরূপে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যান্ বৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে॥" ৩৭
৬ষ্ঠ অধ্যায়।

"রাজা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঋক্‌যজুঃসাম এই বেদত্রয়ের মর্ম্মার্থাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিবেন, এবং তাঁহারা যে সকল আদেশ করেন, তৎসমস্ত প্রতিপালন করিবেন।"

"ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্॥" ১
৮ম অধ্যায়।

"বিচার দর্শনেচ্ছু রাজা ব্রাহ্মণও মন্ত্রনাভিজ্ঞমন্ত্রিগণ সহ বিনীতভাবে সভায় প্রবেশ করিবেন॥"

রাজা স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণকেই নিজ প্রতিনিধি পদে বরিত করিবার বিধিও মনু করিয়াছেন। যথা—

"যদাস্বয়ং ন কুর্য্যাত্ত নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনম্।
তদানিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥ ৯
সোঽস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা॥" ১০

"যখন রাজা স্বয়ং কার্য্যদর্শন করিতে না পারিবেন তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য নিযুক্ত করিবেন।" ৯

"তিনি তিনজন সভ্যসমবেত হইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া তথায় উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।" ১০

এই প্রকারে ব্রাহ্মণের শর্ম্মভাব ও ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মভাবের সংমিশ্রণে এক সময়ে ভারতবর্ষে সুখশান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত স্বর্গরাজ্যের উপর অধিষ্ঠান করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে আপনাদের নিমিত্ত যে দেব-আদর্শ গঠন করিতে হয় তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের শর্ম্ম ও বর্ম্ম এই উপাধি নামের পূর্ব্বে 'দেব'শব্দ সংযুক্ত হইয়া তাঁহারা যথাক্রমে দেবশর্ম্মা ও দেববর্ম্মা এই সাধারণ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

উপরে আমরা দেবশর্ম্মা ও দেববর্ম্মা নামের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে আমরা ইহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উপরে আমরা পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতি সংহিতাদির যে সমস্ত বচনে 'শর্ম্ম' ও 'বর্ম্ম' এবং 'দেব' পূর্ব্বক উভয় শব্দের উল্লেখ পাইয়াছি তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রসকলের পূর্ব্বেই যে এই সমস্ত উপাধির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যে আবহমানকাল হইতে শর্ম্মাদি শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় তাহাতেও ইহাদের প্রাচীনত্ব প্রখ্যাপিত হয়।

'শর্ম্ম' ও 'বর্ম্ম'শব্দের এবং 'দেব' শব্দের সহিত ইহাদের সংযোগের এইরূপ প্রাচীনত্ব ও ইহাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ শাস্ত্রোক্তি হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, স্মরণাতীতকালেই হিন্দুসমাজ ও জীবনের আদর্শ কিরূপ স্বর্গীয় ভাবানুভবতার দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছিল।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বামী

(গল্প)

আরাকান হইতে নবাবের ফৌজ তখন দিল্লী ফিরিতেছিল। পথে বাংলা দেশে এক গ্রামের বুকে তাহাদের তাঁবু পড়িল। কয়দিন বিশ্রাম করিয়া সকলে একটু জুড়াইয়া লইবে।

পরদিন ফৌজ দেখিতে দলে দলে বালক বৃদ্ধ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। প্রথমে ভয়ে তাহারা দূরে দূরে রহিল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখিল, যে উহারা তাহাদেরই মত হাসে, গল্প করে, তখন তাহাদের ভয় ভাঙ্গিল এবং সকলে কাছে গিয়া নানা প্রশ্ন তুলিয়া অলীক বীরত্বের অসংখ্য কাহিনী শুনিতে লাগিল।

এই ক্ষুদ্র দলের সর্দ্দার ছিল, এক মুসলমান যুবা। নবাবের সহিত তাহার না-কি কি সম্পর্ক ছিল; তাই সে অল্প বয়স হইতেই ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে শিখিয়াছিল। ক্ষমতাকে নিজের বিলাসের জন্য খরচ করিতে সে ভাল করিয়াই জানিত। যুবা বিবাহ করে নাই, কোনরূপ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে মোটেই তাহার ইচ্ছা ছিল না।

বৈকালে যুবা গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। সে গ্রামে শুধু হিন্দুর বাস, ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল; কিন্তু ধনী তেমন কেহই নহে।

তিনজন অনুচরকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে যুবা গ্রামের পথে বাহির হইল। দৃষ্টি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিল। চলিতে চলিতে পথের ধারেই তাহারা সুন্দর পরিচ্ছন্ন একখানি বাড়ী দেখিতে পাইল। যুবা ক্ষণকাল পথে দাঁড়াইল।

বাড়ীর মালিক বামাচরণ ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল; জায়গা-জমি যথেষ্ট আছে। নিজে তিনি পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বাড়ীটি এমন মাজা-ঘসা, অন্দর-বাহির এমন সুন্দরভাবে নিকানো, ঝাঁট দেওয়া, যে দেখিলেই বেশ একটা স্নিগ্ধ আরাম ও পবিত্রতার ভাব মনে জাগিয়া উঠে। যুবা কিন্তু এ সব কিছু দেখিতেছিল না। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল। সে দেখিতেছিল, এক কিশোরী সদ্য স্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে গৃহপার্শ্বস্থ পুষ্করিণী হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে, কাঁখে তাহার জল-ভরা কলসী! তাহার সিক্ত-বাস-লিপ্ত নিটোল পরিপূর্ণ দেহ হইতে সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ক্ষুদ্র ঘোমটাখানি তাহার স্নিগ্ধ রমণীয় মুখের অতি অল্পটুকুই ঢাকিতে পারিয়াছিল; বাকিটুকু অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি মাখিয়া এমন অপূর্ব্ব শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছিল যে যুবা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কিশোরী ছায়া-শ্যামল

পথ ধরিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। দৃষ্টি তাহার নত, গতি ত্রস্ত।

কিশোরী দৃষ্টির অন্তরালে গেলে যুবা সঙ্গীদিগকে বলিল, "বুঝলে ত,—আজই। বিশ-বিশ আসরফি বখ্‌সিস মিলবে!"

সঙ্গীরা বলিল, "আলবৎ, কুছ পরোয়া নেই।" তারপর বাড়ীটার অবস্থান ভাল করিয়া সকলে দেখিয়া লইল। যুবা খুসী হইয়া আতর-মাখা গোঁফে চাড়া দিয়া ধীরে ধীরে ঘোড়া হাঁকাইয়া অগ্রসর হইল।

২

গভীর রাত্রে গ্রামবাসীরা শুনিল, বামাচরণ ভট্টাচার্য্যের গৃহে মহা-সোরগোল। সকলেই ঠিক করিল, ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। তখন যাহার যাহা-কিছু লুকাইবার ছিল, সব লুকাইয়া ফেলিল। স্ত্রী-লোকেরা ছেলে-পিলে লইয়া খাটের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কোন কোন ব্রাহ্মণও যে ব্রাহ্মণীর সহিত মশক-সঙ্কুল খাটের নীচে প্রবেশ না করিলেন, এমন নহে। সকলেই কম্পমান বক্ষে নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল—ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ছাড়িয়া ডাকাতেরা কখন্ কাহার বাড়ী চড়াও হয়, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই!

কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর গণ্ডগোল থামিয়া গেল। তখন সকলেরই বুকের স্পন্দন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। এইবার না জানি আবার কাহার সর্ব্বনাশ হয়! কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্তও যখন আর কোন নূতন আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইল না, তখন সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—ঠাকুর এবার খুব রক্ষা করিয়াছেন।

নিজ নিজ বিপদের আশঙ্কা যখন কাটিয়া গেল, তখন তাহাদের হৃদয় বেচারা বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের জন্য সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। অনেকেই গৃহিণীর ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও অসীম সাহসে ভর করিয়া পাট-মোড়ার আঁটি বাঁধিয়া বড় বড় মশাল জ্বালিল, তারপর দল বাঁধিয়া সকলে ভট্টাচার্য্যের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভট্টাচার্য্য শিরে করাঘাত করিয়া যখন তাহাদিগকে জানাইয়া দিল যে দুর্বৃত্তেরা তাঁহার লক্ষ্মী-স্বরূপিণী পুত্রবধূ নয়নতারাকে লইয়া গিয়াছে, তখন সকলেই বিস্ময়ে বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িল। কাহারও মুখে একটিও কথা সরিল না।

কিন্তু বেচারা বৃদ্ধকেও ত সান্ত্বনা দেওয়া চাই! তাই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একে একে প্রত্যেকেই বৃদ্ধকে বুঝাইতে লাগিল, ভগবানের যাহা ইচ্ছা, কে তাহা খণ্ডাইতে পারে? বৃথা শোক করিয়া কোন লাভ নাই, ভগবানের কার্য্য মাথা পাতিয়া লওয়াই বিধেয়! যদিও সকলে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার মত প্রবীণ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ-সব কথা বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র, তবুও উপদেশ দিতে কেহই ছাড়িলেন না। এমন কি, এখন কর্ত্তব্য কি তাহাও স্থির হইয়া গেল! যাদব তর্কালঙ্কার লোকটা যদিও গরীব, কিন্তু তাহার মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী,—তাহার সহিত পুত্রের বিবাহটা শীঘ্র দিয়া ফেলিলে উপযুক্ত পুত্রবধূর অভাব অচিরেই মোচন হইবে।

বৃদ্ধ কোন কথা বলিলেন না। পুত্র

রমানাথ ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া ক্রোধ, বিষাদ, করুণা প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তিগুলা একটা প্রবল ঝড় বহাইয়া তুলিয়াছিল। ঝটিকার প্রথম বেগ একটু শান্ত হইয়া আসিলে রমানাথ বুঝিতে পারিল, রমণীকে উদ্ধার করিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই—বিধাতার এ নিষ্ঠুর বজ্র বুক পাতিয়াই তাহাকে লইতে হইবে! তখন তাহার হৃদয় এই অসহায়া রমণীর জন্য করুণায় ভরিয়া উঠিল। একে একে অতীত জীবনের ছবিগুলি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই ছয় বৎসর পূর্ব্বে বারো বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকার সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার যখন সে গ্রহণ করে, তখন হইতে কত ভাবেই না বালিকাকে সে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে! তারপর ধীরে ধীরে তরুণী যখন তাহার সদ্য-মুঞ্জরিত যৌবন লইয়া নিতান্তই আশ্রয়ের মত তাহাকে লতাইয়া ধরিল, তখন তাহার জীবনে কি মধুর বসন্তের হাওয়া বহিয়া গেল—তাহার সকল হৃদ্-কমল সঞ্জীবিত করিয়া এক নূতন পুলক জাগিয়া উঠিল। ইহার পর এ কয় বৎসর সে কি অনাবিল আনন্দেই যে কিশোরীর সাহচর্য্য ও পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে! আর আজ! কোন্ দস্যু তাহার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া এমনভাবে তাহার জীবনটাকে বিপদের ঘন অন্ধকারে পূর্ণ করিয়া দিল!

রমানাথ কিছুতেই তাহার হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিল না—বিধাতার এই কঠোর বিধান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত হৃদয়ের বল কিছুতেই সে আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিল না। তাই উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পাগলের মত সে কেবল উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে পাড়ার সমবেদনাকারীর দল যখন ছিলিমের পর ছিলিম পুড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন একে একে সকলেই শেষ উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় লইল।

৩

রাত্রি প্রভাত হইল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সকলের শোক আরও বাড়িয়া উঠিল—পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেই দুঃখ যেন ভীষণ নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।

ক্রমে বেলা বাড়িল। হা-হুতাশ কমিয়া আসিতে লাগিল। বিরস বদনে ধীরে ধীরে যে যাহার কাজে মন দিতে সুরু করিল। সংসারের খুঁটিনাটি সব কাজই আবার পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। কিন্তু একটি প্রাণ শুধু কিছুতেই আর নিজেকে গুছাইয়া লইতে পারিল না। সারাটা দিন নিশ্চল নিস্তব্ধভাবে রমানাথ তাহার ঘরে বসিয়া কাটাইয়া দিল। কাহারো কথা শুনিবার বা মুখের দিকে চাহিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

আবার সন্ধ্যা নামিল। আজ সন্ধ্যার আকাশে বাতাসে যেন ছিন্ন হৃদয়ের রক্তের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রক্তের বন্যা গ্রামস্থ দেবালয়ের সন্ধ্যারতির কাঁশর ঘণ্টার রবের সহিত মিশিয়া রমানাথের রুদ্ধ ঘরে ঢুকিয়া তাহার চারি পাশে একটা করুণ মায়াময় আবেশের সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

আপনা হইতেই রমানাথের চোখ বুজিয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরেই সারাদিনের অবসন্নতায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। পাড়ার লোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; চতুর্দ্দিক নীরব নিস্তব্ধ। খানিকটা চাঁদের আলো জানালা দিয়া তাহার বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমটা কিছুই তাহার মনে পড়িল না—কিন্তু বোধ হইতে লাগিল, যেন কি একটা ভীষণ কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। ক্রমে সব তাহার মনে পড়িল। তখন আবার নূতন করিয়া শোকাবেগ তাহার হৃদয়টাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। রজনীর নিস্তব্ধতায় চাঁদের জ্যোৎস্নায় দুঃখ তাহার আরো ঘনাইয়া উঠিল। একটি দিনের ভিতর তাহার জীবনের উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের কি এ দারুণ বন্যা বহিয়া গিয়াছে!

আশে-পাশে তাহার স্ত্রীর কত স্মৃতি পড়িয়া রহিয়াছে! সে একে একে সব দেখিতে লাগিল; ঘরের প্রত্যেক স্থানেই তাহার স্ত্রীর কর্ম্মকুশলতার পরিচয় বর্ত্তমান! এমন কি, তাহার মাথার কাছে স্ত্রীর সেই বালিশটিতে এখনো তাহার চুলের স্নিগ্ধ গন্ধ জাগিয়া রহিয়াছে—সমস্তই আছে! নাই শুধু সেই সহাস সুন্দর মুখখানি!

রমানাথ শুইয়া পড়িয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। যতই ভাবে, ততই স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ তাহার বাড়িয়া উঠে। ততই আরও বেশি করিয়া মন তাহার ক্লিষ্ট হয়। এমন সময় হঠাৎ রমানাথ চমকিয়া উঠিল—সে দেখিতে পাইল, তাহার সম্মুখে খোলা দরজার মাঝখানে নয়নতারা দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার সারাদেহে চাঁদের আলো লুটাইয়া পড়িয়াছে। ছুটিয়া গিয়া রমানাথ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর ঘরের ভিতর তাহাকে লইয়া আসিল।

৪

রমানাথ নয়নতারার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি কেন মিছে ভেবে কষ্ট পাও! আমি তোমাকে কতবার বলব নয়ন, তোমাকে গ্রহণ করতে আমার মনে এতটুকু দ্বিধা নেই!"

নয়নতারা বলিল, "কিন্তু আমার যে মনে হয়, আমার কপাল ভেঙ্গেছে, নইলে এমন ঘটত না। আমার সমস্ত দেহ যে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে—যেখানটা তুমি স্পর্শ করছ, সেখানে কি যে একটা আরাম পাচ্ছি, তোমাকে তা বোঝাতে পারব না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য হয়ে পড়েছি। তোমাকে আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে দিয়ে যেন আমার পাপের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলছি!"

রমানাথ দেখিল, নয়নতারার মুখ হতাশের কালিমায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে! সে মুখে কোনদিন যে হাসির উজ্জ্বলতা বিরাজ করিত, কল্পনাতেও আজ তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সে বলিল, "মিছে কেন কষ্ট পাও? তুমি কি বুঝতে পার না, দেহটা আমাদের কিছু নয়। মনটাই আসল। আমি ভালবাসি তোমাকে, তোমার দেহটাকে নয়। তুমি

কি মনে কর, তোমার দেহের একটা-কিছু হলে—রোগ হয়ে তোমার একটা হাত খসে গেলে তোমাকে আমি ভালবাসব না? তোমার কি কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে? তুমি যা ছিলে, তাই আছ। রোগ তোমার দেহের উপর অত্যাচার করে না? রোগ সেরে গেলে কেউ কি তা মনে করে কষ্ট পায়? মনে রেখো, আমাদের সম্পর্ক দেহ নিয়ে নয়। যতদিন মন আমাদের একনিষ্ঠ হয়ে পরস্পরে অনুরক্ত থাকবে, ততদিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বাইরের কোন আঘাতই ভাঙতে পারবে না। মিছি-মিছি যা-তা ভেবে মনকে আর কষ্ট দিয়ো না।"

স্বামীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া নয়নতারা আনন্দে গর্ব্বে কাঁদিয়া ফেলিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "যখন নরাধমদের তাঁবু থেকে পালিয়ে আসি, তখন মনে ঠিক করেছিলুম, আমি আত্মহত্যা করব, এ পাপ মুখ লোক-সমাজে আর দেখাব না। কেন জানি না, ইচ্ছা হল, তোমাকে একবার শেষ দেখা দেখে যাই। তাই বাড়ীতে এলুম। কিন্তু এখন আর আমার কোন ক্ষোভ নেই, কোন লজ্জা নাই। তোমার চরণে যখন স্থান পেয়েছি, তখন আর আমার কিসের ভয়!"

৫

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল, ভট্টাচার্য্যের বউ ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা দুই দিন নয়নতারার জন্য এতখানি শোক করিতেছিল, তাহারা কেহই এ সংবাদে এতটুকু আনন্দিত হইল না। বেচারী এখন কোথায় দাঁড়াইবে, সেই ভাবনাটাই সকলের কাছে এখন বড় হইয়া উঠিল। কারণ এটা ধ্রুব সত্য যে, তাহাকে সমাজে আর স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাছে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য স্নেহবশতঃ এমন-একটা কিছু করিয়া বসেন, যাহার জন্য হয় ত তাঁহাকে সমাজের কাছে জবাবদিহী করিতে হয়, তাই গ্রাম্য সমাজ পতিরা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া গেলেন যে ভগবান যাহার কপাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহার আর কি করিতে পারে? পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে—সমাজের চেয়ে ত আর বউ বড় নয়!

কাজেই বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যকে অনেক কাসিয়া গলা ঝাড়িয়া অপর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুত্রকে বলিতে হইল, "বাবা, দেখ, কি করব,—ধর্ম্ম মেনে, সমাজ মেনে ত চলতে হবে। তোমাদের অল্প বয়স, ও সবের ধার বড় ধার না। কিন্তু তাই বলে ত আর তোমাদের আমি সমাজচ্যুত করে রেখে যেতে পারি না। তোমার কপালে যখন ভগবান দুঃখ লিখেছেন, তখন তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না; নইলে অমন সোনার বউকে কেন ত্যাগ করতে হবে! বউমাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে বিদায় করে দাও,—বলে দাও, যেন বাকি কটা দিন ধর্ম্মে মন রেখে নবদ্বীপে বা কাশীতে কোথাও তিনি কাটিয়ে দেন।...আর দেখ, যাতে আজই তিনি চলে যান্, তারও বিহিত করে দাও। নইলে কে আবার কি বলবে, তার ঠিক নেই।"

এ কথা যে রমানাথকে শুনিতে হইবে,

তাহা সে জানিত এবং সে জন্য সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াও রাখিয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রেই নিজের কর্ত্তব্য সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি অপরাধে তাকে ত্যাগ করতে আদেশ করছেন?"

পুত্রের প্রশ্নে পিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি অপরাধ! কেন, সে যে এখন পতিতা!"

রমানাথের আজ বিদায়ের দিন; তাই সে আজ নিজের কথাগুলি বলিবার জন্য শুধু সুযোগ খুঁজিতেছিল। সে বলিল, "দুর্বৃত্তেরা তার উপর বল প্রকাশ করেছে বলে পতিতা হল, সে! সে কি কোন অপরাধ করেছে যে, সমাজ তাকে শাসন করবে? দুঃখে অপমানে নিজেই সে মরে আছে, কোথায় সকলে তাকে সান্ত্বনা দেবে, তা না আরো মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে!" বৃদ্ধ কহিলেন, "কি করবে! সমাজে থাকতে হলে—" রমানাথ বাধা দিয়া কহিল, "যে সমাজ শুধু বর্জ্জন করতেই জানে, মার্জ্জনা জানে না, সে সমাজ ভগবান আমার জন্য সৃষ্টি করেন নি।"

পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অবাক হইয়া রহিলেন। রমানাথ বিলম্ব না করিয়া পিতার সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিল।

* * * *

গভীর রাত্রে রমানাথ ও নয়নতারা গৃহ পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইল। নয়নতারা বলিল, "দেখ, তোমাকে আবার বলছি, আমার জন্য কেন তুমি সব ত্যাগ করবে? তুমি থাক, আমি একা যাই। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।"

রমানাথ বলিল, "তোমার অদৃষ্ট আর আমার অদৃষ্ট যে ভগবান একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন, এ কথা তোমাকে কতবার বোঝাব? তুমি কি মনে কর, তুমি বিদেশে বিপাকে পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি এখানে বড় আরামে বাড়ীতে শুয়ে ঘুমোব?"

নয়নতারার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া সে বলিল, "এত দিন তোমাকে চিনতে পারি নি। সত্যি বলছি, তুমি দেবতা!"

রমানাথ তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দেবতা নই নয়ন, শুধু তোমার স্বামী।"

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

কোষ্ঠী-বিচার

[পণ্ডিত-সম্রাট্, শাস্ত্র-বিদাম্বর, শ্রীমৎ নবকুমার কবিরত্ন, জ্যোতির্ব্বেদী, ভৃগুভূষণ, মিহির-মহার্ণব, খনা-বচন-খনিত্র, বরাহ-বিদ্যা-বারিধি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি কৃতম্- সারত্বাৎ Sirস্য চিত্ত-চিকিৎসকস্য ডাক্তারস্য ঠাকুরোপাধিকস্য শ্রীরবীন্দ্রনাথস্য শুভ-কোষ্ঠী-বিচারম্।]

"নমো ভৃগুসংহিতায়ৈ নমঃ শ্রীভৃগবে নমঃ।
মুদ্রায়ৈ তু সমুদ্রায় সামুদ্রিকায় এবচ॥"

ভৃগুসংহিতাকে নমস্কার করি; শ্রীমদ্ ভৃগুকে নমস্কার করি; সামুদ্রিক বিদ্যাকে সহিত বর্ত্তমান তাঁহাকে নমস্কার করি; নমস্কার করি। সমুদ্রকে অর্থাৎ যিনি মুদ্রার

আর যাঁহারা ভুবনকে মোদিত করেন সেই শত্রুমর্দ্দন আনন্দবর্দ্ধন মুদ্রা-সকলকে আমি শত শত নমস্কার করি।

"গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী গোকুলানন্দ গোপ-গোপিকা কান্ত গোবিন্দ আমাকে গো-ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত জানিয়া কোনো মতেই আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না"—ইহা সোপলক্ষে জানিয়াই যিনি শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন সেই লোকচরিত্রজ্ঞ বিজ্ঞবর ভৃগু-মুনিকে আমি নমস্কার করি। যিনি গণকদিগের আদর্শী ও ভৃগুসংহিতার জনক সেই শাস্ত্রকর্ত্তা আদর্শপুরুষ ভৃগুমুনিকে আমি নমস্কার করি। দক্ষযজ্ঞে ভূতে যাঁহার দাড়ি উড়াইয়াছিল সেই মুনিপুঙ্গব ভৃগুমুনির কৃপায় ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই আমি স্ফুট করিয়া, স্ফুটতর করিয়া নখ-দর্পণের ন্যায় দেখাইব। আপনারা একটু অবহিত হউন।

১। জাতকের জন্ম বিশাখা নক্ষত্রান্বিত বৈশাখ মাস; বৈশাখ মাসে রবি মেষ-রাশিতে অবস্থিতি করেন। আবার জাতকের নামও হইবে রবি; সুতরাং তাৎকালীন গগনচারী রবির যে দশা ভূতলচারী রবিরও সেই প্রকার অবস্থা হইবে। রবি মেষ-রাশিতে ছিলেন, সুতরাং রাশীকৃত মেষের মধ্যে ইহাকে দিন যাপন করিতে হইবে। ইহাঁর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গে মধ্যে মধ্যে এই রাশীকৃত মেষে অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপী ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিয়া যাইবে। তজ্জন্য ভেড়ারা অর্থাৎ গড্ডলিকারা ইহাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিবে। কিন্তু এই ভেড়াদের শৃঙ্গে পতিত হইলেও ইহাঁর ধার কমিবে না, কারণ ভেড়ার শৃঙ্গে পড়িলে হীরাংই ধার ভাঙে, রবির ভাঙে না। ভেড়ারা ভেড়া বলিয়াই রবিকে একখণ্ড প্রকাণ্ড হীরা বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু ইহা ভেড়াদের ভুল। সুতরাং গড্ডলিকার শৃঙ্গে পড়িলে রবির কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না, ভেড়ারই শিং পুড়িয়া যাইবে।

২। জাতকের জন্ম-সন বার-শত আট-ষট্টি। অর্থাৎ আট, ষাট, বার। বার—অর্থাৎ বারে বারে ইহাঁকে অস্ত্র ধরিতে হইবে, কলিতে কলম ধরিলেও চলিবে; কারণ কলিতে কলম-ধারীরাই অস্ত্রধারীদের স্থান অধিকার করিবে। ষাট—অর্থাৎ অন্ততঃ ষাট বৎসর কাল এই প্রকার যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে লোকে ইহাঁকে কলমধারী জঙ্গীলাট বা ঐ প্রকার কিছু বলিবে; ঐ প্রকার একটা উপাধিও দিবে। আট—অর্থাৎ আট্‌কাইতে পারা অসম্ভব। বারে বারে কলম ধারণই ইহাঁর ভবিতব্য।

৩। ইহাঁর জন্ম-তারিখ পঁচিশে, আর্য্য-ভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত বলেন পাঁচকে পাঁচগুণে গুণিত করিলে পঁচিশ হয়। ইনি পাঁচজন লোককে গুণ করিবেন, অর্থাৎ পাঁচ রকম গুণের দ্বারা পাঁচ জনকে বশ করিবেন।

ইহাঁর জন্ম-তারিখ পঁচিশে হওয়াতে ইহাঁর মনের বয়স চিরকালই পঁচিশ থাকিবে, —পনের বছরেও পঁচিশ, পঁয়ষট্টি বছরেও পঁচিশ।

৪। জাতকের জন্মতিথি কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী! ইনি যে-কাজে হাত দিবেন তাহাতেই সিদ্ধিলাভ

হইবে। অন্যথা হইবে না। তবে ত্রয়োদশী কৃষ্ণ পক্ষীয় বলিয়া শাদার উপর কালি দেওয়াই ইহাঁর পক্ষে প্রশস্ত। শাদা কাগজে কালির আঁচড় টানিয়া ইনি যে পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিবেন, ব্ল্যাক্-বোর্ডের উপর খড়ি পাড়িয়া আঁক কষিয়া অর্থাৎ মাষ্টারি করিয়া ইনি ঠিক সেই পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না।

পুনশ্চ— কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে জন্ম হওয়ায় জাতকের কখনো এককালীন এয়োদশটির বেশী অন্তরঙ্গ বন্ধুলাভ ঘটিবে না। শুক্লা ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে, তের দুগুণে ছাব্বিশ, এমন কি এককালীন তিন-তেরং উন-চল্লিশটি পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাইতে পারিতেন। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেন এমন হয়? শাস্ত্র বলিতেছেন শুক্লে ও কৃষ্ণে অর্থাৎ গোরায় ও কালায় অনেক তফাৎ, সুতরাং ফলেরও তফাৎ হয়।

৫। জাতকের জন্ম-মাস বৈশাখ, বই হইয়াছে শাখা যাঁর তিনিই বৈশাখ। সুতরাং যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এই বনস্পতির বই-রূপ শাখা বাহির হইবে। ভৃগুসংহিতায় ইহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।

৬। জাতকের জন্মকালীন চন্দ্র মীন-রাশিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন; মীন জলচর জীব; সুতরাং জাতকের যশোরূপ চন্দ্রমা জলচর জাতির মধ্যে যেরূপ প্রভা-জাল বিস্তার করিবে, স্থলচর মেষদিগের মধ্যে তদ্রূপ পারিবে না। এখানে জলচর শব্দ জলবেষ্টিত দ্বীপবাসীদিগের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারিবে। কারণ জলের নিকটে থাকিলেও জলবাসী অর্থাৎ জলচর বলা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রের দ্বারস্বরূপ যে ব্যাকরণ-শাস্ত্র তিনিও এ কথায় সায় দিয়া থাকেন। "গঙ্গায়াং ঘোষ" কি না, ঘোষ মহাশয় গঙ্গায় বাসা বাঁধিয়াছেন, কি না গঙ্গাবাসী হইয়াছেন অর্থাৎ গঙ্গাতীরবাসী হইয়াছেন। এ-সমস্তই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কথা। সুতরাং অকাট্য। আমরা শাস্ত্র-পরায়ণ জাতি, শাস্ত্র লঙ্ঘন আমরা প্রাণান্তেও করি না, করিতে পারিও না। ছাগ মেষাদি যেমন ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইতে পারে না, আমরাও তেমনি শাস্ত্র ডিঙাইয়া কোনো কিছুতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ইহা অস্মদ্দেশীয়ের ভবিতব্য। ইহাও ভৃগুসংহিতায় লেখা আছে— স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে।

৭। মীনের ঠিক পাশের ঘরেই কুম্ভ। সুতরাং মৎস্য-লোকে কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইবারই কুম্ভ-রাশির প্রভাবে কুম্ভ কুম্ভ অর্থাৎ ঘড়া ঘড়া টাকা গিনি বা মোহর প্রাপ্তির খুবই সম্ভাবনা। অন্ততঃ শাস্ত্রে এই প্রকারই লিখিত আছে। শাস্ত্রে যেরূপ দৃষ্টি করিতেছি সেইরূপই বলিতেছি। অপিচ শাস্ত্রই আমাদের চক্ষু। আর লোকে যাহাকে চক্ষু বলিয়া জানে তাহা রক্ত-মাংস-ময় পর-কোলা মাত্র। উহা তো কোনা-ব্যাঙেরও আছে, কুলী মজুরেরও আছে। আমরা শাস্ত্রব্যবসায়ী, বিশুদ্ধ শাস্ত্র জ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া থাকি। স্থূল রক্ত-মাংসের ধার ধারি না।

৮। মেষ-রাশিস্থিত রবির মিত্রস্থান কর্কট! অর্থাৎ কর্কট রবির মিত্র। মেষ-গণ যখন রবিকে একখণ্ড বৃহৎ হীরা মনে

করিয়া ঐ হীরাতে নিজ নিজ শিং ঘষিতে আসিবে তখন কর্কট করজোড়ে অর্থাৎ দাড়াজোড়ে মিনতি করিবে; মিনতিতে ফল না হইলে কট্‌কট্‌ করিয়া শুনাইয়া দিবে। কট্‌কট্‌ করিয়া শুনাইয়া দেয় বলিয়াই উহার নাম কর্কট। ইহাতেও যদি গড্‌-ডলিকা বিরত না হয় তবে দাড়া দিয়া ভেড়াদের গলা আঁকড়াইয়া ধরিবে। ইহা হইল চরমের ব্যবস্থা। কারণ কর্কট জলচর জীব, সহজে উহাদের রক্ত গরম হইবে না।

৯। মেষস্থ রবির বাণিজ্যস্থানে তুলা। জাতককে তুলাদণ্ড অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা ধরিতে হইবে। দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া ইহাকে তুলা অথবা তত্তুল্য কোনো দ্রব্য অর্থাৎ কোমল-ভাবাপন্ন অন্তর কারবার করিতে হইবে। তুলা মানে যদি নিখ্‌তি ধরা যায়, তবে ইনি ডাক্তার হইবেন। কারণ নিখ্‌তি হইল ডাক্তারীর প্রধান অঙ্গ। উহাতে করিয়াই ডাক্তারী ঔষধ ওজন করিতে হয়।

১০। ইহাঁর অর্থাৎ মেষস্থ রবির বিদ্যাস্থানে সিংহ। ইহাঁর বিদ্যায়, বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া শক্তির বাহন সিংহ ইহাঁকে খাতির করিবে, পিঠ পাতিয়া দিবে। ইনি যদি কখনো পশুশালা দেখিতে যান্ তবে ঐদিন উদ্যানস্থ সিংহসকল আনন্দে গর্জ্জন করিবে, আমার গণনা ভুল হইবার নয়।

১১। দশমে মকর, অর্থাৎ কর্ম্মস্থানে মকর। মকর হইল গঙ্গাদেবীর অন্তর্জলী (Submarine) বজরা; সুতরাং বজ্‌রায় থাকিয়া গঙ্গা বা তদ্বৎ কোনো বৃহতী নদীতে ইনি কর্ম্ম করিবেন। নির্জ্জলা মাঠে বসিয়া ইহাঁর কাজকর্ম্ম তেমন সুবিধার হইবে না। তবে যদি ঐ মাঠে মকরাকৃতি বজ্‌রা বা বজ্‌রাকৃতি ভবনে বাস করতঃ কার্য্যাদি করেন, তবে মন্দের ভাল হইবে।

১২। মেষস্থিত রবির আয়-স্থানে কুম্ভ, সুতরাং ইনি যক্ষের ধন পাইবেন। অর্থাৎ যে ধন যুগযুগান্ত ধরিয়া মালিকের অপেক্ষায় মাটির তলে আছে তাহা ইহাঁর করগত হইবে। জাতক যদি যশোধন হন, তবে ইনি কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যের ন্যায় অনেকের যশোরূপ সমুদ্র নিঃশেষে পান করিয়াই যশোধন হইবেন।

১৩। জাতকের জন্ম দেখিতেছি সোমবারে, ইহা নিশ্চয়ই ঠিকুজীকারের ভুল। রবির জন্ম রবিবারেই নিশ্চিত। নিজের বার থাকিতে কেহ অন্যের বারে জন্মগ্রহণ করিতে যায় না। স্বকীয় গৃহ বর্ত্তমান থাকিতে বাবুই বিহঙ্গের বর্ষাভিষিক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়।

১৪। জাতকের জন্মনক্ষত্র—এক্ষণে দিনমান বলিয়া—ঠিক্ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। দিবাভাগে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া অতি দুর্ঘট ব্যাপার। যাঁহারা যম-নিয়মাদি অভ্যাস-পূর্ব্বক যোগী হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা নিয়মিত কুক্কুটাণ্ড ও পলাণ্ডু ভক্ষণ করেন, কেবল তাঁহারাই দিনে তারা দেখিতে পান। যদি কুক্কুটাণ্ড ও পলাণ্ডু খাইতাম তবে আমিও দেখিতে পাইতাম। সম্প্রতি আবার যৌব-নান্তিক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিসভায় নাম লিখাইয়াছি, সুতরাং ও-সব জিনিসের নাম আর মুখে আনা নয়। সুতরাং চোখের

তেজ কমিয়াছে। তদ্ভিন্ন ভৃগু দর্শিত পথে যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহাদের নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণ সমীচীন কিনা তাহাও বিচার্য্য। আপনারা বিস্মিত হইতেছেন? স্থির হউন্। যাহা বলি শ্রবণ করুন্। ভৃগুবংশীয় পরশু-রাম জ্যোতিষ্কদিগকে গর্ব্বস্ফীত ও রোষদীপ্ত ক্ষত্রবন্ধু মনে করিয়া উহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করেন, তাহাতে উহারা "ন ক্ষত্র" অর্থাৎ "আমরা ক্ষত্রিয় নই অতএব আমাদের মারিবেন না" এইরূপ কাপুরুষোচিত উক্তির দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছিল। আমি এই কাপুরুষদের কোনো কথায় থাকিতে চাই না, উহাদের মুখদর্শন করিতে চাই না। সকালে উহাদের মুখ দেখিলে দিন ভাল যাইবে না। আর নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু কপালে তুলিবারই বা প্রয়োজন কি? নক্ষত্রবিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য তাহা তো ভৃগু-মুনির পুঁথির মধ্যেই পাইব। আমি ঋষি-দিগের আপ্তজ্ঞান হইতে অধিক জানিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি না; আমি ম্লেচ্ছ নই।

সে যাহা হউক, আপনারা আমার কোষ্ঠী-বিচারের ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখিলেন, স্বকর্ণে শুনিলেন। এক্ষণে নষ্ট-কোষ্ঠী সম্বন্ধে যাঁহাদের কৌতূহল আছে তাঁহারা গোপনে পান সুপারি ও পয়সা লইয়া একদিন একান্তে আমার সঙ্গে বাসায় দেখা করিবেন। আমি চটক-পক্ষীর নখ দেখিয়া আপনাদের সকলের জন্মনক্ষত্র বলিয়া দিব। পূর্ব্বাহ্নে পঞ্জিকা দেখাইয়া দিন ক্ষণ দেখিয়া আসিবার আবশ্যকতা নাই! সামুদ্রিক গণনায় সমুদ্র হইয়া আসিবেন, আমি আপনাদের মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিব। তবে, দেখুন, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে আসিবেন না, হিন্দুর ছেলের পক্ষে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে কোনো কাজ করা ভাল নয়। কারণ ঐ মুহূর্ত্তটার সঙ্গে ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মদের নাম সংযুক্ত আছে। ও সময়ে আসিলে আমার গণনা ফলিবে না।

শ্রীনরকুমার কবিরত্ন।

বেঙ্গলি

বিগত ৮ই মে বেঙ্গলি জাহাজের নামকরণ অনুষ্ঠানে আমরা নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভার কার্য্যবিবরণ অভিভাষণাদি তৎপর দিনই সংবাদপত্রপ্রমুখাৎ সকলে অবগত হইয়াছেন, কিন্তু তথায় সমবেত প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেদিন যে উৎসাহ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা যিনি সাক্ষাৎভাবে অনুভব না করিয়াছেন তাঁহাকে কথায় সে ভাব বুঝান অসম্ভব।

সভাদৃশ্য সে সুগম্ভীর সুমোহন! বৃহদাকার সুগোল সুদৃশ্য স্তম্ভাবলী শোভিত, চন্দ্রাতপবিধৃত, সুসজ্জিত প্রিন্‌সেপ ঘাট-মণ্ডপে সপারিষদ গভর্ণর সাহেবের স্থান, তৎপার্শ্বে সামিয়ানার নিম্নে দর্শকমণ্ডলী সমাসীন, স্ত্রীপুরুষের

স্থান পৃথক। তাঁহাদের পার্শ্বে উন্মুক্ত ময়দানে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান খাকি-পোষাকধারী স্বেচ্ছাসেবক বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ। ইহারাই আহত সৈনিকদিগের সেবার জন্য বেঙ্গলি জাহাজে আজকার যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে।

বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চেহারারও কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! বাঙ্গালী বলিয়া তাহা চেনাই যায় না, অন্ততঃ আমি ত চিনিতে পারি নাই। শিখ বলিতে পারা যায় না, গুর্খাদল বলিয়াই ভ্রম হয়; অস্ত্রধারী হইলে এ ভ্রমটুকুও হইত না—অধিকাংশ যুবকই এমন সুস্থ ও বলিষ্ঠকায়। যখন শুনিলাম ইহারাই স্বেচ্ছাসৈনিক—আমাদেরই দেশের ছেলে, তখন আনন্দে বুকটা যেন ভরিয়া উঠিল।

ইহাদের অনেকেই বেশ ভদ্রঘরের সন্তান এবং উপার্জ্জনশীল; কোন না কোন আফিসের ক্লার্ক; কয়েকজন প্লীডারও ছিলেন। স্বদেশ, পরিবার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপার্জ্জন সমস্ত ছাড়িয়া বীরোচিত পরোপকার কার্য্যে আত্মদান করিতে প্রবাসে চলিয়াছেন। কে জানে ইহার পরিণাম কি? চোখে জল আসিল। কিন্তু সে আনন্দ-হিল্লোলের মধ্যে অশ্রুর স্থান নাহি আজ, নয়নের জল নয়নেই লীন হইয়া পড়িল।

সভাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, যাহারা বাঙ্গালীর ভীরু নাম দূর করিয়াছে তাহাদের সহিত একটা কথা না কহিয়া কি থাকা যায়! অবসর পাইবামাত্র নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইচ্ছা সুখে যাইতেছ ত?" এক বাক্যে উত্তর ধ্বনিত হইল "অবশ্য অবশ্য।" আকাশে প্রান্তরে জলে স্থলে সেই উৎসাহ-বাক্য শত উচ্ছ্বাসে যেন ছড়াইয়া মিলাইয়া পড়িল। আর গভর্ণর-প্রমুখ দলকে কি তাহার কণা স্পর্শ করে নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিল। সেদিনকার উৎসাহে রাজা প্রজা জেতা বিজেতার সমীকরণ হইয়া গিয়াছিল তাই সেদিনটি বাঙ্গালির পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন।

একদিন বাঙ্গালী জাতির ভীরুতা অপবাদ কত ব্যঙ্গ কবিতার খোরাক জোগাইয়াছে—কিন্তু আজ! আজ হইতে ইতিহাস নূতন কাহিনী গাইবে; আজ যে প্রাণদানের জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে!

এই যে অল্প বয়সের বীরভাব—আত্ম-দানের ইচ্ছা—গভর্ণমেণ্ট যদি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সুপথে চালিত করেন তবেই দেশের কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে ইহা সম্পূর্ণভাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আমাদের মনে হয় এই নীতিই রাজদ্রোহিতা নিবারণের একটি অমোঘ উপায়। যাহারা মরিতে চায় রাজকর্ম্মেই তাহারা মরুক না!

আসল কথা শুধু অস্ত্র বাঁধিলেই চলিবে না, ইচ্ছার গতি বাঁধা চাই। যখন অস্ত্র আইন ছিল না, যখন অবাধে সকলে অস্ত্র ব্যবহার করিতে পাইত তখন কয়জন ভদ্র-সন্তান খুন ডাকাতি করিত বা রাজদ্রোহী ছিল? রাজদ্রোহিতা বলিয়া একটা কথা তখন ভারতের—অন্ততঃ বাঙ্গালার আইন আদালতে উঠে নাই। আর এখন অস্ত্র আইন করিয়াও গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র ব্যবহার নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

যে দিন গভর্ণমেণ্ট এই বীরভাবাপন্ন যুবকদিগকে সৈনিক করিয়া লইবেন, আমাদের বিশ্বাস, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে তাহারা গভর্ণমেণ্টের সহিত এক হইয়া পড়িবে। এবং কাজে-কাজেই তখন হইতে গভর্ণমেণ্ট-দ্রোহিতা অতীতের একটা কথা মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গলার পুলিশ। পুলিশকে বিশ্বাস করিয়া এমন অকালেও গভর্ণমেণ্টকে কোন দিন অনুতাপ করিতে হইয়াছে কি? আর এক কথা, সৈনিক আইন বড় কড়া আইন; একবার তাহার পাশে বদ্ধ হইলে কোন যুবকের গতি-বিশৃঙ্খলারও ভয় নাই।

যেমন অধুনা এই যুদ্ধ উপলক্ষে ইংরাজ-রাজছত্রের নিম্নে বিলাতে ভারত সৈনিকে ইউরোপীয় সৈনিকে প্রাণের মিলন ঘটিয়াছে সেইরূপ বাঙ্গালী-সন্তানকে যুদ্ধে গ্রহণ করিলে এদেশেও রাজা প্রজার মধ্যে বিশ্বাসের ও কার্য্যের একটি প্রেমময় মহামিলন ঘটিবে। রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই ইহা কি মহালাভ নহে?

যাক্ সে কথা, কত বড় বড় লোকে এই প্রস্তাব লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রাদপি লোকের এ প্রসঙ্গ উত্থাপন বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও মন যাহা বলে, মুখে তাহা বাহির হইয়া যায়।

গভর্ণর সাহেব জাহাজ দেখিয়া চলিয়া যাইবার পর আমরা জাহাজ দেখিতে গেলাম। জাহাজের বেঙ্গলি নামকরণ দেখিলাম সর্ব্বতোভাবে সার্থক! বেঙ্গলির ডাক্তার বাঙ্গালী, স্বেচ্ছাসেবক বাঙ্গালী, খালাসীরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালী। কাপ্তেন কেবল ইংরাজ—কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর বেতনভোগী। জাহাজের সমস্ত খরচই শুনিলাম বাঙ্গালীর দান। কেনার খরচ, চালাইবার খরচ আসবার পত্রের খরচ সবই বাঙ্গালীর; জাহাজের যে ইলেক্‌ট্রিক কারখানা তাহাও বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার কৃত; আর এত বড় একটা উদ্যোগের কর্ত্তা হইতেছেন সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ বাঙ্গালীর দল। বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক-কালিমা তাঁহারা আজ সর্ব্বজন সমক্ষে ক্ষালন করিলেন। তাঁহাকে অন্তরের সহিত আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

জাহাজের নীচের ডেক স্বেচ্ছাসেবক দিগের বাসস্থল, আর উপরের ডেক আহত দিগের উদ্দেশে শুভ্রবস্ত্রশোভিত খাটে পূর্ণ। ডেকের আশে-পাশে শবাগার, চিকিৎসালয় ইত্যাদি।

উপর ডেকে যাইবার সিঁড়ি নিতান্ত ছোট, অনবরত দর্শক শ্রেণী সেই ক্ষুদ্র পথে উপর নীচে যাতায়াত করিতেছেন। আমরা যখন উপরে উঠিয়াছিলাম তখন ভিড় একটু কম ছিল,—নামিবার সময় দু একটি বাঙ্গালী যুবকের সহায়তা লইয়া নামিলাম। এইরূপ সহায়তা-দানেও তাহাদেরই বা কত উৎসাহ আর তাহা গ্রহণে আমাদেরই বা কত আনন্দ! দেশের ছেলে আজ দেশের মেয়েদের সম্মান রক্ষা করিতে শিখিয়াছে!

ইহার পর আমরা নীচে নামিয়া একটি ছোট ক্যাবিনে গিয়া বসিয়াছি হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হইল। পাশের ক্যাবিনে দুএকজন ইংরাজ চা পান করিতেছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম

একজনের হাতের পেয়ালা নীচে পড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে! শুনিয়াছিলাম ভাঙ্গা কুলক্ষণ! হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

* * * *

আজ ২৩শে মে সকালে সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, বেঙ্গলি জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে! হা ভগবান! এত আনন্দের এত উৎসবের পরিণাম কি ইহাই! কাগজখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে আবার সেখানা তুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, লোক কেহ মরে নাই, সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। কি সান্ত্বনা! ছেলেরা কেহই ভাগ্যক্রমে এ জাহাজে ছিল না; তাহারা অন্য পথে আগে হইতে সিলনে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এখন তাহারা কোথায় যাইবে? তাহাদের গতি কি?

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সমালোচনা

সাহানা। শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও কেশবধাম শিবালা বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি বালিকা-কবির আট হইতে পনেরো বৎসর বয়সের রচনা।

চন্দ্রহাস-বিষয়া। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকালীমোহন সোম, ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। লেখক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, জৈমিনি ভারত হইতে তিনি গ্রন্থের উপাখ্যান-ভাগ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ৺ রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত 'চন্দ্রহাস' নামক নাট্যগ্রন্থ হইতেও কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছেন। উপাখ্যানের বিষয়টি এদেশে সম্ভবতঃ সকলেরই জানা আছে, কিন্তু লেখার দোষে বিষয়টি এমন নির্জ্জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে দেখিলে কষ্ট হয়। তবে বাঁধানোর জলুসে ও ছাপার চটকে পাঠকের তাক্ লাগাইবার জন্য যথেষ্ট আয়াস করা হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাহার সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। আড়ম্বরের চাপে শিল্প মারা পড়িয়াছে। গ্রন্থে ছবিও কয়েকখানি দেওয়া হইয়াছে—সেগুলিরও ছাপা এবং পরিকল্পনা জঘন্য। অর্থাৎ বইখানি দেখিলে ভীমের গদার কথাই মনে পড়ে—এমন ভারী জিনিস পাঠকের পানে উঁচাইতে নাই!

অম্বা। নাট্যকাব্য। আলো ও ছায়া প্রণেতৃ প্রণীত। কলিকাতা, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৭৫।১।১ নং হ্যারিসন রোড। ১৯১৫। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। 'আলো ও ছায়া' বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'আলো ও ছায়া' যে হাতের লেখা, 'অম্বা'ও সেই হাতের। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইবার দেড় বৎসর পরে লেখিকা অম্বা রচনা করেন। অর্থাৎ সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা। লেখিকার প্রতিভা তখন পূর্ণ বিকশিত। 'অম্বা'তে সে প্রতিভার ছাপ আছে। তবে 'অম্বা'কে নাটকের বিভাগে না ফেলিয়া আমরা ইহাকে কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহি। নাটকের কার্য্য-গতির হিসাবে ধরিলে, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে, অম্বায় সে কার্য্য-গতি একটু 'শ্লো'—মৃদু! তবে কাব্যের উপাদান ইহাতে আছে। 'অম্বা'র চরিত্রটুকু লেখিকা সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—উপেক্ষিতা নারীর সকল

তেজ, সকল শক্তি, তাহার হৃদয়ের ভীষণ দ্বন্দ্ব লেখিকার সুদক্ষ তুলিকায় সজীব হইয়াছে। আমাদের চোখের সম্মুখে তেজস্বিনী আর্য্য রমণীর—শুধু আর্য্য রমণী কেন,—রমণীমাত্রেরই হৃদয়ের যে ছবিটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবন্ত, তাহা প্রাণময়! তুলির দুই-চারিটা মাত্র রেখায় আদর্শ-চরিত ভীষ্মের যে পরিচয়টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে. তাহা সুন্দর! অম্বা ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ-গ্রহণে তৎপর হইলে মহাদেব অম্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীষ্মের প্রতি এ বিদ্বেষ কেন? অম্বা উত্তর দিলেন,

"দেহ-বলে গেছিল যে পরের লাগিয়া
কিনিতে নারীর প্রেম, তার ঔদ্ধত্যের
দিতে চাই ন্যায় দণ্ড।"

অবশ্য মহাভারত-কার এ-সকল যুক্তি বা কারণের উল্লেখ করেন নাই। এ যুক্তি 'অম্বা' কাব্য-প্রণেতৃর স্বকপোল-কল্পিত; সুন্দর! মহাদেব অম্বাকে ভীষ্ম-বধের অস্ত্র দিলেন; কিন্তু ভাবিয়া-চিন্তিয়া অম্বা তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন! অম্বা কহিলেন,

"দেব, বৃথা অস্ত্রলাভ।
রমণী-হৃদয়ে মোর রমণী-সুলভ
শান্তিরস নিশিদিন করে সঞ্চরণ,
নীরবে, নিভৃত-তলে; উপরে আস্তৃত
প্রতিহিংসা বালুস্তর-সম। শুষ্ক কর
এই অন্তঃশীলা নদী, নহিলে পারি না
ভীষ্মেরে করিতে নাশ। রমণীর দেহে
দেহ পুরুষের মন, নির্ম্মম নিষ্ঠুর;
হস্ত কর বজ্রসার। যদি নারীদেহে
ঘৃণা করি, পুরুষত্ব না চাহে আসিতে,
দয়া করি দাও মোরে পুরুষের দেহ;
পুরুষ পুরুষ সাথে করিব সংগ্রাম।"

তাই পর-জন্মে অম্বার শিখণ্ডীতে পরিণতি! বলিতে কি, এইখানেই কবির পরীক্ষা—সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি শেষ-রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। নারী যতই কেন প্রতি-হিংসা-পরায়ণা হোন্ না কেন, তিনি নারীই। লেখিকা এইখানে নারী-চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার শক্তির পরিচয়। মোটের উপর, অম্বা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই বেশ মনোরম হইয়াছে।

ওঁ পিতা নোঽসি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ৬নং দ্বারকা-নাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। এখানি দার্শনিক গ্রন্থ। লেখক বেশ সংক্ষেপে ও সরলভাবে নিত্য-প্রত্যক্ষ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এই গ্রন্থে মঙ্গলময় ঈশ্বরের পিতৃত্বের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে শাস্ত্রাদির বচন অপেক্ষা সাধারণের যুক্তি-পরম্পরার উপরই লেখক অধিক নির্ভর করিয়াছেন, তাহার ফলে সম্পাদ্য বিষয়টুকু জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়াছে।

দারিদ্র্য ও সমবায়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-চন্দ্র পুরকায়স্থ, এম-এ প্রণীত। সিলেট করিমগঞ্জ ন্যাশন্যাল পাবলিশিং এজেন্সি লিমিটেড্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা। আদম-সুমারের বিবরণ হইতে লেখক এ দেশে দারিদ্র্যের অস্তিত্ব আলোচনা করিয়া তাহা নিরাকরণের পক্ষে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের এখনও অভাব; সমবায় সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া আমাদিগের জানা নাই। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের এ চেষ্টা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য, সন্দেহ নাই। তবে এ দেশের মাটির নিন্দা এমন সুপ্রচলিত, এবং সম্প্রতি কয়েকটি গুরুতর কার্য্যে লাঠালাঠিরও এতখানি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে যে জন-সাধারণের এদিকে সন্দেহ থাকাও অপরাধের বিষয় নহে। যাহা হৌক, গ্রন্থ-খানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে—এ গ্রন্থের সমধিক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কাহিনী। শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত প্রণীত। ঢাকা, ভারত-মহিলা যন্ত্রে মুদ্রিত। মৈমনসিং, মুক্তাগাছা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। এখানিতে কয়েকটি 'সত্য ভূতের গল্প'

নিবিষ্ট হইয়াছে। 'ভূতভয়গ্রস্ত' দেশে ভূতের গল্পের প্রচার সম্বন্ধে সাধারণ্যে মতদ্বৈধ থাকিলেও এদিকে যাঁহারা আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট এ কাহিনী একেবারে নিরর্থক হইবে না। তবে কৌতূহল রসের অবতারণায় লেখকের শক্তি বড়ই অল্প। গল্প সত্য হইলেও লেখকের তাহা বলিবার একটা ছন্দ থাকা প্রয়োজন; ইহাতে সেই-টুকুরই অভাব। ভাষা নিতান্তই আড়ষ্ট হইয়া আছে। আর একটা কথা, গল্পগুলি সবই বিদেশীয়ের অনুবাদ। এ দেশের কথা ইহাতে একটিও নাই! থাকিলে কতই ভাল!

স্কান্দ-যোগ। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত তত্ত্বদাস প্রণীত। কলিকাতা, নব্যভারত প্রেসে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "আমি ভিক্ষুক পিতৃহীন। অসহায় দরিদ্রাবস্থায় নানাপ্রকার কষ্টের ভিতর দিয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলে আমার এমন কোন সংস্থান ছিল না যে আমি পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোকে একটু দাঁড়াইতে পারি। প্রৌঢ় কালেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিভাগ নিবন্ধন শিক্ষা-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের টোলে সংস্কৃত-অধ্যয়নের কোন সুযোগ ছিল না।" তাই 'শাস্ত্রশিক্ষা-বিহীন' লেখকের 'স্বাভাবিক যোগ' লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রন্থে 'প্রাণী ও প্রাণ', 'সাধন' 'জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি' 'ত্যাগ বা সন্ন্যাস', 'ধ্যান, 'সমাধি', 'যোগসূত্র' প্রভৃতির তিনি আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মত কতখানি গ্রাহ্য, তাহা বিবেচ্য হইলেও গ্রন্থখানি পাঠ করিলে লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বল্লাল-চরিত। (সমালোচনা) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। জেলা ফরিদপুর রায়াসপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা কলিত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। লেখক বলেন, "রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথাদি সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছে, জাতিগঠিত সমস্ত কার্য্যই বল্লালসেন দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে; এবং যে জাতির যে মনঃক্ষোভ তাহা বল্লালসেনের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেদের ত্রুটি পরিহারের চেষ্টা করিতেছেন। যুগীগণ বল্লালসেনকেই আপনাদের পাতিত্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য বল্লালের শিক্ষক গোপাল ভট্টের নামসংযুক্ত আনন্দভট্টের দ্বারা প্রকাশিত এক বল্লালচরিত মুদ্রিত করিয়াছেন। আবার সুবর্ণবণিকগণ আপনাদের বৈশ্যত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য শরণ দত্তের রচনা সম্বলিত আনন্দ ভট্টের দ্বারা লিখিত আর একখানি বল্লালচরিত প্রকাশিত করিয়াছেন। যুগীগণ গ্রন্থের প্রামাণিকতা দেখাইবার জন্য বল্লালের শিক্ষক গোপালভট্টকে খাড়া করিয়াছেন। সুবর্ণবণিকগণ * * শরণ দত্তকে উপস্থিত করিয়াছেন।" গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থে প্রমাণাদির সাহায্য উক্ত উভয় সাক্ষীই যে জাল তৈয়ারী সাক্ষী তাহাই প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। মূল গ্রন্থদুইখানি পাঠের সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই. এবং এ সমালোচনাও তেমন সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত নয় বলিয়া আমরা কোনদিকে রায় দিতে পারিলাম না। তবে গ্রন্থকার যদি ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া সংযতভাবে যুক্তি-তর্ক খাড়া করিতেন, তবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থই বল্লাল সম্বন্ধে প্রামাণ্যস্বরূপ গৃহীত হইতে পারিত। তাঁহার যখন তথ্য সংগ্রহে এমন পারদর্শিতা রহিয়াছে, তখন তিনি নিজে বল্লাল সম্বন্ধে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়া, উভয় পক্ষের মিথ্যা জল্পনা ছিন্ন করিয়া, ঐতিহাসিক সত্য প্রচার করিলেই ভাল হইত বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

সুরভি। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা. একৃমি প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, পি, চৌধুরী ৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লেখকের কয়েকটি খণ্ড কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে; তাহার মধ্যে কয়েকটি কবিতা পূর্ব্বে 'প্রবাসী', 'মানসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ছাপা কাগজ ভালো।

সরলা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মডর্ণ বুক ডিপো, ৬৩।১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। লেখক 'ভূমিকায়' বলিয়াছেন, "কোন এক বন্ধুর উপরোধে তাঁহার দুরস্থিতা এক নিঃসন্তান বিধবা আত্মীয়ার পাঠের জন্যই ইহার রচনা হয়। * * আদর্শ বিধবার চিত্র অঙ্কন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।" এ গ্রন্থখানিকে কিছুতেই উপন্যাস বলা যায় না। লেখক নিজে ইহার নাম দিয়াছেন, "কথা-গ্রন্থ।" গ্রন্থখানি কতকটা উপদেশের মত। লেখকের রচনা-কৌশল ইহাতে আদৌ নাই।

অদৃষ্ট-লিপি। শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এ গ্রন্থে লেখিকার চারিটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম গল্প 'অদৃষ্ট-লিপির' নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলি সুলিখিত। লেখিকার ভাষা বেশ সরল, আড়ম্বরহীন। গল্পগুলি চিত্র-হিসাবে সুন্দর, সুপাঠ্য। তবে ছোট গল্পের আর্টের দিক দিয়া এগুলির বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, মানব-চিত্তের বিশেষ কোন ভাব গল্পগুলিতে লীলায়িত হয় নাই, চরিত্রগুলিতেও বিশেষত্ব বড় নাই। 'অদৃষ্ট-লিপি' গল্পটিতে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত 'কাহাকে' উপন্যাসের ছায়া এতখানি আসিয়া পড়িয়াছে, যে 'অদৃষ্ট-লিপি'র নিজের কোন স্বাতন্ত্র্যই পাঠকের চোখ পড়িবে না। যাহা হৌক, গ্রন্থখানি যে সুখ্যপাঠ্য হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নবীনা। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ সরকার প্রণীত। নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত মূল্য পাঁচ আনা। এখানি "সংসার-চিত্র", অর্থাৎ উপন্যাস। ইহার রুচি জঘন্য, ভাষা জঘন্য, ভাব জঘন্য। লেখকের ধৃষ্টতা অসাধারণ।

গো-ধন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কিশোরগঞ্জ হইতে শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য রাজ সংস্করণ আড়াই টাকা; সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা। ইহা গোজাতি-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব-সম্বলিত একখানি সচিত্র গ্রন্থ। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ, এবং সুলিখিত। গো-দুগ্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। গো-পালন ভারতবাসীর সখের ও আদরের বস্তু; বাঙ্গালীর ত বটেই! সম্প্রতি গাভীর দুর্লভতা সহিত বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যেরও যে অবনতি ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে শিক্ষিত গ্রন্থকার বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গোজাতির রক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা এবং গব্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। নানাদেশীয় গাভীর আলোচনাও বাদ পড়ে নাই। এখনও বহু সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ গো-পালন-বিষয়ে মনোযোগী; অনেকে Dairy খুলিবার পক্ষেও উদ্যোগী; অথচ উভয়েরই গোজাতি সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব জানা থাকার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কি ব্যবসায়, কি গৃহস্থালী, উভয় দিক হইতেই গো-জাতির সম্বন্ধে এই সকল বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলে না—আনাড়ির হাতে সকল জিনিষেরই পঞ্চত্ব-লাভ ঘটিয়া থাকে। গ্রন্থখানি সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে লেখক গবাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও গোজাতির উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে 'গোজাতীয় গবাদি শ্রেণী বিভাগ', তৃতীয় খণ্ডে 'বৃষাদির বিশেষ বিবরণ', চতুর্থ খণ্ডে 'গোপালন', পঞ্চম খণ্ডে 'গব্য', ষষ্ঠ খণ্ডে 'গব্যয়ী' ও সপ্তম খণ্ডে 'গোজাতির রোগ ও চিকিৎসার' আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানির উপকারিতা খুবই। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও এই হিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার এতখানি আয়াস প্রকৃতই প্রশংসার্হ। এই গ্রন্থ নির্জ্জীব স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালীমাত্রেরই গৃহে গৃহে বিরাজ করুক, ইহাই আমাদিগের কামনা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



শ্রিয়ং পরার্ধ্যং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ
তমো নিরস্তন্নভিভূতভানুভূং।
নুদন্নিঘাঘং জিতচারুচন্দ্রমাঃ
স বন্দ্যতেঽহর্ন্ ইহ যস্ত নোপমা ॥

তিব্বতীয় চিত্র হইতে
অধ্যাপক সমাদ্দারের অনুমত্যনুসারে

Engraved & Printed by
K.V. SEYNE & Bros

৩৯শ ভাগ। শ্রাবণ, ১৩২২ [৪র্থ সংখ্যা

ভারতী

সন্ধ্যায়

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মাণিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই ত আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্ম্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার ;
ঐ যে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়া তরী ;
ঐ যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়
ঘুমে আলস কায় ;
ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন ধূলি নিল সে বিদায় ;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে ;
তোমার অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই, প্রভু
এক-নিমেষের পত্রপুটে ভরি'
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি !

২৭ মাঘ। পদ্মা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

নালক

৯

শিষ্যেরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে—উরাইল বনের সেদিকটা ভারি নির্জ্জন। ঘন ঘন শাল বন সেখানটা দিন রাত্রি ছাওয়া করে রেখেছে। মানুষ সেদিকে বড় আসে না; দুএকটা হরিণ আর দু দশটা কাঠ্‌বেরালী শুকনো শাল-পাতা মাড়িয়ে খুস্ খাস্ চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়েই গাঁয়ে যাবার ছোট রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বট গাছ;—সে যে কত কালের তার ঠিক নেই। তার মোটা মোটা শিকড়গুলো উঁচু পাড় বেয়ে অজগর সাপের মত সটান জলের উপরে ঝুলে পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার কোরে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বোলে সেই গাছকে পূজো দেয়। ফুল-ফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ওপারের গ্রাম থেকে মেয়েরা যখন খুব ভোরে নদী পার হয়ে এদিকে আসে তখন কোনো কোনো দিন তারা যেন দেখতে পায় গেরুয়া কাপড়-পরা কে একজন গাছের তলায় বসে ছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন! কাঠুরেরা কোনো কোনো দিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে গাছের তলা আলো কোরে সোনার কাপড়-পরা দেবতার মত এক পুরুষ! সবাই বোল্‌তো নিশ্চয় ওখানে দেবতা থাকেন কিন্তু দেবতাকে স্পষ্ট করে কেউ কোনোদিন দেখেনি—'পুন্না' ছাড়া। মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজো দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর-একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়েস দশ বছর। সুজাতার ছেলে হয়নি তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মত কোরে মানুষ করেছেন, আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক বছর বটতলায় রোজ একটি ঘিয়ের পিদিম্ দিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভাল করে বটেশ্বরে পূজো দেবেন।

সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে একটি সোনার-চাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যা-বেলা একটি ঘিয়ের পিদিম্ দিতে এই বটতলায় আসে। আজ এক বছর সে আসছে, কোনো দিন কোনো দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কখনো সে আসবার আগেই ছাওয়ার মত দেবতার মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলিয়ে যেত, কখনো বা সে গাছের তলায় পিদিম্‌টি রেখে যখন একলা পায়ে হেঁটে নদীপার হয়ে ফিরে চলেছে তখন দেখ্‌তো যেন দেবতা এসে সেই পাথরের বেদীর উপরে বসেছেন!

আজ শীতের কমাস ধরে পুন্না ছাওয়ার মত—যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখছে, এ কথা সে সুজাতাকে বলেছিল—আর কাউকে না। সুজাতা

সেইদিন থেকে পুন্নাকে দেবতার জন্যে আঁচলে বেঁধে দুটি করে ফল নিয়ে যেতে বোলে দিয়েছিলেন, আর বোলে দিয়েছিলেন যদি দেবতা কোনো দিন স্পষ্ট করে দেখা দেন, কি কথা কন্ তবে যেন পুন্না বলে —দেবতা! আমার সুজাতা মাকে আমার বাবাকে আমার ছোট ভাইটিকে আর আমার মোড়লদাদাকে ভাল রেখো,—বড় হলে আমি যেন একটি সুন্দর বর পাই।

এমনি করে পুন্নার হাত দিয়ে সুজাতা দুটি করে ফল সেই বটতলায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনিও জান্‌তেন না, পুন্নাও জান্‌তেন না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই বটতলায় ঠাণ্ডা পাথরের বেদীটির উপরে এসে বসেন। আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম্, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে একটি ভায়ের নামে একটি মায়ের নামে একটি বাপের নামে একটি মোড়লদাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেল-বেলায় সোনার আলো বটগাছের তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে-পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বয়ে চলেছে—অঞ্জনা নদীটি। ওপারে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্য্যন্ত ধানের ক্ষেত, তার মাঝে মাঝে আম-কাঁঠালের বাগানে ঘেরা ছোট ছোট গ্রামগুলি—মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড় সে কতদূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মত। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা; সবুজ সাড়ির সাদা পাড়ের মত সরু সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরণে রাঙা সাড়ি, হাতে রূপোর চুড়ি, পিঠের উপর ঝুলি-বাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত দুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগলো—একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুন্না দেখছে বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আস্‌ছে অনেকগুলো কালো মোষ; একটার পিঠে মস্ত একগাছ লাঠি-হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক্ দিচ্ছে—আরেরে পুন্নারে! ছেলেটার নাম সোয়াস্তি। পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম্ পাঁচটা জ্বালিয়ে দিয়েই যেদিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেইদিকে চলে গেল।

তখন একখানি সোনার থালার মত পূবদিকে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের উপর বটতলাতে ঝিক্ ঝিক্ করছে পুন্নার দেওয়া পিদিমের আলো। সেই আলোয় সোয়াস্তি পুন্না দুজনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া বসন-পরা দেবতা এসে গাছের তলায় বসেছেন—পাথরের বেদীটিতে!

পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন গোরু-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম

পাড়িয়ে সকালের জন্যে পূজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বল্লে—মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পার তো তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি আমি দুজনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা।

সুজাতা বল্লেন—যদি মনে পড়ত তবে কী চাইতিস্ পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক্—এই বুঝি?

পুন্না তখন পালিয়েছে। সুজাতা পূজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন পুন্না তখন ছোট ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ আর ঘুম নেই;—রাত থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এক কোণে একটি পিদিম্ জ্বালিয়ে গোরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গোরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে—এত রাত্রে কে দুধ নিতে এল?—কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুজাতা উঠোনের এক কোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপরে চাপিয়ে দিলে;—দুধ টক্‌বগ করে ফুটতে লাগলো। সুজাতা ধোয়া কাপড় পোরে পুন্নাকে এসে বল্লেন—তুই গোটাকতক ফুল তুলে আন্, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক। পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু ভেল সিঁদুর পূজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকচে—মা, চলো, আর দেরী কল্লে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না। সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাট্‌কা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বল্লেন—তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পূজোর থালা আর মনুয়াকে নিয়ে যাই।—সুজাতার ছেলের নাম মনুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে আগে দুধের ভার নিয়ে ঝুমুর ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে পিছনে ছেলে কোলে পূজোর থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু একটু ভয় করছিল। সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বল্লেন—ওরে সোয়াস্তিকে ডেকে নে না!—সোয়াস্তিকে আর ডাকতে হোলো না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল। তিন জনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনও আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে,—রাত পোহাতে অনেক দেরী কিন্তু এরি মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ধুঁয়ের ধোঁয়া সাদা একখানি চাঁদোয়ার মত ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উরু বনের ভিতর দু একটা তিতির, বনুর-

গাছে দু একটা শালিক এরি মধ্যে একটু একটু ডাকতে লেগেছে। একটা কটিং পাখী শিস্ দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচ্‌মিচ্ ঝুপ্ ঝুপ্ করে কাঁঠাল গাছের তলায় নেমে পড়ল! আলো নিভিয়ে সুজাতা আর পুন্নাকে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছ পালা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন—বটগাছের নীচে যিনি বসে রয়েছেন—তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথায় আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।

১০

সুজাতা, পুন্না মনের মত করে পূজো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্ব্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি কিন্তু কিছু তাঁকে দিতে পারে নি তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিষাসের একটি আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্যে এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনও সে বটতলাতে আসেন নি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদীর উপর বিছিয়ে দিয়ে মনে মনে সিদ্ধার্থকে নমস্কার করে নদী-পারে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া কুশাসনে এসে বসলেন। জলে ধোয়া কুশ-ঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন—স্পষ্ট পরিষ্কার। পাথরের বেদীতে কুশাসনে বসে সিদ্ধার্থ আজ প্রতিজ্ঞা করলেন এ শরীর থাক্ আর যাক্ দুঃখের শেষ দেখবোই দেখ্‌বো; —সিদ্ধ না হয়ে বুদ্ধ না হয়ে এ আসন ছেড়ে আর উঠেছিনে;—বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধ্যানে বসে বল্লেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্যং বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

তখন 'মার'—যার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয় কুকথা বলায় কুকর্ম্ম করায়—সেই 'মারের' সিংহাসন টল্‌মল্ করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আস্‌ছে মার-মার-শব্দে বুদ্ধের দিকে। চারিদিকে 'মারের' দলবল আজ জেগে উঠেছে! তারা ছুটে আসছে যত পাপ যত দুঃখ যত কালি যত কলঙ্ক যত জ্বালা যন্ত্রণা মলা আর ধূলা জলস্থল-আকাশে দিকে-বিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। পূর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পরদা টেনে দিয়েছে—'মার'! সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাল চোখ, তা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্ত-বিষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিভে নিভে যাচ্ছে।

আকাশকে এক হাতে মুঠিয়ে ধরে পাতালকে একপায়ে চেপে রেখে 'মার' আজ নিজ মূর্ত্তিতে সিদ্ধার্থের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাঙা চাদর —যেন মানুষের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ঝুল্‌ছে বিদ্যুতের তলোয়ার, মাথায়

মুকুটে দুল্‌ছে 'মারের' প্রকাণ্ড একটা রক্ত-মণির দুল, তার কানে দুল্‌ছে মোহন কুণ্ডল তার বুকের উপরে জ্বল্‌ছে অনল-মালা—আগুনের সুতোয় গাঁথা। বুক ফুলিয়ে 'মার' সিদ্ধার্থকে বল্‌ছে—বৃথাই তোমার বুদ্ধ হতে তপস্যা!—'উত্তিষ্ঠ'—ওঠো—'কামেশ্বরোঽস্মি'—'আমি 'মার'! ত্রিভুবনে আমাকে জয় করে এমন কেউ নেই! 'উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মহদ্‌বিষয়স্থং বচং কুরুষ্ব'—ওঠো, চলে যাও, আমাকে জয় করতে চেষ্টা করোনা, আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাক; ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য তোমায় দিচ্ছি, পৃথিবীর রাজা হয়ে সুখভোগ কর; তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে কি লাভ? আমাকে জয় করে বুদ্ধ হওয়া কারো সাধ্যে নাই।

সিদ্ধার্থ 'মারকে' বল্লেন—হে 'মার' আমি জন্ম জন্ম ধরে বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি তপস্যা করছি, এবার বুদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠবো, এ শরীর থাক্ বা যাক্ এই প্রতিজ্ঞা—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তিনবার 'মার' বল্লে—'উত্তিষ্ঠ'—ওঠো, চলে যাও, তপস্যা রাখ! তিনবারই সিদ্ধার্থ বল্লেন—না! না! না!—'নৈবাসনাৎ কায়-মতশ্চলিষ্যতে।'

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান্ দিলে 'মার'! তার নখের আঁচড়ে অমন যে চাঁদে-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে—একখানি নীলাম্বরী সাড়ির মত। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার! মুখ মেলে কে যেন পৃথিবীকে গিল্‌তে আস্‌ছে! বোধ হল তার কালো জিভ্ বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মত কালো নীল! 'মার' সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে কি আর বিদ্যুতের মত দুপাটি সাদা দাঁত শূন্যে ঝিলিক্ দিয়ে কড়মড় করে উঠেছে; আর হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সর্ব্বগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে 'মারের' দলবল। যোগাসন থেকে বুদ্ধদেবকে টেনে ফেল্‌তে পৃথিবীর উপরে নেমে আস্‌ছে 'মারের' দল; চন্দ্র সূর্য্য ঘুরছে তাদের হাতে দুটো যেন আগুনের চরকা! দশদিক অন্ধকার করে ঘুরতে ঘুরতে আস্‌ছে—'মারের' দল ঘূর্ণি বাতাসে ভর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে। তারা শূন্য থেকে ধূমকেতু গুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেল্‌ছে আগুনের ঝাঁটার মত! পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড় গুলোকে মুচ্‌ড়ে নিয়ে বন্-বন্ শব্দে ঘুরিয়ে ফেলছে তারা চারিদিক থেকে অনবরত শিলাবৃষ্টির মত; লক্ষ লক্ষ ক্ষেপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে 'মার'-সৈন্য বুদ্ধদেবের চারিদিকে! তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জলন্ত ফেণা আঁজলা আঁজলা ছড়িয়ে পড়ছে—সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেদীর আশে পাশে। উরাইল বনের প্রত্যেক গাছটি পাতাটি ফুলটি এমনকি ঘাসগুলিও আজ জ্বলে উঠেছে; জলন্ত

রক্তে অঞ্জনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুনে মাখা। বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শাণিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দলের পর দল যত রক্তবীজ তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ছে আজ বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে—যেন একখান্ জ্বলন্ত কয়লা ঘূর্ণি বাতাসে ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে; তার মাঝে জ্বলন্ত একটা তাল গাছ ঘুরিয়ে 'মার' ডাক্‌ছে—হান্ হান্! পায়ের নখে রসাতল চিরে জেগে উঠেছে মহামারী। আজ 'মারের' ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মত সর্ব্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্ত্তনাদ করে ছুটে আস্‌ছে—সে 'মারী'! তার ধূলো-মাখা কটা চুল বাতাসে উড়ছে—আকাশ-জোড়া ধূমকেতুর মত! দিকে দিকে শোকের কান্না উঠেছে, ত্রিভুবন থরথর কাঁপছে! মহামারীর গায়ের বাতাস যেদিকে লাগ্‌ল সেদিকে পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাথর ধূলো হয়ে গেল, বন উপবন জ্বলে গেল, নদী সমুদ্র শুকিয়ে উঠলো। আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না! সব মরুভূমি হয়ে গেছে, সব শুয়ে পড়েছে, সব নুয়ে পড়েছে, জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, ধূলো হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে! জগৎ-জুড়ে উঠেছে 'মারীর' আর্ত্তনাদ, 'মারের' সিংহনাদ, আর শ্মশানের মাংস-পোড়া বিকট গন্ধ!

তখন রাত এক প্রহর। মারের দল, মারীর দল উল্কামুখী শেয়ালের মত, রক্ত-আঁখি বাদুড়ের মত মুখ থেকে আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে চারিদিকে হাহা হুহু কোরে ডেকে বেড়াচ্ছে, কেঁদে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার উপর, পৃথিবী ঘুরছে পায়ের তলায় ঘর্ঘর শব্দে,—প্রকাণ্ড জাঁতার পাথর দুখানা যেন বুদ্ধদেবকে পিষে ফেল্‌তে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করছে! 'মার' দুহাতে দু'টা বিদ্যুতের মশাল নিয়ে বুদ্ধদেবকে ডেকে বল্‌ছে—পালাও পালাও এখনও বল্‌ছি তপস্যা রাখ। বুদ্ধদেব 'মারের' দিকে চেয়েও দেখছেন না, তার কথায় কর্ণ-পাতও কচ্চেন না! 'মারের' মেয়ে 'কামনা' তার ছোট দুই বোন ছলাকলাকে নিয়ে বুদ্ধদেবের যোগ ভঙ্গ করতে কত চেষ্টা করছে—কখনো গৌতমী মায়ের রূপ ধরে, কখনো যশোধরার মত হয়ে বুদ্ধের কাছে আজ হাত জোড় করে কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! তাঁর মন গলাবার ধ্যান ভাঙবার চেষ্টায় কখনো তারা স্বর্গের বিদ্যাধরী সেজে গান গায়, নাচ করে কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবকে ভোলাতে আর পারে না। বজ্রাসনে আজ তিনি অটল হয়ে বসেছেন, তাঁর ধ্যান ভাঙে কার সাধ্য! যে 'মারের' তেজে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, জল স্থল আকাশ,—সেই 'মারের' দর্প চূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে! 'মার' আজ বুদ্ধের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পাল্লে না, সেই অক্ষয়বটের একটি পাতা, সেই পাথরের বেদীর একটি কোণও খসাতে পাল্লে না! বুদ্ধের আগে 'মার' একদণ্ডও কি দাঁড়াতে পারে! বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখবারও তার সাহস নেই! দুই হাতের মশাল নিভিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'মার' আস্তে আস্তে পালিয়ে গেছে—নরকের নীচে—ঘোর অন্ধ-

কায়ে—চারিদিক কালো করে দিয়ে! বুদ্ধদেব সেই কাজল অন্ধকারের মাঝে নির্ভয়ে একা বসে রয়েছেন ধ্যান ধরে পহরের পর পহর।

রাত শেষ হয়ে আস্‌ছে কিন্তু 'মারের' ভয়ে তখনও পৃথিবী এক একবার কেঁপে উঠছে; —চাঁদও উঠতে পারছে না, সকালও আস্‌তে পারছে না। সেই সময়ে ধ্যান ভেঙে 'মারকে' জয় করে সংসার থেকে ভয় ঘুচিয়ে বুদ্ধ দাঁড়ালেন। তিনি আজ সিদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ পেয়েছেন। ডান হাতে তিনি পৃথিবীকে অভয় দিচ্ছেন, বাঁ হাতে তিনি আকাশে দেবতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর সোনার অঙ্গ ঘিরে সাত রঙের আলো! সেই আলোতে জগৎসংসার আনন্দে জয় জয় দিয়ে জেগে উঠেছে—নতুন প্রাণ পেয়ে নতুন সাজে সেজে। বুদ্ধের পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে নৈরঞ্জন নদীটি একূলে ওকূলে শান্তিজল ছিটিয়ে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্রোতের ফুল

(৩১)

বিপিন যখন প্রেমানন্দ স্বামীর আকর্ষণী শক্তিতে মন্ত্রস্তম্ভিতের মতো হইয়া বিশ্বসংসার ভুলিতে বসিয়াছিল, সংসার কিন্তু তখন তাহাকে ভুলিয়া থাকে নাই।

বিপিন মালতীকে লইয়া চলিয়া আসিলে হরিবিহারী ও গিন্নি উভয়েই পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গিন্নি দুর্ব্বলের বল অনাথের নাথ লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রত্যহ একশ-আটপাত তুলসী ও ডবল ভোগ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং রামলাল আচার্য্যকে ডাকাইয়া ডাইনি মালতীর দিক হইতে বিপিনের মন ফিরাইবার জন্য গ্রহশান্তির আয়োজন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য-ঠাকুর সময় বুঝিয়া যে লম্বা চওড়া ফর্দ্দ দিলেন তাহাতে কনকধুস্তূরের ফুল, অরুণবর্ণ অশ্ব, নীলবস্ত্র, কম্বল, মৃগমদ ও নবরত্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে দেশে দেশে লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

হরিবিহারী তাঁহার বুদ্ধির ভাঁড় নিবারণকে ডাকিয়া অনন্তর-করণীয় সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবারণ পরামর্শ দিল মালতীর শ্বশুরবাড়ীতে এবং বিপিনকে দুখানি পত্র দেওয়া হোক। মালতীর ভাসুরকে লেখা হোক বিধবার বিবাহ কুলত্যাগেরই সামিল; ইহাতে তাহাদের কুলের কলঙ্ক, বংশের অপমান; তাহাদের উচিত ইহা রোধ করা, টাকা যত লাগে তাহা হরিবিহারী দিবেন। এবং বিপিনকে এই মর্ম্মে চিঠি লেখা হোক যে মালতীকে তাহার ভালো লাগিয়া থাকে বেশ ত, মালতী তাহার কাছেই থাকুক, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না; বিবাহ যদি করে তবে তাহাকে ত্যাজ্য-পুত্র করা হইবে।

হরিবিহারী এই সৎপরামর্শে আনন্দিত হইয়া দু-জায়গাতেই চিঠি লিখিলেন এবং বিপিনের চিঠিতে স্বয়ং বুদ্ধি খরচ করিয়া আর এক লাইন যোগ করিয়া দিলেন যে বিপিন যদি শীঘ্রই বাড়ী ফিরিয়া না যায় তাহা হইলে নিবারণ-পুত্র পটলার সহিত বিনির বিবাহ দিবেন।

বিপিনের চিত্ত যখন সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে দোল খাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সে পিতার চিঠি পাইল। একে সে ভাবপ্রবণ উত্তেজনাশীল প্রকৃতির লোক, তাহার উপর প্রেমানন্দের প্রবল প্রভাব তাহাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই অবস্থায় বিপিন এই চিঠি পাইয়া লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে পাগল হইয়া পিতাকে যে চিঠি লিখিল তাহা পড়িয়া হরিবিহারীর মতন নিশ্চেষ্ট লোকও নিজে উদ্যোগী হইয়া উকিল ডাকাইয়া বিপিনকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বিপিন পিতৃসংসারের সহিত সম্পর্ক একেবারে চুকাইয়া একরকম নিশ্চিন্ত হইল। এক একবার তাহার মায়ের জন্য বড়ই মন-কেমন করিত। কিন্তু সে তাহা দমন করিয়া ভাবিত গুরুদেব তাহাকে একে একে বন্ধন-মুক্ত করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে সব দিক ঠিক হইয়া যাইবে। এক একবার বিনির ভাগ্যের কথা মনে করিয়া তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিত, কিন্তু তাহার পিতামাতাই যদি তাহার শত্রুতাচরণ করেন তবে সে আর কতদিন সংগ্রাম করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে। না, না, এসব চিন্তা আর না, ইহাতে শুধু বিক্ষেপ, শুধু অশান্তি, শুধু আধ্যাত্মিক অবনতি। বৈরাগ্যমেবাভয়ম্—বিরতিই চরম সুখ।

মালতীর ভাসুর এতদিন ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধে দিব্য উদাসীন ও পরম নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু এখন হরিবিহারীর পত্রে যত টাকা লাগে পাইবার প্রত্যাশায় অকস্মাৎ তাহার বধূর প্রতি মমতা ও কুলমর্য্যাদার প্রতি সতর্কতা অত্যন্ত কঠোরভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তারকের বাড়ী সন্ধান করিয়া বাহির করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গেরুয়া রঙের একখানি মলিদার চাদর মুড়ি দিয়া দরজার ধারে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া বসিয়া তারক মালাজপ করিতেছিল, ঝুলির ছিদ্র দিয়া শীর্ণ তর্জ্জনী অঙ্গুলীটি সোজা হইয়া বাহির হইয়া ছিল, আঙুলের অষ্টধাতুর তারের পুঁটে দেওয়া আংটিটি চকচক করিতেছিল। এমন সময়ে মালতীর ভাসুর মুকুন্দ একটা কালো কাশ্মীরার কোটের উপর একটা চেক আলোয়ান মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া আসিয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল—মশায় এটা কি তারক বাবুর বাড়ী?

তারক বলিল—হাঁ, আপনি কি চান? আপনি?

—আমাকে চিন্তে পারবেন না। আমি আসচি বারাসাত থেকে, আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।—বলিয়া মুকুন্দ দুই হাতে গায়ের কোট ও আলোয়ান কোমরের কাছে গুটাইয়া তারক যে বেঞ্চিতে বসিয়া ছিল সেই বেঞ্চিতে বসিতে গেল। তারক অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ হাঁ করেন কি? করেন কি?

মুকুন্দ থতমত খাইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—কেন হয়েছে কি? কথা কটা বল্‌তে হবে তাই একটু বসব।

তারক বলিল—দেখছেন না আমি মালা জপ করছি?...

—তাতে কি? আমি ত ব্রাহ্মণ।

—হোন না কেন ব্রাহ্মণ। পায়ে জুতো আছে ত? জুতো পরে আমার মালা ছোঁবেন?

—আচ্ছা, না হয় নাই ছুঁলাম। আমার কথা অল্প, আমি দাঁড়িয়েই বলে যাই। ...আমি শুনলাম মথুরাপুরের জমিদারের ছেলে বিপিন বাবু এখানে আছেন?

—হাঁ আছেন ত?

—তাঁর সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক এসেছে?

—হাঁ, তার নাম মালতী। তাকে বিপিন বিয়ে করবে বলে।

—আমি সেই মালতীর ভাসুর। আমার ভাদ্দর্-বৌকে আমি বাড়ীতে না রেখে দূর করে দিয়েছিলাম কেন জানেন? আমি কি আর আমার ভাইয়ের বিধবা বৌকে একবেলা দুটি হবিষ্যি দিতে পারতাম না? আমি কি এমনি কশাই মশাই? কিন্তু তাকে ভদ্রলোকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারে না, এমন সে। বুঝতে পারছেন ত কথাটা?

তারকের মালাজপ স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। সে বিস্মিত হইয়া তাহার বসা গাল আরো তুবড়াইয়া বলিল—অ্যাঁ বলেন কি? তাকে ত বেশ চুপচাপ লক্ষ্মীটির মতো দেখতে।

মুকুন্দ বলিল—ঐ ত, ঐখানেই ত ওর বাহাদুরী; ধরবার ছোঁবার জোটি নেই...

—তা আপনি কি করতে চান?

—আমি যখন শুনলাম যে সে আপনার বাড়ীতে এসে আছে তখন মনে করলাম নিশ্চয় ভদ্রলোক না জেনে অমন মেয়েমানুষকে নিজের পরিবারে ঠাঁই দিয়েছেন; কিন্তু আমাদের ত উচিত নয় তাঁকে ঠকানো। যদিও নিজের ঘরের কুচ্ছো বলতে নিজেরই মুখ হেঁট হচ্ছে, কিন্তু...

তারক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না না না, তা আপনি খুব ভালো কাজই করেছেন। আপনি—হেঁ হেঁ—দাঁড়িয়ে রইলেন যে...বসুন বসুন এই বেঞ্চিতেই বসুন, আমি ত এখন আর মালাজপ করছিনে।...তা আমি বিপিনকে বলব।

মুকুন্দ বেঞ্চিতে বসিয়া বলিল—বলবেন নয়, মেয়েটাকে দূর করে দেবেন। আপনাকে তবে একটা গোপনীয় কথা খুলেই বলি, আপনাকে ভালো মানুষ বলেই ত ঠেকছে, আবার আপনি বিপদে-টিপদে পড়বেন?

বিপদের নাম শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিক ঠাওরেছেন, আমি একেবারে নেহাত ভালো মানুষ। সংসারের মার-পেঁচ কিছুই বুঝিনে। বিপদ-টিপদের কথা কি বলছেন...শুনে আমার গা কাঁপছে। দোহাই...আপনার নাম জানিনে...মালতীর ভাসুর মশায়, আমাকে বাঁচান!

মুকুন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল—সেই জন্যেই ত আমার গাঁটের পয়সা খরচ করে এতদূর আসা।...শুনুন সব খুলে বলি।...আমি পুলিশ-আদালতে নালিশ করেছি যে বিপিন আমার ভাদ্দরবৌকে ফুসলে বার করে এনেছে। আর হাইকোর্টে দরখাস্ত করেছি বিয়েটা যাতে রদ হয়, আর মালতী যাতে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকে। হাজার হোক কুলের বৌ ত সে, অমনি চোদ্দটা বিয়ে করে বেড়াবে সেটা ত আমাদেরই লজ্জার কথা। লোকে বলবে ঐ মুকুন্দ মজুমদারের ভাইয়ের বৌ। কি বলেন আপনি? তাই বলছি, আপনার বাড়ীতে শেষে কি পুলিশের হাঙ্গামা হওয়া ভালো হবে?

মুকুন্দ তারকের গা ঠেলিয়া দিল। তারক পুলিশ ও আদালতের নামে ভীত হইয়া মুকুন্দর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না না মশায় দোহাই আপনার, আপনি ত ব্রাহ্মণ, পায়ের ধূলো মাথায় দিন, আমার বাড়ীতে পুলিশ-হাঙ্গামা করবেন না। আমি আজই এই রাত্রেই ওদের তাড়িয়ে দেবো।

মুকুন্দ বলিল—তা ত আপনি দেবেনই আমি জানি, হাজার হোক আপনি ভদ্রলোক ত। কিন্তু আপনাকে আরও একটা কাজ করতে হবে, ওরা কোথায় যায় তার খোঁজটি আপনাকে রাখতে হবে; নইলে পুলিশ যখন ওদের সন্ধান পাবে না তখন আমি বলে দেবো আপনিই ওদের লুকিয়ে রেখেছেন। বুঝেছেন ত?

তারক বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ খুব বুঝেছি। আমি রাখব রাখব খবর রাখব!

—আচ্ছা তবে বসুন। আমি আসি।—বলিয়া মুকুন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারকও উঠিয়া বলিল—একটা কথা বলতে ভয় হচ্ছে, একবার একটু এই অধমের বাড়ীতে পা ধুয়ে গেলে ভালো হত না।

মুকুন্দ বলিল—না না, সে আজ থাক, আপনার সঙ্গে ত আমার পরে আরও দেখা হবে।

তারক মনে মনে বলিল—না দেখা হলেই ভালো হত।—প্রকাশ্যে বলিল—আজ্ঞে আজ্ঞে তা ত বটেই...আচ্ছা তবে প্রণাম।

মুকুন্দকে বিদায় করিয়া দরজায় খিল দিয়া তারক বাড়ীর ভিতর গেল এবং উদ্বেগ-জড়িত কণ্ঠে স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—কৈ গো কোথায় গেলে?

তারকের স্ত্রী রান্নাঘরে রুটি সেঁকিতেছিল, মালতী রুটি বেলিয়া দিতেছিল, এবং ডেরিডামরি পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি কান্নাকাটি করিয়া হাট বাধাইয়া তুলিয়াছিল। তারকের ডাক শুনিয়া তাহার স্ত্রী উৎকর্ণ হইয়া ছেলেদের ধমক দিয়া বলিল—আঃ থাম না তোরা একেবারে হাট বাধিয়ে তুলেছিস! কিছু কি শোনবার জো আছে ছাই। উনি বোধ হয় ডাকছেন।...

ছেলেরা সব ক্ষণেকের জন্য সন্ধি করিয়া চুপ করিল। তখন আবার তারকের আহ্বান শোনা গেল—ওগো শুনচ?

মালতী বলিল—হ্যাঁ তারক বাবুই ডাকছেন।

একটা ছোট মেয়ে মাতার বাহুর পাশ দিয়া মাথা গলাইয়া স্তনপান করিতেছিল; সেটাকে সরাইয়া দিতেই সে তারস্বরে হাতপা ছুড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তাহার সেই সরব আন্দোলন ও আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তারকের গৃহিণী খুন্তি হাতে করিয়াই বাহির হইয়া আসিল, তাহার গায়ে কাপড়টা পৈতের মতো জড়ানো, আগুন-তাতে ছিল বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা নয়; স্বামীর আহ্বানে বাঁ হাতে আঁচলের একটা খুঁট মাথার মাঝখানে একটু তুলিয়া দিয়াছিল কিন্তু পশ্চাতের খোঁপাটা বাহির হইয়াই ছিল। সে স্বামীর সম্মুখীন হইয়া বলিল—কেন? কেন ডাকছ?

—ঐ যে বৌটি বিপিনের সঙ্গে এসেছে তার ভাসুর এসেছিল। তিনি বল্লেন বৌটির চরিত্তির ভালো নয়, সেই জন্যেই তাঁরা ওকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলেন, আমাকেও বলে গেলেন আজকে রাত্রেই দূর করে দিতে; না দিলে পুলিস এসে হাঙ্গাম করবে। বৌটি ত ওখানে আছে, তাকে বল।

তারকের স্ত্রীকে কিছু বলিতে হইল না, মালতী সব শুনিতেছিল। একজন অপরিচিত পুরুষের মুখে নারীর এই চরম অপমানের কথা শুনিয়া মালতীর চোখ মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল এবং এই মাঘমাসের রাত্রেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

তারকের স্ত্রী গালে হাত দিয়া ঘাড় কাত করিয়া স্বামীকে বলিল—ওমা বল কি গো? শেষকালে কি পরের দায়ে আমাদের হাতে দড়ি পড়বে নাকি? এতগুলি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কি শেষে পথে ভাসব?—ওগো ভালো মানুষের ঝি, শুনছ তোমার গুণের কথা। বেরোও আমার বাড়ী থেকে এখনি এই দণ্ডে।

তারকের স্ত্রী ঘনঘন খুন্তি সঞ্চালন করিয়া মালতীকে বারবার দ্বার নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। মালতী তেজস্বিনী মেয়ে, সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার পাত্র নয়। সে এতদিন এ বাড়ীতে আছে, তারক তাহাকে দেখে নাই, তাহার গলা শুনে নাই। আজ অপমানের আঘাত পাইয়া উদ্ধত ফণিনীর মতন সে বাহিরে আসিয়া বলিল—ভয় নেই আপনাদের। বিপিনবাবু ফিরে এলেই চলে যাব।

মালতী উহাদের আর গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিতলে গিয়া আপনার ও বিপিনের সমস্ত সামগ্রী গুছাইয়া লইতে লাগিল। তারক বিপিনের প্রতীক্ষায় বাহিরে আসিয়া বীরে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া হি হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে বিপিন আসিয়া দরজার কড়া নাড়িল। তারক উঠিয়া দরজার খিল খুলিয়া দিয়াই বিনা ভূমিকায় চটিয়া বলিল—এ তোমার ভারি অন্যায়।

বিপিন হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ ভাই একটু রাত হয়ে গেছে। গুরুজীর সঙ্গে আজ অনেক সুন্দর সুন্দর কথা হল। খেয়ে নিয়ে বলব তোমায়।

তারক বিরক্তির স্বরে বলিল—না না বক্তৃতা শোনবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না। এ তোমার কি অন্যায় ব্যাভার?

বিপিন তারকের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—কি বলছ? কি অন্যায় করেছি?

—আমার বাড়ীতে একটা বেশ্যা এনে রেখেছ!

বিপিন দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ঘুসি তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—দেখ্ তাড়কা রাক্ষুসী, এক ঘুসিতে তোর ঐ মূলোর মতো দাঁতগুলো ঝরিয়ে একেবারে বাকরোধ করে দেবো। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানো না হ্যাংলিড!

তারক কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—এ ত আমার ভারি বিপদ হল দেখছি। মালতীর ভাসুর এসে বলবে তোমায় পুলিশে দেবো, তুমি বলতে ঘুসি মারব?…

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—মালতীর ভাসুর? —হ্যাঁ সেই ত এসে এইসব বলে গেল।

—কি বলে গেল বল।—বলিয়া বিপিন তারকের হাত ধরিয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিল। তারক দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনর্গল সমস্ত কথা বলিয়া গেল। বিপিন চুপ করিয়া শুনিল। সে চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় মালতী সেখানে আসিয়া বলিল—বিপিনবাবু, শিগগীর একখানা গাড়ী ডাকুন; এ বাড়ীতে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন?

বিপিনও বুঝিতেছিল, আত্মসম্মানবোধ যাহার আছে তাহার এ বাড়ীতে আর এক দণ্ডও থাকা উচিত নয়। কিন্তু সে এই রাত্রে এই সুন্দরী রমণীকে সঙ্গে লইয়া যায় কোথায়? বিপিন মহাসমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইতেছিল না, সে যে সংসার-ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সম্পূর্ণ অসহায়। সে কাতরভাবে মালতীর মুখের দিকে চাহিল। মালতীর চক্ষু দুটি বড় হীরার সূচীর মতো জ্বলিতেছিল। মালতী বলিল—চুপ করে ভাবছেন কি? চলুন।

বিপিন হতাশভাবে বলিল—মালতী কোথায় যাব?

মালতী জোরের সহিত বলিল—সে ভাবনার সময় এখন নেই, একখানা গাড়ী ত ডাকুন। ঘণ্টা-হিসেবে গাড়ী করবেন; গাড়ী পথে পথে নিয়ে বেড়াবে। সেই সময়ে যা হয় একটা ঠিক করে ফেলা যাবে।

বিপিন যন্ত্রচালিতের ন্যায় নিজেই গাড়ী ডাকিতে বাহির হইল। তাহাদের চিরপুরাতন ভৃত্য নিধিরাম যে পাশের ঘরে পড়িয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অচেতন আছে, একথা তখন তাহার মনে আসিল না। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিপিনের মনে হইল আজ যেন কলিকাতার সমস্ত গ্যাসের আলো ধূম ও কুয়াশা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, অজগরের মতো পথগুলা পথ ভুলাইবার জন্যই যেন অসংখ্য শাখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অট্টালিকার অরণ্য রুদ্ধ-দ্বার অর্গল বাহুদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া দুটি গৃহহীন নরনারীর দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ঘণ্টা-হিসাবে ভাড়া করিয়া আনিল। তারপর সমস্ত জিনিষ তারকের বাড়ীর একটা ঘরে গুছাইয়া রাখিয়া শুধু একটা বিছানার মোট ও একটা কাপড়ের ট্রাঙ্ক গাড়ীর মাথায় চাপাইয়া বিপিন ও মালতী অভুক্ত অবস্থাতেই গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। কেহ একবার বলিল না, খাইয়া গেলে ভালো হইত। এতগুলা রুটি যে ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নষ্ট হইল এজন্য তারকের স্ত্রী কয়লার উনানের আঙারের মতন গনগন করিতে লাগিল। এবং ছেলেটাকে চড় কসাইয়া

মেয়েটার কষা নিংড়াইয়া সে এক মহামারি কুরুক্ষেত্র গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল।

এই গোলমালে নিধিরামের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে তাহার মুনিবদের গাড়ীতে চড়িতে দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের পুঁটুলিটি বগলে করিয়া গাড়ীর কোচবাক্সে আপনার স্থান করিয়া লইল। তারক জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

বিপিন বলিল—যমের বাড়ী।

তারক ভাবিল, তাইত। সে জায়গাটার সন্ধান ত পুলিশের ভয়েও করা মুস্কিল এবং চেষ্টা করিয়া সন্ধান পাইলেও ভূত হইয়া পুলিশকে পাওয়া ছাড়া আর কোনো প্রকারে ত পুলিশকে সন্ধান জানাইবার উপায় নাই। তারক মহা সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—তাইত!

গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, কোথায় যেতে হবে?

বিপিন বলিল—তোমার যেখানে খুসি, পথে পথে নিয়ে বেড়াও।

গাড়ী নিশিতে-পাওয়া রোগীর মতন এ-পথ ওপথ করিয়া টলিয়া টলিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে হুড়্‌ম করিয়া সাড়ে নটার তোপ পড়িল, আর সেই ফাঁকা তোপের শব্দ শুনিয়াই ঘরে ঘরে লোক বোমকালী বলিয়া চমকিয়া উঠিল। গাড়োয়ান হাঁকিল—বাবু, আর কত ঘুরব?

বিপিন ও মালতী এতক্ষণ ভাবনার মধ্যে ডুব দিয়া একেবারে তলাইয়া গিয়াছিল। তোপের শব্দে আর গাড়োয়ানের ডাকে সচকিত হইয়া নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বিপিন বলিল—তাইত কোথায় যাব?

মালতী বলিল—শুনেছি কলকাতায় কোথায় কোথায় সব হোটেল আছে, সেইখানে চলুন না।

বিপিন বিপন্নের ভাবে বলিল—হোটেল! তাইত। সে-সব কোন রাস্তায় তা ত জানিনে।

—গাড়োয়ানকে বলুন সে খুঁজে কোথাও নিয়ে যাবে।

—কোথায় অচেনা জায়গায় রাত্রে গিয়ে শেষকালে কি বিপদে পড়ব?

—অত ভাবলে ত চলবে না, এক জায়গায় ত যেতে হবে। সমস্ত রাত ত আর গাড়ীতে ঘোরা চলবে না।

বিপিন একটু চিন্তা করিয়া বলিল—এক খুড়িমার কাছে গেলে হত, কিন্তু তাঁদের ঠিকানা ত জানি না, শেষে কি কাশীর গুণ্ডার হাতে পড়ব?...একমাত্র পথ আমি দেখতে পাচ্ছি।...গুরুজীর আশ্রমে গেলে হয়।

মালতী বিস্মিত হইয়া বলিল—গুরুজী! আপনার আবার গুরুজী কে? তাঁর আশ্রম কোথায়?

—আশ্রম তাঁর খড়দায় গঙ্গার ধারে। তাঁর নাম শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসী তিনি। মহাপুরুষ! অসাধারণ লোক!

মালতী বলিল—প্রেমানন্দ! হন না তিনি প্রেমানন্দ, হন না তিনি মহাপুরুষ! কিন্তু সন্ন্যাসীর আশ্রমে আমরা যাব কেন?

বিপিন এই প্রশ্নে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিল—দেখ মালতী, তোমার

আমার সাংসারিক মিলন হওয়া বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, নইলে এমন সব অঘটন কেন ঘটবে। গুরুজীও বলছেন তোমার সঙ্গে আমার সাংসারিক মিলন মঙ্গলকর হবে না। চল আমরা দুজনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করি; কামনা বিসর্জ্জন দিয়ে আমরা দুজনে আধ্যাত্মিক যোগে মিলিত হব, দুজনে পাশাপাশি থেকে পরস্পরকে ভালো বেসে জগতের সেবা করব। আমার মন আজ কদিন থেকে এই কথাই বলছে; আমি বাসনা বিসর্জ্জন দিতে পারিনি বলে ভগবান আজ একেবারে ঘাড়ে ধরে পথে বা'র করেছেন; সব বাড়ীর দরজা বন্ধ; শুধু সেই প্রেমময় ভক্তের আশ্রমের কোনো দ্বারে অর্গল নেই। চল আমরা সেইখানে যাই। সন্ন্যাসই আমাদের চরম অবলম্বন, ভগবানের ইঙ্গিত নানা প্রকারে শুধু এই কথাই আমাদের বলছে।

বিপিনের কথাটা মালতীর বুকে শেলের মতো গিয়া বিঁধিল। সে এত অপমান, এত নির্য্যাতন, এত বিপদ মাথায় করিয়া যে বিপিনের সঙ্গে অকূলে ভাসিয়াছে সে কি এইজন্য? হিন্দু বাঙালী ঘরের বিধবা সে, সে যে কতখানি ভালোবাসিয়া তবে এত বড় সংস্কারের গণ্ডি পার হইয়া বিপিনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, সেই ত্যাগের সেই ভালোবাসার গভীরতা বিপিন বুঝিল না? আজ একটু অসুবিধায় পড়িয়া বিপিন কিনা অনায়াসে চিরজন্মের বিচ্ছেদের কথা মুখে আনিতে পারিল, একবার ভাবিয়া দেখিল না মালতী তাহার জন্য কি না সহ্য করিয়াছে, কি না ত্যাগ করিয়াছে! মালতী মিনতির স্বরে বলিল—যা আপনার ইচ্ছে হয় করবেন, নবকিশোর বাবু ফিরে আসা পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। আজকে হোটেলেই চলুন।

আবার নবকিশোরের নাম? বিপিনের উপর মালতী নির্ভর করিতে পারে না? এই কি তাহার ভালোবাসা? নবকিশোরই যদি তাহার অধিক হিতৈষী হয় তবে সে নবকিশোরের সহিতই বুঝা-পড়া করুক, বিপিনের সহিত তাহার আর কোনো সম্পর্ক না থাকাই ভালো। বিপিন ত তাই চায়, ভগবানের অলক্ষ্য মঙ্গলহস্ত তাহার বন্ধনগুলি যে একে একে খুলিয়া দিতেছে, এ যে গুরুদেবেরই পরম কৃপার ফল, ইহা কি সে বুঝে না? ভালো, তাহাই হোক মালতীকে নবকিশোরের জিম্মায় সোপর্দ্দ করিয়াই বিপিন একেবারে মুক্ত হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বিপিন গাড়োয়ানকে কোনো হোটেলে লইয়া যাইতে বলিল। গাড়োয়ান অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাদিগকে এক হিন্দু-নিবাসে উপস্থিত করিল। অনেক ডাকাডাকি, কড়া খটখটির পর হোটেলের চাকরদের তুলিয়া তাহারা আশ্রয় পাইল। যথারীতি বচসার পর গাড়ীভাড়া চুকাইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয় ও শূন্য উদর লইয়া বিপিন ও মালতী হোটেলের দুই ঘরে দুটি বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। নিধিরাম আপনার কম্বলখানি বিছাইয়া মালতীর ঘরের দরজার সামনে পড়িয়া রহিল।

(৩২)

ভোর না হইতেই কলিকাতার নিদ্রিত-

দের জাগাইবার উৎকট চেষ্টা পথে পথে চলিতে লাগিল। কলে কলে বাঁশি বাজিল, ময়লা-ফেলা গাড়ী উৎকট শব্দে ছুটিতে লাগিল, ট্রাম চলিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কাকের কলরব, ভিখারী বষ্টমের করতাল বাজাইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং নানা ফেরি-ওয়ালার কড়ি-কোমল সাধা সুরের আর্ত্তনাদ প্রবল হইয়া উঠিল। এততেও যাহার ঘুম না ভাঙে সে কুম্ভকর্ণের আধুনিক সংস্করণ। সুতরাং বিপিন ও মালতীকে পরিতৃপ্তির পূর্ব্বেই নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল।

বিপিন নবকিশোরের চিঠির আশায় একবার তারকের বাড়ীতে গেল। কোনো চিঠি আসে নাই। তারক বলিল—চল তোমার বাসাটা দেখে আসি; চিঠি এলে আমি পৌঁছে দেব 'খন।—মুকুন্দকে বিপিনের নূতন বাসার সন্ধান দিতে হইবে বলিয়া তারকের এত আগ্রহ।

বাসায় ফিরিবার সময় বিপিন আপনাকে বড় বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

মাতার আদরের ধন বিপিন চিরদিন পরের যত্নে ও বিলাসিতায় একেবারে অকর্ম্মা হইয়া গিয়াছিল; বড় হইয়া যখন সে মাতার সঙ্গচ্যুত হইয়া বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহার পরম আশ্রয় ছিল বলিষ্ঠ সতেজ নবকিশোরের বন্ধুত্ব। আজ অপরিচিত নূতন বাসার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার ভার পড়িয়াছে একা তাহার উপর! সে ত কখনো নিজের বা পরের আরামের জন্য মাথা ঘামায় নাই, আজ হইতে একটি নূতন অগঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত খুটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। আজ তাহাকে চাল ডাল তরকারি, তেল নুন লকড়ি, হাঁড়ি কুঁড়ি, হাতা খুন্তি বেড়ির তুচ্ছ ভাবনা ভাবিতে হইবে।

সে খুঁজিয়া পাতিয়া করিয়া কর্ম্মিয়া লইবার লোক মোটেই নহে। অথচ এই সমস্ত কাজ, শেক্সপীয়র গেটে বায়রন রবীন্দ্র ভুলিয়া গিয়া, তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই মনে হইয়া তাহার মন ক্লান্ত ভীত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। বাসায় ফিরিতে তাহার পা উঠিতে চাহিতেছিল না। সে এক এক বার মনে করিতেছিল, বিলাতে যেমন এক এক পরিবার সারা জীবনটা হোটেলেই পরের হেফাজতে কাটাইয়া দেয়, সেও তেমনি কাটাইয়া দিবে, ঘরকন্নার হাঙ্গামা সে ঘাড়ে করিবে না। সব চেয়ে সুবিধা হয় সে যদি প্রেমানন্দের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইতে পারে! সেই চিন্তাটাই বড় নিশ্চিন্ত আরামের।

যখন বিপিন নিশ্চিন্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন নিশ্চিন্ত থাকিবার সুবিধা পাইয়াও মালতীর নিশ্চিন্ত থাকিতে ভালো লাগিতেছিল না।

মালতী আজ এই অস্থায়ী অচেনা গৃহের সর্ব্বময়ী গৃহিণী। তাই সে দুঃখের মধ্যেও আনন্দ বোধ করিতেছিল। সে প্রাতঃকালেই স্নান করিয়া নিধিরামকে বলিল—নিধিদা, হোটেলের ঐ ম্লেচ্ছ নোংরা রান্না ত মুখে রুচবে না; তুমি হোটেলের ম্যানেজারকে বলে এই ঘরের একপাশে রান্নার হুকুম নিয়ে এস; আমরা বরং ঘরে

কলি ফেরাবার খরচ দিয়ে যাব; আর বাজার থেকে একটা লোহার আখা, কাঠ, হাঁড়ি, চাল ডাল তরকারি সব কিনে নিয়ে এস, আমি রাঁধব।

নিধিরাম বিনা বাক্যব্যয়ে জোগাড় করিতে বাহির হইয়া গেল; মালতী কোমরে কাপড় জড়াইয়া, সিক্ত চুল চূড়ার আকারে মাথার উপর তুলিয়া গৃহ-কর্ম্মে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়া দিল।

বিপিন আসিয়া দেখিল, তাহার করিবার জন্য কিছু বাকী নাই; মালতী নিজেই সমস্ত জোগাড় করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বিপিন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। গৃহকর্ম্মের মধ্যেই রমণীর আসল রূপটি প্রকাশ পায়। বিপিন মালতীকে অত্যন্ত সহজভাবে এই অচেনা জায়গার অসীম অসুবিধার মধ্যে তাহারই আরামের জন্য গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মালতীর এই কল্যাণী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ বিপিনের কখনো ঘটে নাই। আজ এই দুর্দ্দিনেও তাহার প্রফুল্ল মুখ ও সুনিপুণ তৎপরতা বিপিনের মন এক নূতন রসাবেশে আপ্লুত করিয়া তুলিল। প্রেমানন্দের মোহ তাহার মনে যে ব্যবধান রচনা করিতেছিল মালতীর আচরণে আজ তাহা বুঝি মুছিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল।

এতদিন সমস্ত সংসার ভুলিয়া সর্ব্বস্বের মূল্য দিয়া বিপিন যাহাকে চাহিয়াছিল, তাহাকে আজ পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই, আজ বিপিনের বড় আনন্দের দিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজ কোনো বাধা নাই বলিয়াই মিলনেরও কোনো ব্যগ্রতা নাই, আজ বিপিন নিজেই নিজের বাধা হইয়া উঠিয়াছে!

হোটেলে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া দুদিন গেল; মালতীকে একা ফেলিয়া বিপিন কোথাও যাইতেও পারে না, আর উভয়ের মধ্যে আবার এমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে যে উভয়ের উভয়কে লইয়াই যথেষ্ট বোধ হয় না। বিপিন বসিয়া বসিয়া শুধু গুরুজীর কথা বলে আর ভাবে, আর মালতী ভাবে পুরুষগুলা কি দুর্বোধ্য জাত, একটুখানি স্থিরতা নাই ধৈর্য্য নাই নিষ্ঠা নাই, অবস্থার পর অবস্থার ক্ষণিক উন্মাদনা শুধু চাখিয়া ফিরিতে চায়! মালতীর মনে হইতেছিল বিপিনের এই যে সন্ন্যাস-গ্রহণের ধুয়া, তাহা তাহাকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইবার ছল মাত্র। সত্য বটে জমিদারের ছেলে বিপিন ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত পাইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে যে চাহিবে ইহা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু দুঃখ কি শুধু সেই মালতীর জন্য পাইতেছে, মালতী কি বিপিনের জন্য কোনো দুঃখ স্বীকার করে নাই? হিন্দু বাঙালী-ঘরের মেয়ে সে, বিধবা হইয়া বিবাহ করিতে যে স্বীকার করিয়াছে, ইহার জন্য যে লজ্জা ধিক্কার ও লাঞ্ছনা তাহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে, তাহা যে তাহার অগ্নিপরীক্ষার চেয়েও ভীষণ! তাহা কি তুচ্ছ হইল? সেই অগ্নিপরীক্ষা সে যাহার মুখ চাহিয়া অবাধে স্বীকার করিয়াছিল, সেই কিনা আজ তাহার সকল আশ্রয় নষ্ট করিয়া দিয়া নিরুপায় অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে?

এর চেয়ে অপমান তাহার নামের মিথ্যা কলঙ্কে বা কুৎসায় ত তাহার বোধ হয় নাই।

মালতী হোটেলের ঘর হইতে বসিয়া বসিয়া দেখে কত বর বাদ্যযন্ত্রের কোলাহল ও আলোর সমারোহ করিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে; কত বধূ নববিবাহের রঙিন সজ্জায় ম্লান মুখে অপরিচিত স্বামীর সহিত শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া তাহার নিশ্বাস পড়িত; নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া লজ্জায় অপমানে তাহার সমস্ত অন্তর তাহাকে শত ধিক্কার দিয়া উঠিত।

বিপিনের সহিত একটা শেষ বোঝা-পড়া হওয়া দরকার হইয়া উঠিয়াছে। বিপিন যদি তাহাকে বিবাহ নাই করে তবে বিপিনের কাছে থাকা তাহার আর এক দণ্ডও উচিত নয়। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোও এর চেয়ে সম্মানের, এর চেয়ে সুখের! এই সময় নবকিশোর থাকিলে ঠিক হইত। কিন্তু কেহ যদি সাহায্য করিবার নাই থাকে, তবে তাহাকে নিজেই নিজের অদৃষ্টের একটা হদিস বুঝিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা বড় লজ্জার কথা। কিন্তু উপায় আর নাই।

মালতী সঙ্কল্প ও সাহস সঞ্চয় করিয়া বিপিনের কাছে কথাটা যখন উত্থাপন করিতে গেল, তখন সে কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুন্দর মুখের ক্রন্দন জগতে অতুলনীয় সুন্দর। বিপিন বসিয়া বসিয়া মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, না না, এসব মোহ, ইহা মারের মারিবার ফাঁদ। সে তখন বল সংগ্রহ করিয়া মালতীকে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়ায় কল্যাণ নাই, এমনি বা এর চেয়ে বেশী বিপদ ঘটিবে; আসল আনন্দ আধ্যাত্মিক মিলনে। গুরুজীর কৃপায় তাহাদের যথার্থ মিলন ও কল্যাণের আনন্দ লাভ হইবে।

এমন সময় তারক পথ দেখাইয়া মুকুন্দকে হোটেলে লইয়া আসিল। মুকুন্দ পুলিস-আদালতে ও হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা রুজু করার কথাটা বিপিন ও মালতীকে সাড়ম্বরে ও সাড়ম্বরে শুনাইয়া গেল।

বিপিন বলিল—দেখছ মালতী, ভগবানের কত রকমের নিষেধ কতবারে কত রকমে আসছে? চল আমরা গুরুজীর আশ্রয়ে যাই।

মালতী মিনতির স্বরে বলিল—হায় অল্প অপেক্ষা করুন, নবকিশোর ফিরে আসতে দিন।

আবার নবকিশোর! মালতী মনে করিতেছিল বিপিনের এই যে ক্ষণিক দুর্বলতা তাহা নবকিশোরের বলিষ্ঠ মনের আশ্রয় পাইলেই দূর হইয়া যাইবে; নবকিশোরের এমন একটি শক্তি আছে যাহার দ্বারা সে অনায়াসে তাহাদিগকে সকল তুফান কাটাইয়া বন্দরের ঘাটে পৌঁছাইয়া নিরাপদে নঙ্গর করাইয়া দিবে। সে ভগবানের নিকট অনুক্ষণ প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে ভগবান নবকিশোরকে শীঘ্র প্রেরণ কর।

এদিকে নবকিশোরের প্রতি মালতীর বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাবকে প্রশ্রয়ে

পক্ষপাত মনে করিয়া বিপিন ক্রমশ বন্ধুর প্রতিও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে করিতেছিল এত সমস্ত কাণ্ড সব ত নবকিশোরের বুদ্ধিতেই সংঘটিত হইয়াছে। বিপিন ইহার মধ্যে আগাগোড়া তাহার বন্ধুর একটা মতলবের খেলা দেখিতে পাইল। তাহার এ-সমস্ত কাণ্ড বিপিনের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া সমাজ-সংস্কারের সুনাম সস্তায় নিজে ভোগ করিবার ফন্দি! উঃ! কি ভীষণ প্রতারণা! বিপিনের সরলতার সুযোগ লইয়া সে তাহার কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছে? পাঠশালার ছুতা করিয়া তিন-তিনখানা তালুক নিজে হস্তগত করিয়াছে; পৈতৃক জমিদারী ও পিতা মাতার স্নেহ হইতে তাহারই জন্য বঞ্চিত হইতে হইয়াছে; অবশেষে মালতীরও মন হরণ করিবার ফন্দি খেলাইয়াছে—সে ফন্দিগুলা যে কি তাহা ঠিক স্পষ্ট এখন জানা না গেলেও নিশ্চয় কিছু আছে, নতুবা মালতী এত তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছে কেন? এই ফন্দিগুলা যতই বিপিন ঠাহর করিতে পারিতেছিল না, ততই সেগুলাকে নিগূঢ় ভীষণ বলিয়া অনুভব করিতেছিল। গুরুজীর কৃপায় তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, বিপিন বুঝিয়াছে সংসার মায়ের মায়াচক্র। বিপিন আর এ মায়ায় ভুলিতেছে না।

এইরূপে আরো দুদিন গেল। তার পর-দিন অকস্মাৎ নবকিশোর আসিয়া উপস্থিত হইল। কতক সংবাদ সে তারকের কাছে শুনিয়া আসিয়াছিল। হোটেলে আসিয়াই বিপিনকে বলিল—বেশ লোক যা হোক! এতদিন এই হোটেলে পড়ে আছ, একটা বাড়ী ভাড়া করে নিতে পারনি। নাও ওঠ!

নবকিশোরের সরল বলিষ্ঠ ব্যবহারের কাছে বিপিনের দুর্ব্বলচিত্ত পাশাপাশি হইবা মাত্রই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কুণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন? কোথায় যাব?

—বাড়ীভাড়া করে' সব ঠিক করে এসেছি; দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী, বেলা দ্বিপ্রহর, এখন হুজুর চলুন। এখানে যেতে নাহি দিব বলবার কেউ নেই, থাকতে নাহি দিব বলবার আমি হাজির। ওঠ ওঠ, উঠে পড়।

বিপিন সবিস্ময় সম্ভ্রমে বলিল—তুমি এলেই বা কখন আর বাড়ী ভাড়া করলেই বা কখন?

—এসেছি পাঞ্জাব মেলে ভোরে। তারকের কাছে সব শুনেই ছুটে গিয়ে বাড়ী-ভাড়া করে সেখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করে এই চলে আসচি।

বিপিন মুখখানি যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল—শুনেছ। আদালতে নালিশ করেছে।

নবকিশোর উপেক্ষার ভাবে বলিল—ওঃ! তার জন্যে কিছু ভেবনা, মালতী সাবালগ; তার যা খুসি সে করতে পারে, যেখানে খুসি থাকতে পারে। ওর ভাসুরের ক্ষমতা নেই ওর বিয়ে বন্ধ করে কি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

নবকিশোরের এই আশ্বাসবাক্যে বিপিনের মুখ তেমন প্রসন্ন হইল না; সে যেমনটি মনে করিয়াছিল তেমন ত ঘটিল না; তাহার উপর সে দেখিল যে মালতী এই কদিন তাহার কাছে বিমর্ষ হইয়া কাটাইয়াছে, আজ সে উৎফুল্ল হইয়া নব-

কিশোরের কথা যেন সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া পান করিতেছে, তাহার চোখমুখ হাসিতে জলজল করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন হাসি ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

নবকিশোর কিন্তু বিপিনকে লক্ষ্য না করিয়াই বিয়েবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার মতন অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল—আদালতের ল্যাঠা চুকে গেলেই চটপট বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু সেখানেও এক মুস্কিল আছে…আমি আজ কদিন ধরে তাই ভাবছি।..

মালতী উৎকণ্ঠিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিল। বিপিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি?

নবকিশোর বলিতে লাগিল—ভাবছিলাম বিয়েটা কি প্রণালীতে সম্পন্ন হবে। প্রচলিত হিন্দু প্রণালীতে বিবাহ দিতে হলে শালগ্রাম শিলা আর অগ্নিকে ভগবান স্বীকার করে বিয়ে করতে হবে, কিন্তু তা যখন আমাদের বিশ্বাসের প্রতিকূল তখন সে বিবাহপ্রণালী গ্রহণীয় ত নয়ই। আবার শালগ্রাম ও অগ্নি-হোম ত্যাগ করে বিবাহ দিলে আইন-সঙ্গত হবে না। আইনের মতে রেজেষ্টারী করে বিয়ে হতে পারে, কিন্তু তাতে স্বীকার করতে হয় আমি হিন্দু নই; এ কখনো স্বীকার করা যেতে পারে না—আমরা হিন্দু, একশবার হিন্দু, আমাদের দেশের এতবড় অতীত ঐতিহ্য ছেড়ে একেবারে অহিন্দু হতে আমরা কখনো স্বীকার করতে পারি না।… তা বিয়ের জন্যে তোমরা ভেব না, একটা উপায় ভেবে ঠিক করবই। এখন চল।

সকলে গিয়া জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিল। 'নবকিশোর বাবু যাহা হয় একটা সুব্যবস্থা করিবেনই,' ভাবিয়া মালতী আশ্বস্ত হইয়া সকল ভাবনা ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল বিপিন ভাবিতেছিল—নবকিশোরের সবই বাড়াবাড়ি। এও একটা বোধ হয় নবকিশোরের ফন্দি! আমার সঙ্গে মালতীর যাতে বিয়ে না হয় তারই একটা চাল!

বিপিন নবকিশোরকে আর তেমন প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। আবার তাহার দুর্ব্বল মন তাহার প্রতি ভালো করিয়া রাগ করিতেও পারিতেছিল না; সে মনে মনে নবকিশোরের প্রতি একটু বিরূপ হইয়া থাকিলেও তাহার এমন শক্তি ছিল না যে সে সেকথা প্রকাশ করিয়া বলে। কাজেই তাহার রুদ্ধ রোষ পুটপাকের মতো তাহার অন্তরকে জারিয়া ছাই করিয়া ফেলিতেছিল, অথচ বাহিরে তাহার কোনো প্রকাশ ছিল না।

(৩৩)

মোকদ্দমা চুকিয়া গিয়াছে। বিপিন এখন মালতীকে স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিপিনের মন এই মোকদ্দমার আবর্ত্তে পড়িয়া সংসারের প্রতি আরো বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল!—দিনের পর দিন আদালতে যাওয়া আসার কষ্ট, স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় সকলের সম্মুখে দাঁড়ানোর লজ্জা, সমস্ত দর্শকের সকৌতুক দৃষ্টির আঘাত, এবং সর্ব্বোপরি বিপক্ষ-পক্ষের উকিলদের অভদ্রোচিত বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন বিপিনকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে এই-সকলের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পষ্ট নিবারণ

দেখিতে পাইতেছিল। এদিকে মালতী কিন্তু ডাক্তারের বয়স-পরীক্ষা, উকিলের জেরা বিদ্রূপ সহ্য করিতেছিল শুধু এত দুঃখের অপমানের পর বিপিনের প্রণয়ে সান্ত্বনা পাইয়া পুরস্কৃত হইবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া। যতদিন মোকদ্দমা চলিতেছিল ততদিন মাথা ঘামাইয়াও নবকিশোর বিপিনের বিবাহ দিবার একটা পদ্ধতি মনের মতো খুঁজিয়া পাইল না; কোনোটায় মতে বিশ্বাসে বাধে, কোনোটায় আইনে বাধে, কোনোটায় ধর্ম্মে বাধে। তাহার মনে হইতে লাগিল কি মুস্কিল! রেজেষ্টারী বিবাহের আইনটা এমন কেন হইল? এতদিন এই আইনটা চলিয়া আসিতেছে অথচ ইহার সংস্কার যে প্রয়োজন তাহা কাহারও মাথায় আসে নাই? কিন্তু যাহা হয় নাই তাহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল কি? এখন উপায়? উপায় সে কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তবে কি ইহাদের বিবাহ হইবে না? তাইত! রফা করিবার মতন লোক ত নবকিশোর নয়।

নবকিশোর যখন বিপিনের বিবাহ ও সংসার পাতাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া ফিরিতেছিল, বিপিন তখন দিব্য সুযোগ পাইয়া প্রত্যহ পরম নিশ্চিন্তভাবে প্রেমানন্দের আশ্রমে যাতায়াত করিতেছিল। মালতী ভীত হইয়া উঠিল। বিপিন পাছে মালতীকে স্বার্থপর অধার্ম্মিক বা এমনি কিছু ভাবিয়া তাহার উপর রাগ করে এই ভয়ে সে বিপিনকে কিছু বলিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহাকে প্রেমানন্দের প্রভাব হইতে রক্ষা করাও আবশ্যক ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছিল। একদিন সে নিতান্ত ভীত হইয়া নবকিশোরের শরণাপন্ন হইল। বিপিন তখন চলিয়া গিয়াছে। মালতী নবকিশোরকে বলিল—আপনার বন্ধু আজকাল কোথায় যাতায়াত করছেন খবর রাখেন কি?

মালতীর ম্লান মুখ ও হতাশাকরুণ স্বর শুনিয়া ভীত হইয়া নবকিশোর বলিল—না। কেন? কোথায় সে যায়?

—সন্ন্যাসীর আখড়ায়। তিনি সন্ন্যাসী হবার সংকল্প করছেন?…

শ্রবণমাত্র নবকিশোর হাহা হাহা করিয়া হাসির রবে ঘর ভরিয়া ফেলিয়া বলিল—বিপিন হবে সন্ন্যাসী!…তাহলে তার গেরুয়া কাপড় কুঁচিয়ে দেবার জন্যে আর আলখেল্লা গিলে করে দেবার জন্যে নিধি-দাদাকে, আর তার নিয়ম সংযম পালন করাবার জন্যে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী হতে হবে।…চাই কি তোমারও সন্ন্যাসিনী হওয়া দরকার হতে পারে।…

মালতী নবকিশোরের হাসি ও শ্লেষবাক্যে লজ্জিত ও আশ্বস্ত হইয়াও বলিল—আপনি হাসছেন, কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে। তিনি রাতদিন মুখ ভার করে বসে শুধু সন্ন্যাসের কথাই ভাবেন। আমাকে সুদ্ধ সন্ন্যাসিনী হতে বলেন।…বলেন যে আমাদের মিলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। আর তাঁর গুরু তাঁকে বুঝিয়েছেন যে এ রকম মিলন ধর্ম্মসঙ্গত হবে না।…

নবকিশোর গম্ভীর হইয়া বলিল—গুরু! গুরু কে? বাঁদরটা শেষকালে একটা গুরু কেড়ে বসল নাকি? কে সে?…

—তাঁর নাম নাকি প্রেমানন্দ। খড়দায় তাঁর আশ্রম। সেই আশ্রমেই রোজ যান ...চিরদিনের জন্যেই যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন।

প্রেমানন্দের নাম শুনিয়া নবকিশোর চিন্তিত হইল। সে প্রেমানন্দকে একদিন দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে লোকটার আকর্ষণী শক্তি অসাধারণ এবং আজকাল যে দলে দলে নব্য যুবকেরা বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার চেলা হইতেছে এ খবরও তাহার অবিদিত ছিল না। এই ফ্যাশানের বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ বিক্ষেপে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত বিপিনও সেই দলে সহজে ভিড়িয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

নবকিশোর অত্যন্ত চিন্তিত হইলেও বাহিরে প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়া মালতীকে বলিল—তুমি ক্ষেপেছ? বিপিন হবে সন্ন্যাসী? তোমার কিছু ভয় নেই।..... তোমার উড়ুকুখু পাখীটির ডানাদুটি শীগগির বিবাহের সোনার শিকলে বেঁধে তোমার হাতে দেবো।...তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

নবকিশোরের প্রতি মালতীর অগাধ বিশ্বাস। সে সান্ত্বনা পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু নবকিশোরের মনের মধ্যে অমঙ্গল-আশঙ্কার মেঘ যেন কালো হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিতে লাগিল।

নবকিশোর অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ঠিক করিল তবে আর ইহাদের বিবাহে একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়।

পরদিনই নবকিশোর বিপিনকে বলিল—বিপিন, কোন্ পদ্ধতি অনুসারে বিয়ে হওয়া উচিত আমি ত অনেক ভেবে চিন্তেও ঠিক করতে পারলাম না। যে পদ্ধতিতে বিবাহ তোমার অভিরুচি বল, আমি তারই যোগাড় করে দেবো।

বিপিন মাথা নত করিয়া বলিল—আমি বিয়ে করব না।

নবকিশোর যদি জোর করিয়া বিয়ে দিয়া দিত, বিপিন হয়ত আপত্তি করিত না। কিন্তু নবকিশোর তাহারই উপর ভার দেওয়াতেই সে অবকাশ পাইয়া বলিল —আমি বিয়ে করব না।

নবকিশোর এই উত্তর শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিল—মূর্খ, লজ্জা করল না ঐ কথা মুখে উচ্চারণ করতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকল আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে এতদূর টেনে এনে এখন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাও! কাপুরুষ!

নবকিশোরের উষ্ণতায় বিপিনও উত্তপ্ত হইয়া বলিল—ভদ্রঘরের মেয়েকে যে এতদূর টেনে এনেছি তার জন্যে দায়ী আমি, না, তুমি? তুমিই ত আগাগোড়া আমার প্রবৃত্তির ইন্ধনে বাতাস দিয়ে দিয়ে এই দারুণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছ। এখন আমার চৈতন্য হয়েছে। তুমি নিজে মালতীকে ভালোবাস, মালতীও তোমায় আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালোবাসে। তুমিই মালতীকে বিয়ে করগে।

এতদিন ধরিয়া যে সন্দেহবিদ্বেষের উত্তাপ তিল তিল করিয়া বিপিনের অন্তরে বিপিনেরও প্রায় অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা আজ নবকিশোরের তিরস্কারে হঠাৎ অগ্নিগিরির উৎক্ষেপের ন্যায় বিপিনের

মুখ ফাটিয়া তাহাদের এতদিনের সুখ সান্ত্বনার আয়োজন সমস্ত এক নিমিষে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। এ আগুন নিভাইতে অনেক দিনের চোখের জল লাগিবে, নষ্ট ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া পাইতে বহুদিনের শ্রম-সাধনার প্রয়োজন হইবে।

নবকিশোর বিপিনের কথার বিষে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মালতীর সাক্ষাতে এমন রূঢ় ও কুৎসিতভাবে যে বিপিন এই কথা কেমন করিয়া বলিতে পারিল তাহা নবকিশোর কল্পনা ধারণা করিতে পারিল না। সে যে মালতীকে একটুও ভালোবাসে ইহা সে নিজের কাছেই স্বীকার করিত না; কিন্তু বিপিন যখন সেই অতিগুপ্ত খবরটিকে তাহার অন্তরের অন্ধকার গুহা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিল তখন সেই কথার মধ্যেকার সত্যের সর্ষপপ্রমাণ বীজটি অকস্মাৎ যাদুকরের মায়াবৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া উঠিল,—তাহার প্রকাশের সৌন্দর্য্য মোহ আর ঢাকিয়া রাখিয়া অস্বীকার করা গেল না। সে চকিতে মনের মধ্যে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া লইল সেই হেমন্তের স্নিগ্ধ বৈকালে মালতীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তাহার জড়তাবর্জ্জিত সরল সাহস দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল; তারপর চৌধুরীবাড়ীতে মালতীর নির্য্যাতন দেখিয়া সে সহানুভূতিতে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, মালতীকে সে আশ্বাস ও নির্ভয় দিয়া মালতীর বিশ্বাস লাভ করিয়াছিল; সব শেষে সেই যে দিন তাহার পিতা মালতীকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া নবকিশোরের মনে ক্ষণকালের জন্যও আশা ও আনন্দের মোহ রচনা করিয়াছিলেন;—আজও সে সকলের স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে সজীব হইয়া আছে; সুপ্ত ছিল মাত্র, বিপিনের নির্দ্দয় আঘাতে বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। নবকিশোর নিজের মন হাতড়াইয়া দেখিয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে বিপিনের নির্লজ্জ আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া আরক্ত নত বদনে দাঁড়াইয়া আছে। নবকিশোরের মনে হইল এই নির্লজ্জ কাপুরুষের রূঢ় আঘাত হইতে মালতীকে বাঁচাইবার অধিকার ও উপায় তাহার হাতে আছে। তখন সে নিজের উত্তেজনায় দ্বিধা মাত্র না করিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—মূর্খ! তুমি কাপুরুষের মতো একে যদি ত্যাগ কর, আমি কখনো ত্যাগ করতে পারব না। মালতী যদি স্বীকার করে, আমিই তাকে গ্রহণ করব।

—বাস! আজ থেকে তবে আমি খালাস! মালতীর সম্বন্ধে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই! আমি খালাস!—বলিতে বলিতে বিপিন ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিপিনের কেবলই মনে হইতে লাগিল এই নিষ্ঠুর বাক্য হয় ত মালতীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে তীরের মতো গিয়া বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে তীর একবার ধনুক ছাড়িয়া যায় তাহাকে আর ত ফেরানো যায় না!

মালতীর আজ অপমানের চরম। সে যাহাকে ভালোবাসিয়া এত দুঃখ সহ্য করিতেছিল আজ সেই অনায়াসে তাহাকে পরের হাতে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল! মালতী নবকিশোরকে পরমবন্ধু মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিত, আজ সেই নবকিশোরের প্রচ্ছন্ন প্রণয় তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া তাহাকে লজ্জায় মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। নবকিশোরের প্রতি তাহার বন্ধুত্বের নির্ভরকে প্রণয়ব্যাকুলতা বলিয়া ভুল করিয়া তাহার প্রতি নবকিশোর ও বিপিন উভয়েরই আচরণ মালতীকে চরম আঘাত করিল। তাহাকে লইয়া পুরুষদের এই নির্লজ্জ কৌতুক তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। বিপিন যখন ঘর হইতে প্রস্থান করিল তখন মালতী যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষণেকের জন্য হতচৈতন্য ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। গভীর নিস্তব্ধ নৈশ অন্ধকারে তাহার হৃদয় যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল, বড় বড় কালো কালো চাকা যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সনসন শব্দ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, আর তাহার মধ্যে সবুজ আগুনের হাজারলক্ষ ফুলকি লোষ্ট্রাহত মৌমাছির মতো ভন্ ভন্ করিয়া উড়িতে লাগিল। তারপর যখন চৈতন্য হইল, গভীর বিষাদে তাহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল যেন তাহার স্বল্পাবশেষ সুখসৌভাগ্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

তখন অশ্রুজলের একটা বিপুল আবেগ মালতীর বুকের মধ্যে বার বার ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ ও চক্ষু পর্য্যন্ত আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। জগৎসংসারে তাহার আপনার বলিতে, আহা বলিয়া স্নেহ করিতে, আশ্রয় বলিয়া দাঁড়াইতে, মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া বলিতে কেহ কোথাও যে নাই, এ কথা কাল ত তাহার মনে ছিল না,—আজ একি হইল যাহাতে তাহার কেবলই মনে হইতেছে বিপিন তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? নবকিশোরকেও আর বিশ্বাস নাই। কেন মনে হইতেছে, এ বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ ও কঠোর এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র দুর্ব্বল অসহায়?

দেখিতে দেখিতে অশ্রুজলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কি মর্ম্মভেদী সেই অশ্রুজল! তাহার মনে হইতে লাগিল, হে ভগবান! আমায় এমন কোনো জায়গা দাও যেখানে আমি আপনাকে ইহাদের সকলের দৃষ্টি হইতে লুকাইতে পারি। হে ভগবান! এস তুমি মৃত্যুরূপে এস! সকল লজ্জা, সকল গ্লানি, সকল দুঃখ, তোমাতে ঢাকা পড়ুক!

মালতীকে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নবকিশোর বুঝিল সে নিজের উত্তেজনার বশে নিজের অজ্ঞাতসারে মস্ত একটা আঘাত করিয়া বসিয়াছে। তখন সে নিজেকে মালতী ও বিপিনের নিকট অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এ অপরাধ ক্ষালনের ক্ষমতা নির্ম্মমভাবে তাহার অধিকারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে, বিপিন বা মালতী তাহাদের আচরণ দ্বারা এই আচরণটিকে কোনরকমে ঢাকিয়া না ফেলিলে এই মূঢ়তা চিরকাল তাহাকে ধিক্কার দিবে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া নবকিশোর নিতান্ত

লজ্জিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল; আপনার অসফলতায় আপনাকে দগ্ধ করিতে লাগিল; সেও যে বিপিনের সহিত মিলিত হইয়া এমন নির্দয় অপমানে মালতীকে জর্জ্জরিত করিয়াছে এই মূঢ়তার বেদনায় সে অভিভূত হইয়া চুপ করিয়া নমিয়া বসিয়া বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর মতো নিরুপায়ভাবে শাস্তির অপেক্ষা করিয়া রহিল, ক্রন্দনকাতরা মালতীর কাছে একটি সান্ত্বনার কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কল্পনাপ্রবণ বিপিন যখন দেখিল যে কল্পনা ও বাস্তবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তখন তাহার দুর্ব্বল চিত্ত স্বভাবতই ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। বিপিন এখন নিজের ভরসায় সংসারে দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল সে কতবড় অসহায়, সে কতবড় অক্ষম। সে সমুদ্রবক্ষে নৌকার ললিত নৃত্য দেখিয়া ভাবিয়াছিল সেখানে বুঝি শুধু আনন্দের হিল্লোল, সে বুঝি শুধুই মধুর বায়ুর মুখে রঙ্গে ভাসিয়া যাওয়া, সে বুঝি জলখেলা; কিন্তু নৌকার বুকে পা রাখিয়াই সে দেখিল, দূর থেকে সে বড় ভালো, কাছে গেলে চাঁদে সুধা নাই; কল্পনা ও কর্ত্তব্যে বিষম অন্তর; ইহা ত শুধু বসিয়া বসিয়া দোল খাওয়া নয়, এযে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সচকিত সচেতন থাকা দরকার, কখনো একটু অন্যমনস্ক হইবার জো নাই, একা হাতে নৌকার জল সেচিতে হইবে এবং অনভ্যস্ত হাতে প্রাণপণে দাঁড়ও টানিতে হইবে। দক্ষিণে বামে একটু কাত হইলেই একেবারে জলে গিয়া পড়িবার আশঙ্কা অহরহ বুকের পাশে কাঁটার মত লাগিয়াই আছে। একটু অমনোযোগ, এতটুকু ভুল, একটু নড়াচড়া হইলেই একেবারে সর্ব্বনাশ! আজ তাহার আশ্রয়স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সে স্থান তাহার কোনো কালেই খুব বিস্তীর্ণ ছিল না, কিন্তু নিরাপদ নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট ত ছিল। সেই অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার বশেই ত সে মনে করিয়াছিল মালতীকে পাইলে তাহার জীবনটা একটা সুকবির গানের মতো সহজ মোলায়েম সুরে বহিয়া যাইবে। কিন্তু এখন ঠেকিয়া দেখিল সে শুধু মরীচিকা, তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া মরাতে সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বস্তি নাই। সুখ চেয়ে স্বস্তি ভালো। মালতীকে পাওয়ার সুখের পশ্চাতে যে বিষম উদ্বেগ রহিয়াছে, তাহার আওতায় সেই ভাবময় সুখ কতক্ষণ টিকিবে? প্রেমানন্দ স্বামীর আশ্রমে নিশ্চিন্ত একটু আশ্রয়, অচেষ্টালব্ধ সামান্য অন্নবস্ত্র জুটিলেই বিপিন বাঁচিয়া যায়। মালতীর অদর্শনে তাহার বুকে তুষের আগুন জ্বলিবে। তা জ্বলুক, তাহাও এই দুরন্তদারুণ জীবনসংগ্রামের চেয়ে ঢের সহজে সহনীয়; আর মালতীর বিরহদুঃখের মধ্যেও ত আনন্দ আছে, ভালোবাসিয়া অন্তরের সার্থকতা, প্রেমাস্পদের চিন্তায় তন্ময়তা। মালতীকে ত্যাগ করিয়া সে সন্ন্যাসীর আশ্রমে গেলে মালতীর প্রেম তাহার নিকট অখণ্ড শাশ্বত সম্পূর্ণ হইয়াই থাকিবে, সেই প্রেমকে সংসারের সংঘর্ষে জীবনের জটিলতায় পদে পদে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন দেখিতে হইবে না।

বিপিনের সমস্ত সংঘাত হইতে সরিয়া পড়িবার একমাত্র অন্তরায় ছিল মালতী—তাহাকে বিপিন কোথায় ফেলিবে ঠিক

করিতে পারিতেছিল না। গুরুজীর আশ্রমে লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মালতী ত তাহাতে সম্মত ছিল না। এইখানেই বিপিনের একটু গোল বাধিয়াছিল। কিন্তু যখন নবকিশোর মালতীর ভার গ্রহণ করিল, এমন কি মালতীকে বিবাহ করিতেও স্বীকৃত হইল, তখন বিপিন মালতীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল বটে কিন্তু নবকিশোরের সৌভাগ্যের ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল। মালতীকে এইরূপ অবস্থায় ত্যাগ করাতে তাহার প্রতি বিপিন যে কিছুমাত্র অবিচার করিতেছে তাহা তাহার মনে হইল না; মালতী নবকিশোরকে ভালোবাসে, হয়ত বা বিপিনের চেয়ে বেশীই ভালোবাসে; নবকিশোরকে বিবাহ করিয়াই সে সুখী হইতে পারিবে, বিবাহসম্বন্ধ ত এক মেয়ের কত লোকের সঙ্গেই হয়—অবশেষে যাহার সহিত বিবাহ হয় সেই ত সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসে। যদিই বা মালতী বিপিনকে একটু ভালোবাসিয়া থাকে তবে সে ভাব সে দুঃস্বপ্নের মতো দু দিনেই ভুলিয়া যাইবে।

মানুষ যখন কোনো কাজ করিতে নিতান্ত ইচ্ছা করে তখন তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার মতো যুক্তির অসদ্ভাব কিছুতেই হয় না। যখন কোনো অশান্তি বা অসুখ উপস্থিত হয় তখন লোকে নিজের দিকে না চাহিয়া সমস্ত দোষ পরের উপর নয় অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

বিপিন এতদিন প্রত্যেক বাধার মধ্যে ভগবানের নিষেধ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এখন সমস্ত দোষ নবকিশোরের উপর চাপাইবার সুযোগ পাইয়া বিপিন নিজেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও দায়িত্বমুক্ত বোধ করিতে লাগিল। সে কতকটা প্রসন্ন ভাবেই গুরুজীর আশ্রমে যাইবার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু পোঁটলাপুঁটলি যতই দড়িদড়া দিয়া কষা হইতে লাগিল, বিপিন অনুভব করিতে লাগিল তাহার মনের একধারে যেন টান পড়িতেছে, মন যেন বেদনায় টনটন করিয়া উঠিতেছে। যখন তাহার যাইতে স্পষ্টই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তখন তাহার থাকিতে লজ্জা বোধ হইতেছিল; তাহার মনে মনে ভারি অভিমান হইতে লাগিল যে নবকিশোর তাহাকে তিরস্কার করিয়া প্রতি নিবৃত্ত করিল না, মালতী অশ্রুভরা মিনতির তাহাকে সাধিল না। তবু বিপিন প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিতে লাগিল, যদি কিছুতে কেহ তাহাকে ফিরাইতে আসে। মালতীকে ছাড়িয়া গেলে তাহার জীবনের যে কত খানি খালি হইয়া যাইবে তাহা বিপিন ক্রমশ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু নবকিশোর বা মালতী সেরূপ প্রকৃতিতেই গঠিত নয় যে যুক্তি যেখানে হার মানিয়াছে, হৃদয়ের যেখানে অসম্মান হইয়াছে, সেখানে গিয়া দয়া ভিক্ষা করিবে। মালতীর আত্মমর্য্যাদার ভাব এবং নবকিশোরের লজ্জা এমন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা বিপিনকে আর কোনো অনুরোধ করিতে পারিল না।

বিপিন যখন দেখিল যে কেহই তাহাকে সাধিতে আসিল না, তখন সে অহং অভিমানের প্রবল ধাক্কায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ছিটকাইয়া পড়িবার উপক্রম

করিল। কিন্তু তখনো আশা একেবারে ছাড়িতে পারিতেছিল না।

গাড়ীতে মোট তুলিয়া বিপিনের মনে হইল এইবার মালতী তাহার সম্মুখ দিয়া চলিত হইয়া, চিরদিনের মতো অনায়ত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে; এখনো ইচ্ছা করিলে সে বাহু বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারে। অকরুণ ইতস্তত করিয়া বিপিন একটা দীর্ঘনিশ্বাসে সেই দুরাশাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া গাড়ীতে চড়িতে যাইবে, ঠিক সেই সময় মালতী আসিয়া তাহাকে বলিল—একটু দাঁড়ান, আমিও যাব।

আনন্দে বিপিনের মন নৃত্য করিয়া উঠিল। মালতী ইচ্ছা করিলে নবকিশোরকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত; সে সুখ ত্যাগ করিয়া এই নবীন বয়সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষিয়া তাহার সন্ন্যাসিনী হওয়া উচিত নয়;—মালতীকে এমন-সব কথা একবার বলিবার জন্য অভিমান বিপিনকে একটু ইঙ্গিত করিল; কিন্তু বিপিনের প্রণয় তাহাকে সে কথা বলিতে দিল না, কি জানি অভিমানিনী মালতী যদি সে কথা শুনিয়া সত্যসত্যই থাকিয়া যায়। মালতীর সহিত একই আশ্রমে থাকিলে অন্তত দেখার আনন্দ ত সে পাইবে। তাহার আভাস ত এখনি সে মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছে। কিন্তু পাছে সেই আনন্দ ধরা পড়িয়া তাহার বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইয়া যায় এই ভয়ে বিপিন যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

মালতীর মন কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না—তাহার তেজস্বী মন নৈরাশ্যকে স্বীকার করে না এবং আশাকেও আঁকড়িয়া ধরিয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া ওঠে না। মালতীও ঠিক বিপিনের মতোই ভাবিয়াছিল যে বিপিনকে ত সে এখন পাইতেছে না, কিন্তু তাহাকে চোখের দেখার সৌভাগ্য সে ত্যাগ করে কেন। বিপিনের প্রণয় নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বেগহীন হইয়া পড়িয়াছিল; সেই নষ্ট বেগ সে ফিরিয়া পাইতে পারিবে যদি মালতী তাহার প্রণয় দিয়া বিপিনের মধ্যে নূতন আগ্রহ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে; রক্তহীন রোগী যেমন অপরের সুস্থ তাজা রক্ত পাইয়া বাঁচিয়া ওঠে, তেমনি বিপিনের অবসন্ন প্রণয় মালতীর প্রণয়ের নিকট হইতে বললাভ করিয়া নূতন হইয়া উঠা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। মালতী বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিল যে এই পথ ছাড়া তাহার যাইবার অন্য পথ নাই; সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল সংগ্রাম যতই কেন বিলম্বিত ও কঠোর হোক না তাহার প্রণয়ের জয় নিশ্চিত, কিন্তু অন্য আর যে-কোনো পথের অন্তে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে ধ্রুব সর্ব্বনাশ।

তৎক্ষণাৎ আপনার তোরঙ্গ বিছানা গুছাইয়া লইয়া মালতী গাড়ীতে গিয়া চড়িল।

মালতী যখন স্বেচ্ছায় নবকিশোরকে ত্যাগ করিয়া বিপিনের সঙ্গ গ্রহণ করিল তখন নবকিশোর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন আবার সে নিজের স্বাভাবিক হৃদয়-বল যথাসম্ভব আহরণ করিয়া শুচি তেজস্বিতার সহিত বিপিন ও মালতীর নিকট

আসিয়া বলিল—তোমরা যাচ্ছ যাও, আমি এই বাড়ীতেই তোমাদের অপেক্ষা করে বসে থাকব, যেদিন ইচ্ছে হবে ফিরে এস।—ফিরে তোমাদের আসতেই হবে। বিপিন, তোমার আর আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে।

শেষের কথাটা নবকিশোর জোর দিয়া বলিল। মালতী ও বিপিন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, নবকিশোরের দিকে কেহই চাহিল না; তাহারা পরস্পরের দিকেও চাহিতে পারিতেছিল না। উভয়ে শূন্য দৃষ্টিতে গাড়ীর জানালা দিয়া দুজনে দুদিকে রাস্তার চঞ্চল জনপ্রবাহের পশ্চাতে ক্রম অপস্রিয়মাণ অট্টালিকাশ্রেণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর নবকিশোর দীন অপরাধীর মত কুণ্ঠিত পরাজিত স্তব্ধ হইয়া সেই দ্রুত দূরগামী গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার হৃদয়ের সমস্ত বল তেজ শৌর্য্য সাহস বিশ্বাস উৎসাহ যেন একেবারে এক ধাক্কায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে কেমন করিয়া হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

ক্রমশ

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবর্-ই-নূরজাহান্

"বর্ ম্যজারে মা গরীবাঁ ন্যঃ চেরাগে ন্যঃ গুলে!
ন্যঃ পরে পরমানা সুজদ্ ন্যঃ স্তাতায়ে বুলবুলে॥"

আজ্‌কে তোমায় দেখ্‌তে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান!
সন্ধ্যা রাতের অন্ধকার আজ জোনাক পোকায় স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেখ্‌তে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরাণ দেশের শকুন্তলা! কই সে তোমার রূপ অতুল?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখব তোমায় সুন্দরী!
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান্-নূরী আলোয় ভর দিক আবার;
কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্ত্তন—
কত যুগ আর চল্‌বে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন?
জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ;
রতির মূরতিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ।

রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানেগো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো;—
তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ্ রীতি?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে।

* * * *

রূপের আদর জান্‌ত সেলিম, রূপ-দেবতায় মান্‌ত সে;
সোনার চেয়ে সোনামুখের ঢের বেশী দাম জান্‌ত সে;
বিপুল ভারতভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভরল না মন? হায় তৃষিত চায় কারে?
তোমার সোনামুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় ঝল্‌সেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্‌ল সে,—
রক্ত-সাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।—
টাঁকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
"টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নূরজাহাঁর নাম।"
মোহরে নাম উঠ্‌ল তোমার, লেখা হল তায় শ্লোকে,
"সোনার হ'ল দাম শতগুণ নূরজাহানের নাম যোগে।"

* * * *

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুল্‌তানা!
গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা।
তোমায় ফেলে আস্‌ছিল সব, আস্‌তে ফেলে পারল কই?
দৈন্য দশার নির্ম্মমতা, টিঁক্‌ল না দু দণ্ড বই।
জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন।
মরুভূমির মেহেরবানী! তুমি মেহের-উন্নিসা!
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির দিন নিশা!
পথের প্রসূন! তোমার রূপে দুর্ণিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে দেওয়া কুড়িয়ে নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট!

* * * *

দিনে দিনে উঠ্‌লে ফুটে পরীস্থানের জরীন গুল্‌!
মলিন ক'রে রূপরাণীদের ফুট্‌ল তোমার রূপের ফুল।
রূপে হ'লে অপ্সরী আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোকরচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মূরত বুকে বইল না।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা
নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা!
বাদ্‌শাজাদা দেখ্‌ল তোমায়—দেখ্‌ল প্রথম নওরোজে,
খুশী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।
খস্‌ল হঠাৎ ঘোম্‌টা তোমার, সরমরাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপরাণী গো রূপরাণী!
বাদ্‌শাজাদা চাইল তোমায়, বাদ্‌শা হ'লেন তায় বাদী;
শের আফ্‌গানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি্‌।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো
বর্দ্ধমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

* * * *

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছ'টা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদ্‌শা-জাদা বাদ্‌শা হ'ল তোমায় তবু ভুল্‌ল না;
অন্যায়ের সে বৈরী চির ভুল্‌ল হঠাৎ ধর্ম্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কী বন্যায়!
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফ্‌গান;
সেলিমের দুধ-মায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে;
তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগ্‌ছে জাহাঙ্গীরের লাজ।
সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগ্‌ছে নারী, তোমার জয়!—
সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়।

* * * *

পাল্কী এল "আগ্রা চল" শাহান্‌শাহের অন্দরে,
কাছে গিয়ে দেখ্‌লে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।

মহলে কই বাদ্‌শা এলেন? মৌনে ব্যথা সইলে গো
চোদ্দ আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো।
রেশ্‌মী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,
বাঁদী দিয়ে বিক্রী ক'রে হ'ত তোমার দিন্‌-গুজার;
সাদা-সিধা সুতির কাপড় আপনি পরে থাক্‌তে গো,
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখ্‌তে গো।
স্পর্শে তোমার জুঁই-বুরুজের শিলায় শিলায় ফুট্‌ল ফুল,
রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল।

* * * *

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখ্‌ল তোমার মলিন বেশ;
দেখ্‌ল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখ্‌ল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুল্‌ল সে দুধ-ভায়ের শোক।
বাদ্‌শা সুধান্‌ "এ বেশ কেন? নিজের দাসীর চাইতে ম্লান!"
জবাব দিলে "আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ।
তোমার দাসীর অঙ্গে থামিন্‌! তোমার খুশীর মতন সাজ।"
বাদ্‌শা বলেন "সত্যি কথা, দিলে আমায় উচিত লাজ,
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের! সুন্দরী!
চল আমার খাস্‌মহ'লে মহল-আলো অপ্সরী।
সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,
বাদ্‌শা তোমার গোলাম, জেনো, কবেছ তার দিল্‌ দখল্‌।"

* * * *

পাঁচ হাজারের এক এক মোতি, এম্‌নি হাজার মোতির হার
বাদ্‌শা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত সাগরের শোভার সার।
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শা হ'লে, বাদ্‌শা হ'লেন তোমার বশ
অফুরান্‌ যে স্ফূর্ত্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দ্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চ্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্‌শা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার যোদ্ধৃকবি আসফ জা।
দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব
বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।

নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে !
তুমি গো সাম্রাজ্য লক্ষ্মী কর্ম্মে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাশ্বা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী ;
নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল
দরবারী সব চট্‌ল মনে, উঠ্‌ল জ্বলে ওম্‌রাদল ;
বাদশাজাদা খুরম্ এবং দশহাজারী মহব্বৎ
বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা
ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুল্‌তানা !
বাদ্‌শা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দীতে
চল্‌লে তুমি সিংহী সম চল্‌লে স্বয়ং রণ দিতে ;
হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
ঝাণ্ডা তুলে লড়্‌তে এলে মাত্‌লে তুমি কি রঙ্গে ;
শত্রু মেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিন্‌টে তূণ,
আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝ্‌লে তবু চতুর্গুণ ;
দুষ্‌মনেরা উঁচু ডাঙায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
তোমার হানায় অধীর তবু ভাব্‌ছে কি যে করবে গো ;
হঠাৎ বেঁকে বস্‌ল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়
ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ রোষের যন্ত্রণায়।
বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী
মহব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরাণ-নন্দিনী,
জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাৎ
তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;
ফকীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হল জয় শেষে,—
তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে।

* * * *

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব্‌ডালে
লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,
জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চির'দিনের সুন্দরী !

হোথা তোমার স্বামীর সমাধ্ যত্নে তোমার উজল ভায়
ঝল্‌মলিছে শাহ্-ডেরা রতন-মণির আল্‌পনায়।
গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ একলাটি,—
সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি !
শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাক্‌ছে না,
তুমি যে তার নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখ্‌ছে না।
সূক্ষ্ম সোনার সুতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !
আজ্‌কে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়।
বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে
গোরী ! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ।
সোহাগী ! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ-সিঁদুর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রীদুর্গ !

* * * *

শিয়রে কি লিখন লেখা ! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক
হে সুল্‌তানা ! লিখেছ এ কী আফ্‌শোষে সুন্দরী !
লিখ্‌ছ তুমি "গরীব আমি" পড়্‌তে যে চোখ্ যায় ভরি।—
"গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে—
শ্যামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে।"
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান !
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্তপ্রাণ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্‌ছ কালের সঙ্কেতে।
ডুব্‌ছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুব্‌বে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠ্‌ছে ফুটে সর্ব্বদাই,
হৃদ্‌রাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি'
মোগল-যুগের তিলোত্তমা ! চিরযুগের সুন্দরী !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ওবেলায়

(গল্প)

এবার দার্জিলিঙে এসে এই কাহিনীটি শুনলুম।

অনেক দিনের কথা। ভুটিয়া-বস্তীতে এক ইংরেজ পাদ্রী বাসা বেঁধেছিলেন। ভুটিয়ারা সবাই তাঁকে বড় ভালোবাসত—বিশেষ করে ভুটিয়া-শিশুগুলি।

বিপদ-আপদে এই পাদ্রীসাহেব ভুটিয়াদের বল ভরসা সবই। কারুর অসুখ করলে বুক দিয়ে পড়ে তিনি সেবা করতেন,—তাঁকে ডাকতে হত না। এমন তাঁর যত্ন যে আপনার জনের যত্ন তার কাছে হার মেনে যেত।

পাদ্রীসাহেবের নিজের কোনো সংসার ছিল না। ভুটিয়াদের নিয়েই তাঁর সংসার। তাদের ভালোমন্দ নিয়েই তাঁর ভাবনাচিন্তা। ভুটিয়া-পাড়ায় যেখানে যা-কিছু ঘটত পাদ্রী সাহেবের অজানা থাকত না, এবং ছোটো-বড় যে-রকম অনুষ্ঠানই হোক না তার মধ্যে তাঁর হাত, তাঁর পরামর্শ থাকতই থাকত। কোথাও বিবাদ বাধলে সকলের আগে তাঁরই ডাক পড়ত এবং বিবাহের মিলন-সূত্রটি বাঁধা হবার সময়ও তাঁকে বাদ দেওয়া চলত না।

ভুটিয়া-শিশুগুলি যেন তাঁর প্রাণ ছিল। তাদের বুকে করে, কোলে করে, পিঠে করে, কাঁধে চাপিয়ে, মাথায় বসিয়ে, চট্‌কে, টিপে, কাঁদিয়ে, হাসিয়ে তাঁর মনের আশ যেন মিটত না। তাঁর কাছে সুন্দর কুৎসিত ছিল না—ছেলে হলেই হল। রাস্তার উপর থেকে ধূলাকাদা-মাখা ছেলে অবলীলাক্রমে তিনি বুকে তুলে নিয়ে চুমু খেতেন; মনে কোনো ঘৃণা হত না। অনেক সময় নিজের হাতে তাদের গায়ের ময়লা পরিষ্কার করে দিতেন। তাতে তাঁর আনন্দই ছিল। ছেলেরাও তাঁর ভারি ন্যাওটা। দেখবামাত্র ছেলের পাল তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত—কেউ লাফিয়ে বুকে উঠত, কেউ কাঁধে উঠত, কেউ দুহাত দিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

ভুটিয়াদের মানুষ করে তোলবার জন্য তাঁর মনে অনেক-কিছু সংকল্প ছিল। কিন্তু নিজের সামর্থ্য ও সংস্থান তেমন ছিল না বলে বেশী কিছু করে উঠতে পারেন নি। যা করতে পেরেছিলেন সে একটি স্কুল। স্কুলটিও যে রীতিমত বাড়ি-তুলে তৈরি করতে পেরেছিলেন তা নয়,—স্কুলের জন্য নিজের বসবার ঘরটি ছেড়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাইতেই স্কুল চলত,—পাড়ার সব ছেলে সেখানে একত্র হত। একসঙ্গে সবাইকে তিনি পেতেন—এতে তাঁর ভারি আনন্দ ছিল। সেখানে পড়াশুনা বড় হত, খেলাধূলা তার চেয়ে ঢের বেশী হত। সেই জন্য ছেলেরা সে জায়গাটা ছাড়তে চাইত না।

এই স্কুলে আর-একটি ব্যাপার হত, সে নানারকম উৎসবের অনুষ্ঠান। এই সব

উৎসবে আলো জ্বালিয়ে, ফুল ছড়িয়ে, নিশান উড়িয়ে, বাঁশি বাজিয়ে যে ঘটাটা হত তার রেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত ছেলেদের মনের মধ্যে বাজতে থাকত। কিন্তু সব চেয়ে জমত বড়-দিনের উৎসবটি। সে সময় খাওয়া-দাওয়া আর সব আমোদ তো থাকতই তার উপর লাভ হত নানা রকমের নানা রঙিন খেলনা। এই খেলনাগুলি পূরা-আকারে না হোক, টুক্‌রো টুক্‌রো হয়েও সারা-বছর দিনরাত ছেলেদের হাতে হাতে ঘুরত।

(২)

সে বৎসর উৎসবের দিন ভোর না হতেই ছেলেরা পাদ্রীসাহেবের দরজা ঠেলতে আরম্ভ করেছে। পাদ্রীসাহেব কিছুতেই তাদের ঘরে ঢুকতে দেবেন না। তিনি ঘরের ভিতর থেকে চীৎকার করে বলছেন—"ওরে, এখন না! এখন তোরা যা! ওবেলা আসিস!" কিন্তু সে কথায় কান দেয় কে? শেষে তারা সকলে মিলে এমন ঠেলাঠেলি আরম্ভ করলে যে দরজা বুঝি ভেঙে পড়ে।

পাদ্রীসাহেব দেখলেন, ভালো-মুখে বল্‌লে হবে না। তখন তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন। ছেলেরা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল—তার পর কেউ ছলছল-চোখে, কেউ কাঁদো-কাঁদো মুখে—করুণ দৃষ্টিতে পাদ্রী সাহেবের দিকে চাইতে চাইতে ধীরে ধীরে চলে গেল।

আর কোনো বাধা ছিল না। আজকের উৎসবের জন্য তাঁর ঘরটি তিনি নতুন রকম করে সাজাচ্ছিলেন; মতলব ছিল এখন কারো কাছে ফাঁস করবেন না, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেলেদের একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেবেন। সেই জন্য এবারকার উৎসব সকাল থেকে আরম্ভ না হয়ে সন্ধ্যাবেলা হবার আয়োজন হয়েছিল। তৈরি-করা গাছ দিয়ে, লতাপাতাফুল দিয়ে, ঝরণা দিয়ে ঘরের মধ্যে এমন একটি বাগান গড়ে তুলছিলেন যে দেখলেই যেন ছেলেদের মনে হয়—এ কী! এ যে স্বর্গের নন্দন কানন! দিনের আলোয় এর মূর্ত্তি তেমন ফুটবে না; সেই জন্য সন্ধ্যাবেলাকার ঝাপসা আলোর অপেক্ষায় ছিলেন। এখন ছেলেদের ঘরে ঢুকতে দিলে এর মোহিনী মায়া নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য বাধ্য হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর জন্যে তাঁর মনে কিন্তু একটি তীক্ষ্ণ বেদনা বিঁধে রয়ে গেল।

সমস্ত দিন তিনি ঘর সাজাতে ব্যস্ত। জানলার ফাঁক দিয়ে এক একবার তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন—ছেলেগুলো আশেপাশে ম্লানমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আজ তারা কোনো খেলাতেই মন দিতে পারছে না। আজ যেন তারা পথের কাঙাল—আশ্রয় নেই, আত্মীয় নেই, তাদের জীবনের স্ফূর্ত্তিই যেন উবে গেছে—এমনি তাদের মুখের ভাব!

পাদ্রীসাহেব জানালা দিয়ে ঘন ঘন আকাশের দিকে চাচ্ছিলেন—কখন্ দিনের আলো একটু ম্লান হয়ে আসে।

বিকেল যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় তিনি ঘর থেকে একবার বেরিয়ে এলেন ছেলেদের বলতে—ভালো কাপড়-চোপড় পোরে উৎসবের জন্য তারা তৈরি হয়ে

আসুক। কিন্তু বাইরে এসে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। ভাবলেন, বলবার আর তারা অপেক্ষা রাখেনি, নিজেরাই গেছে। * * *

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। ধূসর সন্ধ্যাকে হঠাৎ একটা কালো পর্দ্দা দিয়ে কে যেন মুড়ে ফেল্লে। জোর বাতাস বইতে লাগল, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

পাদ্রীসাহেব একলাটি ঘরের মধ্যে বসে বসে ভাবছিলেন—কখন ছেলেরা আসে! বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়ছিল, ঝড়ের গর্জ্জন ভীষণ হয়ে উঠছিল! এই ঝড়বৃষ্টি ঠেলে ছেলেরা কেমন করে আসবে তাঁর একটা দুর্ভাবনা হচ্ছিল বটে কিন্তু মনে এ আশাও হচ্ছিল যে বৃষ্টি হয় ত শীঘ্রই থেমে যাবে, এবং ছেলেরা আজকের এই উৎসব থেকে কিছুতেই বাদ পড়তে চাইবে না। * * *

ঘন ধারায় বৃষ্টি পড়ছে—উন্মত্ত গর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়ে ঝড় ছুটোছুটি করছে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। প্রদীপের ম্লান আলোয় পাদ্রীসাহেব ঘরের মধ্যে একা। ছেলেরা কৈ? ছেলেরা কৈ? উৎসবের আনন্দগুলি কৈ?—তাঁর প্রাণের মধ্যে থেকে কেবলই এই ব্যাকুল প্রশ্ন উঠছে। এত সাজসজ্জা সবই নীরস হয়ে শুকিয়ে উঠল যে! ভার হয়ে বুকে চেপে বসেছে যে! ঝড় বহে চলেছে—তার পিছে পিছে সময়ও বহে চলেছে;—কিন্তু অতিথি কৈ? অতিথি কৈ? উৎসবের আলোর শিখাগুলি যে এখনো জ্বলল না। আজকের এত আয়োজন যে ব্যর্থ হয়ে যায়!

একটি ব্যাকুল বেদনা পাদ্রী সাহেবের প্রাণটিকে কাঁদিয়ে তুলতে লাগল। তাঁর কেবলই মনে পড়তে লাগল—ছেলেদের সেই ম্লান মুখগুলি! মনে হচ্ছিল, আজ তিনি যে আঘাত তাদের দিয়েছেন সেই আঘাত ফিরে ফিরে তাঁর বুকে এসে বাজছে! * * *

ঝপ্ করে একটা শব্দ করে সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল! বাতাস আর বইছে না, বৃষ্টিধারা আর নেই।

পাদ্রীসাহেবের মন আশান্বিত হয়ে উঠল—এইবার ছেলেরা আসবে। তিনি উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় বসে রইলেন। এতক্ষণে তারা বাড়ী থেকে বেরিয়েছে!—এতক্ষণে তারা মাঝপথে!—ঐ বুঝি এল! তিনি উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। কিন্তু কৈ? কেউ তো আসেনি!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলি ভীষণ হয়ে তাঁর ব্যাকুল মনকে আরো ব্যাকুল করে তুলতে লাগল। সময় তো বহে যায়—তবু তো তারা আসে না! তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল—তারা অভিমান ভরে চলে গেছে, ব্যথা পেয়ে চলে গেছে; আর ফিরে আসবে না—ফিরে আসবে না! * * *

হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া তাঁর ঘরের দুখানা দরজা ধরে সজোরে একবার নাড়া দিয়ে চলে গেল। ঘরের উপরকার টিনের চালখানা একবার ঝন্‌ঝন্ করে উঠল, দেয়ালের গা থেকে ফুলের মালাগুলো খসে খসে পড়তে লাগল! দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে কেমন-একটা শির্-শিরে বাতাস এসে তাঁর সমস্ত শরীরটাকে শিউরে দিতে লাগল। * * *

হঠাৎ ঘরের বাহিরে মৃদু পায়ের শব্দ, অস্ফুট কলধ্বনি শোনা গেল। মনে হল, কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে, টিপে টিপে পা ফেলছে। কিন্তু ঘরের ভিতর কেউ আসছে না। এ নিশ্চয় তাদের অভিমান—অভিমানের নীরব তিরস্কার!

পাদ্রীসাহেব উঠে গিয়ে দরজা খুলে হাত ধরে তাদের আনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দরজা আর খুলতে হল না। ঝড়ের ঝাপটে দরজা আপনি খুলে গেল। কে যেন হুহু শব্দে ঘরের মধ্যে ছুটে এল—আলো নিবিয়ে, ফুল ছিঁড়ে, সমস্ত সাজসজ্জা একেবারে ওলট-পালট করে দিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠল।

পাদ্রীসাহেব অনেক চেষ্টা করলেন, বাতি আর জ্বলল না; যেন কার তীব্র ফুৎকারে বার বার নিবে যেতে লাগল। বাইরে তখনো চাপা গলার মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। পাদ্রী সাহেব স্নেহের স্বরে ডাকলেন—"ওরে তোরা আয়! আর দেরী করিস্ নে!"

একদল ছেলে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। তাদের কারো মুখে একটি কথা নেই—এতটুকু হাসি নেই!

পাদ্রী মনে মনে বললেন—এ অভিমান শীঘ্রই ঘুচবে—রোসো আগে খেলনা বার করি। তিনি অন্ধকারের মধ্যে হাৎড়াইয়া ছেলেদের জন্য খেলনা বার করতে লাগলেন—

—এই নে তোর বাঁশি!

—এই নে তোর ফানুস!

—এই নে তোর কলের গাড়ি!

—এই নে তোর বিবি-পুতুল!

—এই নে—

কিন্তু এ কি! সমস্ত খেল্‌না মাটিতে গড়াগড়ি যে! কেউ যে তাঁর উপহার নেয় নি! তিনি সমস্ত উপহার উজাড় করে ফেললেন, কৈ কারো মুখে তো হাসি ফুটে উঠল না! তিনি সকলকার দিকে চেয়ে দেখলেন—এখনও সেই ম্লান মুখ, সেই ছলছল চোখ!

—ওরে তোদের এ কী দুর্জ্জয় অভিমান!

* * * *

পাদ্রীসাহেব গভীর রাত্রে বার হয়ে দেখলেন ভুটিয়া-বস্তীর একটা অংশ—যেখানে ছেলেরা থাকত সেখানটায় একটা গভীর গহ্বর দৈত্যের মতো হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে—বাড়ি ঘর দুয়ার সমস্ত কোন্ অতলে ধ্বসে চলে গেছে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ককারের অহঙ্কার

(বক্তা খোদ কর্ত্তা)

বকলমে স্বাক্ষরকারী :—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শনে আমার দর্শন পাওনা বলিয়া আমার প্রতি আক্রোশ করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, কণাদ কপিল আমাকে শীর্ষে স্থান দিয়াছেন, আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ন্যায়সূত্রকার গোতম অক্ষপাদ আখ্যা ও বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ং' আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই প্রকৃততত্ত্ব তাঁহার নিকটে করামলকবৎ প্রতীয়মান। চার্ব্বাকের আমিই বাক ফুটাইয়াছি। তিনিও লোকায়তদর্শনে সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। শারীরকসূত্রে ও বৈশেষিকদর্শনে আমি আছি ; সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় আমি 'আদাবন্তে চ' রহিয়াছি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও কুসুমাঞ্জলি আমার কৃতিত্বের নিদর্শন। ইংরাজীওয়ালারা কোমত কোঁত কম্‌টে কম্‌টি প্রভৃতি যত রকমেই তাঁহাদিগের ফরাসী গুরুর নাম বিকৃত করুন, আমাকে এড়াইতে পারিবেন না। ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, কুজিন, ডেকার্ট, লক, বার্কলে, ম্যাকশ, প্রভৃতি বৈদেশিক দার্শনিকও আমার অধিকারভুক্ত।

আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিকে, অবিকৃতি মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতিবিকৃতিতে, ক্ষণিকবাদে, অধিকরণে, অহঙ্কারে, আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যায় ন্যায়ের কচকচিতে, কালীশঙ্করীতে, অবচ্ছেদকে, পূর্ব্বপক্ষে, কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়ে, সূচিকটাহন্যায়ে, গতানুগতিকন্যায়ে, কাকতালীয়ন্যায়ে আমি, আবার কুম্ভক রেচক পূরক প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের ক্রিয়ায়ও আমি। নবদ্বীপের ন্যায়দীপ রঘুনাথ আমারই কটাক্ষে কণাভট্টে পরিণত। জরন্মীমাংসকে আমি, আবার শঙ্কর তর্কবাগীশ, কালিদাস বিদ্যারত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, প্রভৃতি নৈয়ায়িক বৈদান্তিক আমার অধিকারভুক্ত। এতদ্ভিন্ন বহু তর্কবাগীশ, তর্কপঞ্চানন, তর্কালঙ্কার, তর্কভূষণ, তর্কচুঞ্চু, তর্করত্ন, তর্কতীর্থ আমার পায়ে গড়াগড়ি যান।

শিক্ষাকল্পব্যাকরণেও আমি মূর্ত্তিমান্। আবার আমার মাহাত্ম্যে অভিধানের নাম হইয়াছে কোষ। কলাপ-কাতন্ত্রে, সিদ্ধান্তকৌমুদীতে, কাশিকায়, সংক্ষিপ্তসারে, কবিকল্পদ্রুমে, শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়, প্রাকৃতপ্রকাশে, এমন কি, ব্যাকরণকৌমুদী ও উপক্রমণিকায়, কোথায় আমি নাই? আমিই সূত্রের সহিত বার্ত্তিক যোগ করিয়া

দিয়াছি, কাত্যায়ন-কৈয়ট-ক্রমদীশ্বরের মাথায় চড়িয়াছি, ভট্টোজিদীক্ষিতকে দীক্ষিত করিয়াছি, সংস্কৃত রোমক গ্রীক প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষা গড়িয়াছি। সকল অক্ষরে, বিশেষ করিয়া যুক্তাক্ষরে, আমিই জড়াইয়া আছি, কণ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণকালে কণ্ঠ ও অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণকালে নাসিকা আমিই চাপিয়া আছি।

কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়াত্মক বাক্যে, প্রাতিপদিকে, প্রকৃতিতে, বিভক্তিতে, কৃৎপ্রত্যয়ে, কৃত্যপ্রত্যয়ে, কর্ত্তৃবাচ্য কর্ম্মবাচ্য কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে (কেবল ভাববাচ্যে আমার অভাব) আমি। কোন পুরুষে আমি নাই, কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে আছি। কারকে আমি, একবচনেও আমি আছি। ক্রিয়াদিগণে আমি, ক্রিয়ার কালবোধক বিভক্তিতে আমি। কর্ম্মধারয়ে, একশেষদ্বন্দ্বে, অলুক্ সমাসে, শাকপার্থিবাদিস্থাং সমাসে, আমি। বিকল্পবিধানে আমি। আমারই মুখরক্ষার জন্য 'তি', 'ত', 'তবৎ' 'ক্তি' 'ক্ত' 'ক্তবতু' সংজ্ঞালাভ করিয়াছে ; 'গুণবৃদ্ধ্যোরভাজনং' ক্ত্বাপ্রত্যয় ও ইগুপধাজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ আমারই জয়জয়কার। স্বার্থে কন্, সমাসান্ত ক, এবং ষ্ণিক ও ণক প্রত্যয়—এই চারিটী অস্ত্রে সকল শব্দকে কৃত্রিম উপায়ে স্বকীয় অধিকারে আনিবার জন্য ক্রূরকর্ম্মা আমিই কৌশল প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা কখন লক্ষ্য করিয়াছ কি ?

শুধু নীরস দর্শন-ব্যাকরণে কেন, সরস কাব্যেও আমি প্রকাশমান। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' ইতি লক্ষণেই আমি বার বার তিনবার তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অলঙ্কারেও আমার ঝঙ্কার সুস্পষ্ট। কাব্যপ্রকাশ কাব্যাদর্শ কণ্ঠাভরণ ধ্বন্যালোক চন্দ্রালোকে তাহা দেখিতে পাইতেছ নাকি ? কাকু আমারই স্বরবিকার, লক্ষণা আমারই কল্পনা, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য আমারই অধিকার। অবাচকতা শ্রুতিকটুতা চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি দোষেও আমি ঢাকা পড়ি না। যমক রূপক দীপক ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা কাব্যলিঙ্গ পরিকর, সহোক্তি অতিশয়োক্তি স্বভাবোক্তি সমাসোক্তি বিশেষোক্তি, সমস্তই আমার শক্তির বিকাশ। আবার ছন্দঃশাস্ত্র বৃত্তরত্নাকরে আমাকে দেখিতে পাইবে। শ্লোক যুগ্মক বিশেষক কলাপক কুলক সকলই আমার কৌশল। তোটক তূণক দোধকে আমিই পদান্তে আছি, পজ্ঝটিকায় আমিই ঝটিকা উৎপাদন করিয়াছি, বসন্ততিলকে আমিই তিলক পরাইয়াছি, পথ্যাবক্ত্রের বক্ত্রে আমিই শোভা পাইতেছি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িতের ক্রোড়ে আমিই ক্রীড়া করিতেছি। আমারই করুণায় মন্দাক্রান্তা শোক'ভারাদলসগমনা'।

শতক, শতশ্লোকী, কোষকাব্য, কথা, আখ্যায়িকা, প্রহেলিকা, নাটক ত্রোটক রূপক প্রকরণ, সব আমারই প্রকারভেদ। ভূমিকা বিষ্কম্ভক প্রবেশক প্রবর্ত্তক কথোদ্ঘাতে আমাকে পাইবে, অঙ্ক গর্ভাঙ্কে আমাকে পাইবে, 'আকাশে' 'জনান্তিকে' 'কর্ণে' 'নেপথ্যে মহান্ কলকলে' আমাকে পাইবে, আবার পটক্ষেপণেও আমাকে পাইবে। বিদূষক, পারিপার্শ্বিক, কঞ্চুকী, পরিব্রাজিকা, শকার, নায়ক নায়িকা, স্বকীয়া পরকীয়া, অভিসারিকা স্বাধীনভর্তৃকা কল-

হান্তরিতা, কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নব-যৌবনা—কেহই আমাছাড়া নহেন। সাত্ত্বিক ভাবে, কামজ দশকগণে, স্তোকবাক্যে, কৃতক-কোপে, কৃতককলহে, আমি লাগিয়াই আছি।

ভক্ষ্যসম্পৃক্ত ষড়্‌রসের মধ্যে মুখপ্রিয় মিষ্ট বা মধুরে না থাকিয়া কটুতিক্তকষায়ে থাকি, তাই সেই কসুর কাটাইবার জন্য আমি কাব্যসম্পৃক্ত নবরসের মধ্যে করুণরসে থাকিয়া তাহাকে মধুর করিয়াছি। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought—ইংরাজ কবির এই বাক্য আমার কথার পোষক। পক্ষান্তরে আমি ভয়ানকরসেও রহিয়াছি।

বাল্মীকি বা রত্নাকর আদিকবি আমারই মহিমায়। তাই ক্রৌঞ্চবধদর্শনে কবির বক্ত্র হইতে প্রথম শ্লোকের অভিব্যক্তি, শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ। বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাস নিজ নামের আদ্যক্ষরে আমার মান রাখিয়াছেন, আর আমিও তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছি। কথায় বলে, যাকে রাখ সেই রাখে। আমারই যোটকতায় নীলকণ্ঠসম্ভব জাতুকর্ণী-পুত্র শ্রীকণ্ঠকবি করুণরসে কৃতী। ধাবক আমারই কল্যাণে কাব্যবিক্রয়ে কাঞ্চনলাভ করিয়াছিলেন। শূদ্রক মৃচ্ছকটিককার আমারই কৌশলে। কবিকর্ণপূর আমার কৃপায় ভরপূর। কৃষ্ণকর্ণামৃত, চমৎকার-চন্দ্রিকা, চৈতন্যচন্দ্রিকা আমারই বর্ত্তৃত্বে বৈষ্ণবের কর্ণে অমৃতক্ষরণ করে।

রামায়ণের কাণ্ডই ত আমাকে লইয়া—লঙ্কাকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আমার কিচ্‌কিচি শুনিতে পাও না কি? ত্রিশঙ্কু, ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ, জনক, কুশধ্বজ, কেকয়, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নৃপগণে, তাড়কা নিকষা কালনেমি কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীতে, কপি-কটকে, গুহকে, বিশল্যকরণীতে, জম্ভকে, অভিষেকে, দণ্ডকারণ্যে, কিষ্কিন্ধ্যায়, লঙ্কায়, অশোকবনে, কোথায় আমি নাই? বিশেষতঃ, কুব্জার কুমন্ত্রণায়, কেকয়ীর ক্রূরতায়, কৌশল্যার ক্রন্দনে, জানকীর অশোকবনে বাসক্লেশে ও অলীককলঙ্ক-কথায়, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে, কুশীলবের রামকথাকীর্ত্তনে, আমার কৃতিত্ব। আমারই জন্য লক্ষ্মণ সৌভ্রাত্রের আদর্শ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন শৌর্য্যবীর্য্যের আধার (কুম্ভকর্ণও কম কি?)

মহাভারত-কার কৃষ্ণদ্বৈপায়নে আমি, টীকাকার নীলকণ্ঠেও আমি। কুরুক্ষেত্রে, কপিধ্বজরথে, অক্ষৌহিণী সেনামধ্যে আমি বিরাজ করিতেছি। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার কথায়, তক্ষক-পরীক্ষিতকথায়, কৌরবের ক্রূরতায়, শকুনির কপট অক্ষক্রীড়ায়, বৃকোদর-কর্ত্তৃক রক্তপানে, শ্রীকৃষ্ণের রথচক্রধারণে, কর্ণের কবচকুণ্ডলদানে, ও অতিথিসৎকারার্থ বৃষকেতু-বধে আমি ('করাতে কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর')। কুন্তী, কর্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৌরব, কীচক, বকরাক্ষস, ঘটোৎকচ সকলেই আমার অধিকারভুক্ত। আবার আমার সন্তোষের জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণা, যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীমসেন বৃকোদর, অর্জ্জুন কিরীটী।

কালিদাসকৃত শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র আমারই প্রভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য। আমার অভাবে রঘুবংশ 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং'

বলিয়া ধিক্কৃত। পক্ষান্তরে, আমি মেঘদূতে নাই বলিবার যো নাই, কবি 'কশ্চিৎকান্তা' বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়া আমারই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; 'যক্ষশ্চক্রে জনক-তনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু' ইত্যাদিও আমারই চক্রান্তে; পরন্তু অলকা হইতে কুবের-কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত কুবেরকিঙ্কর যক্ষের বিরহ-কাহিনীতে আমি বহুস্থলে ঝঙ্কৃত—'কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু' প্রভৃতি বাক্যই তাহার সাক্ষ্য। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ' কালিদাস-সম্পর্কে এই কিংবদন্তীতেও আমি প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত। 'একোঽহভূৎ নলিনাৎ' প্রভৃতি কর্ণাটরাজপ্রিয়ার কাণ্ডেও আমি প্রকট।

কালিদাসের খণ্ডকাব্যের অনুকরণ পদাঙ্কদূতে আমার পদাঙ্ক দেখিতে পাও না কি? আমি কিরাতার্জ্জুনীয়ে আছি, শিশু-পালবধে না থাকিলেও কোলাচল-মল্লিনাথ-সূরির সর্ব্বঙ্কষা টীকায় আছি। নাটকের মধ্যে আমি বিশেষভাবে মহানাটক মৃচ্ছকটিক চণ্ডকৌশিক মুদ্রারাক্ষস অবিমারক প্রিয়দর্শিকার শেষ রক্ষা করিয়াছি। ইহা ছাড়া কামন্দকী কপালকুণ্ডলা মকরন্দ মদয়ন্তিকা মালবিকা বকুলাবলিকা নিপুণিকা কুরঙ্গী চাণক্য রাক্ষস প্রভৃতি বহু নাটকীয় পাত্রপাত্রী আমার বশ্যতা স্বীকার করেন।

গদ্যকাব্যে কাদম্বরী আমার প্রধান কীর্ত্তি। শুধু নায়িকা কাদম্বরী কেন, শূদ্রক শুকনাস কপিঞ্জল ইহার সাক্ষী। আর চণ্ডাল-দারিকা ও তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর কথা তুলিব কি? দশকুমারচরিতে, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় আমি বিরাজ করিতেছি। কথাসরিৎসাগরে, বৃহৎকথায়, কামন্দকীয় নীতিসারে, কৌটিল্য সূত্রে, চাণক্যশ্লোকে, আমার সাক্ষাৎ পাইবে। পঞ্চতন্ত্রকে কাকোলুকীয়ে, কাককূর্ম্মকথায়, মূষিককপোতকথায়, করটক-দমনক-কথায়, কল্যাণকটকে, শক্তুশরাবে, করালকেসর কর্পূরপট কাষ্ঠকুট বীণাকর্ণ প্রভৃতি রকমারি নামে, 'কথমেতৎ' ও 'কস্মিংশ্চিৎ' বলিয়া কথারম্ভে আমাকে পাইবে।

কাঁকড়া অক্ষর ও বিভক্তিবাহুল্যের জন্য যদি কটমট সংস্কৃত ভাষা দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠ, তাহা হইলে না হয় কোমলপ্রকৃতি বাঙ্গলা ভাষার কথাই কহিতেছি।

প্রাকৃত ভাষার বিকার বাঙ্গলা ভাষার আধুনিক ব্যাকরণকার পণ্ডিত নকুলেশ্বর আমার অনুগৃহীত। প্রশ্নসূচক বাক্যে কি, কেন, কোথায়, কৈ, অনুজ্ঞায় করুক, বলুক, হউক, যাউক, সম্বন্ধ পদে আজকার, কালকার, সত্যিকার, বিদ্যাসাগরী ভাষায় করিবেক, যাইবেক, দেখিবেক, রাঢ়ের গ্রাম্য ভাষায় যেতেক্ নারি শুতেক্ নারি, এ সকলই আমার রকম রকম কারসাজি। কর্ম্মের পিছনে 'কে' লাগিয়া আছে, সে যে আমিই তাহা বুঝ না কি? 'যতেক', 'এতেক', 'কতক', 'কয়েক' স্থলে আমিই উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছি। আমারই জোরে 'জলকে যেতে আঁচলে ধরে কালা।'

আবার বাঙ্গলা ভাষাকে 'সাধু' সাজাইতে হইলেও আমার ডাক পড়ে। কৃ ধাতুর যোগে যৌগিকক্রিয়ানির্ম্মাণে আমি করিৎকর্ম্মা। আমার যোগসাযোগে রন্ধন করা, ভক্ষণ করা, শয়ন করা, উপবেশন করা, ভিন্ন সাধুভাষার একদণ্ড চলে না। আমারই

দাপটে 'সাহিত্যিক' 'ঔপন্যাসিক' 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি জীবের উদ্ভব। আর কিছুকাল আসকারা পাইলে 'কাব্যিক,' 'গাল্পিক' 'গাণ্ডিক' 'পাণ্ডিক' বানাইয়া ছাড়িব!

বাঙ্গলা সাহিত্যে 'ক' 'খ' জানিলেই গ্রন্থকার হয়—(কবি ও পাঁচালীওয়ালারা আবার অনেকে আরও এক কাঠি সরেস ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা কেহ কেহ একেবারে নিরক্ষর ছিলেন।) সুতরাং এক্ষেত্রে আমার কীর্ত্তি জল-জল করিতেছে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 'ত্র্যহিক', দৈনিক, সব রকম কাগজেই আমি। প্রভাকর-ভাস্কর-নব বিভাকরে আমারই কর শোভা পাইত, এক্ষণে নায়ক, দর্শক, সাধক, বিক্রমপুর, কুশদহ, দৈনিকচন্দ্রিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় কাগজে আমি জোনাকির আলোক বিকীর্ণ করিতেছি। কায়স্থকৌস্তভ আমারই কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল। 'কায়স্থপত্রিকা'র দুই দিক্ রক্ষা করিবার দরকারে আমি আকার গ্রহণ করিয়াছি। খবরের কাগজের প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে আমি, লেখক-সমালোচকে আমি, আর্টিকেলে আমি, 'সডাক' বার্ষিক মূল্যে আমি। পুস্তক বা কেতাবে আমি, সংস্করণ-সঙ্কলনে আমি, প্রকাশকে আমি, কম্পোজিটরে আমি, ভূমিকা অবতরণিকা-গৌরচন্দ্রিকায় আমি, ক্রোড়-পত্রে আমি, ক্রমশঃ প্রকাশ্যে আমি, করকমলে উপহারে আমি, ক্যাটালগে আমি, সার্কুলেটিং লাইব্রেরীতে আমি, পাঠক-পাঠিকায় আমি। মৌলিকে আমি, অনুকরণে বা অবিকল নকলে আমি, কোটেশন-কণ্টকিত কলমবাজীতে আমি, ভাবুক কবিতে আমি, কপোল-কল্পিত কথায় আমি, কষ্টকল্পনায় আমি। মৌখিক বক্তৃতায়, ডাকের কথায়, রূপকথায়, ছড়াকাটায়, কবির লড়াইএ, কলেজীয় কবিতাযুদ্ধে, আধুনিক কার্টুনে আমি। রূপকথায় কঙ্কাবতী, কেশবতী রাজকন্যা, পক্ষিরাজ ঘোটক, রাক্ষস, কোটালপুত্র, সকলেই আমার সম্পর্ক রাখেন।

প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস-কাশীদাস, ক্ষেমানন্দ কেতকীদাস, কবিকঙ্কণ-কবিরঞ্জন-কবিচন্দ্র-কবিবল্লভ, রায়গুণাকর, সাধক কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, আমার উপাসক। হাকন্দপুরাণে, কালকেতুতে, কর্পূরে, ধূমকেতুতে, কালীদহে কমলে কামিনীদর্শনে আমাকেই প্রত্যক্ষ কর। আবার অক্রূরসংবাদে, কড়চায়, ভক্তমালে আমার সাক্ষাৎ পাও।

আধুনিক কালের কলেজে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমে আমি রহিয়াছি। আমি মধুসূদনে নাই, তাই মাইকেল নামকরণ করাইলাম, প্যারীচাঁদকে টেকচাঁদ ঠাকুর নাম ভাঁড়াইলাম, ইন্দ্রনাথকে 'পাঁচু-ঠাকুর' বানাইলাম, রবীন্দ্রনাথের ক-অক্ষরের অভাব পূরণের জন্য তাঁহাকে ডক্টরও কবি-সম্রাট্ উপাধি দেওয়াইলাম। কান্তকবি (রজনীকান্ত সেন) ও রজনীকান্ত গুপ্ত আমারই কল্যাণে লোকপ্রিয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ উভয় কায়স্থই আমার অনুগত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আমায় ডবল ডোজে চড়াইয়াছেন, তাই তাঁহার কলম হইতে 'মিঠেকড়া' জমিয়াছে। অক্ষয় দত্ত, অক্ষয় সরকার (কদমতলার), অক্ষয় মৈত্রেয়, অক্ষয় বড়াল, চারি অক্ষয়েই আমি অক্ষয় হইয়া আছি।

জয়দেবের বাসস্থলী কেন্দুবিল্বে আমি, চণ্ডীদাসের সমাধিস্থান কীর্ণাহারে আমি, রায়গুণাকরের কর্ম্মক্ষেত্র কৃষ্ণনগরে আমি, মধুসূদনের জন্মস্থান কপোতাক্ষকূলে আমি, বিদ্যাসাগরের অবকাশযাপন-স্থান কর্ম্মাটাড়ে আমি, বঙ্কিম-সঞ্জীবের বাসগ্রাম কাঁঠালপাড়ায় আমি, বোসজার বিশ্বকোষ-কুটীর কাঁটাপুকুরেও আমি।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনক, রাজকৃষ্ণের কাব্য-কলাপ, কালীকৃষ্ণের কামিনীকুমার, অক্ষয় বড়ালের কনকাঞ্জলি, ক্ষীরোদপ্রসাদের কবি-কাননিকা, মানকুমারীর কাব্যকুসুমাঞ্জলি, স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্নমুকুল' 'কাহাকে' এই কয়েকস্থলে লেখক ও পুস্তক উভয়ত্রই আমি। করুণানিধান, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, তিনজন নবীন কবি আমারই প্রসাদে কবিকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত আমারই গুণে উৎকৃষ্ট ইতিহাস। আমারই অসকৃৎ সংযোগে তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' বাণভট্টের মূল অপেক্ষাও সুললিত। বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগরও 'কথামালা' লিখিয়া আমার আবদার রক্ষা করিয়াছেন। পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধচন্দ্রিকা, কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত, পত্রকৌমুদী, কুপিতকৌশিক, কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, কলিনাটক প্রভৃতি সেকেলে পুস্তকেও আমার আটক নাই। কাঠের অক্ষরে কেরি-উইলকিন্সের কীর্ত্তিতে আমিই প্রকাশমান।

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের, লোকরহস্যের, কমলাকান্তের দপ্তরের, কৃষ্ণকান্তের উইলের ও কপালকুণ্ডলার উৎকৃষ্টতার নিদান আমিই। কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি, কুলদম, নবকুমার, রুক্মিণীকুমার, ভবানী পাঠক, প্রভৃতির চরিত্রমাধুর্য্য আমারই জন্য। সেকাল ও একাল, কৃষ্ণকুমারী, কর্ম্মদেবী, কমলে কামিনী, কবিতাবলী, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম, মাধবীকঙ্কণ, কালাচাঁদগীতা, অবকাশরঞ্জিনী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, কঙ্কাবতী, কণ্ঠমালা, কামিনী ও কাঞ্চন, এবং রবীন্দ্রনাথের কণিকা, ক্ষণিকা, কড়ি ও কোমল, কথা ও কাহিনী, নৌকাডুবি, ডাকঘর, সবই আমার কীর্ত্তিকথা।

আমারই গুণে কাব্যচিন্তা ও কাব্যসুন্দরী উৎকৃষ্ট সমালোচনাগ্রন্থ। তর্কালঙ্কারের 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' ইত্যাদি প্রকৃতিবর্ণনেও আমি, আবার মাইকেলের 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে' ইত্যাদি করুণরসেও আমি। আজকালকার কীর্ত্তিমান্ বক্তা ও লেখক পাঁচকড়ি বাবু কয় কড়া কড়ির জন্য আমারই নিকট ঋণী। আর আমার স্বীকারোক্তির বকলমে স্বাক্ষর-কারী এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' লিখিয়া শস্তায় কিস্তি পাইয়া বৈয়াকরণ-কেশরী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেও আমার ঘটকালীতে—ইতি কিমু বক্তব্যম্?*

*হুঁঃ, আমাকে টিটকারী করা! 'ক'এর সকল কথাই ত কাণ করিয়া শুনিলাম। কিন্তু কূলের কথা প্রকাশ করিয়া কহিব কি? তবে শ্রবণ করুন। 'ক'এর মতিস্থির নাই, সন্ধিকালে কখন 'গ' কখন 'ঙ' হইয়া

যান, স্বয়ং বাগ্‌দেবী ও সমগ্র বাঙ্ময় তাহার সাক্ষী। বিকৃত উচ্চারণেও 'ক' 'গ' হইয়া পড়েন, কাগে বগে তাহা টের পায়, শাগেও তাহা ঢাকা পড়ে না, আর 'বিগারে'র ক্রিয়ায় ত একেবারে বিগড়াইয়া বসেন। তাহার পর 'য'এ যুক্ত হইলে বাঙ্গালা উচ্চারণে কনিষ্ঠ কিন্তু মহাপ্রাণ 'খ'এর দিকে হেলেন ও তাহার দখলী সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন। যাক্, সে সকল স্থলে নিজের বর্গ ছাড়েন না, ইহাও মন্দের ভাল। কিন্তু অভ্যস্ত ধাতুতে যে 'ক'কার 'চ'কার হইয়া পড়েন (লিটের 'চকার' ইহার প্রমাণ), তখন যে জাতিকুল পর্য্যন্ত থাকে না। আরও দেখুন, প্রাকৃত ভাষায় বিকার ঘটিলে 'ক'ই আগে কারু হয়েন (নকুল=নেউল, দেবকুল=দেউল, ব্যাকুল=বাউল, শূকর=শূওর, গুবাক=গুয়া, কেতকী=কেয়া, শূক=শূয়া, বণিক্=বেণে, আলোক=আলো।) এই ত ক্ষমতা! ওদিকে আবার পরের ঘরেয় দিকেও লক্ষ্য আছে; অসহায় (=হসন্ত) 'চ' 'জ' বা 'শ' পাইলে নিজে তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লয়েন—জলমুক্, বণিক্, দিক্, ইহার সাক্ষ্য দিক। নিজের এত গলদ, অথচ অহঙ্কার—অথবা ভাষাকথায় দেমাক, ঠেকার, ঠসক দেখে কে? আমাকে ঘাঁটাইলেই কুলের কথা প্রকাশ করিয়া দিব। ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকা-কারের টীকা।

বর্ষার আগমনী

বৃষ্টি-মুকুল মঞ্জীর পায়
কূটজ কাঞ্চী পরি,
কণ্ঠে জড়ায়ে সৌরভময়
মালতীর সাতনরী,
কদমের দুল কর্ণে দোলায়ে
যূথিকা-বলয় হাতে,
এস সুন্দরী মোহিনী বরষা
আজিকে আষাঢ়-প্রাতে।

বলাকার শ্রেণী সরণি দেখায়ে
উড়িয়া চলিবে আগে,
ইন্দ্রধনুরা সাজাবে তোরণ
সম্মুখে অনুরাগে,
কামিনী-বকুল ঝরিয়া ভূতলে
কোমল করিবে পথ,
দধিয়াল-গীতি শ্রান্তি হরিবে
বাতাস বহিবে রথ।

ধরণী সে হের বরিতে তোমায়
কত উল্লাস মনে!
ইন্দ্র-গোপের চুমকিতে রাঙা
পাতিয়াছে তৃণাসনে,
ভূমি-চম্পক ফুটায়ে যতনে
উপাধানখানি গড়ি
সেগুনে সাজায় পুষ্প-চামরে
ব্যজন করিতে, মরি!

স্বাগত সরসা বরষা রূপসী
নিশি রচি নভ-গায়
মেঘ-মৃদঙ্গে করি করাঘাত
বিদ্যুৎ-পতাকায়!
সার্থক হোক সকল বিশ্ব
আগমনে তব রাণী,
প্রীতির বন্যা উছলি পরাণে
ধুয়ে দিক সব গ্লানি।

শ্রীনলিনীনাথ দে।



চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে'।—"ফাল্গুনী"—রবীন্দ্রনাথ।
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

উপনিষদে আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের একটী প্রমাণ

বেদ, উপনিষদ, আর্য্যদিগের সর্ব্বাদি-গ্রন্থ। ই সমস্ত গ্রন্থে আর্য্যদিগের সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় [illegible] যে বিশেষ প্রাচীন ও প্রামাণিক [illegible] বিবেচিত হইবে তাহা বোধ হয় সকলে [illegible]কার করিবেন।

'উত্তরকুরু' [illegible] 'কুরু' আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে এক [illegible]ায়ভুক্ত দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে কুরুদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষের একটী উপাখ্যান পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দ[illegible]ত করিয়া দিতেছি :—

"মটচীহতে[illegible]ক্যাসহ জায়য়োষস্তির্হ ক্রায়ণ [illegible]গ্রামে প্রস্থ[illegible]। ১

"সহেভ্যঃ [illegible]দণ্ডং বিভিক্ষে তং হোবাচ [illegible]তোঽন্যে [illegible] ম ইম উপনিহিতা ইতি।২

এতেষা[illegible]তিহোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ [illegible]নুপানমিত্যু[illegible]মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ।৩

নস্বিদেতেঽপ্য[illegible] ইতিনবা অজীবিষ্যমিমান [illegible]দন্নিতি হোবা[illegible] উদকপানমীতি।৪

ছান্দো[illegible]দ্ ১ম অধ্যায় ১০ম খণ্ডঃ।

"পাষাণবৃষ্টির [illegible] শস্যসম্পত্তির নাশে কুরুদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত [illegible], চক্রতনয় উষস্তি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক [illegible] যৌবনা নিজ ভার্য্যা আটিকীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে অন্ন-লাভ হেতু মরণাপন্ন অবস্থায় হস্তিপকদিগের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন।১

উষস্তি যদৃচ্ছাক্রমে কুৎসিত মাষকলায় ভোজনকারী এক জন হস্তিপকের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত কলায় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। উষস্তিকে কলায় যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া ঐ হস্তিপক বলিয়াছিলেন, আমি যাহা ভক্ষণ করিতেছি, এই উচ্ছিষ্ট কলায় ভিন্ন আর আমার কলায় নাই, আমার যাহা কিছু ছিল, তাহা এই পাত্রেই রাখা হইয়াছিল।২

হস্তিপকের বাক্য শ্রবণ করিয়া উষস্তি বলিয়াছিলেন, উহা হইতে আমাকে কিছু দাও। হস্তিপক তাঁহাকে উহারই কিয়দংশ প্রদান করিয়াছিল। পরে যখন হস্তিপক উষস্তিকে পানীয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল, তখন উষস্তি বলিয়াছিলেন, ঐ পানীয়া গ্রহণ করিলে আমার উচ্ছিষ্টভোজন করা হইবে।৩

তচ্ছ্রবণে হস্তিপক বলিয়াছিল, আপনি এই যে কলায়গুলি গ্রহণ করিলেন, এইগুলি উচ্ছিষ্ট নয়? উষস্তি উত্তর করিয়াছিলেন, এই কলায়গুলি ভক্ষণ না করিলে আমার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই আমি এইগুলি ভক্ষণ করিয়াছি।

এখন পানীয় আমার ইচ্ছানুসারে অন্যত্রও পাইতে পারি অতএব উচ্ছিষ্ট জল পান করিব না।"৪

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামির অনুবাদ।

এখানে পাষাণবৃষ্টি শিলাপাত বলিয়াই বোধ হয়। উষস্তি ও হস্তিপকের মধ্যে কথোপকথন হইতে জাতি ও স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার যে তৎসময়ে বিশেষভাবেই বর্ত্তমান ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতদুভয়ের মধ্যে উষস্তিকেই উচ্চজাতীয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। উষস্তি অতঃপর কোন রাজার যজ্ঞে ঋত্বিক কার্য্যে বৃত হইয়া ধন প্রাপ্ত হন, উপাখ্যানের উপসংহারে এরূপ উল্লেখ আছে। ইহা হইতে উষস্তি কেবল উচ্চজাতি ছিলেন বলিয়াই বুঝা যায় না পরন্তু তিনি যে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন তাহাই বুঝা যায়। কারণ ঋত্বিক্ কার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অধিকার থাকার কোন প্রমাণ শাস্ত্রে আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অপর জাতির স্পৃষ্টান্ন ভোজন কেবল আপদ্ধর্ম্ম রূপেই শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহাতেই

উষস্তি কেবল প্রাণরক্ষার্থই উচ্ছিষ্ট মাষকলাই খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাণরক্ষা হইলেই তিনি আর উচ্ছিষ্ট জলপানে সম্মত হইলেন না। সুতরাং এখানে আমরা জাতিধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাবের পরিচয়ই প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা হইতে উত্তরকুরুবাসের সময়ই যে আর্য্যদিগের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই। পারসীকদিগের মধ্যে যে ভারতীয় আর্য্যদিগের অনুরূপ উপনয়নপ্রথা ও জাতিবিভাগ দৃষ্টহয় তাহাতেও সপ্রমাণ হয় যে আর্য্যদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কুরুদেশের নাম যেমন আমরা প্রাপ্ত হই, তেমনই কেকয় দেশ (৫।১১। ৪-৫) ও গান্ধার দেশের নামও (৬.১৪।১-২) প্রাপ্ত হই। শেষোক্ত দেশ দুইটী ভারত বহির্ভূত দেশ—ভারতান্তর্ভূত কোন দেশের নামই ছান্দোগ্যে উল্লিখিত দেখা যায় না। সুতরাং কুরুদেশ যে উত্তরকুরু দেশকেই বুঝাইতেছে তাহা আমরা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কেবল যে কুরুদেশের নামই পাওয়া যায় তাহা নহে; পরন্তু শাস্ত্রাদিতে আর্য্যদিগের আদি বাসভূমিতে ছয় মাস দিবা ও ছয় মাস রাত্রি থাকার যেরূপ আভাস রহিয়াছে,তাহার বর্ণনাও পাওয়া যায়; যথা ঃ—

"অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্ত মেতৈকল এব মধ্যস্থাতা। তদেষ শ্লোকঃ ॥১

নবৈতত্র নানিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন দেবাস্তে-নাহং সত্যেন মাবিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ॥২

নহবা অস্মাউদেতি ননিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মি ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥"৩

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ তৃতীয় অধ্যায় ১১শ খণ্ড।

"অনন্তর ঐ স্থান হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হ[illegible] উদয়ের পর আর উদয়াস্ত ভোগ করিতে হয় না। ঐ স্থানে সূর্য্য একভাবে মধ্যেই অবস্থান করি[illegible] থাকেন। তদ্বিষয়ে বক্ষ্যমান শ্লোক উক্ত হইয়াছে॥

ঐ শ্লোক, যথা—ঐস্থানে ক্রমিক উদয়াস্ত নাই। ঐস্থানে সূর্য্য কখন অস্তগমন করেন না; অর্থা[illegible] ঐস্থানে অস্তগমনের পর যে উদয় তাহাও হয় না। দেবতারা শ্রবণ করুন, আমি সত্য বাক্য বলিতেছি। ঐ সত্যের প্রসাদে আমি ব্রহ্মত[illegible] লাভ করিব। হইব না।২

যিনি এই ব্রহ্মরহস্য অবগত [illegible] তাঁহার পক্ষ একেবারেই দিবা হয়—সূর্য্য উদয় [illegible] না বা অস্তগমন করেন না॥"৩

উপরিবর্ণিত স্থান-মাহা[illegible] শ্লোকাবলী প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আম[illegible] বুঝিতে পারি যে ঐস্থান পবিত্র স্মৃতি[illegible]ত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং আর্য্যগণ এক[illegible] স্থানেই তখন অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে [illegible]খানে প্রতিনিয়ত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত [illegible]। তাহাতে উত্তরকুরুর ছয়মাস একক্র[illegible] দিবা অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইয়াছি[illegible] এই জন্য ইহার সম্বন্ধে প্রত্যয় জন্মাই[illegible]র জন্য এই শপথ-সহকৃত উক্তির প্রয়োজ[illegible] হইয়াছে।

উপনিষদ্-বর্ণিত চির[illegible]লোক-বিভাসিত স্থান যে চিরভাস্বর ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তুলিত হইয়াছে তাহাতেই আমর[illegible] আমাদের পক্ষ দিব্যধাম ব্রহ্মলোকের আদর্শ যে কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হই। মহর্ষি মনু তদীয় সংহিতায় প্রথম আর্য্যাধিবাসকে যে ব্রহ্মাবর্ত্ত আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা বেদে ব্রহ্মার অধিষ্ঠানরূপে কল্পিত দেখিতে পাই

তেমনই দেবস্থানরূপেও কল্পিত দেখিতে পাই যথা—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥"

ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যদিগের আদিস্থান, উত্তরকুরুও আদি অধিস্থান। উত্তরকুরুর ছয়মাস ক্রমাগত দিবা ও ব্রহ্মাবর্ত্তস্বরূপ ব্রহ্মধামের চিরদিবালোকের সাদৃশ্য হইতে ব্রহ্মাবর্ত্তকে আমরা উত্তর কুরুর সহিত অভিন্ন মনে করিবার যথেষ্ট কারণই প্রাপ্ত হইতেছি।

প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারি যে উপনিষদের উল্লিখিত দিব্যধামই কালক্রমে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মাবর্ত্ত, উত্তরকুরু প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বৈদিক সভ্যতা

যজ্ঞ ঃ—দেবতার তৃপ্তি-সাধনের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করিবার বিধি হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মে প্রচলিত দেখা যায়। বৈদিককাল হইতেই ভারতের ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্য-সম্পাদনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; 'হোতা' 'পোতা' 'অধ্বর্য্যু' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ঋত্বিকগণ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেন। অগ্নি না হইলে কোন যজ্ঞই সম্পন্ন হইত না; এইজন্য ঋগ্বেদের অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সায়ণ বলেন,—"যথা রাজ্ঞ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি, তথা অগ্নিরপি যজ্ঞস্য অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি যদ্বা সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগে আহবণীয় রূপেণ অবস্থিতং"। পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থিতা সরস্বতী নদীর তীরেই বড় বড় যজ্ঞ সম্পাদিত হইত, তাহার তীরভূমি প্রতিনিয়ত বেদমন্ত্রে মুখরিত থাকিত; এইজন্যই পরবর্ত্তীকালে সরস্বতীকে মন্ত্রের দেবী বা বাগ্দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকিবে। (Muir)

জাতিভেদ ঃ—বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না। ১।৭।৯ ঋকে পঞ্চক্ষিতি শব্দ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। সায়ণ পঞ্চক্ষিতি অর্থে চারিজাতি এবং নিষাদ—এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী যাহা বলেন, তাহা এই,—প্রাচীন কালে ইদানীন্তন জাতি-বিভাগের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। * * ক্ষিতি শব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে? ক্ষিতি শব্দের অর্থ স্থান। আমার বোধ হয় যে পাঞ্চাল প্রদেশের পঞ্চনদান্তর্গত পঞ্চভূভাগ, যেখানে আর্য্যেরা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন, এই মন্ত্রে তাহারই উল্লেখ আছে। এই পঞ্চনদের নামও অন্যত্র দৃষ্ট হয়। মোক্ষ মূলরও সায়ণের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, "If, then, with the document

before us, we ask the question, does caste, as we find in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided no"—Chips from a German workshop. Vol II. ঋগ্বেদের মধ্যে ঋত্বিক শ্রমজীবী ও রাজপুরুষগণের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু এই তিনশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ-কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল না। বেবার এই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "There were no castes as yet; the people is still one united whole and bears but one name that of the visas.—Indian Literature (Translated) P.38. Muir সাহেব কর্ত্তৃক রচিত Sanskrit Texts নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে কিন্তু সেরূপ সূক্ষ্ম বিচারের স্থান আমাদের নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান কালে আমরা জাতিভেদ বলিতে যাহা বুঝি ঋগ্বেদের কোথাও তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায় না।

১।১০।১ ঋকে আবার ব্রাহ্মণ শব্দ লইয়া এই রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সায়ণ 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী ইহার অর্থ করিয়াছেন ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা; উইলসন্ সাহেব সায়ণের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, The Brahma of a sacrifice does not necessarily involve the notion of a Brahman, আমাদিগেরও সেই কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তুতি; ব্রাহ্মণ একজন স্তুতিবাদক পুরোহিত। সুতরাং 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে স্তুতিবাদকগণ বা পুরোহিতগণ। ঋগ্বেদে সপ্তজন হোতার (১।১৫—৩।১৬ জন) কথা পাওয়া যায়,—সপ্ত হোতা প্রাচী বষট্ কুর্ব্বন্তি—সায়ণ। তাহাদিগের মধ্যে যজমান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, হোতা মন্ত্র পাঠ করিতেন, উদ্গাতা মন্ত্র গান করিতেন, পোতা হব্য প্রস্তুত করিতেন, নেষ্টা অগ্নিতে হব্য নিক্ষেপ করিতেন, ব্রহ্মা সমুদায় তত্ত্বাবধান করিতেন, ও রক্ষ দ্বার রক্ষা করিতেন। সায়ণও অনেক স্থলে ব্রহ্মা বলিতে এই স্তুতিবাদক হোতা অর্থ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে ব্রহ্মা দেখিয়া মনে হয় যে তিনি ঘোর করিয়াই বেদের মধ্যে জাতিভেদ দেখাইতে চান।

বেশভূষা ঃ—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, The first step in the march from barbarism to civilization is indicated by the dress of a nation.—Indo-Aryan Vol I. P 166. এ কথা সত্য। বেশভূষার দ্বারা সভ্যতার অনেকটা পরিমাপ করা যায়। বৈদিক যুগে নানা প্রকারের বেশভূষা উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

২।৩।৬ ঋক পাঠ করিয়া অনুমান হয় যে তৎকালে আর্য্যগণ টানা ও পোড়েন দিয়া বস্ত্র বয়ন করিবার

প্রণালী অবগত ছিলেন। 'বয্যেব রণিতে' শব্দের ব্যাখ্যায় সায়ণ বলেন, 'বান কুশলে ইব ×× পরস্পরৌ গচ্ছন্তৌ'। ইহা ব্যতীত ২।৩৮।৪ ঋকেও বস্ত্রব্যয়-কারিণী রমণীদিগের উল্লেখ দেখা যায়। উইলসন্ সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক যুগে আর্য্যগণ বস্ত্র-বয়ন ও তাহার ব্যবহার অবগত ছিলেন।

ইহা ব্যতীত বৈদিককালেও আর্য্য রমণীগণ অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। ৯।৪৬।২ ঋকে বিবাহ-কালে পিতৃকর্ত্তৃক সালঙ্কারা কন্যা-সম্প্রদানের কথা দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত বেদের দেবতাগণের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের অনেকেরই দেহ নানা অলঙ্কারে ভূষিত এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রুদ্রের দেহ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। সেইরূপ মরুৎ ও অশ্বিনীগণেরও। এমন কি মনুষ্যগণও যে তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতাগণের অনুকরণে অলঙ্কার ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন, এ কথাও বেদে আছে। এতদ্ব্যতীত যজ্ঞাবসানে ঋত্বিকগণকে স্বর্ণের তাল বা স্বর্ণালঙ্কার-দানের কথাও ঋগ্বেদের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন যুগের বহু অলঙ্কারই এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। আর নাম করিলেও তাহাদিগকে চেনা যাইবে না। উদাহরণস্বরূপ আদি ও রুক্ম নামক অলঙ্কারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। (৭।৫৬।১)

আহার ঃ—বেদের আর্য্যগণ মাংসভোজী ছিলেন। বেদের কথা ছাড়িয়া দিয়া পরবর্ত্তী রামায়ণী যুগের আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই মাংস-ভক্ষণে তাঁহাদিগের আপত্তি ছিল না। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের ৩১ সূক্তে ১৫ ঋকে আছে,—

"হে অগ্নি! যে যজমান ঋত্বিকদিগের দক্ষিণা দান করিয়াছে, তুমি সেই পুরুষকে স্যূত বর্ম্মের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর। যে যজমান সুস্বাদু অন্নের দ্বারা অতিথি দিগকে সুখী করিয়া, স্বগৃহে পশুবলিযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সেই স্বর্গের উপমাস্থল হয়।"—(৺রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ) মূলে "জীব যাজং যজতে" আছে। সায়ণ ইহার অর্থে পশুবলিসহিত যজ্ঞ বা পশু-নিষ্পাদ্য যজ্ঞ এই উভয় অর্থ করিয়াছেন। উইলসন্ সাহেব বলেন, আর্য্যগণ অতিথির প্রীতি-সাধনের জন্য তাঁহার উপস্থিতিতে গাভী হনন বা রন্ধন করিয়া তাঁহাকে আহারের জন্য আহ্বান করিতেন। Rosen ও Langlois এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। কোলব্রুক এই প্রসঙ্গে বলেন, It seems to have been anciently the custom to slay a cow on this occassion (The reception of a guest) and a guest was therefore called Goghna or cow-killer—Religious Ceremonies of the Hindus. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও এই মতের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, The Sutras, both Kalpa and Grihya and the Vedas themselves display even less reserve and reticense. They distinctly affirm that bovine meat

was used as food and in details points out the different occasions when cattle should be slaughtered and eaten. Gobhila recommends beef for Sraddhas. (যথা ত্বষ্টা ঊর্দ্ধং অষ্টমাং গৌ) এ বিষয়ে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতীও এই মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, "তৎকালে গো-মাংস অভক্ষ্য ছিল না। অশ্বালায়ণ গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ প্রকরণে এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসেনীয় সংহিতায় পুরুষমেধ-প্রকরণে আর্য্যগণের বিবিধ মাংস ব্যবহারের কথা আছে। গোমেধ, অশ্বমেধ, অজমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে অতিথির সমাগম হইলে "মহোক্ষৎ বা মহাজং" অর্থাৎ বৃষ বা অজ বধ করিয়া অতিথি সৎকার হইত। উত্তরচরিতের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, জনক বৎসতরী ভোজন করিয়াছিলেন। এই কারণেই অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে। বেদে অশ্বমাংস ভোজনের কথাও উল্লিখিত দেখা যায়। (১।১৬২।৬)

বেদে রমণীজাতি ঃ—বেদের সময় রমণীজাতির অবস্থা আর্য্যসমাজে কিরূপ ছিল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারা যায় না। সত্য বটে, ঋগ্বেদের স্থল-বিশেষে রমণীগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইতে তাহাদিগের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না।

সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। তবে ঋগ্বেদের মন্ত্র বিদুষীগণের যে পরিচয় পাই তাহা হইতে মনে হয় যে রমণীগণ তৎকালে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহাদিগকে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তঃপুর-মধ্যে বন্দিনী করিয়া রাখিবার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী ৫।২৮ সূক্তের ঋষি; তিনি ৩য় ঋকে দাম্পত্য শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এইরূপ অনঙ্গের ভার্য্যা অঙ্গিরার কন্যা শাশ্বতী আর এক নারী ঋষি। তিনি ৮ম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের চতুস্ত্রিংশ ঋকের ঋষি। অপলা আর একজন ঋষি; তিনি ৮।৯১ সূক্ত রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ১।১৬৬।৪ ঋকে সস্ত্রীক যজ্ঞ সম্পাদনের কথা আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, তৎকালে রমণীগণকে নির্ব্বোধ ও বিলাসের সামগ্রীমাত্র বলিয়া কেহ মনে করিত না। সায়ণ বলেন, খেল নামে এক রাজা ছিলেন। বিশপলা তাঁহার স্ত্রী। তিনি স্বামীর সহিত যুদ্ধে গিয়াছিলেন, যুদ্ধে তাঁহার একটি চরণ ছিন্ন হয়।

বেদের সময়েও বোধ হয় পুরুষগণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিতেন। কক্ষীবান ঋষি অধ্যয়ন-সমাপনান্তে গৃহ-প্রত্যাগমন-কালে পথিপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। দৈবক্রমে স্বনয় নামে একজন রাজা সেই পথ দিয়া যাইবার কালে নিদ্রিত কক্ষীবানকে দেখিতে পান এবং তিনি

তাঁহার রূপে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার গৃহে লইয়া যান ও তাঁহার হস্তে আপনার দশ কন্যাকে সমর্পণ করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে একাধিক পত্নী-গ্রহণ অপ্রচলিত ছিল না।

বেদের সময় বিবাহের পূর্ব্বে কোন কোন কুমারীর পুত্র প্রসবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পুত্র কানীন পুত্র নামে অভিহিত হইত। ১।১১৬।২১ ঋকে পৃথুশ্রবা নামক একজন রাজার কথা আছে। সায়ণ বলেন, ইনি কানীন পুত্র। তৎকালে কানীন পুত্র সমাজে নিন্দনীয় হইতেন কি না, বেদ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায় না।

বেদে দাম্পত্য-জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় না যে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা সামান্য ছিল। ৮।৩১।৯ ঋকে লিখিত আছে যে, দেবতারাও যজ্ঞরত দম্পতীর স্তুতি কামনা করেন এবং দম্পতীর জীবন চির-সুখময়।

বেদের সময় ভদ্র ও সুগঠন কন্যা আপনার মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। Muir সাহেব ঋগ্বেদের ১০।২৭।১২ ঋক আলোচনা করিয়া বোধ হয় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া থাকিবেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "May we not infer from this passage that freedom of choice in the selection of their husbands was allowed, sometimes at least, to women in those times? Sanskrit Texts Vol V. P 458-59. আলোচ্য ঋক্‌টির অর্থ এই যে কোন কন্যা অর্থেই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু ভদ্রা আপনার মনোমত পতি গ্রহণ করেন। এই সূক্তে অন্ধ কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অপলা ত্বক-রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় ব্যাধিগ্রস্ত রমণীর পক্ষেও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

বৈদিক যুগে নগরাদি ঃ—বৈদিক যুগে আর্য্যগণ গ্রাম ও নগরের পার্থক্য বুঝিতেন। গ্রামনী, পুরপতি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয়। নগরে শত দ্বার ও স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহ থাকিত। দস্যু ও রাক্ষস-গণ নগরের আর্য্যগণকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিত। এই জন্য আত্মরক্ষাহেতু তাঁহারা সুরক্ষিত নগর নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতেন। ৭।৮ সূক্তে বশিষ্ঠ ঋষি অয়ো-নির্ম্মিত নগরের দ্বারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্তব করিয়াছেন। ৭।১৫।১৫ ঋকে আবার তিনি অয়োনির্ম্মিত ও শতগুণা পুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই অয়োনির্ম্মিত নগর কি? ইহার উত্তরে সায়ণ বলেন, এই শব্দের দ্বারা নিরাপদ নগর বুঝাইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ২।৪১।৫ ঋকে স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ এই সকল গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি অবগত ছিলেন।

বৈদিক-যুগে এইরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ এরূপ অট্টালিকার উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। একবার অসুরগণ কঠোর পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর একবার তাহারা শতদ্বার বস্ত্রগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অত্রি ঋষিকে ভিতরে পুরিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল।

বেদে জ্যোতিষ ঃ—পৃথিবীর সূর্য্য-পরিক্রমের দ্বারা যে বৎসর-গণনা করা হয়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করিলে, তাহা অপেক্ষা কয়েকদিন কম হয়। এই জন্য সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসর গণনা করিবার জন্য চান্দ্র বৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি পৃথক মাস ধরিতে হয়। ইহাকে মলমাস বলে। ১।২৫।৮ ঋক হইতে জানা যায় যে আর্য্যগণ এই উভয় গণনা-পদ্ধতিই অবগত ছিলেন। সেই ঋকটির অনুবাদ এই ঃ— "যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্বস্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন ও অপর যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয়, তাহাও জানেন।" (৺রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

আশ্চর্য্যের বিষয় ঋক্‌বেদের ঋষিগণ মাধ্যাকর্ষণ ও পৃথিবীর গতি-সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত ছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যের প্রকৃত উদয় বা অস্ত নাই। ইহা পৃথিবীর দৈনিক গতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত সূর্য্য যে পৃথিবীর ধারক তাহা ঋগ্বেদের অনেক ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। ১০ মণ্ডলের ১৪৯ সূক্তের একটি ঋকে আছে, সবিতা যন্ত্রই পৃথিবী মরম্নাদা কন্তনে সবিতা দ্যাম দৃং হৎ। ইহার অর্থ এই যে, সবিতা যন্ত্রসকল (সংযমন শক্তি) দ্বারা পৃথিবাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, রোধশূন্য হইয়া সবিতা দ্যুলোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহা মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান-সূচক সন্দেহ নাই। বেদে পৃথিবীর গতি শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ১৩১০ সালের ভারতীতে দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর গতি বৈদিক আর্য্যগণের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল; তাহার প্রমাণ যো পৃথিবীবাচক গো, গ্মা, জ্যা ক্ষ্মা, ক্ষা, ক্ষ্ম ক্ষোণি ক্ষিতি, অবনি, রিপ, গাতু ও নির্ঋতি শব্দের দ্বারা গতি বুঝাইয়া থাকে। গম ধাতু উত্তর ও প্রত্যয় করিলে গো পদ সিদ্ধ হয়। গো পৃথিবীর নাম কেন? তাহার উত্তরে যা বলেন, যেহেতু ইহা দূর-পথে গমন করে যে হেতু ইহাতে জীবগণ বিচরণ করে। গ্মা পদও গম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং গো ও গ্মা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই; জ্যা-পদ-জম্-ধাতু হইতে হইয়াছে। বেদে জম্ বা জমতির অর্থ গতি। সুতরাং জ্যা-শব্দের দ্বারাও পৃথিবীর গতি বুঝাইতেছে। এইরূপ ক্ষ্মা, ক্ষা, ক্ষমা ও ক্ষিতি এই পদ চারিটি গত্যর্থক ক্ষি ধাতু দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায়। এই সব আলোচনা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে পৃথিবীর গতির বিষয় আর্য্যগণ বিশেষরূপই অবগত ছিলেন। নতুবা গতি-ক্রিয়া লইয়া তাঁহারা পৃথিবীর এতগুলি নাম করিতেন না।

ঋগ্বেদের জনপদ ঃ—ঋগ্বেদে যে সব আর্য্যসভ্যতা-পরিপোষক জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব। আর্য্যগণ সিন্ধুনদের তীরেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। এই অনুমান কতদূর সঙ্গত তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, সিন্ধুনদের তীরভূমি যে একটি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন জনপদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

এইখানেই প্রথম অশ্বযজ্ঞের আয়োজন হয়। এই সময়ে আর্য্যগণ বোধ হয় অশ্বমাংস ভোজন করিতেন। এই অশ্বযজ্ঞই ক্রমে মহাভারতের সময় অশ্বমেধের আকার ধারণ করে। সিন্ধুর পরই আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থিতা সরস্বতীর কথা বলিতে হয়। এই সরস্বতীর তীরে বহু যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে সরস্বতীর তীরভূমি প্রতিনিয়ত যজ্ঞীয় মন্ত্রে মুখরিত থাকিত বলিয়াই কালক্রমে সরস্বতী বাগ্‌দেবীরূপে পরিচিতা হইয়াছে।

এই দুইটি প্রধান নদী ব্যতীত ঋগ্বেদে (৭।৭৫।৫) আরও আটটি নদীর নাম পাওয়া যায়;—গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু, পরষ্ণী, মরুদ্বুধা, অসিক্নী, বিতস্তা ও আর্জ্জীকীয়া। ইহা ব্যতীত ঐ স্থানেই সুষেমানামক আর একটি নদীর নাম পাওয়া যায়। যাস্ক বলেন, এই সুষেমা সিন্ধু নদের নামান্তর। ঐ আটটি নদীর মধ্যে যাস্কের মতে পরষ্ণী নদী ইরাবতী।

ঋগ্বেদে গঙ্গা ব্যতীত জাহ্নবী শব্দও পাওয়া যায়। (৩।৫৮।৬) উইলসন সাহেব বলেন, It may imply to the Ganges, Jahnavi, if we have reason to suppose the legend of her origin from Jahnu, was known to the vedas বৈদিক আর্য্যগণ গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্প কি করিয়া অবগত হইলেন, অন্য একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

৫।৪২।১৭ ঋকে যমুনার উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের সময় হইতেই যমুনার তীরে গাভী সকল "শ্রুতং" ছিল। ইহা হইতেই ভাগবতের গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ৭।১৮।১৯ ঋকে আর একবার যমুনার উল্লেখ আছে।

৫।৫৩।৯ ঋকে রসা, অনিভতা ও কুভা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের স্থান আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

৫।৬১।১৬ ঋকে গোমতী নদীর নাম পাওয়া যায়। এই গোমতী নদী অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত।

আর্য্যগণ এই নদী-বহুল জনপদে বাস করিতেন। এই উর্ব্বর ভূমি লইয়া আর্য্যগণের মধ্যে বিবাদ হইত। এক আর্য্য নৃপতি অন্য আর্য্য নৃপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, বেদে এরূপ কথাও দেখা যায়।

তৎকালে এক জনপদ হইতে অন্য জনপদে গমনাগমনের কোনরূপ বন্দোবস্ত থাকাই সম্ভব। কেন না ঋষিগণ যজ্ঞ-সম্পাদন-ব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি পিবজনের পুত্র সুদাস রাজার পৌরোহিত্য করিয়া এক জনপদ হইতে অন্য জনপদে প্রত্যাগমন-কালে বিপাশা ও শতদ্রু নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি ঋকের দ্বারা উক্ত নদীদ্বয়ের স্তব করেন।

এতদ্ব্যতীত ধন-লাভ ও বাণিজ্যের জন্য স্থলের কথা কি জলপথেও গমনাগমনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। (৫।৫৫।৬)

আর্য্য জনপদ ব্যতীত বৈদিক কালে কতিপয় অনার্য্য দেশের কথাও বেদে দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ কীকট দেশের উল্লেখ

করা যায়। প্রমগন্দ এই জনপদের রাজা ছিলেন। সায়ণ বলেন, সুদ লইয়া যে টাকা দেয় তাহার নাম মগন্দ; প্রমগন্দ তাহার পুত্র। এই কীকট দেশ বর্ত্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত। উইলসন্ সাহেব বলেন, "Kikat is usually identified with South Behar. বেবার আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন, It seems not impossible that the native inhabitants being particullarly vigorous, retained more influeuce in Magadh than elsewhere after the country had been Brahminised.—Indian Literature (Translation) P. 79. সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যগণ পার্শ্ববর্ত্তী জনপদের সকল তথ্য রাখিবার অন্ততঃ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। আর্য্যগণ নিতান্তই pastoral life যাপন করিতেন ও সে যুগে একদেশের সহিত অন্যদেশের কোনই সম্পর্ক ছিল না, এমন কথা বলা চলে না।

এই সব জনপদ ব্যতীত গান্ধার দেশেরও নাম আছে। তথায় উৎকৃষ্ট লোম পাওয়া যাইত। অতএব কোন্ বিশেষ দেশে কোন্ বিশেষ দ্রব্য পাওয়া যাইত, আর্য্যগণ তাহারও সংবাদ রাখিতেন। এই সকল প্রমাণসত্ত্বেও কি কেহ মনে করিবেন যে, আর্য্যগণ কেবল গরু চরাইয়া ও মাটিতে লাঙ্গল দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন?

৪।৩০।১৮ ঋকের সময় আর্য্যগণ সরযূ নদী অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। রাজ্যলিপ্সা ও প্রাধান্য-লাভ চিরদিনই মানুষকে উন্মত্ত করে। আর্য্যগণও নানা ক্ষুদ্র রাজ্য-সংস্থাপনের পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

৩।২৩।৪ ঋকে সরস্বতী ব্যতীত দৃষদ্বতী ও অপমার নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আর্য্য সভ্যতা বহুদূর-বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

দুর্নিবার

সে যদি তেমন ক'রে চায়;
নিমেষে অমনি থেমে যায়
শোণিতের নিত্য নৃত্য, সব দেহ সর্ব্ব চিত্ত
শ্বাস রোধি' চকিতে দাঁড়ায়
অচল পাষাণ ছবিপ্রায়।

সে যদি তেমন ক'রে চায়
সব যাওয়া অমনি ফুরায়।
পাষাণে বাঁধিয়া বুক যবে গো ফিরাই মুখ
সে আঁখি পিছন হ'তে হায়!
মায়া-কর পিঠেতে বুলায়।
চলিতে চরণ তুলি' ফেলিতে তা যাই ভুলি
সমুখ বিমুখ সম ভায়,
মুখ যে আপনি ফিরে যায়।
নিখিল ভুবনজন ডাকে যদি প্রাণপণ
আপন পরাণ যদি ফাটে
সে মায়া-বাঁধন নাহি কাটে।
কোথা কেবা কোথা কি যে কোথা আমি রহি নিজে
শুধু সে কুহকী আঁখি ভায়;
সে যদি তেমন ক'রে চায়।

সে যদি তেমন ক'রে ডাকে;
থাকি না যেখানে কেন কাণে আসি পশে যেন
মরম পুরিয়া যেন থাকে।
মরু গিরি পারাবার পার হ'য়ে অনিবার
পিয়াসা আকাশে ভাসি আসে
ব্যাকুল বাহুর ডোরে বাঁধি ল'য়ে দৃঢ় মোরে
না জানি কেমনে টানে পাশে।
কোথা রহে ধর্ম্ম লাজ সংসারের কর্ম্ম-কাজ
পুরুষ গৌরব কোথা থাকে
সে যদি তেমন ক'রে ডাকে!
সে যদি তেমন ক'রে বলে
লাভ-ক্ষতি সুখ-দুখে কে হিসাব করে সূক্ষ্ম
পশি আমি অনলে বা জলে?
সম্ভব বা অসম্ভব নাহি রহে অনুভব
চাহি না সমুখে কিম্বা পিছে
আশে-পাশে নর রাগে তাহারি নিদেশ জাগে
সে বিনে সকলি আর মিছে।

প্রবল সে চির দুর্নিবারে
ক্ষণেক ভুলিতে কেবা পারে?
তাই মোর লয় মনে পঁহুছিল যেই ক্ষণে
জীবনের অন্তিম কিনারে;
মৃত্যুর ভৈরব রবে মুগ্ধ ঝাঁপ দিয়া যবে
পড়িবারে চাহিব—পাথারে
তখনো পিছন থেকে সে যদি বারেক ডেকে
আমারে থামিয়া যেতে বলে,
নারিব লঙ্ঘিতে বাণী প্রাণশিখা-রেখাখানি
নিবিতে নিবিতে র'বে জ্বলে।
জাগি'রবে একধার চিরশান্তি পারাবার
মরণের বিরাট মাধুরী
সবলে টানিবে নিতি তাহার আহ্বান-গীতি
আমারে রাখিবে ক'রে চুরি।
চেতনার শতদল মুদি রবে অচপল
সে শুধু জাগিবে এক দ'লে
সে যদি মরিতে নাহি বলে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

যুদ্ধের দস্তুর*

(গল্প)

রুশ ও তুর্কী উভয় দলের সৈন্যেরা সবেমাত্র গুলিবর্ষণ সুরু করিয়াছে।

চারিদিকে এমনি জমাট কুয়াশা যে, শত্রুপক্ষ প্রায় নজরের আড়াল হইয়াছে; একসঙ্গে জমায়েৎ বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে দূর হইতে কতকগুলি টুক্‌রা মেঘের মত দেখাইতেছিল। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া কসাকেরা মিছা তাহাদের দৃষ্টিকে ব্যথিত করিতেছিল; কারণ, এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি কাহার আছে যে, আঁধারের সে যবনিকা ভেদ করিতে পারে!

প্রথমে তুর্কীরাই অগ্নিবৃষ্টি সুরু করিয়াছিল। রুশেরা শুধু জবাব দিতেছিল। কোন পক্ষই শত্রুকে দেখিতে পাইতেছিল না। সকলের অগোচরে শত্রুরা গুঁড়ি মারিয়া পাছে একেবারে কাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে অগ্নিবৃষ্টির বিরাম ছিল না। এমন অবস্থায় উভয় পক্ষের সৈন্যেরা একরূপ নারাজ

* রুশ ঔপন্যাসিক ভাসিলি নেমিরোভিচ্ ডানশেঙ্কো হইতে।

হইয়াও, পরস্পরের প্রতি এলপাতাড়ি গুলিবৃষ্টি করিয়া জানাইয়া দেয় যে, তাহারা খুব কাছে-কাছেই আছে!

রজনী ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল, —তুষারক্ষেত্রের উপর বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলির উপরে একটা আঁধারের আস্তরণ বিছাইয়া দিয়া! রাত্রি যত গভীর হইয়া উঠিল, অগ্নিবৃষ্টিও তত কমিয়া আসিতে লাগিল এবং বন্দুকের শব্দও চারিদিককার স্যাঁৎসেতে ভিজা আবহাওয়ায় ততই থামিয়া পড়িতে লাগিল। শেষে অন্য সব শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। মাঝে মাঝে শুধু আহতের আর্ত্তনাদ, বা মরন্ত ঘোড়ার চীৎকারে রণক্ষেত্রের নীরবতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সারাদিনের হাঁটুনি ও লড়াইয়ের শ্রমে সৈন্যদের দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, মৃত সঙ্গীদের সরাইয়া রাখিবার ভাবনাও তাহাদের আর ভাবিবার অবসর ছিল না। তখন তাহাদের প্রাণে শুধু একটিমাত্র কামনা জাগিতেছিল, —সে শুধু বিশ্রামের কামনা, নিদ্রার কামনা!

"নূতন বছরের আমোদ-আহ্লাদ সব মাটী!"—কথাগুলি যিনি বলিলেন, তিনি একজন কর্ণেল, আকার ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ। কথাগুলি যাঁহাকে বলা হইল, তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, কৃশ; একখণ্ড বস্ত্রের বন্ধনীতে তাঁহার একখানা হাত ঝুলিতেছিল। একটি তুর্কী বাড়ীর বারান্দায় তাঁহারা দুইজনে বসিয়াছিলেন।

"কপাল বড় মন্দ হে! চিঠিপত্রও কিছু পাওয়া গেল না।"

"সেজন্যে আমি বড় মাথা ঘামাচ্চি না। যুদ্ধক্ষেত্রে ডাকঘরের বন্দোবস্ত যে কেমন চমৎকার, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে!

"তবু ক লাইন চিঠি পেলে মনটা কিছু খুসি থাকে। লড়াই কর্ত্তে কর্ত্তে বড়দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা জানতে পারলাম না, আবার আজকের হালখাতা দিনটাও তেমনি করেই কেটে গেল যা কি! হা ভগবান! দেশের বাড়ীতে এরা কি রকম হাসি-খুসিই চল্‌ছে! আমি চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই, ছেলেগুলো আহ্লাদে আটখানা হয়ে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে! আমার বোধ হয়, তোমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরাও এতক্ষণে আমাদের বাড়ীতে এসেছে! আমাদের কোন খবর না পেয়ে নিশ্চয়ই তারা ভারি ভাবিত হয়ে উঠেছে—"

"আচ্ছা, তোমার হাত এখন কেমন?"

"খুব ভালো; তবে মন্দও হতে পারে, ভালও হতে পারে!"

"বেশ ত, এই অছিলায় তুমি ছুটীর দরখাস্ত কর না কেন?"

"বল কি! ফৌজে এখন কর্ম্মচারীর অভাব হয়েছে! বিশেষ এতকাল আমরা একসঙ্গে আছি যে, ছাড়াছাড়ির কথা মনেও আমি ভাবতে পারি না। না—আমি যাব না। যদি আমরা কখনও ফিরতে পারি, তাহলে দুজনেই একসঙ্গে ফিরব।"

রাতি তখন বেশ থম্‌থমে হইয়া আসিয়াছে। গাঁয়ের পথে হঠাৎ একটা জমায়েত মশালের রাঙ্গা আলো এবং একযোড়া বন্দী গোঁফে দুই ভাগে ভাগ-করা একখানা মুখ দেখা গেল।

মশালের দিকে চাহিয়া কর্ণেল বলিলেন, প্যাণ্টেলিফ আস্‌ছে, না?"

সেই গাঢ় অন্ধকারকে সমুজ্জ্বল করিয়া মশালটা আঙ্গিনায় ঢুকিল। একজন ঘোড়-সওয়ার কর্ণেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় ছিলে?"

"ফাঁড়িতে, হুজুর! লড়াই ফের সুরু হয়েছে!"

"আচ্ছা, যাও! আরে—এ কি?"

আঙ্গিনায় জনকয়েক সৈন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছিল।

প্যাণ্টেলিফ মশালটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। সেই আলোয় দেখা গেল, কয়জন লোক কাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"ওরে বুড়ো নেড়ে,—আয় বল্‌ছি, আয়! তোদের জ্বালায় কি একদণ্ড সুস্থির থাকতে পার্ব্ব না? নিপাত যা—তোরা নিপাত যা!"

কর্ণেল উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওহে বাপু,—সব ওখানে দাঁড়িয়ে হচ্ছে কি?"

"হুজুর, এ একজন তুর্কী। লোকটা ঝোপের নীচে লুকিয়ে ছিল, আমরা হঠাৎ বেটাকে ধরে ফেলেছি!"

"ঝোপের নীচে লুকিয়ে ছিল, কি রকম?"

"কাপুরুষের মত জড়সড় হয়ে ঝোপের তলায় পড়েছিল, হুজুর! লেফটেনাণ্ট ভাসিলিয়েফ বল্লেন, একে আপনার কাছে হাজির কর্‌তে। এর নাম হচ্চে মামুদ।"

মশালটা বন্দীর মুখের সামনে ধরা হইল; তাহার নাক খুব লম্বা, গোঁফ বেশ ঘন, নাকের মাঝখানটা ফুলা। কপালে একটা নূতন ক্ষত। পুরাণো তাঁবু হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা ময়লা কাপড়ে তাহার মাথার ক্ষত বাঁধা।

বন্ধুর দিকে ফিরিয়া কর্ণেল সোল্লাসে বলিলেন, "বাহবা কি বাহবা! আমরা যে একজন হোম্‌রা চোম্‌রা অফিসারকে পাক্‌ড়াও করেছি!"

তাঁহার বন্ধু মেজর বন্দীর দিকে তীক্ষ্ণ নেত্রে মনোযোগের সহিত চাহিয়া ছিলেন।

"শুধু হোম্‌রা-চোম্‌রা অফিসার নয় হে, লোকটা আমাদের চেনা-শুনো। তুমি কি একে চিন্তে পার্‌ছ না? ওর কপালের কাটা দাগটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি! ওর বাঁ হাতে নিশ্চয়ই দুটো আঙ্গুল নেই!" —সৈন্যদের দিকে ফিরিয়া তিনি হুকুম দিলেন, "ওরে, ওকে ওর বাঁ হাতটা বার কর্ত্তে বল্‌তো!"

"হাঁ—হাঁ—ঠিক! এ হচ্ছে মামুদ বে, একজন তুর্কী কর্ণেল।"

"হুঁ—ফেরার বন্দী। লোকটার বরাত ভারী খারাপ দেখছি। প্রধান সেনাপতি বোধ হয় ওকে গুলি করে মার্ত্তে হুকুম দেবেন। আহা, বেচারার জন্যে আমার দুঃখ হচ্চে। ওকে এখানে নিয়ে আয় ত রে! তোরা খালি একজনকে এখানে পাহারায় রেখে যত শীগ্‌গির পারিস, সব সরে পড়্!"

মামুদ বে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারের কাছে একজন সিপাহী বন্দুক ঘাড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

বন্দীকে একটি দৈত্যবিশেষ বলিলেও চলে।

তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী। চোখ দুটিতে ভারি একটা দুঃখের ভাব মাখানো। গোঁফজোড়া পাকিয়া ধব্‌ধবে হইয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া তাহা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার পরণে ছেঁড়া-খোড়া কাপড়। কাঁধের উপরকার কাপড়খানায় টাট্‌কা রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে!

কর্ণেল কঠোর স্বরে কহিলেন, "বন্দীর কাঁধে ও কিসের রক্ত?"

"হুজুর, লোকটা যখন ঝোপের তলায় ছিল, তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের গলা প্রায় ভেঙ্গে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আমাদের ডাকাডাকির উত্তরে ও তার পা দুটোকে আমাদের দিকে রেখে গঙ্গা-ফড়িংয়ের মত শুধু নাচাচ্ছিল। কাজেই কিরিলিয়েফ শেষটা মহা খাপ্পা হয়ে ওকে বেওনেটের এক খোঁচা না দিয়ে আর থাকতে পারলে না। খোঁচা খেয়ে ও তখন শুড়্‌শুড়্‌ করে বেরিয়ে পড়ল! লেফ্‌টেনাণ্ট ভাসিলিয়েফ মানা না কর্‌লে আমরা তখনি ওর দফা রফা করে দিতাম।"

"সাইমন, বন্দীর জন্যে একখানা চেয়ার নিয়ে এসো!"

বন্দী আসনের উপর বসিলেন। তাঁহাকে এখন আরও ছন্ন-ছাড়ার মত দেখাইতেছিল। এই নূতন হুকুমদারদের কাছে আসিয়া তিনি বড় বেশী সান্ত্বনা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নাক যেন গোঁফ-জোড়ার ভিতরে বসিয়া গিয়াছিল, মাথা দুই কাঁধের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল!

মেজর তুর্কী ভাষা জানিতেন। তিনি বলিলেন, "এর আগে আমাদের দেখাশোনা হয়েছে, না? আপনার নাম কি মামুদ বে নয়?"

তুর্কীর মাথা যেন আরও নীচে নামিয়া গেল। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝা গেল যে, তিনি একেবারে নিরাশার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

"যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, বলুন। আপনি কি অন্য লোক?"

"আমি কখনো মিথ্যা বলি নি"—বন্দী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "কাল আমি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসেছি। আজ আবার আমি আপনাদের কাছে বন্দী হলুম। পায়ে হেঁটে বেশী দূর পালানো ভারী শক্ত"—বন্দী ম্লান হাস্য করিলেন—"বিশেষ, পায়ে আর মাথায় চোট্ লাগ্‌লে ত কথাই নেই। এখন আবার আমার কাঁধ জখম হয়েছে,—সেটা—"

কণ্ঠস্বরে পদোপযুক্ত কাঠিন্যপ্রকাশের বিফল চেষ্টা করিয়া মেজর বলিলেন, "বসুন আপনি। এ কথা জানেন তো, যে যুদ্ধের দস্তুর হচ্ছে—"

"আমাকে তা মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। আপনাদেরই জিৎ। আমাকে গুলি করে মারবার হুকুম দিন। সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েই আমি পালিয়েছিলাম। মৃত্যু-খেলায় আমি হেরেছি। মৃত্যুই আমার দণ্ড।"

মেজরের স্বর করুণায় কোমল হইয়া আসিল।

"আপনার সঙ্গে কি কোনরকম খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে?"

"কিছু না। যাঁর কাছে আমি বন্দী ছিলাম, তাঁর চেয়ে দয়ালু লোক আর থাকতেই পারে না। তাঁর নিজের বিছানায় আমাকে তিনি শুতে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি খাবার-দাবার সব পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে শত্রুর মত না দেখে ভাইয়ের মতই দেখেছিলেন।"

"তবে, আপনি কি ভেবেছিলেন যে, যখন আপনাকে রুসিয়ায় পাঠানো হবে, তখন আপনি কষ্ট পাবেন?"

"আমি জানি, রুশেরা তাদের বন্দীদের সঙ্গে কুব্যবহার করে না।"

"তবে আপনি পালালেন কেন?"

"কারণ জেনে এখন লাভ কি? আমি আপনাদের হাতের মুঠোয়। আপনারা কর্ত্তব্য পালন করুন; কিন্তু কাজটা শীঘ্র শেষ করে ফেলুন—শীঘ্র শেষ করে ফেলুন।"

বৃদ্ধ তুর্কীর বুকের মধ্য হইতে যেন একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের অস্ফুট স্বর ফুটিয়া উঠিল। তিনি যেন এখনই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন।

"কি আশায় যে আপনি পালাচ্ছিলেন, আমি ত' কিছুতেই সেটা বুঝতে পারছি না। তুর্কীরা সব যায়গাতেই রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। আপনাদের ফৌজে আহারের সংস্থান নেই। সহর ছেড়ে বাসিন্দারাও পালাচ্ছে। আপনার আর কিছুকাল ধৈর্য্য ধরে থাকা উচিত ছিল। এ যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হবে। তখন আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হোত; আপনিও অনায়াসে ঘরে ফিরে যেতে পার্ত্তেন।"

"ঘরে? কোথায় ঘর?"

"অপরাধ নেবেন না। আপনার কথা আমি বুঝ্‌তে পারছি না।"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি। কি যে হচ্ছে, আমি তা ঠিক জান্‌তে পারছি। আমি ভুল বল্‌ছি না। ইস্তাম্বুল থেকে হুকুমনামা বেরিয়েছে যে, রাজ্যের সব লোক যেন এসিয়া মাইনরে চলে যায়। অন্য অন্য সকলের সঙ্গে হয়ত আমার পরিবারবর্গও এসিয়া মাইনরে গিয়েছে। তাদের আমি কি করে আবার দেখ্‌তে পাব? বেশী বলা বাহুল্য। আমার যা কর্ত্তব্য ভেবেছি, আমি তা করেছি। এখন আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারা করুন। মৃত্যুর হাত থেকে কোথাও ছাড়ান নেই। যা হবার, তা হবেই। এ যে কপালের লেখা! নিয়তি যেটুকু সময় দিয়েছে, তার বেশী কেউ বাঁচতে পারে না। আমি যা করেছি, তা আমার নিজের জন্য করিনি—"

বন্দীর স্বরভঙ্গ হইল। হতাশভাবে তিনি মাথা নাড়িলেন।

মেজর নম্রভাবে কহিলেন, "আপনি আপনার পরিবারের কথা বল্‌ছেন। আমারও পরিবার আছে।"

"আপনি যে আবার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পার্ব্বেন, এজন্যে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন। আপনি যে শত্রুর হাতে বন্দী হন নি, এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিন।"

"আমি যে আপনাকে এত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, এসব আপনার পরিবারের মঙ্গলের জন্য, জানবেন।"

বহুক্ষণ সকলে স্তব্ধ রহিলেন।

কর্ণেল বলিলেন, "ওহে, জিজ্ঞাসা কর না, ওঁর ক'টি ছেলে-মেয়ে!"

অতি অস্পষ্টস্বরে মামুদ বলিলেন, "চারটি।"

"তারা কি বেশ বড়-সড়?"

"না—সব ছোট। আমার বড় মেয়েটি এই-সবে ছ-বছরে পড়েছে।"

মেজর আপন-মনে বলিলেন, "আমারও বড় মেয়েটির বয়স ঠিক ছয়।"

মেয়ের কথা মনে করিয়া বন্দী প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আমার মেয়ে কালে রূপবতী হবে। তার ডাগর চোখদুটি এখনি ঝল্‌কে ওঠে। পাঁচমাস হোল, তাকে শেষ দেখেছি; বিদায় নেবার সময় সে কেঁদে-কেটে রসাতল বাধিয়ে তুলেছিল। আমার ছোট খোকাটির বয়স এখনো এক বছর হয়নি। আমি যখন বাড়ী ছেড়ে আসি, সে বেচারী তখনো হাঁট্‌তে শেখেনি। তারা সবাই আদ্রিয়ানোপলের কাছে থাকে; সেখানে আমার চমৎকার একখানি বাড়ী আর বাগান আছে। আমরা বড় সুখে ছিলাম। তারপর এই যুদ্ধ বাধল। যে লড়াই বাধিয়েছে, আমার অভিশাপ তাকে দগ্ধ করুক! ভগবান ন্যায়বান। যারা এই রক্তের সাগর বইয়েছে আর আমাদের নিষ্পাপ সুখের সংসারে আগুন জেলেছে, ভগবান নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি দেবেন।"

মেজর বলিলেন, "আপনার কথা ঠিক। এরকম যুদ্ধে কার উপকার হয়? আমি বারবার মনে মনে এই কথা নিয়ে তোলা-পাড়া করে দেখেছি। আমারই কথা ধরুন, না হয়! মনে করুন, আমি যদি কাল মরে যাই, তবে আমার পরিবারের কি হাল হবে?"

জেরা করার ধরণ-ধারণ একেবারে বদলিয়া গেল। তিনজনে একসঙ্গে বসিয়া বসিয়া এখন আপন আপন পরিবারের সুখ-দুঃখের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। মেজর বন্দীর সকল কথা তর্জ্জমা করিয়া কর্ণেলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কর্ণেলও বন্দীর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

কর্ণেল কহিলেন, "ওঁকে বল যে, ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্যে উনি রুসিয়ায় না গিয়ে এরকম ভাবে জীবনকে বিপন্ন কর্‌তে গেলেন কেন? মাসকতকের হের্‌ফেরে এমন আর কি হোত?"

মামুদ দুঃখিতভাবে বলিলেন, "আমার দেশের লোকেরা,—বিশেষ স্ত্রীলোকেরা যদি রুসদের ভাল করে জানতো! তাহলে যতদিন আমরা না ফিরে যেতাম, ততদিন তাঁরা বাড়ী-ঘর ও ছেলেমেয়েদের নিশ্চিন্ত হয়ে দেখতে শুন্‌তে পারতো। কিন্তু তারা ত' তা বোঝে না। আর দিনকয়েকের মধ্যে বাসিন্দারা সবাই পালাবে; আপনাদের সৈন্যেরা যখন আদ্রিয়ানোপলে গিয়ে হাজির হবে, সহর তখন একেবারে খালি হয়ে পড়্‌বে। সহরে পড়ে থাক্‌বে শুধু জনকতক ক্রিশ্চান।

"কেন আমি পালিয়ে এসেছি? আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে। যাদের আমি ভালবাসি, তাদের কি দশা হবে, আপনি কি তা জানেন? না, জানেন না। বল্‌ছি, শুনুন। আমার স্ত্রী আতঙ্কে

সারা হয়ে, বাড়ী, ঘর, বাগান, সব ছেড়ে পালাবে। যা পড়ে থাক্‌বে, গ্রীক কি আর্ম্মেনিয়ানরা তা লুঠতরাজ কর্‌বে। আমার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ইস্তাম্বুলে যাবে বটে, কিন্তু সরকার থেকে সে কোন সাহায্য পাবে না। আর এতগুলো হতভাগ্য পরিবারকে সাহায্য কর্‌বার টাকা সরকার কোথা থেকেই বা পাবেন? সরকার শুধু তাদের এসিয়া মাইনরে, কিম্বা 'স্কুটারি'তে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর আমার পরিবারের কথা সকলেই ভুলে যাবে। একাকিনী অবলা রমণী সে, এমন বিপাকে পড়্‌লে কি কর্ব্বে বলুন তো? তার হাতে এক-মাত্র উপায় আছে। আমার মেয়েগুলি নীরোগ সুন্দর, সে তাদের বেচে ফেল্‌বে। বাঁদীর মত পরের ঘরে তারা মানুষ হবে, বাপের নাম পর্য্যন্ত জানবে না, শুনবে না। বড় হলে, কোন ধনীর কাছে আবার তাদের বিক্রী করা হবে। আমার ছেলেরাও দাস হবে। আর আমার স্ত্রী? তার দুঃখ কমে গেলে সেও কোন হারেমে গিয়ে ঢুক্‌বে। আমি যদি এক বছর পরে দেশে ফিরি, তখন গিয়ে কি দেখ্‌তে পাব? কিছু না! না বাড়ী-ঘর, না স্ত্রী, না পুত্র-কন্যা! তাদের যে কি দশা হল, তাও আমি জান্‌তে পারব না। তাদের খোঁজ দিতে পারে, এমন কোন লোককেও আমি দেখ্‌তে পাব না। আমি আমার সব হারাব। আমার বাড়ীর মালিক হবে অন্য কেউ। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন আমি পালিয়েছি! মনের যাতনা সইবার সাহস আমার আর ছিল না, তাই আমি পালিয়েছি।"

মেজর বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ। যুদ্ধ ভারি নিষ্ঠুর, ভারি নিষ্ঠুর ব্যাপার!"

বন্দী আবার বলিলেন, "এই হতচ্ছাড়া যুদ্ধের আগে আমি বাড়ীর বাইরে সহজে পা বাড়াতাম না। আমি আমার সব ছেলেমেয়েগুলির জন্মকালে উপস্থিত ছিলাম। দিনে দিনে তাদের আমি বাড়তে দেখেছি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বুদ্ধি কি রকমে পেকে উঠেছে, তাও আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। তাদের সবগুলিই কখন্ আমাকে সবপ্রথমে চিনতে পেরেছিল, আমার তা বেশ মনে আছে। কখন্ তারা প্রথমে কথা কইবার চেষ্টা করেছিল, আমার প্রাণে তা গাঁথা আছে। ক্ষুদে ক্ষুদে তাদের পল্‌কা পাগুলি, পাখীর ছানার মতই তাদের ছোট্ট মুখের সেই রাঙ্গা রাঙ্গা হাঁ,—সমস্ত—সমস্ত—আমার সমস্তই মনে আছে। প্রতিদিন এখন কে তাদের খাওয়াবে দাওয়াবে? তাদের গর্ভধারিণী? সে অভাগিনীও যে এখন বিপাকে পড়ে! আগে—"

বন্দী কথা শেষ করিতে পারিলেন না। তাঁহার শক্তি ও সাহস, দুইই লুপ্ত হইয়াছিল।

কর্ণেল অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে বলিলেন, "বৃদ্ধ, আপনার আর আমাদের মাঝে তফাৎটা কি? হ্যাঁ, আমরা সকলেই ঐ এক গর্ত্তে পড়ে আছি।"

মেজর বলিলেন, "আচ্ছা, বন্দীকে নিয়ে আমরা কি কর্‌ব? এঁকে আজই সেনা-পতির কাছে না পাঠিয়ে, আমাদের কাছে রাখ্‌লে হয় না?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ ত! আজ উনি এখানেই থাকুন। ঠিক কথা—যা বলেছ। আজ উনি থাকুন।"

"কাল পর্য্যন্ত ওঁকে আমাদের সঙ্গে রাখা চলবে ত?"

"কেন চলবে না! উনি এখানেই থাকুন, আমি সাইমনকে ওঁর জন্যে বিছানা-পত্তর তোয়ের করতে বলব। চার-চারটি সন্তান! আহা, চার-চারটি সন্তান!"

"আচ্ছা, সেনাপতি যদি ওঁকে গুলি করে মারতে হুকুম দেন?"

"হুঁ, কি বলচ—সেনাপতি যদি ওঁকে গুলি করে মারতে চান? এ সবই দৈবের উপর নির্ভর করে। বন্দীর যে চারটি ছেলেমেয়ে, সেনাপতিকে কি এ কথা কোন গতিকে জানিয়ে দেবার উপায় নেই?"

"তোমার কি মনে হয় না যে, যুদ্ধের মধ্যে অনেক ঘৃণাকর ব্যাপার আছে?"

"অ্যাঁ, তা—যা বলেছ,—হ্যাঁ, আছে বৈ কি!"—কর্ণেল বড়ই অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন—"কিন্তু কর্ত্তব্য ত' পালন করতেই হবে। আমরা শপথ করেছি, মনে আছে ত?—যাক, সব চুলোয় যাক্! এ লক্ষ্মী-ছাড়া ব্যাপারটা মন থেকে এখনকার মত মুছে ফেলতে পারলে অন্ততঃ কাল পর্য্যন্ত শান্তিতে থাকা যাবে। বন্দী মদ খান কি না, জিজ্ঞাসা কর। উনি আজ রাতে আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবেন।"

কর্ণেল ও মেজরের সহিত বন্দী শয়ন করিলেন। বাহির হইতে মাঝে মাঝে দুই চারিটা বন্দুকের আওয়াজ আসিতেছিল। তা-ছাড়া আর সব নীরব-নিঝুম।

মেজরের ঘুম চটিয়া গিয়াছিল। তিনি কেবলই এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন। লেপখানা একবার ছুড়িয়া ফেলিতেছিলেন, আবার গায়ের উপর টানিয়া লইতেছিলেন। এইবার লইয়া দশবার তিনি খবরের কাগজ পড়িবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কাগজখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। মাঝে-মাঝে তিনি ঘুমন্ত বন্দীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন; অভাগার ওষ্ঠ হইতে দুঃস্বপ্নের অস্পষ্ট ভাষা বাহির হইতেছিল। মেজরের চিন্তাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমাগত সন্তানের দিকে ফিরিয়া আসিতেছিল। বন্দীর সন্তান নয়,—তিনি ভাবিতেছিলেন, নিজের সন্তানের কথা।

অবশেষে, যখন তিনি চোখের পাতা মুদিলেন, তখনও তিনি সে ভাবনা ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তা সেই রক্তাক্ত রণক্ষেত্র হইতে হাজার-হাজার মাইল পার হইয়া, যেখানে, চারিদিকের নিরালা শস্য-ক্ষেত্রের শ্যামলতার মাঝে তাঁহার শান্তিসুখ পরিবারবর্গ বাস করিতেছিল, সেইখানে ছুটিয়া গেল। সেখানে যুদ্ধ নাই, মৃত্যুভয় নাই, ধ্বংশপাথারে রক্তের ঢেউ নাই!

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি একটি মাঝারিগোছের ঘরে গিয়া হাজির হইয়াছেন। এককোণে ছোট বাতির মৃদু আলোয় দুটি ছোট বিছানা দেখা যাইতেছে। বিছানার মশারীর মধ্য হইতে ঘুমন্তের নিশ্বাস-শব্দ আসিতেছে। মেজর একটি বিছানার মশারী তুলিয়া ধরিলেন। ভিতরে একটি ছোট্ট মেয়ে ঘুমাইয়া আছে,—গা হইতে লেপখানা সে খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

আপনার মোটা মোটা পা-দুখানি সে গুটাইয়া পেটের কাছে গুটাইয়া আছে, হাত-দুখানি তার ফাঁক-করা। এই চুলবুলে মেয়েটি সারাদিনের দুরন্তপনার পর এখন একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। মেজরের স্নেহমাখা দৃষ্টি বহুক্ষণ ধরিয়া সেই ঘুমন্ত নীরব পুতলির পানে স্থির হইয়া রহিল।

মেজর আপন-মনে বলিলেন, "ঘুমাও দুলালী, ঘুমাও স্বর্গের পরী!"

তিনি দ্বিতীয় বিছানার দিকে গেলেন। মনুষ্যত্বের এই ছোট টুকরাটির দিকে এক-বার চাহিয়া দেখ! এখনো বয়স তাহার দুই বছর হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে এই বীরপুরুষ দিনভোর শুধু যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি রব ছাড়া আর কিছুই জানে না। তার কচি কাঁচ গালদুটিতে আঁচড়া-আঁচড়ির দাগ। শত্রুদের একজনের সঙ্গে সে ক্ষণিক সন্ধি করিয়াছে তাহার পাশে যে বিড়ালটি পায়ের মধ্যে মাথা লুকাইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে, তাহাকে দেখিলে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। মেজরের খোকাটি কেমন মোটাসোটা! গোল মাথাটি তাহার কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলে ভরা। যাদুর রাঙ্গা রাঙ্গা নধর গালে ঐ যে ছোট টোল্‌টি, ঐখানটিতে চুমা খাইবার জন্য মেজরের মনে ভারী সাধ হইতে লাগিল। কিন্তু না, —চুমা খাইতে গেলে সোনামণির ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে!

পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া মেজর আস্তে আস্তে পাশের ঘরটিতে গেলেন। সেখানে তাঁহার স্ত্রী বড় ছেলের সঙ্গে শুইয়া আছেন। বড় খোকার বয়স ছয় বৎসর। আপনার ভাই-বোনের চেয়ে বয়সে বড় বলিয়া মনে মনে তাহার বড়ই গর্ব্ব! বাতির শিখা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; নীলরঙ্গের মৃদু আলোয় মাতা-পুত্রের দেহ রঞ্জিত। বিছানার পাশটিতে ছোট টেবিলের উপর মেজরের ফোটোগ্রাফ ও একখানা খোলা খবরের কাগজ রহিয়াছে। মেজর বুঝিলেন, ঠিক ঘুমাইবার আগেই তাঁহার প্রিয়তমা খবরের কাগজে তাঁহারই কথা পড়িতেছিলেন। ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে মেজরের আরও কয়খানি ছবি টাঙ্গানো। তাঁহার স্মৃতি এখানে কেহ ভুলে নাই। সাবধানে হেঁট্ হইয়া মেজর তাঁহার প্রিয়ার ওষ্ঠে চুম্বনের দাগ আঁকিয়া দিলেন, তারপর চোখ বুজিয়া তিনি স্ত্রীর কপালে আর একটি চুম্বন করিলেন।

এখানে চারিদিকে অগাধ শান্তি, গভীর সুপ্তি ও মধুর প্রেম বিরাজ করিতেছে! এই সব ঘুমন্ত মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত অশুভ, হতাশা ও ঘৃণা-হিংসার চিন্তা দূর করিবার জন্য এখানে যেন কোন অশরীরী দেবদূত একান্ত প্রাণে প্রার্থনারত রহিয়াছে।

তখন সুস্বপ্নমুগ্ধ সুপ্ত মেজরের দিকে কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, তাঁহার মুখে পুলক-হাসির লীলা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ তাঁহার মুখের হাসি মুছিয়া গেল। হাসির পরিবর্ত্তে তথায় জাগিয়া উঠিল, একটা বিস্ময় ও ভয়ের ভাব। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তিনি যেন তখন একটা বিচিত্র-ভয়াল দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তাঁহার শোণিত-

প্রবাহ শীতল হইয়া শিরায় শিরায় বহিয়া চলিয়াছিল।

তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট বাড়ীর যে ঘরখানি একটু পূর্ব্বে এমন নিসাড় ছিল, তাহা এখন অস্পষ্ট স্বরলহরীতে ভরিয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। তাহাদের মাথার উপর এক-খানা মিশমিশে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহারা সভয়ে ঊর্দ্ধমুখে সেইদিকপানে তাকাইয়া! কি লুকানো ঐ মেঘের মধ্যে,—কি লুকানো আছে? পিতার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইল—সে বুক যেন এখনি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে!

ধীরে ধীরে ধীরে কালো মেঘ দুলিতে দুলিতে নামিয়া আসিতেছে, কাঁপিতে কাঁপিতে নামিয়া আসিতেছে!

শিশুরা সব বিছানার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। তাহারা ভয়ে চেঁচাইতে লাগিল, কিন্তু কোনখান হইতে কোন উত্তর আসিল না। তাহারা মাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কালো মেঘ মাঝ-খানে পড়িয়া তাহাদের মাকে চোখের আড়াল করিয়া দিল। সেই রহস্যময়, ভীষণ, অস্পষ্ট মেঘখানা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করিল। অবশেষে সকলেই দেখিতে পাইল—কি সে জিনিষটা! সে এক দীর্ঘাকৃতি লোকের মৃতদেহ এবং সেই দেহের চারিপাশ ঘিরিয়া চারিটি শিশু! শিশুরা যাতনায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে—তাহাদের ছোট বুক যেন ভাঙ্গিয়া দুইয়া যাইতেছে।

খানিকপরে সাহসে ভর করিয়া মেজরের ছেলেমেয়েরা মৃতদেহের কাছে আগাইয়া আসিয়া দেখিতে লাগিল। মেজরের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে শব কাহার? কপালে সেই কাটা দাগ, সেই সাদা চুলে ভরা মস্ত মাথা, সেই দম্ভ, ধব্‌ধবে গোঁফ! কাঁধের সেই নূতন ক্ষত-চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র ও ছেঁড়াখোড়া ইজার পর্য্যন্ত ঠিক-ঠিক দেখা যাইতেছে।—না, কোন সন্দেহ নাই! মেজরের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

মেজরের ছোট মেয়েটির রাঙ্গা গাল পাঙ্গাস হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে,—কে এ কাজ করেচে?"

মেজরের বড় ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "কে মার্‌লে একে?"

শবকে ঘিরিয়া যে চারিটি অচেনা, কালো শিশু বিদ্যুতের মত চোখ লইয়া বসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আঙ্গুল তুলিয়া মেজরকে দেখাইয়া তাঁহাকেই দোষী করিল।

"ওই আমাদের বাপকে মেরেচে! ওই আমাদের পথে বসিয়েচে—আমাদের ভিখারী করেচে!"

মেজর কথা কহিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার নিজের সন্তানেরা শঙ্কিত মুখে তাঁহার কাছ হইতে সরিয়া গেল। ছোট ছেলেমেয়েদুটি যেন আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের হাতগুলি তুলিয়া ধরিল। মেজর তাঁহার মেয়ের কাছে আগাইয়া আসিলেন, কিন্তু সে

ঘরে পলাইয়া গেল। তারপর সে মেজরের হাত দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল, "রক্ত! রক্ত!"

মেজর নিজের হাতের দিকে চাহিলেন। মেয়ের কথা ঠিক। তাঁহার হাতদুটি—রক্তে রাঙ্গা।

মেজর আবার কথা কহিবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন কাহার লৌহহস্ত সজোরে তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া শ্বাসরোধ করিতে চাহিতেছে! তিনি মুক্তির জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন,—হাঁ, মরিয়া হইয়া! সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া! তারপর আর একবার শেষ চেষ্টা—তারপর জাগরণ!

গায়ের লেপখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি একলাফে বিছানা ছাড়িয়া মাটিতে পড়িলেন।

বন্দী তখন উঠিয়া বসিয়াছেন। কর্ণেলও টেবিলের ধারে বসিয়া আছেন।

"কিহে মেজর, তুমি ত' দেখ্‌ছি দিব্যি একচোট ঘুমিয়ে নিলে!"

"হ্যাঁ, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।"

একটু বিচলিত হইয়া কর্ণেল বলিলেন, "কি! তুমিও?"

"—'তুমিও' বলছ, তার মানে?"

"আমি নিজে এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।"

"তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ? বন্দীর বিষয়ে কিছু?"

"তাই বটে। নইলে আর কি দেখ্‌ব, বল? তুমি আমার একরত্তি ভলোডিয়াকে জান ত?"

"বেশ জিজ্ঞাসা কর্‌ছ, যাহোক! আমি না তার ধর্ম্মপিতা? আমি তাকে জানি ন?"

"তাইত' হে—আমি যে দেখ্‌ছি বেজায় গাধা! আমার মাথাটা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে। যাক্—শোন বলি। ভলোডিয়া কাল সারারাত স্বপ্নে আমার পা ধরে মিনতি করেছে,—যাতে বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?' সে বল্লে, 'বন্দীর ঘরেও ছোট ছোট ভলোডিয়া আছে। তাদের কাছে যাবার জন্যে বন্দীকে আমি ছেড়ে দিতে বল্‌ছি।'—আচ্ছা, কাল রাতে মদে কিছু ছিল বলে কি তোমার মনে হয়?"

মেজর পলকহীন নেত্রে কর্ণেলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

"তোমার স্বপ্নের কথা আমাকে বল।"

মেজর তখন স্বপ্নের কথা খুলিয়া বলিলেন।

কর্ণেল কহিলেন, "বাস্তবিক, এ সব শুন্‌লে আপনা-আপনি মনে একটা কুসংস্কার জন্মে যায়। ওসব কথা থাক্—এখন ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি কর্‌তে হবে ত'। যত শীঘ্র পারা যায় বন্দীকে সেনাপতির কাছে পাঠানো ছাড়া আর ত' কোন উপায় দেখি না। তার নসিবে কি আছে সে কথা সেনাপতিই বল্‌তে পারেন, আমরা না। বন্দীকে আর বেশীক্ষণ আমাদের কাছে রাখ্‌লে, আমরা পাগল হয়ে যাব।"

"তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। বন্দীকে আমি নিজে সেনাপতির কাছে নিয়ে যাব। কি বল?"

কর্ণেল নানাদিকে চাহিতে লাগিলেন, যাহাতে মেজরের সঙ্গে তাঁহার চোখোচোখি না হয়। বলিলেন, "বেশ ত'! তাতে আর আমার আপত্তি কি?"—তাহার পর পদস্থ

কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে যে স্বরে হুকুম দেন, সেইরূপ স্বরে তিনি কহিলেন, "এখন যত শীঘ্র ইচ্ছা তুমি যেতে পার। সেনাপতির কাছে গিয়ে, বন্দীকে তুমি তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌বে।"

***

মামুদ বে'কে সঙ্গে লইয়া মেজর ঘোড়ায় চড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। তাঁহার মনের ভিতরটা আগেকার মতই গুমোট করিয়া ছিল। খানিকপরে তাঁহারা রুশ ফৌজের শেষ ফাঁড়িতে গিয়া পৌছিলেন।

কুয়াশার ভিতর হইতে একজন কসাক সওয়ার বাহির হইয়া আসিল।

সামনের একটা সুঁড়িপথ দেখাইয়া দিয়া মেজর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাপু, এ পথটা কোথায় গিয়েছে, বল্‌তে পার?"

"শত্রুদের আড্ডায়, হুজুর!"

"আজ কোন তুর্কীকে তুমি দেখ্‌তে পেয়েছ?"

"না হুজুর—একজনকেও না। তারা দেখ্‌ছি আজকে বেজায় ঠাণ্ডা বনে' গেছে। কিন্তু কাল তারা পাগলের মত বিষম গোলমাল করেছিল। ভগবানের দয়ায় আজ আমরা একটু শান্তিতে আছি।"

মেজর বন্দীকে তাঁহার পিছনে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া সেই সুঁড়িপথের ভিতর ঢুকিলেন। কিন্তু তাঁহারা বেশীদূর যাইতে না যাইতেই সেই কসাক সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া আবার তাঁহাদের কাছে আসিয়া হাজির হইল।

মেজর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, ব্যাপার কি?"

"হুজুর, একটা কথা আপনাকে বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। তুর্কীরা বেশী তফাতে নেই। তারা হঠাৎ একটা হাঙ্গাম বাধিয়ে তুলতে পারে।"

"বহুৎ আচ্ছা! আমিও চোখ বুজে থাকব না।"

"হুজুর, আপনার বন্দী পালাতে পারে।"

"কোন ভয় নেই। তুর্কীরা কোথায়, কি রকমে আছে, বন্দী আমাকে সে সব দেখিয়ে দেবে বলেছে। তুমি যেতে পার।"

কসাক প্রস্থান করিল। অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহারা দুইজনে নীরবে বহুদূর অগ্রসর হইলেন।

তারপর মেজর ঘোড়া থামাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"মামুদ বে, আমার কথা শুনুন। এখান থেকে তুর্কী ফৌজ বেশী তফাতে নেই। আপনি পালান! আড্রিয়ানোপলে আপনার ছেলেমেয়েদের কাছে যান। শুনতে পাচ্ছেন, যা বল্‌ছি? আমারও ছেলে আছে, মেয়ে আছে। এ কি, কি জন্যে আপনি এখনো যাচ্ছেন না? আর সময় নেই। আপনি যদি বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে আমার মন বদ্‌লে যেতে পারে। দোহাই আপনার! —মশাই, আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন না?"

মামুদ বে যেন পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছেন! কেবল তাঁর চোখদুটি জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

অতি ধীরভাবে মেজর কহিলেন, "আপনাকে আবার বল্‌ছি, আপনি স্বাধীন, নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন।"

এই কল্পনাতীত সত্য যেন বন্দী এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। মামুদ বে হঠাৎ হেঁট হইয়া মেজরের হাত ধরিয়া আবেগভরে তাহা চুম্বন করিলেন।

"রুশ, শুনুন। আপনি আমাকে এমন ঋণের পাশে বাঁধলেন, যা আমি কখনো শোধ করতে পারব না। আপনি কোনদিন বন্দী হলে শত্রুশিবিরে আপনারই মত সদাশয় এক তুর্কীকে দেখ্‌তে পাবেন—এ কথা বলা আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। কিন্তু,—একটি কথা। ঈশ্বর এক। ধর্ম্ম ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর এক। আমি শপথ করছি, আমি আর আমার ছেলেমেয়েরা যতদিন বাঁচব, ভগবানের কাছে ততদিন প্রত্যহ আপনার জন্য প্রার্থনা করব যে, আপনার ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে তিনি যেন আপনাকে রক্ষা করেন, যেমন আমার ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে আপনি আমাকে বাঁচালেন। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। বিদায়, রুশ! বিদায়।"

তারপর,—পাছে মেজর তাঁর মন বদ্‌লান যেন এই ভয়েই—হঠাৎ ঘোড়াকে জোরে চাবুক কশাইয়া মামুদ বে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মেজর খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধ হয়, আরও কিছু আগাইয়া নিরাপদ ব্যবধানে চলিয়া যাইবার জন্য তুর্কীকে তিনি সময় দিতে চাহেন।

যখন তিনি রুশ ফাঁড়ির কাছে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সেই কসাক অশ্বারোহীর সহিত আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

মেজর কহিলেন, "ওহে বাপু, তুমি ত' ঠিক বলেছিলে! বন্দী পালিয়ে গেছে!"

কসাক ভাল করিয়া তীক্ষ্ণ নেত্রে মেজরের মুখটা দেখিয়া লইল। পদস্থ কর্ম্মচারীর দিকে কোন সাধারণ সৈনিক সে-রকম দৃষ্টিতে চাহে না! তারপর বলিল, "তার জোর বরাত, হুজুর! আমাদেরও বন্দীর অভাব নেই।"

মেজর যখন ঘরে ঢুকিলেন, কর্ণেল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল হে?"

"হুজুর, আমাকে গ্রেপ্তার করুন। আমি বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছি।"

কর্ণেল কিছু বলিলেন না। সামনে আসিয়া নীরব আনন্দে মেজরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সেই তাঁহার উত্তর।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আধুনিক ভারত

তৃতীয় কাল-বিভাগ

ইংলণ্ডের ভারতসাম্রাজ্য

ইংরাজের ভারত-বিজয়ে ভারতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, সেই পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই সিপাহী-বিদ্রোহ, একটা সুনির্দ্দিষ্ট কালবিভাগের আরম্ভ সূচনা করে। তখন হইতেই এই ইতিহাসের সেই তৃতীয়ভাগ আরম্ভ হইল, যে-ভাগে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা উত্তরোত্তর মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে।

*
* *

১৮৫৭—৫৮ অব্দের ঘটনায়, ইংরাজদের ক্রটিগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভারতের শাসনতন্ত্র নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য আইনের যে পাণ্ডুলিপি ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয় মহাসভার দুই বিভাগেই, বহু বাদানুবাদের পর ঐ পাণ্ডুলিপি ২রা অগষ্ট ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আইনরূপে গৃহীত হইল। কোম্পানী স্বীয় বিশেষাধিকার হইতে বঞ্চিত হইল এবং কোম্পানীর অধিকৃত সমস্ত ভূসম্পত্তি ইংলণ্ডের রাজার অধিকারভুক্ত হইল। ভারতের রাজপ্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লর্ড ক্যানিং, ১লা নভেম্বর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এক রাজকীয় ঘোষণাপত্র জারি করিলেন। ঐ ঘোষণাপত্র ভারতের অধিকার-পত্র হইয়া দাঁড়াইল।

মহারাণী ঘোষণা করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবেন, কোম্পানীর নিয়োজিত কর্ম্মচারীদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে বাহাল রাখিবেন, কোম্পানীর সহিত রাজাদিগের যে-সব সন্ধি হইয়াছিল সেই-সব সন্ধি মান্য করিবেন, এবং স্বকীয় অধিকারসকল যেরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবেন, রাজাদিগের অধিকারও সেইরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবেন।

পুরাতন ভূস্বামীদিগের ভূসম্পত্তিতে স্বকীয় স্বত্বাধিকার বজায় থাকিবে (কোম্পানী উহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া ঐ সকল অধিকার চাষাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন) এইরূপ অঙ্গীকার করা হইল।

তাহার পর, মহারাণী ঘোষণাপত্রে এই কথাগুলি সংযোজিত করিলেন :—

"যে সকল কর্ত্তব্যের বন্ধনে, যে সকল দায়িত্বের বন্ধনে আমরা সমস্ত প্রজামণ্ডলীর সহিত আবদ্ধ, সেই একই কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের বন্ধনে আমরা ভারতরাজ্যের অধিবাসীদিগের সহিতও আবদ্ধ। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্য, ঐ সকল কর্ত্তব্য যথাযথরূপে ও ধর্ম্মতঃ পালন করিতে আমাদিগকে সমর্থ করিবে। খৃষ্টধর্ম্মের সত্যতায় আমাদের নিজের একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে, ঐ ধর্ম্মের সান্ত্বনা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস আমাদের কোন প্রজার উপর বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দিবার আমাদের কোন অধিকারও নাই, ইচ্ছাও নাই। আরও এই কথা আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, কোন বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাসের দরুণ কিংবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের দরুণ

কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করা হইবে না। পরন্তু সকলেই অপক্ষপাত-সহকারে ও সমানরূপে আইনের আশ্রয় লাভ করিবে; ইহাই আমাদের ইচ্ছা ও আদেশ। এবং আমাদের যাঁহারা প্রতিনিধি তাঁহাদের প্রতি আমাদের এই উপদেশ ও আদেশ যে, তাঁহারা যেন আমাদের কোন প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন—যদি করেন, তবে তাঁহারা আমাদিগের অপ্রীতিভাজন হইবেন.....আরও আমাদের এই ইচ্ছা যে, যতদূর সম্ভব, জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমাদের সকল প্রজাই অপক্ষপাত-সহকারে ও উদারভাবে আমাদের কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে।"

মহারাণী আরও ঘোষণা করিলেন যে, বিদ্রোহীদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিবেন যদি তাহারা ১৮৫৯ অব্দের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সরকারের হস্তে প্রত্যর্পণ করে এবং স্বস্ব গৃহে ফিরিয়া আইসে। কেবল যাহারা ব্রিটিশ প্রজাদিগকে হত্যা করিয়াছিল তাহারাই ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবে।

রাণীর অঙ্গীকারগুলি ইংলণ্ড রক্ষা করিয়াছেন। রাণী যে কার্য্যানুক্রমের রেখাপাত করিয়াছিলেন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে ইংলণ্ড তাহার অনুসরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

এই কার্য্যানুক্রমের পারম্পর্য্য পর্য্যালোচনা করাই আমাদের পক্ষে সুবিধা। প্রথমে সাধারণ রাষ্ট্রনীতি; তাহার পর, শাসনকার্য্য, সাময়িক বন্দোবস্ত, বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষা; পরিশেষে বৈষয়িক ও ভৌতিক উন্নতি।

১

অশোক ও আকবর যে কার্য্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের রাজবিধির দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই তৃতীয়বার,—ভারতের সমস্ত রাজ্য এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কোম্পানী রাজাদের সহিত যে সব সন্ধি করিয়াছিল সেই সন্ধির প্রভাবে রাজারা কোম্পানীর অধীনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানী রাজাদিগকে বিজিত শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিত, আশ্রিত বলিয়া জ্ঞান করিত না। তাহাদিগকে রক্ষা করা দূরে থাক্, কোম্পানী তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা করিত, এমন কি তাহাদিগকে বেদখল করিবার চেষ্টা করিত। তথাপি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজারা কোম্পানীর অনুগত ছিল, (১) অনেকে কোম্পানীকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিল। তাই, এই সব বিদ্রোহের গোলযোগ চুকিয়া গেলে, ইংলণ্ড স্বকীয় রাজশক্তির একটা নূতন পত্তনভূমি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ভারতের সমস্ত খণ্ডরাজ্য, দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য ও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত রাজ্য—সমস্তই এক সাম্রাজ্যের অধীনে আসিবে এবং তাহার অধিস্বামী হইবেন—ইংলণ্ডের অধিপতি।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এক বক্তৃতায় লর্ড ক্যানিং এই রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :

"দিল্লীর রাজবংশের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। পেশোয়ার উত্তরাধিকারের শেষ-দাবিদার অন্তর্হিত

(১) সিংহাসনচ্যুত রাজারাই বিদ্রোহের নেতা ছিল। সিংহাসনস্থ রাজারা সকলেই অনুগত অথবা উদাসীন ছিল। ইহার ব্যতিক্রমস্থল—সেই সব মধ্যমশ্রেণীর সামন্ত-ভূপতিগণ যাহাদের কু-শাসনের উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল।

হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরীই সমস্ত ভারতের অধিসম্বাদিত অধীশ্বরী এবং ইংলণ্ডের রাজশক্তিই ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি। এই সর্ব্বপ্রথম, ইংলণ্ড সমস্ত রাজাদিগের সম্মুখে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিস্বামিত্ব এক্ষণে এমন একটা বাস্তবতা লাভ করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখন করে নাই। ভারতের সমস্ত ভূপতিরা ইহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, সকলেই উহা আগ্রহের সহিত স্বীকার করিতেছে।"

আর এক স্থলে লর্ড ক্যানিং ঝটিকা-তাড়িত উত্তাল-সাগর তরঙ্গের বেগ-নিরোধক প্রাচীর-বাঁধের সহিত সমস্ত ভূপতিদিগের তুলনা দিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—

"যে সকল রাজা আমাদের অনুরক্ত তাহাদিগকে বজায় রাখিলে আমাদের সাম্রাজ্যের শান্তি কমিবে না, বরং আরও বর্দ্ধিত হইবে। যদি কখন বিদেশীয় শত্রুকর্ত্তৃক ভারতআক্রমণের আশঙ্কা হয়, যদি পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ইংরাজ-স্বার্থ ইংলণ্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করিয়া তুলে, তখন দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যগুলিই সাম্রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রক্ষা-দুর্গরূপে পরিণত হইবে।"

এই রাষ্ট্রনীতির ফলে লর্ড ড্যালহৌসির রাজবিধি রহিত হইল :—উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনে এবং উত্তরাধিকারের নিয়ম নির্দ্ধারণে রাজারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল কোন রাজার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লওয়া দূরে থাক,—ভারত-সরকার, প্রাচীন রাজবংশদিগকে স্বকীয় সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিয়াছেন; তাই, যে মহীশূর রাজ্যের শাসনকার্য্য ইংরাজেরা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেই মহীশূর-রাজ্য মহীশূরের প্রাচীন রাজবংশ পুনঃপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু রাজাদিগের দরবারে একজন করিয়া ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকেন এবং তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে এক একদল ইংরাজ-রক্ষীসৈন্য প্রহরীস্বরূপ অবস্থিতি করে। রাজারা আপনাদিগের মধ্যে কিংবা কোন এসিয়িক বা য়ুরোপীয় রাজশক্তির সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে পারেন না।

এক্ষণে ছোট বড় ৭০০ খণ্ডরাজ্য ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাজাদিগের রাজ্যের পরিমাণ, সমস্ত ভারতের এক তৃতীয়াংশ এবং উহার লোক সংখ্যা ৬৩,০০০০০।

ব্রিটিস সরকারের আশ্রয়ে থাকিয়া, এক্ষণে রাজারা ইংলণ্ডের অনুগত মিত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ভারতে ইংলণ্ডের যুবরাজের আগমন, সাম্রাজ্যের পরিষোষণা, রাণীর দুটি "জুবিলি", রাণীর মৃত্যু,—এই সব উপলক্ষে, খুব ধুমধামের সহিত রাজভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যখন রুশের সঙ্গে গোলযোগ বাধে, এবং তাহার পর, বোয়ার-যুদ্ধের সময়, চীন-অভিযানের সময়, সমস্ত রাজারা ইংলণ্ডকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য, শুধু জলন্ত মুখভারতী প্রভৃতি আনুগত্যের—বিশেষত প্রাচ্য রাজাদিগের আনুগত্যের তেমন সুদৃঢ় প্রতিভূ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় রাখা অধিকাংশ রাজাদিগের স্বার্থ। খুব কম রাজবংশই জাতীয় ভাবাপন্ন; প্রাচীন রাজবংশের সংখ্যা আরও কম। সমস্ত ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য নিজাম—একজন মুসলমান। তাঁহার এক কোটি হিন্দুপ্রজা

ভারতবাসীরা স্বকীয় রাজার প্রতি তেমন আসক্ত নহে। ইংরাজরাজশক্তির অধঃপতনে প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজবংশও যে সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ভারতেশ্বরের প্রতিনিধি ভাইস্‌রয় অধীন রাজাদিগের শাসনকার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখেন। জার্ম্মানীতে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, এতকগুলি আইন সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতিই প্রযুক্ত। ভারতের সেরূপ কোন সাধারণ আইন নাই, কিন্তু Sir Henry Maine একটী কথা ঠিক্ বলিয়াছেন—প্রত্যেক খণ্ডরাজ্যই, রাজার সহিত ভাইস্‌রয়ের আধিপত্য-অধিকারের একটা ভাগাভাগি আছে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সহিত খণ্ডরাজ্য সমূহের যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধির সর্ত্ত-অনুসারে প্রত্যেকেরই আধিপত্যের একটা অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড চান যে, রাজারা যথেচ্ছাচারীর ন্যায় প্রজাশাসন না করেন, পরন্তু স্ব স্ব প্রজাবর্গের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার রাজাদিগকে এইরূপ অভিভাষণ করিয়াছিলেন :—

"রাণীর প্রতিনিধিস্বরূপ আমি কতকগুলি কথা আপনাদিগকে পুনর্ব্বার বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছি—সে কথা আমার পূর্ব্বেও অন্যের নিকট আপনারা শুনিয়াছেন। মহারাণীর রাজসরকার আপনাদিগের নিকট এবং আপনাদিগের উত্তরাধিকারীদিগের নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছেন যে আপনারা আপনাদের প্রাচীন অধিকারসকল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে পারিবেন, এবং আইনবিরুদ্ধ না হইলে আপনাদের সমস্ত প্রচলিত প্রথা আপনারা স্বাধীনভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন। আপনাদের পদমর্য্যাদা ও বহুশতাব্দী হইতে আপনারা পুরুষানুক্রমে যে আধিপত্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য মহারাণীর রাজসরকার আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন।

কিন্তু এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আপনাদের আন্তরিক সাহায্য আবশ্যক। আমরা যেমন আপনাদের অধিকারসমূহের প্রতি—আপনাদের বিশেষ অধিকার সমূহের প্রতি—সম্মান প্রদর্শন করিতেছি, আপনাদিগের আশ্রিত প্রজাদিগের অধিকারাদির প্রতিও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা আপনাদের রাজশক্তি বজায় রাখিব, কিন্তু ইহার প্রতিদানস্বরূপ আমরা চাহি যে আপনারা ভাল করিয়া প্রজা-পালন করিবেন; আমরা চাহি যে, সমস্ত রাজস্থানে ন্যায়ধর্ম্ম ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্বাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ভ্রমণকারী সর্ব্বত্র নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পারিবে; কৃষিজীবী নিজ শ্রমের ফল, এবং বণিক নিজ বাণিজ্যের পণ্য-সামগ্রী অবাধে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। আপনারা রাস্তা প্রস্তুত করিবেন এবং যাহাতে করিয়া প্রজাবর্গের অবস্থার উন্নতি হয়, রাজস্বের বৃদ্ধি হয়—সেইরূপ জলসেচনপ্রণালী প্রভৃতি হিতকর অনুষ্ঠান রাজ্যের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবেন; শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহ দিবেন এবং রুগ্ন ও পীড়িতদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিবেন।

ইহা আপনারা নিশ্চিত জানিবেন, এই সকল কাজে আপনাদেরই লাভ হইবে। যদি আপনাদিগকে হীনবল করিবার আমাদের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে বলিতাম :—আপনারা দারিদ্র্যের মধ্যে, অজ্ঞতার মধ্যে, অরাজকতার মধ্যেই চিরকাল অবস্থিতি করুন। আপনাদিগকে শক্তিশালী দেখিতে ইচ্ছা করি বলিয়াই আমরা চাহি, আপনারা ধনশালী হউন, আপনাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হউক, সুশাসন প্রবর্ত্তিত হউক।

মহারাণী তাঁহার যে সকল প্রজাদের উপর ভারত-

শাসনের ভার দিয়াছেন, সেই প্রজাদিগের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। বিধাতা সেই সকল ভূপতিদিগকেই রক্ষা করেন, যাহাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নাই—সে লক্ষ্য প্রজাবর্গের হিতসাধন!

আমি এখানে কয়েক বৎসর মাত্র অবস্থিতি করিব। আমার নিকটে যে সকল সুদক্ষ ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী আছেন তাঁহারাও অনতিবিলম্বে ইংলণ্ডে চলিয়া যাইবেন, কিন্তু যে রাজশক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ আমরা এখানে আছি, সে রাজশক্তি শতশত বৎসরকাল তিষ্ঠিয়া থাকিবে। প্রতিদিনই এই সাম্রাজ্য আমাদের মহারাণীর সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বাষ্পীয় জাহাজ ও রেলপথ প্রতি বৎসর ভারতকে আরও গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিবার জন্য ইংলণ্ডকে সমর্থ করিতেছে। এই সকল বন্ধন লৌহের বন্ধন নহে, ইহা স্বর্ণময় প্রীতির বন্ধন, শান্তির বন্ধন। দিগ্বিজয়ের দিন চলিয়া গিয়াছে; এক্ষণে উন্নতির দিন আরম্ভ হইয়াছে।

রাজা, মহারাজা, আপনারা সোজাপথে অগ্রসর হউন। আপনাদের পুত্রপৌত্রদিগকে, আপনাদের প্রজাবর্গের উত্তরবংশীয়দিগকে এই ধ্রুব আশ্বাসবাক্য শুনাইয়া দিন যে, তাহারা এমন এক রাজশক্তির অনুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ করিয়াছে যে-রাজশক্তি তাহাদের মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চাহে না।" (২)

এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড মেয়ো তিনটি মূলসূত্র স্থাপন করেন। ভারত-সরকার এই তিনটি মূলসূত্রের অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রথম মূল সূত্রটী এই:—কোন রাজার আচরণে, ভাইস্‌রয়ের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হইলেও, মিতব্যবহার অবলম্বন করা উচিত; এইরূপ অবস্থায়, ভাইস্‌রয়, সেই রাজ্যের শাসনভার ইংরাজ বা দেশীয় মন্ত্রিদের হস্তে অর্পণ করিবেন; আবশ্যক হইলে সেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন, অথবা কোন উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদা রাজ্যের জন্য এবং ১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত কাশ্মীর রাজ্যের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মূলসূত্র:—যে সকল রাজ্যে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, সেই সকল রাজ্যের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পাইলে তবেই সেই রাজ্য সুপরিচালিত হওয়া সম্ভব। প্রায় সকল খণ্ডরাজ্যেই নিজের আইন আছে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকার আছে; তাহারা নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করে, কেহ কেহ পণ্যশুল্কও সংগ্রহ করে; ১৮৯৯ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত—সমস্ত সামন্ত রাজাদিগের রাজস্ব ১৫,৩০০,০০০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল ৬১৫,০০০ পৌণ্ড তাহারা ভারত-সরকারকে প্রদান করে। ঐ সময়ের মধ্যে, ঐ সকল রাজ্যের কার্য্যোপযোগী সৈন্য সংখ্যা ৮৬,০০০ ছিল। তা ছাড়া উহারা সাম্রাজ্যের সৈন্যমণ্ডলীকে ১৭,০০০ সৈন্য যোগাইয়াছিল। এই শেষোক্ত সৈন্য য়ুরোপীয় রীতি-অনুসারে অস্ত্রসমন্বিত ও সুশিক্ষিত।

কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের শ্রীবৃদ্ধিসাধন খুবই অসমানভাবে হইয়াছিল। নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর শালার-জং, হাইদ্রাবাদকে এসিয়ার সুলভ সামন্ততন্ত্র-রাষ্ট্র হইতে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছেন। মাধবরাও, পরম্পরা-ক্রমে ত্রিবাঙ্কুরে, গোয়ালিয়ারে ও বরোদায়

(২) Life of Lord Mayo by sir W. W Hunter p. 100.

যে শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইংরাজশাসিত ভারতের শাসন প্রণালীর অল্পই প্রভেদ লক্ষিত হয়। ভূপালের বেগমেরা স্বকীয় রাজ্যটিকে খুবই সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। (৩)

স্বকীয় কার্য্য সুসম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড মেয়ো আর একটি তৃতীয় মূলসূত্র স্থাপন করিলেন। সেই মূলসূত্র ভাবী ভূপতিদিগের সুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা। তিনি কাথেওয়ারের রাজাদিগের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং রাজপুত রাজারা স্বয়ং আজমীরের মেয়ো কলেজ স্থাপনের জন্য ৭০,০০০ পৌণ্ড চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন (৪)। কিন্তু এমনও অনেক রাজা আছে যাহারা তরুণ বয়সে অন্তঃপুরের ভোগ বিলাসে হীনবীর্য্য হইয়া রাজ্য শাসন করিতেও অসমর্থ, পুত্র উৎপাদনেও অসমর্থ।

মোটের উপর বলিতে গেলে, ঊনবিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, দেশীয় রাষ্ট্রসমূহে যে রূপান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় সভ্যতা ও প্রাচ্য সভ্যতার অনুকূলে শুভ-সূচনা করা যাইতে পারে। ১৮৫০-এর পূর্ব্বে, সামন্ত রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান রাজ্যগুলি নিরঙ্কুশ ও নিষ্ঠুর বিদেশী সৈনিক-দলের অনুগ্রহাধীন ছিল, এবং তদন্তর্ভুক্ত হিন্দুরাজ্যগুলিও ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবাধীন ছিল;—ব্রাহ্মণেরা তাহাদের মধ্যে নানাবিধ মূঢ় সংস্কার এবং নিতান্ত স্থূল ও দুর্নীতিজনক অনুষ্ঠানাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

ঐ সমস্ত রাজ্যের রাজারা ভোগসুখে, ষড়যন্ত্রে, কুচক্রে, বিদ্রোহে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; ঐ সমস্ত রাজ্যে, নিষ্ঠুর দণ্ডাদি প্রচলিত, প্রজারা করভারে নিষ্পেষিত, রাজদরবারের বিলাসিতায় ও রাজবল্লভদিগের ধনগৃধ্নুতায় রাজকোষ ক্ষয়গ্রস্ত। না-ছিল রাস্তা, না-ছিল খাল, না-ছিল ডাকের বন্দোবস্ত, না-ছিল পুলিস। আজকাল অনেক রাজাই শিক্ষিত হইয়াছে, এবং প্রায় সকল রাজ্যই সুশাসিত হইতেছে। এখন ঐ সকল রাজ্যে রেল-পথ, ডাক,

(৩) সর-সালার জং (১৮২৯—৮৩), তাঁহার পিতৃব্যের উত্তরাধিকারীস্বরূপ, নিজামের প্রধান মন্ত্রীপদে (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হন। এতদিন ইংরাজেরা বেরার প্রদেশের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া উদ্বৃত্ত রাজস্ব নিজামকে দিতেছিলেন, এক্ষণে সর সালার জং সেই বেরার ইংরাজকে একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। (১৮৫৩) রাষ্ট্রিক সামাজিক আর্থিক সংস্কার সাধন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ-সরকারকে, আনুগত্য সহকৃত সাহায্য প্রদত্ত হয়। নিজামের মৃত্যুতে তিনি প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা (১৮৬৯)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রা। (১৮৭৬) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু।

মাধবরাও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৪ হইতে ১৮৭২ পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান; গোয়ালিয়ারে প্রধানমন্ত্রী; ১৮৭৫ হইতে ১৮৮৩ পর্য্যন্ত বরোদার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনীতিকুশল সচিবদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গোয়ালিয়ারের দিনকররাও, জম্মুর কৃপারাম, আলোয়ারের পণ্ডিত মানফল, কোল্‌হাপুরের মাধোরাও বারোএ, এবং মহীশূরের পুর্ণিয়া। (Sir Richard Temple India id 1880 p 76) দ্রষ্টব্য

(৪) রাজকোটের রাজকুমার-কলেজ, ইন্দোরের ডালি-কলেজ, লাহোরের এচিসন-কলেজ—এইগুলা উল্লেখযোগ্য। এই সকল কলেজের ছাত্র সংখ্যা সর্ব্বসমেত দুইশতের উপর।

টেলিগ্রাফ স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্যের অধিবাসীরা ও ভ্রমণকারীরা এখন নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে। রাজকর বেশী নহে, দুর্ভিক্ষাদি সত্ত্বেও সেখানে বৈষয়িক ও ভৌতিক উন্নতি স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট, ভারতকে একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন। ভারতের নিজস্ব অভাবপ্রয়োজন, ভারতের নিজস্ব রাষ্ট্রনীতি। এই নূতন অবস্থার দরুণ, একটা নূতন নামের প্রয়োজন হইল। ১৮৭৬ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহারাণী "কাইজার-ই-হিন্দ" অর্থাৎ ভারত-সাম্রাজ্ঞী এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। (৫)

এক্ষণে ভারত-সাম্রাজ্য, একটা সাম্রাজ্য-সাধারণ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে চাহিলেন। পূর্ব্বদিকে উচ্চ ব্রহ্মদেশঅধিকার; যুন্নামের পশ্চিমে যাহাতে ভারতের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশে চীনের সহিত সন্ধিস্থাপন; যে-শ্যামদেশের পশ্চিম উপকূল ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত, সেই শ্যামদেশে নানা ষড়যন্ত্রের প্রতিবিধান; উত্তরে,—আসাম, হিমালয় ও কাশ্মীরের রক্ষী-সৈন্যেরা তির্ব্বত পর্য্যন্ত ঠেলিয়া চলিয়াছে; পশ্চিমদিকে চিত্রল-বিজয়, বেলুচি-স্থানে রেলপথ নির্ম্মাণ। পারস্যদেশে কতকগুলি গ্রাম এবং পারস্য-উপসাগরে কতকগুলি দ্বীপ অধিকার-করা; বৈদ্যুতিক রজ্জুর দ্বারা, কারাচির সহিত আরব্য উপকূলের যোগ-বন্ধন; Keweitএর সুল্‌তানের সহিত মৈত্রীবন্ধন; পারস্যদেশের একটা বৃহৎ টেলিগ্রাফ-লাইনের কার্য্যভার এক ইংরেজ-কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ; পরিশেষে, ভারত-উপনিবেশ এডেনের বিস্তার সাধন;—১৮৯৮ পর্য্যন্ত এই এডেন-উপনিবেশ, সোমালিদিগের উপকূলকে আপন আশ্রিতের ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।

অতএব, ভারতের ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য, ভারতীয় ক্রমবিকাশের একটি লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। ইংরেজেরা যাহাকে "ব্রিটানিকী শান্তি" (Pax Britanica) বলিতে ভাল বাসেন, ইংরেজ-সরকার ভারতকে সেই শান্তি এবং সেই শান্তির সঙ্গে—যে-একতাসাধনের চেষ্টা দ্রুশ শতাব্দী কাল ব্যর্থ হইয়াছিল সেই রাষ্ট্রীয় একতার প্রদান করিয়াছেন। ভারতে এই সময় খণ্ডরাষ্ট্র লইয়া সমগ্র একটি রাজ্য গঠিত হয় নাই, পরন্তু একটি রাষ্ট্রসমবায় (confederation) গঠিত হইয়াছে। ঐ সম্মিলনের ফলে, ঐ সকল রাজ্যের অধিবাসীগণ স্বাধীনতা হইতেও বিচ্যুত হয় নাই, স্বকীয় নিজত্ব হইতেও বিচ্যুত হয় নাই। তাছাড়া, এই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ভারতকে এসিয়ার মধ্যে একটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের দিগ্বিজয়, ব্রিটিশ ভারতের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে, এসিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি অভিনব তথ্য। মোগল-অভিযানের শেষ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এসিয়ার লোকেরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। একটা এসিয়া-সাধারণ রাষ্ট্রনীতি

(৫) ভারত সাম্রাজ্যের নিজস্ব পতাকা—নীল কাপড়ের উপর, ভারত-তারকা; কিন্তু সরকারী বিশেষ কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে প্রায়ই ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলিত হইয়া থাকে।

ছিল না। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারত ও জাপান উভয়েরই এক একটা নিজস্ব লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাহা য়ুরোপকে গণনার মধ্যে আনিতেই হইবে। কেননা, জাপান স্বাধীন এবং ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত হইলেও ভারতগভর্ণমেণ্টেরও কতকগুলি নিজস্ব উচ্চাভিলাষ আছে। সেদিন নিশ্চয়ই বেশী দূরবর্ত্তী নহে যেদিন ভারতীয় লোকমত উহার কতকগুলি অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য দাবী করিবে। (৬)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন

ফ্রেডারিক নিট্‌শে

ফ্রেডারিক নিট্‌শের নাম আজ সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুই-এক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে নিট্‌শের নাম শুনিয়াছে এমন-লোক খুব কম দেখা যাইত। কিন্তু আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যে যখন-তখন নিট্‌শের নাম ও মত লইয়া আলোচনা চলিতেছে, সুতরাং এ সময় তাঁহার জীবনের দুই-চারিটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের স্যাক্সনী প্রদেশে, লুটজেন নামক সহরের কাছে ফ্রেডারিক নিট্‌শে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাদরির সন্তান। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে একটি বৃত্তি পাইয়া তিনি 'পোর্টা'র স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হন। দুই বৎসর পরে তিনি সেখানে 'জার্ম্মেনিয়া ক্লব' নামে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে মাসে একবার করিয়া সভ্যগণ পরস্পরে কবিতা, প্রবন্ধ, স্থাপত্য-পরিকল্পনা ও সঙ্গীত রচনা লইয়া আলোচনা করিতেন। জীবনের প্রথম হইতেই নিট্‌শের বিশ্বাস ছিল যে, ললিত-কলামাত্রই মানবাত্মার প্রকাশ, সেই জন্য আর্ট তাঁহার কাছে সাধারণ 'ক্যল্‌চার' বা তুচ্ছ আনন্দের সামগ্রী ছিল না।

কিছুদিন পরে তিনি "বন য়ুনিভার্সিটি"তে ভাষাতত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চোখ খারাপ থাকিলেও, তাঁহাকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে হয়। সামরিক বিভাগে বৎসরকাল কাজ করার পর হঠাৎ একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটায় তিনি সৈন্যদল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। এই সময়ে তিনি

(৬) এ পর্য্যন্ত ভারতীয় লোকমত দিগ্‌বিজয়ের প্রতিকূলে বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ-অধিকারের প্রতিকূলে ছিল। এই সকল দিগবিজয়ের ফলে, ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্ম্মের সংখ্যা বাড়িয়া যায়—সুতরাং কতকগুলি বাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় সংস্কার ঠেলিয়া রাখিবার পক্ষে ইংরাজেরা বেশ একটা যুক্তি দেখাইতে পারে। কিন্তু যখন ভারতে একটা ভারতীয় রাষ্ট্রবুদ্ধি গঠিত হইবে, তখন ভারতবাসীরাই জাপানীদের ন্যায় রাজ্য বিস্তার-নীতির পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে। এক্ষণে এই স্বদেশীয় রাষ্ট্রবুদ্ধি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

'বাস্‌লে'তে ভাষা-তত্ত্বের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন।

নিট্‌শে এখানে ভাষাতত্ত্বের উপর যে সকল বক্তৃতা দিতেন, শ্রোতৃবর্গ তাহাতে একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। শব্দের কস্‌রৎ না দেখাইয়া, 'হোমারিক' যুগ ও 'গ্রীক ক্যল্‌চারকে' ভিত্তি করিয়া তিনি এক নবধর্ম্ম প্রচার করেন। সুখ ও দুঃখ এবং অবহেলা ও তাচ্ছল্যের নিদারুণ আঘাতেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের এই নূতন মত হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। অবশেষে তিনি উন্মাদরোগ-গ্রস্ত হন্ এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লুট্‌যেন সহরে সন্ন্যাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিট্‌শের বিশ্বাস ছিল যে, আধুনি খৃষ্টধর্ম্মে দুর্ব্বলতার পূজা করা হয়। সঙ্গীত ওয়াগনারের ইচ্ছা ছিল,—যে খৃষ্ট মানুষের আপনি ব্যথা-বেদনা সহিয়াও মানুষকে উচ্চ আনন্দলোকে তুলিয়াছেন, সেই খৃষ্টের যাহাতে অথও হইয়া উঠিতে পারে,—নি সেই চেষ্টা করিবেন। ওয়াগনারের এ কল্পনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিট্‌শে "Th Anti-Christ" ও "The Case Against Wagner" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন "Thus Spake Zarathustra নাম গ্রন্থে তিনি তাঁহার বিখ্যাত মহামান (Superman) ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নরশক্তি সাফল্যের আলোচনা করিয়াছেন।

—T. P.'s Magazine হইতে

আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার অপূর্ব্বত্ব

একালে অস্ত্র-চিকিৎসায় আমেরিকাই পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। ডাঃ উইলিয়ম জে, মেয়ো ও ডাঃ চার্লস এইচ মেয়ো নামক ভ্রাতৃযুগলের অস্ত্র-চিকিৎসা দেখিবার জন্য য়ুরোপ হইতে আমেরিকায় দলে দলে লোকজন আসিয়া থাকে। ডাঃ হার্ভে কাসিং মস্তিষ্কের অস্ত্র-চিকিৎসায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ডাঃ অলেক্সিস কারেল জাতিতে ফরাসী হইলেও আমেরিকায় বাস ও চিকিৎসা করেন।

আমেরিকার অস্ত্র-চিকিৎসকগণ মানুষের অঙ্গহীনতা দূর করিয়া চিকিৎসাজগতে যুগান্তর আনিয়াছেন। তোমার হাতের কোন আঙ্গুল যদি, হাত হইতে ছিঁড়িয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার গুণে সে কাটা আঙ্গুল পুনরায় বেমালুম যোড়া লাগিতে পারে। হৃৎপিণ্ড আহত হইলে সাধারণ ক্ষতের মত সে স্থানটি অনায়াসে সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। মস্তিষ্কের মধ্যে স্বাধীনভাবে ছুরি চালাইতে আমেরিকার অস্ত্র-চিকিৎসকেরা একটুও ইতস্ততঃ করেন না। এক দেহের অঙ্গবিশেষ এখন অনায়াসে অন্য দেহে যুড়িয়া দেওয়া যায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক নিগ্রো বালকের বুকে কেহ ছুরি মারে। ছুরির ফলা বালকের

পিণ্ডের মাঝখানে বরাবর ঢুকিয়া গিয়াছিল। লককে যখন অস্ত্র-চিকিৎসার টেবিলের র শোয়ানো হইল, মৃত্যু তখন তাহার রে। এমন কি, তাহার পা-দুইটিও তখন ণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের উপর র্জ্জনরা ছোট গবাক্ষের মত একটি ছিদ্র রিলেন। সেইখান দিয়া ক্ষত-স্থান দেখা ইতে লাগিল,—নাড়ীর প্রতি স্পন্দনে কাটা য়ে তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরিতেছিল। কজন সার্জ্জন বুকের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া য়া হৃৎপিণ্ডটাকে টানিয়া উপরে তুলিয়া রিলেন, এবং ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া লেন। এই অস্ত্র-চিকিৎসা পঞ্চান্ন মিনিটকাল ায়ী হইয়াছিল। বালকটি কিছুদিনের ধ্যে একেবারে আরোগ্য লাভ করিল।

যদি কাহারও গায়ের চাম্‌ড়া পুড়িয়া বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, সার্জ্জনরা তাহা হইলে অন্য কোন লোকের কাটা হাত- া বা কোন সদ্য-মৃত লোকের গা হইতে চামড়া খুলিয়া আনিয়া তথায় লাগাইয়া দেন। জনস্ হপকিন্স য়ুনিভার্সিটির ডাঃ জন ষ্টেজ ডেভিস্ এশ্রেণীর অস্ত্র-চিকিৎসা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখন চিকিৎসক-মহলে এ পদ্ধতিটা খুব চলিয়া গিয়াছে।

রকফেলার ইনষ্টিটিউটের ডাঃ অলেক্সিস কারেল অঙ্গহীনতা দূর করিবার জন্য অপর দেহ হইতে অঙ্গবিশেষ কাটিয়া আনিয়া অঙ্গহীন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলেন। এ কাজে তাঁহার মত দক্ষতা পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। তিনি যে শুধু জীবিত বা সদ্যমৃত লোকের দেহ হইতেই প্রয়োজনীয় অঙ্গ কাটিয়া লন, তাহা নহে; তিনি নরদেহের নানা অঙ্গ পূর্ব্ব হইতেই কাটিয়া মাসের পর মাস ধরিয়া এমন কৌশলে তাহা জিয়াইয়া রাখেন যে, সে-সকল বিচ্ছিন্ন অঙ্গের মধ্যে পেশী ও শিরার কাজ সমান জীবন্তভাবেই চলিতে থাকে! পরে প্রয়োজন হইলেই এই-সকল অঙ্গ তিনি রোগীর দেহে যুড়িয়া দেন! (সম্প্রতি ফ্রান্সের রণক্ষেত্র হইতে খবর আসিয়াছে, গোলার আঘাতে একজন সেনাপতির বাহু উড়িয়া যাওয়ায় ডাঃ কারেল এক মরণোন্মুখ সৈনিকের হাত কাটিয়া লইয়া সেনাপতির কাঁধে যুড়িয়া দিয়াছেন।)

—The World's Work হইতে

কলাবিদের আদর্শ

য়ুরোপের শিল্পীরা সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া কাজ করেন, এ কথা বোধ করি সকলেই জানেন। জগতের রাজপথে মৌন মানসী প্রতিমাকে আমরা সকলেই দেখিতে পাই, কিন্তু সে প্রতিমাকে যে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, সে চিরদিন পর্দ্দার আড়ালেই থাকিয়া যায়, আমরা তাহাকে অনুমান করিতে পারি, অনুভব করিতে পারি না।

শিল্পীরা স্ত্রী-আদর্শকে যতখানি কদর করেন পুরুষ-আদর্শকে তত করেন না। ইহার কারণ, স্ত্রী-আদর্শের দুর্লভতা। সুগঠন ও সুশ্রী স্ত্রী-আদর্শ শিল্পীর ভাগ্যে সহজে জুটে

না ; পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে এজন্য বড়ই বেগ পাইতে হইত, কিন্তু আজকাল "The Artists' Model's Club" স্থাপিত হওয়াতে তাঁহাদের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। এখানে আদর্শের যোগ্য বহু রমণী একসঙ্গে বসবাস করেন এবং শিল্পীরা এখান হইতে আপনাদের পছন্দমত আদর্শ বাছিয়া আনিতে পারেন।

শিল্পীর আদর্শ হইয়া জীবন কাটাইতেছেন, এমন এক রমণী এইভাবে আপনার কথা বলিয়াছেন :—

"আদর্শের জীবন সুখের নয়। ফুলের বিছানায় শুইয়া এ কাজ চলে না—এ কাজ বড় দুঃখের কাজ। ধর, তোমাকে ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে। ঘণ্টায় দশ মিনিট করিয়া তুমি বিশ্রামের অবকাশ পাইবে। এই ছয়ঘণ্টা কাল, (বিশ্রামের সময় ছাড়া) তোমাকে এক ভঙ্গিমায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, মাথা একটু উঁচু কি নীচু করিলে চলিবে না—কারণ, তাহা হইলে তোমার ভবিষ্যৎ খারাপ হইয়া যাইবে!

লণ্ডন সহরে আমরা এইরূপ রোজগার করি :—

শিল্পী যখন শুধু আমাদের মাথাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন, তখন বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত খাটিয়া আমরা পাঁচ শিলিং পাই। ঘণ্টা-হিসাবে ধরিলে ঘণ্টায় এক টাকা।

শিল্পী যখন আদর্শের সর্ব্বাঙ্গ নকল করেন, তখন দশটা-চারিটা খাটিয়া সাত শিলিং পাওয়া যায়। তাহা হইলে ঘণ্টা-হিসাবে দাঁড়াইল, ঘণ্টায় এক শিলিং ছয় পেন্স।

যে-সকল রমণী খুব বেশী খাটিতে পারেন, তাঁহাদেরও আয় বছরে আশী পাউণ্ডের বেশী নয়। তবে যদি কোন রমণীর গড়ন বেশ ভাল



কলাবিদের আদর্শ

য়, মুখের ডৌল বা হাত-পা খুব সুন্দর হয়, তবে তিনি আপনার দাম চড়াইতেও পারেন। কারণ, আদর্শ অসাধারণ হইলে শিল্পী একেবারে বহি যান এবং টাকা খরচ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না।

শরীর ভাল রাখিবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হয়। সারাদিন আদর্শরূপে স্থির থাকিয়া আমরা এমন শ্রান্ত হইয়া পড়ি যে বায়ুসেবন বা শারীরিক ব্যায়ামের জন্য আমাদের মনে মোটেই কোন



কলাবিদের আদর্শ

উৎসাহ থাকে না ; অথচ ব্যায়াম না করিলে ও খোলা হাওয়ায় না বেড়াইলেও চলে না। আবার বেশী খাইলে মোটা ও কম খাইলে রোগা হইবার ভয়ও আছে। সুতরাং এদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আদর্শের দেহে 'প্ল্যাষ্টারে'র প্রলেপ দিয়া শিল্পীরা আদর্শকে নিজেদের মনের মত করিয়া লন। গায়ে এই কাদার প্রলেপ মাখাটা বড় কষ্টকর ব্যাপার। আমার মনে আছে, আমি যেদিন সর্ব্বপ্রথম আদর্শের জন্য বসি, সেদিন কেবল আমার গলা ও বুককে আদর্শ করা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার দম আটকাইয়া আসিতেছে! তাড়াতাড়ি ভয়ে আমি সমস্ত প্রলেপ গা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। অবশ্য দুই-চারদিনের অভ্যাসে এ-সব কষ্টবোধ আর থাকে না।

আমরা কাজ পাই দুই-জায়গায়। এক শিল্প-বিদ্যালয়ে আর এক শিল্পীর গৃহে। আমাদের মধ্যে অনেকে শিল্প-বিদ্যালয়ে গিয়া কাজ করিতে রাজি হয় না ; কারণ, এখানকার কাজে কষ্ট বেশী। আমি কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজই পছন্দ করি। এখানে কষ্টের মাত্রা বেশী হইলেও, টাকাটা বেশ নিয়মিতরূপেই পাওয়া যায়।

শিল্পীদের গৃহে কাজ করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা আত্ম-সম্মানে আঘাত পাই। এক-একজন শিল্পী আছেন, যাঁহারা আমাদিগকে প্রাণশূন্য

পাষাণ প্রতিমা বলিয়া মনে মরেন। তাঁহারা ভাবেন, নির্দ্দয় বাক্যে আমাদের মনে ব্যথা লাগে না, অবসাদ বলিয়া কোন-কিছু আমাদের ভিতর নাই।

যাঁহারা কর্ম্ম দেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেক দয়ালু ও হৃদয়বান শিল্পীও দেখিয়াছি। আমাদের দলে যাহারা গরীব, তাহারা দুঃখ-কষ্টে বা অসুখে পড়িলে, অনেক সহৃদয় শিল্পী তাহাদিগকে সাহায্য দান করেন। প্রয়োজন হইলে আমরাও অনেক দরিদ্র শিল্পীকে সাহায্য করিয়া থাকি। আদর্শের জন্য বলিয়া আমরা তাঁহাদের কাছ হইতে পয়সা-কড়ি কিছু লই না।

আমাদের অনেকে শিল্পীর আদর্শ হইবার শক্তি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়। তাহারা শিশুকাল হইতেই একাজে আশ্চর্য্য নিপুণতার পরিচয় দেয়।"

—The London Magazine হইতে

প্রাচ্য চিত্রকলা

"বোষ্টন মিউজিয়ম অফ্ ফাইন আর্টসে" সম্প্রতি পারস্য, আরব ও ভারতীয় চিত্রাবলী এবং সচিত্র পুস্তক-প্রচ্ছাদনী ও চিত্র-বিচিত্র পুঁথির এক চমৎকার প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ডেনম্যান ডব্লু রস পৃথিবী-পর্য্যটনে বাহির হইয়া প্রাচ্য চিত্রকলার এই সকল নমুনা যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। ফ্রান্সে গত কয় বৎসর ধরিয়া যে-সকল পারস্য ও ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হইতেছিল, বোষ্টন মিউজিয়মে এইসঙ্গে সেগুলিকেও দেখানো হইতেছে।

এই প্রদর্শনীর যে বিশেষ একটা মূল্য আছে, সে কথা বলা বাহুল্য। দশম হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, প্রাচ্য চিত্রমালা ও হস্তলিপি রচনার যত-রকম পদ্ধতি দেখা যায়, এই প্রদর্শনীতে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম যুগের পারস্য-চিত্রে তুর্কী ভঙ্গীর ছাপ্ বড় স্পষ্ট। পঞ্চদশ শতাব্দীর শিল্পে চীনদেশের প্রভাব পড়িয়াছে। কারণ, তৈমুর লংএর রাজত্ব-কালে চীনদেশ পারস্যের সংস্রবে আসিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পারস্য-কলার নক্সা ও রংফলানো একেবারে খাঁটি—পরদেশী রীতি-পদ্ধতির আঁচটুকু পর্য্যন্ত তাহার উপর পড়ে নাই। এই সময়ের ছবিগুলিতে বিচিত্র বর্ণের অভিরাম লীলা দেখিলে মন মজিয়া যায়। আর তাহাদের রেখার কারিগরীও সুন্দর! চিত্রকরেরা সমসাময়িক যুগের উৎসব, যুদ্ধ, রাজসভা ও ঘর-সংসারের দৃশ্য অঙ্কন করাতে, তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচ্য কলায় ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতির প্রাধান্য দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল রাজত্বকালে ভারতীয় চিত্রকলা উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ভারত শিল্পে রাজা-মহারাজার মূর্ত্তি-চিত্রই সকলের চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহাদের রেখাপাত ও বর্ণ-রঞ্জনেও যথেষ্ট লালিত্য আছে; এবং বিশেষ করিয়া

উল্লেখযোগ্য তাহাদের সূক্ষ্ম নক্সা এবং চমৎকার স্বভাবানুগামিতা।

"Hydraulic Automata" নামক বিখ্যাত পুঁথির সচিত্র পত্রগুলিও অল্প



একটি যুবার ছবি
(ভারত পারস্য অঙ্কন পদ্ধতি)

চিত্তগ্রাহী নহে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে তাহার অঙ্কনকাল আরম্ভ হইয়াছে। এই পুঁথিখানি কনস্তান্তিনোপলে আবিষ্কৃত হয় এবং এ ধরণের পুঁথির মধ্যে এইখানিই না কি প্রথম! পুঁথির বারোখানি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে যে-সকল মূর্ত্তিপট আছে, তাহার মধ্যে "পুষ্পধারী যুবকে"র ছবিখানি অন্য সকলগুলিকেই হার মানাইয়াছে। ইহার রেখামালার কোমলতা, সোনালি রংমাখানো নীল পোষাকের উজ্জ্বলতা এবং সমগ্র রচনার সৌন্দর্য্য ও সরলতা, সপ্তদশ শতাব্দীর পারস্যদেশের ওস্তাদ-পটুয়া আগা মিরাককে মনে করাইয়া দেয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্রের মধ্যে, সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত-পারস্য রচনা-পদ্ধতির সংমিশ্রণে যে যুবকের পটখানি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে উপভোগ্য। এই ছবিটি দেখিলে প্রাচীন ইতালীয় রচনা-পদ্ধতির কথা স্মরণ হয়।

—Art and Progress হইতে

পুরুষ ও রমণীর মন

চরিত্র হইতেছে মানস-বস্তু। রমণীর সাধারণ চরিত্র পুরুষ-চরিত্র হইতে ভিন্ন। হিমান্স এবং উইর্‌স্‌মা নামক দুইজন জার্ম্মান প্রোফেসর, এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এক এক বিষয় ধরিয়া অনেক প্রশ্ন করিয়া তাঁহারা পুরুষ ও রমণীদের উত্তর চাহিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সকল উত্তর দেখিয়া তাঁহারা মোটামুটি একটা মীমাংসা করিয়াছেন।

নর-চরিত্রে নিম্নলিখিত গুণগুলির অধিক

বিকাশ হয়। তাহারা অধীনস্থ লোকের প্রতি সদয়, হাস্যরসে সিদ্ধ, সমালোচনায় উৎসুক, নিয়মিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তর্কপ্রিয় ও খেলাধূলা ভালবাসে। পুরুষ স্বাধীনতাপ্রার্থী, টাকা রোজগার করিতে চায়, শোক-দুঃখ সহজে ভুলিয়া যায়, যাহা পড়ে তাহা ঠিকঠাক মনে রাখিতে পারে, এবং নানা বিষয় লইয়া স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া করে।

নারী-চরিত্রে নিম্নলিখিত গুণগুলির চর্চ্চা হয় বেশী। তাহারা পরিশ্রমী, আবেগময়, মিছা সাজসজ্জা করিতে চাহে, ধৈর্য্যশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, আত্মীয়তায় নিপুণ, সহমর্ম্মী, এবং লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার করিতে উৎসাহী। তাহারা হঠকারী, মিতাচারী, বৈচিত্র্যের অভিলাষী, অল্পেই উত্তেজিত হয় এবং লক্ষ্যহীন বাজে কাজে পুরুষ অপেক্ষা সমধিক মনোযোগী।

যে-সকল ইন্দ্রিয় দিয়া আমরা বহিঃ প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করি, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়গুলির কাজও একরূপ নয়। পুরুষের চেয়ে রমণীর স্পর্শশক্তি অধিক প্রখর। রমণীরা প্রায়ই সুরান্ধ হয় না; অর্থাৎ দুটি সুরের পার্থক্য তাহারা সহজেই ধরিতে পারে। রাগ-রাগিণীর প্রভেদ তাহারা যেমন বুঝিতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না।

বর্ণান্ধতা সম্বন্ধেও সেই কথা। শতকরা চারিজন পুরুষ বর্ণান্ধ। তাহারা উজ্জ্বল লোহিত এবং উজ্জ্বল সবুজের বিভেদ মোটেই টের্ পায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র বর্ণান্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, রমণীরা বর্ণান্ধ নহে, তথাপি সন্তানের [illegible] তাহারাই বর্ণান্ধতা সঞ্চারিত করে। [illegible] কোন বর্ণান্ধ পুরুষের ঔরসজাত সন্তান বর্ণান্ধ হয় না; কিন্তু স্বামী বর্ণান্ধ না হইয়া যদি পত্নী বর্ণান্ধ হয়, তবে তাহার গর্ভজাত সন্তানও বর্ণান্ধ হইবে। আবার সন্তানদের ভিতর যাহারা পুরুষ, তাহাদের সন্তানেরা বর্ণান্ধ হইবে না, কিন্তু তাহারা রমণী তাহাদের গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে বর্ণান্ধতা থাকিবে।

অনেক সময় খবরের কাগজে পড়া যায় যে, অমুক ব্যক্তি [illegible] সামান্যরূপে আহত হইয়াও (ধরুন, হাঁটু কাটিয়া) রক্তস্রাবের ফলে মরিয়া গিয়াছে। রক্তের মধ্যে এমন একরূপ পদার্থ আছে যে, রক্তস্রাব বাতাসের সংস্পর্শে আসে, উক্ত পদার্থ তখন রক্তকে ঘনীভূত করে। যাহার শোণিতে ঐ পদার্থ নাই, সামান্য আঘাতে রক্তপাতের ফলে তাহারই মৃত্যু হয়। এই পীড়াটিও রমণীর দ্বারা গর্ভজাত সন্তানের দেহে সংক্রামিত হয়।

এ যুগে মানুষের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি কমিয়া গিয়াছে। নানারূপে জ্ঞান লাভ করি বলিয়া আমরা চোখ দিয়া দেখিয়া সকল জিনিষকে জানিবার চেষ্টা করি না। সমুদ্রগামী জাহাজের সমস্তটা আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখি না। কতকটা চোখে দেখি, বাদ-বাকী সমস্ত পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা সারিয়া লই। অসভ্য মানব বা পশুপক্ষীরা সকল জিনিষ সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে; এদিকে রমণীরাও এদিকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্মৃতিশক্তি আছে, দুই-প্রকার। এক,—অর্থহীন জিনিষ মনে রাখিতে পারা। যেমন, কথা, অঙ্ক, নাম ও সংখ্যা প্রভৃতি। কোন লোকের নামে কিছু মানে থাকে না; আর [illegible] মনে রাখিতেও মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না; ময়না পাখীর বুলি-পড়া এই-রকম। দ্বিতীয়ঃ—কোন ভাব মনে রাখিতে [illegible] এমন অনেক পণ্ডিত লোক দেখা যায়, যাঁহারা বন্ধুবান্ধবের নাম বা [illegible] কোন্ তারিখ তাহা মনে রাখিতে [illegible] না। অথচ অনেক গণ্ডমূর্খ এ-সব বিষয়ে পণ্ডিতকে টেক্কা দিতে পারে। কিন্তু ভাব মনে রাখাই শক্ত কথা। বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকের কতগুলা কথা স্মরণ রাখিয়া কিছু লাভ নাই। বড় বৈজ্ঞানিকেরা সেই পুস্তকের পরীক্ষা-পদ্ধতি ও ভাবপুঞ্জই স্মরণ রাখেন। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, পুরুষেরা সাধারণতঃ ভাবই স্মরণ রাখে; কিন্তু রমণীদের বেশী মনে থাকে বাক্য।

এই স্মৃতিশক্তির বিচার দ্বারা বলা যায়, মানসিক বিচার-শক্তিতে রমণী অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা অধিক। আবার, পুরুষের যতটা বিশ্লেষণ-ক্ষমতা আছে, রমণীর ততটা নাই।

—Pearson's Magazine হইতে

নৃত্য-কাব্যের কথা

জ্যৈষ্ঠে [illegible] ভারতীতে রুশ-নৃত্যের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছিল। গতবারের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী আনা পাভলোভা-কথিত একটি প্রবন্ধের স্থলবিশেষ উদ্ধৃত হইল।

"প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে রুশ সম্রাটেরা আপনাদের প্রজাগণকে নৃত্য-কলা শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ইতালী, ফ্রান্স বা স্পেন দেশে যখনই কোন নূতন নট নাম কিনিয়াছেন, তখনই তাঁহারা রুশরাজ্য হইতে আমন্ত্রণ-পত্র লাভ করিয়াছেন। ফলে, আমাদের জাতীয় নৃত্যকলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিদেশী কালোয়াতদের ভাল দিকটাও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

বর্ত্তমান সম্রাটের তত্ত্বাবধানে রুশদেশের জাতীয় নৃত্য-বিদ্যালয় অতিদ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। 'অপেরা হাউস', 'ফ্রেণ্ড থিয়েটার' ও নৃত্য-বিদ্যালয়ের পরিপোষণের জন্য রুশ-সম্রাট প্রতি বৎসর ষাট লক্ষ টাকা খরচ করেন! নৃত্যবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সর্ব্বদা সাবধানে চোখে-চোখে রাখা হয়; শিক্ষকেরাও খুব যত্নের সহিত শিক্ষা দেন। সে শিক্ষার কঠোরতাও বড় অল্প নহে। আমাদের জীবনের সহিত নৃত্য-কলা এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, দেশের ছোটখাটো বিদ্যালয়গুলি পয়সার

অভাবে উঠিয়া যায় না,—বড় বড় ওস্তাদেরা সেখানে গিয়া বিনামূল্যে শিক্ষা দিয়া তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেন।

রুশেরা নৃত্যকলা দ্বারা আপনাদের ভাবপ্রকাশ করে। একান্ত দুঃখ বা উন্মাদ আনন্দকে তাহারা নৃত্যকলায় ফুটাইতে পারে। রুশদেশের শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের রমণীরা নৃত্য-বিদ্যায় যে-সকল ভঙ্গী শিক্ষা করে, আপনাদের মনের ভাবকে তাহারা সেই ভঙ্গীর সাহায্যে ফুটাইয়া তোলে। ধর,—তাহারা শ্রান্ত হইয়াছে; নির্দ্দোষ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় তাহারা সেই শ্রান্তিকে প্রকাশ করিবে। যাহারা আসল নৃত্যকলায় অনভ্যস্ত, তাহারা এ-রূপ ছন্দপূর্ণ ও কবিত্বময় ভঙ্গিমায় মানসভাব প্রকাশ করিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত।



নর্ত্তকী পাভ্‌লোভা

নৃত্যকলায় কোন্ দেশের নটে[illegible] সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও বিষাদকে জাগাইতে পারে,—আমাকে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে আমি বলি, বিষাদ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস ও আমোদ—একাধারে এই সবগুলির বিচিত্র সমাহার রুশ-নৃত্যে যতটা দেখা যায়, ততটা আর কোথাও নয়।

নৃত্যকলা কাব্য ও গীতকলার সগোত্রের। আমরা যে-ধরণে কাপড়-চোপড় পরি, আমাদের নাচও সেই ধাঁচের উপযোগী হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রাচীন গ্রীক নৃত্য-কলার কথা ধরা যাক্। গ্রীকদের নৃত্য ভঙ্গীতে একটা অবাধ স্বাধীনতা ছিল। তাহাদের ঝল্‌ঝলে ঢিলা পোষাক ঐ স্বাধীনতার উপযোগী। ইংরাজী স্কুলে নাচ শিখাইতে হইলে, নাচকে ঠিক ললিত কলার মত করিয়া শিখাইতে হইবে; কারণ, বিদ্যালয়ে যে-ভাবে ব্যায়াম বা ড্রিল শিখানো হয়, নাটকীয় নাচ তেমন খণ্ডভাবে শিখাইলে কোন ফল হইবে না।

রুশিয়ায় নয় হইতে বারো বছর বয়সের ভিতরে ছেলেমেয়েদের প্রায় নাচ শিখিতে পাঠানো হয়। তাহারা যে শুধুই নাচ, গান ও নাটকীয় কলার শিক্ষা পায়, তাহা নহে;

[illegible] সেইসঙ্গে তাহারা সাধারণ শিক্ষাও লাভ করে। কে কেমন নাচ শিখিতেছে, তাহা পরখ করিবার জন্য প্রতি বৎসরই ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়া হয়। পরীক্ষায় যে ছাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারে না, বিদ্যালয় হইতে তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

যে-সকল শিক্ষিত নট নৃত্য-নিপুণ হইবার জন্য প্রথম যৌবনের কয়েক বৎসর ব্যয় করিয়াছে, তাহার সঙ্গে শুধু তাহাদের পা নাচে না, মাথা ও চোখ নাচে, মুখ ও পা নাচে, বাহু ও হাত নাচে—এক কথায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে।

বিদ্যালয়ে বয়স্ক ছাত্রেরা আপনা-আপনি নাচ অভ্যাস করিবার জন্য বড় অল্প কাল কাটায় না। আমার মনে আছে, একজন [illegible] দিনে ছয় ঘণ্টা ধরিয়া নাচ অভ্যাস করিত। সকল বিভাগের মত নাচেও বহু সাধনা এবং ব্যক্তিগত শক্তির প্রয়োজন। নহিলে সিদ্ধি দুর্লভ। এমন কি, যে-সকল নট সিদ্ধি ও যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও আলস্য সাংঘাতিক। তাঁহারা যদি কেতা-দুরস্ত রাখিতে চান, তবে প্রতিদিনই তাঁহাদিগকে নৃত্য অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাস করিয়া করিয়া নাচে তাঁহাদিগকে এতটা পাকা হইতে হইবে, যে, রঙ্গমঞ্চে গিয়া নৃত্যে উপযোগী ভাবের সমাবেশ ছাড়া তাঁহারা আর কিছু ভাবিতে পারিবেন না;—অভ্যাস-বশে নাচ তাঁহাদের আপনিই চলিতে থাকিবে।

রুশ দেশে বৃদ্ধ নটের স্থান নাই। সাধারণতঃ কুড়ি বৎসর নাচের পরই নটের কার্য্যকাল শেষ হইয়া যায় এবং সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

—The Strand Magazine হইতে

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

নবাব

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমাধি

"তুমি অমন করে কেঁদো না পরী, আমার ওতে বুক ভেঙ্গে যায়। তুমি বরং ফন্তেন্‌ব্লোয় যাও—নিজের কাজকর্ম্ম দেখ'গে। ব্রেহিমের দশ হাজার ফ্রাঙ্ক হাতে পেলে তোমার আর ভাবনা কি? আমি সেখানে গিয়েই তোমায় টাকা পাঠাব। সে আমার হাতের গড়া মূর্ত্তি চায়—তা তাকে দেব—রীতিমত তার দামও আদায় করে নেব। আবার আমার টাকা-কড়ি হবে—অনেক টাকা। কে জানে, হয়ত সুলতানাও হতে পারি একদিন।"

"তাই হও—তুমি সুলতানাই হও। কিন্তু আমায় আর তা চোখে দেখতে হবে না—আমি ততদিন বাঁচছি না।"

ক্রেনমিজ্ চোখের জল মুছিয়া গাড়ীর এককোণে জড়সড় হইয়া বসিল।

ফেলিসিয়া পারি ত্যাগ করিতেছিল।

এখানকার এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা, তীক্ষ্ণ নৈরাশ্য ও কঠোর বিদ্রূপ-লাঞ্ছনার মধ্য হইতে সে এখন পলাইয়া বাঁচিতে চাহে। মোরার মৃত্যু তাহাকে কি ভীষণ আঘাত দান করিয়াছে! একটা তীব্র দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সে ডিউকের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। নিজের সহিত নারীর সকল সম্মান, সকল গৌরব, লজ্জা-সরম অবধি সমস্তই সে ডিউকের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। আর আজ ডিউক যাইবার সময় তাহার কিছুই ফেলিসিয়ার জন্য রাখিয়া যান নাই —ফেলিসিয়াকে এই কঠিন নগরের পথের উপর বসাইয়া গিয়াছেন; সারা জীবনের মত তাহাকে নিঃস্ব সর্ব্বহারা করিয়া গিয়াছেন। গভীর বেদনায় ফেলিসিয়ার বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও চোখে তাহার অশ্রু ঝরিবার আজ উপায় নাই! শোক-চিহ্ন ধরিবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিতা—এতটুকু সম্মান অবধি আজ ফেলিসিয়ার নাই! কিন্তু কি করিয়াছে ফেলিসিয়া যে, সারা জীবন তুষের আগুনে এমন করিয়া তাহাকে পুড়িতে হইবে! ডিউকের সহিত সেণ্ট জেম্‌স্‌ দুই চারিটিমাত্র সন্ধ্যা-যাপন—দুই-চারি রাত্রি থিয়েটারে একত্রে বক্সে বসিয়া অভিনয় দেখা—ইহারই মধ্যে প্রাণহীন প্রণয়-হীন অভিসারের শত কলঙ্ক-রেখা কে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছে! উদ্‌ভ্রান্ত নারী,—জগতে চলিবার ঠিক পথটি তাহার জানা ছিল না—আজ তাই সে সকলের চক্ষে একটা কলঙ্কের নিশানের মত পড়িয়া রহিল!

একবার ফেলিসিয়ার মনে হইল, সে আত্মহত্যা করিবে। পরক্ষণেই মনে হইল, না, তাহা হইলে তাহার ভগ্ন হৃদয়ের ইতি করিয়া এখনই কুৎসার ধারা পারি-ময় ছড়াইয়া পড়িবে! খবরের কাগজে অমনি মোটা কালো অক্ষরে কালিমার মালা দুলিতে থাকিবে! তবে উপায় কি কি উপায় আছে? ফেলিসিয়া স্থির করিল, সে নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে—পারিতে আর থাকিবে না। কিন্তু দেশ ঘোরাইতে গেলে অর্থ চাই,—প্রচুর অর্থ! ফেলিসিয়ার তাহার অভাব বড় বেশী। তখন তাহার মনে পড়িল, বের কথা। এক্সিবিশনে তাহার গড়া মূর্ত্তি দেখিয়া বে'র যুগে প্রশংসার বৃষ্টি ঝরিয়াছিল— তাহাকে বহু অর্থ দিয়া টিউনিসে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল তাহার গড়া মূর্ত্তি দিয়া সে টিউনিসের প্রা সাজাইবে। তখন ফেলিসিয়া এ প্রস্তাবে হয় নাই— প্রাচ্যের বিপুল প্রলোভন কে এতটুকুও চঞ্চল করিতে পারে নাই কিন্তু আজ! আজ তাহার মনে হইল, এ ঐ একটি, একটিমাত্র উপায় আছে! সে আর এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করিল কয়েকখানি টেলিগ্রামে কথাবার্ত্তা-চলাচ পর দর ঠিক হইয়া গেলে, ফেলিসি টিউনিস-যাত্রার উদ্যোগ করিল। চট জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইয়া সে এক পারি ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে ষ্টেশনে অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িল। পারিতে আর একদণ্ডও নহে। সারা আকাশ যেন এখানে তাহাকে চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল! তাই সে এক অজানা দেশে নূতন জীবন-যাপনের কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়

চিন্তার হাত হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিল।

জেনোয়ায় বে'র সজ্জিত বজরা তাহার অপেক্ষা করিবে। সেখান হইতে বরাবর সে টিউনিসে যাইবে। সেখানে তাহার থাকিবার জন্য প্রকাণ্ড বাড়ী—গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন—অভ্যর্থনার চূড়ান্ত আয়োজন হইয়াছে!

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ফেলিসিয়া ইতালির সুদৃশ্য বন্দরের ছবি দেখিতেছিল। শ্বেত মর্ম্মরে বাঁধা ঘাট—চিত্র-বিচিত্র পোষাক পরিয়া ইতালিয় কিশোর-কিশোরী দলে দলে বাহির হইয়াছে—কোথাও মধুর বাদ্য বাজিতেছে, লতা-পাতার মালা মাথায় পরিয়া কোথাও ইতালিয় বালক-বালিকার দল গান ধরিয়াছে! তাহার পর কোথায় সুদূর টিউনিস! মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য—মাঠে কালো-কালো ছেলেমেয়েরা সরল আনন্দে নৃত্য করিতেছে, খেলা করিতেছে! চমৎকার বৈচিত্র্য!

আর এখানে পারির আকাশ—কি বিশ্রী কদর্য্য বেশ ধরিয়া তাহাকে বিদায় দিতেছে। কাল রাত্রি হইতে বৃষ্টির আর বিরাম নাই। পথে কাদা জমিয়া একটা নিরানন্দময় অবসাদের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। অসহ্য এ দৃশ্য! ইহার মধ্য হইতে পলাইতে পারিলে ফেলিসিয়া বাঁচে!

আজ পারির এই নিরানন্দময় বুকের উপর আর এক নিরানন্দময় ব্যাপারের অভিনয় চলিতেছিল। আজ ডিউক মোরার সমাধি। সেই কাদায়-জলে ভরা পথের উপর জনস্রোতের যেন আর বিরাম নাই। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে—সারি দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। সমাধি-যাত্রায় এত বড় বিরাট সমারোহ পারির লোক বহুকাল চক্ষে দেখে নাই! ফেলিসিয়ার গাড়ী একটা মোড় বাঁকিয়া বড় রাস্তায় ক্রমে এই গাড়ীর ভিড়ে পড়িয়া গেল; তখন তাহার গতি অত্যন্ত মৃদু হইয়া আসিল। ওদিকে গাড়ীর মধ্যে ফেলিসিয়ার মন উধাও কল্পনায় ভাসিয়া দুরন্ত ঘোড়ার মতই ছুটিয়া চলিয়াছে—বাহিরের এই রুদ্ধ স্রোত তাহাকে একেবারে বিষম বিরক্ত করিয়া তুলিল। সে চীৎকার করিয়া কোচম্যানকে কহিল, "জোরে হাঁকাও, গাড়ী।"

কোচম্যান সবিনয়ে উত্তর দিল, জোরে চালাইবার উপায় নাই। ডিউকের সমাধি-যাত্রী গাড়ীর ভিড়ে পড়িয়া তাহাকে লাইন ধরিয়া মন্দ গতিতে যাইতেই হইবে; বে-লাইনে বেগে চালাইবার হুকুম নাই। ফেলিসিয়া রাগে উত্তপ্ত হইয়া কহিল, "অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাও।"

ফেলিসিয়ার মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণী বাতাস ছুটিয়াছিল। যাহার হাত এড়াইবার উদ্দেশ্যে সে এত ত্বরা করিয়া আজন্মের বাস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাই আবার এ কি পাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে! স্মৃতির দুরন্ত দাহে তাহার মনখানা যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। সে একবার গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল —সৈন্যের দল বন্দুক নামাইয়া অত্যন্ত গম্ভীর চালে পথে চলিয়াছে, তাহাদের পিছনে সীমাহীন জন-তরঙ্গ! ফেলিসিয়া আর দেখিতে পারিল না; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

তাহার সকল লজ্জা, সকল অপমান, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল দৈন্য যেন এই জনতা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। ফেলিসিয়া কোচম্যানকে কহিল, "প্রথম যে গলি পাবে, সেই গলিতে ঢুকে গাড়ী জোরে হাঁকিয়ে যাও।" তাহার পর সে গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পথে তখন সমাধি-যাত্রার রীতিমত ঘটা বাধিয়াছিল। রাজ্যের যত সম্ভ্রান্ত, পদস্থ কর্ম্মচারীর দল সেই কাদায় হাঁটিয়া ডিউকের প্রতি সারা নগরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছিল। মৃতের প্রতি জীবিতের শেষ শ্রদ্ধা, শেষ সম্মান! প্রথমেই বিপুল বাদ্য-সমারোহ, পরে পাঁচখানি গাড়ীতে পাদ্রীর দল,—সকলেরই পরিধানে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ—তাহার পর ডিউকের সমাধি-শকট, গাঢ় কালো রঙের ছয়টি ঘোড়া সে গাড়ী টানিয়া চলিয়াছে। কফিনের উপর একখানি তরবারি, একটি ইউনিফর্ম্ম-পোষাক, পালক-দেওয়া টুপি, স্বর্ণখচিত তাহার গায়ে বড় বড় মুক্তায় গ্রথিত প্রকাণ্ড একছড়া মালা! ডিউকের গাড়ীর পিছনে শোকচিহ্নধারী কমিটির সদস্য, এবং ডিউকের বন্ধু ও আত্মীয়ের দল হাঁটিয়া চলিয়াছে। সকলেরই মুখে আয়োজনোচিত শোকের উদাস গম্ভীর ভাব। এতগুলি লোকের মধ্যে প্রকৃত শোকের বেদনা যদি কাহারও বুকে বাজিয়া থাকে, তবে সে নবাবের! তাঁহার মুখে কে যেন গভীর হতাশার ছাপ টানিয়া দিয়াছে! নবাবকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন ঐ পুরুষটির সহিত আপনার প্রাণের সমস্ত সাধ, আশা, আপনার সকল ঐশ্বর্য্য-গৌরব মাটীর নীচে সমাহিত করিতে চলিয়াছেন!

সমাধি-যাত্রীর দল ক্রমে গোরস্থানে আসিয়া পৌছিল। সেখানকার করণীয় সমস্ত ব্যাপার শেষ হইলে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি দেখা দিল। তখন চারিধারে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গেল। সকলে ব্যস্ত হইয়া বৃষ্টি হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ছুটিয়া মাথার উপর একটু আশ্রয়-লাভের চেষ্টা দেখিল। হেমারলিঙ আসিয়া একটা ঝোপের মধ্যে দাঁড়াইল—আকাশের পানে অধীর দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে, এমন সময় সে দেখে, নবাব সেই ঝোপটার দিকে আসিতেছেন। নবাবের প্রকৃতি হেমারলিঙের বিলক্ষণ জানা ছিল; তাহার একটু ভয় হইল—কি জানি, এখানে কেহ নাই, যদি নবাব মনের ঝাল মিটাইয়া লয়! কাছাকাছি মস্ত কোথাও সরিয়া পড়িবার উপায় ছিল না। হেমারলিঙ কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় নবাব আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "লাজেয়ার—" হেমারলিঙের পূর্ব্ব নাম ছিল, লাজেয়ার। সে একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। নবাব আবার ডাকিলেন, "লাজেয়ার—"

পরক্ষণেই হেমারলিঙ আপনার স্কন্ধে নবাবের ভারী হাতের তপ্ত স্পর্শ অনুভব করিল। সে ঈষৎ চমকিয়া উঠিল। নবাব কহিলেন, "শোন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমি শুধু তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি আর আমার পিছনে লেগো না।"

হেমারলিঙ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নবাব আবার কহিলেন, "এ যুদ্ধে তোমারই জিত, আমার হার। দেখ, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, আর যুঝতে পারছি না। পুরাণো

বলে আমায় দয়া কর। আমায় মুক্তি দাও।"

হেমারলিঙের প্রাণের কম্পন তখনও থামে নাই। পায়ে যত বলই থাকুক, অপরাধীর মন ভয়ে অতি সহজেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। হেমারলিঙের মনে পড়িল, সেই অতীত দিনের কথা। দারিদ্র্য যখন পিষিয়া মারিতেছিল, তখন দুই বন্ধুতে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায় সুদূর টিউনিসে যাত্রা করে। নির্ব্বাসনে থাকিয়া রৌদ্রে ছুটিয়া দুইজনে পয়সার চেষ্টায় কি কষ্টই না সহ্য করিয়াছে! দারিদ্র্যের সমস্ত কঠিন অত্যাচার দুই বন্ধুতে নীরবে মাথা পাতিয়া লইয়াছে! নবাব কহিলেন, "তোমার তাড়া নেই, বোধ হয়? এস না, একটু বেড়াই। বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। তোমাকে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার অতীত বিশ বচ্ছর আজ ফিরে পেয়েছি—!"

হেমারলিঙ কহিল, "হাঁ, আমারও বড় ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি জানো, আমার পায়ের বেদনার জন্য বেশী চলবার ক্ষমতা আমার নেই।"

নবাব কহিলেন, "তোমার পায়ের কথা আমি ভুলে গেছলুম। এসো, আমার হাতে ভর দিয়ে এসো।"

ভাইয়ের মত যত্নে নবাব তখন হেমারলিঙের হাত ধরিলেন। খানিকটা চলিয়া উভয়ে একটা বেঞ্চে আসিয়া বসিল। নবাব ডিউকের পানে চাহিয়া কহিলেন, "বেচারা ডিউক—"

হেমারলিঙ কহিল, "এ মৃত্যুতে দেশের বড় ক্ষতি হল।"

নবাব কহিলেন, "আমার যা ক্ষতি হয়েছে, তার আর সীমা নেই! আর যদি কিছুদিনও বাঁচতেন; তোমারই বরাত, লাজেয়ার! তা ছাড়া তোমার ক্ষমতাও খুব!"

হেমারলিঙ কহিল, "তা যদি বললে, ক্ষমতা আমার নয়, এর জন্য মেরির কাছে আমি ঋণী!

"মেরি!"

"হাঁ, ব্যারণেস! বিয়ের সময় সে ক্রীশ্চান হয়—তখন তার পুরোণো নাম বদলে মেরি নাম দেওয়া হয়। তার একটা শক্তি আছে, বটে! ব্যাঙ্কের কাজ সে বেশ বোঝে! সে-ই ত সব চালায়—আমার যা-কিছু দেখা-শোনা, সব সে-ই করে।"

নবাব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার মত বরাত কটা লোকের হয়!" নবাব আপনার স্ত্রীর কথা ভাবিতেছিলেন! একটা জানোয়ার সে! হৃদয়-হীনা!

তাহার পর উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল—সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হেমারলিঙই কথা কহিল। হেমারলিঙ বলিল, "মেরি তোমার উপর বড় চটেছে। তোমার সঙ্গে এই আমি কথা কচ্ছি, এ দেখলে সে একেবারে রসাতল বাধিয়ে দেবে।"

নবাব কহিলেন, "কিন্তু কৈ, আমি ত তার কোন ক্ষতি করিনি।

"বিশেষ ভাল ব্যবহারও করনি তুমি। আমাদের বিয়ের পর সেই কাণ্ডখানা মনে পড়ে? তোমার স্ত্রী বলে পাঠালে, যে একটা বাঁদীর সঙ্গে সে দেখা করতে পারবে না! কেন, আমাদের বন্ধুত্ব কি এ সামান্য কুসংস্কারটুকু ভুলতে পারত না? জানো,

মেয়ে মানুষ এ-সব অপমান জীবনে ভোলে না।"

"কিন্তু আমার তাতে কি হাত ছিল, বল? তুমি ত জান, আফসিন্‌দের দর্প কতখানি!"

নবাবের কিন্তু এ দর্প ছিল না, হেমারলিঙ্‌ তাহা বুঝিত। তাহার উপর এই শ্মশানের বুকে বসিয়া মনের ভাব তাহার কোমল হইয়া আসিয়াছিল। সে কহিল, "শোন বার্ণার্ড, এক উপায় আছে। আমাদের পুরানো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে তোলবার একটি মাত্র উপায় আছে। তোমার স্ত্রী আমাদের এই ব্যবধান দূর করতে পারে। তার সেই অপমানের কথা ব্যারণেসের বুকে কাঁটার মত বিঁধে আছে! আমাদের বাড়ীর মধ্যকার এই গোলটুকু যদি মিটে যায় তাহলে আবার আমরা আগেকার মত বন্ধুভাবে পরস্পরে মিশতে পারি—"

নবাব কহিলেন, "কি করলে মেটে, বল।"

"শোন তবে, বলি। আসছে শনিবার ব্যারণেস একটা পার্টি দিচ্ছেন। তাতে পারির সমস্ত বড় বড় লোকই আসবেন। তুমিও তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো! অবশ্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাবেও। তোমার স্ত্রী এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মেশামিশি করুক—সব গোল চুকে যাবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি বড় বিপদে পড়েছ—আমি তোমায় সে বিপদ থেকে উদ্ধার করব। বে'কে তুমি ধার দিয়ে খুব এক চাল চেলেছিলে বটে, কিন্তু কি করবে? তোমার পড়তা যে খারাপ যাচ্ছে! রঙ্‌ পেয়েও খেলা গুছিয়ে নিতে পারছ না—কেবলই হার হচ্ছে।"

নবাবের দর্পিত শির আজ এতখানি দেখিয়া হেমারলিঙ্‌ মনের মধ্যে অ আনন্দ বোধ করিতেছিল। তাহার হইল—আহা, পুরাতন বন্ধু! কিন্তু এ হইতে উদ্ধার-লাভের এক উপায় মাত্র —সে উপায় কি হেমারলিঙ আজ তা ইঙ্গিত দিয়াছে! কিন্তু জাঁস্থলে এ বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন—মে হারাইয়া তিনি যে আজ সব হারাইয়া

হেমারলিঙ্‌ কহিল, "তুমি ডিউক হারিয়েছ বটে, কিন্তু আমায় পাচ্ছ।"

নবাব কহিলেন, "কিন্তু শোন এতে কোন ফল হবে কি? লি মার্কা ত তার রিপোর্ট লিখে শেষ করে ফেলেছে

হেমারলিঙ্‌ কহিল, "আর একটা রিপোর্ট লিখতে কতক্ষণ? এক, দুই, তি চার হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ কর—সব ঠিক যাবে।"

নবাব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সবিস্ময় কহিলেন, "এ কি সম্ভব! লি মার্কার—ম কড়া লোক—"

"পয়সায় কে না নরম হয়? শো টাকাটা কি আর নগদ হাতে দেবে? এ ফিকির চাই। লি মার্কারের ছবির স সখ। খুব দামী ছবিতে সে ঘর সাজিয়েছে সোয়ানবাক্‌-টাক কি এমনি কারো ছ একখানা দাও দেখি—বলো, আপনার ঘর টাঙ্গাবার জন্য একখানা ছবি পেলুম সেখানা টাঙ্গাবার অনুমতি দেন যদি ছবিখানা কোন ধর্ম্ম-বিষয়ের হলে ত আর কথাই নেই—" নবাব ভাবিতে লাগিলেন,

ই ত!...কিন্তু কি করিয়া ছবির স্তাব তুলিবেন, তিনি!

হেমারলিঙ্‌ কহিল, "সে আমি ঠিক করে দেব। মোদ্দা, আগে তুমি ব্যারণেসের সঙ্গে সন্ধি করে ফেল! তাহলেই দেখবে, চারিধার ফরসা হয়ে গেছে। আমার যা কিছু এই মান সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য বল, এর সমস্তর মূলে মেরির বুদ্ধি! মেরির সঙ্গে ভাব করে ফেল, বার্ণার্ড, কোন ভাবনা থাকবে না।

"বেশ, তুমি তাহলে ভার নিচ্ছ—আমায় এ বিপদ থেকে টেনে তুলবে?"

"অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই, বার্ণার্ড। শনিবার আমাদের ওখানে তোমরা সস্ত্রীক এসো—সেখানেই তখন মেরির সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে ফেলব। লি মার্কারের ওখানে কবে যাওয়া যায় —বুঝলে?"

"হাঁ—তাহলে তুমি, আমায় লি মার্কারের ওখানে নিয়ে যাবে—?"

"হাঁ হে, হাঁ।"

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দেড়ে টিকটিকি

(ইস্‌হাক্‌ বিন্‌ খলিফা)

বেঁটে দাউদের লম্বা দাড়ি!
গোঁফে ও দাড়িতে একটি গাড়ী!
আগে চলে দাড়ি পিছে দাউদ
বাপের পিছনে যেন সে পুত!
চড়াই পেয়েছে ময়ূর-পুচ্ছ!
দাড়ি বিনা মিঞা দাউদ তুচ্ছ।
দাড়ি সে রেখেছে, বর্ষা জাড়ে—
লুকাতে বুঝি ও দাড়ির আড়ে।
একদা দাউদ মিঞারে ধরি,
দাড়ি বাদ দিয়া ওজন করি,
তেরিজ কষিয়া দেখিনু ভাই
দাউদের কোনো ওজনই নাই!

ছায়া যেন দাড়ি বহিতে আছে
দাউদ সে জটা দাড়ির গাছে!
দাড়ি নেড়ে চেড়ে আছে বাঁচিয়া
দেড়ে টিক্‌ টিকি দাউদ মিঞা!
দাড়ি পুষে হল দাউদ রোগা!
ফড়িঙের গায়ে দাড়ির চোগা!
ফিরিছে কাহিল দাড়ির মুটে
নগরের কুটো দাড়িতে খুঁটে।
নিবিড় জমাট দাড়ির কাঁড়ি
চামচিকাদের বাগান-বাড়ী!
হেসে ছিঁড়ে যায় পেটের নাড়ী
ছন্‌কের মুখে মুনকে দাড়ি!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

বৈজ্ঞানিক জীবনী। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, এফ, সি এস প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা; বাঁধাই দেড় টাকা। লেখক এই গ্রন্থে "একদিকে সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ও গেলিলিও, নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবন-বৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা" করিয়াছেন। লেখক 'ভূমিকা'য় আর একটি কথা বলিয়াছেন, "কোনও বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্যক বুঝিতে হইলে উহার আবিষ্কারককে জানা উচিত। কিরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে সেই সত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার বর্ণনা কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নহে, প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপাদানও বটে।" কথাটা খুব ঠিক! সুখের বিষয়, কয়টি জীবনীর আলোচনাতেই লেখক এই ধারাটুকু রক্ষা করিয়াছেন, ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। লেখকের এ প্রচেষ্টায় তাঁহার স্বদেশানুরাগেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রাচীন বৈজ্ঞানিক জীবনীর সশ্রদ্ধ ও নিরপেক্ষ আলোচনাটুকু প্রকৃতই উপভোগ্য—তাহাতে অবান্তর উচ্ছ্বাস বা অনাবশ্যক প্রসঙ্গের এতটুকুও উল্লেখ নাই। একশ্রেণীর লোকের ধারণা, প্রাচীন ভারতে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহা যে দারুণ ভ্রমাত্মক, সুশ্রুতের আলোচনা পাঠ করিলে সহজেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। Anatomy সম্বন্ধেও সুশ্রুতের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি মানব শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, শরীরের কোন্ স্থানে কয়টি স্নায়ু, অস্থি, শিরা প্রভৃতি আছে, তাহাও সঠিক নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক উইলিয়ম হার্ভে দেহের মধ্যে রক্তের গতি (Circulation of blood) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাহার বহু-শতাব্দী পূর্ব্বে সুশ্রুত রক্তের গতি নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। সুশ্রুত বলেন, "১৭টি রক্তবাহিনী শিরার দ্বারা রক্ত সমগ্র দেহে চলাচল করিতেছে। এই সকল শিরা যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উদ্গত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শোণিত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ স্বীয় শিরামধ্যে বিচরণ করে (circulates) ততক্ষণ ধাতুসমুদায়ের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্পর্শ-জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই রক্ত দূষিত হইলে রক্ত-জন্য নানাপ্রকার পীড়া জন্মে।" এ সংবাদটুকু ভারতবাসীগণের গৌরবের—সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতে অস্ত্রচিকিৎসারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। রামায়ণ মহাভারতে দেখা যায়, উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসকগণ সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েই অস্ত্রচিকিৎসক ও অস্ত্র-চিকিৎসার উপযুক্ত বন্ধনী (Bandage) ঔষধাদি সংগ্রহ করিতেছেন। সুশ্রুত অস্ত্র-চিকিৎসাকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, (১) ছেদ্যক্রিয়া—কোন অঙ্গ ছেদন করা; (২) ভেদ্যক্রিয়া—কোন স্থানে ভেদ করা; (৩) লেখ্যক্রিয়া—কোন স্থানের চর্ম্ম উত্তোলন করা; (৪) বেধ্যক্রিয়া—দূষিত রক্তাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য শিরাদি ভেদ করা; (৫) এষ্য ক্রিয়া—নালীঘা প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করা; (৬) আহার্য্যক্রিয়া—অপরী প্রভৃতি রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি বাহির করা; (৭) বিস্রাব্য ক্রিয়া—স্রাব উৎপাদন করা; (৮) সীবন—সেলাই করা। পঞ্চাননবাবু অস্ত্রাদির চিত্রাদিও সংগ্রহ করিয়াছেন—এ গ্রন্থে বহু যন্ত্রের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তাহা হইতে বিষয়টি সম্পূর্ণ বুঝা যায়। অস্ত্র-প্রয়োগ-কল্পে সুশ্রুত ১২৫ রকমের অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিরূপ দুরূহ অস্ত্র-চিকিৎসাও তৎকালে প্রচলিত ছিল, পঞ্চানন বাবু তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন—গর্ভস্থ মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রক্রিয়ার বর্ণনাও সুশ্রুতে আছে। সে অস্ত্রের চিত্রও

এ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। সুশ্রুতে বহুবিধ বন্ধনীরও (Bandage) উল্লেখ দেখা যায়। বন্ধনপ্রণালী চতুর্দ্দশ প্রকারের ছিল। দুঃখ ইহাই যে আধুনিক বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকে এ সকল তত্ত্বের ধারও ধারেন না—তাঁহারা সাধারণের মধ্যে এ সকল তথ্যপ্রচারে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা শুধু নিজেদের ব্যবসায়টুকু বুঝিয়াই ক্ষান্ত আছেন; তাঁহাদের যে এদিকে একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আছে, এ কথা তাঁহাদিগের মনে আছে বলিয়াও বুঝা যায় না। যাহা হৌক, এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য পঞ্চানন বাবু সমস্ত দেশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, কোথাও পাণ্ডিত্যের ছড়াছড়ি নাই—তাহার ফলে নিতান্ত অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তিও এ গ্রন্থ সহজে বুঝিতে পারিবেন, ইহার ভিতরকার কঠিন ও জটিল রহস্যগুলি আয়ত্ত করিতে পারিবেন। বইখানি এমনি কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে যে, উপন্যাসের মতই উপভোগ্য। এই গ্রন্থের সকল প্রবন্ধগুলিই 'ভারতী' পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল—এবং 'ভারতী' পত্রিকায় ইহার চিত্রাদিও সে সময় বাহির হইয়াছিল। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ চমৎকার। বহিখানি বঙ্গভাষার সম্পদস্বরূপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

নামিকো। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি জাপানী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। লেখক 'ভূমিকা'য় লিখিয়াছেন, "কবি-কল্পনা নামিকোর ভিত্তি নয়; সুবিখ্যাত জাপানী যোদ্ধা মার্শাল প্রিন্স্ ওয়ামার কন্যার জীবনের করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত।" বাস্তবিক উপন্যাসখানি সর্ব্ববিষয়েই উপভোগ্য হইয়াছে—ইহার মধ্য দিয়া যে করুণ রসের ধারা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন শান্ত, তেমনই অনাবিল। উপন্যাসের আর্ট ইহাতে প্রচুর। কয়েকটি দৃশ্য প্রকৃতই নাটকীয় ভাবের ছায়াপাতে মধুর,—ছবিতে আঁকিয়া রাখিবার যোগ্য। উপন্যাসখানির অন্তরগত মূল ভাবটি সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বজাতির সম্পত্তি; তাই এ গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পাঠকের প্রাণ সজীব থাকে—উপন্যাস-লোকের কাল্পনিক চরিত্রগুলির সুখে-দুঃখে আমাদের সহানুভূতি সর্ব্বত্রই ঝরিয়া পড়ে—তাহা আগাগোড়াই সজাগ থাকে! "প্রাচীনে ও নবীনে, তরুণে ও প্রবীণে সংঘর্ষ দেশে দেশে সকল জাতির মধ্যেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান, জাপানেও অন্যথা নয়।" উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া এ সত্য বুঝিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। গ্রন্থের নায়িকা নামি সুবিখ্যাত যোদ্ধা ভাইকাউণ্ট লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল কাতাওকার জ্যেষ্ঠা কন্যা—আট বৎসর বয়সে জননীকে হারাইয়া পিতার আদরে ও বিমাতার অনাদরে কোনমতে সে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার পর কৈশোরোন্মুখেই সামুরাই বংশীয় তাকেওর সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাকেও নৌ-বিভাগে কাজ করে। তাকেওর মত প্রেমিক স্বামীর হাতে নামির দিন সুখে কাটিতেছিল।

তাকেওর পিতা ছিল না; মাতা কেইয়ের মেজাজ বড় রুক্ষ; আধুনিক কালের শিক্ষা ও রুচির উপর তিনি হাড়ে চটা। বধূর সহিত তিনি রূঢ় আচরণ না করিলেও তাহার প্রতি তাঁহার মন বড় প্রসন্ন ছিল না, কারণ পুত্র তাকেও বধূকে বড় ভালবাসে। কিছু কাল সুখে কাটিবার পর নামির যক্ষ্মা রোগ হইল; এবং মাতৃস্বসৃ-পুত্র চিজিওয়ার চক্রান্তে নামিকে গৃহ হইতে বিদায় দেওয়া হইল; তাকেও তখন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে। নামি গিয়া পিতার গৃহে আশ্রয় পাইল—স্বামীর সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। তবুও মন তাহার স্বামীর জন্য দিবারাত্রি অধীর-আকুল হইয়া রহিল। চীন-জাপানের যুদ্ধ-শেষে তাকেও যখন শ্বশুর-গৃহে ফিরিল, তখন নামি ইহজগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সকল দুঃখ যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থের মূল—ইহাকে অবলম্বন করিয়াই নানা চরিত্র অবতারিত হইয়াছে, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে; এবং এই ঘাত-প্রতিঘাতে উপন্যাস-বর্ণিত বিবিধ চরিত্রগুলি স্বকীয় বিশেষত্বে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুরেশবাবু নিজে বহুকাল জাপানে ছিলেন,

জাপানী আচার-ব্যবহার তাঁহার বিশেষ পরিচিত—তাই তাঁহার এ গ্রন্থে—অনুবাদ হইলেও—জাপানের নিজস্ব বিশেষত্বটুকু কোথাও ঢাকা পড়ে নাই। তাহার উপর অনুবাদ এমন সুদক্ষ—সুন্দর হইয়াছে যে, উপন্যাসখানি পড়িবার সময় পাত্র-পাত্রীগুলিকে নিতান্তই ঘরের লোক বলিয়া মনে হয়! আমরা একাসনে বসিয়া উপন্যাসখানি পড়িয়া ফেলিয়াছি। অধুনা যে সকল মৌলিক উপন্যাস বিপুল ঢক্কা-নাদ করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে, তাহার মধ্যে দুই-চারিখানি ছাড়া অপর কোনখানিই 'নামিকোর পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে না, তাহাদের বহু ঊর্দ্ধে নামিকোর স্থান,—এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। ইহার ভাষা বেশ স্বচ্ছ, সরল,—ভাব যেন নদীর শান্ত স্রোতের মতই উথলিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কোথাও একটা ছোট-খাট বাধা অবধি আসিয়া পড়ে নাই। যে দুই-চারিটি দৃশ্য ছবিতে আঁকিবার মত হইয়াছে, তাহার একটির উল্লেখ করিতেছি। নামিকো যখন শ্বশুর-গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পিতার কাছে ছিল, সে সময় পিতা তাহাকে এক স্বাস্থ্যকর দেশে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন; ফিরিবার সময় তাহারা একখানি পূর্ব্ব-দিকগামী ট্রেনে চাপিল—প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাহারা তিনজন। নামি খোলা জানালার ধারে এবং পিতা দূরে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। ট্রেন একটা ষ্টেশনে থামিয়াছে—এমন সময় পূর্ব্ব দিক হইতে আর একখানি ট্রেন আসিয়া সেই ষ্টেশনে থামিল। নামির ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল—নামি পার্শ্বের ট্রেনখানির দিকে চাহিয়াছিল—ট্রেন যেমন অপর ট্রেনের একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সম্মুখে আসিয়াছে—অমনি সে দেখিল, সে কামরায় একটি যুবক হস্তে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের চোখে চোখে সাক্ষাৎ হইল। নামি একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল।

যুবক 'নামি-সান' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে তাকেও।" তাহার পর ট্রেন চলিয়া গেল।

ছাড়াছাড়ির পর স্বামীর সহিত নামির এই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ! বড় করুণ, বড় সুন্দর দৃশ্য! এমন দৃশ্য এ গ্রন্থে আরও আছে। এই দীর্ঘ ১৯৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থখানির মধ্যে ভাষার কয়েকটি ত্রুটি চোখে পড়িল। ১১৮ পৃষ্ঠার একস্থলে আছে,—কেই তাকেওকে বলিতেছে, "আসবার সময় তুমি জুসিতে থেমেছিলে?" "থেমেছিলে" কথাটা বাঙ্গালায় এখানে প্রযুজ্য হইতে পারে না—হয়, বলিতে হইবে, "নেমেছিলে?" না হয়, বলিতে হইবে, "আসবার সময় তুমি জুসি হয়ে এলে?" বহিখানি ভিতরে-বাহিরে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে, তাই ত্রুটির কথা না তুলিয়া পারিলাম না। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে লিখিয়া লওয়া হইবে। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধা প্রভৃতি নয়নাভিরাম হইয়াছে।

গোবরগণেশের গবেষণা। শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত। ৫৮।২ নং হ্যারিসন রোড, অন্নদা বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত। বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে লেখক বেশ নির্ভীকভাবে আমাদের বহু দোষ ও দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে,—সব মতগুলির সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিলেও লেখকের নির্ভীক মতাভিব্যক্তিটুকু উপভোগ্য, এবং তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। লেখকের আলোচনা কৌতুক-রসে মণ্ডিত। সে রসে প্রাণ আছে—তাহা নির্জ্জীব বা অক্ষম ন্যাকামির রূপান্তর নহে; তবে স্থানে স্থানে এমন রসিকতাও আছে যাহাতে কোনো রস নাই, এবং মধ্যে মধ্যে কল্পনা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা হইয়া পড়িয়াছে। রসিকতায় লেখক যে খুব পাকা এ কথা বলা যায় না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বর্ষা

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্—এলাহাবাদ।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩২২ | [৫ম সংখ্যা

নালক

যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধানুকীর মত বেঁকে চলেছেন। আর ঋষিপত্তনের নীচেই বরুণা নদীর পাড় পাহাড়ের মত খাড়া। তার গায়ে বড় বড় সব গুহা গর্ত্তে মত জটাধারী বক-বেড়ালি-ব্রহ্মচারী ধুনি জ্বালিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে। পাড়ের উপরেই সারনাথের মন্দির। মন্দিরের পরেই গাছে-গাছে-ছায়া-করা তপোবন। সেইখানে সত্যি যাঁরা ঋষি তপস্বী তাঁরা রয়েছেন। হরিণ তাঁদের দেখে ভয় খায় না, পাখী তাঁদের দেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা কাউকে কষ্ট দেন্ না। কারু ঘুম ভাঙবার আগে তাঁরা একটিবার বন থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করে যান্; দিনরাতের মধ্যে তপোবন ছেড়ে আর তাঁরা বার হ'ন্ না। দেবল ঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনে একটি বটগাছের তলায় আজ ক মাস ধরে রয়েছেন।

তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হ'য়েও যেন হয় না,—রোদ পড়েও যেন পড়তে চায় না! সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, কিন্তু তখনও আষাঢ়ান্ত বেলার সোনার রোদ গাছের মাথায় ঝক্ ঝক করছে, হরিণ-গুলি তখনও আস্তে আস্তে চলে বেড়াচ্ছে, ছোট ছোট সবুজ পাখীগুলি এখনও যেখানটিতে একটুখানি রোদ সেইখানটিতে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি বসে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে চুপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা সাদা বক্ তরে চোখের সাম্নে দিয়ে কেবলি নদীর এপার ওপার আনাগোনা করছে;—সে যেন ঠিক করতে পারছেনা কোন্ পারে বাসা বাঁধবে।

বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মনটিকে টান্ছে—সেই বর্দ্ধনের বনের ধারে—তাদের সেই গাঁয়ের দিকে! সেই তেঁতুলগাছে-ছায়া-করা মাটির ঘরে

তার মায়ের কাছে নালকের মন একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আস্‌ছে। মন তার যেতে চাচ্চে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছেনা। সে ওই বকটার মত কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে!

দেবল ঋষি নালককে ছুটি দিয়েছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এদিকে আবার ঋষির মুখে নালক শুনেছে বুদ্ধদেব আস্‌ছেন এই ঋষিপত্তনের দিকে! আজ সে কত বছর নালক ঘর ছেড়ে এসেছে; মাকে সে কতদিন দেখে নি! অথচ বুদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পাচ্চে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে—যায় কি না যায়।

সকাল থেকে একটির পর একটি কত নৌকো কত লোককে যার যার দেশে নামিয়ে দিতে চলে গেল; কত মাঝি নালককে যাবেগো যাবেগো বলে ডেকে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোট নৌকো নালকের দিকে পাল তুলে আস্‌ছে—অনেক দূর থেকে। তার আলোটি দেখা যাচ্ছে নদীর জলে একটি যেন ছোট পিদিম ঝিকঝিক করে ভেসে চলেছে! এইখানি চলে গেলে এদিকে আর নৌকো আসবে না—যাত্রী নিতে। নালক মনে মনে দেবল ঋষিকে প্রণাম করে বল্‌ছে—ঠাকুর, যেন বুদ্ধদেবের দর্শন পাই!

দেখতে দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল! সেই ছোট নৌকোয় নালক তার মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে দেখেনি! ঠিক সেই সময় বরুণার খেয়া-ঘাট পার হয়ে বুদ্ধদেব সারনাথের তপোবনে এসে নাম্‌লেন। আর একটি দিন যদি নালক সেখানে থেকে যেত!

কত দেশবিদেশ ঘুরে, কত নদীর চরে, খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যেবেলায় ছিড়তে ভিড়তে নালকদের নৌকোখানি চলেছে—যে গাঁয়ের যে লোক তাকে সেই গাঁয়ে রেখে; পুরানো যাত্রী যেমন নিজের গাঁয়ে নেমে যাচ্ছে অমনি তার জায়গায় ঘাট থেকে নূতন যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। এমনি করে নালকদের নৌকো চলেছে—কতদিন কতদূর!—কেবলি যাত্রী উঠিয়ে নিয়ে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে। নৌকো কখনো চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তীরের মত জল কেটে, কখনো বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটু আলোর দাগ টেনে;—এমন আস্তে যে মনেই হয় না যাচ্ছি।

দিনে দিনে বর্ষাকালের নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের ক্ষেতগুলো, তার ওধারে গাঁয়ের গাছগুলো ঘরগুলো, এমন কি অনেক দূরের মন্দিরটি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চরগুলো সব ডুবিয়ে দিয়েছে!

নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস; ঝুপ্‌ ঝুপ বিষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে ধারে বাঁশ-ঝাড়ের গোড়া পর্য্যন্ত জল উঠেছে! থৈ থৈ করছে জল! খাল বিল খানা খন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে—স্রোতের জলে—বর্ষাকালের নূতন জলে।

নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্চে। নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে মনে মনে বুদ্ধদেবকে পূজো করে মাঝ-নদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘরের দিকে চলে গেল—বিষ্টির জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে। এই ফুলটির মত নালক—যে মনে পড়ে না কতদিন আগে—ঋষির সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে, সংসারে বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতই ভাস্‌তে ভাসতে তাদের দেশের ঘাটে, মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আট্‌কা পড়ল। আবার সে দিন কবে আসবে যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা-পড়া ফুলটির মত তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন!

নালক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ায় তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠোনের মাঝে একটি ভিখারী দাঁড়িয়ে গাইছে—

"এরে ভিখারী সাজায়ে তুমি কি রঙ্গ করিলে!"

(সমাপ্ত)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবাব

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ব্যারণেস হেমারলিঙ্‌

হেমারলিঙ এণ্ড সন কোম্পানির অফিস-গৃহের একেবারে দক্ষিণ কোণে দ্বিতলের উপর ব্যারণেস হেমারলিঙের খাস-কামরা। সেই ঘরেই আজ খুব জমকালো রকমের পার্টির আয়োজন হইয়াছে। ঘর খানি সে জন্য কায়দা-মাফিক সাজানো হইয়াছে—দেওয়ালে লতা-পাতার বিচিত্র ঝালর দুলিতেছে—ঘর একেবারে ফুলের গন্ধে ভরপুর।

অতিথির মধ্যে জর্ম্মান, ইহুদি, ব্যাঙ্কার ও কমিশন-এজেণ্টের সংখ্যাই অধিক। আফ্রিকা প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া ইহারা প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছে—কাজেই হেমারলিঙের প্রাসাদ-ভবনে তাহাদিগের দ্বার অবারিত বলিলেও চলে।

ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর যতই থাকুক, ব্যারণেসের জীবনে কালির রেখা যথেষ্টই ছিল। পূর্ব্ব-জীবনে সে বাঁদী ছিল—এক দাস-বিক্রেতা আদ্রিয়ানাপ্‌লের বাজারে তাহাকে কিনিয়া মরক্কোর দরবারে বেচিয়াছিল; সম্রাটের মৃত্যুর পর তরুণ বে আহমদ আপনার হারেমের জন্য তাহাকে কিনিয়া

লয়। পরে হারেম ত্যাগ করিয়া আসিলে হেমারলিঙ তাহাকে বিবাহ করে। কিন্তু টিউনিসে ব্যারণেসকে লইয়া হেমারলিঙ বড় বিপদে পড়িল। সে দেশের কোন গৃহে—তুর্কি বা য়ুরোপীয় যে কোন জাতিই হোক না কেন—কোথাও ব্যারণেসের প্রবেশাধিকার ছিল না। একটা বাঁদীকে বন্ধুর সম্মান দিতে সকলেই নারাজ ছিল। পারিতে আসিয়াও হেমারলিঙের সে বিপদ কাটিল না। কাজেই ব্যারণেসকে প্রথম দুই-চারি বৎসর নির্জ্জনে বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্যারণেসের বুদ্ধি ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ—সভ্য সমাজ বশ করিবার মন্ত্রও সে জানিত। সে মন দিয়া অল্প দিনের মধ্যেই ফরাসী ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়া লইল—সাজ-সজ্জা ফরাসী কেতায় গড়িল। বহু মূল্য রেশমি পোষাক পরিয়া সে যখন ঝক্‌মকে বেরুসে চড়িয়া পারির পথে বেড়াইতে বাহির হইল, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য ও রূপের ছটায় সহরের আপামর সাধারণের তাক লাগিয়া গেল। সকলে বলিল, হাঁ, একটা রূপসী বটে!

তারপর ব্যারণেস খুব সমারোহে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল; গির্জ্জায় ও আতুর সভায় অজস্র অর্থ দান করিয়া প্রচুর নাম কিনিল। এই সব ব্যাপারে তাহার প্রধান সহায় ছিল, লি-মার্কার। তাহারই উপদেশে ব্যারণেস বুঝিল, এখানকার সমাজকে হাত করিতে হইলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তার পর যাহা করিবার আপনা হইতেই ঘটিবে; আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না। কারণ সমাজ বশ করিতে হইলে প্রধান যে দুইটি অস্ত্রের প্রয়োজন, ব্যারণেসের তাহা প্রচুর আছে—সে দুটি অস্ত্র, রূপ ও অর্থ।

লি-মার্কারের কথাই সত্য দাঁড়াইল। পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ দুই হাত বাড়াইয়া হেমারলিঙ-গৃহিণীকে বুকে তুলিয়া লইল। একজন শুধু ইহাতে সায় দিতে পারিল না—সে মাদাম জাঁস্থলে। মাদাম টিউনিসের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা—পারির লোক যতই ব্যারণেসকে মাথায় তুলুক, মাদাম জাঁস্থলে এই বাঁদীকে কিছুতেই বন্ধুর চক্ষে দেখিতে পারিল না। এ অপমান ব্যারণেসের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিল।

তাহার পর রাজ্যের কোন অধীশ্বরী যেমন করিয়া ধীরে ধীরে আপনার শক্তির প্রভাব বিপক্ষ পক্ষকে ভালো করিয়া জানাইয়া দেয়, ব্যারণেসও রূপ ও অর্থের সাহায্যে জাঁস্থলে-পরিবারকে তেমনই ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ চলিল। সে যুদ্ধে মুখামুখি অস্ত্র চলে না—গোপন অন্তরালে বসিয়া ব্যারণেস শরক্ষেপ করে, আর সে শর গিয়া বেচারা নবাবকে বিঁধিয়া একেবারে জর্জ্জরিত করে! নবাব বিপন্ন, পরাজিত হইলেন। হেমারলিঙ ও তাহার পত্নী জয়ের গর্ব্বে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তবুও ব্যারণেসের মনে একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল। এ শর মাদাম জাঁস্থলেকে কৈ এতটুকুও বিচলিত করিল না ত! ব্যারণেস ভাবিয়াছিল, এ শরের আঘাতের বেদনায় মাদাম জাঁস্থলে আসিয়া তাহার দরবারে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইবে, তাহার ক্ষমা চাহিয়া তাহার সখীত্ব মাগিয়া সেই অতীত দিনের তীব্র অপমানের জ্বালা হইতে

ব্যারণেসকে মুক্তি দিবে! কিন্তু কোথায় মাদাম জাঁস্থলে!

তাই সেদিন হেমারলিঙ আসিয়া যখন মেরিকে গোরস্থানের ব্যাপার খুলিয়া বলিল, তখন একটা জয়ের আনন্দে মেরির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মেরি ভাবিল, এবার পার্টি দেওয়া তবে তাহার সার্থক হইল। দর্পিতা নারীর উপর সে দর্পের শোধ কেমন করিয়া লইবে, তাহারই উপায় সে চিন্তা করিতে লাগিল।

পার্টির দিন ব্যারণেস একটি লোকের প্রতীক্ষায় অধীরভাবে বসিয়া রহিল—কখন্ সে আসে। যতই বিলম্ব হইতেছিল, অধীরতা ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল। সকলের অভ্যর্থনার ভার অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া ব্যারণেস নিজে এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বসিয়া রহিল। এই কক্ষের খোলা জানালা দিয়া বাড়ীর ফটক দেখা যায়! বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল; তবুও হায়, সে আকাঙ্ক্ষিত জন আসিল না! ব্যারণেসের মনটা ক্রুদ্ধ সর্পের মতই গর্জ্জিতে লাগিল।

পার্টি তখন শেষ হইয়া গিয়াছে—রাত্রি গভীর হইয়াছে। অতিথির দল যাইতে সুরু করিয়াছে, এমন সময় কালো একটা কোট গায়ে নবাব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একেলা, মুখ তাঁহার শুষ্ক, চোখে দারুণ উদ্বেগ ও বিরক্তি মাখানো রহিয়াছে। গাগলের মত মূর্ত্তি! মাদাম আসিতে রাজী হইল না—কিছুতেই না; নবাবের সহস্র কাতর অনুনয়েও নয়।

সেদিন ভোর হইতেই নবাব স্ত্রীকে তাড়া দিতেছিলেন, সাজ-সজ্জার আয়োজন কর। বৈকালে একটা নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে হইবে। একে ত এই স্থূল দেহখানা লইয়া টানাটানি করিতে মাদাম জাঁস্থলে সহজেই নারাজ, তাহার উপর যখন সে শুনিল, হেমারলিঙের গৃহে নিমন্ত্রণ এবং এ নিমন্ত্রণের মূলে সেই বাঁদী, তখন সে একেবারে কঠিন হইয়া বসিল, কিছুতেই সেখানে যাইবে না। ইহার জন্য পৃথিবী যদি রসাতলে যায়, তবুও না! এত বড় অপমান মাদাম জাঁস্থলে একটা রাজ্যের বিনিময়েও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। নবাব কত মিনতি করিলেন, কত সাধিলেন,—নহিলে সব যায়—এ অভিমান, এ গর্ব্ব লইয়া বসিয়া থাকিলে পথের ভিখারী হইতে হইবে। প্রাণে যোগ না-ই থাকিল, শুধু একবার হাজিরা দেওয়ায় দোষ কি! অন্তরে বিরক্তির মহাভার চাপিয়া রাখিয়া একবার হাসিমুখে দুইটা কথা বলিলেই বা! কিন্তু মাদামের ধনুর্ভঙ্গ-পণ, কিছুতেই নড়িবার নহে। প্রাণ যায় যাক্—সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তাহাতেও মাদাম জাঁস্থলে কাতর নহে—কিন্তু তাই বলিয়া একটা বাঁদীর পার্টিতে গিয়া ইজ্জৎ খোয়াইবে—অত-বড় আফ্‌সিন বংশে জন্মিয়া এক কলঙ্কিনী বাঁদীর সখীত্ব স্বীকার করিবে—তেমন পিতার কন্যাই সে নয়!

নবাব সাধিলেন, কাঁদিলেন, রাগিলেন, তবুও স্ত্রীর মন টলিল না। তখন অগত্যা তিনি একেলাই হেমারলিঙের গৃহের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হেমারলিঙের গৃহে পৌঁছিয়া সম্মুখেই হেমারলিঙ ও ব্যারণেসকে দেখিয়া নবাব

কম্পিত স্বরে কয়টা কথা উচ্চারণ করিলেন, "মাদাম জাঁস্থলের শরীরটা বড় খারাপ—আসতে পারলেন না বলে তিনি ভারী দুঃখিত! আমারও সেজন্য আসতে দেরী হয়ে গেল—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্যারণেস কহিল, "হাঁ, আমি জানি, জানি আমি—" নবাব স্পষ্টই বুঝিলেন, সে স্বরে ব্যারণেসের মনের সমস্ত ঝাঁজ ফুটিয়া বাহির হইল! ব্যারণেস সেখান হইতে ক্ষিপ্র পাদক্ষেপে চলিয়া গেল।

নবাব ও হেমারলিঙ উভয়েরই মুখে কিয়ৎক্ষণের জন্য কোন কথা ফুটিল না। পরে হেমারলিঙ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বড় দুঃখের বিষয় যে, তোমার স্ত্রী এলেন না!"

গভীর নৈরাশ্যে জাঁস্থলের মস্তিষ্ক স্থির ছিল না। তিনি কোন মতে হেমারলিঙের কথারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিলেন, "বড় দুঃখের বিষয় বৈ কি!" তাহার পর হেমারলিঙের মুখের পানে চাহিয়া নবাব আবার বলিলেন, "কিন্তু শোন লাজেয়ার, আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে বনিবনাও নেই বলে আমাদেরও কেন বনিবনাও থাকবে না? আমাদের বন্ধুত্ব কত দিনের এ—"

হেমারলিঙ কহিল, "তা ত বটেই! দেখা যাক্—এখন তুমি একটু বসবে কি?"

নবাব কহিলেন, "না, থাক্। তুমি বোধ হয় ব্যস্ত আছ—!"

"হাঁ, ভালো কথা! তা হলে লি-মার্কারের সে ছবির ব্যাপারটা—কবে তোমার সুবিধা হতে পারে, বল দেখি।"

"তার আর সুবিধা-অসুবিধা কি! যেদিন হোক! ভাল কথা—আমি দিন স্থির করে পরে চিঠি লিখব'খন। দু'একদিনের মধ্যেই সেরে ফেলা যাবে—কি বল?

"তুমি ভুলে যাবে না? দেখো। বুঝছ ত, কত জরুরি কাজ এটা—"

"আরে না, না! ভুলব কি! দু'এক-দিনের মধ্যেই তুমি আমার চিঠি পাবে। তাহলে আজ এই অবধি—"

হেমারলিঙ সেখান হইতে চলিয়া গেলে নবাব বিদায় লইলেন।

ইহার দুই দিন পরে হেমারলিঙের নিকট হইতে নবাব এক পত্র পাইলেন। হেমারলিঙ লিখিয়াছে,

"বন্ধুবরেষু

আমি নিজে তোমায় সঙ্গে করিয়া লি-মার্কারের ওখানে যাই, এমন অবসর ইতিমধ্যে চট্ করিয়া মিলিতেছে না! বড় কাজের ভিড় পড়িয়াছে; অথচ এটা খুব জরুরি ব্যাপার। যাই হোক, ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার একলা যাওয়াই ঠিক। নয় কি? কোন দ্বিধা করিয়ো না। লি-মার্কারকে বলা আছে। যে কোন দিন সকালে বেলা আটটা হইতে দশটার মধ্যে তুমি তাহার কাছে যাইতে পার।

তোমারই হেমারলিঙ।"

চিঠির তলায় 'পুনশ্চ' বলিয়া লেখা আছে, "ছবির কথা মনে রাখিয়ো।"

চিঠি পড়িয়া নবাব বিস্মিত হইলেন। চিঠিখানার অর্থ কি? সত্যই কি তাহার অবসর নাই, না, অসম্মতি জানাইবার এ একটা ভদ্র রকমের ছল, শুধু? যাহা হোক, এ-সব ভাবিয়া দেখিবার আর সময় নাই। কাজেই একদিন সকালে জাঁস্থলে লি-মার্কারের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

র‍্যা ক্যাশেয় কাথলিক ক্লবের নিকট লি মার্কারের গৃহ। লি মার্কার ব্যারিষ্টার, নায়নের ডেপুটি, ফ্রান্সের যত ধর্ম্ম সভার এজেণ্ট। হেমারলিঙের সহিত পরিচয় হইবার পর হইতে তাহাকে আর ব্যারিষ্টারি করিতে হয় না—হেমারলিঙের ব্যাঙ্কে মোটা রকম পাওনা আছে। সপ্তাহে দুই-চারি দিন হেমারলিঙের আফিস তদারক করাই তাহার কাজ।

লি মার্কারের গৃহে তখন ভারী ভিড়। রাজ্যের লোক নানা কাজে দেখা করিতে আসিয়াছে সকলে হল-ঘরে বসিয়াছিল—যখন যাহার ডাক পড়িবে, তখন সে গিয়া দেখা করিবে! নবাব আসিয়া সেই দলে মিশিয়া বসিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাঁহার ডাক পড়িল। নবাব উঠিয়া কম্পিত বক্ষে লি মার্কারের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরখানি বড়। প্রকাণ্ড একখানা গদিয়ান চেয়ারে লি মার্কার তাহার দীর্ঘ দেহ গুঁজিয়া বসিয়া আছে। ঘরের চারিধারে বড় বড় দ্বার—দ্বার-পথে মোটা পরদা ঝুলিতেছে। নবাব লি মার্কারকে অভি-বাদন করিলেন—লি মার্কার চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন, পরে চোখ হইতে চশমাজোড়া নামাইয়া টেবিলে রাখিয়া লি মার্কার কহিলেন, "আপনার কি কথা, বলুন।"

"সেই কথাই আমি বলতে এসেছি, ম্যসিয়ো! আপনি হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছেন, যে এ কথা কমিটির কাছেই বললে চলত—কিন্তু ব্যাপারটা এত ঘরোয়া রকমের যে সাধারণের কাছে অত কথা প্রকাশ করে বলা ঠিক হবে না—বিষয়টা গোপনীয়। বিশেষ সে কথা নিয়ে সাধারণে নাড়াচাড়া করলে আমার একজন পরমাত্মীয়ের মনে অত্যন্ত বেদনা দেওয়া হবে। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে আমার এখানে আসা।"

লি মার্কার গোঁফে দুই চারিটা পাক দিয়া বলিলেন, "বলুন।"

নবাব বলিলেন, "শুনুন তবে। আপনার রিপোর্ট যে সঠিক আর নিরপেক্ষ হবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে পথে-ঘাটে আমার নামে যে একটা অপবাদ সম্প্রতি রটে বেড়াচ্ছে, সেটা একে-বারে মিথ্যা। আশা করি, সে মিথ্যা জনরব থেকে আপনি আমার সম্বন্ধে কোনরকম ভুল ধারণা করে বসেন নি! সেই অপবাদ সম্বন্ধেই দু-চারটে কথা আজ আমি বলতে এসেছি। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, সে সব কথা। আমি আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ অবধি আজ সঙ্গে এনেছি। সব দেখলে-শুনলে সহজেই আপনি বুঝবেন, ব্যাপারটা কতখানি গোপনীয়, আর কেনই বা সেটা সাধারণে প্রকাশ করা যায় না।"

তাহার পর নবাব লি-মার্কারকে এক-খানি সার্টিফিকেট দেখাইলেন। সেখানা টিউনিস মন্ত্রীসভার সার্টিফিকেট—তাহাতে লেখা আছে, দীর্ঘ বিশ বৎসর জাঁস্থলে টিউনিসে ছিলেন—এবং এই দীর্ঘ কালের মধ্যে দুইবার মাত্র তিনি টিউনিস ত্যাগ করিয়াছিলেন—একবার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার

পিতাকে দেখিতে—আর একবার বে'র সঙ্গে দেখা করিতে। তাহা ছাড়া এ বিশ বৎসরে নবাব কখনও এক দিনের জন্যও টিউনিস-ছাড়া হন নাই! নবাব কহিলেন, "আপনি এখন বলতে পারেন, এমন প্রমাণ আমার হাতে থাকতে কেন আমি এই সব মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করিনি? তারও কারণ আছে, ম্যসিয়ো। আমার এক ভাই আছে—বেচারা ভাই—পারি সহরের বিলাস-পাপে পঙ্কিল, রুগ্ন ভাই! প্রথম বয়সে পারির বদ্ সঙ্গে পড়ে সে কলঙ্কের কালি মেখে ঘরে ফিরেছিল! কিন্তু সত্যই কি—এই যে অপবাদ-কলঙ্ক আমার নামে আজ রটে বেড়াচ্ছে, সে এতদূর মেখেছিল? তার সন্ধান নেবার সাহস আমার কখনও হয়নি—ভয়ে সে সন্ধান নিওইনি আমি। আমার বাপ এই ভাইয়ের উপর বড় আশা গড়ে তুলেছিলেন। সেই ভাইয়ের এই কীর্ত্তি দেখে তিনি বড় শোক পেয়ে মারা যান। মরবার সময় অতি দুঃখে আমায় তিনি বলেছিলেন, 'বার্ণার্ড, তোমার দাদাই আমায় মারলে! এত বড় লজ্জা, এতখানি কলঙ্ক গায়ে মেখে বাঁচা যায় না!' সে কথা আমি কখনও ভুলবো না।"

নবাব নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে আবার কহিলেন, "বাবা গেছেন, কিন্তু আমার মা এখনও বেঁচে আছেন, ম্যসিয়ো। আমার বেচারী, স্নেহময়ী মা! মা আমার এ-সব কিছুই জানেন না। তিনি জানেন, ছেলে তাঁর রোগে ভুগেই এমন হয়েছে। এ সব কথা শুনলে মা আমার পাগল হয়ে যাবেন। তাই আমি মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারি না। না হলে 'মেসেঞ্জার' কাগজ প্রথম যেদিন আমায় গাল দিলে, সে দিন আমি তাকে অমনি ছেড়ে দি! নালিশ-মকদ্দমা করলে চারদিকে ঢাক বেজে যাবে—মার কানে সব কথা পৌঁছুবে—শুধু সেই ভয়ে আমি চুপ করে সে সব অপমান সহ্য করেছি। এখন বলুন, ম্যসিয়ো, আমার অপরাধ কি, আপনার কাছে আমার মিনতি! এই ত প্রমাণ। আমি দেখালুম ত, এ অপবাদের মূলে আমার থাকা কতখানি অসম্ভব! আপনি সব শুনলেন, এখন আপনি আমার বিচার করুন।"

লি মার্কার স্থিরভাবে সব কথা শুনিল, কিছু বলিল না। তাহার পর নবাব সবিস্তারে আপনার জীবন-কাহিনী বলিয়া গেলেন। পিতার দরিদ্র অবস্থা,—তাহার মধ্যেও বড় ভাইকে মানুষ করিবার জন্য কি তাঁহার আগ্রহ! কত ব্যয়ে তাহাকে সহরে পাঠানো—সেই ভাই শেষে কি হইয়া দাঁড়াইল! তাহার পর ভাগ্যান্বেষণে কোন্ সে সহায়-হীন সুদূর দেশে নবাব যাত্রা করিলেন! সেখানে জ্বলন্ত রৌদ্রে মাথা পাতিয়া, বন্য অসভ্য লোকগুলার সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া একটি-একটি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া এতখানি ঐশ্বর্য্য জমাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন! এখানে চারিধারে কি এ চক্রান্ত—নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র—আর নবাব একা সে সকলের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন! যিনি একমাত্র সহায় ছিলেন, তিনিও আজ পার্শ্বে নাই!

বলিতে বলিতে নবাবের প্রাণ কখনও মমতায় গলিয়া যাইতেছিল, কখনও ক্রোধে

তাতিয়া উঠিতেছিল; লি মার্কার স্তব্ধভাবে বসিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া চলিয়াছিল। বর্ণনার উচ্ছ্বাসে নবাব শেষে বলিয়া ফেলিলেন, "ভাল কথা! আমার বন্ধু হেমারলিঙ বলছিল, আপনার ভাঙা ছবির সখ! অনেক ভাল ভাল ছবি আপনি চড়া দামে কিনেওছেন!"

লি মার্কার নম্র স্বরে কহিল, "কোথায় তেমন ছবি? ছবির দাম কি আজকালকার বাজারে—! ও-সব বড়মানুষেরই সাজে! ডিউক, নবাব—তাঁদেরই এ সখ পোষায়—নাহলে আমাদের মত গরীবদের—! হুঁ! ঐ ত কখানা ছবি শুধু, এই ঘরেই ঐ রয়েছে। তারই দাম কি!"

নবাব দেওয়ালের পানে চাহিলেন। লি মার্কার খুব সতর্কভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। নবাব কহিলেন, "মাঝের দেওয়ানটা ফাঁক রয়ে গেছে যে! আমার কাছে ভাঙ্গিয়ের একখানা ছবি আছে—ছবিখানা ভাল, দামীও বটে! অনুমতি করেন ত সেখানা ঐ দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে যাই।"

নবাবের অলক্ষ্যে লি মার্কারের অধর-প্রান্তে হাসির একটা মৃদু বিদ্যুৎ-রেখা খেলিয়া গেল। লি মার্কার ইহাই চাহিতেছিল। এই কথাটুকুর জন্যই সে অতখানি ধৈর্য্য ধরিয়া নবাবের কাহিনী দিব্য শুনিয়া যাইতেছিল। এখন এই কথা শুনিয়া লি-মার্কার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে সে কহিল, "আপনি বলতে চান, এই ছবিখানা ঘুষ নিয়ে রিপোর্টটা আগাগোড়া আবার বদলে লিখি—কেমন, এই ত চান আপনি? বলুন, সেই জন্যই আজ এসেছেন এখানে!" পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘণ্টা টিপিয়া লি-মার্কার আবার বলিল, "জীবনে অনেকের অনেক-রকম আস্পর্দ্ধা দেখেছি বটে, কিন্তু আপনার এ আস্পর্দ্ধার আর তুলনা নেই! আমার বাড়ীতে বসে আপনি আমায় এমনভাবে অপমান করতে সাহস পান—!"

"কিন্তু শুনুন, ম্যসিয়ো, রিপোর্টের সম্বন্ধে কোন কথা—!"

ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া একটা ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিল। লি মার্কার তাহাকে কহিল, "এঁকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দাও—"

লজ্জায় অপমানে জাঁস্থলে যেন মরিয়া গেলেন। তিনি উঠিয়া যন্ত্র-চালিতের মত ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন শূন্যে ঝুলিতেছেন, পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গিয়াছে—! লি মার্কার কহিল, "আপনি শুধু আজ আমায় অপমান করেন নি, ফ্রান্সের সদস্য সভার অপমান, সমস্ত ফরাসী জাতির অপমান করেছেন, তা জানেন। এ কথা আজই আমি সকলকে বলব। মনে রাখবেন, নবাব বাহাদুর, এটা আফ্রিকা নয়, এ ফ্রান্স। এখানে পয়সা দিয়ে লোকের বিবেক কেনা-বেচা চলে না।"

নবাব পাগলের মত টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে লি মার্কার পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া পরদা টানিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেমন, ব্যারণেস মেরি, আমার অভিনয়টা দেখলে কেমন, সুন্দরী!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

ভারতের শাসনপদ্ধতি

ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা বিধান করিয়া, ইংলণ্ড যে বৃহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সুসিদ্ধ করেন নাই, পরন্তু শুধু তাহার আয়োজন মাত্র করিয়াছিলেন। সেই বৃহৎ কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি এই—যথা :—ভারতকে জাতিভেদ হইতে, ব্রাহ্মণ্যিক উৎপীড়ন হইতে, সামন্ততন্ত্র হইতে মুক্তিদান করিয়া, স্বকীয় ক্রমবিকাশের পথ অবাধে অনুসরণ করিতে সমর্থ করা। নৈতিক ও ভৌতিক সভ্যতার পুষ্টিসাধন করিয়া, কেবল য়ুরোপীয় প্রভাবই এই রূপান্তর সংসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের নৈতিক সভ্যতার উপর এই প্রভাব কিরূপ কাজ করিয়াছিল তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী, সৈন্য-মণ্ডলী, বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতির পর-পর অনুশীলন করিলে সুবিধা হইবে।

১৮৫৭ অব্দের ঘটনাবলী, প্রাচীন পদ্ধতিকে স-দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। সুতরাং কতকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা ভারতের জন্য আবশ্যক হইল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির যুগল প্রকৃতি :—বর্ত্তমানে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান অশান্তি-বিক্ষুব্ধ দেশে পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে; কালক্রমে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিই উদার নৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কারণ, বিদেশে উপনিবেশ-রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের যে একটা বিশেষ পটুত্ব আছে, সেই পটুত্বের বশবর্ত্তী হইয়াই ইংলণ্ড বুঝিলেন, সিপাহী-বিদ্রোহ হইতে যে শিক্ষালাভ হইল তাহা প্রজা-পীড়নের শিক্ষা নহে, পরন্তু মুক্তিদানের শিক্ষা।

অতএব ভারতের শাসনপদ্ধতি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে উত্তরোত্তর কি-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এক্ষণে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

*
* *

প্রথমে দুইটি সমস্যার সমাধান আবশ্যক হইল। প্রথম, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কিরূপ সম্বন্ধ—এই এক সমস্যা। জাতি ও আচার ব্যবহারে ভারত ইংলণ্ড হইতে ভিন্ন; উহাদের স্বার্থ সব-সময়ে এক হইতে পারিবে না; অতএব ইহা স্বাভাবিক যে ভারত ইংলণ্ডের ঐকান্তিক প্রাধান্য হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিবার জন্য সতত উন্মুখ হইবে। কিন্তু ভারত ইংরাজ সাম্রাজ্যের একটা অংশ; শান্তির সময়ে ও যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডকে সাহায্য করা ভারতের কর্ত্তব্য। তা ছাড়া, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে, স্বকীয় উপনিবেশ-রাজ্যের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করিতে ইংলণ্ডের রাজধানী বাধ্য হইয়াছিল, অধুনা ঐ তত্ত্বাবধান অনাবশ্যক; তথাপি এখনো সে সময় আসে নাই যে, অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার ন্যায় ভারত স্বরাষ্ট্রশাসনের অধিকার লাভ করিতে পারিবে; ভারতের আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজ-সৈন্যমণ্ডলী আবশ্যক; পরস্পর-বৈরী বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির মধ্যে শান্তি রক্ষার্থে এবং যে প্রভূত অর্থের জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকট ঋণী, সেই ঋণ পরিশোধার্থ ইংরাজের শাসনকর্ত্তৃত্ব আবশ্যক। এইরূপে, ভারত ইংলণ্ডের অধিপতি ও ইংরাজ পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই পার্লামেণ্টের অধীনে, ভারতের প্রতিনিধিরূপ কাজ করিবার জন্য, এবং আইন ও অন্যান্য প্রভৃতি রাজার দ্বারা মঞ্জুর ও স্বাক্ষর করাইয়া লইবার জন্য, ভারত-রাষ্ট্র-সচিব পদের সৃষ্টি হইল; এই ভারত-সচিব ইংলণ্ডের মন্ত্রি-পরিষদের অঙ্গীভূত; একজন স্থায়ী সরকারী সচিবও নিযুক্ত হইল এবং ১০ হইতে ১২ জন সভাসদ্ লইয়া একটি ভারত-মন্ত্রি-পরিষৎও গঠিত হইল। সচরাচর সময়ে, ভারতসচিব যে সকল কার্য্যোপায় অবলম্বন করেন ভারত-মন্ত্রি-পরিষদ্ তাহারই অনুমোদন করিয়া থাকেন। তবে কোন বিশেষ জরুরী কাজ উপস্থিত হইলে, ভারত-সচিব ভারত-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করিয়াই স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করেন।

এই প্রকার পদ্ধতির একটু দোষ আছে। ইহা ভারতের স্বার্থকে, ইংলণ্ডের স্বার্থের, এমন কি পার্লামেণ্টে-অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি দলের স্বার্থের অধীন করিয়া রাখে। কিন্তু উক্ত দুই দেশের মধ্যে ঐক্যের যে বীজ মন্ত্রটি রহিয়াছে, উহা উহাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা-অনুসারে, নিরন্তর অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তিত হইবে। গোড়ায়, কয়েক লক্ষ মনুষ্য লইয়া একটি জাতি, কোটি কোটি মনুষ্যের বাসভূমি এক মহাদেশকে বশীভূত করে। কিন্তু বিজেতাদিগের সভ্যতা বিজেতা-দিগকে এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, স্বাধীনতার শিক্ষা দেওয়াতেও লাভ আছে; পক্ষান্তরে বিজেতাদের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বিজিতে-রাও বুঝিয়াছিল যে, স্বাধীনতার অধিকার ও কর্ত্তব্য-সকল যারপরনাই বাঞ্ছনীয়।(১)

***

দ্বিতীয় সমস্যা—ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন

(১) বর্ত্তমান ১২ জন সভাসদ্ লইয়া "ভারত-পরিষৎ" (India Council) গঠিত। ১৮৫৮ অব্দের আইনের দ্বারা সভাসদের সংখ্যা ১৫ জন নির্দ্ধারিত হয়। তার পর, ১৮৯৩ অব্দের আইনের দ্বারা ঐ সংখ্যা কমাইয়া ১০ জন নির্দ্ধারিত হয়। ভারতসচিবের প্রস্তাব-অনুসারে ১০ বৎসরের জন্য এই সভাসদ্ সকল রাজাকর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকে। প্রায়ই, দশবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, আবার উহারা ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত হয়। সমস্ত গুরুতর ব্যাপারে, ভারত-সচিব পরিষদের মন্ত্রণা গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি এই মন্ত্রণা উপেক্ষা করিতেও পারেন, এবং কোন বিশেষ জরুরি কাজ উপস্থিত হইলে, পরিষদ্‌কে আহ্বান না করিতেও পারেন। বিচার-বিভাগ, কোষ-বিভাগ, সমর-বিভাগ, রাজস্ব-বিভাগ, রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যের বিভাগ, পূর্ত্তকর্ম্মের বিভাগ—এই সকল বিভাগ অনুসারে, ভারত-পরিষৎ বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত। এই সকল বিভাগের এক এক জন স্থায়ী সম্পাদক আছেন, তাঁহারা পরিষদের অঙ্গীভূত নহেন। ঐ সকল কার্য্যসম্পাদক বা প্রধান মুন্সী প্রায়ই ভারত-সরকারের অবসর-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

করা। অর্দ্ধশতাব্দীকাল হইতে, ভারত-সরকার 'কেন্দ্রীভূত' শাসন ও 'নিষ্কেন্দ্রীকৃত' শাসন—এই দুই প্রণালীর কার্য্যই সমাধা করিয়াছেন। কেন্দ্রীভূত শাসন এই জন্য—যেহেতু তিনটি বিভিন্ন প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য, কেবল ইংরাজকর্ত্তৃক ভারতজয়ের সোপান-পরম্পরা স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র; তাই উত্তরোত্তর সমস্ত বড় বড় পদের কর্ম্ম, কলিকাতায় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। নিষ্কেন্দ্রীকৃত শাসনের প্রয়োজন হইল এই জন্য যে, ১৮৫৮ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রদেশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে লাগিল;—সেই সকল প্রদেশের মধ্যে জাতিগত ভেদ, ঐতিহ্যভেদ, ভূমির প্রকৃতিভেদ, আব্ হাওয়ার ভেদ। কাযেই তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা, বিশেষ প্রকারের বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল। সম্ভবত এই সকল বিভিন্ন প্রদেশও, অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার ন্যায় অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্রশাসনের অধিকার লাভ করিবে। (২)

এই দুই সমস্যা সমাধানান্তে, এক্ষণে অনুসন্ধান করা যাক্, কি পরিমাণে ইংরাজি মতামত ও ভারতীয় মতামত ভারত-ব্রিটেনীয় রাষ্ট্রের সংগঠন-কার্য্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় মূল-ভাবটি ইংরাজি নহে, পরন্তু ভারতীয়; যেহেতু, মূলাংশে ভারতের শাসনতন্ত্র বিশুদ্ধ শাসনতন্ত্র ও অসীম কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন। কিন্তু তাহার পরেই, শাসনতন্ত্রঘটিত ইংরাজি মূল-ভাব, ভারতীয় মূলভাবটির তীব্রতা একটু কমাইয়া দিল, একটু সংযত করিল। বর্ত্তমানে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অসীম কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন হইলেও, ভাইসরয় অসীম কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন নহেন। ইংলণ্ডে, তিনি ভারত-সচিবের অধীন।

ভারতের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক মন্ত্রণা-সভা আছে; ইহা সম্পূর্ণ ইংরাজি ধরণে

(২) কেন্দ্রীকরণ চেষ্টার পথে, এখনো কতকগুলি সংস্কার সাধন করিতে বাকি আছে; যথা,—এখন যেমন ইংলণ্ডের ভারতসচিবকর্ত্তৃক, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিকদিগের মধ্য হইতে বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণর মনোনীত হয়—তাহা না হইয়া, ভাইস্-রয় কর্ত্তৃক ঐ দুই গভর্ণর মনোনীত হওয়াই উচিত; লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরদিগের ন্যায় উহাদিগের ভাইস-রয়ের অধীনে থাকাই উচিত—ইংলণ্ডীয় মন্ত্রীসভার সহিত সাক্ষাৎভাবে উহাদের পত্রব্যবহার থাকা উচিত নহে।

নিষ্কেন্দ্রীকরণ চেষ্টার পথে, যে সকল প্রধান-প্রধান সংস্কার সাধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে—যথা;—প্রথমে লর্ড-মেয়ো প্রদেশগুলিকে কোষ-সম্বন্ধীয় কতকটা স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের জন্য, (১৮৬১) উত্তর-পশ্চিমে প্রদেশগুলির জন্য (১৮৭৭) ব্রহ্মদেশ ও পঞ্জাবের জন্য, (১৮৯৭) ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি। শিক্ষা সম্বন্ধে, পূর্ত্তকর্ম্ম সম্বন্ধে, পুলিশ প্রভৃতির সম্বন্ধে, প্রদেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা উপভোগ করে। বোধ হয় আর কতকগুলি সংস্কার আবশ্যক হইবে। বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর, গভর্ণর উপাধি লাভ করিতে পারেন। মধ্য-ভারতের প্রদেশগুলি ও আসামের চীফ্-কমিশনার লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর উপাধি লাভ করিতে পারেন। সকলেরই এক একটা শাসনকার্য্যনির্ব্বাহক পরিষৎ (Executive Council) থাকা আবশ্যক; তাহারাই মন্ত্রীসভার স্থান অধিকার করিবে। এই সংস্কারটি বিশেষরূপে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গদেশে নিতান্ত আবশ্যক।

গঠিত এবং ইহা মন্ত্রি-পরিষদের স্থলাভিষিক্ত। ভারত-সচিবকর্ত্তৃক ৫জন সভাসদ মনোনীত হইয়া থাকে। এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি এই পরিষদের একজন অতিরিক্ত সভাসদ্। ইহার ছয়টি বিভাগ আছে; এই ৬ বিভাগের অধ্যক্ষ ছয়টি সচিব। কোষাধ্যক্ষ সচিব, পূর্ত্তকর্ম্মাধ্যক্ষ সচিব, আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সচিব, কৃষি ও রাজস্বের সচিব, স্থলযুদ্ধ ও নৌযুদ্ধের সচিব, বিধিব্যবস্থার সচিব, পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সচিব এবং সামন্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সচিব।

একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে; ইহাও ইংরাজি ধরণে গঠিত। ইহার বিলম্বিত ক্রমবিকাশ, ব্রিটিশ-পার্লে-মেণ্টের ক্রম-বিকাশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রথমে ইহা ভাইসরয়ের একটা সাদাসিধা পরামর্শ সভামাত্র ছিল, তাহার পর স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট ও স্বাধীন মতের অধিকারী হইল, এবং ১৮৯২ হইতে ভারতের ভাবী রাষ্ট্রীয়সভার প্রথম-আকার ধারণ করিল। ভাইস্-রয়, সেনাপতি, সচিববর্গ, বম্বের লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর সমেত, ১৭ হইতে ৩৩ জন পর্য্যন্ত ইহার সভাসদ্ সংখ্যা। (৩) অন্যান্য সভাসদ, সরকারের কর্ম্মচারীমণ্ডলী হইতে, জজ্ ও কৌঁশুলির মধ্য হইতে, অথবা কোন কোন নির্ব্বাচন মূলক সভাসমিতি হইতে, ভাইস্-রয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই সভা, আইন-জারি সম্বন্ধে মতামত প্রদান করে, বার্ষিক আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব পরীক্ষা করে; কিন্তু যেহেতু সরকারী কর্ম্মচারিদিগেরই সংখ্যাধিক্য, সুতরাং, যে বাদানুবাদ প্রকাশ্য-রূপে হইয়া থাকে ও সংবাদপত্রাদিতে সমালোচিত হয়, সেই বাদানুবাদের কেবল একমাত্র লক্ষ্য—যতদূর সম্ভব সরকারকে সকল বিষয়ে ভাল করিয়া ওয়াকিব-হাল করা।

এই কেন্দ্রগত কর্ত্তৃমণ্ডলীর নীচে, কতক-গুলি বড় বড় শাসন বিভাগ আছে। দুই প্রেসিডেন্সি:—বোম্বাই ও মাদ্রাজ। এই দুই বিভাগের গভর্ণর সাক্ষাৎভাবে ভারত-সচিব কর্ত্তৃক মনোনীত হয়। ইহার পর আর সাতটি প্রদেশ:—বঙ্গদেশ, মিলিত-প্রদেশসমূহ (উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা), পাঞ্জাব, ও ব্রহ্মদেশ;—এই সকল প্রদেশ লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরের অধীন। মধ্যভারতের প্রদেশসমূহ ও আসাম, চীফ্ কমিশনরের অধীন; এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত-প্রদেশ (১৯০১ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট হয়) ভাইস্-রয়ের একজন প্রতিনিধি কর্ম্মকর্ত্তার অধীন। (৪) মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে; বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যুক্ত-প্রদেশসমূহ ও পঞ্জাব—ইহাদেরও এক একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে।

(৩) গ্রন্থকার যখন লিখিয়াছিলেন, তাহার পর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে।—অনুবাদক।

(৪) তা ছাড়া, কুর্গ, ব্রিটিস্ বেলুচিস্থান, আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জ—এই সকল স্থানেরও চীফ-কমিশনার আছে।

কিয়দংশ মনোনীত সদস্য লইয়া, কিয়দংশ নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া, কিন্তু অধিকাংশই মনোনীত সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া এই সকল সভা গঠিত। এই সকল সভা, নিজ নিজ এলাকায় প্রযুয্য আইন প্রণয়নে মতামত প্রদান করিয়া থাকে।

ভারত ২৪৮ জেলায় বিভক্ত। গড়ে উহাদের অধিবাসী-সংখ্যা ৮৮০,০০০। এই সকল বিভাগ কালেক্টর মেজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পরিশাসিত। এই বন্দোবস্তটা সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের বন্দোবস্ত। কেননা, কালেক্টর (তহসিলদার) খাজনা আদায় করেন, বদমায়েশ্‌দিগকে শাসন করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহাদের প্রতি দুই বৎসর কাল মেয়াদের কারাদণ্ড ও হাজার টাকা পরিমাণ অর্থদণ্ড বিধান করিতে পারেন। তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন জয়েণ্ট-মেজিষ্ট্রেট-কালেক্টর, একজন এসিষ্টেণ্ট মেজিষ্ট্রেট-কলেক্টর এবং একজন ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের হুকুম তালিম করিবার জন্য, সুপারিণ্টেডেণ্ট ও সহকারী সুপরিণ্টে-ডেণ্টের অধীনে পুলিস্‌ অবস্থিত। এই সকল বিভাগ আবার ১০৬১ উপবিভাগে বিভক্ত। উপবিভাগগুলি সব-ডেপুটি [illegible] ষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পরিশাসিত।

মাদ্রাজ ছাড়া, আর সকল প্রদে[illegible] ৫১৬টি জেলা মিলিয়া এক একটি উচ্চ শাসন-বিভাগ গঠিত হইয়াছে। এই বিভাগের কর্ত্তা—একজন কমিশনর (অ[illegible] কমিশনার পদ); বোম্বাই ছাড়া [illegible] সকল প্রদেশেই এক একটা রাজস্ব-পরি[illegible] আছে (Board of Revenue), তা[illegible] সকলগুলিতেই এক একটা মুনসিদ্দ[illegible] আছে (Secretariate)—উহা এক প্রকার প্রাদেশিক সচিব-পরিষৎ।

বিচার-বিভাগের বন্দোবস্ত একেবারে য়ুরোপীয় ধরণের। প্রদেশের প্রধান আ[illegible] স্থানে উচ্চ-আদালৎ বা প্রধান আদা[illegible] অবস্থিত। জেলা-বিভাগে, দেওয়ানী ফৌজদারী জজ্‌, সবডিনেট্‌ জজ্‌; উহা বিভাগগুলিতে মুন্‌সেফ্‌। ছোট আদালত খুজ্‌রা মোকদ্দমা ছাড়া, কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী সকল মোকদ্দমারই আপীল হয়। স্থলবিশেষে, উকীলেরা ইংলণ্ডের প্রিভি কৌন্‌সিলের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে। (৫)

* * *

(৫) যিনি জেলার জজ্‌ তিনি দেওয়ানী জজ্‌, ও ফৌজদারী জজ্‌ উভয়ই। অন্য দেওয়ানী জজ্‌ মুন্‌সি (১০০০ টাকা পরিমাণ পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের ক্ষমতা আছে), নির্ব্বাচিত মুন্‌সিফ, [illegible] পর্য্যন্ত মেক্‌দারের মোকদ্দমা বিচারের ক্ষমতা আছে), সবর্ডিনেট জজ্‌ (সকল দেওয়ানী-মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকার আছে; পক্ষান্তরে জেলা-জজের ১০,০০০ টাকার নীচের মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকার নাই)। মুন্‌সিফ্‌ ও সবর্ডিনেট জজের মোকদ্দমার আপীল জেলা-জজের নিকট আইসে।

ফৌজদারী মোকদ্দমায়, দেওরা-জজের বিচার অধিকারের নিম্নে, মেজিষ্ট্রেটের বিচার অধিকার। [illegible] জজ্‌কে সাহায্য করিয়া থাকে,—কতকগুলি আসেসার অথবা জুরী (৩ হইতে ৯ জন জুরী, প্রায়ই [illegible] সংখ্যা)। উচ্চ-আদালতে জজ্‌কে সাহায্য করেন—কতকগুলি আসেসার অথবা ৯ জন জুরী।

[illegible]খন দেখা যাক, শাসন বিভাগের বাসীই উহার মধ্যে প্রবেশ লাভ [illegible] দেশীয় লোকদের কতটা হাত আছে। করিয়াছে। (৭)

[illegible] বিধি-অনুসারে, ইংরাজের সহিত [illegible]র সমান অধিকার। কিন্তু কার্য্যত [illegible] অল্প ভারতবাসীই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া [illegible]। কখন কোন ভারতবাসীই শাসন-কার্য্য [illegible]ক পরিষদের সদস্য হয় নাই। (৬) [illegible]১৮৯২ অব্দের আইনে আছে—বড়লাট [illegible] ছোটলাট কতকগুলি ভারতবাসীকে [illegible]পক সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত [illegible]বেন এবং আর কতকগুলির নাম, [illegible]চনমূলক কতকগুলি জনসভা, নির্ব্বাচনের [illegible] উক্ত [illegible] লাটের নিকট সমর্পণ [illegible]বেন। শাসন বিভাগের প্রধান প্রধান [illegible] ভারতীয় সিভিল সর্ভিসের জন্য স্বতন্ত্র- [illegible] রক্ষিত। এই সিভিল সর্ভিসের [illegible]র্ভুক্ত ১০০০ হইতে ১১০০ জন রাজ- [illegible]র সযত্নে সংগৃহীত হইয়া থাকে; এই [illegible]ল সর্ভিস এক শতাব্দী হইতে ভারতকে [illegible] ভাল বুদ্ধিমান অর্থশুচি উদ্যমশীল [illegible]চারী যোগাইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন [illegible]তির প্রতিবাদীপক্ষও তাঁহাদের যোগ্যতা [illegible]কার করিয়া থাকেন। ভারতীয় সিভিল [illegible]র্ভসের দ্বার ভারতবাসীদিগের জন্য উদ্- [illegible]টিত আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে উহার পরীক্ষা [illegible] বলিয়া এখনো পর্য্যন্ত অতি অল্প ভারত-

অতএব উচ্চ-ধাপের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রায় এক মাত্র ইংরজের হস্তেই রহিয়াছে। এবং আরও দীর্ঘকাল উহা ইংরাজের হস্তেই থাকিবে। কেননা, ভারতের ধর্ম্মমত, শ্রেণীবিভাগ, জাতি প্রভৃতি এত অসংখ্য এবং এত মিশ্রিত যে, কোন এক প্রদেশ শাসন করিতে সমর্থ এরূপ দেশীয় কর্ম্মচারী পাওয়া দুর্ঘট। তাছাড়া, লোকেরা যেরূপ শিক্ষা পায় তাহাতে ভাল কর্ম্মচারী তৈয়ারী হইতে পারে না। প্রাচ্য দেশে, পদসম্ভ্রম রক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু এপর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগকে ও প্রাচীন সামন্ত-রাজবংশের উত্ত-রাধিকারীদিগকে এই শাসন বিভাগের কার্য্যে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

কিন্তু যদিও শাসনবিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ইংরাজ, তথাপি প্রায় সমস্ত সাধারণ কর্ম্মচারীই ভারতবাসী; অধিকাংশ ডেপুটি কলেক্টর (ভারতে জন্মিয়াছে এরূপ ইঙ্গ-ভারতীয়ও (ফিরিঙ্গি) ইহার অন্তর্ভুক্ত) সমস্ত সব-ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট্‌, প্রায় সমস্ত পুলিশ,—(কেবল সুপরিনটেণ্ডেণ্ট ও সহকারী বাদে)—ভারতবাসী।

(৬) একথা এখন আর বলা চলে না। অনুবাদক।

(৭) পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল—Covenanted Civil Service. Warren Hastings ও Lord Cornwallis নিজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এই নামটি তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহারা উচ্চ-হারে বেতন পাইত, এবং তাহার বদলে এই অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, উহারা ঘুষে লিপ্ত হইবে না, এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিবে না।

অতএব কার্য্যত ভারতবাসীরাই ভারত শাসন করিয়া থাকে, কেবল তাহাদের উপরে, ৬।৭ শত উচ্চপদের ইংরাজ কর্ম্মচারী তত্ত্বাবধানের জন্য রহিয়াছে।

বিচার-বিভাগে, এই দুই উপাদানের মিশ্রণ কার্য্যটি আরো বেশী অগ্রসর হইয়াছে। সমস্ত বড় আদালতে ভারতবাসীরা বিচারাসনে বসিতে পারে, এবং সমস্ত নিম্নপদে ভারতবাসীরাই নিযুক্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, জেলা-জজের পদটা সচরাচর সিভিল সার্ভিসের লোককেই দেওয়া হয়। কোন কোন বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে (ডাক, টেলিগ্রাফ্, পূর্ত্তকর্ম্ম, বিবরণ-সংগ্রহ, ইত্যাদি) কতকগুলিমাত্র যোগ্য ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে অভিরুচি না থাকায়, ভারতবাসীরা এই সকল কর্ম্ম পাইবার জন্য চেষ্টাও করে না।

*
* *

যদিও যথেচ্ছশাসনতন্ত্রই ভারতের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি, যদিও রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য হইতে ভারতবাসী বঞ্চিত, তথাপি ভারতবাসীগণ পৌরজনের হিসাবে বিপুল স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে:—যথা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গৃহের অলঙ্ঘনীয়তা, সম্মিলনের, আবেদনের ও সভাসমিতি স্থাপনের অধিকারলাভ এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। লর্ড রিপনের রাষ্ট্রসংস্কার, ভারতকে স্পেন, অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মানী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে।

তাছাড়া দুইটি ইংরাজি প্রতিষ্ঠান ভারত ইংরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি—ফৌজদারী মোকদ্দমায় জুরীর ব্যবস্থা। আর একটি—নগরাদিতে (municipalities) পৌর-সভা ও জেলায় গ্রাম্য-সভা; এই সকল সভার উপর পুলিসের ভার, পূর্ত্তকর্ম্মের ভার; এবং উহাদের মতামত (vote) অনুসারে আবশ্যক টেক্স স্থাপিত হইয়া থাকে। সদস্য-সংখ্যায় একাংশ কর্তৃপক্ষকর্ত্তৃক এবং অপরাংশ অধিকাংশ টেক্স-দায়ী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। যদি সম্ভব হয় তবে নির্ব্বাচিত সদস্যসংখ্যা রাজকর্ম্মচারী-সদস্য সংখ্যা হইতে অধিক হওয়া চাই, ভারত বাসী সদস্যের সংখ্যা ইংরাজ সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়া চাই। লোকেরা নিজ অধিকার কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তেমন যত্নশীল না আগ্রহান্বিত না হওয়ায়, নির্ব্বাচন-কর্ত্তারা অতি কষ্টে প্রতিনিধি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেক নির্ব্বাচন-গণ্ডীর মধ্যে, নির্ব্বাচনের জন্য কোন উমেদারই উপস্থিত হয় না। অধিকাংশস্থলে সচরাচর এক শ্রেণীর লোকদিগকেই উপস্থিত হইতে দেখা যায়—হয় উকীল, নয় সংবাদপত্রাদির লোক। কেবল বড় বড় সহরের পৌরকার্য্যনির্ব্বাহক সভাগুলি শ্রমশীলতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে।

ইংলণ্ড ভারতবাসীকে শুধু যে পৌরজনের স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা নহে, ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য স্থাপন করিয়াছেন।

ভারতে, ভারতবাসীরা বাধিত রাষ্ট্রীয় অধিকার উপভোগ করে, কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকারও তদপেক্ষা বিস্তৃত নহে; ইংলণ্ডে

ভারতবাসীগণ নির্ব্বাচনের অধিকারী ও নির্ব্বাচনের পাত্র বলিয়া পরিগণিত; কতকগুলি ভারতবাসী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রবেশলাভ করিয়াছে (৮)। অবশ্য, ভারত-শাসন-বিভাগের উচ্চপদে ইংরাজেরা নিযুক্ত হয়। কিন্তু সকল দেশেই, গভর্ণ-মেণ্টের নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা আছে এবং অনেকসময়েই, কোন এক রাষ্ট্রনৈতিকদল, প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে, সর্ব্বপ্রকার শাসন কার্য্য হইতে, ২০।৩০ বৎসর-কাল, বঞ্চিত করিয়া রাখে। বস্তুতঃ, আইন ইংরাজকে শুধু একটি বিশেষ অধিকার দিয়াছে; ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইলে, ইংরাজেরা বিচারার্থ কতকগুলি ইংরাজ জজ পাইবে—নয়, উচ্চপদস্থ দেশী জজ পাইবে এবং তাহার জুরী হইবে—ইংরাজ অথবা আমেরিকান।

***

এই ভারত-ব্রিটিশ রাজ্যশাসনের ব্যাখ্যা হইতে কতকগুলি অবান্তর চিন্তা মনোমধ্যে সমুদিত হয়।

বাণিজ্য-বিস্তাররূপ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কোম্পানী ভারতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে; এবং রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংলণ্ডাধিপতি কোম্পানীর আধিপত্যের স্থলে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। অবশ্য, কতকগুলি উদারচেতা লোক পার্লেমেণ্ট সভায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; অবশ্য ভারতের বড়-লাটেরা যোগ্যতা ও ধর্ম্মজ্ঞানের কতকটা পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু মূলত ভারতের স্বার্থ ব্রিটিশ সম্রাজ্যের স্বার্থের নিম্নে অধিষ্ঠিত এইরূপই বিবেচিত হইত। এবং যেহেতু রাষ্ট্রনৈতিক পুরুষেরা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞও নহেন,

(৮) দাদাভাই নৌরোজিই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম ভারতীয় সদস্য। ইনি একজন পার্শী, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে, বোম্বাইনগরে জন্মগ্রহণ করেন। Elphinstone Institution-এ শিক্ষালাভ করেন। ঐ বিদ্যালয়েই তিনি গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে একটা বড় কালেজের অধ্যাপক হন। ভারতের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতিকল্পে যত সভাসমিতি ছিল, প্রত্যেকেরই তিনি শীর্ষস্থানে ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে লণ্ডনে যে সদাগরী কুঠী স্থাপিত হয়, তিনি তাহার এক সদস্য ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে তিনি East India Association স্থাপন করেন। ১৮৭৪ অব্দে তিনি বরদার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হন। বোম্বায়ের Municipal সভার সদস্য (১৮৭৪) তাহার পর (১৮৮৫) বোম্বাই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভার দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনে (১৮৮৬) এবং নবম বর্ষের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন (১৮৯৩)। Central Finsbury-র জন্য নির্ব্বাচিত পার্লমেণ্টের সদস্য (১৮৯২)। London Indian Society-র সভাপতি। ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহারই প্ররোচনায় এক Royal Commission বসিয়াছিল (১৮৯৫)। ১৮৯৫ অব্দে তিনি পার্লেমেণ্টের সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হন নাই।

Sir Mancherjee Bhownaggree ইনিও একজন পার্শী। ১৮৫১ অব্দে ১৫ অগষ্টে বোম্বাইনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি Elphinstone College-এ শিক্ষালাভ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের fellow (১৮৮১), সংবাদপত্রের পরিচালক, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি বিশ্বহিতৈষী, ও রাষ্ট্রনৈতিক পুরুষ, ১৮৮৭ অব্দে ভবনগরের মহারাজার মন্ত্রী; ভবনগরের রাজ্যে তিনি নিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ অব্দে পার্লেমেণ্টের মেম্বর।

তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন; এবং যেহেতু তাঁহাদের মতামত অতীব সংকীর্ণ, আবার, সেই মতামতের জন্য তাঁহারা গৌরব করিয়াও থাকেন, সুতরাং এই ব্রিটিশ সম্রাজ্যের স্বার্থই তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষ স্বার্থ। তথাপি ইংলণ্ডের উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির এরূপ প্রবল শক্তি (যে শক্তির প্রভাব গোড়ায় কেহই বুঝিতে পারে নাই) যে, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এমন কতকগুলি শ্রেষ্ঠ-ধরণের স্বাধীনতা ভারতবাসীকে প্রদান করা হইয়াছে, যাহা কোন প্রাচ্যদেশ ইতিপূর্ব্বে ভোগ করে নাই এবং যাহা কেবল য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ ভোগ করিয়া থাকে।

এই সর্ব্বপ্রথম, জাতি-ধর্ম্ম-শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী কতকগুলি সমান অধিকার উপভোগ করিতেছে। এই সর্ব্বপ্রথম, সকলেই এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রীয় একতার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিকেরা ভারতকে নৈতিক একতাও প্রদান করিতে কৃতকার্য্য হইবে।

মোটকথা, যে দুই সভ্যতার মধ্যে ইতিপূর্ব্বে বৈর-ভাব ছিল ইংলণ্ড সেই দুই সভ্যতাকে একত্র মিশাইয়া দিবার ভার লইয়াছেন। এই কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে, প্রথমে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, য়ুরোপের কোন্ কোন্ রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানাদি গ্রহণ করা ভারতের কর্ত্তব্য এবং ভারতীয় কোন্ কোন্ রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানাদি ভারতের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অনুসন্ধানে অনেকটা দ্বিধা হইতে পারে, অনেক ভুল হইতে পারে; কেন না, যুক্তি-বিচারের দ্বারা উন্নতির সমস্ত ভাবী পরিণাম পূর্ব্ব হইতে কতকটা পরিলক্ষিত হইলেও, জনসাধারণের কতটা দৌড় ও পাল্লা, একমাত্র কাল-ই তাহার পরিচয় দিতে পারে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ককারের অহঙ্কার

(বক্তা খোদ কর্ত্তা)

বকলমে স্বাক্ষরকারী :—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কি, কেন, কেমন করিয়া, প্রভৃতি প্রশ্ন-পরম্পরায় কৌতূহলোদ্রেকে এবং কার্য্যকারণ-সম্পর্কের আবিষ্কারে যখন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও পরিণতি, তখন সে ক্ষেত্রেও আমার জয়জয়কার—কেমন কি না? প্রকৃতি ও শক্তি, উভয়ত্রই আমি। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিক আকর্ষণ (Capillarity), আকুঞ্চনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা, কেন্দ্রাতিগ

কেন্দ্রানুগ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, ইলেক্‌ট্রিক শক্তি, আলোক, কাচের পরকোলা, কিছুই আমাছাড়া নহে। আমিই ভূমিকম্প ঘটাই, কুজ্ঝটিকা উঠাই, মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা দেখাই, কোটালে বান ডাকাই, নিশ্বাসের কাটা চালাই। কোড্যাক ক্যামেরায়, বেকা রেকর্ডে, বায়োস্কোপে, গ্রামোফোনে, আমারই রকম রকম প্রচার। টেলিগ্রাফের ইরেটকায় আমার আওয়াজ যাও না কি?

কিমিয়া-শাস্ত্রে আমারই অধিকৃত। কেলভিন রাকসলী ক্রুক্‌স্ রঙ্কো প্যাস্ক্যাল কেপলার ডেকার্ট সকলেই আমার অধীন। মারক, গন্ধক, সেঁকো, ফটকিরি, ক্ষার, ক্ষারক প্রভৃতি বাঙ্গলা নামই ধর আর ক্লোরিন, আর্সেনিক, অক্সিজেন, এসেটিক, অক্সালিক প্রভৃতি ইংরাজী নামই ধর, আমি সকলেরই উপাদান। বাঙ্গালা করিয়া সেঁকো সৈকতকই বল আর ইংরাজী করিয়া আর্সেনিক সিলিকনই বল, আমাকে এড়াইতে পারিবে না। কেমিক্যাল কম্‌পাউণ্ড আমারই কর্ম্ম, কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ আমারই কারখানা।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বেশীদূর যাইতে হইবে না, অঙ্কুর বা টঁ্যাকেই আমাকে দেখিবে। শরীরবিজ্ঞানে রক্তের সঙ্গে আমি মিশাইয়া আছি। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আমিই কুস্তির ও পরিপাকের উপকারিতা শিখাই, নৃ-তত্ত্বে আমিই ককেশিয়ান জাতির শ্রেষ্ঠতা রটাই, ডার্বিন-তত্ত্বে আমিই উৎকর্ষ অপকর্ষ ক্রম-বিকাশ ঘটাই।

জ্যোতিষে পৃথিবীকে কদম্বকুসুমাকৃতিই বল আর কমলালেবুর মতই বল, আমার শরণ লইতে হইবে। কোপারনিকাসে আমি, রোমক-সিদ্ধান্তে আমি, ভাস্করাচার্য্যেও আমি। আমি উত্তরায়ণে নাই দক্ষিণায়নে আছি, রাহুতে নাই কেতুতে আছি, গ্রহ উপগ্রহে নাই নক্ষত্র ধূমকেতুতে আছি, অরুন্ধতীতে নাই কালপুরুষে আছি, ধ্রুবতারায় নাই শুকতারায় আছি। আমি অশ্বিনী-ভরণীতে নাই কৃত্তিকাতে সুদশুদ্ধ আদায় করিয়াছি, মেষ বৃষ মিথুনে নাই, কর্কট কন্যা বৃশ্চিক কুম্ভ মকরে প্রখরভাবে আছি। শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষে আমার কোন পক্ষপাত নাই। আহ্নিক বার্ষিক উভয়েই আমার গতি। রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, কক্ষ্যা, অক্ষাংশ, ক্রান্তিপাত, সংক্রান্তি সর্ব্বত্র আমি।

ফলিত-জ্যোতিষে কালবেলা কুলিক বেলায়, কালরাত্রিতে, দিক্‌শূলে, ক্রূরগ্রহে, সপ্তশলাকায়, রাজযোটক মিলে, সুতহিবুক যোগে আমি আছি। জন্মকুণ্ডলীতে আমি কুণ্ডলী পাকাইয়া আছি। করকোষ্ঠী আমারই সৃষ্টি। শাকুনিক, গণক বা গণৎকার আমার বশ, এলম্যানাক, ক্যালেণ্ডার, পঞ্জিকায় আমার অধিকার, কার্ত্তিক মাসে শুক্রবারে আমার সঞ্চার। কালগণনায় কলাকাষ্ঠায় আমি, পলকক্ষণে আমি, শক-শাকে আমি, কল্পেও আমি। কল্যই বল, সকাল বিকালই বল, আমি কস্মিন্‌কালে তিলেকও কাহারও কাছছাড়া হই না।

অঙ্কশাস্ত্রে আঁক কাটায়, আঁক কষায়, চোকে, ইলেকে, একুনে, ঠিক দেওয়ায়, জমাখরচবাকীতে, কড়ি ও কাহনে, কাক-

কড়াক্রান্তি হিসাবে, তঙ্কায়, এক হইতে কুড়ীতে, কুড়ীধরণে ক্রয়-বিক্রয়ে, কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া বুড়কিয়া শতকিয়া প্রভৃতিতে, একক দশক হইতে লক্ষ কোটী সংখ্যায়, কাঠাকালী নৌকাকালী পুকুরকালীতে, কড়ি-কষা কাগজকষায়, কুড়ো কাঠা রেক কুন্‌কে কাঁচ্চা ছটাকে (পোয়াটেক সেরটেকেও), শুভঙ্করী মানসাঙ্কে আমারই কাণ্ড। আবার গুণনীয়ক-গুণিতকে, সঙ্কলনে, লঘূকরণে, কুসীদ ও চক্রবৃদ্ধিতে, বর্গমূল ঘনমূল নিষ্কাশনে, প্রকৃত অপ্রকৃত উভয় প্রকার ভগ্নাংশে, ত্রৈরাশিক বহুরাশিকে, দশমিক পৌনঃপুনিকে আমাকে পুনঃপুনঃ পাইবে। কোণে, কেন্দ্রে, শঙ্কুক্ষেত্রে আমার অধিকার। ত্রিকোণমিতিও আমার এলাকার অন্তর্ভূক্ত। ক্যালকুলস্ কোয়াটারনিয়মের কথা কহিয়া আর আতঙ্কের উদ্রেক করিব না। গৌরীশঙ্কর, কে, পি, বসু ও কে, পি, চট্টোরাজের অঙ্কের কেতাবের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

ইতিহাসে, আমারই প্রসাদে অশোক কণিষ্ক বিক্রমাদিত্য শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তী, চাণক্য বা কৌটিল্য শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, আলেকজ্যাণ্ডার বা আলিকসন্দর বা সেকন্দর দেশ অধিকারে অদ্বিতীয়, আকবর শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট্, মীরকাশিম বাঙ্গালার শেষ নবাব, ক্লাইভ আর্কটবিজয়ী কর্ম্মবীর। আমারই জন্য দারাসিকো সুপণ্ডিত, অশোক-পুত্র কুনাল সুশীল। স্কন্দগুপ্ত কুমারগুপ্ত, রাণা কুম্ভ, শক্তসিংহ, বক্তিয়ার কুতুবুদ্দিন সবক্তগিন আবুবকর কৈকোবাদ, অকল্যাণ্ড কর্ণওয়ালিস বেন্‌টিঙ্ক নর্থব্রুক, কেহই আমা ছাড়া নহেন। ক্লেমেন্সি ক্যানিংএ আমি, দুর্জ্জন কর্জ্জনে আমি, আবার কারমাইকেলেও আমি। শক্তাবৎকুলের শৌর্য্যবীর্য্যে আমি, আবার জাপানের হারাকিরিতেও আমি। ভিক্টোরিয়ায় বেকনস্‌ফীল্ডে আমি, কাইজার বিসমার্কে আমি, জার নিকোলাসে আমি, ফ্রেডরিক দি গ্রেটে আমি। বীরনারী কর্ম্মদেবী কর্ণবতী কমলাবতী ও কুমারী কৃষ্ণকুমারী আমার মানে মানিনী। অক্টারলোনি মনুমেণ্টে আমি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আমি, অন্ধকূপ বা ব্ল্যাকহোলে আমি, সেকেন্দ্রা কুতবমিনারে আমি, আবার কমলমীর ও চৈতককা চবুতারায় আমি। দিল্লীর তক্ত-তাউসে আমিই আসীন। কুরুক্ষেত্র মুদকী ফতেপুরশিক্রী আলঞ্জর-অবরোধ, ব্যানকবর্ণ কিলীক্র্যাঙ্কি ফ্যালকার্ক ম্যাল-প্লাকেট ব্যালাকলাভা প্রভৃতি বহু লড়াই আমার পরাক্রমে ফতে হইয়াছে।

আমারই প্রসাদে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার সভাকবি রায়গুণাকর ও তাঁহার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি। রসসাগরের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত ও নিবাস বাড়েবাঁকা আমারই অধিকারভুক্ত। ক্ষিতীশ-চন্দ্র ক্ষৌণীশচন্দ্রও আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত নহেন। আধুনিক বাঙ্গালায় রামকৃষ্ণ বিজয়-কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন শিশিরকুমার, কৃষ্ণ বন্দ্যো কৃষ্ণদাস পাল, তারক পরামাণিক, তারকনাথ পালিত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ লোক আমার অনুগৃহীত!

কৃষ্ণপান্তি ও কান্তবাবু, রাজা নবকৃষ্ণ ও মহারাজ নন্দকুমার, দ্বারকানাথ ঠাকুর

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব কমলকৃষ্ণ দেব, কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ, জয়কৃষ্ণ মুখো জ্যোৎকুমার মুখো প্রভৃতি আমারই প্রসাদে ধনে মানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কান্তি-চন্দ্র মুখো কালিকাদাস দত্ত ও এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যো আমার কৃপায় ওরূপ উচ্চ পদ পাইয়াছিলেন।

খগোল ভূগোলে যোজক, উপত্যকা, অধিত্যকায় আমাকে পাইবে। আমি সুমেরুতে নাই কুমেরুতে আছি, বিন্ধ্যাচলে নীলাচলে নাই কুলাচলে লোকলোকাচলে আছি, হিমালয়ে নাই মৈনাকে আছি, ধবলগিরিতে নাই কাঞ্চনজঙ্ঘা-গৌরীশঙ্করে আছি, রাম-গিরি খণ্ডগিরিতে নাই ত্রিকূট চিত্রকূটে আছি, পঞ্চবটীতে নাই দণ্ডকারণ্যে আছি, দধিদুগ্ধসমুদ্রে নাই ক্ষারোদক্ষীরোদে আছি, উত্তমাশায় নাই কুমারিকায় আছি, গঙ্গাযমুনা সরস্বতী গোমতী গোদাবরীতে নাই, কাবেরী করতোয়ায় আছি। নদীর কথা যদি উঠিল, তবে আরও বলি—কৃষ্ণনগরের কঙ্কণা, বর্দ্ধমানের বাঁকা, যশোরের কপোতাক্ষ এবং ময়ূরাক্ষী শীতল-লক্ষা দারুকেশ্বর কুমার কুশী কাঠযুড়ী কর্ণফুলী কর্ম্মনাশা কীর্ত্তিনাশা প্রভৃতি অনেক নদনদী কুলকুলরবে আমার কীর্ত্তিকথা কহিতেছে। কাশী কাঞ্চী কোশল কলিঙ্গ কেরল বাহ্লীক কর্ণাট কৌশাম্বী কাশ্মীর কাম্বোজ কাছ কান্যকুব্জ কর্ণসুবর্ণ অমরকোট মঙ্গলকোট তক্ষশিলা ব্যাক্‌ষ্ট্রীয়া কাবুল কান্দাহার—কোথায় আমি নাই? তুরস্ক বল্‌কান কনস্তান্তিনোপ্‌লে আমি, ডেনমার্ক কোপেন-হেগেনে আমি, আবার কাফ্রীর দেশ আফ্রিকায়ও আমি। শুধু তাহা কেন, আমারই খাতিরে নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের নাম আমেরিকা। আমারই চক্রান্তে কোর্টেজ মেক্সিকো জয় করেন।

ক্যালিকাট ক্যানানোর কুম্ভকোণম্ কঞ্জিভেরম্ কোটা শিকাবতী বিকানীর কর্পূর-তলা কুচবিহার কাছাড় কুমায়ুন, সব আমার এলাকাভুক্ত। আবার ভারতের বাহিরে কোচিন হংকং মলক্কাস কোরিয়া টোকিও ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত আমি হল্লা করি। মগের মুল্লুকে আমি, লঙ্কায় কলম্বোয় আমি, কামস্কটকায় আমি, কেপ কলোনিতে আমি। প্রাচীন গান্ধারকে কান্দাহারে পরিণত করা আমারই কারসাজি। আমি সাহেবলোকের স্বর্গ সিমলা দার্জ্জিলিঙ্গে নাই, কিন্তু স্বর্গের শিঁড়ি কালকা কর্সিয়ঙ্গে আছি। বাঁকীপুর কিউল কাটিহার মোকামা কানপুরে লক্ষ্ণৌ-এ আমি আড্ডা করিয়াছি। লুণ্ডিকোটাল কাটগুদাম কোডারমা কাটরাস লক্‌সর দুমকা প্রভৃতি বেমক্কা নাম আমারই সৃষ্টি। আমি খাস বাঙ্গালার কৃষ্ণনগর বাঁকুড়া ঢাকা-কুমিল্লায়, বিক্রমপুর বাকলায়, মুক্তাগাছা ভাগ্যকুলে আছি, কায়েথীর মুলুক বাঁকীপুরে আছি, আবার কাঁচা উড়ের দেশ উৎকলে ভদ্রক কটকে আছি। কুষ্টিয়া কুমারখালি কৃষ্ণগঞ্জ চাকদহ, অম্বিকাকালনা কাটোয়া, কৌড়া ক্ষীরগ্রাম কাগ্রাম কোগ্রাম কুলীন-গ্রাম কাঞ্চননগর, খানাকুলকৃষ্ণনগর, কেন্দুলী কুলিয়া কালিকাপুর, কোড়কদী কৈকালা কুচিয়াকোল কাওয়াকোলা করচমারিয়া কাড়াপাড়া কাঁদোয়া কড়কড়ে কুড়ুলগাছি

কাঁচিকাঁটা কাজীরবাজার কালিয়াকর কালকেওট কুচকুচিয়া, কলসকাটী ও অন্যান্য কাটী এবং বকলমে স্বাক্ষরকারীর ক্ষুদ্র গ্রাম কাঁচকুলি প্রভৃতি নামের তালিকা দিয়া আর কাণ ঝালাপালা করিতে চাহি না।

কলিকাতায় আমি দুই পদে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাই ইহা সেরা সহর। কলিকাতার কাছাকাছি অনেক স্থানেও আমার অধিকার আছে। কালীঘাট ভুকৈলাস শালকিয়া রামকৃষ্ণপুর পদ্মপুকুর পাইকপাড়া কাশীপুর কুঠীঘাটা কড়েয়া কাঁকুড়গাছি কামারডাঙ্গা চড়কডাঙ্গা নারকেলডাঙ্গা কোদালিয়া পোর্ট ক্যানিং কাঁকনাড়া কাঁচড়াপাড়া বারাকপুর দক্ষিণেশ্বর কোন্‌নগর—আর কত কহিব?

কলিকাতার ভিতরে ত আমার জয়-জয়কার। কম্বুলেটোলা কপালিটোলা কলুটোলা কুমারটুলি কাঁটাপুকুর নেউগিপুকুর মুরারিপুকুর হোগলকুড়িয়া কাঁসারিপাড়া পালকীপাড়া মাণিকতলা কালীতলা, সর্ব্বত্র আমি। আমি চাঁপাতলায় পটোলডাঙ্গায় নাই—বৈঠকখানায় আছি, বৌবাজারে নাই—টিকটিকিবাজারে আছি, নেবুতলায় নাই—কেরাণীবাগানে আছি, নিমতলায় নাই কাশীমিত্রের ঘাটে আছি। পথেঘাটেও আমাকে পাইবে। কলেজষ্ট্রীট কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট কটনষ্ট্রীট ক্লাইভষ্ট্রীট ক্রসষ্ট্রীট করপোরেশ্যানষ্ট্রীট কীডষ্ট্রীট ক্যামাকষ্ট্রীট পার্কষ্ট্রীট সার্কুলার রোড ক্রীক রো স্কটলেন কানাই ধরের লেন, সর্ব্বত্র আমার গতিবিধি। হাইকোর্টের ঘাটে কালপিনের ঘাটে কয়লাঘাটে তেলকলঘাটেও আমি। আমি ইডন্‌গার্ডন বীডনগার্ডেনে নাই—কলেজস্কোয়ার কর্ণওয়ালিসস্কোয়ার ও কর্জ্জনপার্কে আছি, চাঁদনীতে নাই—কালীশীলের বাজারে আছি, হেমিল্‌টনের বাড়ী নাই—কুক কেলনার দোকানে আছি, স্মিথের বাথগেটের বাড়ী নাই—স্কট টমসন বা ক্রীষ্ট্যাল আইস কোম্পানীতে আছি, উইলসনের হোটেলে নাই—কেলনার কোম্পানীর কাছে আছি। থ্যাকারের পুস্তকালয়ে, ডোয়াকিন্‌সনের ঘরে, ম্যাকেঞ্জি লায়ালের নীলামে, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির বাড়ী আমার গতিবিধি আছে।

জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইলে আমাকে চাইই। কৃষিকার্য্যে ক্ষেত্রকর্ষণে কৃষককৃষাণে আমি, বণিকের ক্রয়-বিক্রয়ে, ট্রেড মার্কে, জাঁকোরে কেনায়, হকারের (hawker) ঝাঁকায় আমি; ঢেঁকিকুলে নাকুটেকো হইতে কল কারখানা দোকান কারবার কুঠি কন্‌সার্ণ ফ্যাক্টরী কোম্পানী পর্য্যন্ত সকলই আমার কীর্ত্তি। কলকাঠি কলকব্জা কপিকল মাপকাঠি আমিই গড়াই, কলের কুলী আমিই খাটাই, পাটকোষ্টা আমিই কাটাই, ঠিকাদার কন্‌ট্রাক্টর বন্ধা আমিই যোটাই, পব্লিক্ ওয়ার্কস কষ্টমস্‌হাউস কুংঘাট লোকো আফিস্ আমিই বসাই।

হাকিম উকীল মোক্তার কৌনসুলী, পেশকার কেরাণী শিক্ষানবীশ নকলনবীশ, সকলেই আমার এলাকাভুক্ত। হাইকোর্টে স্মলকজকোর্টে, কালেক্টারী কাছারীতে, চৌকী মহকুমায়, হাকিমের হুকুমে, মোকদ্দমা বা কেসে, একরার বা স্বীকারোক্তিতে, ডিক্ল্যারেশানে, ক্লেমে, ফোরক্লোজে, কবুল জবাবে, চুক্তি কনট্রাক্ট্ বা কড়ারে, কিস্তিবন্দীতে, বকলমে বা স্বকলমে স্বাক্ষরে, মুচলেকায়, সাক্ষীতে, কমিশনে সাক্ষ্যে, ডিক্রীজারীতে, ক্রোকে, বেকসুর খালাসে, কোতে, কাঠগড়ায়, চাবুকে, কঠিন পরিশ্রম সহ কারাদণ্ডে, ফাটকে আটকে, ফাঁসী কাঠে লটকানয়, আমাকে পাইবে। আমি উইলে নাই, কডিসিলে আছি, উত্তরাধিকারীতে নাই একজিকিউটরে আছি, রেজুলেশ্যানে নাই এক্টকোডে আছি, আইনে নাই কানুনে আছি, ধারায় নাই সেকশ্যানে আছি, জজ মেজেষ্টারে নাই করোনারে কমিশনরে আছি। হাইকোর্টে অনুকূল মুখো ৺ দ্বারকানাথ মিত্র বিচারকদ্বয় আমার মুখ রাখিয়াছেন, স্যার বার্ণেস্ পীকক হইতে সার লরেন্স জেঙ্কিন্‌স্ পর্য্যন্ত সাহেব প্রাড্‌বিবাকগণও আমার ক্লেম পাকা করিয়া দিয়াছেন।

শান্তিরক্ষক পুলিশের কোতোয়ালীতে আমাকে পাইবে। সেকালের কোটাল, একালের ইন্‌স্পেক্টার কন্‌ষ্টেবল, আমার অধীন, চৌকীদারের ত কথাই নাই। ডাকাতে, অকুস্থানে, সেনাক্ত করায়ও আমি।

মহাজনের রোকা রোকড় মোকররর, কুচ্ছিনামা, ক্ষতি বা লোকসান, কর্জ্জ, বন্ধকী, কস্ত খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, সর্ব্বকর্ম্মে আমি।

জমিদারের পাইক বরকন্দাজ কারপরদাজ বকসী কারকুন আমিই নিযুক্ত করি, কোরফা প্রজার আমিই পত্তন করি, ধরপাকড়ে পলাতকা প্রজাও আমার কঠোরতায় ঘটে। থাকবন্দী, একন্দাজ, শিকস্তিপয়স্তি, কায়েমী স্বত্ব, কর্ণওয়ালিশের

কীর্ত্তি, তালুকমুলুক সরিক, সর্ব্বত্রই আমি। কোটকোবালা কবুলিয়ত তমঃশুক মোকাবিলা কড়চা কবজ নাকচ বাকী বকেয়া নিকাশ প্রকাশ পথকর পব্লিক ওয়ার্কস্ সবই আমার কারসাজি।

লোক্যাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, মিউনিসিপাল করপোরেশন, সেক্রেটারী, সভ্যতার এসকল অঙ্গেই আমি বিরাজ করিতেছি। কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স কন্‌ভেন্‌শ্যান, কমিটি আমিই বসাই, বয়কট পিকেটিং করিতে আমিই শাসাই, কমিশন আমিই যোগাই, ক্যান্‌ভ্যাসার আমিই যোটাই, কন্‌ডোলেন্স কন্‌গ্রেচ্যুলেশান আমিই পাঠাই, প্রোক্ল্যামেশান ডিক্লারেশন আমিই রটাই, কন্‌ষ্টিটিউশ্যানাল এজিটেশ্যান আমিই ঘটাই। ক্যাপিটেলের ম্যাক্সে আমি, র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ডে আমি, তিলকেও আমি।

যুদ্ধের কাণ্ডেও আমি কম যাই না। কেল্লা বারিক ক্যাণ্টনমেণ্ট কমিসেরিয়াটে কুচকাওয়াজে পদাতিকে পতাকায় কন্দাবারে আমি আছি, ক্যাপ্টেন কর্ণেল এডিকং আমার হাতধরা, কিচনার ক্রীগ ক্রঞ্জি কমারফ বরনেকাফ মল্‌টকে জেলিকো ব্লেক্ ড্রেক্ ক্র্যাডক্ আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ। কামান বন্দুক ক্যাপ কার্ত্তুজে আমি, নালিকাস্ত্রে আমি, কিরিচ কুকরীতে আমি, কোদণ্ডকার্ম্মুককৃপাণে আমি, কঞ্চুক কিরীট কুণ্ডল কটিবন্ধে আমি, ক্ষত্রিয়ের হুঙ্কারটঙ্কারেও আমি। কোম্যাগ্যাটামারুর নানা কথা আমিই রটাই, কোকাস্-কীলিংএর কাছে এম্‌ডেন আমিই ফাটাই।

আবার কেবল সংহারকার্য্য আমার ব্যবসায় নহে, জীবনরক্ষাকল্পে চিকিৎসা কার্য্যও আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত নহে। বৈদ্যক শাস্ত্রে চরক তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। আমারই কৃপায় উক্ত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তি কবিরাজ নামে পরিচিত! আমি বায়ুপিত্তে নাই, কিন্তু কফে আছি। আবার আমারই প্রকোপে বাতপিত্ত ক্রূর হয় এবং বিকার ও সান্নিপাতিক ঘটে। কুষ্ঠ, কোষ্টবদ্ধ আমরক্ত, রক্তপিত্ত প্রভৃতি কুৎসিত রোগ, বাধক, সূতিকা, ঠোন্‌কা প্রভৃতি স্ত্রীরোগ, তড়কা, ধনুষ্টঙ্কার, কৃমি যকৃৎ প্রভৃতি বালরোগ, যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস, ক্ষত, পক্ষাঘাত, কম্পজ্বর কালাজ্বর, আধকপালে, দাঁতকপাটি, কাঁওল, কুম্‌রী, ফিকবেদনা, বাতিক, চুলকানি প্রভৃতি রকমারী রোগ, সবই আমার কারসাজি। আমিই অশোক, বাসক, ঘৃতকুমারী, কন্টিকারি, কুকসিমে, কালমিঘে, ওলটকম্বল প্রভৃতি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাই, বটিকা মোদক বা মোড়কে চূর্ণ ঔষধ দেওয়াই, কঠিন রোগে কস্তুরি মকরধ্বজ সূচিকাভরণ কুঁচলে বিষ খাওয়াই। পুটপাক আমারই গুণে ঔষধ প্রস্তুত করার প্রকৃষ্ট প্রণালী। আবার আমি ফাঁক পাইলে টোট্‌কা ঝাড়ফুক তুক-তাকও চালাই।

কেবল কবিরাজ কেন, ডাক্তার কম্‌পাউণ্ডার হকিম অবধৌতিক চিকিৎসক সকলেই আমার কৃপাভিখারী। হোমিও-প্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় আমিই শেষরক্ষা করি। অক্সিপ্যাথির পথেও আমি চলি। টনিক, মিক্‌শ্চার, এমব্রোকেশান, ক্যাপ্‌সুল, ব্যাক্ষর-কেক আমিই যোগাই। মলপক্‌স্ নিবারণে ভ্যাক্‌সিনেশন বা টিকা, কলেরায় ক্যাম্‌ফর, চুলকুনিতে কিউটিকিউরা বা কার্ব্বলিক সাবান, কাটাকাটির কাযে ক্লোরোফর্ম্ম আমারই ব্যবস্থা। ব্রন্‌কাইটিস্, ক্রুপ, কলিক, কার্ব্বঙ্কল, কলেরা, মলপক্স, সাই আমার কার্য্য। আধুনিক রোগতত্ত্বে মশক, মুষিক, মক্ষিকা ও ধূলিকণার রোগসঞ্চার-ক্ষমতা আমারই আবিষ্কার। কুকুর কামড়ে জলাতঙ্ক নিবারণের জন্য ক্ষতস্থানে লোহাপোড়ার বদলে কষ্টিক লাগান ও সাবেক গোদলপাড়ার পরিবর্ত্তে কলেরার পাঠান আমারই কর্ত্তৃক। এপিডেমিক এন্‌ডেমিক স্পোরেডিক তিন রকম রোগ সঞ্চার, এসেপ্‌টিক এন্টিসেপ্টিক উভয় প্রকার চিকিৎসা, ষ্টেথোস্কোপ দিয়া বুকপরীক্ষা, ক্লিনিকাল থার্ম্মোমিটার দিয়া তাপপরীক্ষা, হাইপোডার্মিক ও মেটিরিয়া মেডিকা অনুসারে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শ্যান, পকেটকেসে অস্ত্রসংগ্রহ, সবই আমার যোগসাযোগে। সিন্‌কোনা কুইনিন ক্যাস্‌ক্যারা কাষ্টর অয়েলের গুণ গাহিবার সময় আমার কথা কহিও। এলোপ্যাথিক—লাইকার, হাইড্রোস্যানিক হাইড্রোক্লোরিক, ষ্ট্রীকনিয়া ক্যান্থারাইডিস ক্লোরোডাইন ক্যাজিপুটি অয়েলে, হোমিওপ্যাথিক—একোনাইট ইপিকাক ক্যামোমিলা মারকিউরিয়াস্ করোসিভাসে আমি অজস্র পরিমাণে আছি। কাহিল লোকের পথ্য ক্যাসাভা ট্যাপিওকা (কে সি বসুর) বিস্কুট বেদানা দুধের ভিতরেও আমি।

হোমরাচোমরা ডাক্তার সকলেই আমার হাতধরা। তা' ম্যাকনামারা ম্যাকোনেল ম্যাক্‌লাউড কোট্‌স্ ক্রুশি লুকিস ক্যালভার্ট বল, আর কে ডি ঘোষ কে পি গুপ্ত, ডাক্তার সরকার বা ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, গুডীব সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী বা সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, এস কে মল্লিক কেদার দাস কালী বাগচি প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য অক্ষয় দত্ত চন্দ্রশেখর কালীই বল।

যাক্, আর অধিক বিদ্যা না চট্‌কাইয়া আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে শিক্ষার কোন দিকেই আমি কোণঠেসা নহি। তাই মূর্খের চূড়ান্ত গালি 'ক' অক্ষর গোমাংস! ক খ শেখায়, কাকের ছা বকের ছা লেখায়, কোদালে ক বা আঁকুরে ক, কাকে কলসী, ঝ, ইত্যাদি অক্ষর-পরিচয়ে, কএ করাত ইত্যাদি সঙ্কেতে আমারই শরণ লইতে হয়। কলাপাতায় লেখা, মক্স করা, কলমের কচ কাটা, কসি টানায় আমি, আবার কাগজে লেখা (ক্রীমলেড ফুলস্‌ক্যাপ হইলে ত কথাই নাই), কপিবুকের অনুকরণে লেখা, কার্ব্বন কাগজে নকল বা কাপি করা, কমা কোলন সেমিকোলন কোটেশন মার্ক লাগান, বুককীপিং, ডকেটিং, সবই আমার কল্যাণে। কেরাণীর কাণে কলম আমার কৃপায়। কালী কলম কাগজ—আমি না হইলে কোনটিই পাও না। প্রাথমিক শিক্ষায়, শিশুশিক্ষায় ও শিশুবোধকে, দাতা-কর্ণ গুরুদক্ষিণা কলঙ্কভঞ্জন ও চাণক্যশ্লোকে আমি, আধুনিক কিণ্ডারগার্টেনেও আমি। মুসলমানের মুক্তাবে আমি, নোক্তায় আমি। স্কুল কামাই করিলেও আমাকে এড়াইতে পারিবে না। ঠেকে শেখাতেও আমাকে চোখে ঠেকিবে।

শিক্ষক, পরীক্ষক, পরিদর্শক, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পাঠক (Reader!), কেহই আমার কাছে নিমকহারামি করেন না। শিক্ষা ও পরীক্ষায় আমি, প্র্যাক্‌টিক্যালে ও মৌখিকে আমি, ক্ল্যাস সেক্‌শ্যান কম্‌বিনেশ্যানে আমি, কারিকিউলামে কোর্সে আমি, ক্যালেণ্ডারে আমি, কী ক্র্যাম ক্রীব (Crib) ও 'কোশ্চেনে' আমি, নোট টোকা কণ্ঠস্থ করায় আমি। স্কুল কলেজ একাডেমিতে আমি, ক্লাব কমন-রুমে আমি, ঋষিকুল গুরুকুলে আমি। ভেকেশ্যানেও আমি, কন্‌ভোকেশ্যানেও আমি। সিণ্ডিকেট ফ্যাকল্টীতে আমি, স্কলারশিপ পারিতোষিক পুরস্কার পদক কেয়ূরে আমি। আমিই শেক্‌স্‌পীয়র, বার্ক বেকন কূপর কোলরিজ স্কট কীট্‌স্ ডিক্‌ন্‌স্ লবক কোর্স করিয়াছি, কিছু কাল অপেক্ষা করিলে মেরি করেলি কোনান ডয়েল ভিক্টোরিয়া ক্রস এলা উইলকক্সও কোর্স করিব দেখিতে পাইবে। আমিই এন্‌ট্র্যান্সকে ম্যাট্রিকুলেশান বলাইয়াছি, কিণ্ডারগার্টেন আবিষ্কার করিয়াছি, কৃষি-কলেজ কমার্শ্যাল কলেজ কারিগরি ও কলাশিক্ষার স্কুল খুলিয়াছি, বাঁকিপুরে খোদাবক্স পুস্তকালয় বসাইয়াছি, কাশীম-বাজারের কৃষ্ণনাথের কীর্ত্তিরক্ষাকল্পে কলেজের নাম বদলাইয়াছি, সেকালে থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীকে এবং একালে ক্যাম্বে কোম্পানীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকের কায়েমী প্রকাশক করিয়াছি। এস্ কে লাহিড়ী, ম্যাক্‌মিল্যান কোম্পানী ও ব্ল্যাকি এণ্ড সনকেও আমি নেকনজরে দেখি।

স্কুল-কলেজের মধ্যে আমি বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায়, সংস্কৃত কলেজে, কটক

কলেজ কটন কলেজে, কৃষ্ণনগর কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজে, ঢাকা কলেজ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে, ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজে, কেশব একাডেমি টি কে ঘোষের একাডেমিতে টিকিয়া আছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভুক্ত কায়স্থ পাঠশালা ও ক্যানিং কলেজেও আমি উকিঝুকি মারিতেছি। আবার মেডিক্যাল কলেজে ক্যাম্বেল স্কুলে আর জি করের স্কুলেও আমি। তক্ষশিলায় আমি ছিলাম, অক্সফোর্ড কেমব্রিজে কেয়স্ কলেজ ক্লেয়ার কলেজে, কর্পস্ ক্রিষ্টিতে, ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসে, ক্রেভ্ন্ ক্ল্যাসিক্যাল স্কলারশিপে, কলেজ ক্যাপে আমি। আর কলিকাতায় ত আমি দুযোড় হইয়া বসিয়াছি। বকেয়া ভাইস্‌চ্যান্সেলার ব্রাহ্মণ আশুতোষ স্বয়ং সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি হইয়াও 'ন' অক্ষরের নাগাল পান নাই, কুলীন কায়স্থ সর্ব্বাধিকারী কিন্তু অক্লেশে আমাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

অশোকের কথা

বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। গানে গন্ধে রঙে পৃথিবী ভরপুর! কিন্তু আজ এ আনন্দের দিনে সে কোথায়? যাহার কোমল রক্তিম চরণ দুটির চঞ্চল গতিতে সমস্ত আকাশ বাতাস সাড়া দিয়া উঠিত সেই আনন্দময়ী আজ কোথায়? ওগো; তোমরা কেহ আমার গৌরীকে ডাকিয়া দাও! আমি একবার তাহাকে দেখি!

আমি অশোক। বসন্তের আগমনে যখন চারিদিকে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া যায়, দক্ষিণা বাতাস বহিতে থাকে, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তবর্ণ কুসুমসজ্জায় ভরিয়া ওঠে। আমি অশোক! লোকে বলে, কোনো বিশেষ দিনে আমার ফুল খাইলে নিত্যশোকসমাকুল সংসারে শোক থাকে না! তাই আমার ফুল, পুরাঙ্গনাদের নিকট পরম আদরের বস্তু। সংসারে যে শোক অবশ্যম্ভাবী সেই সর্ব্বজয়ী শোককেও আমি জয় করিয়াছি, তাই আমি অশোক! এতদিন আমি নিজের গৌরবে নিজেই বিভোর ছিলাম,—আজ আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ করিল কে!

যেদিন তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেও এমনি এক ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। মৃদুল বাতাসে আমার আশপাশের ছোট ছোট গাছগুলি আমোদে মাতিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। যদিও আমি তখন খুব বড় হই নাই, তবুও আমার কাছে যারা ছিল, তাদের চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড়। তাই আমি তাদের সঙ্গে বড়-একটা মিশিতাম না। তারা যখন নেহাৎ ছেলেমানুষের মত বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে হাসিয়া লুটোপুটি খাইত, তখন আমি গম্ভীর ভাবে তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতাম। কখনো কখনো সঙ্গীর অভাবে আমার জীবন বড় দুর্ব্বহ বোধ হইত; কাহাকেও ভালবাসিবার জন্য, কাহারও

স্নেহ পাইবার জন্য সময়ে সময়ে আমার অন্তর তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠিত। মানুষের মত বৃক্ষজীবনের ভিতরও যে ভালবাসিবার প্রবৃত্তি উন্মুখ হইয়া থাকে, তোমরা মানুষ —এ কথা বিশ্বাস করিবে কি?

কি বলিতেছিলাম? হাঁ! সেদিনের কথা! সেদিন অপরাহ্ণে আমি মাথা উঁচু করিয়া আমার চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে একবার দেখিয়া লইতেছিলাম। দিনের আলো তখন নিভিয়া আসিতেছিল। রাখাল-বালকের উদাস বাঁশির তান কতদূর হইতে উতলা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

কিছুদূরের চাটুয্যেদের পুকুর। তার চারিধারে সার বাঁধা তাল ও সুপারি গাছের ছায়া ধীর বাতাসে জলের উপর পড়িয়া কত বিচিত্র চিত্র লিখিয়া দিতেছিল। ঘাটে রমণীগণের হাসির উচ্ছ্বাস, গল্পের গুঞ্জন-ধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। আমি অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ কে যেন উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিল—বাবা! বাবা! দেখ! এ গাছটির আগাগোড়া লাল ফুলে ফুলে একবারে ভরে গেছে! এটা কি ফুলের গাছ বাবা?

কি মধুর স্বর তার! আমি মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, কৈলাস চাটুয্যে তার ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া বাগানে বেড়াইতেছে। আমি অবাক্ হইয়া সেই টুকটুকে মেয়েটির মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কি সুন্দর তার সেই হাসিভরা মুখখানি! এক লাফে বাপের হাত ছাড়াইয়া সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল! তার সেই কচি কচি হাত দুখানি দিয়া আমার নীচেকার ডাল নোয়াইয়া সে ফুল ছিঁড়িতে লাগিল। সেই কোমল স্পর্শে আমার সারা অঙ্গ একটা চঞ্চল বিহ্বলতায় শিরশির্ করিয়া উঠিল।

তখন হইতেই আমরা দুজনে প্রগাঢ় একটা মায়ার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেলাম। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই গৌরী আমার আছে ছুটিয়া আসিত। তাহার সঙ্গিনী কতকগুলি বালিকাকে লইয়া আমার ছায়ায় সে খেলাঘর পাতিয়া খেলা করিত। তাহাদের কচিগলার কলরবে, ছোট পায়ের ছুটাছুটিতে, তরল হাসির তরঙ্গে বাগান মাতিয়া উঠিত। এই আনন্দের হিল্লোল আমার গায়ে আসিয়া লাগিত;—আমার সমস্ত দেহ যেন মুদিয়া আসিত। দুপুর বেলা তার মা তাহাকে কাছে লইয়া শুইতেন, তিনি একটু চোখ বুজিলেই গৌরী চুপি চুপি আমার কাছে পলাইয়া আসিত। কোনো কারণে বাড়ীতে কেহ কিছু বলিলে সে অভিমানের বেদনায় ছুটিয়া আসিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত। আমি যখন আমার কচি শাখাগুলি তাহার কপোলে বুলাইয়া দিতাম, তখন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সব ব্যথা আমার সেই নির্ব্বাক স্নেহস্পর্শে জুড়াইয়া যাইত। সুখে দুঃখে সকল সময়েই আমার গৌরী আমার কাছেই ছুটিয়া আসিত। দিনের কাজ শেষ করিয়া দিনমণি যখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িতেন, আমি তৃষিত নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম,—কখন্ আমার হাস্যময়ী গৌরী তাহার কলহাস্যের লহরী তুলিয়া

বাগানে বেড়াইতে আসে। তোমাদের আর কত বলিব?—তাহাকে পাইয়া আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সকল অভাব পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এমনি করিয়া আমি অতি সুখে দিন কাটাইতেছিলাম।

২

গৌরীর বাপের নাম কৈলাস চাটুয্যে। কৈলাসের সংসারে—পত্নী সাবিত্রী, পুত্র অমরনাথ ও কন্যা গৌরী ব্যতীত আর কেহই নাই। অবস্থা সামান্য; অল্প জমীজমার উপসত্ব হইতে সংসার চলে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নীর সুশৃঙ্খলার গুণে দরিদ্র সংসারেও বিশেষ কোনো অভাব নাই। অমরনাথ গ্রামে জেলাস্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছে।

সেদিন প্রভাতে কৈলাসচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। পূর্ব্ব-রাত্রে ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ ঘাট এখনও কর্দ্দমসিক্ত। বর্ষণস্নিগ্ধ গাছপালার শ্যামল পত্রপল্লবে বড় বড় জলের ফোঁটায় রোদ পড়িয়া ঝকঝক করিতেছে। সাবিত্রী ঘর-দুয়ার ঝাঁট দিয়া বাসিপাট সারিতেছেন। গৌরী একটা সাদা বিড়ালছানা লইয়া এতক্ষণ খেলা করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে হইতে বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল। তাহার একটি গুণ ছিল সে মুখ বুজিয়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারিত না। আসিয়াই বলিল—দেখ বাবা, কাল যখন ঝড় উঠল, আমি তখন মার সঙ্গে আম-কুড়োতে বাগানে গিয়েছিলুম। অনেক আম হয়েছিল। আমি আমগুলো সব আনতে পারতুম, মা আমাকে কিছুতেই আনতে দিলে না। মা আমাকে কোনো কাজ করতে দেয় না কেন বাবা?

কৈলাসচন্দ্র তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন—তুমি যে এখন এতটুকু ছেলেমানুষ মা! তুমি কি এখন কাজ করতে পার? আগে বড় হও, তখন তুমিও আবার কত কাজ করবে।

এ কথাটা গৌরীর তেমন ভাল লাগিল না। সে ক্ষুণ্নস্বরে বলিল—হ্যাঁ! আমি ছোট বই কি! কেন ওই দেখ বামী ওরা ত আমার চেয়ে আরো কত ছোট, তারা তবে কি করে কাজ করে?

কৈলাসচন্দ্র এ কথার কোনো সদুত্তর না পাইয়া গভীরভাবে তামাকে মনোনিবেশ করিলেন। গৌরীও সেজন্য ব্যস্ত না হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিল—কাল আমি কি পেয়েছি তা বুঝি এখনও তোমায় বলিনি বাবা? দেখ, ঝড়ে একটা ছোট শালিকের ছানা তার বাসা থেকে গাছতলায় পড়ে গিয়েছিল, আমি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটাকে—

—বাবাজি! কি হচ্ছে তোমাদের? বলিতে বলিতে পাড়ার হরিনাথ মুখুয্যে ওরফে হরি খুড়ো আসিয়া উপস্থিত। সময় কাটাইবার মত এমন উত্তম সঙ্গী পাইয়া কৈলাসচন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, সাগ্রহে বলিলেন—এস, এস, খুড়ো! তোমায় যে আর দেখাই পাই না! কোথায় ছিলে এতদিন?

শালিক-ছানার ইতিহাস শোনাইবার পথে বাধা পড়ায় গৌরী আর সেখানে দাঁড়াইল না! খুড়ো বারান্দায় উঠিয়া বসিয়া কৈলাসের

হাত হইতে হুঁকাটি টানিয়া লইলেন, পরে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—আমার কি একতিল সময় আছে বাবাজি! জান ত এ গ্রামটিতে—মনে কর গে—আমি না হলে ত কারুর কিছু হবার যো নেই। যখন যার কোনো দায় উপস্থিত অমনি ডাক খুড়োকে! তা এই—মনে কর—আমারও ঐ যে কেমন একটা চক্ষুলজ্জা আছে এই মুখের ওপর—মনে কর—কারুকে 'না' কথাটি বলতে পারি নি। বলি যাক বাপু! না হয় আমারই একটু কষ্টের উপর দিয়ে গেল। তবুও—মনে কর—পরের একটা উপকার হয়। কি বল বাবাজি?

কৈলাসচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—তা ত বটেই খুড়ো! তুমি আছ বলেই যার আমরা এখনও পাহাড়ের আড়ালে রয়েছি। জানি, যাই হোক না কেন, ভাবনা নেই,—খুড়ো যখন রয়েছেন!

খুড়ো তখন উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—বল ত বাবা! বল ত! এই নিয়ে তোমার খুড়ী—মনে কর—রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে, তোমার এ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাওয়া কেন? আমি বলি—মনে কর—আমি তখন বলি—আরে তুই মূখ্যু স্ত্রীলোক—তুই এ সবের মর্ম্ম কি বুঝিস্? এই—ধর না কেন—শাস্ত্রে আছে—

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন—তা যাগ্‌গে সে কথা! এখন—তুমি আজ সকালে কি মনে করে বল দেখি? তোমরা হলে কাজের লোক, বিনা কাজে ত কোথাও এক পা চল না!

খুড়ো তখন হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ! হ্যাঁ! বাবা! ঠিক বলেছ! দরকার একটু আছে বই কি। এই মনে কর—ও পাড়ায় মতি রায় আমায় কাল ডেকে পাঠিয়েছিল, তা আমায় ত জান—পরের উপকার হবে—তাতে ত—মনে কর—না বলতে পারি নি। তা গেলুম। মতি রায় বলে—খুড়ো! গৌরীর সঙ্গে আমার রমেশের সম্বন্ধ করতে হবে। মেয়েটি তোমার—মনে কর—দিব্বি ছবির মত কি না—তাই ওদের বড় পছন্দ হয়েছে। তা বাবাজি, মতি রায় লোক ভাল—আমায় খুব খাতির যত্ন করে;—বলে খুড়ো! গৌরীকে তোমায় আমার বউ করে দিতেই হবে। আমি বললুম—তা কৈলাস বাবাজি ত আমার অবাধ্য নয়, বিশেষ—মনে কর—তার মেয়েটিও ত বড় হয়েছে। তা হবে না কেন?

কৈলাসচন্দ্র এ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—আমি এখন গৌরীর বিয়ে দেব না মনে করেছি খুড়ো! সে এখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। তার মায়েরও ইচ্ছা যে আরও দিন কতক যাক।

খুড়ো এ কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার আফিঙের মহিমায় ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুটি সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—সে কি বাবাজি, গৌরীর বয়স ত এগারো পার হয়েছে। এ বয়সে—মনে কর—মেয়েদের দু বছর বিয়ে হয়ে যায়। তার এখনো বিয়ের বয়স হয় নি, বল কি?

কৈলাস বলিলেন—বিশেষ আমি ত

জানি রমেশ অনেক দিন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে; যত সব বদ ছোকরাদের সঙ্গে বখামী করে বেড়ায়। তার সঙ্গে কি করে গৌরীর বিয়ে দেব?

খুড়ো বলিলেন—রাধামাধব! কে তোমাকে এ সব কথা বলে বল ত? রমেশ অতি সৎ ছেলে—তবে একটু আধটু যা দোষ—তা মনে কর—কিছুই নয়—ও বয়স-কালে অমন সকলেরই হয়ে থাকে। বিয়ে হলে, ঘরকন্না হলে ও সব কিছুই থাকবে না।

কৈলাস নীরব রহিলেন।

খুড়ো বলিলেন—আরও দেখ! মতি রায় নির্ধন লোক নয়! তার ঘরে—মনে কর—তোমার মেয়ের কোনো কষ্ট হবে না। আর তোমার কাছে সে কিছু চায়ও না। তা—যদি তুমি শুধু মেয়েটি দাও তাতেও সে না বলবে না। তোমার অবস্থা ত জানি—ভাল করে মনে বিবেচনা করে দেখ। তোমার ভালর জন্যই আমার এত করে বলা।

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন—খুড়ো! তুমি যে আমার ভালর জন্যই বলছ তা কি আমি বুঝছি না? তবে কথা এই—তুমি ত জান, গৌরী আমার কত স্নেহের ধন। আমি তাকে মূর্খ অমানুষের হাতে দিতে পারব না। আমি বড়-ঘর চাই না, তবে ছেলেটি একটু মানুষের মত দেখে দিতে হবে ত? আমি এ সম্বন্ধে রাজী হতে পারলুম না। কিছু মনে কোরো না খুড়ো!

ব্যর্থমনোরথ হইয়া খুড়ো একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—আমি বুঝেছি, আজকাল তোমার সাহেবী মত হয়েছে। ছেলেকে কালেজে পড়তে দিয়েছ, বারো বছরের মেয়েকে বল ছেলেমানুষ—আমি বলছি কিন্তু—মনে কর—এতটা দর্প ভাল নয়। এক পয়সা লাগতনা, এমন ঘরটা ছেড়ে দিলে, এর পরে—মনে কর—এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে।

খুড়ো চলিয়া গেলেন। কৈলাসচন্দ্র অন্যমনা হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অনেকখানি কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন।

৩

এ ঘটনার অনেক দিন পরে একদিন বৈকালে গৌরী আমার কাছে বসিয়া কোঁচড়ে এক রাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছিল। আমি একমনে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম। কেহ কোথায় ছিল না। হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ছুটি যুবক আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। একটু অগ্রসর হইয়া একজন ডাকিল—গৌরি! কি হচ্ছে এখানে বসে?

গৌরী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। তার পরেই এক লাফে ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল।—ওমা! দাদা যে! তুমি কখন এলে দাদা?

কোঁচড়ের ফুলগুলা সব ছড়াইয়া পড়িল।

অমরনাথ বলিল—এই ত আসছি। তুই ভাল আছিস ত? দেখ দেখি আমার সঙ্গে ইনি কে, চিনতে পারিস?

গৌরী অনেকক্ষণ আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিল—আমি ত এঁকে কখনও দেখিনি।

অমরনাথ হাসিয়া বলিল—ইনি আমার একজন বন্ধু। আমার মত ইনিও তোর দাদা হন, বুঝেছিস ত?

গৌরী হ্যাঁ বলিয়াই দাদার হাত ছাড়িয়া

—ও মা! দাদা এসেছেন—বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতর ছুটিল।

শুনিলাম অমরের সঙ্গে বিমলের বড় বন্ধুত্ব। দুজনে কলেজে একসঙ্গে পড়ে। বিমল কলিকাতার কোন্ এক ধনী উকিলের ছেলে। পাশ দিয়া ছুটির সময় অমরের সঙ্গে কিছু দিনের জন্য পল্লীগ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছে।

দুই বন্ধুকে সর্ব্বদাই একসঙ্গে বাগানে বেড়াইতে দেখিতাম। কখনও বা দুজনে পুকুর-ঘাটে বসিয়া মাছ ধরিতেছে দেখিতে পাইতাম। আর গৌরী? তাহার কথা আর কি বলিব? সে এখন আর আমার কাছে বড়-একটা আসে না। দুই দিনের মধ্যেই বিমলের সঙ্গে তার ভাব হইয়া গিয়াছে! নূতন বন্ধুকে পাইয়া সে আমাকে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। হায়! মানুষের মন কি চঞ্চল!

গৌরী এখন আর নিজের খেলাতেও মন দিতে সময় পায় না। দাদাদের লইয়াই সে ব্যস্ত। প্রথম পরিচয়ের পরেই সে বিমলকে তাহার খেলাঘর, তাহার পুতুল, তাহার পাখী বিড়ালছানা সব দেখাইয়াছে। সে যতগুলি রূপকথা জানিত সে সবগুলি শোনানো হইয়া গিয়াছে। এখন সর্ব্বপ্রকারে নিঃসম্বল হইয়া সে তাহাদের সকল প্রকার ফরমাস খাটিবার ও ছিপ, চার ইত্যাদি বহিবার ভার লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত।

সেদিন অমরনাথ বাড়ী ছিল না, কোথায় গিয়াছিল। বিমল তাহার প্রতীক্ষায় স্নানে না গিয়া ঘরে একলা একখানি বই লইয়া শুইয়াছিল। ক্রমে বেলা বেশী হইতেছে দেখিয়া সাবিত্রী আসিয়া বলিলেন—বাবা! অমর ত এখনও এলনা, তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে? স্নান করে এসে ভাত খেয়ে নাও।

বিমল বই রাখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—আর একটু তার জন্য দেখি মা! সে এলে একসঙ্গে দুজনে নাইতে যাব অখন। বোধ হয় তার আর বেশী দেরী হবে না।

সাবিত্রী বলিলেন—না বাছা! তুমি আর দেরী কোরো না। তার এসব অনিয়ম সহা অভ্যাস আছে। তোমরা সহরে বাঁধা নিয়মে থাক—তবু এখানে এসে তোমার কত অনিয়ম হচ্ছে, কত কষ্ট হচ্ছে।

এমন সময়ে গৌরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বিমলের হাত ধরিয়া টানাটানি বাধাইয়া দিল—ও বিমল দাদা! পুকুরের মাঝে দুটো পদ্ম ফুল ফুটেছে দেখে এলুম। আমাকে এনে দেবে এস না!

সাবিত্রী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—ছি গৌরি! ওঁকে অমন করে বিরক্ত কোরো না। উনি কি মাঝ-পুকুরে অত জলে গিয়ে পদ্ম তুলতে পারেন?

—"না পারেন না বই কি! দাদা পারে আর উনি পারেন না! উনি যেন এখনও কচি খোকা—বড় হন নি! সে হবে না! তুমি এস একবার দাদা!"

সাবিত্রী বিমলকে বলিলেন—শোন বাবা! একবার পাগলের কথা শোন! ওকে নিয়ে আমার এক এক সময়ে এত ভাবনা হয় যে কি আর বলব? অত বড় মেয়ে হল, এখনও ওর ছেলেমানুষী গেল না।

কাকে কি বলতে হয় সে জ্ঞান নেই। পরের ঘরে গিয়ে যে ওর কি দুর্দ্দশা হবে আমি তাই দিনরাত ভাবি।

বিমল হাসিয়া সস্নেহে গৌরীর মুখের দিকে চাহিল, বলিল—আমি ত সাঁতার জানি না গৌরি! অত জলে কি করে যাব?

—সাঁতার জান না? গৌরী অবাক হইয়া গেল!—তুমি এত বড় হয়েছ, সাঁতার শেখনি?

কি করে শিখব গৌরি? আমাদের দেশে ত পুকুর নেই।

এবার গৌরী একেবার বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল! পুকুর নেই সে আবার কেমন দেশ! মাগো! সেখানে তবে লোকে থাকে কেমন করে?

বাড়ী ফিরিয়া যাইবার আগের দিন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে বিমল বলিল—গৌরি! কাল আমি বাড়ী যাব। শুনেছ ত? বাবা চিঠি লিখেছেন।

গৌরী বলিল—হ্যাঁ! শুনেছি। তুমি না গেলে তাঁরা খুব রাগ করবেন, না দাদা?

বিমল বলিল—না রাগ করবেন না, তবে অনেকদিন এসেছি এইবার যেতে ত হবে?

গৌরী বলিল—তবে আর কিছুদিন থাক না দাদা! তুমি চলে গেলে আমাদের বড় মন-কেমন করবে। মা ত সেদিন তোমার যাবার কথা শুনে কেঁদে ফেল্‌লেন।

বিমল খানিক চুপ করিয়া বলিল—আচ্ছা গৌরি! তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পার?

গৌরী চুপ করিয়া রহিল।

বিমল বলিল—আমি যদি তোমায় নিয়ে যাই তা হলে আমার সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করবে?

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—না, ভয় করবে না। কিন্তু আমি ত মা আর বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তাঁরা যখন যাবেন, আমি তখন যাব।

সেদিন রাত্রে আহারের পর কৈলাসচন্দ্র বিমলকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—বিমল! অমরের কাছে যে কথা শুনলুম তা কি সত্যি?

বিমল নতমুখে বলিল—হাঁ!

৪

শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া গেল কলিকাতার এক বিখ্যাত ধনী উকীলের ছেলের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ। গ্রামের লোকে প্রথমত কথাটা বিশ্বাস করিল না, উড়াইয়া দিল। অবশেষে যখন সমস্ত পাকাপাকি হইয়া সব স্থির হইয়া গেল, বরপক্ষ হইতে গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল, তখন সকলে একবারে অবাক হইয়া গেল। কৈলাস চাটুয্যের মত দরিদ্রের, তিনটা পাশ করা রূপে গুণে ধনে মানে এমন জামাই! ব্যাপারটা কিসে কি হইল কেহ ঠাওরাইতে পারিল না, চারিদিকে এই বিবাহের কথা লইয়া নানারূপ কল্পনা জল্পনা চলিতে লাগিল।

পাড়ার হিতৈষিণীর দল আসিয়া সাবিত্রীকে বলিতে লাগিল—তা যাই বল ভাই! যে যেমন লোক, তার তেমনি দরের লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে হয়। হাজার হোক,

তারা হল সহুরে বড়লোক—তাদের যুগ্যি আদর যত্ন তত্ত্বতাপাস করা—এসব কি আর তোমরা পেরে উঠবে? একটু ত্রুটি হলেই তখন দেখবে উঠতে বসতে খোঁটা খেতে খেতে মেয়ে তোমার সারা হয়ে যাবে। গঞ্জনার জ্বালায় মেয়ে নাকের জলে চোখের জলে হবে।

সাবিত্রী অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির, বেশী কথা বলিতে জানেন না। তিনি বলিলেন—আজকের দিনে দিদি, আর ও সব কথায় কাজ নেই। তাঁরা যখন আমার অবস্থা দেখেই দয়া করে গরীবের মেয়ে ঘরে নিচ্ছেন তখন আমাদের আর কি বলবার আছে? এখন তোমরা সকলে আমার গৌরীকে মন-খুলে আশীর্ব্বাদ কর—আমার কাঙ্গালের ধন সে—বেঁচে থাক সুখী হোক!—বলিতে বলিতে তাঁহার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ চোখদুটি জলে ভরিয়া গেল।

বিমলের পিতা নবীনবাবু, ছেলের একান্ত জেদ দেখিয়া গৌরীর সহিত তাহার বিবাহ দিতে মুখে সম্মতি দিয়াছিলেন বটে কিন্তু ছেলের এই অবাধ্যতায় মনে মনে তিনি রুদ্ধ অভিমান ও রাগে জ্বলিতেছিলেন। তিনি বিমলকে নানারূপে বোঝাইতে ত্রুটি করেন নাই। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া একটা নেহাৎ নগণ্য লোকের মেয়েকে ঘরে আনা যে বিষম নির্ব্বুদ্ধিতা,—এ কথা তিনি তাহাকে অনেক বোঝাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। বরঞ্চ সে জেদ করিয়া বসিল যদি ও মেয়ের সঙ্গে বিবাহ না হয় তবে আর ইহজীবনে সে বিবাহ করিবে না। নবীনবাবু ছেলের প্রকৃতি জানিতেন; একবার যে কাজে সে না বলে তাহাকে আর কিছুতেই হাঁ বলানো যায় না। কাজেই তিনি সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিলেন। সহজ কথায় যেখানে কাজ বাগানো যায় না—চাতুরী খেলিয়া সে কাজ কেমন করিয়া উদ্ধার করিতে হয় এতদিনের ওকালতিতে সে অভিজ্ঞতায় তিনি পাকা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—আচ্ছা, এ বিবাহে আমার মত আছে।

(৫)

গৌরীর গায়েহলুদ হইয়া গিয়াছে। আর চার দিন পরে বিবাহ। কৈলাসচন্দ্র একমাত্র কন্যার বিবাহে অবস্থার অতিরিক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার বাড়ী আত্মীয়কুটুম্বে পরিপূর্ণ। সকলেই প্রফুল্লমুখে শুভকার্য্যে ব্যস্ত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভাল ভাল কাপড় পরিয়া চারিদিকে কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই আনন্দিত; কেবল বাহিরের বাগানে সকাল বেলাকার নহবতের করুণ-রাগিণী যেন আমারই মনের বেদনাকে সুর দিয়া ফুকারিয়া উঠিতেছিল। আমার মনটা প্রতিক্ষণে দারুণ বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। আমার গৌরী—এই এতদিনের স্নেহ ভালবাসার বন্ধন সব ছিন্ন করিয়া আর দুই দিন পরে কোথায় চলিয়া যাইবে!

গায়-হলুদের পরদিন সকালবেলা নবীন বাবুর বাড়ীর সরকার কৈলাসচন্দ্রকে একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রে নবীন বাবু লিখিতেছেন:—যদিও বিমলের ও আমার একান্ত

ইচ্ছা ছিল যে মহাশয়ের কন্যার সহিতই এ শুভকার্য্য হয়, কিন্তু গৃহিণী প্রথম হইতেই এ সম্বন্ধে অসম্মত ছিলেন। আমরা বহুকষ্টে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া একরকম মত করাইয়াছিলাম। কিন্তু কাল বৈকালে কমলকুঠীর জমীদার শ্রীযুক্ত কামিখ্যা বাবু ঘটকী দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তিনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা, কন্যার তিন হাজার টাকার গহনা, এবং দানসামগ্রী বরাভরণ বাবদে দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া বিমলের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজী আছেন। এই সম্বন্ধ পাইয়া আমার গৃহিণী একবারে বাঁকিয়া বসিয়াছেন। তিনি কাহারও কথা শুনিবেন না;—এইখানেই ছেলের বিবাহ দিবেন। আমি অনেক বুঝাইলাম—ভদ্রলোকের এক কথা—বিশেষ যখন গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে—তা তিনি কোনো কথাই শুনিতে চান না। আমার পীড়াপীড়িতে অনেক কষ্টে এইটুকু হইয়াছে যে যদি আপনি বিবাহের রাত্রে অন্তত চারি হাজার টাকার জোগাড় রাখিতে পারেন তবেই কার্য্য সমাধা হয়—নতুবা বাধ্য হইয়া ঐ দিনে কামিখ্যা বাবুর বাড়ী বর পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে। এ কথা আপনাকে লিখিতে আমি যথেষ্ট লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতেছি, কিন্তু উপায় কি? আপনিও ভাবিয়া দেখিবেন, আপনার যেরূপ জামাতা হইতেছে তাহার তুলনায় টাকার পরিমাণ কিছুই নয়। যেরূপ স্থির হয় সংবাদ দিবেন, সেইমত ব্যবস্থা হইবে।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া কৈলাসচন্দ্র বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। অমরনাথ তাঁহার মুখ দেখিয়া ভীত হইয়া পত্রখানা তুলিয়া লইল। পরক্ষণেই ঘৃণায় ও ক্রোধে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে পত্রটা মোচড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—বাবা! আমি এখনি বিমলের কাছে যাই। তাকে জিজ্ঞাসা করব—এ সব ব্যাপার কি? বলিয়া পাগলের মত সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। বাহির-বাড়িতে সহসা একটা দীর্ঘ তান আকাশের দিকে উঠিতেছিল, হঠাৎ যেন তাহা ছিঁড়িয়া গেল। যে যেখানে যে কাজ করিতেছিল তাহা অমনি পড়িয়া রহিল। সকলেই স্তব্ধ। বাড়ীর সব উৎসব আনন্দ নিভিয়া গিয়া একটা আশঙ্কার কালো ছায়া গভীরভাবে ঘনাইয়া আসিল। সাবিত্রী ভাঁড়ার ঘরে ভাঁড়ার গোছাইতে গোছাইতে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেলে সুবচনীর পূজা মানসিক করিতেছিলেন, সেখানে এ সংবাদ পৌঁছিলে তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে কৈলাসচন্দ্রের বাহিরের ঘরে গ্রামের লোক একবারে ভাঙিয়া পড়িল। যাহারা এ বিবাহের সম্বন্ধ হইতে অবধি মনের মধ্যে স্বস্তিবোধ করিতেছিল না, আজ তাহাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? মহা আস্ফালন করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল—আমরা ত তখনই জানতাম যে এ বিবাহে এ রকম একটা কাণ্ড ঘটবেই! যার যেমন অবস্থা তার তেম্নি থাকাই ভাল। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাওয়াই বা কেন?

হরিনাথ খুড়ো বলিলেন—এ আর তোমরা বলবে কি? মনে কর—এ ত জানাই কথা।

আমি ত আর-বছর কৈলাস বাবাজিকে বলেই দিয়েছিলাম যে কাজটি ভাল হল না। মনে কর—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে, এর ফল ভুগতে হবে না? রমেশের মত এমন জামাই—মনে কর—লোকে ভাগ্য বলে মানে, ওঁর কি না তা পছন্দই হল না।

মতি রায়ও উপস্থিত ছিল, সে চোখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—এ যে তোমার অন্যায় কথা খুড়ো! কৈলাস ভায়া দেখে শুনে ভাল জামাই আনলেন, আমার রমেশকে ওঁর কি পছন্দ হতে পারে? ও কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে। তা যাক্, এটা যদি নেহাৎ হাত-ছাড়াই হয় তাতে ক্ষতি কি? অমরনাথের আর কত বন্ধুবান্ধব আছে। গৌরীর বিয়ে ভাবনা কি?

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ব্যয়লাঘবের জন্য দশ বছরের মেয়েকে একটি পঞ্চাশ বছরের পাত্রের হাতে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহের বছর পাঁচেক পরেই মেয়েটির শ্বশুর বাড়ীর সব বালাই চুকিয়া গিয়াছে। এখন সে সিঁথার সিঁদুর মুছিয়া থান পরিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাপের ঘরে দুবেলা ভাত রাঁধিতেছে। মতি রায়ের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য অবাক হইয়া গালে হাত দিলেন, বলিলেন—বল কি মতি ভায়া! রমেশকে ওঁর মনে ধরে না? মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, শাস্ত্রের শাসন অমান্য করবার যো নেই! তার পরে কার কি হবে না হবে সে ভাবনায় আমাদের দরকার কি? অদৃষ্টে যদি সুখ থাকে ত যার হাতেই দাও, মেয়ে সুখী হবেই! এ যে কৈলাসের অতি দর্পের কথা শুনতে পাই!

কৈলাসচন্দ্র নীরব নিস্তব্ধ। প্রতিবেশীদের টিটকারী তাঁহার বুকে তীক্ষ্ণ শেলের মত বাজিতেছিল। কিন্তু তিনি কাহারও কথার কোনো উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে কেবলই তোলাপাড়া করিতেছিলেন—এ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি উপায়? চার হাজার টাকা! সে যে তাঁর স্বপ্নেরও অতীত! এত টাকার জোগাড় করা কিছুতে তাঁহার ক্ষমতায় কুলাইবে না। সামান্য বাড়ীখানি ও জমীজমা বন্ধক রাখিয়া না হয় হাজার টাকা কষ্টেসৃষ্টে সংগ্রহ করিতে পারেন। আর তিন হাজার টাকা? কে ধার দিবে? তাঁহার এমন কি আছে যে লোকে বিশ্বাস করিয়া এত টাকা দিতে পারে? এদিকে টাকা না সংগ্রহ হইলে বিবাহের দিনে কামিখ্যা বাবুর বাড়ীতে বর যাইবে। ১২।১৩ বৎসরের এত বড় মেয়ে—গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, কি উপায় হইবে! জাতি কুল যায়, মান সম্ভ্রম যায়,—টাকা চাই-ই! কিন্তু কোথা হইতে এ টাকার জোগাড় হইবে?

বেলা দ্বিপ্রহরের পর স্নানাহারের অনুরোধে কৈলাসচন্দ্রের হিতৈষী বন্ধুগণ কিছুকালের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। কৈলাস তখনও একলা সেই ঘরে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে কেহ স্নান আহার করিতে ডাকে নাই, তাঁহার নিজেরও সে কথা মনে ছিল না।

বেলা ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। নিস্পন্দ কৈলাসচন্দ্র যখন কোনোদিকেই ভাবনার কূল কিনারা পাইতেছিলেন না, সেই সময় হঠাৎ গৌরী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। মোটা বেলফুলের

মত শুভ্র সুন্দর মুখখানি তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া আবদার করিয়া বলিল—বাবা! বেলা হয়েছে! নাইতে চল না! বাবা! মা কাঁদছে কেন? কি হয়েছে তোমাদের বাবা?

কৈলাস রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিলেন। দুঃখে অভিমানে তাঁহার অন্তর ফুলিয়া উঠিতেছিল। আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া গৌরীকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—দূর হয়ে যা সর্ব্বনাশি—আমার সামনে থেকে! হয় তুই মর, আর না হয় ত আমার মরণ হোক!

গৌরী অবাক হইয়া গেল। বাড়ীতে কি হইয়াছে? মা কাঁদিতেছেন, কাজ কর্ম্ম সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কাহারও মুখে কথা নাই, জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ তাহাকে কিছু বলে না, সকলেই নীরব স্তম্ভিত। এই ত সকালে সে বাগানে খেলা করিতে গিয়াছিল, তখন ত কিছুই হয় নাই।

বেলা হইলে কেহ খাইতে না ডাকায় ক্ষুধায় কাতর হইয়া গৌরী মায়ের কাছে গিয়াছিল। মা তখন ভাঁড়ার ঘরে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া মা আদর করিয়া ডাকিলেন না, খাবার দিলেন না,—কেবল অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরী কত জিজ্ঞাসা করিল, কত কথা বলিল, মা কিছুই বলিলেন না। মায়ের কান্না দেখিয়া তাহারও কান্না আসিতেছিল কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল বাবাকে ধরিয়া আনিতে পারিলেই সব সমস্যা কাটিয়া যাইবে, তাই সে বাবার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যখন কৈলাসচন্দ্র তাহাকে গালি দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন তখন সে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পিতার নিকট এমন অনাদর সে কখনো পায় নাই। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু যেন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল —আমি কি দোষ করিয়াছি! কেন আমার উপর সকলের এত রাগ! অভিমানে দুঃখে তাহার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে কোথাও স্থান না পাইয়া সে আগেকার মত আবার আমার কাছে আসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার গৌরী! আছ কয় দিন বিবাহের গোলমালে, বহু লোকসমাগমে ব্যস্ত থাকায় সে আমার কাছে আসে নাই। সুখের সময় সে আমায় ভুলিয়াছিল, আজ যখন দুঃখের দিনে বাড়ীতে কেহ স্নেহাশ্রয় মিলিল না; তখন সে সেই ছোটবেলার মত আমারই বুকে ফিরিয়া আসিয়া বেদনার অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

তাহার পরে—তাহার পরে কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সমস্ত দিন সে শুষ্ক মুখে শূন্য মনে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সে মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বাড়ীর বাহিরে, পথে ঘাটে, স্থানে স্থানে স্ত্রীপুরুষেরা তাহার বিবাহের কথা লইয়া জটলা পাকাইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে সেই সব কথা নানা লোকের মুখে নানা প্রকারে শুনিয়া শুনিয়া সে মোটামুটি ব্যাপারটা একরকম বুঝিতে পারিল। তখন মায়ের সেই নীরব রোদন, বাপের সেই হতাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় মুখ তাহার মনের মধ্যে কেবলই প্রবলভাবে ঘা দিতে লাগিল।

তাহার জন্যই ত আজ মা বাপের এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা,—পাড়ায় সকলে আজ তাহাদিগকে কত কথা বলিতেছে, কত টিটকারী দিতেছে! সে কি করিবে? কি করিলে তাঁহাদের সব বেদনা দূর হইবে? ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে কেবলই কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার সময় যখন সে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে আপনার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল তখন প্রবল জ্বরে তাহার আর চৈতন্য রহিল না।

কৈলাসচন্দ্র সেই-যে হঠাৎ মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গৌরীর সহিত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা দিনের মধ্যে কেবলই তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। গৌরীর সেই স্তম্ভিত কাতর মুখ মনে করিয়া তিনি কোথাও স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। একবার তাহাকে বুকে লইয়া আদর করিবার জন্য তাঁহার স্নেহকাতর চিত্ত আকুল হইয়া উঠিতেছিল। নিজের মাথার উপরে যে গুরুভার বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে সে কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি চারিদিকে গৌরীকে খুঁজিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন, প্রখর রৌদ্রতাপিত যূথিকার মত সোনার গৌরী বিছানায় লুটাইতেছে।

গভীর রাত্রে গৌরী একবার চোখ খুলিল। মাকে ডাকিল—মা!

—কি মা।

—মা! বাবা কোথায়!

—"এই যে আমি মা আমার!" কৈলাস তাহার মাথাটি কোলে তুলিয়া লইয়া গভীর স্নেহে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বাপের আদরে গৌরীর উচ্ছ্বসিত রোদন আর বাধা মানিল না। সে কাঁদিয়া বলিল —বাবা! আমার জন্যই তোমাদের এত কষ্ট, আমি যদি এখনি মরে যাই তাহলে আর তোমার কোনও দুঃখ থাকবে না!

মর্ম্মাহত কৈলাসচন্দ্র এই অভিমানপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। বুক ফাটিয়া দুই ফোঁটা গরম রক্ত অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার আহত চিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল—মা! আমি কিছু চাই না! আমার মান সম্ভ্রম যাক্, সর্ব্বস্ব যাক্! তুই ফিরে আয় মা! ফিরে আয়!

* * *

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে অমরনাথ বিমলকে লইয়া অতিশয় ব্যস্তভাবে বাড়ী আসিল। সমস্ত বাড়ীখানি নিস্তব্ধ—বারান্দায় কৈলাসচন্দ্র একা বসিয়াছিলেন। দুই দিন পূর্ব্বে যে গৃহ আনন্দ-উৎসবে, লোকের কলরবে, সানাইয়ের মধুর আলাপে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল, আজ সেই আনন্দময় গৃহ শূন্য—শ্মশানের মত বোধ হইতেছে। বাড়ীতে পা দিয়া কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় অমরনাথের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া বলিল—বাবা! বাড়ীর সব খবর কি? মা কোথায়? গৌরী কই?

কৈলাসচন্দ্র উত্তর দিলেন না।

বিমল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—অমরের কাছে যা শুনলুম তাতে আপনার কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করছে। আমায় বিশ্বাস করুন—আমি শপথ করে বলছি—আমি এ বিষয়ের কিছুই জানতাম না। এ আমার বাবার চাতুরি! আপনার কোনো চিন্তা নেই—বিবাহে কোনো প্রতিবন্ধক হবে না।

কৈলাসচন্দ্র উদাসভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অমরনাথ তাঁহার ভাব দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। উভয়ে ঘরে গিয়া দেখিল, দিনশেষে ঝরা-ফুলের মত গৌরী বিছানার উপর পড়িয়া আছে; তাহার পাশে সংজ্ঞা-হীনা সাবিত্রীর দেহ মাটিতে লুটাইতেছে। "বোনটি আমার!"—বলিয়া অমরনাথ বিছানায় আছড়াইয়া পড়িল। বিমল বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর আর কি বলিব? চাটুয্যের সোনার সংসার শ্মশান হইয়া গিয়াছে। গৌরীর শোকে অল্পদিনের মধ্যেই সাবিত্রীও তাহার অনুগমন করিয়াছেন। অমরনাথ উদ্‌ভ্রান্ত পিতাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছে। বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে;—যেখানে গৌরী বিকালে বাপের হাত ধরিয়া বেড়াইতে আসিত সেই সাধের ফুলবাগান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। চারিদিক শূন্য—নীরব নিস্তব্ধ! এই অসীম শূন্যতার মাঝে বিজন বনে আমি এখনও দগ্ধ হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছি।

বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। নিরাভরণ তরুলতাকে নবীন পত্রপুষ্পে সাজাইয়া বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে বেল জুঁই চাঁপার মধুর গন্ধ —নবমুঞ্জরিত আম্রমুকুলের স্নিগ্ধ সৌরভ, ফাল্গুনের আগমন ঘোষণা করিতেছে। সহকার-শাখার অন্তরাল হইতে বসন্ত-সখা কোকিলের কুহুরব অবিরাম শুনা যাইতেছে। সমস্ত বনস্থলী আজ প্রেমে পূর্ণ—কিন্তু এ আনন্দের দিনে আজ সে কোথায়! যাহার কোমল রক্তিম চরণ দুটির চঞ্চল গতিতে সমস্ত বনস্থলী মুখরিত হইয়া উঠিত, সেই আনন্দময়ী আজ কোথায়? ওগো! তোমরা কেহ আমার গৌরীকে ডাকিয়া দাও! আমি একবার তাহাকে দেখি! বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, সে কি আর ফিরিবে না?

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।



কারাপ্রাঙ্গণে শক্তি

—যেন নিজেই একটি মহান্ধকার রাত্রি!

(শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "ফুলের মালা")

বঙ্গে বিবাহ-বৈচিত্র্য

(আদম সুমারী)

বিবাহের পূর্ব্বে মিলন

কতকগুলি আদিম জাতির মধ্যে এখনও বিবাহের পূর্ব্বে যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; বার্ষিক উৎসবের সময় স্বৈরচারিতা প্রভৃত পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয়। খারিয়া জাতির মধ্যে বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবের সময় গ্রামস্থ যুবক যুবতীরা নির্ব্বিবাদে পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকে। ওরাওঁ জাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবকেরা পিতামাতার নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে 'ধুমকুড়িয়া'য় রাত্রি যাপন করে এবং অবিবাহিতা যুবতীরা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বাটীতে, নামমাত্র তাহার তত্ত্বাবধানে, রাত্রিবাস করে। যদি কোন বালিকা রাত্রে বালকদিগের ঘরে চুপি চুপি পলাইয়া যায়, বৃদ্ধা তাহা চোখে দেখিয়াও দেখে না। আবার কোন কোন গ্রামে ওরাওঁ বালক বালিকারা একই স্থানে রাত্রে শয়ন করে। যদি কোন যুবকের সহিত মিলনে কোন যুবতীর গর্ভ হয়, তাহা হইলে সেই যুবতীকে বিবাহ করিতে সে বাধ্য, নতুবা পঞ্চায়তের বিচারে তাহার দণ্ড হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের মধ্যে যদি কোন যুবক কোন যুবতীর গর্ভ-সঞ্চারের পর স্ববংশীয়া বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে পয়সা কড়ি দিয়া একটি স্বামীর জোগাড় করিয়া দিতে হয়; সাঁওতালেরা এইরূপ জামাইকে "কিরিং জামাই" (ক্রীত জামাই) বলে।

পূর্ণিয়া জেলায় রাজ-বংশীদিগের মধ্যে বিবাহে অত্যধিক ব্যয়ের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব্বেই স্ত্রী-পুরুষের মত একত্র বাসের প্রথা দেখা যায়। স্বজাতীয়গণকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা তাহাদের বিবাহের একটি অনুষ্ঠান। তাহাদিগকে ভোজন না করাইলে বিবাহ নামঞ্জুর হইয়া যায়। অর্থাভাবে যদি কেহ জ্ঞাতিদের ভোজ দিতে না পারে, তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোকের অঙ্গে জল ছিটাইয়া তাহাকে লইয়া সে ঘর করিতে পারে। কিন্তু যত দিন ভোজ দিতে না পারে, সন্তান জন্মিলেও ততদিন তাহার বিবাহ বাতিল থাকে; ভোজ দিতে পারিলেই বিবাহ মঞ্জুর হইয়া যায়।

স্ত্রী-হরণ

ছোটনাগপুরের কতকগুলি আদিম জাতির মধ্যে স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উড়িষ্যায় ভুঁইয়াদিগের মধ্যে যদি কোন যুবক কোন যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়, এবং তাহার পিতামাতা সে বিবাহে সম্মতি দান না করে, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক যুবতীকে যুবা হরণ করিয়া লয়, এমনও দেখা যায়! হো-জাতির মধ্যে নৃত্যের স্থান কিংবা বাজার হইতে যুবকগণ যুবতী হরণ করে। এখনও অনেক নিম্ন জাতির "বরাত" প্রথায় স্ত্রী-হরণ ও তজ্জন্য সংগ্রামের লক্ষণাদিও দেখিতে পাওয়া যায়।

সেবা ও বিবাহ

সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, রাজবংশী ও হাড়িদিগের মধ্যে বর কিয়ৎকাল কন্যার পিতা-মাতার গৃহে থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা কন্যার পিতা-মাতার মনস্তুষ্টি করিয়া, কন্যার পাণিগ্রহণ করে, এ প্রথাও দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালদিগের মধ্যে কন্যা, কুৎসিত কিংবা বিকলাঙ্গী হইলে অথবা কন্যার ভাই না থাকিলে উক্ত প্রথায় তাহার বিবাহ হইতে দেখা যায়। এই "আহারাদি জামাই" সাধারণতঃ দরিদ্র, পণ দিয়া কন্য-গ্রহণে অসমর্থ, ভাবী শ্বশুরের আশ্রয়ে পণের পরিবর্ত্তে পাঁচ বৎসর বিনা মজুরিতে অকাতর পরিশ্রম করিয়া কন্যার পাণিলাভ করে; বিবাহের পর শ্বশুরের নিকট হইতে দুইটি মহিষ, কিঞ্চিৎ ধান্য ও কতকগুলি চাষ করিবার যন্ত্রপাতি লইয়া স্ত্রীর সহিত সে স্বতন্ত্র বাস করিতে যায়। যদি শ্যালক না থাকে, তাহা হইলে জামাতা শ্বশুর-গৃহেই রহিয়া যায়, শ্বশুরের কাজকর্ম্ম দেখা-শুনা করে এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লাভ করে। সেই সকল "ঘর জামাইয়ের" পুত্রেরা মাতামহের নাম গ্রহণ করে। মুণ্ডাদিগের মধ্যে "ঘর-জামাই" তিন বৎসর কাল শ্বশুর-গৃহে বাস করে, তৎপরে কন্যার পাণিগ্রহণের পর স্বগৃহে ফিরিয়া থাকে। তৎকালে সে কতক জমি, বারো মণ চাউল ও দুইটি মহিষ যৌতুক-স্বরূপ লাভ করে। ওরাওঁদিগের মধ্যে তিন প্রকার "ঘর-জামাই" দেখিতে পাওয়া যায়—এক প্রকার—ভৃত্যের মত, যতদিন কাজ করে, ততদিন ভাত, কাপড় ও মজুরি পায়; দ্বিতীয় প্রকার—ভাত, কাপড়, মজুরি ও স্ত্রী-সঙ্গ পাইয়া থাকে এবং তদ্ব্যতীত চলিয়া যাইবার সময় দুইটি মহিষ, একটি লাঙ্গল, কতকগুলি কৃষি-যন্ত্র ও কিছু-কিছু তৈজস পত্রও লাভ করে; তৃতীয় প্রকার জামাতা চিরকাল অপুত্রক শ্বশুরের আলয়ে বাস করে, শ্বশুরের সেবা করে এবং তাহার কাজকর্ম্ম দেখে।

পণ-বিবাহ

বর্ত্তমান কালে পণ-বিবাহ অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত—হয় বর না হয় কন্যাকে অর্থ দিতে হয়; উচ্চ জাতির মধ্যে বরকে দিতে হয় এবং নিম্ন জাতির মধ্যে কন্যাকে দিতে হয়। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপর পণের হার নির্ভর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই আজকালকার বিবাহের বাজারে বরের দর নির্দ্ধারণ করে। বাঙ্গলা দেশে এণ্ট্রান্স, এফ্ এ, ও বি এ উপাধিধারী যুবকগণকে বিবাহের বাজারে ৫০০৲ হইতে ৩০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে সাধারণতঃ বিক্রয় হইতে দেখা যায়; সময় সময় অনেক কন্যার পিতা ১০,০০০ টাকাও অম্লান বদনে বরকে দিয়া থাকেন। বাঁকুড়া জেলায় সদ্‌গোপদিগের মধ্যে কন্যাকে পণ দিয়া বিবাহের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু বর যদি গণ করা হয়, তাহা হইলে বরের অর্থদণ্ড না ঘটিয়া অর্থলাভ ঘটে। বর ও কন্যার বয়সের উপর দরের হার কতকটা নির্ভর করে। যেখানে কন্যা ক্রয় করা হয়, সেখানে অল্পবয়স্কা

বালিকার দর বেশী; যেখানে বর বিক্রয় হয়, সেখানে বয়স্থা বালিকার বিবাহ দিতে অধিক ব্যয় হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর ও কন্যার মোটা মুটি একটা বাজার-দর দেওয়া গেল—

দর

জাতি	কন্যা	বর
আগুরি	—	২০০—৫০০০৲
বাগ্‌দি	৭—৬৪৲	—
বৈদ্য	—	৫০০—৩০০০৲
বাগ্‌রি	৪—১০৲	—
ব্রাহ্মণ	—	৫০০—৫০০০৲
গন্ধবণিক	—	৫০—৩০০৲
গোয়ালা	১০০—৪০০৲	—
কাহার	৫০—১০০৲	—
কৈবর্ত্ত	২৫—১০০৲	—
কাওরা	১৫—৫০৲	—
কায়স্থ	—	২০০—৫০০০৲
কৈরি	৫০—১০০৲	—
কুর্ম্মি	২—১০০৲	—
মুণ্ডা	৫—৮০৲	—
নমঃশূদ্র	২০—১০০৲	—
ওরাওঁ	১০৲	—
পোদ্	১৫—৫০৲	—
রাজবংশী	৮০—১০০৲	—
সদ্‌গোপ	৩০—৫০০৲	—
সাঁওতাল	১৩৲	—
সুবর্ণবণিক	—	৫০০—৩০০০৲
তেওর	১৫—৫০৲	—

সম্প্রতি বর ও কন্যার দর বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কুচবিহারে রাজবংশী কন্যার ৪০।৫০ টাকা দর ছিল, কিন্তু এখন তাহা বাড়িয়া ৮০।১০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। যেমন চাল, ডাল, মাছ, তরকারির দর বাড়িয়াছে, সেইরূপ বর ও কন্যার দরও বাড়িয়া গিয়াছে। আবার রেল বিস্তার হওয়ায় বিবাহের ক্ষেত্র অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। লাহোরের পাত্রীর সহিত কলিকাতার পাত্রের বিবাহ এবং চট্টগ্রামের পাত্রীর সহিত এলাহাবাদের পাত্রের বিবাহ নিত্যই এখন ঘটিতেছে।

বিবাহ ও বয়স

যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। নিম্নজাতির মধ্যে ৮ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে; কিন্তু উচ্চ জাতির মধ্যে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে। বালিকাদিগের বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইবার একটি কারণ, উচ্চ-জাতিসমূহের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার। বিবাহে বাজারে বরের অত্যধিক দরও অপর একটি কারণ। কন্যাদায় ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন দায় হইয়া উঠিতেছে। পিতা অনেক সময় অর্থাভাবে উপযুক্ত সময়ে কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না।

সাধারণতঃ নেপালী, সাঁওতালী ও অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যে যুবক ও যুবতীর মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে অল্পবয়স্কা বালিকার সহিত অল্পবয়স্ক বালক কিংবা যুবকের বিবাহ হয় না

বাল্য-বিবাহ

নিম্নজাতিগুলির মধ্যে এখনও বাল্যবিবাহ দেখা যায়; বিহারে বিশেষতঃ গোয়ালা-দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অত্যধিক প্রচলিত।

বিবাহ-পদ্ধতি

"সিন্দূর-দান" বিবাহের প্রধান অঙ্গ। কয়েকটি জাতির মধ্যে ব্যবস্থা আছে যে যদি কোন প্রেমিক কোন প্রেমিকার কপালে সিন্দূর দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের বিবাহ হইয়া যায়। এমন কি পূর্ণিয়া জেলায় মুসলমানদিগের মধ্যেও যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের কপালে সিন্দূর পরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোকের সহিতই তাহার বিবাহ হইয়া যায়। সিন্দূর-দানেই সাঁওতালদিগের বিবাহ সিদ্ধ; কিন্তু যদি কোন সাঁওতাল যুবক সিন্দূর-দানের সময় ধরা পড়ে, তাহা হইলে সে যথেষ্ট প্রহার লাভ করে; যদি হাতে হাতে ধরা না পড়ে, তাহা হইলে কন্যার আত্মীয় স্বজনেরা যুবকের বাটীতে যাইয়া তাহাকে বাঁধিয়া প্রহার করে ও তাহার গরু কিংবা মহিষ কাড়িয়া আনে এবং পঞ্চায়তের বিচারে কন্যার পিতাকে অর্থদণ্ড দিবার পর সেই গরু বা মহিষ বর ও কন্যার সম্পর্কীয়েরা মিলিয়া ভোজন করে। সিন্দূর-দানের পদ্ধতি, বোধ হয়, পুরাকালে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে রক্ত-বিনিময়-প্রথার নিদর্শন-স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

রক্ত-বিনিময়-প্রথা এখনও বাঙ্গলাদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে দেখা যায়। হাড়িরা বরের অঙ্গুলিতে একটী কাঁটা বিঁধিয়া সেই ক্ষত হইতে রক্ত তুলিয়া কন্যার অঙ্গে এবং সেই ভাবেই কন্যার রক্ত তুলিয়া বরের অঙ্গে মিশাইয়া থাকে। মুঙ্গের জিলায় ধাড়ি ও দোসাদ জাতিরা নাপিত ডাকাইয়া নরুন দিয়া বরের অঙ্গুলি কাটাইয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্তে একটি লাল তুলা ভিজাইয়া লয়; পরে সেই তুলা একটি পানের মধ্যে পুরিয়া কন্যাকে এবং কন্যার রক্তে মাখানো তুলা আর একটি পানের মধ্যে পুরিয়া তাহা বরকে খাইতে দেয়। গুলগুলিয়া জাতির মধ্যে বরের রক্তে মাখানো তুলা দিয়া কন্যার পায়ে আল্‌তা পরানো হয় এবং কন্যার রক্ত মাখানো তুলায় বরের পা রঞ্জিত করিয়া দেয়। উচ্চজাতীয় বাঙ্গালীর মধ্যে এখনও নববধূকে "দুধে আলতায়" দাঁড় করাইয়া অভিভাষণের ব্যবস্থা ঘরে ঘরে প্রচলিত। এই "দুধে আল্‌তার" ব্যবস্থা বোধ হয় পূর্ব্বকালের রক্ত-ব্যবহার প্রথারই নিদর্শন-স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ

উচ্চ জাতিরা বিধবা-বিবাহের অনুমোদন করেন না; এখনও নিম্নজাতিদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমধিক প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু নিম্নজাতির মধ্যেও যাহারা পদ ও মর্য্যাদার অভিলাষী, তাহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নহে এবং তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ-প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কতক-জাতির মধ্যে বিধবার বিবাহ হইলেও তাহার স্থান কুমারী অপেক্ষা অনেক নীচে এবং কয়েক স্থলে আবার উপ-পত্নীর ন্যায় ঘৃণ্য। সাঁওতালেরা বিধবা-বিবাহ ঘৃণার চক্ষে

দেখিয়া থাকে; বিবাহের সময় বিধবার কপালে সিন্দূর না দিয়া বর একটি ফুলে সিন্দূর মাখাইয়া বাম হাতে করিয়া বিধবার মাথায় তাহা ফেলিয়া দেয়। মানভূম জেলার কুর্ম্মিরা বিধবা-বিবাহে হাতে করিয়া না দিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া বিধবার কপালে সিন্দূর পরাইয়া থাকে। রাজবংশীদিগের মধ্যে যাহারা বিধবা বিবাহ করে, তাহাদিগকে "ডেঙ্গুয়া" বলে; ডেঙ্গুয়া অত্যন্ত ঘৃণিত জীব; যদি ডেঙ্গুয়া কোন মরা গরু স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঘৃণায়, শকুনিরাও তাহাকে পরিত্যাগ করে।

ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি (১৮৭২ সালের ৩ আইন) অনুসারে ১৯০১ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত সরকারমেত ৩৩৫টী বিবাহ হইয়াছে; ইহার মধ্যে কেবল মাত্র ৩৪টি বিধবা বিবাহ। ইহাতে বোধ হয় অন্ততঃ বিধবা বিবাহের জন্যও ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধির প্রয়োগ খুবই অল্প হইয়াছে।

দেবর বিবাহ

ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় নিম্ন জাতীয় হিন্দু এবং আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এক প্রকার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে—ইহাকে দেবর-বিবাহ বলা যাইতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকে—পরকে বিলাইয়া দেয় না; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন পণ দিয়া বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তখন সে যৌথ পরিবারের সম্পত্তি, তাহাকে পরের হাতে না দিয়া ঘরে রাখাই কর্ত্তব্য। সাঁওদিগের মধ্যে যখন কোন দেবর তাহার বিধবা ভাজকে বিবাহ করে, তখন আর তাহাকে পণ দিতে হয় না বা বিবাহের কোন আচারও পালন করিতে হয় না। হো এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে দেবর বা ভাজ যদি বিবাহে অসম্মত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বিধবাকে বিবাহ করে, তাহাকে বিধবার প্রথম বিবাহে লব্ধ পণ প্রথম স্বামীর স্বজনকে ফিরাইয়া দিতে হয়। গণ্ডা জাতির মধ্যে বিধবার দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর পণের টাকা দিতে না পারিলে সমাজচ্যুত হয়। দেবরের সহিত ভাজের বিবাহে কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই; দেবর বা ভাজের ইচ্ছার উপরই তাহা নির্ভর করে। উড়িষ্যায় এখনও স্বামী যদি দুই বা তিন বৎসরের জন্য কার্য্যোপ-লক্ষে বিদেশে বাস করে, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীকে দেবর বা অপর কোন পুরুষ কখনও কখনও বিবাহ করিয়া থাকে, এমন দেখা যায়।

কৃত্রিম বিবাহ

বাগ্দীদিগের মধ্যে প্রকৃত বিবাহের পূর্ব্বে মহুয়া গাছের সঙ্গে একরূপ কৃত্রিম বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। খাড়োয়া জাতির মধ্যে আম্র বৃক্ষ কিংবা সেই বৃক্ষের শাখার সহিত কৃত্রিম বিবাহ হইয়া থাকে। ছোট নাগপুরের কুর্ম্মীদের মধ্যে বিবিধ বৃক্ষের সহিত কৃত্রিম বিবাহের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়;—বরের সহিত আম গাছের এবং কন্যার সহিত মহুয়া গাছের বিবাহ হইয়া থাকে। নেপালে নেওয়ার বালিকাদের বেল ফলের সহিত কৃত্রিম বিবাহ এবং বড় হইলে স্বামীর সহিত পুনরায় বিবাহ হইয়া থাকে। এই সকল

গাছের সহিত কৃত্রিম বিবাহ-প্রথা দেখিয়া মনে হয়, ইহা আদিম সমাজেরই বিবাহ-পদ্ধতির নিদর্শন—ইহার দ্বারা বোধ হয় ভ্রান্ত আদিম মানব বিবাহিত জীবনের দুঃখ বৃক্ষকে অর্পণ করিত।

আর এক প্রকার কৃত্রিম বিবাহ দেখা যায়—ইহার উদ্দেশ্য স্ত্রীজাতির বিবাহ না হওয়ার কলঙ্ক মোচন করা। কোন জাতির মধ্যে অসির সহিত, কোন জাতির মধ্যে ফুল বা বৃক্ষের সহিত কিংবা তীরের সহিত কৃত্রিম বিবাহ হইয়া থাকে। আই-বুড়া নাম ঘুচানোই এইরূপ বিবাহের উদ্দেশ্য।

যদি কোন কুমার কোন বিধবাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে গাছ বা ফুলের সহিত তাহাকে কৃত্রিম বিবাহ করিতে দেখা যায়।

বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে দুইবার স্ত্রীবিয়োগের পর তৃতীয় বার যদি পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহের পূর্ব্বে কোন বৃক্ষের গায়ে বা কুকুরের গলায় তাহাকে মালা পরাইয়া দিতে হয়। ইহার অর্থ—যদি আবার কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, ত তাহা ঐ গাছ বা কুকুরের উপর দিয়াই খণ্ডিয়া যাক্! চতুর্থ বার বিবাহ করিতে হইলে এ ব্যবস্থা নাই; পঞ্চমবারে কিন্তু তৃতীয়বারের ব্যবস্থাই বাহাল থাকে!

বেশ্যাদের বিবাহ

যদিও বেশ্যাদের জীবন বিবাহের জলন্ত প্রতিবাদ, তথাপি বেশ্যাদের মধ্যে একপ্রকার কৃত্রিম বিবাহের ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গলা দেশে বেশ্যাকন্যাদের যৌবন উপস্থিত হইলে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কোন গাছ, তরবারি, ছোরা, অথবা কোন ভাড়াটিয়া বৈষ্ণব, বেশ্যা-পুত্র বা বোকা হাবা লোকের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। নীচ জাতীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া বিবাহ দেয়; কিন্তু ভাড়াটিয়া স্বামীর স্ত্রীর উপর কোন দাবী-দাওয়া জন্মে না; বিবাহের পর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। মুসলমানী বেশ্যাদের কৃত্রিম বিবাহে মোল্লা আসিয়া বিবাহ দিয়া থাকে। হিন্দু বেশ্যাদের প্রায় গাছের সহিত এবং মুসলমানী বেশ্যাদের ছোরা বা তরবারির সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। জুঁই, মল্লিকা, গোলাপ গাছই হউক, আর কদলী বৃক্ষই হউক, কিম্বা ছুরি, ছোরা বা তরবারিই হউক, বেশ্যাদের বিবাহে আচার-অনুষ্ঠানের কোনরূপ ত্রুটি থাকে না। বেশ্যারা এই কৃত্রিম বিবাহের মাত্রা অনেক দূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। ইহারা অতি যত্নে সেই বৃক্ষে জলসেচন করে এবং সিন্দুকের মধ্যে সেই তরবারি তুলিয়া রাখে; যত দিন গাছ বাঁচিয়া থাকে বা তরবারি না হারায়, ততদিন বেশ্যাকন্যা আপনাকে সধবা মনে করে; পরে গাছ মরিয়া গেলে কিংবা তরবারি হারাইলে বিধবার মতই সে হাতের লোহা খুলিয়া ও কপালের সিন্দুর মুছিয়া ফেলে। মনে হয়, এই সকল কৃত্রিম বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু আইবুড়া নাম ঘুচানো।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা বা দুরারোগ্য রোগগ্রস্তা হইলে তাহার সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে স্ত্রী হাতের লোহা ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা কোন গাছের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে। কতক জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের পূর্ব্বে পঞ্চায়তের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন; সম্বলপুরে গণ্ডা জাতির মধ্যে "শেঠিয়ার" (বা গ্রামের প্রধানের) অনুমতি ব্যতীত বিচ্ছেদ হইতে পারে না। স্ত্রীলোক-দিগের সাধারণতঃ বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু নেপালে নেয়ার জাতীয় স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মাত্রেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। স্ত্রী দুইটী সুপারি বিছানায় রাখিয়া প্রস্থান করিলে বুঝিতে হইবে যে, সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। পূর্ণিয়া জেলায় মুসলমানী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। যদি কোন মুসলমানী স্বামীর সহিত ঘর করিতে নারাজ হয়, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে সে হাটে গিয়া মনের মত দ্বিতীয় স্বামী খুঁজিয়া লইতে পারে—তাহাকে কেবলমাত্র তাহার সেই নির্ব্বাচিত স্বামীর অঙ্গে কতকগুলি মুড়কি ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে পূর্ব্ব বিবাহের বন্ধন ছিন্ন এবং নূতন বিবাহ সিদ্ধ হইয়া যায়। কোন সাঁওতালী যদি স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে সে স্ত্রী ইচ্ছা করিলে স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার দাবী করিতে পারে।

বহু ভর্ত্তা

দুই প্রকার বহুভর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—একপ্রকারে স্ত্রীলোকের বহু স্বামীদের মধ্যে পরস্পরের কোন সম্পর্ক নাই; অন্য প্রকারে, স্ত্রীলোকের বহু স্বামী মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক। ভুটিয়া সাঁওতালদিগের মধ্যে বহু ভ্রাতায় একটী স্ত্রীকে বিবাহ করে। সাঁওদিগের মধ্যে অবিবাহিত দেবরের ভাজকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের অধিকার আছে।

বহু-বিবাহ

যদিও বহু-বিবাহে কোনরূপ শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক নাই, তথাপি উচ্চজাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ অত্যন্ত বিরল। স্ত্রী বন্ধ্যা কিংবা দুরারোগ্য রোগে প্রপীড়িতা হইলে, কোন কোন স্বামীকে ক্বচিৎ একাধিক বিবাহ করিতে দেখা যায়। এক স্ত্রীকেই ভাত দিতে অনেকে অক্ষম, তাহার উপর বহু স্ত্রী হইলে এই অনাটনের দিনে সতীনের কলহের মধ্যে সংসার চালানো যে কি সুখের তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। সাঁওতাল পরগণার সাওড়িয়া পাহাড়িয়া বা মালের জাতীয়েরা পাঁচ বা ছয়টি ভগ্নীকে এক সঙ্গে বিবাহ করে; প্রথমে বড়, তাহার পর ছোট এবং তৎপরে তাহার ছোট ভগ্নীর সহিত বিবাহ হয়। বড় ভগ্নীর বিনা অনুমতিতে ছোট ভগ্নীর সহিত বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের পর ভগ্নীরা এক বাটীতে এক সঙ্গে বাস করে, রাত্রে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করে। বড় ভগ্নীর আদেশ-ব্যতিরেকে ছোট ভগ্নীর সহিত সহবাস করিলে পঞ্চায়তের বিচারে স্বামী দণ্ডনীয় হয়। সাঁওদিগের মধ্যে শ্যালীর সহিত সম্বন্ধ বড় শিথিল; যদি কাহারও দ্বারা তাহার শ্যালিকার

গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই শ্যালীকে বিবাহ করিতেই হইবে।

পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল; এখন শিক্ষা-বিস্তারের সহিত উহা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

কতকগুলি বিচিত্র প্রথা

সাধারণতঃ কন্যার বাটীতে বিবাহের সময় বর আসে; কিন্তু রাজবংশীদিগের মধ্যে কন্যা বরের বাটীতে যায়—পূর্ব্বে ভগ্নীপতির পিঠে চড়িয়া যাইত। যশোহরে বেদেদের মধ্যে বিবাহের পর নববধূ শ্বশুরালয়ে যায় না; নব-দম্পতীকে একটী "টঙ্" তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে তাহারা বাস করে। সম্বলপুরে বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে বরের সম্পর্কীয়া কতকগুলি বিবাহিতা স্ত্রীলোক কোন নদী বা পুষ্করিণী হইতে লোটা ভরিয়া জল আনে এবং সেই জল আবার অপর সাতটি বাটীতে লইয়া যাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জল লইয়া আসে এবং শেষোক্ত জল দিয়া বরকে স্নান করাইয়া তাহার কৌমার্য্য ধৌত করিয়া দেয়। আবার কন্যা-পক্ষেও ঠিক এইরূপ আচার পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডা জাতির মধ্যে বরযাত্রীরা কন্যার বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে, কন্যাযাত্রীরা তাহাদের নিকটে যায় এবং উভয় দল একত্র মিলিত হইলে বর ও কন্যার মা, খুড়ী বা জেঠাই প্রভৃতি জলপূর্ণ কলস হস্তে অগ্রসর হইয়া পরস্পরে পরস্পরের গায় আম পাতা দিয়া জল ছিটাইয়া আলিঙ্গন করে।

বিবাহিত জীবনের অবস্থা

এদেশে প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই একবার বিবাহ হয়; কেহ চিরকাল আইবুড়া থাকে না। পুরুষদিগের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যাও অতি অল্প। হিন্দুরা প্রায় সকলেই বিবাহ করে। ইংলণ্ডের সহিত বাঙ্গলা দেশের বিবাহের তালিকা মিলাইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইংলণ্ডে শতকরা ৬০ জনের উপর পুরুষ এবং ৫৮ স্ত্রীলোক, বিবাহ যে কি বস্তু, তাহা জানেও না; বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৫১ জন পুরুষ ও ৩৪ জন স্ত্রীলোক অবিবাহিতা থাকে এবং শতকরা ৪৫ জন পুরুষ ও ৪৯ স্ত্রীলোক বিবাহিত। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক; ৩০ বৎসর বয়সের পর বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। সকল বয়সেই অবিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম; কিন্তু বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা বেশী।

বাঙ্গলা দেশে যদি ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের তালিকা লওয়া হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, শতকরা ২২ জন বালিকা এবং ২২ জন বালক অবিবাহিত। ২০ বৎসর বয়সের পর বাঙ্গলায় ৮৭ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন অবিবাহিতা থাকে। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ও আদিম নিবাসীদের মধ্যে প্রকৃত কুমারী দেখিতে পাওয়া যায়। মূক, বধির, অন্ধ, খঞ্জ বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের অধিকাংশ স্থলে অবিবাহিতা থাকিয়াই জীবন যাপন করিতে হয়। বেশ্যা-কন্যারা অবিবাহিতা থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রায় সকল স্ত্রীলোকই বিবাহিত।

পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও ছোটনাগপুর ব্যতীত বাঙ্গলার সর্ব্বত্র মুসলমান অপেক্ষা

হিন্দুর মধ্যে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা অধিক। কিন্তু বাঙ্গলার সর্ব্বস্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে বিবাহিত হিন্দু পুরুষের সংখ্যা বিবাহিত মুসলমান পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; কিন্তু ৪০ বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধে হিন্দুর সংখ্যা কম। ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বালিকাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ৮ জনের মধ্যে প্রতি ১ জনের বিবাহ হইয়াছে এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকাদের ½ অংশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ৫ হইতে ১০ বৎসরের মুসলমান বালিকাদের শতকরা ১ জনের এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসরের বালিকাদের শতকরা ৫৬ জনের বিবাহ হয়।

বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র প্রায় বিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা একপ্রকার; সর্ব্বত্রই প্রায় সমান; কম-বেশী নাই।

শিশু-বিবাহ বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত বিরল। বিহারে ১ হইতে ৫ বৎসরের শিশুর বিবাহ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গত আদম সুমারিতে বাঙ্গলায় ২০,৩৩১ বিবাহিত ও ১২৭৮ বিধবা শিশুর সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিহারে ১২৭,৯৮৪ বিবাহিত ও ৮০৬৪ বিধবা শিশু দেখা গিয়াছিল। বাঙ্গলায় শিশু বিবাহ বিরল হইলেও বাল্য-বিবাহ যথেষ্ট পরিমাণেই প্রচলিত। হিন্দুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বালিকাদের বিবাহ দিয়া থাকেন, কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে বালিকা সাবালিকা হইলে বিবাহ দেওয়া যদিও প্রশস্ত, তথাপি হিন্দুর অনুকরণে তাহাদের বাল্য-বিবাহই ঘটিয়া থাকে।

বাল্য-বিবাহ যে উচ্চ জাতি অপেক্ষা নিম্নজাতির মধ্যে অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত, তাহা নিম্ন তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

প্রতি ১০০০ বিবাহিতা বালিকার মধ্যে

জাতি	বয়স ০-৫	বয়স ৫-১২
ব্রাহ্মণ	৩	১৫৪
বৈদ্য	২	৪৮
কায়স্থ	২	৮৩
বাগদি	৯	২৪৪
ডোম	১৩	২৬৭
চামার	৭	২০৯

পার্ব্বত্য ও আদিম জাতিদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহ অতি বিরল। অহিন্দু অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ অধিক।

শিক্ষা-বিস্তার, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অধিকতর ব্যয় এবং বর ও কন্যার পণের হার বৃদ্ধির সহিত বাল্য-বিবাহের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অধিকতর প্রচলিত। লেপছা, ভোটিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা কম। অ-হিন্দু অপেক্ষা হিন্দুত্বাভিমানী আদিম-নিবাসীদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অধিক। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ-জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা বেশী। ডোম, চামার, মুচি প্রভৃতি নিম্ন জাতীয়দিগের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অল্প। গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, সদ্‌গোপ, ছুতার, তেলি ও তিলিদের

মধ্যে বিধবার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; উচ্চজাতীয় হিন্দুদের অনুকরণে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়াই এই সকল জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা এত অধিক।

বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অধিক। মুসলমানদের মধ্যে যদিও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবাই বেশী। তবে বিধবার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ কিয়ৎ পরিমাণে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, কিয়ৎ পরিমাণে বিধবা বিবাহের অধিকতর প্রচলন। উচ্চ জাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বাল-বিধবাদের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। যে সকল জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু যে সকল জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ সত্ত্বেও বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা নাই, তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

স্রোতের ফুল

৩৪

যখন মালতী ও বিপিনকে বুকে করিয়া পান্সি উজান ভাসিল তখন মালতীর মন ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সংসার ছাড়িয়া এ কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রা! মালতী পান্সিতে বসিয়া দেখিতে লাগিল গ্রামবধূরা রাত্রের মতন জলসঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়াছে, কেহ কাপড় কাচিতে জলে নামিয়াছে; কেহ জল হইতে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে ঘড়া কাঁখে করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে মুখ ফিরাইয়া ঘোমটার আড়াল হইতে চলন্ত পান্সিখানির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদিগের সকলেরই ঘর আছে, কাজ আছে, আপনার বলিয়া যত্ন করিবার লোক আছে, মালতীর কিছু নাই, কেহ নাই, নাই নাই!

পান্সি যখন খড়দার আনন্দাশ্রমের শ্বেতপাথরের ঘাটের কাছে আসিয়া ভিড়িতেছিল, তখন সূর্য্য ডুবুডুবু। নদীর জল সোনার আলোয় হাসিমাখা চোখের মতো তরল উজ্জ্বল। ওপারের নদীর কোলে কোলে কাজল-রেখার মতো অন্ধকার, তটের উপর তরুরাজি ভুরুর মতো একটানা কালো, তাহার উপর নটকনারঙা আকাশের মাঝে রাঙা রবি যেন সুন্দর নিটোল ললাটে একখানি সোনার ডাগর টিকলির মতো বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আশ্রমের শাশিগুলি অস্তরবির লাল আগুনে ঝিলিক হানিতেছিল;—শ্বেতপাথরের ঘাটের কোলে তরল জলে সোনার আলো চলকিয়া উঠিতেছিল, যেন রূপসী তরুণীর পানখাওয়া ঠোঁটে হাসির ঝলক।

একখানা ষ্টিমলঞ্চ পিছনে কতকগুলা গাধাবোট বাঁধিয়া হুস হুস করিয়া তরল সোনার ঢেউ ছড়াইয়া, নৌকা নাচাইয়া

চলিয়া গেল। গাধাবোটগুলা স্রোতের মুখে গা ভাসান দিয়া নিশ্চিন্তভাবে স্থির হইয়া ছিল, যেন কত গম্ভীর বনিয়াদি চাল, যাইবার কিছুমাত্র ত্বরা নাই; কিন্তু যাহারা নিজেরা নড়েনা, তাহাদিগকে সংসার নাকে দড়ি বাঁধিয়া নড়ায়, গাধাবোটগুলাকে পশ্চাতে বাঁধিয়া ষ্টিমলঞ্চখানা ইহাই যেন বলিয়া দিয়া গেল।

আপিস-বাবুদের পান্সিগুলি দাঁড়ের টানে, ঝিকের জোরে হনহন করিয়া চলিয়াছে, বাবুদের কেহ তামাক খাইতেছে, কেহ সিগারেট ফুঁকিতেছে; একজন সৌখীন বাবু মাথায় কোঁচানো চাদর বাঁধিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছে—

"প্রাণের অধিক যারে ভালো বাসি।
আমি তারে চোখের-দেখা দেখে আসি।"

মালতীকে পান্সিতে দেখিয়াই তাহার গানের সুর সপ্তমে চড়িল। আর-একজন বাবু চীৎকার করিয়া বিপিনের উদ্দেশে ডাকিতে লাগিল—ও তিনকড়ি, ও হরেকেষ্ট, নরেন্দ্র, পঞ্চানন, হারাধন,.....কে যাচ্ছ বাবা, সাড়া দাও।—তারপর সে উঠিয়া গানের তালে বর্ব্বর ভঙ্গিতে নাচিতে আরম্ভ করিল।

মালতী পান্সির জানালায় মুখ দিয়া এই-সব দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, পুরুষগুলা সব জানোয়ার নাকি? সে যে নারী, এজন্য সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল।

বিপিনের এসব কিছুরই দিকে লক্ষ্য ছিল না। একখানা খালি পান্সি তাহাদেরই পান্সির পিছে পিছে আসিতেছিল, তাহারই মাঝি বাউলের সুরে গান করিতেছিল—

ওরে ডুবছে নাও ডুবাইয়া বাও
ওরে রসিক নাইয়া!
ওরে ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে
তারে বলি নাইয়া।
ওরে হাল ছেড়না ভয় করনা
পারবারে যাইতে বাইয়া,
ও তোর ভাঙ্গা নাও লোণা পানি—
ছাইড়া দিছে খাইয়া।
ওরে পথের মাঝে ফাঁদ পেতেছে
বাজীকরের মাইয়া।

বিপিনের মন এই গানের মিষ্ট সুরের অন্তরালের রহস্যময় অর্থের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে সহস্র ভাবসঙ্ঘাত গঙ্গাতরঙ্গে পান্সিখানার মতো তাহার চিত্তকে দোলা দিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এই গান তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া গাওয়া হইতেছে।

বিপিনের পান্সি আসিয়া শ্বেতপাথরের ঘাটের উপর জল চলকাইয়া যখন ভিড়িল তখন বিপিনের চৈতন্য হইল। বিপিন ও মালতী নৌকার ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল তারক ঘাটের রানায় বসিয়া আছে। তারকও তাহাদিগকে দেখিল। তারককে দেখিয়া বিপিন ও মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; তারকও অপ্রতিভ হইল। কিন্তু লজ্জার ভাব সামলাইয়া লইয়া তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হেঁ হেঁ হেঁ..... বিপিন যে! একেবারে জোড়ে! এটা সন্ন্যাসীর আশ্রম, কেলিকুঞ্জ নয়!

তারক দাঁত বাহির করিয়া রহিল এবং তাহার কুকুরের দাঁতের মতো বড় বড় শাদা দাঁতের উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়া চিকচিক করিতে লাগিল। তাহার সেই ব্যঙ্গমিশ্র

অসভ্য ভাব দেখিয়া মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া মালতী মুখ নত করিল। বিপিনের ইচ্ছা হইল বাঁদরটাকে ধরিয়া গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল—ভয় নেই হে ধর্ম্মধ্বজ! আমরা দুজনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে এসেছি!

তারক তেমনি ভাবেই দাঁত বাহির করিয়া বলিল—ও! সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ!

মালতীকে লইয়া এই ব্যঙ্গ মালতীর যে শ্রুতিসুখকর হইতেছিল না তাহা বিপিন বুঝিতেছিল, কিন্তু সে সন্ন্যাসী, তাহার ত ক্রোধ করিতে নাই, সে ক্রোধ দমন করিয়া এবার একটু গম্ভীরভাবে বলিল—না না, আমরা বিয়ে করিনি, করব না।.....তুমি বলেছিলে আমি সন্ন্যাসী হলে তুমি তার দায়ী।...এস তবে তুমিও, তোমাকেও সন্ন্যাসী হতে হবে।

তারক মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—তোমার ভাগ্য ভালো, তাই এত সহজে গুরুর কৃপা লাভ করে সংসারের মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছ। আমাদের আর এজন্মে কিছু হল না।.....আমি তোমার নৌকোতেই ফিরে যাই, আমার ছোট ছেলেটার আবার ঠাণ্ডা লেগে ব্রনকাইটিস হয়েছে! উহুহু! কি শীতই পড়েছে এবার।... যাও যাও তোমরা দেরি কোরো না, গুরুজী আবার আরতিতে বসবেন।.....ওরে মাঝি আমায় নিয়ে যাবি?...

বিপিন তারককে আর লক্ষ্য না করিয়া মালতীকে লইয়া আশ্রমের ভিতর চলিয়া গেল। তারক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, সে ভাবিতে লাগিল—বিপিনটা সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হবে নাকি? ওর অদৃষ্ট ভালো দেখছি, আমি এতদিন গুরুদেবের চরণ সেবা করেও তাঁর করুণা পেলাম না, আর বিপিনটা দুদিনেই তাঁর কৃপায় তরে গেল.....যাই, আবার রাত হয়ে যাবে, ঠাণ্ডা লাগবে। এই মাঝি.....

প্রেমানন্দ সম্মুখে দুইটী শ্যামাদান জ্বালিয়া একাকী বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। বিপিন ও মালতী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দ মুখ তুলিয়া চাহিতেই মালতীর সহিত তাঁহার চখোচোখি হইল। মালতী দেখিল গুরুজীর চোখদুটি অন্তরের একটি উত্তাপময় জ্যোতিতে উজ্জ্বল! তাঁহার দেহ দীর্ঘ কৃশ একগাছি দৃঢ় লাঠির মতো, যেন একটি সতেজ চারাগাছ সূর্য্যে মাথা ঠেকাইবার জন্য পরম উৎসাহে ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আনন্দের দীপ্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঢলঢলায়মান। গুরুজী দেখিতে আশ্চর্য্য তরুণ ও সুকুমার! যুবা বয়সের শৈশবের অম্লান লাবণ্য তাঁহার মুখশ্রীকে ত্যাগ করে নাই। অথচ তাঁহার চতুর্দ্দিকে একটি গাম্ভীর্য্য প্রদীপের পার্শ্বে রশ্মিচ্ছটার ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছিল।...এই প্রেমানন্দ! ইনি গুরু!

আর প্রেমানন্দ দেখিলেন জোয়া বাতির আলো মালতীর মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে একখানি প্রতিমার মতো দেখাইতেছে। এ কী অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তি! এ যে কল্পনার মতো সুন্দর, মুর্ত্তির

মতো মনোহর, দীপশিখার মতো উজ্জ্বল, বসন্তী মঞ্জরীর মতো সুকুমার, প্রজাপতির মতো আনন্দ-চঞ্চল, সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর চন্দ্রকান্ত-মণির অমল মন্দির! ইহাকে কল্পনা করিয়াই বুঝি বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন—

"বিজুরি বাটিয়া কেবা গা-খানি মাজিল গো
চাঁদে মাখিল মুখখানি।
লাবণি বাটিয়া কেবা রস নিঙারিল গো
অপরূপ রূপের বলনি!"

প্রেমানন্দের এই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মালতী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাহার কেমন মনে হইতেছিল এ দৃষ্টি যেন শুধু সৌন্দর্য্যমুগ্ধের প্রশংসার দৃষ্টি নয়। মালার মধ্যে কাঁটার মতো এ দৃষ্টি মালতীকে পীড়া দিতে লাগিল।

মালতীর সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত ভাবে চেতনা লাভ করিয়া প্রেমানন্দ বিপিনের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনিই মালতী? ...সাক্ষাৎ রাধারাণীর মূর্ত্তি! তোমাদের শিষ্যরূপে পেয়ে আমি ধন্য হব; তোমাদের প্রেমের স্ফুলিঙ্গ যেন আমার প্রাণের বিশ্ব-প্রেমকে জ্বালিয়ে তুলে!...এখন চল আরতির সময় হয়েছে। আরতির পরে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে। আজ থেকে বিপিন তোমার নাম হল স্বরূপানন্দ, আর মালতীর নাম হল রাধারাণী।...

তারপর প্রেমানন্দ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন —শান্তি! যোগানন্দ!

একটি সন্ন্যাসিনী ও একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেমানন্দ বলিলেন —শান্তি, ইনি রাধারাণী; তোমাদের নূতন ভগিনী; এঁকে নিয়ে যাও। লাইব্রেরীর পাশের ঘরটিতে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাওগে।—আর যোগানন্দ, ইনি ত তোমাদের পরিচিতই; কিন্তু আজ আর ইনি বিপিনবাবু নন; আজ থেকে ইনিও তোমাদের গুরুভাই, স্বরূপানন্দ!...যাও তোমরা হাতমুখ ধুয়ে শুচি হয়ে ঠাকুরদর্শন করবে এস।

৩৫

মালতী শান্তির সহিত নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া দেখিল, ঘরটি গঙ্গার দিকে, ঘরে বসিয়াই গঙ্গা দেখা যায়। তখনও সেই ঘরে অস্তসূর্য্যের লালিমা মার্ব্বেল পাথরের স্বচ্ছ মেঝের উপর দুধে-আলতার মতো টলটল করিতেছিল। তাহার উপরে পা দিতেই মালতীর ভারি হাসি পাইতে লাগিল,—এই তার বিবাহ! সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ তাহার পুরোহিত! বিধবা সন্ন্যাসিনী শান্তি তাহার এয়ো! আর মরণ-রাগিণীতে অস্তসূর্য্য গেরুয়া রঙের চাদর টাঙাইয়া তাহাদের শুভদৃষ্টির আয়োজন করিতেছে! যমের মহিষের মাথার চেয়েও কালো কালো কাকের দল যেন তাহার বাসরঘরের তোরণমাল্য রচনা করিয়া উড়িয়া যাইতেছে! বড় বড় ষ্টিমারগুলি ভারিক্কি গিন্নির ন্যায় ও ষ্টিমলঞ্চ-গুলি চটুল কিশোরীর মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া শাঁখ বাজাইয়া বিয়েবাড়ী মাতাইয়া তুলিতেছে! পরক্ষণে তাহার মনে হইল ইহা তাহার সকল সাধের গঙ্গা-যাত্রার ঘর—এইখানে তাহাদিগকে তীর্থস্থ করা হইয়াছে!

তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া শান্তি দুঃখাবসন্ন

ধীর কণ্ঠে বলিল—আপনি বসুন, আমি আলো এনে দি।

মালতী বলিল—আলোর কি দরকার দিদি, এখনি ত ঠাকুরদর্শন করতে যেতে হবে।...আমি কি এ ঘরে একলাই থাকব?

মালতী দেখিল শান্তির বয়স পঁয়ত্রিশ, মাঝারি আকারের চেহারাটি; তাহার মধ্যে কোথাও কোনো চঞ্চলতা নাই; মুখখানি কি এক গভীর বেদনায় ম্লান, কণ্ঠ বিষণ্ণ ধীর। শান্তি বলিল—এখানে একলা থাকাই নিয়ম।

—আপনি কোন্ ঘরে থাকেন?

—আমি আপনার পাশের ঘরেই থাকি।

—আর কজন সন্ন্যাসিনী আছেন?

—সম্প্রতি আমরা চারজন ছিলাম, আপনি আসাতে পাঁচজন হলাম। কখনো কখানো সংখ্যা বাড়ে কমে; যেখানে সেবার দরকার হয় আমাদের যেতে হয়।

—আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—প্রায় ছবৎসর হবে।

—কিছু মনে না করেন ত আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।...আপনি এই পথ কেন গ্রহণ করেছেন?

শান্তির চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল—আমি বড় দুঃখিনী; ঝড়ে নৌকোডুবি হয়ে একদিনে স্বামী পুত্র সর্ব্বস্ব হারিয়েছি; অভাগিনীকে গুরুদেব জলথেকে তুলে চরণে ঠাঁই দিয়েছেন; এখন রাধাকান্তই আমার স্বামীপুত্র সব। গুরুজী বলেছেন যেদিন আমি মেয়েদের ছেলেকেও বুকে তুলে নিতে পারব, যে একটুও ঘেন্না হবে না, সেদিন আমি আমার হারানো ছেলে ফিরে পাব। সে কি আমি পারব বোন!

মালতী চোখ মুছিয়া বলিল—দিদি, আমি আপনার ছোট বোন, না জেনে কষ্ট দিলাম। আমিও বড় দুঃখী। আমাকে ত আপনি জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি কি দুঃখে এসেছি।

শান্তিও চোখ মুছিয়া বলিল—আমাকে জিজ্ঞাসা করতে নেই। সন্ন্যাসিনীর আবার কৌতূহল কি। জানি তোমারও দুঃখ আছে, আর সে দুঃখ গভীর দুঃখ। দুঃখ না পেলে ত কেউ বোন ভগবানের দিকে মুখ ফেরাতে চায় না। সব দিয়ে যারে তাঁকে পেতে হয়, সে যে অমূল্য ধন, তাকে কি যে-সে মূল্যে কেনা যায়?

মালতী শান্তির কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল—আপনি কি মনে করেন যে সন্ন্যাসী না হলে ভগবানকে পাবার যো নেই!

—না, সন্ন্যাসী না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সে সন্ন্যাসী শুধু গেরুয়া কাপড় পরলেই হয় না, সংসার ছাড়লেও হয় না, সংসারে নির্লিপ্ত মনকে বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে রঙিয়ে যে তুল্‌তে পারে সেই সন্ন্যাসী! গীতায় ভগবান সন্ন্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করে বলেছেন—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

শান্তির মুখে বিশুদ্ধ স্পষ্ট সংস্কৃত শুনিয়া

প্রশংস দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মালতী জিজ্ঞাসা করিল—গুরুজীর মতও কি এই?

—আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ, আমরা স্বতন্ত্র মতামত কোথায় পাব। আমরা গুরুজীরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

—তবে গুরুজী সংসার ছেড়ে বাইরে বসেছেন কেন?

—যেমন চোখের অতি কাছে জিনিস রেখে দেখা যায় না, খানিক দূরে ধরে দেখতে হয়, তেমনি সংসারকে বুঝতে হলে, ভালো বাসতে হলে নির্লিপ্ত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। গুরুজী বলেন তিনি ঘোর সংসারী; বাস্তবিক তাঁর বিশ্বজোড়া প্রকাণ্ড সংসার। সংসারী লোক নিজের গুটিকতক ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে, আর গুরুজী সমস্ত বিশ্বের জন্যে চিন্তিত। যেখানে পীড়িত ক্ষুধিত বিপন্ন সেখানে গুরুজীর ব্যথিত চিত্ত বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে।

—সে-সব সেবা ত আপনারা করেন, গুরুজীর তাতে বাহাদুরী কি?

—সমস্ত বাহাদুরীই তাঁর। হাতপা-গুলো কাজ করে আর অদৃশ্য মস্তিষ্ক নিশ্চিন্ত থাকে একথা বলাও যা, আর গুরুজী নিশ্চেষ্ট, আমরাই কাজ করি, একথা বলাও তাই।

—আপনাদের কি কি করতে হয়?

—পালা করে ঠাকুরের সেবা, পশুসেবা, আশ্রমের সেবা, দুঃখীদের সেবা করতে হয়; গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে অক্ষম গৃহস্থ-দের ছেলেমেয়েদের, বৌঝিদের পড়াতে হয়...সকাল সন্ধ্যায় আমাদেরও লেখাপড়া করতে হয়।

—আপনারা নিজেরাই পড়েন, না কেউ পড়ান?

—নিজেরাও পড়ি, কখনো কখনো গুরুজীও পড়ান, কোনো বিদ্বান শিষ্য উপস্থিত থাকলে তিনিও পড়ান।

—কি বই পড়েন?

—সব বই, কোনো বাছবিচার নেই। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস; বাংলা ইংরিজি সংস্কৃত ফার্সী; যার যা খুসি আর যে যা পারে, সে তাই পড়তে পারে।

ইহা শুনিয়া মালতী সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কি অনেক বই আছে?

—অনেক। এই পাশের ঘরেই পাঠাগার।

—এখানে পুরুষ কতজন আছেন।

—এখন মাত্র তিনজন আছেন। সকলে প্রচার ও সেবা করতে বেরিয়েছেন।

—আর-একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করবেন না।.....স্ত্রী-পুরুষে একত্র একবাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা, এটা.....

শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তেমনি শান্তভাবে বলিল—বিপদের আশঙ্কা যে নেই তা নয়, কিন্তু কখনো কিছু অন্যায় ত ঘটেনি। সকলেই খুব গভীর একটা বেদনা নিয়েই এখানে আসে, তার-পর গুরুজীর উপদেশ মেনে আর নিয়মে থেকে সকলেই বেশ সংযত হয়ে যায়।

মালতী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—কিন্তু স্বভাব কি একেবারে অতিক্রম করা যায়?

শান্তি বলিল—জানিনা যায় কিনা। কিন্তু গুরুজী বলেন যায়। যোগের দ্বারা আত্মশাসন সহজ হয়।

যোগের দোহাইএর পর আর কথা চলিল না। একটা সন্দেহকে আর-একটা না-জানা বিষয় দিয়া চাপা দেওয়া বড় সহজ। মালতী নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শান্তি বলিল—চলুন, আরতির সময় হয়েছে।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া শুচি হইয়া মালতী যখন ঠাকুরঘরে গেল তখনই আরতি সমাপ্ত হইল। গুরু তখন কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিলেন,

বদনচান্দ কোন্ কুন্দারে কুন্দিল গো,
কে না কুন্দিলে দুই আখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেইসে পরাণ তার সাখি॥

* * *

রতন কচিয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না গড়াইয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণ গো
যোগী হইল ওহারি ধেয়ানে॥

* * *

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥"

মালতীর এ গান গুরুজীর মুখে ভালো লাগিল না। তাহার মনে কেবলি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—এ কি ধর্ম্মসঙ্গীত?

৩৬

গান সমাপ্ত করিয়া প্রেমানন্দ আপনার কক্ষে আসিয়া বসিলেন; সমস্ত শিষ্য শিষ্যারাও আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। প্রেমানন্দ মালতীকে বলিলেন—কেমন রাধারাণী, তোমার এই নূতন জীবনের আরম্ভ কেমন লাগছে? সাধন করতে করতে দেখবে যে ত্যাগে নির্ম্মল শান্তি, ভোগে উল্লাস মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করতে পারলে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়; সেই যে বিবাহ, তার আনন্দের সীমা নাই। জীবাত্মা পত্নী, পরমাত্মা স্বামী; তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আমরা গোপী; এই পরমতত্ত্বের অন্তরে পরিস্ফুট হলেই মানুষের সকল দুর্গতি দূর হয়। এই পথ নিতান্ত দুর্গম বা আনন্দ-হীনও নয়; একটু চেষ্টা করে একবার অন্তরকে অনন্তের সুরে মিলিয়ে যদি দিতে পার তাহলে দেখতে পাবে যে এ জীবন তানলয়যুক্ত একটি সঙ্গীত,—একদিকে যেমন নিজে স্বতন্ত্র আর-একদিকে বিশ্বের একতান সঙ্গীতের সঙ্গে মিল গেঁথে চলেছে। যদি তুমি শুধু তোমার নিজের সুরটিই বাজাও তবে তাতে করে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত হবে না; তোমাদের প্রাণের মধ্যে যে ভালোবাসার সুর বেজেছে, তাকে রাগিণীতে বাজিয়ে তুলতে হলে বিশ্বের অপর সুরের সঙ্গে অনুকূলভাবে মিলিয়ে তুলতে হবে। কেমন? কথাটা ঠিক বুঝতে পারছ ত?

মালতী আঘাতের পর আঘাত পাইয়া পাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সবশেষে যখন তাহার সৌভাগ্যতরণী সাতঘাটের জল খাইয়া, ঝড় তুফান কাটাইয়া বন্দরে ভিড়িতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় এই একটা কোথাকার কে সন্ন্যাসী গুপ্ত শৈলশৃঙ্গের

মতো, চোরা বালির মতো, অকস্মাৎ কুহক বিস্তার করিয়া তাহা বানচাল করিয়া দিয়াছে, হয়ত বা ঘাটে আসিয়া ভরাডুবি হইবে; এজন্য মালতীর মন প্রেমানন্দের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। সে প্রেমানন্দের প্রশ্নের উত্তরে নিতান্ত মুখরার মতো বলিল—আমি আপনার শিষ্যা হবার যোগ্যা নই, ওসব কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমি মুখ মেয়েমানুষ, আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন। আমার মনে হয় যে বিশ্ব-প্রেমের এক সঙ্গীতে যোগ দেবার আগে নিজের জীবনকে ভালো করে ঠিক সুরে বেঁধে নিতে হবে; তা যদি না হয়, তবে ত বেসুরো রাগ দিয়ে সমস্ত সঙ্গীতকেই নষ্ট পণ্ড করা হবে। আমরা কোনো জিনিষকে না ভালো বলেই ভালো বলিনে, ভালো বাসি বলেই ভালো বলি; মানুষকে যদি আগে ভালোবাসি তবেই সে আমার চোখে সুন্দর হয়ে দেখা দেবে, তার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা হবে প্রেমেই সহজ হয়ে উঠবে।

প্রেমানন্দ মালতীর নিঃসঙ্কোচ কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন—তাই ত। সেই কথাই ত আমিও বলছি। সংযমসাধনার দ্বারা আপনার হৃদয়যন্ত্রকে বেঁধে তুলতে পারলেই বিশ্বসঙ্গীতে সে হৃদয় আর বেসুরো বাজবে না; তখন সকলকেই বেশ ভালো লাগবে।

মালতী বলিল—সেই ভালো লাগা কি সন্ন্যাস ছাড়া হয় না? মানুষ যখন এক-জনকে ভালোবাসতে শেখে তখনই যে তার কাছে সমস্ত জগৎ মধুময় হয়ে ওঠে।

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—রাধারাণী, তুমি সম্ভোগ আর প্রেমকে এক করে ভুল করছ। আমি ত তোমাদের মিলনকে বাধা দিচ্ছি না, তোমাদের সম্ভোগের লালসাকে দমন করে আধ্যাত্মিক মিলনে যোগযুক্ত হতে বলছি।

—ভগবানকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসা সহজ, না, মানুষকে ভালোবেসে ভগবানকে ভালোবাসা সহজ?

—দুইই সমান। এক অপরের নামান্তর। যত্র জীব তত্র শিব। কিন্তু তাই বলে একটিকে বুকের কাছে আঁকড়ে বসে থাকা মোহ মাত্র, তাতে করে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

—তা হলে কি সংসারধর্ম্ম পালন করা অপকর্ম্ম? সংসারে থেকে তাহলে ভগবানকে পাওয়া যায় না?

—যায় না, এমন কথা বলা যায় না; তবে পাওয়া বড় কঠিন, যাঁরা নিস্পৃহ উদাসীন অথচ ভগবদর্পিতপ্রাণ সংসারী, তাঁরা পেতে পারেন। কিন্তু সে রকম ব্যক্তি দুর্ল্লভ। জলে ডুবব অথচ গায়ে জল লাগবে না, এমন কৌশল সকলে অবলম্বন করতে পারে না; তেমন লোক কোটিকে গুটিক মেলে!

—তা হলে আপনি কি বলতে চান যে ভগবান লোকগুলোকে ভোগাবার জন্যেই ভবসংসারে পাঠিয়ে আপনি এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? সংসার ত্যাগ না করলে তাঁকে পাবার জো নেই বলছেন। তাঁকে পাওয়াই যখন মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য তখন সকলেরই সংসার ত্যাগ করে বনে যাওয়া উচিত। সংসার নষ্ট করবার জন্যেই কি তবে ভগবানের সংসার সৃষ্টি?

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"সংসার" যদি জীবের পরিণতির অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির Stage of Development হয় তা হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হলে সংসার ত নষ্ট হবেই। সে হিসাবে সংসার নষ্ট করার জন্যই সংসারের সৃষ্টি বলতে পার। তা ছাড়া জীবনের উন্নততম আদর্শ মাত্রেই সংসার নষ্ট করার অনুকূল। বুদ্ধ খ্রীষ্ট প্রভৃতির আদর্শ ত অনুকরণীয়, কিন্তু সকলেই যদি সে আদর্শে চলে তবে সংসার নষ্ট হতে একটি দিনও লাগে না। কিন্তু সে ভয় তোমার করতে হবে না, সবাই বনে গেলে বনই আবার সংসার হয়ে উঠবে। সংসার ঠিক চলবে, সংসার যে মানুষের কর্ম্মফল-ভোগের ক্ষেত্র! আমরা সংসার ছেড়ে এসেছি বলেই যে সংসারকে এড়িয়ে যাব তার ত জো নেই, কর্ম্ম ত আমাদের করতে হবে, এবং সেই কর্ম্মই আমাদের অনেককে সংসারে টেনে নিয়ে যাবে। সংসারে বৈরাগ্য ত আর পূর্ণ সৌভাগ্য নয়, আংশিক; ভগবানকে যতক্ষণ না পাব ততক্ষণ ত আর পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। সেই অংশকেই পূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান যখন তোমাদের ডেকে নিতে চাচ্ছেন, তখন কি তোমাদের উচিত হবে বিমুখ হয়ে বেঁকে বসে থাকা।

মালতী তর্ক হইতে নিরস্ত হইল। তখন প্রেমানন্দ সাংখ্য মীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মত আলোচনা করিয়া এমন একটা প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের খিচুড়ি তৈরি করিলেন যে তাহা মালতীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুপাক। বিপিনও চিরকাল কাব্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, দর্শনের দর্শন তা[illegible] ভাগ্যে ঘটে নাই, এবং দর্শন তাহার [illegible]াছে সুদর্শন চক্রের ন্যায় নামে চমৎকার হই[illegible]ও বাস্তবিক বড় ভীষণ বোধ হইত। স গুরুজীকে পাণ্ডিত্যের ভেল্কি খেলাইয়া [illegible]লতীর বাক্ রোধ করিতে সক্ষম দেখি[illegible] মনে মনে ভারি সন্তুষ্ট হইল। গুরুজী[illegible] প্রতি ভক্তি তাহার বিস্ফারিত চোখ [illegible] ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল।

গুরুজীর বাক্য তাহার [illegible]নকট যতই দুর্ব্বোধ ঠেকিতেছিল, তাহা[illegible] ততই মনে হইতেছিল এসব যুক্তি এ[illegible]র অকাট্য। মালতী নিশ্চয় গুরুজীর প[illegible]ত্যের কাছে পরাজিত হইয়া মুগ্ধ হইয়া [illegible]য়াছে।

গুরুজী বক্তৃতা করিয়া [illegible]লতীর মুখ বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে তাহা[illegible] প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহি[illegible] এমন করিয়া কেহ কখনো তর্ক করে [illegible] যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইয়াছে সে [illegible]াঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বিনীত শিষ্যে[illegible] দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু মালতী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের লোক। প্রেমানন্দের মনে[illegible] কাছে মালতী খুব বড় স্পষ্ট হইয়া রহিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

চয়ন

ছোটগল্প

একালের [illegible]ময়িক পত্রগুলি যেন ছোট গল্পের কল্প[illegible]। এটা হচ্ছে ছোটগল্পের যুগ,—যদি[illegible]গের ছোটগল্পগুলি গুণ্‌তিতে যেমন, গুণে [illegible]ন নয়।

এ বছরে [illegible]গুলি ভাল গল্প বাহির হইয়াছে, [illegible] বিখ্যাত লেখক তাহার একটা হি[illegible] দিয়াছেন। এই হিসাবে একুশটি গল্প [illegible]র্ব্বাচিত হইয়াছে। গল্প-গুলির অ[illegible] চরিত্রের গল্প। নির্ব্বাচক বলেন, ঘটনা[illegible] অপেক্ষা চরিত্রের গল্পই সর্ব্বাংশে শ্রে[illegible]

"কথাসা[illegible] চরিত্র-চিত্রণ বড়? না, ঘটনা-সংস্থান বড়?" একজন লেখক এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "ছোটগল্পে মনোবিজ্ঞান বা চরিত্রচিত্র যতটা মোহন ও নিখুঁতরূপেই ফুটিয়া উঠুক না কেন,—গুপ্তরহস্য, অনিশ্চয়তা ও ঘটনা-বিচিত্র কাহিনীই পাঠককে বেশী আকর্ষণ করে। বাঁধা-গৎ ধরিয়া ছোটগল্প লেখা চাই। একজন স্থপতি কোন-একটা বাড়ী তৈয়ারি করিবার আগে, যেমন নক্সা প্রস্তুত করেন, একজন পটুয়া যেমন ছবি তৈরি করিবার আগে মূল বিষয়টি আঁকিয়া নেন, ছোটগল্প লিখিবার আগেও লেখককে তেমনি আখ্যানবস্তুর একটা মুসাবিদা করিয়া লইতে হয়। আগাগোড়া না ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিখিতে বসা মারাত্মক ব্যাপার। দৈনন্দিন জীবনে যে-রকম স্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, গল্প-বর্ণিত ঘটনাও ঠিক তেমনি হওয়া চাই। কল্পিত ঘটনা ছোটগল্পে একেবারেই অচল। গল্পলেখকের আখ্যানবস্তু কল্পিত হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু ঘটনাগুলি স্বাভাবিক হওয়া দরকার। তুমি নিজের ব্যক্তিগত খেয়ালমত যেমন খুসী তেমনি আদর্শের বাড়ী তৈয়ারি করিতে পার বটে, কিন্তু তৈয়ারী করিবার মালমশলাগুলি সত্যিকার হওয়া চাই। তোমাকে পাহাড় হইতে পাথর আনিতে হইবে, মাঠ হইতে মাটি আনিতে হইবে, বন হইতে কাঠ আনিতে হইবে।

আখ্যান-বস্তু আপনাতে-আপনি সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক;—এটি একটি প্রধান কথা। কোন ঘটনার জন্য যেন ব্যাখ্যার দরকার না হয়, আপনাদের উদ্দেশ্য তাহারা যেন আপনারাই বুঝাইয়া দিতে পারে। কল টিপিয়া দিলেই সে যেমন আপনার কাজ আপনি সারিয়া যায়, আখ্যান-বস্তুকেও ঠিক তেমনি করিয়া গড়িতে হইবে। ভাল প্লট তাহাকেই বলা যায়, যাহার ভিতরে একটিমাত্র সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মূলঘটনা আছে। এই মূল ঘটনাটিই কতকগুলি স্বাভাবিক ও নিয়মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সুন্দর সমাহারে ক্রমে ক্রমে পুরন্ত হইয়া উঠিবে। প্রতি ঘটনাটির সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার একটানা শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া



অনন্তের পথে

সংহারকালে আকস্মিকভাবে মীমাংসাটি নিয়া দিতে হইবে। এই মীমাংসা যথাসঙ্গত ক্ষিপ্ত হওয়া চা ; কারণ গল্পের কথা শেষ য়া গেলে পর, পাঠকের মন তার ব্যাখ্যানের ন্য আর অপেক্ষা করিবে না। আখ্যানবস্তুর টিলতা অল্প দু' কথায় পরিষ্কার করিয়া তে হইবে।

আর এক লেখক বলিতেছেন :—

তটুকু ঘটনা-সমাবেশে গল্প একঘেয়ে ইতে পারে ততটুকু ঘটনা-সমাবেশই ান—তার নয়; ঘটনার পর টনায় পাঠকের শ্বাস বন্ধ করিয়া দিবার ন্য ছোটগল্পে ঘটনা সমাবেশ করা হয় া। আখ্যানব পরিণামের অনিশ্চয়তা ও গুপ্তরহস্য মি ততটুকু চাই, যত-কুতে গল্পের ত্রপাত্রীগণের অদৃষ্টসম্বন্ধে পাঠকদের উদ্বেগ ধীরে ধীরে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে পারিবে। আসল কথা, গল্পে নায়ক-নায়িকারা কি করিতেছে বা কি করিবে আমি তাহা জানিতে চাহি না; আমি জানিতে চাহি নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রের স্ফূর্ত্তি।"

উপরে যে দুটি মত দেওয়া গেল, তাহা পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, একজনের মতে ছোটগল্প ঘটনাবহুল হওয়া দরকার—যেহেতু আখ্যানবস্তু চিত্তাকর্ষক না হইলে ছোটগল্প পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। আর একজনের মতে ঘটনাবহুলতা ছেলে ভুলাইবার জন্য। অতএব, কার্য্যদ্বারা চরিত্র বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া, চরিত্রের আসল রূপ ফুটাইয়া চরিত্র বিকশিত করাই শক্তিধরের কার্য্য।

—The Book News Monthly হইতে।

নব কলাবিদ্

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল বিষয়ের সকল বিভাগের পুরানো বাঁধা-গৎকে পায়ে দলিয়া অগ্রাহ্য করা হইতেছে। পুরাতনের আকার, পুরাতনের কল্পনা এবং পুরাতনের রীতি পদ্ধতিগুলি আরও উজ্জ্বল আরও মনোরম ও আরও সতেজ আকার, মহৎ কল্পনা ও সূক্ষ্ম রীতি-পদ্ধতির কাছে আমোল না পাইয়া আপনা-আপনিই সরিয়া পড়িতেছে। ললিত কলাতে আজকাল তাই চারিদিকেই প্রাচীনের পতন এবং নবীনের উত্থান দেখিতে পাইতেছি। অনুকরণের একঘেয়ে সৌন্দর্য্যকে ছাড়িয়া মানুষের চিত্ত এখন বৃহত্তর জীবনের বিশাল পরিধিকে এবং সর্ব্ববিষয়ের মূলীভূত কারণকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে চাহে। এযুগে যাঁহাদের নূতন ভাব ও কল্পনা আছে বিজয়মাল্য তাঁহাদেরই কণ্ঠে পড়িবে। এই নূতনত্বের মোহে পড়িয়া অনেকে অনেক অকেজো এবং উদ্ভট কল্পনাকে আকার দিয়াছেন;—যেমন, এক ক্ষ্যাপা শিল্পী প্রকৃতির সব জিনিষকে "ঘনক্ষেত্রে"র (cube) আকারে দেখিতে ও দেখাইতে চান।



ক্রীড়ক

কিন্তু, এ-সব ক্ষ্যাপামির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, জগতে এমন সকল ওস্তাদ-শিল্পী আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, যাঁহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহী নবীনের দল যথার্থ গর্ব্বপ্রকাশ করিতে পারেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে মিস্ ফিলিস ভিয়ার ক্যাম্পবেল নাম্নী এক মহিলা-শিল্পীর আঁকা কয়েকখানি ছবি বিলাতের স্থানবিশেষে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর প্রথম দিবসেই চিত্রকারিণী সে বিলাতের শিল্প-সমাজে বিখ্যাত হইয়া পড়েন।

চিত্রাঙ্কিত ওই সকল 'ট্রাজেডী'র দিকে চাহিয়া দেখিলে মহাকবি দান্তেকে মনে পড়িয়া যায়। জীবন ও মরণের গভীর অজানা বিষয়ের রহস্য লইয়া এই শক্তি-শালিনী মহিলা তাঁহার কল্পনাকে যেরূপ অবলীলাক্রমে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের প্রাণবীণার তন্ত্রীগুলি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে না; নিট্‌শে, ইব্‌সেন ও পো প্রভৃতির মত প্রতিভার অধিকারী না হইলে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে এমনভাবে অভিভূত করা বড় শক্ত কথা।

ক্যাম্পবেলের চিত্রগুলি চিহ্নাত্মক। অথচ, শিল্পীর কল্পনা-লীলার ভিতরে কিছু-মাত্র জটিলতা নাই—তিনি যাহা বলিতে চান, পরিষ্কার দিনের আলোর মত সবাই তাহা বুঝিতে পারে। যাঁহারা বৈঠকখানার দেয়াল সাজাইবার জন্য বাজারে তস্‌বির কিনিতে বাহির হন, তাঁহারা অবশ্য এই ছবিগুলিকে একেবারেই অপছন্দ করিবেন; কিন্তু যাঁহারা পট বলিতে রঙচঙে খেল্‌নামাত্র বুঝেন না, তাঁহারা এই নক্‌সাগুলির ভিতরে তুলির টানে টানে একএকটি নূতন ও গভীর অর্থের সন্ধান পাইবেন।

প্রথম ছবিখানির নাম, "অনন্তের পথে।" —জীবন হইতে পরলোকের দুর্জ্ঞেয়তার মধ্যে যুগল আত্মা নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। উষ্ট্র তাহাদের বাহন; তাহা সত্যের চিহ্ন-জ্ঞাপক। সীমার নাগপাশ ছাড়াইয়া এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকা অসীম-অনন্তের ভিতরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যমান বিশাল শূন্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহারা সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসের সম্মুখে পড়িলেও প্রেম যে আত্মমহিমায় আপনি অটল থাকে, এই ছবিখানি তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

দ্বিতীয় চিত্র—"ক্রীড়ক।"—জীবন একটা মিছা জাঁকজমক ও খেলো খেলনা মাত্র; পর্ব্বতপ্রমাণ কাফ্রির মস্তক জীবনের মূর্খতা ও অজ্ঞানতাকে দেখাইতেছে। খেলোয়াড় তাহার পুতুলটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছে, তাহার কোথাও কোন খুঁৎ আছে কিনা! অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে প্রদীপহস্তে বসিয়া মৃত্যু তাহার শূন্য করোটির ভিতরে লুপ্ত দৃষ্টিকে অন্বেষণ করিতেছে। আমরা যাহাকে অস্তিত্ব বলি, "ক্রীড়কে" তাহাই সূচিত।

তৃতীয় চিত্র,—"যাদুকর"।—চীনা যাদুকরটি মন্ত্র পড়িয়া স্বেচ্ছায় এমন এক দানবের সৃষ্টি করিয়াছে, জন্মিয়াই যে তাহার জন্মদাতাকেই ফলার করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমরা সাধিয়া আপন অমঙ্গলকে আপনি ডাকিয়া আনিয়া আত্মাহুতি দি,—এই চিত্রে তাহাই সূচিত হইতেছে।



যাদুকর

সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা

গুণের যতই কদর থাক্,—মানুষের কাছে রূপের কদর অন্তরের গুণকেও মলিন করিয়া দেয়। সৌন্দর্য্যচর্চ্চা সকল দেশে সকল সমাজেই আছে। তবে, জীবন-সংগ্রামের খাটুনীটা পুরুষদিগকে বেশীমাত্রায় সামলাইতে হয় বলিয়া, রূপের দিকে তাহাদের নজর ততটা নাই, পুরুষের সবল বাহুর ছায়ায় রমণীদের যতটা আছে।

য়ুরোপের অভিনেত্রী-সমাজে আবার এই রূপচর্চ্চা চরম সীমায় গিয়া উঠিয়াছে। সুরূপ নট যত শীঘ্র দর্শকের মনকে মন্ত্র-পড়া সাপের মত বশ করিতে পারে, কুরূপ তেমন পারে না। রূপানুশীলনের দিকে নটসমাজের দৃষ্টি তাই এত সতর্ক।

য়ুরোপে এই রূপের অনুশীলন বহুযুগের অভিজ্ঞতায় এমন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে



অভিনয়-সজ্জায় সারা বার্ণাড

যে, যৌবন-বসন্তের মধুপুষ্প বার্দ্ধক্যের কঠোর শীতেও তনুলতা হইতে সহজে খসিয়া পড়িতে পারে না। প্রাচ্যের বৈষ্ণব-কবি গায়িয়াছেন, "জোয়ারের পানী নারীর যৌবন—!" প্রতীচ্য এ কথায় কিছুতেই কাণ পাতিবে না।

ইতিহাসে যে-সকল রমণীর রূপ, উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছে, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি যে যথেষ্ট প্রখর ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ক্লিওপেট্রা, লুক্রেশিয়া বোর্গিয়া, রোসামন্দ, ও মেরী, কুইন-অফ-স্কট্‌স প্রভৃতি রমণীরা কতযুগ আগে মানুষের মনের উপরে রূপের যে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, কালের নির্ম্মম কর আজিও তাহা মুছিয়া দিতে পারে নাই। রত্নখচিত কাচ-পাত্রে ক্লিওপেট্রা নানাবিধ সুগন্ধ তৈল ও প্রলেপাদি রাখিয়া দিতেন। লুক্রেশিয়া নানা ফলের নির্য্যাস ব্যবহার করিতেন। একজন ইতালীয় ডাক্তারের পরামর্শে মেরী ষ্টুয়ার্ট বিবিধ দ্রব্যের সারাংশ লইয়া আপন রূপের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন।

সভ্যদেশের মধ্যে একালে ফ্রান্সে যতটা রূপচর্চ্চা হয়, ততটা আর কোথাও নয়। জরার কবল হইতে দেহলাবণ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে ফরাসীরা সকল জাতির চেয়ে বেশী ওস্তাদ। ফ্রান্সে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও চর্ম্মবিজ্ঞানের (Dermatology) বিশেষজ্ঞগণ স্বজাতির দেহে চপল রূপকে বন্দী করিবার জন্য নানারূপ ফাঁদ পাতিবার ফন্দী করিতেছেন।

দেশভেদে রূপ-রক্ষার উপায়ও বিবিধ। ইংরাজ রমণীরা প্রধানত মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিয়া বেশী ফল পান। সুইডেনের রমণীরা প্রধানত মাংসপেশী মর্দ্দন ও জিমনাষ্টিক করিয়া দেহকে স্বাস্থ্য-সবল রাখেন। কিন্তু সুগন্ধ তৈল ও বিবিধ দ্রব্যগুণের উপরেই ফরাসী মহিলাদের বিশ্বাস ও ঝোঁক বেশী। তবে, রূপকে স্থায়ী করিতে হইতে হইলে সকলকেই নিয়মিত স্নান, ব্যায়াম ও [illegible]াদির ব্যবস্থা করিতে হয়।

রূপচর্চ্চার জীবন্ত নিদর্শন চির-যৌবনা সারা বার্ণহার্ডট্। সারার [illegible]্যাত পারিবারিক ডাক্তার কাইস্যা[illegible] বলেন, প্রতিদিন নিয়মমত সৌন্দর্য্য[illegible] ও কর্ম্মময় জীবন-যাপন করিয়াছেন [illegible]লিয়াই সারা বার্ণহার্ডটের কাছ হইতে [illegible]-রূপ আজিও বিদায় মাগিতে পারে না।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২[illegible] অক্টোবারে পৃথিবীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অ[illegible]নেত্রী জন্মগ্রহণ করেন। সারার বয়স [illegible]ন একাত্তর বৎসর। কিন্তু এই বয়[illegible] তাঁহার মুখ, চোখ, দেহ ও গতি যুব[illegible] মত সবল ও সতেজ। তাঁহার মাথা[illegible] চুল পাকিয়া গেলেও দেহের কোথাও বার্দ্ধক্যের কুঞ্চন-রেখা পড়ে নাই। তাঁহার স্বর এখনও কিছুমাত্র ক্ষীণ ও বিকৃত হইয়া যায় নাই। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের বাহু ও চরণের ভঙ্গিমা এমন মধুর যে, তাহা অনায়াসেই যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের প্রতিমার আদর্শ হইতে পারে। সারা প্রতিদিন যে পরিশ্রম করেন, অনেক যুবকও তাহা পারেন না। সংপ্রতি ফ্রান্স হইতে খবর আসিয়াছে,

সারার একখানি পা, কোন অসুখের জন্য চিকিৎসকেরা একেবারে কাটিয়া দেহ হইতে আলাদা ক[illegible] দিয়াছেন। অস্ত্রচিকিৎসার আগে সক[illegible] আশঙ্কা ছিল, এত বয়সে এরূপ গুরু[illegible] ব্যাপার সারার পক্ষে হয়ত সাংঘাতিক [illegible] দাঁড়াইবে। কিন্তু সারা আপনার [illegible]ার সবলতা জানিতেন। তাই তিনি নিজে[illegible]ার করিয়া চিকিৎসকগণকে অস্ত্রচালনা[illegible] করেন।

রূপরক্ষার জন্য ফরাসী মহিলারা "সৌন্দর্য্য-স্নান" (beauty baths) করেন। সারা বার্ণহার্ডট্ এই সৌন্দর্য্য-স্নানের অত্যন্ত পক্ষপাতী। এই প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-স্নানকালেই সারা, তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন নূতন নাটকের ভূমিকাপাঠ শ্রবণ করিতেন। লিনা ক্যাভেলিয়ারি আপনার কান্তিকে কোমল রাখিবার জন্য দুগ্ধধারায় স্নান করেন। (বাঙ্গলা দেশের রমণী-সমাজেও দুধের সর



অভিনয়-সজ্জায় সারা বার্ণাড

গায়ে মাখার রীতি আছে) জেন হেডিং নামক বিখ্যাত রূপবতী মহিলা, ষ্ট্রবেরি ফলের ফেনিল রস গায়ে মাখিতেন। লেন্‌থেল্‌মি নামে আর একজন অভিনেত্রী স্যাম্পেন মদের ধারায় সৌন্দর্য্য-স্নান করিতেন।

—Nash's Magazine হইতে।

শিশু-শিক্ষা

আমেরিকায় এখন শিশু-শিক্ষা লইয়া একটা নূতন আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, শিশু-শিক্ষার বর্ত্তমান পদ্ধতি ঠিক নয়। পৃথিবীর যে-সকল ব্যাপার যে-সময়ে জানা দরকার, শিশুরা ঠিক সেই সময়টিতে সে-সব ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ-লাভ করে না। শিশুরা এখন আট বৎসর বয়সে যতটা জ্ঞানলাভ করে, আরও অল্প বয়সে তাহাদিগকে ঠিক ততটা পরিমাণেই জ্ঞানবান হইতে হইবে। অনেকে শিশুদের জন্য নব আদর্শের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখানে আগে নানা বিষয় শিখিয়া, শিশুরা উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। উচ্চতর বিদ্যালয়-গুলির কার্য্যকালও সংক্ষিপ্ততর করিবার কথা উঠিয়াছে। এই কথা কার্য্যে পরিণত হইলে, ছাত্রেরা এখনকার চাইতে অল্পবয়সে কলেজে প্রবেশ করিতে পারিবে।

এখনকার প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনেক অকারণ বাহুল্য আছে। সেই বাহুল্যকে পরিহার করিয়া শিশুদের প্রথম শিক্ষাকালটা আসল কাজে খাটাইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।—এইটি হইতেছে উপর-উক্ত নব-পদ্ধতির মূল কথা।

সংপ্রতি উইনিফ্রেড স্যাক্‌ভিল ষ্টোনারের "Natural Education" নামে যে নূতন ও বিখ্যাত বইখানি বাহির হইয়াছে, তাহাতে নব শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি ও তাহার আশ্চর্য্য ফললাভ সম্বন্ধে চিত্তগ্রাহী আলোচনা আছে। লেখিকা বলেন, "শিশু-জীবনের প্রথম পাঁচ ছয় বছর বাজে কাজে লাগাইয়া, আমরা সময়ের অত্যন্ত অপব্যবহার করি। নিয়মিত শিক্ষা দিতে পারিলে ঐ সময়টাতেই অন্য সময়ের চেয়ে ঢের বেশী ফল পাওয়া যায়। তাহাতে পরজীবনের ছয়,—এমন-কি দশ বৎসরব্যাপী অকারণ শিক্ষার পেষণ-যন্ত্র হইতে ছাত্রগণ পরিত্রাণ পাইতে পারে! আমাদের মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের জোর করিয়া লেখাপড়া শেখানো উচিত নয়। তারা একটু-আধটু যাহা শিখে, তাই ভাল; কারণ, তাদের হাল্‌কা মস্তিষ্ক গুরুতর শিক্ষার গুরুভার সহিতেপারে না। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, —এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।"

শ্রীমতী ষ্টোনার কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া কোন কথা বলেন নাই; তিনি তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিকে হাতে-নাতে কাজে খাটাইয়াছেন। তাঁহার কন্যার নাম

ইনিফ্রেড। তাহার বয়স বারো বৎসর। বয়সে সে এত বিষয় শিখিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের কোন পরিণতবয়স্ক গ্রাজুয়েটের ছ হইতেও ততটা আশা করা যায় ।

উইনিফ্রেড, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান ও ইংরাজী ষায় লিখিতে, পড়িতে ও কথা কহিতে রে। স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষাতেও তাহার ষ্ট দক্ষতা আছে। এস্পারেণ্টোতে সে -তিনখানি ছোট-ছোট বই লিখিয়াছে। ই না দেখিয়া ভার্জিল ও সিসেরোর চনা হইতে সে দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি বং তার ভাব ব্যাখ্যা করিতে রে। নামজাদা অধ্যাপকেরা তাহাকে নারূপে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কোনমতেই কেহ তাহাকে ঠকাইতে রেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ভাল ত্রও যে তাহার চাইতে ভাল প্রশ্নোত্তর তে পারে না, ইহাও সপ্রমাণ হইয়া য়াছে।

শুধু লেখাপড়াতে নয়, উইনিফ্রেড নানা লিত-কলাতেও সিদ্ধব্রত। পিয়ানো ও বেহালায় তার হাত ভারি মিষ্টি। নাচেও াহার পটুতা বড় কম নয়। নাচে ও াজনায় সে এতটা দক্ষ যে, ভবিষ্যতে ইচ্ছা রিলে সে রঙ্গমঞ্চে নাচিয়া-বাজাইয়া নায়াসে নাম ও পয়সা করিতে পারে। চিত্র-অঙ্কনেও সে যথেষ্ট নিপুণা!

পিটস্‌বার্গে যত দাবাবোড়ে-খেলোয়াড় া সিয়াছে, উইনিফ্রেড তাহাদের সবাইকে ারাইয়া দিয়া নাম কিনিয়াছে। অনেক স্তাদ দাবাবোড়ে-খেলোয়াড়কেও তাহার ক্রীড়াদক্ষতায় হার মানিতে হইয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীতত্ত্বের উপরে সে যে কয়খানি নোটবই লিখিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন অধ্যাপক বলিয়াছেন, অনেক ভাল কলেজেও ঐ নোটবইগুলি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে।

অনেকে এখানে ভাবিতে পারেন, এত অল্পবয়সে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করাতে উইনিফ্রেডের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু তা নয়। চব্বিশ বৎসর বয়সে যে-রকম ক্ষমতা স্বাভাবিক, বারো বৎসর বয়সে সে ঠিক সেইরকমই শক্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে,—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে তাহার সমবয়স্ক আর কোন বালিকার গায়ে এত বেশী জোর নাই। উইনিফ্রেডের গড়নও খুব বাড়ন্ত, দেখিতে তাহাকে ষোল, সতেরো বছর বয়সের যুবতীর মত। তরবারি-খেলায়, দৌড়ানোতে, মুষ্টিযুদ্ধে অনেক পুরুষও তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।

উইনিফ্রেড এই বয়সেই নানা বিষয় লইয়া দশ-এগারোখানি ছোট ছোট বই লিখিয়া ফেলিয়াছে। গতবৎসরে কলমের জোরে সে দেড় হাজার টাকারও বেশী রোজগার করিয়াছে। তাহাকে অনেক বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, নহিলে সে আরও ঢের বেশী টাকা রোজগার করিতে পারিত। তুমি ফর্‌মাস দিলে সে যে-কোন বিষয় লইয়া কবিতা-রচনা করিতে পারে। প্রফেসর ও-সিয়া, একবার কোন ছাত্ররচিত একটি প্রবন্ধ উইনিফ্রেডের হাতে দিয়া বলেন, "এই গদ্যটাকে পদ্যে পরিণত কর দেখি!"

টাইপরাইটারের সুমুখে বসিয়া উইনিফ্রেড সেই গদ্য-প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া বারো মিনিটের ভিতরে একটি চুয়াল্লিশ পংক্তির কবিতা লিখিয়া ফেলিল। আমরা এই গদ্য ও পদ্য হইতে প্রথম অংশ তুলিয়া দিলাম।

গদ্য :—Bones is the framework of the body. If I had no bones in me I should not have so much shape as I have now. If I had no bones, my brain, heart, lungs, and larger blood-vessels would be lying round in me, and might get hurt."—ইত্যাদি।

উইনিফ্রেডের পদ্য :—

"The framework of the body is
The bones—so teachers say ;
And if we didn't have'em
Our shape it wouldn't stay.
Besides, some bones my liver
And brain and even heart
Would get some awful hurtin's
And maybe come apart."

—ইত্যাদি।

শেষ দুই-তিন বৎসর ছাড়া, উইনিফ্রেড বরাবর তার মায়ের কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখিয়াছে। শ্রীমতী ষ্টোনার বলেন, "স্বাভাবিক শিক্ষা-পদ্ধতি"র প্রথম কথা কি? একরকম জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই শিশু-শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। উইনিফ্রেড যখন একরত্তি কচি মেয়ে, শ্রীমতী ষ্টোনার তখন তাহাকে দোলায় শুয়াইয়া ভার্জিলের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘুম পাড়াইতেন। কবিতার সুরে [illegible] কান্না ভুলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া থাকিত। উইনিফ্রেডের বয়স যখন একবৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখনি সে আধো-আধো স্বরে ভার্জিলের Æneid হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিত। শ্রীমতী ষ্টোনার একটু বল লইয়া মেয়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিতেন, "Arma"! উইনিফ্রেড আধো বলটি মায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিত, "Virumque।"

(ভার্জিলের একটি কবিতার আছে:-

"Arma virumque [illegible] no
Troiae qui primus [illegible] oris")

মিসেস ষ্টোনার [illegible] সঙ্গে [illegible] খেলিতে খেলিতে যখন [illegible] তেন, কবিতার প্রথম কথাটি তাহার মুখ [illegible] হইয়া গিয়াছে, তখন আবার তাহার [illegible] কথাটি- "cano" ও "Troiae"- [illegible] থেকে খেলিতে খেলিতে মুখস্থ করা [illegible]। এইরূপে খেলাধূলার সঙ্গেসঙ্গে উইনিফ্রেড ভার্জিলের কবিতার পর কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিল।

মিসেস ষ্টোনার [illegible], শিশুর অজ্ঞাতসারে এইরূপ খেলাধূলার মধ্য সঙ্গেই তাহাদের শৈশবশি[illegible]। ক্রমেই অগ্রসর করিতে হয়। দেশের ভা[illegible] হউক, মা বিদেশের ভাষাই হউ[illegible]—সমস্তই এই উপায়ে শিশুদিগকে [illegible] শাইতে হইবে। অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল, বা[illegible] প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিশুদের দক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য মিসেস ষ্টোনার এক-এক বিষয়ের উপযোগী এক-একরূপ ক্রীড়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের প্রেসিডেণ্টদের নাম

[illegible]নাইবার জন্য মিসেস ষ্টোনার প্রেসিডেণ্টদের [illegible]য়া একখানি নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন। [illegible]রপর উইনিফ্রেডের সামনে উক্ত নাটিকার [illegible]ভিনয় হয়। ফলে, সে প্রেসিডেণ্টদের [illegible]াম ও কার্য্যাবলী সমস্ত ঠিকঠাক জানিয়াও [illegible]ন্দেহ করিতে পারে নাই যে, তাহাকে [illegible]কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে!

মিসেস [illegible]ার আর এক উপায়ে মেয়েকে শিক্ষা দিতেন। তিনি নানারূপ [illegible]জ্ঞানের কথা [illegible]াকারে মেয়েকে শুনাইতেন —এমন-কি [illegible]াস্ত্রের নীরস কথাগুলিও! তাঁহার গল্পের [illegible]াত্রপাত্রীরূপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভা[illegible] প্রভৃতি দৈত্যনামে বিরাজ করিত। এই অদ্ভুত দৈত্যগুলির কার্য্যকলাপ [illegible]য়া উইনিফ্রেড তাহাদের বিশেষ বিশেষ [illegible]ক্ষণগুলি মোটামুটি এক-রকম জানিয়া [illegible] পারিত। মিসেস ষ্টোনারের মতে, যাহার ভিতরে গল্প আছে, তাহার প্রতি শিশুদের টান্ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

অনেকে মনে করিতে পারেন, উইনিফ্রেডের মত অপূর্ব্ব বিদুষী বালিকা জগতে একটি কি দুটির বেশী জন্মিতে পারে না। কিন্তু মিসেস ষ্টোনার এ কথা মানেন না। তিনি বলেন, "আমার মেয়ের চরিত্রে সাধারণ বালিকা-চরিত্র অপেক্ষা বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমি আমার কন্যাকে শিক্ষাদান করিয়াছি, সেই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলে জগতের সকল শিশুই উইনিফ্রেডের মত বিদ্বান হইতে পারিবে।"

মিসেস ষ্টোনারের শিশুশিক্ষাপদ্ধতি যাঁহারা ভাল করিয়া জানিতে চান, তাঁহারা তাঁহার "Natural Education" নামে নবপ্রকাশিত পুস্তক পড়িয়া দেখিতে পারেন।

—McClure's Magazine হইতে।

য়ুরোপের রাজনৈতিক গুপ্তচর

ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান-যুদ্ধের পর হইতেই, জার্ম্মাণ রাজ-সরকার ফরাসীদেশে গোয়েন্দার পর গোয়েন্দা পাঠাইতে সুরু করেন। এই গোয়েন্দার দল দোকানদার, জহুরী, স্বর্ণকার ও বিশেষ করিয়া হোটেলওয়ালার বেশে সারা ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথম-প্রথম জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট ফ্রান্সের গোয়েন্দাদলের কাছে পুরুষ-প্রতিনিধি পাঠাইয়া সমস্ত খবর জানিয়া লইতেন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরেই ফরাসীরা সমস্ত ব্যাপারটা ধরিয়া ফেলেন। তখন, পুরুষ প্রতিনিধির বদলে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য স্ত্রী-প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। এই স্ত্রীলোকগুলি আধাবয়সী ও ভদ্রবংশীয়া ছিল।

এই রমণী-চরেরা রেলপথে ফ্রান্সের নানান জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। মাঝে মাঝে কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে থামিয়া, তাহারা ফ্রান্সের গোয়েন্দাদের সঙ্গে দেখা করিত। কথাবার্ত্তা বড় হইত না,—ট্রেণ ছাড়িবার

আগেই তাহারা যে-যার আপন-আপন বক্তব্য চিঠি-পত্রের দ্বারা পরস্পরকে জানাইয়া যাইত।

গত দশবৎসর ফরাসীদের গুপ্তকার্য্য-বিভাগ জার্ম্মাণ গোয়েন্দাদলকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। পঙ্গপালের মত সমস্ত ফ্রান্সটা আছন্ন করিয়া শত্রু-পক্ষের গোয়েন্দারা যে কিরূপ গুপ্তচক্রান্তে নিযুক্ত হইয়া আছে, ফরাসী গবর্মেণ্ট তাহার সব কথা জানিতে না পারিলেও কতক কতক আন্দাজ করিতে পারিলেন। দেশের গুপ্তকথা যাহাতে চিঠিপত্রের ভিতর দিয়া শত্রুরাজ্যে গিয়া পৌঁছিতে না পারে, ফরাসী গবর্মেণ্ট সেইজন্য ডাকবিভাগের কর্ত্তাদের নিকটে এক হুকুমনামা পাঠাইলেন।

কিন্তু হুকুমনামা শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের কাছে গোপন রহিল না। জার্ম্মাণ গব-র্মেণ্ট বুঝিলেন ডাকে এখন কোনরকম সঙ্কেতলিপি বা সন্দেহজনক পত্র পাঠানো বিবেচনার কাজ নহে। অতএব তাঁহারা চিঠিপত্র লিখিবার এক নূতন কায়দা বাহির করিলেন। চিঠিগুলির ধরণ-ধারণ প্রায় এমনিধারাই হইত ঃ—

"প্রিয় জর্জ্জ,

তুমি আমাকে যে টাকা ধার দিয়াছিলে, আমি তাহার সুদ পাঠাইলাম।

তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, আমরা তাহা ভুলিব না।

এখানকার খবর বড় মন্দ নয়, আগামী বৎসরে লাভের অংশ থেকে তুমি বোধ হয় কিছু বেশী টাকা পাইবে।

আমরা এ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, জানিবে।

সর্ব্বদাই পত্র লিখিবে; তোমার সব খবর আমরা জানিতে চাই।

চার্লস খুড়াকে মিছাই তুমি অবিশ্বাস করিয়াছ, তিনি খুব ভাল লোক। তাঁর উপরে তুমি অনায়াসে নির্ভর করিতে পার।

আমার স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসা নাও। চার্লস, চার্লটী ও ফ্রেডারিকের আলিঙ্গনও গ্রহণ করিবে।"

চিঠিখানির আসল মানে ঃ—

"আমি তোমাকে তোমার গোলমালের মাহিনা পাঠাইলাম। তোমার দেওয়া খবর সন্তোষজনক। তুমি যদি এইভাবে বরাবর কাজ চালাইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আগামী বৎসরে তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিব। সংবাদ আরও বিশদভাবে ও তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। চার্লসকে অবিশ্বাস করিও না,—সে আমাদেরই লোক। চার্লস, চার্লটী ও ফ্রেডারিক নামে আমাদের যে তিনজন সংবাদদাতা আছে, তুমি তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিও।"

সাধারণত, গোয়েন্দাদের মাহিনা দিবার সময়েই জার্ম্মাণ গুপ্তকার্য্য-বিভাগের কর্ত্তারা ডাকমারফতে পত্রব্যবহার করেন। নহিলে, বিশেষ কোন দরকারি কথা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত রমণী-গোয়েন্দাদের দ্বারাই কাজ চালাইয়া নেওয়া হয়। কারণ, তাহাই অধিক নিরাপদ।

ফ্রান্সে যত জার্ম্মাণ গোয়েন্দা আছে, তাহাদিগের জন্য জার্ম্মাণ গুপ্তকার্য্য-বিভাগকে বৎসরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ ডলার (এক ডলার প্রায় তিন টাকা দুআনা) খরচ করিতে হয়।

আগেই বলা হইয়াছে, গোয়েন্দারা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে থাকে। সময়ে সময়ে ফরাসী ডিটেকটিভেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ব্যবসায়ে গোয়েন্দাদের যে আয় হয়, ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষ সেই আয়ের সঙ্গে গোয়েন্দার খরচের তুলনা করেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী দেখিলেই ধৃত গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই অতিরিক্ত ব্যয় পোষানের জন্য সে কোথা হইতে টাকা পাইল? সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিলে ধৃত গোয়েন্দা বিপদে পড়ে। কিন্তু সে প্রায়ই পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রের মত চিঠি দেখাইয়া প্রমাণিত করে যে, অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য তাহার দেশ হইতে টাকা আসিয়াছে।

জার্ম্মাণদের মত ফরাসীরাও গোয়েন্দা পোষণ করে; কিন্তু জার্ম্মাণ গোয়েন্দাদের চাতুরীর কাছে তাহাদিগকে অনেকবার হার মানিতে হইয়াছে। ফরাসীরা যখনই জার্ম্মাণীতে গোয়েন্দা পাঠাইয়াছে, তখনই জার্ম্মাণ গুপ্তকার্য্যবিভাগে সে সংবাদ আগে থাকিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে! একবার ফরাসী-দের নৌবিভাগ হইতে জার্ম্মাণীর হেলিগোল্যাণ্ড ও কিয়েল খাল প্রভৃতি জায়গার মানচিত্র আনিবার জন্য দুজন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীকে চর নিযুক্ত করা হয়। এই গুপ্তসংবাদ গুপ্ত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সৈনিক কর্ম্মচারীরা অসামরিক পোষাক পরিয়া একখানি পান্সী ভাড়া করিলেন—সচরাচর লোকে যেমনভাবে জলবিহারে বাহির হয়, তাঁহারাও যেন তেমনি ভাবেই সমুদ্রে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। যথেষ্ট সাবধানে থাকিয়াও তাঁহারা কিয়েল খালের কাছে যাইবামাত্র বন্দী হইয়া, বিচারার্থ লিপ্‌যিকে প্রেরিত হইলেন। বিচারকালে ফরাসী কর্ম্মচারীরা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, জার্ম্মাণরা সুধু যে তাঁহাদিগকে গোয়েন্দা বলিয়া জানে, তাহা নহে; পরন্তু, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অতি গোপনীয় কথা-গুলিও আগে থাকিতেই শত্রুপক্ষের কর্ণ-গোচর হইয়াছে! তাঁহাদের মধ্যে একজন যে বহু বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি কেল্লার নক্সা লইবার জন্য জার্ম্মাণীতে আসিয়াছিলেন, এ খবরটাও লুকানো নাই!

আর একজন ফরাসী কাপ্তেন গোয়েন্দা-গিরি করিবার জন্য ছদ্মবেশে বার্লিনে গিয়া হাজির হন। তাঁহার উপরে যাহাতে সন্দেহ হইতে না পারে, সেজন্য তিনি অত্যন্ত সাবধানে ছিলেন। বার্লিনের এক বিখ্যাত হোটেলে আহারাদি করিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একটি পরমা সুন্দরী মহিলা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছেন। ভিড়ের ভিতরে তিনি তাঁহার সঙ্গের লোককে হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং পথ না জানার দরুণ বাড়ী যাইতে না পারিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। মহিলাটিকে দেখিলেই বুঝা যায়, তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়া।

ফরাসী কাপ্তেন এরূপ অবস্থায় ভদ্র-লোকের যাহা করা কর্ত্তব্য—তাহাই করিলেন। তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া, তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া আসিলেন।

হোটেলে ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি দেখিলেন, একজন ভদ্রলোক তাঁহার জন্য

অপেক্ষা করিতেছেন। কাপ্তেনকে দেখিয়া সেই ভদ্রলোক আপনার পরিচয় দিয়া বলিলেন, —"আমি এখানকার পুলিশ কমিশনার।"

কাপ্তেন আপনার "পাসপোর্ট" বাহির করিয়া দেখাইলেন।

পুলিশ কমিশনার ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "আমাকে বোকা বনাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এই 'পাসপোর্টে' আপনার ছবি থাক্‌লেও এখানি যে আপনার ভাইয়ের, আমরা তা জানি।"—তারপর, তিনি বিস্মিত ও হতভম্ব ফরাসী কাপ্তেনকে একে একে জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রান্সের কোন্ কোন্ রেজিমেণ্টে, কোথায় তিনি কাজ করেন, কবে, কোন্ তারিখে তিনি যুদ্ধ-বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ সময়ে সৈন্যদলে তিনি কোন্ কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং কোন্ তারিখে কোন্ জায়গায় তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল—এককথায় তাঁহার সমস্ত জীবনচরিতটি পুলিশ কমিশনার একনিশ্বাসে বলিয়া গেলেন,—এমন কি কাপ্তেন ঠিক কোন্ সময়ে বার্লিনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেটি পর্য্যন্ত!

জীবনচরিত সমাপ্ত করিয়া পুলিশ কমিশনার আপনার পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিলেন, তাহার উপর কাপ্তেনের নাম ইত্যাদি লেখা ছিল। সেখানি কাপ্তেনকে দেখাইয়া পুলিশ কমিশনার আবার বলিলেন:—"আপনি যখন দয়া করে আমাদেরই এক স্ত্রী-গোয়েন্দাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় আমরা মহাশয়ের ঘরে ঢুকে আপনার পোর্টম্যাণ্টো'র কৃত্রিম তলা সরিয়ে এই প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আসুন মশাই, ফ্রান্সে যাবার ট্রেণ শীঘ্রই ছাড়বে,—আমি আপনাকে সসম্মানে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব। দেখ্‌ভাব্‌বেন না, আমরা আপনার জন্যে প্রথম শ্রেণীর কামরাই ভাড়া করেছি!"

—The Saturday Evening Post হইতে।

শ্রীপ্রসন্নদাস রায়।

তুকানিয়া ফকির

(পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীচিত্র)

তাহার নাম ছিল তুকানিয়া। সে তখন আমাদের বাড়ী কৃষাণের কাজ করিত। দৈনিক দুবেলা আহার এবং পূজার সময় একখানা নূতন কাপড় ও একজোড়া নারিকেল বাদে তাহার বার্ষিক বেতন পঁচিশ টাকার বেশী ছিল না। গরু চরাইতে, লাঙ্গল টানাইতে, জমী নিড়াইতে, ধান কাটিতে, হাঠবাঠ করিতে ত তাহাকে হইতই, তাহাছাড়া, অন্য কোন পরিশ্রমের কাজ পড়িলে বিনা আপত্তিতে তাহাও সে তৎক্ষণাৎ করিয়া দিত। তখন হিন্দু মুসলমানে বড় সদ্ভাব ছিল। একের সাহায্য

ভিন্ন অন্যের উপায় নাই জানিয়া উভয়েই উভয়কে প্রীতির চক্ষে দেখিত। হিন্দুরা তখন বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলমানগণকে "চাচা", "মামু", "নানা" এবং মুসলমানেরাও বয়োজ্যেষ্ঠ হিন্দুদিগকে "দাদা", "জ্যাঠা" "কাকা" প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে আহ্বান করিত। হিন্দুর কালীবাড়ীতে মুসলমানের মানত পাঁঠা-বলি হইত, হিন্দুরাও মুসলমানের দরগায় চিনি-বাতাসার শিরি দিত!

সেকালে সমস্ত জিনিসই অত্যন্ত সুলভ থাকায় তুকানিয়া এই সামান্য বেতনেও নির্ব্বিঘ্নে সংসার চালাইতে পারিত। তাহার সংসারটিও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, বৃদ্ধা মাতা, নিকা-করা স্ত্রী, একটি অল্পবয়স্কা কন্যা, একটি ছয়মাসের পুত্র ও দুইটি তরুণবয়স্ক কনিষ্ঠ সহোদরের ভরণ-পোষণের ভার তুকানিয়ার উপর ছিল। আয়ের মধ্যে তাহার বেতনের কয়টি টাকা এবং পৈত্রিক দুই-তিন বিঘা জমীর উৎপন্ন সামগ্রীই সম্বল। ইহা ভিন্ন তাহার মধ্যম সহোদর বোঁচা ক্বচিৎ কখনও কোন গৃহস্থের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিয়া দুই এক টাকা আনিয়া দিত। বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার দিনে অনেকে ধারণাই করিতে পারিবেন না, কি করিয়া এই সামান্য আয়ে তুকানিয়া অতগুলি লোককে প্রতিপালন করিত।

শীতকালে একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, তুকানিয়া "ফকিরী" লইয়াছে!—আর সে চাকুরী করিবে না! তাহার বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে বড় বেশী দূরে ছিল না, কিন্তু মুরগীর বাতাস গায়ে লাগিবার ভয়ে আমরা সেখানে বড় একটা যাইতাম না। তুকানিয়া "ফকিরী" লইয়াছে শুনিয়া আমার শিশু-হৃদয়ে সহসা একটা বিপুল বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। যে তুকানিয়া সাধারণ মানুষের মতই আমাদের বাড়ীতে কৃষাণের কাজ করিত,—যাহার কাঁধে চড়িয়া কত বেড়াইয়াছি, রাগের সময় যাহাকে কীল-চড় মারিতেও দ্বিধা করি নাই, সেই তুকানিয়া আজ কেমন করিয়া যে হঠাৎ একেবারে "ফকিরীর" উচ্চসম্মান লাভ করিল, আমি ত তাহা কোনমতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন স্নানের পূর্ব্বে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উহাদের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম, তুকানিয়ার বৃদ্ধা মাতা উঠানের একপার্শ্বে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া সম্মুখে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে, আর তাহার চারিদিকে গ্রামের আরও দশবারো জন মুসলমান গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। উহাদের অসম্ভব গম্ভীর ভাব দর্শনে কোন প্রশ্ন করিতে আমার ভরসা হইল না। কাজেই মনের কৌতূহল মনে চাপিয়া ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলাম।

এমন সময় দেখি, তুকানিয়ার বাহির-বাড়ীতে কুলগাছের তলায় ঈশান ঘোষ দাঁড়াইয়া আছে। ঈশান আমার চেয়ে এক বৎসরের বড়;—গ্রাম-সম্পর্কে সে আমার খুড়া হয়। তাহার সঙ্গে আমার বড় বনিবনাও ছিল না; কারণ, সে এই বয়সে দুইতিন বার তাহার মামার বাড়ী টাঙ্গাইল অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়া নিজেকে একজন মাতব্বর ও

বহুদর্শী লোক বলিয়া মনে করিত, এবং আমরা গ্রাম ছাড়িয়া কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাই নাই বলিয়া—কূপমণ্ডুক ভাবিয়া আমাদিগকে নিতান্তই করুণা ও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। যাহা হউক, আর কারো কাছে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ না থাকায় বাধ্য হইয়া আমাকে ঈশানেরই মুখাপেক্ষী হইতে হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ ঈশান, (সম্পর্কে খুড়া হইলেও, প্রায় সমবয়স্ক বলিয়া আমরা ঈশানকে নাম ধরিয়াই ডাকিতাম, তাহাকে খুড়া বলিয়া ডাকিতে গেলে নিজেকে যে ছোট করিতে হয় তাহাতে আমরা নারাজ ছিলাম),—তুকানিয়া নাকি "ফকির" হয়েছে? সে কেমন করে "ফকির" হল? সে কই? তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না!" ঈশান কহিল, "তোমরা পাড়া-গেঁয়ে ভূত,—জানইবা কি, আর বুঝই-বা কি? কোনদিন ত মায়ের আঁচল ছে'ড়ে কোন জায়গা গেলে না,—এসব ব্যাপার দেখ্‌বে কোথায় বল? আমি মামাদের ওখানে যে'তে আস্‌তে এমন কত "ফকির" দেখেছি। এসব আমার আর জান্‌তে বাকী নেই। তুকানিয়াকে কি আর এখন দেখ্‌বার উপায় আছে, সে ত মাটীর নীচে "কবর" নিয়েছে। দেখ্‌ছ না, তুকানিয়ার মা আর পাড়ার সকলে কবরের উপর পাহারা দিচ্ছে?

সত্যই তখন চাহিয়া দেখি, তুকানিয়ার মা ও পাড়ার অন্যান্য মুসলমানগণ যেখানে বসিয়া আছে, তাহার নিকটস্থ ভূমি ঢিবির মত উঁচু করিয়া তোলা হইয়াছে। সত্যই কি তুকানিয়া উহার নীচে আছে! কি সর্ব্বনাশ! মুসলমান মরিলেইত কবর দেয় শুনিয়াছি, তবে তুকানিয়াকে ঐ কবর দিল কেন? সে মাটীর নীচে কি খায়? কোথায় শোয়? কেমন করিয়া তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসেরই বা কাজ চলে?—কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না। ঈশানকে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—"তবেই হয়েছে, তবেই সব বুঝেছ!" বলিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল। আমিও নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে, আমার চেয়ে ঈশান কত বেশী জানে ও বুঝে, ভাবিতে ভাবিতে তাই বাড়ীর পিছনে "বৈরাগী"দের পুকুরে স্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ মা, তুকানিয়া নাকি "কবর" নিয়েছে? তা সে কি খায়? কবরের নীচে সে কেমন করে বেঁচে আছে?" মা চারিদিকে সশঙ্ক ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "চুপ, চুপ, ওসব কথা বলতে নেই! ওর কথা মুখে আনিস্ না! জানিস্ না, তুকানিয়াকে "মাদারে" ভর করেছে! সে জাম্বুরা (বাতাবি লেবু) গাছতলায় এ কলসী টাকা পেয়েছে, সে টাকা মাদারের একমাস কবরের তলে থেকে যে দিন সে উপরে উঠবে, সেইদিনই মাদারের পূজা আরম্ভ করতে হবে।" আমি মার সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও এটুকু বুঝিলাম যে, হিন্দুদের শিব, দুর্গা, গণেশের মত "মাদার" মুসলমানদের এক দেবতা,

তুকানিয়া সেই মাদারের অনুগ্রহে অনেক টাকা পাইয়াছে, কাজেই সমারোহের সহিত মাদারের পূজা করিবে।

তুকানিয়ার বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাহালের পার্শ্বস্থিত জঙ্গলে সত্যসত্যই একটা জাম্বুরা গাছ ছিল,—মার কথায় বুঝিলাম, তুকানিয়া সেই গাছতলাতেই টাকা পাইয়াছে। একবার সেখানে গিয়া অবস্থাটা চক্ষে দেখিয়া আসিবার জন্য প্রাণে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল,—কিন্তু একে গভীর জঙ্গল, তাহার উপর আবার মাদারের আশ্রয়স্থান, কাজেই সেখানে যাওয়াটা বড় সহজ মনে হইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার ছোট ভাইয়ের নিকট কথাটা প্রকাশ করিলাম। সে আমার চেয়ে প্রায় আড়াই বছরের ছোট, কিন্তু শারীরিক শক্তি এবং মনের সাহসে আমার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ! আমাদের বড় খুড়ামহাশয় ভিন্ন দুনিয়ার সকলকেই সে তৃণবৎ গণ্য করিত। আমি জাম্বুরা গাছতলায় যাইতেছি শুনিয়া সেও আমার সঙ্গে যাইতে রাজি হইল। অবশ্য, এসব কথা মাকে বলা হইল না; দুজনে চুপি চুপি সকলের অগোচরে সেই জাম্বুরা গাছতলায় উপস্থিত হইলাম। ভয়ে আমার গা ছমছম করিতে লাগিল, কিন্তু আমার ছোটভাইটির বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না। জাম্বুরা গাছতলায় দেখিলাম, সত্যসত্যই একস্থানে মাটী খুঁড়িয়া প্রায় দুই হাত গভীর ও দেড় হাত চওড়া গর্ত্ত করা হইয়াছে। আমি বলিলাম, "দেখেছিস্, এইখানে তুকানিয়া টাকার কলসী পেয়েছে।" আমার ছোট ভাই "হো হো" করিয়া হাসিয়া বলিল, "টাকা না ঘণ্টা!—দেখছ না, কে বুনো আলু তু'লে নিয়ে গেছে!" বাস্তবিকই ঐ জায়গায় একটা বুনো আলুর ছিন্ন লতা এবং দুই এক টুকরা বুনো আলু মাটীর ডেলার সঙ্গে পড়িয়া আছে দেখিলাম। সত্যই কেহ আলু তুলিয়াছে, না তুকানিয়া টাকা তুলিবার সময় আলু আপনি বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই জাম্বুরা গাছের নিকটেই একটা বহুকালের পুরাতন পুকুর এবং একটা উঁচু প্রকাণ্ড বাস্তুভিটার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে বলে, এইস্থানে প্রাচীন কালে একদল ডাকাইতের আড্ডা ছিল, তাহারা মানুষ খুন করিয়া এই পুকুরে ডুবাইয়া দিত এবং টাকা মোহর সব জঙ্গলে পুঁতিয়া রাখিত। এই প্রবাদের মূলে কতটুকু সত্য আছে, এখন আর তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই; কিন্তু তুকানিয়ার টাকা পাওয়ার জনরব সত্য হইলে এই প্রবাদকে নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

মাঘমাসের মাঝামাঝি শুনিলাম, তুকানিয়া কবর হইতে বাহির হইয়া বারোয়ারী-তলায় বটগাছের নীচে আশ্রয় লইয়াছে। দিনরাত সেইখানেই সে থাকে; মাদারের পূজা না দেওয়া পর্য্যন্ত আর সে বাড়ী ফিরিতে পারিবে না। মার অনুমতি লইয়া একদিন বৈকালে বটতলায় গিয়া দেখি, তুকানিয়া মাটীর উপর পশ্চিম শিয়রে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, আর মোটা গলায় "মন রে অবোধ, বুঝে দেখ রে ভাই,—দেহের মধ্যে যত দরবেশ খুঁজলে তাহা পাই!" বলিয়া গান করিতেছে। তাহাকে দেখিলে এখন হঠাৎ চেনা যায় না। দেখিলাম তাহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা

অনেক ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, —মাথার বাবরী চুল ও মুখের ঘন দাড়ী অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া গিয়াছে, চোখে-মুখে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিধানে পূর্ব্বেকার সেই ময়লা ধুতির বদলে, চিত্র-বিচিত্র এক লুঙ্গী, মাথায় লাল বনাতের টুপী, গলায় লাল কালো সাদা ও সবুজ রঙ্গের বেলোয়ারী মালা এবং হাতে একখানা ক্ষুদ্র কঞ্চি। দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তুকানিয়ার এমন বিচিত্র-মূর্ত্তি ও অদ্ভুত বেশভুষা পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই;—তাহাকে আগে আর কখনও গান গাহিতে শুনি নাই।—একমাসের মধ্যে সে কেমন করিয়া গান করিতে শিখিল, এই সব মালা, লুঙ্গী এবং বনাতের টুপীই বা কোথা হইতে সংগ্রহ করিল, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আরও একটা গুরুতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই—কি হিন্দু, কি মুসলমান, ওখানে যে আসিতেছে, সেই তুকানিয়াকে ভক্তিভরে সেলাম করিতেছে! তুকানিয়াও নিতান্ত নির্লিপ্ত এবং উদাসীন ভাবে সেইসব সেলাম গ্রহণ করিতেছিল,—যেন এইসব সেলামে তাহার চিরন্তন অধিকার, —এবং সে যেন ইহাতে চির-অভ্যস্ত! যে তুকানিয়া আমাদের বাড়ীর একজন নগণ্য কৃষাণ ছিল, যে তুকানিয়া ঘরে ঢুকিলে হিন্দুরা হুঁকার জল অবধি ফেলিয়া দিতেন, যে তুকানিয়ার আনা বাজার মা না ধুইয়া ঘরে লইতেন না, আজ কোন্ মন্ত্রবলে সেই তুকানিয়ার এত মান, এত সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইল? বটতলায় দেখিলাম, একস্থানে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড; তাহাতে দুই তিনটা বড় গুঁড়ি কাঠ ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে, কত লোক তাহার চারিদিকে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে —কেহ দাঁড়াইয়া ফিস্-ফাস্ করিতেছে, কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কিন্তু সকলেরই সসম্ভ্রম দৃষ্টি তুকানিয়ার প্রতি!

কয়দিন পরেই দেখিলাম, এ অঞ্চলের পাঁচ ছয়খানি গ্রাম হইতে মুসলমানেরা দলে দলে তুকানিয়ার আস্তানা সেই বটতলায় আসিয়া সমবেত হইতেছে। তাহাদের প্রায় সকলের হাতেই এক-একটি সুবর্ণ সুমার্জ্জিত বংশদণ্ড,—কেহ তাহাতে রং মাখাইয়াছে,—কেহ চাঁচিয়া-ছুলিয়া তৈল মাখাইয়া উহা চকচকে মসৃণ করিয়া তুলিয়াছে। কেহ লাল নীল বা সাদা কাপড়ের বেষ্টনী দিয়া বাঁশের আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাহারও বাঁশের আগায় লাল ও সবুজবর্ণের নিশান উড়িতেছে। সকলেরই মুখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত,—সকলেই যথাসাধ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় সাজিয়া আসিয়াছে। যাহাদের মাথায় বাব্‌রী চুল, তাহারা সেই বাব্‌রী তেল-কুচ্‌কুচে করিয়া এবং তাহাতে লম্বা শিঁথী টানিয়া আসিতেও বিস্মৃত হয় নাই। কুমারডাঙার কয়েকজন বাদ্যকর ঢোল সানাই এবং কাঁসি বাজাইয়া দেখিতে দেখিতে গ্রামখানিকে উৎসবানন্দে তোলপাড় করিয়া তুলিল। সমাগত মুসলমানগণ "চলো ভাই ইমামকা লস্কর!" বলিয়া ঘন ঘন চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের অনুপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দকে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। বট-

গাছের উত্তর দিকে ফকির-জাহানালি মীর পাঁচ ছয়টা খাসী ও বক্‌রী এবং কুড়ি-তিন মুরগী একে একে জবাই করিয়া চীৎকার করিতেছিল,—হিন্দু-মুসলমান, বালক বৃদ্ধ ও যুবা অনেকেই অদূরে দাঁড়াইয়া সেই সব মুমূর্ষু পশু-পক্ষীর মৃত্যুযন্ত্রণা অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া দেখিতেছিল। জাহানালি মীর একটা খুব তেজীয়ান মোরগের গলায় ছুরি বসাইয়া তাহার সম্পূর্ণ কণ্ঠচ্ছেদ করিবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ উহা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া উড়িতে উড়িতে আসিয়া আমার সেই পূর্ব্ববর্ণিত খুড়া ঈশান ঘোষের গায়ের উপর পড়িল। রক্তে ঈশানের চোখমুখ, কাপড়চোপড় সব রাঙ্গা হইয়া গেল। ঈশান ত দৌড়িয়া গিয়া সেই এঁদোপুকুরের পচা জলে লাফাইয়া পড়িল,—আমরাও অন্যদিকে গ্রামের ভিতর ছুটিয়া গিয়া "ঈশানের জাত গিয়েছে,—তার মুখে মুরগীর রক্ত পড়েছে" বলিয়া চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া দিলাম। ঈশান কিন্তু সে কথা বেমালুম উড়াইয়া দিল। তাহার চোখ-মুখ-ঘুরানিতে এবং উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনির তোড়ে আমাদের সকল কথাই মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়া গেল।

বৈকালে গিয়া দেখি, বটগাছের চারিদিক্ কোদাল দিয়া পরিষ্কার করিয়া গোময় ও মৃত্তিকার লেপ দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রায় চারি পাঁচশত মুসলমান নানা পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতেছে। উহারা যেরূপ আগ্রহের সহিত আহার করিতেছিল, তাহাতে আহার্য্য দ্রব্যের উপাদেয়তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না।

সারারাত্রি লোকের কোলাহল ও বাদ্যের বিরাম হইল না। পরদিন সকালে গিয়া দেখি, বটগাছের নীচে এক লাল চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে, সেই চাঁদোয়ার নীচে একটা বেদীর মত স্থানে এক অর্দ্ধ-চন্দ্র (Crescent)। সেই অর্দ্ধচন্দ্রের নিকট সকলের সম্মুখে সফরআলি ফকির, জাহানালি মীর এবং তুকানিয়া এক শ্রেণীতে, এবং উহাদের পশ্চাতে প্রায় দশ বারো শ্রেণীতে অপর সকলে নমাজ করিতেছে।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নমাজ চলিল। তারপর সকলে একসঙ্গে বাদ্য বাজাইয়া বংশ-দণ্ডাদিসহ অদূরবর্ত্তী আয়মা নদীতে স্নানার্থ যাত্রা করিল। বলাবাহুল্য যে আমরাও তাহাদের অনুগামী হইলাম। পরম উল্লাসে আয়মায় স্নান ও বংশদণ্ডগুলি ধৌত করিয়া একে একে সকলে কূলে আসিয়া রৌদ্রে সমবেত হইল এবং সফরআলি ফকির ও জাহানালি মীরের আদেশক্রমে এক এক বংশদণ্ডে এক এক বর্ণের বেষ্টনী যোজনা করিতে লাগিল। তারপর উহাদের মধ্যে এক একজনে এক একটি বাঁশ তুলিয়া লইল। একটি বড় অদ্ভুত বংশদণ্ড দেখিলাম, এরূপ বাঁশ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। এই বাঁশের মূল কাণ্ডটি প্রায় চারি হাত ঊর্দ্ধে দুই সমভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি সমানাকার শাখার সৃষ্টি করিয়াছে। শুনিলাম, ইহাই নাকি মাদারের বাঁশ। যাহার বাগানে এইরূপ বাঁশ জন্মিবে, সে ধনী হউক, আর দরিদ্র হউক, মাদারের পূজা তাহাকে করিতেই হইবে। এই বাঁশটি নাকি তুকানিয়ার স্বহস্তে রোপিত

বাঁশের ঝাড়ে জন্মিয়াছে, এবং সেইজন্যই তুকানিয়াকে এইভাবে মাদারের পূজা দিতে হইতেছে। এই বাঁশটি অতি যত্নে চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। তুকানিয়া আপন হাতে এই বাঁশের দুইটি আগায় দুইটী শ্বেতবর্ণের বেষ্টনী পরাইয়া দিল,—মাদারের চিহ্নই নাকি শ্বেত। সকলেই বাঁশটি স্পর্শ করিয়া আপন আপন কপালে হাত ছোঁয়াইতে লাগিল। ব্যবস্থা মত এই বাঁশ তুকানিয়াকেই বহন করিতে হয়, কিন্তু সে মাসাধিক কাল "কবরে" থাকায় নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে এই ষোড়া বাঁশ বহা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা, এজন্য এই বাঁশটি তুকানিয়ার ভাগ্নে-জামাই জাবারিয়া সেখকে তুকানিয়ার প্রতিনিধিস্বরূপ বহন করিতে দেওয়া হইল। জাবারিয়া যখন এই বিশাল বংশদণ্ড হাতে করিয়া তাহার বাব্‌রী চুল দোলাইয়া "গাজীমিঞা সা মাদার দোম্, দম্‌চি মিঞা সা মাদার দোম্!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন তাহাকে যমদূতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তুকানিয়ার মামা জুমাসেখ দুইটি শ্বেতবর্ণের চামর আনিয়া এই ষোড়া বাঁশের এক এক মাথায় এক একটি আঁটিয়া বাঁধিয়া দিল। দেখাদেখি আরও অনেকে তাহাদের বাঁশের আগায় সাদা ও কালো চামর বাঁধিয়া লইল। বাজনার তালে তালে জাবারিয়া যখন নাচিতে লাগিল, তখন ঊর্দ্ধে দুইটী শ্বেত চামর এবং নিম্নে জাবারিয়ার কালো বাব্‌রী চুল দুলিয়া দুলিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। জাবারিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত আর সকলেও একসঙ্গে "গাজীমিঞা সা মাদার—"ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—সে শব্দ এক ক্রোশ দূরের লোকেও শুনিতে পাইয়াছিল।

এই সব শেষ হইলে, সকলে নিজ কাপড়ে বাঁশ কাঁধে ফেলিয়া বাজনার তালে তালে উদ্দামভাবে নৃত্য করিয়া করিতে পার্শ্ববর্ত্তী তিন-চারিখানা গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া তুকানিয়ার আস্তানায় ফিরিয়া আসিল। পথে কি হিন্দু কি মুসলমান, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দুইহাত যুড়িয়া মাদারের উদ্দেশে সেলাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ মাদারের নামে চিনি-বাতাসার শিরণি, কেহ-বা আরও বড় আকাঙ্ক্ষা লইয়া গায়রা, মুরগী পাখী বকরী ইত্যাদি মানত করিতে লাগিল।

সকলে যখন বটতলায় ফিরিয়া আসিল, বেলা তখন দ্বিপ্রহরের বেশী হইয়া গিয়াছে, লোকসংখ্যাও বোধ হয় এক সহস্রের উপর উঠিয়াছে। আমাদের অঞ্চলে মুসলমান-গ্রামে এইরূপ সমারোহের ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই কেহ ভক্তি, কেহ বিস্ময়, কেহবা কৌতূহলে অভিভূত হইয়া এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল। তুকানিয়া, তাহার মামা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে সমাগত সকল মুসলমানকেই বিশেষ যত্ন ও পরিতোষসহকারে পানভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার বাঁশ হাতে সেইরূপ প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হইল। নাচিতে নাচিতে কেহ কেহ পাগলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া প্রাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক একজন

এমন দশাপ্রাপ্ত হইয়া মাটীতে পড়িতে লাগিল, অমনি নৃত্য ও বাদ্য বন্ধ করিয়া তাহার পর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দশাপ্রাপ্ত লোকের উপর মাদার "ভর" করিয়াছেন বলিয়া কতজনে তাহার নিকট কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ পুত্র-কামনায়, কেহ বিত্ত-কামনায়, কেহ শত্রু-দমনার্থ, কেহ রোগনিবারণ প্রত্যাশায়, দশাপ্রাপ্ত লোকের নিকট নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। মাদার দেবতাও অমনি সেই দশাপ্রাপ্ত লোকের মুখ দিয়া কাহারও উপর ছাগল, কাহারও উপর ভেড়া, কাহারও উপর দুগ্ধ, কাহারও উপর চিনি, কাহারও উপর উপবাস প্রভৃতি দাবী করিয়া—সেই দাবী পূর্ণ করলেই—তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এইরূপ ভরসা দিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী যেরূপ একাগ্রতা ও তন্ময়তার সহিত দশাপ্রাপ্ত লোকদের প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিতে ছিল, তাহাতে ঐসব আদেশে কাহারও মনে যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা, অনাস্থা বা অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল, তেমন বোধ হইল না। জাবারিয়াই সকলের চেয়ে ঘন ঘন দশাপ্রাপ্ত হইতেছিল। সে এক একবার যেরূপ ভাবে হাতের বাঁশ ছুড়িয়া ফেলিয়া বিষম শব্দে মাটীতে সবেগে উলট-পালট খাইতেছিল, তাহাতে তাহাকে দেবতা কি অপদেবতা ভর করিয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর হইতেছিল। তাহার মুখ হইতে বহু পরিবারের বহু গুপ্তকাহিনী এবং কত জঙ্গলে কত পোঁতা টাকার সংবাদ শুনিয়া, উপস্থিত সকলে ভয়ে বিস্ময়ে উল্লাসে উদ্বেগে বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। বার বার এই ভাবে দশাপ্রাপ্ত হওয়াতে জাবারিয়ার শরীর ভগ্ন হইয়া যাইবার ভয়ে, অবশেষে মাদারের বাঁশ তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া অনু সেখের হাতে দেওয়া হইল। জাবারিয়াকে আর নাচিতে দেওয়া হইল না। অনুও তুকানিয়ার মত আমাদের বাড়ীতে কৃষাণের কাজ করিত। মাদারের বাঁশ হাতে লইবার পর সেও দুই তিনবার দশাপ্রাপ্ত হওয়ায় আমরা বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। অনু ও তুকানিয়া দুইজন কৃষাণই যদি কাজ বন্ধ করে, তবে আমাদের অসুবিধার সীমা থাকিবে না। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় নমাজের সময় উপস্থিত হওয়াতে সে দিনের মত নৃত্যগীত বন্ধ হইয়া গেল, কাজেই অনু অল্পে অল্পেই নিষ্কৃতি পাইল। তিন দিন এইভাবে নৃত্য, গীত ও পানভোজনের পর সে বৎসরের মত মাদারের পূজা শেষ হইল।

ক্রমাগত তিনবৎসর এই ভাবে তুকানিয়ার বাড়ীতে মাদারের পূজা চলিয়াছিল। প্রত্যেক বৎসরই উহারা কোথা হইতে এক একটি দো-ডালা বাঁশ সংগ্রহ করিয়া আনিত। এক বৎসরের বাঁশ পরবৎসরের উৎসবে ব্যবহার করা হইত না।

দেখিতে দেখিতে তুকানিয়ার নাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে তুকানিয়ার "ক"-অক্ষর হারাম ছিল; সেই তুকানিয়া এখন কথায় কথায় কোরাণের বয়ান বলিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দু ও হিন্দীতে যাহা-ইচ্ছা-তাহাই আওড়াইতে লাগিল। লোকের জ্বরে, প্লীহায়, ওলাউঠায় বসন্তে,

সে কত জলপড়া, তেলপড়া এবং টোট্‌কা টাট্‌কি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কত বন্ধ্যানারীকে সন্তান লাভের জন্য সে মাদুলী দিয়া আশান্বিত করিল, কত ভূত-গ্রস্তাকে ঝাড়ফুঁক দিয়া ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে লাগিল,—কত সর্পদষ্ট কত শৃগালকুক্কুরদষ্ট ব্যক্তিকে মন্ত্রপ্রভাবে নির্ব্বিষ করিল। মামলামোকদ্দমায় লোকে তাহার পরামর্শ লইতে লাগিল। বিদেশস্থ আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলামঙ্গল, অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সে মাটীতে দাগ দিয়া গণিয়া বলিতে লাগিল। কত জনের কত হারাণো গরু তাহার কেরামতে বাহির হইয়া পড়িল। এককথায় বলিতে গেলে ও অঞ্চলে সে একজন "কেষ্ট বিষ্ণু" হইয়া দাঁড়াইল। চারিপাশের পাঁচ ছয়খানা গ্রামে কোন বৃহৎ কার্য্যই তাহার পরামর্শ ব্যতীত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যদি তাহার ঝাড়ফুঁকের বলে কেহ আরাম হইত, তবে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত, যদি কেহ মারা যাইত, তাহা হইলে তাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে বলিয়া সকলে মনকে প্রবোধ দিত;—"তুকানিয়ার হাতে পড়িয়াও যখন বাঁচিল না, তখন আর কেহই উহাকে বাঁচাইতে পারিত না, পরমায়ু না থাকিলে ত তুকানিয়া কাহারও পরমায়ু বাড়াইয়া দিতে পারিবে না—" এই বলিয়া লোকে তাহার ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইত। তাহার গণনা সত্য হইয়া দাঁড়াইলে লোকে অবাক্ হইয়া যাইত, কিন্তু যদি কোন স্থলে তাহার ভবিষ্যৎ-বাণী সার্থক না হইত, তাহা হইলে লোকে সে দোষ নিজেদেরই কোনো ত্রুটির জন্য ঘটিয়াছে বলিয়া মানিয়া লইয়া তুকানিয়াকে নিষ্কৃতি দিত।

যশের সঙ্গে সঙ্গে ধনাগমও তুকানিয়ার মন্দ হইল না। ফকিরী লওয়ার সঙ্গেই তাহার কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, তাহারা দিবারাত্রি তুকানিয়ার আস্তানায় পড়িয়া থাকিত, এবং বাহির লোক তুকানিয়ার নিকট ঔষধ, মাদুলী বা ঝাড়ফুঁকের জন্য আসিলে নানা প্রকার বাক্যবিন্যাসে তাহার নিকট যত পারিত টাকা পয়সা আদায়ের চেষ্টা করিত। তুকানিয়া নিজে কখনও ঝুলি কাঁধে লইয়া ভিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু কেহ বাহির কাজে তাহার নিকট আসিলেই সে বলিত—"দেখিতেছ ত, আমি "ফকির," আমার কোন "ফিকির" নাই,—ভিক্ষাই আমার সম্বল—তোমরা সকলে মেহেরবানি করিয়া দিবে কিছু না দিলে আমার কেমন করিয়া চলে?" তাহার এই বিনয়ে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যথাসাধ্য দান খয়রাৎ করিত। ইহাতে তাহার যে বেশ ভালরকমেই দুই পয়সা আয় হইতেছিল, অল্প দিনেই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। ফকিরী লওয়ার অল্প দিন পরেই সে পূর্ব্ববাসস্থান ছাড়িয়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এক পুরাতন সম্ভ্রান্ত বংশের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা বাগান পুষ্করিণী সমুদায় ক্রয় করিয়া তথায় কয়েক খানা উৎকৃষ্ট টিনের চৌচালা ও দুচালা ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিল। এতৎব্যতীত গ্রামের কয়েকজন নিঃস্ব লোকের জমীজমা কতক ক্রয় করিয়া, কতক বন্ধক রাখিয়া অল্পদিনের মধ্যেই

একজন মস্ত মাতব্বর ব্যক্তি হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে তিন চারিখানা লাঙ্গলের যুক্ত বলদ এবং চারিপাঁচটি দুগ্ধবতী গাভীতে তাহার গো-শালার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী এবং কন্যার অঙ্গে কয়েকখানা সোনারূপার গহনাও দেখা দিল।

অকস্মাৎ দুইটি ঘটনায় তুকানিয়ার এই অশেষ সম্মান এবং বিমল যশঃপ্রভা মলিন হইয়া গেল।

আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা, বসন্ত বা ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন সংক্রামক রোগ এখনও আমাদের গ্রামে দেখা দেয় নাই। দুইদিকে দুইটি বিস্তীর্ণ মাঠ, তাহার মধ্যস্থলে এই ক্ষুদ্র গ্রাম। পরিষ্কার বাতাস ও রৌদ্র সর্ব্বদাই গ্রামময় খেলিয়া বেড়ায়। তুকানিয়া দর্প করিয়া বলিত, কেবল তাহারই প্রতাপে কোন আধি-ব্যাধি এই গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। লোকেও সেই কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিত। গত ১৯০৭ সালের কার্ত্তিক মাসে পাটপচা জল খাইয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, আমাদের গ্রামের পাশে হঠাৎ ওলাউঠা দেখা দিল। প্রতিদিন সেখানে বহুলোক মরিতে লাগিল। লোকে প্রাণের ভয়ে শ্মশানকালীপূজা, হরিসঙ্কীর্ত্তন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন-প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল বটে, কিন্তু দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। আমাদের গ্রামে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তুকানিয়া দিবারাত্রি আমাদের গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া কোরাণের এমন সব বয়ান চেঁচাইতে লাগিল যাহার অর্থগ্রহ করা স্বয়ং কোরাণকারেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সকালে সন্ধ্যায় তাহার "আজানের" শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখনও আমাদের গ্রাম ওলাউঠার প্রকোপ হইতে মুক্ত ছিল। তুকানিয়া এমনি ভাব দেখাইতে লাগিল যেন তাহারই কেরামতে এইরূপ হইয়াছে।

২৩শে কার্ত্তিক সকালবেলায় তুকানিয়া গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে গতরাত্রে ওলাউঠা-রাক্ষসী পালকী চড়িয়া কুলবধূর বেশে যখন আমাদের গ্রামে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন তুকানিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, এবং ওলাউঠা-রাক্ষসীকে এই গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। ওলাউঠা তাহাতে নিরস্ত না হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তুকানিয়ার সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বহু কষ্টে তুকানিয়া ওলাউঠা-রাক্ষসীকে পরাজিত করিয়া তাহার গলায় পা দিয়া চাপিতে থাকে, এবং আমাদের গ্রামে কদাচ প্রবেশ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ভাবেই তাহাকে দলন করিতে থাকে। ওলাউঠা তখন কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কুতুবপুরের দিকে চলিয়া যায়। সুতরাং এই গ্রামে আর কাহারও ভয়ের কোন কারণ নাই,—তবে কুতুবপুরের ভাগ্যে কি আছে, তাহা বলা যায় না।

তুকানিয়ার এই আশ্বাস-বাণীতে সকলেই

আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু সেই আশ্বাস অধিকক্ষণ উপভোগ করা অদৃষ্টে সহিল না। তুকানিয়া নন্দীদের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া পুনরায় যখন গত রজনীর সমর-কাহিনী নানাছন্দে বর্ণনা করিতেছিল সেই সময় দেখা গেল তুকানিয়ার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান (ছেরমান) হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইদিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া সকলের মুখেই একটা প্রবল উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। ছেরমান তুকানিয়াকে অবিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিল, কারণ তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা (তুকানিয়ার প্রথম পুত্র) কুরমানের ঘন ঘন দাস্ত ও বমি হইতেছে। তুকানিয়ার মুখখানায় কে যেন এক রাশ কালি ঢালিয়া দিল, চক্ষু যেন কপালে উঠিল। তাহার এত দর্প যে ভগবান এত শীঘ্র এমন ভাবে চূর্ণ করিবেন, একথা স্বপ্নেও সে মনে করে নাই। তাহার আরব্ধ সংগ্রামবর্ণনা আর শেষ হইল না,—সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী চলিয়া গেল। তাহার শ্রোতৃবৃন্দও পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে করিতে যে যাহার ঘরে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শুনা গেল তুকানিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র কুরমান এবং একটী দৌহিত্র ওলাউঠার প্রবল আক্রমণে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আর একটী কন্যাও মৃত প্রায়! তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যেও দুই-তিন বাড়ীতে কয়েকজন এই রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। তুকানিয়া এই আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া গেল।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ওলাউঠার প্রকোপ হ্রাস পাইল, কিন্তু তুকানিয়ার নষ্টগৌরবের আর পুনরুদ্ধার হইল না। এখন আর কেহই তাহার ভড়ংয়ে বিশ্বাস করে না,—কেহই আর তাহাকে ঝাড়ফুঁক বা টোট্‌কাটাট্‌কি ঔষধের ব্যবস্থার জন্য ডাকে না। সাধিয়া কাহারো বাড়ী গেলেও আর কেহ তেমন আদর যত্ন করে না। কাজেই তাহার আয়ও অনেকটা কমিয়া গেল। ফকিরী করিয়া এখন সে আর বিস্তর পাইত না, তদুপরি উপযুক্ত পুত্র এবং দৌহিত্রটি মারা যাওয়ায় চাষবাসের কাজেও আর পূর্ব্ববৎ সুব্যবস্থা রহিল না। বয়স অধিক হওয়ায় এবং শোকভারগ্রস্ত হইয়া পড়ায় সে নিজেও আর তেমন পরিশ্রম করিতে পারিত না। তুকানিয়া উল্লাসিয়া (হুলাসিয়া) সেখের বিধবা ভগ্নীকে নিকা করিয়াছিল। মুসলমানশাস্ত্রমতে না কি কুমারী কন্যা বিবাহ না করা পর্য্যন্ত পুরুষের প্রকৃত বিবাহ হয় না। তুকানিয়া এই শাস্ত্রবচনের ধূয়া ধরিয়া জীবনের এই অপরাহ্ণ কালে অকস্মাৎ এক কুমারীর পাণিপীড়ন করায় তাহার প্রথমা পত্নী অভিমানে নিজ পুত্রদ্বয়কে লইয়া পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে তুকানিয়ার আয় এবং প্রতিপত্তি আরও কমিয়া গেল।

অবশিষ্ট যেটুকু মানমর্য্যাদা ছিল, একটী দলিল রেজেষ্ট্রী করিতে গিয়া তাহারও শেষ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুকানিয়া লেখা পড়া কিছুই জানিত না, কিন্তু ফকিরী

করিবার পর সে মাদুলী দিবার সময় কাগজে কারাণের বয়ান বলিয়া যা-তা আঁচড় কাটিয়া মাদুলীতে পুরিয়া দিত। গ্রামে কোন দলিল প্রভৃতি লেখা হইলে, সাক্ষীস্বরূপ তাহাতে সে কতকগুলি দাগ কাটিয়া স্বাক্ষর করার ভাণ করিত। তাহার এই সব লেখা কোন্ ভাষার বর্ণমালায় লিখিত,—সে ভাষাটা কোথায় কাহার নিকট কবে সে শিক্ষা করিল, তাহা কেহ জানিত না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। যেন ফকিরী লইবার সঙ্গে সঙ্গেই তুকানিয়া এই বিচিত্র বিদ্যাটিও দৈববলেই লাভ করিয়াছে, সকলে এইরূপ মনে করিত। কাজেই সে বিষয়ে কেহ তাহাকে কখন কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করে নাই।

একে রোজগার নাই, তাহার উপরে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা হওয়াতে তুকানিয়া কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তদুপলক্ষ্যে তাহাকে কতক জমী রেহান দিতে হয়। সেই রেহানীখত রেজেষ্ট্রী করিবার সময় তুকানিয়া সবরেজিষ্ট্রারের সম্মুখে দলীলের পৃষ্ঠে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলে, সবরেজিষ্ট্রার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ ভাষা? তুকানিয়া এত বড় সাংঘাতিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলনা, কাজেই একটু থতমত খাইয়া বলিল—"উহা ফকিয়ানাগরী!" সবরেজিষ্ট্রার বাবু তুকানিয়ার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইহাতে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে; সেজন্য তুকানিয়া ঐ ভাষা কোথায় কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। তুকানিয়া বলিল, সে ঐ ভাষা তাহার পীর ফকির মহম্মদ সার নিকট শিখিয়াছে। এই পীর মহম্মদ সাকে দর্শন করা দূরে থাকুক, আমাদের দেশে কেহ তাহার নামও কখন শ্রবণ করে নাই। সবরেজিষ্ট্রার বাবু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি তিনখানা সাদা কাগজের টুকরায় স্বতন্ত্রভাবে তুকানিয়ার এক একটী স্বাক্ষর গ্রহণ করিলেন। তারপর দলিলের পৃষ্ঠের স্বাক্ষর এবং এই তিনটি স্বাক্ষর পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেন, কোনটির সহিত কোনটির মিল হয় না! তখনই তুকানিয়াকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হইবে বলিয়া সবরেজিষ্ট্রার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাহার সঙ্গীগণ সবরেজিষ্ট্রারের হাতে পায়ে ধরিয়া দলীল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া তুকানিয়াকে সে যাত্রা উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু এই দিন হইতে তাহার সকল সম্ভ্রম, সকল মর্য্যাদা, সকল গৌরব জন্মের মত অতলে তলাইয়া গেল।

এখনও তুকানিয়া গলায় সেই কাঁচের মালা এবং মাথায় সেই চিরপুরাতন বনাতের টুপী পরে বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে সে আর বড় বাহির হয় না। পুনরায় সে যে চাষা সেই চাষাই সাজিয়াছে। তবে এখন সে আর পরের বাড়ী চাকুরী করে না, নিজেই কোনমতে একখানা লাঙ্গল চালাইয়া কায়ক্লেশে সংসার চালায়।

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

কাজ্‌রী-পঞ্চাশৎ

(১)

(এল) শ্রাবণ ফিরে ভুবন পরে
এল মিলন্-ধাম,
সেই পাপিয়ার পিয়াস-হরণ
সেই যে ঘনশ্যাম !
বিধুর ধরার বন্ধু এল
(আজ) পূরবে মনস্কাম—
(দেখ) দিগ্বিদিকে চিক দিয়েছে
ঝুরন্ অবিশ্রাম !

(২)

(মেঘ) ভ্রমর হয়ে উড়ল ঝাঁকে
কী কালো ছায়া !
খুল্‌লে এখন ঘোম্‌টা কে বল্
বল্‌বে বেহায়া ?
(ও সে) দিনকে করে মিলন রাতি
এম্‌নি তার মায়া !
(তার) মনটি ভালো আলোয় ভরা
কালো তার কায়া !

(৩)

(আমরা) ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দেবো
বাদল-হাওয়াতে,
পাখীর সুখের জান্‌ব সোয়াদ
পিয়াল্ ছাওয়াতে !
গাইব পাখীর চাইতে মধুর
(ভুবন) ভরব গাওয়াতে,
খেল্‌বে মেঘে বিজুলী এই
চোখের চাওয়াতে।

(৪)

(আহা) লুকিয়ে ছিল ওই বিজুলী
কোন্ কাজল চোখে !
কালো মেঘের ডাক শুনে কি
উঠ্‌ল সে চম্‌কে !
কদম-ফুলে ভাব লাগে যে
(সেই) আলোর পুলকে
কার পানে কে চায় লুকিয়ে
জান্‌বে কি লোকে ?

(৫)

(ও কার) মিলিয়ে গেল নীলাম্বরী
নিবিড় বাদলে !
শ্যামল বনে সঘন সাঁঝে
মেঘের কাজলে !
(ওগো) কোন্ তমালে ঝুল্‌নো তোমার ?
(বল) কোন্ মালা গলে ?
(তোমায়) সৌরভে আজ চিন্‌ব গহন
রসের অতলে !

(৬)

(ওগো) কোন্ বনে আজ বাঁধ্‌লে দোলা
গহন আঁধারে !
তোমার গলার মালা কোথায়
গন্ধ বিথারে !
(শুধু) গন্ধে তোমায় পাই যে নাগাল
(নীরব) ঝুলন্-সাঁতারে
(তোমার) রূপ-বিজুলি ডুব দিয়েছে
বাদল-পাথারে !

(৭)

(তুমি) আস্‌ছ পথে ভুঁই-চাঁপাতে
ভুবন সাজায়ে !
বাদল-ধারায় তাল মিলায়ে
(মৃদু) নূপুর বাজায়ে !
হাস্‌ছ তুমি জুঁই চামেলির
পরাণ বাঁচায়ে !
আস্‌ছ তুমি পেখম-খোলা
ময়ূর নাচায়ে !

(৮)

(সখী) যখন কেবল শ্রবণ চলে
নয়ন না চলে—
সেই শ্রাবণের আমল এখন
এ রঙ্-মহলে।
(আজ) খোস্ গো কেবল দাদুর কী কয়
(আর) ঝিল্লী কি বলে,
একলা পাখী কী গায়—বাদল-
ধারার বিরলে !

(৯)

(আজ) কুঞ্জ-পথে সবুজ কানাৎ
নতুন কে দিলে !
মেঘ্-ডম্বরী রঙের তাঁবু
(ধারা-) জলের ঝিল্‌মিলে !
আজ বেরুবার নেই মানা আর
সব সখী মিলে,
বাঁশীর সুরে সুর বাঁধা আজ
বাসর নিখিলে।

(১০)

(আজ) নূতন শাখে বাঁধ্ তোরা সই
নূতন হিন্দোলা,
আজ্‌কে হাওয়ার নূতন দুয়ার
হল যে খোলা !

(নব) নীপের দীপে কেয়ার ধূপে
আজ ভুবন ভোলা,
নূতন বঁধুর নূতন মধুর
কাজ্‌রী উতলা !

(১১)

(ওলো) ঘোম্‌টা খোলা সরম ভোলা
আজ বিধির লেখা,
(প্রথম) ভয়-ভাঙার পুলকে প্রাণে
ধ্বনিছে কেকা !
কূল ভেঙেছে যমুনা আজ
(তার) নাই সীমা-রেখা,
(শুধু) ঘনঘটার ঘোম্‌টা রেখে
চল্ পথে একা !

(১২)

(ওগো) এমন দিনে উদাস মনে
কে ঘরের কোণে ?
(এস) আপনাকে আজ লোফালুফি
করব পবনে !
বুক দিয়ে আজ বিঁধব বাতাস
(আকাশ) ঠেক্‌বে চরণে
কিশোর তনুর সকল অণু
ভরবে শ্রাবণে !

(১৩)

(আজ) যে দোলাতে দুজন কুলায়
সেই দোলা বাঁধিস্,
বন্ধু বিনে, নইলে যে হায়,—
ঠেক্‌বে সবই বিষ !
মিশ্ কালো ওই মেঘে মিশে
(আজ) ঝুলন্ অহর্নিশ
বিজুলী ডোর ধরবে দোলার,
উথ্‌লাবে হরিষ !

(১৪)

(আজ) বাদল রাতির কাজল পাঁতি
এল কার তরে !
পৌঁছে দিল পূবের বাতাস
কাহার অন্তরে !
সজল আঁধার কী বোল্ বলে
(আজ) বিভোল্ অম্বরে !
(হায়) বাঁশীর পাগল বেরিয়ে প'ল
বাজ মাথায় ক'রে !

(১৫)

(আজ) গগন 'পরে থর দিয়ে কে
গড়লে এ মৌচাক !
কে খোঁচালে হঠাৎ !—ক্ষেপে
ছুট্‌ল কিসের ঝাঁক !
ছুট্‌ল রাগে বুঁদ হয়ে সব
(চাকের) দুয়ার রেখে ফাঁক !
ঝুঁঝিয়ে ঝরে রসের ধারা
অবাক গো অবাক !

(১৬)

(ওই) মেঘের দেশে রাত হ'ল, ছাখ্
হাওয়ায় লাগে দুল !
গুগ্‌গুলু উগারে তরল
অপ্‌রাজিতার ফুল !
নীল কমলে ঢাক্‌ল ডানায়
কালো ভ্রমরকুল
(যেন) সাপের শেযে গা ঢেলে কে
এলিয়ে দিল চুল !

(১৭)

(ও কে) দোল্ দিল মোর মনে, ওগো !
তাই দোলে ভুবন !
শ্রাবণ দোলে পবন দোলে
দোলে সকল বন !
হৃদয়-দোলায় চল্‌ছে গো কায়
আনন্দ-ঝুলন !
ঝুলন-মাতাল রাগ-রাগিণী
কাজ্‌রী-নিমগন !

(১৮)

(এবার) ফুট্‌ল কিনা কদম বনে
খবর রাখি নে,
শ্রাবণী ফুল ফুটেছে মোর
মনের বিপিনে !
(বঁধু !) আমরা হলাম পুলক-কদম
(তোমার) সোহাগ-সুদিনে,
(মোদের) পরাগ-ভরা এই অনুরাগ
নাও তুমি জিনে !

(১৯)

(গেছে) ঝুল্‌নো বেঁধে রাখাল-ছেলে
সকাল বেলায় আজ,
সেই দোলাতে দুল্‌তে হবে
তোমায় রাখাল-রাজ !
(মোদের) রাই-রাজা পরাবে তোমায়
(আপন) মাথার ফুলের তাজ,
(আজ) হিন্দোলে হিল্লোলে কেবল
টল্‌বে সকাল সাঁঝ।

(২০)

(মোদের) দুপুর বেলাই ঝুলন্ খেলা
আইন্ মানিনে,
(আজ) ঘনঘটাই ঘোম্‌টা যে, তাই
ঘোম্‌টা টানিনে।
কে বিদেশী যায় যে পথে
আমরা জানিনে,
যে খুসী সে হাসুক হাসি
আমল আনিনে।

(২১)

(ওকি !) দোলন্-চাঁপা দুল্‌ছে হাওয়ায়
দোলন্-চাঁপার ফুল !
(তার) দোলন্ দেখে ঝুম্‌কো জবা
দুল্‌ছে গো দোদুল্ !
তপ্ত দুধের মাখন তনু
(তারে) দেখ্‌লে যে হয় ভুল !
মুখটি কচি কাঁচা-দুধের
ননীর সমতুল।

(২২)

(আমরা) ভালবাসার রূপ দেখিনি
(শুধু) নাম শুনি গো তার।
শুনতে যে পাই আওয়াজ বাদল-
ধারায় অনিবার।
চোখ্ বুজে তার ডাক শোনা যায়
সাত সাগরের পার,
(যার) পরশ পেলে প্রাণ নাকি হয়
গুলাবে গুলজার !

(২৩)

(আজ) তোমার তরে এনেছি এই
সন্ধ্যামণি ফুল,
এই দোপাটি হবে তোমার
দুটি কানের দুল ;
চরণ-পীঁড়ি হবে রাধা-
পদ্ম এ রাতুল,
রায়-বেলে সই সাজাব আজ
তোমার কালো চুল।

(২৪)

(আজ) ঝুলন-দিনে ফুল গহনা,
সোনা নামঞ্জুর !
কঠিন সোনা আজ্‌কে মানা
আজ রাখ তায় দূর।
ফুলের কাঁকণ ফুলের মুকুট
(আর) ফুলের রতনচুড়,
ফুলের নূপুর বাজবে নীরব
ভরবে হৃদয়পুর।

(২৫)

(ওগো) তোমরা চোখে কাজল দিয়ো
হরিণ-লোচনা !
ওই কাজলে আমরা করি
কাজ্‌রী রচনা।
ওই কাজলে হয় গো সজল
বাদল-জোছনা,
ওই কাজলে উজল হিয়া
লুকায় শোচনা।

(২৬)

(আজ) অন্ধকারে গন্ধফুলের
হোলি খেলার ধূম !
মাদল বাজে বাদল-মেঘে
নাইক চোখে ঘুম।
পিচকারী সব ভরছে কেয়া
(আর) কদম সে কুঙ্কুম,
গন্ধে রঙীন্ অঙ্গে হাওয়া
সঞ্চরে নিঝুম !

(২৭)

(তোমরা) দুলিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দিলে
রেশ্‌মী হিন্দোলা !
ঝুম্‌রো বটের ঝুরি মোদের
ঝুলনের ঝোলা !
রাজার মেয়ে তোমরা সবাই,
(মোরা) রাখাল মন্-ভোলা !
অ-বোলা কে কয় ? তোমাদের
ভারি বোল্‌বোলা।

(২৮)

(আজ) ঝামর হাওয়ায় তরল মোতি
ফিরতেছে লীলায়!
তাই বুঝি গো মুক্তোঝুরি
তোমার তনু ছায়।
কি দিয়ে কিশোরী! গোরী!
(বল) মুছাই, হায়, তোমায়?
(শুধু) আঁখির পাতা বুলাই, সখী!
তোমার গোরা গায়।

(২৯)

(আহা) এম্‌নি ভিজে আস্‌তে কি হয়
ও বাঁশীর পাগল!
(তোমার) সোনার গায়ে মুক্তোগুঁটি
ফুঁটিয়ে পড়ে জল।
ভয় কি গো নেই দেয়ার ডাকে?
(এই) বিষম ঝড় বাদল!
(ওগো) ভালবাসার এম্‌নি অভয়—
এম্‌নি কি তার বল!

(৩০)

(ওগো) তোমার দোলা কদম-শাখে,
আমার তমালে;
কাছে-কাছেই চল্‌ছে দোলন্
(তবু) নাইক নাগালে!
ওই আঁচলের আভাস লাগে
এ মোর কপালে!
(তোমার) চুলের রাশি নিশাস ফেলে
নিশির আড়ালে!

(৩১)

(আজ) তোমার আমার মন মিলেছে
মনের মালঞ্চে!
কে জানে আজ দুনিয়া সমাজ
পড়শী পঞ্চে?
অঞ্চলে বেঁধেছি মোরা
(আজ) সাত রাজার ধন যে!
কাঞ্চনে নাই রুচি, চরণ
মাণিকের মঞ্চে!
(আজ) তোমার আমার ফুল ফুটেছে
মনের মালঞ্চে।

(৩২)

(দোলা) দুল্‌ল এবার বাদল হাওয়ায়
হারিয়ে দিগ্বিদিক!
দুল্‌বে কে, আর কে দোলাবে
(তার) নাই কিছুরই ঠিক!
ভয়-ভোলা মন ভুল্‌ছে ভরম
আজ সরমে ধিক্;
(আজ) যে পারে সে দিক ছাড়িয়ে,
যে পায় লুফে নিক্!

(৩৩)

(আজ) ডুব-সাঁতারে যায় কে চুপে
হারা পূর্ণিমায়!
গহন মেঘের ওপার দিয়ে
স্বপন-সীমানায়!
চাঁদ্! যেয়োনা অমন করে
(তুমি) পালিয়ো না গো, হায়,
(আজ) আনন্দেরি গন্ধরাজে
পূজ্‌ব যে তোমায়।

(৩৪)

(আজ) কাজল-লতার পাতার 'পরে
ভ্রমর বুলেছে!
কাজল আঁখির জল্‌সাতে মোর
কাজ্‌রী খুলেছে!
চন্দনী পরশে হাওয়ার
(আজ) ভুবন ভুলেছে,
হিন্দোলে আনন্দ ঘন
ছন্দে দুলেছে!

(৩৫)

(ওগো) আজ কোথাকার ঢেউ লেগেছে
সারা গননময়!
সাগর চুরি করেছে রে,
পুকুর চুরি নয়।
চল্‌ছে যখন এমন চুরি
(ওগো) তখন কিসের ভয়?
(আজ) চোরা চোখে চাইলে, ধরা
পড়বে না নিশ্চয়।

(৩৬)

(বল) শ্রাবণ! তুমি শিখবে কবে
নয়ন বাঁকানো?
ভুল্‌তে তুমি বসেছ চোখ
মেলে তাকানো!
হিম যে তোমার নাকের নিশাস
(তোমায়) যায় না জাগানো,
পান্তা বাতাস নেবু-ফুলের
গন্ধ মাখানো!

(৩৭)

(আমায়) কাজ্‌রী গাথার কাজল-লতা
দিব কার করে!
কার দু'আঁখির আপ্‌নি-কাজল
আঁখির ঘুম হরে!
(কার) পায়ের পাতা ছন্দ রচে
(বাদল) মেঘের ডম্বরে!
কার পুলকে নীপ-মুকুলের
অঙ্গ শিহরে!

(৩৮)

(আমায়) সকল ভুবন দোল্ দিলরে
জনম জনমে!
দোল দিল আনন্দ-বিষাদ
শঙ্কা সরমে!
দোল্ দিল কামিনী-কুঁড়ি
(মোর) গোপন মরমে!
সূর্য্য-তারার নাগর-দোলার
ছন্দেরি সমে!

(৩৯)

(ওগো) বাদল-মেলার শাঙন-বেলার
আর কত বাকী!
(আমায়) দোল্ দিয়ে গিয়েছে সে তাই
দুল্‌ছি একাকী!
দুল্‌ছে দোলা, ভুল্‌ছে না মন,
মিছাই মুখ ঢাকি,
(হ'ল) আঁখির লোরে ঝামর হাওয়া
মেল্‌ব কী আঁখি!

(৪০)

(ও তোর) মানের দোলা দুল্‌ছে সে কই?
দুল্‌ছে মন্থরে!
ডুরি যে তার গেছে কেটে
অলখ্ মন্তরে!
(তোর) একলা-গরব আঁখির জলে
(হায়) আজ্ যে সন্তরে।
যে কেঁদে যায় কাঁদিয়ে সে, হায়,
যায় জনম তরে।

(৪১)

(ও সে) স্বপ্নে আমার এসেছিল
কুঞ্জে স্বজনী!
ছিল সে মোর কুসুম-শেষে
সকল রজনী।
ছিনিয়ে হঠাৎ কে নিল তায়
(হায়) কিছুই না জানি!
(শুধু) শুন্‌ছি জেগে দেয়ার হা হা
আর গরজনি।

(৪২)

(মরি) আজ্‌কে কারে দেব্‌তা ডাকে
ডাকে গো দেয়া !
দিনের আলোয় ছায় যে উঁকি
আকাশ-আলেয়া !
আজ যমুনার জমাট নীলে
(ও কে) জমায় শেষ খেয়া !
গায় কাঁটা ছায়, শিওরে ওঠে
কদম আর কেয়া !

(৪৩)

(আজ) জীবন মরণ ঝুলন খ্যালে
দোল দিয়েছে কে !
সুধা-সুরা-সোম-ধুতুরার
ঢেউ পিয়েছে কে !
(আজ) বাদল ধারায় জ্যোৎস্না জড়ায়
(হায়) সে রঙ্গ দেখে !
ঝুলন ঝোলে ঝাণ্ডা তালের
ঝঞ্ঝাতে বেঁকে !

(৪৪)

(হায়) অশ্রুজলের শ্রাবণ দেখে
বন্ধু ! কোথা যাও ?
দাঁড়াও আবার ঝুল্‌নো বাঁধি
রথ রাখ, দাঁড়াও !
মাধব ! ঐ মাধবী লতার
কুঞ্জ পানে চাও !
(বারেক) গাও বাঁশীতে পাগল গানের
শেষ কলিটি গাও।

(৪৫)

(তুই) উজান বয়ে চল্ যমুনা !
চল্ অনুরাগে,
চল্ নিয়ে ফের তুইরে মোদের
বঁধুর সোহাগে।

চোখের কাজল কানের সোনা
(তোরে) দিব যা' লাগে,
কাজল-গাথা আঁধার রাতে
গাইব তোর আগে।

(৪৬)

(এবার) হিন্দোলা হায় বন্ধ আমার,
বন্ধু মথুরায় ;—
বাদল-নিশির আঁধারে মোর
নাইরে প্রদীপ, হায়।
(তবু) বাতাস আমায় দোল্ দিয়ে চাক,
(ফুল) সৌরভে ভোলাক,
কাজ্‌রী সুরে নয়ন ঝুরে
পরাণ লহরায়।

(৪৭)

(এবার) কুটিলা ! তোর ঝুলন ঘরে,
(আর) করিস্‌নে তুই রোষ ;
কুব্জা হ'ল দোলার বিধি,
তোর হ'তে কি দোষ ?
রাই-কমলের দিন গিয়েছে,
(তার) শুকায় হৃদয়-কোষ ;
(এখন) কুবুজা-কুটিলার আমল,
আর কিসের আফ্‌সোষ !

(৪৮)

(আমার) নয়ন-জলের শ্রাবণ এল,
বন্ধু এল না !
ঝুলন-দোলায় রইল পরাণ
(সুখে) দুল্‌তে পেল না !
হায় ! মথুরা এতই কি দূর
খবর গেল না !
যমুনা কি সাগর হ'ল
অশ্রুতে লোণা !

(৪৯)

(তুমি) মোহন বাঁশীর মধুর ডাকে
ডাক্‌লেনা, হায়, আজ ;
ডাক দিয়েছে বন্ধু ! তোমার
বাজের পাখোয়াজ !
(আমার) ভাব-পদ্মের ফুটল কি ফুল !
(মোর) টুট্‌ল গো ভয় লাজ !
(তোমার) আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলাম
(আমি) কই গো হৃদয়-রাজ !

(৫০)

(হায়) ঝুম্‌কো-ফুলের ঝালর-গাঁথা
ঝুলন অবসান,
কোথায় প্রেমী ? কোথায় প্যারী ?—
ভুবন ব্যবধান !
শূন্য দোলা দুল্‌ছে তবু,
চল্‌ছে তবু গান !
(তবু) বাঁধছে গোকুল-গোলোক সেতু
কাজ্‌রী অফুরান্ !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগ। ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যা, সুতরাং ব্রাহ্মণভাগ যে মন্ত্রের পরই প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্রাহ্মণভাগে উত্তরকুরু সম্বন্ধে কোন কথা থাকিলে তাহা অবশ্যই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এতৎপ্রবন্ধে আমরা সেইরূপ একটী প্রমাণেরই আলোচনা করিব।

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণের" একস্থলে উত্তরকুরু সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

"তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কেচ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তে-ঽভিষিচ্যন্তে। বিরাড়িত্যেতান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষতে॥"

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮।১৪)

"হিমবানের অপরপারে উত্তরদিকে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র নামক জনপদ, তথাকার লোকেরা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাড় বলে।"

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে উত্তরকুরু ও উত্তর-মদ্রের রাজগণের যে বিশেষ উপাধি 'বিরাট্' ছিল তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে "মনু" নামধেয় প্রথম সমাজ ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা অধিরাজগণই বিরাট্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা—

"গতেষু তেষু সৃষ্ট্যর্থং প্রণামাবনতামিমাম্।
উপযেমে স বিশ্বাত্মা শতরূপামনিন্দিতাম্॥
সম্বভূব তয়া সার্দ্ধমতিকামাতুরো বিভুঃ।
সলজ্জাং চমকে দেবঃ কমলোদর মন্দিরে॥
যাবদব্দশতং দিব্যং যথান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
ততঃ কালেন মহতা ততঃ পুত্রোঽভবন্মনুঃ॥
স্বায়ম্ভুব ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িতি নঃ শ্রুতম্।
তদ্রূপগুণসামান্যাদধিপূরুষ উচ্যতে॥
বৈরাজ্য যত্রতে জাতা বহবঃ শংসিতব্রতাঃ।
স্বায়ম্ভুবা মহাভাগাঃ সপ্ত সপ্ত তথা পরে॥
স্বারোচিষাদ্যাঃ সর্ব্বেতে ব্রহ্মতুল্যা স্বরূপিণঃ।
ঔত্তমি প্রমুখাস্তদ্বদ্ যেষাং ত্বং সপ্তমোঽধুনা॥"

ইতি মাৎস্যে ৩য় অধ্যায়ঃ

"তাঁহারা সৃষ্টকার্য্যার্থ প্রস্থান করিলে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা সেই প্রণামাবনতা অনিন্দিতা শতরূপার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত অতীব কামাতুর হইয়া তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি প্রাকৃত-জনের ন্যায় সেই লজ্জিতা ললনার সহিত শতবর্ষ যাবৎ কমলগর্ভে থাকিয়া রমণ করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। এই পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত। আমরা শুনিয়াছি ঐ মনুই বিরাট্ পুরুষ এবং তদনুরূপ গুণসমূহযোগে ইনি অধিপুরুষ নামেও নির্দ্দিষ্ট। অপর যে সপ্ত সপ্ত ব্রতপরায়ণ মহাভাগ্যশালী বহু মনু ব্রহ্মা হইতে জাত হইয়াছেন তাঁহারাও তথায় বিরাড্ পদবী লাভ করিয়াছেন। স্বারোচিষাদি ও ঔত্তমি প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্ম স্বরূপ। অধুনা তুমি তাহাদের সপ্তম মনু।"

এই "পুরাণ" বর্ণনার সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত 'ব্রাহ্মণ' বর্ণনার তুলনা করিলে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রের "বিরাট্" আখ্যা যে মনুগণই প্রথম প্রাপ্ত হন তৎসম্বন্ধে অল্প সন্দেহই থাকে। উল্লিখিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অপর একস্থলে উত্তরকুরু "দেবক্ষেত্র" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"ঐ দেশ (উত্তরকুরু) দেবক্ষেত্র, মর্ত্ত্য (মনুষ্য) উহা জয় করিবার অযোগ্য।" অষ্টম পঞ্চিকা, ৯ম খণ্ড ৪০শত অধ্যায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ—৬৬৪ পৃষ্ঠা।

মনুসংহিতায় আমরা প্রথম আর্য্যাধিষ্ঠানকে "দেবনির্ম্মিত দেশ" রূপেই নির্দ্দেশিত দেখিতে পাই যথা—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

"সরস্বতী দৃষদ্বতী এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া বলা হইয়া থাকে।"

এই প্রকারে "দেবস্থান" রূপে ব্রহ্মাবর্ত্ত উত্তরকুরুরই সহিত অভিন্ন হইতেছে।

অগ্নিরূপী ব্রহ্মা এইদেশে প্রথম উপাদিত হইতেন বলিয়াই তদনুসারে ইহার "ব্রহ্মাবর্ত্ত" নাম হইয়াছিল। আমরা প্রথম বিরাড্ রে মনুর নাম পুরাণে প্রাপ্ত হইয়াছি তিনিও ব্রহ্মার পুত্র। সেইজন্য ব্রহ্মার "ব্রহ্মা" নাম হইতে তাঁহার নাম "স্বায়ম্ভুব মনু" হইয়াছে। ইহা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু রে ব্রহ্মাবর্ত্ত বা উত্তরকুরুতেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রথম 'বৈরাজ্য' পদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মনু যে আর্য্যদিগের কেবল আদি রাজা ছিলেন তাহা নহে; পরন্তু তিনি তাঁহাদিগের আদি পিতাও ছিলেন। তাহাতেই মনুর সন্তান বলিয়াই সমগ্র মানবজাতিই 'মনু,' 'মনুষ্য,' 'মানুষ,' 'মনুষ্য' 'মানব' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় ভাষায় এই সম্বন্ধের ইতিহাস যেরূপ সুস্পষ্টাক্ষরে সংরক্ষিত হইয়াছে এরূপ আর অন্য কোন দেশের ভাষায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মনুর সহিত ভারতীয় আর্য্যদিগেরই সবিশেষ ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকারে মনু ভারতীয় আর্য্যদিগের আদি পিতা ও উত্তরকুরুর আদি রাজা বলিয়া যখন প্রতিপন্ন হইতেছেন তখন তৎসঙ্গে সঙ্গেই যে ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুতে আদিবাসও প্রতিপাদিত হইতেছে তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন করে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বর্ষা-নিশায়

আজিকে মেঘেতে ঢাকা নিশীথ নির্জ্জন,
বায়ু কোথা দূর দূরে যায় নিশ্বসিয়া—
যূথিকার মৃদু গন্ধ করি আহরণ ;
অন্ধকারে বনভূমি ওঠে মর্ম্মরিয়া।

তারাহীন দীপ্তিহীন আঁধার নিশায়,
নিদ্রার কোলেতে মগ্ন নিখিল নিশ্চল ;
রহি রহি গরজিয়া মর্ম্মবেদনায়
ঢালিছে নীরদ রাশি ঘন অবিরল।

আজ তুমি কত দূরে ? উঠিছে ভাসিয়া
দুর্লভ মূরতি তব হৃদি-দরপণে !
সুদূর দূরের পানে চাহিয়া চাহিয়া—
ঝরে যায় অশ্রু শুধু এই নিরজনে।

দু'জনের মাঝে আজি অসীম অপার—
ফেনিল সাগর করে উন্মাদ নর্ত্তন !
শুনিনা তোমার বার্ত্তা—পশে না গো আর
এ পারে ;—কেবলি শুনি সিন্ধু-গরজন !

নয়নের সুখ-আলো হরণ করিয়া,
হৃদয়ের মাঝে সৃজি অপার দূরতা —
গিয়াছ চলিয়া তুমি ! তবুও ধরিয়া
রাখিবারে চাহি আমি ; এ কি এ মূঢ়তা !

যাও তবে, ওগো চিরবসন্ত জীবন,
যথা ফুটে প্রীতি-ফুল্ল পুষ্প রাশি রাশি,
যথা বহে ফুলগন্ধী মলয় পবন,
যথা আছে চির সুখ, চির মধু হাসি।

তুমি যাও সুখ যথা ; আমি থাকি তবে
আমারি আঁধার-ভরা হৃদয়ের তলে
চির-সুপ্ত ;—দীপসম স্মৃতি জেগে রবে
আঁধার শিয়রে মোর ! যাও তবে চ'লে !

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী।

সমালোচনা

আকাশ-প্রদীপ। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, নির্ম্মল কুটীর, ঢাকা। ঢাকা, ইষ্টবেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লেখকের বক্তব্য কি, ঠিক বুঝা গেল না—দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। আমাদের নিতান্তই হেঁয়ালির মতই ঠেকিল। গ্রন্থ খানি নাটকীয় ধরণে লিখিত। মাঝে মাঝে কবিত্ব আছে, তবে তাহার উপর চকিতে আবার লেখক হেঁয়ালির জাল চাপা দিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল।

আহতের সদ্য সেবা। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, এম, এস, এম-আর-স্যান্-আই,এম-আর-আই-পি-এচ্ প্রণীত The Indian Manual of First Aid নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এই মূল গ্রন্থখানির অনুবাদ বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল—কেবল বঙ্গভাষায় ইহার কোন অনুবাদ ছিল না। গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, প্রত্যেক গৃহে পঞ্জিকার মতই স্থানলাভের যোগ্য। লেখক ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। সহসা শারীরিক কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে ডাক্তার ডাকিবার পূর্ব্বে বাড়ীর লোক আহতকে কতখানি সাহায্য করিতে পারেন, এ গ্রন্থে তাহারই বিশদ আলোচনা আছে। তবে সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে সকলকেই সতর্ক করা হইয়াছে, যেন কেহ চিকিৎসার চেষ্টা না করেন—কারণ তাহা কেবল শিক্ষিত ডাক্তারেরই অধিকারভুক্ত। গ্রন্থখানি এদেশের উপযোগী করিয়া বেশ ঘরোয়া ধরণে লিখিত। তবে বঙ্গানুবাদে ভাষার দোষ বড় বেশী রহিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে স্থানে স্থানে লেখকের বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই। লেখক কোন পা[illegible] লইয়া ইহার ভাষা শুধরাইয়া [illegible] আশা করি. দ্বিতীয় সংস্করণে [illegible] নিবারিত হইবে। এত-বড় [illegible] সরলতা থাকা নিতান্ত দরকার। [illegible] ক্ষুদ্র, অনায়াসে পকেটে রাখা [illegible]

তাই তাই—শ্রীযুক্ত [illegible] প্রণীত। কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রা[illegible] মূল্য ছয় আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্য [illegible] "সাবিত্রী" যেমন আদর লা[illegible] বিশ্বাস এই গ্রন্থও তেমনি আ[illegible] শিশুদের জন্য লিখিত ছড়া[illegible] ছড়া নয়, কার্ত্তিকবাবুর [illegible] দুই চার দশ লাইনের মধ্যে অ[illegible] এই কবিতার টুকরাগুলি [illegible] করিবে এবং তাহাদের কল্পনা[illegible] আবছায়ার মত দিবারাত্র ঘুরি[illegible] সেগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিবে, [illegible] কল্পনারও সন্ধান পাইবে। [illegible] রঙ্গিন—বহুবর্ণে রঞ্জিত ছবি [illegible] খুব চমৎকার।

ফুলঝুরি—শ্রীযুক্ত [illegible] প্রণীত। কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদা[illegible] মূল্য ছয় আনা। এখানি [illegible] ইহা শিশুজীবনের কবিতা এবং [illegible] ভরপুর। গঠন পরিপাট্যে এই [illegible] শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সঙ্গে একাসনে [illegible] পূজার বাজারে কার্ত্তিকবাবুর [illegible] প্রলুব্ধ করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, [illegible] হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



সুজাতা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

আশ্বিন, ১৩২২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

জীবন মরণ

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে
মোর কানে কানে
রজনী ক'বে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে' যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে' চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালো ফুল

সে কোন্ পাহাড় তা আমি জানিনা ; কিন্তু এটা আমার মনে পড়ে দেবদারু-বনের ফাঁক দিয়ে একটা বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে সেই পাহাড়ের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আমার গায়ে এসে লাগ্‌ছে—আর ছোট একটি চীনের গাম্‌লায় আমাকে নিয়ে একটা পাহাড়ী-মেয়ে বাজারে বেচ্‌তে এসেছে।

সেখানটায় সেদিন ফুলের বাজার বসেছিল ;—লাল নীল হল্‌দে সাদা সে কত ফুলগাছ! সাহেব বিবিরা সেই সব ফুলগাছ কিনে নিয়ে ঘরে ফিরছিল ; কেবল কেসাংফু—কালোফুলের গাছ—আমাকে কেউ নিতে চাইলে না।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ; পাহাড়ের গা বেয়ে সাদা কুয়াশা থেকে থেকে জোরে এক পস্‌লা বৃষ্টি নেমেছে ; দু-আনায় এক বাঙালীর ঘরে আমাকে বেচে পাহাড়ী মেয়েটা ভিজতে ভিজতে চলে গেল।

আমার কালো ফুল তখনো ফোটেনি।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে। কল্‌কাতার একটা অন্ধকার গলির ছোট বাড়ির ছাদের আল্‌সেয় তারা আমাকে এনে রেখেছে। কারো আদর পাইনে, কারো যত্ন পাইনে ; কেবল বাবুদের ছোট মেয়ে রাণী আমাকে নিয়ে খেলা করে, প্রত্যহ জল দিয়ে আমার গা ভিজিয়ে দেয় আর তার বড় বড় দুটি কালো চোখ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে থাকে! সে কি ভাবে তা সেই জানে, কিন্তু তার

কালো চোখের আলোতে আমার সমস্ত প্রাণটা যে একটা কালো ফুল হয়ে ফুটে ওঠবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করছে সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি।

হঠাৎ একদিন প্রকাণ্ড একটা অপূর্ব্ব কালো ফুল চয়ে দেখা দেবার উৎকট লালসা আমাকে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে বাড়িয়ে তুলেছে। মানুষের এমন হয় কি? জানিনে কেন, এবছরে সমস্ত বসন্ত কালটা ধরে গুটির ভিতরে গুটিপোকার মত আপনার ভিতরে আপনি আমি একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে আছি! চারিদিকে আমার যখন হাওয়া বইছে, পাখী গাইছে, আমার আশপাশের ছাদের টবে সব গাছগুলো অজস্র নূতন নূতন পাতা খুলছে, ফুল ফোটাচ্ছে তখন আমি কেবল এ সকলের সঙ্গে আড়ি দিয়ে রয়েছি—সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট।

লোকে আমায় দেখে আজকাল বলছে রাণীর গাছের মরণদশা উপস্থিত! কিন্তু আমি জানি আমি কালোফুল ; বেল চাঁপা কুন্দ করবীর মত জীবনের ঐশ্বর্য্য নানা-বর্ণে নানা ছন্দে নিত্য ফুটিয়ে তোলা আমার কাজ নয়, জীবনের শেষদিনটিই হচ্ছে আমার ফোটবার দিন—যেদিন আমার সকল প্রাণ তার সমস্ত শোভা সমস্ত রং এক-করে-নিয়ে দেখা দেবে—কালো-ডানা প্রকাণ্ড একটি প্রজাপতির মত—ভোরের অন্ধকারে চুপি চুপি।

কোন্ সুদিনে যে রাণীর বিয়ের ফুল ফুটলো, কবে বাঁশী বাজলো, বর এলো ফুটন্ত গোলাপের মত রাণীকে তারা এখান থেকে সেখানে তুলে নিয়ে গেল তা আমি জানিনে। আমার বর তখন আমার দিকে আস্‌ছিল বহু দূর থেকে, আমি তার আসার পথে সমস্ত মন পেতে দিয়ে শুনছিলেম—বুকের মাঝে তারই বরযাত্রার বিপুল আয়োজনের ঝম্‌ঝম্ ঝিম্‌ঝিম্ ধ্বনিটিমাত্র!

* * * *

শেষে শীতের হাওয়ায় যেদিন আমার প্রেমের পাল ভরে উঠেছে, সারারাতের অবিশ্রান্ত শিলাবৃষ্টি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে—আমাকে বেঁধে রেখেছিল যে চিত্রবিচিত্র চীনের টব্ সেটি—সেই দিন অকালের বাদলে আর ঝঞ্ঝাবাতের শঙ্খধ্বনির মাঝে আমার ফুল ফুটলো! বাসা-বাড়ির আল্‌সে ছেড়ে ফিরে এলেম আমি আমার মায়ের ঘরে পথের পরে—বিয়ের কনে এলো-খোঁপা কালো ফুলে সাজিয়ে। রথের চাকায় আমার বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে দেখা দিলেন আমার বর—পথের শেষে দুর্দ্দিনের সে কালো ফুলের কালো ভ্রমর।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবিমারক

অবিমারক নামক নবাবিষ্কৃত ভাসের নাটকখানি নায়কের নামানুসারে নাম-প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটক নাটিকা নায়িকা বা নায়ক-নায়িকার যুগল-নামে খ্যাত হয়। রত্নাবলী মালতীমাধব প্রভৃতি নামগুলি ইহার প্রমাণ। "চণ্ডকৌশিক" "প্রসন্নরাঘব" প্রভৃতি নামকরণে নাটকের নায়ক বা অপর কোনও প্রধান পুরুষ চরিত্রের নাম গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কেবল নায়কের নামে নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ভাসের "অবিমারক" ও "চারুদত্ত" নাটকদ্বয় নায়কের নামে আখ্যাত হইয়াছে।

অবিমারকের জন্ম-কাহিনী এইরূপ:—সুদর্শনা ও সুচেতনা দুই সহোদরা। সুদর্শনার সহিত কাশীরাজের ও সুচেতনার সহিত সৌবীররাজের বিবাহ হয়। অগ্নি হইতে সুদর্শনার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুদর্শনা সেই পুত্র সুচেতনাকে প্রদান করেন। প্রসব-সময়েই সুচেতনার এক পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুদর্শনার পুত্র লইয়া মৃতপুত্রের স্থানে স্থাপন করাতে জনসাধারণ সুদর্শনার পুত্রকে সুচেতনার পুত্র বলিয়াই জানিত। সৌবীররাজ পুত্রের নাম রাখিলেন বিষ্ণুসেন। বিষ্ণুসেন যখন বালক, তখন ধূমকেতু নামক এক অসুর সৌবীররাজ্যে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। বালক বিষ্ণুসেন সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বিস্রস্তকেশে ধূলিধূসরিত কলেবরে এই রাক্ষসের নিকট গিয়া পড়েন। রাক্ষসরক্ষীগণ সুরাপানমত্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করাতেই বিষ্ণুসেন এই অসুরের নিকট গিয়া পড়িয়াছিলেন। অসুর বিষ্ণুসেনকে সুন্দর আহার মনে করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে নিরস্ত্র বিষ্ণুসেন এক আঘাতে এই অসুরকে বিনাশ করেন। এই ধূমকেতু "অবি" নামেও পরিচিত ছিল। "অবি"কে বধ করায় বিষ্ণুসেন "অবিমারক" নামে বিখ্যাত হইলেন।

অবিমারক যৌবন প্রাপ্ত হইলে একদিন সৌবীররাজ মৃগয়া করিতে অরণ্যে গমন করেন। চণ্ডভার্গব নামক এক ঋষি কাশ্যপ নামক শিষ্য সমভিব্যাহারে সৌবীররাজ্যে আগমন করিতেছিলেন। যে অরণ্যে সৌবীররাজ শিকারার্থ গমন করেন, সেই অরণ্যেই কাশ্যপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অকালে নিহত হয়। মৃগয়া-বিহারী রাজাকে সম্মুখে পাইয়া চণ্ডভার্গব রোষে তিরস্কার করিতে থাকিলে, সৌবীররাজ বলেন, "তুমি ক্রোধের দাস। তুমি কি মুনি? তুমি চণ্ডাল।" এই কথা শুনিয়া চণ্ডভার্গব অতি ক্রোধে শাপ দিলেন—"আমি চণ্ডাল? তুই স্ত্রীপুত্রসহ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবি।" সৌবীররাজ তখন অনুতপ্ত হইয়া শাপ-মোচনের জন্য চণ্ডভার্গবের বহু আরাধনা করিলে ঋষি বলিলেন, "এক বৎসর চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছদ্মবেশে কাল যাপন কর। পরে নিজ-

প্রকৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।" এই শাপবশে সৌবীররাজ, তাঁহার স্ত্রী সুচেতনা ও পুত্র অবিমারক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছদ্মবেশে কুন্তিভোজের রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন কুন্তিভোজের কন্যা কুরঙ্গী সখীগণসহ উদ্যানে বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় অঞ্জনগিরি নামক রাজহস্তী মদমত্ত হইয়া সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। বীর রক্ষীগণ হস্তীকর্ত্তৃক নিহত হইল। কুরঙ্গীর সখীগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হস্তী কুরঙ্গীর শিবিকার নিকট উপস্থিত, এমন সময় চণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত অবিমারক সেইখানে উপস্থিত হইল। রাজহস্তীকে বাধা দিলেন। তাঁহার তাড়নায় হস্তী রাজকুমারীর শিবিকার প্রতি লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া অবিমারককে আক্রমণ করিল। কিন্তু অবিমারক অপূর্ব্ব কৌশলে সেই মদমত্ত হস্তীকে শীঘ্রই বশ করিলেন। কুরঙ্গীও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

এই প্রথম দর্শনেই অবিমারক ও কুরঙ্গীর প্রণয়সঞ্চার। কুরঙ্গী বিরহ-কাতরা হইয়া ধাত্রীকে অবিমারকের নিকট পাঠাইল। অবিমারকও কুরঙ্গীর দর্শনে উৎকণ্ঠিত। স্থির হইল, নিশীথে গোপনে অবিমারক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। রাজবাড়ীর সংস্থান জানিয়া লইয়া সেই রাত্রেই অবিমারক চোরের বেশে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় কুরঙ্গীর সহিত তাঁহার মিলন হইল। অবিমারক অন্তঃপুরেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সুখের দিন অধিককাল স্থায়ী হইল না। কুন্তিভোজ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। কিন্তু সতর্ক প্রহরী বসিবার পূর্ব্বেই অবিমারক অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিলেন।

পলায়ন করিলেন বটে কিন্তু সতর্ক প্রহরী অন্তঃপুরে তাঁহার পুনঃপ্রবেশের উপায় রাখিল না। তখন অবিমারক আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। প্রথমে তিনি অগ্নি-প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি অগ্নিরই পুত্র। সেই জন্য অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। শেষে তিনি পর্ব্বতশিখর হইতে লম্ফ দিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন।

এই সময় আকাশ-যানে মেঘনাদ নামক বিদ্যাধর সৌদামনী নামক পত্নীর সহিত সেই পর্ব্বতে অবতরণ করিল। অবিমারকের অবস্থা দেখিয়া কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া বিদ্যাধর কুরঙ্গীর সহিত গোপন-মিলনের উপায়-স্বরূপ এক অঙ্গুরীয় অবিমারককে দান করিল। এই অঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তে যে ধারণ করে সে অদৃশ্য হয়। তাহাকে যে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেও অদৃশ্য হয়। আবার অঙ্গুরীটি বাম হস্তে ধারণ করিলে সে সকলের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। এই অঙ্গুরীয় পাইয়া অবিমারক নিজ মিত্র বিদূষকসহ অদৃশ্য-ভাবে পুনরায় কুন্তিভোজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে কুরঙ্গী তখন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা। সহসা অবিমারকের আবির্ভাবে ও বাধাদানে তাঁহার সে সঙ্কল্প দূর হইল এবং উভয়ের পুনর্মিলন হইল।

এদিকে কুন্তিভোজ কুরঙ্গীর সহিত বিবাহ দিবার জন্য কাশীরাজের পুত্র জয়-

বর্ম্মাকে আবাহন করিয়াছিলেন—জয়বর্ম্মার সঙ্গে তাঁহার মাতা সুদর্শনাও আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই সুদর্শনাই অবিমারকের জননী। সুদর্শনা সৌবীররাজপত্নী সুচেতনাকে পুত্র দান করাতেই সুচেতনাই অবিমারকের মাতা বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। নারদ আসিয়া সকলের সম্মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন কুরঙ্গীর সহিত অবিমারকের এবং কুরঙ্গীর কনিষ্ঠা ভগিনী সুমিত্রার সহিত জয়বর্ম্মার বিবাহ হইল।

অবিমারক নাটকের মূল ঘটনা এইরূপ। আমরা অবিমারক সম্বন্ধে যে যে বিষয় আলোচনা করিব, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে নাটকের ঘটনাটি মোটামুটি জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। তাই সর্ব্বাগ্রে সংক্ষেপে নাটকের আখ্যান-বস্তুর পরিচয় প্রদত্ত হইল।

অবিমারকের আখ্যানবস্তু ভাসের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এমন কি অনেকে এরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকের ঘটনার অনুকরণে অবিমারকের ঘটনা-সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও সমালোচক ভাসকে বহু-পরবর্ত্তী কবি বলিয়া এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে ভাস শূদ্রক ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকারের আখ্যান-বস্তু অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখাইব যে অবিমারকের কাহিনী বহু প্রাচীন ও কোন কবি-বিশেষের নাটকানুকরণে রচিত নহে।

প্রাচীন ভারতে বহু কিম্বদন্তী ও গল্পের প্রচার ছিল। এই সকল গল্প রূপান্তরিত হইয়া বিদেশীয় ভাষাতেও স্থান পাইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর সহিত বিদেশীয় গল্পসমূহের অদ্ভুত সাদৃশ্য ইহার জলন্ত প্রমাণ। পুরাতন কাহিনী বা কিম্বদন্তী পূর্ব্বে জনসাধারণের মুখে মুখেই চলিয়া আসিত; পরে স্থায়ীভাবে সাহিত্যে স্থান লাভ করে। এই সকল কাহিনীর মূলে কোনও সত্য ঘটনা নিহিত আছে কি না, থাকিলে সে সত্য কতটুকু, ও সেই ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া কতটা বিদ্যা সংযোজিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে এই সকল সুপ্রাচীন কাহিনী-অবলম্বনে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, অন্যান্য স্বকপোলকল্পিত নাটকের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য দেখা গেলে প্রথমোক্ত নাটকগুলি যে শেষের অনুকরণ, তাহা বলা যাইতে পারে না। বরং শেষোক্ত নাটকগুলিই প্রথমোক্ত নাটক-সকল বা ঐ সকল নাটকের মূল কিম্বদন্তী অনুকরণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা লইয়াই ভাসের অধিকাংশ নাটক রচিত। "পঞ্চরাত্র" "দূতঘটোৎকচ", "উরুভঙ্গ" "কর্ণভার", প্রভৃতি নাটক ইহার প্রমাণ। আর কতকগুলি নাটক প্রাচীন কিম্বদন্তী-মূলক। উদয়ন ও বাসবদত্তার কাহিনী অতি প্রাচীন ও সুপরিচিত। এই কিম্বদন্তী স্থানী আকারে "বৃহৎ-কথা", "কথা-সরিৎসাগর" প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই চিরন্তন কাহিনীর উপর ভাসের "স্বপ্ন-

বাসবদত্তা" ও "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ" নাটকের প্রতিষ্ঠা। শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী" প্রভৃতি নাটকও এই উদয়নের কাহিনী অবলম্বন করিয়াছে।

এইরূপ এক প্রাচীন কাহিনীর উপরই অবিমারকের ভিত্তি। কেবল অনুমান সাহায্যে আমরা এ কথা বলিতেছি না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রদর্শন করিব। বাৎস্যায়ন-প্রণীত "কামসূত্র" একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী ইহার রচনা কাল। ইন্দ্রপাদ উপাধিধারী কোনও এই গ্রন্থের জয়মঙ্গল নামক একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

কামসূত্রের পঞ্চম প্রকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে:—"অহল্যাবিমারকশাকুন্তলাদীনাঞ্চান্যেষামপি লৌকিকানি চ কথয়েৎ।" অর্থাৎ "অহল্যা, অবিমারক, শকুন্তলা প্রভৃতি ও অন্যান্য লৌকিক কাহিনী বলিবে।" ইহাতে কিরূপ ভাবের কথার অবতারণা করিতে হইবে, তাহার প্রসঙ্গে এই পংক্তি লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "অবিমারকের" কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। বাৎস্যায়নকৃত পূর্ব্বোদ্ধৃত মূল সূত্রাংশে অবিমারকের কাহিনীর কোনও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে কিন্তু উক্ত সূত্রের "জয়মঙ্গল" নামক টীকায় অবিমারকের আখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে:—"অগ্নিহোত্রকেণাগ্নিপরিচরণে বধূর্নিযুক্তা। সা চ কুণ্ডাদুত্থিতেন মূর্ত্তিমতা অগ্নিনা কামিতা। জাতগর্ভাঞ্চ তাং শ্বশুরঃ কুলদোষভয়াদটব্যাং তত্যাজ। প্রসূতাঞ্চ সহ সূনুনা শবর-সেনাপতিরপত্যবুদ্ধয়া সংবর্দ্ধিতবান্। তৎপুত্রশ্চ আজাবিকসমূহেন বালবৎস্বাৎ ক্রীড়মানঃ পরিভ্রমন্ তৎক্ষীর পানান্মহাবলোঽভূদ্ যেন শিশুরেব হস্তগ্রহণাদজাবিকং জঘান, সেনা-পতির প্যন্বর্থমস্য নাম চক্রে 'অবিমারক' ইতি। ততঃ প্রবৃদ্ধযৌবনঃ কদাচিদ্রাজ্ঞোঽটব্যাং সমাবাসিতস্য দুহিতরং হস্তিনা ব্যাপাদ্যমানাং তং হত্বা ররক্ষ। ততো জাতোৎকণ্ঠা সা স্বয়মেব পাণিং গ্রাহিতবতী।"

ইহার মর্ম্ম এই:—এক বধূ অগ্নিহোত্র অনল রক্ষার ভার প্রাপ্ত হয়। অগ্নি-পরিচরণে নিযুক্তা সেই বধূ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত মূর্ত্তিমান্ অগ্নিকর্ত্তৃক ভুক্তা হন। তাহাকে সগর্ভা দেখিয়া তাহার শ্বশুর কুলকলঙ্কের ভয়ে তাহাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন। সেইখানে বধূ পুত্রসন্তান প্রসব করেন। শবর সেনাপতি বধূকে ও তাহার পুত্রকে নিজ পুত্রসম করিয়া প্রতিপালন করেন। সেই পুত্র ছাগপালদিগের সহিত বাল্যে ক্রীড়া করিতে করিতে দুগ্ধপানে মহাবলসম্পন্ন হইয়া উঠে এবং শিশু কালেই স্বহস্তে ছাগপালকে বধ করে। শবর-সেনাপতি তখন ইহার সার্থক নাম দেন, 'অবিমারক।' ক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে অবিমারক এক সময়ে বনে হস্তী-কর্ত্তৃক বধ্যমানা রাজার দুহিতাকে হস্তী নিধন করিয়া রক্ষা করেন; তাহার পর জাতানুরাগা সেই রাজপুত্রী নিজেই উদ্যোগ করিয়া অবিমারককে বিবাহ করেন।

এই কাহিনীর সহিত অবিমারক নাটকের ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। নাটকে অবিমারক অগ্নির পুত্র ইহামাত্র উল্লিখিত

আছে; কিন্তু কিরূপে অগ্নির ঔরসে তাহার জন্ম হয় এমন কোনও পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। বাৎস্যায়নের জয়মঙ্গল টীকায় সে কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। অবিমারকের মাতা অরণ্যে পরিত্যক্তা হন, সেখানে অবিমারক শবর দ্বারা প্রতিপালিত হন প্রভৃতি কাহিনী নাটকে স্বীকৃত হয় নাই। কারণ ভাস নিজ নায়ককে রাজপুত্র করিয়া অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কিম্বদন্তীতে অবিমারক রাজপুত্র কি না তাহার উল্লেখ নাই। বরং রাজপুত্র না হওয়াই সম্ভব। নিজের অসীম শক্তিতে সে ছাগপালকে বধ করিয়াছিল। হস্তীকে বধ করিয়া রাজকুমারীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, এইজন্য রাজকন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুকচিত্তা হইয়াছিলেন। এক অগ্নি হইতে জন্ম ভিন্ন প্রাচীন কাহিনীতে অলৌকিক কিছুই নাই। আর অগ্নি হইতে জন্মের বিবরণটাও যে অবিমারকের অতুল শক্তি কোথা হইতে আসিল তাহাই বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। হয়ত সত্যই কোনও বধূ অরণ্যে পরিত্যক্তা হইয়া মহাবলসম্পন্ন সন্তান প্রসব করে। সে পরে নিজ শৌর্য্যে রাজকুমারীকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। এই সাধারণ ঘটনাটিই কিম্বদন্তীর আকারে প্রচলিত ছিল। এইরূপ এক যথার্থ ঘটনা ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ছাগপাল বধ করিয়া অবিমারক নাম-প্রাপ্তিও কিছুমাত্র অলৌকিক নহে।

কিন্তু অলঙ্কার-শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কৃত নাটকের নায়ক হীন পাত্র হইতে পারে না। কাজেই ভাস অবিমারককে রাজপুত্র রূপে খাড়া করিলেন। প্রাচীন কাহিনীতে ছিল, রাজকন্যা নীচজাতীয় যুবক অবিমারকের প্রতি অনুরক্তা হন। ইহা কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতে ভাস করিলেন অবিমারক যথার্থ রাজপুত্র বটে কিন্তু ঋষির শাপে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। ঋষির শাপের অলৌকিক কাহিনী এইরূপে অবতারিত হইল। ছাগপালবধ ততটা বিস্ময়কর নহে—ভাস তাই অসুর-বধের কাহিনী সৃষ্টি করিলেন।

অবিমারক নাটকখানিতে প্রাচীন কালের সমাজের চিত্র কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা এইবার প্রদর্শন করিব। কুরঙ্গীর প্রতি অনুরক্ত অবিমারকের গোপনভাবে রাজান্তঃপুর-প্রবেশ প্রশংসনীয় কার্য্য নহে। প্রাচীন কাহিনীতে যেরূপ ছিল, হীন অবস্থার যুবক রাজকুমারীর প্রেমে বরং সেরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিলেও করিতে পারিত। অন্তঃপুরে প্রবেশ বারিত হইলে আত্মহত্যার সংকল্পও তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। কিন্তু নাটকের নায়ক অবিমারক যুবরাজ। তাঁহার সহিত কুরঙ্গীর বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল। অল্প দিন পরেই তাঁহার চণ্ডালত্ব দূর হইত। নিজ পরিচয় দিয়া কুরঙ্গীর পাণিপ্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সফল হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কাজেই নাটকের অবিমারকের আত্মহত্যার চেষ্টা ততটা সম্ভবপর মনে হয় না। কুরঙ্গীর আত্মহত্যার চেষ্টাও প্রাচীন কাহিনীর নায়ক থাকিলে বড় সুন্দর মানাইত। হীন যুবককে আত্মদান করিয়া তাহার অভাবে, লজ্জায়, হতাশে আত্মহত্যার উদ্যোগ বেশ স্বাভাবিক হইত।

কিন্তু সংস্কৃত নাটকের নায়ক "প্রখ্যাতবংশ" রাজা হওয়াই চাই। ভাস তাই অবিমারককে রাজপুত্র করিয়াছেন;—নাটকের অবিমারক ও কুরঙ্গীর আচরণগুলি অতিরিক্ত ভাবাতিশয্যের দ্যোতক (Sentimental) বোধ হইলেও "কামস্য বামা গতিঃ" এই বচন-অনুসারে তাহার কথঞ্চিৎ সমর্থন করা যায়।

প্রাচীন ভারতে রাজ-অন্তঃপুরে বহু রমণীর সদ্ভাব হেতু সময় সময় তাহাদের কাহারও কাহারও চরিত্রভ্রংশের সম্ভাবনা ঘটিত। বাৎস্যায়নের কাম-সূত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অন্তঃপুর সতর্কভাবে রক্ষিত হইলেও বাহির হইতে পুরুষগণ নানা কৌশলে তথায় প্রবেশ করিত। কামসূত্রে আছে, অন্তঃপুরচারিণীগণ ধাত্রীদ্বারা বাহিরের পুরুষগণকে মনোভাব জানাইয়া থাকেন। এই ধাত্রীগণ পুরুষদের বলে, "রাজপুরীতে প্রবেশ করা সহজেই হয়। বাহির হইবারও সহজ উপায় আছে। অতিবিস্তৃত অন্তঃপুর, কোথায় কে আছে, কি করিতেছে তাহার সংবাদ কেহ রাখে না।(১) অন্তঃপুরের রক্ষীগণও অসাবধান। রাজ-পরিজনসমূহও সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকে না।" এই সকল কথাদ্বারা বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ধাত্রীগণ পুরুষদের লইয়া যায়। বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন, পুরুষেরাও অন্তঃপুরের সংস্থান অবগত হইয়া কোথায় কি আছে, কোন সময়ে কি বেশে কিরূপভাবে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা জানিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। ("কক্ষাপ্রবেশং চ দৃষ্ট্বা তাভিরেব বিহিতোপয়াঃ প্রবিশেৎ।" কামাসূত্র ৫।৬।১)

রাজান্তঃপুরের এই দুর্নীতিমূলক আচরণ ঠিক বাৎস্যায়ন যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন সেই ভাবের ঘটনা প্রাচীন কাব্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। দশকুমারচরিত তৃতীয় উচ্ছ্বাসে উপহারবর্ম্মা গোপনে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভ্রষ্টচরিত্রা রাজমহিষীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এইরূপ কাহিনী আছে। সেখানেও দূতী—ধাত্রী ও রাজমহিষীর পরিচারিকা। উপহারবর্ম্মা অন্তঃপুরের সংস্থান, রক্ষীগণের বাসস্থান, উদ্যান প্রভৃতি কোথায় কিরূপ আছে তাহা জানিয়া লন।(২) পরে অন্ধকার রাত্রে নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া খড়্গ হস্তে রাজান্তঃপুর-প্রবেশে উদ্যত হন। বংশদণ্ড দ্বারা পরিখা পার হইয়া তাহারই সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।(৩)

(১) "তেষামুপাবর্ত্তনে ধাত্রেয়িকাশ্চাভ্যন্তর-সংসৃষ্টা, আয়তিং দর্শয়ন্ত্যঃ প্রযতেরন্। সুখপ্রবেশিতামগধারভূমিং বিশালতাং বেশ্মনঃ, প্রমাদং রক্ষিণামনিত্যতাং পরিজনস্য বর্ণয়েয়ুঃ।"

কামসূত্র, ৫ম অধিকরণ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(২) "ততস্তস্যা এব সকাশাদন্তঃপুরনিবেশমন্তর্বংশিকপুরুষস্থান্ প্রমদবনপ্রদেশানপি বিভাগেনাবগম্য....."

দশকুমারচরিত, ৩য় উচ্ছ্বাস।

(৩) "কার্দ্দমিকনিবসনশ্চ.....খড়্গপাণিরুপহৃতপ্রকৃতোপস্করঃ .....বেণুযষ্টিমাদায় [তয়া শায়িতয়া] চ পরিখাম্, স্থাপিতয়া চ প্রাকারভিত্তিমলঙ্ঘয়ম্।"

দশকুমার-চরিত ৩য় উচ্ছ্বাস

"অবিমারকে"ও দেখি, ধাত্রী অবিমারককে বলিতেছে, "রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাই সুকঠিন। কোনক্রমে প্রবেশ করিতে পারিলে অনেকদিন থাকিতে পারা যায়।" (দ্বিতীয় অঙ্ক) অবিমারক বলিলেন, "রাজান্তঃপুরের কোথায় কি আছে আমায় বুঝাইয়া দাও।" (দ্বিতীয় অঙ্ক) ধাত্রী তাহাই করিল। তৃতীয় অঙ্কে দেখি, রজ্জু ও তরবারি লইয়া অবিমারক রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। রজ্জুর অগ্রভাগে সংলগ্ন আঁকড়া প্রাচীরের উপর আটকাইয়া অবিমারক রজ্জু ধরিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িলেন এবং প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই প্রকার ঘটনা প্রাচীন ভারতে ঘটিতে পারিত। রাজধানীর পথে গভীর রজনীর ঘোরান্ধকারে চোরের সঞ্চরণ, রক্ষী দেখিয়া শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ—এসকল প্রাচীনকালের চিত্র। অঙ্গুরীয়কের অদ্ভুত শক্তিতে বিশ্বাসও প্রাচীনকালের নাট্যাভিনয়-দর্শকেরই থাকা সম্ভব। মণি, মন্ত্র, মহৌষধির অত্যাশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন সংস্কৃত নাটকের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নাবলী নাটিকায় অকালে বৃক্ষের কুসুমোদ্গম মালবিকাগ্নিমিত্রে সর্প-বিষ-হর মণি প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। অবিমারক নাটকের প্রথম অঙ্কে যেরূপ উন্মত্ত হস্তী-দমনের বর্ণনা আছে, মৃচ্ছকটিকেও দ্বিতীয় অঙ্কে কর্ণপূরক বসন্তসেনার নিকট এইরূপ এক হস্তী দলনের বর্ণনা করিতেছে। অবিমারকে নায়ক যেরূপ হস্তীর আক্রমণ হইতে নায়িকাকে রক্ষা করিল, মালতীমাধবের তৃতীয় অঙ্কে মকরন্দ সেইরূপ মদয়ন্তিকাকে ব্যাঘ্র কবল হইতে রক্ষা করিল। অবিমারকের চোরবেশে সঞ্চরণের সহিত মৃচ্ছকটিকে চোরবেশী শর্ব্বিলকের আচরণের তুলনা করা যাইতে পারে।

অবিমারকের প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ, ইহার প্রধান ঘটনা, নায়কের মাতুলকন্যা-বিবাহ। কুরঙ্গী অবিমারকের মাতুল-কন্যা। এই প্রকার বিবাহ অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকিলেও পরবর্ত্তী যুগে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অবিমারক নাটকখানিতে অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের অনুরূপ ঘটনা ও চরিত্রের অভাব নাই। নির্ব্বোধ ভোজন-লোলুপ বিদূষক নায়কের সখা, অন্তঃপুর-পরিচারিকার হস্তে বিদূষকের নিগ্রহ, নায়ক-নায়িকার মামুলী বিরহ-বর্ণনা, আত্মহত্যার উদ্যোগ, অলৌকিকচরিত্র বিদ্যাধর, নারদ প্রভৃতির সৃষ্টি অনেক নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদূষকের মুখে "অবিমারকে" একস্থলে "বৌদ্ধ শ্রমণে"র উল্লেখ আছে। রাজকন্যা বর্ষার বৃষ্টিধারায় স্নান করিতে যাইতেছেন। নায়ক সন্ধ্যার সময় স্নান ও আহ্নিক করিতেছেন। রাজান্তঃপুরের সেই চিরন্তন ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা—উপবনের অনুপম মাধুরী—প্রাসাদের অলৌকিক সুষমা। ময়ূররা বিচরণ করিতেছে, শুক-সারিকা আলাপন-রত। চন্দ্রালোকে হর্ম্ম্যশিখরে রাজকন্যা মহার্ঘ্য আস্তরণে শয়ন করিয়া আছেন।

অপর দিকে নিশীথে রাজমার্গে ঘোর অন্ধকার। রক্ষীগণের দৃষ্টি এড়াইয়া চোর ও কামুক বিচরণ করিতেছে। মাঝে মাঝে রাজপথ-পার্শ্বের অট্টালিকার গবাক্ষ দিয়া দীপালোক পথের উপর পড়িয়াছে। কোন গৃহাভ্যন্তর হইতে রমণী-কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ বীণা বাজাইতেছে।

ভাসের নিপুণ হস্তে সরল অথচ সুন্দর ভাষায় এই সকল চরিত্র ও চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভাস উপমার উপর উপমা পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। এক এক স্থলে এমন এক একটি উক্তি বিদ্যমান যে তাহা সর্ব্বযুগে প্রযুজ্য। প্রথম অঙ্কে কন্যার বিবাহে পিতার কর্ত্তব্যের উল্লেখ, এই শ্রেণীর উক্তি। এরূপ আরও আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ও দিবসের বিভিন্ন সময়ের বর্ণনাতেও ভাস তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগীর নিকট এই নাটকখানি উপেক্ষার সামগ্রী নয়। কেবলমাত্র ইহার বর্ণনাগুলি পাঠ করিলেই পাঠক ভাসের কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

চাষার বাড়ী

(গল্প)

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

একটা ছোট পাহাড়ের তল-দেশে দুটি কুটীর পাশাপাশি অবস্থিত। তাহার নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নগর। স্বাস্থ্যের জন্য লোকে এই নগরে স্নান করিতে আসে। এই দুই কুটীরের মালিক দুজন চাষা। শিশু-সন্তানের ভরণপোষণার্থ এই অনুর্ব্বর ভূমিতে ফসল উঠাইবার জন্য উহাদের খুবই খাটিতে হয়। প্রত্যেকের ঘরে চারিটি করিয়া সন্তান। এই দুই পাশাপাশি কুটীরের দুই দ্বারের সম্মুখে, মাটির উপর গড়াগড়ি দিয়া ছেলেগুলা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধূলাখেলা করে। প্রত্যেক ঘরের বড় ছেলে দুটির বয়স ৬ বৎসর, আর ছোট ছেলে দুটির বয়স ১৪ মাস। এই দুই ঘরে বিবাহ ও জন্ম প্রায় এক সময়েই ঘটিয়াছিল।

দুই মা ঐ শিশুর গাদার মধ্যে বড় একটা তফাৎ বুঝিতে পারিত না। আর দুই বাপ উহাদিগকে একেবারেই এক-সামিল করিয়া ফেলিয়াছিল। ৮ টা নাম উহাদের মাথায় সর্ব্বদাই ভাসিয়া বেড়াইত, ক্রমাগত একত্র মিশিয়া যাইত। এবং যখন একজনকে ডাকা আবশ্যক হইত, উহারা তিনজনের নাম ধরিয়া ডাকিত। শেষে আসল নামটিতে আসিয়া পৌঁছিত। প্রথম বাড়ীতে থাকিত "তুবাস্" নামক একজন চাষা।

তাহার তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। দ্বিতীয় বাড়ীতে থাকিত "ভালঁ্যা"। তাহার একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে।

উহারা অতি কষ্টে জীবনধারণ করিত। উহাদের আহার ছিল একটু সুরুয়া, কিছু আলু, আর আকাশের মুক্ত বায়ু। প্রাতে সাতটার সময়, তার পর দুফুরবেলা, তার পর অপরাহ্ণ ৬ টার সময়, তার পর সায়াহ্নে, দুই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের একত্র করিয়া উহারা তাহাদিগকে এক-একটু মাংসর ঘণ্ট খাইতে দিত। হংস-পালক হাঁসের বাচ্চাদের যে রকম খাওয়াইয়া থাকে সেই রকম। একটা কাঠের টেবিল, ৫০ বৎসরের অবিরাম ব্যবহারে ভার্নিসের মত চক্‌চকে হইয়া উঠিয়াছে। এই টেবিলের চারিধারে ছেলে মেয়েগুলা বয়স অনুসারে সারি-সারি খাইতে বসিয়াছে। সব-ছোটটির মুখ ও টেবিলের ধারটা প্রায় সমভূমিতে স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের সম্মুখে এক-একটা খোঁদল-করা প্লেট। প্লেট্ গরম জলে ডোবান পাউরুটির টুকরায় পূর্ণ। সেই জলে কতকগুলা আলু, আধখানা কপি ও তিনটে পেয়াঁজ রাঁধা হইয়াছিল। ছেলেমেয়েগুলা খুব ক্ষুধার সহিত উহা গ্রাস করিতেছিল। মা নিজে কেবল সব-ছোটটিকে উহা গিলাইয়া দিতেছিল। আগুনের পাকে সিদ্ধ করা একটু মাংস—ইহাই সকলের রবিবারের ভোজ। ঐ দিন বাবা একটু বিলম্ব করিয়া আহার করিতেন। আর পুনঃপুনঃ বলিতেন, এমন ভোজ ত রোজ হয় না। আজ ধীরে সুস্থে খাওয়া যাক্।

একদিন অগষ্ট মাসের অপরাহ্নে, একটা হাল্‌কা-ধরণের গাড়ী হঠাৎ ঐ দুই কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন তরুণী নিজে গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন; তিনি তাঁর পাশের পুরুষটিকে বলিলেন:—

"ওগো, চেয়ে দেখ,—এক-গাদা ছেলে! অমন সুন্দর ছেলেগুলি কি না ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্চে!" পুরুষটি কোন উত্তর করিল না। এরূপ প্রশংসা তার শোনা অভ্যাস ছিল। তার পক্ষে এই প্রশংসা একটা কষ্টের বিষয়—কতকটা তিরস্কারের মতো।

তরুণী আবার আরম্ভ করিল:—

"আমার বড় চুমো খেতে ইচ্ছে করচে! আহা, ঐটি যদি আমি পাই—ঐ সবার ছোটটি!"

তাহার পর, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, তরুণী শিশুদিগের নিকট ছুটিয়া গেল। তুবাসের একটি ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া তার নোংরা গালে চুমা খাইতে লাগিল, মাটি-মাখানো কোঁকড়া কোঁকড়া কটা চুলের উপর চুমা খাইতে লাগিল, ছোট হাত দুটিতে চুমা খাইতে লাগিল। ছেলেটি তার সেই ছোট হাত দুটি নাড়িয়া তরুণীর বিরক্তিজনক আদর হইতে আপনাকে আগ্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

তাহার পর, সেই তরুণী আবার গাড়ীতে উঠিয়া, দ্রুত কদমে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পর-সপ্তাহে আবার সে আসিল, মাটির উপর আসিয়া বসিল; আবার সেই ছেলেটিকে কোলে লইয়া, খুব ঠাসিয়া তাহাকে কেক্ খাওয়াইতে

লাগিল; অন্য ছেলেমেয়েদের শুধু কতক-গুলা বাতাসা দিল। এবং তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদের সহিত খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে তাহার স্বামী সেই ভঙ্গুর গাড়ীতে বসিয়া খুব ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

সেই তরুণী আবার একদিন আসিল; আসিয়া বাপ-মার সহিত আলাপ পরিচয় করিল। তারপর, মিষ্টান্ন ও পয়সায় পাকেট ভরিয়া প্রতিদিন আসিতে লাগিল।

একদিন প্রাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তাহার সহিত তাহার স্বামীও গাড়ী হইতে নামিল। তরুণী ছেলেদের কাছে না থামিয়া একেবারে তাদের বাপ-মায়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তারা ঘরে ছিল। রন্ধনের জন্য কাঠ চিরিতেছিল। বিস্মিত হইয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। বসিবার জন্য সসম্ভ্রমে চৌকি এগাইয়া দিল। তখন সেই তরুণী বাধ-বাধ স্বরে থামিয়া থামিয়া আরম্ভ করিল:—

"ওগো বাছা, আমি তোমার কাছে এসেছি—কেন জান? আমার ইচ্ছে হয়েছে ...আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে···তোমার ঐ ছেলেটিকে...আমার সঙ্গে···নিয়ে যাই..."

চাষারা হতভম্বা হইয়া রহিল, সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না।

একটু দম লইয়া তরুণী আবার আরম্ভ করিল:—

"আমাদের ছেলেপিলে নেই। আমরা শুধু দুটি প্রাণী—আমি ও আমার স্বামী।"

চাষাণী, কথাটা যেন একটু বুঝিতে আরম্ভ করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল:—

—"তুমি আমাদের শার্লোকে নিয়ে যেতে চাও? ওমা তা কি কখন হয়। তা হতেই পারে না।"

তখন তরুণীর স্বামী এই কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন:—

—"আমার স্ত্রী তোমাদের ভাল করে' বোঝাতে পারেন নি। আমরা ওটিকে "পুষ্যি" নিতে চাই। ছেলেটি আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বে। যদি ছেলেটি ভাল-রকম ওৎরায়, তাহলে ও-ই আমাদের উত্তরাধিকারী হবে। যদি দৈবযোগে আমাদের কখন ছেলেপিলে হয়, তাহলে, তোমার ছেলেটি তাদের সঙ্গে বিষয়ের সমান ভাগ পাবে। কিন্তু খুব আদর যত্ন করেও যদি ছেলেটির মন আমরা না পাই, তাহলে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, তাকে ২০ হাজার টাকা আমরা দেব; আর ঐ টাকা তখনই তার নামে উকীলের ঘরে গচ্ছিত রাখা যাবে। আর তোমাকেও তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত মাসে মাসে ১০০৲ টাকা করে মাসোহারা দেওয়া যাবে। এখন সব ভাল করে' বুঝ্‌লে ত?"

চাষাণী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। —"তুমি চাও আমি আমার শার্লোকে তোমার কাছে বিক্রী করি? না, তা কখনই হবে না। মা-কে না কি একথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে! মিন্‌সেটা বলে কি! ওমা! কি ঘেন্নার কথা।"

চাষা কোন কথাই কহিল না; গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু সে ক্রমাগত ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া তার স্ত্রীর কথায় সায় দিতেছিল।

তরুণী হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং স্বামীর দিকে ফিরিয়া, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে—আদুরে মেয়ের মত আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"ওগো ওরা যে দেবেনা বল্‌চে, ওরা যে দিতে চাচ্চে না।"

তখন তরুণীর স্বামী আর একবার শেষ-চেষ্টা করিয়া দেখিলেন!

—"কিন্তু বাপু, তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ-টার দিকে একবার তাকিও—তার সুখের দিকে, তার...

চাষানী, আর সহিতে না পারিয়া তার কথা শেষ করিতে দিল না :—

—"ওগো সব শুনেছি, সব দেখেছি, সব বুঝেছি—আর বেশী বোঝাতে হবে না··· এখান থেকে দূর হও, যদি আবার এখানে এসো ত ভাল হবে না বল্‌ছি। এই রকম করে ছেলে না কি কেউ কাউকে দেয়। মরণ আর কি!"

তখন তরুণী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আর দুইটি ছেলেকে দেখিতে পাইলেন। এবং নারীসুলভ নছোড়-বন্দা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সাশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু এছেলেটি ত তোমার নয়!"

চাষা তুবাস উত্তর করিল :—

"ও ছেলেটি পাশের ঘরের; যদি ইচ্ছে হয় ত ওখানে যেতে পার।"

এই বলিয়া চাষা তুবাস আবার ঘরে ঢুকিল; তখনও তাহার স্ত্রীর কুপিত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

পার্শ্বস্থ কুটীরবাসী চাষা—"ভাল্যাঁ" তখন আহারে বসিয়াছিল। খান কয়েক রুটী চাকলা, ছুরীর আগা দিয়া কার্পণ্যসহকারে তাহাতে একটু মাখন মাখানো হইয়াছে; ইহাই সে ধীরে ধীরে খাইতেছিল।

সেই তরুণীর স্বামী আবার সেই প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার খুব ঠারে-ঠোরে, এবং সতর্ক ও চতুর বাক্-বিন্যাস-সহকারে। কৃষক ও কৃষক-গৃহিণী অস্বীকার-সূচক ঘাড় নাড়িলেন। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল, তাহারা ১০০ টাকা মাসোহারা পাইবে, তাহারা চোখ ঠারিয়া পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল—সাত-পাঁচ বিবেচনা করিতে লাগিল। মনে হইল, তাহারা যেন একটু টলিয়াছে।

উহারা অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিল, ভাবিত হইয়া পড়িল, ইতস্তত করিতে লাগিল। অবশেষে কৃষক-পত্নী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিল :—

—"ওগো মিন্‌সেটা তোমায় বলে কি!"

তরুণীর স্বামী উত্তর করিল :—

"আমি ভাল কথাই তোমাদের বল্‌চি।"

তরুণী ভয়ে ভয়ে ছিল, এও যদি একেবারে অস্বীকৃত হয়। এখন একটু আশ্বস্ত হইয়া, ছেলেটির ভাবী সুখের কথা, পরে ছেলেটি যে টাকা পাইবে তাহার কথা একে একে সমস্ত বলিল।

কৃষক জিজ্ঞাসা করিল :—

"বৎসরে ১২শ টাকা পাবে, আর সে কথা উকীলের সাম্‌নে করার করা হবে!"

তরুণীর স্বামী উত্তর করিলেন :—

"তা নয় ত কি,—কাল থেকেই এই বন্দোবস্ত হবে।"

এতক্ষণ কৃষকপত্নী ভাবিতেছিল;—সে এখন উত্তর করিল :—

—"মাসে মাসে ১০০৲ টাকা? এত কম টাকায় আমরা কি ছেলে দিতে পারি বাপু? আর কয়েক বৎসর পরে আমার ছেলে ত নিজেই রোজকার করবে। না, ১২৫-এর কমে হবে না। ১২৫ টাকা চাই।

তরুণী বড়ই অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবে তখনই স্বীকৃত হইলেন। ছেলেকে এখনই লইয়া যাইবেন স্থির করিয়া কৃষকপত্নীকে আগাম ১০০৲ টাকা দিলেন। তৎক্ষণ কৃষক একটা চুক্তিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতেছিল। সেই পল্লীর একজন সরকারী কর্ম্মচারী ও একজন প্রতিবেশী সাক্ষী হইল।

তখন তরুণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া —দোকানে কোন একটা সখের জিনিস কিনিবার মত,—ছেলেটিকে লইয়া একেবারে ছুটিয়া চলিলেন। অপর কৃষক তুবাস্ নির্ব্বাক ও কঠোরভাবে নিজ কুটীরের দ্বারে বসিয়াছিল,—উহাদিগকে এক্ষণে যাইতে দেখিল। এখন বোধ হয়, কেন অস্বীকার করিল বলিয়া মনে মনে সে অনুতাপ করিতেছিল।

কৃষক ভাল্যাঁর কথা আর তাহাকে কিছু বলিতে শোনা যাইত না। কৃষক ও কৃষকপত্নী প্রতি মাসে উকীলের বাড়ী গিয়া ১২৫৲ টাকা লইয়া আসিত। ইহারা তাহাদের প্রতিবেশীদের ব্যবহারে চটিয়াছিল, কেন না, অপর কৃষক তুবাসের পত্নী, কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদের বড়ই কষ্ট দিত; ঘরে-ঘরে কেবল বলিয়া বেড়াইত,—তুবাস্‌রা কি অর্থপিশাচ, অর্থের জন্য আপনার পেটের ছেলেকে বিক্রয় করিয়াছে। কি নোংরা কাজ, কি জঘন্য ব্যাপার।

কখন কখন তুবাস্-পত্নী নিজের ছোট ছেলে শার্লোকে কোলে লইয়া খুব ভড়ং করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিত :—যেন সে তার কথা কতই বুঝিতেছে!—

—"আমি তোকে বিক্রী করিনি যাদু, আমি তোকে বিক্রী করিনি। আমার ধন দৌলত নেই, তবু আমি আমার ছেলে বিক্রী করি নে।"

কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন এইরূপ চলিত; প্রতিদিন নিজ কুটীর-দ্বারের সম্মুখে, ভাল্যাঁর উদ্দেশে কত কথাই চীৎকার করিয়া এইরূপ বলা হইত। এমন করিয়া বলা হইত যাতে পাশের গৃহে কথাগুলি পৌছায়। তুবাস্-পত্নীর মনে মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তার শার্লোকে বিক্রয় করে নাই বলিয়া সে দেশের মধ্যে সব-চেয়ে সেরা।

অন্য লোকেও তুবাস্-পত্নীর নাম করিয়া এইরূপ প্রশংসা করিত।

—"তুবাস্-পত্নী বড় ভাল—ও ঠিক্ মায়ের মতই কাজ করেছে।"

সকলেই তুবাস্-পত্নীর দৃষ্টান্ত দেখাইত। শার্লোর এখন বয়স দশ বৎসর;—এই কথা ক্রমাগত শুনিয়া শুনিয়া তাহারও বিশ্বাস জন্মিল, তার সঙ্গীদের মধ্যে সেই সব চেয়ে সেরা; কেন না, কেহ তাহাকে বিক্রয় করে নাই।

সেই মাসোহারার কল্যাণে ভাল্যাঁ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তুবাস্‌দের দেষ ততই বাড়িতে লাগিল;

উহার স্বচ্ছল অবস্থা দেখিয়া উহারা বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

তুবাস্‌দের বড় ছেলেটি, চাকুরীর জন্য বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় ছেলেটি মারা গিয়াছিল। একমাত্র শার্লো কেবল তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে থাকিত। তার জননী ও দুই ভগ্নীকে দেখিবার জন্য সে ভিন্ন আর কেহই ছিল না।

ক্রমে সে ২১ বৎসরে পড়িল। এক-দিন প্রাতে একটা জাঁকাল গাড়ী ঐ দুই কৃষক-কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সোণার ঘড়ীর চেনে ভূষিত একটি যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া, একটি পলিত-কেশা বৃদ্ধাকে বাহু-অবলম্বন দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। বৃদ্ধা তাহাকে বলিল :—

"বাছা, ঐ—ঐ দ্বিতীয় কুটীরটা।"

তখন যুবক নিজ পিতা ভাল্যাঁর গৃহে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধা জননী কাপড় কাচিতেছিল; জরাগ্রস্ত অক্ষম পিতা উনানের নিকট বসিয়া ঢুলিতেছিল।

দুজনেই মাথা তুলিল এবং যুবক এইরূপ বলিল :—

"প্রণাম হই বাবা, প্রণাম হই মা।"

উহারা বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে খাড়া হইয়া উঠিল।

কৃষকপত্নী মনের আবেগে সাবানটা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গদগদস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল :—

—"বাছা তুই এসেছিস্? তুই এসে-ছিস যাদু?"

যুবককে বুকে চাপিয়া ধরিয়া—"প্রণাম হই মা, প্রণাম হই মা" এই কথাটি পুনঃ পুনঃ মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে-তাহার ললাট চুম্বন করিল।

এদিকে তার পিতা বৃদ্ধ কৃষক, তার সেই চির-অভ্যস্ত প্রশান্ত স্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল যেন এই এক মাস পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছে :—"আবার তুই ফিরে এসেছিস্?"

যখন পরস্পরের সহিত দেখাশুনা হইয়া গেল, পিতামাতার বড় ইচ্ছা হইল, তখনই তাহাকে পল্লীর সবাইকে দেখাইয়া আনে।

তাহাকে গ্রামের প্রধান সরকারী কর্ম্ম-চারীর নিকট, সহকারী প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট, পাদ্রির নিকট, প্রধান শিক্ষকের নিকট লইয়া গেল।

প্রতিবেশী প্রথম-কৃষকের পুত্র শার্লো তাহার কুটীরের দ্বারদেশে ছিল, সে কৃষক ভাল্যাঁর পুত্রকে যাইতে দেখিল।

অপরাহ্নে আহারের সময় তার বুড়া বাপ মাকে সে এই কথা বলিল :—

দেখ দিকি তোমরা কি বোকা,—দেখ দেখি, ভাল্যাঁ কেমন তার ছেলেকে বিক্রী করলে।"

মা বলিল :

"আমরা ছেলে বিক্রী করতে চাই না।"

বাপ কিছুই বলিল না। পুত্র আবার বলিল :—

"তোমাদের মন্দভাগ্য বল্‌তে হবে—অমন দাঁও ছেড়ে দিতে আছে?"

তখন কৃষক তুবাস্ একটু ক্রোধের স্বরে বলিল :—

"তোকে আমরা ছাড়িনি বলে তুই আমাদের তিরস্কার করচিস্?"

যুবক নির্দ্দয়ভাবে বলিল :—

"হাঁ আমি তোমাদের তিরস্কার করচি, —তোমরা নেহাৎ বোকা! তোমাদের মত বাপ-মাই ছেলের অনিষ্ট করে। অমন বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।"

স্নেহময়ী কৃষকপত্নী কাঁদিতে লাগিল। চামচ দিয়া সুরুয়া খাইতেছিল—অর্দ্ধেক সুরুয়া মুখ হইতে পড়িয়া গেল।

"তোকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করেছি বলে',—তোকে মানুষ করেছি বলে' তুই কি আমাদের এখন মার্‌তে চাস্?"

যুবক কঠোরভাবে উত্তর করিল :—

"এরকম অবস্থায় থাক্‌বার চেয়ে আমার জন্মানই ভাল ছিল। আমি যখন ওদের ছেলেকে দেখ্‌লাম, তখন আমার শরীরের রক্ত মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ফুটন্ করে' উঠ্‌ল। আমি মনে মনে ভাবলাম—আমি ত ওরই মত হতে পারতাম।"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দেখ আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। কেন না আমি যদি এখানে থাকি, রাতদিনই আমি তোমাদের খোঁটা দেব, তোমরা জ্বালাতন হবে। তোমরা যে কাজ করেছ তার জন্য কখনই তোমা-দের আমি ক্ষমা করব না।"

বুড়াবুড়ী চুপ করিয়া রহিল। জলে চোখ্ ভরিয়া আসিল। তারা যেন বজ্রাহত হইল।

যুবক আবার বলিতে লাগিল :—

"না আমি এখানে আর থাক্‌তে পারব না। আর কোথাও গিয়ে আমার উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।"

যুবক দ্বার খুলিল। কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর দম্‌কা-বাতাসের মত ঘরে প্রবেশ করিল।

ভ্যালাঁ ও ভ্যালাঁ-পত্নী খুব আনন্দ করিতে করিতে পুত্রকে লইয়া সেই সময় গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল। তখন চালো মাটিতে পদাঘাত করিয়া তাহার বাপমায়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং এই কথা বলিয়া উঠিল :—

"মা, বাবা, আমি চল্লাম!"

এই বলিয়া রাত্রির অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর.

কালো জুড়ি

[সম্পাদকীয় মন্তব্য :—এই রচনাটি গল্প কি প্রবন্ধ তাই লইয়া গোল বাধিতে পারে। সেইজন্য জানাইয়া রাখা ভালো যে, লেখকের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়াছি ইহা একটি গল্প।

গল্প বলিয়া এই রচনাটিকে পাঠক অবজ্ঞা করিবেন না। ইহা আজকালকার বাজারে চল্‌তি বাজে চুট্‌কি গল্প নহে। ইহা গল্পরাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছে। নানা আলোচনায় পরিপুষ্ট হইয়া এমন সারালো ও ধারালো গল্প আমি তো কোথাও পড়ি নাই—এবং আমার বিশ্বাস কেহই পড়েন নাই। গল্পের ভাণ করিয়া লেখক এমন অনেক গুরুতর সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন যাহা সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বদেশে। গল্প বলিলে স্বকপোলকল্পিত বোঝায়;—ইহা মোটেই সে ধরণের নহে, ইহাতে কল্পনার ছায়ামাত্র নাই, আগাগোড়া বাস্তব। লেখক ত্রিতল কক্ষে বসিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত ধোঁয়াকার করিয়া তোলেন নাই;—ইনি আস্তাবলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণপাত করিয়া অশ্বসমাজের একেবারে প্রাণের কথাটি লিখিয়াছেন;—সেইজন্য ইহার রস ধনীর উজ্জ্বল প্রাসাদ-শিখরে যেমন উপভোগ্য, কৃষকের বিষণ্ণ কুটীরেও তেমনি উপভোগ্য। লেখক যে বাবুয়ানির মায়া কাটাইয়া ইতর জীবজন্তুর সুখ-দুঃখ, তাহাদের জীবনের সমস্যা লইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সেজন্য তিনি আমাদের নমস্য।]

(১)

হাড়কাটার পাঁচু মিঞার টিনের ছাদ-ওয়ালা আস্তাবলে সেই কালো ঘোড়া দুটির ছিল আস্তানা। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াটিয়া গাড়ি তারা টানিত। এই গাড়িখানির সঙ্গে তাদের কবে যে মিলন-সূত্র বাঁধা হইয়াছিল সে কথা ঠিক তাদের মনে পড়ে না—তখন তারা নিতান্ত ছেলে-ঘোড়া।

গাড়িখানির বয়স তাদের চেয়ে ঢের বেশী। তাই বলিয়া তাকে জীবনের সঙ্গিনী করিতে ঘোড়া দুটি আপত্তি করে নাই;—কারণ জীবনসঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিবার কোনো অধিকার সনাতন কাল হইতে ঘোড়াসমাজে প্রচলিত নাই। যাহার অদৃষ্টে যেমন জোটাইয়া দেওয়া হয় তাহাই গ্রহণ করে—মনের মতো হউক আর নাই হউক, বিচার করে না, যাহাকে পায় তাহাকে লইয়া চোককান বুজিয়া কোনো-রকমে চিরজীবন তাহাকে বহন করে।

ইহার বিরুদ্ধে একালের একদল অর্ব্বাচীন ঘোড়া মধ্যে একবার ভয়ঙ্কর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন ঘোড়ার দল এতবড় অনাচার কিছুতেই ঘটিতে দিবে না বলিয়া পণ করিয়া বসিয়াছে। একালের ঘোড়াদের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রাচীন দলকে অগ্রাহ্য করিয়া মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠিতেছে;—সেইজন্য পথে-ঘাটে দেখা যায় এক একটা ছোঁড়া ঘোড়া পিছনের পা দিয়া তার গাড়িখানাকে লাথাইয়া

লাথাইয়া খেঁৎলাইয়া ফেলিতেছে। পিঠে অনেক চাবুক পড়িলেও এই দলের ঘোড়া কিছুতেই সায়েস্তা হয় না;—সেইজন্য ঘোড়া ও গাড়োয়ান-সমাজে একটা দুর্ভাবনার ঝড় চলিতেছে। এই দলের বিদ্রোহ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে সেজন্য অতি সাবধানে তাহাদের রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—তাহাদের ছোঁয়া যাহাতে আর-কারো না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি আছে;—উহা-দিগকে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে এবং বৃদ্ধ-বয়সে পিঁজরাপোলে স্থান দেওয়া হইবে না বলিয়া শাসানো হইয়াছে।

এদিকে অশ্বকোবিদ্‌গণ অভিমত দিয়াছেন যে উহা একপ্রকার সংক্রামক রোগ;—আজ-কাল ইথরের মধ্য দিয়া ঐ রোগের বীজাণু ইউরোপ হইতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে;—এ রোগ জাতিবিচার করে না, নর, পশু, পক্ষী সকলকেই পাইয়া বসে। যাহার অন্তর-স্বাস্থ্য দুর্ব্বল—অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে সনাতনী মহাশক্তি শুদ্ধাচারের অভাবে লোপ পাইয়াছে—এই রোগ তাহা-দিগকেই পাইয়া বসে। খবর পাওয়া গিয়াছে, এই রোগের বীজাণু ধ্বংস করিবার জন্য প্যাস্টারিনারি কালেজে গভীর আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোগবীজ ধ্বংস করিবার প্রণালীর উপর অনেকের আস্থা নাই—তাঁহারা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীঅশ্ব-ষষ্ঠীর মানসিক মানিয়াছেন।

সে যাহা হৌক, আমরা যে কালো জুড়ির কথা বলিতেছি, তাদের এসব বালাই নাই,—তাদের সহিত তাদের জীবনসঙ্গিনীর বেশ মনের মিল ছিল। সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িখানি বৃদ্ধা হইলে কি হয়—সাজে সজ্জায় চাকচিক্যে এমনি চমৎকার যে মনে হয় যেন পূর্ণ যুবতী। পাঁচু মিঞা ভাড়ায় গাড়ি খাটায় বটে কিন্তু গাড়ির সখ তার আছে। সেইজন্য তার আস্তাবলের গাড়ির বয়স ধরে কার সাধ্য! কালো জুড়ি তাদের জীবন-সঙ্গিনীর বয়স টের পাইয়াছিল কিনা জানিনা কিন্তু এ কথা বলিতে পারি গাড়ি নিজে সে কথা উহাদের কাছে ফাঁস করে নাই।

(২)

কালো জুড়ির জীবন বেশ সুখেরই ছিল;—পাঁচু মিঞার আদর-যত্নের অভাব ছিল না, আহার মনের মতো মিলিত এবং পরিশ্রম যাহা করিতে হইত কাঁচা বয়স বলিয়া গায়ে লাগিত না। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ ইহজগতে মেলেনা। সেইজন্যই কালো জুড়ির অদৃষ্টে মধ্যে মধ্যে দুঃখভোগ থাকিত;—সে দুঃখ বিরহ-যন্ত্রণা। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ গাড়িখানি কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। দুই চারিদিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। কালো জুড়ি জিজ্ঞাসা করিলে গাড়ি বলিত—"আমি বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম।"

জীবনসঙ্গিনীকে দেখিয়া তখন কালো জুড়ির বিরহ-যন্ত্রণা যেন আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইত—এমন চমৎকার রূপ লইয়া সে ফিরিত যে তার দিক হইতে চোখ ফেরানো যাইত না;—সে কী লাবণ্য, সে কী চাকচিক্য! দিবারাত্র হাড়ভাঙা খাটিয়া খাটিয়া তার কণ্ঠা যখন বাহির হইয়া পড়িত, ধূলায় কাদায় সে

যখন বিশ্রী হইয়া উঠিত তখনই তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেখানে সেবাশুশ্রূষা পাইয়া সে আলো-করা রূপ লইয়া কালো জুড়ির কাছে ফিরিয়া আসিত! কালো জুড়ি আস্তাবলে পড়িয়া পড়িয়া যখন বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিত,—তাদের অলস দিনগুলি যখন আর কাটিতে চাহিত না, সঙ্গিনী অভাবে জীবন যখন মরুময় হইয়া উঠিত তখন কল্পনায় ঐ রূপের মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়া তাদের বিরস চিত্তকে সরস করিয়া তুলিত;—সেই রূপসুধা পান করিয়াই তাহারা বিরহী জীবন বাঁচাইয়া রাখিত।

আমি তখন পাঁচু মিঞার আস্তাবলের কাছেই থাকিতাম। যখন শুনিতাম গাড়িখানি কালো জুড়িকে বলিতেছে—"আমি বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম"—তখন আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিত। রমণী হইয়া এ কী জঘন্য চাতুরী! সে গিয়াছিল কারখানায় আর বলে কি না বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম! রমণী জাতির কতদূর অধঃপতন হইতে পারে ভাবিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতাম। রমণীর মুখে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা—এ কি সহ্য করা যায়? আমি দেখিলাম, উহা সংশোধন করিবার জন্য পাঁচু মিঞাকে না বলিলে আমার কর্ত্তব্যের হানি হয়। আমি পাঁচু মিঞাকে একদিন বলিলাম। সে আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। বলিল,—"যেখানে যার জন্ম, সেই তো তার বাপের বাড়ী!" আমি বলিলাম—"তা বটে!" কিন্তু মন হইতে এখনো সন্দেহ ঘোচে নাই। মনে হয় ঐ কথাটার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁকি আছে। সেইজন্য আমার মতে—বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম—না বলিয়া—বোধ হয় বাপের বাড়ি গিয়াছিলাম—বলিলে—বোধ হয় ঠিক হয়।

মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদির কথা বলিতে গিয়া আমি আর-একটি গুরুতর অবিচারের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। যদি রসভঙ্গ হয় পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

আমাদের বাড়ীর পাশে একজন ধনী মহাজনের একখানি টম্‌টম আছে—সেই টম্‌টম এক লাল ঘোড়ায় টানে। ইহা ছাড়া সহরে মফস্বলে টম্‌টম্ আমি ঢের দেখিয়াছি কিন্তু ঐ টম্‌টম্ দেখিলেই আমার চিত্ত জ্বলিয়া ওঠে। এ কী অবিচার!—চারি পা ওয়ালা ঘোড়ার সঙ্গে দুই-চাকার গাড়ি সাম্য-মন্ত্রের এত বড় অপমান? কি আশ্চর্য্য, এটা কাহারো চোখেই পড়ে না! বিজ্ঞান এত অসাধ্য সাধন করিয়াছে, দুই পেয়ে ঘোড়া দিয়া টম্‌টম্ চালানো কি তার পক্ষে এতই অসাধ্য? এদিকে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়িতেছেনা বড়ই ক্ষোভের বিষয়! বড় বড় প্রশ্নের সমাধান ছাড়িয়া দিয়া এই সব ছোটো-খাটো বিষয়ে মন দেওয়াই তো চাই! এই ছোটোকে অবলম্বন করিয়াই তো বড় হইতে হয়। নয় ত আকাশে উড়িয়া গাছপালাকে গান শেখাইয়া তো আর পেট ভরিবে না! আমি অনেকবার এ সম্বন্ধে চীৎকার করিয়াছি—কিন্তু সে আমার অরণ্যে রোদন হইয়াছে।

ক্ষুদে জাপানী এত বড় হইয়াছে কেন জান? তোমরা অনেকে অনেক কথা বল, আমি সে সব মানিনা। আমি বলি, জাপানীরা দুচাকার গাড়ি রিক্‌স দু-পেয়ে জানোয়ার দিয়া টানায় বলিয়া তাহারা উন্নতির এই উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এসব কথা তুলিয়া লাভ কি? যাহা বলিতেছিলাম বলি।

দিন বেশ চলিতেছিল, এবং চিরজীবন বেশ চলিতে পারিত কিন্তু হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তনে সব গোলমাল হইয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনই তো সর্ব্বনেশে! যেমন চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে তেমনি বরাবর চলিলে কোনো হাঙ্গাম থাকে না,—চোখ বুজিয়া বাঁধা-পথ ধরিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাও—ব্যস্। কিন্তু তা নয়। সুখে থাকিতে ভূতে কিলাইবার জন্য, কতকগুলা নির্ব্বোধ জীব আছে, তারা একেবারে অস্থির! তারা কেবলই বলে—"পরিবর্ত্তন কর, পরিবর্ত্তন কর!" আরে বাপু, পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া মরিবার জন্য এত ছটফটানি কেন? মরিবার কি আর পথ পাওনা?

ঘোড়ায় ট্রাম উঠিয়া গিয়া সহরে যে দিন ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম চলা আরম্ভ হইল, ঘোড়া-সমাজ সেই দিন মনে মনে বিপদ গণিল। ট্রামের ঘোড়াদের কাজ গেল। তাহাদের কেহ বলিল—"হায়! আমাদের আদর যাইতে বসিল।" কেহ বলিল—"হায়, আমাদের মূল্য কমিয়া গেল।" কেহ বলিল —"কলিযুগে দিন দিন হইতে চলিল কি! আমাদের এতদিনের অধিকার—যাহা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিল? এখনও চন্দ্রসূর্য্য উঠিতেছে—ধর্ম্ম কি এত বড় অন্যায় সহিবেন?" আর একজন অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে বলিল—"মানুষই যদি না বহিতে পাইলাম, বোঝা যদি পিঠে না করিলাম তবে এ ঘোড়া-জীবনের প্রয়োজন কি? অমনি একজন সুর করিয়া উচ্চস্বরে গাহিয়া উঠিল—"জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ —পরাণ সঁপিবে অশ্বিনীকুল!"

(৩)

যতটা ভয় হইয়াছিল আসলে দেখা গেল ততটা ভয়ের কারণ নাই। ট্রামের বরখাস্ত ঘোড়ার অন্যত্র কাজ জুটিয়া গেল। ভাড়া গাড়ির ভাড়াটিয়া কিছু-কিছু কমিল বটে কিন্তু কাজ একেবারে অচল হইল না। হইবার মধ্যে এইটুকু হইল যে, বছর-বছর সহরে যে ঘোড়ার আমদানি হইত তাহার মাত্রা অনেক কমিয়া গেল। সে একরূপ ভালোই হইল। ছত্রিশ-জাতের ঘোড়ায় সহর ভরিয়া যাইতেছিল—তাহাদের সহিত জাতিধর্ম্ম বাঁচাইয়া লোকলৌকিকতা করা শক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখন সে ভাবনা অনেকটা ঘুচিল।

এই তো গেল সাধারণ ভাবের কথা। খুটিনাটি করিয়া দেখিতে গেলে অনেকের অনেক রকম অসুবিধা ঘটিতেছিল। পাঁচু মিঞার উপার্জ্জন কমিয়াছিল। সেইজন্য সে সর্ব্বদাই মুখ ভার করিয়া থাকিত;—তাহা দেখিয়া আমাদের কালো জুড়ির মনে বড়ই দুঃখ হইত। পাঁচু মিঞার মেজাজও আগের চেয়ে অনেক খারাপ হইয়া উঠিয়াছে—সেই জন্য কালো জুড়ির পিঠে যখন-তখন চাবুক পড়ে;—সেও এক দুঃখ। লাভ কমিয়া

গেছে বলিয়া তাদের আহারের মাপও কমানো হইয়াছিল।

এ সব দুঃখ একরকম করিয়া সহা যাইত কিন্তু ঐ যে জীবন-সঙ্গিনীর সহিত মিলনের অবসর কম ঘটিতেছে সেজন্য মনটা দিন দিন বড়ই খারাপ হইয়া উঠিতেছিল। ভাড়া তেমন জোটে না বলিয়া আজকাল আর গাড়ি সব সময়ে জোতা হয় না—অনেক সময় বেকার পড়িয়া থাকে।

কথায় বলে, দুর্দ্দিন একা আসেনা। হঠাৎ পাঁচু মিঞার অসুখ হইয়া পড়িল। যে কটা দিন সে বিছানায় পড়িয়া ছিল, সে কটা দিন কালো জুড়ির যে কি কষ্টে গিয়াছে বলা যায় না। জীবনসঙ্গিনী আস্তাবলের এক ধারে কাৎ হইয়া পড়িয়া আছেন—আর-এক ধারে দড়ি-বাঁধা কালো জুড়ি। দু দলের মিলন নাই!—এ যেন সেই নদীর এপারে চখা, ওপারে চখী! হায়, হায়! সে অবস্থায় কালো জুড়ির পায়ের কাছে কাগজ কলম ছিল না; যদি থাকিত তাহা হইলে অমি জোর করিয়া বলিতে পারি তারা নিশ্চয় কতকগুলা কবিতা লিখিয়া ফেলিত। কে বলিতে পারে সে কবিতা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিত না! এমনি করিয়া কত ভালো ভালো জিনিষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে!—ইহার একটা উপায় করা উচিত।

পাঁচু মিঞার সারিতে যতই দেরি হইতে লাগিল, কালো জুড়ি দুঃখে ভাবনায় ততই সারা হইতে লাগিল। গাড়ির এ কী অবস্থা! এ কি চোখে দেখা যায়? মুখের উপর কালি পড়িয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কাদা! তাহার সে অপরূপ শ্রী আজ কোথায়! কালো জুড়ির বুক ফাটিয়া দুঃখ উথলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হায়, উপায় নাই—হাত পা বাঁধা! গাড়ি একবার গড়াইয়া কালো জুড়ির কাছে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু নিজের জোরে চলিতে সে কখনো শেখে নাই—কেমন করিয়া পারিবে? চাকা কিছুতেই গড়াইল না। তার এই নিস্ফল উদ্যম দেখিয়া পাশ হইতে ল্যাজ-ছাঁটা একটা ফচ্‌কে টিটকারি দিয়া বলিয়া উঠিল—"কেমন? বলি নাই—তোমাদের জীবনসঙ্গিনীদের নিজের পায়ে চলিবার অধিকার দাও?—এখন টের পাইতেছে ত!"

কালো জুড়ি সেই ছোকরার বেয়াদবীতে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সজোরে একবার চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করিয়া উঠিল। পা খোলা থাকিলে নিশ্চয় একটা লাথি কসাইয়া দিত।

(৪)

বর্ষা চিরদিন থাকে না—আবার রোদ ওঠে, হাসি ফোটে। পাঁচু মিঞা সারিয়া উঠিল। আগের মতো আবার দিন চলিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোথা হইতে মোটর গাড়ি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। ঘোড়াকুল এইবার মাথায় খুর দিয়া বসিয়া পড়িল।

খবরের কাগজে পড়া গেল—লণ্ডনে মোটর গাড়ির আধিক্য দিন দিন এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে ঘোড়ার গাড়ি প্রায় নির্ম্মূল। তবে উপায়? এখানেও তো সেই অবস্থা হইবে। সহরের অধিকাংশ

ঘোড়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেবল কয়েকটা ফচ্‌কে যাহারা ইচড়ে পাকিয়াছে তাহারা ফূর্ত্তির সহিত বলাবলি করিতে লাগিল—"ভালই হইয়াছে! এইবার আমরা লাগাম-মুক্ত হইলাম।"

একজন ঘোড়া-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! লাগাম-মুক্ত! তাহা হইলে যে সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার রসাতলে ডুবিয়া মরিবে!"

একজন তার্কিক ছোকরা যুক্তি দেখাইয়া বলিল—"এমন ঘোড়া তো ঢের আছে যাদের মুখে এখনো লাগাম পড়ে নাই—তারা তো দিব্য বাঁচিয়া আছে।"

হিতৈষী মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তাদের কথা ছাড়িয়া দাও—তারা বর্ব্বর বুনো ঘোড়া।"

ফচ্‌কে ছোকরা মাটিতে খুর ঠুকিয়া বলিল—"আমরাও না হয় সেই বুনো ঘোড়া হইলাম!"

এই কথায় এক পণ্ডিত ঘোড়া রোষ-কষায়িত লোচনে বলিয়া উঠিলেন—"তোরা উচ্ছন্ন যা! উচ্ছন্ন যা! যা-খুসি করিয়া তোরাই তো আমাদের মজাইতে বসিয়াছিস। তোদের পাপেই তো আমাদের এই দুর্দ্দশা!"

এক বুদ্ধিমান ঘোড়া ক্রুদ্ধ বক্তার পিঠে ল্যাজ বুলাইয়া বলিলেন—"রাগ করিতে নাই বাপু, রাগ চণ্ডাল। ঐ চণ্ডালের স্পর্শে দেহ মন অশুচি হয়।"

তারপর ঐ ফচ্‌কেগুলোকে ডাকিয়া তিনি সৎপরামর্শ দিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বোঝো বাপু, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন আমাদেরও তাই করা উচিত নয় কি? তাঁরা তো আর বোকা ছিলেন না। আমাদের ধর্ম্মই হইতেছে—বোঝা বওয়া। বোঝা যদি আমরা না বই তাহা হইলে যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব;—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।" এই কথার উত্তরে ফচকেগুলো এমন জোরে হাসিয়া উঠিল যে বক্তার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

(৫)

মোটর গাড়ির অধিষ্ঠান লইয়া ঘোড়া মহলে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। সে সব কথা লিখিয়া লেখার ভার বৃদ্ধি করিতে চাই না। কিন্তু তার মধ্যেকার একটি মূল্যবান কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একজন বক্তাকে একবার বলিতে শুনিয়াছিলাম—"প্রতিদিন আমরা কি শিক্ষালাভ করিয়াছি? আমাদের আস্তাবলে চোখের সম্মুখে মিঞাসাহেবের মুরগির ডিমগুলো যে প্রতিদিন নিজের আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সে কিসের জন্য?—সে কি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া মিঞাসাহেবের রসনাকে পরিতৃপ্তি দিবার জন্য নহে? দ্বিজরাজ কি গায়ত্রীমন্ত্র আমাদের কানে কানে দিনরাত শোনাইয়াছেন? সে কি পরার্থে জীবন বিসর্জ্জন নয়? সেই মহৎ শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়াই আমরা মানুষের জন্য—আমাদের ধর্ম্মের জন্য এমন করিয়া প্রাণপাত করিতে পারি। যতক্ষণ প্রাণ থাকে আমরা মানুষকে বিনা আপত্তিতে স্বচ্ছন্দচিত্তে বহন করি; তার পর লাগামমুদ্ধ মুখ-থুবড়াইয়া পড়িয়া মরণের দ্বারা জীবনকে সার্থক করিয়া তুলি। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের জীবনের এই ধর্ম্ম, এই মহত্ত্ব যেন না ভুলি!"

এই সব ব্যাপারে কালো জুড়ি কি মনে করিয়াছিল তাহা আমরা ঠিক জানিনা, কিন্তু এটা জানি যে তাহারা ভাবিতেছিল —কাজ যদি মারা যায় তাহা হইলে জীবন-সঙ্গিনীর সহিত যে অত্যন্ত বিচ্ছেদ হইবে! সেই ভাবনায় তাহারা দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এবং মনে মনে মোটর গাড়ির নিপাত কামনা করিতে লাগিল।

ঘোড়ার দল কি করিবে স্থির করিতে করিতে—তর্ক বিতর্ক, বিচার বিবেচনা, আলোচনা আবেদন ঠিক করিতে করিতে এদিকে সহর মোটর গাড়িতে ছাইয়া গেল। তখন দুর্ভাবনা হইল মোটরকুল সংখ্যায় এত বেশী এবং ওজনে এত ভারি হইয়া উঠিতেছে যে বক্তৃতার ফুঁয়ে আর তাহাদের হটানো যাইবে না। এমনি করিয়া দিন দিন প্রশ্ন জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই জটিলতার মীমাংসা করিতে গিয়া ব্যাপার আরো জট পাকাইয়া যাইতে লাগিল। এবং ধীর চিত্তে সব দিক দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া সে জট খুলিবার চেষ্টায় যে সময় গেল তার মধ্যে তার চতুর্গুণ জট অন্যত্র পাকাইয়া গেল। এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। শেষে ভাড়াটিয়া মোটরও দেখা দিল। তখন ঘোড়ারা একেবারে হতাশ।

* * *

কালো জুড়ি সেদিন বৈকালে বাহির হইয়া চৌরঙ্গীর গাড়ির আড্ডায় দাঁড়াইয়াছে। পাঁচু মিঞা কোচ-বাক্সে আছে। সমস্ত দিনের মধ্যে সে কিছুই রোজগার করিতে পারে নাই। সেইজন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। পাঁচু বসিয়া বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতেছিল।

ভাড়াটিয়া নাই। প্রায় পঁচিশখানা গাড়ি দাঁড়াইয়া—কাহারো একটা ডাক নাই। এমনই দুর্দ্দিন! অনেকক্ষণ পরে এক সাহেব খানিকদূর হইতে হাতনাড়া দিয়া ইসারা করিল। অমনি যে যেখানে ছিল গাড়ী লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। এমনি হুটোপাটি যে এ ওর ঘাড়ে গিয়া পড়ে! এমন সময় পাশের গলি হইতে ঝড়ের মতো এক মোটর হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল;—পড়বি তো পড় একেবারে কালো জুড়ির ঘাড়ের উপরে! কালো জুড়ি চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল—পাঁচু মিঞা গাড়ির উপর হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। বিপদ দেখিয়া অন্য গাড়োয়ানেরা যে যেখানে পাইল ছুট দিল—পাছে পুলিশে সাক্ষী দিতে হয়। রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেলে দেখা গেল—কালো জুড়ি রক্তাক্ত—গাড়ি অর্দ্ধ-ভগ্ন, কেবল পাঁচু মিঞা অক্ষত।

এই ব্যাপার লইয়া ঘোড়া মহলে খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। সকলেই মোটর গাড়ির দাম্ভিকতায় ক্ষেপিয়া উঠিল। একজন বিচক্ষণ ঘোড়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"বুঝিলে কি? ব্যাপারটার গূঢ় অর্থ বুঝিলে কি? মোটর গাড়ি যে অখুরকুল নির্ম্মূল করিবে তাহা ভগবান প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেন।" এই কথা শুনিয়া ঘোড়ারা চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া সে রাত্রি সমস্তক্ষণ আস্তাবলে পড়িয়া মনের ক্ষোভে কেবল চিঁ হিঁ হিঁ চিঁ হিঁ হিঁ করিতে লাগিল।

তারপর? তার পর আর কি? অনেক চিকিৎসা করিয়া দেখা গেল কালো জুড়ি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেছে। তাহাদের পিঁজরাপোলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। চারি চক্ষু দরদর-ধারায় বিগলিত করিয়া মুমূর্ষু জীবন-সঙ্গিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া তারা পিঁজরাপোলে চলিয়া গেল। যাইবার সময় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিয়া গেল—"হে মানববৃন্দ! জীবনে বড় দুঃখ রহিয়া গেল—শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের সেবায় প্রাণপাত করিতে পারিলাম না। হে প্রভু তোমরা ক্ষমা করিয়ো—কত অপরাধ করিয়াছি! মোহান্ধ হইয়া হয় ত কত সময় নিজের গোঁভরে চলিতে গিয়া তোমাদের অসুবিধা ঘটাইয়াছি। যেখানে তোমাদের জ্রুত যাওয়া প্রয়োজন, সেখানে হয় ত অবহেলা করিয়াছি—ছি, ছি! হয় ত অচল হইয়াছি। আজ জীবনের শেষদশায় তার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত। তোমরা ক্ষমা করিয়ো। হে দেব, যতই চেষ্টা করিনা কেন তবু আমরা তোমাদের হাতের কল একেবারে বনিয়া যাইতে পারি নাই—অনেক সময় নিজের দৌর্ব্বল্যবশত স্বেচ্ছাচার করিয়াছি —এ অক্ষমতার জন্য লজ্জিত। কিন্তু এখন এ আশা লইয়া মরিতে পারিব—আমাদিগের স্থান যাহারা অধিকার করিবে তাহারা তোমাদের হাতে তেমনই নাচিবে যেমন তোমরা নাচাইবে; আমরা যাহা পারি নাই আমাদের চেয়ে উন্নত যাহারা তাহা পারিবে।"

শুনিয়াছি পিঁজরাপোলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কালো জুড়ি আবেদন করিয়াছে তাহাদের সহিত তাহাদের অকর্ম্মণ্য জীবনসঙ্গিনীকেও পিঁজরাপোলে রাখা হউক। কিন্তু পিঁজরাপোলে গাড়ি রাখিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা সে আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন।*

শত্রু

(ইংরাজী নাটিকা অবলম্বনে)

পাত্র ও পাত্রী

পূরণ সিংহ...জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি; সম্ভ্রান্ত বংশের হীনাবস্থ বংশধর।

মীঠীবাঈ...পূরণ সিংহের যুবতী স্ত্রী।

একজন চিকিৎসক।

একটি পুরাতন ভৃত্য।

ছায়ামূর্ত্তি।

প্রথম দৃশ্য

[কাশ্মীরের একটি পুরাতন কেল্লার কাম্‌রা; কাম্‌রাটি একরকম আস্‌বাবহীন; দেওয়ালে ছবি নাই, কিন্তু ফ্রেমের দাগ আছে; মর্ম্মর প্রতিমাগুলি বিকাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার শূন্য বেদীগুলি দাঁড়াইয়া আছে। থাকিবার মধ্যে পূরণ সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের

* এইখানে শেষ না করিয়া লেখক যদি আরো অগ্রসর হইতেন আমার মনে হয় ভালো হইত। কারণ ইহা একটু আধুনিক গল্পের মতো হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করিয়া যথাসময়ে অর্থাৎ কালো জুড়ি ইহলোক ত্যাগ করিলে তাহাদের পারলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া এই গল্পটি শেষ করিবেন।—সম্পাদক।

কতকগুলি বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ মানুষের আকারে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া খাড়া হইয়া আছে। সময়—মধ্য রাত্রি। আঙার-ধানীতে আগুন জ্বলিতেছে। পূরণ সিংহ ও মীঠীবাঈ আসীন।]

পূরণ সিংহ।

হায় প্রিয়া! বড় ব্যথা পাই আমি প্রাণে
যখনি পৈতৃক এই গেহ পানে চাই;
হৃতসজ্জা কক্ষ সব, আভরণহীন
ঝঞ্ঝাহত নিষ্পত্র এ বনস্থলী হায়!
যুগযুগান্তের যত সঞ্চিত সম্পদ,—
মূর্ত্তি, চিত্র, গিয়েছে বিকায়ে একে একে,
অতীত জয়ের যত স্মৃতি-নিদর্শন
শত্রু-রক্ত-রেখাঙ্কিত খড়্গ তলোয়ার
সব গেছে নষ্ট হয়ে। পৈতৃক বৈভব
কিছু নাই; নিবে গেছে বংশের গরিমা।
কষ্টের উপরে কষ্ট হায় প্রিয়তমে!
তোমারে মলিন দেখি, আরামের নীড়ে
সুখে ছিলে হে কিশোরী! ঐশ্বর্য্যের কোলে;
না করিতে পদার্পণ আনন্দ যৌবনে
বন্দীসম বন্ধ মোর নিরানন্দ গেহে।

[বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পায়চারি করিতে লাগিলেন। মীঠীবাঈ আঙার-ধানীর আগুনের দিকে আরো ঘেঁষিয়া বসিলেন।]

কে দায়ী? কে দোষী ইথে? এই দুর্দ্দশার
দায় দোষ—সে কি মোর? মিতব্যয়ী আমি
চিরদিন, আশক্তি নাহিক দ্যূতে কভু,
মদ্যে মোর নাহি রুচি; তবু, নিত্য নব
দুর্নিয়তি হায় মোরে দুখ, দলে মোরে
দুই পায়ে, ধূলিতলে করে অবনত,
রন্ধ্রগত শনি সম নিয়ত ফিরিছে
অলক্ষ্যে নিষ্ঠুর শত্রু মোর পিছে পিছে।

মীঠী বাঈ।

শত্রু?...অতীত জীবনে, কখনো কি হায়
করেছ অহিত কারো? দেখ দেখি ভেবে,
সে বুঝিবা এতদিনে লয় প্রতিশোধ!
কিম্বা এ পৈতৃক শত্রু?—প্রাণে জাগে যার
শত্রুশোণিতের তৃষ্ণা—অতৃপ্ত দুর্ব্বার!

পূরণ সিংহ।

জেনেশুনে কভু কারো করিনি অহিত।

মীঠী বাঈ।

অজানিতে হয় তো করেছ; ভেবে দেখ।

পূরণ সিংহ।

পৈতৃক শত্রুর কথা...তাও শুনি নাই
পিতৃমুখে কোনোদিন; বংশগত রোষ
আমাদের বংশে নাই। এই শুধু জানি
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র যত, যত মোর গ্রাম—
একে একে গ্রাসিয়াছে শত্রু নামহীন,
মুখস পরিয়া মুখে পিছনে সম্মুখে
অহর্নিশি ফিরিছে সে গুপ্ত ছোরা হাতে
লক্ষ্যিয়া এ বক্ষ মোর পিতৃধনহারী।
মিছে তারে খুঁজে মরি ধরিতে না পারি।

[ঘরে ভোরের আলো ঢুকিতেই মীঠীবাঈ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

মীঠি বাঈ।

উঠেছে ভোরের হাওয়া, দেখিগে খোকারে।

(প্রস্থান)

পূরণ সিংহ।

(বর্ম্মময় মূর্ত্তিগুলির দিকে ফিরিয়া)

ওগো বর্ম্মপরিহিত পিতৃপিতামহ!
অতীতের দেশমুখ ওগো বীরগণ!

আছে কি এ বংশে কোনো অন্যায়ের কালি?
এ রক্ত কি অতীতের দুষ্কৃতি পঙ্কিল?
কোন্ অন্ধ যুগে হায় করেছ কি পাপ
ফলভোগ করি যার আমি এতদিনে?
তুমি খুল্লপিতামহ! তুমি হে হম্মীল্!
দুষ্কৃতিতে দুঃশাসন ছিলে তুমি শুনি,—
দ্বেদ্বেষী, রমণীর অপমানকারী,
পরের পীড়ক চির,—তোমারে কি কেহ
দিয়েছিল অভিশাপ অমোঘ দারুণ
যার দাহে আমি আজ দহি অহর্নিশি?
তুমি করে গেছ পাপ, এতদিনে তার
প্রায়শ্চিত্ত করে কি গো মোরে দিয়া? বল,
বল, বল, বল, কথা কও একজন
ভোরের আলোকে পরিস্নাত কথা কও।

[এই সময় বর্ম্মময় মূর্ত্তিগুলির উপর অল্পে অল্পে ভোরের আলো আসিয়া পড়িল।]

সবাই নির্ব্বাক। সব স্থির! স্পন্দহীন!
তবু সাধি পুনর্ব্বার, মৃতেরে জাগাই
প্রশ্নের উত্তর লাগি। বল, কে আমায়
করিল এমন রিক্ত সর্ব্ব বিত্তহীন?
কে করিল নগ্ন মোরে জগতের আগে?

ছায়ামূর্ত্তি।

(অভ্র-ফলকে ঢাকা জানালার পিছন হইতে)

আমি!

পূরণ সিংহ।

(আতঙ্কের স্বরে)

তুই!...কে তুই? জীবন্ত জীব কি রে?
কিম্বা মোর চিন্তা-তপ্ত মস্তিষ্কের মায়া?
মুখসে আবৃত মুখ...কথা ক'...কে তুই!

[পূরণ সিংহ স্বপ্নাবিষ্টের মত ছায়ামূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে না হইতে মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল।]

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ব্বোক্ত কাম্‌রা; সময়—মধ্য-রাত্রি; পট উঠিবার সময় দূরে পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজিল। পূর্ব্ব দৃশ্যে যেখানে ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়াছিল ঠিক সেইখানে পূরণ সিংহ দণ্ডায়মান।]

পূরণ সিংহ।

সেই তবে শত্রু মোর—মুখেতে মুখস্,—
সহসা দেখিনু যারে ভোরের আলোয়
আব্‌ছায়ে, সেই মোর দুর্দ্দশার হেতু
নিজমুখে করেছে স্বীকার; তবু ঠিক
পাইনি জবাব; বাহির করিতে তবু
সবিশেষ পারিনিক হায়, কোনো কথা।
নিকটে যেতে না যেতে হল অন্তর্ধান
নিঃসাড়ে, যেমন এসেছিল নিঃশবদে।

[গর্ভ-গৃহের দিকে চাহিয়া]

শিশু মোর ঘুমাইছে, কিন্তু কোথা গেল
প্রসূতি তাহার? এ রাতে কোথা সে নারী?

(পত্র হস্তে ম্লানবেশী বৃদ্ধ ভৃত্য প্রবেশ করিল।)

ভৃত্য।

প্রভু! ঠাকুরাণী মোর দিলেন এ চিঠি,
হুজুরের হাতে দিতে হুকুম তাঁহার
দুপুর বাজিয়া গেলে রাতের ঘড়িতে।

(পূরণ সিংহ সাগ্রহে ভৃত্যের হাত হইতে চিঠি লইলেন।)

পূরণ সিংহ।

(চিঠি খুলিয়া পাঠ)

"স্বামিন্! আমি বাড়ী ছাড়িলাম, আর ফিরিব না। বাড়ী ছাড়িলাম বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানিবেন আমি নিষ্কলঙ্ক। আমি

তোমার কুলে কালি দিই নাই, অন্য কানো
লোকের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই।
থাকিতে পারিলাম না, তাই চলিলাম।
আমাকে ক্ষমা করিয়ো, আর খোকা বড়
হইলে তাহাকে আমায় ক্ষমা করিতে
শিখাইয়ো। ইতি মীঠা বাঈ।"

[পূরণ সিংহ ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে
ইঙ্গিত করিলেন।]

পূরণ সিংহ।

চলে গেল, সেও ছেড়ে চলে গেল মোরে,
লক্ষ্মীশূন্য গেহ মোর শ্মশান করিয়া
চলে গেল।...হে বিধাতা! আর কিবা বাকী?
ছেড়ে গেল অকারণে? পারিল সে যেতে?...
দুশ্চিন্তার অবিশ্রান্ত দংশনের ব্যথা,—
নিত্য নব চিত্তের উদ্বেগ, দৈন্য জ্বালা,
অতিষ্ঠ বা করিল নারীরে! তাই বুঝি
ছেড়ে চলে গেল; সম্পদে লালিত সে যে
বিপদের দিনে শেষ দাগা দিয়ে গেল
বুকে।

(সহসা গর্ভগৃহের দিকে ফিরিয়া
তাকাইয়া রহিলেন।)

শিশু হোথা অঘোরে ঘুমায় একা!
জীবনের রক্তরাগ জাগে মুখে তাই,—
নহিলে ও ঘুম মনে হ'ত শেষ ঘুম
বলে; হায়, এরেও ছাড়িয়া গেল নারী!
বনের যে হিংস্র পশু—সেও নাহি ছাড়ে
আপনার শাবকেরে মরণের মুখে।
সে তবে কিসের লোভে ছেড়ে চলে গেল
অসহায় এ শিশুরে? লিখেছে চিঠিতে
"স্থির জেনো, নিষ্কলঙ্ক আমি।" তবে হায়,
কিসে তারে করিল এমন গৃহত্যাগী?

ছায়ামূর্ত্তি।

আমি!

পূরণ সিংহ।

তুই! ফের্ তুই! মুখসের আড়ে
নিজমুখে আপনারে করিস্ ঘোষণা
আমার দুঃখের হেতু বলি, যে দুঃখের
অধঃপাতে নাই রোধ, অবলম্বা নাই,—
তার হেতু তুই! তুই!...মোর কাছে আর
ঢাকিতে নারিবি তুই নাম আপনার,
বল্ নাম বল্; কি করেছি অপরাধ
তোর কাছে আমি? কী সে মহা অপরাধ
যার লাগি রিক্ত, শূন্য, উদাস, হতাশ
আমারে করিলি তুই এমন করিয়া?

(উত্তরের প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া রহিলেন।)

দিবি না উত্তর? তুই কি রে রক্ত মাংস?
কিম্বা উঠে এসেছিস্ প্রেতস্থান হতে
প্রতিহিংসাপূরিত অন্তরে, মোর পরে
নিতে প্রতিশোধ? মরণে কি ঢাকে নাই
বিস্মৃতি-অঙ্গারে অতীতের অগ্নিকণা?
কোন্ জনমের কোন্ অপমান স্মরি
ওরে প্রেত! মোর পিছে ফিরিস্ নিয়ত?
অমোঘ এ চির ঘৃণা তোর নিদারুণ,
মর্ত্ত্য মানুষের মত নহে এ ক্ষণিক।
কে তুই?...না জেনে আমি ছাড়িব না আজ।

(ছায়ামূর্ত্তির দিকে বেগে ধাবিত হইয়া
মাত্র মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পটক্ষেপণ
হইল।)

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ব্বোক্ত কাম্‌রা; সময়—গভীর রাত্রি;
পূরণ সিংহ উৎকণ্ঠিতভাবে নেপথ্যের দিকে

চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা দরজা
খুলিয়া একজন পক্বকেশ চিকিৎসক কাম্‌রায়
আসিলেন।]

পূরণ সিংহ।

খোকা?...জীবনের আশা আছে?

(চিকিৎষক বিষণ্ণভাবে ঘাড় হেঁট
করিলেন।)

হ'য়ে গেছে?

(চিকিৎসক নীরবে তাঁহাকে শান্ত
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূরণ
সিংহ একটা মলিন চৌকীর উপর বসিয়া
পড়িলেন।)

পূরণ সিংহ।

বৈদ্য ও গো! ও গো বৃদ্ধ! বল, তুমি বল,
দুঃখের উপরে দুঃখ জড় হ'য়ে হ'য়ে—
মতিভ্রম ঘটিছে কি মোর? বল, বল;
প্রতি দুর্ঘটন কালে, মনে হয় মোর
কারে যেন দেখি আমি জানালার পাশে
ওই খানে, সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকা তার,
মুখসে আবৃত মুখ। যখনি কাতরে
বিধিরে সুধাই নিজ দুরদৃষ্ট-হেতু,—
ওই মূর্ত্তি কাছে এসে বলে শুধু "আমি"!
বাহির করিতে নারি আর কোনো কথা
তার মুখ হ'তে, হায়! কাছে যদি যাই
অমনি সে হয় অন্তর্ধান। বল মোরে
বিজ্ঞ তুমি, সুস্থ মন, স্বচ্ছন্দ শরীর,
বল, বল, এ কি হায় মনের বিকার?
অধিক দুশ্চিন্তাভরে মস্তিষ্ক আমার
সদা তপ্ত,—এ কি তারি বিকৃত কল্পনা?
কিম্বা কেহ পিছে ফেরে প্রতিহিংসা লাগি'?
থাক তুমি এইখানে সতর্ক সজাগ,—
তোমার নাড়ীতে নাই চঞ্চলতা লেশ,—
দেখ তুমি কী এ ছায়া; বস মোর কাছে;
উত্তপ্ত মস্তিষ্কে মনে দাও হে আশ্বাস।

চিকিৎসক।

বিপদে বিক্ষিপ্ত মন, বিক্ষত হৃদয়,—
জাগিয়া স্বপন দেখে, বিচিত্র এ নয়।
প্রভাতের আগে আমি পাঠাব ঔষধ,
পান করি' ঘুমাইবে, ভয় কিছু নাই।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান।)

পূরণ সিংহ।

স্বর্গাসীন ভগবান! সর্ব্বশক্তিমান্!
জানি আমি দণ্ড তব ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত,
তোমারে সুধাই প্রভু কী অন্যায় আমি
করেছি জীবনে, যার লাগি এই শাস্তি?—
যার লাগি শ্রীহীন এ বাস্তভিটা মোর?—
যার লাগি অকারণে চলে গেল নারী?—
যার লাগি মৃত্যু নিল সন্তানেরে হরি?—
অভিশপ্ত আমি হায়, কী সে অভিশাপ?

(ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া।)

আমি!

পূরণ সিংহ।

ফের্ তুই এসেছিস্ হেথা? ফের্?
বার বার তিনবার! তবে ছায়া ন'স?
স্পষ্ট আমি দেখি তোরে চোখের সম্মুখে,
শত্রু বলে জেনেছি তোমায়, আপনি তা
করেছ স্বীকার বারে বারে মোর কাছে,
বলেছিস্—আমার দুঃখের হেতু তুই।
আজ হ'তে সঙ্গ নেব, পিছে পিছে তোর
ফিরিব দিবস নিশি সাগরে প্রান্তরে;
অরণ্য হয়নি আজো তেমন নিবিড়

যেথা তুই লুকাইবি আমারে এড়ায়ে,
দুর্গ আজো হয় নাই তেমন দুর্গম
আরাম করিবি যেথা মোরে ফাঁকি দিয়ে,
ওরে মূঢ় !—হেন দৃঢ় হয়নি কবাট।
যেমন ফিরেছ তুমি আমার পিছনে
তেমনি ফিরিব তোর পিছে পিছে আমি
আজ হতে, শিকারের পিছে ব্যাধ সম,
শেষ দেখে তবে সে ছাড়িব। একা আমি
শোকার্ত্ত, নির্ধন, নিঃসংসার—আজ হতে
এই কাজে শুধু সঁপিব জীবন মন ;
রিক্ত এ পৈত্রিক মোর ভিটার শপথ
সদ্যমৃত পুত্রের আতপ্ত দেহ আগে
দিব্য করি কহি আমি,—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়
নিঃশেষে বর্জ্জন করি আজ হতে শুধু
তোর পিছে ছুটিব নিয়ত ; যতদিন
বোঝাপড়া না হয় নিকাশ হিসাবের
ততদিন নিস্তার নাহিক মোর হাতে।

(ছায়ামূর্ত্তিকে ধরিতে যাইবামাত্র উহা অদৃশ্য হইল। পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ দৃশ্য

(একটা অত্যন্ত সরু মোদা গলি ; মেঘচ্ছিন্ন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। ছায়ামূর্ত্তি গলির মোদা মুখের দিকে লম্বা পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। সহসা পূরণ সিংহ ধূলিধূসর বেশে দৌড়িতে দৌড়িতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিলেন।)

পূরণ সিংহ।

এইবার পেয়েছি নাগালে ! আর কোথা ?
আর কোথা পালাবি এখন ? মোদা গলি,—
পালাবার নাই পথ, আত্ম-প্রকাশের
তোর এসেছে সময় ; দাঁড়া, ঘুরে দাঁড়া,
খোল্ ও মুখস্, নহিলে ফেলিব কেড়ে
এই খড়্গাঘাতে।

(তলোয়ার খাপ হইতে নিমেষে বাহির করিয়া)

ঘুরে দাঁড়া হ'স যদি
রক্ত মাংসে গঠিত মানুষ, ঘুরে দাঁড়া ;
এইবার দিতে মোরে হবে পরিচয়,—
এইবার বোঝাপড়া হিসাবনিকাশ ;—
প্রত্যাখ্যান করিবার রাখি নাই পথ ;
ঘুরে দাঁড়া, পিছে হ'তে মারিব না আমি।

(ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং আস্তে আস্তে মুখের মুখস এবং গায়ের আবরণ খুলিয়া ফেলিল ; ইহার মুখ চোখ, সাজসজ্জা সমস্তই হুবহু পূরণ সিংহের অনুরূপ।)

ছায়ামূর্ত্তি।

পূর্ণ সিংহ ! পূর্ণ হ'ল সাধ ?

পূরণ সিংহ।

(বিকট চীৎকার করিয়া)

এ কি ! আমি !

[বিকটচক্ষু মরণাহত পূরণ সিংহের কাষ্ঠবৎ দেহ জড়পদার্থের মত ছায়ামূর্ত্তির পায়ের গোড়ায় পড়িয়া গেল। ছায়ামূর্ত্তি পূরণ সিংহের বুকের উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িল।]

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

১। পূর্ব্ব ও পশ্চিম

ইয়াঙ্কি স্থানের 'মধ্য পশ্চিম' এবং 'আরও পশ্চিম' জনপদসমূহ এক্ষণে আমাদের পূর্ব্ব দিকে। কলম্বাস-আবিষ্কৃত ভূখণ্ডের মহাপশ্চিম প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। বস্তুতঃ ইহা সমগ্র জগতেরই পশ্চিমতম অংশ।

প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমতম অথবা পূর্ব্বতম বলিয়া কোনো শব্দ ব্যবহৃত হইতেই পারে না। প্রকৃতি দেবীর জ্ঞানে পূর্ব্ব বা পশ্চিম নামে কতকগুলি চিহ্নিত স্থান নাই। রামের বাড়ীর যে ঘর পশ্চিম ভিটায় অবস্থিত, সেই ঘর যদুর বাড়ীর হিসাবে পূর্ব্ব ভিটায় অবস্থিত। ইয়াঙ্কিদের পশ্চিমতম প্রদেশ ক্যালিফর্ণিয়া—কিন্তু ক্যালিফর্ণিয়া-বাসী প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে সূর্য্যাস্ত দেশ দেখে না কি ? কাজেই স্যান্‌ফ্রানসিস্কোর লোকেরা জাপানের টোকিওকে পাশ্চাত্য দেশীয় নগর বিবেচনা করিতে বাধ্য। ভারতবাসীর হিসাবে আফগানিস্থান হইতে ইংলিশস্থান পর্য্যন্ত সকল দেশই পাশ্চাত্য, সেইরূপ কালিফর্ণিয়া বাসীর হিসাবে জাপান হইতে হিন্দুস্থান পারস্য তুরস্ক পর্য্যন্ত সবই পশ্চিম দেশ। কাজেই স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোকে দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর বলিলে ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা সপ্রমাণ হয়। অথচ বিশ্ববাসী সকলেই এই ভুল বিশ্বাস ও ধারণা সংশোধন করিতেছে না কেন ? আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত জগতের সকল লোকই পৃথিবীর কতকগুলি দেশকে Near East বা সমীপবর্ত্তী প্রাচ্য, কতকগুলি দেশকে Farther East অথবা Middle East—দূরবর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তী প্রাচ্য এবং কতকগুলি দেশকে Farthest East—দূরতমবর্ত্তী প্রাচ্য বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কতকগুলি দেশকে আমরা বিনা বাক্য-ব্যয়ে পশ্চিম ও মহাপশ্চিম বিবেচনা করিয়া থাকি। প্রাকৃতিক হিসাবে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর লোকেরা টোকিও নগরকে পাশ্চাত্যদেশীয় বিবেচনা করিতে বাধ্য। অথচ দেখিতেছি এখানকার মহাপণ্ডিতেরাও জাপানীগণকে প্রাচ্যতম দেশের লোক বিবেচনা করে। দুনিয়ার পশ্চিমতম দেশের পশ্চিমে পূর্ব্বতম দেশ অবস্থিত হইল কি করিয়া ? আবার জাপানীরা প্রাকৃতিক হিসাবে আমেরিকাকে সূর্য্যোদয়ের দেশ অর্থাৎ প্রাচ্য বিবেচনা করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহারাও ইয়াঙ্কি সমাজকে পাশ্চাত্য বিবেচনা করিতেছে। দুনিয়ার লোকেরা কি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নির্ণয় করিতে জানে না ?

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শব্দ দুইটা পারিভাষিক শব্দস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাকৃতিক ভূগোলের হিসাবে এই দুই শব্দে যাহা বুঝায় পারিভাষিক হিসাবে তাহা বুঝায় না। ভৌগোলিকের বিবেচনায় কোনো দেশ সর্ব্বদা

প্রাচ্য, এবং কোনো দেশ সর্ব্বদা পাশ্চাত্য থাকিতে পারে না। একই জনপদ কোন দেশের পক্ষে পূর্ব্বে অবস্থিত কিন্তু অন্য দেশের পক্ষে তাহা পশ্চিমে অবস্থিত। অথচ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করিলে প্রাচ্য শব্দে সর্ব্বদা সকল দেশের লোকই কতকগুলি জনপদ বুঝিয়া আসিতেছে। আফগানিস্থান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সকল দেশই ভারত-বাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য—এবং চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম ও জাপান প্রাচ্য। কিন্তু পারিভাষিক ভাবে আমরা সমগ্র এসিয়াকেই প্রাচ্য বলিতেছি—জাপান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সকল দেশকেই ভারতবাসীরা প্রাচ্য বিবেচনা করে। তুরস্কের পশ্চিম হইতে ইয়োরোপের আরম্ভ বিচার করা হয়—আমেরিকাকে ইয়োরোপেরই বিস্তৃত অংশ ধরা যায়। এই দুই ভূখণ্ডকে এক সঙ্গে "ইয়োরামেরিকা" বলা যাইতে পারে। সমগ্র এশিয়বাসীর চিন্তায় এই দুই ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশ পাশ্চাত্য নামে পরিচিত।

এইরূপ কৃত্রিম অর্থযুক্ত পারিভাষিক শব্দের উৎপত্তি কেন হইল? প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ধরণের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইত না;—দুনিয়ার বড় বড় মহাদেশগুলিকে এইরূপে বিভক্ত করা হইত না। তখন ক্ষুদ্র গ্রীসের রাষ্ট্রপুঞ্জ তাহাদের বহির্ভূত সমাজকে মোটের উপর Barbarian বা বর্ব্বর বলিয়া জানিত। ইংরাজেরা বিদেশীয় লোকজনকে Welsh বলিত, হিন্দুরা বিধর্ম্মীদিগকে ম্লেচ্ছ বা দস্যু বলিত, মুসলমানেরা অপর ধর্ম্মাশ্রয়ী দিগকে কাফের বলিত। আজকালকার প্রাচ্য পাশ্চাত্য ইত্যাদি শব্দ তখন সৃষ্ট হয় নাই। এই শব্দগুলি বর্ত্তমান যুগের ইয়োরামেরিকানেরা আবিষ্কার করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীটা বিশেষভাবে এই জাতীয় মানবেরই বিশ্ব-বাণিজ্য ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যের যুগ। ইহারা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের নামকরণ করিয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্র ইয়োরামেরিকা—এই বিবেচনা করিয়া ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এই বিস্তৃত ভূভাগের জনগণ যেন এক অখণ্ড সভ্যতা ও সমাজের অন্তর্গত—সুতরাং ইহার এক অঞ্চলের পক্ষে যাহা প্রাচ্য, সকল অঞ্চলের পক্ষেও তাহাই প্রাচ্য এইরূপ বিবেচিত হইতেছে। বিলাতী কবি কিপ্‌লিঙের

"East is East, and West is West,
The twain will never meet"

ইত্যাদি সুপরিচিত দোঁহাতে East এবং West এই পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। ইয়াঙ্কি নগরের নৈশ দৃশ্য

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে রাত্রিকালে ষ্টীমারে ক্ষুদ্র উপসাগর পার হইতে হইয়াছিল। ষ্টীমারে বসিয়াই দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর ও বন্দরের নৈশ শোভা দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইয়াঙ্কিস্থানের প্রত্যেক নগরই রাত্রিকালে নন্দনপুরীতে পরিণত হয়। দেওয়ালীর উৎসব এই দেশে প্রতি রজনীতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলা যাইতে পারে। তড়িতের বাতী গৃহে গৃহে রাস্তায় রাস্তায় বাগানে,—নগরবাসীদিগের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। বাতীগুলি একমাত্র আলোকদানের জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাস্তার সৌন্দর্য্য, উদ্যানের শোভা, হোটেল ও দোকানের আকর্ষণীশক্তি ইত্যাদি নানা উপায়ে বাড়াইয়া তুলিবার জন্যই বাতীগুলি বিশেষভাবে সাজানো হইয়া থাকে। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার সময়ে এঞ্জিনীয়ারেরা আলোক-বিকীরণের প্রণালী বিশেষ দক্ষতার সহিত আলোচনা করেন। বাতী সাজাইবার বিদ্যাটা এদেশে একটা স্বতন্ত্র সাধনার সামগ্রী। কাজেই নিউইয়ার্ক হইতে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক নগরেই আলোকমালা একটা দেখিবার জিনিষ। রাত্রিকালে নগর পর্য্যটন একটা কার্য্যবিশেষ। একমাত্র দিবাভাগে নগরাদি দেখিলে এদেশের অর্দ্ধাংশ দেখা হয় মাত্র।

দোকান-গৃহের মালিকেরা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য আলোকমালার অশেষবিধ বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া থাকেন। তড়িতের শক্তি ব্যবহার করিয়া আজকাল লোকেরা আলোকের ইচ্ছানুরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন, আকৃতি পরিবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন ইত্যাদি সাধন করিতে পারে। ইয়াঙ্কিরা পাকা ব্যবসায়ী—বিজ্ঞাপন প্রচার ইহাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ। তড়িতের সাহায্যে আলোকমালার শোভা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে ইহারা যার-পর-নাই যত্নবান্। এক্ষণে স্যান্‌-ফ্রান্‌সিস্কোয় বিশ্ববাসীর সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ক্যালিফর্ণিয়া রাষ্ট্র দুনিয়ার লোককে আহ্বান করিয়াছেন। কাজেই

বিজ্ঞাপনের ছটা এখানে আজকাল চূড়ান্ত দেখিবারই কথা। কার্য্যেও তাহাই দেখিতেছি।

ষ্টীমার হইতে দেখিলাম—যে-ঘাটে নামিব তাহার মাথায় তড়িতের বাতী দ্বারা লেখা রহিয়াছে—"California invites the World—Panama-Pacific Exposition, 1915" প্যানামা যোজকে খাল কাটা সম্পূর্ণ হইয়াছে—এক্ষণে প্রশান্ত মহাসাগর আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘটনা স্মরণীয় রাখিবার জন্য যুক্তরাজ্যের ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশ এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে জগতের সকল জাতিই তাঁহাদের নিজ নিজ উৎকর্ষ-বিজ্ঞাপক বস্তু প্রদর্শনীক্ষেত্রে পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ১৯১৫ সালের সারাবৎসর এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

ষ্টীমার হইতেই সুবিস্তৃত প্রদর্শনীক্ষেত্রের সৌধসমূহের আলোকমালা দেখিতে পাইলাম। অট্টালিকাবলীর শিরোভাগ বিভিন্ন ধরণের—কোনটা গম্বুজের মত, কোনটা মন্দিরশীর্ষের মত, কোনটা গির্জ্জার মত ইত্যাদি। এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট সৌধের "রোশনাই" সাগরবক্ষ হইতে যেন কোন্ একটা আলোক-লোকের আভাস দিতেছে। বাতীর রংগুলি এবং অগণিত Search light-এর রেখাপাত সমগ্র নভোমণ্ডলকে অদ্ভুত রাগে রঞ্জিত করিয়াছে। মহানগরের উপরে মেঘশূন্য নীল আকাশ, তাহাতে শুক্লপক্ষের চাঁদ—কিন্তু

"স্থলভাগের দীপাবলী" চন্দ্র-কিরণকে নিতান্তই মলিন করিয়া তুলিয়াছে।

নগরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর নগর-শাসকেরা এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক রোশনাই সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্। কোন কোন রাস্তায় বাতীর ফটক প্রস্তুত হইয়াছে।

৩। বিশ্ব-মেলা

এই বৎসর দুনিয়ার সকল জাতি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরে সম্মিলিত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটা বিশ্ব-সম্মিলন ইয়াঙ্কিস্থানের আর-এক নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৪ সালের সেই মেলা সেণ্ট লুই নগরে আহূত হয়। এই নগর মিসিসিপি ও মিসৌরি নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। শিকাগোর ন্যায় ইহা মধ্যপশ্চিম জনপদের প্রধান নগর। এই দুই নগরকে কেন্দ্র করিয়াই ইয়াঙ্কিরা ক্রমশঃ মহাপশ্চিম প্রদেশে বাণিজ্য বিস্তার এবং বসতিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। সেণ্ট-লুইয়ের পূর্ব্বে শিকাগো নগরে বিশ্ব-মেলা বসিয়াছিল—সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সম্মিলন উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ ইয়াঙ্কি-স্থানে বেদান্ত প্রচারের সুযোগ পান। প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে জগতে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতি অল্প সাধিত হয় না। মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বুঝিবার জন্যই এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়া থাকে। ইয়াঙ্কিরা বিশ বৎসরের ভিতর তিনবার এইরূপ বিশ্ব মেলা আহ্বান করিল। ইয়াঙ্কিরা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সর্ব্ব-প্রথম প্রদর্শনী খুলিয়াছিল। সেই মেলা স্বাধীনতাপুরী ফিলাডেল্‌ফিয়ায় বসে। ইংরাজ হইতে স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষ স্মরণীয় রাখিবার জন্য তাহারা এই আয়োজন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইয়াঙ্কিরা প্রথমে প্রাচ্য জনপদে, পরে মধ্য জনপদে সর্ব্বশেষে পশ্চিম জনপদে তাহাদের সম্মিলনক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছে। তাহাদের ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্রমবিকাশের ধারাও এইরূপই;—তাহারা পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছে।

ফিলাডেল্‌ফিয়ায় সম্মিলনের ফলে প্রাচ্য জনপদের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে Civil war বাধে;—সেই গৃহবিবাদ ও দ্বন্দ্বের জের মিটাইয়া দিবার পক্ষে এই মেলা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। মধ্য প্রদেশে মেলাদ্বয়ের প্রভাবে ইয়াঙ্কিস্থানের লোকেরা স্বদেশের বিস্তৃত জনপদসমূহের যথার্থ পরিচয় পাইল। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পর্য্যটন আরব্ধ হইল। মধ্য প্রদেশের সুযোগ সুবিধাগুলি প্রাচ্য জনপদের লোকেরা জানিতে পারিল। ইয়াঙ্কিস্থান সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মিবার পক্ষে নানা উপায় সৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান বিশ্ব-মেলার ফলে ইয়াঙ্কিরা তাহাদের স্বদেশকে সত্য ভাবে চিনিতে পারিবে। তাহাদের মহাপশ্চিম জনপদ যে কত বড়, ইহার অভ্যন্তরে যে কত প্রকার ধাতু রত্ন শস্য পশু লুক্কায়িত আছে তাহা এইবার ইহারা যথার্থরূপে জানিতে

পারিবে। পূর্ব্ব ও মধ্য প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই বিশাল মহাদেশে পর্য্যটন করিতে আসিবে। এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল জনপদের নামমাত্র জানা ছিল, সেই সকল জনপদ এখন হইতে জীবন্ত সত্যরূপে ইয়াঙ্কিদের চিত্তে স্থান পাইবে। রেলকোম্পানিরা পর্য্যটকগণকে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোয় আকৃষ্ট করিবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাইতেছেন। তাঁহারা এক ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে অসংখ্য যাত্রী এই দিকে ঝুঁকিয়াছে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো দেখার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যটকেরা মধ্যবর্ত্তী পল্লী নগরাদিতেও ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেস আহূত হয়। তাহার ফলে ভারতবর্ষ বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সকল প্রদেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের ন্যূনাধিক পরিচয় সঙ্ঘটিত হইতে পারিয়াছে। শিল্প-সম্মিলন, সাহিত্যসম্মিলন, ধর্ম্মসম্মিলন, শিক্ষা সম্মিলন ইত্যাদির সাহায্যেও এইরূপে দেশের পরিচয় সকলেই পাইয়া আসিতেছে। এই সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে আর কোন সুফল না ফলিলেও অন্ততঃ দেশভ্রমণের সুযোগ ও প্রবৃত্তি সৃষ্ট হয়। দেশবাসীরা পরস্পর দেখাশুনা মেলামেশা ও ভাববিনিময় এবং কর্ম্মবিনিময় করিতে পারে। তাহা ছাড়া তুলনাসাধন, আত্মসংশোধন এবং আত্মোন্নতির উপায়ও সহজেই উদ্ভাবিত হয়। নিজের মামুলি কর্ম্মপ্রণালীকেই আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিবার কুসংস্কার চলিয়া যায়।

৪। প্রদর্শনী-ক্ষেত্র

উপসাগরের ধারে সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর প্রদর্শনী-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। প্রায় আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত স্থানে একটি নাতি ক্ষুদ্র সুরম্য নগর দেখিতে পাইতেছি। এই নগরের ভিতর রাজপথ, উদ্যান, ফোয়ারা, প্রাসাদ, সৌধ, আলোক-স্তম্ভ, নাচগৃহ, প্রমোদালয়, রেলওয়ে ইত্যাদি সবই আছে। সমগ্র প্রদর্শনী-নগর নির্ম্মাণ করিতে বহুকোটি টাকা খরচ হইয়াছে—কিন্তু মেলা শেষ হইয়া গেলে নগর ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে। মেলার সকলপ্রকার খরচের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা ১৫০,০০০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেড় টাকার টিকিট কিনিয়া প্রদর্শনী-নগরে প্রবেশ করিলাম। ফটক হইতে প্রাঙ্গণে পড়িয়াই মনে হইল যেন দিল্লীদরবারে উপস্থিত হইয়াছি। মহাভারত-বর্ণিত রাজসূয়-যজ্ঞের বিরাট আয়োজন চোখে পড়িতেছে। চারিদিকে মহোৎসবের লক্ষণ। পার্শ্বস্থিত কতকগুলি গৃহে নাচ, গান, বাজনা চলিতেছে—এদিকে ওদিকে সর্ব্বত্র লোকের ভিড়—অপূর্ব্ব নরনারীর সমাবেশ। সৌধ-সমূহ নানাবর্ণে বিভূষিত, আলোকস্তম্ভগুলির আকৃতি এবং বর্ণ নয়নরঞ্জক। বিচিত্র পতাকা, মূর্ত্তি, ফোয়ারা ইত্যাদির প্রভাবে সমস্ত প্রাঙ্গণ ও পথগুলি এক রমণীয় দৃশ্যের আধার হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে আমাদের দেশের বিবাহোৎসবের উল্লাস উচ্ছ্বাস বা 'যজ্ঞিবাড়ি'র মহাসমারোহ দেখা যাইতেছে। মোটের উপর মনে হইতে

লাগিল যে, দুনিয়ার নানাস্থান হইতে আনীত বস্তুগুলি না দেখিয়া কেবল প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের সৌধ, সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, উদ্যান, ফোয়ারা, আলোক-স্তম্ভ ইত্যাদি দেখিয়া গেলেও এই বিরাট বিশ্বসম্মিলনে আসা সার্থক হইবে। প্রদর্শনীর বাহিরে ইয়াঙ্কিরা অত্যুচ্চশ্রেণীর সুকুমার শিল্প, কলাজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, বিজ্ঞানশক্তি এবং সুশৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশ্ব-মেলার বাহ্য অঙ্গগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্ব্বপ্রথম দর্শন-যোগ্য।

কি দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে, একটি গৃহ সকলেরই চোখে পড়ে। তাহার নাম "রত্ন-মন্দির" বা Tower of Jewels।

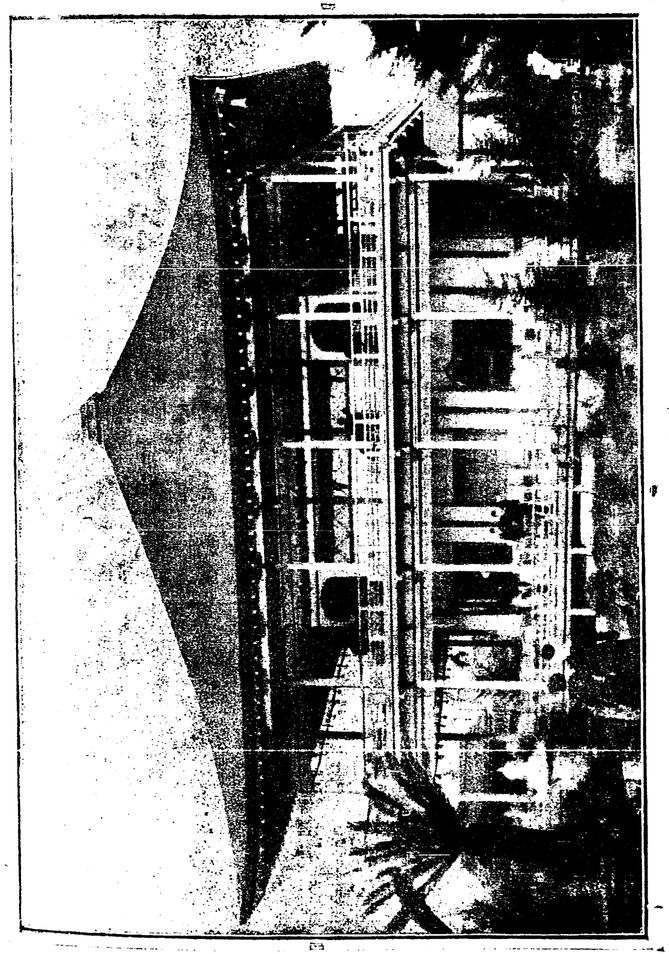

মেলাক্ষেত্রে জাপানী সৌধ

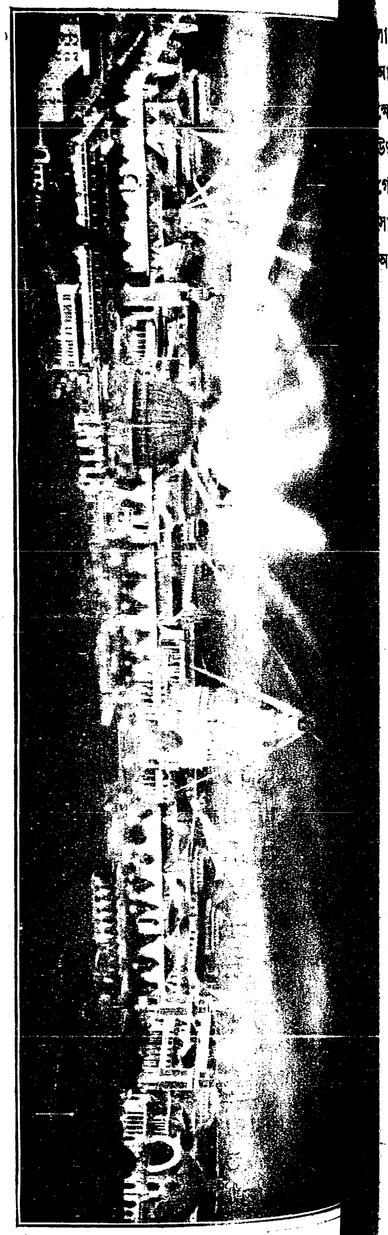

প্রদর্শনী-নগরের নৈশ দৃশ্য

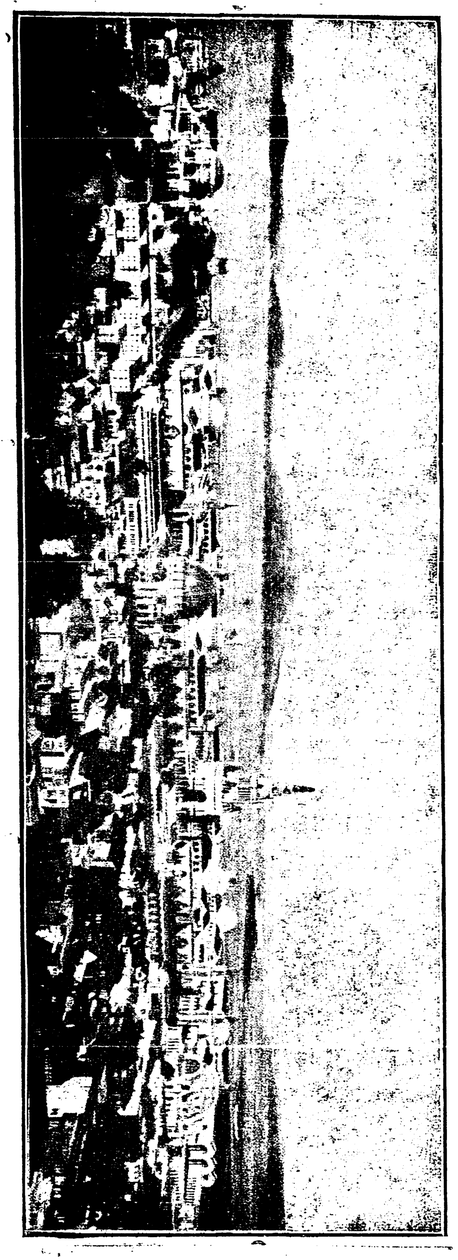

বিশ্বমেলার প্রদর্শনী ক্ষেত্র

দেখিতে ইহা হিন্দু-মন্দিরের মত—মন্দিরের "শিখর" ইহার বিশেষত্ব। জগন্নাথদেবের মন্দির অথবা রথের ন্যায় এই প্রাসাদটি কয়েক স্তরে বিভক্ত। সমস্ত প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধির জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতরে প্রদর্শনযোগ্য কোন পদার্থ রক্ষিত হয় নাই। চুনী, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, হীরা এবং অন্যান্য রত্নের বর্ণবিশিষ্ট কাচ-প্রিজ্‌ম্ এই মন্দিরের গাত্রে খচিত দেখিতে পাইলাম। দিনে সূর্য্যের কিরণে মণিমালায় বিভূষিত এই সৌধ দর্শক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় ১৫০০০ ক্ষুদ্র বৃহৎ রত্নসদৃশ উজ্জ্বল বস্তু এই সৌধ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাত্রিকালে ইহার গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া ওঠে। কারণ প্রায় দুই শত নানা রঙের আলোক নানা স্থান হইতে এই মন্দিরের উপর নিক্ষিপ্ত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শুনিতে পাই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সূর্য্যের কিরণ সপ্তবর্ণে বিভক্ত রামধনুর ন্যায় দেখায়। তাহাকে ইংরাজিতে বলে Aurora Borealis। সেই রামধনুসদৃশ আলোক-সন্নিপাতের আয়োজন প্রদর্শনীর কর্ত্তারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এইখানে রাত্রিকালের Aurora Borealis-এর অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের সৌধগুলির রচনা-রীতি নানা রকমের। এক এক ভবনের জন্য এক এক প্রকার নির্ম্মাণ-কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক কায়দা, মধ্যযুগের বাস্তু-পদ্ধতি, মুসলমানী রীতি, রেণাসাঁস্-প্রণালী ইত্যাদি নানাপ্রকার গৃহনির্ম্মাণরীতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যের ফলে চোখের আনন্দ বেশ জমে—গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে দৃশ্য পরিবর্ত্তন ও স্থান পরিবর্ত্তনে মন ক্লান্ত হইয়া পড়িবার অবসর পায় না। একঘেয়ে গৃহসজ্জা অথবা পথ-সমাবেশ দেখিতে গিয়া যে বিশেষ কষ্টকর হইত। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের এক স্থানে ফরাসী-রীতি, অপর এক স্থানে জাপানী-রীতি, কোন অংশে ওরিয়েন্টাল বাস্তুবিদ্যার নিদর্শন—অন্যত্র হয়ত কোথাও মুসলমানী কায়দা। এই বিশ্বমেলায় দুনিয়ার বিভিন্ন কারিগরী একত্র দেখিবার সুবিধা পাইলাম। দশ লক্ষ হইতে পনর লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এক-একটা সৌধ-নির্ম্মাণে খরচ করা হইয়াছে।

কেবল গৃহনির্ম্মাণ-রীতি দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেছি তাহা নহে। এখানে চিত্রকর-গণের কারুকার্য্যও কম দেখিতেছি না। সৌধসমূহের সাজসজ্জায় চিত্রবিদ্যার প্রয়োগ বহুল পরিমাণে দেখিতেছি। স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয়ও প্রদর্শন-ক্ষেত্রের কোন অংশেই দেখিতে পাই। প্রত্যেক ভবনের প্রাচীর, কার্ণিশ, স্তম্ভ, ছাদ ইত্যাদিতে নরনারীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রত্যেক উদ্যানে ও প্রাঙ্গণে বহু উচ্চ শ্রেণীর ভাস্কর্য্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলের ফোয়ারা অবস্থিত—সেইগুলির প্রত্যেকটাই স্থপতিগণের কারিগরীর অপূর্ব্ব নিদর্শন।

আলোক-বিকীরণে, বর্ণবিন্যাসে ও ফোয়ারা নির্ম্মাণে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যার চরম প্রয়োগ দেখিতেছি। গৃহনির্ম্মাণে

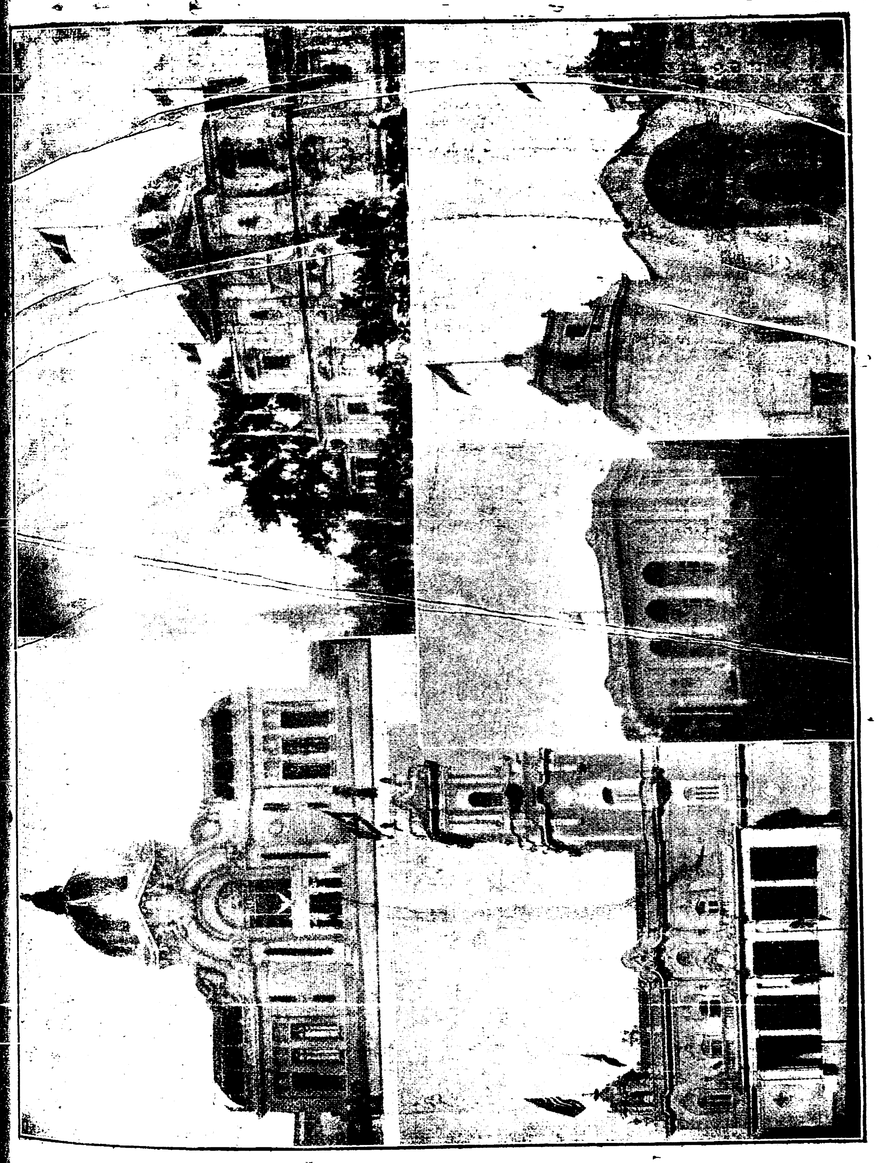

প্রদর্শনী-নগরের সৌধাবলী

এঞ্জিনীয়ারিংয়ের পরাকাষ্ঠা পাইতেছি। সুকুমার শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য, উদ্যান-রচনা ইত্যাদিও এই প্রদর্শনী-নগরে বিশেষরূপই দেখিবার জিনিষ। এই সমুদয়ের সাজান-গুছান কার্য্যেও উচ্চ অঙ্গের সৌন্দর্য্যজ্ঞান পরিস্ফুট রহিয়াছে। রাত্রিকালে কোন কোন দিন Fire-works বা আতসবাজীর খেলা দেখান হয়। হাওয়াই, তুবড়ী ইত্যাদির শেষ পরিণতি যেন তখন চোখের সম্মুখে প্রকটিত হয়। মনে হয়, বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়ই যেন এক্ষেত্রে অবতাররূপে একত্র আবির্ভূত হইয়া প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে এই নগর-রচনায় পরিচালিত করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মহাকুরুক্ষেত্রেও এই দুই অবতারের রাক্ষসী-লীলা দেখিতে পাই। সেই অবতারদ্বয়েরই অপর লীলা—শান্ত-মূর্ত্তি স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর এই মেলা-ক্ষেত্রে দেখিয়া লইলাম। সৌধসমূহের অভ্যন্তরে সংগৃহীত দ্রব্যনিচয় না দেখিলেও মনে দুঃখ থাকিবে না। বহির্ভাগেই সমগ্র বর্ত্তমান জগতের কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ধনশক্তি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে।

প্রদর্শনী-নগরের সাধারণ সৌধসমূহের সংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু তাহাদের আকৃতি সুবৃহৎ এবং রচনা-রীতি সৌন্দর্য্যের পরিপোষক। এই সৌধসমূহ ব্যতীত বহুসংখ্যক আমোদ-প্রমোদ-ভবন রহিয়াছে। এইগুলিতে চীনা, জাপানী, মিশরীয়, লোহিতাঙ্গ, মেক্সিকান্, মেওরি ইত্যাদি নানাজাতীয় জনগণের পল্লীজীবন বুঝাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সমুদয়ের নির্ম্মাণে ভিন্ন ভিন্ন "স্বদেশী" কায়দা অনুসৃত দেখিলাম। এগুলির ভিতর প্রবেশ ক[illegible]লে বিভিন্ন জাতি নরনারীর শিল্প, চিত্রকলা, দোকানদারি নাচগান, ক্রীড়াকৌতুক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিতে পারা লাগে। যাইয়া অনেক[illegible] সময় কাটি গেল। সহজে বিভিন্ন দেশের রীতিনী আদব-কায়দা হৃদয়ঙ্গম [illegible]বার পক্ষে বেশ ভাল উপায়।

এই সমুদয় কৌতুক[illegible] ব্যতীত আর কতকগুলি অট্টালিকায় [illegible]র্শনী-ক্ষেত্র পরি পূর্ণ। তাহাদের সং[illegible] প্রায় অর্দ্ধশত এইগুলির অর্দ্ধেক [illegible]াষ্ট্রের বিভি প্রদেশ কর্ত্তৃক নির্ম্মি[illegible]য়াছে। কো কোন প্রদেশের সকল [illegible] প্রদর্শনযো বস্তু এইরূপ এক ভব[illegible] সংগৃহীত র য়াছে। কালিফর্ণিয়া-রা[illegible] প্রাসাদ বিশে উল্লেখযোগ্য। জাপান, [illegible]হলাও, তুরস্ক আর্জ্জেন্টিনা, সুইজারল্যা[illegible] ইত্যাদি বিভি স্বাধীন রাষ্ট্রও ২০[illegible] গৃহ নির্ম্মা করিয়াছেন। এই প্রা[illegible]ক ও বিদেশী রাষ্ট্রভবনগুলির কোন[illegible] কানটা বিশেষ ভাবে দর্শনযোগ্য। [illegible] এই সমুদ দেশের প্রদর্শিত দ্রব্যনি[illegible] সাধারণ সৌধ সমূহেই রক্ষিত হইয়াছে।

চীনাগৃহ-নির্ম্মাণের [illegible] চীন হইতে কারিগর ও মিস্ত্রী আমদানী করা হইয়া ছিল। এমন কি বহু [illegible]কবর্ণ, তৈজসপত্র, উদ্যানরচনার সামগ্রীও চীন হইতে আন হইয়াছে। জাপানী গৃহও এইরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্যামদেশীয় ভবন পুরাপুরি ব্যাঙ্ক রাজ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পরে ইহার বিভিন্ন অংশ টুকরা টুকরা করিয়া

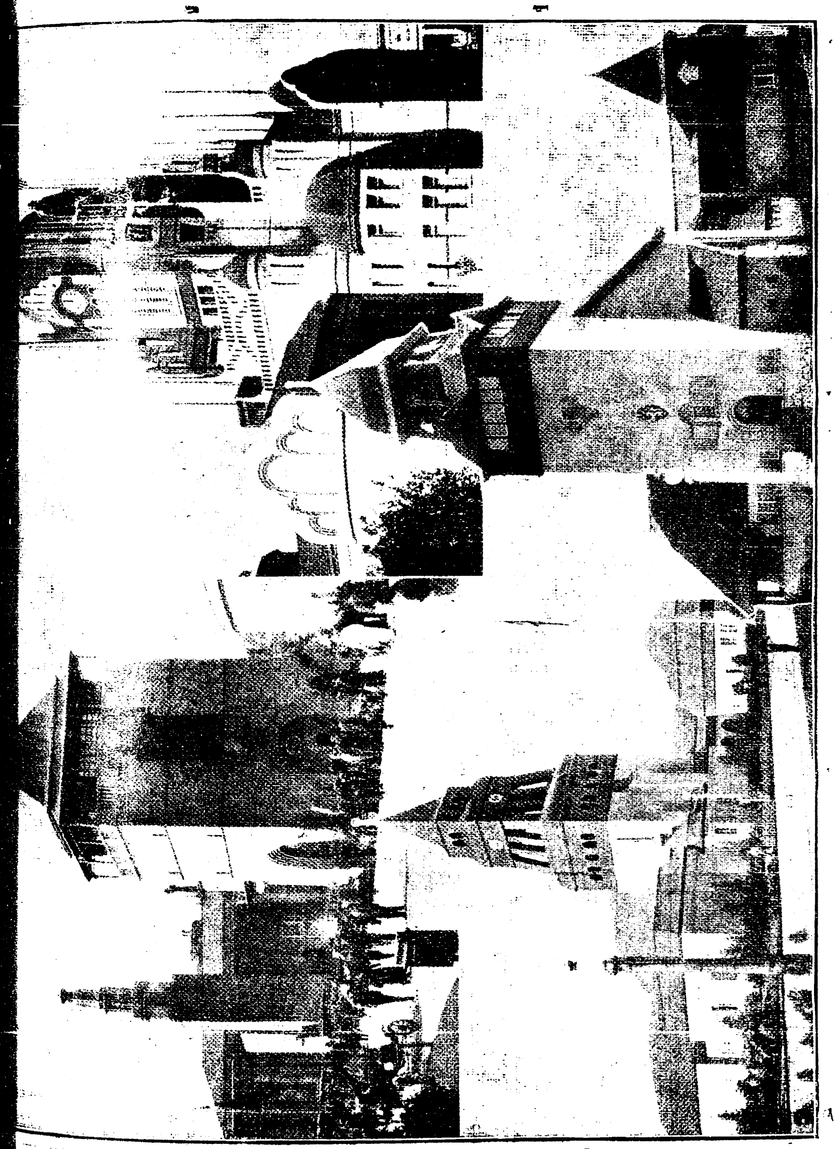

প্রদর্শনী-নগরের সৌধাবলী

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় পাঠান হইয়াছে। এই-খানে শ্যামদেশীয় মিস্ত্রীরাই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

এশিয়ার সকল দেশের পরিচয়ই এই বিশ্ব-মেলায় প্রচুর পরিমাণে পাইলাম। স্বতন্ত্র জাপানী ও স্বতন্ত্র চীনা ভবন ব্যতীত সাধারণ সৌধ-সমূহের প্রত্যেকটাতেই জাপান ও চীনের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু ভারত-বর্ষের চিহ্ন কোথাও দেখিলাম না। একজন পার্সী দোকানদার নিজ ব্যবসায়ের স্বার্থে কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন;—ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রতি-নিধি নাই। খাদ্যদ্রব্য-বিভাগে, সাধারণ সৌধের ভিতর দেখিলাম, বিলাতী, ইয়াঙ্কি ফরাসী, জার্ম্মাণ, তুরকী, চীনা, জাপানী, নিগ্রো, মেক্সিকান্ ইত্যাদি নানাজাতীয় রন্ধনপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। এই গৃহে পর্য্যটকেরা বিনা পয়সায় নানাবিধ খাদ্য খাইতে পায়। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম ময়দা রুটি বিস্কুটের এক [illegible] মহাজন প্রকাণ্ড মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। তাহার এক পার্শ্বে একজন পাগড়ী-ধারী ভারতবাসী খাদ্য [illegible] তত্ত্বাবধান করিতেছে। লুচি পকৌড়ি [illegible] ভাজিয়া দর্শকগণকে উপহার দেওয়া তাহার কার্য্য। বিরাট বিশ্ব-মেলায় ভারতবর্ষের স্থান এইটুকু।

শ্রীবিনয় কুমার সরকার।

শরৎ

রৌদ্র-গরদ ঝলমল বাসে
রামধনু ধরি করে
কে ওই আসিছে বরষা-বিকল
বিশ্বরাণীর ঘরে!
চলিতে চরণে ফোটে থরে থরে
কমল কুমুদ কত,
মঞ্জীর মধু বাজে নদী-নীরে
কল্লোলে অবিরত!

পরশে তাহার কাশের ক্ষেতেতে
দুধের লহর ওঠে,
সৌরভময়ী শেফালিকা আর
বন আলো করি ফোটে;
কীচক-কুঞ্জে বাজে বীণা বেণু
বাতাসে শিশির লেখা,
নীরনিমজ্জ ধান্যের শীষ
উঁকি দেয়—যায় দেখা।

বারিধি বরণ আকাশ আজিকে
মুক্ত মেঘের মাঝে,
আলোর জোয়ারে [illegible] পৃথিবী
ম্লানিমার নাহি [illegible],
রিক্ত চিত্ত উঠিছে ভরিয়া
চথার মধুর গানে,
চলচঞ্চল [illegible] ধরণী
পুণ্য পুলক বানে।

স্বাগত শরত [illegible]মোহিনী
ঋতুকুল অধিরাজ,
মানস সরসে [illegible] দেবী তব
সরস পরশখানি;
ফুটিয়া উঠুক কল্পনা-কলি
মেলিয়া হাজার দল
ভাব-সৌরভে করি মধুময়
মলিন মর্ম্মতল।

শ্রীনলিনীনাথ দে।

স্রোতের ফুল

(৩৭)

পরদিন বিপিন ও মালতীকে প্রেমানন্দ স্বামী সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে প্রেমযোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাক্য-মনের সংযমের জন্য তাহাদের প্রতি প্রত্যহ লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করিবার আদেশ হইল; সে জপ একদিন মালাতে এবং একদিন কাগজে লিখিয়া করিতে হইবে।

গুরুজী প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শিষ্যদের [illegible] শাস্ত্রপাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন [illegible] পর কীর্ত্তন করেন। এই অবসরে প্রেমা তিনি দেখিতে লাগিলেন যে বিপিন ও মালতীর ব্যাকুল দৃষ্টি ঘন ঘন অভিসার করে এবং চকিতে মধ্যপথে মিলিত হইয়া ভরে ফিরিয়া আসে। তাহারা কৃষ্ণনাম লিখিতে লিখিতে অনেক সময় ভুলিয়া নিজেদের প্রেমাস্পদের নাম লিখিয়া ফেলে এবং গুরুজীর কাছে ধরা পড়িয়া এমন একটি সলজ্জ আনন্দের ভাবে পরস্পরের দিকে চুরি করিয়া তাকায় যে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এই দুটি ব্যাকুল প্রাণের শান্ত নীরব প্রণয়লীলা গুরুজীর মনে প্রথম প্রথম একটি অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার করিতে লাগিল এবং সেই জন্যই তিনি বিপিন ও মালতীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে লাগিলেন।

তাহাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে গিয়া গুরুজী দেখিলেন যে এই দুটি লোকের কাছে তাঁহার আসন অন্তত একজনের নীচে। এমন ঘটনা গুরুর অভিজ্ঞতায় এই নূতন; তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছে, অথচ তাঁহার চেয়ে অন্য লোকের প্রতি বেশি আকর্ষণ, এমন লোক তিনি এই প্রথম দেখিলেন। তাঁহার সকল ভক্ত শিষ্য তাঁহাকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল; আজ বিপিন ও মালতীর কাছে তিনি সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তি নহেন; ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে ক্রূর হইয়া উঠিল। সংযম সাধনের জন্য বিপিন ও মালতীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় না হয় গুরুজী এমন ব্যবস্থা করিলেন।

গুরুজী নিজের অজ্ঞাতসারে মনের সমস্ত অহঙ্কার ও লালসা চুয়াইয়া নিজের প্রাণপ্রদীপ ভরিয়া রাখিয়াছিলেন, অপেক্ষা ছিল একটি জোরালো প্রতপ্ত স্ফুলিঙ্গের। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে বিপিন ও মালতী চকমকি ও ইস্পাতের মতো নিজেদের প্রণয়সংঘর্ষণে যে দীপ্ত অগ্নিকণা বিকীর্ণ করিতেছিল তাহা গুরুজীর প্রাণপ্রদীপখানি জ্বালাইয়া দিল। গুরুজী এই নূতন আলোকে ছন্নদৃষ্টি হইয়া বিপিন ও মালতীর দৃষ্টি আবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গুরুজী বিপিনকে বুঝাইয়া দিলেন যে সাধনের প্রথম অবস্থায় মালতীর সহিত সাক্ষাৎ তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অতএব তাহাদের এক্ষণে পরস্পরকে দেখা দেওয়া উচিত নয়। মন স্থির হইয়া গেলে তাহারা স্বচ্ছন্দেই পর-

স্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। বিপিন গুরুজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মালতীকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু মালতী বিপিনকে এড়াইবার জন্য বিশেষ কিছু ব্যস্ত হইল না; তাহার যে আধ্যাত্মিক পথে দ্রুত অগ্রসর হইবার কিছুমাত্র ত্বরা আছে এমন লক্ষণ সে একেবারেই দেখাইল না।

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও মালতী আর এখন বিপিনকে দেখিতে পায় না। গুরুজী এখন স্ত্রী ও পুরুষ-শিষ্যদিগকে পৃথক ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যে আধ্যাত্মিক বিঘ্নকর ইহা এখন তিনি মুক্তকণ্ঠে যখন-তখন প্রকাশ করেন।

মালতী বিপিনকে অন্তত দেখিতে পাইবার লোভেই এই সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়াছিল; সে আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় লুব্ধ হইয়া আসে নাই। এখন সেই একমাত্র অবশিষ্ট সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত হইয়া এই আশ্রমবাস তাহার নিকট কষ্টকর কারাবাস হইয়া উঠিল। সে সুযোগ খুঁজিয়া যদি বা কখনো বিপিনের কাছাকাছি হইত, বিপিন গুরুজীর ও আধ্যাত্মিক বিঘ্ন হইবার ভয়ে তাহাকে দেখা দিত না। সে অকস্মাৎ কখনো বিপিনের গৈরিক উত্তরীয়ের চঞ্চল আভাস দেখিয়া চমকিয়া উঠিত, বিপিনের দূরাগত কথা আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহার বুকে বাজিত। বিপিন তাহার কত কাছে অথচ কী সুদূর। তাহার সেই আর্ত্ত জীবনের সহিত কী নিদারুণ ভাবে বিচ্ছিন্ন! মালতীর দিনগুলি একটার পর একটা বোঝার মতো নামিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সময় যেন প্রকাণ্ড একটা অরূপ সূতার গুলি এবং দিনগুলি যেন লম্বা ধূসর বর্ণের সূতা, সেই গুলি হইতে ক্রমাগতই খুলিয়া খুলিয়া আসিতেছে, তাহার অন্ত নাই, অবসান নাই, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই ধূসর ক্লান্ত দিনগুলি এমনি উদাস-বিষণ্ণ ভাবেই আসিবে ও যাইবে এবং আমরণ তাহাকে এই আশ্রমে গুরুজীর শুষ্ক কঠোর উপদেশামৃত হজম করিবার দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

মালতীর মনে তাহার পূর্ব্ব অবস্থার যে-সব আনন্দমধুর ভাবরস সঞ্চিত হইয়া ছিল সেই-সব ভাবস্মৃতি আজ তাহাকে একাকিনী পাইয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে গুঞ্জন করিতে লাগিল; তাহার কেহ সঙ্গিনী ছিল না যে দুদণ্ড তাহার সহিত কথা কহিবে বা তাহার কাছে নিজের বেদনা উজাড় করিয়া হৃদয় লঘু করিবে; তাহার যত কিছু সুখদুঃখ চিন্তাভাবনা সবখানিই তার নিজের একলার; সেই-সব অতীত ও অনাগত ভাব ও আশা আলো-আঁধারের জাল বুনিয়া তাহার চারিদিক ঘিরিয়া দিতে লাগিল। সে জালের ত অন্ত নাই, ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহার দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া তুলিল, আলোয় আঁধারে গলাগলি হইয়া তাহার যেন শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল। কখনো কখনো তাহার চিত্ত যেন অকূল অপার সাগরের মতো দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত; ভীষণ গর্জ্জনে কালো কালো ঢেউ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিত; তখন সে চোখ বুজিয়া মনে

করিত নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইয়া এখান হইতে কোথাও পলায়ন করিবে,—দূরে—দূরে—সে বহুদূরে,—তাহার মাসিমা যেমন সংসার অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও অনেক দূরে—সে পলায়ন করিবে, সে পলায়ন চিরজন্মের পলায়ন, তাহার পশ্চাতে প্রত্যাবর্ত্তন থাকিবে না, এই ধূসর দিনের মধ্যে এই দুঃসহ দুর্ব্বোধ অবস্থায় আর সে কখনো ফিরিয়া ধরা দিবে না।

যখন মালতীর নিজের এই নিঃসঙ্গ দারুণ অবস্থা দুর্বহ বোধ হইত তখন সে মাঝে মাঝে পড়িতে চেষ্টা করিত। পড়িতে পড়িতে মনে হইত সে যেন আর এই সন্ন্যাসীর আশ্রমের লোক নয়, সে যেন কোন্ আনন্দ-লোকের অধিবাসী; কিন্তু বই বন্ধ করিলেই মনে হইত সে যেন আনন্দের মন্দিরচূড়া হইতে একেবারে দুঃখের তিমির গহ্বরে পতিত হইয়াছে। তখন সে প্রায়ই ভগবানের উপাসনা করিতে বসিত এবং উপাসনান্তে মনে হইত যেন তুষার-শীতল চন্দনবাসিত তাঁহার চরণামৃতে হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা ধুইয়া মুছিয়া জুড়াইয়া গেছে।

ওদিকে বিপিনের গুরুজীর প্রতি অচলা ভক্তি এবং সংযম অভ্যাসের প্রতি অসাধারণ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাহার অবস্থা ক্রমশ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। বিপিন সংসারের অবস্থা-পরম্পরার আঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোথাও একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; এখানে আসিয়া বিপিন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইয়াছে, এবং সেই জন্যই এখন তাহার মন মালতীর অভাব বিশেষ করিয়াই অনুভব করিতে পারিতেছে। আধ্যাত্মিক মিলন প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনিতে যেমন চমৎকার, জীবনক্ষেত্রে বিপিনের তাহা তেমন লোভনীয় বোধ হইতেছিল না। জীবনের বিরুদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া বিপিন নিজের প্রণয়ের প্রতি তাকাইয়া দেখিবার অবসর পায় নাই; এখন তাহাকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া মালতীর প্রতি তাহার প্রেম আকার ধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া, জাগ্রত হইয়া, মোহন রূপে একেবারে চোখের সামনে উপস্থিত হইল। বিপিন কাব্যসাহিত্যে প্রেমের কথা যত কিছু পড়িয়াছিল সমস্তই সে দেখিল তাহারই হৃদয়ের তুচ্ছ প্রতিধ্বনি। মালতী যখন আশ্রমে আসিতে চাহিয়াছিল, তখন বিপিনের অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এখন সে দেখিতেছে মালতীর এখানে আসা না-আসা সমান। মালতী উপরের ঘরে থাকে, সে থাকে ঠিক তাহারই নীচের ঘরে—একখানি ছাদ মাত্র ব্যবধান, কিন্তু সে-ই কত দূর! মালতী উত্তর-মেরুতে থাকাও যা, এখানে অদর্শনীয় হইয়া থাকাও তাই। মাথার উপর ঘরের মেঝেয় কাহার পদশব্দ, জিনিষ রাখার খুটখাট শব্দ হয়,—হয়ত সে-সব মালতীরই অস্তিত্বের পরিচয়, কিন্তু সে-সব যেন হৃদয়ের মাঝে স্মৃতির স্পন্দন, দেখিবার নয়, শুধু অনুভবে বুঝিবার। মালতীকে তাহার যতই দুর্লভ মনে হইতে লাগিল, ততই তাহার আবেগময় চিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে হইত সম্মুখে

সমস্ত জীবনই ত পড়িয়া আছে—তাহার অতৃপ্ত উপবাসী জীবন; তাহা কি সে এমনই দুশ্ছেদ্য সঙ্কটজালে জড়াইয়াই রাখিবে, না, একদিন সবলে দুই হাত দিয়া সকল জাল জঞ্জাল দূর করিয়া দিয়া নিজের ক্ষুধা মিটাইবে। এখন মালতীকে একেবারে হারাইতে বসিয়া কৃপণের মতো মালতীর পায়ের ধ্বনিটুকু, কাশির শব্দটুকু, চাবি বা চুড়ির টুনটুনিটি, আবছায়া মূর্ত্তির চকিত দৃষ্টিটি কুড়াইয়া বেড়ানোই বিপিনের কাজ হইয়া উঠিল। মালতীর অস্তিত্বের পরিচয় পাইবার জন্য বিপিনের সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিত, আর যখনই সে মালতীর অস্তিত্বের এতটুকু চিহ্ন ধরিতে পারিত, তখনই সে আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উঠিত। এই নিভৃত গঙ্গাতীরের মনোরম উদ্যানে বিশ্বসঙ্গীতের মাঝখানে সে আপনার আরাধ্যা দেবীর ধ্যানমূর্ত্তির নিকটে আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতে লাগিল। একদিকে পাহারা দিতে গিয়া বিপিন আর সব দিকে অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়া উঠিতেছিল; সে নাম জপ করিতে করিতে উদাসভাবে বসিয়া থাকিত, একটু শব্দ শুনিলেই চমকিয়া উঠিত।

মালতীরও অবস্থা বিপিনেরই অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। মালতী নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না; রাত্রে সকলের সুপ্তির স্তব্ধতার মাঝখানে সে একা বারান্দায় উঠিয়া গিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত—জীবনটা ত এমনি একটানা মধুস্রোতের মতো ভাসিয়া যাইতে পারিত! বিপিনকে সে কত ভালো বাসিয়াছিল; কিন্তু আজ এমন অসময়ে আসিয়াছে যে বিপিনের জন্য বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। অথচ সে বিপিনকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতে চায় না। কেন সে দুদিনের জন্য একটা দৈব দুর্বিপাকের মতো চৌধুরী-পরিবারে গিয়া পড়িয়াছিল, সে ঘূর্ণী উড়াইয়া তাহার আজন্মের স্নেহনীড় হইতে বিপিনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে কিন্তু নিজের সঙ্গেও তাহাকে মিলাইতে সে পারিল না; এর চেয়ে তাহার বাপের ভিটায় পড়িয়া থাকিয়া মরা যে শতগুণে ছিল ভালো। যাহার স্বাদ সে জীবনে কখনো জানে নাই, জানা যাহা উচিত ছিল না, সেই প্রণয়ের স্বাদ জানিল যদি তবে জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিল না কেন? সে যে বিপিনের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে ইহার লজ্জা সে কিছুতেই ঢাকিতে পারিতেছিল না। এ লজ্জা ঢাকে বিপিন যদি তাহাকে এখনও গ্রহণ করে। সুতরাং সে নিজের কাছে স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার অন্তরের অন্তরালে একটি মিলনচেষ্টা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। এইরূপে তাহাদের প্রণয় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বাঁধরুদ্ধ নদীস্রোতের মতো ফাঁপিয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। এক একবার সকল বাঁধ ভাঙিয়া মিলিত হইবার বিদ্রোহভাবও তাহাদের মনে আসিতে আরম্ভ করে নাই এমন নয়।

কিন্তু নূতন শিষ্যদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অতিমাত্র সতর্ক ও উৎকণ্ঠিত গুরু সর্ব্বদাই তাহাদিগকে পাহারা দিয়া ফিরিতেন বলিয়া শিষ্যদের এতটুকু চাঞ্চল্য

এবং মিলন-চেষ্টা গুরুর দৃষ্টি এড়াইত না। গুরু তখন বিপিন ও মালতীকে নূতন নূতন নিয়ম সংযম অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিতেন। তাহাদিগকে বুঝাইতেন যে এই-সব চাঞ্চল্য ধর্ম্মপথে চিরকালই অন্তরায়-রূপে উপস্থিত হয়; ইহাকেই খৃষ্টানে ও মুসলমানে বলে সয়তান, বুদ্ধ বলিয়াছেন মার। মহাদেবের মতো মদন ভস্ম না করিলে গৌরীকে পাওয়া যাইবে না; শঙ্করকে পাইতে হইলে গৌরীরও তপস্যা করিতে হইবে।

বিপিন গুরুজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আবার আপনাকে দমন করিতে চেষ্টা করিত। মালতী কিন্তু তেমন আগ্রহ সহকারে গুরুজীর উপদেশ ও বিবিধ অনুষ্ঠান পালন করিত না। এই বিদ্রোহী নারীটিকে লইয়া গুরুদেব বিব্রত হইয়া উঠিলেন; তাহাকে শাসন করিতে গেলে সে তর্ক করে, শাস্ত্রের দোহাই সে মানে না, ব্যবস্থিত অনুষ্ঠান সে পালন করে না। এই-সব কারণে গুরুর বাধ্য হইয়া এই অবশ্যা শিষ্যাটিকে অত্যন্ত অধিক মনোযোগের সহিত আগলাইবার দরকার হইতে লাগিল।

গুরু যতই নিবিষ্ট মনে মালতীর আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ততই তিনি সেই তেজস্বিনী বুদ্ধিপ্রখরা সুন্দরী তরুণীর বিপিনের প্রতি অনুরাগ ও প্রণয়ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রেমানন্দের মনে ঈষৎ ঈর্ষা দেখা দিল,—

"কুশের অঙ্কুর সম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম!"

গুরুর কেবলি মনে হইতে লাগিল তাঁহার জন্য কাহারো হৃদয় ত এমন করিয়া ব্যাকুল বেদনায় স্পন্দিত হয় না। এতকাল নিরবচ্ছিন্ন সম্মান সম্ভ্রম পাইয়া পাইয়া তাঁহার অহঙ্কার পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; আজ মালতী সেই চিরাভ্যস্ত জীবনপ্রবাহের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটাইয়া প্রেমানন্দের মনে এমন একটি নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল যাহাতে তিনি কিছুতেই নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল মালতীর অখণ্ড মনোযোগ তাঁহারই প্রাপ্য, বিপিন তাহা ফাঁকি দিয়া নিজে আত্মসাৎ করিতেছে।

তখন, মালতীর মন বিপিনের দিক হইতে একেবারে বিমুখ করিয়া দিয়া নিজের দিকেই নিতান্ত নিবিষ্ট করাইবার জন্য গুরু বিপিনের প্রতি কঠিনতর নিয়মের ব্যবস্থা করিলেন এবং আপনি মালতীকে পাহারা দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া নিজের কাছেই নিজেকে তাঁহার ছোট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে তিনি কিছুমাত্র অন্যায় করিতেছেন না, কর্ত্তব্যই তিনি করিতেছেন, শিষ্যের ইহপারত্রিক কল্যাণের জন্য গুরুর ত এমনি সতর্ক প্রহরী হওয়াই চাই,—গুরু হওয়া কি অমনি মুখের কথা, শিষ্যের পাপের অংশীদার যে গুরু!

নিজের কাছে যখন কাজটা বেশ সঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া গেল তখন গুরু

বেশ হৃষ্টভাবেই মালতীর পাহারায় উৎসাহিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

(৩৮)

গুরু যখন মালতীকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মালতীও তখন নিজেকে লইয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম প্রথম এই আশ্রমে আসিয়া তাহার বেশ ভালোই বোধ হইতেছিল; গঙ্গার ধারে এমন একটি চমৎকার উদ্যানে বিচিত্র রকমের ফুল, অপূর্ব্ব ধরণের কেয়ারি, কত জানা অজানা গাছের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, রকম রকম পাখীর গান, ময়ূর হরিণের নাচ, গঙ্গার বুকে প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, বিচিত্র রকমের নৌকা ষ্টিমারের গতিভঙ্গী, সকালে সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে আলোছায়ার খেলা, মাঝির গান, বাতাস চিরিয়া ষ্টিমারের বাঁশির চীৎকার দেখিয়া ও শুনিয়া তাহার দিন উহারই মধ্যে বেশ একরকম আনন্দেই কাটিতেছিল। মালতী মথুরাপুরে বিপিনের বাড়ীতে সকলের ছুতের ভয়ে আড়ষ্ট নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এখানে আসিয়া রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া সে অনেকটা নিজেকে লঘু মনে করিতেছিল। কিন্তু গুরুর কৃপায় তাহার সেই-সব কাজ হইতে অব্যাহতি মিলিয়াছে, তাহাকে নড়িয়া বসিতে হয় না, একগাছি কুটা ভাঙিয়া দুটুকরা করিতে হয় না, উপর হইতে নীচে নামিবারও তাহার হুকুম নাই। কিন্তু মালতী এমন অদ্ভুত রকমের লোক যে ভূতের মতন খাটুনি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এতবড় সৌভাগ্য সে গুরুর প্রতি প্রসন্নকৃতজ্ঞতায় হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া সমস্ত দিন গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে; ওপারের গাছের ঘন সবুজ ঝোপের মাঝে মাঝে আবছায়া বাড়ীগুলি ছবির মতন চিরদিনই নিশ্চল, কোনো বাড়ীতে একটু প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না, যেন সবাই মালতীর মতোই নিষ্কর্ম্মা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। অকস্মাৎ যদি কোনো দিন মালতী দেখে কোনো বাড়ীর ছাদে কোনো বধূ কাপড় শুকাইতে দিতেছে, কি কোনো চিলের ছাদের উপর একখানা রঙচঙা ঘুড়ি কোনো শিশু বালকের মোহনস্পর্শের পুলকে স্পন্দিত হইতেছে, অমনি তাহার সমস্ত শরীর মন যেন সজীব জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই প্রাণের পরিচয় শীঘ্রই মিলাইয়া যায়; তখন মালতী দেখে নদীর বুকে জলের স্রোত চলিয়াছে, অফুরন্ত সুতার মতন, স্রোতের শাড়ীর মতন, অন্ত নাই, বিরাম নাই, কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন বিশ্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, কাহারো ধার সে ধারে না, কাহারো সুখদুঃখে তাহার কিছু আসিয়া যায় না। স্রোতের উপর নৌকা-গুলি কালো কালো পাখীর মতো শাদা পালের ডানা মেলিয়া নীরবে ভাসিয়া যায়, ষ্টিমারগুলি পেকাণ্ড রাজহাঁসের মতো তীব্র চীৎকার করিয়া জল কাঁপাইয়া পাখা ঝটপট করিয়া ছুটিয়া চলে, ব্যস্তসমস্ত পান্সির বুকে বসিয়া আপিসের বাবুরা তামাক খায়, গান গাহে,—কিন্তু সবই

যেন নিত্যকর্ম্মের আবৃত্তি মাত্র, কোথাও যেন একটি সচেতন চেষ্টা জাগ্রত হইয়া নাই, সমস্তই যেন যন্ত্রবদ্ধ একঘেয়ে বোধ হয়। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। পাখীর দল ম্লানায়মান সূর্য্যাস্তদীপ্তির স্বর্ণশোণিত গগনের মধ্য দিয়া নদীর উপর দিয়া তারণদ্বারে পুষ্পপল্লবের মঙ্গল-মাল্যের মতো উড়িয়া যায়, মালতী দেখিয়া দেখিয়া কি ভাবে। লম্বা লম্বা তাল জাতীয় গাছগুলির ছায়া তাহার চোখের সামনেই ক্রমে হইতে আসিয়া পূর্ব্ব দিকে ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, ওপারের কালো কালো গাছগুলির উপর কালো অন্ধকার ঘন হইয়া উঠে, সমস্ত ক্রমশ একাকার সঙ্কুচিত হইয়া যায়, দূরে আর দৃষ্টি চলে না, তখন মালতী ঘরের কোণে একলা আপনাকে লইয়া চুপটি করিয়া কাটাইতে হয়। পরিণামবিরস শীতের দিনগুলি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহে না।

যখন আহার আর কিছু ভালো লাগে না, তখন মালতী বই খুলিয়া বসে; অনেক সময় বই তাহার কোলের উপর চোখের সামনে খোলাই পড়িয়া থাকে, মন তাহার ঘুরিয়া বেড়ায় বিপিনের স্মৃতিটির চারি-দিকে—বন্ধকমল বেষ্টন করিয়া ভ্রমরের মতো, কানুচাচা দীপের পাশে পতঙ্গের ন্যায়। কখনো কখনো বা সে নিজের মনোবেদনাকে কবিতার আকার দিতে চেষ্টা করে, কখনো নিজের অজ্ঞাতসারে বিপিনের নাম লিখিতে থাকে। সেই নামের শব্দটি ও রূপটিও যেন তাহার হৃদয়ের উপর সুমধুর স্পর্শ বুলাইয়া যায়, যেন অপরি-

মেয় করুণা-রসার্দ্র দুইটি তরল চোখের দৃষ্টি তাহার গভীর বেদনার উপর সান্ত্বনা বিকীর্ণ করিয়া যায়। তেশিরা কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে বাহিরটা যেমন বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, অতীতের স্মৃতির ভিতর দিয়া দেখিয়া মালতী তেমনি নিজের এই দুর্ব্বহ জীবনকে রঙিন করিয়া দেখিতে চাহিত।

মালতী যাহা করে গুরু তাহা দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া দেখেন। শিকারী বিড়ালের মতো গুরু নিঃশব্দে পা টিপিয়া আসিয়া খিলশূন্য কপাট ফাঁক করিয়া মালতীর প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করেন। মালতী অনেক সময় প্রেমানন্দের এই চুরি টের পায়, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করে না। প্রেমানন্দ যখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে মালতী তাঁহার গোয়েন্দাগিরি টের পাইয়াও অগ্রাহ্য করিতেছে, তখন তাঁহারও সাহস ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল।

একদিন মালতী বুকে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া কবিতা রচনা করিতেছে, গঙ্গার খোলা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া খোলা বইয়ের পাতাগুলি লইয়া ফরফর করিয়া নাচাইতেছে, মালতীর অলকগুচ্ছ চোখের উপর আসিয়া দুলাইতেছে—এমন সময় প্রেমানন্দ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া একেবারে মালতীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হাত দুখানা পশ্চাতে শৃঙ্খলিত করিয়া শরীরের উপরার্দ্ধ ঝুঁকাইয়া মালতীর কাঁধের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন মালতী কবিতা লিখিতেছে। তারপর আস্তে আস্তে নত হইয়া হাত

বাড়াইয়া ছোঁ মারিয়া কবিতার কাগজখানা টানিয়া লইলেন।

মালতী কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কিছুই টের পায় নাই, চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল প্রেমানন্দ! সে সর্পভীত বা তাড়িৎ-স্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ঝটিতি উঠিয়া আপনার কেশবাস সংযত করিয়া যখন প্রেমানন্দের দিকে চাহিল তখন তাহার চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে।

প্রেমানন্দ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সন্ন্যাসিনীর ব্রত পালন চমৎকার হচ্ছে, রাধারাণী! সন্ন্যাসিনী লেখেন প্রণয়-কবিতা! নাম জপ করেন পরপুরুষের!

মালতী গুরুর এই শ্লেষবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া নিজের ক্রোধে নিজেকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচিত।

মালতী চোখ পাকাইয়া বলিল—আপনি গুরু, না চোর?

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিল—আমি গুরু! শিষ্য যখন চুরি করিয়া চুরি করিতে আরম্ভ করে, তখন গুরুকেও বাধ্য হইয়া চুরি করিয়া চুরি ধরিতে হয়। তুমি কি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম পালন করছ?

মালতী আর থাকিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া বলিল—আমি সন্ন্যাসিনী নই! আমি চীৎকার করে বলছি, হাজার বার বলছি, আমি সন্ন্যাসিনী নই! আপনি আমাকে দূর করে দিন আপনার আশ্রম থেকে। আমাকে এমন করে অপমান করবেন না।

মালতী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রেমানন্দ একটু লজ্জিত ঈষৎ দুঃখিত হইয়া বলিল—কাঁদ, রাধারাণী, কাঁদ! অশ্রুজলে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে ফেল। ধর্ম্মের পথ বড় দুর্গম, মনের সকল ভার পশ্চাতে ফেলে হয়ে লঘু হয়ে যেতে হবে, নইলে লক্ষ্য স্থান পৌঁছনো দুর্ঘট হবে। প্রাণ যখন আকুল হবে ভাগবত পোড়ো, ধর্ম্মগ্রন্থ পোড়া, কবিতা লিখতে ইচ্ছা হয় ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন কোরো—নিজেকে তাঁর মধ্যে এমন করে' ছেড়ে দিয়ো না।

মালতী মুখ ফিরাইয়া জানালা দিয়া এই মাঘ মাসের দারুণ শীতে ঝড় করিয়া ঘামিতেছিল। গুরু যে অন্ধকূপের পৃষ্ঠি গহ্বরে কতখানি নামিয়া গেছেন ইহা মনে করিতেও মালতীর দুঃসহ লজ্জা বোধ হইতেছিল।

মালতী যখন মুখ ফিরাইল তখন তাহার মুখ সিঁদুরে আমের মতো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সে দৃপ্তস্বরে বলিল—আপনি আমার ঘর থেকে এক্ষণি বেরিয়ে যান, নইলে আমি চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে দেবো।

প্রেমানন্দ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তোমার মন এখন চড়া-বাঁধা সেতারের মতো বাতাসের স্পর্শে ঝঙ্কার দিয়া উঠছে, তুমি ঠাণ্ডা হও। আমি অন্য সময় এসে তোমায় বুঝিয়ে দেবো, এটা তোমার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

প্রেমানন্দ এক পা দুই পা করিয়া হটিতে হটিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মালতী বিছানার উপর আছাড়িয়া উপুড় হইয়া পড়িল, এবং বালিশে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।



ভরা সাঁঝ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

পূর্ণ

রবিবারের সকালবেলাকার তাসের আড্ডা ভাঙি[illegible] বাড়ি ফিরিতেছি, পথে একজন ছোক[illegible] আমায় ধরিল।—খালি পা, চুল উস্কখু[illegible] শুকনো মুখ, অত্যন্ত ময়লা কোঁচার টিপ [illegible]। সে মাটির দিকে মুখ নীচু করিয়া [illegible]বড় করিয়া কি আমায় বলিল, [illegible] শুনিতে পাইলাম না। আমি তীক্ষ্ণ [illegible]তে তার আপাদমস্তক একবার [illegible] লইলাম। সদ্য রোগ-শয্যা ছাড়িয়া [illegible]ঠলে মানুষের যেমন চেহারা হয় তার শ[illegible]র অবস্থা ঠিক তেমনি। চোখ কোট[illegible] প্রবেশ করিয়াছে, গাল দুটা তুব্‌ড়িয়া চু[illegible] গেছে—একটা দুর্ব্বলতা তার শরীরে[illegible] [illegible]ল-কব্জাকে দুমড়াইয়া যেন তাকে মাটি[illegible]কে টানিতেছে।

আমি ব[illegible]ম—"কি চাও?"

সে মুখ [illegible] তুলিয়াই বলিল—"মশায় বল্‌তে বড় [illegible]—।" কথাটা সে শেষ করিল না।

আমি বলিলাম—"কি বলই না!"

—"বড় বিপদ!—"

আমি বলিলাম—কি, শুনি!"

সে বলিল—"ভদ্রসন্তান হয়ে ভিক্ষা চাইতে মাথা কাটা যায়!"

আমি দেখিলাম, লোকটা ভিখিরী, কেবল কথার ভড়ং বাড়াইতেছে। ভিখারীর দৌরাত্ম্যে পথ চলা দায়; তাড়াইয়া দিলে নড়ে না—নাছোড়বান্দা; দাঁড়াইয়া তার কথা শুনিলে কি আর রক্ষা আছে? একেবারে পাইয়া বসিবে। আমি তার দিকে আর দৃকপাত না করিয়া বাড়ির দিকে চলিতে লাগিলাম।

লোকটা ছাড়িল না, আমার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল, একটু কাছাকাছি হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"মশায়, ভদ্র-লোকের ছেলে, বড় দায়ে পড়েই প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি পথের ভিখিরী নই!"

সে যে ভদ্রলোকের ছেলে তার ছাপ এখনও কিছু কিছু তার দেহের উপরে আছে। তার কথা আমি একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তার কণ্ঠের কাতরতা আমার মনের উপর একটু ঘা দিল। আমি বলিলাম—"কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল।"

সে বলিল—"আজ সকালে আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে, এমন সংস্থান নেই যে তাঁর সৎকার করি। আমরা বড় গরীব। ঘটি-বাটি বেচে বাপের চিকিৎসা হয়েছে; —তাঁর যে আয় ছিল তাতে কায়েক্লেশে সংসার চলত, তিনি ব্যামোয় পড়ে অবধি একটি পয়সা উপার্জ্জন নেই—অনেক দেনা হয়েছে, আর কেউ ধার দিতে চায় না। আপনি যদি পাঁচটি টাকা দেন তাহ'লে তাঁর সৎকার হয়। আপনি আমার মা-বাপ—আমায় রক্ষা করুন।"

আমার পকেটে টাকা ছিল না, আমি বলিলাম—"আচ্ছা বাড়ি চল, টাকা দিচ্ছি।"

বাড়ির সাম্‌নে আসিয়া বলিলাম—"দরজার কাছে দাঁড়াও, আমি টাকা আনছি।"

টাকা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি লোকটা বাহিরের রকে শুইয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি টাকা দিতে গেলাম। সে কাপড়ের ভিতর হইতে হাতখানা বাহির করিল।

হঠাৎ আমার কেমন ধাঁদা লাগিল। লোকটার ডান হাতে ছটা আঙুল। এই ছয় আঙুলের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি আবছায়ার মতো আমার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। আমি টাকা কয়টা মুঠোর মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিলাম। একটা সন্দেহ আমার মনটাকে দোলা দিতে লাগিল। অন্বেষী দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আমার সেই সন্দেহ যেন দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার ভাব-গতিক দেখিয়া সে অবাক!

আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম—জোচ্চোর! তুমি না সেদিন আমার কাছ থেকে ক টাকা ধার চেয়েছিলে?"

সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল—"কবে মশায়?"

আমি বলিলাম—"তারিখটা ঠিক মনে নেই। কিন্তু সেবার তোমার পিতৃবিয়োগ নয়; সেবার তোমার গাঁঠকাটা,—রেলের টিকিটখানি পর্য্যন্ত গিয়েছিল! ভারি বিপদ! বিদেশী লোক, কোথায় যাবে, কি করবে, কিছু জানতে না। সেবার তোমার ফন্দি ছিল টিকিটের দাম আদায় করা!"

সে বিস্মিত হইয়া গেল, বলিল—"ধরে কি মশায়! ভদ্রসন্তান হয়ে এমন কাজ করতে পারি।"

আমি রাগিয়া উঠিয়া বলিলাম—"বের দাও তোমার ভদ্রসন্তান!"

সে বলিল—"বিশ্বাস ক ছেন না মশায়! চলুন আমার বাড়িতে চলুন—স্বচক্ষে দেখবেন আমার পিতৃবিয়ে হয়েছে কি না।"

আমি বলিলাম—"এ ম জুয়াচুরি ঢের জানা আছে! বেরও তুমি এমনিধারা সব অকাট্য প্রমা তে চেয়েছিল। পকেটে তোমার কাঁচি-কা চিহ্ন ছিল। দেশে ফিরে গিয়েই আ তুমি যে আমার টাকা মানি-অর্ডারে শোধ করবে —ভদ্রতার এই আশ্বাস দি আমার নাম ঠিকানাটি পর্য্যন্ত লিখে ছলে; মনে পড়েছে?"

সে প্রতিবাদের স্বরে বলল—"আপনি ভুল করছেন মশায়! সে আমি নই!"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয় আমি! তোমার সঙ্গে যত কথা কচ্ছি ত আমার সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠছে কথাবার্ত্তা সব এক ছাঁচে ঢালা!"

সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর হতাশ হইয়া বলল—"বিশ্বাস করবেন না, কি করব বলুন" বলিয়া সে রকটার উপর বসিয়া পড়িল। কথার উত্তেজনায় সে হাঁফাইতেছিল।

তাহার সে অবস্থা দেখিয়া আমার কেমন মায়া করিতে লাগিল। কিন্তু একটা লোক যে ঠকাইয়া টাকা লইয়া যাইবে ইহা

আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না।

আমি বলিলাম—"কবুল কর।"

সে কোনো উত্তর করিল না;—চোখ বুজিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"তুমি যদি কবুল না কর, তাহলে আমায় পুলিশে দেব।"

সে কথা যে গ্রাহ্যে আনিল এমন বোধ হইল না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে যেন আপনার সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কবুল না করে কি! এতে আর দিন চলে না। কেউ বিশ্বাসও করে না—কথায় ভোলে না।"

আমি বলিলাম—"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে জুয়াচুরি কর?"

সে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"কি করব?"

—"কেন চাকরী করতে পার না?"

—"চাকরী কে দেবে?"

—"লেখা পড়া জান?"

—"সে নয় জানারই সামিল!"

—"বেশ! লেখাপড়ার কাজ করতে না পার, অন্য কাজ কর!"

—"কি কাজ বলুন?"

—"মোট বইতে পার!"

—"আজ্ঞে ভদ্রলোকের ছেলে কি মোট বইতে পারে?"

—"কেন পারবে না? তুমি বুড়ো নও, হাবড়া নও!"

সে একটা অবজ্ঞার সঙ্গে বলিল—"হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে ত! পারব কেন?"

—"না পার, কোনো বাবুর বাড়ি চাকর-নফরের কাজ নাও।"

—"আজ্ঞে, ছোটো-লোকের কাজ!"—বলিয়া সে মুখটা বিকৃত করিল।

লোকটা কুড়ের সর্দ্দার! যত রকম কাজের কথা তুলিলাম সব তাতেই সে মাথা নাড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম—"তুমি যে দেখছি একেবারে নবাব খাঞ্জা খাঁ! কোনো কাজই তোমার মনের মতো নয়।"

সে আমার কথার কোনো উত্তর করিল না, বলিল—"মশায় দয়া করে আমায় কিছু খেতে দিন;—আজ দুদিন জলস্পর্শ হয়নি!"

আমি বলিলাম—"তোমার মতো লোককে আমি দয়া করতে পারব না। নিজের উপার্জ্জনে খেতে পার তো খাও—নয় তো মর!"

সে বলিল—"কোথায় কাজ পাব বলুন।"

আমি বলিলাম—"আমি তোমায় কাজ দিচ্ছি।"

—"কি কাজ?"

—"বাসন মাজা।"

—"বাসন মাজা!"—সে চোখ দুটা কপালে তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল—"আমি তো কখনো বাসন মাজিনি—আমি তো পারব না।"

আমি বলিলাম—"না পার তো দূর হও!"

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; তার পর কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা রাজি আছি। কিন্তু আগে দুটি খেতে দিন, নইলে শরীর বইবে না!"

আমি দেখিলাম সে কথা মিথ্যা নয়।

তার জন্যে কিছু জলপানের বন্দোবস্ত করিয়া আমি ঝিকে ডাকিয়া বলিলাম—"ঝি, একে আমাদের বাসনগুলো মাজতে দিস।"

ঝি লোকটার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিল, তার পর বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

আমি স্নান-আহার সারিয়া বাহির-বাড়িতে আসিতেছি, দেখিলাম, কলতলায় একরাশ বাসন সমুখে রাখিয়া লোকটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—তখনও কাজে হাত দেয় নাই। ভাবিলাম, লোকটা দেখিতেছি বাদশাহী কুড়ে! দেখি কি হয়—মনে মনে বলিয়া বৈঠকখানা ঘরে চলিয়া গেলাম। তামাক টানিতে টানিতে শুনিলাম ঝি গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে—"কেমন মানুষ গো! ঠুঁটো নাকি! বাসন কোলে করে সেই অবধি বসে রয়েছে!"

রবিবারের দুপুরবেলাটা বৃথা নষ্ট করা উচিত নয় মনে করিয়া তামাকের ধোঁয়ায় তন্দ্রাদেবীর আরতি করিতেছিলাম, তারপর তিনি যে কখন ভক্তের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা ঠিক মনে নাই। যখন নিদ্রামন্দির ছাড়িয়া উঠিলাম তখন বৈকাল হইয়াছে। লোকটা আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—"কাজ শেষ হয়েছে?"

সে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ!"

আমি তার হাতে দুই-আনার পয়সা দিয়া বলিলাম—"এই নাও তোমার পারি-শ্রমিক। কালও যদি বাসন মাজতে এস তাহলে একবেলার খাবার আর এই রকম দু-আনা পয়সা পাবে।"

সে দো-আঁশটি আমার হাত [illegible] লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পর দি[illegible] ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির। আমি দেখিলা[illegible] লোকটার ভাবগতিক আ[illegible] একটু কেম[illegible] এক রকম;—গা হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহি[illegible] হইতেছে। আমি ব্যাপা[illegible] বুঝিলাম কি[illegible] কিছু বলিলাম না;—দেখি কি হয়। ঝিকে বলিতে হইল না, লো[illegible]কে দেখিয়া সে আপনা হইতে বাসন [illegible]নিয়া মাজিয়া করিল। কাজ শেষ [illegible]য়া বৈকালে দু আনা লইয়া সে চলিয়া গেল; শুনিলাম সেদিন আর সে আমা[illegible] বাড়ির ভাত খায় নাই—শরীর না কি [illegible]লো ছিল না।

একমাস আমাদের [illegible]ড়ি সে নিয়মিত কাজ করিল;—প্রথম [illegible] তার গায়ে তাড়ির গন্ধ পাইতাম বটে কিন্তু শেষাশেষি খুব বিশেষভা[illegible] লক্ষ্য করিয়াও নেশার কোনো চিহ্ন দেখিতাম না। বাস্তবিকই লোকটার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইতেছিল। তার শরীরের অবস্থা দিন দিন ভালো হইয়া ত উঠিতেই [illegible]ল, তা ছাড়া তার মনের মধ্যেও যে একটা সুবাতাস বহিতেছে এমন পরিচয়ের ও অভাব ছিল না।

আত্মগৌরবে আমার মন[illegible] ভরিয়া উঠিতেছিল। একটা লোককে বিনাশের পথ হইতে উদ্ধার করিবার আনন্দ যে কী তাহা এই কাজের কাজী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। নিজের হাতে গড়া জিনিষের উপর মানুষের যেমন মায়া হয় তেমনি একটা মায়া ঐ লোকটার উপর জমিয়া উঠিতেছিল। নিজের হাতের জিনিষ

[illegible]পূর্ণ রাখিয়া যেমন তৃপ্তি হয় না—তেমনি [illegible]কটা সম্বন্ধে একটা অতৃপ্তি আমার [illegible]র মধ্যে জাগিতেছিল। কি করিলে [illegible]কটার উন্নতি হইবে এই ভাবনা তখন [illegible]মার সব চেয়ে বড় ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। [illegible] আমি তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি লেখাপড়া কিছু জান?"

সে বলিল—"সামান্য লিখতে পড়তে [illegible]রি।"

আমার মাথায় একটা কল্পনা ছিল। [illegible]মার এক বন্ধুর প্রকাণ্ড এক ছাপাখানা [illegible]ছে। তাহাকে অনুরোধ করিয়া একখানা চিঠি লিখিতে বসিলাম।

এতদিন আমি লোকটার নাম জিজ্ঞাসা [illegible]রি নাই;—চিঠিতে নামের উল্লেখ করিতে হবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল—"আমার নাম পূর্ণচন্দ্র বসু।"

চিঠি শেষ করিয়া আমি বলিলাম—"পূর্ণ! এই চিঠি নিয়ে যাও;—ছাপাখানার কাজ শিখলে তোমার উন্নতি হবে।"

পূর্ণ চিঠিখানা হাতে করিয়া কেমন একটু ইতস্তত করিল; কোনো উৎসাহ দেখাইল না। আমি ভাবিলাম, লোকটার জন্মগত কুড়েমি বোধ হয় এখনো যায় নাই। আমি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম। সে চুপ করিয়া সব শুনিল; তার পর আমার বাড়ির কলতলাটার দিকে কেমন একটা করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি মনে মনে হাসিয়া উঠিলাম—আমাদের কলতলাটার উপর পূর্ণর মায়া পড়িয়া গেল না কি!

আমার বন্ধুর ছাপাখানায় পূর্ণ বেশ মনোযোগ দিয়া কাজ করিতেছে—মধ্যে মধ্যে খবর পাইতাম। অল্প অল্প করিয়া তার মাহিনাও বাড়িতেছিল। প্রথম প্রথম প্রায়ই আমি পূর্ণর খবর লইতাম, কিন্তু যখন দেখিলাম সে সত্যকার মানুষের মতো হইয়া উঠিয়াছে—আর কোনো ভয় নাই, তখন আমার একটু ঢিল পড়িয়া গেল। শেষে নানা কাজের হেঙ্গামে আর খবর লওয়া হইয়া উঠিত না।

অনেক দিন পরে একদিন আমার এক আত্মীয়কে দার্জ্জিলিং মেলে উঠাইয়া দিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছি এমন সময় পূর্ণর সঙ্গে আমার দেখা। সেই প্রথম দিনের পূর্ণর চেহারা আমার মনে পড়িল; তার সঙ্গে আজ কত তফাৎ। সে-পূর্ণকে এ-পূর্ণ বলিয়া চেনাই যায় না। সুস্থ সবল চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—রীতিমত ভদ্রলোক! পূর্ণকে দেখিয়া সত্যই একটা আনন্দ বোধ করিলাম। আমার ভিতর হইতে যে একটা আত্মগৌরবের গর্ব্ব উছলিয়া উঠিতেছিল তাহা বোধ হয় পূর্ণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবে; সে বলিল—"আপনার অনুগ্রহে—"

আমি কথাটা চাপা দিয়া বলিলাম—"কি হে, কেমন আছ?"

সে বলিল—"আজ্ঞে ভালো আছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন মাহিনা পাও কত?"

সে বলিল—"আজ্ঞে ত্রিশ টাকা।"

আমি বলিলাম—"বেশ! বেশ!"

আমার দ্বারাই যে পূর্ণর ভালো হইল এ কথাটা প্রচার করার চেয়ে গোপন

রাখাতেই যে মহত্ত্ব তাহা আমি জানি, তবুও আমার ভিতর হইতে বোধ হয় ঐ কথাটা বার বার ঠেসা দিতেছিল, তাই আমি বলিয়া ফেলিলাম—"ভেবে দেখ দিকিন্ পূর্ণ! তুমি যদি সেই সর্ব্বনাশের পথ থেকে না ফিরতে তাহলে আজ কোথায় থাকতে!"

পূর্ণ কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"তা আর বল্‌তে মশাই! আপনার অনুগ্রহ না পেলে আমার যে কী দশা হত, বলতে পারিনি—আপনি আমার জীবন—জীবন কেন—জীবনের বাড়া মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, আপনার এ ঋণ আমি—"

এই কথাগুলার জন্যই বোধ হয় আমার ক্ষুধিত অন্তর অপেক্ষা করিতেছিল। মানুষ যেমন তার উপাদেয় সামগ্রী অল্পে অল্পে স্বাদ লইয়া খায়,আমার প্রশংসাটাকে তেমনি করিয়া গ্রহণ না করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছিল না, সেইজন্যই সম্ভবত আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"থাক্, থাক্—সে সব কথা! এখন যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

সে বলিল—"একটু কাজে—ব্যারাকপুরে।"

আমি বলিলাম—"ট্রেণ ফেল হবে না ত?"

—"আজ্ঞে না, এখনো দেরী আছে।"

পূর্ণ কথাটা শেষ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। সে বলিতে লাগিল—"একটা কথা আপনাকে জানাতে না পারলে আমার শান্তি নেই। আপনি আমার এত উপকার করেছেন কিন্তু আমি আপনার ফাঁকি দিয়েছিলুম।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"ফাঁকি!"

সে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ। আপনি যে আমায় বাসন মাজতে দিয়েছিলেন তার একখানাও আমি মাজিনি।"

—"মাজনি?"

—"আজ্ঞে না। বাসন মাজবার জন্য আমি কিছুতেই হাত তুলতে পারতুম না—আমি চুপ করে বসে থাকতুম—আপনার সেই দাসীটি আমার সমস্ত বাসন মেজে দিত।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম।

পূর্ণ বলিতে লাগিল—"আমার পানে একটিবার চেয়ে, কোনো কথা না বলে, যখন আগ্রহ করে বাসনগুলি মেজে দিত তখন আমার মনে যে কী হ'ল তা আমি ইহজন্মে ভুলতে পারব না। আমার মনে হল, আমার সমস্ত পাপ তার ঐ চোখ দিয়ে যেন সে মুছে নিলে। সেই মুহূর্ত্তে আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেলুম। আমার দুঃখের বোঝা এমন আদর করে কেউ তো কখনো বুকের ওপর টেনে নেয় নি—"

বলিতে বলিতে ঢং ঢং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল;—পূর্ণ উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ির দিকে ছুট দিল।

আমি ভাবিতেছিলাম—পূর্ণকে শুধরাইল কে?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্কল্প

তেমন-ই কি আসে ঊষা ভূষি অঙ্গ সুষমায়,
উদ্ভাসিয়া শ্যাম তনু শরতের?
শুনি যবে পাখীদের মধু-গীতি-ঘোষণায়
ধীরে ভাঙ্গে নীরবতা জগতের?
প্রভাতের বায়ু যবে বহে যায়,—কহে যায়
কাণে কাণে কাননের কাহিনী,
সপ্তবর্ণ-আঁকা পর্ণে তেমনি কি রহে যায়
স্মিত-শোভা চারুপ্রভাবাহিনী?
বসন্তে নিদাঘে মোর গাও পিক পাপিয়া!
স্মরিব মানসে ঋতু-মাধুরী।
শ্রাবণপ্লাবনে নিশা উৎসবে যাপিয়া,
জাগ সবে ঝিল্লী ও দাদুরি।
কেমনে জানিবে কবে কোন্ শুভ লগনে
সাধের শরৎ মোর আসিবে?
সরসী-সলিলে আর গাঢ় নীল গগনে,
স্বপনে জড়ানো আলো ভাসিবে?
পুলক-ললিত হাসি, পুষ্পরাশি আননের,
ফুটিলে না পারি আর লখিতে।
জগতে অতুল্য সে যে ফুল্লশোভা মানবের;
নির্ব্বাপিত কোথা গো সে চকিতে?
প্রভাত সায়াহ্ন সন্ধ্যা! অস্ত যাও আঁধারে;
নিশা! কেঁদে মরে যাও নীরবে।
তমিস্রার পরপার পাড়ি দিয়া সাঁতারে,
লভিব নবীন জ্যোতি বিভবে।
এস স্পর্শ গন্ধ গান! ভূষি প্রাণ সুষমায়;
বিরচিব নবঋতু জগতের।
জাগ প্রীতি! বিশ্বে আজি নব গীতি-ঘোষণায়
উদ্বোধিব দেব-লীলা জগতের।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি

আর্য্যদিগের প্রথম সূতিকাগার কোথায় ছিল এবং তথায় তাঁহারা কিরূপ সভ্যতার বিকাশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি পুরাতত্ত্বের সহিত তাঁহাদের সমগ্র ইতিহাসেরই অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং আর্য্যজাতির লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদিগকে ইহার মূলোদ্ধারেরই চেষ্টা করিতে হইবে।

'পুরাণ' কল্পনামাত্র এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে পুরাণের প্রমাণ গ্রাহ্য করিতে একেবারেই প্রস্তুত নহেন। কিন্তু পুরাণে ইতিহাসের যে সমস্ত মূল্যবান্ উপাদান নিহিত রহিয়াছে—সে সমস্তের দ্বারাই ভারতের প্রাগৈতিহাসিক কালের পুরাবৃত্তের বহু অধ্যায় বিরচিত হইতে পারে। আমাদের উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্যটিই পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

মৎস্যপুরাণে ইলাবৃতবর্ষ দেবতাদিগের জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় যথা—

"ইলাবৃতমিতিখ্যাতং তদ্বর্ষং বিস্তৃতায়তম্।
যত্র যজ্ঞোবলের্বৃত্তো বলির্যত্রচ সংযতঃ ॥ ২
দেবানাং জন্মভূমির্যা ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতা ॥" ৩
মৎস্য পুরাণ ১৩৫ অধ্যায়।

"যেখানে বলি যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং বদ্ধ হইয়াছিলেন—সেই বিস্তৃত আয়তন স্থানই ইলাবৃতবর্ষ—ইহা দেবতাদিগের জন্মভূমি বলিয়া ত্রিলোকেই খ্যাত আছে।"

ইলাবৃতবর্ষ মেরুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া পুরাণে ইহার অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা পাঠ করিলেও ইহাকে মেরুস্থান বলিয়া জানিতে পারা যায়—

"নতত্র সূর্য্যস্তপতি নতেজীর্য্যন্তি মানবাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যৌ নক্ষত্রং ন প্রকাশমিলাবৃতে॥"
ইতি লিঙ্গ পুরাণম্।

"ইলাবৃতে সূর্য্য তাপ প্রদান করে না—চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র তাহাতে প্রকাশ পায় না। ইহাতে লোক কখন জরাপ্রাপ্ত হয় না॥"

ইলাবৃত মেরুস্থল বলিয়া সূর্য্য তথায় উদিত হইলেও ইহার তাপ অনুভূত হয় না এবং কখনও সূর্য্য সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকে এবং ক্রমাগত যখন ছয় মাস দিবা থাকে তখন চন্দ্র তারকাদি একবারেই দৃশ্যমান হয় না ইত্যাদি প্রাকৃতিক অবস্থাই উদ্ধৃত বিবরণের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে।

ইলাবৃতের লোক সকলের বিবরণ নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"পদ্মপ্রভাবাঃ পদ্মমুখাঃ পদ্মপত্র নিভেক্ষণাঃ।
পদ্মপত্র সুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে ভবভাবিতাঃ॥
জম্বুফলরসাহারা অনিস্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ।
দেবলোকগতাস্তত্র জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ॥
ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণান্তে নরোত্তমাঃ।
আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি বর্ষেদিব্যেত্বিলাবৃতে॥"
ইতি লিঙ্গ পুরাণম্।

প্রথমেই লিঙ্গপুরাণের বর্ণনায় যে ইলাবৃতে "নতেজীর্য্যন্তি মানবাঃ" মনুষ্য সকল জরাগ্রস্ত হয় না বলিয়া উল্লেখ আমরা পাইয়াছি—তাহাতেই উহা যে প্রকৃত দেবস্থান নহে প্রত্যুত মর্ত্ত্যস্থান তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইলাবৃত শীতপ্রধান স্থান বলিয়া তথাকার লোক সকল চিরযৌবন ভোগ করিত ও চিরজীবী হইত বলিয়াই যে দেবতার ন্যায় 'অজর' 'অমর' রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ইহা হইতে দেবতুল্য লোকদিগের বাসহেতুই যে ইলাবৃত "দিব্য" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট সুগম বলিয়াই বোধ হয়।

ইলাবৃতের অব্যবহিত দক্ষিণে শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতই উত্তরকুরুর সীমা ছিল। এই শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উপরেই উত্তরকুরু অবস্থিত ছিল। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"উত্তরে চাস্য শৃঙ্গস্য সমুদ্রান্তেচ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধ নিষেবিতম্॥"
মৎস্য পুরাণ ১১৩ অধ্যায়।

"এই শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরাবধি দক্ষিণভাগান্তে উত্তরকুরুভূমি—ইহা সমুদ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুণ্য সিদ্ধজন নিষেবিত।"

এই উত্তরকুরুর লোক সকল ইলাবৃত রূপ দিব্যলোক হইতেই যে তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা লিঙ্গ পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায় :—

"কুরুবর্ষেতু কুরব স্বর্গলোকাৎ পরিচ্যুতাঃ।
৫২ অধ্যায়।

ইলাবৃতবর্ষ যে দেবলোক বা স্বর্গলোক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল তাহাতে ইহাকে সকল আর্য্যজাতির সাধারণ পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি জন্মস্থান বলিয়াই বোধ হয়। এবং মৎস্য পুরাণের দেবতাদিগের জন্মভূমিরূপে ইহার নির্দ্দেশ হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

কালে ভ্রাতৃবিরোধ সঙ্ঘটিত হইলেই আর্য্যসন্তানগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ কেহ উত্তরকুরুতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহারা "স্বর্গলোক পরিচ্যুত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

আমরা যে বিরোধের কথা অনুমান করিয়াছি, 'অসুর' নামের অভিধান আলোচনা করিলে আমরা তাহার যথেষ্ট সমর্থনই পাইতে পারি। 'অসুর' নামের অভিধেয় সম্বন্ধে অমরকোষে এইরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায় :—

"অসুরা দৈত্য-দৈতেয়-দনুজেন্দ্রারি-দানবাঃ।
শুক্রশিষ্যা দিতিসুতা পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ॥"

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি আর্য্যগণ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়াই 'সুর' ও 'অসুর' এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই অসুরগণ সুরদ্বেষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে বিভক্ত হইলেও পূর্ব্বে যে তাঁহারা এক দেবতা জাতির অন্তর্ভূত ছিলেন তাহা তাহাদের 'পূর্ব্বদেব' নামের দ্বারাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বে দেবতাসকল দেব ও অসুর উভয় নামেই পূজিত হইতেন। বিরোধের পর কিন্তু একদল দেব নামেই পূজা করিতে লাগিলেন—অপর দল দেব নাম ছাড়িয়া কেবল অসুর নামেই পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে দেবোপাসকেরা 'দেব' নামেই আখ্যাত হইলেন এবং অসুরোপাসকেরা

'অসুর' নামে আখ্যাত হইলেন। 'অসুর' শব্দের অর্থ পূর্ব্বে 'অসু' অর্থাৎ প্রাণ বা বলযুক্ত ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিপক্ষতা হইতেই ইহা "সুরদ্বেষী" অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইন্দ্র-পূজা লইয়াই প্রথম বিরোধের উৎপত্তি হয়। একদল ইন্দ্রকে প্রাধান্য প্রদান করেন—কিন্তু অপর দল তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। তাহাতেই অসুরগণ বিশেষভাবে 'ইন্দ্রারি' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

উপরি উল্লিখিত দেবপূজক আর্য্যেরাই যে ভারতীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ তাহা না বলিলেও চলে। এই দেবপূজক আর্য্যেরাই আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি ইলাবৃত হইতে আসিয়া উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অসুরেরা তাঁহাদেরই পার্শ্বে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন—লিঙ্গ পুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় তাহার স্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায়:—

"দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতঃ পর্ব্বত উচ্যতে।
শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতশ্চৈব পিতৃণাং নিলয়ঃ সদা॥"

৫২ অধ্যায়।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে "শ্বেত পর্ব্বত যেমন দৈত্য দানবদিগের স্থান ছিল, শৃঙ্গবান্ও তদ্রূপ পিতৃপুরুষদিগের স্থান ছিল।"

আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে স্বর্গলোক-পরিভ্রষ্ট দেবগণই শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতাবস্থিত উত্তরকুরুতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতৃপুরুষ যে ভারতীয় আর্য্যদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ তাহা আর বলিতে হয় না। কারণ পুরাণকার পিতৃগণের দ্বারা যে আপনার পূর্ব্বপুরুষের কথাই বলিতেছেন—তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ উত্তরকুরুতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন—তাহাতেই "পিতৃণাং নিলয়ঃ সদা"—এইরূপ বর্ণনা দ্বারা ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত পিতৃভূমিরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পুরাণে যেরূপ নিয়ত পিতৃভূমিরূপে উত্তরকুরুর উল্লেখ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিলেও যে উত্তরকুরুর সহিত তাঁহাদের পিতৃভূমি-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল তাহাই সপ্রমাণ হয়।

আর্য্যগণ ইলাবৃত বা দেবলোক হইতে উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের লোকোত্তর দিব্য প্রভাব ও বিক্রমের এইরূপই পরিচয় দিয়াছিলেন যে এই উত্তরকুরুও দেবলোক রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই:—

"সেই বাশিষ্ঠ সাত্যহব্য (অত্যরাজিক) বলিয়াছিলেন, তুমি [বিদ্যাবলে] সর্ব্ব দিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়াছ, আমাকে অত্যরাজি জানন্তপি বলিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ, আমি যখন উত্তরকুরু জয় করিব, তুমি তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে, আমি তোমার সেনাপতি হইব।"

বাশিষ্ঠ সাত্যহব্য বলিলেন,—

"ঐ দেশ (উত্তরকুরু) দেবক্ষেত্র, মর্ত্ত্য (মনুষ্য) উহা জয় করিবার অযোগ্য;* তুমি আমায় ব্রেণ

* "দেবক্ষেত্রং বৈতন্ন বৈতন্মর্ত্ত্যোজেতু মর্হতি॥"

প্রতারণা) করিলে, তোমার এই (বীর্য্য) আমি অপহরণ করিব।" অষ্টম পঞ্চিকা ৯ম খণ্ড ৪০শ অধ্যায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ ৬৬৪ পৃঃ।

উত্তরকুরু যেমন এই প্রকারে দেবোপাসকদিগের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া দেবস্থান রূপে আখ্যাত হইল;—অসুরোপাসকদিগের উপনিবেশও তদ্রূপ অসুর-দেশ বা আসিরিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইল।

যে বলি ইলাবৃতে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া মৎস্য পুরাণের বর্ণনা হইতে, আমরা জানিতে পারিয়াছি—তিনি অসুর বা দৈত্যদিগের রাজা ছিলেন। বেদে 'বল' নামক অসুরকে আমরা ইন্দ্রের শত্রুরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই; যথা:—

"ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম্।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তজ্যমানাস আবিষুঃ॥" ৫

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১১শ সূক্ত।

"হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভী-হননকারী বল নামক অসুরের গহ্বর উদ্ঘাটিত করিয়াছিলে। তখন বলাসুর নিপীড়িত দেবতাগণ ভয়শূন্য হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

এস্থলে রমেশবাবু লিখিয়াছেন—

"ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিরীয় ইতিহাসের বাবিলনাধিপতি বলদিগের সহিত বৈদিক বলের ঐক্যসাধন করিতে সমুৎসুক।" বস্তুত আসিরীয় সুপ্রসিদ্ধ রাজা বেলাস (Belus) দৈত্যরাজ বলির সহিত অভিন্ন বলিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের দ্বারা বিবেচিত হইয়াছেন। এই প্রকারে বল বা বলির বংশের সহিত ইন্দ্রের শত্রুতা হইতেই যে অসুরগণ "ইন্দ্রারি" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম।

ইলাবৃতে যেমন প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছিল, তেমনই বিবাহ ও জাতকর্ম্মাদি সংস্কারেরও যে উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা আমরা মৎস্য পুরাণের বর্ণনা হইতেই জানিতে পারি যথা—

"বিবাহাঃ ক্রতবশ্চৈব জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ৩
দেবানাং যত্রবৃত্তানি কন্যাদানানি যানিচ॥" ৪

১৩৫ অধ্যায়।

"দেবতাদিগের যাগ, যজ্ঞ, বিবাহ ও জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ এবং কন্যাদানাদি যাবতীয় কার্য্য ঐ স্থানেই সম্পন্ন হয়॥"

ইলাবৃতের দক্ষিণায়নের ছয় মাস রাত্রি বশতঃ বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদিত হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিত বলিয়া উত্তরায়ণের ছয় মাস দিবাতে ঐ সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। ইলাবৃতের এই প্রথা আর্য্যদিগের মধ্যে এইরূপই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ছয়মাস রাত্রির দেশ ছাড়িয়া আসিলেও সেই পূর্ব্ব-সংস্কার তাঁহারা ছাড়িতে পারেন নাই। তাহাতেই তাঁহাদের চূড়া, উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কারে সেই আদি পুরুষদিগের উত্তরায়ণের বিধিই পূর্ব্ববৎ বলবৎ রহিয়াছে যথা—

"উদায়নে আপূর্য্যমাণে পক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে চৌড় কর্ম্মোপনয়ন গোদান বিবাহাঃ॥" ইতি আশ্বলায়নঃ

বলা বাহুল্য যে "উদগয়ন" উত্তরায়ণকেই বুঝাইতেছে।

এই প্রকারে, আমাদের জাতীয় জীবনের বিলুপ্ত আদি ইতিবৃত্তের ছিন্নসূত্র চির সংস্কারের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবার জন্যই যেন প্রত্যেকের জীবনের দশবিধ সংস্কারের মধ্যেই আশ্চর্য্যরূপে অনুস্যূত রহিয়াছে—আমাদের উপরি-উক্ত পর্য্যালোচনা হইতে তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অপূর্ব্ব কৌটা

হের এই ক্ষুদ্র কৌটা হাতে মোর! কোন্ রাজবালা
চাহে রাখিবারে ইথে সোহাগের কনকের হার?
কোন্ এয়ো, সুরভিয়া ঘনঘোর কেশের সম্ভার,
রাখিবারে চাহে ইথে লালে-লাল সিন্দুর উজালা?
রাজবালা রাগি কহে—"এ কি কৌটা! ছি ছি এ কি জ্বালা!"
রোষ-কষায়িত আঁখি এয়ো কহে—"শোভার আধার
আমার গৃহের কৌটা শতগুণে! এ কি ব্যবহার
কবি তব! সৃষ্টিছাড়া অনুরোধ! কানে ধরে তালা।"

অনাদৃত, উপেক্ষিত রে আমার কৌটা কবিতার,
থাক্ তবে, থাক্ তুই অতি গুপ্ত হৃদয়-মন্দিরে—
আমার সে নীলকান্তমণিধনে নয়নের নীরে
পূজি যথা,—নিত্য যথা নৃত্য, গীত, আনন্দ অপার!
থাকুক্ লো তোরি মাঝে সুধামাখা হরিনাম-মালা,
জিনি কোটী কণ্ঠহার কান্তি যার অপূর্ব্ব উজালা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নবাব

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাচন

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খর-করজালের মধ্য দিয়া একখানা গাড়ী আসিয়া নবাবের প্রাসাদের সম্মুখে থামিল। ভাড়াটিয়া গাড়ী; মাথায় প্রকাণ্ড এক চামড়ার পোর্টম্যাণ্ট ও দুই-চারিটা ছোট বাক্স।

গাড়ী থামিলে এক বৃদ্ধা নারী গাড়ীর মধ্য হইতে নামিলেন।

প্রাসাদের দ্বারে এক ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ী জাঁসুলের?"

ভৃত্য অবাক্ হইয়া গেল! এই নিতান্ত সাধারণ-গোছ-দেখিতে বৃদ্ধা নবাবের প্রতি সম্মান-সূচক একটা উপাধি না দিয়া সটান তাঁহার নাম ধরিয়া বলিল, জাঁসুলে! ভৃত্য কহিল, "তাঁরই বাড়ী। তবে তিনি এখন বেরিয়েছেন।"

"তাতে কিছু আসে-যায় না" বলিয়া বৃদ্ধা ভৃত্যকে গাড়ীর মাথা হইতে মোট-ঘাট নামাইতে আদেশ দিল; তাহার পর জাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া ভৃত্যকে বলিল, "জিনিষ-পত্তর সব জাঁসুলের ঘরে রাখবি, বুঝলি?"

বৃদ্ধা উপরের ঘরে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় নবাবের খাস-ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা কহিল, "তোমাদের মনিব বাড়ীতে নেই?"

খাস-ভৃত্য উত্তর দিল, "না।"

"ছেলেরা?"

"তারা মাষ্টারের কাছে পড়ছে। এখন ত দেখা হবে না। হুকুম নেই।"

"আর গিন্নী?"

"তিনি ঘুমোচ্ছেন। বেলা তিনটের আগে তাঁর ঘুম ভাঙ্গবে না। সে ঘরে কারও যাবারও জো নেই।"

শুনিয়া বৃদ্ধার হাড় জ্বলিয়া গেল। এই দিনে দুপুরে বিছানায় পড়িয়া গড়ানোর মত অপরাধ মানুষের আর কিছু হইতেই পারে না—বিশেষ বাড়ীর গৃহিণী সে, বয়সেও বুড়া নহে! শিক্ষাহীনতার এমন ফল ফলিবে না-ই বা কেন? বৃদ্ধা তখন গেরির সন্ধান লইল; ভৃত্য কহিল, তিনি বিদেশে গিয়াছেন!

"কখন?"

"তিনি হুজুরের সঙ্গে চেম্বারে গিয়েছেন।"

বৃদ্ধা তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "যাক, ভাবনা নেই, তোমরা যাও। আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না—" খাস ভৃত্য তখনও সরিল না—চোখে সবিস্ময় দৃষ্টি ভরিয়া বৃদ্ধার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধা তাহার বিস্ময়ের কারণ বুঝিল, তাই মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি কোন কুটুম-অতিথ্ আসিনি, বাছা—আমি তোমার মনিবের মা। বুঝলে?"

ভৃত্য তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রম অভিবাদন করিল। এবং এ সংবাদটা নিমেষেই ভৃত্য-মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকৌতূহলে প্রায় সকলেই আসিয়া বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিল। সেক্রেটারি ব্যারো কহিল, "আপনাকে আমি আগে দেখেছি, একবার।"

বৃদ্ধা তাহাকে চিনিল। বে'র অভ্যর্থনা-সমারোহের উদ্যোগে লোকটা প্রাণ দিয়া খাটিয়াছিল, বটে! আজ আবার ইহাকে দেখিয়া সে অপমানের কথা নূতন করিয়া মনে পড়ায় বৃদ্ধার প্রাণে ঈষৎ বেদনা-বোধ হইল। বৃদ্ধা কহিল, "হুঁ, তুমি ক'দিন ছিলে না, ওখানে!"

সেক্রেটারিকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করায় বৃদ্ধার প্রতি ভৃত্যবর্গের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

কিন্তু প্রাসাদের এই ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরে বৃদ্ধার কিছুমাত্র তাক্ লাগিল না। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বৃদ্ধা লক্ষ্য করিল, মেঝের উপর আগাগোড়া কার্পেট মোড়া থাকিলে কি হইবে, সেই কার্পেটের প্রান্তে বিস্তর ধূলা জমিয়া রহিয়াছে—আলোর বৃহৎ ঝাড়েও ধূলার অভাব নাই। এত দাস-দাসী লোক-জন-সত্ত্বেও এ অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বৃদ্ধার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা দেখিল, এত-সব মূল্যবান আস্‌বাব—তবুও যেন ঘরের একটা

শ্রী নাই! বৃদ্ধা নিজের হাতে চিরদিনই গৃহমার্জ্জনা করিয়া আসিয়াছে—এখন পুত্রের ঐশ্বর্য্য হইয়াছে—মার সেবার জন্য পুত্র কোথাও কোন ত্রুটি রাখে নাই, তথাপি বৃদ্ধা এখনও নিজের হাতে কাজ-কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। তাই দুই-এক কথার পর সেক্রেটারির নিকট ভৃত্যদের এই সকল অবহেলা-ত্রুটির সম্বন্ধে অনুযোগ করিতে বৃদ্ধা ভুলিল না। সকলেই বুঝিল, বৃদ্ধা বেশ পাকা রকমের গৃহিণী বটে!

এমন সময় নবাবের পুরাতন ভৃত্য কাবাসু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধাকে সসম্মান অভিবাদন জানাইল। বৃদ্ধা প্রসন্ন স্বরে কহিল, "এই যে কাবাসু—ভাল আছ ত বাবা?"

এক-গাল হাসিয়া কাবাসু উত্তর দিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি!"

"ছেলেরা কোথায় সব? কি করছে? সব ভাল আছে ত?"

"পড়ছেন। এখনই ছুটি হবে'খন। সবাই ভাল আছেন।"

"বার্ণার্ডের শরীর ভাল ত? কাজ-কর্ম্ম চলছে বেশ?"

"কৈ আর তেমন চলছে! তবে মোটা-মুটি খবর সব মন্দ নয়। থাক, আমি এখন আপনার খাবার যোগাড় করিয়ে দি—" কথাটা বলিয়া কাবাসু চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "থাক্ কাবাসু, কিছু ব্যস্ত হতে হবে না। আমার খাওয়া হয়েছে।"

কাবাসু কহিল, "তবে আমি যাই, ছেলেদের খপর দিই গে—বলিগে ঠাকুরমা এসেছেন।"

"না, না, তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত করে কাজ নেই! তোমার মা-ঠাকরুণ বুঝি ঘুমোচ্ছে?"

কাবাসু সে কথার উত্তর দিল না। একটু কান পাতিয়া সে কহিল, "ঐ রে ছেলেদের পড়া হয়েছে। তারা আসছে; তাদের পায়ের শব্দ পাচ্ছি। তারা এই দিকেই আসছে, বটে!"

সত্যই তাহারা আসিয়া পৌঁছিল। তিনটি সুস্থ সবল বালক—গায়ে গরম পোষাক, মাথায় নরম টুপি, পায়ে বার মোজা—হাতে একটি করিয়া চামড়ার ব্যাগ। ছেলেরা আসিয়া এই নূতন আগন্তুকের পানে সবিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কাবাসু কহিল, "এঁকে চেন না,—ঠাকুরমা হন্ যে! তোমাদের দেখতে এসেছেন।"

ছেলেরা অবাক হইয়া বৃদ্ধাকে দেখিতে লাগিল। সাদাসিধা পোষাক, গ্রাম্য সরলতা-ভরা মুখ—ছেলেরা বৃদ্ধার পানে চাহিয়া আপনা হইতেই বুঝিতে পারিল, এই অপরিচিতা বৃদ্ধার হৃদয়ে স্নেহের নির্ঝর উৎসারিত রহিয়াছে—সে স্নেহ তাহারা ইচ্ছা করিলেই আকণ্ঠ পান করিতে পাইবে! কেমন এক বরাভয় নিশ্চিন্ত আশ্বাসে যে চোখের দৃষ্টি পরিপূর্ণ!

সেক্রেটারি আবার কথা কহিল, সে বলিল, "মাদাম্, আজ নবাবের এক মহা-দিন। মস্ত মিটিং। ডেপুটি হবার মিটিং। আজ এই সভায় নবাব তাঁর সমস্ত শত্রুকে জয় করে মাথা তুলে দাঁড়াবেন।"

বৃদ্ধা সেক্রেটারির পানে ফিরিয়া চাহিল। সেক্রেটারি আবার কহিল, "শত্রুদের সংখ্যা কম নয়, আর ক্ষমতাও তাদের অনেকখানি। কিন্তু ভগবান নবাবের সহায়! আমাদেরই জয় হবে।"

এমন সময় এক কাফ্রী বালক আসিয়া সংবাদ দিল, ছেলেদের খাবার দেওয়া হইয়াছে। ছেলেরা বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল। অপর লোকজন চলিয়া গেলে ঘরে যখন শুধু বৃদ্ধা ও কাবাসু রহিল, তখন বৃদ্ধা কাবাসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ যে মিটিংয়ের কথা সবাই বলছে—এ কি, কাবাসু? কেন?"

কাবাসু কহিল, "আজকে ভারী জাঁকালো সভা বসেছে—এই সভায় আজই স্থির হবে যে নবাব বাহাদুর কর্সিকার ডেপুটি হবেন কি না!"

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, কহিল, "এ্যাঁ,—এখনও ডেপুটি হয়নি! সে কি! আর আমি যে সকলকে বলে আসছি, সে ডেপুটি হয়েছে—তবে গে, আজ মাসখানেক হল আমি সাঁতে রোমানের পথে বাঁধা রোশনাইয়ের বন্দোবস্ত করেছিলুম। তাহলে সকলকে আমি মিথ্যা কথা বলেছি এতদিন—?"

কাবাসু তখন অনেক কথা কহিয়া বৃদ্ধাকে বুঝাইল যে একমাস পূর্ব্বে নবাবের নাম শুধু ডেপুটি পদপ্রার্থীর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, আজ পার্লামেণ্ট মহাসভায় সকলের মত সংগ্রহ করিয়া তবে ডেপুটি নির্ব্বাচনের পালা সারা হইবে।

শুনিয়া বৃদ্ধা কহিল, "তাহলে আমার বার্ণার্ড এখন কোথায়? সেই সভায়?"

কাবাসু কহিল, "হাঁ, মাদাম।"

"মেয়েরা সেখানে যেতে পারে? তাদের বসবার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে? তোমার মাঠাকরুণ তবে সেখানে যায়নি যে! তার স্বামীর এত বড় একটা ব্যাপার আর বৌমা সেখানে যায়নি? এদিনে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পাবার জন্য তার যে বড় ইচ্ছে হবে। আয় কাবাসু, তুই আমায় সেখানে নিয়ে চল্। আমি এখনই সেখানে যেতে চাই। সে কতদূর?"

"এই কাছেই। এতক্ষণে সভা বসে গেছে, বোধ হয়। তবে আমার যাওয়া হবে না। এখনি বৌমা ঘুম থেকে উঠবেন! তা ছাড়া আপনার ত সেখানে যাবার টিকিট নেই।"

"নাই থাকল! আমি বলব, আমি জাঁসুলের মা! এ শুনলে আমায় ঢুকতে দেবে না? আমি সেখানে গিয়ে সব শুনতে চাই, দেখতে চাই।"

হায়, বেচারী মা—! সে জানে না, সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে, কি শুনিবে!

কাবাসু কহিল, "তাহলে একটু অপেক্ষা করুন—আমি এখনই সঙ্গে লোক দিচ্ছি।"

"কাকেও সঙ্গে দিতে হবে না—তুমি খালি বলে দাও, বাড়ীটা কোন্ দিকে। আমি এখনই ঠিক যাব'খন।"

কাবাসু কহিল, "কিন্তু তাঁর শত্রুরা সেখানে তাঁর নামে ঢের কলঙ্ক, ঢের অপবাদ রটাবে!"

"রটাক। তাতে কিছু এসে যাবে না। আমার ছেলে কি মানুষ, সে আমি যেমন জানি তেমন ত আর কেউ জানে না। যার যা খুসি বলুক আমি তাতে এতটুকু

হঠব না! তবে আমি চল্লুম, কাবাস্থ।" মাথায় টুপি তুলিয়া বৃদ্ধা বাহির হইল।

খানিকটা পথ গিয়া বৃদ্ধা দেখিল, এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে লোকজন ও গাড়ীঘোড়ার ভারী ভিড়! সকলেই ব্যস্ত ভাবে চলাফেরা করিতেছে। মুখে বিকট গাম্ভীর্য্য—লোকগুলা যেন কি এক বিপুল সম্ভাবনায় উদ্‌গ্রীব চঞ্চল হইয়া নড়িতেছে, ফিরিতেছে! বৃদ্ধা সেই বাড়ীর ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল—তারপর দ্বারীকে আপনার পরিচয় দিলে সে একটু সরিয়া বৃদ্ধাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

ভিতরে বিস্তীর্ণ হল—সজ্জিত, লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য চেয়ার জুড়িয়া সারা পারির লোক বসিয়া গিয়াছে। সকলেরই মুখে একটা কৌতূহলের অধীর আগ্রহ। বৃদ্ধা আসিয়া দ্বিতলে একটা চেয়ারে স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিল। আশে-পাশে দুই-চারিজন লোক নবাবের নাম লইয়া রঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছিল। বৃদ্ধার সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। নীচেকার সেই উত্তাল জনতরঙ্গ ভেদ করিয়া পরিচিত একখানা মধুর মুখের সন্ধানে সে তখন ব্যস্ত ছিল। ঐ যে ঐ একধারে চেয়ারে বসিয়া জাঁস্থলে। হর্ষের এক চঞ্চল স্রোতে বৃদ্ধার বুক আলোড়িত হইল। জাঁস্থলে অত কি গভীর চিন্তায় মগ্ন? আজ এ বিপুল সমারোহ তাহারই উদ্দেশ্যে—এমন উৎসব-প্রাচুর্য্যের মধ্যে বার্ণার্ডের এত কি ভাবনা মাথায় আসিল? তবে কি ভাবনার কোন কারণ আছে!

বোধ হয়, আছে। না হইলে এত লোক ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া আছে, আর নবাবের পার্শ্বে কেহ বসে নাই কেন? তাহার পার্শ্বে চারি-পাঁচখানা চেয়ার একেবারেই শূন্য। যেন অস্পৃশ্য কুষ্ঠরোগীর ন্যায়ই সকলে জাঁস্থলেকে দূরে রাখিয়া বসিয়াছে। কেন এ সতর্কতা?

নীচে তখন কি কতকগুলা বক্তৃতা হইতেছিল। বৃদ্ধা সেগুলা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কতকগুলা হিসাব-নিকাশের কথা—টাকাপয়সার প্রসঙ্গ। বৃদ্ধা সুগভীর স্নেহদৃষ্টিতে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল। আহা, মার এ প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে যেন সকল বাধা সকল বিঘ্ন মুছিয়া যাক, বাছা!

সহসা বক্তা থামিয়া বসিয়া পড়িল। ঘণ্টা বাজিল। আর একজন লোক বক্তৃতা করিতে উঠিল। সে ভীষণ জনতা মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া বসিল। একটু পূর্ব্বে কোলাহলের এই যে একটা মিশ্র গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছিল, নিমেষে তাহা থামিয়া গেল। বৃদ্ধাও কি এক সম্ভাবনার আশায় বক্তার পানে কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিল।

তাই ত—লোকটা ও কি বলে! বার্ণার্ডের নাম করিল, না! বৃদ্ধা জীর্ণ মনের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। লি মার্কার প্রকাণ্ড খাতা খুলিয়া রিপোর্ট পড়িতেছিল। বৃদ্ধার চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে কখনও পুত্রের কখনও বা বক্তার পানে ঘড়ির কাঁটার মতই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। বক্তা নানা জটিল রহস্যের বিবরণী দিতেছিল, তারপর বলিল, আইনের প্রতি এতটুকু সম্ভ্রম নাই—প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া বেড়াইয়াছে! দৃষ্টান্তের পর

দৃষ্টান্তেরও অভাব ছিল না! ভাড়া-করা গুণ্ডার মত এখন দেশের বুকে চাপিয়া বসিয়া লোকের রক্ত শুষিয়া খাইতে চাহে! বক্তা উচ্ছ্বাসের আবেগে কহিল, "হাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, দেশের লোকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে!"

কথাগুলা যেন বাজের মতই শুনাইল। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, বিস্ফারিত নেত্রে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কাহার কথা বলিতেছে! কে গুণ্ডা—দেশের রক্ত কে শুষিয়া খাইতে চায়?

লি মার্কার বলিল, "এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে—আপনারা বুঝিয়া সে প্রশ্নের মীমাংসা করুন। চিরদিন দস্যু-তস্করের দলে যে মিশিয়া বেড়াইয়াছে, দেশের নাড়ীর সহিত যাহার কিছুমাত্র যোগ নাই, তেমন একটা লোক আজ দেশের বুকে বসিয়া দেশের দণ্ডমুণ্ডের একজন কর্ত্তা হইতে যায়! থাকিবার মধ্যে আছে তাহার টাকা! টাকায় সে সকলের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে, স্বীকার করি। কিন্তু সে টাকা কোথা হইতে কেমন করিয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে, আপনারা তাহার কোনো সন্ধান রাখিয়াছেন কি? সে টাকা যত মূর্খ নির্ব্বোধকে ঠকাইয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে। এ টাকা সে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে, চুরি করিয়া আনিয়াছে—হাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, এ টাকা চোরের টাকা—ঘাটপাড়ের টাকা! আপনারা আজ তাহার টাকার জমক দেখিয়া দেশের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিবেন না। তাহার উপর যখন দেখিতেছেন, এখনও এখানে আসিয়াও তাহার প্রবঞ্চনা-বৃত্তি শোধরায় নাই। নির্লজ্জের মত এখানে বসিয়াও দিব্য সে লোক ঠকাইবার ব্যবসায় সুরু করিয়াছে। আপনারা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, আমি কোন্ ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে স্পষ্টই খুলিয়া বলি।

"আপনারা কি ঐ কর্সিকার নূতন কোম্পানির সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিয়াছেন? শূন্য খনি আর আগাছার জঙ্গলের অবস্থাটা স্বচক্ষে কেহ দেখিয়া আসিয়াছেন কি? এই সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি ঐ কোম্পানির শেয়ার কিনিয়াছেন? তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইতে কয়টা টাকা ঘরে ফিরিয়া পাইয়াছেন? সে কোম্পানির কার্য্যই বা কতদূর অগ্রসর হইল? বিজ্ঞাপনের চমক লাগাইয়া এই যে ব্যক্তি দেশের লোককে ঠকাইতেছে, সেই আজ কর্সিকার ডেপুটি-পদের প্রার্থী; সুখের বিষয়, এ কারবার-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট হইতে তদন্তের আদেশ হইয়াছে। তখনই সকল সংবাদ আপনারা ওজন করিয়া বুঝিয়া পাইবেন! কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নহে! আরও একটা কথা আছে—

"এই লোকটি ভাবে, টাকায় সব পাওয়া যায়। দেশ-নায়কের বিবেক অবধি ক্রয় করিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে, এতখানি তাহার ধৃষ্টতা! তাহার উপর সে একজন জেল-ফেরত আসামী—দাগী লোক! সে আজ বহু বৎসরের কথা—এই জাঁস্থলে জেলে গিয়াছিল! তাহার প্রমাণও আমি দেখাইতেছি।"

লি মার্কার তখন বার্ণার্ডের রুগ্ন ভ্রাতার সমস্ত কলঙ্ক ভাল করিয়াই তাহার গায়ে লেপিয়া লেপিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ধরিতে লাগিল। বিপুল জনতা রুদ্ধ নিশ্বাসে সব কথা শুনিয়া যাইতেছিল—সহসা তাহার মধ্য হইতে এক রমণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সাবাস! সাবাস!" সে নারী ব্যারণেস হেমারলিঙ।

শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধার আপাদ-মস্তক এক বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আর জাঁসুলে? এতক্ষণ নতমুখে সে বসিয়াছিল—শেষের এই অপবাদগুলা শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুইটা বাঘের চোখের মতই তখন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

লি মার্কারের বক্তৃতা তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিতেছিল, "এখন আপনারা বলুন, এমন লোককে আপনারা কৌন্সিলে বসিতে দেখিলে কি সুখী হইবেন? গর্ব্বে আপনাদের বুক ভরিয়া যাইবে? দেশে কি আর দ্বিতীয় যোগ্য ব্যক্তি নাই? যদি না থাকে, তবে কর্সিকাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সাগর-গর্ভে ডুবাইয়া দিন, কোন ক্ষোভ থাকিবে না।"

লি মার্কার উপবেশন করিল। জন-তরঙ্গে তখন সমালোচনার একটা অস্ফুট কাকলী উঠিয়াছে! নানা তর্কের মৃদু সঙ্কেত! স্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না। সেই অস্ফুট কাকলীর মধ্যে নবাব তাঁহার বিপুল দেহ লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন—ললাট ঘর্ম্মাক্ত। নবাব গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ—"

বিরাট সভা আবার স্তব্ধ হইল। সকলেই নবাবের পানে চাহিয়া দেখিল। একজন উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "নবাবের জবাবটা এখন শোনা যাক্—কি বলে!" বৃদ্ধা বিস্ফারিত নেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

রুমালে ললাটের ঘাম মুছিয়া একবার কাশিয়া নবাব কহিলেন, "আমি আমার নির্ব্বাচন সমর্থন করিবার জন্য কিছু বলিতে চাহি না। আপনাদের ইচ্ছা না হয়, আমায় নির্ব্বাচিত করিবেন না, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইব না। কিন্তু ঐ শেষের অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। আমাকে জেলফেরত আসামী, দাগী বলা হইয়াছে এবং লি মার্কার তাহার প্রমাণ অবধি আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। এই অপবাদ-সম্বন্ধেই শুধু একটি কথা আমি বলিতে চাই। কেন না, আমার নিজের নাম, বংশ ও সন্তানদের মঙ্গলের জন্যও সকল কথা প্রকাশ করা সঙ্গত এবং তাহা আমার কর্ত্তব্য।

"ভদ্রমহোদয়গণ, চুরি বাটপাড়ি করিয়া এ টাকা, এ ঐশ্বর্য্য আমি সংগ্রহ করি নাই। যে যাহা বলে বলুক—কিন্তু আমার মত যদি কেহ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সমস্ত আত্মীয়-জন ছাড়িয়া আপনার সাধের জন্মভূমি হইতে বহুদূর দেশে গিয়া শরীর খাটাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন, আমার সে কষ্ট, সে পরিশ্রমের মূল্য কি! কিন্তু সে কথার প্রয়োজন নাই—সে কথা আমি এখানে তুলিতেও চাহি না।

"এই যে অপবাদে আমায় আজ কলঙ্কিত

করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। এ অপবাদ একেবারে মিথ্যা। আপনারা একটু কষ্ট করিয়া যদি সন্ধান লন তবে সহজেই দেখিতে পাইবেন, যে, যে সময় পারিতে জাঁসুলে নামে এক ব্যক্তির জেল হয়, সে সময় আমি বিদেশে ছিলাম। আরও দেখিবেন, আমার নাম বার্ণার্ড জাঁসুলে—কিন্তু জেলফেরত জাঁসুলের নাম লুই।"

সহসা নবাবের কণ্ঠরোধ হইল। কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইবার সময় চকিতের জন্য দ্বিতলের একটা আসনের উপর নবাবের দৃষ্টি পড়িল—তাঁহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। ও যে মা! নবাব থপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—আর একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

চকিতে তাঁহার মনের মধ্যে ঝড় বহিয়া গেল। বলার আর বাকী কি রহিল। এমনই স্বার্থপর কুপুত্র সে, যে কথা মা জানিতেন না—যে কথা জানিবার তাঁহার সম্ভাবনাও ছিল না, সেই কথা হঠাৎ কি এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে জাঁসুলে বলিয়া ফেলিলেন! হায়, তুচ্ছ পদ গর্ব্বের লোভে মার মনে আজ তিনি কতখানি আঘাত দিলেন! শত চেষ্টা করিয়া আবার তিনি উঠিলেন, কহিলেন, "আমায় ক্ষমা করিবেন। ইহার অধিক আর আমি বলিতে পারিব না। বলিবার শক্তি বা অধিকারও আমার নাই। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ও অপবাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—ও কলঙ্ক হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।"

জন-সঙ্ঘ সহসা নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া বিষম বিচলিত হইয়া উঠিল। নবাবের করুণ উক্তিতে যাহাদের একটু সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইতেছিল, তাহারাও বিরক্ত হইল। এমনই কোলাহল-বিড়ম্বনার মধ্যে বজ্রের মত সভাপতির বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, "বার্ণার্ড জাঁসুলের নির্ব্বাচন নামঞ্জুর।"

একটি মাত্র কথা! কিন্তু একটা লোকের জীবন যেন সে কথার ধারে কাটিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

উপরে বসিয়া জাঁসুলের মাতা অবাক হইয়া গেলেন—এ কি—! লোকজন চলিয়া যাইতেছে যে! চারিদিকে ছত্রভঙ্গ ব্যাপার! দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ হল খালি হইয়া গেল। বার্ণার্ডও উঠিয়া যায় যে! ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া বৃদ্ধা পার্শ্ববর্ত্তিনী এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হল কি? সব উঠে যাচ্ছে যে?"

"নবাব হেরে গেল—ডেপুটি হল না।"

"হল না!" বৃদ্ধার বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল। তাহার মুখ পাণ্ডু হইয়া গেল। কোনমতে সম্মুখের রেলিঙে ভর দিয়া বৃদ্ধা আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিল;—তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। তার পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বৃদ্ধা সব বুঝিয়া লইল। পুত্র কি কথা বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিল না? বলিতেছিল, কিন্তু তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র থামিয়া গেল! পুত্র শুধু মাতার জন্য এতখানি স্বার্থত্যাগ করিল! আপনার ভবিষ্যৎ—আপনার সকল সাধ সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বচ্ছন্দে এত বড় কলঙ্কের কালি মুখে মাখিয়াই সে বসিয়া রহিল! বৃদ্ধা মুহূর্ত্তে বুঝিল, হতভাগা লুই শুধু নিজের সর্ব্বনাশ

করিয়াই ক্ষান্ত হয় নই—তাহার অমন ভাইয়েরও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল! বৃদ্ধার মনে হইল, এই এতগুলা লোককে দাঁড় করাইয়া নিজে সে একবার সব রহস্য সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া বলে! একজন ছেলে খারাপ বলিয়া সে অপমান প্রকাশ হইবার ভয়ে আর একজনের উপর অবিচার করিবে, এমন প্রাণ তাহার নহে। ইহা সে চাহেও না—কোথায় বার্ণার্ড? আসুক সে—মমতার কোন প্রয়োজন নাই! সত্য কথা খুলিয়া সে বলুক—এ মিথ্যা অপবাদ তাহার মাথায় বহিবার কোন প্রয়োজন নাই! মাতার প্রাণে আঘাত বাজিবে, বাজুক! এ ত্যাগ মা হইয়া পুত্রকে সে কখনই মাথায় তুলিতে দিবে না!

বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া আসিয়া একজনকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল, বার্ণার্ড? নবাব,—আমার ছেলে?"

লোকটা কহিল, "এই যে, আপনিই তাঁর মা? তিনি আমায় পাঠালেন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি গাড়ীতে আছেন। আসুন।"

বৃদ্ধা তাহার সহিত নীচে নামিয়া আসিল। বাহিরের দালানে তখনও বহু লোক দাঁড়াইয়া গল্প-গুজব করিতেছিল—নবাবের নামে হাসি-ঠাট্টাও বেশ চলিতেছিল। একজন বলিল, "কিন্তু বলতে বলতে অমন হঠাৎ থেমে গেল কেন?"

আর একজন হাসিয়া কহিল, "বুঝলে না? একটা কথা বলা সহজ—তারপর ঐ প্রমাণ-পত্র যে লি মার্কারের হাতে—তাই আর কি চেপে গেল।"

বৃদ্ধার মাথা চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সে তীব্র স্বরে কহিল, "না, তা নয়। শুনুন আপনারা তবে, আমি বলছি—আমি তার মা—বার্ণার্ডের মা—আমি সব কথা খুলে বলছি। আমার দুই ছেলে,—বার্ণার্ড ছোট, বড়র নাম লুই।" বৃদ্ধা সহসা দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া লি মার্কার। সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে—আপনিই ত যত কথা বলছিলেন—বার্ণার্ডকে অত দোষ দিচ্ছিলেন। শুনুন, আমি তার মা—আমার দুই ছেলে,—বার্ণার্ড আর লুই। এই লুই প্রথম বয়সে—"

লোকগুলা বিদ্রূপের একটা তীব্র তরঙ্গ হানিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধা কাতরভাবে কহিল, "ওগো তোমরা একটু দাঁড়িয়ে শুনে যাও। একটু শোন, না হয় তাকে ডেপুটি নাই করলে! তা বলে একজন নির্দ্দোষ নির্দ্দোষ লোকের উপর অন্যায় অবিচার করো না—"

কিন্তু হায়, এ যে অরণ্যে রোদন! এ যেন ঘোড়দৌড় প্রভৃতির ন্যায়ই ভিতরে এতক্ষণ একটা খেলা চলিতেছিল—খেলা ভঙ্গে তেমনই লঘু চিত্তে শিষ দিতে দিতে সকলে ঘরে ফিরিতেছে! অথচ নিষ্ঠুর সব, জানে না যে, এই খেলায় তাহার প্রিয়তম তাহার অমন গুণের পুত্র বার্ণার্ডের কি দারুণ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে—তাহার বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বৃদ্ধার মনে হইল, ভগবান কি নাই—এ পাপের শাস্তি কি তিনি দিবেন না?

এমন সময় নবাব আসিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা, এসো বাড়ী এসো!"

বৃদ্ধা ঝাঁপাইয়া পুত্রের বুকে মুখ লুকাইল—ফুঁপাইয়া কোনমতে বলিল, "কেন তুমি সব কথা খুলে বললে না, বাবা? কেন এ কলঙ্ক মেখে বসে রইলে? সব খোয়ালে যে।"

নবাব ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কিছু খোয়াই নি মা। কিছু চাই না মা—আমি। কলঙ্ক? দিক্ কলঙ্ক ওরা—আমার মার কোল আছে—সেখানে আমার প্রচুর শান্তি জমা রয়েছে। আমার কি সর্ব্বনাশ হবে? কিছু না! তুমি বাড়ী এসো।"

নবাব মাকে টানিয়া লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মাকে মুখে সান্ত্বনা দিলে কি হইবে, বুক তাঁহার ফাটিয়া যাইতেছিল। গাড়ী চলিলে মার বুকে মাথা রাখিয়া ছোট শিশুর মতই মৃদু কণ্ঠে নবাব ডাকিলেন, "মা, মা আমার—" সে স্বরে বুক-ভাঙ্গা বেদনা যেন উছলিয়া উঠিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাতিদান

(রুস গল্পলেখক আন্তন শেখভ্ হইতে)

সাসা স্মারনভ, তার মায়ের 'সবে-ধন-নীলমণি!' খবরের কাগজে কি-একটি জিনিষ মুড়িয়া বগলদাবা করিয়া সে নামজাদা ডাক্তার কোসেল্‌ককের রোগী-দেখিবার-ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে ছোক্‌রা, খবর কি? আজ সকালে তুমি কেমন আছ?"

সাসা'র চোখ মিট্-মিট্ করিয়া উঠিল। বুকের উপরে একহাত রাখিয়া, বাধো-বাধো গলায় সে বলিল, "আপনি আমাদের যে উপকারটা করেচেন সেজন্যে মা আপনার কাছে বড়ই ঋণী আছেন। মায়ের আমি একছেলে। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন!"

ডাক্তার খুসী হইয়া সদয় স্বরে বলিলেন, "আহা, থাক্—থাক্! ও-সব কথা আর তুল্‌তে হবে না! আমার জায়গায় অন্য কেউ এলে যা কর্‌ত আমি শুধু তাই করেচি বৈ ত নয়!"

সাসা বলিল, "মায়ের আমি একছেলে। আমরা ভারি গরিব ডাক্তার-সায়েব! আপনার 'ভিজিটে'র টাকা ঠিক দিতে পারিনি বলে আমরা বড়ই লজ্জিত। তবে,——মা আপনাকে একটি জিনিষ ভেট্ পাঠিয়েছেন। এটি হচ্চে অষ্টধাতুর পুতুলঅলা বাতিদান, বাজারে এখন আর এ কিন্‌তে মেলে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "না, না—তোমাদের ভেট্-'টেট্' আর কিছু দিতে হবে না।"

সাসা মোড়কটি খুলিতে-খুলিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে কি হয় ডাক্তার-সায়েব! তাহলে আমরা বড় দুঃখিত হব। আমার বাবার সেকালকার জিনিষ-পত্তর কেনার বাতিক ছিল কিনা! তাই এটিকেও তিনি কিনেছিলেন। এ-বড় দুর্লভ রত্ন ডাক্তার-সায়েব, বড় দুর্লভ রত্ন!"

সাসা মোড়ক খুলিয়া জিনিষটি গর্ব্বিত ভাবে টেবিলের উপরে রাখিল। ডাক্তার দেখিলেন, সেটি একটি সুন্দর বাতিদান—চমৎকার কারিগরী! দুটি নগ্ন রমণীর মূর্ত্তি বাতিদানটি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তিদুটির চোখে-মুখে দুষ্টামিভরা হাসি। তাদের ভাবগতিক দেখিলে মনে হয়, বাতির ভার বহিতে তারা যেন নেহাৎ নারাজ;—এমন-কি, তারা দুটিতে যেন, যে-কোন-মুহূর্ত্তে মাথার উপর হইতে বাতি-দানটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, এমন এক বিষম অভদ্র নাচ সুরু করিয়া দিতে পারে, যার কথা ভাবিতে গেলেও লজ্জায় মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠে!

পুতুলদুটির দিকে অনেকক্ষণ কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, ডাক্তার আস্তে-আস্তে দু-চারবার কাশিয়া ও কান চুল্‌কাইয়া বলিলেন, "হুঁ, পুতুলদুটিতে যে খুব ভাল কারিগরী আছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু—কিন্তু—বুঝ্‌চ হে ছোক্‌রা—কিন্তু—"

সাসা কহিল, "আপনি কি বল্‌চেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "বল্‌চি কি জান? সয়তানও বোধহয় এমন বিদ্‌কুটে পুতুল গড়্‌তে পারে না। এ বাতিদানটা কি করে আমি টেবিলে সাজিয়ে রাখি?"

সাসা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "বলেন কি ডাক্তার-সায়েব! আপনার সঙ্কোচ কিসের? এ যে আর্ট! দেখুন না এতে কি সৌন্দর্য্য! একেবারে পৃথিবীকে ভুলে যেতে হয়! এর মাপ্‌জোক কেমন নিখুঁত, খোদ্‌কারীর হাত কি সাফ্, পুতুলদুটির চেহারাই বা কি জ্বলজ্যান্ত!—"

ডাক্তার বলিলেন, "হুঁ, হুঁ, সে সব আমিও বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌চি। তবে কি জান বাপু, আমি বিবাহিত পুরুষ, আমার ঘরে ভদ্রমহিলারা আর ছেলেপুলেরা হামেসাই আসা-যাওয়া করে থাকে।"

সাসা বলিল, "হ্যাঁ, আপনি যে চোখে দেখ্‌চেন, সে চোখে দেখলে এ-রকম উঁচুদরের আর্টেও খারাপ ভাব পাওয়া যায় বটে! কিন্তু, ডাক্তার-সায়েব, আপনার মত শিক্ষিত লোক অসভ্য চাষা-ভুষোর মত হলে চল্‌বে কেন? বুঝ্‌চেন ত, আপনি যদি আমাদের এ সাধের উপহারটি ফিরিয়ে দেন, তাহলে মায়ের আর দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকবে না। মায়ের আমি একছেলে,—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, —আমি এ উপহার নিলুম। তোমার মাকে আমার ধন্যবাদ জানিও।"

সাসা খোস্-মেজাজে ডাক্তারকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার একলা-একলা বসিয়া বাতি-দানটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দু-চারবার কান চুল্‌কাইলেন। খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন।

"হুঁ, এটা নিশ্চয়ই খুব উঁচুদরের আর্ট!

একে ফেলে দেওয়াও বোকামির কাজ, অথচ এখানে রাখাও বেজায় মুস্কিল! আচ্ছা, এটাকে অন্য কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে হয় না?"

হঠাৎ প্রাণের বন্ধু উকিল ঔকফের কথা ডাক্তারের মনে উদয় হইল। সে তাঁর কাজ করে, অথচ টাকা দিতে গেলে নেয় না।

"ঠিক! সে বিয়ে করেনি, সুতরাং এমন উপহার পেলে নিশ্চয়ই সে কোন আপত্তি-টাপত্তি' কর্‌বে না!"

ডাক্তার আর একটুও সময় নষ্ট করিলেন না। ভুল করিয়া বাতিদানটা কাগজে মুড়িয়া তিনি সোজা তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলেন।

"সুপ্রভাত, বন্ধু! আজ তোমার জন্যে একটি উপহার এনেছি। আমার কাজে তুমি যখন টাকা-কড়ি কিছু নাও না, তখন এ উপহারটি না নিলে তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌চি না!"

বাতিদানটা দেখিয়া ঔকফ একেবার অবাক ও মোহিত হইয়া গেলেন।

"কি ভয়ানক কল্পনা! অথচ কি সুন্দর! বাঃ বাঃ! কোত্থেকে এটা পেলে হে?"

"তোমাকে দিলুম।"

অসোয়াস্তির সঙ্গে দরজার দিকে চাহিয়া একটা ঢোক্ গিলিয়া, ঔকফ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "মাপ কর ভায়া, আমি তোমার উপহার নিতে পার্‌লাম না! এটাকে শীগ্‌গির এখান থেকে সরিয়ে ফেল।"

ডাক্তার যেন আকাশ থেকে পড়িয়া বলিলেন, "সে কি! কেন?"

"কি-জান? আমার মা এখানে আসেন, মক্কেলেরা আসে, চাকর-বাকরেরা আসে, ওটা কি এখানে সবার সুমুখে ফেলে রাখা যায়? সরিয়ে ফেল, জল্‌দি সরিয়ে ফেল!"

একসঙ্গে হাতনাড়া ও মাথানাড়া দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "না ভাই, না! এটা ফিরিয়ে দিলে আমি ভারি দুঃখিত হব। তোমার লজ্জা কিসের?—এ তো আর্ট! এর প্রতি তুমি অবিচার কোর না।"

"সব ত বুঝ্‌চি। কিন্তু পুতুলদুটোতে যদি কাপড়-পরানো থাক্‌ত, তাহলেও বরং—"

কিন্তু ঔকফের কথা শেষ হইবার আগেই ডাক্তার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন। এই বিষম আর্টের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইয়া, ডাক্তার যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ঔকফও ডাক্তারের মত একলাটি বসিয়া অনেকক্ষণ বাতিদানটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দু-চারবার সেটাকে আষ্টে-পিষ্টে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করা উচিত!

"খুব উঁচুদরের আর্ট বটে! একে ফেলে দেওয়াও যায় না, রাখাও চলে না। আচ্ছা, এটা কারুকে গছিয়ে দিতে পার্‌লে ত বেশ হয়! ঠিক্! স্যাস্‌কাইন থিয়েটার করে, আজ তার সাহায্য-রজনী—বিশেষ, এরকম জিনিষ সে খুব ভালবাসে!"

ঔকফ আর দেরি করিলেন না। বাতি-দানটা কাগজে মুড়িয়া লইয়া, কোনদিকে না চাহিয়া তিনি একেবারে স্যাস্‌কাইনের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

উপহার দেখিয়া স্যাস্‌কাইন ভারি খুসি! সেদিন তাঁহার ঘরে যত বন্ধুবান্ধব আসিলেন, সবাই মিলিয়া বাতিদানের কি তারিফটাই যে করিলেন! কিন্তু এই হাসি-ঠাট্টা-হট্টগোলের মাঝখানে যখন একজন অভিনেত্রী আসিয়া হঠাৎ দরজায় ঘা মারিলেন, স্যাস্‌কাইন তখন চমকিয়া তড়াক্ করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ শুকাইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

দরজার পিছন হইতে মহিলাটিকে উদ্দেশ করিয়া ব্যস্তভাবে তিনি বলিলেন, "এখন ভেতরে এসনা গো, এসনা! আমি কাপড় পর্‌চি!"

সে রাতে, অভিনয়ের পর বাড়ীতে ফিরিয়া স্যাস্‌কাইন উপহারটির দিকে তাকাইয়া, ঘন ঘন মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করিলেন।

"তাইত, কি মুস্কিল! এখানে যখন-তখন অভিনেত্রীরা এসে থাকেন, অতবড় জিনিষটাকে টপ্ করে যে টানায় পূরে ফেল্‌ব তারও যো নেই। এটাকে ফেলে দিলেও লোকে আমাকে বদ্‌রসিক ঠাওরাবে, —এ যে আর্ট!"

তাঁহার জামা খুলিয়া দিতে-দিতে চাকর পরামর্শ দিল, "আচ্ছা, তার চেয়ে এটা বিক্রী করে ফেলুন না! বাজারে একটা বুড়ো স্ত্রীলোক আছে, সে এ-রকম জিনিষ কেনে-বেচে,—তার দোকানে এটা পাঠালে হয় না?"

তাহাই হইল। স্যাস্‌কাইন তখন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

দুদিন কাটিয়াছে। ডাক্তার কোসেল্‌ফ্ আরাম-কেদারায় বসিয়া-বসিয়া আপনমনে এটা-সেটা ভাবিতেছেন।

হঠাৎ দরজাটা দুম্ করিয়া খুলিয়া গেল! সাসা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল,—তার ঠোঁটের পাশ দিয়া হাসি যেন উপ্‌ছাইয়া পড়িতেছে!

খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিষ টেবিলের উপরে যত্নভরে রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ডাক্তার-সায়েব! বড় সুখবর! আমাদের আর ছিল না বলে, আপনাকে একটা বাতিদানই দিয়েছিলাম। আজ বাজারের এক স্ত্রীলোকের দোকান থেকে ঠিক অমনিধারা আর একটা বাতিদান কিনে এনেছি। এইবারে আপনার জোড়া মিল্‌ল ডাক্তার-সায়েব! মায়ের আমি এক ছেলে,—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন!"

কি আপদ! হতভম্ব ডাক্তার হাঁ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। তিনি কথা কহিতে গেলেন,—পারিলেন না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অন্ধকারের কথা

হে সূর্য্য! ইদানীং কিছুদিন হইতে আলোর গৌরবে তোমার আর মাটিতে পা পড়িতেছেনা, আলোর সহিত চারিদিকে যে দাম্ভিকতা বিকীরণ করিতেছ এবং কতক মূঢ় লোকে অবাক হইয়া ভক্তিভরে যে আলোকের বিকাশলীলা দেখিতেছে। কিন্তু আমাদের সনাতনী সান্দ্রতামসী সভার প্রতিনিধিস্বরূপ আমি তোমারই আলোকে দাঁড়াইয়া তোমাকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে জানাইতেছি যে, আমরা তোমাকে মানিনা; তোমাকে স্বীকার করিনা। তোমার ভক্তরা বলিতেছে—"দশদিক কি আলোর সঙ্গে মত বিকশিত হইয়া উঠিতেছেনা?—সারাঙ্গী কি সঙ্গীতে মুখরিত হয় নাই?—সহস্রবিকশিত অযুত ফুলের ঘনসৌরভ-ভারে বাতাস কি মন্থরতা লাভ করে নাই?" কিন্তু তোমরা! তাই প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতেছ! আলো ও প্রাণের রহস্য লীলা থাক্ বা না থাক্ তাহাতে কাহারো আসে যায় না—এ বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ আপ্তবাক্য। আমাদের সভার ঋষিতমা ঋষির স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দেখাইতে পার কি যে তুমি সূর্য্য? তাহা না পারিলে তোমাকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না। তোমার সঙ্গে আলো, প্রাণ ও গানের লীলা কতকটা জড়িত হইয়া আছে তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু আমরা বলি তাহা কেবলমাত্র অভিনয়—ইন্দ্রজাল—ম্যাজিক—হিপ্‌নটিস্‌ম্ অথবা আর কিছু। আজ যদি পৃথিবীতে সত্যযুগ বিদ্যমান থাকিত কিম্বা তুমি ও আমরা যদি তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিতাম তাহা হইলে এই আলোবিকীরণের অপরাধের জন্য তোমার নিমিত্ত যে অভিনব দণ্ডের ব্যবস্থা করিতাম তাহার তুলনায় Bruno প্রভৃতির দণ্ড ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু ঘোর কলি কাজেই—!

তোমার আলো হয়তো কোনও রূপে ক্ষমা করিতে পারিতাম, হয়তো জবা-কুসুমসঙ্কাশং বলিয়া দু একটি বচনও তোমার সম্বন্ধে আওড়াইতে পারিতাম কিন্তু তোমার বুদ্ধির দোষে সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলে। সমুদ্রপারে ম্লেচ্ছদের দেশ—যেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের নিষেধ এবং যেখানকার অধিবাসীদিগের প্রতি নির্জ্জলা বিদ্বেষ আমাদের নব্যশাস্ত্রের বিধি—সেখানে আলো ছড়াইতে কে তোমাকে সাধিয়াছিল? ইহাতে যে তোমার আলোর জাতি গিয়াছে সে সংবাদ রাখ কি? আমাদের দলের সূচীভেদ্য orderএর বড় বড় Knightরা এ সম্বন্ধে বৈঠক করিয়া প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন—তোমাকে একঘরে করা হইবে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের খেয়াল হইল তাহাতে কোনও ফল হইবে না;—তোমাকে একঘরে করার নির্ম্মল আনন্দ হইতে স্বয়ং ভগবানই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন;—তোমাকে এমন দারুণ একঘরে করিয়া

সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা ভাবিতে গেলে আমাদেরই কষ্ট হয়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও সহিত কাঁধে কাঁধে মিলিবেনা—এ কি কম শাস্তি? এ সংসারে গাধা, গোরু, গ্রন্থকার—এমন কি বাঙলা কাগজের সম্পাদক পর্য্যন্ত সকলেরই তুল্য-মূল্য লোক আছে—পাল আছে, তোমারই নাই। তোমাকে এমনই হেয় করিয়াই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন—এমনি নিঃসঙ্গ, এমনি একাকী। সে যাহা হউক, তোমার ভক্তেরা যে তোমার আলোকের এত গৌরব করিয়া থাকে তাহা তাহাদের অর্ব্বাচীনতা মাত্র।

আলোকের কি কোনও মূল্য আছে? উহা চঞ্চল, হাল্‌কা—একেবারে বস্তুশূন্য। তোমার সমস্ত সৌরজগতের সমস্ত জ্যোতিষ্কের সকল আলো কুড়াইয়া ওজন করিলে এক ছটাকও হয় কি না সন্দেহ! আমাদের দলের ক্ষুদ্রতম অর্ভকের মস্তিষ্ক কোটরে যেটুকু অন্ধকার আছে তাহার ভারেই পৃথিবী টল্‌মল্ করিয়া উঠে। তাহা ছাড়া আলোকটা নিতান্তই হঠাৎ নবাব—upstart; আমাদের অন্ধকারের মত সনাতন বনেদী নহে। আর এটুকুও তোমার জানিয়া রাখা উচিত—তোমার আলো যতই শুভ্র হোক তাহা একেবারে পবিত্র নহে। কোনও রূপে গোময় লিপ্ত করিয়া একটু শুদ্ধ করিয়া লইলে তাহা হিন্দুর ব্যবহারে লাগিলেও লাগিতে পারিত। এ সম্বন্ধে একবার আমাদের বৈঠক বসিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল আমাদের দলপতিদিগের যাহার মাথায় গোময় ও অন্ধকার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাকে রূপে ঊর্দ্ধে স্থাপন করিতে পারিলে ও অন্ধকার বর্ষণ হইয়া তোমার আলোর দোষ অনেকটা কাটিতে পারে। নানা যন্ত্র-সহকারে তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া বার জন্য রীতিমত চেষ্টাও করা হইয়াছিল কিন্তু এমনই গুরুভার যে কিছুতেই বেশী ঊর্দ্ধে তুলিতে পারা গেল না—সমস্ত গোময় ও অন্ধকার কেবল আমাদেরই মাথার উপরে পড়িতে লাগিল;—আলোকের যেমন চলিতেছিল, চলিতে থাকিল। যাহা হউক, আমরা একেবারে নিরাশ হই নাই;—আমাদের জ্যোতিষী-মহোদয় বিশের সহকারে গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারের অন্তে স্বারোচিষ মনুর অধিকার, তদন্তে তামস মন্বন্তরের আবির্ভাব—তাহার পরমায়ু পঞ্চ পরার্দ্ধ বর্ষ—তাহার পর কৃষ্ণ-গোকল্প প্রবর্ত্তন হইবে। ভূলোকের একেবারে গোলোক-প্রাপ্তি ঘটিবে। ততদিন পর্য্যন্ত আলোকের অধিকার তোমার প্রভাব থাকিবে—তার পর আর না। সময় কিছু দীর্ঘ বটে কিন্তু আশার আশায় চোখ-কান বুজিয়া এক রকমে কাটিয়া যাইবে। এস ভাইসকল, আমরা সেই শুভদিনের আগমনের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হই এবং যথাসাধ্য ভূলোকের গোলোক-প্রাপ্তিবিষয়ে সাহায্য করি! বাঢ়ম্।

শ্রীতোতারাম শর্ম্মা শাস্ত্রী এম, এ।

চয়ন

জার্ম্মানীর তিন মহারথ

জার্ম্মানীর আধুনিক সাহিত্যের এই তিনজন প্রতিভাবান লেখকের নাম এখন সাহিত্য-সমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে,—সুডারম্যান, ভন্ ওস্পটেডা ও গাংঘোফার। তিনজনেই শক্তিধর ও প্রথম শ্রেণীর লেখক এবং তিনজনের রচনার ভিতরেই এমন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যে, তাঁহাদিগকে কিছুতেই একজাতীয় লেখক বলিয়া মনে হয় না।

এই তিনজনের মধ্যে সুডারম্যানই সর্ব্বাধিক ক্ষমতাবান, সর্ব্বাধিক নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাধিক বাস্তববাদী। তাঁহার রচনাপাঠে পাঠকগণের প্রাণমন একেবারে মোহিত হইয়া যায়। ভন্ ওস্পটেডার রচনা বিশ্লেষণ-প্রধান এবং মনোবিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। তিনি আমাদিগকে ধাপে-ধাপে নামাইয়া লইয়া যান এবং পরিণামে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কার্য্যকারণ-প্রণালী আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রতি গল্পের আখ্যান-বস্তু ও চরিত্র-চিত্রণ নূতন—লিখন-ভঙ্গী ও রচনা-পদ্ধতির সাদৃশ্য ছাড়া উহাদের ভিতরে আর কোন সাদৃশ্য নাই।—এই বৈচিত্র্য-সৃষ্টিতেও ওস্পটেডার নিপুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লিখন-ভঙ্গী পরিষ্কার ও সংযত এবং স্থানে স্থানে তাহা স্বপ্নের মত স্নিগ্ধ কবিত্বের আভাস প্রদান করে—সুডারম্যান বা গাংঘোফারের সঙ্গে এদিকেও তাঁহার কিছুমাত্র মিল নাই। গাংঘোফার 'রোম্যান্স'-সৃজনে সিদ্ধহস্ত এবং তিনজনের মধ্যে প্রকৃতি-বর্ণনায় তিনি সর্ব্বাধিক কৌশলী ও ওস্তাদের শিরোমণি। সুডারম্যানেও কবিত্ব আছে—কিন্তু সে অন্য রকমের।

সুডারম্যানের এক-একটি গল্প এতটা বিয়োগান্ত ও বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ যে, দ্বিতীয়বার তাহা পাঠ করিতে মন সরে না। আবার, করুণ ও বিয়োগান্ত হইলেও তাঁহার কোন কোন গল্পের এমন মোহিনী শক্তি আছে যে, বারংবার পাঠ করিয়াও আমাদের চিত্ত-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয় না।

তাঁহার "Dame Care" গল্পটিতে কেবলই জীবন-সংগ্রামের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত। উপন্যাসের চেয়ে সত্য যে আশ্চর্য্য, সুডারম্যানের এই গল্পটিতে তাহা জাজ্বল্যমান। লেখকের আত্মপরিবারের জীবন-সংগ্রামের সত্য কাহিনীই Dame Care-এর আখ্যান-বস্তু।

It was নামে উপন্যাসখানির রচনা-প্রণালী এতদূর সুন্দর এবং তাহা এমন খণ্ড-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ যে, তাহার যে-কোন একটি পরিচ্ছেদ মাঝখান হইতে খুলিয়া পড়িতে বসিলেও উপভোগের এতটুকু ব্যাঘাত হয় না। পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার সম্ভ্রান্ত-বংশীয় গ্রাম্য ব্যক্তিবর্গের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা এবং সেখানকার সহজ মানুষের সরল হৃদয়গুলি এই উপন্যাসে নিখুঁত-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার চরিত্র-

গুলিও অত্যন্ত চিত্তরঞ্জক। তরুণী Herthar চরিত্র-চিত্রণ একেবারে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং পড়িতে পড়িতে ইহাই মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, রমণীর দুর্জ্ঞেয় মনটিকে পুরুষেও এমনভাবে বুঝিতে পারে! এ বিষয়ে সুডারম্যানের প্রতিভা গেথের সমকক্ষ।

তের বৎসর আগে সুডারম্যানের John the Baptist নামক বিয়োগান্ত উপন্যাসখানি, ফ্রান্সিয়ার সর্ব্বত্র, সর্ব্বসাধারণের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ভাষার উপরে কাব্যের যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব! সুডারম্যান এই পুস্তকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, মতের সংকীর্ণতা ও বিবেকের কঠোরতা অপেক্ষা দুর্নীতিমূলক প্রেমও অনেক উচ্চ, অনেক শ্রেষ্ঠ।

সুডারম্যানের রচনা ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুবাদে মূলের রস ও ভাষার মাধুর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভন্ ওম্পটেডা, তাঁহার একখানি উপন্যাসে দেখাইয়াছেন, একজন হতভাগ্য ভাস্কর নৈরাশ্য ও অভাবের হাহাকারে কেমন করিয়া অবশেষে চোর ও হত্যাকারীতে পরিণত হইয়াছিল। এই উপন্যাসের সমগ্র সৌন্দর্য্য ভাস্করের পত্নীর চরিত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ভাস্কর, আপন সহধর্ম্মিণীকে আদর্শ করিয়া একটি প্রতিমা গড়িতেছিল। কিন্তু পাষাণী প্রতিমাকে প্রাণময়ী করিয়া তুলিবার জন্য তাহার সকল সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল।

একরাত্রে ভাস্কর, পত্নীর কাছে আপনার হত্যাপরাধের কাহিনী খুলিয়া বলিল। হত্যার কারণ বুঝিয়া সাধ্বী পত্নী অনায়াসে স্বামীকে ক্ষমা করিয়া বসিল। অনুতাপী ভাস্করের দৃষ্টি তখন খুলিয়া গেল, সে দেখিল তাহার পত্নীর হৃদয় তো পাষাণের নয়, প্রেমের মাধুর্য্যে তাহা কি কোমল, কি উদার!

সারারাত ধরিয়া ভাস্কর সকল তুলিয়া প্রতিমা গড়িতে লাগিল। ভোরবেলায় সে বিচারকের হাতে আত্মসমর্পণ করিল।

কিন্তু সাধনার মুকুল আজ পুষ্পিত। প্রতিমার পাষাণ-নেত্রে আজ জীবন ফুটিয়াছে, পাষাণময়ী প্রতিমা আজ প্রাণময়ী! এতদিন ভাস্কর শুধু পত্নীর রক্ত-মাংসের রূপ দেখিতেছিল, তাই সে জীবনের সাড়া পাইতেছিল না; কিন্তু আজ সে আদর্শের মধ্যে হৃদয়-সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে!

যাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার বিচিত্র লীলা দেখিতে ভালবাসেন, গাংঘোফারের রচনা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবে। তাঁহার উপন্যাসের অনেক ঘটনা চিত্তোত্তেজক ও একটু অস্বাভাবিক।

তাঁহার কোন কোন উপন্যাস একবার পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না এবং একেবারে শেষ লাইনে গিয়া হাজির না হওয়া পর্য্যন্ত নায়ক-নায়িকার অদৃষ্ট যে কোন্ পথে ফিরিবে, তাহাও আন্দাজ করিতে পারা যায় না। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সাধারণত সাধুপ্রকৃতির। এমন কি, তাঁহার উপন্যাসের যে চরিত্রগুলি অত্যন্ত অসৎ ও হীন, তাহাদের ভিতরেও একেবারে সৎগুণের অভাব নাই।

গাংঘোফারের রচনায় আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল আল্পস-পাহাড়ের বার্ত্তা পাইয়া থাকি। সেখানকার কৃষকদের স্বভাবসরল জীবন, আকাশের প্রদীপ্ত নীলিমা, স্বর্ণশ্রী রৌদ্রে ঝলসিত অনন্ত তুষার-প্রান্তর, সবুজ পত্রের অবিরাম মর্ম্মর-গান, গভীর বনানীর অতুল রহস্য শ্রী, স্বাধীন পাখীর নির্ভয় কাকলি, মাতাল ঝরণার এলমেলো হা-হা হাসি, অস্তসূর্য্যের জ্বলন্ত চিতা, সাগরের উপর প্রভাতের প্রথম আবির্ভাব,—প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব শব্দ-স্পর্শের মধ্যে আসিয়া আমরা কাব্যলোকের এক মায়াময় স্বপ্নদৃশ্যের ভিতরে ডুবিয়া—আরও ডুবিয়া যাই!

গাংঘোফার, জীবনের অধিকাংশ কাল গিরিশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় এবং স্তব্ধ অরণ্যের নির্জ্জনতার মধ্যে সাধনা-সমাহিত থাকিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য, প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য এবং স্বভাবের দুলাল কৃষকদের সরল জীবন তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। বসন্ত ও শরৎকালটা এই বিজনতার ভিতরে তিনি একাকী থাকিতেন; কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাঁহার নির্জ্জন ভবন অতিথিদের সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন তিনি স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধুবান্ধব লইয়া আনন্দ-হাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিতেন। রাত্রিই তাঁহার রচনার নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। দিনের বেলাটা অতিথিদের মনোরঞ্জনে, গল্পস্বল্পে, শীকারে ও বংশীবাদনে পরমসুখে কাটিয়া যাইত।

আমরা এখানে জার্ম্মানীর তিন সাহিত্যরথীর রচনার মূল কথাগুলির ইঙ্গিত দিলাম মাত্র; যাঁহারা তাঁহাদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চান, এই সামান্য ইঙ্গিত তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে।

The Simmons Magazine হইতে।

জাপানী বালুকা-চিত্র

সমুদ্রের ধারে ছেলেমেয়েরা বালির খেলাঘর গড়ে আর ভাঙ্গে; ভাঙ্গে আর গড়ে। বয়স্ক লোকেরা এ-সব ছেলে-খেলা পছন্দ করেন না। আর, বালি ছড়াইয়া যে আর্ট ফলানো যায়, এ কথা তাঁহারা জানেনও না।

কিন্তু, জাপানীরা এই বালুকা-স্তূপকে কাজে খাটাইয়াছে। সেখানে Bon-seki বা Bon-kei নামে একরকম আর্ট আছে, তাহাতে বালির পটে আঁচড় কাটিয়া চমৎকার ছবি আঁকা হয়।

জাপানী-শিল্পীরা সমুদ্র-তটে গিয়া ছবি আঁকিতে বসিয়া যান না। কালো বার্ণিশ-করা একখানি থালার উপরে জাপানী শিল্পী বালী আর নানান্ আকারের ছোট পাথরের টুক্‌রা ছড়াইয়া দেন। তারপর একটি পালক বা কাটি লইয়া, থালার বালুকণা ও পাথর-কুচিগুলি সুকৌশলে নাড়িয়া-চাড়িয়া সাজাইয়া দেন,—আর অমনি থালার উপরে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য—সাগরের চঞ্চল তরঙ্গ, দিগন্ত-রেখায়

কুয়াশার খেলা বা এমনি আর-কিছু ভোজবাজীর মত ফুটিয়া ওঠে!

জাপানীদের এই অদ্ভুত চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি নূতন নহে,—আজ প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া তাহারা এইরূপ চিত্রাঙ্কণ করিয়া আসিতেছে। মুরাতা সুকো নামে একজন জাপানী বৌদ্ধ-পুরোহিত সর্ব্বপ্রথমে এই Bon-seki-র আর্ট আবিষ্কার করেন। Bon মানে বারকোস্ ও seki মানে পাথর। মুরাতা সুকোর সময়ে বারকোসে পাথর বিকীর্ণ করিয়াই ছবি আঁকা হইত। তাঁহার শতবৎসর পরে জাপানের একজন সম্ভ্রান্ত লোক পাথরের টুক্‌রার সঙ্গে বালির কণাও ব্যবহার করিতেন। সেই সময় হইতেই পাথর-কুচির সঙ্গে বালুকণার ব্যবহারও চলিয়া গেল।

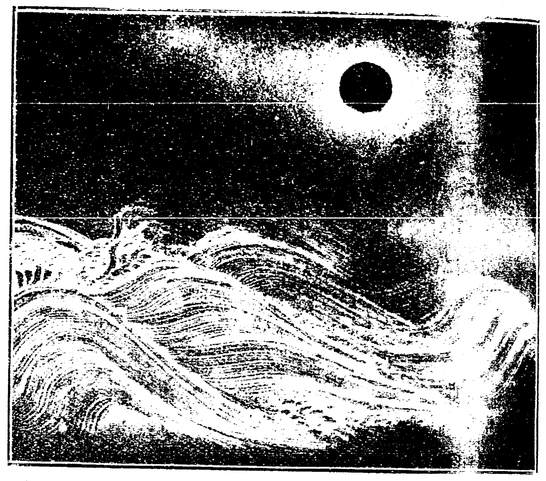

"অশান্ত সাগরের উপরে শান্ত শশী"

আমরা এখানে একখানি ছবির নমুনা দিলাম। ইহার নাম,—"অশান্ত সাগরের উপরে শান্ত শশী।"—অবশ্য, এ নমুনায় আসলের কোন রঙ ফুটে নাই,—কেবল তাহার আভাস আছে মাত্র।

The Strand Mag... হইতে

প্রাচীন মিশর

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতার মুখ দেখিয়াছে—মিশর। গত কুড়িবৎসর ধরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের দিবারাত্র পরিশ্রমের ফলে, প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে যে-সকল খবর বাহির হইয়াছে, তাহা উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।

মিশরের অতীত সভ্যতাকে দেখিবার জন্য কল্পনাকে যদি সারথী কর, তাহা হইলে সে তোমাকে ছয় হাজার বৎসর

আগেকার এক উন্নত প্রাচীনতার মধ্যে লইয়া যাইবে!

৪২৪১ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে, প্রাচীন মিশরের জ্যোতিষীগণ সর্ব্বপ্রথমে বৎসরকে তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ৪২৪১ খৃঃ পূঃ শতাব্দীটি কেবল যে মিশরের প্রথম তারিখ তাহা নহে;—ইহার আগে পৃথিবীতে যে কাল-নিরূপণের জন্য আর কোন সাল-তারিখ ছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা প্রথম ঐতিহাসিক বৎসর।

ঐ বৎসরের আগে ক্রমোন্নত সভ্যতার কি বিচিত্র ইতিহাস লুকানো আছে! সেকালের লিখিত কাহিনী আর কখনও জানা যাইবে কি না,—কে জানে?

নেপোলিয়ন যখন ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার একজন সেনাপতি, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রোসেটা নামক স্থানে খোদাই-করা বিখ্যাত কৃষ্ণ প্রস্তরের ফলক আবিষ্কার করেন। লিপি তিন ভাষায় লেখা হইয়াছিল। এই আবিষ্কারের পর হইতেই মিশরের ইতিহাসের দিকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি ভাল করিয়া আকৃষ্ট হয়।

বাড়ী তৈয়ারি করিবার জন্য খিলান ও থামের আবিষ্কার মিশরেই সর্ব্বপ্রথমে হয়। গ্রীকেরা যখন সভ্যতার আলোক দেখে নাই, মিশরবাসীরা তখন হইতেই ভাস্কর-কার্য্যে সুদক্ষ। মিশরেই প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মিত হয়। মানব-জাতির মধ্যে গভর্মেণ্ট, আইন-কানুন ও বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থা মিশরবাসীরাই করেন। মিশর হইতে য়ুরোপ ভাষার বর্ণমালা, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, মিশর-বাসীদের হৃদয়েই সকলের আগে ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হয়। জগতের সর্ব্বপ্রথম কাব্য ও কথা-সাহিত্য প্রাচীন মিশরেই রচিত হইয়াছে।* রমণী যে পুরুষের চেয়ে হীন নন, পুরুষের সহিত রমণীর যে সমান অধিকার,—মিশরই সর্ব্বপ্রথমে এই বাণী উচ্চারণ করেন।

প্রাচীন মিশরবাসীর উৎপত্তি কোথায়? এ বিষয় লইয়া এখনও বিচার-বিতর্কের অবসান হয় নাই। কপ্ট্ নামক জাতির যে হাজার-সাতেক লোক এখনও উত্তর ইজিপ্টে দেখা যায়, পণ্ডিতগণের মতে তাহারাই মিশরের আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীর যে-সকল প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মুখাকৃতি ও দৈহিক গড়নের সঙ্গে আধুনিক কপ্ট্-জাতীয় ব্যক্তিগণের আকারের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। ঐ সাদৃশ্য হইতেই এই সিদ্ধান্ত।

মিশরবাসীরা মরুভূমির অসভ্যগণের সহিত আপনাদের পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য আপনাদিগকে "মানুষ" বলিতেন।

প্রাচীন মিশরের নাম ছিল 'কেম' বা 'কেমি'—অর্থাৎ 'কৃষ্ণদেশ'। আগে সমগ্র দেশটি দুভাগে বিভক্ত ছিল,—উত্তর ও দক্ষিণ ইজিপ্ট। পঞ্চাশ শতাব্দী পূর্ব্বে ইজিপ্টের আদিম বাসিন্দারা যত টাকার 'টেক্স' দিতেন, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে

* এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যার ৬০৯ পৃঃ মুদ্রিত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মিশরী কবিতার অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

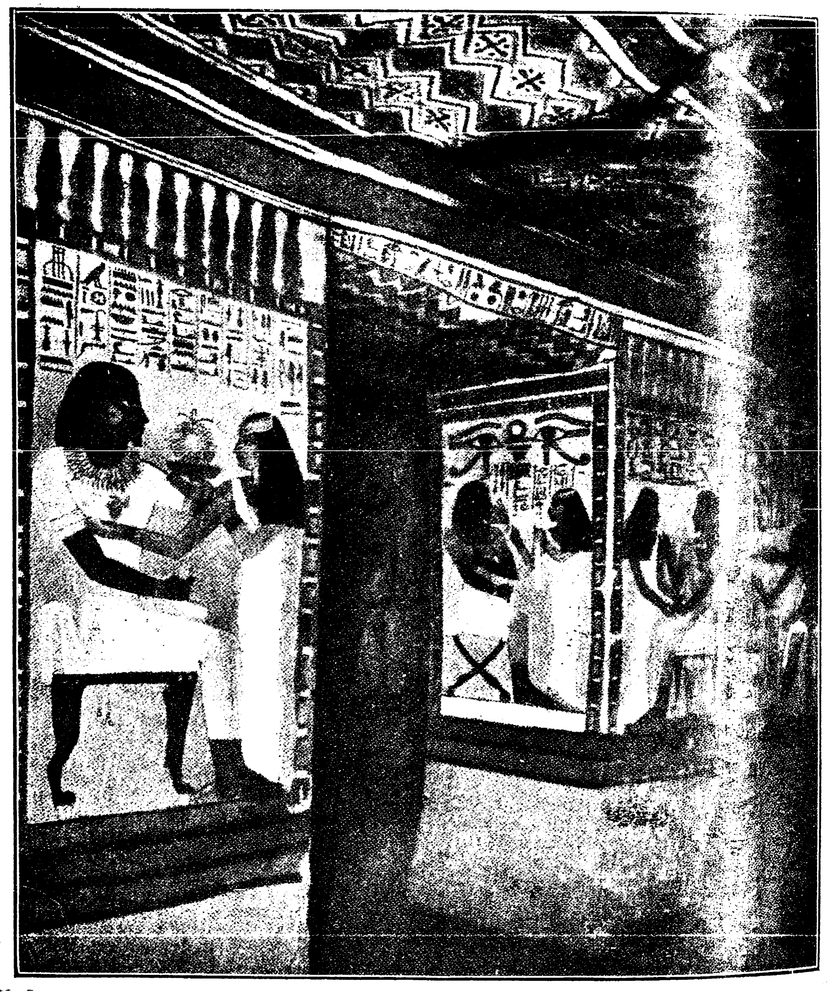

প্রাচীন মিশরের এক সমাধিভবনের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবি

ইংরাজ-শাসনে আসিয়াও এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসীরা ঠিক তত টাকাই রাজকর দেন!

মেনিথো নামে এক পুরোহিত খৃঃ পূঃ ২৮৩ অব্দে মিশরের প্রথম রাজবংশাবলী রচনা করেন। এই বংশাবলীর ইতিহাস সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক না হইলেও এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ এই ইতিহাসের সাহায্যেই পণ্ডিতগণের আলোচনা চলিতেছে। এই রাজ-বংশাবলী হইতে রাজাদিগের একটি ঠিক শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্খলা বা তাঁহাদের কার্য্যাবলীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না,—অনেক রাজা কেবল নামমাত্র সার হইয়াই আছেন।

আমরা এখানে প্রাচীন মিশরের এক-খানি ছবির নমুনা দিলাম। ইহার অঙ্কন-কাল খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ। রাজকুমার সেনোফারের শিলারচিত সমাধিভবনের দেয়ালে এই ছবিগুলি আঁকা আছে। ছবিগুলির প্রধান মূর্ত্তিদুটির একটি রাজকুমার সেনোফার এবং অন্যটি তাঁহার ভগিনী মেরিত্।

Munsey's Magazine হইতে

'মমি'র মাথা

ইজিপ্টের লুক্সর নামে সহরের কাছে সুপ্রসিদ্ধ থিবসের প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের আশেপাশের শ্রী-ছাঁদ এখন আর কিছু নাই। আরবেরা সমাধি হইতে মমিগুলাকে বাহির করিয়া বালির উপরে টানিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং মমির সঙ্গে যা-কিছু দামী জিনিষ-পত্র ছিল, সে-সমস্ত লুটিয়া লইয়াছে। মন্দিরেরও এখন ভগ্নদশা।

মিঃ জর্জ্জ এলফাউণ্ডার নামে এক ভদ্রলোক একদিন উটে চাপিয়া সস্ত্রীক এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মিঃ এলফাউণ্ডারের উট হঠাৎ হোঁচট্ খাইয়া তাঁহাকে পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দিল। ভূমিতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি দেখিলেন, উটের পায়ের কাছে কি-একটা কালো জিনিষ বালির ভিতরে আধঢাকা হইয়া রহিয়াছে। বালি সরাইয়া তিনি দেখিলেন, সেটা একটা মানুষের মমি। সমস্ত দেহটাকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়া অসম্ভব দেখিয়া, এলফাউণ্ডার মমির মাথাটা ছুরি দিয়া কাটিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

বিলাতে ফিরিয়া আসিবার পর, মিঃ এলফাউণ্ডার নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িতে লাগিলেন। তিনি যে কাজে, যে ব্যবসায়ে হাত দেন, তাহাতেই বিষম লোকসান্ হইতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার দেহ হঠাৎ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মমির মাথাটা তখন তাঁহার সঙ্গেই ছিল। কিন্তু তাহার অস্তিত্বের কথা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় প্রেততত্ত্ব চর্চ্চা করিবার বাতিক ঢুকিল। কিছুদিন

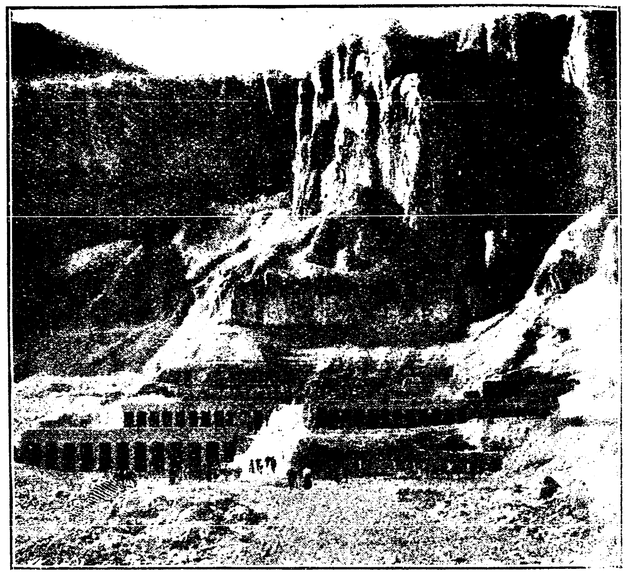

থিব্‌সের মন্দির

খোঁজখবরের পর তিনি মিঃ ব্রেলি নামে একজন 'মিডিয়াম'কে পাইলেন।

একদিন চক্রে বসিয়া মিডিয়াম অচেতন অবস্থায় মিঃ এলফাউণ্ডারকে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একজন আত্মা দেখা কর্‌তে চান। আমার দিকে একটি মূর্ত্তি আস্‌চে,—তার চারিদিকে ধূলোর মেঘ! ওকি! মূর্ত্তির যে মাথা নেই—সে যেন কি বল্‌তে চাইচে!"

মিঃ এলফাউণ্ডার মিডিয়ামের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেদিন এই পর্য্যন্ত।

আরও কিছুদিন পরে শ্রীমতী গ্রেক্ নামে অন্য একজন মিডিয়াম লইয়া চক্রে বসিলেন। এলফাউণ্ডার বিস্মিত হইয়া শুনিলেন, গ্রেক্‌ও ঠিক আগের মিডিয়ামের মতই মুণ্ডহীন এক দেহের কল্পনা করিতেছেন! মূর্ত্তিটি কোথায়? এ কথা জিজ্ঞাসা করায় মিডিয়াম বলিলেন, উঁচু পাহাড়—নীচে বাড়ীঘর আর বালি!"

এ বর্ণনা ঠিক থিব্‌সের মন্দিরের মত!

এলফাউণ্ডার তাঁহার স্ত্রীর কাছে এই ব্যাপারের কথা বলিলেন।

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "কি মুস্কিল! তুমি যে মমির মাথাটা সঙ্গে করে এনেছ, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই তার সম্পর্ক আছে!"

মিঃ এলফাউণ্ডার বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ কথাটা আমার মাথায় ত একেবারেই আসেনি! নাঃ—এ মমির মাথা আর কাছে রাখা নয়—যেখানকার

জিনিষ, সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক্।"

এলফাউণ্ডার মমির মাথাটা তাঁহার ফ্রান্স ইজিপ্‌সিয়ান্ বন্ধুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন যে, থিব্‌সের মন্দিরে একে যেন আবার কবর দেওয়া হয়।

কিন্তু, ইতিমধ্যে মমির মাথা কবরস্থ না হইয়া ডাঃ 'এক্স' নামে একজন বিখ্যাত বিশ্বতত্ত্ববিদের হস্তগত হইল। ডাঃ 'এক্স' তাহার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন:—

"এটি [illegible] যুবকের দাড়ি-গোঁফ-কামানো সুন্দর মুখ,—মাথায় ছোট ছোট কোঁকড়ানো [illegible] আছে, তাহা দেখিলে বোঝা যায় [illegible] মাথা যাহার, সে টলেমিদের রাজত্বকালের লোক। দাঁতগুলি এখনও সব ঠিকঠাক আছে। আকৃতিতে একে ইজিপ্‌সিয়ান্ বলিয়া মনে হয় না।" পরীক্ষার পর মাথাটি কবরস্থ করা হয়।

আর এলফাউণ্ডারের কৌতূহলী লোক এলফাউণ্ডারের কথা শুনিয়া মিঃ ব্রেলিকে লইয়া আবার চক্রে বসিয়াছিলেন। মিডিয়ামের মুখ দিয়া সেই সময়ে এই কথাগুলি পাওয়া গিয়াছিল:—"আপনারা যে আমার মাথাকে কবর দিয়েছেন, এজন্যে আমি বড়ই সুখী। কিন্তু মাথাটিকে মন্দিরের ভিতরে কবর দেওয়া হয়নি—বাইরে দেওয়া হয়েছে। যিনি আমার মাথাটিকে মন্দিরের ভিতরে সমাধি দিতে পার্‌বেন, পৃথিবীতে তিনি যতকাল থাক্‌বেন, আমি তাঁকে সাহায্য কর্ব্ব। এককালে আমি থিব্‌সের মন্দিরের পুরোহিত ছিলাম। একবার অত্যন্ত নির্য্যাতন হওয়াতে আমি মন্দির ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হই; কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে আবার মন্দিরে ফিরে আসি। আমার পিতা গ্রীক্ ও মা পারস্যের বাসিন্দা ছিলেন। আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি—মনে রাখ্‌বেন, ইজিপ্‌সিয়ানরা উপকার ভোলে না।" পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, মমিটি খৃঃ পূঃ ২,০০০ অব্দের।

এই ঘটনাটি যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণের বিশ্বাসের জন্য তিনি অনেক সন্তোষজনক প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা সে প্রমাণগুলির আর তর্জ্জমা করিয়া দিলাম না।

The Wide World Magazine হইতে

সূর্য্য-ঘড়ী

সময়-নিরূপণের জন্য যত রকমের কল আজ পর্য্যন্ত তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার ভিতরে সূর্য্য-ঘড়ী সকলের চেয়ে পুরাতন। কিন্তু আজকাল সাধারণের মধ্যে ইহার চলন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। শুধু য়ুরোপে ধনীদের বাগানে, এখনও মাঝে মাঝে সূর্য্য-ঘড়ীর দেখা পাওয়া যায়।

একথা ঠিক যে, আমরা এখন যেভাবে সময়-হিসাব করিয়া থাকি, সূর্য্য-ঘড়ীতে তাহা হয় না। জ্যোতিষীরা সূর্য্য-ঘড়ীর

নিরূপিত সময়কেই ঠিক বলিয়া ধরিয়া নেন, কিন্তু আমরা গ্রীণউইচ-সময় ধরিয়াই কাজকর্ম্ম করিয়া থাকি। গ্রীণউইচ-সময়ের সঙ্গে বৎসরের ভিতরে কেবল চারিদিনমাত্র সূর্য্য-ঘড়ী ঠিক সমান-সমান যায়। আর সকল দিনই সূর্য্য-ঘড়ী ও গ্রীণউইচ-সময়ের ভিতরে কয়েক সেকেণ্ড হইতে ষোল মিনিট পর্য্যন্ত এদিক-ওদিক হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যদি সামান্য রকম অভ্যাস করি, তাহা হইলে এই পার্থক্যের জন্য আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না; এমন কি, তখন আমরা অনায়াসেই সূর্য্য-ঘড়ী দেখিয়াই, ঘণ্টার প্রতি সেকেণ্ডটি পর্য্যন্ত ঠিকঠাক বলিয়া দিতে পারিব। সংপ্রতি, বিলাতে মিঃ জি, জে, গিব্‌স্ নামে একজন জ্যোতিষী, "হেলিওক্রণোমেটার" নামক একরূপ নূতন সূর্য্য-ঘড়ী তৈয়ারি করিয়াছেন—যাহা বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ততা-প্রধান জীবনেও, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও বোধগম্য।

ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম সূর্য্য-ঘড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়, খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে। জুডার রাজা Ahaz উক্ত সূর্য্য-ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র-প্রিয় চ্যাল্ডিয়ানরাই যে সে-যুগে সূর্য্য-ঘড়ী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে গ্রীক্ ও রোম্যানরা যেরূপ সূর্য্য-ঘড়ী ব্যবহার করিতেন, তাহার নমুনা এখনও আছে। ৬৭০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটি সূর্য্য-ঘড়ী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, স্যাক্সনরাও এই যন্ত্র ব্যবহারে অনভিজ্ঞ ছিল না।

পিরাণিম্ পাহাড়ের চাষারা এখনও সূর্য্য-ঘড়ী দেখিয়া সময় নিরূপণ করে। কোন কৃষককে এই ব্যাপার লইয়া 'সেকেলে' বলিয়া ঠাট্টাতামাসা করাতে, একদা আমেরিকানকে সে বলিয়াছিল, "তোর মানুষের এমন সাধ্য নেই যে, সূর্য্য ও দিনের ঠিক সময়টি বলিয়া দিতে পারে; কারণ, সূর্য্য যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে সময় বলিয়াও কোন ব্যাপার থাকিত না। আমরা তাই সময়-নিরূপণের সময়ে সূর্য্যকে দেখিয়াই ঘড়ীর কাজ সারিয়া থাকি।" সেই আমেরিকান এই সামান্য কৃষকের উত্তর শুনিয়া একেবারে নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিলেন।

কিছুদিন আগে, মরক্কোর সুলতানের ফর্‌মাজে, বিলাতের এক ব্যবসাদার একটি চমৎকার ও নূতন আকারের সূর্য্য-ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এটি হচ্ছে সোনার ঘড়ী।

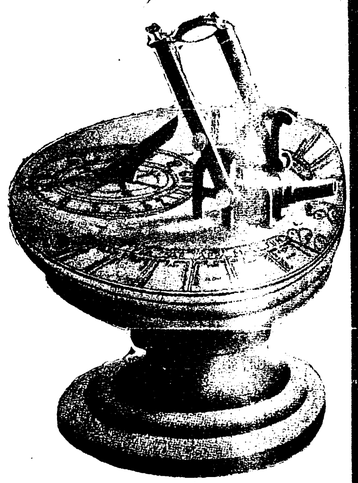

মরক্কোর সুলতানের সূর্য্য-ঘড়ী

এই পিতলে তৈয়ারি ঘড়ীটি ঠিক সময় রাখিতে পারে। ঘড়ীর উপরে একখানি আতসী কাঁচ এমনভাবে সাজানো থাকে যে, প্রতিদিন ঠিক দুপুরবেলা সূর্য্য-রশ্মি সেই কাঁচের ভিতরে কেন্দ্রীকৃত হইয়া বারুদভরা কামানের ছিদ্রে আগুন ধরাইয়া দেয়! অগ্নিসংযোগ হইবামাত্র কামানটিও গর্জ্জিয়া উঠিয়া মধ্যাহ্নকালের বার্ত্তা ঘোষণা করে। কিন্তু পুরাণো ইংরাজী বাগানের সূর্য্য-ঘড়ীগুলি আপনাদের শ্রী-ছাঁদে আর সব দেশকে হারাইয়া দিয়াছে। সেকালের এই ঘড়ীগুলির গায়ে যে-সকল বচন খোদিত থাকিত, তাহাদের সৌন্দর্য্যও বড় অল্প নয়। আমরা দু-চারিটির নমুনা দিলাম :—

১। অন্য সবাই ঝড়ঝাপ্‌টা আর বৃষ্টি-বাদলের কথাই বলুক; আমরা সুধু তোমার রবিকরোজ্জ্বল ঘণ্টাগুলিকে গুণে গুণে যাব।

২। এই ঘড়ী কি বল্‌চে জানো?—

জীবন শুধু একটা ছায়া, মানুষ শুধু ধূলিমুষ্টি—আমরা মরব, সবাই মরব!

৩। আলো ও ছায়ায় গড়া এই জীবন! তবু—সূর্য্য কি মহান্ আর ছায়া কত ক্ষুদ্র!

৪। সময় চলে যায় আর ফুল ঝরে পড়ে। নতুন দিন, নতুন জীবন থাকে না—থাকে খালি প্রেম!

৫। এই ছায়া—এই আলো; তবু সদাই ভালবেস!

৬। কি বল্‌ছ—সময় যায়? হায়, সময় থাকে, যাই কেবল আমরা।

৭। জাগো, ওগো, জাগো—ওগো অলস, জাগো! চেয়ে দেখ 'বর্ত্তমান' যে 'অতীত' হয়ে গেছে!

৮। রজনী এল গো, রজনী এল!

Pearson's Magazine হইতে

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

আফ্‌তাব্

(এই কবিতাটি খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে রচিত)

নয়নাভিরাম নভোতলে প্রভু! তোমার আবির্ভাব,
হে সঞ্জীবন! সংজ্ঞাসাধন! আত্মন্! আফ্‌তাব্।
তুমি জীবন্ত জীবনের আদি, তুমি আদি-অনুভব,
তোমার অভাবে আঁধার ভুবন, শবের মতন সব;
ঘরে ঘরে হায় লুটায় মানব বসনে আবৃত দেহ,
আঁখি-তারা থির বিবশ শরীর কারেও পুছে না কেহ!
তোমার নয়ন মুদিত যখন সেইক্ষণে জাগে পাপ,
সিংহ সে আসে হিংসা করিতে দংশিতে ওঠে সাপ।

তোমার আভাসে হাসে দশদিক্ হরষিত বসুমাতা,
ক্ষুধিত ধেনু সে হেরে তৃণভূমি সঞ্চরে লতাপাতা ;
হংস সারস প্রণতি জানায় উঁচু ডানা দুটি জুড়ে,
পা আছে যাহার ওঠে সে লাফায়ে, পাখা আছে যার ওড়ে।
ডিম্বের মাঝে পক্ষীর ভ্রূণ সহসা লভিয়া প্রাণ
আবরণ টুটি, বাহিরায় ছুটি গাহি' মৃদু কলগান ;
তব জাগরণে জগতে হর্ষ-কোলাহল যায় শোনা,
চঞ্চল করি' নীলজল জাগে নৌকার আনাগোনা।
তোমার উদয় হৃদয়ে আমার আছ তুমি মোর মাঝ,
অক্ষাত্মন বরপুত্র সে তোমারি হে রাজরাজ!
তোমার শকতি তোমার বিধান জানায়েছ মোরে তুমি,
তোমার উদয়ে জেগেছে হৃদয় জেগেছে বিশ্বভূমি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফেল-জামিন

(গল্প)

আমি ক্যাম্বেলের পাশ নেটিভ ডাক্তার। সাত ঘাটের জল খাইয়া সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি জেলে বদলি হইয়া আসিয়াছি।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাসার সম্মুখে একটু খোলা জায়গা ছিল; সেইখানে ইজিচেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, এমন সময় একটা ওয়ার্ডার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, জেলে একটা অ্যাক্সিডেণ্ট কেশ হইয়াছে। উমেশ কয়েদী পাথর-ভাঙ্গা মুগুর নিজের মাথায় মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। এখনই আমাকে যাইতে হইবে। ডাক্তার সাহেবের কাছেও লোক ছুটিয়াছে।

তাড়াতাড়ি জেলে ছুটিলাম। আমার বাসা হইতে জেল দশ মিনিটের পথ।

জেলে গিয়া দেখি, লোকটা বেহুঁস হইয়া রহিয়াছে। কপাল ছেঁচিয়া গিয়াছে —রক্তারক্তি ব্যাপার! একটু আশ্বস্ত হইলাম—মাথাটা একেবারে ভাঙ্গে নাই। তখনই প্রয়োজনমত ঔষধ-ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিলাম। নাড়ী টিপিলাম, ঠিক আছে! ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবও আসিয়া পড়িলেন। ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া রিপোর্ট লিখিতে বলিয়া তিনি ক্লাবে চলিয়া গেলেন।

ইহার চার-পাঁচ দিন পরে—ঠিক তখন ভোর হইয়াছে,—সারারাত্রি ধরিয়া চীৎকার করিয়া জ্বালাইয়া ছোট ছেলেটা সবেমাত্র

ঘুমাইয়া ঘুমাইবারও একটু অবকাশ দিয়াছে—আমিও ঘড়ির পানে চাহিয়া চক্ষু মুদিবার কল্পনা করিতেছি, এমন সময় ওয়ার্ডার আসিয়া বহির্দ্বারে উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল, "বাবু—"

ভাল উৎপাত! বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। ওয়ার্ডার সেলাম করিয়া জানাইল, সেই উমেশ কয়েদী শেষরাত্রি হইতে বিষম বায়না ধরিয়াছে, ডাক্তার বাবুকে একবার ডাকিয়া দাও। কিছুতেই তাহাকে থামানো যাইতেছে না। বকিয়া বুঝাইয়া সকলে হার মানিয়া গিয়াছে! তাই শেষে—

লোকটার সবে জ্বর ছাড়িয়াছে। কাল রাত্রেও তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, অনেকটা ভালই আছে। আবার পাছে কোন উৎপাত বাধাইয়া তুলে,—কাজেই জামাটা গায়ে দিয়া জেলে চলিলাম।

উমেশের বিছানার পাশে আসিয়া দেখি, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া আছে। তাহার গায়ে হাত দিলাম, জ্বর নাই। উমেশ ফিরিয়া চাহিল, চোখ দুইটা তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে, বুঝিলাম, সে খুব কাঁদিয়াছে। আমি কহিলাম, "কি হয়েছে উমেশ, ডাকছিলে কেন?"

উমেশের চোখে জল দেখা দিল। ফুঁপাইয়া সে কহিল, "বাবু, কেন আমায় বাঁচালেন? আজ ক'দিন এ মনের মধ্যে কি যে আগুন জ্বলছে, তা যদি বুঝতেন!"

ভাবিলাম, লোকটার অনুতাপ হইয়াছে! সে কহিল, "মরণ ত কিছুতেই দেখা দেয় না, কতদিন জ্বলব, তাও জানি না। সব আমি তাই শেষ করে দিতে গেছলুম, কিন্তু ধরে বেঁধে আবার আমায় টেনে তোলেন, কেন? মাথা জোড়া দিয়ে কি করবেন? মনটা আমার ঠিক করে দিতে পারবেন না ত!"

তাহাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে দুই-চারিটা হিতকথা পাড়িলাম। কিন্তু উমেশ কহিল, ও সবে কোন ফল নাই! যে গাছের শিকড় কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে জল-সিঞ্চন আর কেন?

আমি তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। উমেশ কহিল, "এ সহরে আমার পানে কেউ ফিরে চায়নি, শুধু আপনি চেয়েছেন। আপনার প্রাণে একটু মায়া আছে দেখলুম, তাই আপনাকে সব কথা খুলে বলছি, শুনুন। শুনে বলুন, এত কাণ্ডের পর কেউ যদি মরতে চায় ত তাতে বাধা দিতে আছে কি না!" সে তখন আপনার জীবনের কাহিনী বলিতে সুরু করিল।

২

উমেশ বলিল, "সে আজ তিন বৎসরের কথা। রাণীগঞ্জের হাটে গিয়াছিলাম, গরু কিনিতে। আমার বাড়ী জিয়ালিতে। দামোদরের উপরেই জিয়ালি,—ক্ষুদ্র গ্রাম।

গরু কিনিয়া ফিরিবার পথে এক মুদির দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলাম। সেখানে এক লোকের মুখে শুনিলাম, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান ভাসিয়া গিয়াছে—এমন জল সে তল্লাটে বহুকাল কেহ চক্ষে দেখে নাই। লোকের ঘর-বাড়ী, গরু-বাছুর, সে জলের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

শুনিয়া বুক আমার কাঁপিয়া উঠিল। আমার জিয়ালি? লোকটা কহিল, জিয়ালির কোন চিহ্নই নাই! বহুক্রোশ ব্যাপিয়া সে এক সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে! কাটা ছাগলের মতই প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল! জিয়ালি গিয়াছে? তাহার অর্থ, —আমার সব গিয়াছে! ঘরে রুগ্না স্ত্রী, আদরের মেয়ে দুলালী, ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর,—সব—সব গিয়াছে! কিছুই আর নাই!

দোকানীর ঘরে গরু ফেলিয়া ছুটিয়া পথে বাহির হইলাম। উদরে কয়দিন অন্ন ছিল না, ক্ষুধায় নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছিল —তবুও সাত-আট ঘণ্টা পুরা দমে চলিয়া বর্দ্ধমানের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম! তাহার পরই মেঠো পথ জলের তলায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! যে ধারে চাই, কেবলই জল! বড় মাঠ বিলের আকার ধারণ করিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা বড় বড় গাছ স্তব্ধ প্রহরীর মত মাথা তুলিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছিল,—তাহার সে লাল আলো জলে যেন সিঁদুর গুলিয়া দিতেছিল।

আমার চোখের সম্মুখে সে লাল জল রক্তনদীর মতই টক্‌টক্ করিতেছিল। পথ নাই, পথ নাই—চারিদিকে কেবলই জল! উপায় কি! মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। সাঁতরাইয়া গৃহে ফিরিব ভাবিয়া জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ফাঁড়ির এক চৌকিদার আমায় চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল। আমি কাঁদিয়া মিনতি করিলাম, ছাড়িয়া দাও—আমার সব যায়!

সে কহিল, তাহার ছাড়িবার হুকুম নাই। পাছে কেহ জলে নামে, তাই রোধ করিবার জন্য সেখানে সে মোতায়েন আছে। আমায় ছাড়িয়া গাফিলির দণ্ড স্বরূপ দশটাকার চাকরিটি সে খোয়াইতে পারিবে না। সেই চাকরির উপরই তাহার জান-বাচ্ছার নির্ভর। বেশী জিদ ধরিলে সে আমায় থানার জিম্মা করিয়া দিবে, এমন ভয়ও দেখাইতে ছাড়িল না। আমি কেমন হতভম্বের মত বসিয়া পড়িলাম। চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী আঁধারে ভরিয়া গেল।

৩

উমেশ বলিতে লাগিল, "কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়াছিলাম, জানি না—মাথার উপর দিয়া আঁধার রাত্রি পোহাইয়া গেল—আবার সূর্য্য উঠিল। সূর্য্যের তাপ গায়ে লাগায় আমার হুঁস হইল। তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অন্য পথে চলিলাম। চৌকিদার বাধা দিল না।

তারপর কোনমতে কোনখানে হাঁটু ভোর জল ভাঙ্গিয়া, কোনখানে বা সাঁতরাইয়া গ্রামে ফিরিলাম। কিন্তু কোথায় ঘর! কোথায় গ্রাম! কোথায় স্ত্রী! কোথাই বা মেয়ে! দামোদর এক নিশ্বাসে সমস্তই গ্রাস করিয়াছে! মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আমি শুইয়া পড়িলাম! ঘুমে চোখ ছাইয়া গেল।

যখন চোখ মেলিলাম, তখন দেখি, এক কানাতের ঘরে আমি শুইয়া আছি। পাশে একটি বাবু বসিয়া আছেন। প্রথমটা কিছু খেয়াল হইল না। কিন্তু পাশ

ফিরিতেই একটা নিশ্বাস পড়িল। অমনিই মেঘের মত বিপদের কালো স্মৃতি মনের উপর ঘনাইয়া আসিল। চোখে জল ঘুরিল।

বাবুদের চেষ্টায় মেয়ে মিলিল—স্ত্রীকে পাওয়া গেল না। মেয়ে আসিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল, "বাবা, আমার মা?"

তেরো বছরের মেয়ে—তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! বুঝাইবই বা কি করিয়া—! তাহাকে বুকে চাপিতে চোখের জলে বুক ভরিয়া গেল। সাজানো ঘর, সাজানো সংসার দেখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম —ফিরিয়া দেখি, ভোজবাজির মতই সব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! জীবনে দুঃস্বপ্ন মানুষ অনেক দেখে,—কিন্তু এ সত্য যে সে স্বপ্নেরও অগোচর!

ভাবিলাম, স্ত্রী যে পথে গিয়াছে, দুলালীকে বুকে করিয়া সেই পথেরই পথিক হইব। সব যদি গেল ত এ গুঁড়াটুকুকে লইয়াই বা কোথায় রহিব! চোখের একটি পলক-পাতমাত্র—এ গুঁড়াটুকু উবিতে কতক্ষণ!

বাবুরা বুঝি মনটাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন! তাঁহারা কহিলেন, মেয়ের মুখ চাহিয়া আবার আমায় গা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে! গলা টিপিয়া ত ইহাকে মারিতে পারি না। মেয়ের পানে চাহিলাম, তাহার চোখের কোণে জলের দাগ তখনও মিলাইয়া যায় নাই! সেই ঝাপসা জল-ভরা দৃষ্টিতে কি যে মমতা মাখানো ছিল! মরা হইল না —তাহাকে হাতে করিয়া মারা—না, সে আরও অসম্ভব!

কিন্তু কি দিয়া বাঁচাইব? ঘর নাই, অন্ন নাই—ধূ-ধূ প্রান্তরে কি দিয়া আবার ঘর বাঁধিব? কি খাইয়া বাঁচিব! এ বয়সে নূতন করিয়া সংগ্রহেরও সামর্থ্য নাই! তাহার উপর ডাগর মেয়ে, এখনই বিবাহ দিতে হইবে! পাহাড়ের মত দুর্ভাবনার ভারী বোঝা মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আমি পাগল হইয়া উঠিলাম।

বাবুর দল কহিলেন, সহরে যাও। কলিকাতার পথে পয়সা ছড়ানো আছে। অতীতের সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া মেয়ের পানে চাহিয়া নূতন করিয়া আবার সব গড়িয়া তোল!

তাঁহাদের মুখের উপর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহারা গাঁটের পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; সঙ্গে খরচও কিছু গুঁজিয়া দিতে ভুলিলেন না। চোখের জল মুছিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া সহর কলিকাতায় আসিলাম।

৪

অসংখ্য গাড়ীঘোড়া, লোকজন—সকলেই ব্যস্ত, অধীর—এ এক সমারোহ ব্যাপার! এ ভিড়ের চাপে পড়িয়া পিষিয়া ধূলা হইয়া যাইতে হয়! যেদিকে লোক চলিয়াছে, সেই দিকে তাহাদেরই পিছনে চলিতে আরম্ভ করিলাম। গঙ্গার প্রকাণ্ড পুল পার হইলাম! ভিড়ের আর বিরাম নাই! কোলাহলও

অবিরাম! কোন্ পথে যাই? কোথায় গিয়া একটু আশ্রয় পাই?

হাঁটিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। দুলালী আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, আর যে চল্‌তে পারছি না! কোথাও একটু বসবে, চল!"

কোথায় বসি! বড় বড় বাড়ী—সব ছাদ গিয়া যেন আকাশে ঠেকিয়াছে—লোকের কোলাহলে চারিধার গম-গম করিতেছে! কোন বাড়ীর সম্মুখে ছোট একটু রোয়াক। সেখানেও বসিবার ঠাঁই নাই। রঙ-বেরঙের সামগ্রী লইয়া লোকেরা বেচা-কেনা করিতেছে। নিরুপায় হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িলাম—জনস্রোতের প্রবল ঘায় কোথায় ছিটকাইয়া সরিয়া গেলাম—দাঁড়াইবার সাধ্য কি! মেয়েটাকে ধরিয়া টানিয়া কোনমতে একটা খাবারের দোকানের সম্মুখে আসিলাম। দুলালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিছু খাবি, মা?"

উদ্‌গ্রীব নয়নে দুলালী আমার পানে চাহিল। দোকানে ঢুকিয়া তাহাকে কিছু খাবার কিনিয়া দিলাম। নিজে ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা জল খাইলাম। একটু সুস্থ হইলে দোকানীর সহিত আলাপ সুরু করিলাম।

বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছি শুনিয়া দোকানী মহা-উৎসাহেই আলাপে যোগ দিল। কেমন জল, কাহার কি রহিল-গেল,—তাহারই বিস্তৃত বিবরণ খুঁটিয়া খুটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে শ্রোতাও বিস্তর জুটিল। সকলেরই শুনিবার সে কি আগ্রহ! কি কৌতূহল! মনে মনে ভাবিলাম, আঃ, ভগবান খুব আশ্রয় মিলাইয়া দিয়াছেন! মেয়েটাকে লইয়া জুড়াইতে পাইলাম!

কিন্তু কিছু পরেই ভুল ভাঙ্গিল। শুনিবার সব কথা শেষ হইয়া গেলে দোকানী কহিল, "তাহলে এখন এসো, কর্ত্তা। আমার দোকানে লোকজন আসছে—ঠাঁই জুড়ে চোপর দিন বসে থাকলে ত আমার চলবে না। পাশ দাও।"

দুলালী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বড় শ্রান্তির পর বড় আরামের ঘুম! সে ঘুম ভাঙ্গাইতে মমতা হইল। কিন্তু দোকানী পর, সে শুনিবে কেন? তাহার অনুরোধের সুর ক্রমে চড়া হইয়া উঠিল—একটা ভংসনাও মিলিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া দুলালীকে উঠাইয়া আবার পথে বাহির হইলাম। ঘুমে সে ঢুলিয়া পড়িতেছিল—পা ভাল সরিতেছিল না—টানিয়া তাহাকে লইয়া ফুটপাথে এক গাছতলায় বসিয়া পড়িলাম। দুলালী আমার গায়ে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিল। কিন্তু বরাত মন্দ—শান্তি মিলিবে কেন? এক পাহারওয়ালা আসিয়া কহিল, রাস্তা বন্ধ করিয়া বসিলে চলিবে না! চোখ রাঙাইয়া সে উঠাইয়া দিল। আবার রাস্তায় দাঁড়াইলাম।

সেই রৌদ্রতপ্ত পথে কষ্টের আর সীমা ছিল না! বড় বাড়ী দেখিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি,—এমন দাতা কি কেহ নাই, যে শুধু একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই দেয়! বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে গেলে গালপাট্টাওয়ালা মোটা দরোয়ানের দল হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া তাড়া করে। দুই দিন দুই রাত্রি

ঘুরিয়া কত ঘুরিলাম, কোথাও আশ্রয় মিলিল না।

তৃতীয় দিনে এক গলির মধ্য দিয়া চলিয়া একটা বাড়ীর রোয়াকে আসিয়া বসিলাম। পথে দুই-চারি পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়াছিলাম, মেয়ের মুখে দিলাম—নিজেও কিছু খাইয়া লইলাম। রাস্তার কলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। তার পর একবার দেবতার নাম স্মরণ করিয়া এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলাম, "বাবু—"

সম্মুখেই ঘরে বসিয়া এক বাবু গড়গড়ার নল টানিতে ছিলেন। নিকটে বিছানার উপর বাঁয়া-তবলা প্রভৃতি বাদ্যের সরঞ্জাম পড়িয়া ছিল। তিনি চোখ তুলিয়া কহিলেন, "কি চাস?" একটা লোক ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাড়ীতে ব্যামো, ভিক্ষে মিলবে না—পথ দ্যাখ্।"

দুলালী জড়সড়ভাবে আমার বুকে মুখ লুকাইল। আমি কাতর স্বরে কহিলাম, "ভিক্ষে আমি চাই না, বাবা, চাকরি চাই।"

বাবুটি কট্‌মট্ করিয়া চাহিলেন—মেয়ের পানেও একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। বাবু বলিলেন, "তোর জামিন কেউ আছে?"

জামিন! কথাটা কানে নূতন ঠেকিল। অর্থ বুঝিলাম না। বাবুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। বাবু বলিলেন, "তুই চোর কি ছ্যাঁচোড়—তার পরিচয় কে দেবে?"

আমি কহিলাম, আমি চোর বা ছ্যাঁচোড় নহি। নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলাম। বাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "ও সব লোককে চাকরি দেওয়া যায় না, বাপু। তোমায় জানে-শোনে এমন লোক আনতে পার ত একটা মিলতে পারে—আমার জামাইয়ের বাড়ী লোকের দরকার ছিল বটে! তা তোমার আবার সঙ্গে দেখ্‌চি, একটা মেয়ে! বয়সটাও ত তার বড় সুবিধের নয়!"

কাঁদিয়া বাবুর পায়ে ধরিলাম—গৃহ-হীন আশ্রয় হীন, নিতান্ত অসহায় আমি! বাবুর কিন্তু সেই এক কথা, অজানা অচেনা লোককে চাকরী দিয়া তিনি দায়ে ঠেকিতে পারেন না। তাহার উপর ঘাড়ে এক ধাড়ি মেয়ে!

মুখ চুণ করিয়া আবার পথে বাহির হইলাম। বাড়ী-বাড়ী ঘুরিলাম—সব জায়গায় সেই একই কথা। অজানা অচেনা লোকের জন্য এ মুল্লুকে ঠাঁই নাই! তবে আমি যাই কোথা? খাই কি? এ কি ভীষণ শাস্তি, ভগবান!

ক্রমে গাঁটের পয়সা ফুরাইয়া আসিল। যেদিন শেষ পয়সাটি বাহির হইয়া আমায় একেবারে সম্বলহীন রিক্ত করিয়া দিল, সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার মধ্যে আগুন ছুটিল। দুলালী কাঁদিতেছিল। ক্ষুধায় তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। সারাদিন এক গলির মোড়ে বসিয়া রহিলাম—দুলালী আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আমি তাহার মুখে চোখে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইলাম। খাইবার যাহার কিছু জুটে না—নিদ্রা তাহার প্রতি বড় সদয়। নিমেষেই দুলালী ঘুমাইয়া পড়িল। আমি তাহার কপালের উপর হইতে কেশের গুচ্ছ সরাইতে সরাইতে কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি গরীব

চাষা—কিন্তু দেশে আমার দ্বার হইতে কোন ভিখারী-অতিথ্ অতৃপ্ত বুকে কোনদিন ফিরিয়া যায় নাই! সেই আমি,—আজ পথের কাঙালেরও অধম! শেষে স্থির করিলাম, ভিক্ষাই করিব! দেখি, সহরে ভিক্ষা মিলে কি না! সহরের উপর দারুণ অভিমান জন্মিয়াছিল। এই এত বড় বিরাট শরীর লইয়া সজ্জিত সহর পড়িয়া আছে—গলির মোড়ে সারাদিন বিষণ্ণ মুখে আমি বসিয়া—আমায় দেখিয়া লোকের দয়া না হোক—এই কচি মেয়ের শুষ্ক ম্লান মুখ দেখিয়াও কি কাহারও দয়া হয় না! সারাদিন আমারই সম্মুখ দিয়া এত লোক আসিল-গেল, কৈ কেহ ত একবার ফিরিয়া চাহিল না! জিজ্ঞাসাও করিল না—কেন আমরা এখানে বসিয়া আছি! কি চাই—কি আমাদের দুঃখ! আশ্চর্য্য! এ কি আমার সেই ছোট গ্রামে—সেই দরিদ্রের পুরীতে সম্ভব হইত! পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া গায়ে পড়িয়া সাহায্য করিত! আর এত বড় সহর—পাষাণ—পাষাণ সহর! লোকের এখানে প্রাণ নাই, মন নাই, ভিতরে পাষাণ পুরিয়া নিজেদের লইয়াই সব ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে!

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছিল! সম্মুখে এক বাবু চুরুট টানিতে টানিতে পথে চলিয়াছিলেন—গলায় তাঁহার ফুলের মালা, ফিট্‌ফাট্ পোষাক! গলির মোড়ে আর কোন লোক ছিল না। তাঁহারই কাছে ভিক্ষার জন্য প্রথম হাত পাতিব স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, "বাবু—"

বাবু ফিরিয়া চাহিলেন। আমার জিভ কেমন জড়াইয়া গেল—কি বলিব? কখনও ভিক্ষা চাহি নাই—ভিক্ষা চাহিতে বাধ-বাধ ঠেকিল। তবু কথা যখন আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহা শেষ করিতেই হইবে! কোনমতে বল সংগ্রহ করিলাম, কহিলাম, "আজ দুদিন কিছু খাইনি বাবা, এই মেয়েটি—এর মুখের দিকে চেয়েও না হয়—"

বাবু মেয়ের পানে চাহিলেন। রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ যেমন দৃষ্টিতে ফিরিয়া চায়, বাবুর দৃষ্টিও ঠিক তেমনি! আমি সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিলাম। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। আমার ইচ্ছা হইল, এখনই ইহার টুঁটি টিপিয়া চোখ দুইটাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিই!

বাবু বলিলেন, "তাই ত, মেয়েটি ত দেখছি দিব্যি! তা এক কাজ কর না—পয়সার দুঃখ থাকবে না! আমার সঙ্গে আয়, মেয়েকে নিয়ে। আমি থাকবার ঠাঁই দেখিয়ে দেব।"

কথাগুলা যেন বাজের মতই শুনাইল! কলিকাতার অনেক কীর্ত্তির কথা গ্রামে বসিয়া শুনিয়া ছিলাম। আমি বাবুর পানে কট্‌মট্ করিয়া চাহিলাম। বাবু কেমন ভড়কাইয়া সরিয়া গেল। আপদ চুকিল! আমিও নিশ্বাস ফেলিলাম।

আমার মাথায় তখন একটা মৎলব দেখা দিল। চমৎকার! ঠিক! দুলালীকে উঠাইলাম। পথে মৈ ঘাড়ে করিয়া একটা লোক আলো জ্বালিতে ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গার তীরে যাইবার পথ কোন্ দিকে! সে বলিল, বাঁয়ে ঘুরিয়া সোজা পশ্চিমে গেলে গঙ্গাতীরে পৌঁছিব। দুলালীকে কোনমতে টানিয়া গঙ্গার তীরে আসিলাম।

৫

স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে সব জ্বালা জুড়াইয়া গেল। চারিধারে আঁধার নামিতেছিল। মাঝ-গঙ্গায় দুই-চারিখানা নৌকা হইতে আলোর রশ্মি আসিয়া জলে পড়িয়াছিল। তীরের কাছে কতকগুলা বোট বাঁধা ছিল—সেখানে মাঝিরা রান্না-বান্নার আয়োজন করিতেছিল। দূরে এক বোটের উপর বসিয়া কে গান গাহিতেছিল—বড় করুণ সুর! আমার তপ্ত প্রাণ সে সুরে মাতিয়া উঠিল! চারিধার শান্ত, কি এক আবেশে ভরা! ঘাটে তখন দুই-চারিটা কুলি স্নান করিতেছিল। আমি ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির উপর বসিয়া রহিলাম।

এই শান্ত নীরবতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। ঘরে ঘরে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে—সকলে দিনের শেষে শান্তির কোলে মাথা গুঁজিয়া বিরাম পাইয়াছে। অতীতের কথা মনে পড়িল। সারাদিন ক্ষেত-খামার দেখাশুনার পর গৃহে ফিরিতাম—প্রদীপের আলোয় আলো-করা ছোট সুন্দর ঘরখানি,—স্ত্রীর আদরে, মেয়ের আব্দারে সে ঘর উজ্জ্বল! সে ঘরে ঢুকিয়া দিনের সব ক্লান্তি নিমেষে ভুলিয়া যাইতাম। সে কি সুখ—কি আরাম! কোন্ পাপে আমার সে ঘর—সে আশ্রয় কর্পূরের মত আজ উবিয়া গেল! গেল যদি ত এ মেয়েটা কেন আটকাইয়া রহিল? এ যে শিকলের মত আমায় আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। না, এ শিকল কাটিতেই হইবে—এ শিকল কাটিবই। না কাটিতে পারি ত, এই শিকল গলায় বাঁধিয়াই সব শেষ করিয়া দিব!

কুলিরা চলিয়া গিয়াছিল—রাত্রিও তখন গভীর। বোটের উপর জীবনের কোলাহলটুকুও নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছে। দুলালীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলাম। শান্ত সুরে মৃদু ঢেউ তটের কোলে আছড়াইয়া পড়িতেছিল—সে যেন মুমূর্ষুর কাতর বিলাপের মতই করুণ, বেদনাময়! সে সুর আমাকেই আহ্বান করিতেছিল। প্রাণ আমার নাচিয়া উঠিল। কোমর-ভোর জল ছাড়িয়া আরও একটু অগ্রসর হইলাম। দুলালী ডাকিল, "বাবা—"

আমি কহিলাম, "চুপ কর্। ডুব দে—সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।"

দুলালী ডুব দিল না—কাঁদিয়া আবার ডাকিল, "বাবা—"

আবার অমন করিয়া ডাকে! আমার রাগ ধরিল। তাহার ঘাড়টা টিপিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিলাম—বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। একটা পৈশাচিক বাসনা মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল—সে গর্জ্জন আমি যেন স্পষ্ট কানে শুনিতেছিলাম। আমার মাথায় খুন চাপিয়া ছিল।

দুলালীও প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছিল। তাহার মরিবার ইচ্ছা নাই,—সে মরিবে না! নিতান্তই অবুঝ হতভাগা মেয়ে! এত দুঃখেও তাহার বাঁচিবার সাধ হয়! শেষে তাহারই জয় হইল। বোধ হয়, বাপের স্নেহ-দুর্ব্বল হাত মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল

হইয়া পড়িয়াছিল! সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। আমি হারিলাম—তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। জল খাইয়া উঠিয়া কাশিয়া সে ডাকিল, "ও বাবা—আমি মরে যাব যে।"

আমি ভৎর্সনা করিয়া কহিলাম, "এত কষ্টেও তোর বাঁচবার সাধ হয়?"

"আমি মরতে পারব না, বাবা—" দুলালী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে কান্নায় আমার রাক্ষসের প্রাণ নিমেষের জন্য গলিয়া গেল—কিন্তু তখনই ভাবিলাম, না, এ মায়া ভাল নয়! দুলালীকে মরিতেই হইবে—মরা ছাড়া উপায় নাই! সারা পৃথিবীর উপর রাগ ধরিয়া ছিল! মাথায় উপর অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—আমি তীব্র দৃষ্টিতে সে নক্ষত্রগুলার পানে চাহিলাম—! মনে হইল, মেয়েকে মারিয়া, নিজে মরিয়া দুনিয়ার এই এত-বড় হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত শোধ গ্রহণ করি—ইহারা তাহার সাক্ষ্য থাকুক। অনেক চেষ্টা করিয়াও দুলালীকে ডুবাইতে পারিলাম না। প্রাণপণ শক্তিতে সে জীবনের জন্য সংগ্রাম করিতেছে! মনে হইল, তাহাকে তুলিয়া ঐ শানের সিঁড়িতে আছড়াইয়া ফেলি! দুলালীকে কোলে তুলিলাম। সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া "মাগো—"বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ও কি! এ কাহাকে ডাকে? আমার হাত-পা থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহাকে আছাড় দিতে হাত আর উঠিল না। দুলালী আবার ডাকিল, "ও বাবা, আমায় মেরে ফেলো না। আমি মরতে পারব না—"

সে কি অধীর আগ্রহে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আমাকে সে চাপিয়া ধরিল। আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। তাহার মুখে অজস্র চুমা দিয়া আমি কহিলাম, "না মা, মরতে হবে না। আয়, তবে দুজনেই বেঁচে থাকি—যে-টুকু কষ্ট বাকী আছে, নিঃশেষে আয়, ভোগ করি।"

দুলালীকে লইয়া ঘাটে উঠিলাম। মায়া হইল না! সে ক্ষণ কেন হারাইলাম! একটি ক্ষণ শুধু—না হারাইলে এ মনস্তাপ আজ সহিতে হইত না! ফেলে বাস ঘটিত না।"

উমেশ চুপ করিল। আমি কহিলাম, "চুপ কর, উমেশ—আর আমি শুনতে চাই না।"

উমেশ কহিল, "না বাবু, আর একটু শুনুন—দয়া করে শুনুন—প্রাণ আমার জলে যাচ্ছে!" আমি কহিলাম, "আচ্ছা, বল।"

৬

উমেশ বলিতে লাগিল, "সে রাত্রি ঘাটের চাতালেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিন উঠিয়া দেখি, দুলালীর চোখ দুইটা জবা-ফুলের মতই লাল হইয়া উঠিয়াছে—গা আগুনের মত গরম। তাহার প্রবল জ্বর।

সেদিন বুঝি কি একটা যোগ ছিল। ভোর হইতে না হইতেই ঘাটে খুব জন-সমাগম দেখা গেল। ঘোমটায় মুখ-ঢাকা কচি বৌ-ঝী হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কেহই আর ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিল না—সকলেই স্নান সারিয়া গল্প করিয়া হাসিয়া হাসাইয়া আসিল, চলিয়া গেল। দুই-চারিজন চালটা আলুটা বিতরণ

করিতেও কার্পণ্য করিল না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্পই। আমার ভাগ্যেও কিছু চাল তরকারী মিলিল। কিন্তু ইহা লইয়া কি করিব? কাঁচা চাউল মানুষ কত চিবাইবে? কাঁচা আনাজ-তরকারীও খাওয়া যায় না।

মাথায় একটা বুদ্ধি জোগাইল! বেলা তখন আবার পড়িয়া আসিয়াছে, এক বোটের মাঝির কাছে গিয়া চাউলগুলা তাহাকে ঢালিয়া দিলাম—বলিলাম, "ভাই, চালগুলো নাও, নিয়ে এই আলু ক'টা আমায় পুড়িয়ে দাও! আজ দুদিন আহার জোটে নি।"

মাঝি বাবু নহে, ভদ্র নহে—তাই সে অত জামিন-জানার সন্ধান করিল না—চিন্তোপদেশ দিল না—তাহার দয়া হইল। সে বলিল, "চালগুলো সিদ্ধ করে দেব কি? কিন্তু জেতে আমি মুসলমান—"

ক্ষুধার বেগে জাতি-বিচারের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু না, আমার দুলালী জ্বরের ঘোরে পড়িয়া আছে—দুই দিন অন্ন তাহার জুটে নাই। আর আমি ভাত গিলিব কোন্ মুখে! বলিলাম, "না, ভাত চাই না, শুধু আলু ক'টা পুড়িয়ে দাও।"

সেই পোড়া আলু আনিয়া দুলালীকে ডাকিলাম, "মা—"

দুলালী অতিকষ্টে চোখ মেলিল। আমি কহিলাম, "এই নে মা, খা,—

দুলালী আলু পোড়া খাইল—আমায় বলিল, "তুমি একটা খাও, বাবা—

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পোড়া আলু মুখে দিলাম। সে যেন অমৃত!

সন্ধ্যার দিকে দুলালীর জ্বর ছাড়িল সে কথাবার্ত্তা কহিল—আমার প্রাণ একটু শান্ত হইল। দুলালী বলিল, "বাবা, চল, বাড়ী যাই। এখানে এমন করে ঘুরে কি করে বাঁচবো, বাবা?"

সে কথা আমারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ী কোথায় যে, ফিরিব! জলে ধুইয়া বাড়ীর চিহ্ন অবধি যে লোপ পাইয়াছে! আর ফিরিব কি করিয়া? রেলের ভাড়া চাই—বিনা পয়সায় রেলে কেহ যাইতে দিবে না। সকল পথই যে আজ আমার বন্ধ! এই সহরের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। না পারি ত ঐ পাষাণের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরা ভিন্ন মুক্তিরও আজ আর কোন উপায় নাই!

আবার রাত্রি আসিল। মাথার উপর আকাশে একরাশ নক্ষত্র আসর জমাইয়া বসিল। তাহারা নীরব নেত্রে যেন আমাদেরই পানে চাহিয়া ছিল! মানুষ কত দুঃখ সহিতে পারে—সহিয়া বাঁচিয়া থাকে, বিদ্রূপ-ভরা চোখে বুঝি তাহারা তাহাই দেখিতেছিল।

তখন বোধ হয় মাঝরাত্রি—একটু ঘুম আসিয়াছিল—সহসা একটা দুপ্‌দাপ্ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া উঠিয়া দেখি, দুলালী আমার পার্শ্বে নাই! দাঁড়াইয়া গঙ্গার পানে চাহিলাম—স্থির জল, মৃদু তরঙ্গ-ভঙ্গে গান গাহিতেছে। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। ঘাটের উপর যে চাতাল ছিল, সেখানে আসিলাম—দেখি, ঘাটের উপর একখানা ঘোড়ার গাড়ী। তিন-চারিটা

লোক ব্যস্ত হইয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া কহিল, "যাও—" স্তব্ধ আকাশে বাজ্ যেমন হাঁকিয়া যায়—তেমনই শব্দ করিয়া গাড়ী ছুটিল! আমার আবার মনে হইল—যেন কে 'বাবা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়াই সে নীরব হইল। এ না আমার দুলালীর স্বর! দুলালীকে চোরে চুরি করিয়াছে? আমি পাগলের মত গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম! কিছু হইল না—দুর্ব্বল পা, কি তাহার শক্তি যে সে গাড়ীর সঙ্গে সমানে ছুটিবে! হাঁফাইয়া শেষে একটা মোড়ের উপর বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, আর কেন এ মায়া! শিকল যদি এমন করিয়াই ছিঁড়িল ত সে ছিঁড়ুক! আর সে শিকলের পিছনে ছুটিয়া কি ফল! যাক্—যে ছোট সম্বলটুকু অবশিষ্ট ছিল—সে ত বহুপূর্ব্বেই যাইবার কথা—উহাকে ত ফিরিয়া পাইবার কথা নয়! গেল যদি ত যাক্! আমার সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে! আঃ, এ কি মুক্তি—কি আরাম! এখন ঐ গঙ্গার কোলে পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিব। প্রাণে অত্যন্ত উল্লাস হইল—হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম! সে হাসির শব্দে চারিধার যেন দুলিয়া উঠিল। আমিও সে স্বরে কাঁপিয়া উঠিলাম! তারপর এক বার প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম করিয়া লইব ভাবিয়া সেই রাস্তার একধারে শুইয়া চোখ বুজিলাম।

৭

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন আমার সেই দেশের ঘরে পরম সুখে শুইয়া আছি, দুলালী আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে, "বাবা—" ধড়মড়িয়া উঠিলাম। একটা মানুষ সত্যই আমায় ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে,—"এই—"। চোখ মুছিয়া চাহিলাম, সে দুলালী নয়, লাল পাগড়ী মাথায় এক পাহারওয়ালা! সে আমায় ঠেলা দিয়া দাঁড় করাইল—হাতটা আঁটিয়া ধরিয়া গালি দিল, কহিল, আমি পাকা চোর—আমায় থানায় যাইতে হইবে!

কোন কথা বলিলাম না—তাহার ইঙ্গিতে চলিতে লাগিলাম। একটা বাড়ীর মধ্যে সে আমায় লইয়া আসিল। ছোট ঘর—টেবিল-চেয়ারে সাজানো! একধারে একটা বেঞ্চের উপর গাদা-করা বাঁধানো খাতা! টেবিলের উপর আলো জলিতেছে, আর তাহারই সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া একটা লোক ঘুমাইতেছে! পাহারওয়ালা আমায় দাঁড় করাইয়া তাহাকে ডাকিল, "বাবু—"

সে চোখ মেলিয়া চাহিল, পাহারওয়ালা সটান বলিয়া গেল, আমি পথে ঘুরিতেছিলাম। তাহাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করি। সুবা হওয়ায় দৌড়িয়া গিয়া সে আমায় ধরিয়া ফেলে! 'কাজ-কাম' আমার কিছুই নাই!

বাবু খিঁচাইয়া আমায় গালি দিল, আমাদের জ্বালায় একদণ্ডও তাঁহার চোখ বুজিবার অবসর মিলিবে না! প্রকাণ্ড খাতা টানিয়া কি-সব লিখিয়া আমায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ঘর-বাড়ী কোথায়! কাজ-কর্ম্ম কিছু করি কি না! আমি কহিলাম, কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় সহরে আসিয়াছিলাম—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, সবই খুলিয়া বলিলাম। বাবুটি পাহারওয়ালাকে কহিল, "ঘাটে নিয়ে যা একে। সব তদন্ত করে আয়।"

পাহারওয়ালা বিরক্ত চিত্তে আমায় লইয়া বাহিরে আসিল—কোথা হইতে দড়ি আনিয়া আমার কোমরে জড়াইল; এবং সেই দড়ির প্রান্ত ধরিয়া পশুর মত আমায় পথে খানিকটা ঘুরাইয়া আবার থানায় ফিরিল, ঘাটে গেল না।

তারপর আদালতে যথাসময়ে আমায় চালান দেওয়া হইল। সেখানে পাহারাওয়ালা উঠিয়া সাক্ষ্য দিল, যে, আমার কাজ-কর্ম্ম কিছুই নাই। অনেক রাত্রে পথে ঘুরিতেছিলাম—তাহাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলে সে আমায় ধরিয়া ফেলে! তাহার পর আমারই কথামত দুই-চারি জায়গায় ঘুরিয়া সে তত্ত্ব লয়—সকলেই বলে, আমায় কেহ চিনে না!

হাকিম জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে—তোর কাজ-কর্ম্ম কিছু আছে?" ভাবিয়াছিলাম, কথা কহিব না—কিন্তু কহিতে হইল। এতক্ষণ হাজতে বসিয়া চোর ডাকাতের মুখে শুনিতেছিলাম, আমার জেল হইবে! আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম—কি দোষ করিয়াছি যে, জেলে যাইব? খাইতে পাই না—ঘর নাই, আশ্রয় নাই, ভগবান নিষ্ঠুর বাজ ফেলিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছেন—তাই মেয়েকে লইয়া পয়সা-উপার্জ্জনের আশায় সহরে আসিয়াছিলাম—সে পয়সাও গতর খাটাইয়া উপার্জ্জন করিব! সহরে ডাকিয়াও ত কেহ একদিন জিজ্ঞাসা করে নাই, কোথা হইতে আসিলাম—কি চাই! চাকরির সন্ধানে যাইয়া কেবলই কটু কথা ও হিতোপদেশ শুনিয়া আসিয়াছি—অপরাধ আমি কি করিলাম যে, জেলে যাইব! হাকিমকে কহিলাম, "চাকরি নেই, হুজুর—তারই চেষ্টায় সহরে এসেছি! এসে কিছুই মেলে নি, একমুঠো অন্ন অবধি না! মেয়েটাকে শেষে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে!"

হাকিমের মুখের ভাবে বোধ হইল, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেন নাই! হারে অভাগা—ভগবান যাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহেন না, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার পানে চাহিয়া দেখিবে, এমন আশা এখনও তুই করিস্!

হাকিম কাগজে কি-সব লিখিয়া লইয়া আমায় কহিলেন, "একে জেরা কর্‌বি?"

জেরা! কি তাহার অর্থ? কি সে? আমি একবার চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিলাম। কাঠের পিঁজরার মধ্যে কি-এক দ্রষ্টব্য পশুর মত আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। এক-আদালত লোক আমার পানে চাহিয়া আছে। আমি মাথা নীচু করিলাম! হাকিম গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "জেরা কর্‌বি কিছু?"

আবার সেই উদ্ভট শব্দ! যে কথার অর্থও বুঝি না—তাহার কি করিব? আমি বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। হাকিম হুঙ্কার দিলেন, "একে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাস্?" আমি ঘাড় নাড়িলাম—না। এমন করিয়া মিথ্যা যে সাজাইয়া বলিতে পারে, তাহাকে আর কি জিজ্ঞাসা

করিব? তাহার দিকে চাহিতে ঘৃণা করে—আর তাহার সহিত কথা কহিব?

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে যেন গানের বাঁধা গতের মত এক নিশ্বাসে তিনি বলিয়া গেলেন, 'ছ মাসের জন্য পঞ্চাশ টাকা জামিন, না দিলে ছ'মাস জেল।'

ছোট ছেলেরা সাদা কাগজে যেমন কালির দাগ টানিয়া নিমেষেই শুভ্র কাগজ কালো করিয়া দেয়, হাকিমের কলমের একটি আঁচড় আমার ললাটে তেমনই করিয়া কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় আঁটা গাড়ীতে চড়িয়া অসংখ্য চোর-ডাকাত-খুনীর সঙ্গী হইয়া আমি প্রথম জেলে আসিলাম।

৮

জেলে বসিয়া মৃত্যুর কথা কেবলই মনে হইত! এক এক সময় ভাবিতাম মাথায় মুগুর মারিয়া, না হয় প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া সব শেষ করিয়া দি। কিন্তু একটা সাধ সে সময় মনের মধ্যে উঁকি দিয়া আমায় মরিতে দিত না। সে সাধ—একবার শোধ তুলিব। যাহার মিথ্যা কথায় রিক্ত সর্ব্বস্ব-হারা হইয়াও স্বাধীন আমি এই সব বদমায়েসের দলে পড়িয়া আমার সে শুভ্র জীবনে ছয়মাস ধরিয়া কেবল কলঙ্কের কালো কালি মাখাইয়াছি,—সেই পাষণ্ডের সেই মিথ্যার একবার চূড়ান্ত শাস্তি দিব! জেলের সঙ্গীরা আমায় টিট্‌কারি দিত, আমি বোকা—মিছা জেল খাটিতেছি। ইহাতে মজা নাই, কেবল সাজাই আছে। চুরি করিয়া, লোককে মারিয়া-ধরিয়া জেলে আসিলে তাকেই বলে জেল! নয় ত এ ত কেবল অদৃষ্টের ভোগ! তাহারা দিব্য স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বলিত, যাহার উদরের অন্ন নাই, জেল ত তাহার কাছে কাশীর অন্নসত্র! এ কথাটা নেহাৎ মন্দ শুনাইত না।

ছয়মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই—সেই পথের কথা প্রথমে মনে পড়িল। জোর করিয়া তুলালীকে ভুলিলাম—স্ত্রীকে ভুলিলাম—নিজের অতীত ভুলিলাম! সে সব কথা মনে পড়িলে মন দুর্ব্বল হয়—শক্তি উবিয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার পর সেই পাহারওয়ালাকে দেখিলাম—সেই মোটা শরীর—বিপুল গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন বিশ্রী মুখ! সে এক পানের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করিতেছিল। দেখিয়া আমার প্রাণে দৈত্য নাচিয়া উঠিল। বাঘের মত ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলাম! দাড়ি ধরিয়া সবলে টানিয়া তাহাকে ভূমে ফেলিলাম—তার পর অজস্র কিল চড় লাথিতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলাম। আমার জ্ঞান ছিল না—চোখের সম্মুখে মহাকালী লোল রসনা মেলিয়া নৃত্য করিতেছিল—করালিনী কালীকে সেদিন যেন আমি সত্যই প্রত্যক্ষ করিলাম। নৃমুণ্ড-মালিনীর ভীষণ নৃত্য; চকিতে সে দৃশ্য সরিয়া গেল—চোখের সম্মুখে রক্তের নদী বহিল!

বিস্তর লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল—পাহারওয়ালা তখন রক্তে স্নান করিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর আবার সেই আদালতে হাকিম, উকিল পেয়াদার ভিড়ের মধ্যে হাজির হইলাম। পাহারওয়ালাটা কোনমতে প্রাণে

রক্ষা পাইল—কিন্তু তাহার সে ভাঙ্গা নাক আর খাড়া হইল না। আমার দেড় বৎসর জেলের হুকুম হইল। স্থির হইয়াই সে শাস্তির আদেশ শুনিলাম। যখন ডক্ হইতে আমায় লইয়া গেল, তখন সে পাহারওয়ালা একদিকে দাঁড়াইয়াছিল—ভাঙ্গা নাক—কাটা কপাল—ফাটা মাথা—মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া আমি হাজতে আসিলাম। মনে আনন্দ হইল—জয়ের আনন্দ! সেবার বিনা দোষে জেলে ঢুকিয়াছিলাম—এবার মনে ক্ষোভ রহিল না—দোষ করিয়া জেলে চলিয়াছি।"

উমেশ স্থির হইল। সে ফুঁসিতেছিল। তাহার চোখ দুইটাও জ্বলিতেছিল। সে যেন আরও কি বলিবে মনে হইতেছিল—একটু যেন জিরাইয়া লইতেছে! এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ কহিল "বাবু—",

আমি কহিলাম, "বেলা হয়ে যাচ্ছে, উমেশ—এখনই ত আবার বেরুতে হবে—। কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে দুপুরবেলা এসে বাকি টুকু শুনব'খন।"

উমেশ কোন কথা কহিল না—আমার পানে চাহিয়া রহিল,—উদাস, করুণ দৃষ্টি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যার সীমা

সই আসিয়া ডাকিল—সই, ও সই, কি করিতেছ?

আমি উত্তর দিলাম—যাহা নয় তাহাই করিতেছি।

সই আসিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া বলিল—ও কি নেক্‌চ ভাই?

আমি বলিলাম লিখ্‌ছি আমার মাথা! যখন যাহা শুনি, যখন যাহা মনে পড়ে, তখন তাহা লিখিয়া রাখি।

সই বলিল—উহাতে কি হয় ভাই?

আমি। অন্যের কিছুই হয় না বটে, তবে আমার মনে শান্তি পাই।

সই। সে আবার কি?

আমি। অনেক সুখ পাই।

সই। আচ্ছা সই, আমাদের পাড়ার রায় গিন্নি বলে, তুমি নাকি খুব ইংরাজি, ফারসি ন্যাকা-পড়া জান। রায়-গিন্নি বলে, তুমি যা জান তাকোত্তে ন্যাকা-পড়া মেয়েমানুষকে পড়তে নাই।

আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি যে বিদ্যার জাহাজ তাহা রায়-গিন্নি কিসে প্রমাণ পাইল?

সই। তা কি জানি! হাঁ সই, তুমি এত ন্যাকা-পড়া কি করে শিখ্‌লে?

সইয়ের কথা শুনিয়া আমি লেখা বন্ধ রাখিয়া তাহার নিকট আমার বিদ্যার আদি-

অন্ত পরিচয় দিতে বসিলাম। আমার যে বড় দাদা ছিলেন, তিনিই আমাকে বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ পড়াইয়া ছিলেন; তাহার পর বড় দাদার কাল হইলে পাল-পাড়ার উমেশ ঘোষ নামে একজন গোয়ালা ছোট দাদাকে পড়াইতে আসিতেন, মা আমাকে তাঁহার নিকট পড়িবার কথা বলিয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট দ্বিতীয় ভাগ, নীতিকথা শেষ করিলাম।

তাহার পর মেয়ে-স্কুলে কিছুদিন আনা-গোনা করিলাম; তাহার পর পিতামাতা বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া এই কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন।

সই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

আহা, তাই বটে সই! মেয়েমানুষের শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার নিয়মটা কে করে ছিল?

আমি। যিনিই করুন তিনি নিশ্চয় পুরুষ, তাহার সন্দেহ নাই।

সই। ঠিক্ কথা! বেটাছেলেরা আপনাদের বাড়ীতে থাকিবে আর মেয়েরা চিরকাল উহাদের বাড়ী গিয়ে দাস্যবৃত্তি করিবে! তাতেও মন পায় না। সই, তুমি ত ন্যাকা-পড়া জান, তুমি ত আপনার স্বাধীন!

আমি। স্বাধীন আর কেমন করে?

সই। তুমি ত নেকৃতে জান, মন হলে বাপের বাড়ি পত্তর নেকৃতে পার আমরা যে তাও জানি না। কত খোসামোদ করেও কেউ একখানা পত্র নেকে দেয় না। সই, তুমি কি করে পত্র নেকৃতে শিখে ছিলে?

আমি। আমি যদি চেষ্টা করতাম তবে আরো ভাল শিখতে পারিতাম।

সই। চেষ্টা কর নাই কেন?

আমি। এখন তাই মনে হয়—তখন চেষ্টা করি নাই কেন? তখন মনে হইত এত চেষ্টা করিতেছি তথাপি লেখা ভাল হয় না কেন? কিন্তু সই, চেষ্টা যে কাহার নাম তাহা এখন জানিতেছি। দিনকতক লিখিয়া দেখিলাম, বাবার মত হস্তাক্ষর করিতে পারিলাম না। কলম ফেলিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, যত দিন বাবার মত লেখা হইবে, ততদিন আর কলম ধরিব না।

সই। তবে যে বলে, নেকে-নেকে সরে আর খেতে-খেতেই মানে!

আমি। কিন্তু আমার হস্তাক্ষরের সীমা ঐ পর্য্যন্ত!

সই। তবে যে লোকে বলে তোমার স্বামী তোমার কাছে ন্যাকা-পড়া শিখেছিল। তাই তিনি অত পণ্ডিত হয়েছেন।

আমি সবিস্ময়ে কহিলাম—সে কি! এ কথা তোমায় কে কহিল?

সই হাসিয়া বলিল—তুমি গোপন করিতেছ, কিন্তু তোমার বরই আমার কাছে বলিয়াছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তাহা পরিহাস মাত্র। সই, তখন যদি জানিতাম যে লেখাই আমার একমাত্র বন্ধু হইবে, লেখাই আমার একমাত্র শান্তির উপায় হইবে, তবে কি আমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতাম? এখন বড়ই অনুতাপ হয়, কিন্তু নিরুপায়, আজীবন অনুতাপ করিতেই রহিলাম।

সই আমার কথার এক বর্ণও বুঝিল না।

আগ্রহের সহিত বলিল—সই, তবে এই অক্ষরটা কি আমাকে খুলিয়া বল। তোমার কাছে ন্যাকা পড়া শিখিয়াছিল এ কথা কেন তোমার স্বামী আমার কাছে বলিয়াছিল।

আমি বলিতে লাগিলাম,—

একদিনের একটা ঘটনা বলি শোন, তাহাতেই বুঝিতে পারিবে আমি কত বড় বিদ্যাবতী।

আমি পুত্র দুইটিকে লইয়া শয়ন করিয়া ঘুম পাড়াইতাম, আমার স্বামী শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বেদান্তসার ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। আমি চুপ করিয়া সেই সংস্কৃত শ্লোকগুলি শুনিতাম। সই, তেমন কখনও শুনি নাই! আমি শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম; শ্লোক সুন্দর কি মুখ সুন্দর কি কণ্ঠ সুন্দর তাহা বুঝিতে পারিতাম না। একদিন তাঁহাকে কহিলাম—আমাকে সংস্কৃত শিখাও। তিনি বলিলেন—আচ্ছা। শুধু "আচ্ছা" শুনিয়া আমার সন্তোষ হইল না; তাঁহাকে বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিলাম; —পুস্তক কাড়িয়া লইতাম, প্রদীপ নিবাইয়া দিতাম! আমি একদিনে বিদ্যালঙ্কার হইবার জন্য বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিলাম। একদিন তিনি কহিলেন—ভূতে পাইলে ঝাড়া ফুঁয়ে ছাড়ে। কিন্তু পেত্নী পাইলে ঝাড়া ফুঁয়ে বা জলপড়াতে ছাড়ে না। বলিয়া তিনি একখানা সরল ব্যাকরণ হাতে করিয়া আমাকে বলিলেন—এই নাও, এই ব্যাকরণের গোড়াটা আজ মুখস্থ কর, কাল তোমাকে পড়া বুঝাইয়া দিব। আমি বলিলাম—এ কি বই! তোমার সেই বই কোথা? আমি তাহাই পড়িব।

স্বামী কহিলেন—বাঙ্গলা ব্যাকরণে জ্ঞান না জন্মিলে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। আগে এই বই পড়।

আমি ব্যাকরণ পড়িতে বসিলাম। তিনি আপনার পড়া দেখিতে লাগিলেন। ব্যাকরণ খুলিয়া আমার কান্না পাইল।

সই বাধা দিয়া কহিল—তাতে বুঝি হরিশ্চন্দ্রের পালা ন্যাকা ছিল? কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রামে যাত্রা হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পালা অভিনয় হইয়াছিল; সই সে স্থলে উপস্থিত ছিল। আমি বলিলাম —না সই, হরিশ্চন্দ্রের পালা কি ব্যাকরণে লেখা থাকে? তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহা বলিলে কি তুমি বুঝিতে পারিবে?

সই। পারি না পারি তুমি বলই না কেন?

আমি। পুস্তক খুলিয়া দেখি, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—অ, আ, ই, ঈ, ইত্যাদিকে স্বরবর্ণ কহে। সই, আমি অমনি পুস্তক বন্ধ করিয়া শিক্ষকের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলাম, ক্রমে ঘুম আসিল। স্বামী কহিলেন,—আমার মুখে কিছু লেখা আছে কি? আমি অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া সেই স্থানেই শয়ন করিয়া অঞ্চল লইয়া মুখে চাপা দিলাম। সেদিন আমার ব্যাকরণ-শিক্ষা এই পর্য্যন্তই হইল। সই, পর-রাত্রে আবার স্বামী বলিলেন—এস, আগে তোমার পড়া দেখি। আমি ব্যাকরণ লইয়া বসিলাম। আমার হাতে পুস্তক, তিনি পড়া বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর আমি হতভাগিনী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অযথা হুঁ দিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন—বুঝিতে পারিলে? আমি এক হুঁ দিলাম। তিনি কহিলেন,—কি

বুঝিলে, আমাকে বুঝাও। আমি অপ্রতিভ হইয়া রাগিয়া গেলাম। বলিলাম—যাও, বুঝাইব না!

স্বামী কহিলেন—বুঝিতে পার নাই। এস তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি—অর পর আ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়।

আমি সক্রোধে কহিলাম—হয় হউক তাহাতে আমার কি! আমি কেন তাহা লইয়া মাথা কুটিয়া রাত জাগিয়া মরিব!

স্বামী কহিলেন,—আমারই বুঝিবার ভুল! সাড়ে নয়টার সময় ঘুমাইতে না পাইলে যত ক্ষতি অর পর আ থাকিলে কি তত ক্ষতি হয়?

আমি বলিলাম—যাও, ওসব বলিলে আমি পড়িব না,—আর কখনও তোমার কাছে পড়িবনা। বলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলাম।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম; আর আমার আরাধ্যদেব হাসিয়া বলিলেন—পায়ে পড়ি, পিঠে দাঁত ছেড়ে দে, কাল সাতটা সরিষা মাথায় দিয়া গঙ্গাস্নান করিব। কাল তোমাকে লইয়া আমি পড়িতে বসিব, নচেৎ আমার স্কন্ধস্থিত প্রেতিনী ছাড়াইবার উপায় নাই! তোমাকে লইয়া না বসিলে এ বৎসর পরীক্ষা দিতে পারিব না।

—সই, আমার বিদ্যার সীমা এই পর্য্যন্ত। সই। ছিঃ সই, তুমি ও ছেলেমানুষ নও ভাই, দুপুরবেলা কাঁদিতে নাই, চুপ কর, ছেলেদের অকল্যাণ হইবে।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

লুপ্তকাব্য-পরিচয়

প্রবাদ আছে যে বেদমন্ত্রগুলি এক সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং পরে ঋষি সারস্বত ঐ নষ্টবেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। যে যুগকে বৈদিক যুগ বলি, সে যুগেও যে লোকসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য লৌকিক-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বেদ এবং ব্রাহ্মণ নামক সাহিত্যের কোন কোন উল্লেখ হইতে ধরিতে পারা যায়। লৌকিক-কবিতার কবিদিগকে যে কারু বলিত, এ কথা বেদমন্ত্রেই উল্লিখিত আছে। প্রলয়-পয়োধি হইতে যে সময়ে আর্ষ-মন্ত্র টানিয়া তোলা হইয়াছিল, তখন কোন মহাপুরুষ কারু কৃত সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করেন নাই। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে যে সকল লৌকিক কাব্যের নাম পাওয়া যায়, তাহাদেরও কোন সন্ধান নাই। অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি অর্ব্বাচীনযুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব যে, যে সকল কাব্য এক-সময়ে প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাও ধ্বংস হইয়াছে। কাল যাহা ধ্বংস করিয়াছে তাহা যে সম্পূর্ণ ধ্বংসের যোগ্যই ছিল, এ কথা বলিতে পারি না। এই প্রবন্ধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, যে প্রলয়-পয়োধি আমাদের অনেক অমূল্যরত্ন গ্রাস করিয়াছে।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা হইতে এক সময়ে বঙ্গভাষা নামে যে মাসিক

পত্রিকা প্রকাশিত হইত, তাহাতে ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে "কয়েকখানি লুপ্তকাব্য" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং উহাতে উল্লেখ করিয়াছিলাম—"নাটক লিখিয়া "ভাস" নামক কবি খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু এই কবির নামাঙ্কিত কোন নাটক প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে কবি ভাসের কয়েকখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে। গুণাঢ্য বা আঢ্যরাজ-কৃত বৃহৎ-কথা, ক্ষেমেন্দ্রীর অনুবাদে কতদূর পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে, তাহা জানা অসম্ভব। দৈবাৎ যদি সেই পৈশাচী-প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি পাওয়া যায়, তবে ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থখানি আন্ধ্র-ভাষায় লিখিত ছিল, এবং হইতে পারে যে, ভাসের কাব্যের মত, মাদ্রাজপ্রদেশের কোন পুস্তকালয়ে এখনও উহা রক্ষিত আছে।

ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যকাব্য যখন বাণভট্ট কর্ত্তৃক প্রশংসিত, তখন নিশ্চয়ই ঐ গ্রন্থের লোপে একখানি সুপাঠ্য সাহিত্যগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন পণ্ডিতও আছেন যাঁহারা ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়-কাব্য-প্রণেতা হরিচন্দ্রকে এই হরিচন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয় পদ্য মহাকাব্য,—গদ্য-বন্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ এই কাব্য বাণভট্টের বহুকাল পরে, ৮৫৯ শকাব্দে অর্থাৎ ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, বিলাসপুর জেলায় রতনপুরের রাজসভায় লিখিত। (২১ সর্গের ১৮৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

কবি সাতবাহনের সম্বন্ধে বাণভট্ট এইরূপ লিখিয়াছেন:—

অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ
বিশুদ্ধি জাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ।

বাণভট্টের রচনা শ্লেষপ্রায়, তাহা সকলেই জানেন। বিশুদ্ধ জাতির রত্নে কোষ সংগ্রহ, এই অর্থ ব্যতীত "জাতি" কথার অন্য অর্থ আছে। জাতি, প্রাকৃত-রচনায় একটি বৃত্তের নাম; ঐ বৃত্ত অক্ষর সংখ্যা দ্বারা অথবা মাত্রানিবদ্ধ হইয়া রচিত হইত। ভট্টি কাব্যে এবং কাব্যাদর্শে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ইহাতে ঐ গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। হাল কবির গাথা-সপ্তশতীকে সাতবাহনের এই গ্রন্থ বলিয়া নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। হাল কবির এই গ্রন্থ যে বিভিন্ন কবির রচনা, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে, এবং এই কাব্য যে কদাচ বাণভট্টের উল্লিখিত কাব্য নহে, তাহা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি।

প্রথমতঃ, যে প্রাকৃত ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত, তাহা সপ্তম-শতাব্দীরও পরবর্ত্তী সময়ের প্রাকৃত। তাহার পর হাল কবিকে সাল, শালিবাহন এবং সাতবাহন করা বড় দুঃসাহসের কথা। দ্বিতীয়তঃ, অভিনন্দ-প্রণীত রামচরিতে এই হাল-প্রণীত গ্রন্থের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ কাব্য সাতবাহন-প্রণীত বলিয়া লিখিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বাণভট্টের বর্ণনা দেখিয়া ঐ কাব্যের নাম কদাচ গাথা সপ্ত-শতী বলিয়া মনে করা যায় না। উহার নাম সম্ভবতঃ সুভাষিত কোষ, অথবা সুভাষিত রত্নকোষ, এইরূপ কিছু ছিল। চতুর্থতঃ, এই গাথা-সপ্তশতী জাতিবৃত্তে রচিত নহে;

ইহাতে জাতিবৃত্ত আছে, কিন্তু অল্প। প্রাচীন সময়ে যে প্রাকৃত রচনা জাতিবৃত্তেই অধিক হইত তাহা কাব্যাদর্শে দেখিতে পাই; এবং বাণভট্টের উক্তি হইতেও জানিতে পারি যে, সাত-বাহনের গ্রন্থ জাতিবৃত্তে রচিত হইয়াছিল।

মহাকবি কালিদাস যে সুপ্রসিদ্ধ গুপ্ত-সম্রাটদের রাজত্বকালে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন তাহা মৎপ্রণীত "কালিদাস"-গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছি। সুখের বিষয় যে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আমার গ্রন্থের যুক্তিগুলি সুবিবেচিত মনে করিয়াছেন এবং কালিদাসের অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কবি কালিদাসের পূর্ব্বে, মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়, যে সুকবির জন্ম হইয়াছিল, প্রাচীন খোদিত-লিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়কার খোদিত-লিপিতে কবি হরিসেনের নাম এবং রচনা পাওয়া যায়। এই কবি হরিসেন সমুদ্রগুপ্তের একখানি প্রস্তর লিপিতে শ্রগ্ধরা, শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দে পদ্য রচনা করিয়াছেন, এবং অতি সুস্পষ্ট ওজস্বী ভাষায় গদ্য রচনা করিয়াছেন। এই লিপিতে স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত সুকবি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। নূতন নূতন ছন্দ, এবং নূতন ধরণের কাব্য-রচনা-কৌশল লইয়া যখন এই সময়ে পণ্ডিতদিগের সহিত তর্কবিতর্ক হইত তখন মনে হয় যে, ঐগুলি সম্ভবতঃ সমুদ্র-গুপ্তের সময়ে প্রায় নূতনভাবে আরব্ধ। এই দেখুন, এই লিপির একস্থানে আছে:—

যস্য প্রজ্ঞানুসঙ্গোচিতসুখ মনসাঃ শাস্ত্রতত্ত্বার্থভর্ত্তৃঃ
.....স্তব্ধো.....নি.....নোচ্ছ্.....
সৎকাব্য শ্রীবিরোধান্ বুধ গুণিতগুণাজ্জহতানেব কৃয়
বিদ্বল্লোকে বি...স্ফুটবহু কবিতা কীর্ত্তিরাজ্যাং ভুনক্তি।

সমুদ্রগুপ্তের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া যে মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা যেন এলাবাবাদ-স্তম্ভলিপির কয়েকটি অর্দ্ধস্ফুট শব্দ হইতে সূচিত হয়। "কাব্যাং...ধ্যানপাত্রং স্তোত ব্যানেকাভূতোদারচরিতস্য" প্রভৃতি কথা আমার অনুমানের অনুকূল হইতে পারে, যে এটা বড় দুর্ব্বল ভিত্তি, কিন্তু অসম্ভব নহে বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম।

কবি কালিদাসের সময়ের পরে ৪৭২ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে, কবি বৎস-ভট্টির যে রচনা পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই "রচিতা বৎসভট্টিনা" প্রস্তর-লিপির কবিতার কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

যঃ প্রত্যহং প্রতিবিভাত্যুদয়াচলেন্দ্র
বিস্তীর্ণ তুঙ্গ শিখরস্খলিতাংশু জালঃ
ক্ষীবাঙ্গনা জন কপোলতলাভিতাম্রঃ
পায়াৎ স বঃ সুকিরণাভরণো বিবস্বান্।

মদমত্তা রমণীর কপোলের বর্ণের সহিত সূর্য্যকিরণের তুলনাটা নূতন বটে। নদী-তটস্থ নগরের শোভা-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে:—

তটোত্থ বৃক্ষচ্যুতনৈক পুষ্প
বিচিত্র তীরান্ত জলানি ভান্তি।
প্রফুল্লপদ্মাভরণানি যত্র
সরাংসি কারণ্ডব সংকুলানি॥

বিলোল বীচী চলিতারবিন্দ
পতদ্রজঃ পিঞ্জরিতৈশ্চ হংসৈঃ
সকেশরোদারভরাবভুগ্নৈঃ
ক্বচিৎ সরাংস্যম্বুরুহৈশ্চভান্তি॥

সপুষ্প ভারাবনতৈর্নগেন্দ্রৈ
র্মদপ্রগল্‌ভালি কুলশ্বনৈশ্চ
অজস্র গাভিশ্চ পুরাঙ্গনাভি
র্বনানি যস্মিন্ সমলং কৃতানি॥

এই প্রস্তরলিপির কবি বৎসভট্টি, যে বলভী নগরে প্রথম শ্রীধর সেন রাজার সভায় ভট্টি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের রয়াল এসিয়াটিক সোসাই-টির পত্রে লিখিয়াছিলাম। ইউরোপীয় পণ্ডিত দিগের মধ্যে কয়েকজন আমার ঐ অনুমান গ্রহণ-যোগ্য মনে করিয়াছেন। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, যে শেষোদ্ধৃত পদ্যগুলির সহিত ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের পদ্যগুলির রচনা-সাদৃশ্য আছে। যে সকল যুক্তির বলে উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি করিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা এখন যে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থখানি পাই, উহা গুপ্তকালের সাহিত্য। এই গ্রন্থ যখন প্রথম রচিত হয়, তখন ইহার তন্ত্র বা ভাগ, পাঁচটির স্থলে দ্বাদশটি ছিল; নামও পঞ্চতন্ত্র ছিল না। সম্ভবতঃ ইহার নাম ছিল, "করটকদমনকৌ" কারণ সিরীয়া এবং আরবে ইহার ঐ নামের অনুবাদ পাওয়া যায়। পুস্তকখানি যখন ৫৩০ খৃষ্টাব্দে পারস্য-ভাষায় ভাষান্তরিত হয়, তখনও ১২টি ভাগ ছিল। নূতন সংক্ষিপ্ত পঞ্চতন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্রূপের অংশ অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং উহাতে পরবর্ত্তী সময়ের অনেক শ্লোকও সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সকল লুপ্তকাব্যেরই উদ্ধার-সাধন হইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। সেদিনকার অলঙ্কার-দর্পণ গ্রন্থে যে সকল নাটক এবং অন্যান্য কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলিই যখন পাওয়া যায় না, তখন বেশি আশা করা চলে না। প্রাচীন খোদিত লিপিতে অনেক স্থানে যে উত্তম রচনা পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটির নিদর্শন দিয়াছি। কেহ যদি খোদিত-লিপি-সংগ্রহের গ্রন্থগুলি হইতে পর্য্যায়ক্রমে সুরচিত কবিতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেক সুখপাঠ্য রচনা সাধারণের নিকট সুলভ হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সাহিত্যিক ইস্তাহার

[সাহিত্যিক সুহৃদ্বর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পূজার বাজারে আমরা এই ইস্তাহার প্রথম বাহির করিলাম। সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের ইস্তাহার ইহাতে লওয়া হইবে না। এই ইস্তাহার প্রচারের জন্য আমরা অনেকগুলি শিক্ষিত সন্দেশবাহী পারাবত নিযুক্ত করিয়াছি। সেইজন্য এই ইস্তাহারে খোপের উল্লেখ পাইবেন। কোন্ ইস্তাহার কোন্ খোপে পড়িবে আমরা ঠিক করিয়া দিব। আমাদের বিশ্বাস, এই ইস্তাহারের মারফৎ আমরা সাহিত্যিকবর্গের এবং সাহিত্যব্যবসায়ীদের উন্নতির চৌরাস্তা খুলিয়া দিতে পারিব। বিজ্ঞাপন না হইলে আজকাল কিছুই চলে না। আমাদের সাহিত্যিকেরা যে এত পঙ্গু তাহার কারণ এইরূপ বিজ্ঞাপনের অভাব নয় কি? পর পৃষ্ঠা দেখুন।]

আশ্চর্য্য ছিপ

এ মাছ ধরিবার ছিপ নয়; লেখক গাঁথিবার ছিপ। এই ছিপ ফেলিয়া ইচ্ছামত লেখক ধরিতে পারিবেন। তবে কোন্ লেখক কোন্ টোপ গিলিবেন তাহা আমাদের নিকট জানিয়া লওয়া দরকার। বহুবিধ টোপ আমরা মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে নূতন টোপ তৈয়ারি করিয়া দিতে পারি। খোপ নং ৪৯

সমালোচকের জন্য

সম্প্রতি কোনো কোনো সমালোচক ভারি মুস্কিলে পড়িয়াছেন। তাঁহারা গীতি-কবিতা, ছোট গল্প, প্রভৃতির ভাব ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না; তাঁহারা এ সকল জিনিস ঝাপসা দেখিতেছেন—অথচ চোখে ছানি পড়ে নাই। তাঁহাদের দাওয়াই আমাদের কাছে আছে। আমাদের কাছে আসিলে আমরা আচ্ছা-করিয়া-সমঝাইয়া দিব। খোপ নং ৪২

সম্পাদক প্রয়োজন

একটি নূতন মাসিক-পত্রের উদ্গম হইবে। একজন প্রগাঢ় ঘুমন্ত সম্পাদকের প্রয়োজন। প্রতিমাসে ছাপাখানার এবং রাত্রের খানার বিল শোধ করিবার সামর্থ্য যাঁহার নাই, তিনি যেন আবেদন না করেন। ঘুমন্ত সম্পাদকের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হইবে না;—সেজন্য আমরা দায়ী থাকিব। খোপ নং ৭

গ্রন্থকর্ত্তার কারখানা

আর পরের খোসামোদ করিতে হইবে না!
এতদিনে দেশের দারুণ দুর্ভাবনা দূর হইল!
আমরা গ্রন্থকর্ত্তা প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিয়াছি।

আমাদের এই কারখানা হইতে নানা প্যাটার্ণের চমৎকার চমৎকার গ্রন্থকার বাহির হইতেছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। খোপ নং ১৪

সভাপতি হইবার কাকুতি

আমি সাহিত্যসংক্রান্ত (রাজনৈতিক নহে) সভার সভাপতি হইতে চাই। আমার যোগ্যতা ও গুণপনা এই:—আমার জমিদারীর বার্ষিক কম নহে এবং আমি রাজসম্মানেও ভূষিত। আমাকে সভাপতি করিলে সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা। খোপ নং ২১

মহামন্ত্র প্রচার

অনেকদিন ধরিয়া এক জটাজূটধারী হিমালয়বাসী মহাত্মার মনস্তুষ্টি করিয়া এই মহামন্ত্র লাভ করিয়াছি। আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি একদিন বলিলেন—"যাও বৎস! তোমাকে এই অমূল্য মহামন্ত্র দিলাম—জগতের হিতার্থ ইহার প্রচার কর।" পবিত্র হিমালয় ছাড়িয়া এই পাপ-পঙ্কিল সংসারে আসিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করিব? গুরুর আদেশ! সন্ন্যাসীপ্রদত্ত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহামন্ত্রের গুণ এই যে ইহার মাহাত্ম্যে মাসিক-পত্রের সম্পাদক হইতে আরম্ভ করিয়া ছাপক পর্য্যন্ত যাহাকে খুসী বশ করা যায়। এই মন্ত্র পড়িয়া কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প যাহা পাঠাইবেন কিছুতেই ছাপা থাকিবে না—নিশ্চয় ছাপা হইবে। মন্ত্রবলে খলস্বভাব সর্প বশ হয় দেখিয়াছেন তো? তবে সন্দেহের কারণ কি? খোপ নং ২৮

সাহিত্যের উন্নতি

ইহা সকলেই জানেন আজকালকার অর্ব্বাচীন সাহিত্য আমাদের সনাতন আদর্শ নাশ করিতে বসিয়াছে। আমাদের এত সাধের গরল-হীন সরল সমাজ, ঘুটঘুটে-অন্ধকার অন্তঃপুর, কুণ্ডলীময় পরিপক্ক পাকশালা, বিলাতী বৈ-বিবর্জ্জিত বৈষয়িক বৈঠকখানা—এ সমস্তেরই উচ্চ আদর্শ অসার সাহিত্যের দৌরাত্ম্যে হীন হইয়া পড়িতেছে। ইহার একটা উপায় করা চাই ভাবিয়া আমরা যোগাসনে বসিয়াছিলাম। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর একটা প্রকৃষ্ট উপায় বাহির হইয়াছে। বাজারে গোরুর ছবির মধ্যে আমাদের সমস্ত দেবদেবীর অধিষ্ঠান দেখিয়াছেন তো! এই গোরুকে দিয়া যদি সাহিত্য রচনা করানো যায়, তাহা হইলে কিছুতেই আমাদের উচ্চ আদর্শের মর্য্যাদা নষ্ট হইতে পারে না এবং তাহাতে সাহিত্যের উন্নতি হইতেই হইবে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য অনেক। বিস্তারিত করিয়া সকল কথা লিখিতে গেলে খরচ বাড়িয়া যায়। অতএব সাহিত্যের উন্নতিপ্রয়াসীগণ! আমাদের অফিসে আসিয়া পরামর্শ করুন। খোপ নং ৩৫

গন্ধমাদন

ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই! আমরা তাই বিপুল আয়োজনে ঠিক সেই আকারের নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতেছি। প্রতিমাসে ওজন করিয়া লইবেন—এক মণ ওজনের বিরাট পত্রিকা! পাতায় পাতায় ছবি থাকিবে। লেখকদের ছবি তো ইহাতে থাকিবেই! তাহার উপর যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাঁহাদের কলম ধরিবার প্রধান সহায় সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছবি, যাহাতে লেখেন সেই দোয়াতের ছবি, কলমের ছবি থাকিবে। আরও শুনুন! বিজ্ঞাপন-দাতাদের ছবি, তাঁহাদের ফার্ম্মের ছবি—যে প্রিণ্টার কাগজ ছাপিবে তাহার ছবি—

যে সকল কম্পোজিটর প্রাণপাত-পরিশ্রমে কাপি দেখিয়া ভুল টাইপ সাজাইবে তাহাদের ছবি, যে কুলী ললাটের ঘর্ম্ম চরণে ফেলিয়া কাগজ বহিয়া আনিবে, তাহার ছবি, যে দপ্তরী বই বাঁধিবে তাহার ছবি,—এমন কি ডিকিন্সন কোম্পানির দরোয়ানদের ছবি পর্য্যন্ত আমরা প্রতি মাসে ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি।

তাহার পর প্রবন্ধ! যিনি যাহা লিখিবেন, গন্ধমাদন সাদরে তাহাই বক্ষে ধরিবে।

প্রথম সংখ্যার জন্য জাঁকালো আয়োজন হইতেছে। অনেক অর্থব্যয়ে আমরা "আলকাৎরার স্বরূপ" নামে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে ৫২ খানি ছবি থাকিবে। পটুয়াদের আঁকা ছবির ন্যায় এ ছবির ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই—ছবি দেখিয়াই সকলে বুঝিয়া ফেলিবেন, আদি ও অকৃত্রিম আলকাৎরা। এই ছবির গায়ে তুলি বুলাইয়া আপনারা বাড়ীর কড়ি-কাঠের কাঠিন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া বিখ্যাত লক্কড় ও ভুইফোঁড় কবিদের কবিতা, সবজান্তা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের স্নিগ্ধ-শীতল পান্তা প্রবন্ধ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ফক্কড় হামবড়া গল্পলেখকদের দমে-ভারী ও দম-হারী গল্প ও উপন্যাসে গন্ধমাদন আচ্ছাদিত থাকিবে!

মূল্য নগদে দিতে পারেন, ধারও রাখিতে পারেন অর্থাৎ যাঁহার যেমন সুবিধা। যিনি তাহাও না পারিবেন, তিনি পত্র লিখিয়া স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করুন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য চিঠি লিখুন—বেয়ারিং পত্রও সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি কার্য্যাধ্যক্ষ গন্ধমাদন। খোপ নং ৬৬

ব্রহ্মচারী ফিল্‌টার বা বিশুদ্ধ বক-যন্ত্র

ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প জগতে অভাবনীয় আবিষ্কার! উচ্চ শিক্ষিত সাধারণের উন্নতি-কল্পে বিরচিত এই ফিল্‌টার-যন্ত্রটি ব্যবহার করুন। পরিশুদ্ধ সাহিত্যের বিশুদ্ধানন্দ উপভোগ করিয়া নির্ব্বিকার জীবন যাপন করিতে থাকুন। ইহার গুণ এই যে ইহা সাহিত্যের চিত্ত-উদ্‌ভ্রান্তকারী অসার রসকষ মারিয়া একেবারে খাঁটি পবিত্র মালটুকু বাহির করিয়া দেয়। প্রাপ্তিস্থান ঃ—নয় নম্বর, রসিক কর্ম্মকার্‌স্ লেন এবং মুচীপাড়া নবীনমিস্ত্রীর জুতার দোকান ও বঙ্গদেশের তাবৎ ধর্ম্ম-শালা এবং পাঠ-শালার সংলগ্ন আমাদের এজেন্সি।

"প্রশংসাপত্র"

বক্ষ, চুম্বন, রসনা, মেখলা, যুগল-মিলন, কুহু-কেকা ইত্যাদি ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক দুষ্ট সাহিত্যের পক্ষে আপনাদের ব্রহ্মচারী ফিল্‌টার ও বিশুদ্ধ বক-যন্ত্র সম্মার্জ্জনীর কাজ করিতেছে। আর কিছুদিন ইহা রীতিমত চলিলে বঙ্গ-সাহিত্য সম্পূর্ণ দোষ-বর্জ্জিত টেক্‌সট্ বুকের আকার ধারণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি। ইতি—সম্পাদক "সম্মার্জ্জনী।"

কলিকাতা, ২২ স্থকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



অশোক

(প্রাচীন চিত্র হইতে)
অধ্যাপক সমাদ্দারের অনুমতানুসারে

BEYNE

ভারতী

৩৯শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২২ | [৭ম সংখ্যা

আদ্যিকালের ছবি

যুগের [illegible] মানুষ যে এই পৃথিবীতে বাস করছে [illegible]র অকাট্য নিদর্শন ও প্রমাণসকল [illegible] আবিষ্কার করে ভূতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে [illegible]ত হয়েছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে [illegible] মানবজাতি গুহাবাসী ছিল এবং তাদের [illegible] অস্ত্রশস্ত্র ও নানা ব্যবহার্য্য সামগ্রী পাষাণ [illegible] লয়েই তারা রচনা করতো এবং শৃঙ্গ, দন্ত ও অল্পসল্প কাঠের কাজও তাদের জানা ছিল। এই পাষাণের যুগে ভারতবর্ষেও মানুষ ছিল এবং তাদের নানা নিদর্শন দক্ষিণ ভারত ও নর্ম্মদার তীরে পাওয়া যায়। যে সকল গুহায় আদি-মনুষ্যেরা বাস করে গেছেন তাদের অনেকগুলি থেকে [illegible]—চকমকি পাথরের তৈরী তীরের ফলা, ছুরির ফাট ইত্যাদি পাওয়া গেছে; আর সেই সঙ্গে তাঁদের হাতে লেখা নানা ছবিও ঐ সকল গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমি যে ছবিগুলির কথা বলছি সে সকল গুলিই ইউরোপের গুহাবাসীদের লেখা এবং বলাই বাহুল্য যে অনেক তর্কবিতর্কের পরে এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতেই একমত হয়েছেন। আমাদের দেশে ঐ যুগের চিত্রের নমুনা সম্প্রতি মধ্যভারতে রায়গড় নামক স্থানে রেলকোম্পানির এক সাহেব আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপীয় ঐ শ্রেণীর চিত্রগুলির সঙ্গে তাদের এমন সৌসাদৃশ্য আছে যে মনে হয় যেন একই লোকের লেখা। এই ভারতীয় গুহাবাসীদের ছবিগুলি আমি দেখবার অধিকার মাত্র পেয়েছি কিন্তু এখনও প্রকাশের হুকুম পাইনি। ইউরোপীয় গুহাসকলের চিত্রাবলীর নমুনা Spearing সাহেব তাঁর The Childhood of Art নামক পুস্তকে প্রকাশ করেছেন; তারই নমুনা হ'তে আমরা বুঝি যে সেই আদিকালের মানুষের চিত্রকলার দক্ষতা বড় কম ছিল না।

এ হচ্ছে সেই সময়ের কথা মানুষ যখন তরুশাখা ছেড়ে পর্ব্বতগুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছে,—বিশ্বরাজ্যের অনেকটাই যখন তার কাছে অপরিচিত এবং অনির্দ্দিষ্ট।

ভীষণ নিবিড় রহস্যের মধ্যে মানুষকে যখন অসহায় শিশুর মত তার অশেষ আশঙ্কা নিয়ে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নিজের সত্তারক্ষার জন্যে চারিদিকে কেবলি ধস্তা-ধস্তি করে চলতে হচ্ছে সে সময়ে ছবি-লেখার শক্তি তার ভিতরে জেগেছে এবং সে ছবি-লিখতে বসেছে এটা হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না;—যদিও বা বিশ্বাস করি তবে সে ছবি যে ঘুণাক্ষরের মত বা ছোট ছেলের ক খ লেখার মত নিতান্ত বাঁকা-চোরা ও অস্পষ্ট ছিল এটা বলতে আমরা কিছুমাত্র ইতস্তত করি না। কিন্তু যেটা অদ্ভুত, যেটা অঘটন, সেটাও দেখছি মানুষের ইতিহাসে ঘটে গেছে! আদিযুগের তাদের হাতে-লেখা শত শত ছবি পাষাণের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখা অতি অপূর্ব্ব একখানি ইতিহাসের মত দিনের পর দিন আমাদের চোখের সম্মুখে খুলে যাচ্ছে! এবং আমরা দেখছি চিত্রবিদ্যার সঙ্গে প্রথম এবং প্রকৃষ্ট পরিচয়ের এই ইতিহাস তারাই দিচ্ছে যাদের বিজ্ঞান ছিলনা, সাহিত্য ছিলনা;—যারা কেবল বিরাট এ বিশ্বরচনার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল—ঠিক একটি শিশু যেমন করে চেয়ে থাকে অপরিচিতের মুখে।

কালে কালে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় যত বেড়েছে ততই মানুষ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে শিল্পরচনা প্রকাশ পাচ্ছে তার আড়ালে যে রচয়িতা রয়েছেন তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে এবং নিজেদের শিল্পকে সাহিত্যকে সঙ্গীতকে যেন তাঁরই মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছে, কিন্তু আদিম যুগের মানুষ বিশ্ব-রচয়িতার পরিচয় দূরে থাক্ বিশ্বের মধ্যে যেগুলি তাদের খুব নিকটে ছিল তারও পরিচয় যখন ভালো করে নিতে পারেনি তখন এই ছবি-লেখার নানা কৌশলের সঙ্গে তাদের অনিষ্ঠ পরিচয় দেখে আমরা আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারিনা। চিত্রের যে ষড়ঙ্গ যেমন রূপ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ —সেই ছয়টারই সঙ্গে যে আদিম মানুষ কেমন সহজভাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এটা তাদের লেখা ছবিগুলি না দেখলে বোঝা কঠিন। রেখা রং এবং আলো-ছায়ার খেলা দিয়ে রূপের ভোলটা হুবহু ফুটিয়ে তোলা, যেটি দেখছি সেটি, যা লিখছি বা যাকে লিখছি তার সমান হওয়া এবং ছবিটিতে ভাব ও লাবণ্য জুড়ে দেওয়া —এই হচ্ছে চিত্রবিদ্যার সমস্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুহাবাসী আদিমমনুষ্যের লেখা ছবিতে আমরা এর একটারও অভাব দেখতে পাইনে। তাদের লেখা মহিষ বরাহ, হরিণ শুধু এক একটা রূপের ছাপ নয়, তারা এক একটি ছবি—যার ভিতরে শিল্পীর মনকে আমরা যেন ধরতে পাই। সন্ধ্যার একটা রক্তরাগ আকাশ থেকে পৃথিবী পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, তারি মাঝে প্রকাণ্ড একটা নেকড়ে-বাঘের খানিকটা মুখ দেখা যাচ্ছে! এটা যদি ছবি না হয় তো ছবি আর কাকে বলি। দুইটি হরিণ আসছে, এক-ধারে নদী বয়ে চলেছে জলে অনেক মাছ খেলা করছে, একটি হরিণ ঘাড় ফিরিয়ে যেন তার শাবক গুলিকে ডেকে নিচ্ছে; ছবির একধারে

হরিণের দুটি চোখের আকারটি শিল্পী টুকে রেখেছে। একটা বরাহ লাফ্ দিয়েছে; একটি ঘোড়া দৌড়ে চলেছে; এক-পাল মহিষ, অনেকগুলো ঘোড়া ছুটেছে —একত্রে ঘেঁষাঘেঁসি।

এমনি সব ছোটখাটো দৃশ্য; কিন্তু সেগুলি লেখা হয়েছে একেবারে পাকা চিত্রকরের মত। বাল্মীকির মুখের প্রথম শ্লোকের মত আদিমনুষ্যের এই হাতের লেখা, তার মধ্যে কোথাও অসম্পূর্ণতা নেই!

কিসের জন্য তারা ছবি লিখ্‌ছে? কার জন্য তারা মুখের ভাষার অভাব সুনিপুণ রেখা ও বর্ণপাতের দ্বারা সম্পূর্ণ করে তুলছে? ধরতে গেলে যে ভীষণ জন্তুগুলোর সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম কোরে তাদের বেঁচে থাকতে হয়েছিল তাদের মৃত্যুবাণ গুলোই উচিত ছিল তাদের নিপুণভাবে আঁকা। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ঘটনাটাই ঘটেছে দেখছি। জীবজন্তুর ছবিগুলো লিখেছে তারা পাকা-হাতে, তার অস্ত্রগুলো গড়েছে অত্যন্ত কাঁচারকম! এক টুকরো পাথর কোনোরকমে ঘসে তারা বানিয়েছে তীরের ফলা, নয়তো হাতুড়ির মাথা। একটা পাহাড়ের গুহাকে কোনোরকমে পরিষ্কার করে নিয়ে বাস করেছে তারা তারি ভিতর অথচ চিত্রে সামান্য খুঁত্‌টাও তাদের হয় নি!

অশ্রান্তভাবে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করবার জন্যই যার প্রস্তুত হবার কথা, সেটা না হয়ে ওঠে কেন সে চিত্রলেখায় রেখা ও বর্ণের ছন্দ-বাঁধায় পরিপক্ক? এ এক মহা রহস্য!

আবার ধরতে গেলে যে পদার্থগুলো স্থির ও লেখা সহজ—যেমন গাছ পাতা ফল ফুল ইত্যাদি, সেইগুলোরই চিত্র করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু তা না করে তারা দেখছি লিখে চলেছে সেই গুলো যারা জীবন্ত—ছুটে বেড়াচ্ছে, খেলে বেড়াচ্ছে, গতিবিশিষ্ট এবং অস্থির! এরই বা অর্থ কি?

তবেই দেখছি মানুষ তদানিন্তন অবস্থায় বলের দ্বারা বিপদ-আপদ ঠেকিয়ে রেখে যে-কোনো-প্রকারে আপনাকে এবং সন্তান-গণকে রক্ষা করে চলাই একমাত্র কর্ম্ম বলে স্বীকার করেনি। শুধু যে তারা গৃহ-স্থালি করছে বা লড়াই করছে তা নয়, তারা দেখছি ছবি লিখে এক একটা ঘটনা, এক একটা ভাব বর্ণনা করছে! তারা যে শুধু বিশ্বরাজ্যে অবোলা জীবের মত একমাত্র আত্মরক্ষা ও সন্তানপালন নিয়ে ব্যস্ত, তা নয়। চোখ তাদের নানা পদার্থের পরিচয় নিচ্ছে, মন তাদের নানা রসের আস্বাদ পাচ্ছে, এবং তাদের নিপুণ অঙ্গুলি তখন থেকেই রেখার মধ্য দিয়ে রূপের মধ্য দিয়ে রঙের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলছে আপনাদের মনোভাবের নানা ছবি! তাদের ছবিগুলো দেখলে বোঝা যায় যে তারা দিনের অনেকখানি ধরে প্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র গতিভঙ্গী এবং আলো-ছায়ার খেলা চলেছে তা নিরীক্ষণ করছে, উপভোগ করছে, সেগুলিকে নিরূপণ করছে ও সেটা চিত্রের দ্বারায় বর্ণন করে আনন্দ পাচ্ছে!

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই ছবিগুলো লেখার অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ

যে কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য এগুলি রচনা করেছিল সেই কথাটাই বলেছেন। ছায়ার সঙ্গে কায়ার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দেখে আদিম মনুষ্যেরা সেই ছায়াকে পাকড়াও করে নানা জীবজন্তুর কায়াটির উপরে দখল জমাতে পারবে এই বিশ্বাসই যে এক সকল চিত্রের রচনার কারণ—এই কথাটি পণ্ডিতেরা বলেন। কিন্তু এটা তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ তখন এত অক্ষম ছিলনা যে ছায়াবাজীর মন্ত্র দিয়ে গোরু-বাঁধবার জন্য তারা চেষ্টা পাবে বা কুশপুত্র পুড়িয়ে কারু জীবন-সংহারে উদ্যত হবে। তারা যাকে বাঁধতে চাইতো তাকে জোর করেই বেঁধে আন্‌তো; মারতো তারা পাষাণের আঘাতে নিজের হাতে। ঘরে বসে মন্ত্র পড়বার তাদের সময় ছিল না।

নিজের খাদ্য-সংগ্রহের জন্য হরিণের পিছনে দিনের পর দিন তারা মাঠে মাঠে ঘুরছে; বরাহ তাদের তেড়ে আস্‌ছে, বন্য মহিষ তাদের দিকে রক্তচক্ষু হয়ে দৃষ্টিপাত করছে নয়তো পাষাণ মুদ্গরের আঘাতে সে ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে!—এরি ছবি তারা লিখেছে। গ্রামবৃদ্ধ ধুনো জ্বালিয়ে বশীকরণ মন্ত্র আওড়াচ্ছে—এ ছবি প্রকৃতির তখনকার কৃতী সন্তান লিখে যায়নি। সেই সমস্ত পদার্থ যারা চোলতো না, বলতো না, তাদের কোনো চিত্র তারা দিয়ে যায়নি; যারা তাদের সঙ্গে লড়াই দিতে আস্‌তো, তাদের কাছ থেকে পালাতে চাইতো, তাদেরই মত অক্লান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতো, নির্ভীক নির্ব্বাক অথচ প্রাণের উচ্ছ্বাসে একেবারে পরিপূর্ণ কেবল তাদেরই দিকে সেই আদিমমনুষ্যের প্রাণ টেনেছে এবং তাদেরই ছবি তারা লিখেছে—অতি যত্নে মহা আনন্দে, রক্তের রাঙা আভা দিয়ে ভীষণতার প্রগাঢ় ছায়া দিয়ে। আকাশ বাতাস, রাত্রির অন্ধকার, বনের নিবিড়তা, ফুলপাতার বিচিত্রতা, মেঘের খেলা, এমন কি নানা কীট পতঙ্গ ও পক্ষীগুলির দিকে তারা লক্ষ্যই করেনি। যদিও এগুলো তাদের মনকে খুবই বিচলিত করতো সন্দেহ নাই কিন্তু এগুলোর সঙ্গে তারা যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না; এবং তাদের চিত্রগুলি থেকে এইটিই প্রমাণ হচ্ছে যে এগুলোকে তারা একটু ভয়ের চোখে দেখ্‌ছে। মনে হয় যেন তারা এ সকল থেকে দূরেই থাকতে চেয়েছে। অন্ধকার আকাশে প্রকাণ্ড নক্ষত্রশালখানার মত চন্দ্রের উদয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে বনের নিবিড়তা, হাওয়ার মধ্য দিয়ে পাখীর সৃষ্টিছাড়া আশ্চর্য্যগতি—এ সবই তাদের মনকে ভয়েই হোক্ বা বিস্ময়েই হোক্ বিমুখ করে দেওয়া বই আকর্ষণ করতো না—নিশ্চয়। পাহাড়ের মধ্যে একটা নিত্যতা তারা অনুভব করেই তবে তাকে আশ্রয় করেছিল; চতুষ্পদ জীবগুলির সঙ্গে পৃথিবীর উপরে বিচরণ করা নিয়ে একটা যে আত্মীয়তার ভাব তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল; তাই যেন পাখীদের অপেক্ষা এই সকল জীবজন্তুর খুব কাছে যেতে, তাদের যেন খুব কাছাকাছি পেতে, আদিমমানুষের প্রাণ চাইতো; এবং সেই প্রাণের টানে এই সকল চিত্রের সৃষ্টির কারণ।

শাস্ত্রের মারণ-মন্ত্রের কাজ করবার জন্যে এ ছবিগুলোর অবতারণা নয়;—প্রাচীন মানবের অবিশ্রান্ত জীবন-সংগ্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে যে ছুটি আসতো এগুলো সেই ছুটির খেলা;—এক-একটি দিনের অবকাশের এক-একটু আনন্দের ইতিহাস।

মা যেমন মরাছেলের খেলেনাগুলি গোপনে রক্ষা করেন তেমনি ধরিত্রী যেন তাঁর প্রথম-সন্তানের খেলার সামগ্রী—এগুলিকে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যুগযুগান্তর ধরে এতদিন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেচারা

বিষ্ণু রায়বাবুদের বাড়ীতে মোসাহেবী করিত।

এই চাকরিটি সে যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জোগাড় করিয়াছিল তাহা নহে—বিনা চেষ্টায়, বিনা আয়াসে, একরকম আপনা-হইতেই এ কর্ম্মটি তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। কবে হইতে তার এ কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহা সে নিজেই ঠিক জানে না;—বহুকাল পরে সে যখন একজন পাকা-মোসাহেব হইয়া উঠিল তখনই সে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিল।

যে রায়বাবুদের সে এখন মোসাহেবী করিতেছে ছেলেবেলায় তাদেরই সঙ্গে একত্রে সে স্কুলে পড়িত। রায়বাবুরা বড়-লোকের ছেলে;—তারা যে স্কুলে পড়িতে আসে এ ব্যাপারটাকে হেডমাষ্টার হইতে দরোয়ান পর্য্যন্ত এমনি করিয়া দেখিত যেন সেটা একটা তাদের মস্ত অনুগ্রহ!

রায়বাবুদের কাছে সমস্ত স্কুলটির এমনি ভাবে অবনত হইয়া থাকিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। দশখানা গ্রামের মধ্যে এই একটিমাত্র স্কুল। ঐ সবে-ধন-নীলমণিকে শত্রুমুখে-ছাই-দিয়া জিয়াইয়া রাখিবার অন্য উপায় ছিল না, রায়কর্ত্তাদেরই মুখ-তাকাইতে হইত। নানা অনটন ও নানা অঘটনের মধ্যে পড়িয়া এই স্কুল-তরীটি যখন একবার মাঝ-দরিয়ায় ডুবু-ডুবু হইয়াছিল তখন রায়-কর্ত্তারাই ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তার পর থেকে বিপদ আপদে উঁহারাই একমাত্র ভরসা।

তা ছাড়া রায়বাবুরা যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইল তখন হেডমাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলের অর্দ্ধেকের উপর মাষ্টারের প্রাইভেট টুইসনি জুটিয়া গেল। এবং যাদের জোটে নাই তারাও আশায় আশায় রহিল। কেহ রায়বাবুদের ইংরাজি পড়াইত, কেহ গণিত, কেহ বাংলা কেহ আর-কিছু, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল প্রাইভেট-টুউটরদের মাহিনা ছাড়া, পূজা-পার্ব্বণ ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন-ইত্যাদি-আকারে অনেক উপরি-পাওনাও ছিল। এবং নীচের তলাকার চাকর-নফররাও যে রায়-বাবুদের করুণা হইতে বঞ্চিত হইত তাহা নহে। কাজেই স্কুলটির সমস্ত নাড়ী যে কেন্দ্র হইতে

রস সঞ্চয় করিত সেই কেন্দ্রটির পায়ে মাথা না ঠেকাইলে ধর্ম্মে সহিবে কেন?

এই স্কুলটিতে ছেলে খুব বেশী পড়িত না, এবং যারা পড়িত তারা সকলেই পাড়ার গরীবের ছেলে;—কেহই পূরা মাহিনা দিতে পারিত না। কাজেই তারা স্কুলের মধ্যে নগণ্য হইয়া ছিল। কেবল রায়বাড়ীর ছেলেরাই নিজেদের চারিদিকে ধনগৌরবের স্ফূলিঙ্গ ছড়াইয়া স্কুলের মহিমা বর্দ্ধন করিত এবং নগণ্য ছাত্রদের সসঙ্কোচ দৃষ্টির আগে আগে থাকিয়া তাহাদিগকে আরো সঙ্কুচিত করিয়া তুলিত।

বিষ্ণুও ঐ নগণ্য ছাত্রদের একজন। কাজেই সহপাঠী হইলে কি হয় ছেলেবেলা হইতে রায়বাবুদের উপর একটা সমীহ রাখা তার প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া, তার বাপ-পিতামহ যে ঐ রায়বাবুদের অন্নে একরকম মানুষ বলিলেই চলে।

নগণ্য ছাত্রদের মধ্যে কেহই সাহস করিয়া রায়বাবুদের সহিত সমান হইয়া মিশিতে পারিত না—রায়বাবুরাও গরীবের ছেলের সঙ্গে মিশিয়া নিজেদের পদমর্য্যাদা নষ্ট করিবার কুশিক্ষা লাভ করে নাই। কাজেই সম্বন্ধ যতই নিকট হোক, সহপাঠীদের সহিত রায়বাবুদের ব্যবহার অত্যন্ত বিকট রকমেরই ছিল।

হঠাৎ একটা ছেলে একদিন কলিকাতা হইতে আসিয়া এই স্কুলে ভর্ত্তি হইল—একেবারে পূরা মাহিনা দিয়া। রায়বাবুরা ছাড়া স্কুলে কেহই পূরা মাহিনা দিত না; কাজেই এই ঘটনাটা স্কুলের সকলকে একেবারে অবাক করিয়া দিল। ছেলেটির নাম সতীশ। তার বাপ কলিকাতার একজন বড় উকীল। সে কলিকাতায় লেখাপড়ায় মন দিত না—বদ্-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সেই জন্য তার বাপ তাকে এই গ্রামে তার কাকার কাছে পাঠাইয়াছেন। তার কাকা এখানকার মুন্সেফ।

সতীশ স্কুলে প্রবেশ করিতেই পাড়াগেঁয়ে ভূতগুলোর প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা দেখাইতে লাগিল—রায়বাবুদেরও বাদ দিল না।

সতীশ ডবল ব্রেষ্ট সার্ট গায়ে দিত—চিনাবাড়ির চকচকে পম্পসু পায়ে পরিত এবং তার চোখে একজোড়া সোনার চশমা ছিল। রায়বাবুরা বড়লোক হইলে কিহয় সাজসজ্জার পারিপাট্য তাদের মোটেই ছিল না—পোষাক একেবারে সাদাসিধা।

এইখানেই সতীশ রায়বাবুদের একটা প্রচণ্ড ঘা দিল। এতদিন তারা সব-বিষয়ে সকলের চেয়ে বড় হইয়াছিল—কোথা হইতে একটা ছেলে আসিয়া তাদের সমস্ত মান-সম্ভ্রম যেন রসাতলে তলাইয়া দিল। সতীশ যখন-তখন সার্টের আস্তিন হইতে সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিত,—এসেন্সের গন্ধে চারিদিক ভরভর করিতে থাকিত। ছেলেরা তন্ময় হইয়া তাহা উপভোগ করিত, রায়বাবুদের মন কিন্তু আপশোষে জ্বলিতে থাকিত।

রায়বাবুরা জমীদার, সহজে দমিবার ছেলে নয়;—কেহ যে তাহাদের উপর টেক্কা দিয়া যাইবে তাহা হইবে না! তাহারা তখন

আলাপী-আতরের তুলো কানে গুঁজিয়া স্কুলে আসিতে আরম্ভ করিল।

সতীশ সেই দেখিয়া একদিন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং লেড-পেন্সিলের চোলো মুখটা দিয়া তুলোর কুণ্ডলীর উপর একটা খোঁচা দিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিল, বলিল—"What is that?" আতর-মাখানো তুলো কান হইতে খসিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

সতীশ তখন পেন্সিলের মুখটা নাকের কাছে একবার ধরিয়া নাকটা বিকৃত করিয়া বলিল—"What an obnoxious thing!" বলিয়া সে পেন্সিলের শিসটা পট্ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। রায়বাবুদের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সতীশ তাদের দিকে না চাহিয়া পম্পসু করিয়া ডবল-ব্রেষ্ট জামার আস্তিন হইতে চওড়া-পাড় রেশমী রুমাল বাহির করিয়া পেন্সিলের মুখটা একবার মুছিয়া লইল তার পর আপন-মনে শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল।

রায়বাবুদের এক পোষা মুচি ছিল। সেই বাবুদের জুতো বানাইত। পূজার সময় তারই হাতের জুতো পায়ে দিয়া যখন রায়-বাড়ীর ছেলেরা বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইত তখন গ্রামের ছেলেরা লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই জুতোর দিকে চাহিয়া থাকিত—অনেক ছেলের প্রতিমা দেখার কথা মনেই থাকিত না। কিন্তু রায়বাবুরা যেদিন সতীশের পায়ে পম্পসু দেখিল সেই দিন তাদের জুতোর গুমোর ভাঙিয়া গেল।

রায়বাবুদের মুচি কখনো পম্পসু তৈরি করে নাই—চক্ষে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। বাবুদের ছেলেরা যখন তাকে পম্পসুর ফরমাস দিল তখন জুতোর নাম শুনিয়াই তার মহা ভাবনা হইল। কিন্তু মুচির পো বড় চালাক ছেলে সে সহজে নিজের বিদ্যা ধরা পড়িতে দিল না। সে বলিল—"তার আর কি! এ কথা তো বল্লেই হ'ত—কোন্‌কালে বানিয়ে দিতুম। আমার পিসেমশায়ের খুড়ো কলকাতার সাহেব-বাড়ির মুচি ছিল—তার কাছেই আমার কাজকর্ম্ম শেখা—আপনাদের আশী-র্ব্বাদে কোন্ কাজ শিখতে আমার বাকি? এমন জুতো বানিয়ে দেব যে চক্ষুস্থির হয়ে যাবে!"

মুচির পো মুখে সাওখুড়ি করিয়া গেল বটে কিন্তু কাজের বেলায় মনে মনে বিপদ গণিল। কি করিতে হইবে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কিছুদিন পালাইয়া পালাইয়া বেড়াইতে লাগিল। রায়বাবুরা খোঁজ করিয়া তাহাকে পাইত না। শেষে দ্বারবান দিয়া যেদিন তাকে ধরিয়া আনা হইল সে বলিল—"এ ত আর যে-সে কাজ নয়—এ পান্‌সি জুতো! এর অনেক সরঞ্জাম চাই, সে সব তো যোগাড় করতে হবে। তাড়া দিলে চলবে কেন?"

মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল, তাগাদার পর তাগাদা চলিতে লাগিল, তবু পম্পসু তৈরি হইয়া আসিল না।

মুচির পো ভাবিয়াছিল—এমনি করিলে বাবুরা শেষে হাল ছাড়িয়া দিবে কিন্তু সে দেখিল বেগতিক—বাবুরা কিছুতেই হাল ছাড়িতে চায় না, বরঞ্চ শক্ত করিয়া ধরে। তখন সে একদিন বাবুদের বাড়ী গিয়া

বলিল—"সরঞ্জাম সব তৈরি এখন বলুন কেমন পান্‌সি তৈরি করতে হবে। পান্‌সি তো আর এক রকমের নয়—হরেক রকমের।"

ছেলেরা পম্পসু সম্বন্ধে মুচির পোর মতোই অভিজ্ঞ, কাজেই এ কথায় পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। মুচির পো মনে মনে হাসিতে লাগিল—এমনটা হইবে সে গোড়া হইতেই জানিত, তাই সে সাহস করিয়া বুক ফুলাইয়া বাবুদের বাড়ী আসিতে পারিয়াছিল।

বড়বাবু বলিলেন—"কেমনতর জুতো হবে আমি দেখিয়ে দেব—তুই আমার সঙ্গে স্কুলে আসিস।"

পরদিন স্কুলে গিয়া মুচির পো সতীশের পায়ের পান্‌সি দেখিয়া আসিল।

যথাসময়ে এক অদ্ভুত চেহারার পম্পসু তৈরি হইয়া আসিল। রায়বাড়ীর ছেলেরা মহা ফূর্ত্তির সহিত নূতন জুতা পায়ে দিয়া মসমস্ শব্দে স্কুলময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সতীশ সেই শব্দ শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘাড় বেঁকাইয়া একবার জুতার দিকে চাহিল, তার পর চীৎকার করিয়া উঠিল—"Silence please!"

রায়বাড়ীর ছেলেরা থতমত খাইয়া গেল। সতীশ বলিল—"জুতার শব্দ করা ভয়ানক অসভ্যতা—জানেন কি? শিখুন!"

বাবুদের মুখ হেঁট হইয়া গেল। ছেলেদের সামনে এই অপমানে তাদের যেন মাথা কাটা গেল।

ব্যাপার ঐখানেই শেষ হইল না। সতীশ ঐ নূতন পম্পসুর গঠন সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিল তাতে সে জুতো আর পায়ে দেওয়া চলে না—জলে ভাসাইতে হয়।

এমনি করিয়া সতীশ যখন-তখন যেখানে-সেখানে রায়বাবুদের ঠোক্কর মারিতে লাগিল। স্কুলের অন্য ছেলেরা তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইত। রায়বাবুদের মুখের উপর কথা বলিবার সাধ্য যে এ জগতে কারো আছে এ কথা তারা কল্পনাও করিতে পারিত না। এ যে দেখি তাও ছাড়াইয়া গেল—এ যে একেবারে অপমান!

সতীশের অপমানে রায়বাবুরা যে ইচ্ছা করিয়া চুপ করিয়া থাকিত তাহা নহে, চুপ না করিয়া উপায় ছিল না। সতীশ এমন সব ব্যাপার লইয়া ঠোক্কর দিত যাহা সতীশের বলিবার ধরণে রায়বাবুদেরও মনে হইত—হাঁ অদ্ভুত বটে! সতীশ সহরে ছেলে—সভ্যতা সম্বন্ধে তার শিক্ষা, রুচি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা গাঁয়ে-গেঁয়ে ছেলের চেয়ে ঢের বেশী—এ কথা রায়বাবুরা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, কাজেই সেখানে তারা দুর্ব্বল ছিল। সেই জন্যই সতীশের সমস্ত অপমান তাদের নীরবে সহ্য করিতে হইত।

সতীশের আর-এক বিষয়ে প্রতিপত্তি ছিল। এর আগে সে কলিকাতার এক সাহেবী স্কুলে পড়িয়াছিল। সেইজন্য সে ফড়ফড় করিয়া ইংরাজি বলিতে পারিত এবং ইংরাজি উচ্চারণটা তার ভালোও ছিল। ক্লাসের মধ্যে মাষ্টারের ভুল উচ্চারণ লইয়া সে ছেলেদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতে সঙ্কোচ করিত না এবং তাহাদিগকে

ভুল উচ্চারণের বিরুদ্ধে রীতিমত সতর্ক করিয়া দিত। একদিন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে Pudding কথাটা পাওয়া গেল। মাষ্টার মশায় সেটির উচ্চারণ করিলেন—পাডিং! সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"Beg your pardon Sir! ওটা পুডিং হবে!"

মাষ্টারমশায় প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তীব্র স্বরে বলিলেন—"কে তোমায় বল্লে পুডিং হবে?"

সতীশ বলিল—"Excuse me Sir! আমি খাস সাহেবের মুখেই ও কথাটা শুনেছি এবং অনেক বার ও জিনিষটার স্বাদও ইংরেজি হোটেলে গ্রহণ করেছি!"

মাষ্টারমশায় খানিকটা আমতা-আমতা করিলেন, তার পর চুপ করিয়া গেলেন। এর পর থেকে সতীশ সম্বন্ধে তাঁকে একটু সাবধান হইয়া চলিতে হইল।

ইতিপূর্ব্বে ইসারায়ও যদি কেহ রায়-বাড়ীর ছেলের প্রতি অসম্ভ্রম দেখাইত তাহা হইলে দারবান থেকে হেডমাষ্টার পর্য্যন্ত অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিত এবং তার রীতিমত সাজা হইয়া যাইত। কাজেই সব ছেলে রায়বাবুদের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে চলিত। কিন্তু সতীশ সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটানো গেল না। একে সে সহুরে ছেলে—তার সঙ্গে পারা যায় না, তার পরে সে পূরা মাহিনা দেয়, সর্ব্বোপরি সে মুন্সেফ বাবুর ভাইপো! কাজেই তাকে আর-সকলের মতো হেনস্থা করা চলে না। তার বাপ আবার কলিকাতার উকিল। ছেলের উপর উপদ্রব করিলে ফ্যাসাদে পড়িবার ভয়ও আছে। কে বলিতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কানে সে কথা উঠিবে না। অনেক কষ্টের চাকরি কি শেষে যাইবে!—হেডমাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষকের সে ভয় গুরুতর ছিল।

সতীশের আচরণ দেখিয়া কিন্তু কয়েকটা ছেলের সাহস বাড়িয়া গেল। তারা মনে মনে রায়বাড়ীর ছেলেদের উপর চটা ছিল কিন্তু কিছু করিবার সাহস ছিল না—মনে মনে কেবল গুমরাইত। সতীশের সেই নির্ভিকতা তাদের মনের চটকা যেন ভাঙিয়া দিল।

একদিন টিফিনের ছুটির সময় হুটোপাটি করিতে করিতে একটা ছেলের ঠেলা খাইয়া সতীশ রায়বাড়ীর মেজোবাবুর গায়ের উপরে পড়িয়া গেল। মেজোবাবু সতীশকে কিছু বলিল না কিন্তু যে ছেলেটা ঠেলা দিয়াছিল ধাঁ করিয়া তাকে এক চড় কসাইয়া দিল। ছেলেরা এমন চড় আগে অনেকবার সহিয়াছে, গায়ে মাখে নাই, কিন্তু সেদিন আর সে পারিল না—সেও সজোরে এক চড় কসাইয়া দিল। মেজোবাবু উত্তেজিত হইয়া জুতা খুলিয়া তাকে মারিতে গেল—সতীশ তাড়াতাড়ি মাঝে আসিয়া বুক-ফুলাইয়া দাঁড়াইল—মেজোবাবুর হাতের জুতা হাতেই রহিয়া গেল।

এ ঘটনায় স্কুলের সমস্ত ছেলে একেবারে স্তব্ধ। কি ব্যাপার! রায়বাবু মার খাইল? এমন অঘটন তারা কখনো চক্ষেও দেখে নাই। যথাসময়ে হেডমাষ্টারের

কানে এ কথা গেল। তিনি ছেলেটাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হেডমাষ্টারের ঘরের দিকে চলিতে লাগিল। সতীশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া ক্লাস ছাড়িয়া তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

হেডমাষ্টার মনে করিতেছিলেন ছেলেটার একটা রীতিমত শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন—কিন্তু সতীশকে দেখিয়া তিনি দমিয়া গেলেন।

হেডমাষ্টার ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই চড় মেরেছিস্?"

ছেলেটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"হ্যাঁ!"

হেডমাষ্টার বলিলেন—"পূন্ন! বেতগাছটা নিয়ে আয় ত।"

পূর্ণ বেত আনিয়া হাজির করিল;—হেডমাষ্টার হাতে করিয়া লইলেন।

ছেলেটা দূরে দাঁড়াইয়াছিল। হেডমাষ্টার বেতটা বাতাসের উপর দুই চারিবার শানাইয়া লইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"এ দিকে সরে আয় বল্‌চি!"

ছেলেটা কাতরভাবে চাহিতে চাহিতে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সতীশ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে এইবার খপ্ করিয়া গিয়া ছেলেটার হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"দাঁড়া!"

হেডমাষ্টার চোখ পাকাইয়া বলিলেন—"সতীশ!"

সতীশ অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর করিল "Yes Sir!"

হেডমাষ্টার বলিলেন—"তুমি ক্লাসে যাও! এখানে তো তোমার দরকার নেই!"

সতীশ বলিল—"Pardon Sir! I am not an intruder!" বলিয়া সতীশ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

হেডমাষ্টার সতীশের দিকে আর না ফিরিয়া ছেলেটাকে ধমক দিয়া বলিলেন—"এদিকে আয়!"

সতীশ সজোরে তার হাত চাপিয়া রহিল।

হেডমাষ্টার তখন সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সতীশ তুমি অন্যায় করচ।"

সতীশ মাথাটা একটা বিলাতী ভঙ্গীতে নত করিয়া কথাটার উপর শ্রদ্ধা দেখাইল! তার পর মুখ তুলিয়া বলিল—"If you allow my criticism Sir, তাহলে বলি, আমি অন্যায় করিনি—Your Sirship অন্যায় করছেন সুবোধের তো কোনো দোষ নেই—আমিই মেজোবাবুর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিলুম—তাতে তিনি রেগে সুবোধকে মেরেছেন। সুবোধ মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দিয়েছে—and I admire his bravery!" বলিয়া সুবোধের পিঠটা সে একবার খাবড়াইয়া দিল।

হেডমাষ্টার একটু চুপ করিয়া রহিলেন!

সতীশ একটা দুষ্ট চাহনি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল—"কলকাতার এক Class-friendএর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি Sir, সেখানে স্কুলে বেত-মারা তুলে দেওয়া হয়েছে।"

হেডমাষ্টার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। তার পর সুবোধকে সে দিনকার মতো রেহাই দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা আমি খোঁজ করে দেখব—দোষ কার? এখন তোমরা যাও।"

কিন্তু সে খোঁজ সেইখানেই শেষ হইয়াছিল;—এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য হয় নাই।

সুবোধ কখনো বেত খায় নাই—বেত দেখিয়া তার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গিয়াছিল। বেতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সে ভালো করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সতীশ যে তাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে সে জন্য একটু কৃতজ্ঞতা সে মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না বটে কিন্তু তার সমস্ত দেহ দিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পাড়াগেঁয়ে ভূত বলিয়া সুবোধের প্রতি সতীশ কোনো দিন ভালো করিয়া তাকায় নাই কিন্তু আজ সুবোধের সেই আশঙ্কাপীড়িত করুণ মুখখানি দেখিয়া অবধি তার প্রতি কেমন একটি স্নেহের উচ্ছ্বাস তার অন্তর পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। সুবোধ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল;—সতীশ তার হাত ধরিয়া বলিল—"চল্ ভাই, ক্লাসে যাই!"

সুবোধের জন্য ক্লাসসুদ্ধ ছেলে শঙ্কিত হইয়াছিল! যখন শুনিল তার কোনো শাস্তি হয় নাই তখন তারা একেবারে অবাক হইয়া গেল। সতীশ যে একেবারে অঘটন ঘটাইয়া দিল! আশ্চর্য্য ক্ষমতা! সেই মুহূর্ত্ত হইতে সতীশের শক্তির অসীমতার উপরে তাদের একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল।

এখন হইতে সতীশকে দলপতি করিয়া ছেলেরা নির্ভয়ে স্কুলে বেড়াইতে লাগিল।

রায়বাবুদের উপর তাদের যে সমীহ ছিল তাহা কর্পূরের মতো উবিয়া গেল।

এই দলে সকলেই যোগ দিল কিন্তু বিষ্ণু পারিল না। বিষ্ণুর এই ছেলে-বয়সেই বুদ্ধি পাকিয়াছিল! সে বুঝিল সতীশ ঝড়ের মতো দুদণ্ডের জন্য আসিয়া পড়িয়াছে;—রায়-বাবুরা চিরদিনের,—চিরজীবনের। সতীশের ঝড়ে পড়িয়া সে যে কোথায় গিয়া পড়িবে তার ঠিক নাই। সেই জন্য সতীশকে সে বড় ভয় করিত। এই অল্পদিনের জীবনের মধ্যেই বিষ্ণু অনেক দুঃখ পাইয়াছে, অনেক দেখিয়াছে। তার বাপ কত ফিকির-ফন্দি করিয়া, কত হিসাব করিয়া তাদের দুঃখের সংসার চালাইত তাহা সে প্রতিদিন দেখিয়া আসিতেছে। বিপদে-আপদে রায়বাবুরা যে তাদের একমাত্র ভরসা তাহা সে এত টুকু বেলা হইতে বুঝিয়াছে। সে যে স্কুলে বিনা-বেতনে পড়ে তাহা রায়বাবুদের দৌলতে। সে যে জুতা জামা কাপড় পরিয়া স্কুলে আসে তাও তার বাপ বায়বাড়ী হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া জোগাইয়াছে। শুনিয়াছে তার পিতামহ একসময় দেনার দায়ে জেলে যাইতে বসিয়াছিল, সে-সময় স্বর্গীয় রায়কর্ত্তরা তাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কথা বিষ্ণুর মনে জাজ্বল্য হইয়া ছিল। সে দিবারাত্র ভিতরে-বাহিরে রায়-বাবুদের করুণা বহন করিয়া বেড়াইত—কাজেই তাদের বিরুদ্ধ-দলের সহিত যোগ দেওয়া কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ছেলেরা অনেক টিটকারি দিল—খোসা মুদে বলিয়া তাকে উপহাস করিল কিন্তু তবুও বিষ্ণু অচল অটল হইয়া রহিল!

রায়বাবুরা স্কুলের ছেলেদের দ্বারা যখন এমনি ভাবে অপমানিত হইল তখন তারা মনে মনে খুব চটিয়া উঠিল বটে কিন্তু সতীশ আছে বলিয়া কিছু করিতে সাহস পাইল না। তাকে ঘাঁটাইতে গেলে অপমানের বোঝা বাড়িবে বই কমিবে না। সতীশ যদি না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় ছেলেগুলোর হাতে-মাথা-কাটা হইত।

ছেলেদের প্রতি তারা একরকম উদাসীনই ছিল;—কেবল নিজেদের গর্ব্বপ্রকাশের জন্য তাদের একটু আবশ্যক ছিল, এখন সে প্রয়োজনেরও মায়া কাটাইয়া রায়বাবুরা ছেলেদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব ধারণ করিল। মনে হইয়াছিল, এই ঔদাসীন্য ছেলেদের আঁতে গিয়া লাগিবে; কারণ তারা স্বচক্ষে প্রতিদিনই ত দেখে তাদের বাপ খুড়ার একটু প্রসন্ন মুখ, একটু সদয় চাহনি লাভ করিবার জন্য এই সব ছেলেদেরই বাপ-দাদারা উমেদার হইয়া ফিরিতেছে;—বড়-মানুষের এতটুকু কৃপাকণা পাইলে তারা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করে, —এরা তো তাদেরই ছেলে! কিন্তু স্কুলের ছেলেরা তাদের ঐ উদাসীনতায় মোটেই বিচলিত হইল না, বরং এমনি ভাব দেখাইল যে তারা উহা গ্রাহ্যই করে না। বাবুদের মন ভারি দমিয়া গেল এবং ছেলেদের উপর একটা আক্রোশ বাড়িতে লাগিল। তখন তাদের মনে হইতে লাগিল, বড়মানুষের অনুগ্রহ লাভ করাটা যে কী তাহা ছেলেদের একবার সমঝাইয়া দেওয়া চাই; তাহা না হইলে কেমন করিয়া বুঝিবে যে তারা কতটা বঞ্চিত। এই অনুগ্রহ বিষ্ণুর উপর গিয়াই পড়িল—কারণ শ্রদ্ধার সহিত অনুগ্রহ গ্রহণ করে এমন ছেলে তো আর ছিল না।

বিষ্ণুর তখন আদর দেখে [illegible] রায়বাবুরা তার সহিত এমন ব্যবহার আরম্ভ করিল যেন সে তাদেরই এক [illegible]। সর্ব্বদা বিষ্ণুকে কাছে-কাছে রাখা, একসঙ্গে স্কুলে আসা, স্কুল থেকে যাওয়া, ফিনের সময় একসঙ্গে খাবার ভাগ করা খাওয়া—এই রকম খুঁটিনাটি হইতে [illegible] করিয়া সর্ব্বরকমে তাকে অনুগ্রহে [illegible]রে প্লাবিত করিয়া তুলিতে লাগিল। [illegible]ও এতটুকু ফাঁক থাকিতে দিল না। [illegible]জার ঢৌক তার ফিরিয়া গেল—এখন [illegible] সে ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া জামা নাই, [illegible]দব ঝকঝকে চকচকে! এক সতীশ ছাড়া [illegible]ন পারিপাটা আর-কারো ছিল না। [illegible]লেদের ঈর্ষা উদ্রেক করিবার জন্য [illegible]দের চোখের সাম্‌নে রায়বাবুরা বিষ্ণুকে [illegible]য়া একেবারে মাতিয়া থাকিত। যে [illegible]বাবুরা গুমোরে কারো সহিত ভালো [illegible] কথা কহিত না, তারাই আজ বিষ্ণুর [illegible] না লইয়া এতটুকু কাজও করে [illegible]। অনেক সময় এরা দেখাইয়া দেখাইয়া নিজেদের চেয়ে ভালো জিনিষ বিষ্ণুকে দিত এবং নিজেরা ছোটো হইয়া থাকিয়া [illegible]কে বড় করিয়া ধরিত।

বিষ্ণু রায়বাবুদের দেবতার মতো দেখিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই বিষ্ণু যখন দেখিল, যে-রায়বাবুরা তার ছায়া মাড়াইতে ঘৃণা করিত—কাছে পড়িলে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইত, সেই রায়বাবুরা তার এত

[illegible]ছে, হাত ধরিয়া কথা কহিতেছে, তখন [illegible]র ছোটো মনটি গুটাইয়া আরও ছোটো হইয়া যাইতে লাগিল। রায়বাবুদের কাছে আগে তার যতটা সঙ্কোচ ছিল এখন তার চেয়ে ঢের বেশি সঙ্কোচ সে ভিতরে ভিতরে বোধ করিতে লাগিল। এতটা দয়ার যোগ্য [illegible] কিছুতেই নয়—এই তার দৃঢ়বিশ্বাস। সেইজন্য রায়বাবুদের এতখানি অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে তার [illegible] কাঁপিত, হাত কাঁপিত—কিন্তু মনের ভিতর হইতে এমন সাহস পাইত যাতে সেই [illegible]টুকুও সে প্রকাশ করে। সে যেন কলের পুতুল; রায়বাবুরা যাহা দিত মাথা নীচু করিয়া তাহা গ্রহণ করিত। তার অন্তরের মধ্যে তার অযোগ্যতার যে ব্যথা ছিল তাহা প্রকাশ করাও হইয়া উঠিতনা। এমন সাহস তার কোথায় যে রায়বাবুদের সামনে দাঁড়াইয়া যেমন-হোক্ দুটো কথা সে কহিতে পারে?

বিষ্ণুর অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সে কৃতজ্ঞতাও সে কথা দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না, কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বাড়িয়াই চলিতেছিল। এ কি কম কথা! রায়বাবুরা তাকে ভায়ের মতো দেখে! এ কথা ভাবিতেও যে তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! কিন্তু তাই তো সে পদে পদে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে! সে মুখে কিছু বলিতে পারিত না কিন্তু তার মনটা রায়বাবুদের পায়ের তলার ধূলোর মধ্যে লুটাইতে থাকিত। তার মনে হইত—আর কিছু নয়, রায় বাবুদের ঐ পা জড়াইয়া মাটিতে লুটাইতে পারিলে যেন তার জীবন তৃপ্ত হইয়া যায়।

প্রথমটা সে বিশ্বাসই করিতে পারে নাই;—মনে হইয়াছিল রায়বাবুদের এ পরিহাস! কিন্তু পরিহাস তো আর দিনের পর দিন চলে না। কাজেই এতবড় অসম্ভব ব্যাপারটা তাকে বিশ্বাস করিতেই হইল। তার পর একদিন যখন বড়বাবু সকলকার সামনে তাকে বিষ্ণুদা বলিয়া ডাকিল এবং তার দেখাদেখি অন্য ভায়েরাও তাই বলিতে লাগিল, তখন তার মনের অবস্থাটা যে কি হইল তাহা ঠিক বর্ণনা করা যায় না। সে কোথাকার কে—এক অতি নগণ্য গরীবের ছেলে, তাকে মহাপ্রতাপান্বিত রায়বাবুরা দাদা বলিয়া ডাকিতেছে—এর চেয়ে সৌভাগ্য জগতে আর-কিছু আছে বলিয়া বিষ্ণু মনেই করিতে পারে না। তার মতো গরীবের উপর রায়বাবুদের যে এতখানি দয়া তাহা বহন করিবার মতো শক্তি যেন সে নিজের মধ্যে হাতড়াইয়া পাইতেছিল না! এ যেন তার এতটুকু হৃদয়ের উপরে একেবারে আচম্‌কা এক বন্যার মতো আসিয়া পড়িয়াছে—সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল।

গোড়া হইতেই বিষ্ণু রায়বাবুদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এখন হইতে একেবারে তার সমস্ত প্রাণটা তাদের কাছে দিবারাত্র প্রণত হইয়া রহিল। এমন কি, যদি মনে হইত রায়বাবুদের কঠিন ভূমি মাড়াইয়া চলিতে কষ্ট হইতেছে তবে বুকখানা সেইখানে পাতিয়া দিবার জন্য তার প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করিত। তার মন বলিত, আর ত উপায় নাই—এমনি করিয়াই তো অন্তরের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে!

ছেলেরা বিষ্ণুকে দলে টানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল—অনেক সাধ্যসাধনা করিল, অনেক ভয় দেখাইল, গাল দিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিষ্ণু যে স্বপ্নেও রায়বাবুদের বিরুদ্ধে যোগ দিতে পারে এমন বিশ্বাস তার ছিল না। সে ছেলেদের স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। তাদের জন্য সময় সময় তার একটু দুঃখ হইত,—হায়, গোঁয়ার সতীশের পাল্লায় পড়িয়া ছেলেগুলো কী সর্ব্বনেশে কাণ্ড করিতেছে! তারা কি জানে না ইচ্ছা করিলে রায়বাবুরা তাদের রাখিতে পারে,—মারিতে পারে!

ছেলেরা যখন বিষ্ণুকে কিছুতেই বাগাইতে পারিল না তখন তারা তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে টিট্‌কারি দিতে লাগিল। এমন সব কথা বলিতে লাগিল যাতে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা শক্ত। রায়বাবুরা কিন্তু এই টিট্‌কারি বিশেষভাবে উপভোগ করিত। কারণ তারা বুঝিত এ টিটকারি তো আর-কিছু নহে—বিষ্ণু যে আদর পাইতেছে তারই জন্য এ গায়ের জ্বালা! যতই এই গায়ের জ্বালা প্রকাশ পাইত, রায়-বাবুরা ততই খুসি হইয়া উঠিত।

(বিষ্ণু প্রথম প্রথম এই টিট্‌কারিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু যেদিন দেখিল রায়বাবুরা তাহাতে খুসি, তখন তারও মনটা খুসি হইয়া গেল। তখন সে কামনা করিতে লাগিল—উহারা যত পারে টিট্‌কারি দিক্! আমাকে অবলম্বন করিয়া এই যে রায়-বাবুদের মন খুসি হইয়া উঠিতেছে এ তো আমার সৌভাগ্য!—আমার কী সাধ্য আছে যে রায়বাবুদের আমি খুসি করিতে পারি! ছেলেদের টিট্‌কারিতে রায়বাবু যখন হাসিত বিষ্ণুও সে হাসিতে যো দিয়া রসান দিত। শেষে ছেলেরা দেখি এমন বেহায়ার সঙ্গে পারিয়া ওঠা শক্ত

বিষ্ণু রায়বাবুদের আছে একেবা পুতুল বনিয়া গিয়াছিল বলিলে বিষ্ণুকে নই যা ইচ্ছা তাই করিতে তাহার আটকায় না। নইলে এতটা কি সম্ভব হয় খেলার পুতুল শিশুদের ইচ্ছায় কোনে বাধা দেয় না, তাই ছেলে পুতুল এ ভালোবাসে—পুতুল যদি ভাঙ্গে হইত তা হইলে ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই তার বনি না। রায়বাবুরা যে দিন অনুভব করি বিষ্ণু পুতুলেরই মতো, সে দিন হইতে বিষ্ণুকে লইয়া খেলা করি মজা দেখিবার প্রবৃত্তি মনে জাগিয়া উঠে। বিষ্ণু খেলার প্রতিবন্ধক হইত না সেই জন্য খেলা দিন দিন জমিয়াই উঠিতে লাগিল—নইলে কবে ভাঙিয়া যাইত!

একদিন রায়বাবুরা বিষ্ণুকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। বিষ্ণু একেবারে গলিয়া গেল। তার পর রায়বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিল, বাবুদের সঙ্গেই তার আসন পাতা হইয়াছে তখন সে একেবারে অবাক! ইহার পূর্ব্বে সে পূজার সময় বাপের সহিত রায়বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছে বটে কিন্তু তখন আহারের স্থান হইত উঠানে। কিন্তু এ যে একেবারে বাবুদের খাসমহলে! এবার পাতা পড়িয়া নহে—রূপার বাসনে! সে বাবুদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল;

করিয়া আহারে মনই দিতে পারিল রায়বাবুরা তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। যতই পীড়াপীড়ি হয় ততই আরো তার হাত গুটাইয়া আসে। যখন খাইতে বসে—কেহ তার ভাত ঢাকা পড়িয়া থাকে আপন-মনে গলাধঃকরণ পড়িল কি না এ প্রশ্ন এ ধারণাই তার ছিল এই পীড়াপীড়িতে, এই একেবারে অভিভূত হইয়া

বিষ্ণুকে যখন খাইতে বলা হয়, সে খাইতে না—ইহাতে রায়বাবুরা মজা পাইয়া যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন ভাই আসিয়া জোর করিয়া বিষ্ণুর মধ্যে খাবার পুরিয়া দিল। বিষ্ণুর তখন কষ্ট—খাবার সে গিলিতে কেন? বাবুর সেদিকে দৃষ্টি নাই, খাবারের পর খাবার পুরিয়া যাইতে গিল। বিষ্ণু গিলিতেও পারে না, ফেলিতেও না। শেষ গাল দুটো ফুলিয়া যখন অবধি ঠেলিয়া আসিল, তখন তার মূর্ত্তি দেখিয়া রায়বাবুরা সমস্বরে হো-হো-করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিষ্ণু ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এ মজাটা নিজে না দেখিলে পূরা জমিবে বলিয়া ছোটোবাবু ছুটিয়া গিয়া একখানা আয়না আনিয়া বিষ্ণুর মুখের সামনে ধরিল। বিষ্ণু খানিকক্ষণ নিজের সেই গোবিন্দ-জননী মূর্ত্তির পানে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল—তার পর তার দুই চক্ষু দিয়া টস্-টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রায়বাবুরা আবার যেমন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বিষ্ণু মুখের খাবার ফেলিয়া দিয়া তাদের সঙ্গে উচ্চ হাস্যে যোগ দিল—তখনও তার চোখের জল শুকায় নাই। জানি না, তার জীবনের এই প্রথম রাজভোগ বিষ্ণু পান্তাভাতের চেয়ে বেশী উপভোগ করিয়াছিল কি না!

ইহার অল্প দিন পরে আর একটা মজা হইয়া গেল! রায়বাবুদের এক ভাগ্নে—ছোট্ট ছেলে—রামায়ণের গল্প শুনিয়া হনুমান দেখিবার বায়না ধরিল। ছেলেটি সম্প্রতি শক্ত রোগ হইতে উঠিয়াছে—এ সময়কার বায়না দীর্ঘস্থায়ী হইলে শরীরের ক্ষতি হইতে পারে মনে করিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হনুমান এখন পাওয়া যায় কোথা? অগত্যা বিষ্ণুকেই হনুমান সাজিতে হইল। দুই গালে ভুষা মাখিয়া লম্বা ল্যাজ পরিয়া তাকে গাছের ডালে গিয়া বসিতে হইল। তার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ছেলেটি হাসিয়া খুন—আর সকলেও হাসিতেছিল। বিষ্ণুরও একবার মনে হইয়াছিল হাসে, কিন্তু পাছে হাসিলে হনুমানী নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে সে হাসি চাপিয়া গেল।

পরদিন ছেলেদের কানে এ খবরটা কেমন করিয়া গিয়া পৌঁছিল। তারা বিষ্ণুকে লইয়া ক্ষেপাইতে লাগিল। বিষ্ণু তাদের কথা হা-হাঃ হা-হাঃ করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তবুও যখন ছেলেরা ছাড়িল না তখন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—"জান ত, হনুমানের জন্যেই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল!"

রায়বাবুদের উপর সতীশের এখন আর তেমন দৃষ্টি ছিল না। প্রথমটা তাদের যতটা অদ্ভুত সে দেখিয়াছিল, এখন আর তেমন বোধ হয় না—তাদের অনেক খোঁচ-খাঁচ সমান হইয়া গেছে। সে এখন ফুটবল ক্লব, ডিবেটিং ক্লব প্রভৃতি লইয়াই মাতিয়াছিল,—রায়বাবুদের কথা লইয়া মাথা-ঘামাইবার সময় ছিল না। রায়বাবুরা কিন্তু সতীশের দাম্ভিকতা ভুলিতে পারে নাই —যদি কখনো বাগে পায় একবার শিক্ষা দিবে এ সংকল্প তাদের মনে মনে ছিল।

বিষ্ণু অন্য ছেলেদের গ্রাহ্য করিত না—তারা কি করে, না করে তার জন্য সে কিছুমাত্র চিন্তিত ছিল না; কিন্তু সতীশকে সে মনে মনে ভয় করিত। এ ভয়টা যে কেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিত না। তবুও সতীশের নামে তার বুকটা কেমন দুরদুর্ করিয়া উঠিত। তার মনে হইত—সে যেন ইচ্ছা করিলে একটা প্রলয় বাধাইয়া দিতে পারে। পাছে সে সতীশের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এই জন্য তার মনে একটা আতঙ্কও ছিল।—সেই জন্য প্রকাশ্যভাবে সতীশের কোনোরূপ বিরুদ্ধতা করিবার সাহস তার ছিল না। বরঞ্চ সুবিধা পাইলে এমন ভাব সে বাহিরে দেখাইত যে সতীশের সে অনুগত। রায়বাবুরা অনেকবার সতীশকে জব্দ করিবার ফন্দি আঁটিয়াছে, বিষ্ণু সে সব শুনিয়াছে, একবার তার সুযোগও হইয়াছিল কিন্তু বিষ্ণুর সাহস হয় নাই। সেবার পরীক্ষার সময় সতীশ একটা কাগজে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া সুবোধের কাছে চালান করিয়া দিতেছি সুবোধ সে বছর অনেক দিন ব্যা ভুগিয়াছিল, পড়াশুনা কিছুই হয় না পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, অথচ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তার বৃত্তি বন্ধ হইয়া পড়াশুনার শেষ হইবে। সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ছিল কেবল সতীশ সাহস দিয়াছে—কোনো নাই! এবং সেই জন্যই সতীশ এমনি করি সুবোধকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সাহা করিতেছিল। বিষ্ণুর ইহা পড়ে বিষ্ণুর মনে হইল সতীশকে জব্দ করি রায়বাবুদের প্রীতিভাজন হই এই সুযোগ ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দিতে পারি সতীশের লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না বিষ্ণু সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই কিন্তু সেই সময়টিতে সতীশ লিখি লিখিতে একবার অন্যমনস্কভাবে যে মাথা তুলিয়া বিষ্ণুর দিকে চাহিল অম তার বুক কাঁপিয়া উঠিল—সে থ করিয়া বসিয়া পড়িল। ক করিতে হইয়া পড়িবে ভাবিয়া এ কথা কার কাছে আর প্রকাশ করিল না।

সতীশ যেদিন শুনিল রায়বাবুরা বিষ্ণুকে হনুমান সাজাইয়াছে, সে কোনোরূপ বিদ্রূপ করিল না, শুধু বিষ্ণুকে গোপনে ডাকিয়া তীব্র স্বরে বলিল—"কেন এ সকল অপমান তুমি সহ্য কর!"

বিষ্ণু অন্য ছেলেদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল কিন্তু সতীশের কথার হাসিঠাট্টার তরলতা ছিল না বলিয়া সে কোনো উত্তর করিতে পারিল না। অপমান

সে তখন বোধ করিতে পারে নাই কিন্তু সতীশের কথার ভিতর কি ছিল সেইটা অপমানের খোঁচা হইয়া এখন বিষ্ণুর বুকে গিয়া বিঁধিল। এখন সে সত্যই বুঝিল কত-বড়-একটা অপমান সে সহ্য করিয়াছে! সতীশের তিরস্কারের রেশ তার অন্তরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রণিত হইতে লাগিল; এবং তারই তাপে রায়বাবুদের উপর একটা বিদ্বেষ তার মনের মধ্যে ধোঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। সে অনেকক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল। তারপর রায়বাবুরা যখন তাকে আদর করিয়া ডাকিল তখন ক্ষণেকের জন্য তার মন বিমুখ হইয়া রহিল বটে কিন্তু সে যখন সাড়া দিল তখন তার মন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেছে। রায়বাবুদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তার হঠাৎ একবার মনে পড়িল—সতীশকে! —সে চোখের সামনে দেখিল সতীশ যেন একটা প্রলয়ের ঝড়—কিছু মানে না, সর্ব্বস্ব উড়াইয়া লইয়া চলিয়া যায়! পাছে সেই ঝড়ের ঘূর্ণীর মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে মনে মনে সেই সময় রায়বাবুদের পা সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিল।

সতীশকে পালাইয়া বেড়াইতে পারিলে বিষ্ণু বাঁচিত কিন্তু ছাড়ো-ছাড়ো ভাব দেখাইলে পাছে সতীশ রাগ করে তাই সে একেবারে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিত না। তা ছাড়া সতীশের সঙ্গে কথায় এইটে সে অনুভব করিত সতীশ বিষ্ণুকে একেবারে তাচ্ছিল্য করে না—তার জন্য একটুখানি স্নেহ তার হৃদয়ের কোথায় সঞ্চিত হইয়া আছে—মধ্যে মধ্যে তার বিন্দু বিষ্ণুর উপর ক্ষরিত হইয়া পড়ে। দয়ার পাত্র বলিয়া বিষ্ণুর উপর একটা মায়া সত্যই সতীশের ছিল। এবং সেই মায়ার টানে বিষ্ণুর জন্য যে কথাগুলা সে মধ্যে মধ্যে বলিত তাহা বিষ্ণুর হৃদয় একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিত না।

বিষ্ণুর এক একবার মনে হইত একটা বিষের মত যেন কি সতীশ তার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে এবং তারই চাঞ্চল্য সে মধ্যে মধ্যে সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে অনুভব করিত। হঠাৎ এই বিষ এতটা কাজ করিয়াছিল যে সে একদিন রায়বাবুদের কথা গ্রাহ্য করে নাই;—তাকে লইয়া মজা করিবার মজলিশ হইতে যে ডাক আসিল তাহা উপেক্ষা করিয়া সে ঘরে বসিয়া রহিল। সে বলিয়া পাঠাইল শরীর অসুখ, আজ যাইতে পারিব না। তারপর সেই কথা শুনিয়া রায়বাবুরা যখন হুড়মুড় করিয়া তাহার ভাঙা কুঁড়েয় আসিয়া হাজির হইল এবং যত্নের সহিত তার শরীর সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল তখন সে একেবারে গলিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কপট রোগশয্যা ছাড়িয়া সে রায়-বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। এবং রায়বাবুদের সম্বন্ধে তার মনের সমস্ত গ্লানি তখনই মুছিয়া গেল। ইহার পর কয়েকদিন সে সতীশকে এড়াইয়া চলিয়াছিল এবং তার মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে পারে নাই।

বিষ্ণুকে রোজই সকাল-বিকাল রায় বাড়ীতে হাজিরা দিতে হইত। তাকে

লইয়া রায়বাবুদের বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল—সে যেন একটা নেশার জিনিষ! তার দুদণ্ড আসিতে দেরী হইলে বাবুরা ছট্‌ফট্ করিত। এমনি রোজ চলিতেছিল। হঠাৎ একটা ঘটনায় কয়েকদিনের জন্য বিষ্ণুর রায়বাড়ীতে আসা বারণ হইল। বিষ্ণুর বাপ বসন্ত-রোগে মারা গিয়াছিল—পাছে ছোঁয়া লাগে এই ভয়!

বিষ্ণু অশৌচের দিন কয়েকটা একলাটি বাড়ীতে বসিয়া কাটাইতেছিল, রায়বাবুদের জন্য মনটা এক একবার কেমন-কেমন করিত বটে কিন্তু তার চেয়ে একটা ভাবনা বেশী করিয়া তাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। সেই ভাবনাতে সে বাপের শোকও তেমন করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছিল না। এত-বড় সংসারের ভাবনা তারই ঘাড়ে এইবার পড়িল। সে যে কি করিবে ভাবিয়া কূল পাইতেছিল না—চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল। টাকা যে কেমন করিয়া রোজগার হয় সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান তার ছিল না—অথচ এটা সে দেখিতেছে টাকা না হইলে সংসার চলে না। সে তো কাহাকেও কোথাও দেখিতেছে না—কেহ তো এই দুর্দ্দিনে তার কাছে একবার আসিল না। তবে সাহায্য কে করিবে? এই বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ তাকে কে দেখাইয়া দিবে?—এই ভাবনা সে দিনরাত ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না। রায়বাবুদের কথা তার মনে উঠিয়াছিল বটে কিন্তু রায়বাবুদের সামনে দাঁড়াইয়া মুখ ফুটিয়া কেমন করিয়া সে নিজের দুঃখের কথা জানাইবে? কোনো কথা তো সে আজ পর্য্যন্ত নিজের থেকে বলিতে পারে নাই—বলিতে তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া শুষ্কমুখে একলাটি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে এমন সময় সতীশ আসিয়া হাজির হইল। আসিয়াই বলিল—"বড় দুঃখিত হলুম বিষ্ণু তোমাদের বিপদ শুনে!"

তার জন্য দুঃখিত! বিষ্ণু জীবনে এই প্রথম এমন কথা শুনিল। তারপর সতীশ আসিয়া যখন স্নেহের সহিত তার হাতখানা ধরিল তখন সে একেবারে গলিয়া গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সতীশ বলিল—"কাঁদিসনে ভাই, এ দুঃখ তো আছেই একদিন না একদিন সবাইকে সইতে হবে।"

বিষ্ণু এই ক'দিন নিজের কী ভয়ানক নিরাশ্রয় মনে করিতেছিল, আজ হঠাৎ মনে হইল সে যেন একটা শক্ত আশ্রয় পাইয়াছে—সে সতীশকে আঁকড়াইয়া ধরিল। সতীশ তাকে স্নেহের সহিত বুকের মধ্যে ধরিয়া নিজের হাতে তার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল।

এর পর থেকে সতীশ রোজ একবার করিয়া বিষ্ণুর সহিত দেখা করিতে আসিত এবং খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিত। বিষ্ণু একদিন সমস্ত দুঃখের কথা বলিয়া বলিল—"কি করি বল দেখি ভাই সতীশ?"

সতীশ বিষ্ণুর সমস্ত ভাবনাটাকে যেন ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল—"এর জন্যে ভাবনা কি? আমি তো শীঘ্রই কলকাতায় চলে যাচ্ছি—তুমি আমার সঙ্গে এস, সেখানে একটা চাকরীর যোগাড় আমি ঠিক করে দেব! এখানে পড়ে থাকলে বিষ্ণু তোমায় পচে মরতে হবে!"

সতীশের মতো এমন সুহৃদ বিষ্ণুর কে আছে? বিষ্ণু বলিল—"তুমি যা বল ভাই, আমি তাই করতে রাজী।"

সেদিন যাইবার সময় সতীশ বলিয়া গেল—"বিষ্ণু তুমি কিছু ভেব না, আমি আছি!"

সতীশ আছে!—এ কথাটা নিজের অন্তরের মধ্যে হইতেও বিষ্ণু বেশ শুনিতে পাইতেছে।

তারপর সে বন্ধুতে মিলিয়া দিনের পর দিন কলিকাতা যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিল। ঠিক হইল অশৌচটা শেষ হইলেই সতীশের সঙ্গে বিষ্ণু চলিয়া যাইবে!

যাইবার দিন বিষ্ণু বলিল—"সতীশ, একবার রায়বাবুদের বলে যাওয়া দরকার। তাঁদেরই আশ্রিত আমরা! না বলে গেলে রাগ করতে পারেন। কি জানি শেষে কি হতে কি হবে!"

সতীশ কথাটা শুনিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—"আচ্ছা!"

বিষ্ণু বলিল—"তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি চট্ করে সেরে আসি!"

বিষ্ণু খানিক দূর যাইতে সতীশ কি মনে করিয়া বিষ্ণুকে ডাকিল, বলিল—"দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

রায়বাড়ী গিয়া পৌঁছিতে বাবুরা হল্লা করিয়া উঠিল—"এই যে বিষ্ণু দা! এই যে বিষ্ণু দা!"

সকলে আসিয়া হাত ধরিয়া তাকে বসাইল।

বিষ্ণু একেবারে থতমত খাইয়া গেল—কোনো কথা কহিতে পারিল না।

সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"বিষ্ণু, তোমার কাজটা সেরে নাও!"

সতীশের কথায় বিষ্ণুর যেন চট্‌কা ভাঙিল, সে যেন একটু সাহস পাইল, সেই সাহসের স্ফুলিঙ্গের মাথায় সে ঝট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"আমি বিদায় নিতে এসেছি!"

চারিদিক হইতে একটা বিস্মিত প্রশ্ন উঠিল—"বিদায়?"

বিষ্ণুর মুখে আর কথা নাই।

সতীশ তখন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—"বিষ্ণু চাকরী করতে কলকাতায় যাচ্ছে!"

সতীশের দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না, কথাটা যেন বিষ্ণুরই—এম্‌নিভাবে বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া সকলে বলিল—"সে কি হয় বিষ্ণুদা! আমাদের ছেড়ে যাবে কোথায়? তোমায় ছাড়ে কে?" বলিয়া সকলে মিলিয়া তাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল।

বিষ্ণু মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। সতীশ দাঁড়াইয়াছিল। রায়বাবুদের কেহ তার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। এই তাচ্ছিল্যে সতীশের মুখের আগায় একটা খোঁচা আসিয়াছিল কিন্তু সে সামলাইয়া গেল। সে কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিষ্ণুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিয়া উঠিল—"তাহ'লে চল্লুম ভাই, বিষ্ণু!"

বিষ্ণু একটা ফ্যাল্-ফেলে দৃষ্টি তুলিয়া সতীশের মুখের পানে চাহিল। সতীশ বিষ্ণুর প্রতি শুধু একটা কঠোর দৃষ্টি-ক্ষেপ করিল, তার পর গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

মোটরকারে নগর ভ্রমণ

সেদিন Sightseeing Carএ বসিয়া ডেন্‌ভার নগর দেখিয়া লইয়াছি। আজ স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো দেখিতে বাহির হইলাম। যাতায়াতে প্রায় ৫০ মাইল হইবে—চারি ঘণ্টার পালা। মূল্য ৫৲। প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী ২৫।৩০ জন লোক বসিতে পারে। প্রদর্শক, আরোহীদিগের দিকে মুখ করিয়া, চালকের নিকট উপবেশন করে। তাহার মুখে একটা চোঙ্গা লাগান থাকে। ইহার ভিতর কথা বলিয়া প্রদর্শক সহজেই সকলের নিকটে নিজ বক্তব্য প্রচার করে।

স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো সহরের কয়েকটা রাস্তা পার হওয়া গেল। সহরটা সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এইরূপ সহর পূর্ব্বে আর দেখি নাই। দার্জ্জিলিং, শিমলা ইত্যাদি অঞ্চলে পাহাড় কাটিয়া সমতলভূমি প্রস্তুত করা হয়—তাহার উপর বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে; দূর হইতে সে গৃহগুলিকে সিঁড়ির স্তরবিন্যাসের অনুরূপ দেখায়। কিন্তু স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরের জন্য পাহাড় কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই। তরঙ্গায়িত পর্ব্বতের পৃষ্ঠে, স্কন্ধে, শিরোভাগে এবং পাদদেশে গৃহাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজপথ, উদ্যান, সৌধ, আলোকস্তম্ভ সকলই এই অসমতল ভূমির উপর অবস্থিত। পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষরাজি যেরূপ দেখায়—স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো নগরের অট্টালিকাবলী ঠিক সেইরূপই দেখাইতেছে। যে কোন রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকিলে বুঝিব একবার উঠিতেছি একবার নামিতেছি—আবার উঠিতেছি আবার নামিতেছি। এই কারণে গৃহগুলি তরঙ্গায়িত বোধ হয়—সমস্ত নগরটা যেন গৃহের তরঙ্গস্বরূপ।

ডেন্‌ভার দেখিয়া স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যময় নগরের একটা পরিচয় পাইয়াছিলাম। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো ডেন্‌ভার অপেক্ষা বৃহত্তর। ধনসম্পদের প্রভাবও এখানে বেশী কিন্তু শিকাগো নিউইয়র্ক অপেক্ষা এই নগর বেশী সুশ্রী ও স্বাস্থ্যকর বোধ হইতেছে। ইয়াঙ্কিরা এখানে নীল নভোমণ্ডল, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ, অসমতল পার্ব্বত্যভূমি, বিচিত্র উদ্ভিদ্‌রাজি এবং সুনীল সমুদ্র প্রকৃতির দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে বিদ্যাবল ও ধনবল প্রয়োগপূর্ব্বক ইহারা দুনিয়ার পশ্চিমতম প্রদেশে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রাসাদপুরী দেখিবামাত্র প্রত্যেক ব্যক্তিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

মোটরকার উপসাগরের কিনারায় আসিল। এইখানে ষ্টিমারে চড়িলাম। সাত মাইল সমুদ্রের হাওয়া খাইতে খাইতে অপর পারে পৌঁছিলাম। উপসাগরের ভিতর দুএকখানা রণতরী দেখা গেল। বন্দর রক্ষা করিবার জন্য উহা প্রহরীর কার্য্য করে। ক্ষুদ্র দ্বীপও দুএকটা পথে পড়িল। একটাতে আলোকগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

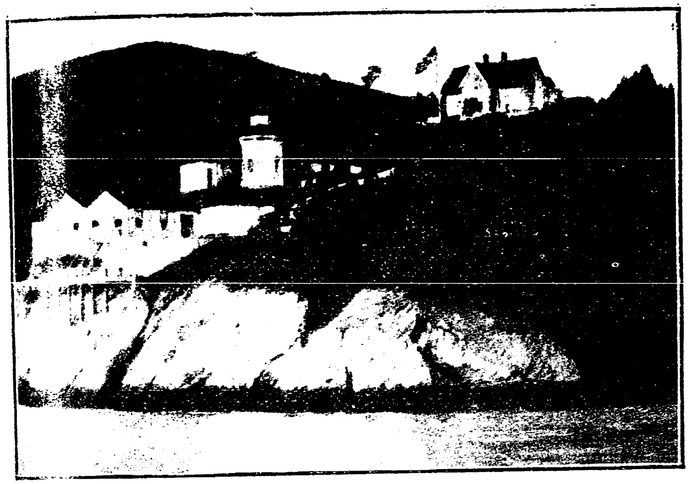

দ্বীপের উপর আলোক-গৃহ

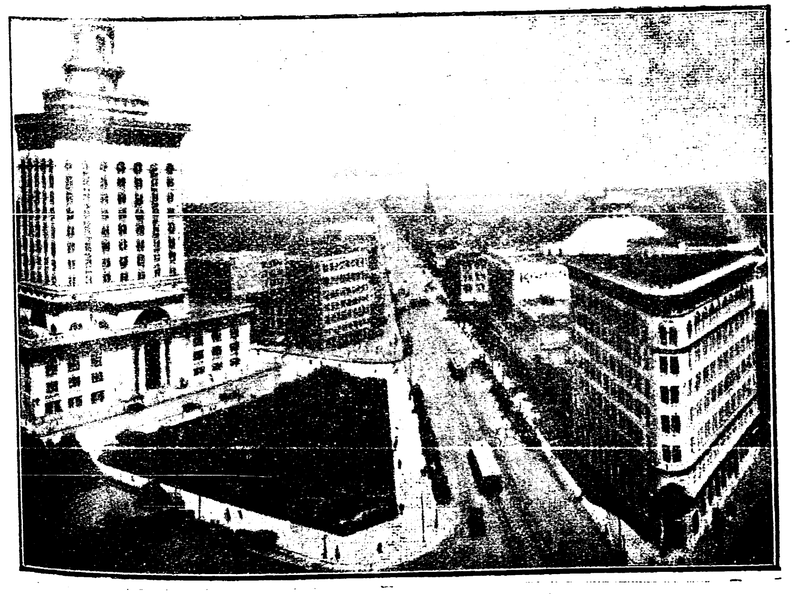

ওক্‌ল্যাণ্ডের কিয়দংশ

ডাঙায় নামিয়া আবার মোটরে বসা গেল। প্রদর্শক-কোম্পানীর ব্যবসায় সুবিস্তৃত—এপারে ওপারে সকল পারেই তাহাদের কার্য্যালয় আছে। গাড়ী ওক্‌ল্যাণ্ড সহরের ভিতর দিয়া চলিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ এবং প্রশস্ত রাজপথ ইয়াঙ্কিস্থানের সর্ব্বত্র দেখিয়াছি—পশ্চিমতম জনপদেও এই সমুদায় লক্ষ্য করিতেছি। ওক্‌ল্যাণ্ডে প্রস্ফুটিত ফুলের বাগান রাস্তার দুইধারে অনেক দেখিলাম। প্রত্যেক গৃহের সঙ্গেই ক্ষুদ্রবৃহৎ উদ্যান সংলগ্ন। সবুজ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের শোভা কালিফর্ণিয়া প্রদেশের প্রারম্ভ হইতেই দেখিতে পাইয়াছি—ওক্‌ল্যাণ্ডে তাহার প্রাচুর্য্য উপলব্ধি করিলাম। সহরের নিতান্ত ব্যবসায়-পাড়া ছাড়াইয়া আসিবার পর যেন কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। নানাবর্ণের পুষ্পরাশি এই অঞ্চলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

ক্রমশঃ বার্কলে নগরের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। সুবিখ্যাত কালিফর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় এই নগরে অবস্থিত। বিলাতের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ যেমন বিদ্যা-নগর, ইয়াঙ্কিস্থানের বার্কলেও সেইরূপ প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ বিদ্যা-নগর। এখানকার আব্-হাওয়ায় শিক্ষাপ্রচার ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠানের স্থান নাই।

ইয়াঙ্কিস্থানের প্রাচ্যতম প্রদেশে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ছাত্রসংখ্যা কলম্বিয়ায় যত আমেরিকার অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত নয়। আজ ইয়াঙ্কিস্থানের পাশ্চাত্যতম প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত। ছাত্রসংখ্যা হিসাবে কলম্বিয়ার পরেই বার্কলের বিশ্ব-বিদ্যালয়, কিন্তু এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনের ভিতর অবস্থিত তাহার সঙ্গে কলম্বিয়ার তুলনা করিতে হইলে লজ্জাবোধ হয়। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটের উপর সেনেট-হাউস, মেডিক্যাল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাদির অবস্থান স্মরণ করিলেই নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মালগুদামসদৃশ ব্যারাক-গৃহগুলির চিত্র কল্পনা করিতে পারা যায়। বিলাতের লীড্‌স্ ও ম্যাঞ্চেষ্টার, স্কট্‌ল্যাণ্ডের এডিনবরা এবং আয়র্লণ্ডের ডাব্‌লিন—এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ও অবস্থান হিসাবে নিতান্তই অবজ্ঞেয়। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজগুলির কোন-কোনটার নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। কিন্তু মোটের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যহিসাবে ইহারাও দুনিয়ার পশ্চিমতম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতপ্রভ। এমন রমণীয় স্থানে জগতের আর-কোন বিদ্যা-মন্দির আছে কি না জানিনা।

একটা পাহাড়ের পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ভবন নির্ম্মিত। সৌধগুলি একটা সুবিস্তৃত উদ্যানের ভিতর স্থাপিত হইয়াছে মনে হয়। অন্যান্য স্থানে আগে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া পরে গাছপালা বাগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্রকৃতি-রচিত বাগানের অভ্যন্তরেই বিদ্যা-মন্দির তৈয়ারী হইয়াছে। পাহাড়ের শিরোভাগ আজ কুয়াশায় আচ্ছন্ন দেখিলাম —অতি বৃহদাকার বৃক্ষ এই পর্ব্বতকে নিবিড় ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

...বিশ্ববিদ্যালয়ের কতি...
...য়া পর্ব্বতের কটিদেশে উ...
...খানে তরুবরসমাবৃত নিভৃ...
...। প্রদর্শকের কথা অনুসা...
...তে নামিলাম। প্রাচীন গ্রীকেরা তাহ...
...ঞ্চ যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিত,
...লিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রণালীতে
...কটা নাট্যমঞ্চ তৈয়ার করিয়াছেন। মঞ্চের
...রে কোন ছাদ নাই, পশ্চাতে কতকগুলি
..., তাহার প্রাচীর মাত্র দেখা যায়। মঞ্চের
...খে অর্দ্ধগোলাকৃতি স্থান—তাহার উপরেও
...ান ছাদ নাই। এই স্থানে দর্শক ও
...াতৃমণ্ডলী উপবেশন করিতে পারে।
...নিলাম এই "গ্রীক থিয়েটারে" যুক্তরাষ্ট্রের
...তিপয় সভাপতি বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।
...্যাডিনয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা
...ই মঞ্চ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

...বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বার্কলে নগরের অন্য
...কে যাওয়া গেল। চারিদিকে ফুলের গাড়ী
...দেখিবার ...
...অংশই প্রাকৃতিক
...ছিলাম, কাজেই এই ...
...ফুলফল দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম না। ইহার ভিতরে জাপানী রীতিতে নির্ম্মিত একটা চা-পানের গৃহ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এখানকার চিত্র-ভবন। এই ভবনে প্রায় পাঁচশত অত্যুচ্চ শ্রেণীর চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। রুষ, ফরাসী, জার্ম্মান, ওলন্দাজ, ইয়াঙ্কি, ইতালীয় ইত্যাদি সকল শিল্পীর কারুকার্য্য এই ভবনে দেখিতে

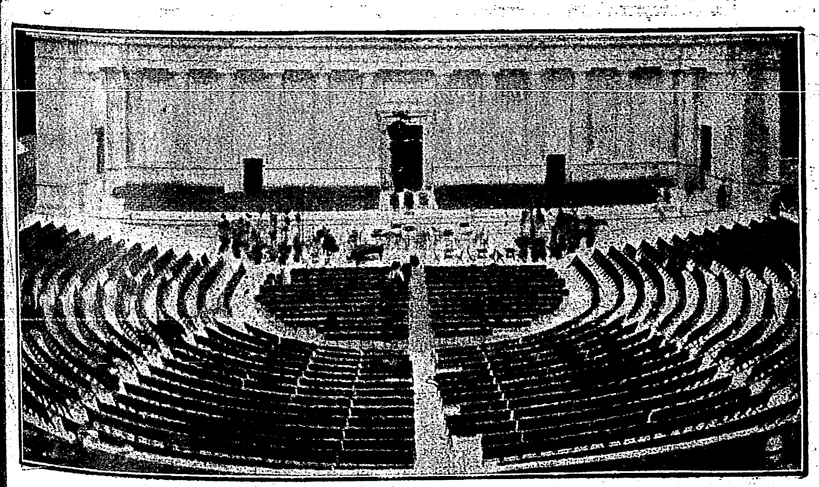

গ্রীক থিয়েটার

TORN AND DAMAGE PAGE(S)



পীডমন্ট বাগানে জাপানী চা-গৃহ

পাইলাম। একমাত্র এই চিত্রগুলি দেখিবার জন্যই একবার এই উদ্যানে আসা উচিত। চিত্রগুলির বর্ণিত বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রদর্শককে চেষ্টিত দেখিলাম।

চিত্র-ভবন হইতে নূতন পথে ফেরি-ঘাটে উপস্থিত হওয়া গেল। ষ্টিমারে বসিয়া দেখিলাম স্যানফ্র্যান্‌সিস্কো হইতে হাজার হাজার নরনারী ষ্টিমারে পার হইয়া আসিতেছে। দিবাভাগে কর্ম্ম করিয়া ইহারা সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিতেছে। হাবড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনদ্বয়েও সন্ধ্যাকালে এই দৃশ্য দেখা যায়। ওক্‌ল্যাণ্ড ও বার্কলে স্যান-ফ্র্যান্‌সিস্কোর উপনগর।

ক্যালিফর্ণিয়ার সম্পদ্

কি দিনে কি রাত্রে প্রদর্শনী-নগরের সৌধগুলি যতবার দেখিতেছি ততবারই মনে হইতেছে যেন অগণিত তাজমহলের মেলা বসান হইয়াছে। প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ যে সমুদায় দ্রব্য থাকা ভিতর সবই দেখিতে তালিকা করিয়া লাভ বৎসরের মধ্যে দুনিয়ার ইত্যাদি বিভাগে যত প্র সে সকলই এখানে স বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা কল-বিশেষ।

দুই তিন বৎসর পূ প্রদর্শনী খোলা হইয়াছি প্রদর্শনী দেখিয়াছেন মেলা না দেখিলে প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীতে কঠিন। প্রত্যেকটাতেই দেখা যায়—কতকগুলি বেশী, অন্য কতকগুলি কাজেই যে কোন দুই বুঝিতে হইলে বিশেষজ্ঞের বিভাগ তলাইয়া দেখা

ওরূপ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার সময়, সুবিধা ও যোগ্যতা বহু লোকের নাই। স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিচক্ষণ ধুরন্ধরেরা এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগের সকল প্রকার খুঁটিনাটি বুঝিবার প্রদর্শনীতে বহুক্ষণ কাটাইয়া থাকেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সাহায্য করেন। ব্যতীত আর এক প্রকার লোক প্রদর্শনী দেখিয়া উপকৃত হন। যাঁহারা শিল্প, ব্যবসায়, বিদ্যালয় ইত্যাদির পরিচালক তাঁহারা নানাবিধ সংগৃহীত দ্রব্যের সাক্ষাৎ পেলে সহজেই ভবিষ্যতে লাভবান্ হইবার উদ্ভাবন করিতে পারেন।

স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোর বিশ্বমেলায় এই দুই শ্রেণীর লোকই নানা দেশ হইতে আসিয়াছে। ইয়াঙ্কিরাও প্রদর্শনীর নানা বিভাগে নিজ নিজ অসম্পূর্ণতাগুলি সংশোধন করিবার প্রণালী চিন্তা করিতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে এই ধরণের বিচক্ষণ লোক একজনও আসেন নাই। এমন কি ভারতবর্ষে আজকাল ছোট-বড় যত প্রদর্শনী খোলা হয় সেগুলি দেখিয়া যথার্থরূপে শিক্ষালাভ করিবার জন্য কয়জন ভারতবাসী চেষ্টা করেন, জানি না। বোধ হয় ভারতীয় প্রদর্শনীসমূহ হইতে দেশীয় লোকের ভিতর যথোচিত শিক্ষাবিস্তার হয় না। বরং ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, জার্ম্মানী ইত্যাদি বিদেশীয় ব্যবসায়ী ও পর্য্যটকেরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় লোকজনের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ভবিষ্যতে দখল করিবার পন্থা বুঝিয়া লন। এলাহাবাদের বিরাট প্রদর্শনী হইতে ভারতবাসীর লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশী হইয়াছে মনে হইতেছে।

স্যানফ্র্যানসিস্কোর এই মেলায় ক্যালি-ফর্ণিয়া প্রদেশের ধাতু-রত্ন-পশু-সম্পদ্ বিশেষ-ভাবেই সংগৃহীত হইবার কথা। যখন যে কেন্দ্রে বিশ্ব-সম্মিলন হয় তখন সেই কেন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদই বিশ্বে সুপ্রচারিত হয়। এইবার ইয়াঙ্কিস্থানের পশ্চিম প্রদেশ এবং বিশেষভাবে ক্যালিফর্ণিয়া সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

নেভাডা পর্ব্বতের শৃঙ্গেই রেলগাড়ী ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে চলিতেছে। তখন এই অঞ্চলের আকর সম্পদ দেখিতে পাইলাম। ক্রমশঃ নিম্নতর ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছিল। তখন মনে হইতেছিল বাঙ্গলা দেশের কথা আর সেই মিশরের কথা—

"এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

* * * *

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
সে যে পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখীর গানে জেগে।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ক্যালিফর্ণিয়া-ভূমির ফুল-বাগান, ফল-বাগান, কৃষিক্ষেত্র, পশু-চারণের মাঠ দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? মাত্র ৪০।৫০ বৎসর হইল এই প্রদেশে বসতিস্থাপন যথার্থভাবে আরব্ধ হইয়াছে। আগামী ৫০ বৎসরের ভিতর এই ধনধান্যপুষ্পভরা জনপদের সমৃদ্ধি কতগুণ বাড়িয়া যাইবে কে বলিতে পারে?

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

প্রদর্শনী-নগরের সুবৃহৎ ক্যালিফর্ণিয়া-ভবনে প্রবেশ করিয়া এই প্রদেশের সকল সম্পদ্ একত্র দেখিয়া লইলাম। লতাপাতা ফুলফল নদনদী পর্ব্বতসাগর ইত্যাদি বিভাগ হইতে উদ্ভাবিত ধনাগমের উপায়সমূহ এই সৌধে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রচুর ধনলাভের সুযোগ আছে তাহা দর্শকগণকে বুঝাইবার জন্য নানা প্রকার বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা বিতরিত হইতেছে। কৃষিকার্য্য ও পশুপালন সম্বন্ধেই লোকজনের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হইল। অশেষবিধ ফলমূল শাকসব্জীর নমুনা দেখিলাম। ফলমূল বহুকাল অবধি তাজা রাখিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলমূলের চাষে বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন করিয়া ক্যালিফর্ণিয়ার প্রথার বার্ব্বাঙ্ক প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীর নিদর্শনসমূহও দেখিতে পাওয়া গেল।

সোনার ক্যালিফর্ণিয়ায় ইয়োরোপের নানা স্থানের নানা সৌন্দর্য্য একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "জমায়ে চাঁদের সুধা বিধি গড়েছিল তায়!" ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনায় এই প্রদেশের কৃষিসম্পদ্ও যথেষ্ট।

ভারতবর্ষের এক প্রদেশসম্বন্ধে আমরা প্রাকৃতিক শোভা ও কৃষিসম্পদ্ নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া থাকি :—

"সবার—সবার হইতে মধুর
যাহার শস্য, যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে
গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে
সুরভিস্নিগ্ধ পবন ধীর!
মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
ধুম্র যাহার তুঙ্গ শির!
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া
ভাসায় যাহার কানন-তীর!
মাধুরী বন্য কুসুমে জানিয়া
ঘুমায় অঙ্গে রমণী-শ্রীর;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে
কে সম মেবার-সুন্দরীর!"

সুতরাং বাঙ্গালী ক্যালিফর্ণিয়ার গৌরব সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

চীনা-টোলা

উত্তর-ভারতের প্রায় সকল সহরেই একটা করিয়া বাঙ্গালী-টোলা আছে। কাশীর বাঙ্গালী-টোলা সুপ্রসিদ্ধ। আমেরিকার বড় বড় সহরে একটা করিয়া চীনা-টোলা দেখিতে পাই। নিউইয়র্ক, শিকাগো এবং স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর চীনা-পাড়াগুলির নাম পর্য্যটক-মাত্রেই শুনিতে পান।

মার্কিন দেশ দুনিয়ার বারইয়ারিতলা—ইয়োরোপ ও এসিয়া দুইদিক হইতেই এখানে লোক আসিয়া বাস করিতেছে। বলাবাহুল্য পশ্চিম জনপদে এসিয়াবাসীর প্রভাবই বেশী। চীনা ও জাপানী নরনারীর সংখ্যা এই অঞ্চলে অত্যধিক—এমন কি কয়েক হাজার ভারতীয় শিখ এবং পাঞ্জাবীও এখানকার অধিবাসী। মার্কিনেরা ইয়োরোপীয় জনগণকে সাদরে গ্রহণ করিতে চাহে, কিন্তু "প্রাচ্য"-দেশীয় লোকের উপনিবেশ-স্থাপন আদৌ পছন্দ করে না। ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় যাহাতে লোক আসিতে না পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্র করিতেছেন। এমন

কি ভারতীয় ছাত্রগণের আগমন এই বিধানে যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ; সুতরাং ভারতবাসীর বিরুদ্ধে আইন জারি করিতে যাইয়া ইয়াঙ্কিদের কোন বাধা পাইতে হয় না। অধিকন্তু ভারতীয় নরনারীর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে অতিশয় অল্প—এই কারণে তাহাদের প্রভাবে ইয়াঙ্কি-সমাজের সুফল কুফল বেশী ঘটে না। কিন্তু চীনা ও জাপানীদের লইয়া মার্কিনদের মহাবিপদ। জাপানকে অসন্তুষ্ট করা যুক্ত-রাষ্ট্রের নিতান্তই ইচ্ছাবিরুদ্ধ—জাপানের ক্ষমতায় ইয়াঙ্কিরা সত্যসত্যই আশঙ্কিত, কাজেই জাপানীদের বিরুদ্ধে আইনজারি করিবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত হইতে হয়। ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে বহু জাপানী বসতিস্থাপন করিয়া বসিয়াছে। ইহাদিগকে যেন তেন প্রকারেণ এখান হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য ক্যালিফর্ণিয়া-রাষ্ট্র অতিশয় চেষ্টিত। জাপানের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া লড়াই বাধিবার আশঙ্কাও কম নয়। কোন কোন ইয়াঙ্কির মুখে শুনিতে পাই—"জাপানীরা যদি ক্যালিফর্ণিয়া দখল করে, তাহা হইলে আমরা নেভাডা পর্ব্বতের পূর্ব্ব অঞ্চলে যাইয়া বাস করিব, —জাপানের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।" জাপানের সঙ্গে মার্কিনদের মন কষাকষি অত্যধিক চলিতেছে। ক্যালিফর্ণিয়া রাষ্ট্র দুএক স্থলে কিছু কাঁচা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা সাম্‌লাইয়া তুলিবার জন্য ফেডারাল রাষ্ট্র যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। যাহা হউক, ইয়াঙ্কিদের জাপান-বিভীষিকা যে কোন মুহূর্ত্তে একটা বিষম আকার ধারণ করিতে পারে। এই জন্যই আজকাল জাপানীতে ও ইয়াঙ্কিতে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সম্মিলন ইত্যাদির বহুবিধ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। কারণ "সেটার যতই অভাব হবে, ততই সেটা বলতে হবে।"

ভারতবাসীর মা-বাপ নাই; কাজেই মার্কিন রাষ্ট্র এক কলমের খোঁচায় ভারতীয় সমস্যা সমাধান করিতে পারেন। চীন স্বাধীন বটে এবং আজকাল স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্র-শাসনের পর হইতে চীনারা ইয়াঙ্কিদের মহাবন্ধু হইয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু চীন অতি দুর্ব্বল—দুনিয়ার বাজার স্বরূপ—স্বাতন্ত্র্যহীন মেরুদণ্ডহীন "কোম্পানীর নাগড়া"। সেদিন পর্য্যন্ত মিশরের যে দুরবস্থা ছিল, তুরস্কের আজও যে দুরবস্থা রহিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের যে দুরবস্থা ছিল, চীনের এখন সেই দুরবস্থা। শক্তিহীন চীন-সমাজ রুশ, ইংরাজ, জার্ম্মাণ, জাপানী ও ইয়াঙ্কি এই পাঁচজাতির প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কাজেই চীনদেশে আজকাল চীনাদের গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া কঠিন। চীনের হাটে কখনও ইংরাজের গলা, কখনও ইয়াঙ্কির গলা, কখনও জার্ম্মানের গলা শুনিতে পাই—চীনাদের গলা শুনিতে কখনও পাই কিনা সন্দেহ! এই হ-জ-ব-র-ল-য়ের ভিতর ইয়াঙ্কিরা নিজেদের প্রতিপত্তি কিছু বেশী রকমেই স্থাপিত করিয়া লইয়াছে। চীনারাও ইয়াঙ্কি-দিগকে খুব ভালবাসে—ইয়াঙ্কি-সমাজকে সকল বিষয়েই ইহারা গুরু ও পথপ্রদর্শক এবং উদ্ধারকর্ত্তা বিবেচনা করিতেছে।

ইয়াঙ্কিরা যুবক চীনের হৃদয়মধ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ হিসাবে চীনাদের সঙ্গে ইয়াঙ্কিদের লেন্-দেন্ বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই চলিয়া থাকে। কিন্তু রক্তসংমিশ্রণ, শ্রমজীবি-সমস্যা, পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে ইয়াঙ্কিরা চীনাদিগকেও ভারতীয় ও জাপানী হইতে পৃথক বিবেচনা করে না। এইজন্য চীনা নরনারীগণকে ইয়াঙ্কিস্থানে দলে দলে প্রবেশ না করিতে দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বহুবিধ আইন আছে। ইয়াঙ্কিরা ভারতবাসীদের সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখে না—জাপানীদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু বিবেচনা করে—ও চীনাগণকে বন্ধুভাবে আদর করে এবং তাহাদের পীঠে হাত বুলাইয়া কাজ হাসিল করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই তিন জাতীয় লোকের কোন ব্যক্তিকেই ইহারা মার্কিনদেশে বসতি-স্থাপনের জন্য আহ্বান করিতে চাহে না। সকল এসিয়াবাসীর উপরেই ইহাদের ঘৃণা অত্যধিক।

বর্ত্তমানে চীনা-টাউন বা চীনা-টোলা ইয়াঙ্কিস্থানের বড় বড় নগরমাত্রেই আছে—বিগত ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে এইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই এক্ষণে এগুলি কোন আইনের জোরে উঠাইয়া দেওয়া সহজ নয়। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে চীনাদের আমদানী কম হয়, তাহার জন্য বিশেষ কতকগুলি Immigration Rules প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতার চীনা-বাজারে চীনারাই প্রধানতঃ এবং বিশেষভাবে মুচিগিরি করে। ছুতার-মিস্ত্রির কাজেও চীনাদিগকে আমরা দেখিতে পাই। আমেরিকার চীনা-টোলাগুলি কেবলমাত্র ছুতারপাড়া বা মুচিপাড়া মাত্র নয়। এখানকার নগরের চীনাপাড়ায় অন্যান্য পাড়ার ন্যায় ধনীদরিদ্র, শিল্পী, দোকানদার, দর্জ্জী, হোটেলওয়ালা ব্যাঙ্কার, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই থাকে। নিউইয়র্ক, শিকাগো, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো ইত্যাদি নগরে নিগ্রোপাড়া, ইহুদিপাড়া, জার্ম্মানপাড়া, পোলপাড়া, ইতালীপাড়া ইত্যাদি নানাজাতির বড় বড় পাড়া আছে। প্রত্যেক পাড়াতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের

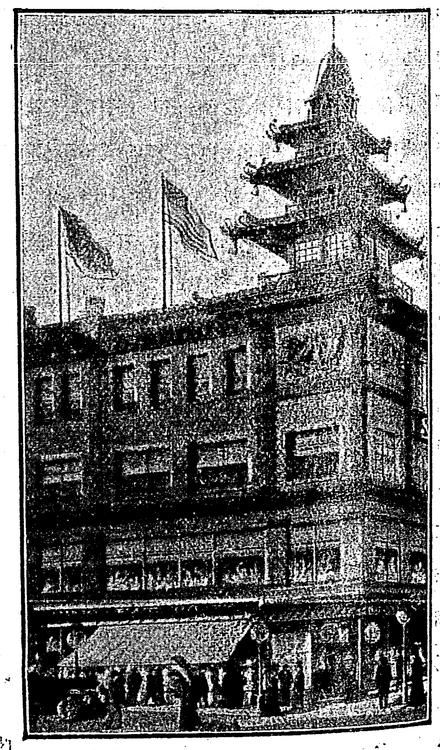

চীনা-দোকান

াকই বাস করে। চীনাপাড়াতেও ঠিক ইরূপ চীনাসমাজের সকল প্রকার লোক খিতে পাওয়া যায়। চীনাদের মন্দির, টেল, নাচঘর, থিয়েটার, ব্যাঙ্ক, বিদ্যালয়, াসমিতি ইত্যাদি সকলেরই প্রতিষ্ঠা চীনা-ালায় আছে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর চীনা-ালার অধিবাসীরা চীনা ভাষায় টেলিফোন্ ন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। এইজন্য িফোন্-কোম্পানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া-ন। এই সকল কারণে পর্য্যটকেরা ী-টোলায় বেড়াইতে আসা একটা অবশ্য-র্য্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য করে।

চীনা-টাউন দেখিবার জন্য নগর-প্রদর্শক-াম্পানীর মোটরকারে বসা গেল। নৈশ-াজনের পর বাহির হইলাম। মূল্য দিতে ল তিনটাকা। যে গাড়ীতে বসিলাম, ার ভিতর প্রায় পঞ্চাশজন পুরুষ ও ী। এইরূপ গাড়ীভরা 'টুরিষ্টে'র সঙ্গে ায় অনেকবার দেখা হইল।

নগর প্রদর্শনী-কার্য্য এদেশের একটা শেষ ব্যবসায়। এজন্য কোম্পানী সকল কার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া থাকে। ান্ কোন্ বাড়ীতে যাইতে হইবে—কোন্ ান্ লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে বে—কোন্ কোন্ পরিবারের পরিচয় ওয়া হইবে—কোথায় কোন্ ব্যক্তি বক্তা ও র্শকের কার্য্য করিবেন—এই সকল বিষয়ই টি ব্যবসায়ের নিয়মে নির্দ্ধারিত করা হয়। টকেরা কোম্পানীর আশ্রয় লইয়া নগরস্থ ান কোন জিনিষ অতি সহজে বুঝিতে রেন। এমন কি ফ্যাক্‌টরী, বিদ্যালয়, াসমিতি ও কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেখা সম্বন্ধেও প্রদর্শক-কোম্পানী সাহায্য করিয়া থাকে।

গাড়ী নগরের নানা নৈশ-দৃশ্যের ভিতর দিয়া এক চীনা-মন্দিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মন্দির দেখাইয়া বক্তা বলিলেন—"কয়েক বৎসর হইল চীনাদের মন্দির এই নগরের অন্যান্য অট্টালিকার সঙ্গে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ১৯০৬ সালের ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে করুন। কিন্তু এই মন্দিরে ধনবান্ চীনাদের আসা-যাওয়া আছে। কাজেই অল্পকালের ভিতরই কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। চীন-দেশ হইতে সকল প্রকার মাল-মসলা ও উপকরণ আনা হইয়াছিল।"

মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বক্তা বেশ সরসভাবে চীনাদের ধর্ম্ম, পূজা, দেব-দেবী, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-পদ্ধতি, ও শবসৎকার ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প করিলেন। মন্দিরের ভিতরকার কারুকার্য্য, মূর্ত্তি, সিংহাসন ইত্যাদির ভিতর উচ্চ অঙ্গের শিল্পকর্ম্ম বিদ্যমান। বক্তৃতা হইতে দর্শকেরা তাহাও বুঝিতে পারিল। বর্ত্তমানে খ্রীষ্টানদের পক্ষে দেবতাপূজা, আরতি, দেবনিদ্রার প্রার্থনা ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কাজেই চীনা-ধর্ম্মপ্রণালী ইহাদের নিকট অদ্ভুত বোধ হইল। আমি দেখিলাম মূর্ত্তি-পূজা যে যে দেশে আছে, সেই সকল দেশেই পূজা-প্রণালীও মোটের উপর এক প্রকার। ভারতীয় জনগণ চীনা-মন্দিরের আসবাব-অনুষ্ঠান ও রীতি-পদ্ধতিতে নিজেদের সুপরিচিত বস্তুই দেখিতে পাইবে। কাঁশর-ঘণ্টা বাজাইয়া চীনাপুরোহিত দেবতার

নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া থাকেন। দিবারাত্র আগুণ জ্বালাইয়া আলোক-রক্ষা করা চীনারা বিশেষ আবশ্যক বোধ করে। শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা অশৌচের লক্ষণ বিবেচিত হয়। দেবতার "চালী"তে অসংখ্য মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিলাম। চালী আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া। এই সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনের ভিতরে ও উপরে বহু স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া সাধারণ হিন্দুরা তাঁহাদিগকে সহজেই তেত্রিশকোটি দেবদেবীর অন্যতম বিবেচনা করিবে। বাস্তবিক পক্ষে মূর্ত্তিগুলির আকার যদি চীনাজাতির অনুরূপ না হইত, শিক্ষিত হিন্দুও তাহা হইলে এইরূপই বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেন। অন্ততঃ, যাঁহারা বহুদেবদেবীর মূর্ত্তিতে মঙ্গোলিয় জাতির আকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা চীনাধর্ম্মে হিন্দুপ্রভাব ও হিন্দুধর্ম্মে চীনা-প্রভাব বুঝিতে পারিবেন। মূর্ত্তিগঠনশিল্পে চীনা এবং হিন্দুর সাম্যও অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়।

মন্দির দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া যাইতে হইল। চীনাদের করে বড় বড় দোকানে প্রবেশ করিলাম। চীনা-পরিবারের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগু কাটান গেল। চীনা বালকবালিকারা গান শুনাইল। অবশেষে এক চীনা আসিলাম। গান-বাজনা হইতে লাগি চীনাবালিকারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনামূ চা-পান করাইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যে এক "পুরিয়া" চা উপহার পাইলাম।

বক্তা মাঝে মাঝে চীনের প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে The Great Republic of Chi বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইহার মুখে শুনিলা "চীনারা অত্যন্ত সাধু। ইহারা রসিদ না লই টাকা ধার দেয়। ইহাদের কথার দাম খুব বেশী

ঘণ্টাতিনেক আনন্দের সহিত কা গেল। দলের মধ্যে একজন ইয়াঙ্কি-রম সঙ্গে আলাপ হইল। গৃহ নেব্রাস্কা-প্রদেশে ইনি পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকা

সাক্ষী

(গান)

পাখী আমার সাক্ষী আছে, ঊষা-অরুণ এসেছিল।
কুঞ্জতলে, দীঘির জলে হাসির দীপ্তি ভেসেছিল।
আঁধার ঘরে আমি একা! আমাকে না দিল দেখা!
ভুলে গেছে, আগে আমায় কত ভালবেসেছিল।

শিশির-ধোয়া কুসুমরাশির গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল;
তখন আমি দুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে;
আমার দুঃখে ডাকল পাখী, বাতাস একটু শ্বসেছিল।
জান্‌ত তারা আগে মোরে কত ভালবেসেছিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কুসুম

ক

সে পতিতা। জীবনের ক্ষণিক ভ্রমেতে
—বিধাতার বিধানে সে পতিতা।.....
পঙ্কের ভিতরে পদ্মের মতই কুসুম
য়া উঠিয়াছিল।

* * *

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিবার
পথের ধারের বারান্দায় কুসুম
র রূপের প্রদীপ উজল করিয়া বসিয়া
ত। তাহার প্রাণ তখন কাঁদিত,
হাসিত!

রাস্তার লোকগুলা যেন 'ঊর্দ্ধমুণ্ড' ব্রত
করিয়াছে,—সকলের চোখ তাহার
র! তাহাদের সেই নিষ্ঠুর, ক্ষুধিত, ও
দৃষ্টির মাঝে কুসুম, বিশ্বের নারী-
র প্রতি মৌন ধিক্কারকে ফুটিয়া
ত দেখিত পাইত।

রাস্তায় গাড়ীর পর গাড়ী ছুটিতেছে।
একখানা গাড়ীর খড়খড়ি-কপাট সব
া। কিন্তু কুসুম দেখিত, খড়খড়ির ফাঁকে
কুললক্ষ্মীদের কৌতূহলী দৃষ্টি বাহিরের
আলোর দিকে একাগ্র হইয়া আছে।
দৃষ্টি কুসুমের উপর পড়িলেই সচকিত
উঠিত। কুসুমের মনে হইত, সে
নয়নের নির্ম্মল দৃষ্টি যেন বিদ্যুতাগ্নির
তার দেহ-মনকে ঝল্‌ষাইয়া দিয়া
ছে। মরমে মরিয়া কুসুম, বারান্দার
মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিত।
ভিতর হইতে তাহার নারী-প্রাণ
যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিত, "এ রূপের প্রদীপ নিবিয়ে দাও,—ওগো কঙ্কালের বাঁধন খুলে দাও!"

খ

বারান্দা হইতে কুসুম সেদিন উৎকণ্ঠিত হইয়া দেখিল, ট্রামগাড়ী থেকে নাবিতে গিয়া একটি ভদ্রলোক পা ফস্কাইয়া রাস্তার উপরে পড়িয়া গেলেন। গাড়ীসুদ্ধ লোক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল,—কিন্তু গাড়ী না থামাইয়া চালক আরও জোরে গাড়ী চালাইয়া দিল।

পাথরে মাথা ঠুকিয়া বৃদ্ধ একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চারিপাশে ক্রমেই লোক জড় হইতে লাগিল।

একজন বলিল, "ওহে, মাথা দিয়ে রক্ত পড়্‌চে যে!"

আর একজন বলিল, "মরে যায় নি ত?"

আর একজন বলিল, "উঁহু!"

আর একজন বলিল, "মরেনি, কিন্তু মর্‌তে কতক্ষণ! চলহে, এখনি পুলিশ-টুলিস এসে পড়বে, আর সাক্ষী মেনে থানায় ধরে নিয়ে যাবে!"

বারান্দার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আকুল-চোখে কুসুম দেখিল, সবাই গোলমালই করিতেছে, বৃদ্ধকে সাহায্য করা কাহারও ইচ্ছা নয়!

কুসুম আর থির্ থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি উপর হইতে নামিয়া আসিল।

ভিড় ঠেলিয়া সে ভিতরে গেল। অচেতন বৃদ্ধের দিকে একবার চাহিয়া, কুসুম বলিল, "আপনারা এঁকে দয়া করে আমার ঘরে তুলে দিয়ে আস্‌বেন? নৈলে ইনি মারা যাবেন।"

তিন-চারজন লোক ছুটিয়া আসিল।

ভিড়ের ভিতরে ফিস্‌ফিস্ করিয়া একজন বলিল, "বুড়োটা এর কে রে?"

আর একজন বলিল, "হেঁঃ! তা আর বুঝ্‌তে পার্‌চ না ম্যাড়াকান্ত?"—সে একটা অর্থপূর্ণ ঈশারা করিল। অনেকেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কুসুম সে সব কাণেও তুলিল না। চোখ নামাইয়া সে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

চারজন লোকে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে তুলিয়া ধরিল। তখনও তাঁর জ্ঞান হয় নাই; মাথায় রক্তপড়াও বন্ধ হয় নাই। তাঁর মুখ একদিকে হেলিয়া আছে,—হাত দুখানি অসহায়-ভাবে দু'দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুসুম আস্তে আস্তে হাতদুটি আবার বৃদ্ধের বুকের উপরে তুলিয়া দিল।

পিছন হইতে কে-একটা অসভ্য উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যত্ন কর্‌বার এমন মনের মানুষ পেলে আমিও বাবা, দিনে দুশোবার ট্রাম থেকে পড়ে যেতে রাজী আছি!"

গ

একরাত একদিন গিয়াছে,—বৃদ্ধ তেমনি অজ্ঞান।

কুসুম একরকম খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে।

সে নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া বৃদ্ধের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিয়াছে; রাত্রে জাগিয়া, বিছানার পাশে বসিয়া তাঁর পাখার হাওয়া করিয়াছে। বাড়ীর একজন ডাক্তার থাকিত, কুসুম তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়াছিল।

কিন্তু সকাল গেল, বিকাল গেল—বৃদ্ধ রোগীত এখনো চোখ মেলিয়া চাহিল না! কুসুম ভাবনায় পড়িল।

সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়া কুসুম দেখিল, গা যেন আগুন!

ভয় পাইয়া তখনি সে চাকরকে এক নামজাদা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে বলিল।

ডাক্তার আসিল। সে বয়সে যুবক, সবে বিলাত হইতে ফিরিয়াছে।

পরীক্ষার পর ডাক্তার বলিল, "অবস্থা বড় ভাল নয়।"

কুসুম কাতরে বলিল, "তবে কি হবে?"

"ভাল করে চিকিৎসা হলে, বিশেষ কোন ভয় নেই।"

রোগীর মাথায় 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া 'প্রেস্‌ক্রিপসন্' লিখিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম, ডাক্তারের হাতে 'ভিজিটে' টাকা কটা গুঁজিয়া দিল।

আঙ্গুল দিয়া টাকাগুলি অনুভব করিতে করিতে কুসুমের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিল, "ইনি তোমার কে?"

কুসুম কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, তার আগেই ডাক্তার আবার বলিল, "বুঝি—"

ডাক্তার কি বলিবে, সেটা আন্দাজ থাকিতেই আন্দাজ করিয়া তাহার

শেষ না-হইতে-হইতেই কুসুম সবেগে মাথা-নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, না!"

"তবে?"

কুসুম অল্প দু-চার কথায় সব বুঝাইয়া দিল।

ডাক্তার খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল, "দেখ, তুমি এক কাজ কর। এঁকে কাল সকালেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। সেখানে ভাল চিকিৎসাও হবে, আর হঠাৎ কিছু হলে তোমারও কোন দায়দোষ থাকবে না।"

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ডাক্তারের কথা একমনে শুনিতেছিল। এখন, হঠাৎ সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "আমিও তাই বলি ডাক্তার-বাবু! ছাখদিকিন্, কোথাকার আপদ কার ঘাড়ে এসে পড়্‌ল! ও ছুঁড়ীর মতিচ্ছন্ন হয়েছে,—আমার কথাতে কিছুতেই ও কাণ দাত্‌বে না। আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় কোনরকমে দুটাকা-পাঁচটাকা ঘরে আসে, তা ও হ্যানরে ত্যানরে, রুগীরে ডাক্তার রে, ওষুধ রে পত্তি রে,—ভালমানুষের ওসব কি পোষায়, না ভাল দ্যাখায়? তা তুই—"

কোনরকম উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনমনে সে গড়্‌গড়্ করিয়া বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা তুই থাম্ বল্‌চি!"

"থাম্‌ব? কেন থাম্‌ব? হক্ কথা বল্‌ব, তা—"

"ফের্ যদি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ কর্‌বি মা, তাহলে এই ঘটি দিয়ে—" বলিতে বলিতে কুসুম জলের ঘটির দিকে হাত বাড়াইল।

কুসুমের মা ভয় পাইয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল; এবং সেখান হইতে অকথ্য ভাষায় মেয়েকে গালি পাড়িতে লাগিল।

সেদিকে কাণ না পাতিয়া কুসুম, ডাক্তারকে বলিল, "এঁর জ্ঞান হবে কখন্?"

ডাক্তার এতক্ষণ চুপ্‌টি করিয়া কি-এক চোখে কুসুমের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "আজ রাতেই জ্ঞান হতে পারে। তবে, বলাও যায় না",—তারপর হাত বাড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টুপীটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তবে, আমি এখন চল্লম।"

"আসুন,"—কুসুম, ডাক্তারকে নমস্কার করিল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া ডাক্তার বলিল, "দেখ, তোমার 'ভিজিটে'র টাকা ফিরিয়ে নাও।"

কুসুম, বিস্মিতস্বরে বলিল, "কেন?"

ডাক্তার স্নিগ্ধচোখে কুসুমের চকিত চোখের দিকে চাহিয়া, মৃদু বলিল, "না।"

কুসুম অত্যন্ত সন্দেহ ও বিরক্তির সহিত কহিল, "কেন নেবেন না, বলুন আপনি!"

কুসুমের মনের ভাব বুঝিয়া ডাক্তার মুখ টিপিয়া নীরব-হাস্য করিল। তারপর হাতের টাকাগুলো ঝন্‌ঝন্-শব্দে বিছানার উপরে ছুঁড়িয়া দিয়া, জুতা মস্‌মস্ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম খানিকটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। আপনমনে অস্ফুট ও দুঃখিত কণ্ঠে বলিল, "এমন পোড়া মন নিয়ে সংসারে এসেচি যে, সাধুকেও সন্দেহ হয়!"

ঘ

অনেক রাতে রোগীর জ্ঞান হইল।

পাশ ফিরিয়া, থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "বুক জ্বলে যাচ্চে—একটু জল।"

পাখার বাতাস করিতে করিতে তখন কুসুমের সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। রোগীর গলা শুনিয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া সে উঠিয়া বসিল। তাড়াতাড়ি কুঁজো হইতে একটা কাঁচের গেলাসে জল গড়াইয়া সে রোগীর মুখের কাছে ধরিল।

জলপান করিয়া রোগী আরাম পাইলেন। কুসুম তাঁহার তপ্ত কপালে আপনার ঠাণ্ডা হাতদুখানি আল্‌ততাবে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

"ওঃ! বুক জ্বলে যাচ্ছে, বুক জ্বলে যাচ্ছে!

কুসুম তখনি রোগীর বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। তিনি "আঃ" বলিয়া চোখ বুজিলেন।

খানিক পরে আবার তাঁহার তৃষ্ণা পাইল। কুসুম আবার জল দিল।

রোগী খানিকক্ষণ ঝিমন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একবার জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কে? মা সুধা?"

মুখ ফিরাইয়া কুসুম বলিল, "না, না! আমি পোড়াকপালী!"

রোগী চোখ মুদিয়া আপনা-আপনি বলিলেন, "এত রাত অবধি জেগে আছিস মা!"

মা! সে কি কথা, সে কি সুর!—কুসুমের সারা বুক ভরিয়া উঠিল। খাটে পরে মাথা রাখিয়া সে একমনে, সে সুর আপন মনের মধ্যে উল্টাইয়া-পাল্টাই শুনিতে লাগিল।

তার বোধ হইল, সে যেন এই বি বৃদ্ধের আপন কন্যা! বাবা যে মে কুসুম ত একথা কখনই জানে নাই,—আ যেন তারই একটা অজানা আনন্দের আভা প্রাণে তার জাগিয়া উঠিল।

হঠাৎ ঘরের দরজায় বাহির হই করাঘাত হইল।

কে ডাকিল, "কুসুম!"

কুসুম শুনিয়াও শুনিল না। সে তখ বুঝি মা-ডাক্ শুনিতেছে!

"কুসুম!—অ আমার কুসুমকলি!"

কুসুম চুপ।

"ও কুসুম, শুন্‌চ?"—সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুক বাজ্‌খাই গলায় একটা গান ধরি বসিল। সে ত গান নয়—যেন ষাঁড়ে ডাক্!

এবারে কুসুমের মনে ভারি ভয় হই লাগিল,—রোগী যদি শুনিতে পান?

"(হঠাৎ গান থামাইয়া) ওগো কুসু —ও—" কিন্তু কথা শেষ হইতে হইতেই হঠাৎ নীরবে দরজাটা খুলি গেল এবং বিদ্যুতের মত বাহিরে বাড়াইয়া নিম্ন অথচ তীব্রস্বরে কুসুম বলি "ফের্ যদি কুসুম কুসুম করবে, তাহ ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব। বেরো এখান থেকে—।

যেমন সহসা দরজাটা খুলিয়াছিল তেম সহসা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

ঙ

পরদিনের সন্ধ্যাবেলা। কুসুম জানালার ছে একলাটি বসিয়াছিল।

আজ সকালে রোগীর জ্বর হঠাৎ ড়িয়া উঠাতে কুসুম ভয় পাইয়া অনিচ্ছা- ও রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া াছে। না দিয়া আর উপায় কি?

আপন জীবনের মলিনতা, কুসুমকে -সময়েই কাতর করিয়া রাখিত। এই নতার ভিতরে থাকিয়াও, সে যে একটা ল কাজ করিতে পারিয়াছে, এটা ভাবিয়াও তার সন্তোষ ও পুলকে পূরিয়া উঠিতে- ল।

আর, রোগীর উপরে তার কেমন টা মায়াও পড়িয়া গিয়াছিল। রোগীর ই রোগকাতর মুখখানি এখনও তার ণের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল। দিনের ভিতরে চার-পাঁচবার চাকর ঠাইয়া কুসুম রোগীর খবর লইয়াছে। নিয়াছে যে, রোগীর বাড়ীর লোকেরা মন করিয়া সংবাদ পাইয়া হাসপাতালে সিয়াছে।

* * *

তিন-চারদিন পরে শুনিল, রোগীর জ্বর হইয়াছে, কাল তিনি নিজের বাড়ীতে রিবেন।

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কুসুম বানকে ধন্যবাদ দিল। ঠিক করিল আজই রোগীকে একবার দেখিতে যাইবে।

চ

হাসপাতালের সুমুখে আসিয়া কুসুম ড়ী হইতে নামিল। ফুলদার্ রেশমী চাদরখানি মাথার উপরে টানিয়া দিয়া চাকরের সঙ্গে চলিল। চাকর তাহাকে রোগীর ঘর চিনাইয়া দিল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া কুসুম ভিতরে ঢুকিল।

একটি বালিসে ঠেসান্ দিয়া বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। পাশে একটি যুবক ও একটি বয়স্কা রমণী। বৃদ্ধ কি কথা কহিতেছিলেন,—হঠাৎ কুসুমকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

কুসুম সঙ্কুচিতভাবে আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধের পায়ে মাথা ছোঁয়াইয়া ভক্তিমতী কন্যার মত প্রণাম করিল।

কুসুমের দিকে চাহিয়া বিস্মিত বৃদ্ধ বলিলেন, "কে গা তুমি?"

কুসুম মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে চিনতে পার্‌ছেন না বাবা?"

ভাল করিয়া কুসুমের মুখ দেখিতে-দেখিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "হুঁ, চিনি-চিনি কর্‌চি বটে! বোধ হয়—বোধ হয়, অসুখের সময়ে তোমাকে কোথায় দেখেচি। তাই নয় কি?"

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

"রোসো—রোসো, মনে পড়েচে। তুমি কি আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলে, আমাকে জল খেতে দিয়েছিলে?"

"ট্রাম থেকে পড়ে গেলে পর আপনাকে আমি আমার ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আমার বাড়ীতে দু-রাত ছিলেন। তারপর আপনার জ্বর বেড়ে ওঠাতে আমি ভয় পেয়ে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দি। আপনি ভাল আছেন শুনে একবার দেখে যেতে এসেচি।"

বৃদ্ধ মুখ নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর, কুসুমের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার খরচোখে দেখিয়া লইয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তোমার ঘরে, তোমার হাতে আমি জল খেয়েচি,—বল্-কি, অ্যাঁ!"

বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া কুসুম একেবারে থ হইয়া গেল।

তীব্রস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, আরও মনে পড়্চে। তুমি আমাকে দুধ আর সাবুও খেতে দিয়েছিলে।" একটু থামিয়া হঠাৎ বিছানার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া, উগ্রকণ্ঠে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন, "গণিকা তুই,—জানিস্, আমি ব্রাহ্মণ!"

কুসুমের মাথা হেঁট হইয়া গেল।

"আমার জাত মেরেচিস্! তার চেয়ে আমি মরে গেলাম না কেন, আমি মরে গেলাম না কেন!—পাপিষ্ঠা, আবার কি কর্‌তে এখানে এসেচিস্ তুই?"

কুসুম কিছু বলিতে পারিল না। আড়ষ্ট ও জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ কর্কশস্বরে বলিলেন, "কথা ক'! বল্, কি চাস্ তুই? বখ্‌শিষ্?"

বখ্‌শিষ্!—কুসুমকে ঠিক যেন কে একটা ধাক্কা মারিল। গর্ব্বিতভাবে হঠাৎ মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "হাঁ!"

বালিশের তলা থেকে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া, বৃদ্ধ অবজ্ঞা ভরে কুসুমের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। নোটখানা কুসুমের গায়ে লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

কুসুম হেঁট হইয়া নোটখানা তুলিয়া লইল। তারপর কোন দিকে না-চাহিয়া নতমুখে দৃঢ়পদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কুসুম, রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা খোঁড়া ভিখারী হাত পাতিয়া বলিল, "মা কিছু ভিক্ষে দাও মা!"

কুসুম অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নোটখানা ভিখারীর হাতে গুঁজিয়া দিল।

ভিখারী প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর কুসুমের পায়ের তলায় পড়িয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিল, "জয় হোক্ রাজা-মা,—জয় হোক্!"

কিন্তু, সে জয়ধ্বনি কুসুমের কাণে প্রবেশ করিল না। বধির হইয়া সে রৌদ্রদীপ্ত আকাশের অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিল,—হায়, তাহার অশ্রু-অন্ধ চোখে বিশ্ব আজ অন্ধকার—অন্ধকার!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভাষা-সংস্কার-বিচার

দিনকার-দিন বাঙ্গালা ভাষার বেশ আদর বাড়িয়াছে; যাঁহাদের সুশিক্ষা আছে, সদমর্য্যাদা আছে, তাঁহাদের অনেকে এখন বাঙ্গালায় রচনা করা কিংবা বাঙ্গালা-সাহিত্য পড়া বিশেষ লজ্জার কথা মনে করেন না। বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা বাড়িয়াছে বলিয়াই, কিরূপ ভাষায় লিখিতে হইবে বা রচনা-রীতি কিরূপ হইবে প্রভৃতি বিষয় লইয়া, অনেক আলোচনা চলিতেছে। ভাষা এবং সাহিত্যকে উন্নত করিবার উপায়-নির্দ্ধারণই যখন সকলের উদ্দেশ্য, তখন এ বিষয়ের আলোচনার সময়ে কেহ যেন মতভেদের জন্য ধীরতা না হারাই।

একবার শুনিয়াছিলাম যে কোন কোন সুধী ব্যক্তি নাকি আমাদের সাহিত্যে হুতুমি বাঙ্গালা চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং নিজেরা ঐ রীতিতে রচনা প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহাদের নামে এই কথাটি রটিয়াছিল, তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া এবং তাঁহাদের মুখেই তাঁহাদের রচনা-পাঠ শুনিয়া বুঝিলাম, কথাটি মিথ্যা। হইতে পারে, যাঁহাদের নাম শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখন যখন সংবাদপত্র বাড়িতেছে, সাহিত্যমুকুর (magazine) বাড়িতেছে, নানা শ্রেণীর পুস্তকের সংখ্যা বাড়িতেছে, এবং লেখক ও পাঠকদলের বৃদ্ধির সঙ্গে নানা মুনির নানা মত জানিবার সম্ভাবনা আছে, তখন সাহিত্যের আদর্শ-ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

সাহিত্যে যদি শব্দগুলিকে জনসাধারণের উচ্চারণের অনুরূপ মূর্ত্তিতে ব্যবহার করিতে হয়, অর্থাৎ যদি হুতুমি ভাষাকে চূড়ান্ত হুতুমি করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে জমিদারি সেরেস্তার মুহুরি এবং আদালতের মোক্তারদিগকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক করিতে হয়। আদর্শ-ভাষা চালাইবার জন্য যদি একখানা পত্রিকার প্রয়োজন হয়, তবে এইভাবে তাহার বিজ্ঞাপন দিলে চলে:—"আম্রা শিগ্‌গির অ্যাক্ লতুন কাগোজ চালাবো, ও তার্ কত্তা কোর্বো জগোবন্ধু বিদ্দেসাগোর্‌কে, আর সহোকারি কোর্বো ওতুল চন্দোর্ বিস্‌সেস্‌কে। চোত্তিরের তিরিশের মোদ্‌ধে বারো আনা না পেলে কাক্‌কেও কাগোজ দোবো না। আম্রা জোচ্চোর নৈ, তা জোতিন্দির্ মিত্তিরের মোতো ভদ্দোর বেক্তিরে বোল্‌বেন। ভালো জে লিখ্‌বো, তার্ত্তো ভাব্‌না নেই। ঈতি ছ্রি গং-আ নারান্ রোক্‌খিৎ। সাকিন্ কোলকেতা ত্যারো নোম্‌বোর পেল্লাদ মোল্লিকের গোলি।"

কেহ যদি বলেন যে তিনি ঠিক জন-সাধারণের উচ্চারণ ধরিবার জন্য আদম-সুমারির বিবরণ দেখিয়া অধিকসংখ্যক লোকের হিসাব লইবেন না, কেবল তাঁহার নিজের দলের কয়েকজন ভদ্রলোকের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া চলিবেন, তাহা হইলেও গোল

মেটে না। সকলে না হয় একটা নির্দ্দিষ্ট দলকে আদর্শ ভদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে যে আবার সেই প্রাচীন "সাধু বনাম অসাধু"র কথা তুলিতে হয়। পাকে চক্রে সকলকেই যখন একটা সাধুভাষা খাড়া করিতে হইতেছে, তখন সাধু কথাটাকে তামাসার জিনিস না করিয়া, কে সাধু কে অসাধু তাহার বিচার করিলেই ভাল হয়। এই বিচারের সুবিধার জন্য একটুখানি ইংরেজি-ভাষার দৃষ্টান্ত ও নজীর দিতে হইবে; কারণ প্রথমতঃ এই বিচারের জন্য অন্য একটি উন্নত ও লোক-ব্যবহৃত ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ তুলনা করিবার প্রয়োজন আছে, এবং দ্বিতীয়তঃ ভাষা-বিজ্ঞানটি ইউরোপীয় এবং উহার মূল সূত্রগুলি খাটাইয়া যে সকল ভাষার উন্নতি এবং ক্ষয়ের কথা বিচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমরা ইংরেজির সহিত অল্পাধিক পরিচিত।

সকল ভাষারই পরিবর্ত্তনে এবং গড়নে দুইটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়,—একটি Phonetic decay বা স্বর-ক্ষয় এবং অন্যটি Dialectic regeneration বা প্রাদেশিক শব্দের উদ্ধারে ভাষার পুষ্টি। ভাষা-বিজ্ঞানের কথায় যাঁহাদের নামের দোহাই দেওয়া চলে তাঁহারা বলেন, যে মানুষেরা স্বাভাবিক আলস্যে এবং অন্যবিধ প্রাকৃতিক কারণে নিরন্তরই ভাষার শব্দগুলিকে ভাঙ্গিয়া ছোট করিতেছে এবং উচ্চারণ-বিকৃতিতে একেবারে নূতন শব্দের মত করিয়া তুলিতেছে। Dr. Skeat বলিয়াছেন যে সমুদ্রের ঢেউ গণা যেমন অসম্ভব, এই Phoneticএর decay কার্য্য-নির্দ্দেশ করাও তেমনই অসম্ভব। আমাদের দেশে কি ভাবে শব্দ-বিকৃতি এবং স্বর-ক্ষ চলিয়া আসিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত না দি সুবিধার জন্য দোহাইয়ের উপরই নি করিলাম, কারণ-প্রযুক্ত সূত্রের যথার্থ দেখাইতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখি হয়।

মানুষে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে স্বাভাবি নিয়মে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইতে তাহাই যদি আদর্শ-ভাষায় গৃহীত হই তাহা হইলে সাহিত্যের আদর্শ-ভাষাকে প্রতি মুহূর্ত্তে নবজন্ম পরিগ্রহ করিতে হইত। নূতন নূতন রঙ্গিনপত্রে সাহিত্য-মুকু প্রকাশ করিবার মত, না হয় প্রতিদি ভাষাকে নূতন মূর্ত্তিতে খাড়া করা যাইত কিন্তু পরিবর্ত্তনের ঢেউগুলি অসংখ্য বলি এ কাজটি করা অসম্ভব। সাধুদের লোকেরাও এবৎসর যে কয়েকটি সংক্ষি শব্দ চালাইতেছেন, কয়েক বৎসর পরে তাঁহাদিগকে তদতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত এ বিকৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে; এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক বিকৃতির নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাল ঠিক রাখিয়া চলা, সকল ভাষার পক্ষেই অসম্ভব। তবে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট দলের লোকেরা বলেন, যে আমরা এই মুহূর্ত্তে যেরূপ সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃতরূপ দেখাইতেছি, তোমরা তাহাই চিরস্থায়ী করিয়া রাখ, তাহা হইলে সেই আব্দার গ্রাহ্য করা চলে কি না, ভাবিয়া দেখিতে হয়।

ইংলণ্ডের মত ছোট দেশেও অনেক গুলি প্রাদেশিক ভাষা বা Dialect পূর্ণ-

গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে, অথচ ই সকলগুলি প্রাদেশিক ভাষাই একটি দর্শ-সাহিত্যের ভাষার শাসনে শাসিত তেছে। এ কথাও উল্লেখ করিয়া রাখি, লণ্ডন সহরের প্রাদেশিকতা এবং ণ্ডনের নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রাদেশিকতাও দর্শ বলিয়া গৃহীত হয় না বরং আদর্শের াসনে নিয়মিত হয়। নাটকাদিতে এবং ুবিধ রচনায় প্রয়োজন-মত ভিন্ন ভিন্ন ানের প্রাদেশিক ভাষা, উচ্চারণের অনুরূপ রিয়া লিখিত হয়, এবং প্রয়োজন হইলে কল প্রদেশের ঘরওয়া কথা এবং প্রবাদ-চনাদি আদর্শ ভাষা, রচনার কাছা-কাছিই ক্ষিত হয়; এবং তাহাতে আদর্শ-ভাষাকে ীগবল বা উপহসিত হইতে হয় না।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহার সহিত সবুজ পত্রে'র সুযোগ্য সম্পাদকের কোন বিরোধ নাই। তিনি সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলির সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে চাহেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি, যে তিনি দেশবিশেষের বিকৃত উচ্চারণের শাসন মানা দূরে থাকুক, বরং সাহিত্যে আদর্শ-ভাষার প্রভাবে প্রাদেশিক বিকৃতিকে দূর করিতে চাহেন। শব্দের মৌলিক শুদ্ধতা রক্ষা করিবার দিকে এবং যথাস্থানে যথার্থ ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করিবার দিকে সুপণ্ডিত প্রমথনাথ চৌধুরী সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন। সাহিত্যের আদর্শ-ভাষায় যিনি সর্ব্ববিধ বিকৃতি পরিহার করেন, তিনি যে কি জন্য সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে নিয়মের ব্যভিচার করিতে চাহেন তাহার আলোচনা করিতেছি।

বহুশ্রুত প্রমথনাথ জানেন এবং স্বীকার করেন, যে, করিয়া, খেলিয়াছি, গিয়াছে, ঘটিল প্রভৃতি রূপগুলি ভাষায় কল্পিত নহে এবং ক'রে, খেলেছি, গেছে, ঘট্‌ল প্রভৃতি উহাদেরই ক্ষয়ে জাত। তিনি বলেন যে "ক্ষীণ" ক্রিয়াপদগুলি ভাষায় অধিকতর বলশালী এবং অবিকল পদগুলি বাক্যের দ্রুতগতির বাধা। যে সকল শব্দ গদ্য-রচনায় ব্যবহার করিলে বেশ ভাল শোনায় সেগুলিও অনেক সময়ে পদ্যরচনায় কথা, এবং ভাবের জোর রাখিতে পারে না। কবিতায় যখন—ধরিয়া চরণ, করিয়া যতন, মরমে মরিয়া, ভরিয়া লইবে কুম্ভ, খেলিয়াছি কত খেলা করিয়াছি কত আয়োজন, গিয়াছে চলিয়া, নিশ্চয় মরিব, ঘটিল কি দায়, চলিতেছি পথ একেলা প্রভৃতি কোন প্রকার দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে না, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মত শব্দকুশলী ও সুর-তালের ওস্তাদ যখন ঐ সকল ক্রিয়া তাঁহার পদ্য-রচনায় অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারেন, তখন উহাদিগকে ক্ষীণ করিয়া বলবিধানের চেষ্টা না করিলে চলে। পদ্য-রচনাতেই সময়ে সময়ে অনেক শব্দকে কাটিয়া ছাঁটিয়া লইতে হয়; পদ্যেও যাহাকে আস্ত রাখা চলে, গদ্যে তাহাকে খর্ব্ব করিবার কোন কারণ নাই। ক্রিয়াগুলির ব্যবহারে যখন একটা সাধারণ নিয়ম থাকিবে তখন এ কথাও বলা চলে না যে, দৃষ্টান্তের ক্রিয়াপদগুলি এবং ঐরূপ আরও কতকগুলি ক্রিয়াপদ না হয় পূর্ণাঙ্গরূপে রক্ষিত হইবে, কিন্তু অতিদীর্ঘ ক্রিয়াপদ-গুলিকে খর্ব্ব করিতে হইবে।

এখন সর্ব্বনামের কয়েকটি শব্দের কথা বলিতেছি। উত্তম-মধ্যমের বেলায় সকলেই নীরব আছেন দেখিতেছি; আমি, আমরা, তোমাকে, তোমাদের, আপনি, আপনাদের প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গিয়াছে। "সে" এবং "তিনি"র বহুবচনে এবং কর্ম্মাদি কারকের রূপে যে "হা" এবং "হাঁ" আসে তাহা লোপ করিলেই যে ভাষার গায়ের জোর অধিক হইবে এবং রচনার গাম্ভার্য্য বাড়িবে তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। কথার জোর উহার Emphasis বা ঝোঁকের উপর নির্ভর করে; যেখানে ঝোঁকের মাথায় "হা" বা "হাঁ" আপনি লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, সেখানে অক্ষর থাকিলেও কোন বাধা হয় না এবং সকল ভাষাতেই ঝোঁক এবং টানের (accent) অনুক্রমে শব্দের অক্ষরবিশেষ অনুচ্চারিত বা অর্দ্ধ-উচ্চারিত থাকে। কোনস্থানেই যখন নূতন কিছু করিবার প্রয়োজন হইল না, তখন এই তুচ্ছ "হা" "হাঁ" লইয়া তর্কের ঝড় তুলিবার প্রয়োজন কি? এইসঙ্গে আর একটি কথাও বলিয়া রাখি। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা যায়, যে চৌধুরী-মহাশয় যে পন্থা অবলম্বনীয় মনে করিয়াছেন তাহাই প্রশস্ত, তাহা হইলেও দশজনের অবলম্বিত পন্থা তিনি একাকী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যেখানে চরিত্র-নিষ্ঠার কথা নাই, জীবন-মরণের কথা নাই, সেখানে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজের মতটি গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার মত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রচলিত প্রথাই মানিয়া চলিতে হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল স্থানে সাহিত্য-সমাজ স্বতন্ত্র অর্থাৎ যেখানে আমাদের দেশের মত এক ব্যক্তিই স্বাধীন হইতে পারে না, সেখা কেহ নূতন মত-প্রচারের জন্য তাঁহ নূতন ব্যাকরণ অথবা বানান অন্য অন্যবিধ পরিবর্ত্তন, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে পারে কিন্তু নিজের উদ্ভাবিত পন্থা অনুসরণ করি যদি সাধারণ প্রবন্ধে নূতন বানান, ব্যাক প্রভৃতি চালাইয়া যান, তবে প্রবন্ধটি ভাষা হিসাবে কুত্রচিত বিবেচিত হইবে কুত্রাপি মুদ্রিত হইবে না। কেহ ন উচ্ছৃঙ্খলতা না আনেন ইহাই প্রার্থনা।

এ পর্য্যন্ত স্বরক্ষয়ের কথা বলিয়াছি এখন Dialectic regeneration স কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলি সকলেই জানেন যে বিশেষ্য-বিশেষণজা শব্দরাশি অর্থাৎ Vocabulary লইয়া ভা কাঠাম রচিত হয় না এবং যে ব্যাক লইয়াই ভাষা, তাহার পনরআনা স সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদের রূপ ও সং লইয়া। সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ ঐগুলি যদি প্রাদেশিক বিকৃতির অনুরূপ না হয়, হইলে আমাদের সাহিত্যের আদর্শ-ভা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের বলিয়া উঠিবে না। কোন বিশেষ কারণে কোন একটি প্রদেশের শব্দ বেশী ব্যবহৃ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না; এতদিন পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন কথা উঠে নাই। আরব ও পারস্যের অনে শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে

এখন ইউরোপের অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করিতেছি। সংস্কৃত নামে প্রসিদ্ধ তাহাতেও বৈদিক শব্দ ছাড়া ভারতবর্ষের দ্রবিড়াদি জাতির এবং বাহিরের গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। ভাব-প্রকাশের জন্য শব্দের অভাব হইলে লোকে প্রথমতঃ আপনাদের ভাণ্ডার খুঁজিয়া দেখে এবং পরে বাধ্য হইয়া অপরের কাছে ঋণ ধার করে। মূলতঃ ইংরেজি ভাষায় অক্স-মর্শিয়ার শব্দই অধিক ছিল, কিন্তু টেম্স নদীর উত্তরভাগের প্রাদেশিক শব্দ কম-পরিমাণে অধিকার লাভ করিতে ছাড়ে নাই। আদর্শ-ইংরেজি ভাষায় ভাব-প্রকাশের সুবিধার জন্য দেশের সকল প্রাদেশিক ভাষা হইতেই সযত্নে শব্দ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা-বিজ্ঞান গ্রন্থে দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত শব্দগুলির সুদীর্ঘ দীর্ঘ তালিকা আছে।

ভাব-প্রকাশের অসুবিধা দেখিয়া মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত বর্দ্ধমান জেলা হইতে প্রধানকার দেশী "ভাস্কর" শব্দটি সংগ্রহ করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। আমাদের যদি আপনাদের ভাষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকে, সকল প্রদেশগুলিকে টানিয়া একসঙ্গে মিলিবার ইচ্ছা থাকে, উপযুক্ত ভাব-প্রকাশক শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টি-বিধানের চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মত যত্ন করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে মুদ্রিত করিব, এবং যে প্রদেশের যে শব্দটি ভাষার অভাব পূরণ করিবে মনে হইবে, তাহাই আদর্শ-ভাষায় প্রচলিত করিব। নিজের ঘরের শব্দ-ভাণ্ডার না খুঁজিয়া সংস্কৃত-কোষ হইতে শব্দ খুঁজিতে যাওয়াও অন্যায় বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষার ভাণ্ডার হইতে যেদিন শব্দ সংগৃহীত হইয়া আদর্শ-ভাষা পুষ্টিলাভ করিবে, সেদিন অলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রদেশগুলি প্রাণের টানে একত্র মিলিবে এবং আমাদের আদর্শ ভাষা অমুক বিশেষ প্রদেশের বলিয়া অসার কোলাহল উঠিবে না। ত্রিবেণী হইতে কলিকাতার উত্তরভাগ পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয়কূলস্থিত স্থানের শব্দ-উচ্চারণের যে ধাঁচা আছে এবং টান্ (accent) আছে, কেহ কিছু না বলিলেও উহাই সর্ব্বত্র গৃহীত এবং শিক্ষিত হইবে; কারণ ঐ ধাঁচা ও টান্ আপনার প্রাকৃতিক মাধুরীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

Dialectic regeneration প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতেছি। অনেককেই এ-যুগে নূতন ভাব বুঝাইবার জন্য নূতন নূতন কথা চালাইতে হয় এবং নূতন করিয়া শব্দ গড়িতে হয়। যে পদ্ধতিতে এই কাজটি হইয়া থাকে তাহার সমালোচনায় দুই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শব্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) একজন একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করিবার পরেও অন্য ব্যক্তি অন্য নূতন শব্দ চালাইতে চেষ্টা করেন, এবং তাহাতে নূতন ভাব-প্রকাশক একটা সুনির্দ্দিষ্ট শব্দ পাওয়া যায় না। একজন আগে কিছু লিখিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার কথাটি বজায় রাখিতে হইবে, তাহা নয়; তবে প্রথমকার ব্যবহৃত শব্দটির যে কোন বিচারই হয় না, এবং ইচ্ছামত সকলেই যে নূতন

নূতন শব্দ গড়িতে থাকেন, এইটিই দুঃখ। একালের বিজ্ঞানের Evolution শব্দটির বিভিন্ন শব্দে অনুবাদ দেখিতে পাই। প্রথমে Evolution অর্থে বিবর্ত্তন শব্দটি চলিয়াছিল এবং এখনও উহার ব্যবহার আছে, কাহারও কাহারও আপত্তি এই, যে বিবর্ত্তন বলিলে ঠিক Darwinএর Evolution বুঝায় না। এটা বড়ই দুর্ব্বল যুক্তি। Darwinএর প্রপিতামহের জন্মের পূর্ব্বেও Evolution শব্দটি ইংরেজি ভাষায় ছিল, এবং উহার যে অর্থ ছিল তাহাতে Darwinএর তত্ত্ব পরিস্ফুট হইত না। নূতন বিজ্ঞানে ঐ শব্দটি, যে ভাব বুঝাইবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নূতন তত্ত্ব না পড়িলে কাহারও বুঝিতে পারা অসম্ভব। একটা ভাবের কথঞ্চিৎ অনুরূপ শব্দ যদি ভাষায় পাই, তবে তাহাকেই নূতন ভাব দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারি; চিরকালই এই প্রথায় কাজ চলিয়াছে। Darwinএর বিবর্ত্তন-বাদ বলিলে কোন প্রকারে হিন্দু-দর্শনের কথার সহিত গোল বাধে না, এবং যেখানে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখানে কথার ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে কোন্ বিবর্ত্তনের কথা বলা হইতেছে। যে উহার তত্ত্ব কিছুই জানে না, তাহার কাছে সকল শব্দই সমান হইয়া উঠিবে। বিবর্ত্তনবাদের সঙ্গে যে Progress কথা চলে তাহারও অনুবাদে আমরা উন্নতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারি,—কোন ক্ষতি হয় না; Progress বলিতে এবং উন্নতি বলিতে একটা ভালর দিকে গতি হইতেছে বুঝা যায়; অথচ বিবর্ত্তনের উন্নতিতে ভালমন্দ বিচার আদৌ নাই। কথা বলিবামাত্রই সমস্ত বিজ্ঞানের ভাব লোকে বুঝিয়া ফেলিবে পারিবে, এমন শব্দ কেহই আবিষ্কার কি উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না। নূতন ভাবে কাছা-কাছি হইলেই একটা দেশী শব্দ লই সেই নূতন ভাব বুঝাইয়া তুলিতে চেষ্টা করি হইবে; এবং তাহাতে এক শব্দের ভিন্ন ভি অর্থ জন্মিতে পারে,—এবং চিরকালই ম দেশে তাহা হইতেছে। বিবর্ত্তন শব্দটা দার্শনিকদের নূতন গড়া নহে, এ প্রাচীন ভাষায় উহার অন্য অর্থে ব্যবহা ছিল। এইরূপ শ্রেণীর হইতে সূক্ষ্ম বিবাদের সৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই। ক্রমাগত ইচ্ছামত নূ নূতন শব্দ গড়িলে পাঠকদিগকে বিব্রত করা হয়। Evolu অন্তর্গত তাহার সাধারণ নাম Cosmology উদ্ভব-তত্ত্ব নাম দিলে সকলের বেশ বুঝি পারে; এবং ঐ তত্ত্বের ব্যা করিবার নূতন বিবর্ত্তন-পদ্ধতি বুঝা কিছুই হয় না।

(২) সংস্কৃত ভাষা হইতে অপ্রচলি নূতন শব্দ আনিয়া তাহার ব্যাখ্যা করি নূতন ভাব বুঝাইবার আগে দেশী শ দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করা উচি অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে Prestige Sensitive শব্দের অনুবাদ লইয়া কয়েক পণ্ডিত বিষম তর্ক তুলিয়াছিলেন, অবিশ্রান্ত সংস্কৃত কোষগ্রন্থ হাতড়াইতেছিলে আমাদের দেশের "গুমর" শব্দটির গায়ে যে কোন ভাবের ছায়া থাকুক না কেন, Prestige কথা বুঝাইবার সময়ে যদি "গু শব্দটির ব্যবহার করা যায়, তবে

লোকের পক্ষে যথার্থ অর্থ বুঝিতে গোল না। যতদিন একজনের কোন দুর্ব্বলতা ছন্ন থাকে এবং বাহিরের লোকে তাহা রিতে পারে না, ততদিন তাহার দব্‌দবাই গুমর বেশ বজায় থাকে, কিন্তু কোনপ্রকারে টা প্রকাশ হইয়া পড়িলেই গুমর চলিয়া য়। ঐ গুমর শব্দটি কখনও Pride এবং খনও Conceit অর্থেও ব্যবহৃত হয়। রূপ স্থলে আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি ভৃতি দেখিয়া সকল ভাষাতেই শব্দের র্থ স্থির করিতে হয়।

(৩) Sensitive কথাটা লইয়াই আর কশ্রেণীর গোলযোগের কথার দৃষ্টান্ত তেছি। ইংরেজি একটা শব্দে যত র্মের ভাব সূচিত হয়, সেই সকল ভাব-নিই আনর একটা শব্দে গুঁজিতে চেষ্টা ধিব কেন শরীরে একটা প্রদাহের ল একটি স্থান Sensitive হয়, অর্থাৎ স্থানটি অল্প একটু ছুঁইলেই ছন্‌ছন্ রিয়া উঠে, সেখানে ছন্‌ছন্ কথার শেষণরূপে "ছন্‌ছনে" বলিলে Sensitive থা সহজে ব্যক্ত হয়। একটু কথা হিলেই যাহার লাগে এবং কথায় কথায় ভিমান হয় তাহাকে অভিমানী বলি; ও Sensitive। যেখানে অল্প ছুঁইলেই শটি সর্ব্বত্র চালিত হয়, অথচ যেখানে ভিমানের কথা নাই, সেখানে স্বতন্ত্র শব্দ জিতে হইবে। অমুক যন্ত্রটি Sensitive বা অমুক গাছটি Sensitive বলিলে সূক্ষ্মরকমের স্পর্শানুভব-সামর্থ্য বুঝায়, হা যখন কেবল তত্ত্বান্বেষী-দিগকে বুঝাইতে হইবে, তখন সংস্কৃত স্পর্শভেদ্য শব্দ ব্যবহার করা চলে। শব্দগুলি সাহিত্যে চালাইবার জন্য লিখি নাই; শব্দ গড়িবার পদ্ধতির আলোচনার জন্যই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

যখন বীরভূমের অজয়ের কূল হইতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি পর্য্যন্ত এবং কশাই বা বা কাঁশাই নামে পরিচিত কপিশা হইতে ত্রিস্রোতা বা তিস্তা পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিব, তখন হয়ত দেখিব যে বিভিন্ন নূতন ভাব প্রকাশ করিবার অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। সমগ্র বঙ্গভূমির প্রতি যথার্থ ভালবাসা না বাড়িলে এ কাজ হইতে পারিবে না। প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতায় আমরা পাছে সমগ্র ভারতের প্রতি ভালবাসা হারাই, সেইজন্য হয়ত প্রতিদিন স্নানের সময়ে সমগ্র দেশের প্রধান প্রধান নদীর নাম করিয়া মন্ত্র পড়িতে হয়। "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি, সরস্বতী, নর্ম্মদে, সিন্ধু, কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু" বলিয়া আমরা প্রথম ডুবটি দিব, কিন্তু দ্বিতীয়বার ডুব দিবার পূর্ব্বে যদি নিম্নলিখিত নূতন শ্লোকটি পড়ি, তাহা হইলে হয়ত বা নিয়ত মন্ত্রজপের ফলে যথার্থ স্বদেশ-প্রীতি একটু বাড়িতে পারে। আমার প্রস্তাবিত শ্লোকটি এই ঃ—

অজয়প্রীতসঙ্গীতৈঃ কপিশে, দারুকেশ্বর,
দামোদর, তথা রূপনারায়ণ শ্রিতাম্বুধে।
ত্রিস্রোতশ্চ তথা কর্ণফুল্লি, পদ্মে, চ মেঘনে,
কপোতাক্ষ, তথা গঙ্গে, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সৈন্য ও বিধি-ব্যবস্থা

শাসন-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, সৈন্য-বিভাগের নূতন বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল; কেননা সৈন্যবিভাগ হইতেই ১৮৫৭ অব্দের যত কিছু উৎপাত উপদ্রব সমুদ্ভূত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, সামরিক প্রণালী পর-পর তিনটি অবস্থা অতিক্রম করে।

*
* *

প্রথম অবস্থায়,—ভারত-সরকারের রাষ্ট্র-নীতির মূল-কথা :—"যুদ্ধং দেহি।" ভারত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, সৈন্যমণ্ডলী ভারত সাম্রাজ্যকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যগণ দুই বৎসর ধরিয়া স্বকীয় প্রধানদের সহিত বিবাদ করিয়াছিল এবং কোম্পানীর য়ুরোপীয় সৈন্যগণ সিপাহী-বিদ্রোহের ঠিক পূর্ব্বেই বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাই উভয় সৈন্যদলেরই নূতন বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল।

প্রথমেই য়ুরোপীয় সৈন্য। কোম্পানীর সৈন্যদলকে বিদায় করা হইল; "রাজকীয়" সৈন্য সংখ্যা বাড়ান হইল। কেবলমাত্র এই সৈন্যমণ্ডলী হইতেই তোপের সৈন্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট সৈন্যদল গৃহীত হইবে স্থির হইল।

ভারতীয় সৈন্য। এই সৈন্যের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক কমাইতে হইল। পুরাতন "বঙ্গ-ফৌজ"কে একেবারেই রহিত করা হইল। নূতন ফৌজ গঠিত হইল :—যাহারা সিপাহী বিদ্রোহের মূল, সেই উচ্চবর্ণের হিন্দুস্থানী দিগের মধ্য হইতে আর সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে না স্থির হইল। তাহাদের বদলে পঞ্জাবী (বিশেষতঃ শিখ্) গুর্খা আফগান বেলুচিদিগকে সৈন্যভুক্ত করা হইবে।

কিন্তু কেবল সাবধানতা ও দূরদর্শিতা হইতেই এই সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল সামরিক গঠনপদ্ধতির আর কোন বদল হইল না। সেই তিন শ্রেণীর গুলী লইয়া সৈন্যসংগঠন, অশ্বারোহী ও পদাতিক পল্টনের সেই একইরূপ বিভাগ, দেশীয় সেনা নায়কদিগের সেই একইরূপ নিম্নপদে নিয়োগ সৈন্যসংগ্রহকার্য্যে ও ইংরাজ সেনাধ্যক্ষদিগের উন্নতিসম্বন্ধেই যাহা কিছু অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ফলতঃ প্রকৃত পরিবর্ত্তন যাহা হইয়াছিল—তাহা ভিতরকার মূল-ভাবটির লর্ড ডেলহৌসীর সৈন্য দেশ-জয়ের সৈন্য ছিল। ১৮৫৭ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত ভূটানে কতকগুলি প্রদেশ ছাড়া আর কোন বিষ সাধনের কাজ হয় নাই। সৈন্যমণ্ডলী প্রা পুলিশের মতই পাহারা ও পরিদর্শনের কা নিযুক্ত ছিল।

*
* *

দ্বিতীয় অবস্থায়,—আফগানিস্থান ও ব্রহ্ম দেশের যুদ্ধবিগ্রহে, সৈন্যের মধ্যে সামরি

বটা ফিরিয়া আসিল। আশিয়ায় রুশের প্রসরণ, ভারতের পক্ষে আশঙ্কার কারণ য়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সাধারণ প্রজা- ও দেশীয় সৈন্যসম্বন্ধে ইংরাজ-সরকারের অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ত্রিশ বৎসরকাল- ব্যাপী রাজভক্তির প্রভাবে সেই অবিশ্বাস দূরিত হইল। এখন হইতে অধিক সংখ্যায় সিপাহী সৈন্য সংগৃহীত হইবে, পূর্ব্বাপেক্ষা ইহারা রণসাজে ভাল করিয়া সজ্জিত হইবে, আধুনিকতম আদর্শের বন্দুক প্রাপ্ত হইবে এইরূপ স্থির হইল। ইংরাজ-সৈন্য যাহাদের কাজ শুধু উহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা—এখন হইতে তাহারা সম্পূর্ণ-রূপে উহাদিগকে স্বকীয় যুদ্ধসহচররূপে গ্রহণ করিল। এক্ষণে ভারতকে একটি সামরিক শক্তিরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে এইরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইল। যে বড় বড় পদগুলা তিন প্রেসিডেন্সির মধ্যে বিভক্ত ছিল, সেই সকল পদ কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইল। প্রধান সেনাপতি "বঙ্গ ফৌজের" সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিলেন। "বঙ্গ ফৌজ" এক্ষণে স্বতন্ত্র দুই বিভাগে বিভক্ত হইল;—"বাঙ্গলা" ও "পঞ্জাব।" সর্ব্বসমেত উপসেনাপতিদিগের অধীনে চারিটি সৈন্যমণ্ডলী গঠিত হইল।

শীঘ্রই সৈন্যের ক্ষুদ্র বিভাগগুলি রহিত হইয়া তাহার স্থলে সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী বড় বড় স্বতন্ত্র সৈন্যদলে বিভক্ত হইল। যে প্রদেশে সৈন্য সংগৃহীত হইবে, ইহার দ্বারা সেই প্রদেশের দেশীয় বিশেষত্বটুকু রক্ষিত হইতে পারিবে।

*
* *

ভারতীয় সৈন্যের ক্রমবিকাশ, অবশেষে পরিবর্ত্তনের তৃতীয় অবস্থায় প্রবেশ করিল। সাম্রাজ্যবিস্তার ও এসিয়ায় য়ুরোপীয় উপনিবেশাদির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, ভারত দুর্জ্জয় শত্রুসমূহের সংস্পর্শে আসিল। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রনৈতিক বিভ্রাটবশতঃ, চীন, সোদান ও এডেনে সৈন্য পাঠান আবশ্যক হইয়া পড়িল। বড় বড় নগরে রাজা-দিগের রাজধানীতে একটা ভারতীয় বিশেষ মতামত ও ভারতীয় মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল। যদি সরকার-বাহাদুর কখন কখন শিক্ষিত লোকদিগের, রাজকর্ম্মচারী দিগের, অধ্যাপকদিগের, মুদ্রাযন্ত্রের এবং ভারতের যোদ্ধৃজাতি সামন্তমণ্ডলীর সাহায্য না পান তাহা হইলে একটা সাম্রাজ্য-সাধারণ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সৈন্যসংগ্রহের কোন এক নূতন প্রণালীকে জাতীয় ভাবাপন্ন করিতে হইলে, যাহাতে রাজপুতবংশধরেরা, সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমানেরা, প্রাচীন মারাঠা সর্দ্দারেরা, উচ্চপদে উপনীত হইতে পারে তাহা দেখা আবশ্যক। সায়ত্ত শাসনের অধিকার ছাড়া আর সমস্ত অধিকারই যে দেশে আছে, সে দেশে বিদেশীয় সৈন্যা-ধ্যক্ষের অধীনে কেবল একটা পেষাদার সৈন্যমণ্ডলী অবস্থিত। এই সব কারণেই সেখানে যুদ্ধ-প্রধান রাষ্ট্রনীতি অসম্ভব।

*
* *

ভারতীয় সৈন্যের ক্রমবিকাশ হইতেই আমরা ভারতের দুই শতাব্দীব্যাপী ক্রম-বিকাশের ইতিহাস অবগত হই। পেশাদার

ভারতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ভারতবিজয়, এই পেশাদার সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহের আবির্ভাব, কিছুকাল ধরিয়া প্রতীক্ষা ও অবিশ্বাসের অবস্থা, আবার যে সময় হইতে, একটা জাতীয় সৈন্যমণ্ডলী ক্রমশ গড়িয়া উঠিবে বলিয়া একটু আভাস পাওয়া যায় সেই নূতন যুদ্ধবিগ্রহের কাল।

বিধি-ব্যবস্থা

শাসনকার্য্য ও সৈন্যমণ্ডলীর দ্বারা বর্ত্তমানে ভারত-জয় সাধিত হইল; এবং ভবিষ্যতে এই বিজয় কার্য্য স্থিরতর রাখিবার জন্য বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক হইল।

ভারতীয় বিধিব্যবস্থা এক জটিল ব্যাপার সিপাহী বিদ্রোহ হইতে গভর্ণমেণ্ট এই যুগলাত্মক শিক্ষাটি লাভ করিয়াছিল:— ভারতীয় সভ্যতার প্রতি গভর্ণমেণ্টের অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, অথচ য়ুরোপীয় সভ্যতার দ্বারা, সাবধানে ও অধ্যবসায় সহকারে, ভারতকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা।

নূতন বিধিব্যবস্থার স্থূল রেখাগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

*
* *

হিন্দু ও মুসলমানের প্রাচীন ব্যবস্থাদির দ্বারা, জাতি ও বর্ণের প্রথাদির দ্বারা, ব্যক্তিগত অধিকার এবং উত্তরাধিকার সাধারণভাবে নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল আইন, এই সকল প্রথা, আদালতের বিচার-নিষ্পত্তি, ও ভাষ্যকারদিগের লেখার দ্বারা, আইনের আলোচনা অনেকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে এ বিশেষাধিকারসমন্বিত বর্ণবিশেষের যে মিথ্যা ব্যাখ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল, মিথ্যা ব্যাখ্যা রহিত হইয়াছে। ক্রমশঃ এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাশাস্ত্র গড়ি উঠিল। তবে কিনা উহা একটু বেশী পাণ্ডি পূর্ণ—কেননা, লোকপ্রচলিত প্রথার স আকারগুলিকে উহা জটিল করিয়া তুলিয় এবং উহা একটু বেশী সুনির্দ্দিষ্ট কেন এই ব্যবস্থাশাস্ত্র পরিবর্ত্তন প্রথাগুলি স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল, অ নিয়মগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল, বহুজাতি সমূহের উপর—অস্পৃশ্য জাতিসমূহের উপ হিন্দু আইন জারি করি এমন কি তদ্দ্বারা তাহাদের নীচত্বও একটা যুচাইয়া দিল। এই সকল বাড়াবাড়ির মূল কারণগুলি এই:—

ভারতবাসীদিগের মন নিয়ম-বন্ধনের অনুরাগী ও সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী; তাই যে সকল সাধারণ নিয়ম তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতে চাহে না (প্রকৃত প্রাচ্য জাতিরই অনুরূপ), সেই সকল সাধারণ নিয়ম হইতে তাহারা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য বাহির করিতে ভালবাসে; কিন্তু ইংরাজের দৃঢ়-চিত্ত ও তাহাদের যথাযথদর্শিনী বুদ্ধি; সুতরাং তাহারা আইনের আক্ষরিক অর্থ সর্ব্বদাই বিচার করিয়া দেখে এবং ভারতবাসীরা যে সকল উপপত্তি মূলক নিয়ম অনুসরণ করিয়াছে, ইংরাজেরা প্রায়ই তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া থাকে।

এই অভিনব ব্যবস্থাশাস্ত্রের কতকগুলি ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার গুণগুলি ঢাকা পড়ে নাই।

বিবিধ প্রথার বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা না আনিয়াছে; স্থিরনির্দ্দিষ্টতা,—অনিশ্চয় পরিবর্ত্তনের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহারই মধ্যে সংহিতার দ্বারা, অথবা ন একটা ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা দ্বারা, ত্তরাধিকার এবং চুক্তি প্রভৃতি আইন বিধি- হইয়াছে অনতিবিলম্বেই কতকগুলি াইন সংহিতা পরিণত হইবে। মুসলমান াইন, সম্বন্ধে কোনপ্রকার কঠিনতা উপস্থিত বে না। কো বহু শতাব্দী হইতে মেক্কা, দীনা ও দিল্লির ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ ণ্ডিতদিগের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ন্তু হিন্দু আইন সম্বন্ধে একথা বলা যায় । মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য ধর্ম্মসংহিতা খনই আইনের বলবত্তা প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দু আইন চিরকালই ব্যবহারের আইন ইয়া থাকিবে। তথাপি বিবিধ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা হইতে কতকগুলি প্রাদেশিক াবহার লিপিবদ্ধ হইতে পারে এবং ক্রমে তকগুলি ব্যবহার ক্রমশ আইন-সংহিতায় রিণত হইবে।

*
* *

এই ভারতীয় বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে ব্যবস্থাকর্ত্তারা এসিয়ার মতামত ও য়ুরোপেয় মতামতের একটা আপোষ বা "মন রাখার" সংকল্প করিয়াছেন। এ সমস্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্ত্তিত আইন।

ব্যক্তিগত অধিকার, উত্তরাধিকার এবং সমজাতি ও সমধর্ম্মী লোকদিগের মধ্যে চুক্তি-ব্যবহার সম্বন্ধে এই সকল আইন খুব সাবধান সহকারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমাসম্বন্ধে আইন-ঘটিত কতকগুলি মূল-নিয়ম স্থাপন করা, দেওয়ানী কার্য্যবিধি স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, য়ুরোপীয়, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি-ব্যবহার নিয়মিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এখন যে ফৌজদারী আইন আছে তাহা সমস্ত ভারতেই প্রযুজ্য:—১৮৬০ অব্দের দণ্ডবিধি, ১৮৬১ অব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধি (মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পুনঃসংস্কার হইতেছে), ১৮৭২ অব্দের "প্রমাণ বিধি" ইত্যাদি।

*
* *

পরিশেষে সমস্ত য়ুরোপীয় ধরণের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন। ইংরাজ পার্লেমেণ্টের বিধিবদ্ধ আইন, সমস্ত ভারতে প্রযুজ্য। অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে, সিভিল-সার্ভিশ সম্বন্ধে, সৈন্যসম্বন্ধে এই সকল আইন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। দেওয়ানী মোকদ্দমার উপরেও উহার কতকটা প্রভাব আছে; তাহার পর, কাহার দ্বারা আইন প্রণীত হইবে, কি রকম-ভাবে প্রণীত হইবে, কিরূপে উহার প্রয়োগ হইবে —এই সমস্তও উহার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

অতএব, ভারতীয় ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্রমবিকাশে আমরা দুইটি লক্ষণ দেখিতে পাই।

একপক্ষে স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইবার দিকে এই সকল ব্যবস্থার প্রবণতা। কেননা, একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা, সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রথাদিকে কতকগুলি ধ্রুব নিয়মের

অধীনে আনয়ন করা—ইহাই আজকালের আধুনিক সমাজের একটা পরিচায়ক লক্ষণ।

পক্ষান্তরে, হিন্দু আইন ও য়ুরোপীয় আইন একত্র মিশাইয়া একটা জাতি-সাধারণ আইন গড়িয়া তোলাই এই ব্যবস্থাকর্ত্তাদিগের চেষ্টা হইয়াছে। এবং ইহার দ্বারা হিন্দু-য়ুরোপীয় সভ্যতার পথ যে প্রস্তুত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মস্তিষ্ক ও আত্মার বিকাশ

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদে মস্তিষ্কের বিকাশই জীববিকাশের শেষ পরিণামরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই মস্তিষ্কের বিকাশ দ্বারাই মনুষ্য জীবজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। সুতরাং মস্তিষ্কের বিকাশ আলোচনায় জীবরাজ্যে মনুষ্যের রাজমহিমার প্রকৃততত্ত্ব আমরা উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইব আশায় উপস্থিত প্রসঙ্গের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

হৃদয়ের বিকাশের সহিত যেমন রক্তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় মস্তিষ্কের বিকাশের সহিতও তেমনই স্নায়ুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত শরীরের প্রথম উপাদান;—তাহাতেই "রক্তমাংসের শরীর" এইরূপ কথা প্রচলিত হইয়াছে। রক্তকে যেমন আমরা শরীরের প্রথম উপাদান বলিতে পারি—স্নায়ুকে তেমনই শেষ উপাদান বলিতে পারি।

হৃদ্‌যন্ত্রে যেমন রক্তরাশি কেন্দ্রীভূত হয়—স্নায়ুমণ্ডলও তেমনই মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রকারে হৃদ্‌যন্ত্র যেমন রক্তের আধার মস্তিষ্কও তেমনই স্নায়ুর আধার হইয়াছে। ইহা হইতে হৃদয় ও মস্তিষ্ক শরীর ধারণের প্রধান যন্ত্র তাহাই বুঝিতে পারা যায়। উভয়ই শরীর ধারণের প্রধান যন্ত্র হইলেও ইহাদের মধ্যে স্নায়ুরই বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ স্নায়ু শক্তিই রক্ত সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হইয়া তবে দেহের রক্ষা ও পোষণকার্য্য সম্পাদিত করিয়া থাকে।

রক্ত হইতেই আমাদের দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। তাহাতেই রক্তহীন স্থানে অনুভূতির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত চৈতন্যের সঞ্চারক বলিয়াই রক্তাধার হৃদ্‌যন্ত্রও চৈতন্যের আধার হইয়াছে। এই জন্যই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হইলে চৈতন্যেরও বিলোপ হয়। হৃদয় এই প্রকার অনুভূতির আধার বলিয়াই সুখ-দুঃখের অনুভূতি হৃদয়ে হইয়া থাকে।

স্নায়ুর দ্বারা শরীরের রক্তসঞ্চালন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কার্য্যই নির্দ্ধারিত হয়। এই কারণেই দেহের কোন অঙ্গে স্নায়ু বিকল হইয়া গেলে তাহা যেমনই রক্তাভাবে শুষ্ক হইয়া যায় তেমনই অকর্ম্মণ্য

হইয়া যায়। কোন অঙ্গে স্নায়ুর কার্য্য-ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলে তাহার অনুভব শক্তিও নাশ পাইয়া থাকে। পক্ষাঘাতের দ্বারা যে অবশাঙ্গতা ঘটে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই প্রকারে আমরা স্নায়ুতে রক্তাপেক্ষাও অধিক বোধশক্তির আধার দেখিতে পাইতেছি। ইহা হইতে স্নায়ুতে রক্তাপেক্ষাও অধিক চৈতন্য নিহিত আছে তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। সুতরাং হৃদযন্ত্র রক্তকেন্দ্র বলিয়া এবং চৈতন্যাধার মস্তিষ্ক স্নায়ুকেন্দ্র বলিয়া তদপেক্ষাও চৈতন্যাধার তাহাই আমরা দেখিতে পারিতেছি। এই প্রকারে মস্তিষ্কই আমাদের চৈতন্যের প্রধান মূলাধার হইতেছে। নিদ্রাসরোগে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়াতেই সংজ্ঞা লোপ পাইয়া থাকে। নিদ্রাতেও মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা বদ্ধ হওয়াতেই অচৈতন্যাবস্থা সংঘটিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে চৈতন্যস্ফূর্ত্তিই যে মস্তিষ্ক-বিকাশের প্রধান ফল তাহাই আমরা প্রতিপাদন করিতে পারি।

মস্তিষ্কের উপরি-উক্ত চৈতন্যশক্তির মাত্রাদ্বারাই বিকাশের মাত্রা পরিমিত হইয়া থাকে। যাহাতে উক্ত চৈতন্যশক্তি বা চিচ্ছক্তির অধিক পূর্ণতা, তাহাতেই বিকাশের অধিক পূর্ণতা ইহাই চৈতন্য বা চিচ্ছক্তির দ্বারা বিকাশ-বিচারের পদ্ধতি। মস্তিষ্ক আমাদের দেহের উৎকৃষ্ট বিকাশ বলিয়াই ইহার আধারভূত মস্তক দেহের "উত্তমাঙ্গ" অর্থাৎ প্রকৃষ্টাঙ্গ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্কের এই চিচ্ছক্তির প্রেরণায় স্নায়ুজালযোগে শরীরের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় ইহাই পাশ্চাত্য দর্শনের মত। পাশ্চাত্য দর্শনমতে এই চিচ্ছক্তিই 'মন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মস্তিষ্ক ইহারই যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় আমাদের শাস্ত্রেও মস্তিষ্কেই সমস্ত কার্য্যপ্রেরণার স্থান সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা এই প্রেরণার কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম শাস্ত্রে "আজ্ঞাচক্র" প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার বর্ণনা এইরূপ:—

"ভ্রুবোরুপরি নাড়ীনাং ত্রয়ানাং প্রান্ত উচ্যতে।
তৎপ্রান্তং ত্রিপদ্মস্থানং ষট্‌কোণং চতুরঙ্গলম্॥
রক্তবর্ণন্তু যোগজ্ঞৈরাজ্ঞাচক্রমিতীরিতম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কালিকাপুরাণে ৫৪ অধ্যায়।

পাশ্চাত্যগণ যেমন মনকে মস্তিষ্কের অধিষ্ঠাতা বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন, শাস্ত্রে 'আজ্ঞাচক্রের' অধিষ্ঠাতাও মনকেই উল্লিখিত দেখা যায়; যথা:—

"ষষ্ঠমাজ্ঞালয়ং চক্রং দ্বিদলং শ্বেত মুত্তমম্।
ধারাচক্রমিতিখ্যাতং মনঃস্থান প্রকীর্ত্তিতম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুধৃত পাদ্মে স্বর্গ খণ্ডে ২৭ অধ্যায়।

কিন্তু এই প্রকারে মন মস্তিষ্কের অগ্রভাগের বা ললাটদেশের অধিষ্ঠাতারূপে বর্ণিত হইলেও ইহা পাশ্চাত্যদিগের মনস্তত্ত্বের সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। আজ্ঞাচক্রের অধিষ্ঠাতারূপে মন আত্মারই সহযোগী। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কিন্তু আত্মা হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই মনস্তত্ত্বকে বুঝিয়া থাকেন। এই আত্মনিরপেক্ষ মনস্তত্ত্বের স্থান কিন্তু ললাটদেশ নহে—তাহার স্থান হৃদয় বা হৃদযন্ত্র। নিম্নোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে:—

"ত্রয়াণামথ নাড়ীনাং হৃদয়ে চৈকতা ভবেৎ।
তৎস্থানং ষোড়শারং স্যাৎ সপ্তাঙ্গুলপ্রমাণতঃ।
তৎপীতমুক্তং যোগজ্ঞৈরাদি ষোড়শচক্রকম্।
ধ্যানানামথ মন্ত্রাণাং চিন্তনস্য জপস্যচ।
যস্মাদাদ্যঞ্চ হৃদয়ং তস্মাদাদীতি গদ্যতে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কালিকাপুরাণে ৫৪ অধ্যায়।

চৈতন্যের আদিস্থান হৃদয় বলিয়াই ইহার নাম "আদিচক্র" হইয়াছে।

ললাট যে প্রকৃত মনের অধিষ্ঠান স্থান নহে পরন্তু আত্মারই অধিষ্ঠান স্থান, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তান্ত্রিক বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়:—

"আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধেতু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত তন্ত্রসারঃ।

হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আমরা শরীরের প্রধান যন্ত্র বলিয়াছি। এই দুই যন্ত্রযোগেই আমাদের দেহমনের কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। (১) হৃদয়কে মনের অধিষ্ঠান বলিয়া বুঝিলে এবং মস্তিষ্ককে আত্মার অধিষ্ঠান বলিয়া বুঝিলে হৃদয় ও মস্তিষ্কের একযোগে কাজ মন ও আত্মার একযোগে কাজই বুঝিতে হয়। আমরা "মনেপ্রাণে" কার্য্যের কথা যে বলিয়া থাকি তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মন ও আত্মার যোগই বুঝায়। ইংরেজী 'Heart and Soul' কথায় এই যোগের কথা বিশেষরূপেই পরিস্ফুট। আত্মা যে মন হইতে পৃথক্ পদার্থ তাহা প্রধানতঃ নিদ্রায় স্বপ্ন-ব্যাপারের দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। স্বপ্নে আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকায় তখন কেবল মনেরই কার্য্য হইতে থাকে—তাহাতেই অনেক সময় স্বপ্নে অসম্ভব ঘটনা-পরম্পরা দৃষ্ট হয়। উন্মাদগ্রস্ত লোকদিগের মনের উপর আত্মার প্রভুত্ব না থাকাতে তাহাদিগকে অসংলগ্ন উক্তি ও অসঙ্গত কার্য্য করিতে দেখা যায়।

আমরা মন হইতে অতিরিক্ত যে প্রকৃত চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি—আমাদের দর্শনশাস্ত্রে তাহা আত্মতত্ত্বরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে; যথা—

"তত্তদ্ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সত্য স্বভাবং
প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বম্॥" ইতিশব্দকল্পদ্রুম।

এই বিশুদ্ধচেতনতত্ত্ব যে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলেরই বিকাশ ষট্‌চক্রের সহস্রার (সহস্রদল) পদ্মের বর্ণনায় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে; যথা:—

"সহস্রদল সমাকীর্ণং পরমাত্মপ্রকাশকম্।
নিত্যজ্ঞানময়ং সত্যং সহস্রাদিত্য সন্নিভম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৭ অধ্যায়ঃ

এস্থলে যে সহস্রদল পদ্মকে আমরা 'পরমাত্মার প্রকাশক' বলিয়া উল্লেখ পাইতেছি তাহা যে মস্তিষ্কের উপর বিস্তৃত স্নায়ুমণ্ডলেরই রূপকমাত্র এ কথা যাঁহারা মস্তিষ্কের আবরণকারী স্নায়ুমণ্ডলের চিত্র কোন শারীর বিজ্ঞানগ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছেন তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

এই সমস্ত হইতে আত্মার প্রধান লক্ষণ আমরা প্রকৃষ্টচৈতন্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। চিন্তাকেই এই চৈতন্যের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। চৈতন্য ও চিন্তা যে একই চিৎধাতু হইতে উৎপন্ন তাহাতেই উভয়ের যোগ প্রমাণিত হয়।

ললাটে আত্মার স্থান বলিয়াই যোগিগণ

(১) ইংরেজী "Head and heart" কথায় এই যোগের বিশেষ আভাসই পাওয়া যায়।

"আত্মাই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা।' ইন্দ্রিয় শব্দের ব্যুৎপাদনেও আমরা ইন্দ্র শব্দকে আত্মা অর্থেই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই; যথা—

"ইন্দ্রস্য আত্মনঃ লিঙ্গং ইন্দ্রিয়ম্॥"

উপনিষদে রূপকচ্ছলে আত্মাই সারথী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যথা:—

"আত্মানং সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ॥"

"আত্মা সারথি (চালক) ইন্দ্রিয়সকল অশ্ব আর মন অশ্বের বল্‌গা।"

মস্তিষ্কের পরমবিকাশরূপ আত্মা কেবল পার্থিব দেহেরই শেষ বিকাশরূপে শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হয় নাই—কিন্তু ইহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শেষ বিকাশরূপেও বিবেচিত হইয়াছে। তাহাতেই বিশ্বের চরম তত্ত্বরূপে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান যেমন "ব্রহ্মাণ্ড" নামে আখ্যাত হইয়াছে—ব্রহ্মরূপী আত্মার অধিষ্ঠানভূত বলিয়াই মস্তিষ্কও তদ্রূপ "ব্রহ্মরন্ধ্র" (২) নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সহস্রার পদ্ম যে পরমাত্মার প্রকাশক তাহা আমরা উপরি-উদ্ধৃত পুরাণের বর্ণনা হইতেই জানিতে পারিয়াছি।

ললাটদেশস্থ মস্তিষ্কের 'আজ্ঞাচক্র' নামক স্থান যে আত্মার অধিষ্ঠান তাহারও উল্লেখ আমরা উপরে পাইয়াছি। সহস্রারাধিষ্ঠিত আত্মা যেমন পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—আজ্ঞাচক্রাধিষ্ঠিত আত্মাও তেমনই জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃ যো বুদ্ধেঃ পরতস্তুসঃ॥" ৪
৩য় অধ্যায়ঃ।

"ইন্দ্রিয়গণকে (দেহাদি অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি পর (শ্রেষ্ঠ) তিনি সেই (আত্মা)।"

আত্মা প্রকৃত চৈতন্যতত্ত্ব বলিয়া আত্মার যোগ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্ভবপর হয় না—তাহাতেই আমাদের দর্শনে আত্মাকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ামকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যথা—"আত্মেন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠাতা।"

(২) জ্ঞাত্বা সুষুম্না সন্ভেদং কৃত্বা বায়ুঞ্চ মধ্যগম্॥
স্থিত্বা সদৈব সুস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিরোধয়েৎ॥
বিশ্বকোষধৃত হটযোগ দীপিকা। ৪।১৬

পরমাত্মা ললাটস্থিত স্নায়ুমণ্ডলে অধিষ্ঠিত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়যোগে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে বলিয়াই এই মণ্ডলের 'আজ্ঞাচক্র' নাম হইয়াছে। আত্মা যখন মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগবিরহিত হইয়া সহস্রারে স্ব-ভাবে অবস্থিত হয় তখনই ইহার কূটস্থ চৈতন্য অবস্থা বলা যায়। ইহাই পরমাত্মার ভাব—পরম ব্রহ্মভাব। যোগে আত্মাকে আত্মাচক্র হইতে আনিয়া সহস্রার চক্রে স্থাপন করিতে হয়। এইরূপে জীবাত্মা সহস্রারে আসিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয় বলিয়াই এই কার্য্যের নাম যোগ হইয়াছে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ যে যোগসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাতেও সমস্ত চিত্তবৃত্তির কার্য্য নিবৃত্ত করিয়াই যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ যে সহস্রার পদ্মকে আমরা পরমাত্মার অধিষ্ঠানরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই—তাহা পরমাত্মার অসংখ্য বৃত্তিরই রূপকমাত্র। অসংখ্যবৃত্তির কার্য্যসূত্ররূপেই স্নায়ুসকল সহস্রদলরূপে কল্পিত হইয়াছে। আত্মার বৃত্তিসকল বহির্মুখ হইলেই বাহ্যবিষয়সকল আরব্ধ হয়। বৃত্তিরূপে এই প্রকার আত্মা যে বাহ্যবিষয়সকলে ব্যাপৃত হয় তাহাই জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃত্তি সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় মূলকেন্দ্রে আসিয়া উপসংহৃত হইলে যে বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা উদ্ভাসিত হয়, তাহাই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। জীবাত্মা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হইতে যে পরমাত্মার সারূপ্য প্রাপ্ত হয় তাহাকে ইহার পরমাত্মায় লীন হওয়া বলিয়া কথিত হয়। ইহাই যোগের মূলকথা। এই মূল আত্মা বা পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম উভয়ের একই স্বরূপ সুতরাং উভয়ের মূলে এক তত্ত্ব। যোগের দ্বারা ঈশ্বরভাব সিদ্ধ হয় বলিয়াই যোগের অষ্টশক্তি, অষ্টৈশ্বর্য্য অর্থাৎ অষ্টঈশ্বরপ্রভাবনামে নির্দ্দেশ করা হয়। এই প্রকারে আমাদের মস্তিষ্কে কেবল আত্মারই বিকাশ হয় তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরত্ব, পরব্রহ্মত্বেরও যে বিকাশ হয় তাহাও আমরা এতক্ষণে বুঝিতে সমর্থ হইলাম।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়

(আদম্ সুমারি)

গত আদম্ সুমারিতে বঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা কত ছিল, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা জানা যায়ঃ

ধর্ম্ম	সংখ্যা ১৯১১ খৃঃ অব্দ
মুসলমান	২৪,২৩৭,২২৮
হিন্দু	২০,৯৪৫,৩৭৯
এনিমিষ্ট	৭৩০,৭৮০
বৌদ্ধ	২৪৬,৮৬৬
খৃষ্টান	১২৯,৭৪৬
জৈন	৬,৭৮২
ব্রাহ্ম	২,৯৫৮
শিখ	২,২২১
ইহুদী	১,৯৯৩
কনফিউসিয়ান	১,০৫৮
পার্শী	৬১১
আর্য্য	২০

হিন্দু ও মুসলমান

বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক; অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা ৫২·৩ জন মুসলমান, ৪৫·২ জন হিন্দু, এবং ২·৫ জন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা

সর্ব্বত্র সমান নয়; পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম, পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং উত্তর ও মধ্যবঙ্গে মাঝামাঝি।

	হিন্দুর সংখ্যা শতকরা
পশ্চিম বঙ্গ	৮২
মধ্য বঙ্গ	৫১
উত্তর বঙ্গ	৩৭
পূর্ব্ব বঙ্গ	৩১

বঙ্গে ১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ-কালের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। এ বৃদ্ধির হারও আবার বঙ্গের সর্ব্বত্র সমান নয়—

হিন্দুর বৃদ্ধির হার

পূর্ব্ববঙ্গ	৬.৬	শতকরা
মধ্য বঙ্গ	৫.২	"
উত্তর বঙ্গ	৩	"
পশ্চিম বঙ্গ	২	"

যেখানে হিন্দুর সংখ্যা যত কম, বৃদ্ধির হারও সেখানে সেই পরিমাণে বেশী।

বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু সর্ব্বত্র সমান নয়, পূর্ব্বে বেশী, পশ্চিমে কম।

	মুসলমান সংখ্যা শতকরা
পশ্চিম বঙ্গ	১৩
মধ্য বঙ্গ	৪৮
উত্তর বঙ্গ	৫৯
পূর্ব্ব বঙ্গ	৬২

হিন্দুর ৬ অংশ পশ্চিম বঙ্গে, ৯ অংশ পূর্ব্ব বঙ্গে, এবং ৯ অংশ মধ্য ও উত্তর বঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়; মুসলমানের ৯ অংশ পূর্ব্ববঙ্গে, ৯ অংশ উত্তর বঙ্গে, এবং ৬ অংশ মধ্যবঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১০.৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে; কিন্তু বৃদ্ধির হার সর্ব্বত্র সমান নয়—

মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার	
পূর্ব্ব বঙ্গ	১৪.৬
উত্তর বঙ্গ	৮.২
পশ্চিম বঙ্গ	৪,৯
মধ্য বঙ্গ	৩.১

যেখানে মুসলমানের সংখ্যা যত বেশী সেখানে বৃদ্ধির হারও তত অধিক।

বঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে; মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা হিসাবে তিনগুণ বাড়িয়া যাইতেছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুরা শতকরা ১৬ জন হিসাবে বাড়িয়াছে, কিন্তু মুসলমানের বৃদ্ধির হার শতকরা ২৯ জন হিসাবে। গেটসাহেবের মতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের এই সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ—

(১) তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের সমধিক প্রচলন;

(২) স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের মধ্যে সামান্য পার্থক্য;

(৩) পুষ্টিকর আহার;

(৪) উন্নত আর্থিক অবস্থা

এবং এই সব কারণে তাহাদের উর্ব্বরতাও সমধিক।

আবার ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

	কুমারী	সধবা	বিধবা
হিন্দু	২	৭৬	২২
মুসলমান	২	৮৭	১১

১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা

হিন্দু	১,২৩৮,১৮৯
মুসলমান	১,১৮১,২৮৭

মুসলমানের সংখ্যা অধিক, উর্ব্বরতা অধিক এবং স্ত্রীলোকের পতিপ্রাণও অধিক সেই জন্যই তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিধবা-বিবাহ এবং বহুবিবাহও এ বৃদ্ধির হার কিয়ৎপরিমাণে বাড়াইয়া দিতেছে।

এনিমিস্ট*

পশ্চিম বঙ্গে, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অনুর্ব্বর অংশে, প্রায় তিন লক্ষ এনিমিষ্ট (অধিকাংশই সাঁওতাল) বাস করে; মালদহ, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় ২৩৮,০০০ ঔপনিবেশিক সাঁওতাল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ময়মনসিং ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে কোচ, কুকি, মরং, ক্ষামী, ত্রিপুরা প্রভৃতি জাতি দেখা যায়।

* Primitive Religionist.

এনিমিষ্টদের সংখ্যা ১৯০১ হইতে ১৯১১ [illegible] মধ্যে শতকরা ৬৫ জন হিসাবে [illegible]য়াছে; বৃদ্ধির কারণ বঙ্গের বিভিন্ন [illegible] ইহাদের ঔপনিবেশ-বিস্তার।

বৌদ্ধ

কলিকাতায় বিস্তর বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী চীনা [illegible]খিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ১৯১১ [illegible]ব্দের আদম সুমারিতে বঙ্গের বিভিন্ন [illegible]নায় বৌদ্ধধর্ম্মের সংখ্যা ছিল,—

[illegible]টগ্রাম বিভাগ	১৭৩, ১৯৪
[illegible]বরগঞ্জে	৮, ৮২৮
[illegible]র্দ্ধমান ত্রিপুরায়	৫, ৯৯৭
	১৮৮, ০১৯
[illegible]র্জ্জিলিংয়ে	৪৭, ৯০৫
[illegible]কিমে	২৮, ৯১৫
[illegible]লপাইগুড়িতে	৮, ০৫৪
	৮৪, ৮৭৪

এখন বঙ্গের পূর্ব্ব দক্ষিণে এবং উত্তর [illegible]শে মগ, নেপালী, ভুটিয়া ও লেপছা [illegible]তির মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে [illegible]ওয়া যায়।

শিখ ও জৈন

১৯১১ সালের গণনার সময় কলিকাতায় [illegible]খের সংখ্যা ছিল, ৯৩২ জন এবং জৈনের [illegible]খ্যা সমগ্র বঙ্গদেশে ৬৭৮২ জন। জৈনদের [illegible]ধিকাংশই মাড়োয়ারী।

ব্রাহ্ম

১৯১১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় আদম সুমারিতে [illegible]হ্মের সংখ্যা ছিল ৩৫৪৩, জন এবং [illegible]৯০১ খৃষ্টাব্দে ছিল, ৩১৭১ জন। দশ বৎসরে ব্রাহ্মের সংখ্যা কেবলমাত্র ৩৭২ বাড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, নূতন কেহ বড়-একটা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন না। উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারের সহিত লোকের গোঁড়ামি কমিয়া যাইতেছে এবং আধুনিক হিন্দুর দল ব্রাহ্ম নামে অভিহিত হইবার কোন আবশ্যকতাও বিবেচনা করেন না। আবার ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও হিন্দু-আখ্যায় অভিহিত হইবার প্রবল ইচ্ছাও দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন কলিকাতায় বাস করেন; বাকীর অধিকাংশ মফঃস্বলের বড় বড় সহরে বাস করেন; পল্লীগ্রামে ব্রাহ্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিগত আদম সুমারিতে পল্লীগ্রাম হইতে কেবলমাত্র ৫৭৪ জন ব্রাহ্মের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল।

ইহুদি, পার্শী ও কন্‌ফিউশন

বঙ্গদেশের সমগ্র ২,০১৮ ইহুদীর মধ্যে ১৯১৯ জন কলিকাতায় বাস করে। ইহারা আবার দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ স্পেনদেশীয় ইহুদী, ধর্ম্মের তাড়নায় স্পেন পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে আসিয়া বহুকালাবধি বসবাস করিতেছে; অপর একভাগ আরব ও তুরস্ক হইতে এদেশে আসিয়া ইদানীং বাস করিতেছে। ইহুদীদের ৬ অংশের ভাষা ইংরাজী, বাকীরা হিব্রু কিংবা আরবি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহুদীদিগের ৬ অংশের জন্মস্থান কলিকাতা, বাকী ৬ অংশের জন্ম আরবে।

পার্শী বণিকেরা সকলেই জোরোয়াষ্টার মতাবলম্বী; চীনা মুচী ও ছুতারেরা কতক

কনফিউসান মতাবলম্বী, কতক-বা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। চীনাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে।

খৃষ্টান

বঙ্গে গত আদম সুমারিতে ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, ও ইউরোপীয় জাতি-সম্ভূত অপর জাতির সংখ্যা ছিল ২৪,৩৮৮; আরমানীর সংখ্যা, ১০৬৩, এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা ছিল ১৯, ৮৩৩ জন। কলিকাতায় শতকরা ৫৫ জন ইউরোপীয়ান, ৭৭ জন আমেরিকান ও ৭১ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাস করে।

উক্ত ইউরোপীয়ানদের ½ ভাগ বৃটিশ প্রজা এবং সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজের সংখ্যাই অধিক। গত আদম সুমারিতে কলিকাতায় ইউরোপীয়ানের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া গিয়াছিল—

ইংরাজ	...	৯,২১৫
আইরিস	...	৯৯০
স্কচ	...	১,৫৮৪
জার্ম্মান	...	২৮০
ফরাসী	...	২১২

সমগ্র বঙ্গে ১৪,৭৫১ জন (প্রায় অর্দ্ধেক) ইউরোপীয়ান যুক্তরাজ্যে জন্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ১১, ০২৯ জন ইংরাজ।

ইউরেশীয়ানদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন এনগ্লিকান, ২০ জন রোমান কাথলিক, এবং ১০ জন প্রেসবিটেরিয়ান।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের (অর্থাৎ ইউরেশীয়ানদের) মধ্যে শতকরা ৫৮ জন রোমান কাথলিক, ৩২ জন এংগ্লিকান, ব্যাপটীষ্ট, মেথডিষ্ট অথবা প্রেসবিটেরিয়ান।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রায় ১২০ জন পূর্ব্ববঙ্গীয় ফিরিঙ্গী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহারা বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি চট্টগ্রামে বাস করে; প্রায় সকলেই এক রোমান কাথলিক ও ওলন্দাজ দস্যুবংশ সম্ভূত। ইহারা এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদে বিবাহ করে এবং ইহাদের আচার ব্যবহারও কতকটা এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণী মত; প্রভেদ যা-কিছু তা কেবল খাদ্য পরিচ্ছদে, নামে ও বর্ণের উজ্জ্বলতায়।

মেদিনীপুর জেলায় গোঘাটের নিক কতকগুলি ফিরিঙ্গী বাস করে। অষ্টাদ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহিষাদলের রাজা বর্গী হাঙ্গামা হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করিবা জন্য চট্টগ্রাম হইতে যে কতক ওলন্দা গোলন্দাজ আনাইয়াছিলেন, ইহারা তাহাদের বংশধর। ইহাদের সংখ্যা অল্প—১২৯ জ মাত্র। ইহারা নাম ও ধর্ম ছাড়া সক বিষয়েই সাধারণ বাঙ্গালীর মত।

আরমানীরা বঙ্গে ন্যূনাধিক তিন শতাব্দী কাল ধরিয়া বাস করিতেছে। বাণিজ্য করিবার জন্য ইহারা সুতানটীতে (বর্ত্তমান কলিকাতা) জব চার্ণকের অন্ততঃ ৬০ বৎস পূর্ব্বে এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আরমানীরা সম্রাট ঔরঙ্গ জেবের নিকট হইতে পরওয়ানা পাইয়া মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ সৈয়দাবাদ গ্রামে উপ নিবেশ স্থাপন করে, এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এতদ্দে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পায়। ইহারা

বণিক প্রধানতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায় করিত, তথাপি রাজদ্বারে তৎকালে ইহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল; আরমানী বণিক খোজা সারহদের প্রভাবে ইংরাজেরা মোগল সম্রাট ফারুকসিয়রের নিকট হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল। আরমানীদের মধ্যে অনেকে তদ্দেশে বাদশাহগণের সৈন্য-বিভাগে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিল; গুরগন্ খাঁ (খোজা গ্রেগরি) মীর কাশেম আলির প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

১৯১১ সালে বঙ্গে ১,০৬৩ জন আরমানী ছিল এবং ইহাদের ½ অংশের বাস কলিকাতায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই সাদীনন্তন পারস্যের জুলফা নামক স্থান হইতে আসিয়াছে। ইহারা যখন কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করে, তখন ইংরাজী ভাষা মোটেই জানিত না, কিন্তু অল্পকাল পরে ইংরাজী ভাষা শিখিয়া লয় ও ইংরাজী চাল-চলনের অনুকরণ করে। কলিকাতাবাসী আরমানী পুরুষদের অর্দ্ধেকের জন্ম পারস্য দেশে; কিন্তু পারস্যদেশীয় আরমানী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প।

গত আদম্ সুমারিতে বঙ্গে ৮৩,২৬০ জন দেশী খৃষ্টান পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০১ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে বঙ্গদেশে ২৩, ১৫০ (অর্থাৎ শতকরা ২১.৭ জন) দেশী খৃষ্টান সংখ্যায় বাড়িয়াছে; কিন্তু ছোটনাগপুর বিভাগে ৯৫,৭৬৭ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫.৫ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা ছোটনাগপুরে খৃষ্টান ধর্ম্ম অধিকতর প্রখরভাবে আদিম নিবাসীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। একমাত্র রাঁচিতেই দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গের সংখ্যার দ্বিগুণ। নিম্ন তালিকা হইতে বঙ্গের নেটিভ খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা জানা যাইবে—

রোমান কাথলিক	২৮,৮৮৫
লুথারেন্	৩,৯৭৬
এন্গ্লিকান	১৮,০০৮
ব্যাপ্টিষ্ট্	২২,৯০৩
প্রেস্বিটেরিয়ান্	৪,১১৫
মেথডিষ্ট্	৩,০৩৭
কন্গ্রিগেসন লিষ্ট্	২,৩৩৬
	৮৩,২৬০

বঙ্গে লেপছা ও সাঁওতালদের মধ্যে "নেটিভ খৃষ্টানে"র সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ছোটনাগপুরে ওরাওঁ, মুণ্ডা, খাড়িয়া ও সাঁওতালদিগের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে।

আদিম নিবাসীদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মের অধিকতর প্রসার লাভের একটি কারণ বোধ হয় এই যে, তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও স্বজাতীয়ের সহিত সংস্রব-সম্পর্ক হারায় না; এমন কি একসঙ্গে পান-ভোজনেও তাহাদের কোন বাধা থাকে না। অপর একটি কারণ এই যে তাহারা ইচ্ছা করিলে খৃষ্টান ধর্ম্মে ইস্তফা দিয়া আবার স্বধর্ম্মে ফিরিতে পারে। আবার খৃষ্টান হইবার পক্ষে তাহাদিগের প্রধান প্রলোভনও এই যে, পাদ্রী সাহেবেরা তাহাদিগকে জমিদারের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবেন ও তাহাদের জমি-জমা লইয়া যে সকল

বিবাদ-বিসম্বাদ বাধে, তাহাতে সাহায্য করিবেন। পাদরী সাহেবদের চেষ্টায় তাহাদের ভূমি-সংক্রান্ত আইনেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পার্ব্বত্য জাতিদিগকে বাদ দিলে দেখা যায় যে খৃষ্টান ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে নিম্ন-জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ উচ্চজাতীয় হিন্দু খৃষ্টান হইলে স্বজনের সহিত সকল সংস্রব তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়; গৃহ-ত্যাগীও হইতে হয়। কিন্তু নিম্নজাতীয় হিন্দু খৃষ্টান হইলে বরং সে মর্য্যাদা লাভ করে, সমাজে স্থান পায়,—যেন এক ধাপ উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

হিন্দুত্ব

হিন্দু কে? সিন্ধু নদের অপর পারে যে বাস করে। হিন্দু শব্দ পারসী ভাষা হইতে উদ্ভূত। সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে যাহারা বাস করিত, পারসিকেরা তাহাদিগকে হিন্দু বলিত। কালক্রমে 'হিন্দু' আখ্যা প্রসার লাভ করিয়া এক বিশেষ-সমাজ-বন্ধনে-বদ্ধ, এক বিশেষ-ধর্ম্মাবলম্বী ভারত-বাসী জাতি-সমষ্টিকে বুঝাইতেছে। শুধু ভারতবর্ষে বাস করিলে, কিংবা কোন বিশেষ জাতিভুক্ত হইলে, কিংবা কোন বিশেষ প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত অবলম্বন করিলেই হিন্দু হয় না। যে কেহ হিন্দু হইতে পারে না—হিন্দুর ঘরে না জন্মিলে হিন্দু হওয়া যায় না; হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খৃষ্টান হইতে পারে, কিন্তু মুসলমান বা খৃষ্টান হিন্দু হইতে পারে না। বৈষ্ণব এক পন্থাবলম্বী, শাক্ত অপর পন্থাবলম্বী, কিন্তু উভয়েই হিন্দু; আবার বৈদান্তিক যে সেও হিন্দু। কেবল ধর্ম্ম মত বা মার্গের উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। একেশ্বর-বাদ, অনেকেশ্বর-বাদ, নিরীশ্বর-বাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সবই হিন্দু ধর্ম্মে স্থান লাভ করিয়াছে। মতসম্বন্ধে হিন্দু অত্যন্ত উদার। কিন্তু আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হিন্দু অত্যন্ত কঠোর। আচার-ভ্রষ্ট হইলে হিন্দুত্ব লোপ পায়। হিন্দুর সমাজ আচারের উপর গঠিত, ধর্ম্ম তাহার ইহার একটি অঙ্গ। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আচারই অভিব্যক্তির প্রধান অবলম্বন। সামাজিক অভিব্যক্তি সামাজিক আচারের উপর নির্ভর করে, সামাজিক আচার ত্যাগ করিলে সামাজিক অভিব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সামাজিক আচারই সমাজের ধর্ম্ম; আচারই সমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছে; আচারই আত্মরক্ষার মূল। সামাজিক অভিব্যক্তি ধাপের পরে ধাপ ধরিয়া চলিতেছে; এক একটি জাতি অভিব্যক্তির পথে এক একটি ধাপ; এবং প্রতি জাতির আচারের উপর ইহার অভিব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। সনাতন ধর্ম্মে অভিব্যক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। যে হিন্দু সমাজের উপযোগী আচার পালন করে, সে "হিন্দু"; যে করে না, সে অহিন্দু, "ম্লেচ্ছ"।

গত আদম সুমারিতে হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে কি প্রভেদ তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল—(১) যে কোন বিশেষ দেবতার পূজা করিলে হিন্দু আখ্যা দেওয়া যায় কি না; (২) হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিলে, হিন্দু বলা যায় কি না; (৩) সদ্‌ব্রাহ্মণ যাহার পৌরোহিত্য করে, সে হিন্দু কি না; (৪) পতিত ব্রাহ্মণ যাহার পুরোহিত, সে হিন্দু কি না; (৫) উচ্চজাতীয়েরা যাহাদের জল গ্রহণ করে তাহারই কেবল হিন্দু কি না; এবং (৬) অস্পৃশ্য জাতিরা হিন্দু কি না!

কেহ দুর্গা, কেহ কালী, কেহ হরি, কেহ হর, কেহ মনসা, কেহ শীতলা, কেহ ষষ্ঠী, কেহ বা গণেশের পূজা করে। সকলেই হিন্দু; হিন্দুর দেবতা অসংখ্য; সুতরাং কোন বিশেষ দেবতার পূজার উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার ও পূজা দিবার অধিকার থাকিলেই কাহাকেও হিন্দু বলা ঠিক হয় না। অনেক নিম্ন-জাতি আজও দেবমন্দিরে যাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তজ্জন্য তাহারা অহিন্দু নহে। আবার নিম্নজাতীয় হিন্দু মন্দির স্থাপন ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং সে বিগ্রহের পূজা করিতে পারে না; পূজার ভার ব্রাহ্মণের উপর। অহিন্দু "ফিরিঙ্গী" বহুবাজারে "ফিরিঙ্গী কালীর" পূজা দেয় বলিয়া সে হিন্দু হইয়া যায় না। পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম, চামার, বাগ্‌দী, তেওর, শুঁড়ি প্রভৃতির প্রবেশের অধিকার নাই; গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দিরে চামার, ধোপা, ডোম ও মুচিরা প্রবেশ করিতে পারে না; সেজন্য তাহারা কেহই অহিন্দু নহে।

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়, হিন্দুত্ব ধর্ম্মমতের উপর নির্ভর করে; লৌকিক আচারের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমান-বঞ্চিত শত সহস্র হিন্দুর চক্ষে হিন্দুয়ানী হিন্দুর চাল-চলন ও হিন্দুর আচার-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। হিন্দুত্ব বলিলে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মমত, জাতিভেদ, জন্মস্থান লৌকিক আচার ও সামাজিক মঙ্গলের সমষ্টি বুঝায়। সেজন্য কেবল ধর্ম্মমত, বা পূজা-পদ্ধতি, বা জাতি-গত ভেদ, বা আচার-ব্যবহার, বা ব্রাহ্মণের শাসনের উপর হিন্দুর পরিচয় নির্ভর করে না। এই কারণে গত আদম সুমারিতে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে হিন্দু নামে পরিচিত অনেক জাতি আছে, যাহারা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে না; বেদ মানে না; হিন্দুর প্রধান প্রধান দেবতার পূজা করে না; সদ্‌ব্রাহ্মণ যাহাদের পৌরোহিত্য করে না; যাহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত মোটেই নাই; হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশে যাহাদিগের অধিকার নাই; যাহারা অস্পৃশ্য; যাহারা শব দাহ না করিয়া সমাহিত করে; এবং যাহারা গো-খাদক।

বৈষ্ণব, যুগী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, চথমা ও কোরা জাতিরা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে না। বাউরি, ভুঁইয়া, চামার, কোরা, মুচি, মুণ্ডা ও সাঁওতালেরা ব্রাহ্মণ বা কোন হিন্দু গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে না। সুব্রাহ্মণে বাগ্দী, বৈষ্ণব, বাউরি, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চথমা, চামার, চাষাধোপা, ধোপা, ডোম, হাড়ি, যুগী, জেলে, কৈবর্ত্ত, কলু, কাওরা, কাপালী,

কোচ, কোরা, মাল, মালো, মুচি, মুণ্ডা, নমঃশূদ্র, ওরাওঁ, পাটনী, পোদ, রাজবংশী, সাঁওতাল, সাহা, সোণার, সুবর্ণবণিক, শুঁড়ি, ছুতর ও তেওর প্রভৃতি জাতির পৌরোহিত্য গ্রহণ করে না। বৈষ্ণব, বাউরি, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চকমা, চামার, ডোম, হাড়ি, যুগী, কাওরা, কোরা, মাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির আদৌ ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। বাগ্‌দী, বাউরি, ভুঁই মালী, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চামার, ধোপা, ডোম, হাড়ি, যুগী, কলু, কামার, কাওরা, কাপালী, কোরা, মাল, মুচি, নমঃশূদ্র, পোদ, রাজবংশী, সাঁওতাল, সাহা, সোনার, শুঁড়ি ছুতার ও তেওর প্রভৃতি জাতির হিন্দুর দেব-মন্দির-প্রবেশে অধিকার নাই। বাগ্‌দী, বাউরি, ভুঁইমালী, ভূমিজা, ভূঁইয়া, চামার, ধোপা, ডোম, হাড়ি, কাওরা, কোরা, মাল, মুচি, মুণ্ডা, ওরাওঁ, পোদ, সাঁওতাল, মুঁচি ও তেওর অস্পৃশ্য। বৈষ্ণব ও যুগীরা তাহাদের শব দাহ না করিয়া পুঁতিয়া ফেলে। বাউরি, চামার, ডোম, হাড়ি, কাওরা, কোরা, মাল, মুচি, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে গোখাদক দেখা যায়।

বেদ মানে না বা হিন্দু দেবতার পূজা করে না, এরূপ হিন্দু জাতি বঙ্গে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে গতিবিধি ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়ায়, হিন্দুদের মধ্যে "ছোঁয়াছুতের" ভাব ক্রমশ শিথিল হইয়া যাইতেছে। অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যে শব দাহ না করিয়া সমাহিত করিবার কারণ বোধ হয় তাহাদিগের দারিদ্র্য, কাঠ কিনিবার অক্ষমতা। যে সকল গো-খাদক নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কসাইয়ের দ্বারা গোহত্যা করায় না, বা গোমাংস খরিদ করিয়া খায় না, তাহারা কেবল মৃত গরুর মাংস ভোজন করে। উপর্য্যুক্ত তালিকায় অনেকগুলি জাতির নামোল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা প্রকৃতপক্ষে এনিমিষ্ট, প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাদিগকে হিন্দু বলা ঠিক নহে।

বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের অধিকাংশই আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগের বংশধর; এবং তাহারা অল্পকাল হইতে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। পশ্চিম বঙ্গের অনুর্ব্বর প্রান্ত ও ছোটনাগপুরের অধিত্যকা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে অনার্য্য ভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। বৈবস্বত পুরাণে বীরভূমি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং তথায় কৃষ্ণকায়, নীতি-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-বিহীন এক জাতির বাস ছিল বলিয়াও জানা যায়; বরাহভূমিতে (মানভূম ও বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে) ধর্ম্মহীন, বন্য ও সঙ্কুচ, তস্কর-দস্যুদের বাস ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে; তাহারাই বোধ হয় "চোয়াড় জাতীয়" আধুনিক বাগ্‌দী, বাউরি, ও ভূমিজ। আর্য্যজাতীয়েরা ক্রমশ বঙ্গদেশ অধিকার করায় অধিকাংশ অনার্য্য জাতি পাহাড় পর্ব্বত, উপত্যকা, অধিত্যকা, বনে ও জঙ্গলে পলাইয়া যায়, এবং সামান্যভাগ আর্য্যদের দাসত্ব স্বীকার করে এবং ক্রমশ তাহাদের ধর্ম্ম ও ভাষাও গ্রহণ করে। অহিন্দু অনার্য্য কিরূপে এখনও হিন্দুত্ব লাভ করিতেছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অহিন্দু

লাভ করিবার এক প্রকৃষ্ট উপায়, পুরোহিত নিয়োগ করা। যে জাতি কে পুরোহিতরূপে নিয়োগ করিতে হইয়াছে, সেই জাতিই হিন্দু বলিয়া দিবার অধিকার পাইয়াছে। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হইতে পারে, তাহাতে কিছুই যায় না—শুধু ব্রাহ্মণ হইলেই হইল। চারণীয় জাতীয়েরা স্বজাতীয় "পণ্ডিত" ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ তে পারিলেই হিন্দু-আখ্যা লাভ য়া, ক্রমশ সদ্‌মর্য্যাদাও প্রাপ্ত হয়। ও দেখা যায়, কোন কোন জাতি ণ্ডিত"-স্বত্বেও ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে, া পণ্ডিতদিগকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ াগ করে, আবার কেহ-বা পণ্ডিত-বংশ া পাইলে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে। ণেরা ক্রমশ পণ্ডিতদিগকে অপসারিত তেছে। পূর্ব্বে হাড়িদিগের পুরোহিত ত্রিমূর্ত্তি সংজ্ঞা-ধর্ম্ম-মিত্রের মধ্যে "ধর্ম্মকে" করিত; এখন ব্রাহ্মণেরা "ধর্ম্ম"কে া শিব বলিয়া পূজা করে।

বর্ত্তমান হিন্দুয়ানি

শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দু দর্শন ও পুনরনুপ্রাণিত ও পুনরভ্যুদিত হইয়াছে। রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ র, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব ও তাঁহার ণ্ডলী এবং থিয়সফিষ্টেরা হিন্দুশাস্ত্র লোচনা করিবার ফলে বাঙ্গলা দেশে স্ত্রের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ য়াছে। বৈদান্তিকেরা সাধারণত উদার বলম্বী; আচার-ব্যবহার, এবং পানাহার প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন গোঁড়ামি নাই।

বৈদান্তিক

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের উক্তি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বেদান্তের সার কথাও বাঙ্গালী জানিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে পরমহংস দেবের শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রয়াস করেন এবং সম্যকরূপে বেদান্ত-চর্চ্চার নিমিত্ত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "রাম কৃষ্ণ-মিশন" স্থাপন করেন। খৃষ্টান-মিশনের ন্যায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, আতুর ও রোগগ্রস্ত জীবের সেবাশ্রম-স্থাপন এবং ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার করিতেছে। বৈদান্তিক অত্যন্ত উদার; সকল ধর্ম্মই তাহাতে লীন হয়; যে, যে পথে থাকিয়া ভগবানকে সর্ব্বান্তঃকরণে পাইতে চাহে, সে সেই পথেই তাঁহাকে পাইবে; তুমি যে পথে যাও, চাহিলে তাঁহাকে পাইবেই!

জ্যোতিঃস্বরূপ উপাসনা

কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে গাজিপুর হইতে পরমহংস শিবনারায়ণ বঙ্গে আসিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ উপাসনা-পদ্ধতি প্রচার করেন। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং পরমহংসদেব সেই জ্যোতিঃস্বরূপের একাগ্র উপাসনা-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। জাতি-ভেদ বা প্রতিমা-পূজা তাঁহার শিক্ষায় স্থান পায় নাই।

রাধাস্বামী

আগ্রা-নিবাসী শিব দয়াল সিং রাধাস্বামী

সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই; এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে কোন হিন্দুকে তাহার সামাজিক আচার-ব্যবহারও পরিত্যাগ করিতে হয় না। আত্মার মুক্তি কেবল যোগ-সাধনায় সম্ভব; কিন্তু সদ্‌গুরু ব্যতীত তাহা ঘটিতে পারে না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতাতেও অনেক রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী আছেন।

হরিসভা

হরিসভা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়! জ্ঞান-মার্গ সাধারণের নহে; কিন্তু ভক্তি-মার্গ জন-সাধারণেরই। হরি-সভায় ভক্তি-পথে সাধারণের মুক্তির ব্যবস্থার নিমিত্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত ও পুরাণাদি পাঠ, হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। দেব-মন্দিরে দেব-পূজায় সাধারণের অধিকার নাই; কেবল ব্রাহ্মণেরই পূজায় অধিকার; বিনা "মারফতে" কোন পূজা সম্ভব নহে। কিন্তু হরিসভায় দোল, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসবের সময় পূজা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে; হরি-সভায় সকলেই যোগদান করিতে পারে। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই হরিসভায় যোগদান করিয়া থাকে।

গীতাসভা

জন-সাধারণের মধ্যে গীতার উপদেশ প্রচারই গীতা-সভার উদ্দেশ্য। পল্লীতে পল্লীতে হরিসভা এবং নগরে নগরে এখন গীতা-সভা দেখিতে পাওয়া যায়; উভয়েরই উদ্দেশ্য ধর্ম্মতত্ত্ব জন-সাধারণের নিকট সহ সুবোধ্য করিয়া তোলা।

কর্ত্তাভজা

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জগৎ- ভজনা করে; ইহাদের সংসার- ব্যবস্থা নাই; সংসার-ধর্ম্মপালনই এবং সংসার-আশ্রমে কর্ত্তা ক একাগ্র করিলে সামীপ্য-মুক্তি হই থাকে। ভজারা মিথ্যা কথা বলে না, প্রতিদিন বার—সাম্প্রদায়িক মন্ত্রোচ্চারণ করে, শুক্রবারে উপবাস, ধ্যান ধারণা, ধ ও "মজলিস" করিয়া থা । তাহা ও মাংস আহার করে না; এবং পাড়ার মেলায় উৎসব উপলক্ষে যথ যোগদান করিয়া থাকে। ইহারা সম্প্র বাহিরে সামাজিক আচ ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করে না; কিন্ত ভাদের সম্প্র ভিতর ছোট-বড় বিচার নাই, সকলে জাতিভেদ নাই। সাধারণ লোকের ইহাদের গূঢ়তত্ত্ব প্রচারিত না হওয়ায় এবং ইহাদের নিত্যক্রিয়াকলাপ চক্ষুর অলক্ষ্যে হওয়ায়, সাধারণ ধারণা যে অন্তরালে ইহারা বীভৎস সংঘটিত করিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৈষ্ণবদিগের "সহজ প্রচলিত ছিল; কর্ত্তাভজার সহিত সহ প্রভেদ এই যে বৈষ্ণবের মার্গ ভক্তি কর্ত্তাভজার মার্গ জ্ঞান।

বাউল

বাউল এক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্র জনসাধারণের মধ্যে ইহারা ভগবদ্

াহিরা বেড়ায়; চুল বা নখ কাটে তেরো তালি দেওয়া ময়লা আলখাল্লা থাকে, হাতে সর্ব্বদাই গোপীযন্ত্র ।

তীমার দল

হা একটি নূতন সম্প্রদায়। মুর্শিদাবাদ, ও কলিকাতা অঞ্চলেই ইহাদের ইহারা শক্তির উপাসক। ইহারা র-ধর্ম্ম পালন করে; পুরুষেরা বড় চুল ও নখ রাখে; স্ত্রীলোকেরা জটা রাখে। ইহারা মদ্য মাংস ন করে না; ব্যারাম হইলে ঔষধ না, সতীমার পীঠের মাটি মাথায় য়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মেলা- র বাধা নাই। এই সম্প্রদায়টি বোধ কর্ত্তাভজাদেরই একটি শাখা। কর্ত্তা- র দল পুরুষ কর্ত্তার ভজনা করে এবং মার দল প্রকৃতিরূপী আদ্যাশক্তি সতীকে না করে, এই যা প্র ভেদ! নতুবা দের আচার-ব্যবহার, করণ-কারণ তিতে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। রামশরণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক; তাঁহার স্ত্রীকে ী-মা" বলা হইত; যে গাছের তলায় -মার সমাধি হইয়াছিল, সেখানকার একটু অঙ্গে ছোঁয়াইতে পারিলে সকল প্রকার ধি সারিয়া যায় ও সকল পাপ বিদূরিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

কালাচণ্ডী

নদীয়ায় এক নূতন বৈষ্ণব দল দেখা াছে, ইহাদিগকে "কালাচণ্ডী" বলে; গণ কালাচাঁদ ইহাদের সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা নাই, তীর্থস্থান নাই, জাতিভেদ নাই। ইহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক।

মাণিক-কালীর দল

মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগে মাণিককালীর দল বলিয়া একটী সম্প্রদায় আছে; হেদা-রাম দাস,—জাতিতে কৈবর্ত্ত,—এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি উড়িয়া ভাষায় আগম পুরাণ প্রভৃতি শিখিয়াছেন, এখনও জলমুথা পরগণার অন্তর্গত গোপীনাথপুর গ্রামে ইঁহার পাদুকা ও আগম পুরাণের নিত্য পূজা হইয়া থাকে। হেদারাম নিজে সাধক ছিলেন; মাণিক কালী তাঁহার মত প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করে। মাণি-কের বুলি ছিল, "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"। মাণিকের দলে জাতিভেদ নাই।

সাঁই

ইদানীন্তন বাঁকুড়া জেলায় সাঁই নামক একটি নূতন সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবান সাঁই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা অপ্রত্যক্ষ দেবতায় বিশ্বাস করে না; গুরুই ইহাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহারা গুরুর উপাসনা করে। ইহাদের গুরুর উপদেশ—মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, স্ত্রী-সহবাস না করা, সাধু-সঙ্গে বাস করা, ও আত্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা করা।

শিক্ষাপড়া

ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র শাখা; মধ্য বাঙ্গালায় ইহাদের করেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিশ্বাস

শ্রীকৃষ্ণই এ বিশ্বে একমাত্র পুরুষ, তদ্ব্য-তীত সবই প্রকৃতি; স্ত্রীলোকের শ্রীকৃষ্ণই স্বামী; এ জগতে গুরুই শ্রীকৃষ্ণ-স্থানীয়; এবং সেই গুরুরই পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই।

বিবিধ মুসলমান সম্প্রদায়

মুসলমানদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে প্রতি শতাব্দীর প্রারম্ভে খোদা তাঁহার ইমামকে ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ ও সংস্কার করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন; এবং প্রলয়ের পূর্ব্বে মাহদি আবির্ভূত হইয়া, দজ্জলকে শাসন করিয়া, জগতে ইসলাম ধর্ম্ম 'প্রোথিত' করিবেন। আধুনিক কয়েকটি মুসলমান সম্প্র-দায়ের মূলে উক্ত বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান সম্প্রদায়গুলি ওহাবি সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদ ইব্‌ন অবদুল ওহাব নামে আরব্যদেশীয় এক ধর্ম্মসংস্কারক ওহাবি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ওহাবিরা উৎকট ধর্ম্মনিষ্ঠ; ইহারা স্বাধীনভাবে কোরাণ ব্যাখ্যা করে; গোঁড়া মুসলমান দিগের হনিফা, মালিক, সফি, ও হনবল নামক চারিজন ইমামের মত গ্রাহ্য করে না; ইহারা মৃত পীর প্রভৃতির পূজা নিষেধ করে; এবং বিধর্ম্মীর সহিত জেহাদ কর্ত্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করে।

ভারতে সৈয়দ মহম্মদ ওহাবি-মত প্রচারকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মক্কায় গমন করিয়া ওহাবের শিষত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারতে প্রত্যা-গমন করিয়া পীর পূজা নিষেধ ক মৃতব্যক্তির পূজায় কোন লাভ নাই ব প্রচার করেন, সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ ক নিষেধ করেন এবং বিধর্ম্মীর সহিত জে করিতে উপদেশ দেন। বাঙ্গালাদে বর্ত্তমান মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সকল মত সমধিক প্রচার লাভ করিয়াছে।

তিতুমিয়া বঙ্গে ওহাবি ধর্ম্ম প্র করিবার বাসনায় জেহাদ করেন; ১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৩৭ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ২৪-পরগণা, নদীয়া ফরিদপুরে বলপূর্ব্বক কতকগুলি হিন্দু ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, গোঁড়া মু মানদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, অনেক গ্রাম লুণ্ঠন করেন এবং প্রচার ক যে মুসলমানেরা তাহাদের রাজা শাস ভার পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সহিত ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ ম তিতুমিয়ার লড়াই হয়; এবং সেই তিতুমিয়ার মৃত্যু ঘটে। তাহার ৩৫০ শিষ্যও বন্দী হয়।

তিতুমিয়ার মৃত্যুর পর পাটনানিব ওহাবি এনায়েত আলি লালদহ, বগু রাজসাহী, পাবনা, নদীয়া ও ফরিদপ জেলায়, কেরামত আলি ঢাকা, নৈমন নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলায়, এ জৈয়েন-উল-আবদিন ত্রিপুরা ও শ্রীহ ওহাবি মত প্রচার করেন।

বিচারে ওহাবিদিগের রাজদণ্ড হইব পর হইতে তাহারা তাহাদের নাম প বর্ত্তন করিয়াছে। এখন তাহারা আপনাদে হয়, "আহল-ই-হাদি" না হয়, "ঘয়ের মুকাল্লি

দিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। "আহল-ই-হাদি"রা স্বাধীনভাবে "হাদি" (মহম্মদের উক্তি) ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, "ঘয়ের কল্লিদেরা সুন্নীদের চারিজন ইমামের মধ্যে তাহাকেও মানে না। আহল-ই-হাদিরা তাহাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এতদূর নিষ্ঠাবান্ যে তাহারা গোঁড়া মুসলমানদিগেকে বিধর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই তাহাদের মসজিদ দখল করিবার প্রয়াস করে এবং সেই অভিলাষে কখনও কখনও দেওয়ানি আদালতে মকর্দ্দমা অবধিও রুজু হয়। তাহারা বিবাহাদি উপলক্ষে বাদ্য-বাদ্য, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শির্ণি চড়ান, এবং পীরের কবরে পূজা দেওয়া নিষেধ করে। নদীয়া জেলার মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া মহকুমায় কতকগুলি "আহল ই-হাদি" দেখিতে পাওয়া যায়।

পাগল-পংক্তি

মৈমনসিংহে একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আচার-ব্যবহার এতই উদ্ভট যে লোকে তাহাদিগকে "পাগল-পংক্তি" বলে। করিম দরবেশ এই সম্প্র-দায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা কোরাণ ও মহম্মদে বিশ্বাস করে, সুন্নত করে না, এবং নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে বিবাহ বা আহারাদি করে না। ইহারা টাকার সুদ লয় না, বিবাহে পণ দেয় না, লয়ও না, এবং পাল্কী, ছাতা কিংবা জুতা ব্যবহার করে না।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

নবাব

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পারির জীবন-লীলা

মাদাম জেঙ্কিন্স সজ্জিত সুন্দর কক্ষে বসিয়া পিয়ানোর সুরে কণ্ঠ ছাড়িয়া নূতন গানটা গাহিবার চেষ্টা করিতেছিল। ওস্তাদ সেদিন সকালে আসিয়া এই গানটাই শিখাইয়া গিয়াছিল। মাদাম গাহিতেছিল,

"ভালবেসে তারে কেঁদে সারা আমি
বুক ফাটে সখি, বলিতে!
সে যে বলে মোরে, 'ভালবাসি কত'—
সে কেবলি মোরে ছলিতে।"

বেদনার এই স্বর-লহরী বাহিরের আকাশ-বাতাসটুকুকে অবধি করুণ করিয়া তুলিয়াছিল। মাদাম আবার গাহিল,

"এই যে প্রাণের প্রেম-আরাধন
আদর, সোহাগ, প্রীতির বচন—"

গাহিতে গাহিতে মাদামের বুক বেদনায় ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ সুর ছাড়িয়া সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। গানের সুরে আজ নিজেরই প্রাণের সহস্র সুপ্ত বেদনা সর্পের মত ফণা তুলিয়া উঠিয়াছে! সেগুলা যেন এখনই তাহাকে দংশন করিবে! মাদাম পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে কৃত্রিম-পাহাড়ের

গায়ে-রচা কৃত্রিম নিঝর হইতে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল সহস্র ধারায় উছলিয়া পড়িতেছিল —রৌদ্র-কিরণ পড়ায় সে জল আবার রূপালি ঝালরের মত দেখাইতেছিল। মাদাম একদৃষ্টে সেই নৃত্যশীল জলরাশির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার জেঙ্কিন্স গৃহে ছিল না। কাজের ভিড়ে ও স্বাস্থ্যের আহ্বানে ডাক্তার আজ কয়দিন পারি ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় মাদামের প্রাণের মধ্যে নিষ্ফল প্রণয়ের সহস্র বেদনা কোনমতেই আর আপনাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। সে আজ কত দিনেরই বা কথা! ইহারই মধ্যে তাহাদের প্রণয়-স্রোতে এতখানি বাধা লাগিল, কেন? আজ কয় মাস ধরিয়া দুইজনের কথাবার্ত্তাও অনেকটা ঢিলা পড়িয়া আসিয়াছে। আহারের সময় মাত্র দুইজনের শুধু সাক্ষাৎ হইত—তখন সংসারের প্রয়োজনীয় দুই-চারিটা মাপা-বাঁধা কথা ছাড়া উভয়ের মধ্যে আর কোন কথা হইত না। অপর কথা যদি উঠিত ত সে মাদামের পুত্র মারাণকে লইয়া। ডাক্তার মারাণের সম্বন্ধে দুই-চারিটা কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিত, মাদাম স্তব্ধ হইয়া সে মন্তব্য শুনিয়া যাইত,—চোখের পিছনে অশ্রু আসিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা পাইত, মাদাম প্রাণপণ বলে সে অশ্রু রোধ করিত। এই প্রাণহীন বর্ব্বর যদি সে অশ্রু দেখিয়া ফেলে ত পরিহাসের আর সীমা থাকিবে না! মার প্রাণের সে আন্তরিক বেদনার এতটুকু অপমানও মাদাম সহ্য করিতে পারিবে না!

এত দুঃখেও ডাক্তারের প্রতি মাদামের ভালবাসা কিন্তু একতিল কমে নাই! আজ কাল করিয়া বিবাহ-ব্যাপারটা পিছাইতে পিছাইতে ক্রমেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—ইচ্ছা থাকিলেও মাদামের সে কথা নূতন করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি ছিল না! অথচ বিবাহ-বন্ধন-হীন এই ঘৃণ্য জীবনও আর বহন করা যায় না! এমনি অতিষ্ঠ মাদাম কথাটা তুলিয়াছিল—ডাক্তার হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "সুবিবেচনা হরেখনা তোমার কি সন্দেহ হয়, আমাকে?" ইহার পর মাদামের মুখে আর দ্বিতীয় কথা জোগাইয়া উঠে নাই।

তাহার পর চারিদিকে বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। ডিউকের মৃত্যু ডাক্তারের সমস্ত আশার মূল কাটিয়া দিয়াছে! এক বড় একটা রোগীকে মৃত্যু আসিয়া হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। ডাক্তার বিরাগিয়া গেল; প্রমাদ গণিল। দেশের লোকের ডাক্তারের উপর বিশ্বাসও কমিয়া গিয়াছে—তাহার উপর বেথলিহামের অমন আশ্রমটার লোকসানে দাঁড়াইলে—নবাব আর তাহাকে এক পয়সাও সাহায্য দান করিবে না। নানা কারণে কোন দিকেই আর সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে ছিল না। ডাক্তারের আর্থিক অবস্থাও ক্রমে মন্দ হইয়া দাঁড়াইল! এই সকল ব্যাপারের জন্য ডাক্তার কিছু দিনের মত পারি ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও থাকিবার সঙ্কল্প করিল। মাদাম নিঃসঙ্গ একা এই প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে পড়িয়া রহিল। যদি বিবাহটা হইয়া যাইত, তাহা হইলে মাদাম কেমন থাকিত বলা যায় না—কিন্তু এই

অবহেলিত জীবন লইয়া এত বড় পুরীর মধ্যে পড়িয়া থাকা—না, এ অসহ্য কষ্ট, মর্ম্মন্তুদ দুঃখ!

তবু এ কষ্টের মধ্যেও মাদাম কোনমতে একটু সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইয়া ছিল। খুঁজিয়া পাতিয়া মনের মত গানগুলি গাহিয়া কোনমতে দিন কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আপনার প্রাণের সহিত কথা কহিয়া, আপনার মনকে এ সমস্ত বেদনার সাক্ষ্য দিয়া মাদাম একটু পরিতৃপ্তির সন্ধান করিতেছিল—কিন্তু কোথায় সে পরিতৃপ্তি, কোথায় বা সান্ত্বনা! কিছুই মিলে নাই! বাহিরের পানে চাহিয়া মাদাম আপনার এই জীবনটার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া তাতে একখানা কার্ড দিল। কার্ডে লেখা আছে—"হার্ত্তজ্—এজেণ্ট।"

দাসী কহিল, লোকটি মাদামের সহিত দেখা করিতে চায়—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মাদাম কহিল, "তুমি বলো, ডাক্তার সাহেব বাড়ী নেই!"

দাসী কহিল, "বলেছি, তিনি বললেন, মাদামের কাছেই তাঁর দরকার।"

"আমার কাছে!" মাদাম ভাবিল, আমার সহিত এ অপরিচিত লোকটার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে! নিশ্চয় কোন ফন্দী করিয়াছে! তবুও একটু পরে কহিল, "আচ্ছা, যাও, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।"

হার্ত্তজ্ আসিয়া মাদামকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। কাঠের মত শক্ত মুখ—ভাবহীন চক্ষু—ক্রমাগত আইন ঘাঁটিয়া দাঁড়াইলে যেমন একটা মমতা-হীন কাঠিন্যের ছাপ মুখে-চোখে আঁটিয়া যায়, লোকটার মুখে-চোখে তেমনই একটা কঠিন পরুষতা! সে মুখ দেখিলে বুকের রক্ত যেন জল হইয়া যায়!

মাদাম কহিল, "আপনি জানেন না, বোধ হয়, আমার স্বামী ডাক্তার জেঙ্কিন্স এখন এখানে নেই—আর তাঁর বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

হাতে কাগজের তাড়া দেখাইয়া হার্ত্তজ্ কহিল, "আমি সব কথা জানি, মাদাম। তাঁরই কাছ থেকে আমি আসছি।"

মাদামের মুখ চকিতে পাংশু হইয়া গেল। মাদাম কহিল, "তাঁর কাছ থেকে আসছেন, আপনি?"

"হাঁ, মাদাম। ডাক্তারের অবস্থা—এখন —অর্থাৎ সে সব আপনি ত জানেনই। চারদিকেই তাঁর সব কারবারে লোকসান যাচ্ছে। তাই তিনি বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, আসবাবপত্র, অর্থাৎ সবই আর কি, এই মোক্তার-নামায় আমায় বিক্রী করবার অধিকার দিয়েছেন।"

মাদাম একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, —মোক্তার-নামা কেন—এ কাজ কি আমি করিতে পারিতাম না! কিন্তু সহসা দারুণ অভিমান তাহার বুকের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিল! ইহার সহিত তর্ক? না, ঘৃণা হয়! মাদামকে নিরুত্তর দেখিয়া হার্ত্তজ্ আবার কহিল, "একটা কথা—আপনাকে না বললেও নয়—মানে, ডাক্তার জেঙ্কিন্স পারিতে কবে ফিরবেন, আর ফিরবেন কি না, তারও কোন ঠিকানা নেই—অর্থাৎ যেখানে তিনি অমন মাথা তুলে

অতখানি প্রতিপত্তিতে বাস করতেন, এখন সব খুইয়ে সেখানে থাকা—বুঝতেই ত পারছেন—তাই আর কি তিনি বলেছেন, আপনি যদি আপনার ছেলের সঙ্গে থাকতে চান ত তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। মানে, আপনি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই —অর্থাৎ বুঝেছেন কি না—"

মাদামের কানে আর কোন কথাই প্রবেশ করিল না। সুতার মুখ ধরিয়া টানিলে রিলে জড়ানো সুতা যেমন অনর্গল বাহির হইতে থাকে, হার্ত্তুজের মুখ হইতে তেমনি কথার রাশি কুণ্ডলী-মুক্ত হইয়া অবাধে বাহির হইতেছিল। মাদামের কর্ণে তখন চকিতে সেই গানের সুরের রেশটুকু বাজিয়া উঠিল—

"এই যে প্রাণের প্রেম-আরাধন,
আদর, সোহাগ, প্রীতির বচন—"

মাদাম ভাবিল, মিথ্যা, মিথ্যা কথা! এত মিথ্যা কে রচিয়াছিল? ভালবাসা—! সে ত শুধু কথার কথা মাত্র! তখনই আবার তাহার চিত্তে নারীর গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। দৃপ্ত স্বরে মাদাম কহিল, "থাক্, আর কোন কথা বলতে হবে না, মশায়, আমি সব বুঝেছি। বুঝেছি, যে, আমায় এই দণ্ডে ঘর ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—একটা দাসীর মত পথে দাঁড়াতে হবে। আর কথা বলে আমায় অপমান করবেন না। যথেষ্ট হয়েছে, আমি এখনই যাচ্ছি।"

হার্ত্তুজ্ একটু সহানুভূতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে কঠিন মুখে হাসির রেখা টানিয়া কহিল, "আমি কি করব, মাদাম, এর জন্য যথার্থই আমি দুঃখিত! তবে ডাক্তার বলে দিয়েছেন, এ ছাড়াছাড়ির জন্য তাঁরও খুব কষ্ট হয়েছে—কিন্তু কি করেন? তিনি নিরুপায়! হাঁ, তবে তিনি বলে দেছেন—টেবিল, চেয়ার, সোফা, কৌচ, বাজনা,—এ সব জিনিষের মধ্যে আপনি যা দরকার মনে করেন, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন—বিষয়ে আপনার মতকে মেনে চলতে আমি বাধ্য। ডাক্তার আপনাকে একেবারে নিঃসম্বল করতে চান না—এই আর কি মানে!"

মাদাম বিদ্রূপের সুরে কহিল, "অনুগ্রহ তাঁর! থাক্, এ অনুগ্রহের কোন প্রয়োজন নেই।" বলিয়া মাদাম ঘণ্টি টিপিল। নিমেষে এক দাসী আসিয়া দেখা দিল।

মাদাম কহিল, "আমি এখনই বেরুব—আমার টুপি আর ক্লোকটা দিয়ে যাও শীগ্‌গির—"

দাসী চলিয়া গেলে মাদাম হার্ত্তুজ্‌কে কহিল, "এখানকার এ সমস্ত জিনিষ ডাক্তার জেঙ্কিন্সের। আপনি এ সমস্ত বিক্রী করিতে পারেন। আমি এর কিছু নিতে চাই না—আমার কোন দরকার নেই।"

হার্ত্তুজ কোন উত্তর দিল না। উত্তরের প্রয়োজনও ছিল না। তাহার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে—বাকীটুকুতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

মাদাম একটা ড্রয়ার খুলিয়া কতকগুলা চিঠি-পত্র বাহির করিল। এগুলা মারাণের চিঠিপত্র। যতগুলি চিঠি সে মাদামকে লিখিয়াছিল, মাদাম তাহার সবগুলিকেই

রাখিয়া দিয়াছে। এইগুলাকে নাড়িয়া বুকে ধরিয়াই মাদাম আপনার প্তপ্ত স্নেহ-ক্ষুধা মিটাইতে বসিত! দাসী বাক্স আনিয়া দিলে মাদাম শীঘ্র তাহা রে দিয়া দাঁড়াইল, আবার ড্রয়ার খুলিল,—একখানা চিঠিও পড়িয়া থাকে! না, —একখানিও পড়িয়া নাই!

দাসী কহিল, "একখানা গাড়ী ডেকে র?"

"না, না, গাড়ী কি হবে?" মাদামের অঞ্চল! মাদাম বাড়ীর বাহির হইয়া ল।

বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়াছে। ঠিক ই মুহূর্ত্তে বার্ণাড জাঁসুলে মার বুকে থা গুঁজিয়া গাড়ী করিয়া সম্মুখ-পথ দিয়া লিয়া যাইতেছিল। মাদাম জেঙ্কিন্সের জীবন-টকের অভিনয়টুকুও নবাবের জীবন-ভিনয়ের মতই করুণ, বেদনাময়। না, ঝি, এ অভিনয়ের খেলা আরও করুণ, ন না, ইহা নিতান্তই আকস্মিক, নিতান্তই তর্কিত।

মাদাম জেঙ্কিন্স ক্ষিপ্র চরণে চলিয়াছিল। ক দারুণ, ভীষণ এ পতন! পাঁচ মিনিট র্ব্বে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে সে বসিয়াছিল—ারিধারে সম্ভ্রম ও সম্মানের বিপুল সমারোহ —আর এখন—মাথা গুঁজিবার এতটুকুও াশ্রয় নাই। নিতান্তই নাম-হীনা অভাগিনী —পথের কাঙ্গালেরও অধম সে! নির্ম্মম দৃষ্ট!

মাদাম এখন কোথায় যাইবে? কি করিবে?

মারাণের কথাই আজ সকলের আগে তাহার মনে জাগিল। কিন্তু পুত্রের কাছে সকল অপরাধ, সকল ত্রুটি স্বীকার করা—সম্মান ও ইজ্জৎ খোয়াইয়া অমন উঁচু-মন ছেলের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়া—সে বড় কষ্ট—সে কষ্ট সহিবার সামর্থ্যও যে মাদামের আজ নাই! না, কি বলিয়া কোন্ মুখ লইয়া অমন ছেলের সম্মুখে গিয়া আজ সে দাঁড়াইবে? না, না, সে তাহা পারিবে না! তবে মৃত্যু! মৃত্যুই তাহার একমাত্র উপায়—মুক্তির একটিমাত্র পথ! যত শীঘ্র পারা যায়, মৃত্যুর হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিতে হইবে! কিন্তু কেমন করিয়া, কোথায় গিয়া মরা যায়? মৃত্যুলোকে যাইবার পথ ত অনেক! মনে মনে সব পথগুলারই একটা চিত্র সে আঁকিয়া লইল। সহসা মাদামের মনে হইল—কিন্তু এ মৃত্যু—আত্ম-হত্যার সে বিকৃত মূর্ত্তি, তীব্র কুৎসা—না, না, চারিধারে কোলাহল পড়িয়া যাইবে। সে কোলাহলে ছেলের মাথা আরও হেঁট হইবে! সে অনেক সহ্য করিয়াছে—এ সব সে সহ্য করিতে পারিবে না! না, না, ছেলের হিতের জন্য আত্মহত্যা করা হইবে না! আত্মঘাতিনী সে হইতে পারিবে না! তবে—উপায়—উপায় কি?

মাদাম জেঙ্কিন্স মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল—কি ভাবিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা কে অভিবাদন করিয়া ডাকিল, "মাদাম জেঙ্কিন্স—"

মাদাম মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, মার্ক্‌ইস্ দ্য মপার্ভ—শক্ত প্লেটওয়ালা সার্টের উপর কালো ভেলভেটের কোট চড়াইয়া দর্প-স্ফীত বক্ষে দাঁড়াইয়া—জামার বোতামের ছিদ্রে এক

গুচ্ছ ফুল গাঁথা—মুখে মৃদু হাসির রেখা! মাদাম মৃদু হাসিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া দ্রুত সরিয়া গেল—দাঁড়াইল না।

মোরার প্রিয় বন্ধু মপাভঁ। মুখে হাসির রেখা টানিলেও ভিতরটা তাহার আজ পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। তাহার টাকাকড়ি বন্যার জলে ধুইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। পাওনাদারের ভিড়ে বাড়ীতে থাকিবার জো নাই। কেবলই তাগাদা আসিতেছে! পোষাকের দাম, মদের দাম, আসবাবের দাম—দেনায় মপাভঁর মাথার চুল অবধি বিক্রয় হইবার জো! পাওনাদারের দল তাগাদায় শেষ হার মানিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়াছিল। সেই দিনই পাঁচ-ছয়খানা ক্রোকের নোটিশ জারি হইয়াছে। মাথা আর তুলিয়া রাখা যায় না। মপাভঁর বুকের পাঁজরাগুলা যেন চূর্ণ হইয়া যাইবে, এমনই মনে হইতেছিল। নোটিশ পাইয়া মপাভঁ বাড়ী ছাড়িয়া পথে ঘুরিতেছিল। কি করিবে সে উপায়ও স্থির হইয়া গিয়াছিল। দেনার দায়ে অত বড় বংশের ছেলে হইয়া শেষে সে জেলে যাইবে—মপাভঁ জেলে! না, না, না!

গোপনীয় চিঠি-পত্র পুড়াইয়া ছাই করিয়া, ছোট-খাট ব্যাপারগুলা সারিয়া লইয়া মপাভঁ আজ পথে বাহির হইয়াছে, মরিবার জন্য। সে মরিবে! কিন্তু কোথায় গিয়া, কেমন করিয়া মরিবে সে? পারিতে নয়। এখনই একটা হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে। কলঙ্কের কালিতে সহর কালো হইয়া উঠিবে। মরিবে সে নিশ্চয়—কিন্তু পারির বাহিরে গিয়া মরা চাই! এক নিভৃত নির্জ্জন কোণে! বিকৃত মুখে পরিচয়ের চিহ্ন থাকিবে না! মপাভঁ তাই মরিবার এক নিভৃত বিজন কোণের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল।

হাঁটিয়া সহর পার হইয়া মপাভঁ ক্ষুদ্র গ্রাম-প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্রি হইয়াছে। খানিকটা পথ চলিয়া মপাভ দেখে, এক কয়লার দোকানের পার্শ্বে গেট-ওয়ালা একটা বাগান। বাগানের ফটকে অস্পষ্ট আলোর অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "বাথ" (স্নানাগার)। মপাভঁর মুখে হাসি দেখা দিল। আঃ, এতক্ষণে মিলিয়াছে,—স্থান মিলিয়াছে। এই নির্জ্জন গ্রাম-প্রান্তে ক্ষুদ্র একটা স্নানাগার,—ঠিক কেহ চিনিতে পারিবে না—কোন গোল উঠিবে না—নামহীন পরিচয়হীন একটা সাধারণ শবের মতই তাহার মৃত দেহপিণ্ডটাকে ইহারা টানিয়া কোথায় জঙ্গলের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবে। ঠিক হইয়াছে! মরিবার জন্য এমন ঠাঁই আর কোথাও মিলিবে না!

মপাভঁ ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই খানিকটা সরু পথ—পথের দুইধারে বন্য গাছের ঝোপ। পথ গিয়া একটা কুটীরের দ্বারে মিশিয়াছে! মপাভঁ দ্বারে আসিয়া ডাকিল, "বেয়ারা—"

একটা লোক আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

মপাভঁ কহিল, "জল তোয়ের কর। স্নান করব।"

মপাভঁকে ভিতরে বসিতে বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। ঘরে সম্মুখেই একটা বৃহৎ আয়না ছিল। মপাভঁ তাহার সম্মুখে

সিয়া দাঁড়াইল। আপনার প্রতিবিম্বের
ন চাহিয়া রহিল—এই গর্ব্বস্ফীত বুক—
তেজোদীপ্ত মুখ—না, আর এখন ও-সব
খিয়া, ও-সব ভাবিয়া কি ফল? হাতের
া পড়িয়া গিয়াছে—ও-সব কথা ভাবিবার
ন প্রয়োজন নাই!

ভৃত্য আসিয়া সেলাম করিয়া জানাইল,
া তৈয়ার হইয়াছে। "চল" বলিয়া
ভঁ কুটীরের বাহিরে আসিল। বাগানের
ক কোণে বাথ-রুম—মপাভঁ ভিতরে ঢুকিয়া
র বন্ধ করিয়া দিল।

* * *

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কম্পিত বক্ষে মাদাম
ছিল আঁদ্রের ষ্টুডিয়ো-ঘরে প্রবেশ করিল।
র কেহ নাই! মাদামের পা কাঁপিয়া
ঠিল। সে যেন চোর—এ ঘরের বিমল
স্তিটুকু যেন সে চুরি করিতে আসিয়াছে!
রের একটা চাবি তাহার কাছে পূর্ব্ব
ইতেই ছিল—মারাণের দেওয়া চাবি—
ার একটা মারাণ নিজে রাখিত।
াজেই ঘরে ঢুকিতে কোন বাধা ছিল
।

চিরপ্রথামত টেবিলের উপর ভাঁজ-করা
ক-টুকরা কাগজ ছিল। মারাণের লেখা।
ারাণ লিখিয়া রাখিয়াছিল, "আমি রিহার্সালে
াইতেছি। সন্ধ্যার পরই ফিরিব।"

এ ব্যবস্থা বহুদিন হইতেই চলিয়া
াসিতেছিল। মা যদি আসিয়া পুত্রকে দেখিতে
া পায়, তাই বাহিরে গেলে কখন্ তাহার
ফিরিবার সম্ভাবনা, সে কথা এমনইভাবে সে
লিখিয়া রাখিত। সেই লেখাটুকু মাদাম
বুকে ধরিয়া সেই কাগজটুকুতে অজস্র চুম্বন
ঢালিয়া প্রাণ ভরিয়া একবার কাঁদিল।
কিসের লোভে, কিসের প্রলোভনে, এই
পুত্রের সান্নিধ্য ছাড়িয়া সে দূরে ছিল!
পুত্রের প্রতি কিসের জন্য সে এতখানি
অবিচার করিয়াছে—আপনার হৃদয়ের
সমস্ত স্নেহ-ভালবাসারও এতখানি অপমান
করিয়াছে! ধিক তাহার নারী-জন্মে, ধিক
তাহার মাতৃত্বে! এই ক্ষুদ্র ঘরের কোণে যে
বিপুল শান্তি জমা রহিয়াছে, তাহার একটা
কণাও যে জেঙ্কিন্সের সেই অত-বড় প্রাসাদে
খুঁজিলে মিলে না! কখনও মিলেও নাই!
মাদামের দুই চোখ বহিয়া হু-হু করিয়া জল
ঝরিয়া পড়িল।

মাদাম বসিয়া অতীতের কথা ভাবিতেছিল! পাপিষ্ঠের প্রতারণাময় সেই সব প্রলোভন—পুত্রের সহিত ছাড়াছাড়ি—কি সে মুহূর্ত্তগুলা! চিন্তার পর চিন্তা তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া ছুটিয়াছিল। তাহার আর সীমা নাই—শেষ নাই!

সহসা বাহিরে জুতার শব্দ পাওয়া গেল। শিষ দিতে দিতে আঁদ্রে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অন্ধকার ঘর। মন আজ তাহার উল্লাসে ভরা ছিল—জুজের গৃহে এখনই নিমন্ত্রণ যাইতে হইবে! আলো! আলো! আজ একটু সাজিবারও প্রয়োজন আছে! প্রণয়ী আজ প্রণয়িনীর গৃহে ভোজন করিবে! আলো জ্বালিতেই পিছনে কাহার দীর্ঘশ্বাস শুনা গেল। চমকিয়া আঁদ্রে ফিরিয়া চাহিল, রুদ্ধ স্বরে বলিল, "কে? মা!"

তখনই দুইখানা অধীর হস্ত আসিয়া আঁদ্রেকে আঁটিয়া ধরিল—স্নেহের একটা উষ্ণ

তাপ—মা ছেলেকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল; কহিল, "হাঁ, আমি।"

দুই-চারিটা কথা কহিয়াই মাদাম পলাইবে, স্থির করিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল, "একটু বেড়াতে যাব, আমি। তাই যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলুম।"

"কেন মা? কোথায় যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন? আমার নতুন নাটক থিয়েটারে 'প্লে' হবে—তুমি দেখবে না? না মা,—তোমায় দেখতেই হবে। তার পর আমাদের বিয়ে আসছে—তুমি সে সময় না থাকলেই যে নয় মা! ও বুঝি তোমায় আসতে দেবে না? সেই মতলবেই—"

মাদাম তাড়াতাড়ি সে কথায় বাধা দিয়া—দুই-একটা মিথ্যা ওজরে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আঁদ্রে কহিল, "না, মা, আমি কোন কথা শুনতে চাই না।"

মাদাম আর পারিল না, কাঁদিয়া বসিয়া পড়িল। আঁদ্রে আসিয়া মার হাতটা টানিয়া আপনার দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, কহিল, "কি হয়েছে, মা—আমায় বল, তুমি। খুলে বল আমায়—"

মাদাম চোখের জল মুছিয়া কহিল, "কিছু না, বাবা, কিছু নয়—আমার মনটা ভাল নেই—তাই একটু ঘুরে আসতে চাই, তুমি আমায় এমনি চোখেই দেখো—আমি তোমার মা—বড় দুঃখিনী মা—"

আঁদ্রে মিনতি করিল, "না, মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি আমায় বল, কি হয়েছে!"

মাদাম কোন কথা কহিল না—রহিল।

আঁদ্রে কহিল, "তোমাদের কি ছাড়া হয়েছে, তবে?"

মাদাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "আমায় বলো ও সব কোন কথা তুলো না, মারাণ।"

"মা, আমার কাছে কি লুকোচ্ছো, তু আমি ত ছ'মাস আগেই বলে রেখেছি নয় কি, মা?"

"তুমি তা হলে সব জানো?"

"সব জানি! এ যে হবে, তা বহুদিন থেকেই জানি, মা! আমি ত দিনেরই প্রতীক্ষায় ছিলুম—"

"আমি এখানে এলুম—"

বাধা দিয়া মারাণ কহিল, "এই তোমার ঘর, মা—এ তোমার মন্দির আজ দশ বছর আমি তোমার কাছ-ছা হয়েছি—তোমার কাছ থেকে দশ বছরে স্নেহ আমার পাওনা আছে—আমি আ তোমায় ছেড়ে দেব না।"

বাহিরে আবার কাহার পদ-শব্দ শু গেল। এলিস মারাণের খোঁজে আসি ছিল। ঘরে ঢুকিয়াই আলিঙ্গন-বদ্ধ মা পুত্রকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াই পড়িল। মারাণ কহিল, "এসো এলিস,— মার কাছে এসো, এই আমার মা। মা এই এলিস—তোমার বৌ—"

দুই হাত বাড়াইয়া মাদাম তখ এলিসকে বুকের মধ্যে টানিয়া লই অজস্র চুম্বনে তাহার মুখখানিকে রাঙা তুলিল, তারপর গাঢ় স্বরে কহিল, "একবা

মায় ডাকো—'মা' বলে একবার তোমরা নে আমায় ডাকো,—আমার সব দুঃখ নই ঘুচে যাবে।"

আঁদ্রে, এলিস দুইজনে তখন মাদামের ক মাথা রাখিয়া ডাকিল, "মা—"

"আঃ, বড় সুখ, বড় সুখ" সুগভীর পরি- প্তিতে মাদামের বেদনা-দীর্ণ মন ভরিয়া ল। সত্যই বড় সুখ! পৃথিবীতে যে এত খ ছিল,—মাদাম তাহা কোনদিন ধারণাও রিতে পারে নাই।

ও-ধারে পল্লী-প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র বাথে খন মহা কলরব পড়িয়া গিয়াছিল। এক ন লোক বাথে ঢুকিয়া বহুক্ষণ বাহির হেছে না দেখিয়া ভৃত্যকে সন্ধান লইতে পাঠানো হয়। সে গিয়া দেখে, রক্ত-মাখা একটা মাংস-পিণ্ড পড়িয়া আছে—তাহার মুখে গলায় অজস্র ক্ষুরের ঘা—প্রাণ-হীন দেহ! ফুলের মত শুভ্র সার্টের প্লেট রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে। বীভৎস মুখ! দেখিলে চেনা যায় না! সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

হায়, বেচারা মপার্ভ! মাদামের এ তৃপ্তির একটি কণারও স্বাদ সে জীবনে কখনও পায় নাই! এই স্নেহ-ভরা দৃষ্টির অতি ক্ষীণ একটা রশ্মিও কোনদিন তাহার আঁধার বুকে মুহূর্ত্তের জন্য ফুটিবার অবকাশ পায় নাই! হতভাগ্য জীব!

(ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চয়ন

বিস্মৃত নগর

একটি বিশাল নগর গভীর জঙ্গলের তরে কেমন করিয়া হারাইয়া গিয়াছিল, াজ কেহ তাহা বলিতে পারে না। সে তদিনের কথা! ইংলণ্ড তখনও প্রায়- সভ্য, পারি তখন ছোটখাট একটি ওগ্রামের মত এবং শ্বেতাঙ্গের নিকট ামেরিকা তখনও একটি না-দেখা স্বপ্ন! ই সুদূর অতীতে কিন্তু এই বিস্মৃত ার সভ্যতার সিংহাসন ছিল,—ঐ স্তব্ধ টালিকা এবং ভগ্ন স্তম্ভাবলীকে জিজ্ঞাসা র, উহারা মৌন ভাষায় এক বিলুপ্ত শের প্রতিভা ও ক্ষমতা, ধৈর্য্য ও নিপুণতা এবং অর্থ ও সামর্থ্যের অপূর্ব্ব কাহিনী আবৃত্তি করিবে—যে অবর্ণিত কাহিনী ইতিহাসে স্থান লাভ করে নাই।

'ইণ্ডো-চায়না'র এক নিবিড় অরণ্যে এই বিস্মৃত নগর আজিও ধ্বংশ-বিধ্বস্ত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। একদিন ইহা Khmer বা কাম্বোডিয়ার রাজাগণের বড় আদরের রাজধানী ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখানকার ইট-কাঠ-পার্থর ও শিলালিপি প্রভৃতি পরখ করিয়া বলিয়াছেন, নবম খৃষ্টাব্দে এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহর হইতে মাইল-খানেক তফাতে ওঙ্কার-বাট নামে একটি

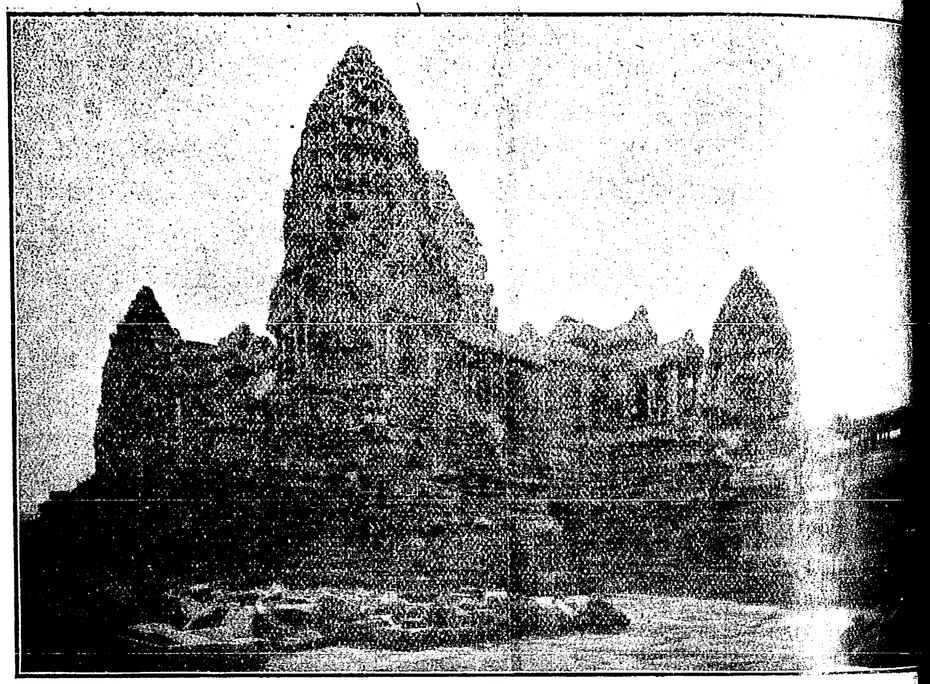

ওঙ্কার-বাটের মন্দির

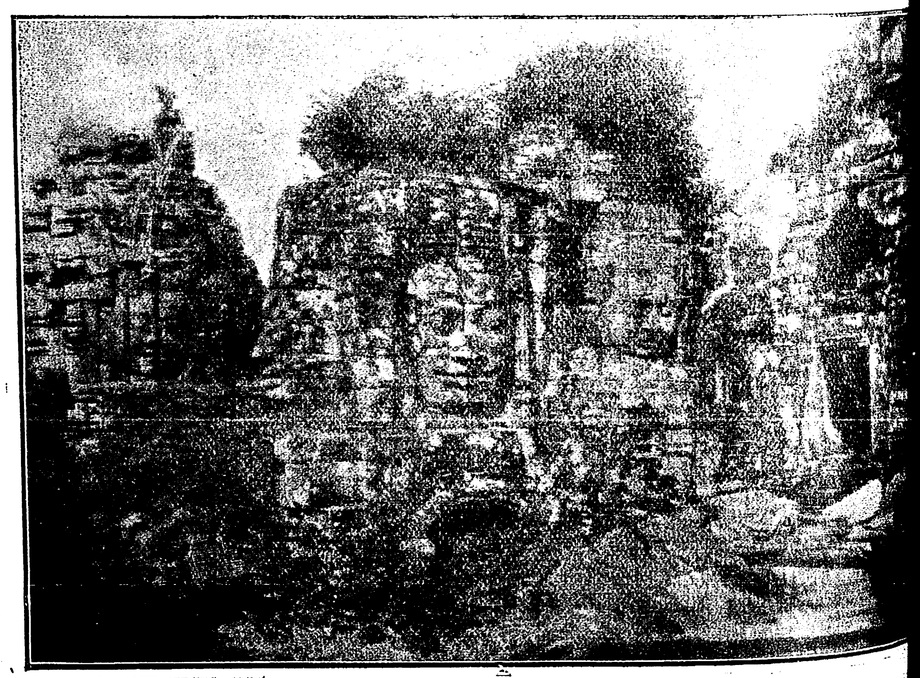

ছাদশীর্ষে শিবের প্রকাণ্ড মুখ

কাণ্ড মন্দির আছে, তাহার নির্ম্মাণকাল দশ খৃষ্টাব্দ। নগর এখন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাকার, রাজপথগুলি বুনো গাছপালায় গম্য, বাড়ীঘর বন্য পশুদের নিরাপদ রামাগার হইলেও মন্দিরটি এখনও প্রায় টুট আছে—কেবল সামান্য দু-চার জায়গা সিয়া গিয়াছে।

এই রাজধানী-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, এক ন্দুরাজা স্বদেশে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এখানে াসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। এখানকার ানীয় বাসিন্দাদের বশ করিতে তাঁহাকে বড় ণী বেগ পাইতে হয় নাই। রাজার সঙ্গে রল যে সৈন্যসামন্ত আসিয়াছিল, তাহা হে; পরন্তু, দলে দলে পুরোহিত, পণ্ডিত, ণী, স্থাপত্যবিদ্, রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার এবং স্ত্রবায়ও তাঁহার সাথের সাথী হইয়াছিল। হাদের লইয়া রাজা এখানে জাঁকিয়া সিলেন; এবং দেখিতে দেখিতে ভারত-র্ষের উন্নত হিন্দু সভ্যতা ঘরের বাহিরেও ক স্বপ্নের মত বিচিত্র 'ময়দানবের পুরী' ড়িয়া আকাশের অনেকটা শূন্য পূর্ণ করিয়া লিল। এই প্রবাদ-কাহিনীর মধ্যে কতটুকু তিহাসিক সত্য ও কতটুকু জনরবের ক্তি আছে, তাহা ঠিক বলা না গেলেও কথা নিশ্চিত যে, এই বিস্মৃত নগর হিন্দুর র্ত্তি।

কিন্তু এই নগর-নির্ম্মাতা পরাক্রমশালী াজবংশের অধঃপতনের কারণ কি? নগর কন পরিত্যক্ত হইল—রাজবংশ কোথায় াল? সে কাহিনী এখনও ভাল করিয়া ানা যায় নাই। কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে া ভূমিকম্পে নগর যে সহসা শ্মশানে পরিণত হয় নাই, ধ্বংসস্তূপগুলি দেখিলে সে কথা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন পরাক্রমশালী জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কি ওঙ্কার-ধামের পরিণাম এমন শোচনীয় হইয়াছে? এ প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

স্থানীয় বাসিন্দারা এই ভাঙ্গাচোরা, পুরাণো সহরের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছিয়া ফেলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কারুকাজ-করা পাথরের থাম্, সিংহমূর্ত্তি, নাগের মাথা এবং শিব ও বুদ্ধের প্রতিমা প্রভৃতি নানারকমের রাশীকৃত জিনিষ মানুষের অত্যাচারে স্থানচ্যুত হইয়া এদিকে-ওদিকে পড়িয়া আছে। সেকালের সেই প্রতিভাবান্ শিল্পিগণের অন্ধ অভাগা বংশ-ধরেরা আজ এতটা আত্মবিস্মৃত হইয়াছে যে, তাহারা আপনাদের স্মরণীয় গৌরবের মূলেও কুঠারাঘাত করিতে লজ্জাবোধ করে নাই। সংপ্রতি ফরাসী-গভর্ণমেণ্ট কালের ও মানুষের অত্যাচার-নিবারণের চেষ্টায় মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগেও ভারত-শিল্পীর মাল-মশ্‌লা ও নির্ম্মাণ-পদ্ধতি এমন চমৎকার ছিল যে, মন্দির বা প্রাসাদের যে-সকল অংশ হারাইয়া বা খসিয়া গিয়াছে, এই উন্নত, বৈজ্ঞানিক যুগের কারিকরেরা যথাসাধ্য যত্ন-চেষ্টাতেও সে-সকল জায়গা আর মেরামত করিতে পারে নাই।

ওঙ্কারধামের বাড়ী-ঘর, মন্দির, স্তম্ভ, এমন-কি পগঘাট পর্য্যন্ত শিল্প-সুষমা ও খোদন-পটুতায় পরিপূর্ণ;—সে কলা-বৈচিত্র্য দেখিলেই অজন্তা, এলোরা, সাঞ্চী, সারনাথ

ও কণারকের ঐন্দ্রজালিক শিল্পিগণকে মনে পড়িয়া যায়। পাথরের গায়ে এখানেও শত শত অবদান খোদা আছে। কোথাও একটি যুদ্ধযাত্রার ছবি খোদিত। সকলের আগে-আগে ভেরী-বাদকের দল; তারপর ছত্রধারীদের মাঝখানে হস্তীপৃষ্ঠে সেনাপতি; তারপর বর্ষা-চর্ম্মধারী রথারোহী ফৌজের সারি, তারপর রণ-হস্তী প্রভৃতির সম্মুখে বর্ম্মাবৃত, অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ; তারপর তীর-ধনু, তরবারি, কুঠার ও যষ্টি লইয়া পদাতিক সেনাদলের পিছনে সেনাদল ও ক্রীতদাসগণ, গরুর গাড়ীতে বোঝাই-করা ভারে ভারে রসদ, ফৌজদের পরিচর্য্যা ও আনন্দবিধানের জন্য ভৃত্যগণ, বাদ্যবাদকের শ্রেণী ও নর্ত্তকীবৃন্দ। বালু-পাথরের উপরে খোদা এ-সকল ছবির প্রতি খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত শিল্পীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। মূর্ত্তিগুলি জীবন্ত, স্বাভাবিক ও তেজে-ভরা,—তাহাদের ভঙ্গিমাও সুন্দর ও বিচিত্র! চারিদিকে শতসহস্র মূর্ত্তির ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলে, কোন্‌টি আগে বা কোন্‌টি পরে দেখিব, কোন্‌টি ভাল বা কোন্‌টি মন্দ এ-সব কিছুই ঠাহর করিতে পারা যায় না। সমস্ত মূর্ত্তির মুখে-চোখেই খোদ্‌কারী এক-একটি বিশেষ ও বিভিন্ন ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ সুখে উল্লসিত, কেহ দুঃখে ম্রিয়মান! শুধু মানুষ নয়, ছবিতে জীবজন্তুদের যে-সকল মূর্ত্তি দেখা যায়, সেগুলিও সুললিত ভাবপূর্ণ। হাতীর ছোট ছোট চোখগুলি ঠিক যেন জীবন্তের মতই ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, গরুগুলি ঠিক যেন মূর্ত্তিমান ধৈর্য্য, শূকরগুলা পাগলে ডাঙ্গসের ঘা খাইয়া রাগে ঘোৎঘো করিতেছে। শিল্পীরা যে নেহাৎ বেরসি ছিলেন না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যা এক জায়গায়, একজন মাহুত ভয়ে-ভ আড়্-চোখে চারিদিকে চাহিতে চাহি পিছন দিকে হাত চালাইয়া দিয়া সাবধা থলি হইতে মাল চুরি করিতেছে! এ পাথরের পটে ঠিক যেন বায়স্কোপের ছবির পর ছবি,—ছবির পর ছবি! যু দৃশ্য, শীকার, নৌ-বিহার, মাছ ধরা, উৎস শোভাযাত্রা, কীর্ত্তন-সম্প্রদায়, রাজপথে জনতা, কুচ-কাওয়াজ, রাজ-অভ্যর্থনা, ম ক্রীড়া, গৃহস্থের ঘর-সংসার, কুটুনা-কুটী রান্না-বান্না ও পারিবারিক মেলা-মে প্রভৃতি সেকালের সেই অতীত সভ্যতা বিষয়ে যাহা-কিছু জানিবার-বুঝিবার, তখনকার জীবন-যাত্রা-প্রণালী, আচার-পদ্ধতি মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রশ এবং ঘটি-বাটি-গেলাস প্রভৃতি সমস্ত বাটালির মুখে দেওয়ালে দেওয়ালে খুদি রাখা হইয়াছে। এইসঙ্গে যেখানে-সেখানে হিন্দু-দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অসং ত্রিমূর্ত্তি নজরে পড়িয়া যায়।

এক জায়গায় বাহান্নটি কোণাকৃতি চূড়ার মাঝখানে প্রাসাদের প্রধান চূড়া আকাশ ছুঁইতে উপরে উঠিয়াছে। এ চূড়াটির সঙ্গে শিবের চারিটি করিয়া মু খোদিত। ছাদের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে সমস্ত ওঙ্কার-ধাম সুলিখিত চিত্রের ম চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে

ম্নাইল জঙ্গল যুড়িয়া ধ্বংশ-স্তূপের পর শ-স্তূপ, গভীর কাননের সবুজ বর্ণলীলার ঝ মাঝে কোথাও একটা হেলিয়া-পড়া সাদের চূড়া, কোথাও একটা শৈবালশ্যাম দরের মুকুট, কোথাও-বা একটা ভাঙ্গা মর আধখানা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সাদের ছাদ হইতে দেখিলে বুঝা যায়, দিন এই শক্তিশালী রাজার রাজধানী, শালতায়, মহিমায় ও সৌন্দর্য্য-শ্রীতে রোর রোমকেও সর্ব্বাংশে পরাজিত রিয়াছিল।

এই প্রকাণ্ড সহরের চারিদিক বেড়িয়া ক দীর্ঘ প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। াচীরের উচ্চতা ষাট ফুট; পাঁচটি ফটক ছে। এই ফটকগুলির ভিতর দিয়া নায়াসে হাতীর দল হাওদা-সমেত চলিয়া ইতে পারে। সৈন্যদল, ক্রীতদাস ও কুলি ভৃতি রাজকার্য্যে নিযুক্ত অসংখ্য লোকের থা ছাড়িয়া দিলেও অনায়াসে ইহা বলা যায় , এ সহরে অন্তত দুইলক্ষ বাসিন্দা বাস রিত।

ওঙ্কার-ধামের অদূরে ওঙ্কার-বাট। াকারে ছোটখাট হইলেও এটিও একটি গরবিশেষ। এখানেও রাজপ্রাসাদ, এবং রোহিত, অতিথি ও অসংখ্য সৈন্যের ন্য বাড়ী-ঘর আছে। ওঙ্কার-ধামের মত খানেও মাইলের পর মাইল যুড়িয়া শিল্পবিচিত্র প্রস্তরপট আছে। তবে এখান-কার শিল্প ওঙ্কার-ধামের কারুকার্য্য অপেক্ষা দেখিতে পেলব ও সুন্দর হইলেও ততটা সতেজ ও স্বাভাবিক নহে।

এ-সব ছোটখাট খুঁতের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, ওঙ্কার-বাটের খোদন-শিল্প পৃথিবীর ভিতরে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এখানে দেড়শত ফুটের চেয়েও দীর্ঘ এক-এক-খণ্ড প্রস্তর-পটের উপরে রামায়ণ ও মহাভারতের এক-একটি গল্পচিত্র খোদিত আছে। বৌদ্ধধর্ম্মমূলক চিত্রাবলীরও অভাব নাই। ওঙ্কার-বাটের প্রধান চূড়াটির উচ্চতাও বড় অল্প নহে—সমতল ভূমি হইতে দুইশত ফুটেরও অধিক!

হায়, এই বিরাট-বিশাল শিল্প-পুরী গড়িয়া তুলিবার জন্য শত শত বর্ষ ধরিয়া কত কষ্ট, কত যত্ন, কত ধৈর্য্যের আবশ্যক হইয়াছিল! মহাকালের একটি দীর্ঘনিশ্বাসে আজ তাহার সকল মহিমা, সকল গরিমা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে,—পড়িয়া আছে শুধু দিগন্তব্যাপী এক মহা-কঙ্কাল! কিন্তু এ কঙ্কালও মাধুর্য্যবর্জ্জিত নহে,—কলাবিদের কাছে এখনও ইহা আনন্দ ও দৈববাণীর মত, কবির কাছে সোণার স্বপ্নের মত, দার্শনিকের কাছে ধর্ম্মবাণীর মত, শিক্ষিতের কাছে জ্ঞানাগারের মত, এবং নূতনত্বপ্রার্থী ভ্রমণকারীর কাছে যেন জলন্ত উত্তেজনার মত!

পশ্চিম-গগনে স্বরচিত শ্মশান-চিতায় সূর্য্য যখন মরণ-শয়নে ঢলিয়া পড়েন, ওঙ্কার-বাটের বিপুল ধ্বংশ-স্তূপের উচ্চ শিখরের উপরে তখন ঘনীভূত অন্ধকারের যবনিকা নামিয়া আসে, চারিদিকের শত শত কুঠরীর ভিতর হইতে সহসা তখন হাজার হাজার বাদুড়ের দল নিবিড় তিমিরের বার্ত্তা বহন করিয়া মাথার উপরে

চক্রে চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে, তাহাদের ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দে ঘুমন্ত বনভূমি যেন ভয়ে শিহরিয়া জাগিয়া উঠিয়া বসে! রজনীর আগমনে আকাশের বিলীয়মান নীলিমার উপরে ঐ কালো কালো নিশাচর-গুলাকে দেখিতে কি ভয়ানক—কি ভা —যাহাদের প্রাণের একান্ত কা ওঙ্কার-ধামের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়া উহারা কি তাহাদেরই অশান্ত আত্মা?.....কে বলিতে পারে?

The Pall Mall Magazine হই

নূতন শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি

ভাদ্রমাসের ভারতীতে প্রকাশিত "শিশু-শিক্ষায় নবপদ্ধতি" পাঠ করিয়া অনেক পাঠক আগ্রহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন; অতএব, এ-বিষয়ে আরও দু-এক কথা বলিলে বোধ করি, মন্দ হইবে না।

আজকাল আমেরিকাতেই শিশু-শিক্ষা লইয়া বেশী আলোচনা চলিতেছে। ফলে, শিশুশিক্ষার জন্য তথায় অনেকগুলি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ-সকল পদ্ধতি ঠিক একরকমের না হইলেও, উহাদের মূলকথা এক। শিশুদের শৈশবকালটা যাহাতে অকেজো শিক্ষায় বিফল হইয়া না যায়, সকল পদ্ধতিতেই প্রধানত সেই চেষ্টাই করা হয়।

ডাঃ বোরিস সিডিস্‌ নামে আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত একরূপ নূতন পদ্ধতিতে তাঁহার পুত্রকে এমন শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, এগার বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার বালকপুত্র হার্ভার্ড য়ুনি-ভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষালাভের অধিকারী হইয়াছিলেন! এই নবপদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেকে অনেকরকম মত জাহির করিয়াছেন। কেহ বলেন, "কচি ছেলেকে এমন ক করিয়া লেখাপড়া শিখাইলে বয়সকা তাহার দৈহিক ও মানসিক অবন ঘটিবে।"—কেহ বলেন, "ইহাতে শি শিশুত্বের উপরে ডাকাতি করা হয়।"—কে বলেন, "নবপদ্ধতির গুণে এরূপ শিক্ষা হয় না,—ছাত্রের বিশেষ একটা শক্তি গুণেই হয়। সকল শিশুর ভিতরেই কিন্তু এ বিশেষ গুণটি নাই";—এই মতগুলির কোনটিই কাজের নয়।

নূতন পদ্ধতি শিশুকে ঔষধ গিলাইবার মত করিয়া লেখাপড়া শিখায় না, তাহার শিশুত্ব হরণ করিয়া তাহাকে 'ইঁচড়ে পাকায়' না। এ শিক্ষা দেওয়া হয় আনন্দের সহিত, শিশুকে খেলায় মাতাইয়া ক্রীড়াচ্ছলে। প্রতি শিশুর ভিতরেই সুপ্ত ভাবে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহার বিকাশ সাধন করাই নবপদ্ধতির উদ্দেশ্য।

এর্ভিন পাল্ডা নামে একটি শিশু দুবছর বয়সের সময় সমস্ত ইংরাজী বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। যে ঘরে বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরা লেখাপড়া ত,করি এর্ভি

ঘরে উপস্থিত থাকিত। ছেলেদের শুনা এর্ভিন যে মন দিয়া শুনিত, তার দেখিলে তাহা আদোপেই টের পাওয়া ত না। অবশেষে তার বাপ-মা দৈব-কে হঠাৎ একদিন টের পাইলেন যে, র্ভিন আপনা-আপনি সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়া লিয়াছে!

এই সত্যটা জানিতে পারিয়া পিতা-ার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল; তাঁহারা াহের সহিত এর্ভিনকে বানান ও অঙ্ক াইতে লাগিলেন। এর্ভিনও খুব খুসি য়া এই শিক্ষা গ্রহণ করিত। মাস-কের ভিতরেই এর্ভিন বানান ও অঙ্ক ন্ধে এতটা জ্ঞানলাভ করিল, যে সকলেই হার আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত য়া গেলেন।

কিন্তু এর্ভিনের বয়স যখন তিন বৎসর, হার পিতামাতা তখন শিশুর অনিষ্ট-শঙ্কায় লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

এর্ভিনের পিতা বলিতেছেন, "আমার ছেলে পাছে শিশুত্বের আনন্দ থেকে বঞ্চিত , সেই ভয়েই আমি তার লেখাপড়া বন্ধ রে দিয়েছিলাম। এর্ভিনও অতি শীঘ্রই -কিছু শিখেছিল, সব ভুলে গেল। তার রে যখন তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া ল, তখন তাকে আবার নূতন করে সমস্ত খতে হয়েছিল। শিশুকালে যে-সব বিষয় া খুব ফূর্ত্তির সঙ্গে অনায়াসে শিখতে য়েছিল, বালকবয়সে সেই বিষয়গুলিও সে তমন সহজে শিখতে ও বুঝতে পারে নি। খন তার বয়স আঠারো বছর। সে পাধি পেয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ বালকের চেয়ে আমার পুত্র বেশী কোন শক্তি দেখাতে পারে নি। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, শিশুকালে তার লেখাপড়া বন্ধ না করলে, সে ঠিক ডাক্তার সিডিসের পুত্রের মত শক্তির পরিচয় দিতে পারত।"

ঠিক নিয়মে শিক্ষা দিতে পারিলে, এমন শিশু নাই, যে অল্পবয়সে অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ দিতে না পারিবে। রেভারেণ্ড এ, এ, বার্ল্‌ নামে এক পাদরী তাঁহার চারিটি সন্তানকেই নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি, পিতামাতারা আপনাদের দায়িত্ব ভুলে মাহিনাকরা মাষ্টারের হাতে ছেলেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন বলেই ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে অক্ষম হয়। আমার বড় মেয়ে লিনার বয়স যখন তিন বছর, আমরা তখনি তাকে লেখাপড়া শিখাতে সুরু করি। —স্কুলে যাবার আগেই শিশুদের লেখাপড়া সুরু করা উচিত; এ শিক্ষায় শিশুরা কষ্ট বোধ করে না, আর শৈশবের হাসি-খুসিতেও বঞ্চিত হয় না। আমার মেয়ে লিনা পুতুলখেলাও করত, লেখাপড়াও শিখত। আমরা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে-ছিলাম, লেখাপড়াও একরকম খেলা। সেও তাই বুঝেছিল।"

মিঃ বার্লের বড় মেয়ে লিনার বয়স এখন ষোল বৎসর; সে র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজে পড়ে; আপাতত 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট'। তাঁহার প্রথম পুত্রও হার্ভাড য়ুনিভার্সিটির 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট'। তাহার বয়স পনেরো বছর।

হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর লিও উয়েনারও শিশুশিক্ষায় নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার পুত্র-কন্যারাও অপূর্ব্ব বিদ্যার পরিচয় দিয়াছে। অধ্যাপকের জ্যেষ্ঠপুত্র নরবার্ট এগার বছর বয়সে কলেজে প্রবিষ্ট হয় এবং চৌদ্দ বছর বয়সেই গ্রাজুয়েটের সম্মান লাভ করে। এখন সে Ph. D. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণ বালকেরা যে বয়সে সর্ব্বপ্রথম কলেজের শিক্ষা আরম্ভ করে, সেই বয়সেই নরবার্ট যে Ph, D. ডিগ্রি লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নরবার্টের পিতা বলিতেছেন :—যাঁরা মনে করেন আমার ছেলেমেয়েরা বিশেষ একটা গুণ পেয়েছে, তাঁরা নির্ব্বোধ। অন্যান্য বালক-বালিকারা আমার পুত্র-কন্যার মত জ্ঞানলাভ করতে পারে না, তার প্রধান কারণ এই যে, আমার সন্তানেরা যেভাবে শিক্ষা পেয়েছে, অন্যান্য বালক-বালিকা সেভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয় না।

"পিতা-মাতারা তাঁদের শিশু-সন্তানকে যতটা নির্ব্বোধ মনে করেন, তারা ততটা নির্ব্বোধ নয়। শিশুদের স্বভাবিক বুদ্ধি কাজে খাটালেই সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও শিক্ষা-প্রবৃত্তিকে চে রাখ্‌লে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হবে না। শি কথা ও কার্য্যের উপরে পিতা-মাতার স দৃষ্টি রাখা উচিত। শিশুর সাম্‌নে বি ভাষায় কথা বল্‌তে হবে, ছেলে-মেয়েরা যা বাপ-মায়ের সঙ্গে সমানভাবে আলোচনা সুযোগ পায়, তাও করতে হবে, তা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সকল বিষয় উপলে করবার ক্ষমতা তাদের আছে। এক কথা যাতে তাদের বিচারবুদ্ধি বিকাশলাভ কর সর্ব্বদাই সেইদিকে মনোযোগী থাকতে হবে

"তারপর, শিশুদের মনের টান্ বিষয়ের প্রতি, সেই বিষয়ই তাদের শেখা দরকার। হয়ত কেউ আঁক কষ্‌তে ভা বাসে, কেউ পড়তে ভালবাসে, কেউ ছ আঁকতে ভালবাসে। তাদের ভালবা উপেক্ষা করলে চল্‌বে না। আমার ছে নরবার্ট যখন আঠারো মাসের, তখন তা ধাত্রী একদিন তাকে নিয়ে সাগরতীরে গি বালিতে এ, বি, সি, ডি লিখে খেলা কর্‌ছিল নরবার্ট খুব মন দিয়ে সব দেখ্‌চে-শুন্‌চে দেখে ধাত্রী বালির উপর আঁচড় কেটে তাকে বর্ণমালা শেখাতে লাগ্‌ল। দুদি পরে সে আমার কাছে এসে বল্লে যে, নরবার্ট সমস্ত বর্ণমালা শিখে ফেলেছে!"

The Lady's Realm হইতে

রোঁদার বিখ্যাত ছাত্রী

ভাস্কর-কার্য্যে সাধারণত পুরুষের নামই বেশী দেখা যায়। কিন্তু সংপ্রতি একজন রমণী ভাস্করের কাজে আশ্চর্য্য পুণ্যতা দেখাইয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

এই মহিলার নাম কাথেলীন ব্রুশ স্কট; তিনি অজ্ঞাত তুষার-রাজ্যের আবিষ্কারক, বীর কাপ্তেন রবার্ট স্কটের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী।

কাথেলীন স্কট সর্ব্বপ্রথমে চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য প্যারিসে গমন করেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তাঁহার মন ফিরিয়া যায়। ছবি-আঁকার চেয়ে মূর্ত্তি-গড়ার কাজই তাঁহার বেশী পছন্দ হইল। ফলে, তিনি সুবিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোঁদার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

রোঁদার কাছে তিনি পাঁচবছর ধরিয়া শিক্ষানবীসি করেন। এই পাঁচ বছরের শিক্ষা ও সাধনায় তিনি যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, অনেক পুরুষের পক্ষেও তাহা বড়াই কথা।

কাথেলীন স্কটের হাতের কাজ এতটা পাকা যে, সেগুলি দেখিলে সকলেরই মনে হইবে তাহা খোদ রোঁদারই তৈয়ারী। তাঁহার গড়া সকল মূর্ত্তিই ভাবাভিরাম ও জীবন্ত। কোন মহিলা-শিল্পী যে মানুষের ভিতরের আত্মাকে এমন অবলীলায়, এমন তেজের সহিত প্রকাশ করিতে পারেন, এ কথা এতদিন কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারিতেন না। মূর্ত্তিগুলির গড়ন-পিটনে, ভাব-ভঙ্গীতেও শিল্পীর আত্মপ্রকাশ নাই, রমণীর রমণীত্ব বা কোমলতা নাই, তাহাদের ভিতরে পুরুষোচিত ভাব আছে, রোঁদার সফল অনুকরণ আছে।

কাথেলীন স্কট বলেন, "পুরুষ-মানুষ গড়্‌তে আমার বড় সাধ। আমি মেয়েমানুষ গড়্‌তে চাই না—শুধু চাই পুরুষ গড়্‌তে। এতে বেশী আমোদ পাওয়া যায়।.....টাকার জন্যে আমি মূর্ত্তি গড়ি না। শিল্পকর্ম্মের ভিতরে যখনি টাকা-পয়সার কথা ওঠে, তখনি আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। ইচ্ছা করলেই আমি অগাধ অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পারি, কিন্তু তেমন ইচ্ছা আমার কখনো হয় না। আমি যখন নিজের মনের খুসিতে কাজে লেগে যাই, তখন আনন্দও পাই, কাজও ভাল হয়। কিন্তু যখন কারও ফর্‌মাস-মত পয়সার জন্যে কাজ কর্‌তে বসি, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌তে থাকে,—আমার খালি ভয় হতে থাকে যে, হয়ত আমার কাজ খরিদ্দারের মনে ধরবে না।"

কাথেলীন স্কট অনেক নামজাদা লোকের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়াছেন; যেমন, ম্যাক্স বীর-ভোম্, জন গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, স্যর ক্লেমেণ্টস্ মার্কহাম্, ডাঃ ন্যান্‌সেন্, শি, এস্, রল্‌স্, মিঃ অ্যাস্‌কুইথ্ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে শি, এস্, রল্‌সের প্রতিমূর্ত্তিটি বিশেষরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বর্গীয় শি, এস্, রল্‌স্ বিলাতের বিখ্যাত পুষ্পক-রথ-সারথি। পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে 'ইংলিশ প্রণালী' পার হইয়াছিলেন। রসজ্ঞ শিল্পী মূর্ত্তিটিকে এমনি লঘু করিয়া গড়িয়াছেন, যে মূর্ত্তিটি ভূতলে

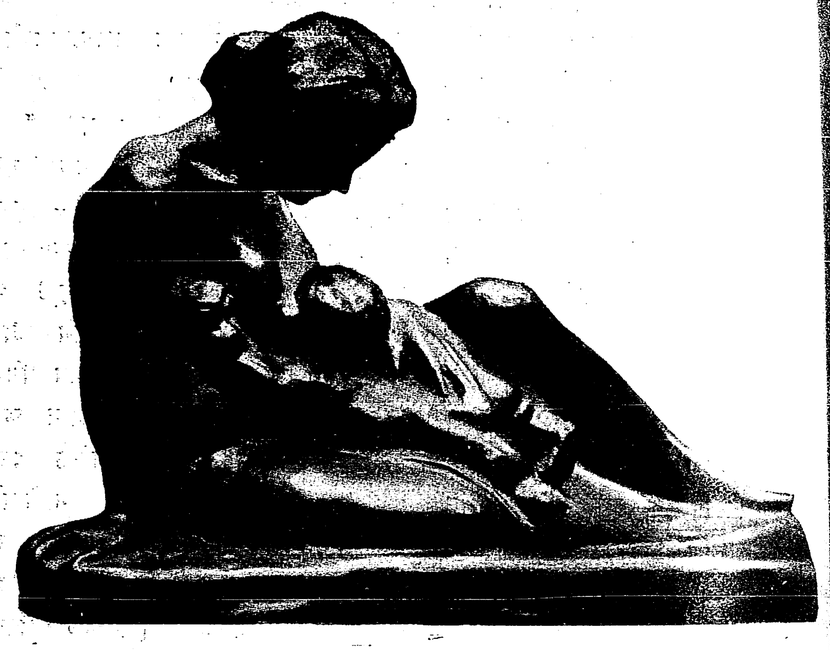

মাতৃত্ব

দাঁড়াইয়া থাকিলেও মনে হয়, তাহা যেন অনায়াসেই শূন্যে উড়িয়া যাইতে পারে!

তাঁহার গঠিত "শৈশব", "যৌবন" ও "আনন্দের" প্রতিমূর্ত্তিও অপূর্ব্বসুন্দর; এবং কঠিন পাষাণেও পেলব জীবনের এমন উচ্ছাস ও আভাস দেখিলে দর্শকমাত্রকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

আমরা এখানে কাথেলীন স্কটের "মাতৃত্বে"র প্রতিমূর্ত্তি দিলাম। কাথেলীনের উপরে রোঁদার প্রভাব যে কতটা বেশী এই মূর্ত্তিটি দেখিলে তাহা বুঝা যায়। দুগ্ধরূপে মা তাঁর বুকের রক্ত প্রাণের দুলালকে দান করিতেছেন; জননীর নিমীলিত স্নেহ দৃষ্টি পুত্রের উপর আনত। "মাতৃত্ব" ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না,—ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সকলেরই বোধগম্য।

Nash's Magazine হইতে
শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

নব্য ইতালীর কবি

নব্য ইতালীর নূতন কবি দান্নুন্‌সিয়োর (Gabriele D' Annunzio) নাম আমাদের অনেকের নিকট অপরিচিত; কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা ইতালীয় সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তিনিই নব্য ইতালীর জাতীয় কবি এবং এই

বিরাট য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় তাঁহার বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "Song of the Dardanelles" ইতালীর নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এবং পথে পথে নর-নারীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত ও গীত হইতেছে।

দান্নুন্‌সিয়োর বয়স এখন পঞ্চাশ বৎসর মাত্র। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আব্রুজি প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রৌদ্রস্নাত উন্মুক্ত দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়—প্রকৃতির এই নগ্ন সৌন্দর্য্য যে তাঁহার বাল্যজীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মধুর আঙ্গুর-কুঞ্জের সৌন্দর্য্য-শ্রী ফুলের মত তাঁহার হৃদয়ে মুকুলিত হইয়া এবং যথাকালে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ইতালীয় সাহিত্যকে বৈচিত্রে ও মাধুর্য্যে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। ষোল বৎসর বয়সে যখন তিনি টাস্কানিতে শেষ বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তিনি Primo Vere" নামক এক কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কাব্যপাঠে ইতালীর বিখ্যাত সমালোচক Giuseppe Chiarini এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি নবীন কবির কবিতাসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া উদীয়মান সাহিত্যিককে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। প্রতিভার প্রধান ধর্ম্ম, মৌলিকতা। দান্নুন্‌সিয়োও পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সৃষ্ট এই অভিনব সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিন মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে। দান্নুন্‌সিয়ো যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করেন, তখন ইতালীর অনেক দিনের তন্দ্রা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, এবং ইতালীয় সাহিত্য-শিল্পের ভিতরে জাগরণের চেতনা ফুটিয়া উঠিতেছিল। দান্নুন্‌সিয়ো এই জাগরণের বার্ত্তাঘোষণা করিবার ভার লইলেন। কিন্তু এখানেও সেই পুরাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না—সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার অনেক শত্রুসৃষ্টি হইল। তাঁহার নূতন প্রণালী পুরাতন-পন্থীদিগকে আঘাতদান করিল। এমন-কি, তাঁহার সাহিত্য-গুরু Chiarini ও তাঁহাকে অশ্লীলতা-দোষে অপরাধী করিয়া তাঁহার কলঙ্কিত লেখনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন!

এদিকে কেবলমাত্র নিছক সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা দিনাতিপাত করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। উদর-পোষণের জন্য তিনি সংবাদপত্রের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন, এবং 'Tribuna' পত্রে 'Duca Minimo' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নাটক প্রভৃতি রচনা দ্বারা সংবাদপত্রের লেখনীর মধ্য দিয়াও যে প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টি কতটা করা যায়, সকলকেই তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, ফ্রান্সের আঁতো ফ্রানস্।

এইবার দান্নুন্‌সিয়োর সাধনার কথা। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে মনে হয় যে, তিনি একজন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কবি; বস্তুত, তাঁহার লেখাকে Physical passion হইতে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত। তাঁহার সমস্ত লেখাতে ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-

জনিত সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় আছে। তবে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি যেরূপ আন্তরিকতার সহিত পৃথিবীর সৌন্দর্য্য, দুঃখ ও নৃশংসতাকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর অন্য কোন লেখক তাহা পারেন নাই। তিনি যেমন পরিপূর্ণভাবে, মেঘ-রৌদ্রের খেলা, সুমিষ্ট আঙ্গুরের আঘ্রাণ, তরুণীর এলায়িত বেণীর সুষমা এবং ঘনকৃষ্ণ মেঘের শ্রী-ছাঁদ অনুভব করিতে পারেন—তেমন অপরের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতির এই বিচিত্র শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ তাঁহার লেখনীর মুখে মধুঝরণার সৃষ্টি করিয়াছে।

দান্নুনসিয়োর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তাঁহার রচনা দুর্নীতির নির্ঝর। তিনি যেরূপ ভাবে Sexual relation বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহা দর্শন করিলে ইবসেন কিম্বা ষ্টিণ্ড্‌বার্গের শিষ্যেরাও হয়ত চমকিয়া উঠিবেন। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসই স্ত্রী-পুরুষের বিরহ-মিলন লইয়া রচিত।

দান্নুনসিয়োর একজন ইংরাজভক্ত এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সাফাই দিয়াছেন:—"বেশত,—পৃথিবীতে কোন্ জিনিসই বা দুর্নীতি নয়—এই প্রকৃতিটাই ত' একটা মস্ত দুর্নীতির খেলা! জন্মটাও কত বড় কামুকতার ব্যাপার!"

"Birth is a grossly sexual thing!" এত বড় কথার পরেও আমাদের নীতিবাগীশ সাহিত্যিকেরা যে দান্নুনসিয়োকে আমোল দিবেন; তাত মনে হয় না! এমন-কি ইংলণ্ডেও তিনি বেশী শিষ্যলাভ করি পারিবেন না। যাহা হউক, যিনি সৌন্দর্য্যে পূজারী, তাঁহার নিকট এই ইতালীয় কবি কাব্য পরম উপভোগ্য।

ইতালীতে কেবল কবি বলিয়া নহে স্বদেশ-প্রেমিকরূপেও দান্নুনসিয়োর স্থা অতি উচ্চে। তাঁহার বিশ্বাস, প্রাচী গৌরব ইতালীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে তিনি বলেন, এই প্রাচীন গৌরব ইতালী গলায় ভারী পাথরের মত ঝুলিতেছে আর ইতালী কি কেবল য়ুরোপ আমেরিকার ক্রীড়া ও ভ্রমণক্ষেত্র হইয়া থাকিবে? ইতালীর কি কোন উচ্চতর আদ নাই?

তিনি সেদিন উচ্চকণ্ঠে তূর্যস্বরে ঘোষণ করিয়াছেন, "না, আমার ইতালী আ বিদেশীর জন্য যাদুঘর হইয়া থাকিবে না— জাগিয়া উঠুক্ রোমের সমস্ত শক্তি! বিদেশী ক্রীড়াকুঞ্জ সে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিক্!

"ভিনিসের খালে খালে ঐ যে আমো আকুল নরনারীদের বহন করিয়া প্রমোদ তরণীগুলা ভাসিয়া যাইতেছে, পুড়াইয়া দাও —উহাদিগকে পুড়াইয়া দাও!"

নব্য ইতালীর কবি দান্নুনসিয়ো মহিমময়ী নূতন বাণী প্রচার করিতেছেন, ইতালীকে একদিন তাহা গৌরবের দুর্গম শিখরে অগ্রসর করিয়া দিবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

বিনয়-পরিচয় *

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বলাভের পর যত দিন তাঁহার ধর্ম্ম লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়া বেশ একটু প্রসার লাভ করিতে সমর্থ না হইয়াছে, তত দিন তিনি নিজের অধিগত তত্ত্ব বা সাধ্য-সাধন বুঝাইতে ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করিতেন, বিনয়ের কথা বা ঐ শব্দ তখন তাঁহার নিকট শুনিতে পাওয়া যাইত না। বোধিলাভের পর তিনি অজপালনামক-বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছেন (মহা.১-৫-২), তিনি যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, (১) তাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ ও দুর্ব্বোধ। সংসারাসক্ত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিবে না। তিনি ধর্ম্ম উপদেশ করিতে পারেন, (২) কিন্তু বুঝিবে কে? ইহার পর ব্রহ্মার সহিত তাঁহার যথোপকথনে (মহা ১-৫), আড়ার কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রকে উপদেশদানে (১-৬), এবং পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ হইতে আরম্ভ করিয়া (১-৬-১৪) যশের আত্মীয়বর্গকে উপসম্পদা দান পর্য্যন্ত (১-১০) সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখে ধর্ম্মেরই কথা শুনা যায়, বিনয়ের কথা তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

শনৈঃ-শনৈঃ দুই-চারিজন করিয়া লোক তাঁহার নব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা ৬১ জন পর্য্যন্ত হইয়াছে (১-১০-৪), তিনি ইহার বহুল প্রচারের জন্য বলিতেছেন (১-১১-১)—"ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহু-জনের সুখের জন্য তোমরা ভ্রমণ কর। একসঙ্গে দুই জন যাইও না। তোমরা আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও অন্তকল্যাণ ধর্ম্ম উপদেশ কর।" ভিক্ষুগণ এই আদেশ লাভ করিয়া নানাদিকে নানা জনপদে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন, এবং বহু-বহু লোকে আকৃষ্ট হইয়া এই নব ধর্ম্মে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভিক্ষুগণ চারি-দিকে দূর-দূরতর স্থান হইতে দলে-দলে এই সমস্ত লোককে বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে এইরূপে বহুলোকের একটি দল সৃষ্ট হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে তিনি নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিতেন, কিন্তু তখন দেখিলেন একাকী তাঁহার দ্বারা ইহা হওয়া কঠিন। তিনি বহুদিকে বহু অসুবিধা বুঝিতে পারিলেন। দূর-দূরতর স্থান হইতে ধর্ম্মার্থী লোকসমূহের তাঁহার নিকটে আসা কষ্টকর, আবার ভিক্ষুগণেরও তাহাদিগকে তাঁহার নিকটে আনা কষ্টকর (১-১২-২)।

---

* বিনয়পিটকের (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয়ই) প্রাতিমোক্ষ প্রবন্ধকার-কৃত অনুবাদ ও সুবৃহৎ টীকার সহিত অচিরে প্রকাশিত হইবে, এই প্রবন্ধটি তাহারই ভূমিকার একাংশ।

১। "অধিগতো খো ম্যায়ং ধম্মো।"

২। "ধম্মং দেসেয্যং।"

তিনি ইহা আলোচনা করিয়া ভিক্ষুগণেরও উপর প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ভিক্ষুগণ এতদিন কেবল নিজেরই ভার বহন করিতেছিলেন, এখন হইতে তাঁহাদিগকে অন্যেরও ভার গ্রহণ করিতে হইল। পূর্ব্বে ধর্ম্মসাধনায় কেবল বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত, এখন হইতে ভিক্ষুগণ অর্থাৎ সঙ্ঘেরও আশ্রয় গ্রহণ করা আরম্ভ হইল। (৩) সঙ্ঘের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভিক্ষুগণ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন না; তিনিও নানাস্থানে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া মগধ-জনপদের এত লোক তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল যে, সেখানকার অধিবাসীরা হতাশ হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল (মহা. ১-২৪-৫)—'শ্রমণ গৌতম স্ত্রীলোকদের বৈধব্যসাধনের জন্য, অপুত্রতার জন্য, বংশোচ্ছেদের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন!' ভিক্ষুর সংখ্যা যখন এইরূপ বাড়িয়া উঠিল; উত্তম-অধম যোগ্য-অযোগ্য, অধিকারী-অনধিকারী সকলেই যখন নির্বিশেষে দলে-দলে সঙ্ঘমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন, বলা বাহুল্য, নৈসর্গিক নিয়মেই মানবের স্বাভাবিক ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষ বশতই এই ভিক্ষুদলের মধ্যে নানাবিধ ত্রু পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথ নবপ্রবিষ্টগণকে শিক্ষা উপদেশ দিবা বিশেষ কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কিরূ ভাবে কি করিতে হইবে, না-হইবে, তাহার ঠিক করিতে পারিত না; কোনোস্থানে নানা-রূপ অকার্য্য করিয়া ফেলিত। বুদ্ধদেব এই সমস্ত দেখিয়া বিরক্ত হইতে লাগিল, এবং বুদ্ধদেবকে ইহার উপায় চিন্তা করিতে হইল। তিনি উপাধ্যায়ের প্রথা করিলেন (১-২৫-৬)—"ভিক্ষুগণ, আ উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি অনুজ্ঞানাদি ভিক্‌খবে উপজ্ঝায়ং")। প্রতিস্থানেই সর্ব্ব প্রথমে বিনয়ের সূত্রপাত হইল। তিনি উপাধ্যায়ের বিধান করিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় নিজের সদৃশ ("সদ্ধি-বিহারিক") ভিক্ষুকে পুত্রের মত দেখিবেন, এবং সহচরও উপাধ্যায়কে পিতার মত দেখিবেন। তাহা হইলেই তাহারা এই ধর্ম্ম-বিনয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপুষ্ট হইতে পারিবেন। (৪) তিনি পূর্ব্বে ধর্ম্মের ই কথা বলিতেন, এখন হইতে ধর্ম্ম ও বিনয় উভয়কেই একত্র বলিতে

৩। এই জন্যই দেখা যায় (১-৪-৫) উপাসকও হইতে হইলে পূর্ব্বে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত—"এতে বয়ং ভন্তে ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম ধম্মং চ,...তেব লোকে পঠমং উপাসকা অহেসুং দ্বে বাচিকা।" কিন্তু পরে সঙ্ঘেরও আশ্রয় প্রচলিত হইল। পূর্ব্বে "স্বাক্‌খাতো ধম্মো, চর ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুক্‌খস্স অন্ত করিয়ায়" (১-৬-৩২, ৩৪, ৩৭, ইত্যাদি)—এই মাত্র বলিয়াই ভগবান্ উপসম্পদা প্রদান করিতেন, কিন্তু পরে (১-১২-৪) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি"—ইহাই তিনবার পাঠ করাইয়া উপসম্পদা দান বিহিত হইল।

৪। "ইমস্মিং ধম্ম বিনয়ে বুড্‌ঢিং...আপজ্জিস্সন্তি।"

আরম্ভ করিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাই বলিয়াছেন। (৫)

দেশ-দেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচারের বৃদ্ধির সহিত সঙ্ঘও ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বে যেরূপ সূচিত হইয়াছে, এই সঙ্ঘমধ্যে আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই নানা-বিধ বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নানা-রূপ অনাচার দেখা যাইতে লাগিল। (৬) সময়োচিত নিয়মের মধ্যে আনিয়া সংযত করিতে না পারিলে, এই সঙ্ঘকে সৎপথে পরিচালিত করা অসম্ভব দেখিয়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব-সম্বন্ধে, শরীর ও বাক্যের সংযম সম্বন্ধে শিক্ষার (৭) বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি নানারূপ আজ্ঞার প্রচার (৮) ও নানারূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুগণের এক-একটি অন্যায় কার্য্য ও অসদাচরণের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে লাগিল, আর তিনিও তাহার প্রতিকারের জন্য এক-একটি নিয়ম করিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভবিষ্যতে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। আবার তাহাদের কোন অভাব-অভিযোগ বা অসুখ-অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তিনি অবিলম্বে তাহা অপনয়ন করিবার জন্য নূতন-নূতন নিয়ম বিধান করিতেন। আবশ্যক হইলে তাহাদের কল্যাণের জন্য পূর্ব্ববিহিত কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে তাহার স্থানে নূতন নিয়ম উদ্ভাবন করিতে হইত, অথবা তাহাতেই আর কিছু যোগ করিতে হইত, কিংবা তাহার প্রতিপ্রসব করিতে হইত। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের পর হইতেই বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে এই বিধি-নিষেধ লইয়াই কাটাইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত বিধি-নিষেধের সংখ্যা এত অত্যধিক, এবং ইহাদের কোনো-কোনটি এতই যৎ-সামান্য ও অনাবশ্যক বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব এই সকল লইয়া তাঁহার অমূল্য সময় ব্যর্থ নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব। বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত শীলবিষয়ক এই সকল বিধি-নিষেধই বিনয় নামে প্রসিদ্ধ। (৯)

৫। "ইমস্মিং ধম্ম বিনয়ে আকঙ্খতি পব্বজ্জং" (দীঘ.১৬-৫-২৮)। এইরূপ অনেক। বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ-সময়ে বলিতেছেন (দীঘ.১৬-৬-১)—"যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো।" এই ধর্ম্ম ও বিনয় একত্র শাসন (উপদেশ) নামে অভিহিত হইয়া থাকে (মহা.১০-৫); —"এসো ধম্মো এসো বিনয়ো এতং সত্থু সাসনং।"

৬। "অনাচারং আচরতি।"—মহা.১-২৯-১; ভিক্ষুবিভঙ্গ, সঙ্ঘা, ২২-১। এইরূপ বহু স্থানে। "বিবিধম্পি অনাচারং আচরন্তি।"—ভিক্ষুবিভঙ্গ, সঙ্ঘা ১৩-১-২। বিবিধ অনাচারটা কিরূপ তাহাও এইখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৭। "অধিসীলসিক্‌খা" (অধিশীলশিক্ষা); "বিনয়নতো কায়বাচানং।"

৮। "আণাদেসনা" (আজ্ঞাদেশনা)।

৯। প্রাচীন আচার্য্যগণ বিনয় শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"বিবিধ-বিসেস-নয়ত্তা বিনয়নতো চ কায়বাচানং।
বিনয়বিদূহি অয়ং বিনয়ো বিনয়োতি অক্‌খাতো।"

বুদ্ধদেব প্রথমত নিজের ধর্ম্মই প্রচার করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত ধর্ম্ম-তত্ত্বকে,—সাধ্য-সাধনকে চারিটি সহজ কথায় বলিতেন। তিনি ইহাদের নাম দিয়াছিলেন আর্য্য সত্য। তিনি বলিতেন, ১। দুঃখ আছে, ২। দুঃখের কারণ আছে, ৩। দুঃখের ধ্বংস আছে, এবং ৪। দুঃখধ্বংসের উপায়ও আছে। দুঃখধ্বংসের উপায় (১-৬-২২) "সম্যগ্‌দর্শন" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গ পথ (আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ)। লোকেরা ইহা শুনিল ও গ্রহণ করিল। তাহারা বুঝিল দুঃখধ্বংসই লক্ষ্য বা সাধ্য। এবং তাহার উপায় বা সাধন হইতেছে ঐ অষ্টাঙ্গ পথ। বলিবার বা বুঝিবার আর কিছু বাকী থাকিল না, ধর্ম্মের প্রচার ও গ্রহণ চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহা অতি-স্বাভাবিক যে, অনেক সময়ে কেবল সাধ্য-সাধনেরই উপদেশে কাজ হয় না, হইতেও পারে না; সাধনেরও সাধন উপদেশ করিতে হয়। পিপাসার উপশমের জন্য জলের উপদেশ করিয়া কখনো-কখনো কোনো-কোনো লোককে কোথা হইতে কিরূপে কিসের দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাও বলি দিতে হয়; সাধনেরও সাধন বলিতে হ বুদ্ধদেবকেও ইহা করিতে হইয়াছিল। তি প্রথমে ধর্ম্ম অর্থাৎ মূলভূত সাধ্য-সা নির্দ্দেশ করিয়া অবান্তর সাধ বিধি-নিষেধাত্মক বিনয় বিধান করিয়া ছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, চক্রে অভাবে যেমন রথ চলিতে পা বিনয়ের অভাবে তাঁহার ধ পারে না। এইজন্যই নির্ব্বাণ-সম তিনি বলিয়াছিলেন (মহাপ)—"আনন্দ তোমাদের মনে হইতে পারে যে, 'আমাদে প্রবচনের (উপদেশের) শা উপদেশক চলিয়া গেলেন, আমাদের শাসক কে নাই।' আনন্দ, এরূপ ম করিও না। আমি যে, তোমাদিগকে ধ ও বিনয়ে উপদেশ করিয়াছি, বুঝাইয়া দিয়াছি, আমা অভাবে তাহাই তোমাদের শাসক হইবে। (১০) ধর্ম্মের জন্য যে, বি য় চাই-ই চাই ইহা তিনি গভীরভাবে বুঝাইবার জ পুনঃপুনঃ পুনঃপুনঃ ঐ শব্দ দুইটিকে একত্র প্রয়োগ করিতেন; এবং সর্ব্বত্রই

ইহার অর্থ:—যেহেতু ইহাতে বিবিধ নয় (=নীতি) ও বিশেষ নয় আছে, এবং যেহেতু ইহা কায় ও বাক্যের (অত্যাচার অর্থাৎ অসংযমকে) অপনয়ন করে, সেই জন্য বিনয়বিদ্‌গণ ইহাকে বি য় বলিয়া থাকেন। বিবিধ নয়=পঞ্চবিধ প্রতিমোক্ষপাঠ, পারাজিকাদি সপ্তবিধ দোষসমূহ, মূল প্রতিমোক্ষ ও বিভঙ্গাদি। বিশেষ ন ঐ সকল নয়েরই আবশ্যকস্থলে দৃঢ়ীকরণ, শিথিলীকরণ, ইত্যাদি।

১০। "যো বো আনন্দ, ময়া ধম্মো চ বি ন য়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চয়েন সত্থা।" ইহা দ্বারা শাস্ত্রনিষ্ঠাই উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেব আর এক স্থানে (দীঘ.১৬-১-৬; =মহাপ.২-৭৭) অপরিহায্য ধর্ম্মের মধ্যে এই কথাটি খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—"ভিক্ষুগণ, আমি যাহা বিধান করি নাই, যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ তাহা বিধান করিবে না; বা যাহা আমি বিধান করিয়াছি, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা তাহার সমুচ্ছেদ করিবে না; এবং আমি যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তৎসমুদয়ই অবলম্বন করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা চলিবে, হে ভিক্ষুগণ, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের উন্নতি হইবে, হানি হইবে না।" বিহিত বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করার

র্ম্ম শব্দকে প্রথমে ও বি ন য় শব্দকে তাহার ব্যবহিত পরে প্রয়োগ করিতেন।" (১১) ইরূপ গৌরব দেখিয়াই তাঁহার শিষ্যগণ ধর্ম্মসঙ্গীতির সময়ে প্রথমে বি ন য় আবৃত্তি রিয়া পরে ধর্ম্ম আবৃত্তি করেন (চুল্ল-১-১-৬, ৮)। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বি ন য় ক ভাবে থাকিলে ধর্ম্ম ও ঠিক ভাবে াকিবে, অন্যথা ধর্ম্ম টিকিতে পারে না। সই জন্যই বুদ্ধঘোষের সমন্তপাসাদিকায় (২৮৯ পৃ) প্রথম ধর্ম্মমহাসঙ্গীতির বিবরণে ক্ত হইয়াছে, মহাকাশ্যপ যখন সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রথমে র্ম্ম বা বি ন য় আবৃত্তি করা যাইবে, খন ভিক্ষুগণ উত্তর করিয়াছিলেন—বিনয়ই বুদ্ধশাসনের আয়ু, বি ন য় াকিলেই শাসন থাকিবে, অতএব আমরা প্রথমে বি ন য় আবৃত্তি করিব।" (১২) দেখা যায় বিনয়ই নির্ব্বাণলাভের প্রথম সোপান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (১৩)

সমগ্র বুদ্ধবচনের একই তাৎপর্য্য ('বিমুত্তিরস') হইলেও এইরূপে তাহা স্পষ্টত দুইভাগে বিভক্ত হইল, ধর্ম্ম ও বি ন য়। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণলাভের পরেই রাজ-গৃহের ধর্ম্মমহাসঙ্গীতিতে সমবেত ভিক্ষুগণ পরিস্ফুটভাবে এই দুই ভাগেই সমগ্র বুদ্ধ-বচনকে যথাক্রমে উপালি ও আনন্দের নিকট জিজ্ঞাসা করেন (চুল্ল.১১-১-৭-৮)। পরে,—বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অনেক পরে, তাঁহার চিন্তাশীল শিষ্যবর্গ ধর্ম্মেরই অংশ-বিশেষ, অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তার অনুকূল বিষয়সমূহকে অবলম্বন করিয়া একটি নূতন তত্ত্বের, নূতন সাহিত্যের উদ্ভাবন করেন, ইহার নাম হইল অভিধর্ম্ম। (১৪) এবং বুদ্ধবচনের যে অংশ পূর্ব্বে ধর্ম্ম নামে

কতকগুলি ভিক্ষু কিরূপ দুর্গতিপ্রাপ্ত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল, বিনয়ে (সুত্তবিভঙ্গ, পারা.১-৭) তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণও এই শাস্ত্রনিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন (১৬-২৩,২৪):—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।"

১১। "ইমস্মিং ধম্ম বি ন য়ে আকঙ্খতি পব্বজ্জং",—মহাপ ১-৩৮-১। এইরূপ শতশত বাক্য আছে। তাঁহার পরও বৌদ্ধসাহিত্যে এই শব্দযুগল এইরূপ ভাবেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

১২। "বি ন য়ো নাম বুদ্ধসাসনস্স আয়ু, বি ন য়ে ঠিতে সাসনং ঠিতং হোতি, তস্মা পঠমং বি ন য়ং সংগায়াম। বুদ্ধঘোষের অন্যান্য অর্থকথাতেও ইহা উক্ত হইয়াছে (দ্রঃ—সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১০ পৃ)।

১৩। "বি ন য়ো সংবরত্থায়, সংবরো অবিপ্পটিসারত্থায়.....বিমুত্তি ঞাণ দস্সনং অনুপাদপরিনিব্বানত্থায়।"

১৪। অভি ধর্ম্ম=অধি ধর্ম্ম (তুলঃ—"অভিসমাচারিকায় সিক্‌খায় সিক্‌খাপেতুং, অভি ব্রহ্মচারিকায় সিক্‌খায় সিক্‌খাপেতুং, অভি ধম্মে বিনেতুং, অভি বি ন য়ে বিনেতুং"—(মহা.১-৩৬-১২), অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক। ধর্ম্ম শব্দ এখানে ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব অংশে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় অভি ধর্ম্মের কোনো কথাই ছিল না, তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। চুল্লবগ্‌গে বর্ণিত প্রথম (রাজগৃহের) ও দ্বিতীয় (বৈশালীর) ধর্ম্মমহাসঙ্গীতিতে ইহার কোনো উল্লেখ নাই; কেবল ধর্ম্ম ও বি ন য়ের কথা আছে। বুদ্ধঘোষের অর্থকথা-গুলিতে ধর্ম্মমহাসঙ্গীতির বিবরণসমূহে অভি ধর্ম্মের ও পাঠের কথা আছে, কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী সংযোগ ভিন্ন কিছুই নহে।

প্রচলিত ছিল, পরে তাহাই সূত্র বা সূত্রান্ত নামে কথিত হইতে লাগিল। অবশিষ্ট বিনয় অংশ সেই নামেই চলিতে থাকিল। ক্রমশ এই তিন অংশ পৃথক্ পৃথক্ তিন ভাগে সঙ্কলিত ও লিখিত হইল, এবং এক-একটি পৃথক্-পৃথক্ পিটকে (অর্থাৎ পেটী বা ঝাঁপিতে) রক্ষিত হওয়ায় কালক্রমে আধার ও আধেয়ের অভেদ-ব্যবহারে (১৫) প্রত্যেক অংশই এক একটি পিটক নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ইহা হইতেই তিনটির সাধারণ নাম হইল ত্রিপিটক। এই তিন পিটকে প্রধানত তিনটি বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে, শীলবিষয়ক (১৬) শিক্ষা বিনয়ে, চিত্তবিষয়ক শিক্ষা সূত্রে, (১৭) এবং প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষা অভিধর্ম্মে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

স্রোতের ফুল

(৩৯)

এই ঘটনার পর মালতীর মন অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল, না জানি কখন প্রেমানন্দ আসিয়া তাহার নিভৃত বাসে উপদ্রব ঘটাইয়া তুলিবে। ঘরে এমন একটি খিল নাই যাহা রুদ্ধ করিয়া মালতী একটু আপনাকে অন্তরাল করিতে পারে। মালতী মনে করিল কপাট ভেজাইয়া তোরঙ্গ প্রভৃতি ভারি জিনিষ চাপাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে; কিন্তু খিল দরজাগুলি সমস্তই বাহির দিকে খোলে। ইহাতে তাহার মন এমনি ভয়চকিত হইয়া উঠিল যে তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল সকল দরজার ফাঁকে লুব্ধ দৃষ্টি পাতিয়া প্রেমানন্দ বুঝি তাহাকে দেখিতেছে, কোথাও একটু খুট করিয়া শব্দ হইলে কাহারও পদশব্দ শুনিলেই সন্ত্রস্ত হইয়া সে চমকিয়া উঠে। মালতীর বিশ্রাম নিদ্রা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল; সে আপনাকে লইয়া একটু নিরালা বসিয়া ভাবিবারও সময় পায় না।

কিন্তু তার পাঁচ দিন মালতী গুরুর দর্শন পর্য্যন্ত পাইল না; তিনি সর্ব্বদা নিজের ঘরটিতে বসিয়া পূজা পাঠে অত্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া উঠিয়াছেন।

হঠাৎ এক দিন প্রভাতে প্রেমানন্দ বিপিন ও মালতীকে ডাকাইয়া আনিলেন। গুরুর আহ্বান শুনিয়া মালতীর মন ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিয়াছিল; সে শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, সেখানে আর কে আছেন?

শান্তি বলিল—যোগানন্দ আর আমি ছিলাম; যোগানন্দ স্বরূপানন্দকে ডাকতে গেছেন, আর তোমায় ডাকতে এসেছি।

মালতী যখন দেখিল যে বিপিনেরও ডাক পড়িয়াছে, তখন সে নির্ভয়ে গুরুর গৃহের অভিমুখে শান্তির সঙ্গে যাত্রা করিল।

প্রেমানন্দ বলিতেছেন—দেখ বিপিন বাবু, আমি ভেবে দেখলুম এ আশ্রমে তোমাদের থাকা কল্যাণের হবে না। তুমি মালতীকে নিয়ে সংসারাশ্রমেই ফিরে যাও...

কথাটা মালতীর কানে গেল। মালতী আসিয়া কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া প্রেমানন্দকে প্রণাম করিয়া এক পাশে উৎসুক হইয়া বসিল।

বিপিন একবার অপাঙ্গে মালতীর দিকে চাহিয়া গুরুকে বলিল—আমাকে এমন কঠোর আদেশ করছেন কোন্ অপরাধে? সংসারে আমার কোথাও ঠাঁই নেই দেখে আমি আপনার চরণে আশ্রয় নিয়েছি—আমার কি কোথাও আশ্রয় নেই?

নিরুপায় ভাবপ্রবণ বিপিনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

প্রেমানন্দ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; আর একটি কথাও তিনি বলিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া মালতী হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। তখন বিপিনও গুরুকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখ বিপিন, তোমার মনে বৈরাগ্য এসে থাকলেও মালতীর মন বড় তরল আছে; এ আশ্রমে আর থাকা কল্যাণের হচ্ছে না! তুমি তাকে অন্যত্র রাখবার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

বিপিন মালতীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে নিশ্চয় আশ্রম-প্রতিকূল এমন আচরণ কিছু করিয়াছে যাহার জন্য গুরু তাহাকে আশ্রমে রাখিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিপিন হনহন করিয়া গিয়া মালতীর ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিল—মালতী!

আশ্রমে আসিয়া অবধি বিপিন একটি বারও মালতীর নিকটে আসে নাই, কথা বলে নাই। আজ তাহাকে ডাকিতে শুনিয়া মালতীর আনন্দ-সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল, হৃদয় শতদল বিকশিত হইয়া উঠিল, —তবে বুঝিবা গুরুদেবের অনুরোধে সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিপিন তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে! মালতী তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া লজ্জিত স্মিতমুখে বিপিনির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

বিপিনের মনের সমস্ত উগ্রতা নিমেষে

১৫। "ত্রিভুবন-বাসী জানে" এই অর্থে "ত্রি ভু ব ন জানে" প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এখানে আধার ও আধেয়ের অভেদ ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতস্থলে বি ন য় রাখিবার একটা পৃথক্ পিটক ছিল, এইরূপ সূত্র অ ভি ধ র্ম্মে র ও পৃথক্-পৃথক্ পিটক ছিল। প্রথম-প্রথম সকলে বলিত "বি ন য়ে র পিটক," "সূ ত্রে র পিটক," "অ ভি ধ র্ম্মে র পিটক"; তাহার পর অভেদে বি ন য় পি ট ক ইত্যাদি ব্যবহার হয়। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলে এইরূপই বলিতে হয়। তিনি পৌরাণিকগণের মতানুসারে (সুমঙ্গল ১৮—১৯ পৃ) বলেন— "তেন এবং দুবিধখেন পিটকসদ্দেন সহ সমাসং কত্বা বি ন য়ো চ সো পি ট ক ঞ্চ পরিয়ত্তিভাবতো তস্স অবয়ব ভাজনতো চাতি বি ন য় পি ট কং।" বস্তুত, কর্ম্মধারয় সমাস না করিয়া বি ন য়ে র পি ট ক, বি ন য় পি ট ক এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলেই হইতে পারে।

১৬। শীল=স্বভাব (অভিধান. ১৭৮, ১০৯১), সংযম (ঐ, ৪৩০)।

১৭। অর্থাৎ কিরূপে ধ্যান-সমাধি-ভাবনাদি দ্বারা চিত্তকে সংস্কৃত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক।

মিলাইয়া গেল। তাহারও অন্তরে সুখের প্রলোভন উঁকি মারিতে লাগিল। বিপিন আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; সে মালতীকে কিছুই না বলিয়া ফিরিয়া চলিল।

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আপনি আমাকে কি বলছিলেন?

কুণ্ঠিত বিপিন একবার মালতীর দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তুমি কি আশ্রমের নিয়ম পালন কর না?

মালতীর অত্যন্ত রাগ হইল—প্রেমানন্দ নিশ্চয় বিপিনের কাছে তাহার নামে নালিশ করিয়াছে। মালতী উগ্রস্বরে বলিল—না।

—কেন?

—কেন? জানিনে কেন।—বলিয়াই মালতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বিপিন দেখিল মালতী মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া খাটের বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। বিপিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

(৪০)

বিপিন নীচে নামিয়াই দেখিল দুর্গ্রহের মতো তারক দাঁড়াইয়া আছে। বিপিনকে দেখিয়াই তারক তাহার বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—কি হে সৌখীন সন্ন্যাসী, অপি তপো বর্দ্ধতে? কিংবা—

অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং
সম্যগ্-বিনীয়ানুমতো গৃহায়?
কালোহ্যয়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয়ং
সর্ব্বোপকারক্ষমমাশ্রমং তে!

দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশের জোগাড় গাঁটছড়া বেঁধে ভায়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফির কেমন নয়?

বিপিন তাহাকে গ্রাহ্য মাত্র না করি নিজের ঘরে গিয়া যোগবাশিষ্ঠ খুলি পড়িতে বসিল—

এই যে চরাচর-চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য বিষয়,— সমস্তই অস্থির, ইহা আপদের মূল ও পাপের হে বিষয়-সমূহের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা মানসিক কল্পনামাত্র।

শিরা-কঙ্কাল-গ্রন্থি-শালিনী মাংসপুত্তলী রমণীর যন্ত্র চঞ্চল অঙ্গসমূহে প্রকৃতপক্ষে শোভার সামগ্রী আছে? পুরুষ সংসার-পল্বলের মৎস্য, চিত্তকর্ম তাহার বিহারক্ষেত্র, দুষ্টবাসনা সেই মৎস্য ধরিব বঁড়িশ-সূত্র এবং রমণী সেই বঁড়িশাহত পিষ্টকপিঞ্জ

হে রাম! পণ্ডিতেরা বাসনা-ক্ষয়কেই মুক্তি এ বিষয়বাসনার আতিশয্যকেই বন্ধন বলিয়া থাকেন।

যদ্দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় এবং পুনর্জন্ম যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় আর যা পরম শান্তির আস্পদ, তাহাই জীবনপদবাচ্য।

কিন্তু শাস্ত্র যাহাই বলুক, রমণীকে যতই কদর্য্য করিয়া চিত্রিত করুক, বিপিনের মনের মধ্যে মালতী কিছুতেই অসুন্দর হইতেছিল না, মালতীহীন জীবন তাহার নিকট জীবনপদবাচ্য বোধ হইতেছিল না। সদ্য সে মালতীকে কাঁদিতে দেখিয়া আসিয়াছে—সেই তাহার তপ্ত অশ্রুবিন্দুগুলি একে একে গলিয়া গলিয়া বিপিনেরই হৃদয়পাত্রে পড়িয়া মুক্তাময় বরমাল্যের আকারে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে ভাবিতেছিল ঐ উপরের ঘরেই মালতী আছে, ইচ্ছা করিলে সে তাহাকে পাইতে

রিত, এখনো পারে, কিন্তু এই সুখ সে ায় ত্যাগ করিয়াছে; এই জন্য বেদনার ও ত্যাগের একটা গর্ব্ব অনুভব রিতেছিল।

তথাপি শাস্ত্রের উপদেশ ও অনুশাসন বং বৈরাগ্যের গর্ব্ব অগ্রাহ্য করিয়া তাহার চিত্ত বলই মালতীর দিকেই অভিসার করিতে- ল। তাহার এক একবার মনে হইতেছিল, র চেয়ে মালতীকে বিবাহ করিয়া রানীগিরি করাও ভালো ছিল। নিঃসঙ্গ কাকী বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িবার তো মনের গঠন বিপিনের নহে।

বিপিন ভাবিতে লাগিল—মালতী আমার কটি প্রশ্নেই অমন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল কন? তবে কি মালতী এখনো আমায় ালো বাসে? এখনো কি তাহার মন আমার প্রতি তেমনি অনুরক্ত আছে? আমি তাহার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছি তাহা কি সে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? আমি যেমন তাহার অভাবে দগ্ধ হইতেছি, তাহার প্রাণেও কি তেমনিতর প্রণয়বহ্নি জ্বলিতেছে? হায় অভাগিনী! কেন তুমি নবকিশোরকে বিবাহ করিয়া তাহার কাছে থাকিলে না। তাহা হইলে আমার সাধনার বিঘ্ন ঘটাইয়া তোমার চিন্তা সর্ব্বদা আমায় ঘিরিয়া থাকিত না। আগে মনে করিয়া- ছিলাম মালতী কাছে থাকিলে নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মসাধন করিতে পারিব; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিতেছি তাহা ভ্রম; পরম প্রলোভনের সামগ্রী পার্শ্বে রাখিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে পারিবার মতো দৃঢ় চিত্ত আমার নয়, এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। তার চেয়ে বরং মালতী নবকিশোরকে বিবাহ করিলে তাহাকে একেবারে আয়ত্তাতীত মনে করিয়া হয় ত ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সত্যই তাহা পারিতাম কি? সে হয় ত আরো অসহ্য হইত। দূর হোক ছাই, এ সন্ন্যাসের পথে ধর্ম্মসাধন আমার কর্ম্ম নয়; আমি আজই গুরুজীকে বলি মালতীকে না পাইলে আমার ইহ-পরকাল দুই-ই নষ্ট হইয়া যাইবে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপিনের অন্তর মালতীর প্রতি অনুরাগে প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। সে তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুরুজীর সন্ধানে বহির্গত হইল।

সে গুরুর ঘরে গিয়া দেখিল গুরু একখানি আসনে স্তব্ধ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন।

বিপিন এতক্ষণ যে সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া আসিয়াছিল তাহা এখন গুরুর সম্মুখে আসিয়া শিথিল হইয়া পড়িল। সে এই মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্যকে কেমন করিয়া বলিবে যে সে আর পারিতেছে না, মালতীকে তাহার পত্নীরূপেই চাই। বিপিনের মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে অপ্রতিভ ভাবে ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আপনার ঘরে গিয়া গীতা খুলিয়া পাঠ করিতে বসিল—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়মৈতদ্ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

বিপিন অবশ চিত্তকে দমন করিবার জন্য

আগামী মাঘীপূর্ণিমা হইতে নির্জ্জন-বাস আরম্ভ করিবে স্থির করিল। যে সন্ন্যাসী নির্জ্জনে জপ আরাধনা করিতে চায় তাহার জন্য আশ্রম-উদ্যানের চার কোণে চারটি গুহাগৃহ আছে; সে সেই গৃহে সংরুদ্ধ থাকে—আশ্রমের একজন নির্দ্দিষ্ট কেহ দিনান্তে তাহাকে কিছু পানীয় ও আহার্য্য দিয়া আসে। শীঘ্রই আশ্রমে রটিয়া গেল বিপিন নির্জ্জনে তপস্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিপিন নির্জ্জনবাস করিবে শুনিয়া মালতী ভীত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

(৪১)

আশ্রমের সকল শিষ্য ও শিষ্যারা লক্ষ্য করিতেছিল কয়েক দিন ধরিয়া গুরুর মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া আছে; তিনি সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, দিনে ও রাত্রে অধিক সময়েই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া কাটাইতেছেন; থাকিয়া থাকিয়া উঠিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে পূজায় বসেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার মুখে স্নিগ্ধ হাসি লাগিয়াই থাকে না; সমবেত শিষ্যদের মিষ্ট কথায় উপদেশ দান না; শিষ্যশিষ্যারা অভ্যাস ও নিয়ম-মত প্রাতে ও সন্ধ্যায় আসিয়া তাঁহার ঘরে সমবেত হইলে গুরু কেমন ব্যস্ত হইয়া পড়েন; কেহ কোনো প্রশ্ন করিলে নীরস বিরস ভাবে তাহার উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ হয়ত মাঝ-খানে থামিয়া অন্যমনস্ক হইয়া যান অথবা সেখান হইতে চঞ্চল হইয়া চলিয়া যান।

ইহা দেখিয়া ও বুঝিয়া শিষ্যশিষ্যারা আর তাঁহার কাছে কেহ আসিত না; সকলেই ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে রহিত। দু-চার-দিন পরে হঠাৎ এক সময় প্রেমানন্দ নিজেই সকল শিষ্য-শিষ্যাকে ডাকিয়া ত দিগকে শাস্ত্র পড়িয়া শুনাইতে বসিতেন, কে দিন বা বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন, কোনো দিন তিনি মালতীকে ডাকিতেন মালতীও গুরুর মুখে বৈরাগ্যের উপ শুনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিল না।

মালতী বুঝিতে পারিতেছিল গুরু তাহা এড়াইয়া চলিতেই চাহিতেছেন। প্রেমানন্দ ঘর হইতে ঠাকুরঘরে বা নীচে যাই হইলে বা ঠাকুরঘর বা নীচে হইতে তা ঘরে আসিতে হইলে মালতীর ঘরের স দিয়া যাইতে হয়; মালতী দেখিত প্রেমা অভ্যাসের বশে সেই পথে যাইতে আসিতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া অন্য দি বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া যাইতেন। মা বুঝিতেছিল যে গুরু হইয়া তিনি যে মালত গোপনতার মধ্যে একদিন উঁকি মারি গিয়াছিলেন এইজন্য তিনি লজ্জিত হ মালতীর সম্মুখীন হইতেও পারিতেছি না। মালতী ক্ষমা করিয়া নিজে তাঁ সম্মুখে গিয়া যতদিন না তাঁহার মনের ম মার্জ্জনা করিয়া দিবে ততদিন তিনি মালতীর নিকটে সহজভাবে উপস্থিত হই পারিবেন না। মালতীর কিন্তু প্রেমানন্দের লজ্জার দীনতা দূর করিবার বিশেষ কো আগ্রহ হইতেছিল না। প্রেমানন্দের ঘ মজলিসে যোগ দিলে মাঝে মাঝে বিপিন দেখিতে পাইবে বলিয়া যাইবার প্রলো হইত, কিন্তু প্রেমানন্দের দৃষ্টির সম্মু বিপিনের সহিত মিলনও তাহার এক বাঞ্ছনীয় মনে হইত না।

বিপিনও এই সুযোগটি খুঁজিয়া ও

সে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া হাজির হইত মালতীকে দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘ-স ফেলিয়া সকলের শেষে চলিয়া যাইত। র দিন এক-একটা করিয়া বড় শীঘ্র া যাইতেছে, তাহাকে মাঘী পূর্ণিমা তে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নির্জ্জনবাস তে হইবে—কি পাথেয় কি সঞ্চয় লইয়া ঐ সুদীর্ঘ সময় বদ্ধ থাকিবে? তাহার গে মালতীকে যদি সে একটিবারও ভালো রিয়া দেখিয়া লইতে পারিত!

আজ মাঘী পূর্ণিমা। আজ চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে বিপিনকে গুহায় রুদ্ধ হইতে বে। যুদ্ধযাত্রী ভীরু সৈনিকের ন্যায় তে তাহার কিছুতেই মন চাহিতেছিল থাকিবারও তাহার আর জো নাই। পিন আজ ছটফট করিয়া বেড়াইতে-।

মালতীরও আজ দুঃখ যেন চরমে ঠিয়াছে। এতও তাহার অদৃষ্টে ছিল! বিপিনের কাছে-কাছে থাকিতে পাইবে য়া সে সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়াছে, ই বিপিন তাহাকে অসহায় কোথায় হার কাছে রাখিয়া নির্জ্জন গুহায় তপস্যা রিতে চলিল! এত বড় ধার্ম্মিক সে! ত বড় নিষ্ঠুর নির্ম্মম নির্দ্দয় পাষাণ সে! ালতী আপনার ঘরের চারিদিকের দরজা ভেজাইয়া দিয়া আপনার তোরঙ্গের গোপন ল হইতে বিপিনের একখানি ফটোগ্রাফ াহির করিল; এই ছবিখানি সে মথুরাপুর হইতে আসিবার সময় বিপিনের ঘর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল; এখানি তাহার বড় লজ্জার বড় গোপনের বড় আদরের ধন! ইহার দিকে চাহিতেই তাহার অশ্রু-ধারা পাগল হইয়া ছুটিল। মালতী ফটো-গ্রাফখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুতে অন্ধ হইয়া ব্যথিত অন্তরে নীরবে আর্ত্তনাদ করিয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল—ওগো তুমি এত নিষ্ঠুর! এত নিষ্ঠুর!

মালতী ছবিখানিকে খাটের বিছানার উপর রাখিয়া তাহার সামনে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছিল—ওগো তুমি কি এমনি কাগজে তৈরি—প্রাণহীন ভাবহীন দয়াহীন!

কখন্ গঙ্গার হাওয়া আসিয়া নিঃশব্দে মালতীর ঘরের বারান্দার দিককার কপাটটি আস্তে আস্তে খুলিয়া দিয়াছিল। মালতী মাথা নীচু করিয়া চোখ মুদিয়া অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আপনার গভীর বেদনার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, সে টের পায় নাই। ঠিক সেই সময় প্রেমানন্দ সেই পথ দিয়া ঠাকুর-ঘরে যাইতেছিলেন; মালতীর ঘরের সামনে আসিয়া থমকিয়া ফিরিতে যাইবেন; দেখিলেন মালতী বিপিনের ছবির পায়ে মাথা রাখিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

প্রেমানন্দ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিলেন; একবার ফিরিয়া গেলেন; আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া ছবিখানি হঠাৎ হাতে উঠাইয়া লইয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন—রাধারাণী, এ উত্তম!

শাবক চুরি করিতে গেলে বাঘিনী যেমন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে মালতী তেমনি করিয়া ধনুক-ছাড়া বাণের মতো প্রেমানন্দের উপর লাফাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর!

প্রেমানন্দ মালতীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও আবেগমত্ত আক্রমণে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি একহাতে মালতীকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া একহাতে ছবিখানিকে পিছনে সরাইয়া ধরিয়া ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

মালতী চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার জিনিস আপনি দিয়ে যান বলছি।

মালতীর চোখ হইতে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

গোলমাল শুনিয়া কয়েকজন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সেখানে ছুটিয়া আসিয়া জড়ো হইল—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার গুরুর দিকে একবার মালতীর দিকে চাহিল!

মালতী গর্জ্জন করিয়া প্রেমানন্দের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—এই চোরটাকে আপনারা গুরু বলে পূজো করেন! সকলে অবাক হইয়া গুরুর দিকে চাহিল।

গুরু মালতীর দৃপ্ত মূর্ত্তির সম্মুখে একেবারে অপ্রতিভ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আজ যেন অপরাধী—বিচারকদের সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিপিনের ছবিখানি সকলকে দেখাইয়া বলিলেন—সন্ন্যাসিনী এইখানি বুকে করে বসে ছিলেন! চোর কে?

কি লজ্জা! কি লজ্জা! এত লোকের সামনে এমন করিয়া একজন স্ত্রীলোককে অপমান করিতে পারে—এমন কাপুরুষ বলিয়া মালতী ত একবারও প্রেমানন্দকে ভাবে নাই! কি লজ্জা! কি লজ্জা! একজন সন্ন্যাসিনা একজন সন্ন্যাসীর ছবি বুকে করিয়া রাখিতে পারে এমন অঘটন ত এ কখনো ঘটিতে সমবেত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসি দেখে নাই! তাহারা সকলে মালতীর ঘৃণার দৃষ্টি হানিয়া অবাক হইয়া চ গেল। মালতী রৌদ্রদগ্ধ লতার মতন হইয়া সেইখানে দুই হাতে মুখ ঢা বসিয়া পড়িল। প্রেমানন্দ বিপিনের খানি লইয়া নিজের ঘরে গিয়া লুকাইলে

বিপিন তখন গঙ্গায় স্নান করিয়া গৈরিক বস্ত্র পরিয়া এক হাতে কমণ্ডলু একহাতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ লইয়া গু অবরুদ্ধ হইতে যাইতেছিল! এমন স সন্ধ্যার বাতাস বিদীর্ণ করিয়া মালতী আর্ত্ত কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—চো

বিপিনের রক্ত প্রতপ্ত হইয়া উঠি চরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল ছু গিয়া মালতীকে দুই বাহু দিয়া আগলাই বলে—ভয় নাই তোমার, আমি আছি!

যোগানন্দ বলিল—গুরুভাই, এ তোমার চিত্তবিক্ষেপ হওয়া উচিত নয়, তু গুহায় চল।

বিপিন একবার পিছন ফিরিয়া তাকাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল

মালতী ছুটিয়া আসিয়া পথরোধ করি দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আমা অসহায় ফেলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন আপনি যাকে গুরু মনে করে পূ করছেন সে একটা চোর!

বিপিনের মুখ শুকাইয়া ফ্যাকাশে হই গিয়াছে; সে শূন্য ভীত দৃষ্টিতে মালতী দিকে চাহিয়া কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞা করিল—হয়েছে কি?

প্রেমানন্দ অগ্রসর হইয়া আসিয়া দিলেন—সন্ন্যাসিনী একজন পুরুষের ছবি ক করে কাঁদছিলেন; আমি কেড়ে য়েছি।

বিপিন যেন কতদিন আগে মরিয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহা তাহার শব।

মালতী তীব্রস্বরে বিপিনকে বলিল—লুন আপনি আপনার গুরুকে, আমার নিস আমায় ফিরিয়ে দিতে।

বিপিনের রসশূন্য জিহ্বা কষ্টে জিজ্ঞাসা রিল—কার ছবি?

মালতীর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছিল; এখন লজ্জার আভা সেই লালিমা াঢ়তর করিয়া তুলিল; তাহার উপর াসিয়া পড়িয়াছিল অস্তসূর্য্যের আলো ার উদীয়মান চন্দ্রের জ্যোৎস্না! মালতী াথা নত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—স আমি জানিনে, আপনি দিতে বলুন।

বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে গ্রসর হইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

মালতী সেই পথের ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া ধূলির চেয়েও ধিক্কৃত উপেক্ষিত তাহার অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দিতে চাহিল! এমনি লজ্জায় জানকী মাটিতে মিশাইয়াছিলেন; যে অপমানে স্ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের নিষ্ঠুর কৌতূহল-দৃষ্টির মাঝখানে দাঁড় করাইয়া ছায়, এ সেই অপমান; সেই দারুণ অপমানের লজ্জায় মালতী মাটির ধূলা চোখের জলে ভিজাইতে লাগিল।

কে দুখানি স্নেহকোমল হস্তে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া করুণাস্নিগ্ধ স্বরে ডাকিল—দিদি, তুমি উঠে এস।

মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া শান্তির বুকে মুখ লুকাইয়া লজ্জা ঢাকিয়া যেন বাঁচিল। পুরুষ পুরুষদের দৃষ্টি হইতে শান্তি তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল। মাঘীপূর্ণিমার চন্দ্র তখন সমস্ত আশ্রম ভরিয়া হাসিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি

আশ্বিনের ভারতীতে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিম্নে লিখিলাম। আশা করি শীতলবাবু বিবেচনা করিয়া লিখিবেন।

পুরাণোদ্ধার না করিলে আর্য্যজাতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইবে না। এদিক ওদিক বাদ দিয়া মধ্য হইতে ইতিহাস লিখিলে তাহা কখন ঠিক হইতে পারে না। এজন্য প্রথম হইতেই ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। আমার "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" এই ধরণের পুস্তক।

যাঁহারা পুরাণ পড়েন নাই, তাঁহারাই পুরাণকে ঘৃণা করেন। যাঁহারা পড়িয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতে ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, এ হিসাবে শীতলবাবু ধন্যবাদের পাত্র।

পুরাণে প্রাচীন ইতিহাসের যে উপাদান আছে তাহা কত মূল্যবান, তাহা শীতলবাবুর প্রবন্ধ পড়িলে বিশেষরূপে জানা যায়। "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" পাঠ করিলে তাহাই ধারাবাহিকরূপে জানিতে পারিবেন।

ইলাবৃত বর্ষ দুইটি। যে ইলাবৃত বর্ষে সূর্য্য ছয় মাস উদিত এবং ছয় মাস অস্তগত থাকেন, যেখানে তিনি তাপ প্রদান করেন না, যেখানে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র প্রকাশ পায় না বলিয়া লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, সেই ইলাবৃত বর্ষই প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম ইলাবৃত বর্ষ। ইহা উত্তরমেরু প্রদেশে অবস্থিত। ইহাই নারায়ণের নাভিপদ্ম বলিয়া পুরাণে কথিত। এখানেই আদি আর্য্যমানব ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল। যজ্ঞাগ্নি প্রথম এখানেই প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

যে ইলাবৃত বর্ষে দেবতাদিগের অর্থাৎ ইন্দ্রাদির জন্ম হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় ইলাবৃত বর্ষ। ইহা সুমেরু প্রদেশে অর্থাৎ আল্‌টাই পার্ব্বত্য প্রদেশে সাইবেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ড মেরুতত্ত্বে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইলাবৃতের অব্যবহিত দক্ষিণে যে উত্তরকুরু, তাহা আদি উত্তরকুরু নহে। আদি উত্তরকুরুতে ও ভারতে সূর্য্য একসঙ্গে উদয় হয় না। ভারতে লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, উত্তরকুরুতে সিদ্ধপুরে তখন সন্ধ্যা হয়। এই উত্তরকুরুই আদি। পরে যখন সুমেরু প্রদেশ (আল্‌টাই পার্ব্বত্য প্রদেশ) ইলাবৃত বর্ষ হইয়াছে, তখন প্রথম ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে উত্তরকুরু স্থাপিত হইয়াছে। এই উত্তরকুরুর কথাই রামায়ণে সুগ্রীব মুখে উক্ত হইয়াছে। এখানে ও ভারতে সূর্য্য এক সঙ্গে উদয় হয়।

১৩২১ সালের মাঘের নব্যভারতের ৬২৯ পৃষ্ঠায় আমার প্রতিবাদের উত্তরে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াও যে শীতলবাবু ১৩২২ সালের আশ্বিনের ভারতীতে লিখিয়াছেন যে, "আর্য্যগণ পরস্পরের সহিত বিরো করিয়াই সুর ও অসুর এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে তাঁহারা এক দেবতাজাতির অন্তর্ভু ছিলেন," ইহাতে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি পৃথিবীর পুরাতত্ত্বে এ সব বিষয় বিস্তৃতভা আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রাচীন মিশর

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ না কি স্থির করিয়াছেন, পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতার মুখ দেখিয়াছে—মিশর। কিন্তু তাঁহারা যদি হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রকে বিশ্ব করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন মিশরে প্রথম রাজা "মেনা" পুরাণাদিতে "মনু" নামে কথি হইয়াছেন। সাবার্ণমনু মিশরের প্রথম রাজা। ই বিদেশী শাস্ত্রে "নুহ্" নামে কথিত হইয়াছেন।

সাবর্ণ মনুর পুত্রের নাম ধৃতি, নির্ম্মোহ, য সুমতি ইত্যাদি। মিশরের প্রথম রাজা মেনার পু তৎপুত্র "তেতা" রাজা হইয়াছিলেন, এই তেতা "ধৃতি" নামে কথিত। নির্ম্মোহ হাম নামে, য যাযেত নামে এবং সুমতি সাম নামে কথি হইয়াছে। সকলেরই গোড়া ভারতীয় শাস্ত্রে পাইবে সুতরাং যে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলে তাঁহাদেরই স্বজাতি মিশরেও প্রবেশ করিয়াছিলে কাণ ধরিয়া টানিলেই মাথা আপনি আইসে, বি আদি সভ্যদেশ বলিলে ভারতের সভ্যতার প্রশ্ন আপ মীমাংসিত হইয়া যাইবে। চাই আলোচনা।

"মিশরবাসীরা মরুভূমির অসভ্যগণের স আপনাদের পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য আপনাদিগে "মানুষ" বলিতেন" কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই জানে "মনুর" পুত্রই মানুষ বা মানব নামে কথিত।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

* ভারতী, আশ্বিন, ৬০২ পৃষ্ঠা।

সমালোচনা

অশোক অনুশাসন। (মূল পাঠ, অনুবাদ, ব টীকা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ ও ত তাৎপর্য্যসহিত) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত মোহন কর কাব্যতীর্থ এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ীর ও পাবলিশার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস, মেটকাফ টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা, ড়ে বাঁধাই দুই টাকা মাত্র। এই গ্রন্থে সমগ্র াক অনুশাসনের মূল, টীকাদিসহ প্রকাশিত াছে। এই ঐতিহাসিক-তত্ত্বানুসন্ধানে সম্পাদকদ্বয় নাধুনিক পদ্ধতি (Comparative Study) অব- ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "ঐতিহাসিক া-সংগ্রহের যতপ্রকার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, ধ্যে (১) বিদেশীর ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারি- র লিখিত ইতিবৃত্ত, (২) প্রস্তর-গাত্রে, ধাতু- ক বা অন্য আধারে খোদিত লেখরাজি ও মুদ্রা ি, (৩) গাথা কাহিনী ও আখ্যায়িকা এবং াময়িক সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।" কথাটা ই ঠিক। সুখের বিষয় আমাদের ঐতিহাসিকগণ ন এই পথেরই পথিক এবং এইরূপ আলোচনা ারাই সম্প্রতি আমাদের জাতীয় লুপ্ত ইতিহাসের ার-কার্য্য চলিয়াছে। প্রাচীন ভারতে মহারাজ াশকেই যে উৎকীর্ণ শিলালিপির সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক লেন, সে বিষয়েও ঐতিহাসিকগণ এখন এক-মত। ই লিপিসকল মুখ্যতঃ 'ব্রাহ্মী' অক্ষরে লিখিত।" াদকদ্বয় বেশ দক্ষতার সহিত 'ব্রাহ্মী' অক্ষরের পত্তি সম্বন্ধে নানামতের আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন রিয়াছেন, "এই ব্রাহ্মীলিপিই এক সময়ে প্রাচীন রতের জাতীয় লিপি ছিল; কুষাণ, গুপ্ত, প্রাচীন ত্তি, দেবনাগরী, বাঙ্গালা, তিব্বতী, উড়িয়া, গুরুমুখী, রদাদিক্ষী, গ্রন্থ, তেলুগু, তামিল, মলয়ালম, সিংহলী ী, শ্যামী, কম্বোজ, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি ভারতের বহির্ভারতের তাবৎ প্রাচীন ও আধুনিক লিপি ই ব্রাহ্মী বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত।" তাহার পর সম্পাদকদ্বয় 'প্রাচীন বস্তু-চিত্র' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মিসর, আসিরীয় ও চীন প্রভৃতি দেশের বর্ণমালা বস্তু-চিত্র হইতে উৎপন্ন। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার আচার ও গঠন-প্রণালী বিশেষভাবে আলোচনা করিলে উহাও যে প্রাচীন বস্তু চিত্র (hieroglyphics) হইতে উৎপন্ন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।" এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা বেশ সুনিপুণ যুক্তি-প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, "অশোক বুদ্ধ-দেবের উপদেশের অর্থ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কথিত জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় আপনার বক্তব্য প্রচার করিলেন, পরবর্ত্তী ভারতীয় রাজাগণের ন্যায় সংস্কৃতের আশ্রয় লইলেন না। তাঁহার অনু-শাসনের ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে। এই মাগধী প্রাকৃত হইতেই কথিত বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে এবং কথিত বাঙ্গালা ক্রমে সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া 'সাধু' বা সাহিত্যের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। এই হিসাবে অশোকের ভাষাকে প্রাচীনতম বাঙ্গালা বলিতে পারা যায়। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এই কারণে অশোক অনুশাসনের মূল্য অধিক।" * * * কথিত বাঙ্গালার 'মুনিস', 'কেওট,' 'নেথা', 'বছর' 'বাম্ভন' 'চিকিছা' প্রভৃতি অনেক শব্দ অশোক অনুশাসনেও দেখা যায়।" এই গ্রন্থখানি নানা দিক দিয়াই আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া ইতিহাস-বিভাগের সমধিক সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। সমগ্র অনুশাসনের সংগ্রহ ভারতীয় অপর কোন ভাষাতেই এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই, বাঙ্গালায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সম্পাদকদ্বয়ের সুগভীর গবেষণা-শক্তি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনার নিপুণতা, অসাধারণ অধ্যবসায় ও স্বদেশ-প্রীতির প্রগাঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ জাত্যভিমানী প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে স্থান-লাভের যোগ্য।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী। দুর্গাপ্রসাদ ঘটক বিরচিত। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত; রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত এবং মুদ্রিত। এই গ্রন্থের ভূমিকাটির বিশেষ মূল্য আছে। 'ভূমিকা'য়, সত্যনারায়ণের পূজা-প্রবর্ত্তনের কাল-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে এবং ভারতের নানা প্রদেশে কি ভাবে এই পূজা প্রচলিত, তাহারও একটি কৌতূহলপূর্ণ আলোচনা আছে।

বল্লাল সেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। কলিকাতা, লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটক। আনন্দভট্ট রচিত 'বল্লাল-চরিতম্' এই নাটকের ভিত্তি। নাটক-হিসাবে গ্রন্থের কোন বিশেষত্ব নাই—নাটক-রচনায় লেখকের শক্তির কোন পরিচয় পাইলাম না।

অবদান। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। "ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিবিধ গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া" এই পুস্তকের আখ্যায়িকাগুলি রচিত। হকিকত রায়, ইউলালিয়া, তুলসীদাস, মার্গারেট, লুৎ-ফউন্নিসা প্রভৃতি নয়টি আখ্যায়িকা হইতে সন্নিবিষ্ট। আখ্যায়িকাগুলি ঐতিহাসিক। লেখকের উদ্যম ও নির্ব্বাচন প্রশংসার্হ, কিন্তু রচনায় বিশেষত্ব নাই। আখ্যায়িকাগুলির স্বকীয় একটা রস আছে—লেখায় কিন্তু সে রস ফুটিতে পায় নাই। লিপিকুশলতার অভাবে সংবাদপত্রের সংবাদের মতই আখ্যায়িকাগুলি নির্জ্জীব ও প্রাণহীন হইয়াছে।

ভাষা ও সুর। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। কলিকাতা, লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লে ভূমিকায় বহ্বারম্ভ করিয়া লিখিয়াছেন:—"ক গুলির মধ্যে একটা আন্তরিকতা—একটা আ একটা প্রবাহ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" আ লেখকের বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সেগুলির স লইতে গিয়া কিন্তু নিরাশ হইয়াছি—আশা ক লেখক ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না।

বল্লরী। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি, প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকা প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এ কবিতাগ্রন্থ। অনেকগুলি খণ্ডকবিতা এই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার লেখক বাঙ্গালার এ উদীয়মান কবি। কবিতাগুলির অধিকাংশই স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর, ঝঙ্কারে রমণীয়—ছন্দের অপূ লীলায় মনোহর। শব্দ-চয়নেও লেখকের অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কল-ঝঙ্কারে এমন এ আন্তরিকতা আছে যে প্রাণের তার সে ঝ সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই কবির ভবি উজ্জ্বল, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি

ঢেউ। শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণী প্রকাশক, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, যশোর কলিকাতা, বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আ এখানিও কবিতা-গ্রন্থ; কয়েকটি খণ্ডকবি সমষ্টি। কবিতাগুলিতে ভাব কোথাও বড়-একটা ফুটে নাই; কোথাও-বা আবার ভাষা ও ছ গহনে ভাব উদ্দাম দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া মরিয়াছে লেখকের হাত কাঁচা—তবে চর্চ্চা রাখিলে 'চলন-স কবিতা তাঁহার হাতে বাহির হইতে পারে বলিয়া হয়। 'ঢেউয়ে'র কবিতাগুলিতে চেষ্টা ও কষ্ট-কল্প ছাপ্‌টাই সব-চেয়ে চোখে বেশী পড়ে। বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়-মহাশয় প্রশংসার টিকিট আঁটা থাকা সত্ত্বেও আমরা গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হই
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

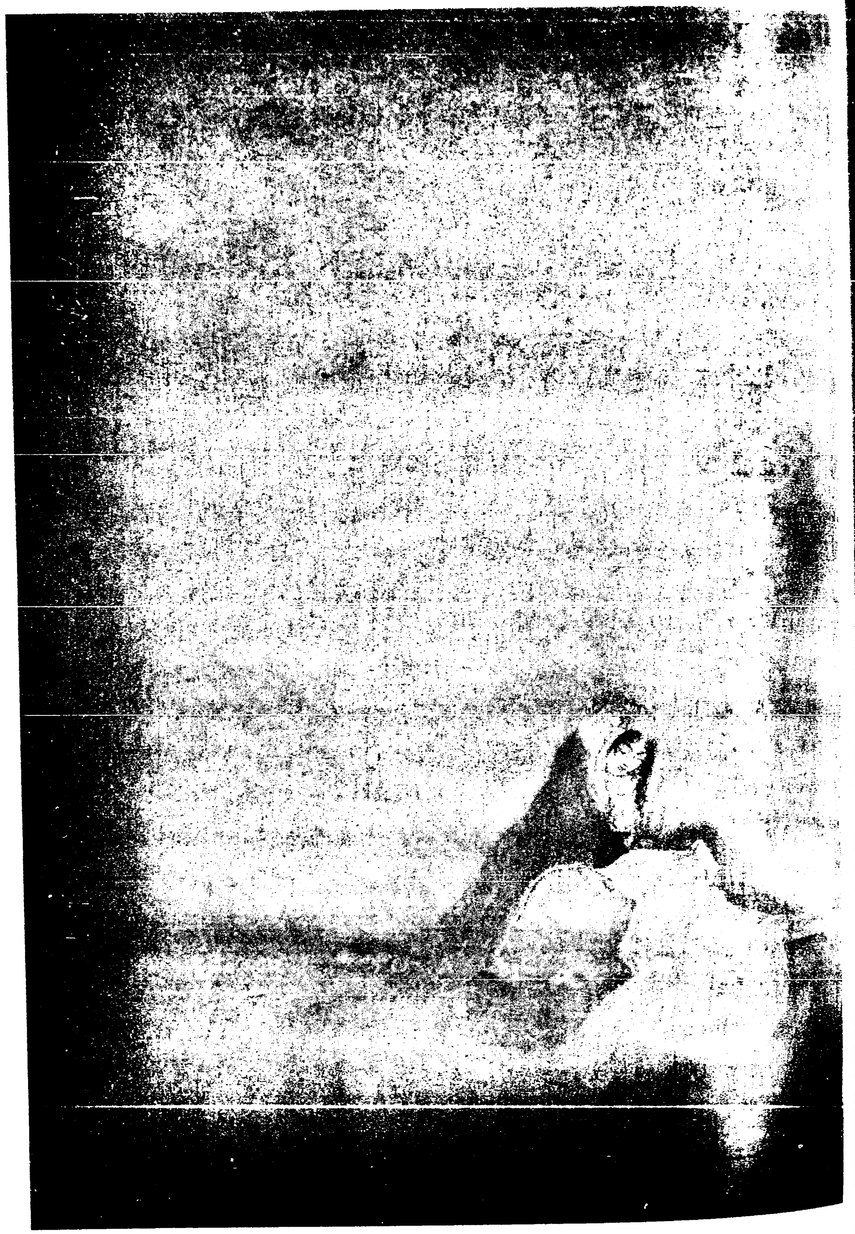

বেহুলা

চিত্রশিল্পী-শ্রীনন্দলাল বসু।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২২ [৮ম সংখ্যা

নবাব

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদেশে

তিন সপ্তাহ পরে পল দ্য গেরি টিউনিস হইতে দেশে ফিরিতেছিল। তিন সপ্তাহ কাল টিউনিসে থাকিয়া সে হেমারলিঙ্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিপুল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়াই সে শুনিল, জাঁসুলের বিরুদ্ধে গোপনে এক মকর্দ্দমা রুজু করিয়া বে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিতে ক্রোক দিয়া বসিয়াছে। নবাবের অফিস বন্ধ, জাহাজ ও সম্পত্তিতে শীল পড়িয়াছে—এবং তাঁহার প্রকাণ্ড প্রাসাদের সম্মুখে সতর্ক সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্রি মোতায়েন রহিয়াছে! সমস্ত আয়োজন ঠিক—শুধু লুঠের দ্রব্য ভাগ করিয়া লইতেই বাকী! ইহারই মধ্যে মাথা খেলাইয়া গেরি বাহিরের টাকা-কড়িগুলাকে কোনমতে আদায় করিয়া দ্রুত দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

সে এক অক্লান্ত শ্রম, বিপুল সংগ্রাম! নৈরাশ্য বা অবসাদ কোনটিকেই গেরি মুহূর্ত্তের জন্য আমোল দিল না! হেমার-লিঙের ফাঁস কাটাইয়া নবাবের পাওনা টাকার কতক উসুল করিয়া গেরি টিউনিসে মুহূর্ত্তকালও আর অপেক্ষা করা সঙ্গত ভাবিল না। কে জানে, মামুদ বের হুকুমে এখনই এ টাকা হয়ত পথেই বাজেয়াপ্ত হইতে পারে! ইহার উপর সে টেলিগ্রাম পাইয়াছিল, পারিতে নবাবের নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া গিয়াছে! এ সংবাদ টিউনিসেও রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। গেরি তখন দ্রুত আসিয়া একখানা ইতালী-গামী জাহাজে টিকিট কিনিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। সে দশলক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিল। এই লুঠের বন্দরে আবার পাছে তাহা হারাইতে হয়, এই ভয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাহার রোমাঞ্চ হইতেছিল।

সকালে জাহাজ ছাড়িল। গেরি যখন

ডেকে বসিয়া দেখিল, টিউনিসের শ্বেত অট্টালিকাগুলা জাহাজের পশ্চাতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ক্রমে জাহাজ আসিয়া জেনোয়ার বন্দরে নোঙ্গর ফেলিল। গেরির বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কি জানি, টিউনিস হইতে যদি কোন টেলিগ্রাম আসিয়া থাকে এবং সেই টেলিগ্রাম পাইয়া ইতালীয় পুলিশ যদি জাহাজে উঠিয়া তাহার সন্ধান করে? কিন্তু না,—কেহই তাহার কোন সন্ধান করিল না। পল জাহাজ হইতে নামিয়া ট্রেনে উঠিল। এই ট্রেণ বরাবর সমুদ্রতীর দিয়া মার্শেল যাইবে।

পথে কিন্তু এক বিপদ ঘটিল। সাভোনা-ষ্টেশনে এঞ্জিন বিগড়াইল। দশ-বারো ঘণ্টা এখানে এখন অপেক্ষা করিতে হইবে। রিলিফ-এঞ্জিন না আসিলে ট্রেণের আর নড়িবার সামর্থ্য নাই।

তখন আবার সকাল হইয়াছে। বিলম্বে বিরক্ত হইয়া গেরি ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল। কোথায় গিয়া এখন এই সময়টুকু কাটানো যায়! লোকচক্ষুর সম্মুখে থাকিতে কিছুতেই তাহার মন সরিতে ছিল না। বেচারা জাঁস্থলের কথাই সর্ব্বাগ্রে তাহার মনে হইল। তাঁহার ইজ্জৎ, তাঁহার সম্ভ্রম—সব যে এই টাকার উপর নির্ভর করিতেছে! আর আলিন,—তাহার প্রাণাধিকা আলিন! সে যে গেরির পথ চাহিয়াই বসিয়া আছে! কিন্তু উপায় নাই—দশ-বারো ঘণ্টা এখানে পড়িয়া থাকিতেই হইবে!

গেরি তখন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া নাইস্ সহরটা দেখিয়া লইবার সঙ্কল্প করিল।

চারিধার তরুণ সূর্য্য-কিরণে ঝল্‌মল্ করিতেছিল—সেই স্নিগ্ধ রৌদ্রে স্নান করি তরু-লতা অপূর্ব্ব শ্রীতে সাজিয়া উঠিয়াছি দূরে-অদূরে অনতি-উচ্চ গিরিমালা নী আকাশের দিকে অসংখ্য শৃঙ্গ-বাহু তুলি আনন্দে যেন তাহাকে অভিবাদন করিতেছি পথের দুইপার্শ্বে সবুজ শষ্পে মণ্ডিত ভূ অঙ্গে সূর্য্য-কিরণ মাখিয়া সবুজ ভেলভেটে মতই পড়িয়া ছিল! চারিদিকে সমা সজ্জিত, সুন্দর! গেরির অশান্ত চিত্ত দৃশ্যে মুগ্ধ হইল!

গেরির গাড়ী আসিয়া পর্ব্বত-প্রান্তে অ স্থিত ব্রেহাট হোটেলের সম্মুখে থামিল। গে হোটেলে ঢুকিতেই সম্মুখে দেখিল, একা একটা কুকুর! কাতুর, না—ফেলিসিয়া কুকুর? দেখিতে হুবহু কাতুরের মতই।

গেরি আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট ক প্রবেশ করিল। পোষাক ছাড়িয়া হাত-মু ধুইয়া সে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছগুলা চঞ্চ শিশুর মতই বায়ুর সহিত লীলা-রঙ্গে মাতি খেলা করিতেছে। হঠাৎ পাশের ঘরে কাহা স্বর শুনা গেল! এ কি স্বপ্ন! গেরি চমকি উঠিল। না, ভুল হইয়াছে, নিশ্চয় ভুল! পৃথিবীতে দুইজনের কণ্ঠস্বরে এতখানি মি থাকিতেই পারে না! স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে গেরি সকল ক্লান্তি ঘুচিয়া গিয়াছিল—তাহা তন্দ্রাবোধ হইতেছিল। গেরি আসিয়া বিছানা শুইয়া পড়িল। নিদ্রা আসিয়া নিমেষে তাহা শ্রান্ত শিরে হাত বুলাইয়া দিল; গেরি ঘুমাইয়া

ইয়া সে স্বপ্ন দেখিল,—বিচিত্র, মধুর সে !

—আলিনের সহিত যেন সে মধু-বাসর-নে যাত্রা করিয়াছে। সুন্দরী বধূ! জল চক্ষু, প্রেম ও বিশ্বাসে ভরা আলি-র দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থির-নিবদ্ধ! র এই হোটেলেরই অপর প্রান্তের ঘরে ছিল—ফেলিসিয়া! তাহার উজ্জ্বল শুভ্র শনী পোষাক—ভায়োলেটের গন্ধে ভরপুর! রে ফেলিসিয়ার অস্তিত্ব সে স্পষ্ট ভব করিতেছিল।

আবেগে গেরি আলিনকে চুম্বন করিল। লিন চমকিয়া সরিয়া গেল। তাহার মুখে মেঘে করুণ বিষাদের এমন একটা ছায়া ল যে তাহা দেখিয়া গেরির প্রাণ র্দ্র হইল। গেরি সাদরে আলিনকে র মধ্যে টানিয়া লইল। আলিন তাহার মুখ লুকাইয়া মৃদু কম্পিত স্বরে ল, "ফেলিসিয়া রয়েছে—তুমি আমায় ভালো বাসবে না।" হাসিয়া গেরি ল, "কে বললে, ফেলিসিয়া এখানে ছে?" আলিন সহসা মুখ তুলিয়া সভয়ে য়া উঠিল, "হাঁ, সে আছে ঐ যে—য়ে সে—"আলিন পার্শ্বের ঘরের দিকে লি দেখাইল! অমনি গেরি শুনিল, লিসিয়ার স্বর! স্পষ্ট! ফেলিসিয়া হাঁকি-ছে, "কাতুর—কাতুর—"

চমকিয়া গেরি জাগিয়া উঠিল। চোখ য়া সে দেখে, ঘরে সে একা! াথায় আলিন! কোথায় সে প্রেমের া-রঙ্গ! কিন্তু এবার সে স্পষ্ট শুনিল, শের ঘরে একটা কুকুর ডাকিতেছে। গেরি বিছানায় পড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। পাশের ঘরে কে করাঘাত করিল। পরমুহূর্ত্তেই গেরি মানুষের কণ্ঠ শুনিল, "দোর খোল গো—আমি এসেছি —আমি জেঙ্কিন্স।"

এ কি সত্য—না, এখনও সে স্বপ্ন দেখিতেছে? না, এ'ত স্বপ্ন নয়! ঐ যে জানালার বাহিরে পাহাড় দেখা যায়। ঘরে রৌদ্র-কিরণের ঢেউ উথলিয়া উঠিয়াছে—আর এই ত সে জাগিয়া আছে! তবে—তবে!

গেরি বিছানায় উঠিয়া বসিল। সত্যই কি তবে ফেলিসিয়া এখানে আছে? আর সেই পাপিষ্ঠ জেঙ্কিন্সটাও এখানে আসিয়া জুটিয়াছে! পাশের ঘরে দ্বার খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষ কণ্ঠের পরিচিত স্বর—"কেমন, এবার তোমায় খুঁজে বার করেছি ত!"

না, কোন ভুল নাই। সে নাম না বলিলেও শুধু স্বর শুনিয়াই গেরি ঠিক বুঝিত, এ আর কেহ নহে, জেঙ্কিন্স! এমন পরুষ কর্কশ স্বর আর কাহারও থাকিতে পারে না।

জেঙ্কিন্স কহিল, "তোমায় আজ পেয়েছি, তা হলে। আট দিন ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি—জেনোয়া থেকে নাইসের মধ্যে তন্ন তন্ন করে তোমার সন্ধান করেছি। আমি জানি, তুমি এখনও বেরিয়ে পড়নি। বের বজরা এখনও বন্দরে বাঁধা রয়েছে! সমুদ্রের ধারে সমস্ত হোটেলে খোঁজ করেছি! ব্রেহাটের কথা আজ মনে পড়ল। ভাব-লুম, হয়ত তাহলে এখানে আছ। এসে

খোঁজ নিলুম—ঠিক! এখানেই তুমি আছ, তাহলে! আঃ—"

কিন্তু এ কাহার সহিত জেঙ্কিন্স কথা কহিতেছে! কৈ, কেহ উত্তর দিল না ত! তবে—তবে—না, ঐ যে কে উত্তর দেয়! বড় কোমল মৃদু কণ্ঠ! উত্তর হইল, "হাঁ, এখানে আছি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে, শুনি—"

গেরি উঠিয়া দেওয়ালে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের মধ্যে একটা দারুণ অস্বস্তি সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। জেঙ্কিন্স কহিল, "আমি এসেছি, তোমায় আটকে রাখতে। টিউনিসে তোমায় যেতে দেব না।"

"টিউনিসে আমার কাজ আছে। আমি সেখানে যাবই।" না, কোন ভুল নাই। এ স্বর ফেলিসিয়ারই বটে!

জেঙ্কিন্স কহিল, "কিন্তু তুমি বুঝছ না—ফেলি, শোন—"

—"কোন দরকার নেই, শোনবার। আমি নিজে যা ভাল বুঝব, করব। তুমি আমার অভিভাবক নও যে আমায় উপদেশ দিতে আসবে! আমি অবাক হচ্ছি, তোমার এ আস্পর্দ্ধা দেখে! এ অনধিকার চর্চ্চা কেন! তোমার উপদেশের মূল্য জেনো—ঐ কুকুরটার চীৎকারের মতই আমি অর্থহীন, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি।"

"বোঝ, ফেলিসিয়া, তোমার এই রূপ, এই বয়স! টিউনিস তোমার পক্ষে এমন অবস্থায় মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। বিশেষ তুমি একা—"

—"পারিতেও ত আমি একা ছিলুম তা ছাড়া আমি কনস্তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি—"

—"শুধু কনস্তাঁকে নয়—আমাকে তাহলে সঙ্গে নিতে হয়।"

—"তোমাকে?" ফেলিসিয়া বিদ্রূপে হাসি হাসিল, পরে কহিল, "আর তোমার পারিকে—তোমার মক্কেলদের—তোমার সুসভ্য সমাজটি—তাদেরও সঙ্গে নিতে হবে কি বল? তুমি পাগল!"

—"যাই বল, ফেলিসিয়া, তুমি যেখানে যাও না কেন, আমি তোমার সঙ্গে যাবই—এ আমার প্রতিজ্ঞা।"

তাহার পর মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েই স্তব্ধ রহিল। পল ভাবিল, এ ভাবে লুকাইয়া এ সকল কথাবার্ত্তা শুনা তাহার পক্ষে উচিত হইতেছে না! কিন্তু প্রাণে তাহার অদম্য কৌতূহল জাগিতেছিল। যদি মূল্যবান তথ্য কিছু সংগ্রহ হয়! ক্লান্তিতে পা তাহার জড়াইয়া আসিতেছিল—দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়! তবুও পারির সভ্য সম্ভ্রান্ত সমাজের যে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা ধীরে ধীরে আজ আপনার বদ্ধ ফাঁদের সুতাগুলাকে জোট খুলিয়া মুক্ত করিয়া ধরিতেছিল, তাহার যতখানি বুঝিতে পারা যায়—এই আশায় পল কিছুতেই আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সেই জন্য কোন মতে সে নিশ্বাস রোধ করিয়াও স্থির জড়পুত্তলির মতই দেওয়ালে কান পাতিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, "বাজে কথা যাক জেঙ্কিন্স—তুমি চাও কি?"

—"আমি তোমায় চাই, ফেলিসিয়া!"

—"জেঙ্কিন্স—" সে স্বর তীব্র, পরুষ!

—"হাঁ, আমি শুধু তোমায় চাই, ফেলিসিয়া। এ কথা আমায় মুখে উচ্চারণ করতে তুমি বারণ করেছ—কিন্তু অন্য অনেকে তোমার কাছে এই কথা বলেছে—তখন তুমি বিরক্ত হওনি—কাজেই আমি আবার এ কথা বলছি। আমার কথাই বা তুমি রাখবে না, কেন, ফেলিসিয়া?"

পাশের ঘরে মুহূর্ত্তে যেন বাজ হাঁকিল। ফেলিসিয়া তীব্র দীপ্ত স্বরে কহিল, "সাবধান হয়ে কথা বলো, জেঙ্কিন্স, আমার মর্য্যাদায় আঘাত করো না। যতই তোমার শক্তি থাকুক না কেন,—তবু জেনো, আমিও একেবারে দুর্ব্বল নই। এ ধৃষ্টতার শাস্তি আমি দিতে জানি—"

গদ্‌গদ কণ্ঠে জেঙ্কিন্স কহিল, "কেন এত রাগ করছ, ফেলিসিয়া? আমি তোমায় ভালবাসি—চিরকাল ভাল বেসেছি—। কেন, তুমি নিষ্ঠুর হচ্ছ? তুমি বিচার করে দেখ, তোমায় ভালবাসি বলে—"

"আমায় ভালবাস!" ফেলিসিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "ভালবাস, জেঙ্কিন্স? তোমার মর্জ্জি হয়, আমায় ভালবাসতে পার। কিন্তু জেনো, আমারও মর্জ্জি, আমি তোমায় ঘৃণা করি। এত ঘৃণা মানুষ ইতর পশুকেও করতে পারে না! আমার যত কিছু বিশ্বাস শক্তি সে সমস্ত তোমারই জন্য আজ ধূলায় লুটিয়ে গেছে! আমার সমস্ত জীবনটা তোমারই নিশ্বাসে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! আমার নারীত্ব তোমারই স্পর্শে কলঙ্কিত অপমানিত হয়েছে! তুমিই আমাকে আমার মর্য্যাদার আসন থেকে টেনে এনে মাটিতে লুটিয়ে দেছ। তোমার সঙ্গ-সুখের চেয়ে আমি যে কোন অমর্য্যাদা যে কোন হীনতাকে আজ মাথায় তুলে নিতে পারি। পারির সমাজের যত কিছু ভাণ, মিথ্যা, আমি মাথায় তুলে নিয়েছি—নিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়েছি—সে সব শুধু তোমারই কৃপায়! আর কেউ তোমায় চিনতে না পারে, কিন্তু আমি তোমায় চিনি—একটা ভণ্ড, স্বার্থপর, পাপিষ্ঠ, নির্লজ্জ কাপুরুষ—পারির সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত পাপের কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি—তুমি এসেছ, আমার কাছে ভালবাসা জানিয়ে আমার হৃদয় অধিকার করতে—"

ক্রোধে ফেলিসিয়ার মুখে স্বর আর বাহির হইল না। সে রাগে ফুঁসিতে লাগিল।

জেঙ্কিন্স কহিল, "তুমি এ সব কি বলছ, ফেলিসিয়া? যদি তুমি জানতে, তোমার এ রাগে আমার বুক কতখানি জ্বলে যাচ্ছে! দায়ে পড়ে আমায় এমন অমানুষ হতে হয়েছিল, ফেলিসিয়া! কি বিপুল বিঘ্নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমায় দিন কাটাতে হয়েছিল, তা যদি তুমি জানতে! তবুও একমাত্র তোমাকেই আমি চিরদিন ভাল বেসেছি! তোমার ক্রোধ, তোমার বিদ্রূপ, তোমার অপমান—কিছুতেই আমার এ ভালবাসা কম পড়েনি। সেই ভালবাসার বলেই আমার সাহস আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে—না হলে তোমার কাছে ঘেঁসতেও আমার আজ সাহস হত না, ফেলিসিয়া। আজ আর কোন দিকে আমার লক্ষ্য নেই—কোন বিষয়ে স্পৃহা নেই। আমি সব ত্যাগ করতে পারি—ত্যাগ করেওছি—কিন্তু

Tight Binding

তোমার আশা ত্যাগ করতে পারব না। ফেলিসিয়া, তুমি আমায় বিয়ে কর।"

"বিয়ে!"

"হাঁ, বিয়ে।"

"আর তোমার স্ত্রী?"

"সে মারা গেছে।"

"মারা গেছে? মাদাম জেঙ্কিন্স মারা গেছে! এ কথা সত্য?"

"তুমি আমার স্ত্রীকে জানতে না, ফেলিসিয়া। যাকে জানতে, সে আমার স্ত্রী নয়। তার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন আমার স্ত্রী যে ছিল, সে বেঁচে, আয়ার্লাণ্ডে থাকত। এর সঙ্গে জানাশোনা হবার ঢের আগেই আমার গলায় দড়ি পড়েছিল। তখন আমার বয়স পঁচিশ বৎসর, আয়ার্লাণ্ডে আমি ডাক্তারি পড়ছিলুম। অবস্থা খারাপ—পড়ার খরচ চলত না। সেই সময় এই বিয়ে হয়। তার নাম ছিল, মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গ। দেনায় তখন আমার মাথার চুল অবধি বিকোবার জো। এই মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গের ভাইয়ের কাছে পাঁচশ পাউণ্ড ধার জমে গেছল। সে আমায় জেলে পাঠাবার উদ্যোগ করে ছিল, কাজেই সেই জেল আর দেনা দুয়েরই হাত এড়াতে তার বেতো রোগী বোন মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গ্‌কে বিবাহ করি! ভেবেছিলুম, কালে তাদের সম্পত্তিরও মালিক হব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর! সম্পত্তি পাওয়া দূরে থাক, সেই বেতো স্ত্রী ক্রমে এক ভার হয়ে দাঁড়াল। তার কড়া তদারক আর কড়া মেজাজের জ্বালায় আয়ার্লাণ্ড ছেড়ে পারিতে এলুম, ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায়। চারিদিকে বিপদের আর কূল-কিনারা দেখা যাচ্ছিল না, তাতে মানুষকে একটু দুঃসাহসিক হতে হয়—সেই দুঃসাহসে ভর করে পা বাড়াতে এসে মাথা তুললুম। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে মানুষের উপর আমার প্রবল ঘৃণা জন্মেছিল; সেই ঘৃণার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে চারিদিকে শুধু বিষ ছড়িয়েছি। মান ইজ্জৎ টাকা সবই দু হাতে কুড়িয়ে বেড়িয়েছি! কিন্তু কোন দিন শান্তি পাইনি। তাই শেষ সে-সব ছেড়ে দিয়েছি। স্ত্রীর সে ভাইটা নিঃসম্বল হয়ে মারা গেল। বেতো স্ত্রীকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হই। আজ আমি আবার মুক্ত, স্বাধীন—"

"মুক্ত, স্বাধীন! ঠিক বলেছ, জেঙ্কিন্স! তবে যে তোমার স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর অধিক তোমার অনুগতা, দাসীর মত পড়েছিল, তাকে কেন বিয়ে কর না!"

"না, আর নয়! সেও ত কয়েদ! অত মিনমিনে ভাব, অত অনুরাগ, তাও আমার অসহ্য বোধ হয়। তা ছাড়া তাকে ধরে এনে রাখলেও যেদিন তোমায় দেখেছি, মন আমার সেই দিন থেকে তোমারই পিছনে ছুটে বেড়িয়েছে—মন শুধু তোমাকেই চায়। তার সঙ্গে আমার সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলেছি।"

"হঠাৎ এমন সর্ব্বত্যাগী হলে যে!"

"পারি, সমাজ—সব ত্যাগ করেছি। সেখানে শান্তি নেই, সুখ নেই—"

"পারিতে আর ফিরবে না?"

"না। এখন শুধু তোমার সঙ্গ-সুখের প্রার্থী আমি। সব ত্যাগ করে আমি তোমার বাসায় গেলুম। গিয়ে দেখলুম,

ড়ী খালি পড়ে আছে—গায়ে টিকিট টা, "বাড়ী ভাড়া।" তখন আমার মাথার ধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করে উঠল। পাখী উড়ে নিয়েছে! তুমি পারি ছেড়ে আসায় খানে আমার আর সুখ নেই—আমিও তাই রি ছাড়লুম; তুমি তোমার ঘর-বাড়ী চে ফেলেছ, আমিও আমার ঘরবাড়ী চে এসেছি।"

"আর সে? সেই সাধ্বী, সেই অনুগতা ারী যে তোমার স্ত্রী না হয়েও লক্ষ ীর চেয়ে তোমায় ভালবাসত, তোমার খের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও যে কুণ্ঠিত য়—সেই নারীকে তুমি পথে বসিয়ে সেছ! চমৎকার কাজ করেছ, জেঙ্কিন্স, ৎকার কাজ! আজ তার সেই পরিত্যক্ত মূল্য আসনে আমায় বসাবার জন্য তুমি অনুরোধ করতে এসেছ! স্বার্থপর কাপুরুষ—" কথাটা বলিয়া ফেলিসিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

জেঙ্কিন্স করুণ স্বরে কহিল, "আর আমায় লজ্জা দিয়ো না, ফেলিসিয়া। তাকেও যে আমি ত্যাগ করেছি, সে তোমারই জন্য। আজ আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এসেছি, শুধু তোমারই আশায়। আমার এ অবস্থায় তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না—নিষ্ঠুর হয়ো না। আমায় দয়া কর।"

"দয়ার আশা মনেও স্থান দিয়ো না, জেঙ্কিন্স। এত বড় নিষ্ঠুর কাপুরুষের হাতে আপনাকে আমি সঁপে দেব, এমন পরিচয় পাবার পরও? তা হয় না, জেঙ্কিন্স, তা অসম্ভব!"

জেঙ্কিন্স তখন ভূমির উপর নতজানু হইয়া বসিল, করুণ আবেদনের দৃষ্টিতে ফেলিসিয়ার পানে চাহিয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, "এ আশা ত্যাগ কর, জেঙ্কিন্স। তুমি অসম্ভব কামনা করছ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোথাও কিছু রাখা-টাকা নেই। বিশেষ এ-সব কথার পর তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও আমি বিশ্বাস করতে পারব না। তা ছাড়া আরও শোন, জেঙ্কিন্স, আমার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক নয়—আমি মোরার রক্ষিতা ছিলুম।"

পল চমকিয়া উঠিল। এ সন্দেহ আভাষে তাহার মনে উঁকি দিত। তবুও সেই কণ্ঠ হইতে এমন পরিষ্কার অকম্পিত স্বীকৃতি সে কোন দিনই আশা করে নাই! পৃথিবীর সমস্ত আলো নিমেষে যেন তাহার চোখের সম্মুখে নিবিয়া গেল। এই নারী—এই হৃদয় লইয়া এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া আসিয়াছে!

জেঙ্কিন্স মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া উত্তর দিল, "আমি তা জানি। তুমি তাকে যে সব চিঠি লিখেছিলে, তার কতক আমার হাতে পড়েছে।"

"আমার চিঠি!"

"হাঁ, তোমার চিঠি—এই সে চিঠি। নাও, আমি এ চিঠি তোমায় ফিরিয়ে দিলুম। নাও। ও চিঠি অনেকবার করে আমি পড়েছি, আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে। এ চিঠির কথা মনে হলে আমার বড় কষ্ট হয়! কিন্তু জীবনে এর চেয়েও ঢের বড় বড় কষ্ট আমি সহ্য করেছি! ওঃ, কত পার্ল ডিউককে আমি খাইয়েছি। যত খেয়েছে, তত চেয়েছে। এই পার্ল ই তার

Tight Binding

মৃত্যুকে আরও এগিয়ে এনেছিল! বড় জ্বালা আমি পেয়েছিলুম, ফেলিসিয়া। জ্বলে পালের মাত্রা বাড়িয়ে তাকেও আরও জ্বালিয়েছি! তবুও সে চেয়েছে। আমিও তার মুখে ধরে দিয়ে মনে মনে বলেছি,—আরও জ্বলতে চাও, তুমি? নাও, খেয়ে জ্বলো—"

* * *

পল সভয়ে সরিয়া আসিল। আর না—এত বড় পাপের কথা ধৈর্য্য ধরিয়া কানে শুনাও যায় না! সে আর শুনিবে না!

সহসা তাহার দ্বারে করাঘাত হইল—"গাড়ী হাজির—"

পল তাহার পোর্টম্যাণ্টটা তুলিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। পাশের ঘর তখন নিস্তব্ধ হইয়াছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। পল দ্রুত হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িলে পল আপনার জামার পকেট হইতে পেন্সিলে আঁকা একখানি ছবি বাহির করিল। সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল চোখ! সে চোখে অখণ্ড বিশ্বাস—অপরিসীম অনুরাগ জ্বল্‌জ্বল করিতেছে। পল নিমেষ দৃষ্টিতে সে ছবির পানে চাহিয়া রহিল। পরে পরিপূর্ণ আবেগে ছবিখানাতে মুখ চুম্বন বর্ষণ করিয়া সেখানাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার প্রাণের জ্বালা মুহূর্ত্তে যেন জুড়াইয়া গেল। (ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সরসী

কি শোভা খেলিছে মোর অঙ্গে অঙ্গে লহরে লহরে!
কোটী রতনের খনি, নাহি যার অন্ত ও অবধি,
আমি নহি ফেনময় ফণাময় সে নীল জলধি;
শাখা-বাহু প্রসারিয়া, আলিঙ্গিতে ভীষণ সাগরে
উচ্ছৃঙ্খল গতি যার, আমি নহি সে দুরন্তা নদী
কল কল ছল ছল করি আমি ক্ষুদ্র পরিসরে;
জল মম বিহীন-শৈবাল-রাশি! ভ্রমরে ভ্রমরে
লীলায়িত, হের বক্ষে শত পদ্ম, কুমুদী শারদী!
কবিচিত্তকুঞ্জবনে আমি ক্ষুদ্র সনেট্-সরসী!
হের হের, লাল নীল শ্বেত পীত ভাবের শফরী,
উছলি উছলি নাচে অঙ্গে মম দিবস-শর্ব্বরী!
এ কি লহরীর লীলা!—ওই হের হাসে পূর্ণশশী
একা শূন্যে; কিন্তু মোর অপরূপ স্বচ্ছ শুভ্রজলে
চতুর্দ্দশ রাকা চাঁদ!—হেন চাঁদ আছে কি ভূতলে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অতৃপ্তি

আমাদের সংসারে আমরা যত প্রকার আনন্দ জানি, তাহার সবগুলিই সংস্পর্শজ। রসনার সহিত সুস্বাদু দ্রব্যের সংস্পর্শ হইলেই সুখ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সুন্দর সুমধুর সঙ্গীতের সংস্পর্শ হইলেই আনন্দিত হই। কিন্তু এই প্রকার সুখ বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ তাহাদের উৎপত্তি দুঃখে। এই সকল সুখের প্রভাবজনিত যে অনুভূতি, তাহা অতীব দুঃখকর। কাজেই দেখিতেছি, তাহাদের উৎপত্তি প্রারম্ভ দুঃখে। আবার যাহার আরম্ভ আছে, তাহার শেষও আছে। সংসারের নিয়মই এই। এই জন্য আবার শেষেও দুঃখ প্রধ্বংসাভাবের জন্য। সুখটা শেষ হইয়া গেল, আর তাহা ভোগ করিতে পাইতেছি না! এইরূপে যে সুখের আদি আছে, অন্ত আছে—যাহার আদিতে দুঃখ, ইচ্ছার উদ্রেক অবধি,—যাহার অন্তে দুঃখ, সুখটি শেষ হওয়া অবধি, বোধ হয় মৃত্যু পর্য্যন্ত,—এমন দ্রব্যে এমন সুখে পণ্ডিতগণ মুগ্ধ হন না। ইহাই গীতার একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

তাই প্রায়ই দেখিতে পাই, লোকে কোন একটি আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছে; অত্যন্ত ছুটাছুটি, পরিশ্রম, কলহ করিতেছে। আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইতেছে না বলিয়া স্বীয় পুরুষকার, দৈব, ভগবান, প্রত্যেককে, একের পর এককে আহ্বান করিতেছে এবং সফলকাম বা সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে একটা স্থান কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসে—

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায়, মা!

কি করুণ, কি হতাশ, হতভাগ্যের আক্ষেপ! সংসারও আবার এমন স্থান যে যদি প্রত্যেক লোককে পরীক্ষা করা যায়, বা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, প্রত্যেকেরই একটা না একটা বা একাধিক আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিয়া তাহাকে বেদনা দিতেছে। এই অতৃপ্তিই যখন অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইয়া উঠে, তখনই আকুল ক্রন্দনে স্বতঃই তাহা বাহির হইয়া আসে।

তবে এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সকলেরই একরূপ নহে। কাহারও হয় ত অর্থ, কাহারও স্ত্রী, কাহারও পুত্র, কাহারও যশ লইয়া; কাহারও আকাঙ্ক্ষা পবিত্র, কাহারও বা অপবিত্র। কেহ চায় আত্মতৃপ্তি, স্বার্থ, কেহ চায় পরোপকার, পরার্থ। কিন্তু সংসার যেরূপ নশ্বর, সেইরূপ অসম্পূর্ণ; সম্পূর্ণ তৃপ্তিও কোথাও নাই; সাময়িক তৃপ্তিমাত্র দেখিতে পাই। অথবা তাহাকে সাময়িক তৃপ্তি না বলিয়া "সাময়িক অবসাদ" বলা উচিত। এই সাময়িক অবসাদের অবসানে আবার অতৃপ্তির উদ্রেক ও কষ্ট।

তাই গীতাতে দেখি—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ৫।২২

পারিতেছে না বলিয়া অশেষ মনের দুঃখে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু হয়ত একদিন তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, অথবা সে ভাবিল যে, তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, অমনি তাহার মুখে হাসির রেখা ফুটিল। তাহার ললাট কুঞ্চিত অশান্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। তাহার শরীর আর খিন্ন স্বেদসিক্ত বা আকুল সঞ্চালনে ব্যস্ত নহে, এখন তাহা বেশ শান্ত, সুস্থ।

কিন্তু আবার শীঘ্রই চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দেয়। এবারের চাঞ্চল্য ঠিক যে অতৃপ্তির তাহা নহে। এবারকার চাঞ্চল্য দীর্ঘ ঈপ্সিত, আজ এত নিকট,—তৃপ্তির মুখ চাহিয়া। এই তৃপ্তি, যাহার জন্য সে কত আকুল হইয়া বেড়াইয়াছে, কত খাটিয়াছে, কত প্রার্থনা করিয়াছে, ইহার জন্য কত পবিত্র, কত অপবিত্র চিন্তায় মন পরিপূর্ণ করিয়াছে, সে আজ এত নিকট, ইহারই জন্য এই চাঞ্চল্য। পরে যখন সেই আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবার জন্য চাঞ্চল্য আরও তীব্র হইয়া উঠে। তখন এই সুখ যত গভীরভাবে যত অধিক কাল ধরিয়া ভোগ করা যায়, সেই চিন্তা, সেই চেষ্টা তাহাকে তত অনুপ্রাণিত করে। এই নূতন চাঞ্চল্যে তাহার ভোগ পরিপূর্ণ হয় এবং যতক্ষণ তাহার সে সুখ ভোগ শেষ না হয়, ততক্ষণ তাহার ভোগের আনন্দের সঙ্গেই সেই ভোগ শেষ হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। তাহার এই যে ভোগ-জনিত আনন্দ তাহাও যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অবিমিশ্র [illegible] সম্পূর্ণ নহে। তাহাতেও আশঙ্কা ভয়, বিষা[illegible] জড়িত রহিয়াছে।

সুখভোগ যত শেষ হইয়া আসে, ততই এই আশঙ্কা, ভয়, বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইয়া মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ক্রমে যখন সত্যই সুখভোগের অবসান হয়, তখন প্রধ্বংসাভাবজনিত দুঃখ ও নৈরাশ্য তাহাকে আবেষ্টন করিয়া ফেলে।

এই জন্যই দেখি, সাংসারিক সুখের প্রথমে দুঃখ, মধ্যে আশঙ্কা-মিশ্রিত সুখ, শেষে আবার দুঃখ। এই জন্যই গীতায় সংস্পর্শজনিত সুখ-ভোগের বিরুদ্ধে মানবকে সতর্ক হইতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঠিক দেখিলে দেখিতে পাই যে সংসারে সংস্পর্শজ আনন্দ ত সবই। হয় শারীরিক, না হয় মানসিক। যাহা শারীরিক তাহা ত সকলেই দেখিতে পাই। মানসিক দেখি, মনে কোনও একটি ভাব বা চিন্তার উদ্রেকে। কিন্তু তাহাদেরও ত আরম্ভ এবং শেষ আছে।

মনে কোন একটি ভাবের উদ্রেকে আনন্দ হয়। কিন্তু হয়ত তৎপরেই ভাবান্তরের ঘাত-প্রতিঘাতে আনন্দের স্থলে নিরানন্দের আবির্ভাব দেখিতে পাই। তাহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই, প্রত্যহ না হউক, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃপ্তি কোথাও নাই। তাহার স্থলে একটা সাময়িক অবসাদ মাত্র আসিয়া পূর্ব্বাপর অতৃপ্তির হাহাকারকে তীব্রতর

করিয়া দেখায়। বিরাট সাহারার তৃষ্ণা ক্ষুদ্র মানবের তৃষ্ণার নিকট হার মানে।

যদি তর্কের খাতিরে বলি যে, আমরা তৃপ্তি পাই, তাহা হইলেও যে বিশেষ কিছু বাহাদুরির কথা, তাহা নহে। কারণ প্রায়ই দেখিতে পাই যে যাহাকে তৃপ্তি বলিয়া তাহার শান্ত ভাবের কীর্ত্তন করি, তাহা মোহাবপ্রধান, আলস্য-জনিত জড়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্ম্ম হইতে, চেষ্টা হইতে বিরাম চাহি বলিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, এই ওজরে চাদর গুটাইয়া বসিয়া থাকি। এই তৃপ্তি আধ্যাত্মিক মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র।

অথচ গীতায় দেখিতেছি, আদেশ, নিত্য তৃপ্ত হও! এই "নিত্য তৃপ্ত" হইবার চেষ্টায় আবার যেন কাল্পনিক তৃপ্তির মিথ্যা ভাব হইতে সুপ্তি, এবং সুপ্তি হইতে আধ্যাত্মিক মৃত্যুতে গড়াইয়া না পড়ি! তাহা হইলে কি গীতায় এই নিত্য তৃপ্ত হইবার উপদেশ মিথ্যা?

আবার উপনিষদে দেখি, "ক্রতুময়ো পুরুষঃ, অথ ক্রতুং কুর্বীত", অধ্যবসায় কর।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

অনবরত কর্ম্ম করিতে করিতে একশত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে ইহাই উপদেশ। ইহা ব্যতীত তোমার আর কিছু করিবার নাই।

বিষম সমস্যার কথা। বিরুদ্ধ দুই মত সমান তেজে অভিব্যক্ত হইতেছে।

আবার যদি অধ্যবসায়ই করিলাম, তাহাতে লাভ কি?

যদি অতৃপ্তিই মানব-ভাগ্যে স্থিরভাবে লেখা থাকে, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া অধ্যবসায় করা মূর্খের কাজ। অধ্যবসায় না করিলেও ত অতৃপ্তি ঘুচে না। অধ্যবসায় করিয়াও ঘুচে না। লাভের মধ্যে পরিশ্রম-জনিত শারীরিক অবসাদ ও তাহার ফলস্বরূপ আশাভঙ্গ, অতৃপ্তি, মানসিক অবসাদ। ইহাই অধ্যবসায়ের সমগ্র ফল।

আবার যদি বলি তৃপ্তি হয়, তাহাতে ত' দেখি যে "তৃপ্তি" কথাটার কোন স্থির অর্থ নাই। কে বা কতটুকুতে তৃপ্ত হয়, তাহারও ঠিক নাই। অল্পবীর্য্য হীনমতি লোকে অল্পেই তৃপ্ত হয়। তাই বলে—

সুপূরা স্যাৎ কুনদিকা সুপূরো মূষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তুষ্টঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি তুষ্যতি॥

আবার দেখি, একজন যাহাতে তৃপ্ত, আর একজন তাহার দ্বিগুণে তৃপ্ত, তৃতীয় ব্যক্তি তাহার একশত গুণে তৃপ্ত ইত্যাদি। কিন্তু যে দিন তাহার তৃপ্তি আসে, সেই দিনই (তাহার অধোগতি না হউক) ঊর্দ্ধগতি বন্ধ হইয়া যায়। একটা বিরাট সম্ভাবনার হঠাৎ কি এক ক্ষুদ্রত্বে পর্য্যবসান!

উপনিষৎ এই বিষম সমস্যার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। উপনিষৎ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং...যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্যং"। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই অমৃত, যাহা অল্প, তাহা মরণশীল। ইহা যে অকাট্য সত্য, তাহা আমরা জীবনে প্রত্যহ দেখিতেছি! সামান্য ক্ষুদ্র দীপবর্ত্তিকা অন্ধকারে যথেষ্ট

আলো দেয়, কিন্তু তীব্রতর দীপবর্ত্তিকার নিকট তাহার প্রভা ম্লান হইয়া পড়ে। এই তীব্রতর দীপ-বর্ত্তিকাও আবার কেরোসিন তৈলের বর্ত্তিকার নিকট ম্লান। কেরোসিন দীপবর্ত্তিকাও আবার বৈদ্যুতিক দীপের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। বৈদ্যুতিক দীপও দিবালোকে হীনপ্রভ। এইরূপে স্বল্পশিক্ষিত লোক অল্পশিক্ষিত লোকের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু উত্তরোত্তর অধিক শিক্ষিত লোকের নিকট নিকৃষ্টতর শিক্ষিত লোক হীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। হীনতর লোকের প্রভাব উচ্চতর লোকের নিকট পরাজিত ও মৃত। সে প্রভাব জীবিত থাকে, যতক্ষণ না উচ্চতর লোক তাহার নিকটে আসে। সে প্রভাবের অস্তিত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নহে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে। সে প্রভাবের মূল্য অতি অল্প। কিন্তু যাহা ভূমা, যাহার উপর আর কিছুই নাই, সেই অমৃত, তাহার পরাভব নাই, এবং পরাভবই মৃত্যু, তাই ভূমা অমৃত। সেইজন্যই এই ভূমা প্রার্থনা করিবে, এই ভূমার জন্য অধ্যবসায় করিবে, অল্পে কখনও তৃপ্ত থাকিবে না, অল্প লইবে, কিন্তু অতৃপ্তির ভাবে। ইহার অপেক্ষাও ঊর্দ্ধে যাইতে হইবে, ইহার অপেক্ষাও অধিক লাভ করিতে হইবে। অল্পকে আরও-অধিক-পাইবার সোপান স্বরূপ বিবেচনা ও ব্যবহার করিবে।

তাহা হইলে দেখিতেছি যে উপনিষৎ খুবই জোরের সহিত অতৃপ্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৃপ্তিই মৃত্যু, অতৃপ্তি জীবন। তৃপ্ত হইও না। কিন্তু সত্য কি তাহাই? উপনিষৎ কি বলেন যে চিরজীবন অতৃপ্তির ভীষণ তৃষ্ণা মিটিবে না? মানুষ কি চিরকাল অতৃপ্তির হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিবে? তাহা নহে।

উপনিষৎ বলেন, ব্যথাবেদনা ও চাঞ্চল্যময় অতৃপ্তির মধ্য দিয়াই চিরশান্তিময় তৃপ্তিতে পৌঁছিতে হইবে। কিন্তু এই অতৃপ্তি অতি তীব্র ও দীর্ঘকালব্যাপী নহে। যথাসময় ভিতর এই অতৃপ্তি ত্যাগ করিতে জীবনের সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইহার কথা সুন্দররূপে তৈত্তিরিয় উপনিষদে বলা আছে—

যুবা স্যাৎ সাধুযুবা? অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বানামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্বানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবানপিয়ন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।

উপনিষৎ বলিতেছেন, আনন্দের কথা অনেক লোকে বলিয়া থাকে যে আমি

আনন্দ পাইলাম। কিন্তু সত্য সত্য যানি আনন্দ সে পাইয়াছে, তাহা বিচার লে দেখা যায় যে, সে পূর্ণ একমাত্রাও -আনন্দ পায় নাই। একমাত্রা মানুষ-দ পাইবার পাত্র কিরূপ, তাহা উপ- বলিয়াছেন—তিনি যুবা, অর্থাৎ ারিক, ও মানসিক ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতি স্বাস্থ্যে বর্ত্তমান; তিনি সাধু, কারণ অসাধু হইতে পারে, এবং তাহা লে তাহার অশান্তি ও অসুখেরই ারনা; তিনি অধ্যায়ক, অধীতবেদ; নি আশিষ্ঠ, দৃঢ়াস্তৃতম; তিনি দৃঢ়িষ্ঠ; নি বলিষ্ঠ; এইরূপ গুণসম্পন্ন লোকের ছই এই পৃথিবী সর্ব্ব বিত্তে পূর্ণ, ইনিই মাত্রা মানুষ-আনন্দের অধিকারী।

ইহাতেই প্রতীত হইয়াছে যে যিনি া অপেক্ষা গুণে যতখানি হীন, তিনি ইরূপে ততখানি কম মানুষ-আনন্দ াইতে পারেন। তাহা হইলে কত কম খ্যক লোকে যে একমাত্রা মানুষ-আনন্দের ধিকারী তাহা আমরা বুঝিতে পারি! ই একমাত্রা মানুষ-আনন্দের শতগুণ নন্দ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ। এই তগুণ আনন্দও মানুষ পাইতে পারে। কিন্তু যে সে নহে—যিনি এই আনন্দ াকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার "অকামহত" ওয়া চাই। তিনি যদি "কামহত" হইয়া ই অতি দুর্ল্লভ একমাত্রা মানুষ-আনন্দে জিয়া যান, তাহা হইলে আর তাঁহার র্দ্ধগতি নাই। তাঁহার ভাগ্যে ঐ একমাত্রা মানুষ-আনন্দ মিলিয়া সব শেষ হইয়া গেল; কিন্তু তিনি যদি ঐ একমাত্রা মানুষ-আনন্দে না মজিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া আরও ঊর্দ্ধগতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্রমে ঐ প্রথমলব্ধ একমাত্রা মানুষ-আনন্দের শতগুণ যে একমাত্রা মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব-দিগের আনন্দ, তাহা লাভ হইবে। এখানে দেখিতেছি যে অতৃপ্তিই ঊর্দ্ধগতির মূলীভূত কারণ।

এইরূপে অতৃপ্তিই ক্রমে সোপান-পরম্পরায় ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতরে মানবকে লইয়া যায়। মনুষ্যগন্ধর্ব্বদিগের আনন্দ হইতে দেবগন্ধর্ব্ব-দিগের আনন্দে, তাহা হইতে পিতৃলোক-দিগের আনন্দে, তাহা হইতে আজানজ দেব-দিগের আনন্দে, তাহা হইতে কর্ম্মদেবদিগের আনন্দে, তাহা হইতে ইন্দ্রের আনন্দে, তাহা হইতে বৃহস্পতির আনন্দে, তাহা হইতে প্রজাপতির আনন্দে। এইরূপে মানুষ-আনন্দ হইতে শতগুণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে প্রজাপতির আনন্দে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে এক আনন্দে উপস্থিত হইয়া তৎপর এবং ঊর্দ্ধস্থিত আনন্দে যাইতে হইলে, পূর্ব্বলব্ধ আনন্দ যতই লোভনীয় হউক, তাহাকে তাচ্ছল্যের সহিত ত্যাগ না করিলে উচ্চতর আনন্দ-প্রাপ্তি অসম্ভব।

এখানে দেখিতেছি যে প্রজাপতির আনন্দ দুর্ল্লভ মানুষ-আনন্দের ১০০০০০০০ ০০০০০০০০০০ গুণ। এই আনন্দ যে কত বেশী তাহার ধারণা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহার অপেক্ষাও উচ্চতর আনন্দ আছে। এই বিরাট প্রজাপতির আনন্দেও তৃপ্ত না হইয়া, যে আরও উচ্চতর আনন্দের চেষ্টা করিবে, তাহার জন্যই এই আনন্দ

সেই আনন্দ ব্রহ্মের আনন্দ। ইহা প্রজাপতির আনন্দেরও শতগুণ। আর এ আনন্দের গুণ এরূপ যে এ আনন্দ কেহ পাইলে—

"ন বিভেতি কুতশ্চন (কদাচন)"
"অভয়ং গতো ভবতি।" ইত্যাদি

তাহার কারণ যে মূল হইতে যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অগভীর গভীর আনন্দের ধারাসমূহ বহিয়া যাইতেছে, সেই আনন্দের মূলকেই সে পাইয়াছে; "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি।"

কিন্তু এই আনন্দ পাইতেছি না যতক্ষণ না সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সংস্পর্শ হইতেছে। মানুষ-আনন্দ হইতে যত ঊর্দ্ধে উঠিব, ততই ব্রহ্মের আনন্দের নিকট যাইব। উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিলেই ক্রমে ব্যবধান কমিতে থাকিবে। কিন্তু যেখানে তৃপ্ত হইব, আমার ঊর্দ্ধগতি সেইখানেই রুদ্ধ। এমন কি যদি প্রজাপতির আনন্দে গিয়াও তৃপ্ত হই, তাহা হইলে আমার লব্ধ আনন্দ ও ব্রহ্মের আনন্দের মধ্যে ব্যবধান সামান্য হইলেও উক্ত ব্রহ্মের আনন্দ হইতে আমাকে রূঢ়ভাবে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

এই ব্রহ্ম সংস্পর্শ যে কি বস্তু, তাহার কথা কেনোপনিষদে আছে যে, ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারাই প্রথমে ব্রহ্মকে দেখিয়াছিলেন। আবার এই তিন দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই শ্রেষ্ঠতম পদলাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনিই প্রথম ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন।

কিন্তু এই ব্রহ্মের আনন্দস্পর্শ কারণ ব্রহ্ম সংস্পর্শ। এখানে আবার সমস্যা—সংস্পর্শ। গীতাতে ত সংস্পর্শ সুখকে ত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এখানে তবে "সংস্পর্শ" কিরূপ?

একরূপে দেখিতে গেলে "সংস্পর্শ" ব্যবহার ঠিক এবং অন্যরূপ ভুল। "সংস্পর্শ" মাত্র হইলে ভাল নয়। কারণ সে সংস্পর্শের অবসান হইলেই আবার দুঃখের পুনরুদয় এবং সুখের পর বলিয়া সে দুঃখ তীব্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

কিন্তু আমরা যে সংস্পর্শের কথা বলিতেছি, তাহা উপলব্ধি-জনিত। যাহা আছে, এতকাল উপলব্ধ হয় নাই, এ হইলেই যে সংস্পর্শের ভাব মনে আসে ইহা তাহাই।

আরও সাধারণতঃ আমরা খণ্ড উপলব্ধি খণ্ডসংস্পর্শ লইয়াই থাকি। এই সব খণ্ডসংস্পর্শ ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে যায়, তখন এক খণ্ডসংস্পর্শ তদপেক্ষা বৃহৎ খণ্ডসংস্পর্শে লয় পাইয়া স্বীয় অস্তিত্ব হারায়। এইরূপে যখন বৃহত্তমতে আসিয়া পৌঁছাই, তখন দেখি—

"অনন্তমানো যদনন্তমস্তি"

তিনি সকলকে গ্রাস করিয়া আছেন, তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে এমন কেহই নাই। এত সর্ব্বগ্রাসী, যে ইহার জোয়ার ভাঁটা নাই। ইহার পরিচ্ছেদ নাই। তাঁহারই কথা—

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এ বেদং সর্ব্বমিতি।"

ইনিই সৎ, ইনিই সত্ত্বা, ইনিই সত্য

আনন্দ! ইহা ব্যতীত যাহা কিছু, কম হউক না কেন, তাহা সৎ হীন, তাহা খণ্ড সত্ত্বা, তাহা খণ্ড তাহা আপেক্ষিক তাহা বেদনপূর্ব্ব ও দুখের সুখ, তাহা নশ্বর; যতই দীর্ঘস্থায়ী না কেন, অনন্তের হিসাবে তাহা স্থায়ী, তাহা নিথ্যা, আজ আছে, কাল

যতদিন এই সত্য ব্যতীত অন্য 'জ্ঞান' তাদের অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন সত্য হইতে বঞ্চিত থাকিব, ততদিন 'আমাদের অধিকার করিয়া থাকিবে। দিন আমাদের স্বরূপ যে সত্য, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া মিথ্যারূপের বাঁধনে পড়িয়া থাকিব। যেদিন এই পূর্ণ তার উপলব্ধি হইবে, সেইদিনই এই মিথ্যারূপ ত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ পাইব ও তাদের মুক্তি হইবে। তাই ভাগবতে বলে—

"মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

কিন্তু এই মুক্তিতে পৌঁছবার মূলীভূত হল, অতৃপ্তি। নিয়তর আনন্দে অতৃপ্ত হও। উচ্চতর আনন্দের আকাঙ্ক্ষা কর। নিম্নতরকে সোপান-স্বরূপ করিয়া ঊর্দ্ধতরতে উঠিবার চেষ্টা কর। নিম্নতর যেন তোমাকে আকর্ষণ করিয়া বাঁধিয়া না রাখে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ততোঽধিকতরং পুরুষার্থংদ্রাপ্রপমপি প্রাপ্রিপয়িষুঃ ক তদাস্থো ভবেৎ। ন কশ্চিৎ তদসারজ্ঞস্তদর্থী স্যাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বো হ্যপর্য্যুপর্য্যেব বুভুষতি লোকঃ।"

এইরূপে অতৃপ্তির সাহায্যে যখন ক্ষুদ্র আনন্দকে তুচ্ছ করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর আনন্দের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া বৃহত্তম পূর্ণতমতে গিয়া দেখিব—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদব্যত।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেতাবশিষ্যতে॥

তখন আনন্দ এত হইবে যে দেখিব,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি, অভিসংবিশন্তি।"

অতৃপ্তির চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া লাভ হইবে,—অখণ্ড অনন্ত তৃপ্তি ও আনন্দ!

শ্রীবিমলাচরণ দেব।

দুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

বর্ত্তমান যুগের কৃষিকার্য্য

আধুনিক জগতে কৃষিকর্ম্ম কলযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত শিল্প-বিশেষ। সাধারণ শিল্প-কারখানার মতই কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য চলিয়া থাকে। ভূমি-কর্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাজারের খাদ্যদ্রব্য ও প্রাকৃতিক উপকরণ সরবরাহ করা পর্য্যন্ত সকল কাজেই উচ্চতম বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিতে পাই। বিলাতে বিস্কুট-ফ্যাক্টরী দেখিয়া সামান্য সামান্য কার্য্যেও কলকারখানার আধিপত্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমে-

রিকার কৃষিক্ষেত্রেও তাহাই বেশ দেখিতে পাইতেছি। রেলে বসিয়া ভুট্টা ভাজা, মুড়্‌কী, চীনাবাদামভাজা, শুকনা মিষ্ট ডুমুর, কৌটায় সুরক্ষিত তাজা আনারস ও নাসপাতি এবং অন্যান্য বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য পাইয়াছি। মনে হইতেছিল, এই সকল জিনিষ পরিষ্কার করিবার সময় শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছে—শেষ পর্য্যন্ত পুরিয়ার মধ্যে রাখিবার সময়েও কলের সাহায্যই লওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে লোকসংখ্যা অল্প হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বেশী—কারণ এক একটা কল বা যন্ত্র বহু ব্যক্তির কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতেছিলাম—ইয়াঙ্কিরা কি ক্রমশঃ চীন ও ভারতবর্ষের মুড়িমুড়কীর দোকানগুলিও দখল করিয়া ফেলিবে? এ ভয় নিতান্ত অমূলক বলিয়াও মনে হয় না!

প্রদর্শনী-নগরের কয়েকটা সৌধে প্রবেশ করিয়া আধুনিক কৃষিকার্য্যের চরম নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। ফ্রান্সে মনে হইতেছিল—"ফরাসীরা কৃষিজীবী জাতি, কি শিল্পী জাতি, কি ব্যবসায়ী জাতি, তাহা স্থির করা কঠিন।" ইয়াঙ্কিস্থানের পশ্চিম অঞ্চল এবং এই প্রদর্শনী দেখিয়াও ভাবিতেছি—মার্কিনদেশ কৃষিপ্রধান কি শিল্পপ্রধান কি বাণিজ্যপ্রধান তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। এখানে কৃষিসম্পদের চূড়ান্তই দেখিতেছি। ভারতভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধনধান্য পুষ্পে ভরা বিবেচনা করিতে এখন লজ্জাবোধ হয়। ভারতের কৃষিসম্পদ্ লইয়া বর্ত্তমান যুগে আর গৌরব করা চলে না। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যাহাই থাকু কেন, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভা বর্ষ কৃষিকার্য্য হিসাবেও নিতান্তই অব কাজেই দশ-বিশ বৎসরের ভিতর ভা বাসীর মুড়িমুড়্‌কী, চিঁড়ে, খৈ, আম, খেজুর, আলু ও কপিও বিদেশীয়েরা যোগা থাকিবে এরূপ আশঙ্কা করা পাগ বোধ হয় না।

বিগত ৫০।৭৫।১০০ বৎসরের কৃষিকার্য্যে এবং কৃষিবিজ্ঞানের যত পরি ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব ৫০০০ বৎসরেও তত হয় নাই। অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেটাতেই ভা বাসী সাহায্য করেন নাই; এবং করি সুযোগও পান নাই। সুতরাং কৃষি দ্রব্য সম্বন্ধেও ভারতবাসী ক্রমশঃ বিদে উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন।

আজকালকার কৃষক তাহাদের সাহা কারী মানবমাত্র নয়। তাহারা শিল্প-ক খানার মজুরের ন্যায় কলকব্জার পরিচা বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানসমূহের নিয় প্রদর্শনীর ক্যালিফর্ণিয়া-ভবন, কানা সৌধ, Horticulture-গৃহ ইত্যা ভিতর দেখিলাম, কৃষকদের সকল কা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাবলের ফল। ভূ উর্ব্বরতা নাই—তাহাতে আধুনিক কৃ ভীত হয় না। সে রাসায়নিক উপকর সাহায্যে ভূমির উৎপাদনী শক্তি যথেচ্ছ বাড়াইয়া লইতেছে। উত্তাপ, আলো গ্রীষ্ম-বর্ষা, জলাভাব, জলপ্রপাত, জলাধি ইত্যাদির কোনটা কৃষকের কার্য্যেই অ কাল অন্তরায় থাকিতে পারে না। বৃ

বর্ত্তমান যুগের কৃষক এই সমুদয় প্রাকৃতিক শক্তির ইচ্ছামত সদ্ব্যবহার করিতেছে। বীজ, অঙ্কুর, ফসল, ফল, মূল, লতা ইত্যাদির আকার বাড়ান-কমান অথবা স্বাদ ও বর্ণ বদলান—এই সব কার্য্যও কৃষকেরা অতি সহজেই করিতে পারে। ছোট আলুকে বড় আলুতে পরিণত করা, সকণ্টক ও বিস্বাদ শাক-শব্জীকে নিষ্কণ্টক ও সুস্বাদু জাতিতে পরিণত করা এই সমুদয় কার্য্যে ইহারা সিদ্ধহস্ত। আজকালিকার উদ্ভিদ-জগতে কৃষকেরা ঐন্দ্রজালিক ও যাদুকরের মত। তাহার পর বীজবপন হইতে শস্যকর্ত্তন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই পশুলোকের পরিবর্ত্তে একজন লোকের সাহায্য লওয়া হইতেছে। অল্পমাত্র মানবশ্রমে প্রচুর ফল পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু কৃষিকার্য্য সম্পর্কিত কোন দ্রব্যই বৃথা নষ্ট হয় না। কোন না কোন উপায়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহও নানাবিধ অর্থকর প্রণালীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাঠের কোন জিনিষই অনাবশ্যক বিবেচনায় ফেলা যায় না।

ভারতবর্ষে দেখা যায় আম জাম কাঁঠাল গাছ একবার খারাপ হইতে থাকিলে সেগুলির আর উন্নতি হয় না। বৎসর বৎসর এই সমুদয়ের ফল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র, স্বাদহীন ও অল্পসংখ্যক হইতে থাকে। পাশ্চাত্যদেশে প্রত্যেক বৃক্ষের উৎপাদনী-শক্তি অশেষ উপায়ে বাড়াইবার ব্যবস্থা আছে। গাছের পাতাগুলি মাঝে মাঝে ধুইয়া পরিষ্কার করিবার জন্যই বহুবিধ কলের ব্যবহার হয়। জলের মধ্যে নানা-প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া মালীরা গাছের পাতায় সেই জল ছিটাইয়া দেয়। বৃক্ষের ব্যাধি নিরূপণপূর্ব্বক রাসায়নিক পদার্থ নির্ব্বাচন করা হয়—এবং বৃক্ষের আকার অনুসারে জল ছিটাইবার

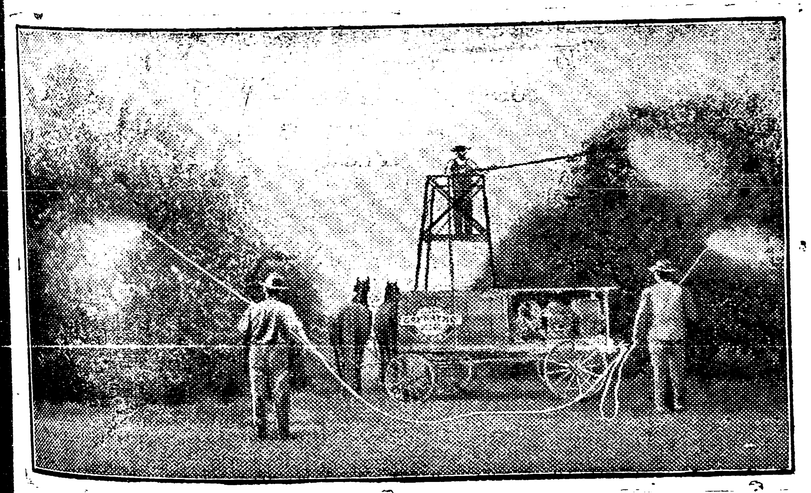

গাছে রাসায়নিক পদার্থ-মিশ্রিত জল ছিটান হইতেছে

কল ব্যবহার করা হয়। "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ"-বিদ্যা হিন্দুর অপরিচিত নয়—কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহার ব্যবহার অত্যল্প হইতেছে—অধিকন্তু, নবীন বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও উন্নতি সাধিত হয় নাই।

কৃষিকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী নানা কল এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। স্যান্‌ফ্রানসিস্কোতেও অনেক দেখিলাম। লাঙ্গল ব্যবহার যেমন কৃষকমাত্রেরই অত্যাবশ্যক সেইরূপ নানাবিধ দমকল, জল ছিটাইবার কল, Force-Pump, Sprayer ইত্যাদির ব্যবহারও আজকাল অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়।

আলুর ক্ষেত্রে, তুলার জমিতে, ফলফুলের বাগানে সর্ব্বত্রই এই সকল কলের ব্যবহার হইতেছে। বহুবর্ষজীবী প্রাচীন এল্‌ম্ তরুও এই সমুদয়ের প্রয়োগ-ফলে নবীন ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষে এই সমুদয়ের ব্যবহার-প্রচলন নিতান্তই আবশ্যক। প্রাচীন বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থার সঙ্গে নবীন Horticulture বিদ্যার সংযোগ-বিধান শীঘ্রই কর্ত্তব্য।

উন্নত লাঙ্গল ও সার সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক কথা জানা আছে। কতকগুলি সামান্য সামান্য কার্য্যে কারিগরী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম! একটা কলের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছোট বড় মাঝারি নাসপাতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সাজান হইতেছে। কোন লোকের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। একটা ক্ষুদ্র কলে মুড়কী প্রস্তুত হইতেছে—গুড়ের সঙ্গে খৈ মিশাইবার জন্য কোন লোকের না বসিয়া থাকিলেও চলে। এমন কি চীনাবাদামও কলে ভাজা হইতেছে। আগুনের তা এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, হঠাৎ খানিক বাদাম বেশী-ভাজা হইয়া যাইতে পারে না। কলের সাহায্যে বাদামগুলি আপনাআপনি যথাস্থান হইতে পড়িয়া নিয়ম-মত ভাজা হইয়া যথাস্থানে জমা হয়। কলের সাহায্যে কিশমিশের বোঁটা ছাড়ান, খোসা ছাড়ান পরিষ্কার করাও দেখিলাম। প্রত্যেক স্থানে পুরিয়-বাঁধাও কলে হইয়া থাকে।

এই সব দেখিতেছি আর ভাবিতেছি—রজনীকান্তের সাধ

"যদি কুমড়োর মত চালে ধরে ত'
পান্‌তোয়া শত শত
আর সরিষার মত হত মিঠাদানা
বুদিয়া বুটের মত"—ইত্যাদি

একমাত্র মিষ্টান্ন সম্বন্ধেই মিটিয়াছে এমন নহে—মার্কিনদেশীয় লোকেরা উদ্ভিজ্জ বিষয়ে এইরূপ সাধ মিটাইতে সমর্থ। কৃষিক্ষেত্রে যাদুকরেরা অদ্ভুত ফল প্রদর্শন করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে সোরা উৎপন্ন হয়। এই সোরা সারের আদান। কিন্তু এখানে সোরা যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আজকালকার কৃষকেরা হা হতোহস্মি করিতে থাকিবে কি? বৈজ্ঞানিকেরা আশ্বাস দিয়াছেন—"কোন ভয় নাই।" কৃত্রিম উপায়ে বাতাস হইতে সোরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। সোরার প্রধান উপকরণ নাইট্রিক য়্যাসিড। এই য়্যাসিড প্রস্তুত করিবার জন্য খোলা আকাশ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। তাহার সঙ্গে অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ বিধান

করিলে সহজে নাইট্রিক য়্যাসিড তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। কাজেই ভূমিতে সোরা না ছড়াইয়া গেলেও কৃষকেরা বিব্রত হয় না। স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর একজন বিজ্ঞানসেবীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি বাতাস হইতে নাইট্রিক য়্যাসিড ও সোরা প্রস্তুত করিবার সস্তা ও সহজ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। কয়দিন ইহার ল্যাবরেটরীতে যাইয়া কলগুলি দেখিয়া আসিলাম।

প্রকৃতির দাসত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকৃতিকে দাসীতে পরিণত করা বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষকেরা সমধিক সাধন করিতেছে। বর্ত্তমান জগতের কৃষিকার্য্য প্রকৃতির খেয়ালের অধীন নয়—প্রাকৃতিক শক্তিগুলি মানবকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মরুভূমিতে সোনাফলান, আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসান, বর্ষাকালে আমসত্ত্ব শুকান, কাশীধামে ভূমিকম্প ঘটান, পশ্চিমে সূর্য্য উঠান—এ সব কার্য্য বর্ত্তমান যুগেই সম্ভব।

শুনিতে পাই, কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান প্রয়োগ জর্ম্মাণিতে চূড়ান্তরূপেই হইয়া থাকে। জর্ম্মাণ দেশের ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা নয়—অথচ এখনকার কৃষকেরা রুষিয়ার কৃষকগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতেছে। জর্ম্মাণির ভূমি হইতে সস্তায় বেশী মাল উৎপন্ন হয়—কৃষকগণের লাভও বেশ থাকে। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জর্ম্মাণিতে পূর্ব্ব অপেক্ষা শতকরা ৬০ ভাগ বেশী গোধূম উৎপন্ন হইতেছে—অন্যান্য শস্যের উৎপত্তিও প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বাড়িয়াছে। অথচ কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ কিছুই বাড়ান হয় নাই এবং কৃষকদিগের সংখ্যাও পূর্ব্বের মত সমানই রহিয়াছে। এই শস্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ বিজ্ঞানের সাহায্য। বস্তুত ইয়াঙ্কিদের ন্যায় জর্ম্মাণরাও শস্য "Manufacture" করিতেছে বলা যাইতে পারে। জুতা তৈয়ারী, জামা তৈয়ারী, কাপড় তৈয়ারী, টেবিল তৈয়ারী, ও গ্লাস তৈয়ারী ইত্যাদি শিল্পের ন্যায় আলু, কপি, বীট-চিনি, গোধূম ইত্যাদি তৈয়ারীও জার্ম্মাণদেশে একটা শিল্পবিশেষ!—ইহাকে কৃষিকার্য্য বলা উচিত নয়। প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করিয়া কৃষকেরা সাধারণ ভূমির উপর একটা ইচ্ছানুরূপ কৃত্রিম ভূমি প্রস্তুত করিয়া লয়। এই কৃত্রিম ভূমির রাসায়নিক পদার্থসমূহই উদ্ভিজ্জের আকারে দেখা দেয়। এই জন্য উদ্ভিজ্জসমূহকে প্রাকৃতিক অথবা কৃষিজাত না বলিয়া শিল্পজাত বলা হইল।

দুধের ব্যবসায়

একদিন প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রায় বার ঘণ্টা কাটানো গেল। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, হাওয়াই, শ্যাম, তুরস্ক ইত্যাদি দেশীয় ভবনগুলি দেখিলাম। জাপানী বাগান, চা-গৃহ এবং প্রমোদালয় বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরের পাড়ায় পাড়ায় জাপানী প্রভাব দেখিতে পাই—প্রদর্শনীতেও জাপানীরা প্রভুত্ব করিতেছে। এখানে মার্কিনদের পরেই জাপানীদের জয়জয়কার দেখিতেছি।

ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকজন ভারতবাসীর সঙ্গে দেখা হইল। কেহ কেহ পথশ্রান্ত পর্য্যটকগণকে গাড়ীতে বসাইয়া প্রদর্শনী দেখাইতেছে। এই উপায়ে তাহাদের জীবিকা

উপার্জ্জিত হয়। এই ধরণের ভারতীয় যুবক দুইজন মাত্র চোখে পড়িল। দর্শকমণ্ডলীর ভিতর দুইটি ভারতীয় বালিকার সঙ্গে আলাপ হইল। ইহারা আমেরিকাতেই বাস করিতেছে। ইহাদের সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক শিশুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটি কে?" বুঝিলাম—এই দুই ভগ্নী তাহাদের তিন ভাইয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে এখানে লেখাপড়া শিখিবার জন্য আসিয়াছে। এক্ষণে প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল ইহারা গৃহত্যাগী। দিল্লী নগরীর বণিকবংশে ইহাদের জন্ম। গৃহ হইতে কোন সাহায্য না লওয়া ইহাদের উদ্দেশ্য। পাঁচ হাজার টাকা লইয়া দে হইতে বাহির হইয়াছিল। অল্পকালের ম সে অর্থ নিঃশেষ হয়। তাহার পর হই বড় ভাইয়েরা দোকানে ও কৃষিক্ষেত্রে মজু করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছে। দৈনি বেতন ইহারা ছয় টাকা করিয়া পায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎস ধনবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছিল—অর্থাভা লেখাপড়া সম্প্রতি স্থগিত রহিয়াছে। কনি ভ্রাতা ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন ভা জানে না। যখন ইহারা আমেরিকা পদার্পণ করে তখন এই শিশু বয়স ৫।৬ বৎসর মাত্র ছিল। কনি ভগ্নীও হিন্দী কিম্বা উর্দ্দ জানেন না। স্যানফ্র্যান্সিস্কোর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ইহারা লেখাপড়া শিখিতেছে। উচ্চতম শিক্ষা না পাইয়া কেহই স্বদেশে ফিরিবে না। বালক-বালিকারা ইয়াঙ্কিদের মতই ইংরাজী বলে—ভারতবর্ষের কোন কথাই জানে না। ইতালীয়, জর্ম্মাণ, পোল ইত্যাদি জাতীয় লোকেরা ইয়াঙ্কি-স্থানে আসিয়া যেরূপ হয়, এই ভারতসন্তানগণকেও সেইরূপ বোধ হইল। মোটের উপর ইহাদের উৎসাহ, ভাবুকতা ও অসমসাহসিকতা দেখিয়া



ইয়াঙ্কিস্থানে হিন্দু বালক-বালিকা

হইলাম। ভারতীয় পুরুষ ও রমণী-মধ্যে এই শ্রেণীর উদ্যম ও হঠকারিতা অতি বিরল—কিন্তু অল্পকালের ভিতরই গুণের আবির্ভাব আমাদের সমাজে অত্যাবশ্যক।

পশুবিভাগে খানিকক্ষণ কাটাইলাম। খচ্চর, গো বলদ, মেষ ছাগল, শূকর , বিড়াল, এবং পাখী ইত্যাদি বিধ জন্তু সংগৃহীত হইয়াছে। এই পশু-পক্ষী এখানে বিক্রয় করাও হয়। ছাড়া এইগুলি লইয়া নানাপ্রকার বাজী লবার বন্দোবস্ত আছে। কোন্ মুরগী াপেক্ষা বেশী ডিম পাড়ে তাহারও পরীক্ষা তেছে। এই প্রতিযোগিতার নাম ternational Egg-laying contest"! চালন, ঘোড়দৌড়, পোলো-প্রতিযোগিতা, রের লড়াই ইত্যাদি নানাবিধ খেলারও য়া আছে।

পশুশালার গাভী ও বলদগুলি একটা াবসায়ী কোম্পানীর সম্পত্তি। এই াম্পানীর প্রস্তুত দুধ স্যানফ্র্যানসিস্কোয় িয়া অবধি রোজ পান করিতেছি। এইজন্য াদের গোয়াল-ঘরে কিছুকাল ঘুরিয়া রিয়া দেখিলাম। আমরা গোসেবক াপূজক জাতি, কিন্তু আমাদের গোমাতা রতমাতার ন্যায়ই জীর্ণশীর্ণ ও অস্থিকঙ্কাল-র। মার্কিন দেশের গোখাদক জাতির াশালা এবং গোধন দেখিবামাত্র আমাদের রবস্থা স্মরণ করিলাম। একমণ দেড়মণ দেয় এরূপ গাভী এখানে অসংখ্য। ধিকন্তু গাভীর জাতি-সংস্কার করিবার ইয়াঙ্কি বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। উদ্ভিজ্জগতে বীজের উন্নতি, চারাগাছের উন্নতি, ফলের উন্নতি, ফুলের উন্নতি ক্রমাগত সাধিত হইতেছে। দুই-চারি-দশ বৎসরের ভিতর এক একটা উদ্ভিদের জাতি ও বংশ বদলাইয়া ফেলা হইতেছে। বীজনির্ব্বাচন ইত্যাদির প্রভাবে অতি নিম্ন-জাতীয় উদ্ভিদসমূহও উচ্চজাতীয় উদ্ভিদে পরিণত হইতেছে। এইরূপ নির্ব্বাচন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া পশুপালকেরাও জীব-জগতে নূতন নূতন গুণ-রূপবিশিষ্ট বংশ ও জাতির সৃষ্টি করিতেছে। Breeding বা (উদ্ভিদ পালন ও পশুপালন) বর্ত্তমান যুগে হাতুড়ের কাজমাত্র নয়—উচ্চ অঙ্গের প্রাণি-বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগপূর্ব্বক করিৎ-কর্ম্মা লোকেরা উদ্ভিদ ও পশুর রূপান্তর ও গুণান্তর সাধন করিয়া থাকে। মানব-জগতেও এই ধরণের গুণ-রূপ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের নাম Eagerist বা "বংশোন্নতি সাধক।" যাহা হউক পশুশালায় থাকিতে থাকিতে মার্কিন দেশের Breeding বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। এই বিদ্যা-সম্পর্কিত নানাবিধ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র এবং পুস্তিকাও সংগৃহীত হইয়াছে। কোনটা পক্ষী-সম্বন্ধীয়, কোনটা অশ্ব-সম্বন্ধীয়, কোনটা মুরগী-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি। এই রচনাগুলি খাঁটি বৈজ্ঞানিকের ভাষায় লিখিত নয়—সাধারণ কৃষক পশুপালক এবং গ্রাম্য লোকেরা যাহাতে বংশোন্নতি-বিদ্যা সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্যই এই ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়।

গোশালা দেখিয়া দুধের কারখানায়

আসিলাম। এ কয়দিন লক্ষ্য করিতেছি—আধুনিক যুগের কৃষিকর্ম্ম একটা শিল্প-বিশেষ। আজ দেখিলাম, আজকালকার গোয়ালাগিরিও কলযন্ত্রনিয়ন্ত্রিত কারবার-বিশেষ। সাধারণ কারখানায় আর দুধের কারখানায় কোন প্রভেদ নাই।

আমরা ভারতবর্ষে "গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধে"র বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকি। এই কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক সুইজর্ল্যাণ্ডে প্রস্তুত হয়। যাঁহারা চা-পানের জন্য অথবা শিশুদের জন্য এই দুগ্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—এই দুধের সঙ্গে চিনি এবং অন্যান্য পদার্থও মিশ্রিত আছে। গরম জলের সঙ্গে না মিশাইলে এই দুগ্ধ তরল হয় না। ইহা আঠাল, দেখিলে দুধ মনে হয় না। ইহার স্বাদও খাঁটি দুধ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। কিন্তু মার্কিন দেশে কৌটায় বন্ধ করা একপ্রকার দুধ পান করিতেছি, তাহাতে দুগ্ধ ছাড়া আর কোন জিনিষ নাই—ইহার রং ও স্বাদ সবই খাঁটি গো-দুগ্ধের মত। বস্তুতঃ গাভীর দুধ হইতে জল শুকাইয়া ফেলিলে দুধের যে অবস্থা হয় এই দুধ সেই ধরণের। অথচ আগুনে জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ, ক্ষীর বা রাবড়িও ইহাকে বলা উচিত নয়। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আসিয়া দুধের জল Evaporate বা শুকাইয়া ফেলিবার প্রণালী দেখিয়া লইলাম।

এই গৃহের কর্ত্তা যন্ত্রগুলির কার্য্য বুঝাইয়া দিলেন। যন্ত্রগুলি বিশেষ জটিল বোধ হইল না। আবার সেই ম্যাঞ্চেষ্টারের বিস্কুট-ফ্যাক্টরীর কথা মনে হইল। মাত্র ১৪।১৫টা স্বতন্ত্র কল। ইহাদের প্রথমটাতে গো-দুগ্ধ ঢালা হইতেছে—এখান হ[illegible] আপনা-আপনিই দুধ পরবর্ত্তী কলে চা[illegible] হইতেছে। দুগ্ধ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ক[illegible] ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে অব[illegible] বাজারে রাখিবার উপযোগী কৌটা-বন্দী হ[illegible] পড়ে। এইরূপে হাজার হাজার কে[illegible] প্রতিদিন বাহির হইতেছে।

কলগুলির সাহায্যে দুগ্ধ সম্পূর্ণরূ[illegible] নির্জ্জলা হইয়া যায়। কৌটাগুলি[illegible] তাড়িতের দ্বারা বিশেষরূপে শুদ্ধ ক[illegible] লওয়া হয়। কাজেই দুধের মধ্যে কে[illegible] প্রকার 'ব্যাসিলাই' বা স্বাস্থ্যহানিকর প[illegible] আসিতে পারে না। শত শত সহস্র স[illegible] মাইল দূরেও এই সমুদয় দুগ্ধভরা কৌ[illegible] চালান দেওয়া চলে। বহুকাল পরে ব্যবহ[illegible] করিলেও দুধের কোন দোষ দেখা যায় না[illegible] ভারতবর্ষে আমরা এখনও মামুলি প্রথ[illegible] দুধ দোহাইয়া থাকি—তাই এবেলার [illegible] ওবেলা পর্য্যন্ত থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। কাজে[illegible] বর্ত্তমান যুগের দুগ্ধ-ব্যবসায় আমাদের প[illegible] বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। আজকালকা[illegible] কৃষকের ন্যায় গোয়ালারাও বস্তুতঃই শি[illegible] ও কারিগর বা Manufacturer। ইহা[illegible] ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অসম্ভবও স[illegible] করিতেছে।

ছোট কৌটায় প্রায় এক পোয়া দু[illegible] থাকে—মূল্য দশ পয়সা। দুধ এত ঘ[illegible] যে জলের সঙ্গে না মিশাইয়া পান ক[illegible] চলে না। অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দু[illegible] মিশাইয়া এক পেয়ালা পান করিলাম[illegible] মূল্য দিতে হইল না। কলিকাতায় পাঁ[illegible] আনা সেরের দুধ জ্বাল দিলে যেরূপ স্বা[illegible]

এই জলমিশ্রিত দুধের স্বাদ সেইরূপ হইল। সুতরাং মার্কিনেরা অতি [illegible]রেই দুধ Manufacture করিতেছে না [illegible] হায়, অল্পকালের ভিতরেই ইয়াঙ্কিরা ভারতের গোপজাতিকেও যে ব্যবসায়হীন করিয়া ফেলিবে দেখিতেছি। তবুও কি আমরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য কিছু করিব না?

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মেরুদণ্ডের বিকাশ

প্রাণিবিজ্ঞানে প্রাণীদিগের মেরুদণ্ডী ও [illegible]রুদণ্ডী এই দুই প্রধান বিভাগ দেখিতে [illegible]য়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিকাশক্রমে [illegible]দণ্ডী প্রাণিশ্রেণীই শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের [illegible]রুদণ্ডী" নামের দ্বারা মেরুদণ্ডেই যে [illegible]দের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য নিহিত আছে [illegible]হার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং [illegible]রুদণ্ডের বিকাশ-আলোচনায় ক্রমবিকাশের [illegible]শেষ রহস্যই যে উদ্ঘাটিত হইবে, তাহা [illegible]মরা আশা করিতে পারি।

মেরুদণ্ডের প্রথম গঠন মৎস্যজাতীয় [illegible]বের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible]রুদণ্ডের পাশ্চাত্য ভাষার নাম হইতে [illegible]হার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য [illegible]ষায় মেরুদণ্ডের নাম Spine। ইহা [illegible]মন মেরুদণ্ডকে বুঝায় তেমনই মাছের [illegible]ঠের তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা বিশেষকেও বুঝায়। [illegible]স্যাস্থিকে আমরা কাঁটা বলিয়া থাকি। Spine শব্দের প্রকৃতিগত অর্থও অভিধানে কাঁটাই পাওয়া যায়।

মৎস্যজাতির কাঁটাসকল অপর মেরুদণ্ডী জীবদিগের অস্থিসকলের ন্যায় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় না।* সুতরাং ইহাদের মেরুদণ্ডও অপর মেরুদণ্ডী জীবদিগের মেরুদণ্ড অপেক্ষা যে কোমল হইবে তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। ইহা হইতেও তাহাদের মেরুদণ্ডই যে মেরুদণ্ডের প্রথম বিকাশ তাহার প্রমাণ পাই।

মৎস্যাদির মেরুদণ্ড অপেক্ষা পক্ষীদিগের মেরুদণ্ড অধিকতর দৃঢ়; পক্ষীদিগের অপেক্ষা আবার পশুদিগের আরও অধিক দৃঢ়। পশুদিগের মধ্যে আবার বানর ও বনমানুষজাতির মেরুদণ্ড সমধিক দৃঢ়। মনুষ্যদিগের মেরুদণ্ড বানর বনমানুষাদির মেরুদণ্ড অপেক্ষাও দৃঢ়তর। এই প্রকারে মেরুদণ্ডকেই আমরা মেরুদণ্ডী জীবদিগের

---

* "With respect to fishes, whose growth is slow, and whose skeleton never attains to the consistency which characterizes the bones of mammalia and birds and which in some, as the ray, skates, sharks etc. remains permanently cartilaginous * * *."

National Encyclopaedia. Article : Age of Animals.

ক্রমবিকাশের মানদণ্ড বলিয়া মনে করিতে পারি।

মনুষ্যজাতির বিকাশ-ক্রম পর্য্যালোচনা করিলে আমরা মেরুদণ্ডসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। মানবশিশুকে যে প্রথমে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয়, তাহা হইতে তাহার মেরুদণ্ড যথোচিত দৃঢ় না থাকারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে যতই মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা হইতে থাকে ততই শিশু প্রথমে উঠিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করে এবং পরে হাঁটিয়া চলিতে সমর্থ হয়। মেরুদণ্ড স্নায়ুরজ্জুর আধার। স্নায়ুরজ্জুর পুষ্টির সঙ্গেসঙ্গেই মেরুদণ্ডের বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রকারে মেরুদণ্ডের সবলতা হইতেই দেহোন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং স্নায়ুশক্তিই আমাদিগের দেহকে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত করে। এইজন্যই স্নায়ুর বিশিষ্ট পরিণাম বিকাশের পরিচিহ্ন হইয়াছে। ইহা হইতে মেরুদণ্ডের বা তৎসঙ্গে সঙ্গে দেহের উন্নমনই যে আমাদের উচ্চবিকাশ বা উন্নতির প্রকৃত অর্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

মনুষ্যোচিত উচ্চ বিকাশের আনুসঙ্গিক রূপেই স্নায়ুর বিশেষ পরিপুষ্টি হইয়া থাকে, এবং স্নায়ুর বিশেষ পরিপুষ্টির আনুসঙ্গিক রূপেই মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা হইয়া থাকে। এইজন্যই কোন কারণে মনুষ্যসমাজে শিশুর পক্ষে প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ না ঘটিলে তাহার মেরুদণ্ডের মনুষ্যোচিত দৃঢ়তা না ঘটিবারই সম্ভাবন। বস্তুতঃ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক মনুষ্যশিশুর প্রতিপালিত হওয়ার যে ঘটনা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে ব্যাঘ্রের ন্যায়ই তাহাকে হাতে ও পায়ে জানা গিয়াছে, মনুষ্যের ন্যায় কেবল হাঁটিতে জানা যায় নাই।

পশুদিগের মধ্যেও মনুষ্যজাতির যাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌ পরিলক্ষিত হয়,—যেমন বানর ও বনমানুষ তাহাদিগকে কখন কখন হাঁটিয়াও চ দেখা যায়। আমাদের ভাষায় ইহা 'বানর' ও 'বনমানুষ' উভয় নাম ব ইহারা যে মনুষ্যেরই পূর্ব্ববর্ত্তী বিকাশ পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়। 'ব শব্দের অর্থানুধাবন দ্বারা 'নরসদৃশ' অর্থই উপলব্ধ হয়; কারণ 'বা' অব্য উপমা অর্থ অভিধানে স্পষ্টরূপেই স্বী হইয়াছে, যথা—

"বাস্তাদ্বিকল্পোপমেয়য়োরেবার্থেঽপি সমুচ্চয়ে।"

'বনমানুষ' নামের দ্বারা কেবল ভাবেই মানুষের সহিত পার্থক্যের প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য জীব-বিজ্ঞ ইহারা যে anthropiod ape অর্থাৎ "ম লক্ষণান্বিত বানর" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিরই পোষক দেখা যাইতেছে। এই প্রকারে ইহা প্রকৃতিতে মানবের তুল্য বিকাশ হই ইহাদের মেরুদণ্ডও মানব মেরুদণ্ডের দৃঢ় হইয়াছে—তাহাতেই অন্য কোন হাঁটিতে সমর্থ না হইলেও ইহারা হাঁটি সমর্থ হইয়াছে।

মেরুদণ্ডের উন্নতি কেবল যে মানসি বিকাশেরই মানদণ্ড তাহা নহে; তা আধ্যাত্মিক বিকাশেরও মানদণ্ড। এইজন্য উপাসনা—যোগ-সাধন প্রভৃতি আধ্যাত্মি

ষ্ঠানে আমরা আসনের বিশেষ বিধান খিতে পাই; এবং এই সমস্ত বিধানেই দণ্ডকে বিশেষরূপে সমুন্নত রাখার ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। আমরা গীতা হইতে এরূপ সনের একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদান রিতেছি ঃ—

তত্রৈকাগ্রং মনঃকৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলংস্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীতমৎপরঃ ॥ ১৪
৬ষ্ঠ অধ্যায়।

"সেই আসনে বসিয়া মনকে একাগ্র করিয়া, চিত্ত ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন।"

"দেহের মধ্যভাগ মস্তক ও গ্রীবাদেশকে (অর্থাৎ ধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) সরল ও চলভাবে ধারণ করিয়া স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকার গ্রভাগ (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ) অবলোকন করিয়া র অন্যদিকে অবলোকন না করিয়া (শিবনেত্র হইয়া) শান্ত চিত্তে, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া কে সংযত করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া গরায়ণ ও যুক্ত হইয়া অবস্থিত করিবেন অর্থাৎ রূপদিষ্ট সাধন করিবেন।"

আর্য্যমিশন অনুবাদ।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেও শিরোগ্রীবের সমভাবে অবস্থানই শরীরের স্বাভাবিক অবস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মেরুদণ্ডের সমুচিত দৃঢ়তা দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত রূপ সমুন্নত ভাবটি স্থায়ী হইতে পারে। আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা স্নায়ুবল সঞ্চিত হইয়াই সেই দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। তাহাতেই যোগীগণকে যুগ যুগান্তর অক্লান্তভাবে এইরূপ সমুন্নত অবস্থায় অবস্থিত হইতে দেখা যায়। এই প্রকারে আমরা সমুন্নত মেরুদণ্ডকে আধ্যাত্মিক বলের মানদণ্ডস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারি। ইংরেজীতে "strong backbone of character" 'চরিত্রের দৃঢ় মেরুদণ্ড' রূপ কথা যে প্রচলিত আছে, তাহা ও মেরুদণ্ড যে আধ্যাত্মিক বলেরই আধার তাহারই আভাস প্রদান করে।

আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যেমন মেরুদণ্ডকে সমুন্নত করে—আধ্যাত্মিক অবনতিতে তেমনই ইহাকে অবনত করে। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি সেক্ষপীয়র তদীয় "Tempest" (ঝটিকা) নামক নাটকে—সাইকোরেক্স (Sycorax) নাম্নী ডাকিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "who was with age and envy almost bent double",—"যে বার্দ্ধক্যে ও ঈর্ষ্যার ভারে প্রায় দ্বিগুণ নমিত হইয়াছিল।"

এই প্রকারে মেরুদণ্ডের অবনত ভাবের সহিত অনুচ্চ বিকাশের যেরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে—মেরুদণ্ডের অভাবের সহিত তদ্রূপ আরও অধিক অনুচ্চবিকাশের সম্বন্ধও জড়িত হইয়াছে। তাহাতেই নৈতিক চরম অবনতি প্রকাশ করিবার জন্য কৃমি কীটের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডহীন জন্তুর মৃত্তিকায় বুকে ভর দিয়া চলা বুঝাইতে ইংরেজীতে creep শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই creep শব্দ চাটুকারিতার হেয় অর্থও প্রকাশ করে। ইংরেজীতে চাটুকারিতার বাচক যে "cringe" শব্দ

পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃত অর্থ নতদেহ বা আনতজানু হওয়াই বুঝায়। ইহা দ্বারাও মেরুদণ্ডের নতভাবের প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমাদের মেরুদণ্ডের উন্নতি যেমন উৎকৃষ্ট বিকাশের নির্দেশক তেমনই মেরুদণ্ডের অবনতি বা অভাব নিকৃষ্ট বিকাশের নির্দেশক তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য

গবর্ণমেণ্টের Statistical Report বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতের বহির্বাণিজ্য শনৈঃ শনৈঃ বাড়িতেছে। ১৯০৪—৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের সহিত ১৯১৩-১৪খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের তুলনা করিলে এই কথার যাথার্থ্য সহজেই উপলব্ধি হয়। ঐ বৎসরে আমাদের দেশ হইতে ১৫০ কোটির অধিক দ্রব্য রপ্তানি এবং কিছু কম ১১০ কোটির দ্রব্য বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হয়। ১৯০৬-৭ সালে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১৬৫ কোটি মুদ্রা। ঐ বৎসরে আমাদের দেশে আমদানী দ্রব্যের মূল্য ১১০ কোটি মুদ্রা হইবে। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য আরও বেশী,—এই বৎসর আমরা প্রায় ১৭৫ কোটি মুদ্রার দ্রব্য বিদেশে চালান দিই, এবং ১২০ কোটি টাকার দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করি। পর বৎসরে ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে আমদানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়; রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য গত বৎসরের অনুরূপ; —আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ১৩৫ কোটি ও ১৭৫ কোটি মুদ্রা। ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের বাণিজ্যের কি অবনতি ঘটে। এই আন্তর প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-(International trade)-বিপ্লব; ঐ সালে আমরা মাত্র ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করি; এবং বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যাদির মূল্যও ১৩০ কোটি মুদ্রার অধিক নহে। ইহার পর বৎসর হইতে আবার ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য কিছু কম ১৯০ কোটি মুদ্রা; এবং আমদানি দ্রব্যও প্রায় ১৩৫ কোটি টাকার। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি বাবদে কিছু কম ২১০ কোটি টাকার দ্রব্য চালান যায় এবং প্রায় ১৫০ কোটি মুদ্রার দ্রব্য ভারতে আমদানি হয়। ১৯১১-১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা যথাক্রমে প্রায় ২৩০, ২৫০, ২৫০, ও ২৫০ কোটি মুদ্রার দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়াছি এবং বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ১৩৮, ১৫০, ১৭০ ও ২১০ কোটি মুদ্রা। উপরে এই যে নয় বৎসরের

তুলনামূলক (comparative figure) অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ভারতের বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতির মুখে চলিয়াছে। ইহা আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান ভারতীয় বাণিজ্যের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। এখানে সেই স্বাতন্ত্র্যের কথাটিও সংক্ষেপে বিবৃত করা উচিত। মোটামুটি ভাবে এ কথা বলা পারা যায় যে, আমরা সমস্ত জগৎকে কাঁচা মাল (Raw Material) যোগাই আর তাহার পরিবর্ত্তে সভ্য জগতের নিকট হইতে আমরা তৈয়ারি মাল পাইয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন করিয়া তুলা প্রস্তুত করি, তুলা বিদেশে চালান যায়, এবং তাহা হইতে আবার সেই তুলাই বস্ত্রে পরিণত হইয়া আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করে। আমাদেরই দেশে প্রস্তুত চামড়া (Hide) জুতায় পরিণত হইয়া আসিয়া আমাদের শ্রীচরণে বুটের আকার ধারণ করে। আমাদেরই দেশে উৎপন্ন পাট বিদেশে গাত্রবস্ত্রে পরিণত হইয়া আবার এখানে আসিয়া আমাদের শরীর রক্ষা করে। এইরূপে আমাদের দেশের উৎপন্ন অধিকাংশ দ্রব্যই বিদেশীর দ্বারা Raw Material ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ কি? ইহার সহজ অর্থ এই যে, ইহা যুগান্তরের সূচনা করিতেছে। এতদিন আমরা নিষ্ক্রিয় শান্তি-প্রিয় জাতিমাত্র ছিলাম। ছায়া-দিয়া-ঘেরা কলহশূন্য পল্লীজীবন আমাদের আদর্শ ছিল। কিন্তু সে নেশা ছুটিতেছে। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাঁচিতে চাহিলে কলহ চাই, মারামারি চাই, ঠেলাঠেলি চাই। এই শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে নগরের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বাণিজ্যের পথ ক্রমশঃ সুগম হইতেছে এবং ভারতবাসীর জীবিকা-নির্ব্বাহের নানা উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারত এখনও নূতনের সহিত সম্পূর্ণ বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারে নাই; তাই এখনও অতি-বৃদ্ধ ভারতবর্ষ Factoryর জীবন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই; ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে মাত্র। এইজন্যই ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত করিবার জন্য বিদেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং বাধ্য হইয়া আমরা তাহাদের সাহায্য লইতেছি। এইজন্যই ভারতকে Mart for Raw materials নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হইতে ভারতে কল-কারখানাও কিছু কিছু বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশের যুবকগণ বিদেশ হইতে কলকারখানা চালাইবার উপায় শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, ভারত কৃষিকার্য্যকেই আর একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ না করিয়া Factoryর জীবন শীঘ্রই বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিবে। তাহার সূচনা কিরূপ দেখা যাইতেছে, প্রথমে তাহাই বলিতেছি।

চাষ-বাস ভারতবর্ষের প্রধান অবলম্বন। ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৬৭ জন চাষ-বাসের উপর নির্ভর করে। অবশিষ্ট লোক নানা উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভারতবর্ষে যে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যসূত্র জড়িত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইতেছি, এই কল-কারখানা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের জীবিকা-অর্জ্জনের পথে কতটুকু সহায়তা করিতেছে। ইহার পর বিলাতের কল-কারখানার সংখ্যা ও প্রণালীর সহিত ভারতীয় কল-কারখানার তুলনা করিয়া দেশের ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রকার কল-কারখানার সংখ্যা ছিল ৩৩২৭। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৩৮৬৭টি কারখানা (Factory) স্থাপিত হয়; ইহা ব্যতীত করদ ও মিত্ররাজ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত কারখানার সংখ্যাও ১৭টি। কোন্‌প্রকার কারখানার সংখ্যা কত, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল;—

তুলার কল—২৬৮
পাটের কল—৬৫
পাট পিষিয়া গাঁট বাঁধিবার কল—১২০
জিন ও তুলা বাঁধিবার কল—১৫৩৯
চালের কল—৩২৭
রেলওয়ের কারখানা—১২৯
ময়দার কল—৪১
লোহা ও পিতল ঢালাইয়ের কল—৪৮
কাঠ কাটিবার (Saw mill) কল—১২৯

উল্লিখিত কলগুলির মধ্যে পাটের কল ও কাপড়ের কলগুলিই বিখ্যাত। যে দেশে যে Raw Material হয়, সেই দেশে প্রায় সেই জাতীয় কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বেরার প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়, এজন্য বোম্বাই প্রদেশেই কাপড়ের কল অধিক। পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া, এইজন্য কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া হুগলী অবধি গঙ্গার দুই ধারে অসংখ্য পাটের কল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্মদেশে চালের আড়ৎ। এইজন্য চাল ভাঙ্গিবার কল ব্রহ্মদেশে অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপরে কল-কারখানার যে Figure দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে যেগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং কারখানার আইনের মধ্যে আসিয়া পড়ে না, সেগুলি ছাড়িয়া দেওয়া গেল। ঐ কল এঞ্জিন বা তাড়িত সাহায্যে পরিচালিত; কিন্তু অবশিষ্টগুলি প্রায়ই স্বভাবের সাহায্য গ্রহণ করে না। সেগুলি সাধারণতঃ ছোট কুটির এবং খুব অল্প লোক লইয়া সেখানে কাজ-কর্ম্ম হয়। এই জাতীয় কলগুলি প্রায়ই পাথরের কল, না-হয় রেশমের ছোট ছোট ছিপিখানা ছাপাই কল।

ভারতের কলগুলিতে যে সমস্ত শ্রমজীবী তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য কার্য্য করে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০,৫৮১৪১ জন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা ছিল ৯,৭৮৯২৩ জন। এই মোট শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা কেবল কারখানা-সংক্রান্ত আইন-কর্ত্তৃক পরিচালিত কলে কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা ৮,৬৯৬৪৩ জন; তাহাদের মধ্যে ৬,৮৫৮২২ জন পুরুষ, ১,৩০,০২৫ জন স্ত্রী, ৪৪,১৩২জন বালক এবং ৯,৬৬৪ জন বালিকা। মোটামুটি বলিতে হইলে, বলা যায় যে, সমগ্র ভারতে যত লোক কারখানায় কার্য্য করিয়া দিনপাত করে, তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৭ জন

...লায় এবং ৩০ জন বোম্বাইয়ের ...মূহে কার্য্য করিয়া থাকে।

...এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি ...ধর্ম্মের ভাব প্রবলভাবেই আমাদের ... প্রবেশ করিতেছে। ইহাকেই আমরা ...রের সূচনা বলিয়া মনে করি। ...ত কল-কারখানা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ...বে বলিয়াই বিশ্বাস হয়। আমা- ... দেশের অনেক কাঁচা মাল (Raw ...erial) ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত ...বার জন্য বহু সহস্র কারখানার প্রয়ো- ...আছে। আমাদের দেশে কাপড়ের কলের ...ও আরও বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক, কেন না ...ও আমরা অনেক কাপড় ভারতের বাহির ...ত আনিয়া তবে আমাদের লজ্জা ...রণ করিতেছি। জুতার কারখানা ...শে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। গত ... বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় "উৎকল ...রি" প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ কার্য্য করিতেছে; ... জাতীয় বহু 'টানারী'র এখনও প্রয়োজন ...ছে। পশম ও রেশমের কারখানারও ... বাঞ্ছনীয়। কোন্ দ্রব্য বাবদে কত ...র দ্রব্য আমাদের দেশে আমদানি হয়, ...র আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমাদের ... প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানার সংক্ষিপ্ত ...হাস দিতেছি।

...১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদের দেশে ...াপড়ের কল ছিল না। আমরা ঘরে কাটা ...া তাঁতিদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া, ...াদের দ্বারা কাপড় বুনাইয়া লইতাম। ...াতেই আমাদের লজ্জা নিবারণ হইত। ... জাতীয় বস্ত্র অত্যন্ত মোটা ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইত। বিলাসীদিগের জন্য একপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের তাঁতিগণ হাতে প্রস্তুত করিত; কিন্তু গৃহস্থগণ তাহা কখনও চক্ষেও দেখিতে পাইত না। আর্ক-রাইট প্রভৃতি মনীষিগণকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত অভিনব কলে পরিপূর্ণ মাঞ্চেষ্টার যদি আমাদের দেশে অল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট বস্ত্রের আমদানি না করিত তাহা হইলে স্বল্পে সন্তুষ্ট গতানুগতিক তন্তুবায়-সম্প্রদায় আরও কতকাল সনাতন প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিত, তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশ ব্যবসায়-হিসাবে সমধিক উন্নত। তথাকার ব্যবসায়িগণ য়ুরোপবাসিগণের সহিত বাণিজ্যে অনেকটা প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরেই প্রথম কল স্থাপিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা তখনও কল-কারখানার উপযোগিতা বুঝিতে পারে নাই,—মুক্ত ময়দানে বিস্তৃত গগন-তলে বসিয়া পুরুষানুক্রমে স্বচ্ছন্দে যাহারা উদর পূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বদ্ধ স্থানে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক হওয়া বিচিত্র নয়। কাজেই বাঙ্গালায় কল-কারখানার আশানুরূপ উন্নতি এখনও দেখা যায় নাই। বোম্বাইয়ের উন্নতিশীল পারসীগণ কাপড়ের ব্যবসা অনেকটা নির্ব্বিবাদে হস্তগত করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। অত্যল্পকাল মধ্যে বোম্বাই কাপড়-কলের পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে। কাপড়ের ব্যবসায় কেমন ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্রে উন্নত হইতেছে, নিম্নে উদ্ধৃত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে তাহা বুঝা যাইবে;—

১৮৭৯—৮৪ সাল	পর্য্যন্ত	কাপড়ের কল	৬৩
১৮৮৪—৮৯	,,	,,	৯৩
১৮৮৯—৯৪	,,	,,	১২৭
১৮৯৪—৯৯	,,	,,	১৫৬
১৮৯৯—১৯০৪	,,	,,	১৯৫
১৯০৪—১৯০৫	,,	,,	২১৮
১৯০৯—১০	,,	,,	২৪৫
১৯১০—১১	,,	,,	২৫৪
১৯১১—১২	,,	,,	১৫৮
১৯১২—১৩	,,	,,	১৬৬
১৯১৩—১৪	,,	,,	২৬৪

Currency Reformএর পর হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্রমশ উন্নতিলাভ করিতেছে। ১৮৯৪—১৮৯৯ সালের মধ্যে বোম্বাই সহরে ২৭টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর উন্নতি তত দ্রুত না হইলেও বোম্বাই নিতান্ত পিছাইয়া পড়িতেছে না। কেবল গত বৎসরে বোম্বাইয়ের কোনই উন্নতি হয় নাই, বরং দুইটি কল উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি?

আমাদের দেশে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় কেবলমাত্র আমরাই ব্যবহার করিতাম না। তাহার অধিকাংশই আমরা হয় চীনে, না হয় জাপানে বিক্রয় করিতাম। সম্প্রতি জাপানে এই সব জিনিষের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা যে শুধুই আমাদের কাপড় লইতেছে, তাহা নয়, অধিকন্তু চীনের ব্যবসায়ও হস্তগত করিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও দুইটি সাময়িক দুর্ঘটনায় বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ১৯১৩ সালে আমাদের দেশের কতকগুলি দেশীয় ব্যাঙ্ক ফেল হয়। বোম্বাইয়ের কলগুলির তাহ[সহিত লেন-দেন ছিল, কাজেই এই দুর্ঘ[পর হইতে তাহাদেরও আর্থিক অবস্থা শো[হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৯১৪ খৃ[বেরার প্রদেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন কলওয়ালারা পর-বৎসরে উচ্চদরে বস্ত্র [করিবার আশায় অধিক সংখ্যক বস্ত্র প্র করাইয়া গুদাম-জাত কর[পর বৎস তুলার দর বৃদ্ধি পায় [তাহার য়ুরোপে মহাসমরের সূ[হইতেই র[ও আমদানি দ্রব্যের পরি[আশাতীত হ্রাস পাইয়াছে। ফলে তাহাদের [আরও ঘনীভূত হইয়া উঠি[ছে।

কাপড়ের কলগুলিতে প্রায় ২,৬০৮৪৭ লোক কার্য্য করে। ইহা[মধ্যে ১,৮৯৫ জন পুরুষ, ৪৪,৮৪৮ জন স্ত্রী[লোক, এবং ২৬,৪ জন বালক-বালিকা। ১৯১৩—১৪ খৃষ্ট ভারতে সর্ব্বসমেত ৬৪,৪৮,[৬৭৭ পাউণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহার ম[২০,৬৭৯০৪ পাউণ্ড আমরা বিদেশে পা[ইয়া দিই। এ আমাদের দেশে যে সূতা উৎপন্ন হয়, ত[২৫ নম্বরের নীচে। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা [অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সূতা যথেষ্ট প্রস্তুত করিত[গত বৎসর ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০০০ পাউণ্ড সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

এইবার পাটের কথা বলিব। পা[কার্য্যকারিতা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গা নীল চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গা দেশই নীলের একচেটিয়া ব্যবসার স্থান ছি[ইহারও পূর্ব্বে বাঙ্গালা য়ুরোপকে রে[যোগাইত। বাঙ্গালার প্রাচীন ব্যবসা[ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু ক্র[

বাঙ্গালার রেশমের ব্যবসায় চীন ও [ব্যবসায় জর্ম্মাণি গ্রাস করিয়া বসিল, [হইতেই সে পাটের একচেটিয়া কারবার [করিয়াছে। এখন পাটের কারবারই [ার প্রধান কারবার। শুনা যাইতেছে [ৌগণ রসায়ন-সাহায্যে বৃক্ষ-ত্বক [সূতা বাহির করিয়া নকল পাট [করিবার [বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। [যতদিন না তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী [ততদিন পাট আমাদের একচেটিয়া [ায় থাকিয়া যাইবে। ১৮৭৮—৭৯ পর্য্যন্ত [ট কারবার তত লাভজনক ছিল না, [ই লোকে এই ব্যবসায়ে ততখানি মনো- [শ করিত না। কিন্তু ১৮৭৯—৮০ হইতে [ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। নিম্নে [কলের কারখানা ও শ্রমজীবিদিগের [া প্রদত্ত হইল :—

কারখানার সংখ্যা	শ্রমজীবীর সংখ্যা (নম্বরগুলি হাজার-করা হিসাবে)
১৮৭৯—৮৪ = ২১	৩৮.৮
১৮৮৪—৮৯ = ২৪	৫২.৭
১৮৮৯—৯৪ = ২৬	৬৪.৩
১৮৯৪—৯৯ = ৩১	৮৬.৭
১৮৯৯—১৯০৪ = ৩৬	১১৪'২
১৯০৪—০৯ = ৪৬	১৬৫
১৯০৯—১৯১০ = ৬০	২০৪.১
১৯১০—১৯১১ = ৫৮	২১৬.৪
১৯১১—১৯১২ = ৫৯	২০১.৩
১৯১২—১৯১৩ = ৬১	২০৪
১৯১৩—১৯১৪ = ৬৪	২১৬.৩

সাল	পাটের থলি (নম্বরগুলি দশশক্ষ হিঃ)	পাটের কাপড় (নম্বরগুলি ১০ লক্ষ গজ হিঃ)
১৮৭৯—৮৪	৫৪.৯	৪·৪
১৮৮৪—৮৯	৭৭	১৫.৪
১৮৮৯—৯৪	১১১.৫	৪১
১৮৯৪—৯৯	১৭১.৫	১৮২
১৮৯৯—১৯০৪	২০৬.৫	৪২৭.২
১৯০৪—০৯	২৫৭.৮	৬৯৮
১৯০৯—১০	৩৬৪.৪	৯৪০.১
১৯১০—১১	৩৬০.৯	৯৫৫.৩
১৯১২—১২	২৮৯.৯	৮৭১.৫
১৯১২—১৩	৩১১.৭	১, ০২১.৮
১৯১৩—১৪	৩৬৮.৮	১, ০৬১.২

ইতিমধ্যে কাঁচা পাটের রপ্তানিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৫৫০,০০০০ হনড্রেড ওয়েট কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৭৯—১৮৮০ কাঁচা পাটের রপ্তানি ৭৫০০০০০ হনড্রেওয়েট মাত্র ছিল। কাঁচা পাটের দাম ক্রমশঃ উঠিতেছে। ১৯০৭—৮ খৃষ্টাব্দে যে বেলের পাটের দাম ৪২৲ টাকা মাত্র ছিল, ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে সেই বেলের পাটের দাম দাঁড়াইয়াছিল, ৭৬৲। ইহাই পাটের Record Sale.

ভারতে আর একটি দ্রব্য ক্রমশঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। সেটি কাগজ। ভারতবর্ষের বাসিন্দারা এখন আর ভূর্জ্জপত্রে লিখে না। পূর্ব্বে মহাভারতের ন্যায় প্রকাণ্ড গ্রন্থও ভূর্জ্জপত্রে লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু এখন কাগজ না হইলে কাহারও চলে না। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে আমরা ২৩৯ লক্ষ মুদ্রার কাগজ

ব্যবহার করিয়াছি। কাজেই আমাদের কলের কাগজের প্রয়োজন আছে। গত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে মোট কাগজের কল ছিল নয়টি। এই নয়টির মধ্যে তিনটি বাঙ্গালায়, চারিটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে, একটি যুক্ত রাজ্যে, এবং একটি গোয়ালিয়র ষ্টেটে অবস্থিত আছে। এই সমস্ত কলে ৫৪ লক্ষ টাকা ফেলা (Invested) হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই সমুদয় কল হইতে ৮১৫ লক্ষ টাকার, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৭৭ লক্ষ এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৮০ লক্ষ টাকার কাগজ প্রস্তুত হয়। এই সময়ে য়ুরোপে প্রস্তুত শস্তা দরের কাগজ আমাদের দেশে আমদানি হয়। তাহাতে আমাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে। এই আমদানি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। নিম্নে বিদেশ হইতে আনীত ও এ-দেশে প্রস্তুত কাগজের একটি তুলনামূলক তালিকা দিলাম ঃ—

সাল	ভারতে উৎপন্ন কাগজ (মূল্য)	বিদেশী কাগজ (মূল্য)
১৯০৯	৭৯,১২,০০০৲	১০,০৩,০০০৲
১৯১০	৮১,৫২,০০০৲	১১,০০৬,০০০
১৯১১	৮০,০৪০০৲	১১,৬১২,০০০
১৯১২	৭৭,০৬,০০০	১৩,৫৪৩,০০০
১৯১৩	৮০,৩৭,০০০	১৪,৯০০,০০০

ভারতবর্ষ কখনই পশমের জন্য বিখ্যাত ছিল না। ছাগ, চামরী প্রভৃতি পশুলোমে কাশ্মীরে ও পঞ্জাবে হাতের তাঁতে গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত হইত। ভারতে উৎকৃষ্ট পশম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কখনই পাওয়া যাইত না। পশমের ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া কতিপয় য়ুরোপীয় বণিক কা কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহারা অষ্ট্রেলি সূক্ষ্ম পশমের সহিত ভারতের নিকৃ পশম মিশ্রিত করিয়া সৈনিকগণের জন্য এ গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন। সমগ্র ভা সাতটি পশমের কল দেখিতে পাওয়া যা তাহাদের মধ্যে মহীশূর ষ্টেটে একটি কা এল্‌গিন ও লালিম্‌লি নামক দু এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবওয়ালের প মের কলই সমধিক প্রসি নিম্নে ভা জাত ও বিদেশ হইতে আনীত পশ কাপড়ের তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

সাল	ভারতে প্রস্তুত (মূল্য)	বিদেশ হইতে দা (মূল্য)
১৯০৯	৪৩২৫০০০৲	২০১৮৫০০
১৯১০	৪৭২০০০০৲	২৯২৯৭০০
১৯১১	৫১০৪০০০৲	৩৪৫৪৩০০
১৯১২	৫৩৮৩০০০৲	৩০৪৪২০০
১৯১৩	৬১৬৬০০০৲	৩৮৪১২০০

আমরা কিছু কিছু কম্বল ও কারপে ইত্যাদি পশমীদ্রব্যও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকি। কোন্ বৎসরে ক টাকার দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে, নি তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

	টাকার দ্র
১৯০৯ সালে	২০৬৮০০০ ,,
১৯১০ সালে	২৪৫৫০০০ ,,
১৯১১ সালে	২৪৪৮০০০ ,,
১৯১২ সালে	২২৬২০০০ ,,
১৯১৩ সালে	২২৩০,০০০ ,,

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

স্রোতের ফুল

(৪২)

বিপিন মালতীকে উপেক্ষা করিয়া গুহায় গিয়া রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা বাহির রুদ্ধ করিয়া আসিতে পারিল না। গুহার মধ্যেকার নিরেট অন্ধকার একখানা প্রকাণ্ড কালো পাথরের মতো তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল; অসহায় সে একা, তাই সহস্র চিন্তা তাহার মন ছেঁকিয়া ধরিতে লাগিল। মালতী কার ছবি বুকে করিয়া কাঁদিতেছিল? মালতীর জন্য সে পিতামাতার স্নেহ-স্বর্গচ্যুত; নিরাশ্রয় সন্ন্যাসী হইয়াও সে মালতীর চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে নাই; সে যে নির্জ্জন গুহায় তপস্যা করিতে আসিয়া শুধু মালতীরই ধ্যান করিতেছে। আর মালতী?—সে কাহার অনুরক্ত, কাহার বিরহে তাহার এত আকুলতা, অশ্রুজলে সে কাহার স্মৃতির তর্পণ করে? বিপিনের মন নানা সন্দেহে নানা আশঙ্কায় পীড়িত হইতে লাগিল—কেন সে জানিয়া আসিল না সে ছবিখানি কার! বিপিন বৃশ্চিকদষ্ট বন্দীর মতো ছটফট করিতে লাগিল—এত কষ্ট, এমন কষ্ট, জীবনে সে কখনো ত পায় নাই। বিপিন গীতা পাঠে মন দিল—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি॥

মালতীরও বুকে বড় ব্যথা বাজিয়াছিল। তাহাকে অপমানের মুখে অসহায় ফেলিয়া বিপিন অক্লেশে চলিয়া যাইতে পারিল! পুরুষ মাত্রেই কি এমনি নির্ম্মম, এমনি নিষ্ঠুর, এমনি হৃদয়হীন! কোনো পুরুষ ত তাহাকে কখন এতটুকু করুণা করে নাই। শান্তি যদি না থাকিত তবে তাহার লজ্জা ঢাকিত কে? সে বড় বিশ্বাস করিয়া বিপিনের সঙ্গে আসিয়াছিল—নবকিশোর থাকিলে তাহার প্রতি এই অপমান কখনো সে নীরবে সহ্য করিত না। মালতীর নবকিশোরের উপর দারুণ রাগ হইতে লাগিল—কেন সে বিপিনকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল না, কেন সে বিপিনকে এমন করিয়া বহিয়া যাইতে দিল!

গুরু প্রেমানন্দের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আপনার কাছে আপনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, আপনার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া দুর্ব্বল সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। গুরু সঙ্কল্প করিলেন তিনি তীর্থপর্য্যটনে যাইবেন। বিলম্ব করা নয়, শীঘ্রই।

গুরু দীর্ঘকালের জন্য তীর্থপর্য্যটনে যাইবেন, শিষ্যশিষ্যারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ বিমর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি সর্ব্বক্ষণ গুরুর কাছে-কাছেই তাঁহার সেবা করিয়া ফিরিতেছে। মালতী আবার একাকী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার প্রাণে কেমন একটা মুক্তির আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল; এই আশ্রমে কিছুদিন অন্তত

গুরু থাকিবেন না, বিপিন কিছুদিনের জন্যও প্রেমানন্দের প্রভাব হইতে বিযুক্ত হইবে, এই সম্ভাবনাতেই মালতীর মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

কাল প্রত্যুষে প্রেমানন্দ তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিবেন। সমস্ত দিন তিনি ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান পূজা করিয়া তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া লইতেছিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে সমস্ত শিষ্যশিষ্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়া গুরু আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। কেবল মালতী আশীর্ব্বাদ লইতে বা গুরুকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিতে আসিল না। বিপিন ত গুহায় বদ্ধ। কিসের একটা উত্তেজনা গুরুর চিত্ত আলোড়িত করিতেছিল —তাহার সংঘাতে তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত ও অবস্থা বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেমানন্দ বুকের উপর দুই হাত শৃঙ্খলিত করিয়া দীর্ঘ ঋজুভাবে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

রাত্রি গভীর নিশীথ হইয়া গেল তবু তাঁহার পায়চারির বিরাম নাই; একবার ঘর হইতে লাইব্রেরী-ঘরে, আবার লাইব্রেরী-ঘর হইতে ঘরে, বারবার ধীরে ধীরে গতায়াত চলিতে লাগিল; মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি উদাস লক্ষ্যহীন।

স্তব্ধ গভীর নিশা। ঘরের মধ্যে একটা ঘড়ী মুহূর্ত্ত গণিতেছে, পাশের ঘরে মালতীর নিশ্বাস পতনের শব্দ শোনা যাইতেছে; মর্ম্মরসোপানে গঙ্গাজলের মর্ম্মর শব্দ প্রেয়সীর কানে প্রণয়গুঞ্জনের মতো হিমভরা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। গঙ্গার পরপারে একটা কুকুরের চীৎকার-শব্দ জলের উপর দিয়া গড়াইয়া এপারে আসিতেছিল। আ কোথাও কেনো প্রাণের সাড়া নাই প্রেমানন্দ বেড়াইতে বেড়াইতে এক-একবা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া তাহা শুনিতেছেন।

হঠাৎ মালতীর ঘরের অর্গলহীন কপা উন্মুক্ত হইয়া গেল। কপাটের ফাঁক দি লাইব্রেরী-ঘরের প্রদীপের স্বর্ণকিরণ সোনা সূতার জালের মতন বাতাসে ভাসিয়া গি মালতীর মুখে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রেমানন্দ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধনে দেখিলেন মালতী ঘুমাইতেছে। নগ্ন বালিশে তাহার মাথাটি ডুবিয়া গেছে খোঁপাতে চাপ লাগিয়া মুখের চারি ধারে চুলগুলি ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর প্রদীপের সোনালি আলো আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে,—যেন জলের উপর বড় একটি পদ্মফুল অরুণা লোকে পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বুকের উপর শ্লথবাস নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ঢেউয়ের মতো দুলিতেছিল, যেন ঊষারাণি ফুলের বনে নিদ্রামগ্ন।

প্রেমানন্দ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যতই ঐ মুখ তাঁহার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাঁহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমশ অবশ হইয়া চারি-দিকের হাল্কা হাওয়ার সহিত মিশাইয়া যাইতে লাগিল;—বিশ্বজগতের মধ্যে কিছুই আর রহিল না, রহিল শুধু তাঁহার অচপল দৃষ্টি আর ঐ নিদ্রামগ্ন মুখখানি। তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রেমানন্দের মন

তে বিপিন, গুরুগিরি, আশ্রম, শিষ্য, শ্বরব্রহ্মাণ্ড তিরোহিত হইয়া গেল, তাঁহার ন হইতে লাগিল, অনন্ত দেশকালের ীয় সৌন্দর্য্যের শতদলের মাঝখানে তিনিই ধু ভক্ত উপাসক মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো কাকী দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বসৌন্দর্য্যের রাসার, চুনির পেয়ালার ন্যায় মালতীর ধরপুটে, তাঁহারই জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে; প্রমানন্দের ইচ্ছা হইতে লাগিল তাঁহার াজন্মের উন্মাদ পিপাসা এক চুমুকে মিটাইয়া াতাল হইয়া উঠেন। কে বলিতে পারে ই প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালবর্ত্তী প্রণয়-াগণ প্রাণ এই গভীর নিশীথে চুম্বন-ুনিঙ্গ লাভ করিয়া চকমকির আগুনে ালার মতো জ্বলিয়া না উঠিবে? প্রমানন্দের হৃদয় গুরু স্পন্দিত হইতে াগিল, আগ্রহ ও অপেক্ষার মধ্যে মন ান্দোলিত হইতে লাগিল, ইচ্ছা হইতে লাগিল সেই মোমের মতো নরম নমনীয় সুন্দর ারীটিকে দুই বাহুর নিবিড় চাপে একেবারে নিঙাড়িয়া ফেলেন। এই নীরব নিস্তব্ধ নিশীথে সৌন্দর্য্যের পদতলে আপনাকে নঃশেষে নিবেদন করিয়া স্থান।

এমন সময় নিদ্রাঘোরেই প্রেমানন্দের প্রতপ্ত বাসনার উদ্যত আক্রমণ অনুভব করিয়া মালতী মুখ অপ্রসন্ন করিয়া একবার পাশ ফিরিল—চোখে আলো াগিতেই পরক্ষণেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া ঘরের একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। চোখে আলো লাগাতে এবং হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দকে স্তব্ধ লুব্ধ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মালতীর মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, সে মূর্চ্ছিতপ্রায় দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তাহার মনে হইতেছিল, অন্ধের গৃহে আগুন লাগিলে সে যেমন প্রজ্বলিত গৃহ হইতে নিরাশ্রয় হওয়ার দুঃখে ও মুক্তির আনন্দে নূতন বিপদের আশঙ্কা না করিয়া পাগলের মতো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করে সেও তেমনি করিয়া এই আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে।

প্রেমানন্দ মালতীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মালতীর চোখ দুটি দুখানি ধারালো ছুরীর মতো তাঁহার বুকের রক্ত চুষিয়া খাইবার জন্য যেন উদ্যত হইয়া আছে। প্রেমানন্দ সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া আপনার ঘরে পলায়ন করিলেন।

ঘরে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বারান্দায় গিয়া প্রেমানন্দ ডাকিলেন—যোগানন্দ, শান্তি, আমার তীর্থযাত্রার উদ্যোগ কর।

বাহিরে তখন ঊষার গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড় বোনা হইতেছিল। দিঘীর জলে গাছের সবুজ ছায়া পড়িয়া তরল পান্নার মতো টলটল করিতেছিল। ছোট ছোটা শাদা শাদা মেঘ আকাশময় ছড়াইয়া আছে; তাহাদের উপর যখন প্রভাতারুণের চুম্বনরাগ ফুটিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন বিস্ময়-আনন্দে আকাশ রোমাঞ্চিত হইতেছে। প্রভাতের আগমন-সংবাদ ক্রমশ বিশ্বের বুকের মধ্যে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল,

গাছপালা যেন হাতপা মেলিতে লাগিল, পত্রে পত্রে শিহরণ খেলিয়া যাইতে লাগিল; কত নামগোত্রহীন ফুল সূর্য্যার্ঘ্য সাজাইয়া ফুটিয়া উঠিল, কত বিচিত্র মিশ্র গন্ধ বাতাস ভরিয়া তুলিল। বড় বড় নীল প্রজাপতি এক এক টুকরো আকাশভাঙা আনন্দের মতো ফুলে ফুলে নাচিয়া বেড়াইতেছিল, টিয়াপাখীগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, যেন সবুজ ঘাসের এক-একখানি ক্ষেত আকাশের গায়ে ভাসিয়া যাইতেছে। পল্লবের মরমর, ঝরণার ঝরঝর, গঙ্গার কলকল, কাকের কলরব যেন একতান সঙ্গীতে প্রভাতী নহবত বাজাইয়া তুলিতেছিল।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দিকে প্রেমানন্দের দৃষ্টি ছিল না। তিনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

(৪৩)

প্রেমানন্দ চলিয়া গেলেও মালতী অপমানের লজ্জায় স্তম্ভিত নিস্পন্দ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর দাবানল-দগ্ধ বন হইতে হরিণীর ন্যায় ত্রাসচঞ্চল হৃদয়ে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। লঘুক্ষিপ্র গতিতে নীচে নামিয়া একবার বিপিনের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল বিপিন গুহায় বদ্ধ, ঘরে নাই; আর ঘরে থাকিলেই বা কি? সে এই দুদিন আগে তাহার যাচিয়া-বলা দুঃখ-নিবেদন শুনে নাই, অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজই কি শুনিত? যে উপেক্ষা করে তাহার কাছে ভিক্ষার দীনতা স্বীকার করা নয়, আর নয়! কিন্তু জগতে তার আশ্রয়ও ত দ্বিতীয় আর কেহ নাই, না থাকে গঙ্গার গভীর ক্রোড় আছে, তবু বিপিনের কাছে দয়া ভিক্ষা আর নয়! তখন সে দ্রুতপদে বাগা নামিল; অন্ধকার শীতের রাত্রি—মাঠ কোয়াসায় আচ্ছন্ন, বরফের মতো কন ঠাণ্ডা, তাহার তলে বাগানের ঝোপ অন্ধকার বাড়াইয়া কালো কালো দৈত্যে মতো দাঁড়াইয়া আছে। মালতী এক আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল এ তারা পূর্ব্ব গগনে আগুনের ফুলের ম দপদপ করিতেছে, আর সমস্ত বিশ্বচরা শীতের ভয়ে কোয়াসার নীচের মুড়ি দি আকাশের অসংখ্য চোখটি নিবা নিশ্চিন্তনীরবে ঘুমাইতেছে। কোথ জীবনের এতটুকু সাড়া নাই—গঙ্গার নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে অজগর সর্পের চি কৃষ্ণচর্ম্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিকি করিয়া উঠিতেছে। দীঘির কালো প্রকাণ্ড দৈত্যের বড় একটা চোখের ম সজল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আ যেন তাহাকে চোখের ইসারায় ডাকিতেছে মালতীর মনে হইল এমন জীবন্ত গ থাকিতে পুকুরে ডুবিয়া মরিব কেন, জী দিব যদি ত জীবনস্রোতেই ঢালিয়া দিব সে দ্রুতপদে গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে ফিরিয়া পলায় করিল—অত ভোরে কে একজন গঙ্গায় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে মালতী এক দৌড়ে একেবারে বাগা

বাহিরের রাস্তায় গিয়া

হইয়া
।
পথ নির্জ্জন নিঃশব্দ। মধ্যে মধ্যে
কুর চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।
কিনী এই পথে চলিতে মালতীর
ছমছম করিতে লাগিল, প্রতি পদ-
গে বিপদের আশঙ্কা তাহাকে সচকিত
য়া তুলিতেছিল, কিন্তু সে যে প্রেমা-
র আশ্রম হইতে মুক্তি পাইয়াছে এই
ব তাহার নূতন বিপদের ভয়ও তুচ্ছ
ধ হইতেছিল। সে জানে না কোথায়
যাইতেছে, কোথায় সে যাইতে চাহে।
সে যে সকলের অজ্ঞাতসারে আশ্রম
তে বাহির হইয়া পড়িতে পারিয়াছে
াতেই সে যেন মুক্তির আনন্দ বোধ
রিতেছিল, বাহিরের বাতাস হাল্কা বোধ
তে লাগিল, মাঘ মাসের ভোরের হিম-
র বায়ুর নিষ্ঠুর স্পর্শও তাহার নিকট
াশ্রমের আরাম-শয্যা অপেক্ষা সুখকর
বোধ হইতে লাগিল। সে যেন লঘুচরণে
ড়িয়া চলিতেছিল, পথের বুকে শিশিরের
ানা ভাঙিয়া তাহার পায়ের দাগ যেন
াটিতে পড়িতেছিল না।

সে জানে না কোন্ পথে কোন্ দিকে
াইতে হয়—কোন্ পথ কোন্ অজানা বিপদের
দিকে না জানি তাহাকে লইয়া যাইবে।
তবু সে শুকতারাটিকে সম্মুখে রাখিয়া
বরাবর ছুটিয়া চলিয়াছিল,—শুকতারাটি
সম্মুখে রাখিয়া চলিলে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া
যেখানেই গিয়া পড়ুক আশ্রম হইতে দূরেই
চলিয়া যাইবে। মালতী ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে
চলিতে এক-একবার ফিরিয়া ফিরিয়া
দেখিতেছিল কেহ তাহাকে ধরিতে আসিতেছে কি না, কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে কি না। তাহার মনে হইতেছিল এতক্ষণ হয়ত আশ্রমে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে, হয়ত সকলে দলে দলে লণ্ঠন লইয়া তাহাকে খুঁজিতে ছুটিয়াছে, তাহারা আসিল বলিয়া, ধরিল বলিয়া। প্রত্যেক ঝোপঝাড় তাহাকে চমকিত করিয়া তুলিতেছিল, পথের ধারে সামান্য একটু শব্দ তাহাকে আতঙ্কিত করিতেছিল। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল যে অন্বেষণকারীরা এতক্ষণে হয়ত তাহার খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এখনি আসিয়া তাহারা তাহাকে ধরিবে, লাঞ্ছনা করিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে আশ্রমে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিবে, আবার প্রেমানন্দের গঞ্জনা ও জঘন্য ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে। এই কথা যতই তাহার মনে হয়, ততই সে দ্বিগুণ বেগে ছুটিতে থাকে; তাহার অনভ্যস্ত চরণ ক্লান্ত হইয়া বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, রাস্তার কাঁকরে কোমল চরণতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তবু তাহার গমনে বিরতি ছিল না।

ক্রমে ফর্সা হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের যবনিকা পশ্চিমদিগন্তে গুটাইয়া যাইতে লাগিল। কোকিল জাগ্রত হইয়া আম্রকুঞ্জে তন্দ্রাজড়িম কণ্ঠে কুহুরিয়া উঠিল, দোয়েল শ্যামা বুলবুল শিশের একতান ঝঙ্কারে প্রভাতী বন্দনা গাহিতে লাগিল। পথপার্শ্বে ঘাসের শীষে শিশিরকণাগুলি অরুণচুম্বনে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তখনো রাস্তার ধারের গাছগুলা শীতের জড়িমায়

নিজেদের পল্লীবাবরণের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ভোরের বাতাসে হিহি করিতেছে; পাড়ার চালে চালে তখনো কুয়াসা কুণ্ডলী পাকাইয়া স্থির হইয়া ছিল, যেন বড় বড় হাঁসগুলি বসিয়া বসিয়া ডিমে তা দিতেছে। তখনো কোনো গৃহে জাগরণের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। ক্রমে পথে দুএকজন লোক দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা একজন অপরূপ রূপসীকে একাকিনী যাইতে দেখিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মালতী আপনাকে যথাসম্ভব সমাবৃত করিয়া কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু বুকের মধ্যে তাহার ভয় তোলপাড় করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে রৌদ্র উঠিল; পথের ধারে ধারে নরনারী রৌদ্রে পিঠ দিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া সেবারকার কনকনে শীত আর প্রচুর আমের ফসলের সম্ভাবনা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু মালতীর আবির্ভাবে তাহাদের আরব্ধ আলাপ থামিয়া যাইতেছিল, সকলেই অবাক দৃষ্টিতে মালতীকেই দেখিতেছিল এবং মালতী তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে না-হইতে তাহার সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা অনুমান আলোচনা আরম্ভ করিতেছিল। মালতী এসমস্তই অনুভব করিতেছিল বলিয়া আপনাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। একজন শিউলী বাঁকের দুধারে অনেকগুলি খেজুর-রসের ডাবরি লইয়া একগাছের তলা হইতে অপর গাছের তলায় রসসংগ্রহের জন্য হনহন করিয়া চলিয়া গেল; তাহার পিঠের কোমরে কাপড়ের মধ্যে একখানা গোঁজা; গলায় গাছে উঠিবার জন্য দড়ি জড়ানো। সে বাঁকের বাঁ করিয়া রাস্তা জুড়িয়া চলিতেছিল, একপাশ হইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া অল্প অগ্রসর হইয়াই মালতী এক দেখিল কয়েকজন রমণী রোদ পোহাইতে পোহাইতে পরস্প মাথার উকুন বাছিতেছে; একটি আ বর্ণা বালিকা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড় আছে, তাহার কোমরে একহাতে একটি ধামির মুড়কি খাইতেছে, আর শীতে তাহার ঠোঁটটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে; বালকের গায়ে দোলাই পিছনে গিট বাঁধা—জগদ্ধাত্রী-মূর্তির নিশ্চল দাঁড়াইয়া মধ্যে মুড়িমুড়কির ধামির দিকে লোলুপ হানিতেছে। একটি শিশু উকুন-বাছি ব্যস্ত জননীর হাতের পাশ দিয়া মা গলাইয়া স্তন্যপান করিতে লাগিয়া গিয়াছে নিকটেই একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকা শুইয়া, আর একটা বিড়াল লেজ খাড় করিয়া দোলাই জড়ানো ছেলেটির পা গা ঘসিয়া ঘসিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ঘরর-ঘরর শব্দ করিয়া নিজেকে একটুখানি উষ্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মালতী দেখিল সম্মুখেই রেল-লাইন তখন সে রাস্তা ছাড়িয়া রেল-লাইনে গিয়া উঠিল এবং রেল-লাইন ধরিয়া ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হাতে তাহার

নাই, ষ্টেসনে গিয়া কি হইবে, এ তখনো তাহার মনে উঠে নাই— ধু ভাবিতেছিল, রেলে উঠিতে পারিলে মহুর সে প্রেমানন্দের কবল হইতে ণ পাইয়া বাঁচিবে। সম্মুখে সুদূর- ত রেল-লাইনগুলি যেন তাহাকে ার উদ্দেশে আহ্বান করিয়া ইঙ্গিত তেছে। প্রভাত-রৌদ্র হিমসিক্ত রেলের গড়িয়া চকচক করিতেছে, সঙ্কেত- র মাথায় স্থানের লাল সবুজ কাচে লাগিয়া লোহিত হরিৎ সূর্য্যমূর্ত্তি চোখে ক হানিতেছে।

এই-সব দেখিতে দেখিতে মালতী নের প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া উঠিল। অমনি ার দৃষ্টি গাড়ল তাঁহার শিষ্যদের পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন ানন্দ। মালতী তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে কার করিয়া উঠিল—সে ব্যাধবেষ্টিত ীর ন্যায় কোন্ পথে যে কোথায় াইবে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

প্রেমানন্দ তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দর হইয়া আসিয়া বলিলেন—রাধারাণী, মি তীর্থে চলেছি; কবে ফিরব, ফিরব না, ঠিক নেই। তুমি কোথায় যাবে , যোগানন্দ টিকিট করে তোমায় সেই ীতে তুলে দেবে।

মালতী ক্ষণেক অবাক হইয়া প্রেমানন্দের খর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আমি কাশী—না, কলকাতা যাব।

প্রেমানন্দ বলিলেন—বেশ, তাই হবে।

মালতীর আবির্ভাবে প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত ত্রী বাবুর দলে সাড়া পড়িয়া গেল। যেমন গঙ্গার মাঝখান দিয়া ষ্টিমার চলিয়া গেলে তাহার আন্দোলন দুই তটকে স্পর্শ করে, তেমনি মালতী বাবুদের জনতা ভেদ করিয়া যাইবার সময় দুধারের হৃদয়ে আন্দোলন নাচিয়া উঠিল। মালতী দৃপ্ত অটল গতিতে গিয়া মেয়েদের অপেক্ষা কক্ষে প্রবেশ করিল।

কলিকাতা যাইবার ট্রেন আসিলে যোগানন্দ মালতীকে মেয়ে-কামরায় তুলিয়া টিকিট দিয়া গেল। মালতী জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল—রেল-লাইনের ধারে ধারে রেল-কর্ম্মচারীদের, কুলিদের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাসা ও বাড়ী; কোনো বাড়ীর জানালায় একটি বধূ দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও ছেলেরা দাণ্ডাগুলি খেলিতেছে, কোথাও খর্জ্জুর তাল নারিকেল শজিনাবৃক্ষে বেষ্টিত ডোবায় রমণীরা স্নান করিতেছে, বাসন মাজিতেছে, জল্পনা করিতেছে, কলহ করিতেছে; রেলের ধারে কুলিরা কাজ করিতেছে। গাড়ী হুসহুস করিয়া প্রকাণ্ড অজগরের মতো এত বড় প্রাণের বোঝা উদরে বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু নিত্যকার ব্যাপার বলিয়া অভ্যাসবশত কেহই তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছিল না। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে মাঠে বেগুন, কপি, মটর, আর রবি শস্যের ক্ষেত; গোরু ছাগল চরিতেছে, রাখাল গান গাহিতে গাহিতে থামিয়া চলিষ্ণু গাড়ীর আরোহীদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে এবং এই অর্থহীন আচরণেই অপর্য্যাপ্ত কৌতুক তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। মালতী দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল, সকলেরই আশ্রয় আছে, কাজ

আছে, আনন্দ আছে; সেই কেবল নিরাশ্রয়, জগতের জঞ্জাল।

গাড়ীর দুপাশে কত বাড়ী, বাগান, ক্ষেত খামার, কলকারখানা বায়োস্কোপের ছবির মতো ক্ষণিকের জন্য দর্শন দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া সরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে গাড়ী আসিয়া শিয়ালদহে পৌছিল। একদণ্ডে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম্ম জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। আবার দেখিতে দেখিতে জনতা পাতলা হইয়া গেল। তখন মালতী নামিয়া একখানা ঠিকা গাড়ীতে, যে প্রথমে তাহাকে ডাকিল তাহাতেই, ভাড়া ঠিক না করিয়াই চড়িয়া বসিল। গাড়োয়ান দরজা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে?

মালতী বলিল—চোরবাগান।

গাড়োয়ান দুই হাতে ঘোড়ার রাশ আছড়াইয়া হেই হেই টকাস টকাস শব্দ করিতে করিতে ও পাদানিতে পা ঘসিতে ঘসিতে অশ্বিনীকুমার যুগলকে গমনে উৎসাহিত করিতে করিতে রওনা হইল।

গাড়ী নবকিশোরের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতী গাড়োয়ানকে গাড়ীর কড়া নাড়িতে বলিল। গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর কড়া নাড়িতে লাগিল। নবকিশোর দরজা খুলিয়াই মালতীকে গাড়ীতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—মালতী! তুমি একলা?

মালতী নবাকশোরের মুখের দিকে করুণ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমি চলে এসেছি।

—কেন? হয়েছে কি?

মালতী অঞ্চলে চক্ষু আবৃত ক কাঁদিয়া ফেলিল।

নবকিশোর অবাক হইয়া মা ক্রন্দন দেখিতে লাগিল; কি হ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটিও সা কথা বলিতে পারিতেছিল না।

বাহির হইতে গাড়োয়ান চীৎকার ক —ওগো বাবু, সোয়ারি নামিয়ে ল গো! হামি কি সারা রোজ খাড়া থা

নবকিশোর তাড়াতাড়ি গাড়ীর দ খুলিয়া মালতীকে বলিল—তুমি বা ভিতর যাও।

মালতী নামিয়া গেল নবকিশোর গা য়ানকে জিজ্ঞাসা করিল কত ভাড়া?

গাড়োয়ান বলিল—দো রুপেয়া ভাড়া আব আপনে কি রুপেয়া দো রুপেয়া দেবে হামি ভি মাঙ্গব? সিয়ালদা সে চোরবা ত বারে আনা হিসাব রোজ আছে।

নবকিশোর দ্বিরুক্তি না করিয়া ব আনা পয়সা দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় দি

ইত্যবসরে মালতী বস্ত্রসংবরণ ক মুখ মুছিয়া বসিয়া ছিল। নবকিশো ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মালতী সন্ধ্যম বর্ষণ সন্ধ্যাশ্রীর মতো দীপ্ত বিষণ্ণতার প্র মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া আছে। সে সস্নে জিজ্ঞাসা করিল—মালতী, বিপিন ভা আছে ত?

মালতী ঘাড় নাড়িল। তখন নবকিশো অধিকতর বিস্মিত হইয়া ধাঁধায় পড়ি গেল। কি জিজ্ঞাসা করিবে ঠিক করিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তুমি এক এলে যে?

মালতী গম্ভীর ভাবে বলিল—আমি কাউকে বলে আসিনি।

এ উত্তরে নবকিশোরের নিকট সমস্যার সমাধান না হইয়া বরং সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল। সে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাউকে না বলে একলা চলে এলে, ব্যাপার কি?

—গুরুর অত্যাচারে আমার সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

মালতী একে একে সমস্ত কথা সংক্ষেপে নবকিশোরকে বলিল। নবকিশোর শুনিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল—বিপিনকে এ কথা জানাওনি কেন?

—জানাতে চেষ্টা করেছিলুম, তিনি শোনেন নি। .....তারপর গুরুর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠতে কাল রাত্রে গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলুম, তাতেও বাধা পড়ল। মাসিমার কাছেই যেতুম, কিন্তু ঐদিকে প্রেমানন্দ যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে যেতে সাহস বা প্রবৃত্তি হল না। তাই আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে মাসিমার কাছে দিয়ে আসুন।

গম্ভীরভাবে নবকিশোর বলিল—পালিয়ে এসে কাজটা ভালো করনি মালতী। ... তোমায় ফের আশ্রমে ফিরে যেতে হবে। মানুষের মনের মধ্যে স্বাভাবিক একটা আরাম-স্পৃহা আছে, যাতে করে সে সহজে শান্তিকে ঘাঁটিয়ে গণ্ডগোল বাধাতে চায় না; সেইজন্যে সে জেনে শুনেও মিথ্যাকেও সহজে অবিশ্বাস করতে চায় না। বিপিনের এই বিশ্বাস তোমাকেই ভাঙতে হবে।

মালতী রুদ্ধমুখী হইয়া বলিল—আপনিও আমায় ত্যাগ করবেন? তবে কি আমার মৃত্যু ভিন্ন আর গতি নেই?

নবকিশোরের হৃদয়বীণার প্রণয়তন্ত্রীর কোমল পর্দ্দায় আঘাত করিয়া মালতীর এই কথা কটি একটি করুণ রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিল। নবকিশোর বলিল—বিপিনকে ছেড়ে গেলে, বিপিনের সঙ্গে মিলনে তোমার ব্যাঘাত ঘটবে।

হতাশার করুণ রাগিণী বাজাইয়া মালতী বলিল—সে আশা সে আকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই। কোথাও একটু নিরুপদ্রবে থাকতে পেলে বেঁচে যাই। আপনি আমায় মাসিমার কাছে রেখে আসুন।

—আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, সে মিথ্যে কথা, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই অভিমান অমন ছলনা করছে। এই উপদ্রবের ভিতর দিয়েই নিরুপদ্রব হবার সূচনা হয়েছে। একদিন না একদিন বিপিনের মোহ কাটবে, ...সেদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে তোমায় বিপিনের কাছে থাকতে হবে।.....তুমি মরতে পাবে না, পালাতে পাবে না, সকল অত্যাচার থেকে আপনাকে রক্ষা করে বিপিনকে সেই-সব অত্যাচারের আঘাত দিয়েই সচেতন করে তোলা তোমার এখনকার কর্ত্তব্য হবে।.....এই যে তুমি আমার কাছে এসেছ, এতে তোমার কাজ অনেকখানি পিছিয়ে গেল। ভারি ভুল করেছ, তুমি চলে না এসে যদি বিপিনকে আর-একবার একটা নাড়া দিয়ে দিতে তাহলে এতক্ষণে তার সকল মোহ ঝরে পড়ত; তোমরা দুজনে একসঙ্গে আমার কাছে এসে হেসে বলতে পারতে, বন্ধু, অনেক তুফান

কাটিয়ে আমরা আজ মিলতে পেরেছি। .....আসবে সেদিন শীগগির আসবে, তুমি কিছু ভেব না। এখন চল। আর বিলম্ব নয়।.....তোমার খাওয়া হয়নি, না? চট করে স্নান করে খেয়ে নাও, আমি গাড়ী ডেকে আনি। (আগামী বারে সমাপ্য)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ইতিহাস*

(আলোচনা)

বোধ হয় স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন গবেষণার আশ্রয় লইয়া বাঙ্গালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস ছাড়া আর যতগুলি বাঙ্গালার বা ভারতবর্ষের ইতিহাস বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হইত তাহাদের প্রায় সকলগুলিই ইংরেজী পুস্তকের তরজমা। ইদানীং বঙ্গীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বদেশের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সাধনার ফলস্বরূপ সম্প্রতি দুইখানি ইতিহাস-গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। একখানি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়-রাজমালা, অপরখানি এই আলোচ্যমান রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস।

যে সকল বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রাচীন লিপিবিদ্যায় একজন প্রকৃষ্ট পণ্ডিত, কাজও করেন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে; ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম এবং বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। এতাদৃশ ব্যক্তি ইতিবৃত্ত প্রণয়নে হস্তার্পণ করিলে তাহা যে অতি শোভন হইবে এটা বলাই বাহুল্য।

আলোচ্য পুস্তকখানিকে রাখাল বাবু যদি "বাঙ্গালার ইতিহাস" না বলিয়া "ভারত-বর্ষের ইতিহাস" বলিতেন, তাহা হইলেই বোধ হয় যথার্থ কথা বলা হইত। তিনি যেভাবে ভারতময় শিল্পলিপি ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আর একটু বাড়াইলেই সমগ্র 'ভারতের প্রাচীন ইতিহাস' রূপে এই গ্রন্থ পরিগণিত হইতে পারিত। ভিন্‌সেণ্ট এ, স্মিথ কৃত আর্লি হিস্টরি অব্ ইণ্ডিয়া (প্রাচীন ভারতেতিহাস) গ্রন্থে ইহার অধিক দুএকটি অধ্যায়ে দুই চারিটি বেশী কথা বলা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় গৌড় রাজমালায়ই সংক্ষেপে বঙ্গ (গৌড়-মগধ) রাজ্যের ঈদৃশ

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। প্রথম ভাগ, মূল্য ২৷৷০

ইতিহাস লিখিয়াছেন; সুতরাং এক্ষেত্রে না চলিয়া রাখালবাবু বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেই ভাল হইত।

স্বদেশের ঐতিহাসিক উপকরণ সম্বন্ধে তিনি উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। যে মহাগ্রন্থ উপলক্ষ করিয়া "ইতিহাস" শব্দটি সংস্কৃত অভিধানে ব্যবহৃত হইতেছে সেই মহাভারতেরই ঐতিহাসিকতা তর্কের বিষয় মনে করিয়া রাখালবাবু উহা পরিহার করিতেছেন। (১) ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই, "ইতিহ" পারম্পর্য্যোপদেশ অর্থাৎ লোকপরম্পরায় যাহা চলিয়া আসিয়াছে। "আস" আসন, স্থান। যাহাতে লোক-পরম্পরাগত উপদেশ স্থানলাভ করিয়াছে। রাখালবাবু গোঁড়ামি করিয়া ইতিহাসের এই শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করিবেন, অথবা মহাভারতের অনুস্বার-বিসর্গকেও আধুনিক 'ইতিহাস' বলিয়া গণনা করিবেন, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু শুধু তর্কের বিষয় বলিয়া মহাভারতকে বর্জ্জন করিবেন, এটা তাঁহার কাছ হইতে আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি নাই। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা উপলক্ষে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন রাখালবাবু অবশ্যই তাহা দেখিয়াছেন। তবে অন্ততঃ বঙ্কিমবাবুর মতটার অসমীচীনতা দেখাইয়া দিয়া এইরূপ বর্জ্জন করিলে শোভন হইত। মহাভারতেরই যখন এই অবস্থা, 'পুরাণ'ও যে রাখালবাবুর নিকট সমাদরণীয় হইবে না, তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নহে। (২) কিন্তু সুখের বিষয়, পুরাণেও যে ইতিহাসের উপাদান আছে, আধুনিক অনেক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইতেছে। তারপর জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় রাখালবাবু—কেবল তিনি কেন, ইংরেজী-শিক্ষিত প্রায় সকলেই—স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে এই ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি পূর্ব্বে ছিল না। আর্য্যেরা মধ্য এশিয়া—অথবা বল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী কিংবা এতাদৃশ অপর কোনও স্থান হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। এটা ভাষাতত্ত্ব-আলোচনাকারি-গণের অনুমান হইতে প্রচারিত হইয়াছে—কোনও শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, গ্রন্থ ইত্যাদিতে এ বিষয়ের ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। বরং এদেশের বেদ পুরাণ ইতিহাস সংহিতা প্রভৃতিতে ইহার বিপরীত কথাই পাওয়া যায়। এতদিন একতরফা বিচারই চলিতে ছিল। সুখের বিষয় অধুনা উল্টা দিক্‌টার আলোচনাও হইতেছে, এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রমুখ দুই একজন লেখক ভারতবর্ষই যে আর্য্যজাতির সনাতন আবাসভূমি তাহা প্রমাণিত করিতেছেন। আমার সবিনয় অনুরোধ, রাখালবাবুর ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিগণও কেবল ইংরেজ গ্রন্থকার-গণের কথা উদ্ধৃত না করিয়া স্বয়ং

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, পরিশিষ্ট (ক) ২৬ পৃষ্ঠা।

(২) পরিশিষ্ট (খ) ৪৬পৃঃ। রাখালবাবু পার্জিটর সাহেবের গ্রন্থোল্লেখিত পুরাণের মাত্র দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বয়ং সেদিকে যান নাই।

দুইপক্ষ দেখিয়া যাহা হয় একটা মীমাংসা করিবেন। (৩)

একটি মাত্র কথা এতৎসম্পর্কে এস্থলে বলিব। পৌণ্ড জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে রাখালবাবু বলেন, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে" পাদটীকায় বলেন, "মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অদর্শনে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির বৃষলত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে পৌণ্ড্র গণের নাম আছে।" (৪) সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদ্ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।"

দেখা গেল ব্রাহ্মণাদর্শন এবং ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হইয়া পৌণ্ড্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক পূর্ব্বে আর্য্যনিবাস ও আর্য্যোচিত সংস্কারাদির সত্তা ঐ সকল জাতিতে বা তদধ্যুষিত স্থানে ছিল বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না কি? শনৈঃ শনৈঃ 'ক্রিয়া লোপ' হইতে যে কত সময়ের প্রয়োজন তাহাও ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার এই আকুঞ্চন-প্রসারণের স্পষ্ট নিদর্শন পূর্ব্ব-ভারতীয়-দ্বীপপুঞ্জ ও তৎ সমীপস্থ এশিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আজও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কি?

রাখালবাবু সমতট, শিলিচটল কমলাঙ্ক প্রভৃতির অবস্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। তিনি, "সমতট যদি বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম হয়" (৫) এই বলিয়া ফুটনোটে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের যে ইহাই মত তাহা বলিয়াছেন। নলিনীকান্ত বাবুর লিখিত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রবন্ধ পড়ি নাই। কিন্তু তল্লিখিত "পূর্ব্বাঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ" নামক প্রবন্ধ পড়িয়াছি। তাহাতে তিনি বলেন, "চট্টগ্রাম ত্রিপুরা নোয়াখালি বরিশাল ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলা লইয়া এই (সমতট) রাজ্য গঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কর্ম্মান্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল।" (৬) অতএব রাখালবাবু ঠিক যাহা বলিতে চান, নলিনীবাবু তাহা বলেন নাই। যাহা হউক এস্থলে নলিনীবাবুর অভিমত সম্বন্ধেও আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

"শিলিচটল" ও "কমলাঙ্ক" সম্বন্ধে ইউয়ান্ চুয়াং বলেন যে, শিলিচটল সমতটের পূর্ব্বোত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল এবং কমলাঙ্ক শিলিচটলের দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগে ছিল। শিলিচটল ও কমলাঙ্ক উভয়ই সমুদ্রের তীরে পর্ব্বতময় ভূভাগে অবস্থিত। ইউয়ান্ চুয়াঙ্

(৩) শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বোধ হয় এই মতটিতে একটা আশ্বাসের হেতু পাইয়াছিলেন; আফ্রিকা-আমেরিকার ইউরোপীয় উপনিবেশকারিগণ তদ্দেশীয় প্রাচীনতর অধিবাসীদিগকে "নেটিভ" বলেন—আমরা তাদৃশ "নেটিভ" নহি—আমরাও অন্যান্য দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতিকে তাড়াইয়া দিয়া এখানে উপনিবিষ্ট হইয়াছি!

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১৭—৩৮পৃঃ।

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৪৮ পৃষ্ঠা।

(৬) প্রতিভা, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা. ৩৮২ পৃঃ।

বলাতেই একদল প্রত্নতাত্ত্বিক সমুদ্র-নিম্ন ব্রহ্মে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ। কিন্তু ওয়াটার্স্ সাহেব বলেন, হইলে শ্রীহট্টের "পূর্ব্বদক্ষিণ" বলা চুয়াংএর উচিত ছিল; কিন্তু যাবতীয় যতগুলি পাঠ আছে সমস্তই তাহা "পূর্ব্বোত্তর" নির্দ্দেশ করিয়া; অতএব তাহা বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলা (৭) ওয়াটার্স সাহেবের এই হিন্‌সেন্ট্‌ও সমর্থন করিয়াছেন (৮) ওয়াটার্স সাহেব প্রকৃত স্থানের কাছি গিয়াছেন মাত্র। শিলিচটল দ্বারা যাহা বুঝায় বর্ত্তমান ত্রিপুরার উত্তরার্দ্ধ খণ্ডল বা সরাইল পরগণা সেই টুর অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ৺ রাজকৃষ্ণ গাধ্যায় ও ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির মতই ছিল; এবং ইহাই সমীচীন মত। বিষয়ে পূর্ব্বেও অন্যত্র বলিয়াছি, (৯) ও এস্থলে বলি, যে চীনদেশীয় যাত্রকের নিকট "শ্রীহট্ট" এই কট-মট টের নামটি 'শ্রীক্ষত্র' বলিয়া প্রতীত ছিল—তাহা আবার চৈনিক অক্ষরে শি-চ-ট-ল রূপে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট সমুদ্রতীরবর্ত্তী হইল কিরূপে? প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। রবার্ট লিণ্ডসে নামক জনৈক ইংরেজ ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট্ ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকা হইতে কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় পথের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে আছে—

"In passing my boat towards Sylhet, I had recourse to my compass, the same as in sea and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent". (১০)

মাত্র একশত পনেরো বৎসর পূর্ব্বেকার এই কথা। ইহারও প্রায় ১১২৫ বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থা ছিল, একবার ভাবিয়া দেখুন।

এই শ্রীহট্ট রাজ্য তখন বহুবিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ এবং ত্রিপুরার উত্তরাংশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এই বিস্তৃত রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে "কমলাঙ্ক" প্রদেশ ছিল। ইহাও একটা উপসাগরের তীরস্থ বলিয়া ইউয়ান্ চুয়াং বলিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরস্থ শ্রীহট্টের যখন ঐ অবস্থা ছিল, এই কমলাঙ্ক অর্থাৎ "কোমিল্লা" রাজ্যেরও যে তাদৃশ দশা ছিল না, এ কথা বলা যায় না। (১১)

প্রাচীন পুঁথিতেও এই "কমলাঙ্ক" রাজ্যের ঐ অঞ্চলে অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত

(৭) Watter's Yuang Chwang, Vol ii. pp. 188-89.

(৮) Watter's Yuang Chwang, Vol ii. p. 340.

(৯) বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০, ৬৩০ পৃষ্ঠা।

(১০) Lives of the Lyndsays (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত)।

(১১) এবার বন্যায় যে দৃশ্য দেখা গিয়াছে প্রায় ১২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থা যে রূপই ছিল তাহা অনুমানতঃ বলা যাইতে পারে।

ভট্টশালী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ময়নামতীর গানে দেখা যায়—

বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়ির সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাইমু কমলাকনগর। (১২)

এই 'কমলাক' যে "কমলাঙ্ক", নলিনী বাবু তদীয় "ময়নামতীগানের ভূমিকায়" তাহা বলিয়াছেন। ফলতঃ "কোমিল্লা"ই যে 'কমলাঙ্ক' তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না।

তবে অবান্তর হইলেও এস্থলে নলিনী বাবুর একটি কথার আলোচনা করিতে হইতেছে। তিনি কোমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমস্থিত বড়-কামতা নামক স্থানটিকে "কর্ম্মান্ত" নগররূপে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহাকেই সমতটের রাজধানী বলিয়াছেন। আমার বোধ হয় এই "কর্ম্মান্ত" 'কমলাঙ্কের'ই রূপান্তর—এস্থান হইতে হয়ত কমলাঙ্ক নগর স্থানান্তরিত হইয়া নিকটস্থ কোমিল্লায়' পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সমতটকে একটি বিশাল রাজ্য বলিয়াছেন—যাহা বর্ত্তমান বরিশাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার রাজধানী এমন একটা প্রান্তভাগে হইবার বিশেষ কারণ আছে কি? তিনি ই-চিং-কথিত সমতট-রাজের তাম্রশাসন বিশেষে উল্লিখিত "রাজভট্ট" ও কর্ম্মান্তরাজ "রাজভট্টকে" একই ব্যক্তি মনে করিয়াছেন। কিন্তু দুইটি কথা এস্থলে বিবেচ্য; ১ম ইচিং যে নামটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া তাহা বহু আয়াসে "রাজভট" হইয়াছে

"Iching who uses our pilgrim's (Yu chwang's) transcription of the n merely places the country sanea in East India. He calls the kin his time "Hoh-to-she-po-ta' which Chavannes restores as Hatshabhat the first three characters are as he used to express Raja, and the l name was probably "R[illegible]bhata." (

ইউয়ান চুয়াং অবশ্যই 'হোলশে' হর্ষ দ্বারা 'রাজা' শব্দ বুঝাইতেন; তখন ভারতবর্ষের রাজা হর্ষই ছিলেন। ইচিং সকল বিষয়ে ইউয়ানের অনু করিলেও মাছিমারা কেরাণীর ন্যায় অর্থে "হর্ষ" লিখিবেন কেন দ্বিতীয়তঃ, বা ইচিং এর সময়ে সমতটের রাজার রাজভট্টই ছিল, তথাপি তিনি কর্ম্মান্তরাজ প্রদত্ত শাসনে উল্লিখিত 'রাজ যে একই ব্যক্তি তাহার প্রমাণ কোথা নলিনীবাবু প্রধানতঃ অক্ষরের সা দেখিয়াই কর্ম্মান্তের রাজভট্টকে ইচিং- সমসাময়িক বলেন, কিন্তু এই সাদৃশ্য ম হর্ষের ফলকের সঙ্গে কর্ম্মান্তের শতাধিক বৎসর অগ্র-পশ্চাৎ হই পারে (১৪) এবং সমতটের

(১২) প্রতিভায় প্রকাশিত ময়নামতীর গান ৬ পৃষ্ঠা। (অত্রোল্লিখিত 'গৌড়'ও সন্নিকৃষ্ট 'শ্রীহট্ট' রাজ্যে একাংশ ছিল।)

(১৩) Watter's Yuang Chwang, Vol ii. p. 188.

(১৪) ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সভ্যতার কেন্দ্রস্থান আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যভাগে অক্ষরাদির পরিবর্ত্ত যেরূপ সত্বর হইয়াছে পূর্ব্বতম প্রান্তস্থিত স্থানবিশেষে তাহা না হইতে পারে। কাছাড়ের দিমলাদি আজও এমন অক্ষর দেখা যায় যাহা হয়ত কলিকাতাতে শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

রাজভট্টের নামে কর্ম্মান্তের রের নামকরণ হওয়াও বিচিত্র নহে। সমুদ্রগুপ্তের দেখাদেখি কামরূপ- সমুদ্র'বর্ম্মার নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের আদি প্রত্নোপাসক গঙ্গামোহনবাবু এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল কবাক্যে এই শাসনগুলিকে অষ্টম র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। টক; আমার বক্তব্য বলিলাম। করি রাখালবাবু এবিষয়ে একটু গ প্রদান করিবেন। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "সমতটের পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র ন প্রোম) কমলাঙ্ক (বর্ত্তমান পেগু)" । জিজ্ঞাস্য এই যে প্রোম 'পেগু' কি কোমিল্লার পূর্ব্বে? অতএব ই উক্তিতে 'সমতট' কোমিল্লা হইতে ছে না

তত্ত্বে কল্পনা অনুমান ইত্যাদির কার্য্য- খুবই আছে এবং থাকিবেও। তবে সঙ্গত হওয়া চাই। এই ভূমিকা দিয়াও র দুই একটি আনুমানিক কথা নিতে হইল—অসঙ্গত হইলে আশা ঐতিহাসিক মহাত্মগণ উদারতাগুণে করিবেন। কমলাঙ্কের পূর্ব্বে চুয়াং "তলপতি" এবং তৎপূর্ব্বে নোগুল" প্রদেশের কথা শুনিতে ছিলেন। (১৭) কমলাঙ্ককে কর্ম্মান্ত —কোমিল্লার সঙ্গে এক করিলে তাহার পূর্ব্বাংশে ত্রিপুরা রাজ্য—পাওয়া যায়। তৎকালে যে ইহা ছিল, ত্রিপুরাব্দই তাহার প্রমাণ। আজ ১৩২৫ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে অর্থাৎ '৫৯০' খৃষ্টাব্দে ইহা আরব্ধ হয়। অতএব 'তলপতি' ত্রৈপুরপতির রাজ্য ত্রিপুরা হইতে পারে কি না একটু ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি? তৎপরে ইহার পূর্ব্বে "ইশাংনোপুল" মণিপুর রাজ্যের "বিষ্ণুপুর" হইতে পারে নাকি? ত্রিপুরা রাজ্য তখন লুশাই পাহাড় নিয়া অবস্থিত ছিল—তাহার পূর্ব্বে মণিপুরের সংস্থান বটে। এই বিষ্ণুপুরের অস্তিত্ব আমরা একসম্প্রদায় মণিপুরী হইতে পাইতেছি--উহাদের ভাষা 'আর্য্যগন্ধি'। ডাঃ গ্রিয়ারসন তদীয় "লিঙ্গুইস্‌টিক্ সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

A tribe known as Mayang speaks a mongrel form of Assamese known by the same name. * * * They are also known as Bishnupuriya Manipuris. * * I have said above that Mayang is a mongrel form of Assamese. It can with equal (or perhaps more) justice be classed as a form of Eastern Bengali the language posseses characteristic of both the languages but at the same timediffers widely from both. I therefore place it in a supplement while for statistical purposes I have shown it as a form of Assamese merely because its speakers all live in the territory

(১৫) ইহা নলিনীবাবুর প্রদত্ত বিশেষণ; কিন্তু ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির উপর অবিচার হয় নাই

(১৬) বাঙ্গালার ইতিহাস পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯৫ পৃঃ

(১৭) Watter's Yuang Chwang Vol ii p p 487-88.

under the political influence of the Assam Government. * * * In the Manipur state the Leadguistic of Mayang are two or three plain villages near Bishnupur (locally known as Lamangdong), 18 miles to the south-west of Imphal. (১৮)

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বিষ্ণুপুর মণিপুরের প্রাচীন রাজধানী। (১৯) এবং তাই ইউয়ান চুয়াং বিষ্ণুপুরের কথা শুনিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু অনুগ্রহ করিয়া তদীয় ইতিহাসে ভাস্কর-বর্ম্মার কর্ণসুবর্ণ অধিকার সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র লেখকের নাম ও গ্রহণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও আমার যাহা বক্তব্য আছে, সবিনয়ে বলিতেছি। তিনি বলেন—

নিধানপুরের (২০) আবিষ্কৃত ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত তাম্রশাসন কর্ণসুবর্ণ বাস হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে শ্রীযুক্ত (এই লেখক) অনুমান করেন যে কর্ণসুবর্ণ তৎকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।* * কিন্তু এই অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। স্কন্ধাবার বা বাসক শব্দে রাজধানী বুঝায় না। সম্ভবতঃ ভাস্করবর্ম্মা শশাঙ্কের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের কিয়ৎকাল কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া এবং সেই সময়ে নিধানপুরে আ তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধ সময়ে তাম্রশাসন প্রদানের আরও একটি উদাহরণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। গহড়বাল-বংশীয় কান্যকুব্জ গোবিন্দচন্দ্র ১২০২ বিক্রমাব্দে গিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীধর নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি দান করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র এই নিশ্চয়ই যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে মুদ্গগি বা মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন। কারণ, তখনও গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্ভু নাই। (২১)

"কর্ণসুবর্ণ তৎকালে কামরূপ রা অন্তর্ভুক্ত ছিল" এ কথা আমি বলি "তৎকালে" দ্বারা রাখালবাবু যেন বর্দ্ধনের কালে বুঝাইয়াছেন—আমি বলি নাই। যাহা বলিয়াছি নিম্নে করিতেছি—

"হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে সেই বি সময়েই হউক বা চীনদূতের সাহা প্রতিদানস্বরূপেই হউক, তৎকালে ভ বর্ম্মার হাতে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যটি পড়িয়া এটা আমরা অনুমান করিতে পারি।"

(১৮) Dr. Grierson's Ling. Survy. of India, Vol. V. part I. p. 419.

(১৯) এ বিষয় অন্যত্র বহু আলোচনা করিয়াছি তাই এস্থলে উল্লেখমাত্র করিলাম। Mr. Gait's History of Assam—a critical study. Hindustan Review, 1908 F p p. 196-198.

(২০) স্থানটির প্রকৃত নাম নিধনপুর।

(২১) বাঙ্গালার ইতিহাস, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯০—৯১ পৃঃ

"কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল" এই বাক্যটি আমি বলি নাই বটে, উহা বস্তুতঃ কামরূপের অধীন হইয়াছিল বই কি? কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্ম্মার "রাজধানী" না হইতে পারে। ইংরাজীতে যাহাকে "কেন্দ্র" বলে কর্ণসুবর্ণ তাহাই ছিল। লর্ড হার্ডিং আজ গৌহাটি হইতে যদি একটা আদেশবাক্য প্রচার করেন তবে তাহা "কেন্দ্র গৌহাটি" হইতেই বাহির হইবে—তদ্রূপ ভাস্করবর্ম্মারও স্কন্ধাবার কর্ণসুবর্ণ বাসক হইতে দানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে আপত্তির স্থল কোথায়? শশাঙ্ক ও ভাস্করবর্ম্মার যুদ্ধের সময়ে এই শাসনপত্র জারী হয়, এটাও বলিতে পারি না। কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের করতল অবস্থায়—ভাস্করের দূরে থাকুক শশাঙ্কের হস্তেও পতিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ! শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালবাবু বিশেষজ্ঞ সুতরাং তাঁহার প্রতিবাদে কিছু বলিতে চাহি। অতিসাহসের কথা। কিন্তু শশাঙ্ক সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তাহাতে বোধ হয় যে ভাস্কর, শশাঙ্ককে ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করিতেন এবং হর্ষবর্দ্ধনও শশাঙ্ক না মরা পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে একছত্র সম্রাট্‌রূপে আপনাকে পরিগণিত করিতে পারেন নাই। এই মহাবীর শশাঙ্ক যে প্রাণ থাকিতে যুদ্ধে বিমুখ হইয়া কর্ণসুবর্ণ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন এটা অবিশ্বাস্য কথা। এবং যুদ্ধেও যে তিনি মরেন নাই, ইউয়ান চুয়াংই তাহার সাক্ষী। একথা অন্যত্র বলিয়াছি। (২২)

রাখালবাবু দৃষ্টান্তস্বরূপ গহড়বালের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের যে নজীর দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে রাখালবাবুর কথা আমি বুঝি নাই। তিনি উদ্ধৃত অংশে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "অঙ্গদেশ কখনও গহড়বাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই" অথচ একাদশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, "১২০২ বিক্রমাব্দে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গদেশের (২৩) কিয়দংশ অধিকার করিয়া মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়ায় গোবিন্দদেব মুদ্গগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনদ্বয় গোবিন্দচন্দ্রকর্ত্তৃক মগধ ও অঙ্গ অধিকারের স্পষ্ট প্রমাণ। গোবিন্দচন্দ্র বোধ হয় পালবংশীয় নরপালগণের সাহায্যার্থে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ অধিকৃত হইলে তিনি উহা পালরাজগণকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। (২৪)

রাখালবাবুর কোন্ কথা গ্রহণ করিব? একটা রাজ্য যদি বৃটিশ সম্রাটের দখলে আসে, তবে উহা অবশ্যই তদীয় রাজ্যের অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই হইয়া পড়ে। তবে রাখালবাবু যদি কথার মার-পেচ খেলান, সে স্বতন্ত্র কথা। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা তাঁহার এই দুই স্থলের উক্তিতে অসামঞ্জস্য

(২২) বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০। ৬২৬—২৭ পৃঃ

(২৩) না "অঙ্গদেশের"?

(২৪) বাঙ্গালার ইতিহাস। ২৯৬ পৃঃ

দেখিয়া, "বুঝিতে পারিলাম না" এইমাত্রই বলিলাম।

এই "দুর্ব্বোধ" বিষয়ের অপর একটি ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ করিব। "মাৎস্যন্যায়" শব্দের অর্থ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাহা গৌড়-লেখমালায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহাতে রাখালবাবু "বিদ্রূপের" ভাব দেখিতে পাইলেন কিরূপে? (২৫)

আর একটি জায়গায় আমার খট্‌কা বাঁধিয়াছে। রাখালবাবু লিখেন—

"নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে জয়পাল প্রাগ্‌-জ্যোতিষ্কের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন, 'ভগদত্ত'বংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল বীরবাহু সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।" (২৬)

এই জয়পাল, দেবপালের খুল্লতাত-পুত্র; তাঁহারই রাজত্বকালে (৮২৫—৮৬৫) বিদ্যমান ছিলেন। ঐ সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে হর্জ্জরদেব রাজা ছিলেন—৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে (৫১০ গুপ্তাব্দে) উৎকীর্ণ তেজপুর পর্ব্বতগাত্র-লিপিতে তাঁহার নাম পা গিয়াছে। তাহা হইলে বড় জোর অ পুত্র বনমালদেবের সঙ্গে জয়পালের ঘটিয়া থাকিতে পারে। জয়মাল বীর নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছি বলিয়া আমাদের অনুমান (২৭) আরও অনুমান করি যে বিজেতা 'জয়পাল' নামে হয় তো 'জয়মাল' নামক হইয়াছিল; কেননা বঙ্গে ও ভার অনেক দিগ্বিজয়ী রাজার নামে কামরূপাধিপতির নাম শুনিতে পাইবে —পুষ্য, সমুদ্র, হর্ষ, গোপাল, ধর্ম্মপাল, কত বলিব?

রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসে শ্রী রাজ্যের কোন উল্লেখ নাই; অবশ্য অ ইহা আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ১৮ অব্দ পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট বাঙ্গালার অংশই ছি এবং ভবিষ্যতেও আবার হয়ত বাঙ্গালা সামিল হইতেও পারে। ১৮৮০ অব্দে আগষ্ট্ মাসের এশিয়াটিক সোসাইটি প্রসিডিংসের মধ্যে শ্রীহট্ট আটোয় প্রাপ্ত দু খানি তাম্রশাসন দেখা যায় (২৮) তাহা "শ্রীহট্ট" রাজ্যের "নরপতির্ব্বাণ খরবা

(২৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, সপ্তম পরিচ্ছেদ, ১৪৮ পৃঃ, ২৫ সংখ্যক পাদটীকা।

(২৬) বাঙ্গালার ইতিহাস, অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৮৩—৪ পৃঃ

(২৭) এ বিষয়ে প্রাচীন কামরূপের রাজমালা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩২০, ৩য় সংখ্যা

(২৮) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহা আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠে ভুল আছে—শ্রীহ ইতিবৃত্তেও সকল ভুল রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি ভুল বড়ই রহস্যজনক। প্রথম শাসনখানি ৪র্থ শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে আছে, "শৃহ রাজ্যকমলায়াঃ"। ইহার পাঠ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল "স্বচ্ছরাজ্য কমলায়া করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পাদে দুইটি মাত্রা কম হইয়াছে, কেননা একটি অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে; অক্ষরটি "ট্ট"; অতএব "শৃহট্ট রাজ্য কমলায়াঃ" পাঠ হইবে। "শ্রীহট্ট" স্থলে 'শৃহট্ট' বানান এই শাস অপরত্রও দেখা যাইবে।

তি পাঁচজন ভূপতির নাম আছে—
বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের এক
ার হইবার উপযুক্ত। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেও
ক নূতন কথা আছে; কিন্তু রাখালবাবুকে
লার ঐ তবৃত্তগুলির প্রতি তেমন
ুগ্রহপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল না। ঐ
লির কোনটির উল্লেখ তদীয় ইতিহাসে
খা গেল না। কিন্তু এসকলের প্রতি
কটু দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বাঙ্গালার ইতিহাস
রিপুষ্টবয়ব হইত।

রাখালবাবু ইতিহাস-সঙ্কলনে তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা ও প্রাচীন সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াছেন—ইহা ন কথা। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস (পলিটিকেল হিস্ট্রি) এই গুলি হইতেই পাওয়া যায়। যুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব হোদয় বহু পরিমাণে কুলগ্রন্থগুলির উপরেও র্ভর করিয়াছেন—কেননা তিনি বঙ্গের ামাজিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। আমার বোধ হয়, নগেন্দ্রবাবুর পন্থা ভিন্ন হওয়াতে, রাখালবাবু তাঁহার গ্রন্থে নগেন্দ্রবাবুর এত প্রতিবাদ না করিলেই ভাল হইত। কুল-গ্রন্থের উপর রাখালবাবু, রমাপ্রসাদবাবু প্রভৃতি অনেকেই বীতরাগ; কিন্তু এগুলি একেবারে ফেলিয়া দিবারও জিনিস নহে। যেখানে তাম্রশাসন বা শিলালিপি প্রভৃতির সঙ্গে অনৈক্য হয় সেখানে কুলগ্রন্থোক্ত বিবরণ বর্জ্জনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাম্র-শাসন যে জাল হয়, রাখালবাবুই তার দু-একটি উদাহরণ দিয়াছেন। তাম্রশাসনেরই যখন এই অবস্থা তখন মুদ্রা তো অনায়াসেই কৃত্রিম হইতে পারে। অন্ততঃ আধুনিক সময়ে এই প্রত্নতত্ত্বের হুজুগে উপরওয়ালার সন্তোষের নিমিত্ত অথবা নাম কিনিবার জন্য কেহ সামান্য চেষ্টায়ই জালমুদ্রা তৈয়ার করাইতে পারে। অতএব শাসন বা মুদ্রা মাত্রেই যে গ্রহণীয় এবং কুলগ্রন্থ মাত্রেই যে বর্জ্জনীয় তাহা বলা যায় না।

কুলগ্রন্থে অথবা প্রাচীন পুঁথিতে অনেক অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীও স্থান পাইয়া থাকে। এক হিসাবে সেগুলিও গ্রহণীয়। মহামতি গেইট্ বাহাদুর তদীয় আসাম-ইতিহাসে 'জয়মতী'র কাহিনী বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছেন—অথচ তাঁহার অলৌকিক ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার ও আত্মবলির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ জয়সাগর আজিও বর্ত্তমান আছে। আসামের আহোম রাজ-বংশের কোনও ব্যক্তির কাহিনী যদি বঙ্গীয় সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে তবে এই জয়মতীর কাহিনীই নানা গ্রন্থে এমন কি গীতাভিনয়েও স্থানলাভ করিয়াছে। যাঁহারা আমাদিগকে এই সকল বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদেরই জাতীয় একজন বিশিষ্ট ইতিহাস-লেখকের কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

Our ideas of Roman characters are derived in some degree from the legends which appear in the earlier part of the Roman story and which we have rejected from history. Those legends however were universally received as true by the Romans themselves and therefore they are, as a distinguished writer (Dr Merivale) says "true to the genius of the time and of the people, true in the lessons of Roman character which they inculcate, true for the practical purpose of teaching us what

manner of men those old Romans really were." Legendery lore possesses in fact a formative power in moulding the national character by consecrating traditional types of men for the admiration and imitation of posterity. The Romans thought of early Rome and of her heroes as the poets and orators taught him to think and so from the legends we can understand in a measure the thoughts and actions of those. who inplicitly believed them. (২৯)

আমরা টডের "রাজস্থান"কে হেয়জ্ঞান করিতে পারি কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই মহাগ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালা দেশের কত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ নিবন্ধ সৃষ্টি করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা প্রদান করিয়াছে। ভি, এ, স্মিথের 'আর্লি হিস্‌টরি অব্‌ ইণ্ডিয়া' স্কুল কলেজের পাঠ্য হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আমাদের তাদৃশ উপকার হইবে কি? ক্ষেতে চাউল বুনিলে চারা হয় না; বায়ু রাশিতে শুধু অম্লজান থাকিলে সংসার ছারখারে গিয়া শ্মশান হইত। ভগবান এই ইঙ্গিতের প্রতি আমাদের উদাসীন ঐতিহাসিকগণ একটু দৃষ্টিপাত করেন অনুরোধ।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে তদীয় উৎ গ্রন্থের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতে —ইহা হইতে আমি কি শিক্ষালা করিয়াছি। তবে ভুলভ্রান্তি মানবের সহ বিষয়েই থাকিবে—ইহাতে আছে, তা তিনি নিজেও ভূমিকায় স্বীকার করি ছেন। তাঁহার এই মূল্যবান গ্রন্থখানি যথাসম্ভব নির্দ্দোষ দেখিতে আসনা করি এই সামান্য আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি যদি ইহাতে আলোচিত গ্রন্থের অণুমাত্র উপকার হয় তাহা হইলে নিজেকে কৃত মনে করিব।

শ্রীপ্রমথনাথ দেবশর্ম্মা

দারোগা-গিরির নমুনা

জেলার মাজিষ্ট্রেট প্রেক সাহেব, শ্যামলাল বাবু দারোগার এলাকা ডেফলতলা থানার অধীন তারাপুর গ্রামে একটি Bad livelihood মোকদ্দমা (চলিত ভাষায় ইহাকে "বদমায়েসী" মোকদ্দমা বা "১১০ ধারার মোকদ্দমা" বলে) বিচার করিতে যাইবেন। বর্ষার প্রাচুর্য্যবশতঃ কোর্ট সব-ইনস্‌পেক্টর-বাবু স্বকীয় কোটর ত্যাগ করিয়া অতদূর যাইতে নারাজ হইলেন। অবশ্য পুলিশের চাকরিতে "রাজী", "নারাজী" বলিয়া কোন আপত্তি চলে না, "Police officers are always on duty,"—তবে কোর্ট-বাবু হইতেছেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পেয়ারের লোক, কাজেই তাঁহার

(২৯) Sanderson's Outlines of the World's History: part II. p. 176.

খুন মাপ! সদরে আর কোন নাও-রশ মাল না থাকায় কোতোয়ালী থানার ট দারোগা,—"ছাই ফেলিবার ভাঙ্গা লা" আমার উপরই এই কাজের ভার ন। আমি নূতন লোক, কর্ম্মজীবনের মায়ু আমার তখন দুই বৎসরও পূর্ণ নাই,—কাজেই "টুঁ" শব্দটি উচ্চারণের হস না করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত লাম।

পাসীঘাটায় গিয়া ডকিলাম, "ভাড়া বি কে রে?" অমনি এক সঙ্গে সাত ট জন মাঝি হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদারা, দারা, তারা—নানা স্বরে চীৎকার করিয়া ঠল, "আইসেন কর্ত্তা, আমার নৌকায় ইসেন, যাবেন কোহানে?" আমার স্কন্ধে যে শনি চাপিল, পরিণাম অজ্ঞাত না কিলেও রসনায় হঠাৎ সত্য কথাটাই ির হইয়া পড়িল, বলিলাম, "যাব, ডেফল-া থানায়।" থানা-পুলিশের নাম শুনিলেই কার মাঝিমাল্লারা শীতের সাপের মত বারে যেন জড়সড় হইয়া পড়ে, কোন কই আর মাথা তুলিতে চায় না। আমার া শুনিবামাত্র উহাদের আর বুঝিতে বাকী ল না যে আমি একজন "পুলুশ"। নি সব চুপচাপ,—কাহারও মুখে র কথাটি নাই, যেন নৌকা ভাড়া ওয়া উহাদের কর্ম্মই নহে। মুহূর্ত্তমধ্যে মাথাগুলি কচ্ছপের গলার মত নৌকার রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বুঝিলাম, ধর দোষে সব মাটী হইয়াছে। আর শোধনের উপায় নাই। তথাপি একবার ষ্টা করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে যে নৌকাখানা ছিল, তাহারই মাঝিকে ডাক দিয়া বলিলাম, "কিরে বাবু, কত ভাড়া চাস?" মাঝি মহাশয় নিতান্ত কাতর ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আপনাকে নৌকায় নেওয়া ত আমার ভাগ্যের কথা,—কিন্তু কি করব কর্ত্তা,—মাল্লা দুজনেরই আজ ৫।৬ দিন যাবৎ জ্বর, নৌকা বাইবে কে? কদিন থেকে ঘাটে বসে বসে ঘাট-মাঝির পয়সা দিচ্ছি, আমার পরে এসে কত নৌকা ভাড়া হয়ে চলে গেল, আমিই এখনও পড়ে আছি! বাড়ী হতে যা চাল ডাল এনেছিলাম, তাও প্রায় শেষ, এখন না খেয়ে মরতে হবে দেখ্‌ছি।" মাঝি এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে, গলুইয়ে বসিয়া যে মাল্লাটি রসুইয়ের উদ্যোগ করিতেছিল, তাহার কোঁকানি ও কাঁপুনি একসঙ্গে আরম্ভ হইল,—দ্বিতীয় মাঝিটি এতক্ষণ ছাপ্পড়ের উপর বসিয়াছিল; সেও তাড়াতাড়ি পালখানা বেশ তাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া দিল। উহাদের কাণ্ড দেখিয়া আমি হাসিব, না নিজমূর্ত্তি ধারণ করিব, তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই চাহিয়া দেখিলাম, অপর সব নৌকার মাঝিমাল্লারা "পাড়া" খুলিয়া "পাড়ি" ধরিয়া যেন-কতই-কাজে-ব্যস্তভাবে ওপারে "দাসের বাজারে" যাইবার উদ্যোগ করিল। বিলম্বে কার্য্যহানি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আমি জ্বর-হওয়া এই দুইজন মাল্লারই নৌকাখানায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কাজেই উহারা আর নৌকা খুলিতে অবসর পাইল না। মাঝি মহাশয় আরও দীনভাবে ব'লল, "হুজুর, আমার নৌকোয় উঠলেন কেন?

দেখ্‌ছেনই ত, আমার ডান হাত বাঁ-হাত দুখানাই ভাঙ্গা,—(অর্থাৎ দুইজন দাঁড়ীরই অসুখ)!" আমি বলিলাম, "সেজন্য কোন চিন্তা নাই, আমার কনেষ্টবল বেশ হাল ধরিতে জানে, সে তোমার বদলে মাঝি গিরি করিবে, তুমি একখানা দাঁড় টানিও, আর একখানা দাঁড় টানিবার জন্য না হয় একজন চৌকিদারকে সঙ্গে লইব।"

দাঁড়িবিষয়ক আপত্তি ভঞ্জন হইলেও মাঝি কিন্তু নিরস্ত হইল না। সে দ্বিতীয় অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল, "হুজুর, আমার এই একটুখানি নৌকো, তাতে আপনার বিছানা-পত্র, বাক্স, পেটারা সব তুলে আনলে সে সবই বা রাখব কোথায়,—আর আমার এই মাল্লাদেরই বা শুতে দেব কোন্‌খানে? এ নৌকায় গেলে আপনার বড়ই কষ্ট হবে। আরও ত কত নৌকো আছে, আপনি তারই এক খানা নিয়ে যান না কেন?" আমি গরম না হইয়া মাঝির দৌড় কতদূর, তাহা দেখিবার জন্য, অত্যন্ত নরম সুরেই বলিলাম, "বাবা, আমি বাক্স-পেটারা কিছুই সঙ্গে লইব না,—বিছানাপত্রও অতি সামান্য, —একখানা তোষক, দুইটা বালিশ আর একখানা কম্বল মাত্র, তাহাতেও যদি তোমার মাল্লাদের অসুবিধা হয়, তবে না হয় আমি কম্বলখানা পাতিয়াই বসিব,—বিছানা আর বিছাইব না।" মাঝি যেন আমার দুঃখে বড়ই কাতর হইয়া বলিল, "তাও কি হয় হুজুর,—ডেফলতলা ত নিকটের রাস্তা নয়,—এক ভাঁটা এক জোয়ারে সেখানে যাওয়া দুষ্কর,—ততক্ষণ আপনি কেমন করে বসে কাটাবেন আপনি হচ্ছেন বড়লোক, আপনি দু দিলে এখনই কত নৌকা এসে পড়বে, তারই একখানা নিয়ে যান,—আমার নৌ এসে কেন মিছে কষ্ট পাবেন?" আ বলিলাম, "আহা! আমার কষ্টের ভাবিয়া তোমার মনে যেরূপ উ দেখিতেছি, তাহাতে অন্য নৌকায় যাই আমার আর ইচ্ছা হইতেছে না,—আম দরদ তোমার মত আর কে বুঝিবে বিশেষতঃ আমার দুঃখে দুঃ যখন এ দুঃখিত হইয়াছ, তখন আমার দুঃখ ত আমার বুঝা উচিত! তা না হই ধর্ম্মে সহিবে কেন! তোমার দুইজন মা দুই জনেই ৫।৬ দিন যাবৎ জ্বরে প আছে, ওদিকে তোমার আরাকীও এমন অবস্থায় তোমার সাহায্য করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য! তা বেশ, আমি নিজের লোক দিয়াই নৌকা বাহিয়া ল —তুমি বিনা মেহনতে যা হয় কিছু পা ত, তাহাতে আর কিছু না হোক, মাঝির খাজনা এবং তোমাদের পে খোরাকিটা একরকমে চলিয়া যাইবেই, মন্দ কি?" ভাবিয়াছিলাম, বাগযুদ্ধ খানেই শেষ হইবে,—মাঝির মাথায় কোন আপত্তি বোধ হয় যোগাইবে কিন্তু আমার সে ভ্রম ঘুচিতে বিলম্ব না।

মাঝিটী যেন দ্বিতীয় সব্যসাচী, যেমন দুইহাতে সমান অস্ত্র ধরি জানে, তাহার হরদত্ত তূণটীও তে অক্ষয়! সে এবার তাহার ব্রহ্মাস্ত্র

য়া বলিল, "হুজুর, এই ভরা বাদলের া আমার এই ভাঙ্গা নৌকায় আপনাকে মি কোনমতেই তুলিতে পারিব না। টের জালা ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির য়া আসিয়াছি, নৌকার উপরে নীচে, কোন নেই হাত দিতে পারি নাই,—এখন দেখি, ষ্টি হইলে ছাপ্পর দিয়া জল চুঁয়ায়,—আবার লা দিয়াও পানি নেয়। এ নৌকায় কি লোকের যাওয়া পোষায়? ঘণ্টায় ণ্টায় বিছানা তুলিয়া জল সেঁচিতে হয়, -আবার ঝড় নামিলে ত উৎপাতের সীমাই াকে না,—বিছানাপত্র সব গুটাইয়া ঢাকিয়া কিয়া না বলিলে ত সব ভিজিয়া একাকার ইয়া যায়! হাঙ্গামার অন্ত নাই!"

মাঝির কাণ্ড দেখিয়া আমার সুপ্ত দিশী মেজাজ ক্রমেই জাগিয়া উঠিতেছিল, থাপি যথাসাধ্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া লিলাম, "কলিকালেও যে তোমার মত এমন চ্ছা লোক জন্মায়, সে ধারণা আমার আদৌ ল না মাঝি,—আজকালকার দিনে দেখিতে াই, লোক "মেকি"কেই "সাচ্চা" বলিয়া ানাইতে চেষ্টা করে, আর তুমি কি না জেই তোমার নৌকার যত দোষ আছে, ব তোমার চড়নদারকে আগে হইতে ানাইয়া দিতেছ! তোমার মত খাঁটী লোক আর কখনও আমার চোখে পড়ে নাই,—তোমার মত সাধু লোক দর্শনেও পুণ্য! তোমার কথা শুনিয়া বড় আহ্লাদ ইল। তা বাপু, সেজন্যও তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। তুমি নিজেই যখন বলিতেছ যে, তোমার নৌকাখানা খারাপ, ছাপ্পর দিয়া জল পড়ে, তলা দিয়াও জল নেয়,—তার উপর তোমার মাল্লাদেরও জ্বরে শয্যাত্যাগ, তখন আমি তোমাকে ভাড়া যতদূর সম্ভব কম করিয়া দিব! অন্য নৌকার ভাড়া রোজ এক টাকা,—তা আমি তোমাকে ছয় আনা হিসাবে দিব, তবেই আর কোন গোল থাকিবে না। কেমন, এইবার হইল ত?—আর ত কোন আপত্তি নাই? এই বার তোমার হাইলটী খুলিয়া আমার সঙ্গে চল দেখি বাপু,—আমার বিছানাপত্র লইয়া আসিবে।" মাঝির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল,—তাহার এত বাক্-প্রপঞ্চের পরিণাম যে এমন সাংঘাতিক দাঁড়াইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। আর বাক্-চাতুর্য্য বিস্তারে ভরসা না করিয়া এবার উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমি এত বক্‌তে পারি না বাবু,—আমি ভাড়া যাব না,—আপনি অন্য নৌকার চেষ্টা দেখুন।" —এই কথা বলিয়া সে গলুইয়ে আসিয়া "পাড়া" তুলিবার উপক্রম করিবামাত্র আমিও নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিলাম, "তবে রে বেটা বদমায়েস, চালাকি পেয়েছিস! ভাল চাস ত চল্,—না হয় ধরে নিয়ে জেলে পুরে দেব, জানিস্?" ভরা জালায় একখানা ইট ছুড়িয়া মারিলে জালার জল যেমন ছিট্‌কাইয়া উঠে, আমার মুখে জেল-খানার নাম শুনিবামাত্র, মাঝির সঙ্গে সঙ্গে মাল্লা দুইজনও তেমনই লাফ দিয়া উঠিল,— আর তাহাদের সে কাঁপুনি-কোঁকানি নাই, আর সে শীতে জড়সড় ভাব নাই; তিনজনের ছয়টা চক্ষু যেন দুর্ব্বাসা মুনির মত আমাকে ভস্ম করিবার জন্য

একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। তিনজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি? কি? কি বল্লে বাবু, তুমি? জেলে দেবে?—জেল অম্‌নি পথে ঘাটে পড়ে আছে আর কি! কার ঘ'রে চুরি করেছি,—কার চালে আগুন দিয়েছি,—কার বুকে ছুরি মেরেছি,—জেল অমনি দিলেই হলো আর কি? এটা বুঝি মগের মুল্লুক? খুসী হলো না ভাড়া গেলাম না,—তার আবার জোর-জবরদস্তি কি? যান্, যান্ মশায় আপনি,—নামুন আমাদের নৌকা থেকে,—আমাদের নৌকা ভাড়া হয়ে গেছে কবে! যদুবাবু উকীলের মেয়েকে নিয়ে আমরা বাঁশবেড়ে থেকে এসেছি, জামাইবাবু আবার এখনই এই নৌকায় বাড়ী ফিরে যাবেন। আমরা তাঁর কাছে আগাম ভাড়া পেয়েছি!" আমার আর সহ্য হইল না,—সব-চেয়ে জোয়ান যে মাল্লাটি, তাহার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিয়া বলিলাম, "এই নে বেটা তোর আগামি ভাড়া,"—"এই নে বেটা, তোর জ্বরের পাঁচন,"—(আর এক চড়),—"আয়, এইবার নিয়ে যাবি চ তোর যদুবাবুর জামাইকে,"—বলিয়া নিজহাতে আমি হাইলটি খুলিয়া উহার কাঁধে চাপাইয়া দিলাম। জ্বলন্ত আগুনে হঠাৎ এক কলসী জল ঢালিয়া দিলে সে আগুন যেমন মুহূর্ত্তে নিবিয়া যায়,—আমার এই দুইটি বজ্র চাপড়ে মাঝি-মাল্লা তিনজনেরই নর্ত্তন কুর্দ্দন একদম থামিয়া গেল,—আগুন নিবিলে তবু একটু ধোঁয়া থাকে,—ইহাদের কিন্তু তাহাও রহিল না, একেবারে সব অবাক্, হতভম্ব! গোলমাল শুনিয়া ক্ষণকাল মধ্যে সেখানে অনেক লোক জমিয়া গে —ঘাট-মাঝিও দৌড়িয়া আসিল। মাঝি লোকটি আমার পরিচিত,—আমাকে দেখিয়াই লম্বা এক সেলাম ঝাড়ি বলিল,—"আপনি কেন নৌকা নিতে এসেছে ছোটবাবু? আপনি নেমে আসুন,—আমি সব ঠিক্ করে দিচ্ছি!" তারপর মাঝির দি চাহিয়া বলিল, "আরে কি করিমবক্স —দাড়ী চুল পেকে গেল, তবু গো চিন্‌তে পার্‌লে না? আমাদের ছো বাবুর মত সদাশয় লোক কি আর আছে উনি অন্য পুলিশের মত নন। যা যাও, ওঁর সঙ্গে যাও. ভাড়া নি কোন গোল হবে না। যাওয়া-নাওয়ার কোন কষ্ট পাবে না, নিশ্চিন্তে চ যাও।" ঘাটমাঝিকে দেখিয়া মাঝিমাল্লাদে ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। করিমবক্স মা অমনই সুর বদলাইয়া বলিল, "ভাড়া না কেন? ভাড়াই যদি না যাব, এসেছি কি কর্‌তে? বাবুদের সঙ্গে যাও ত আরও সুখের কথা,—কোন চো ডাকাতের ভয় থাকে না,—কোন লো কোন কথা বল্‌তে সাহস পায় না,—ঘাটে গেলেই চাহিতে না চাহিতে মাছ দু তরকারী সব আসিয়া হাজির হয়,—এম সুখের ভাড়া যাব না কেন? অবশ্য ভাড় যাব। যা বে পীরমামুদ যা, বাবুর বিছান নিয়ে আয়!" মাঝির আদেশে সেই চপেটা ঘাত-প্রাপ্ত মাল্লাটী হাইল কাঁধে লইয় নামিতে উদ্যত হইলে ঘাটমাঝি বলিল "হাইল আর নিতে হবে না,—যা, আমি যখন আছি, তখন আর এদের পালাবা

নাই, ছোটবাবু,—আপনি যান্, বিছানা চস্তে পাঠিয়ে দিন্-গে।" ঘাটমাঝির য় হাইলটা রাখিয়াই মাল্লার সঙ্গে থানায় লাম।

থানায় আসিয়া রামদীন সিংহ কনষ্টে- ক আমার বিছানা-পত্র লইয়া অবিলম্বে ায় যাইতে আদেশ করিলাম,—সে আজ্ঞে, হুজুর,"—বলিয়া সম্মতি দ করিল। আমিও তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম, ণ ভাঁটার বড় অধিক বিলম্ব না। ভাঁটায় আমাদিগকে কল্যাণপুর স্ত গিয়া তথা হইতে জোয়ারে ডেফল- থানায় যাইতে হইবে। সেখানে জালবাবু দারোগার নিকট মোকদ্দমার া শুনিয়া তবে আমাকে তারাপুরে কদ্দমা পরিচালন করিতে হইবে। খুন, াতি, চুরি ইত্যাদি মোকদ্দমার মত d livelihood Case-এ পুলিশ প্রায়ই ন ডায়েরী দেয় না, কেবল মামুলী-মত টী রিপোর্ট দাখিল করে মাত্র। সে পোর্ট যেরূপ অদ্ভুত রকমের সেকেলে লা ভাষায় লেখা থাকে, তাহা বুঝিয়া আমার মত নিতান্ত একেলে লোকের ক তখনও তেমন সহজ হইয়া উঠে ই। সেই জাতীয় বাঙ্গলার একটু নমুনা তেছি,—"হুং হয় যে, লাং বাং হাং হয়, তিনি কং এর সন্তোষজনক কৈঃ হুং পেং রেন।"*

আহারান্তে ঘাটে আসিয়া দেখি, রামদীন কনষ্টেবল ঝোলাটী শিয়রে দিয়া ঘাটমাঝির ঘরে পাশাপাশি-পাতা দুইটী কেরোসিনের বাক্সের উপর পড়িয়া গভীর নিদ্রায় অচেতন, আর আমার বিছানাটী একখানা মাদুরের উপর মেজেতে পড়িয়া আছে। ঘাটে কোন নৌকা নাই, ঘাটমাঝিও অন্তর্হিত। ভাঁটার টান ফিরিয়াছে,—অবিলম্বে যাত্রা না করিলে জোয়ার আসিবার পূর্ব্বে কল্যাণপুর পর্য্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। অন্তরে তখন যে ভাবের সঞ্চার হইল, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা দুরূহ। হাতের লাঠি দিয়া রামদীনের পার্শ্বদেশে এক খোঁচা মারিলাম, অমনি সে "কোন্ হ্যায়," "কোন্ হ্যায়", বলিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উঠিয়া বসিল। আমার দিকে চাহিতেই তাহার মুখখানা যেন অম্লরসে ভরিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া নিজের পাগড়ী দিয়া একটী কেরোসিনের বাক্স মুছিয়া, "বৈঠিয়ে হুজুর, হাম্ মান্‌ঝি কো বোলাওতে হেঁ," বলিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল। পাখী যে শিক্‌লি কাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে, সে কথাটা তাহাকে বলিবারও অবসর পাইলাম না,—সে উধাও হইয়া ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। এখন কি করি,—কোথায় যাই,—কেমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গম্য স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, এই সব কথা ভাবিতেছি, আর রামদীনের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই যে

* "হুকুম হয় যে, লাইনবাবুর (Reserve Sub-Inspector) হাওলা হয়,—তিনি কনষ্টেবলের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ হুজুরে পেশ করেন।"

এত কষ্টে ঠিক-করা নৌকাখানা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, সেই কথা ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া উঠিতেছি,—এমন সময় শুনিলাম, রামদীন "ও মান্‌ঝি, মান্‌ঝি, জল্‌দী কিস্তী হিঁয়া লে আও, বাবু আয়া হ্যায়" বলিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। সে কোন্ মাঝিকে কোথা হইতে আসিতে বলিতেছে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই নদীর অপর পার হইতে একজন লোক উত্তর দিল, "এই যাচ্চি গো! পেস্কারবাবু এখনো আসে নি।" রামদীন আবার ঘাটমাঝির ঘরে ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নৌকা কোথায় হে রামদীন?" সে তদুত্তরে জানাইল, আমি নৌকা ভাড়া করিয়াছি জানিয়া, পেস্কার কেদারবাবুও আমার সঙ্গে সেই নৌকায় যাইবেন, স্থির করিয়াছেন। কেদারবাবুর বাড়ী নদীর অপর পারে "দাসের বাজারে।" আমার আগমন-সংবাদে তিনি রামদীনকে বলিয়া বিছানাপত্র আনিবার জন্য নৌকা নিজের ঘাটে লইয়া গিয়াছেন। আমার প্রধূমিত ক্রোধ কাজেই আর বহ্নিমান্ হইতে পারিল না; বরং অন্তরে হর্ষেরই সঞ্চার হইল। কারণ, এতটা পথ একাকী যাওয়ার চেয়ে একজন ভদ্রলোক সঙ্গী পাওয়া আনন্দেরই কথা, তাহার উপর কেদারবাবুরও আমারই মত দাবাখেলায় বড় আগ্রহ, কাজেই তাঁহার মত একজন সঙ্গীলাভ করা ত ভাগ্যের কথা! রামদীনকে তখনই বাসা হইতে দাবা-বোড়ে এবং খেলিবার নক্সা-করা পেষ্টবোর্ডখানা আনিবার জন্য দৌড়িয়া যাইতে বলিলাম। সে ফিরিয়া আসিতে আসিতে নৌকাখানাও গে বাবুকে লইয়া এপারে আসিল। বিলম্ব না করিয়া বিছানাপত্রসহ নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম, এবং মাঝিমাল্লা "দরিয়ার পাঁচপীর, গাজী, বদর ব বলিয়া নৌকা খুলিয়া দিল।

এখন আর মাঝি-মাল্লাদের অপ্রসন্ন ভাব ছিল না,—আমারও নিশ্চিন্ত। কাজেই একটু তামাসা দেখি জন্য মাঝিকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলি "দেখুন কেদারবাবু, আমাদের এই মা বড় নিস্পৃহ, এবং ভা সাধু লো উহার নৌকার ছাপ্পড় দিয়া জল চু এবং তলা দিয়া জল উঠে বলিয়া নিজেই দৈনিক ছয় আ হিসাবে লইতে রাজী হইয়াছে।" মাঝির মুখ অমনি পোড়া হাঁড়ীর তলার মত হইয়া গেল,—সে আম্‌তা-আম্‌তা ক বলিল, "ছ' আনা ভাড়া দিলে কি বাঁচে কর্ত্তা? আমার নৌকার দিয়া ত কই তেমন পানি উঠে না, যদিও-বা একটু-আধটু উঠে, তা একবার সেঁচে ফেল্‌লেই যথেষ্ট। ছাপ্পর্ দিয়া ত কখনও পানি চুয়াতে নাই,—যদিই বা হঠাৎ কখনও আধটু চুয়ায়, তবে তখন না-হয় কাঁথাখানা ছাপ্পড়ের উপর পেতে দিব, তাই বলে কি আপনাদের গায় পড়্‌তে দিব?" আমি সে কথা না শুনি ভাণ করিয়া রামদীনের দিকে চা বলিলাম, "ভাল কথা, রামদীন, তুমি বেশ হাইল ধরিতে জান, (বলাবাহু

রামদীন আরা জেলার বিশুদ্ধ ছত্রী, র সাত পুরুষেও কেহ কখনও নৌকার ধরে নাই),—তা তুমি গিয়া মাঝির থেকে হুইলটী নিয়ে বস গে,—আর পাড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় দি চৌকিদারকে ডেকে নিও,—কারণ রা দুজনেই অসুস্থ, নৌকা বাইতে বে না।"

করিমবক্স মাঝি অমনি বলিয়া ল, "কে আর মিছে চৌকি-কে ডাকবেন কর্ত্তা,—একেই ত এই নৌকা, তার উপর আরও লোক নৌকায় জায়গা হবে কেন? কি করা যাবে, পীরমামুদ আর সোনা-ই কোনমতে দাঁড় টেনে যাবে আর জ্বর বলে বসে থাক্‌লে কি আর দের মত গরীব কাঙ্গালের চলে ?"

আমি তখন করিমবক্সকে বলিলাম, াচ্ছা মাঝি, এখন যে তুমি সব কথাই টাইয়া দিতেছ, প্রথমে তবে অত সাত ঘোর-ফের কথা বলিতেছিলে কেন? লিশের কাছে নৌকা ভাড়া দিতে মাদের আপত্তি করিবার কি হেতু থাকিতে রে? প্রায়ই দেখি, পুলিশের লোক কা ভাড়া করিতে আসিলেই সব মাঝি-জারা পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে,—ইহার রণ কি? ভাড়াও ত আমার বিশ্বাস, লিশের নিকট কেহ কম পায় না! কারণ াড়ার পয়সা ত পুলিশের লোক কখনও জের গাঁট হইতে দেয় না। বদলী ইয়া যাইবার সময়, কিম্বা সরকারী খাজনা কি আফিং, কি কয়েদী প্রভৃতি একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইতে হইলে সে ভাড়া ত সরকার হইতেই পাওয়া যায়। থানার দারোগারা খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি মোকদ্দমা তদন্ত করিতে মফঃস্বলে গেলে তখনকার নৌকাভাড়া ত পক্ষগণ আইন খরচের মতই বিনা আপত্তিতে বহন করে, —সুতরাং পুলিশের লোকের ভাড়া কম দিবার কোন কারণই আমি বুঝিতে পারি না। আহারাদি যে ভাল হয়, সে কথা ত তুমি নিজেই বলিলে,—তবু পুলিশের লোককে নৌকাভাড়া দিতে তোমরা এত আপত্তি কর কেন?" করিমবক্স আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—কোন উত্তর দিল না। কেদারবাবু বলিলেন, "কিহে, চুপ করিয়া থাকিলে কেন,—দারোগাবাবু যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কথার জবাব দাও না।"

মাঝি তখন অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত বলিল, "বল্‌ব আর কি কর্ত্তা? আমাদের এই বাবুটী যেমন সদাশয় (?), তেমন ত পুলিশের সকল বাবু নন! অনেক বাবুই আমাদিগকে জোয়ার-ভাঁটায়, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে অনাহারে অনিদ্রায় খাটাইয়া বেজায় কষ্ট দেন। খুন জখম চুরি ডাকাতি ইত্যাদি মোকদ্দমার সংবাদ পাইলে তাঁহারা ঘটনা-স্থলে পৌঁছিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তখন তাঁহারা নৌকায় যাইতে-ছেন কি ষ্টীমারে যাইতেছেন, সে কথাটা যেন ভুলিয়া যান, কেবল বলেন, 'ও মাঝি, জোরে চালাও, আরও জোরে চালাও,—ভারি দেরী হয়ে গেল যে!' যদি বলা

যায়, 'বাবু বেগণ * হ'য়ে গেছে। নৌকো এখন চালাব কেমন করে?' অমনি বাবু তেড়ে উঠে বলেন, "বেগণ হয়েছে, ত ভারি বয়ে গেছে,—দাঁড়ে না চলে ত গুণে নেমে যা,—গুণের পথ না থাকে ত লগি খুঁচিয়ে চল, বজ্জাতি করে যদি কাজ নষ্ট করিস্, তবে এক পয়সাও ভাড়া পাবি নে, জানিস?' কাজেই আমরা প্রাণপণে নৌকা বাইতে সুরু করি। ষ্টীমারের যে ইঞ্জিন, সেও কয়লা আর জল না পেলে চল্‌তে পারে না,—পুলিশের বাবুরা আমাদের ইঞ্জিনের চেয়েও বোধ হয় ভাল কল বলে মনে করেন,—সেজন্যে আমরা নাওয়া খাওয়া কর্‌তে চাইলেও নৌকা থামাতে দেন না! থানায় ফেরবার সময়েও আবার 'চল্ চল্, শিগ্‌গির চল,—না-জানি, এ ক'দিনে থানার কি হয়ে গেছে,' বলিয়া তেমনই তাড়া দিতে থাকেন! এত খাটুনির পর যেই ভাড়া চাওয়া গেল অম্‌নি কসাকসি আরম্ভ হইল। নৌকা ভাড়া কর্‌বার সময় যা চাই, বাবুরা তাতেই রাজী, কিন্তু টাকা দেবার বেলাই ঢু-ঢু। বাবুরা ত ঘাটে-ঘাটেই, যেখানে যে মোকদ্দমা থাকে, সব মোকদ্দমার আসামী ফরিয়াদী দু'পক্ষের কাছ থেকেই নৌকাভাড়া বলে গণ্ডা গণ্ডা টাকা আদায় করেন। কেউ দু'-চার-আনা কম দিতে চাইলে আমাদের সাক্ষ্য মানিয়া বলেন, 'জিজ্ঞাসা কর না মাঝিকে রোজ কত ভাড়া—'। আমরাও পাইবার আশায় এক টাকার জায়গায় দেড় টাকা হাঁকিয়া বসি। পক্ষগণও আর সামান্য টাকার জন্য দারোগার কোপ না জন্মাইয়া যাহা চান দিয়া ফেলেন। সে টাকাটা কিন্তু আমা হাতে আসে না,—বাবুর নজরের টা সঙ্গে সঙ্গে নৌকাভাড়ার টাকাটাও ক বলের হাতে পড়ে,—বাবুরা নিজ হ কখনও কারও কাছ হইতে এক গ্রহণ করেন না। কাজ-অন্তে থ আসিয়াই বাবু সটান বাসায় চলিয়া কনষ্টেবল মহাশয় দিন যত দিন ততটা টাকাও আমাদিগকে দিতে না,—বলে, 'বেটা, সে কেন ত দণ্ড বেলা থাকতেই থানা থেকে রওনা গেলাম, সে দিনের আর ভাড়া পাবি তার পরদিন থেকে বিশ্রাম কর্‌।' দণ্ড থাকতে নৌকা ছাড়া হয়েছিল, কথা ঠিক্ বটে,—কিন্তু সারাটা রাত্রি নৌকা ঠেলে গেলাম, সে পরিশ্র কনষ্টেবল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আন্‌লে যেখানে পাব ন্যায্য পাঁচ টাকা, সে ফকিরের ভিক্ষার মত বড়-জোর দুটো ট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যদি অত কম নিতে আপত্তি করা যায়, তবে "আচ্ছা, তা'হলে এখন চলে যা, আসুন, তখন যত নিতে পারিস্ নিবি, বাবু আমাকে এর চেয়ে বেশী ভাড়া দে হুকুম দিয়ে যান্ নি, আমি কোথা থে দিব?' তিনদিন তিন রাত্রি খাটিয়া কো একটু বিশ্রাম করিব, তা না, আব বাবুর খোঁজে আসিতে হইবে! হয়ত ত আসিয়া শুনিব যে, বাবু অন্য কা

* প্রতিকূল স্রোতঃ।

াথায় চলিয়াই গিয়াছেন! কাজেই কনষ্টে- য়াহা দিল, তাহাই হাতে লইয়া বাবুর ার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কনষ্টেবল, ী, জমাদার সকলে অমনি তাড়া ারম্ভ করিল, 'ওখানে দাঁড়ালি কেনরে টা, বাবু তিন দিন তিন রাত্রি কত টিয়া আনিয়া, সবে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন, র মধ্যে আবার তাঁকে ত্যক্ত করিতে লি কেন? ভাড়া ত পেয়েছিস্, আবার ক চাস্? কোন কথা থাকে, একটু পরে াসিস্। আমরা ত আর থানা সমেত ালিয়ে যাব না,—ভয় কি?' মজা খুন—বাবুর বেলা বলা হলো, তিন দিন তিন রাত' কিন্তু ভাড়া দিবার ময় দুই রোজের বেশী দেওয়া হল না! ন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলে, এমন াহস কার? তাড়া খেয়েও যদি সেখানে াড়িয়ে থেকে "বাবু," "বাবু," বলে ডাক দেওয়া গেল, তা আধ-ঘণ্টার মধ্যে কোন াড়াই পাওয়া গেল না। নিতান্ত নাছোড়- ান্দা হয়ে যদি তখনও ডাকাডাকি বন্ধ না রিলে, তবে হয় ত বাবু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া াহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে হে াপু, তোমরা অত চেঁচামেচি কচ্চ কেন? কি চাও? বাড়ী কোথায় তোমার?' ায় রে! তিন দিন তিন রাত যে বাবু আমার নৌকায় কাটাইয়া আসিলেন, আজ আবার তিনি আমাকে দেখিয়া চিনিতেও পারিলেন না! নিজের পরিচয় দিয়া ভাড়ার টাকা চাহিবামাত্র তিনি কনষ্টে- বলকে তাড়া দিয়া উঠিলেন, 'এখনও ইহাদের ভাড়া দাও নাই কেন?' কনষ্টে- বল অগ্রসর হইয়া বলিল, 'সে কি কথা? ভাড়া ত আমি কোন্‌কালে দিয়েছি। —বেটা বজ্জাতি করে আবার তবু আপনাকে ত্যক্ত কর্‌তে গিয়েছে?' যেই কনষ্টেবল এই কথা বলেছে, বাবু অমনি পায়ের জুতা খুলে 'তবে রে বেটা হারাম- জাদ—জোচ্চোর, এত বড় আস্পর্দ্ধা, থানার উপর ফাঁকি দিয়ে দু'বার ভাড়া নিতে এসেছিস্,—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা?' বলিয়া মারেন আর কি! ইহাতেও যদি হাত যোড় করে বলা যায়, 'হুজুর, তিন দিন তিন রাত খাটিয়া যদি দুইটিমাত্র টাকা পাওয়া যায়, তবে আমাদের কেমন করিয়া চলে? অমনি বাবু বলেন, 'ওহো! দু'টাকা পেয়েও তোমরা সুখী হও নাই,—আচ্ছা, বেশ, দেখি টাকা দুটো, দাও ত আমার হাতে' —যেমন টাকা দুইটী হাতে দেওয়া গেল, অমনি তিনি বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আশা করিতেছি, বাবু বোধ হয় একখানা পাঁচটাকার নোটই আনিয়া দিবেন। শোভান আল্লা! সে আশায় ছাই পড়িতে বিলম্ব হইল না। বাবু তাঁহার চাকরের হাত দিয়া একটি টাকা আর আট আনার পয়সা পাঠাইয়া দিয়াছেন! চাকর বলিল, 'বাবু বলিয়াছেন যে, আপ্-খোরাকী ভাড়া রোজ বার-আনা,—তোরা ত প্রত্যহ দু'বেলা খোরাকীও পেয়েছিস্, কাজেই রোজ আট-আনার বেশী কিছুতেই পাবি না,—হাতীর মত যোয়ান এক এক বেটা, চার আনায় তোদের একজনেরও দুবেলা খোরাকী হয়

না। যা হোক, বাবু দয়া করে আট আনা হিসাবে তিন দিনে পূরা দেড় টাকাই দিয়েছেন। এই নিয়ে যা তোরা,—এখন গিয়া ঘাটেই থাক্, মকিমপুরে একটা বড় চুরি হয়ে গেছে,—বাবু নেয়েখেয়েই সেখানে যাবেন। তোদের নৌকাখানা নাকি ভাল, বাবু আবার তোদের নৌকাতেই যাবেন—'। শুনিবামাত্র আমাদের পেটের পিলে চম্‌কে উঠ্‌ল,—আর 'ভিক্ষায় কাজ নাই বাবা, তোর কুকুর ঠেকা' বলিয়া মনে মনে বাবুকে 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক', আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দে সটান দৌড়! তারপর ঘাটে আসিয়াই লম্বা চম্পট! এই ত গেল মফঃস্বলের কথা। যদি বদলী বা খাজনা লইয়া একস্থান হইতে অন্যত্র বাবুদেরে লইয়া যাওয়া হয়, তবে ত ভাড়া আদৌ দিতে চায় না,—বলে, 'এখন টাকা পাব কোথায়? আগে বিল করি, সরকার থেকে টাকা পাই, তারপর ত তোদের টাকা দেব। টাকা কি আর আমার বাক্সে মজুত আছে? মাস্‌কাবারে যখন বিল পাশ হয়ে আস্‌বে, তখন খবর দেব, এসে রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে যাস্!' কাজেই বুঝতে পারেন যে, আমরা কেন বাবুদের নৌকা ভাড়া দিতে ভয় পাই! কি বল্‌ব বাবু, নেঙ্গটি-পরা বয়স থেকে নৌকা বেয়ে বেয়ে দাড়ী-চুল পেকে গেল, অনেক দেখে-ঠেকেই এই রকম কর্‌তে হয়।"

মাঝির এই সুদীর্ঘ কাহিনী একটু রঞ্জিত হইলেও, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে আমার জিহ্বাতেও বাধে, কাজেই আর ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া 'মৌনং শোভনং' নীতি অবলম্বন করিয়া দাবা-ব লইয়া কেদারবাবুর সহিত সম্মুখ-সংগ্রা প্রবৃত্ত হইলাম।

পর দিন অতি প্রত্যূষেই আমাদের নৌ ডেফলতলা থানায় উপস্থিত হইল আমাদের গমন-সংবাদ শ্যামবাবু পূর্ব্বে পত্রযোগে অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহা অত সকালে ঘাটে পায়চারি করি দেখিয়া বোধ হইল যে, তিনি যে আমাদের আগমনের জন্যই প্রতীক্ষা করি ছিলেন। কেদারবাবুর পিতাত ভা ডেফলতলা কাছারীর নায়েব, নৌকা ঘা ভিড়িবামাত্র কেদারবাবু সেইখানে চলি গেলেন। তিনি আমাকেও তাঁহার অনুব হইতে অনুরোধ করিলেন, আমি জি কাটিয়া বলিলাম, "আরে রাম, তাও কি হয় মশা'য়, শ্যামলালবাবুকে আগে থেকে খবর দিয়ে রেখেছি, এখন অন্যত্র গেলে তিনি কি মনে করবেন?" শ্যামলালবাবু সঙ্গে এক থানায় কাজ করিবার সৌভাগ্য না ঘটিলেও তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচ পূর্ব্ব হইতে ছিল। সাক্ষ্যদান বা অন্য কোন কার্য্য-উপলক্ষে সদরে গেলেই তিনি আমাদের থানায় একবার পদধূলি দিয় ও সকলের কুশল-সংবাদ লইয়া আপ্যায়িত করিয়া আসিতেন। সময়ে অসময়ে দুই একবেলা এই দীনের কুটীরে আতিথ্য স্বীকার করিয়াও কৃতার্থ করিয়াছেন। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য তিনি নৌকার নিকট আসিবামাত্র আমি নমস্কার করিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং তিনিও

তি-নমস্কারান্তে আমার শারীরিক ও রিবারিক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দারবাবুকেও সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া নায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দারবাবু যথেষ্ট বিনয়ের সহিত সে নুরোধ এড়াইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার য় কেদারবাবুর চক্ষু দুইটি যেন আমার কে একটু বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল, তখন আমি ইহার কোন হেতু উপলব্ধি রিতে পারিলাম না।

শ্যামলালবাবু প্রায় আমার পিতার য়সী, এবং একজন সিনিয়র অফিসার, াজেই আমি যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার ছনে পিছনে গিয়া থানা-ঘরে উপবিষ্ট ইলাম। একথা সেকথা বহু কথার পর াজের কথা আরম্ভ হইল। আমি যে মোকদ্দমা-পরিচালনের জন্য তারাপুর লিয়াছি, সেই মোকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত কে একে তাঁহার নিকট জানিয়া লইলাম। য়জন আসামী, কাহার কয়টি পূর্ব্ব-শাস্তি (Previous conviction) আছে, কে কয়টা মোকদ্দমায় কি কি কারণে সন্দিগ্ধ হইয়াছে, কাহার সংসারে কয়জন খাইবার লোক, কাহার কত বিঘা জমি-জমা আছে,—কাহার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ সাক্ষীদ্বারা কি কি বিষয় প্রমাণিত হইবে, —একে একে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কথাই সংক্ষেপে নোট-বহিতে টুকিয়া লইলাম। াহাতে আসামীগুলি সকলেই শ্রীমন্দির র্শন করে, সেজন্য মোকদ্দমাটী বিশেষ নোযোগের সহিত পরিচালন করিবার জন্য শ্যামলালবাবু পুনঃপুনঃ আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমিও যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটি করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে,—কথাবার্ত্তায় এতক্ষণ স্নানাহারের চিন্তা মনেও আসে নাই। ঘড়ির দিকে চাহিয়াই মনে পড়িল, পূর্ব্ব রাত্রে আমাদের কিছুই আহার হয় নাই,—কাজেই শ্যামলালবাবু সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি আত্মীয়তার ভাব দেখাইয়া বলিলাম, "আর কেন মশায়, এইবার উঠে পড়ুন, স্নানাহার করা যাক্‌গে,—।" আমার কথায় শ্যামলালবাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল,—তিনি বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তাই ত, তাইত, বেলা যে ঢের হয়ে গেছে,—সহরে থেকে তোমাদের সকাল সকাল খাওয়ার অভ্যাস,—তা বেশ, এখন তুমি ওঠ। আমাদের ত আজ একাদশী,—আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়,—বেলা গেলে যা হয় একটু ফলটল খাব,—তা তুমি ভায়া যাও, স্নানাহার সেরে ফেল,—বৈকালে কিন্তু আমার একটু কাজ করে দিতে হবে।" আমি বলিলাম, "তা বেশ ত, আহারান্তে যা বলেন করে দেব। এখন একটু তেল দিতে বলুন, স্নানটা করে আসি।" শ্যামলালবাবু অমনি, "কানাই, কানাই, ও কানাই,—আঃ, বেটা যেন কুড়ের বাদশা,—কোথায় গেলি, ও কানাই—" বলিয়া হাঁক দিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একটী কৃশকায় ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্যামলালবাবু তাহাকে একটু তৈল আনিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্যটি অত্যন্ত

কুণ্ঠার সহিত বলিল, "আজ্ঞে, তেল কোথায় পাব? আজ রান্না হবে না বলে ত তেল মোটে আনাই হয় নি,—সেই কাল দুপুরে যে দু-পয়সার তেল আনতে দিয়েছিলেন, তা'ত কালকেই প্রায় শেষ হয়েছিল,—শিশির-তলায় যা একটু-খানি ছিটে-ফোঁটা ছিল, তাও আজ সকালে আপনার আফিঙ্গে মেখে দিয়েছি,—তেল ত আর নাই—"! শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম! শ্যামলাল বাবু কি তবে আমার পত্র পান নাই? কিন্তু পত্র না পাইলেই বা ক্ষতি কি? আমরা যে আসিয়াছি, সেও ত প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টার কথা,—ইহার মধ্যে কি আর একজনের আহারের যোগাড় হইয়া উঠিতে পারে না? এইবার কেদারবাবুর সেই অপাঙ্গ ভঙ্গির কথাটা আমার মনে পড়িল; অমনি সকল ব্যাপার জলের মত তরল হইয়া উঠিল। হায়, হায়, এত-ক্ষণ যে চর্ব্বা-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কত কি উপাদেয় পদার্থের আশায় রসনা আমার অসংযত হইয়া উঠিতেছিল! নিজের কাছেই নিজের দারুণ লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। কোথায় কত যত্নে আহার করিব ভাবিয়া মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করিতেছি, —আর কোথায় একবারে অরন্ধন,—স্নানের তৈলটুকু পর্য্যন্ত নাই!

ঘরে তৈল না থাকা, এবং অহিফেন-সেবনের অভ্যাস থাকা, এই দুইটী অগৌ-রবের ব্যাপার যুগপৎ আমার গোচরীভূত করাতে শ্যামলালবাবু কানাইয়ের উপর বড়ই অপ্রসন্ন হইলেন, ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, —"যা, যা, বেটা গোবরগণেশ, দূর হয়ে যা,—বুদ্ধির ঢেঁকি বেটা,—যা দেখ্ বিনুর বাসায় তেল আছে কি না,—থাকে ত একটু তেল এনে দে—"। বিনোদ দে শ্যামলালবাবুর জমাদারের নাম,—সে শ্যামলালবাবুর অধীনে টাউন-চৌকিদারী, কনষ্টেবলী এবং বক্সীর কাজ করিতে করিতে বাইশ বৎসর পরে এতদিনে জমাদারের পদে প্রোমোশন পাইয়াছে,—শ্যামলালবাবু কিন্তু এই পদোন্নতিতেও বিনোদকে সেই সাবেক আদরের নাম "বিনু" বলিয়াই ডাকেন,—তাই বিনোদ ইহাতে তেমন সন্তুষ্ট নয়, অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারে না। কানাই বিনোদবাবুর বাসায় তৈল আনিতে যাইবার পূর্ব্বেই বিনোদবাবু স্বয়ং তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্যাম-লালবাবু অত্যন্ত অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন, "দেখেছ বিনু, আমার কপাল,—ভায়া ত (আমার দিকে তাকাইয়া) কোন দিন এদিকে পদার্পণ করবেন না,—আজ যদিও-বা ভাগ্যগুণে শুভাগমন হলো, তাও কি না একাদশীর দিনে, যেদিন আমাদের ঘরে হাঁড়ীই চড়ে না! কথায় কথায় বেলাও হয়ে গেছে ঢের,—ভায়া যে কোথায় কি খাবার যোগাড় করেছেন, তার কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। একটু স্নানের তেল যে দেব কানাই বেটা সে উপায়ও রাখেনি। তুমি বাবা একটুখানি তেল তোমার ঘর থেকে ঝট্ করে ভায়াকে এনে দাও ত!" ক্রোধে ও ঘৃণায় আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিতেছিল,—অনেক কষ্টে সে ভাব

দমন করিয়া বলিলাম, "না, না, না, আর তেল আনতে হবে না,—একেবারে বাজারে গিয়েই স্নানাহার করব, তেল সেখানেই পাওয়া যাবে।" বিনোদ বেচারী আমার কথায় বড়ই অপ্রতিভ হইয়া গেল,—সে বোধ হয় জানিত না যে দারোগার গৃহে সেদিন "অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ"। তেল দিতে সে আর সাধ্যসাধনা করিল না; তবে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমার সহিত বাজার পর্য্যন্ত গিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। আমি ধন্যবাদের সহিত সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া নৌকা খুলিয়া নদীর অপর পারে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে ভাল খাবার কিছুই নাই,—সামান্য কিছু বাতাসা ও মুড়ি পাওয়া গেল, তাহা দিয়াই একটু জল খাইয়া রামদীনকে লুচি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম।

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

চয়ন

মার্কিন-কবি উইল্‌কক্স

এলা হুইলার উইলকক্স মার্কিন দেশের জনপ্রিয় মহিলাকবি। উইলকক্সের জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার সাহিত্যানুরাগিনী জননীর প্রাণে একটা অদ্ভুত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এবারে তাঁহার কন্যা-সন্তান জন্মিবে, এবং সে বড় হইয়া সাহিত্যের সেবাতেই জীবন সমর্পণ করিবে। তাহার ফলে কুমারী এলা আপনার শৈশবচাপল্যে ও নবআয়ত্ত বিদ্যার উৎসাহে যেখানে-সেখানে যাহা-কিছু লিখিতেন তাহাতেই পরিবারের সকলের একটা উৎসাহ দেখা যাইত।

তিনি নিজেও বলেন—"বাস্তবিক, ছেলে-বেলায় আমার মা আর বাবা আমাকে কি উৎসাহটাই দিতেন! সাত বৎসর বয়সের সময়,—তখন বছর-দুই সবে লিখতে শিখেছি আর কি,— আঁকা-বাঁকা, ছোট-বড় অক্ষরে যেখানে সুবিধা পেতুম, আপনার খেয়ালে দু-চার লাইন ছাইভস্ম লিখে ফেল্‌তুম; আমার বাবা ও মা সেগুলো দেখলেই ভারি খুসি হয়ে আমাকে আদর করে, পিঠ চাপড়ে নানা রকমে খুব উৎসাহিত করতেন; বাবার অবশ্য আমার সম্বন্ধে যে বিশেষ উঁচু ধারণা ছিল তা নয়; মা কিন্তু মনে করতেন আমি সেক্সপীয়র বা এমার্সন বা অমনি একটা-কিছু হব। আমাদের বাড়ীর আর সকলেও তাঁদের দেখাদেখি আমার বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন।"

এই রকমে পরিবারের সকলের নিকট হইতে সতত উৎসাহ লাভ করিয়া কুমারী এলার মনে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব

বেশ সুস্পষ্টরূপে জাগরূক হইয়া ছিল। তিনি আট বৎসর বয়সের সময় রীতিমত খাতা বাঁধিয়া সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দেন; পনেরো-ষোল বৎসর বয়সের সময় এই শিশু, পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। স্থানীয় কোনও একখানি কাগজের অফিসে তিনি ছোট ছোট তিনটি কবিতা লুকাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কয়দিনের ভিতরেও কোন উত্তর না পাইয়া নবীন কবি যখন কবিতা-প্রকাশের আশা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছেন, তখন একদিন সকালে খাইতে বসিয়া একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সম্পাদকের জবাব পাইলেন। তাঁহার কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া, সম্পাদক মূল্যস্বরূপ একখানি চেক পাঠাইয়া দিয়াছেন!

কাগজে কবিতা প্রকাশিত হইলেই যথেষ্ট, —আবার তাহার উপর টাকা, কেন— কিসের জন্য? তিনি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! তাড়াতাড়ি পিতা মাতাকে সেই চিঠিখানি দেখাইলেন—ওঃ! সেদিনকার আনন্দ তিনি জীবনেও ভুলিবেন না! এই বয়সে লিখিয়া একেবারেই টাকা পাওয়াতে বাড়ীর সকলেই অবাক হইয়া গেলেন! মাতা চুম্বনে চুম্বনে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পিতা এতদিন মাত্র আমোদ উপভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহ দিলেও, তাঁহার কন্যা যে কেবল দখিণ হাওয়া, জ্যোৎস্না আর পুষ্প-সৌরভ লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে— মনে মনে এটা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। আজ কিন্তু তিনিও কন্যার এই অভাবনীয় সাফল্যে পুলকিত হই উইলকক্সকে পুরস্কার দান করিলেন ফলে, কবির উৎসাহ এত বাড়িয়া গেল তিনি যখনই একটু সময় পাইতেন, তখ কবিতা লিখিতে বসিতেন। কিন্তু যা লিখিতেন তাহাই ছাপা হইত না; অনেক স তাঁহার ডাকটিকিট খরচ করিয়া সম্পাদক কাছে লেখা পাঠানোই সার হইত। এ তাঁহার পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া মেয়েকে বাজে খরচ করিতে মানা করিতেন।

একবার উপর-উপরি ছয়মাস দেশে কোন সম্পাদক তাঁহার ক ছাপা মিঃ হুইলার মেয়েকে তিরস্ক করিলেন। কিন্তু চতুর্থ মাসের প্র সপ্তাহে উইলকক্স আবার কবিতার জ একখানি চল্লিশ ডলারের পাওয়াতে তাঁহার পিতার সকল অসন্তোষ দূর হই গেল। কন্যার কবিত্বশক্তি বুঝিয়া তি আর কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই

মিসেস উইলকক্স বলেন—"একদি বাবা সহরের বাহিরে গিয়াছিলেন; য ফিরলেন তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে বাবা ফিরে এসেই তাড়াতাড়ি একেবা আমার ঘরে হাজির—আমার তখন ভাল করে ঘুম ভাঙ্গেনি—তাড়াতা আমাকে তুলেই তিনি সেই রাত্রে আম কবিতার পক্ষপাতী একজন পাঠকে কথা আমাকে বল্লেন। তাঁর সঙ্গে লোকটির ট্রেণে আলাপ হয়েছিল। মে সুখ্যাতি শুনে বাবা আমার এম আনন্দিত হয়েছিলেন যে, নিজে ত রাত্রি একবার চোখের পাতা বোজেন

ার তাকেও ঘুমতে দেননি! লোকটাও নি পাগল যে, সে নাকি আবার আমার বিতার লাইন তুলে তুলে বাবাকে নিয়েছে! জীবনে প্রশংসা আমি অনেক য়েছি, কিন্তু এর চেয়ে বড় প্রশংসা আমি ার কখনও পাই নি।"

জীবনে নিন্দাও তাঁহার যথেষ্ট লাভ য়াছে। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে ন তিনি আপনার স্নেহপূর্ণ পরিবারের ণ্ডী ছাড়িয়া বাহিরের পৃথিবীর সহিত প্রথম রিচয় লাভ করিলেন, তখন হইতেই লোকে াঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া আসিয়াছে। াকে ক্রমাগতই তাঁহার মনের মধ্যে এই া বেশ করিয়া গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা য়াছে যে, তিনি যাহা-কিছুই লিখুন না ন, তাহা তাঁহার বহু পূর্ব্বে বলা হইয়া য়াছে, তিনি নূতন কিছুই বলিতে পারিবেন —কেবল চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিবেন মাত্র;— কি যখন তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার বার উপায় ছিল না, যখন তাঁহার র আমেরিকার একপ্রান্ত হইতে অপর ন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, নও অবধি লোকে তাঁহাকে তৃতীয় ীয় কবি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে হে নাই। বড় বড় সমালোচক পর্য্যন্ত য়ার কবিতা কেবলমাত্র পদ্য, এই া দান করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে ই হন নাই। তার পর এমন দিন সিল, যখন এই সকল সমালোচকই আবার তে বাধ্য হইলেন যে, মিসেস উইল-য়ের কবিতা মার্কিণ-সাহিত্যে নবযুগের র্ত্তন করিয়াছে। তাঁহার Laugh and the world laughs with you" পড়িয়া আমেরিকাবাসী মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম দিয়াছিল The poet of ever-lasting laughter বা চিরহাস্যের কবি। তাঁহার কবিতা পড়িলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যত মন্দই হউক না কেন তাহার মধ্যে যে ভালর অঙ্কুর নিহিত আছেই;—এ-কথা তিনি নিজেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এবং বারবার উচ্চকণ্ঠে এই সত্যই তিনি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা যেমন সরল, তেমনি কোমল।

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলেন— "আমার মনে হয় বিশ্বস্রষ্টার এই বিরাট সৃষ্টির অংশরূপে আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারা, তাঁহার বাণী উচ্চারণ করিবার শক্তি লাভ করা এবং তাঁহার কর্ম্মের কর্ম্মী হইতে পারাই আমাদের জীবনে পূর্ণতা লাভ এবং পরিপূর্ণরূপে সন্তোষলাভ করিতে পারিবার একমাত্র উপায়, ইহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। জীবন বলিতে আমি কেবলমাত্র এই পার্থিব জীবনটুকু মনে করি না। আমি জীবনের উপাসক, নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুলফলে আমি জীবন দেখিতে ভালবাসি, পার্থিব এই জীবন, লোকান্তরের সেই মহাজীবনের উপক্রমণিকা মাত্র, ইহাই আমার বিশ্বাস, ইহাই আমার বক্তব্য—।"

মিসেস্ উইলকক্স পরমেশ্বরকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তিনি সহমর্ম্মিতা, মঙ্গলানুভূতি ও মানবতা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

নানা ধর্ম্ম নানা জাতি
নানা পন্থা নানা গতি
করে খালি গণ্ডগোল
বুঝিবে না হায়,
কণামাত্র দয়া শুধু
ধরা যাহা চায়।

মিসেস উইলকক্সের মতে এই কবিতাটিই তাঁহার সর্ব্বোত্তম রচনা। ইহা যতবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহার আর কোনও কবিতা ততবার হয় নাই।

সৌন্দর্য্য না থাকিলে জীবন সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় না, তাই তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসনা করেন। তাঁহার বয়স এখন যথেষ্ট হইলেও তাঁহাকে অতি তরুণীর মত দেখায়; সেইজন্য আমেরিকার লোকে তাঁহার নাম দিয়াছে, "চিরযৌবনা।" এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন—"সৌন্দর্য্যই জীবনের চিহ্ন, জীবনের লক্ষণ, যাহাতে জীবন নাই, তাহাতে কোন সৌন্দর্য্যও নাই, প্রকৃতির মধ্যে চাহিয়া দেখিলেই এ-কথা বুঝা যাইবে; কাজেই আমি মনে করি, প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিরই সুন্দর হইবার এবং সৌন্দর্য্যের সাধনা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহাই আমার Philosophy বা দর্শন, আমি ইহা বর্ণে বর্ণে পালন করিবার জন্য সারা জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছি। যে ব্যক্তি সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার সুন্দর হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক। কারণ আমরা সকলেই চিন্তার ফলমাত্র, মনে যেরূপ চিন্তা করা হয়, শরীরের উপর সেই চিন্তার হুবহু ছাপ পড়িয়া যায়। আমার মতে সৌন্দর্য্যলাভের জন্য তিনটী পথ আছে। প্রথম আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় মানসিক ও তৃতীয় শারীরিক। সর্ব্বদা পুতচরিত্র হইয়া শুদ্ধান্তঃকরণে সকল প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিতে, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে এবং সকল জীবে ভ্রাতৃভাব দেখিতে হইবে। অসৎ সংসর্গ ত্যাগ করিবে, কিন্তু অসৎ লোককে ত্যাগ করিতে বলিবে না। প্রাণ খুলিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার পতনে দুঃখবোধ করিতে হইবে,—ইহা আধ্যাত্মিক জীবনের সাধন-প্রণালী। দ্বিতীয় প্রণালী মানসিক:—মনকে সর্ব্বদা বিভিন্ন ভাব ও উপভোগ্য বস্তু লাভ করিতে অবসর দেওয়া আবশ্যক। তৃতীয়, শারীরিক সাধনা:—অল্পাহার, গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বিশেষ বিবেচনার সহিত সাম্যব্যায়ামের অভ্যাস। ইহাই সৌন্দর্য্যলাভের উপায়।

বিশ্ব-মানবতার গতির সহিত সম্পূর্ণরূপে যোগ রাখিয়া সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা আমার মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য মানুষের জীবনে কেবল বসন্ত, ফুল ও জ্যোৎস্না নাই, সেখানে মাঝে মাঝে দুঃখ-শোকের অবসাদে প্রাণমন আচ্ছন্ন হইয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবান মঙ্গলময়। তিনি দুঃখ দেন একগুণ, আর সুখ দেন তার তিনগুণ। জীবনে আমি ঢের জ্বালা সহিয়াছি, কিন্তু দুঃখের পর আমি আবার সুখের যে স্বাদ পাইয়াছি, মুখে তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। জীবনের তুলাদণ্ডে

কাঁটায় কাঁটায় সমান হইবেই-হইবে। বালিকা ছিলাম, তখন অসীম পিতামাতার আদরিণী হইয়া কালযাপন করিয়াছি; তারপর যখন তাঁহাদের স্নেহনীড় ছাড়িয়া আর একজনের সহিত আমার জীবন-সূত্র গ্রথিত করিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম বুঝি বিশ্বে আমি এবার একেবারেই অসহায় হইয়া পড়িব। কিন্তু আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। আমার জীবন-দেবতার সুন্দর মন, উদার হৃদয়, ও মহাপ্রাণতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার সবল বাহুর চির-প্রহরায় আমি এতদিন যে সুখ, যে নির্ভরতার সহিত কালযাপন করিয়াছি তাহা আমার শৈশবের মায়ের কোল হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।"

মিসেস উইলকক্স বিশ্বাস করেন যে, কবি হইয়া না জন্মিলে কেহ কবি হইতে পারে না। তিনি বলেন, কবিমাত্রই "Inspired", পরমেশ্বর কবিকে ভাবসম্পদ দান করিয়া থাকেন, তিনিই তাহাকে কাব্য-রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন, সে অনুপ্রেরণা কবি ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করে এবং চিরজীবন তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না।

মিসেস উইলকক্স গদ্য-রচনাও করিয়াছেন; তবে তাঁহার কাব্যের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। তাঁহার মতে The woman of the world নামক বইখানিই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গদ্য-রচনা।

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত।

জ্ঞানের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি

বি, ম্যাসন হেডিকার বিলাতের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। মিঃ হেডিকারকে আক্ষরিকই জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিঃ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি যে পরিমাণ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কল্পনা করিলেও, বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হয়। অধুনা সাধারণের মধ্যে "জ্ঞানী" আখ্যার যোগ্য হওয়া বড়ই কঠিন; কারণ, জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা আজকাল এতই অধিক, যে তাহার ইয়ত্তা হয় না; মিঃ হেডিকার বিশিষ্টরূপে অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্ ব্যক্তি। তাঁহার প্রতিভা যে কেবল জ্ঞানের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ, তাহা নহে; তিনি অনেকগুলি বিষয়েই তুল্যরূপে পারদর্শী। জ্ঞান-রাজ্যের অন্তর্নিহিত যে-কোনও প্রশ্নের মীমাংসা, তিনি অতি অল্প আয়াসেই করিতে পারেন। দেশ-দেশান্তর হইতে, প্রশ্নমীমাংসার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সুধী-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রত্যহই তিনি নানা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র পাইয়া থাকেন এবং স্বীয় অদ্ভুত জ্ঞান-প্রভাবে সেগুলির যথাযথ সদুত্তর-দানে প্রত্যেকেরই প্রীতি, আনন্দ ও ভক্তি আকর্ষণ করেন। ইহার জন্য তিনি কোনরূপ মূল্য বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। পত্রদ্বারাই হউক বা স্বয়ং



বি, ম্যাসন হেডিকার

আসিয়াই হউক, এ-পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য তাঁহার নিকটে আবেদন করিয়া বিফলকাম হন নাই। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে অষ্ট্রীয়া, ইটালী, ফ্রান্স, রুষিয়া, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য অনেক রাজ্যের বিভিন্ন প্রকারের পারিভাষিক তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মিঃ বি, ম্যাসন হেডিকার লণ্ডন-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি বিজ্ঞান-বিভাগের লিনীয়ান্-সমাজের একজন সভ্য। অর্থশাস্ত্রে ও রাজনীতি-বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহুব্যক্তি তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মত অনেক সময়ে মন্ত্রীসভার শাসন-প্রণালী ও 'পার্লামেণ্টে'র আইন-গঠনোদ্দেশ্যে বিশেষরূপে সহায়তা করে। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তকাগারের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক পুস্তকাবলী তাঁহার রীতিমত অধীত। তাঁহার নিজেরও একটী পুস্তকাগার আছে। এই পুস্তকাগারে বিবিধ বিষয়ের অসংখ্য পুস্তক ও চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকাগারের উপস্থিত পুস্তক-সংখ্যা ২৫০,০০০। হেডিকার এই সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে ১,০০০ করিয়া নূতন পুস্তক ক্রয় করিতেছেন। অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক যে সকল অমূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর অন্য কোনও পুস্তকাগারে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার পুস্তকাগারে তাহা অনায়াস-

লভ্য। তিনি নিজে বহুভাষাবিদ্, সুতরাং তাঁহার পুস্তকাগারে বহু ভাষায় রচিত নানা পুস্তকও রক্ষিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগত ভাবে, পত্রদ্বারা বা তারযোগে সহস্র সহস্র ব্যক্তির ও বহু সম্প্রদায় এবং শাসন-বিভাগের প্রশ্নের সমাধান করা ব্যতীত তিনি তালিকাভুক্ত প্রায় দ্বিসহস্র ছাত্রের পাঠ-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। লণ্ডনের অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণের ভিতর হইতে যে-কোন প্রবন্ধ, পুস্তক বা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার প্রত্যেকটির জন্য তিনি দায়ী। মিঃ হেডিকার বলেন, "উপস্থিত আমার হাতে 'সময়োচিত বাণিজ্য' 'রেলওয়ে-নিয়ম-প্রণালী,' 'ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব', 'মধ্যবিত্ত অর্থশাস্ত্র', 'যুদ্ধ' ও 'সাধারণ নগরবাসী' প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক-রচনার ভার অর্পিত আছে।

মিঃ হেডিকারের জনকয়েক প্রতিভাশালী সহকারী আছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার পরম ভক্ত ও তাঁহারই শিক্ষায় শিক্ষিত। ইঁহাদের মধ্যে W. D. Webb, B.S.C., F. S. S., হেডিকারের শক্তিতে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত এবং এই সঙ্গীর সাহায্যে হেডিকার বিগত কয়েক মাসের মধ্যে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়াছেন। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় ভুবন-বিখ্যাত অমূল্য গ্রন্থ "Britannica"র সহিত সুপরিচিত এবং জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে উহার স্থান যে কত উচ্চে, তাহাও বোধ হয়, তাঁহারা সকলে উত্তমরূপে অবগত আছেন। হেডিকারের আনুকূল্যে ওয়েব-রচিত এই সুবৃহৎখানি "Britannica" অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। "Unemployment and Insurance" নামক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা Mr I. G, Gibbon, ছাত্রজীবনের অধিকাংশ পাঠই হেডিকারের পরামর্শমত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মিঃ হেডিকার যে কেবলমাত্র আধুনিক ভাষাগুলিতেই বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন, তাহা নহে; অধিকন্তু বিবিধ প্রাচীন ভাষাও তাঁহার বেশ ভালরকমই জানা আছে। সংপ্রতি তিনি ভারতবর্ষের এটোয়া নামক স্থানের কোন একটী সংস্কৃত পুস্তকাগার সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির অবগতির জন্য তিনি প্রতিমাসেই "Les Meilleiurs Livres" নামে শ্রমসাধ্য ও বহু পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার-সম্বলিত একখানি তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বহু উপাধি-ভূষিত এবং 'কলেজ' ও সুধী-সমাজ-প্রদত্ত প্রভূত পদকপ্রাপ্ত, জ্ঞানের জীবন্ত মূর্ত্তি মিঃ হেডিকারকে যদি কখনও, তাঁহার 'স্কুল' বা 'কলেজ'-জীবন-সম্বন্ধীয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তিনি তাহার যে উত্তর দান করেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তিনি বলেন, "বারো বৎসর বয়স হইতে আমি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছি।" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি ভূষণে ভূষিত না হইয়াও যে অনেকে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ কথা ইতিহাসের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হেডিকারের ন্যায় এত অল্প বয়সে বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মানুষ যে জীবনের মধ্যাহ্নেও এরূপ



ভাস্কর জর্জ গ্রে বার্ণার্ড

সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, ইহা কল্পনা করাও কঠিন।

অল্পদিন হইল, তিনি অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রীসভা, ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় ও জনকয়েক প্রখ্যাতনামা 'পার্লামেণ্টে'র সভ্য এবং সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুর নামক জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, "কি প্রকারে জার্ম্মানী, ফ্রান্সের নিকট হইতে প্রাপ্ত যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণের অর্থ ব্যয় করিয়াছিল," তাহার বিস্তৃত ও নির্ভুল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

হেডিকারের মানচিত্র-রচনা-শক্তিও অদ্ভুত। তিনি বলেন, "দেশের বিংশতিখানি মানচিত্রের মধ্যে ঊনবিংশখানি একেবারেই ভুল।" সম্প্রতি তাঁহার সম্পাদকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কয়েকখানি ভারতবর্ষ, মধ্য-য়ুরোপ ও ট্রান্স-সাইবিরিয়ার বিশেষ মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

মিঃ হেডিকারের বর্ত্তমান বয়স ৩৭ বৎসর মাত্র হইলেও, তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেই এরূপ একটী পুস্তকাগার গঠন করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির, সকল প্রকার প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তর প্রদান করিতে পারে।

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মিত্র।

মানবতার উপাসক

জর্জ গ্রে বার্ণার্ডকে লক্ষ্য করিয়া এক-জন ফরাসী কলাবিদ্ বলিয়াছেন, "শিল্পরাজ্যে তিনিই একমাত্র লোক, যাঁহার সম্বন্ধে বিশেষরূপে কিছু চিন্তা করা যাইতে পারে।" বার্ণাড নিজের সম্বন্ধে বলেন, "আমি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা।" সত্য কথা। যে-সকল শক্তিধর পৃথিবীকে বিচলিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বপ্ন দেখিয়াছেন; এবং যাঁহাদের স্বপ্ন সত্য হইয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রতিভাবান।

বার্ণার্ড যে কি-রকম উঁচুদরের শিল্পী, সে-কথা বুঝাইতে বসা বিড়ম্বনা। পারি-নগরীর "গ্র্যাণ্ড প্যালেসে" যাঁহারা তাঁহার হাতে-গড়া মূর্ত্তিগুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা কেহই বার্ণার্ডের অসাধারণ শক্তিসম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না।

বার্ণাড বয়সে প্রৌঢ়, আকারে মাঝারি। তিনি সামাজিকতার কোন ধার ধারেন না; কারণ সমাজে গিয়া মেলা-মেশার সুযোগ তাঁহার নাই। তিনি কথা কন তাড়াতাড়ি; সাজগোজের জাঁকজমক তিনি মোটেই ভালবাসেন না। আমেরিকার "বেলেফোণ্টি" নামক স্থানে তাঁহার জন্ম।

তিনি খুব গোঁড়া ধার্ম্মিক নন। তিনি পশুপক্ষী ভালবাসেন, নদীর জলে লীলা-চপল মাছগুলি ভালবাসেন, বাতাসে-উড়ন্ত পতঙ্গদলকে ভালবাসেন। স্কুল, পড়ার বই ও মাষ্টার-পণ্ডিত চিরকালটাই তাঁহার চোখের বালি। একমাত্র প্রকৃতিকে তিনি আপনার শিক্ষয়িত্রীর আসনে বরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বজীবনে তিনি বছরে একবার করিয়া

সহরের জনতা ছাড়িয়া মিসিসিপির গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে পলায়ন করিতেন। সেখানে গেলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত—শান্তি, আনন্দ, নীরবতা ও দৈব-প্রেরণার মধ্যে তিনি দিনের পর দিন ও রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া নদীর ধারে বসিয়া থাকিতেন এবং পাখী, বীবর, ইঁদুর ও খরগোশদের অপূর্ব্ব স্বাধীন জীবনকে প্রাণ-মন দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হইলেও, তাহাদের শরীর-তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মাঝে মাঝে পশু-পক্ষী বধ করিতে হইত। তখন সৌন্দর্য্যের চেয়ে সত্যের প্রতি তাঁর বেশী ঝোঁক ছিল; এখন দুয়েরই প্রতি তাঁহার সমান টান। সে-সময়ে শিল্পশাস্ত্রে কোন অভিজ্ঞতা বা শিল্পী হইবার কোন বাসনা তাঁহার ছিল না। কিন্তু আঁকিবার কোন নিয়ম না জানিয়াও যে-সব পশু-পক্ষী তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহাদের ছবি তিনি আপনা হইতে বেশ ভালরূপই আঁকিতে পারিতেন।

এই-সব ছবি দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক 'এন্‌গ্রেভারের' কাছে কাজ শিখিতে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে দুই বছর ধরিয়া তিনি একেবারে নিজের মনের মত করিয়া আঁকিতে শিখিলেন। কোন সামান্য ব্যাপারেও তিনি এমন উচ্চশ্রেণীর কলা-পটুতার পরিচয় দিতেন যে, তাঁহার ওস্তাদও তাঁহাকে তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না!

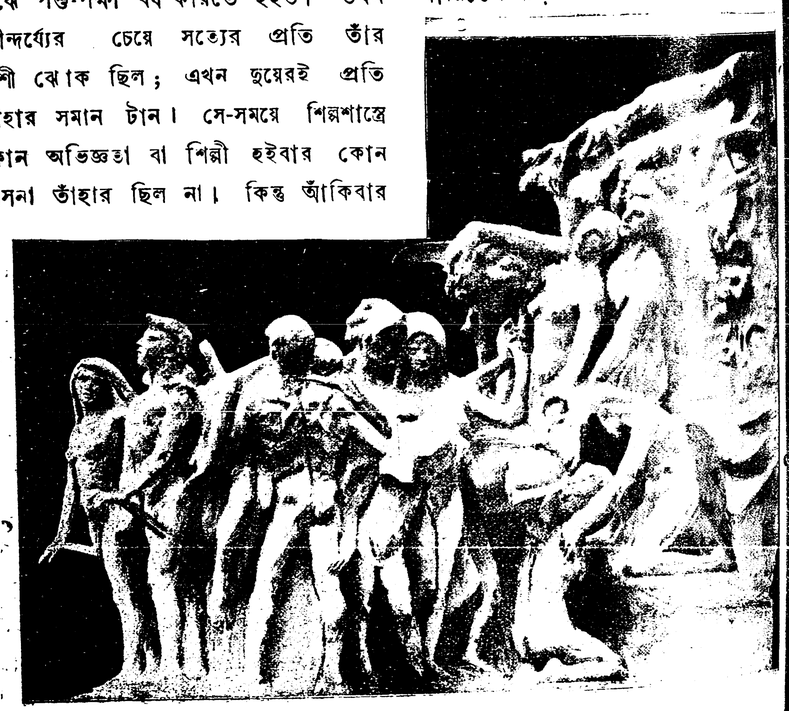

কর্ম্ম ও ভ্রাতৃত্ব

তাঁহার হাতে যখন কিছু-কম আড়াই শো টাকা জমিল, তখন তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য শিল্পকে অবলম্বন করিলেন। ঐ সামান্য টাকার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে কায়ক্লেশে একটি বৎসর কাটাইয়া দিলেন। এমনি কঠোর জীবন-সংগ্রামের পর তিনি "শিকাগো-আর্ট-ইন্‌ষ্টিটিউটে" রক্ষিত কয়েকটি 'প্ল্যাষ্টারে'র ছাঁচ, আদর্শরূপে ব্যবহার করিবার হুকুম পাইলেন। গ্রীক আর্টের সঙ্গে এই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পরিচয়।

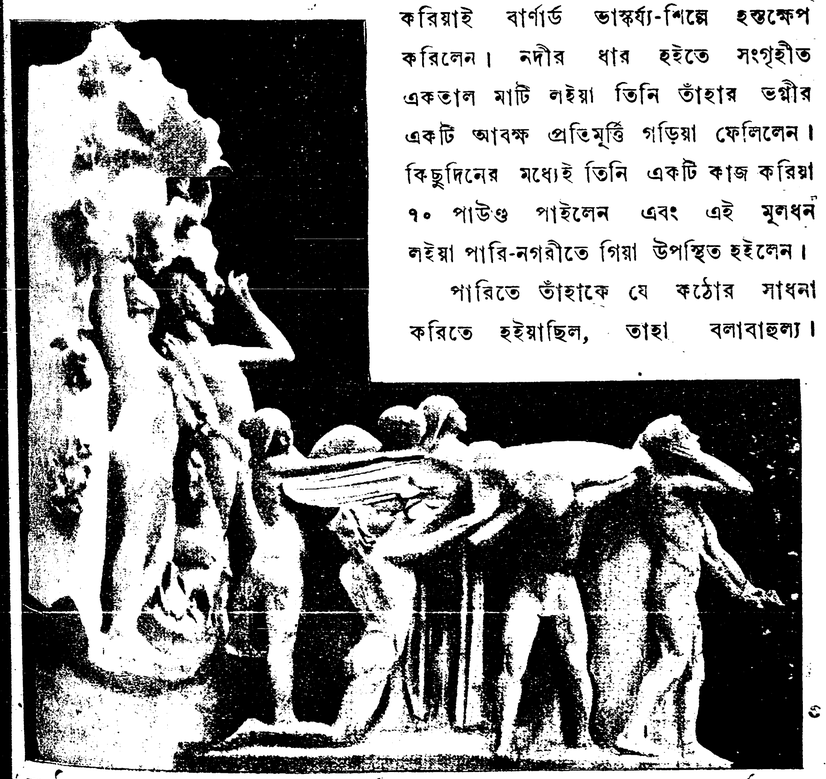

জীবনের বোঝা

বার্ণার্ড বলেন, "স্কুলের কয়েকটা বদ্‌ছেলে ছাঁচগুলির প্রতি কু-ব্যবহার করেছিল, কর্ত্তারা তাই প্রথমটা কিছুতেই আমাকে ছাঁচগুলি ব্যবহার করতে দিতে চাননি। আমি কিন্তু জোর করে তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম যে, ঐ ছাঁচগুলি ব্যবহার করবার একমাত্র যোগ্যপাত্র আমিই। শেষটা অবশ্য আমি অনুমতি পেলাম; এবং ছাঁচগুলির ভিতর গ্রহণযোগ্য যা-কিছু ছিল, অবিলম্বেই তা একেবারে আয়ত্ত করে ফেল্‌লাম।"

অতঃপর, কোনরূপ শিক্ষালাভ না করিয়াই বার্ণার্ড ভাস্কর্য্য-শিল্পে হস্তক্ষেপ করিলেন। নদীর ধার হইতে সংগৃহীত একতাল মাটি লইয়া তিনি তাঁহার ভগ্নীর একটি আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি কাজ করিয়া ৭০ পাউণ্ড পাইলেন এবং এই মূলধন লইয়া পারি-নগরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পারিতে তাঁহাকে যে কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল, তাহা বলাবাহুল্য।

প্রতিদিন নানা শিল্পশালায় গমন করিয়া তিনি নূতন নূতন শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। গ্রীক আর্টের অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়া ললিতকলার গূঢ় কথাটি তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কেবল গ্রীক আর্ট লইয়াই বার্ণাড তুষ্ট রহিলেন না—কারণ তিনি এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগে জন্মিয়া আধুনিকতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি দেখ্‌লাম, গ্রীক আর্টের আদর্শ, দেবতা-গড়া। গ্রীকেরা সুন্দর আকার, সুন্দর প্রতিরূপ গঠন করে বেদীর উপরে স্থাপন কর্‌ত। কিন্তু যেখানে মানবতা ও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলবার দরকার, সেখানে তাদের শক্তি পিছিয়ে পড়্‌ত। দেবতাদের যুগ চলে গেছে;—এটা হচ্ছে মানুষের যুগ। ভাস্কর্য্যে আমি তাই মানুষ ও তার বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই। লোকে বলে, 'মূর্ত্তি গড়ে লাভ কি? যা কর্‌বার তা হয়ে গেছে,'—আমি উত্তর দি, 'না। ভাস্কর্য্যে আমরা এই সবে হস্তার্পণ করেছি মাত্র—পাথরে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্যে সমগ্র মানবতা এখনো পড়ে আছে'।"



যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন

বার্ণার্ডের শিল্পে এই মানবতাই হইতেছে গোড়ার কথা ও আসল বিশেষত্ব। এইটুকু বুঝিলেই বার্ণার্ডের গড়া মূর্ত্তিগুলির সৌন্দর্য্য ও রহস্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

Salonএ তাঁহার গঠিত যে-সকল মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে, সেগুলি দেখিতে গেলে দর্শককেও যেন চিত্রার্পিতের মত হইয়া যাইতে হয়। মূর্ত্তিগুলি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব বিচিত্র। তাহাদের মধ্য হইতে শক্তি ও কাব্য যেন মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অতীতের মাপকাটিতে তাহাদিগকে মাপিতে গেলে তাহারা অপ্রিয় সমালোচনার বস্তু হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমানের কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাহারা সুন্দর ও ভাবাভিরাম।

সুবিখ্যাত ফরাসী-চিত্রকর পল লরেন্স, বার্ণার্ডকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উপসংহারে আমরা তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম:—

"আপনারা কাজ আমাকে আনন্দদান করে। আপনি আপনার বিজ্ঞান

কলাকে করায়ত্ত করিয়াছেন; না—আপনি র চেয়েও বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছেন,—প্রকৃতির সামনে মুখোমুখী হইয়া আপনি াইতে পারিয়াছেন। আমরা—ফরাসী ারা—প্রচলিত রীতি-নীতি ও বাঁধা ইন-কানুনের অধীন; আপনি যেমন সমস্তই নিজের মত করিয়া লইয়া দেখিতে পারিয়াছেন, আমাদের মধ্যে একজনও তেমনটি পারেন না। আপনি সুধু নিজের চোখে দেখিয়াই থামিয়া যান নাই; পরন্তু, দৃষ্ট বস্তুটিকে আকারও প্রদান করিয়াছেন।"

বিনা যাতনায় মাতৃত্ব

বর্ত্তমান য়ুরোপ-ব্যাপী মহাসমর আরম্ভ বার কিছুদিন পূর্ব্বে সমগ্র ফরাসীজাতি ক সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে মাতিয়া ঠিয়াছিল। সংবাদটি এই:—বিখ্যাত ীষধ-শাস্ত্রবিৎ জর্জ্জেস পলিন বহুবৎসর



জর্জেস পলিন

বষণার পর এক অপূর্ব্ব ঔষধ আবিষ্কার রিয়াছেন। এই ঔষধগুণে ভবিষ্যতে ীগণকে আর প্রসব-যাতনায় কাতর হইতে বে না!

সন্তান-সম্ভাবনার সময় রমণীকে বেদনা-নাশক ঔষধ-সেবন করানো, কিছু একটা নূতন কথা নহে;—কিন্তু আসন্নপ্রসবা রমণীকে আফিমের সার বা অন্য কোনরূপ ব্যথাহারী ঔষধ সেবন করাইলে যথেষ্ট বিপদ-ভয় আছে। এমন-কি, সময়ে সময়ে তাহাতে ব্যথা না কমিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। শ্রীযুত পলিনের আবিষ্কৃত ঔষধের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে কোন অনিষ্টকর পদার্থ নাই এবং তাহা সেবন করিলে স্বাভাবিক প্রসবে কোনরূপ বাধা হয় না। শ্রীযুত পলিনের বহুদিনব্যাপী পরীক্ষার পর আফিমের সার হইতে বিষাক্ত অংশ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আজ কিছু-বেশী দুই বৎসর পূর্ব্বে এই ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের পরে শ্রীযুত পলিন ও তাঁহার সহকারী ডাক্তার পিয়ের লরেণ্ট কুকুর, বিড়াল ও খরগোশ প্রভৃতি জন্তুদের উপরে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চূড়ান্ত মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন। এক বৎসর পরীক্ষার পর তাঁহারা Beanjon Hospital-এর বিখ্যাত ডাক্তার Ribemont-

Dessaigne-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই নবাবিষ্কৃত ঔষধের কথা গোপনে খুলিয়া বলিলেন।



ডাঃ রিবেমণ্ট

ডাক্তার Dessaigne যখন বুঝিলেন, এই প্রায়-বিষহীন আফিমের সার ক্লোর‍্যাল ও ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতি তথাকথিত বেদনানাশক ঔষধের মত প্রসূতি বা গর্ভস্থ সন্তানের কোন অনিষ্টসাধন করে না, তখন তিনি বিনা-বাক্যব্যয়ে এক গর্ভবতী রমণীর উপর ঔষধটি প্রয়োগ করিলেন। বলাবাহুল্য তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে সফল হইল।

প্রথম পরীক্ষার পর সর্ব্বসমেত একশত বারোজন রমণী এই অপূর্ব্ব ঔষধের গুণে বিনা যন্ত্রণায় মাতৃত্বের সম্মানলাভ করিয়াছেন।

এই নূতন ঔষধ সম্পূর্ণরূপে বিষহীন নয় বটে, কিন্তু ইহা ব্যথা নাশ করে। ইহা সেবন করিলে প্রসব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না এবং গর্ভস্থ সন্তানেরও সামান্যমাত্র অনিষ্ট-ক থাকে না। প্রসবকালে গর্ভিণী সজ্ঞান থাকিবে —কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইবে তিনি যেন কি-এক সুখের স্বপ্নলোকে বা করিতেছেন! তাঁহাকে ডাকিলে তি চোখ তুলিয়া চাহিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে দে যাইবে বিস্ময়, আনন্দ ও মাতৃপ্রেম! তাঁহা কণ্ঠ দিয়া আর্ত্তনাদের একটি ধ্বনিও বাহি হইবে না—পরন্তু, প্রসবকা তাঁহার প্রস মুখ উজ্জ্বল হাস্যে উদ্ভাসিত থাকিবে।

পূর্ব্ব-উক্ত একশত বারোজন রমণী ভিতর তিন জন যমজ সন্তান প্রস করিয়াছেন—কিন্তু, তথাপি সামান্য যন্ত্রণা ভোগও করেন নাই! ডাক্তার Ribemont Dessaigne বলিতেছেন:

"কোন পরীক্ষাতেই কু পাওয়া য নাই; অতিরিক্ত উদ্যমের ব কোনপ্রকা কু-প্রতিক্রিয়ার চিহ্নও দেখা যায় নাই মানসিক যাতনা বা শ্রান্তির কোন লক্ষণও প্রসবের পর যাহা সচরাচর দেখা যায়—প্রকা পায় নাই। এই স্ত্রীলোকগুলি কিছুমা শারীরিক কষ্টভোগ করে নাই। একজনে দেহেও আমি অবসাদ বা স্নায়ুসংক্রান্ত উত্তেজ দেখি নাই। যাহারা সন্ধ্যাকালে সন্ত প্রসব করিয়াছে, তাহারা পরদিন পর্য্যন্ত প শান্তিতে নিদ্রাভোগ করিতে পারিয়াছে।

ফরাসী-বিজ্ঞান-সভা প্রকাশ্যভাবে নি লিখিত মত জ্ঞাপন করিয়াছেন:

১। আজকাল একটুও বিপদ-ভয় করিয়া প্রত্যেক জননীর পক্ষে বিনা যন্ত্র সন্তান প্রসব করা সম্ভব।

২। এই চিকিৎসায় সন্তান-প্রসবে কোন বা বিলম্ব হয় না; পরন্তু অনেক স্থলে দেখা য়াছে, এই ঔষধ-সেবনে শীঘ্র সুপ্রসব হইয়াছে।

৩। জন্মকালে প্রতি তিনটি সন্তানের যা গড়ে একটি করিয়া নীরব থাকে—ই নীরবতা বাস্তবিকপক্ষে সুবিধাকর।

৪। এই ঔষধে প্রসবান্তেও বেদনাবোধ হয় না।

৫। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যে, অতঃপর রমণীরা বিনা যাতনায় মাতৃত্ব লাভ করিবেন।

ফ্রান্স ও রুষিয়ার বাণী

একজন সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক লিতেছেন:—"পৃথিবীকে সহজ জ্ঞান, রুচি বিচারবুদ্ধি শিক্ষা দিয়াছেন—ফরাসী াতি। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা এবং ছন্দ রচনা-ভঙ্গীতে ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ইংরাজ গদ্য লিখিতে শিখিয়াছে ফরাসী-দের কাছ হইতে। চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্ব-কালে ইংরাজী সাহিত্য যখন ফরাসী-প্রভাবে াচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অবশ্য ইংরাজেরা খন গদ্যেই কথা কহিতেন ও রচনা করিতেন; কিন্তু সে গদ্যের ভঙ্গীটি ঠিক এখনকার মত ছন্দ ও সুষ্ঠু ছিল না। ফরাসী লেখকেরাই ইংরাজদিগকে গদ্য লিখিবার সুসঙ্গত ভঙ্গী দেখাইয়া দিয়াছিলেন; এবং এই ভঙ্গী ইংরাজদের এতটা মুগ্ধ করিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের কবিরা পর্য্যন্ত তাহার প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাই ড্রাইডেন ও পোপের াদাছন্দেও ফরাসী গদ্যের গন্ধ পাওয়া যায়!

ফরাসীরা দুটি বিষয়ে তাহাদের দুই নিকট-প্রতিবেশীর কাছে পরাজয় স্বীকার রিতে বাধ্য। কাব্যে ইংরাজ ও সঙ্গীতে ার্ম্মাণ জাতি ফরাসীদের অপেক্ষা সমুন্নত।

জাগতিক সভ্যতার যাহা-কিছু মহৎ, তাহার অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র হইতেছে, ফ্রান্স। সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে যদি কোন সভ্যজাতির বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন হয়, তবে সে ফরাসী জাতির। মধ্যযুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর চিন্তা-রাজ্যে ফরাসীরা অটলভাবে প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। এ-যুগের ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রান্সের উপন্যাসগুলি পাঠ কর। পৃথিবীর মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন বটে, কিন্তু এমন কোন ইংরাজ, জার্ম্মাণ বা রুশ ঔপন্যাসিক দেখাইতে পার কি, যাঁহার উপন্যাস ভবিষ্য সভ্যতার দিকে হৃদয়কে এতটা অগ্রসর করিয়া দিতে পারে? হেন্‌রি ডি বোর্ণিয়ার যে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ:—

"প্রতি মানুষের দুইটি দেশ আছে—তাহার জন্মভূমি এবং ফ্রান্স!"

কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকাকে ফ্রান্স সর্ব্বপ্রধান কি শিক্ষা দান করিয়াছে? রাষ্ট্রবিপ্লবের মহা শিক্ষা।

দুইটি বিষয়ে ফরাসীরা রাষ্ট্র-বিপ্লব দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে—গিলোটিন এবং নেপোলিয়ন।

কিন্তু, ফল কি হইল, দেখ।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবরে প্রুশিয়ার রাজা হুকুমজারি করিলেন,

"আমাদের রাজ্যে সকলকার দাসত্ব ঘুচিয়া গেল;—এখানে কেবল স্বাধীন ব্যক্তিরা থাকিবেন।"

কেন? প্রুশিয়া ফরাসীদের পদদলিত হইয়াছিল বলিয়া। নেপোলিয়নের শাসন-কালে ফরাসী কৃষক-সমাজ স্বাধীন ছিল। নেপোলিয়নের পূর্ব্বে সাধারণ-তন্ত্রের সময়েও কৃষকেরা স্বাধীন ছিল, কিন্তু পুরাতন রাজবংশের শাসন-সময়ে তাহাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। এই স্বাধীনতা রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাপ্রসাদ। স্বাধীন কৃষকেরা সানন্দে তেজের সহিত চাষ-বাস করিত—তাহাদের ভাণ্ডার ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। বিদ্রোহের মানসপুত্র নেপোলিয়ন এই স্বাধীনতার অগ্রদূত।

প্রুশিয়ার রাজ্ঞী লিখিয়াছিলেন:—

"নেপোলিয়নের কাছ হইতে আমরা অনেক বিষয় শিখিতে পারি। 'ভগবান তাঁহার সঙ্গে থাকুন'—এ কথা বলিলে ঈশ্বর-নিন্দা করা হইবে; কিন্তু এ কথা ঠিক যে সর্ব্ব-শক্তিমানের হস্তে তিনি চালিত যন্ত্রের মত,—এ যন্ত্র প্রাচীন ও জীবনহীন যাহা-কিছু স্পর্শ করিত, তাহা ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিত।"

য়ুরোপের অধিকাংশ স্থল হইতে নেপোলিয়ন যে সুধুই দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু বিপ্লবের আর এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন,—কি ব্যক্তিগত আর কি ব্যবসায়-গতভাবে আইনের সম্মুখে সকল লোকের সমান অধিকার।

নেপোলিয়ন যে-ভাবে এই স্বাধীন[তা] ঘোষণা করিয়াছিলেন, প্রুশিয়ার রাজাও ঠি[ক] সেইভাবেই রাজত্ব হইতে দাসত্বকে বি[দায়] দিলেন। ফলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও কৃষকের ম[ধ্যে] আর কোন পার্থক্য রহিল না। ই[হা] হইলে কৃষকেরাও সম্ভ্রান্ত হইতে পারিত এ[বং] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও সাধারণ ব্যবসায়ে প্র[বৃত্ত] হইতে পারিত!

ফরাসী বিপ্লবের মহাদান—এই সাম্য নীতি।

চিন্তারাজ্যে রুশিয়া এখনও অপরে[র] নিকট ঋণগ্রস্ত। তাহার মাতৃত্ব অত্য[ন্ত] অধিক—তাহার শিক্ষকত্ব অতি সামান্য। বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প বা শাসনতন্ত্র, সভ্যতা[র] ক্ষেত্রে রুষিয়ার দান খুব কম—কিন্তু কলায় সে একটি স্থায়ী আসন দ[খল] করিয়াছে। সঙ্গীত-রচনায় Tschaikowsky চিত্রাঙ্কনে Verestchagin, নৃত্যে Mordkin বা Pavlowa-কে আমরা কখন[ও] ভুলিতে পারিব না। কিন্তু ইহারা সকলে[ই] স্ব স্ব বিভাগে সমগ্রের ছাপ দিয়া আপনা[র] ব্যক্তিত্বই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

রুষিয়ার সকল শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকে[র] মধ্যেও বিশেষ করিয়া যেন এই গুণটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা ঘটনার মধ্য দি[য়া] রুষ ঔপন্যাসিক আপনার উদ্দেশ্যই প্রকা[শ] করেন। পৃথিবীর উপর আমার প্রতি[ক্রি]য়া——আমার!

টলষ্টয়ের নভেলগুলি হইতে পরিণা[মে] আত্মপ্রকাশ করেন টলষ্টয়! তিনি একজ[ন] অপূর্ব্ব কলাবিদ নন,—কিন্তু তিনি স্ব[য়ং] একটি অপূর্ব্ব কলা-বস্তু!

এই ঔপন্যাসিকদের সাহায্যে রুষিয়া পৃথিবীর উপর এক অসীম প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ড ও অন্যান্য সকল দেশের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রুষিয়ার কথা-সাহিত্যের মহিমায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রুষিয়ার ঔপন্যাসিকগণই জাগতিক সাহিত্যে সমধিক প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

পাগল ভাষাতত্ত্ববিদের কথা

সার জেম্‌স্ ম্যরের নাম বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং এক খ্যাতনামা অভি-ধানের সম্পাদক। সম্প্রতি ইহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সময় ইনি অদম্য উৎসাহে তাঁহার নূতন অভিধানের জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ম্যরে তাঁহার অভিধান-গ্রন্থের জন্য বহু লোকের সাহায্য পাইতেছিলেন। তিনি এক-একটি শব্দ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাঠকদের নিকট প্রেরণ করিতেন এবং তাঁহারা সেই সকল শব্দের নানা প্রকার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইতেন।

ম্যরে তাঁহার অভিধানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার মাইনর এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হেডেন চার্চ্চ মহাশয় উক্ত ডাক্তারের সম্বন্ধে এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

সার জেম্‌সের সঙ্গে মাইনরের পত্র দ্বারাই আলাপের সূত্রপাত হয়। ডাক্তার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ইংরাজী শব্দ সম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ণ নিবন্ধ পাঠান। ম্যরে তাহা পড়িয়া দেখিলেন, ডাক্তার অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তি এবং ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও অপরিসীম। সার জেম্‌স্ তাঁহার এই অজ্ঞাত সাহায্য-কারীর প্রকৃষ্ট পরিচয় জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তবে উভয়ের মধ্যে পত্র লেখালেখি পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিল। মাইনরের চিন্তাশীল টিপ্পনী ও শ্রমলব্ধ অনুশীলন ক্রমেই সার জেম্‌স্‌কে মুগ্ধ করিতে লাগিল।

ম্যরে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মাইনরের কথা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বর লোক-দিগকে জানাইলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তখন মাইনরকে কয়েকদিন অক্সফোর্ডে থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। উত্তরে মাইনর লিখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার উপর এতাদৃশ দয়া প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অক্ষম।

ম্যরে ভাবিলেন, মাইনরের আর্থিক অবস্থা বোধ হয় ভাল নয়, সেই জন্য

তিনি অক্সফোর্ড পর্য্যন্ত আসিবার ব্যয়-সংকুলানে অপারগ। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, আর্থিক অসচ্ছলতাই যদি মাইনরের না আসিবার কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভাবনার প্রয়োজন নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিবে। তদুত্তরে মাইনর লিখিলেন, আর্থিক অবস্থাই তাঁহার না-যাওয়ার কারণ নয়, কারণ, তাঁহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য। তাহার চেয়ে ম্যরে যদি দুই দিনের জন্য তাঁহার অতিথি হন তবে তিনি বিশেষ আপ্যায়িত হইবেন।

ম্যরে ডাক্তারের সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিঠি পাইয়া তিনি ভাবিলেন, মন্দ কি! একবার না-হয় দেখিয়া আসাই যাক্ না! মাইনরকে তিনি লিখিয়া দিলেন, তিনি যাইতে প্রস্তুত।

মাইনরের বাড়ী ক্রোথর্নে। ম্যরে আসিয়া অক্সফোর্ড হইতে ওয়েলিংটন কলেজ ষ্টেশনে নামিলেন। ষ্টেশনে তাঁহার জন্য মাইনর-প্রেরিত ভৃত্য ও একখানি জুড়ি-গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। ভৃত্যের মুখে মাইনর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে কোন কারণবশতঃ তিনি ষ্টেশনে সার জেম্‌সের সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না।

সার জেম্‌স্ গাড়ীতে উঠিলেন; দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী আসিয়া এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে থামিল। ভৃত্য পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল; অবশেষে এক সজ্জিত কক্ষে সার জেম্‌স্‌কে প্রবেশ করিতে বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া ম্যরে দেখিলেন, এক ব্যক্তি ডেস্কের ধারে বসিয়া কি লিখিতেছেন। তিনি ঢুকিতেই লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন করিল।

প্রতিনমস্কার করিয়া ম্যরে কহিলেন "আপনি বুঝি ডাক্তার মাইনর?"

লোকটি বলিলেন, "না, আমি ডাক্তার মাইনর নই, তাঁর সঙ্গে আপনার শীঘ্রই দেখা হবে—তার আগে আমার বলে রাখা ভাল যে এই জায়গাটা হচ্ছে ব্রড্‌মুরের বিখ্যাত পাগলা গারদ, আর আমি হচ্ছি তার অধ্যক্ষ।"

বিস্ময়-বিহ্বল বৃদ্ধ ম্যরে কহিলেন "ব্রড্‌মুরের পাগলা গারদ! তাহলে—

"হাঁ, তিনি পাগল। তাঁর তিনি একটি খুনও করেছেন। বিচারে পর থেকে তাঁকে এইখানেই রাখা হয়েছে। আমি আপনাকে তাঁর জীবনের সমস্ত কথা খুলে বল্‌ছি, শুনুন।" এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—

"ডাক্তার মাইনর আমেরিকা-নিবাসী। এখানে তিনি যখন প্রথম আসেন, তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তিনি এখন বেশ ভালই আছেন ও আমাদের অনুরোধে তাঁকে বেশ সুন্দর ঘরই দেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি দেশ থেকে ঢের ভাল ভাল বই আনিয়ে লাইব্রেরী সাজিয়েছেন। ইনি বেশ পয়সাওয়ালা লোক। সেই জন্য তাঁর কোন অভাবই নেই। কি করে ডাক্তার মাইনর এখানে এলেন, সে কথা আপনাকে আমি সব বল্‌ছি।"

সার জেমস্ মন্ত্রমুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়া গেলেন—

"১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় ডাক্তার মাইনর তাহাতে যোগ

দেন। উঁহার বয়স তখন ২৬ বৎসর মাত্র। অল্প ইতিমধ্যেই তিনি অস্ত্র-বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইহার অগাধ পয়সা—কোন ভাবনা-চিন্তা নাই। অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, চিত্র-বিদ্যাতেও তাঁহার পারদর্শিতা বিলক্ষণ।

"এই সময় একজন পলাতক সৈন্যকে চিকিৎসা করিবার জন্য ডাক্তার মাইনরের নিকট আনা হয়। কষ্টকর হইলেও মাইনরকে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপার তাঁহার মনের মধ্যে সুদৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল। ইহার ফলে সময়ে সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত হইতে দেখা যাইত।

"কিছুদিন পরে ডাক্তারের একবার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়। উহার পর তাঁহার মন মাঝে মাঝে খারাপ হইয়া পড়ে যে তাঁহাকে ডাক্তারী একেবারেই বন্ধ করিতে হয়! এবং সেই কারণে ডাক্তারী কার্য্যও তাঁহাকে ছাড়িতে হয়।

"এই সময় তিনি সর্ব্বদা কাল্পনিক ভয়ে ত্রস্ত থাকিতেন। সর্ব্বদা তাঁহার মনে হইত, জন কতকগুলি আইরিশ্ তাঁহাকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে; এই কাল্পনিক ভয় তাঁহার মনে এতদূর আঁটিয়া গেল যে তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

"এইরূপে কিছুদিন গেল। মাইনরের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ইউরোপে লইয়া আসিবার পরামর্শ দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাইনরের টাকার অভাব ছিল না। যথেষ্ট টাকাকড়ি সঙ্গে লইয়া তিনি আমেরিকা ছাড়িলেন। সঙ্গে তাঁহার অনেক গুলি পরিচয়-পত্র ছিল। পত্রগুলি আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকদের লেখা। মাইনর আমেরিকায় থাকিতে বিদ্বৎ-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ঐ পত্রগুলির মধ্যে ইয়েল-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-লিখিত বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্যিক্ জন্ রাস্কিনের নামে একখানি পরিচয়-পত্রও ছিল।

"মাইনর প্রথমেই ইংলণ্ডে আসিলেন। লণ্ডনে টেম্‌সের নিকট টেনিসন্ ষ্ট্রীটে তিনি থাকিবার জন্য ঘর ভাড়া লইলেন।

"এখানে আসিয়া মাইনর তাঁহার গৃহ-কর্ত্রীকে নানারূপ অসংলগ্ন কথা বলিয়া ভীত করিয়া তুলিলেন। এমন-কি একবার তিনি পুলিশে চিঠিও লিখিলেন, 'আমার প্রাণ লইবার জন্য অনেক লোক ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহারা আমাকে যে-কোন দিন খুন করিতে পারে।' পুলিশ কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিল না।

"ইহার পর এক ভয়ানক ঘটনা ঘটিল। মাইনর যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাড়ীর কিছু দূরে মদ চুয়াইবার এক আস্তানা ছিল। এই বাড়ীটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি দুইটার সময় ডাক্তার মাইনর বাড়ী ফিরিতেছিলেন। মাথার উপর পরিষ্কার নক্ষত্র-খচিত আকাশ। মদের আড্ডার কাছেই মাইনর জর্জ্জ মেরিট্ নামক ঐ স্থানের একজন কর্ম্মচারীর দেখা পাইলেন। তারপর হঠাৎ সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাস্তায় তিনবার পিস্তলের আওয়াজ হইল। সেই মুহূর্ত্তেই রাস্তায় হতভাগ্য জর্জ্জ মেরিট্ চির-

নিদ্রায় ঢুলিয়া পড়িল। নিকটস্থ পাহার-ওয়ালা রঙ্গস্থলে ছুটিয়া আসিয়া দেখে, ডাক্তার মাইনর পিস্তল-হস্তে দণ্ডায়মান, আর কর্ম্মচারীর দেহ ভূতলে পড়িয়া আছে। পাহার-ওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'কে গুলি ছুড়লে?'

"মাইনর উত্তর দিলেন, 'আমি—আমিই ঐ লোকটাকে খুন করেছি।'

"ইতিমধ্যে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আর একজন পুলিশ কর্ম্মচারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরস্ত্র করিয়া ডাক্তারকে সাউথওয়ার্ক নামক থানায় আনা হইল।

"অনুসন্ধানের ফলে মাইনরের নিকট একখানা ছোরা পাওয়া গেল। পুলিশ তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া রাস্কিনের নামের পরিচয়-পত্র পায়; মাইনর-অঙ্কিত অনেকগুলি সুন্দর ছবিও সেই সঙ্গে বাহির হইল।

"পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে প্রবীণ বিচারপতি লর্ড বভিলের নিকট মাইনরের বিচার হয়। স্যর (তখন মিষ্টার) এড্‌ওয়ার্ড ক্লার্ক মাইনরের পক্ষে কৌসুলী ছিলেন। জুরীগণ মাইনরকে নির্দ্দোষ বলিয়া মত দিলেন। বিচারপতি জুরীগণের সহিত একমত হইয়া মাইনরকে এই পাগলা গারদে বদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা দিলেন।

"তারপর হইতে ডাক্তার মাইনর এই-খানে বাস করিতেছেন। এখন তাঁহার মাথার অবস্থা অত্যন্ত আশাপ্রদ। ভাষার ইতিহাস-অনুসন্ধানে ইঁহার বড়ই আগ্রহ সম্প্রতি আমেরিকা হইতে তাঁহার অনে পুস্তক আসিয়াছে।"

ম্যরে নিস্তব্ধ হইয়া অধ্যক্ষের গল্প শুনি গেলেন। গল্প শেষ হইলে মাইনরের সহি ম্যরের দেখা হইল। দুজন বিদ্বা ভাষাতত্ত্ববিদ্ সানন্দে পরস্পরের কর-কম্প করিলেন। ইহার পর ম্যরে মৃত্যু পর্য্য উভয়ের বন্ধুত্ব অটুট ছিল এবং মাইন শেষ পর্য্যন্ত অভিধান-গ্রন্থ সম্পাদনে ম্যরে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

সার জেমস্ ভূমিকায় লিখিয়াছেন, প্রা ৮০০০ কথার বিভিন্ন ব্যবহার মাইনর এক সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এই কাহিনীর এক অংশ মিথ্যা কল্পনা-রঞ্জিত নহে। ম্যরে নিজে ইহা সত্যতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত হেন্রে চার্চ্চ মহাশ মাইনরের পক্ষে নিযুক্ত কৌসুলী সার এড ওয়ার্ড ক্লার্ক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া এ কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ অব সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠ এপ্রিল তারিখে মাইনরের বিচার হয়। সময়কার টাইম্‌স্ পত্রে এই মকর্দ্দমার আমূ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। মাইন এখনও জীবিত। তবে, তিনি ব্রড্‌মুরে পাগলা গারদ হইতে আমেরিকায় ফিরি গিয়াছেন।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বিপর্য্যয়

ওলো ননদিনী—তোর এ কি হ'ল আজ কেন এ নূতন ধারা
গঞ্জনা কেন নীরব কেনগো বিভল আপনাহারা?
নিশিদিশি বাজে শ্যামের বাঁশরী তোর সে কঠোর বাণী
দোঁহে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে পূরেছে মরমখানি।
শ্যামের বাঁশীর মাঝারে গঞ্জে তোর সে দারুণ কথা
তোর গঞ্জনার পরাণে গুঞ্জে বাঁশীর বিপুল ব্যথা।
ওলো ননদিনী এ ব্রজ-মণ্ডলে সবাই বধির আর
শুনেনি শ্রবণে বাঁশীর মিনতি বুঝেনি মরম তার।
সবার মাঝারে মোদের দোঁহারে বেঁধেছে বাঁশীর ডোর
তোমার কণ্ঠে গঞ্জনা ফুটে আমার চক্ষে লোর।
মনোচোর তোর মনেতে পশেছে সারা মনে জাগে রোল—
'গেল গেল সব সামাল সামাল মনেরে জাগায়ে তোল্,
সকল রন্ধ্র রুদ্ধ ক'রে দে—বাঁশীর প্রবেশ-দ্বার
পাষাণ প্রাচীর কুলের ধরমে ঘিরি দেরে চারিধার।
মনে মহাভয় কোলাহল জাগে মুখে বাণী নিদারুণ—
আপনি জান না অন্তরে তার বাজে বাঁশী সকরুণ।
মনোহর শুধু পশিয়াছে মনে হরে নাই সারা মন
মনের ধরম জেগে উঠে' তাই বাধায় তুমুল রণ।
জানিতাম আমি জানিতাম মনে আসিবেই হেন দিন
রসের সায়রে তলাইয়া যাবে বাধা ব্যবধান—ক্ষীণ।
আমার মতন তোরো হ'বে দশা দুকুলে রবে না ঠাঁই
সুধার লহরে ভাসিতে ভাসিতে ঠেকিবি শ্যামের পায়।
শ্যামকলঙ্ক রাণীর টীকাটি উজল জ্বলিবে ভালে
লাজ ঘোমটায় কেমনে ঢাকিবি নিবিবে না কোনও কালে।
যতেক গঞ্জনা দিয়েছিস্ মোরে ফিরে তা শুনিতে হবে
কানে যদি পশে শ্যামের বাঁশরী প্রাণে সব ব্যথা স'বে।
মহাক্ষণ যদি এসে থাকে আজ লাজ কিবা তাহে বোন্,
কে কবে মরণ এড়ায় শ্যাম সে মরণ-অধিক ধন!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

দাগী

(গল্প)

তখন আমার জুনিয়ারির পালা। সারাদিন কোর্টে ঘুরিয়া রৌদ্র ও ধূলা খাইয়া গৃহে ফিরি ; প্রাণে বৈরাগ্যেরও বাসনা দেখা দিয়াছে।

বেশ মনে পড়ে, সেদিন সকাল হইতে বাদলা সুরু হইয়াছে—পথে কাদা, আকাশে মেঘ, চারিদিকে বিষম নিরানন্দ ভাব,—হাতে কোন কাজ ছিল না। হাকিম সদানন্দ সেন একটা একশ'-দশ ধারার মামলা করিতেছিলেন। একটু রস পাইবার আশায় তাঁহার এজলাসে আসিয়া বসিলাম।

আসামী এক বাঙ্গালী যুবক—গায়ের রঙ তামার মত, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরণে ময়লা কাপড়, অঙ্গে একটা তালি দেওয়া ছিটের কামিজ! কাঠগড়ার রেলিঙে মাথার ভর রাখিয়া মুখ গুঁজিয়া সে দাঁড়াইয়া ছিল। পুলিশ হইতে প্রায় ত্রিশ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইতেছিল। কয়েকজন দোকানদার, কয়টা পতিতা নারী, দুই-চারিজন পানওয়ালা—সকলেই হলফ লইয়া সাক্ষ্য দিতেছিল, আসামী একটা গুণ্ডা, কোন কাজ-কর্ম্ম করে না—যখন-তখন তাহাদের কাছে আসিয়া জুলুম করিয়া ভয় দেখাইয়া নেশা-ভাঙ্ করিবার জন্য পয়সা আদায় করে—বে-গোছ দেখিলে না কি ছুরিও উচাইতে ছাড়ে না। প্রাণের ভয়ে সাক্ষীর দল কেহ চার আনা, কেহ সাত পয়সা, কেহ বা পাঁচ সিকাও কখনও কখনও তাহাকে দিয়া ফেলিয়া প্রাণে খুব রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। এই পয়সা কেহ দিয়াছে, এক মাস পূর্ব্বে; আবার কেহ-বা সাত-আট মাস পূর্ব্বে। ইহার বিরুদ্ধে কোন দিন কেহ আদালতে নালিশ করে নাই; বা পুলিশেও কোন ডায়েরী লেখায় নাই!

লোকটার চেহারা দেখিয়া মনে হয়, সে চিররুগ্ন,—অত্যন্ত কৃশ দেহ, পেশীগুলা নিতান্তই ক্ষীণ, দুর্ব্বল! অথচ সে কেমন জুলুম-জবরদস্তি করিয়া এই-সব ষণ্ডা জোয়ান দোকানদার ও ভীমা বারাঙ্গনাদের কাছ হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে,—শুনিয়া প্রাণে কেমন একটা বিস্ময়-কৌতূহলের সঞ্চার হইল।

একজন বন্ধু কহিলেন, "এস না হে, এর হয়ে দাঁড়ানো যাক্!"

আমি কহিলাম, "পয়সা দেবে কে?"

বন্ধু কহিলেন, "কি এমন পাঁচশ' দশ রোজগার করা যাচ্ছে যে পয়সার দুঃখে মরে যাব! অমনিই একবার পরখ করি —এই ত রাবিশ সাক্ষী—"

অপর বন্ধু কহিলেন, "বিনা পয়সায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে জেলে ঠেলবে? পয়সা পেলে তবু নেমকহারামী পাপটা ঘটত না!"

আমি কহিলাম, "মন্দ নয়—শাস্ত্রেও আছে, শতমারী ভবেৎ বৈদ্য! তা এ নয় হবে আমাদের নম্বর ওয়ান্।"

হাকিমের অনুমতি চাহিলাম। তিনি

বিরক্ত চিত্তে কহিলেন, "ওর আবার উকিল দেওয়া কি! পাঁচবারের দাগী—"

আমরা নাছোড়বন্দা—আসামীকে জনান্তিকে রাজী করাইয়াছিলাম ; হাকিম অগত্যা অনুমতি দিলেন। আমরা আসামীর জামিন প্রার্থনা করিয়া বসিলাম। হাকিম বক্র হাসিতে চাহিয়া জামিনের আদেশ দিলেন। আমরা অমনি মোক্তার নারাণবাবুকে আনিয়া পাঁচটার পয়সা ধার করিয়া তাহার জামিন দাখিল করাইয়া লইলাম।

পুলিশের দারোগা তখন কোর্ট বাবুকে দু-একখানা ছোটো কাগজ দেখাইতেছিল। হাকিমের সেদিকে নজর পড়িল। হাকিম কহিলেন, "কি ওটা?"

দারোগা সসম্ভ্রমে সেটি হাকিমের হাতে দিয়া কহিল, "আসামীর কাছে সম্পত্তির মধ্যে এই ছবিখানা শুধু পাওয়া গেছে।"

হাকিম ছবিখানার পানে চাহিয়া পরক্ষণেই আসামীর দিকে চাহিলেন। চোরের সেই কুণ্ঠিত দৃষ্টি! মুখ তাঁহার নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল—কপালে বেশ স্পষ্ট স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনার খাস-কামরায় উঠিয়া গেলেন; আমাদিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।

আমরা অবাক হইয়া গেলাম। কি এমন ফটোগ্রাফ—কাহার ফটোগ্রাফ যে তাহার এ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি!

ফটোখানা হাকিমের টেবিলেই পড়িয়া-ছিল। কোর্ট বাবুর খোসামোদ করিয়া দেখিয়া লইলাম। এক স্ত্রীলোকের ফটো—সুন্দর। কুঞ্চিত সজ্জিত কৃষ্ণ কেশদামের

মধ্যে অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরীর মুখ! ছবিখানি অত্যন্ত পুরাতন—কালের নিশ্বাসে ঈষৎ অস্পষ্ট ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে!

পেস্কার, আমলা সকলেই কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কড়া হাকিম—সাজা দিতে অদ্বিতীয়—সে বিষয়ে বাপের খাতিরও যিনি রাখিতে জানেন না, এ ছবিতে হঠাৎ তাঁহার এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন?

সকলেই আসামীর পানে চাহিল—এ দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না! জামিনের কাগজ সহি করিয়া নারাণ মোক্তারের সহিত এক কোণে বসিয়া সে তখন দিব্য গল্প জুড়িয়া দিয়াছে।

২

পরদিন সকালে আসামীকে ধরিয়া পড়িলাম, ও ছবি কাহার? বলিতে হইবে। আসামী প্রথমটা কিছুতেই বলিতে চাহে না—শেষে বিস্তর পীড়াপীড়িতে কহিল, ও ছবি তাহার মৃতা জননীর!

তারপর সে আপনার জীবনের কাহিনী বলিল। তাহার নাম, মাখন।

মাখন বলিল, "আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমার মা মারা যান। বাবা পাগলের মত হইলেন। তিনি তখন এম, এ পড়িতেছেন—পরীক্ষা পড়া সব ছাড়িয়া আমায় বুকে টানিয়াই বাহিরের ঘরে দিবা-রাত্র তিনি পড়িয়া থাকিতেন। আত্মীয় বন্ধুর দল ঘাড়ে পড়িয়া তাঁহার সে ভীষণ শোকাগ্নি নিবাইবার চেষ্টা জুড়িয়া দিল।

পুরুষমানুষের শোক, তায় আবার স্ত্রীবিয়োগের—সে মুছিতে বড় বিলম্ব হয়

না—তবে ঠিক ঔষধটি দেওয়া চাই। শেষে সেই ঔষধেরই ব্যবস্থা হইল। বাবা আবার বিবাহ করিলেন। নূতন মা এক বড় চাকুরের কন্যা। সমস্ত দুঃখ-বেদনা নিরানন্দ, মুছিয়া তিনি একদিন আমাদের গৃহে সম্রাজ্ঞীর আসন পাতিয়া বসিয়া গেলেন। বাবার মুখে অচিরেই আবার হাসি দেখা দিল—মাত্রা যেন পূর্ব্বেকার চেয়েও বেশী!

আমি কিন্তু তাঁহার পানে আর ঘেঁস দিলাম না। প্রথম হইতেই কি যে কুবুদ্ধি ঘটিল! নূতন মার উপর রাগ ধরিয়া ছিল। নিজের মাকে হারাইয়াও একটা সান্ত্বনা ইহাই ছিল, বাবাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছি! এতখানি লাভের মুখে মা-হারাণোর লোকসানটা মনেও উঠে নাই! কিন্তু নূতন মা বাবাকে আমার কাছ হইতে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! আমার পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশও বাবাকে তিনি দিতে পারিতেন না! আমার বেশ মনে পড়ে, মা তখন বাঁচিয়া ছিলেন, দুপুর-বেলা তিনি নিদ্রা গেলে আমি বাহিরের ঘরে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম, দেখিতাম, ঠিক পথের অপর পার্শ্বে একটা নিমগাছের তলায় একটু ছায়ার আড়াল পাইয়া একটা রুগ্ন কুকুর আসিয়া তথায় পড়িয়া আছে—অত্যন্ত রুক্ষ তাহার মূর্ত্তি—নিতান্ত নিঃসঙ্গ বেচারা! বাবার এই পরিবর্ত্তনে আমার নিজের মনটা ঠিক সেই কুকুরটার মতই যেন এক অসীম বেদনার ঘা খাইয়া তেমনই নিঃসঙ্গ কুণ্ঠিতভাবে পড়িয়া থাকিত। অথচ উপায়ও ছিল না। একদিন জোর করিয়া বাবার আদর কাড়িতে গিয়াছিলাম—নূতন মা তাড়া দিয়ে "পড়া নেই, শোনা নেই, বুড়োধাড়ি ছে খালি খেই খেই করে নেচে বেড়াচ্ছেন দুঃখে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। জোর করিয়া কান্নাটাকে বোধ করিলাম এই পাষাণীর কাছে চোখের জল ফেলি না, কখনও না! বাবার পানে একবা চাহিলাম, বাবার মুখ নিরুপায় কু একেবারে যেন সাদা হইয়া গিয়াছে! গতি বুঝিয়া আমি সে ঘর ত্যাগ করিলাম।

বাড়ীতে আত্মীয়ও কে কহ না ছি এমন নহে। তবে সকলে নিজেদের ল ব্যস্ত। স্কুলে যাইতাম—ইং জী বইয়ে এ গল্প পড়িয়াছিলাম—কি এ দেশের ত অত্যন্ত অরাজক অবস্থা যে যেমন করি পারে, শুধু নিজেদের জিনি পত্র সামলাইতে দারুণ ব্যস্ত, আশে-পাশে কত নিরীহ দু অত্যাচারে চীৎকার জু দিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কাহা ও অবসর নাই আমাদের বাড়ীর দশাটা তখন ঠিক রকম! মাথার উপর অভিভাবক ন —বাবা বাড়ীর বড় ছেলে—অপরে জ্ঞাতিকু মাত্র, তাহারা উৎসব-আমোদের সময় মেলিয়া সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে —বিপদের লক্ষণ বুঝিলে নিমেষে কো অন্তর্ধান হয়!

এইভাবেই ভাঙ্গা নৌকার মত জী টাকে যখন টানিয়া লইয়া ফিরিতেছি তখন সহসা একটা দমকা হাওয়া দিল। বাবা এম-এ ফেল করিয়া বসিলেন এবং তাহার দুই-চারি মাস শ্বশুরের সুপারিশ ও জোগাড়ের জো

একদিন হাকিম হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমাকেও বাবার সঙ্গে লইয়া যাইবার কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ যাত্রাকালে নূতন মা বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিলেন, তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে না। কারণ, হাকিমি চাকরি লইয়া বাবাকে সাত ঘাটে জল খাইয়া ফিরিতে হইবে—আমি সঙ্গে থাকিলে আমার পড়াশুনার বিষম ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটুকু একদম মাটি হইয়া যাইবে। স্ত্রীলোকের দূরদর্শিতাসম্বন্ধে সহসা বাবার বড়ই আস্থা দেখা দিল। কাজেই তিনি মাসহারার আশা দিয়া আমাকে জ্ঞাতির দলে রাখিয়া গেলেন!

আমি কোন কথা কহিলাম না। আমার কেমন তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল! মনে হইতেছিল, এ বিশ্ব-রঙ্গভূমে কোথায় কি অভিনয় চলিতেছে, আমার যেন শুধু তাহা দেখিবারই পালা! এ অভিনয়ে আমায় নামিতে হইবে না—আমার জন্য এখানে কোন ভূমিকাই নির্দ্দিষ্ট নাই! স্থাণুর মতই অচপল চিত্তে আমি বাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম।"

৩

যখন বলিতে লাগিল, "দুই-তিন বৎসর এক রকমে কাটিয়া গেল। তারপর একদিন বড় কাকা বলিলেন, "বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে, তোমার বাবাই এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। আমরা নানান্ দিকে ছড়িয়ে পড়ছি —তোমার পক্ষে এখন তোমার বাবার কাছে যাওয়াই উচিত।" বড় কাকার কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না! সাধারণ দশ বৎসর বয়সের বাঙ্গালীর ছেলেরা এ-সব বিষয় বড়-একটা বুঝিতে পারে না—কিন্তু মা-মরা ছেলে—বিশেষ আমার মত অবস্থায় পড়িলে—বুদ্ধি তাহার একটু চট্ করিয়াই বাড়িয়া উঠে!

সে রাত্রে নিদ্রা হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিলাম,—কোথায় যাই, কি করি! একবার ভাবিলাম, বাবার কাছে যাই। বাবা তখন খুলনার ওদিকে কোথায় এক মহকুমার হাকিম—কিন্তু পরক্ষণেই বিমাতার সেই রোষ-রুদ্র মুখ ও কঠিন দৃষ্টির কথা মনে পড়িতেই সে বাসনা কর্পূরের মত উবিয়া গেল! ভাবিলাম, সেখানে যাওয়ার চেয়ে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোতেও ঢের আরাম, ঢের সুখ! ঘরের দেওয়ালে মার একখানি ফ্রেমে-আঁটা ছবি টাঙ্গানো ছিল। সারা রাত্রি প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় সেখানার পানে চাহিয়াই চোখের জল ফেলিলাম। মার শোক সে রাত্রে যেন নূতন করিয়া বুকে বাজিল! শেষে সেই ছবিখানাকে মাত্র সম্বল করিয়া পরণের দুই-চারি-খানা কাপড় লইয়া ভোরের দিকে বাড়ী ছাড়িলাম।

সম্মুখে দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত সেই পথে চলিতে সুরু করিলাম! মাথার উপর তরুণ স্নিগ্ধ সূর্য্য ক্রমে রুদ্র মূর্ত্তিতে রক্ত আঁখি মেলিয়া দেখা দিল—সেদিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—সূর্য্য হার মানিয়া শেষে আবার শান্ত শীতল মূর্ত্তি ধরিয়া মৃদু হাসিয়া দিগন্তের কোলে সরিয়া পড়িল—তবুও আমি চলিয়াছি! হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরিয়া

গিয়াছে, দারুণ পিপাসায় গলার মধ্যে যেন সূচ ফুটিতেছে, এমনই বেদনা বোধ হইতেছিল! কিন্তু কোথায় বসিব—আমার যে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তিলার্দ্ধ স্থান নাই!

যাক্, সে পথের কষ্ট আর খুলিয়া বলিয়া কাজ নাই। শেষে আশ্রয় মিলিল। এক গৃহস্থের বাড়ী বাসন-মাজার কাজে লাগিয়া গেলাম। চার বৎসর কাজ করিলাম—মন্দ লাগিত না, আরামও পাইতাম! এক একবার মনে হইত, আমার বাপ হাকিম, —তখনই হাসি আসিত। কিন্তু একদিনের জন্যও ক্ষোভ জাগে নাই।

আমার নিশ্বাসে বুঝি কি বিষ ছিল! নহিলে বাড়ীর কর্ত্তা একদিন গ্রামান্তর হইতে জ্বর গায় গৃহে ফিরিয়া যে বিছানা লইলেন—সে বিছানা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় না কেন? মৃত্যু তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া লইল। পাখীর বাসায় ঢিল ছুড়িলে মুহূর্ত্তে যেমন তাহা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়—মনিবের গৃহের দশা ঠিক তেমনই ঘটিল। আমি আবার পথে বাহির হইলাম। বাবা তখন কটকে আমার এক ভাইয়ের জন্মোৎসবের ধুমে আত্মহারা!

তার পর এই সহর কলিকাতায় আসিলাম। এ এক মজার দেশ! যাহারা এখানে সুখী, যাহারা বড় লোক, তাহারা কাহারও পানে ফিরিয়া না চাহিলেও দুঃখী-গরিবের দল সাধিয়া কথা কহে, ডাকিয়া দুই মুঠা খাইতেও দেয়! এক ঠাকুরবাড়ীতে আস্তানা মিলিল। কিছুদিন সেখানে পূজারীর মন জোগাইয়া কাটাইয়া দিলাম; কিন্তু টিঁকিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোথা হইতে যেন এক অদৃশ্য রজ্জু, কোন্ এক অজানা পথে আমায় টানিতেছিল। তিন-চার বৎসর এখানে-ওখানে ঘুরিয়া একটা হোটেলে চাকরি করিতে আসিলাম। সেখানে বিশ্বের যত বিদ্বেষ, কলহ, নীচতা, স্বার্থ এক বিপুল ষড়যন্ত্র পাকাইয়া বসিয়া আছে, হিংসার জোট বিছানো আছে—তাহাতে পা বাধিল। সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া একেবারে আদালতের দ্বারে গড়াইয়া পড়িলাম। হোটেলের কর্ত্তার এক প্রৌঢ়া প্রণয়িণী ছিল—আমার উপর কি তাহার একটু অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল; নেপথ্যেই ইহার ইঙ্গিতাভিনয় চলিতেছিল, তাহার আভাষমাত্রও আমার পাইবার সুযোগ ঘটে নাই—ইতিমধ্যেই কর্ত্তার মনে কেমন করিয়া সন্দেহ হয়—সে একেবারে থালা-ঘটি-সমেত চুরির চার্জ্জ দিয়া আমাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিল। আমি কেমন স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ব্যাপারখানা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই হাকিমের রায় বাহির হইয়া গেল—তিন মাসের জন্য আমার জেলের ব্যবস্থা। জেলের গাড়ীতে বসিয়া সত্যই সেদিন প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া ছিলাম—বাঃ, আশ্রয়হীন আমি, আজ এখানে, কাল সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম, ভগবান আজ আমায় দিব্য আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন ত! আর অন্নের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, পড়িয়া ঘুমাইবার জন্য ছাদ-ঢাকা একটু ঠাঁইও অনায়াসে মিলিবে!

তিন মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। ভিক্ষা মাগিয়া দিন কাটিত। একদিন রাত্রে বাজারে যাত্রা হইতেছে

শুনিয়া সেই দিকে চলিলাম—পথে পাহারা-ওয়ালা পাকড়াও করিয়া থানায় চালান দিল। দাগী চোর রাত্রে রাস্তায় ঘোরা অপরাধে হাকিমের বিচারে আবার চারি মাসের জন্য জেলের দণ্ড হইল। যাত্রার কথা হাকিম আমলই দিলেন না, পুলিশ ত সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। কোথায় যাত্রা! ও শুধু একটা মিথ্যা ছল!

এবার জেলে বসিয়া স্থির করিলাম, এই পথই ভাল। বাহিরে যখন নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই,—কাজ করিতে গেলে লোকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে, কাজের চেষ্টায় পথে বাহির হইলে পুলিশে ধরিয়া টানান দিবে! তাহার চেয়ে জেলে থাকিলে বাধাবাধির আর ভয় থাকিবে না, রুলের গুঁতা হইতেও রক্ষা পাইব!

এবার জেল হইতে ফিরিলাম,—অদৃষ্ট প্রসন্ন মূর্ত্তিতে অভ্যর্থনা করিল। এক ভদ্রলোকের কাছে চাকরি মিলিল। জেলেই এক বন্ধু জুটিয়া ছিল—আমারই সমবয়সী। সে তাহার মনিবের খুব সুখ্যাতি করিত। মনিব কোকেন-ওয়ালা। সে তাহার অধীনে থাকিয়া লুকাইয়া কোকেন বেচিত। মনিবের যত্নের ত্রুটি নাই। কোকেন-বেচায় আশঙ্কা যথেষ্ট, অথচ লাভেরও সীমা নাই। ধরা পড়িলে মনিব বেশ মোটা টাকা ব্যয় করিয়া বড় উকিল লাগাইয়া বাঁচাইবারও যথেষ্ট চেষ্টা করে। বরাতে যদি জেল ঘটে, ঘটুক —ফিরিয়া কিন্তু মনিবের কাছে রীতিমত বখশিস্ মিলিবে!

সেই চাকরিই ধরিলাম। দুঃসাহসের কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধু ঠিকই বলিয়াছিল, লাভ ইহাতে বিলক্ষণ! এই কোকেন লইয়া দুইবার আরও জেল খাটিয়া আসিলাম।

শেষবারে ফিরিয়া কিন্তু পুনর্মূষিক! কোকেন-ওয়ালা মনিব এক খুনী মামলার আসামী হইয়া বিচারে দ্বীপান্তরে চালান হইয়া গিয়াছে। চারিধার অন্ধকার দেখিলাম। হাতে টাকা ছিল না। কোনমতে কিছু জোগাড় করিয়া একবার ভদ্রলোক সাজিয়া বাবার সহিত দেখা করিব, ভাবিলাম। তাহার পর একবার এমন একটা কীর্ত্তির কাজ করিব, যাহাতে দেশের বুকে আমার নাম চিরকালের জন্য খোদা থাকে! বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়!

একটা দল জড় করিলাম। রাত্রে উল্টাডিঙ্গির বিখ্যাত মহাজন ঘনশ্যাম সাধু-খাঁর তহবিল চলিয়াছিল, লোকের মাথায়। তাহাদের ঘাড়ে পড়িয়া সেই তহবিলে ছোঁ দিলাম। বেশ মোটা টাকা হাতে আসিল।

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবারও অবকাশ মিলিল না, পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার করিল—এই হাকিমেরই কাছে চালান দিল। এ হাকিম বড় কড়া—ভাল লোক বলিয়া নাম-ডাক আছে—আমার পূর্ব্ব-শাস্তির বহর দেখিয়া একেবারে দেড় বৎসরের জন্য জেলে আমার নিরাপদ নীড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তাহার পরই এই উৎপাত! এবার কিন্তু এ সবই কাল্পনিক ব্যাপার! দেড়মাস জেল হইতে ফিরিয়াছি—শরীর ত এই—দেহে বল নাই—মনে স্ফূর্ত্তি নাই। মার ছবি লইয়া একেবারে দেশে গিয়া সেই

শ্মশানে পড়িয়া সব শেষ করিব ভাবিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু গোলযোগ ঘটিল। রাস্তার মোড়ে একটা থার্ড ক্লাশ গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। এক জমাদার আসিয়া গাড়োয়ানের উপর তম্বি করে! গাড়োয়ান বেচারা সন্ত্রস্ত। আমি গায়ে পড়িয়া তাহার পক্ষ লইলাম। জমাদারের কোপ পড়িল, আমার উপর—তাহার এক জুড়িদার নিমেষে কোথা হইতে আসিয়া আমায় সনাক্ত করিল, এ বেটা পুরানো দাগী! জমাদার আমায় ধরিয়া থানায় আনিল! দুই দিন কোমরে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইয়া এই এক শ' দশ ধারায় শেষে চালান দিয়াছে। সাক্ষীগুলা কোথা হইতে আসিল, জানি না। আমি উহাদের চক্ষেও কখনও দেখি নাই, যে পাড়ার লোক উহারা, সে পাড়ার পথেও কোনদিন হাঁটি নাই! অথচ উহারা সকলেই হলফ লইয়া সটান্ জুলুম-জবরদস্তির কথা বলিয়া গেল।"

মাখন চুপ করিল।

আমি কহিলাম, "তোমার বাবার নাম কি? তিনি এখনও বেঁচে আছেন ত?"

মাখন বলিল, "সে খপরে কি হবে, বাবু?"

আমি কহিলাম, "হাকিমের কাছে প্রকাশ করে বললে সুবিচার প্রত্যাশা করতে পারি।"

মাখনের চোখ-দুইটা সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল,—বজ্র স্বরে সে কহিল, "কি বললেন, সুবিচার? এই হাকিমের কাছে? অসম্ভব! যদি সে আশা থাকত, তাহলে আজ এজলাসে ওর ঠাঁই না হয়ে আমার পাশে সেই আসামীর কাঠগড়ায় ওকে দাঁড়াতে দেখতুম। আমার এ দুর্দ্দশার জন্য যে দায়ী,—আমি, না, ও? যদি ভগবান থাকেন তিনি এর বিচার করবেন! হাকিম হয়ে বসে লোকের বিচার করছেন,—উনি! মাখন ফুঁসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "মাখন—ও কথা তোমার বাপের নামটা বলই না, কিছু উপায় হবেই—"

"কিসের উপায়? কোন উপায় করতে হবে না, বাবু! যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন ও কি করবে—আমার? হয় আমায় জেলে দেবে! দিক্—ভগবান সব লিখে রাখছেন! ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে যদি ওঁর পৌরুষ হয়, হোক—"

আমি কহিলাম, "না, আবার কি বকতে সুরু করলে, মাখন—"

"তবু বুঝতে পারছেন না বাবু? ওই ত আমার বাপ, ঐ সদানন্দ সেন—আপনাদের হাকিম—"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! হাকিম সদানন্দ সেন! সেদিন ছবি দেখিয়া হাকিমের সে চিত্ত-বিকারের কথা অমনি আমার মনে পড়িল! ব্যাপারটা জলের মত সাফ হইয়া গেল! আমি মাখনের পানে চাহিলাম! তাহার চোখ দিয়া তখনও যেন আগুন বাহির হইতেছে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

ভূতপত্ত্বীর দেশ। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি শিশু-গ্রন্থ,—কলাবিদ্ লেখকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পড়িতে পড়িতে পাঠকের চিত্ত কল্পনার লঘু পক্ষে ভর করিয়া বিস্ময়-কৌতূহলের অপরূপ উজ্জ্বল মায়ালোকের মধ্য দিয়া এক অজানা রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়—শেষ করিয়া পড়িলেই মনে হয়, এখানেই থামিলাম কেন? আরও চাই। শিশুদিগের চির-পরিচিত অত্যন্ত সাধারণ গল্পের সূত্র ধরিয়া নব নব ভাব, নব নব ছবি শিশু-চিত্তে দেখা দিয়া একটু মৃদু দোল দিয়া যায়। প্রতি ছত্রে এমন বিরাট আগ্রহ, অপূর্ব্ব কৌতূহল জাগিয়া উঠে যে বইখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। ভাষা জলের স্রোতের মত উধাও বহিয়া চলিয়াছে, সে স্রোতে ভাবের মুক্তা অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে—তাহা যেমন শুভ্র, তেমনই উজ্জ্বল। ইহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসটুকুও এক নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া—অতীত ও বর্ত্তমানে মিশিয়া—দিব্য বিচিত্র রসের সৃষ্টি করিয়াছে। একাধারে এতখানি খাঁটি আনন্দ, শিক্ষা ও কৌতুকের অবতারণা শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বিরল। বইখানিতে চিত্রশিল্পী গ্রন্থকারের কয়েকখানি স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে—সেগুলিও যেন কৌতূহল ও কৌতুকের ছোঁয়াচ! Pen-and-ink sketch হইলেও সেগুলি জীবন্ত, প্রাণময়! বইখানির ছাপা সুন্দর, ইংলিশ অক্ষরে—বাঁধাই মনোরম—অর্থাৎ ভিতর ও বাহিরের সৌষ্ঠব—সর্ব্বাংশেই গ্রন্থখানি শিশু-সাহিত্যে অভিনব, অমূল্য।

নয়ন-তারা। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম,এ, প্রণীত। কলিকাতা এস. কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কটন প্রেসে মুদ্রিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এখানি পারিবারিক উপন্যাস। বঙ্গভাষায় যে কয়খানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আছে, এখানি তাহার অন্যতম। এতদিনে যে এ উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকের লজ্জিত হওয়া উচিত। শাস্ত্রী মহাশয় একজন বহুদর্শী সুলেখক। এ উপন্যাসে তিনি যে কয়টি আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশের উপযোগী। উপন্যাসের প্লটটি যেমন সরল, অনাড়ম্বর, ভাষাও তেমনই সহজ এবং মর্ম্মস্পর্শী। রায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র গৃহটি এমনই শান্তি-সুখে পরিপূর্ণ যে তাহার পানে চাহিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। রায় মহাশয়ের শিক্ষা-প্রণালী এমনই মধুর, পুত্র-কন্যাগুলির চরিত্রে এমন একটি রমণীয় স্নিগ্ধতা আছে, যাহা বাঙ্গলার মকর্দ্দমা-পীড়িত কোলাহল-মুখরিত গৃহে একান্ত প্রার্থনীয়। দরিদ্র হরেন্দ্রর চরিত্রে যে তেজ ও মনুষ্যত্ব প্রতিফলিত, প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে তাহা শিক্ষণীয়। নয়ন-তারা লেখকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—সারল্যে ও দৃঢ়তায়, কোমলতায় ও তেজে এমন মিশ খাইয়াছে যে কোথাও তাহার নারীত্বে ব্যাঘাত ঘটে নাই। অথচ চরিত্রটিতে রোমান্সও প্রচুর! বাঙ্গালীর সংসারে নিত্য যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহারই সাহায্যে লেখক অপরূপ চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন—জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব-প্রদর্শনের প্রচুর সুযোগ বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনায় কেমন অনায়াসলব্ধ, উপন্যাসখানি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়! এ উপন্যাস-পাঠে বিশ্রাম-ক্ষণ ত আনন্দে কাটিবেই, তদ্ভিন্ন ইহার চরিত্রগুলি পাঠকের চিত্তে যে সুদৃঢ় উজ্জ্বল রেখাপাত করিবে, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালী মহত্তর আদর্শের সন্ধান পাইবেন। উপন্যাসখানির ইহাই একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব! গ্রন্থের ছাপা, কাগজ সুন্দর। এ উপন্যাস বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য।

পসরা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। 'পসরা' ছোট গল্পের সমষ্টি—'কেরাণী', 'স্মৃতির শ্মশানে,' 'কপোতী', 'যশের মূল্য', জীবন-যুদ্ধে', 'অন্ধ' ও 'সোণার চুড়ি'—এই সাতটি গল্প পসরায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে, 'সোনার চুড়ি' গল্পটি। অমলার হৃদয়ের দ্বন্দ্বটুকু লেখক বেশ দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—আমরা অত্যন্ত ত্রস্ত হৃদয়ে তাহার চিত্ত-বৃত্তির অনুসরণ করিয়াছি; তাহার পরিণাম ভাবিয়া যথেষ্ট চিন্তিতও হইয়াছিলাম। কিন্তু লেখক শেষ রক্ষা করিয়াছেন—শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটির পরিণাম খুব সরল, খুব সহজ এবং খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। কোন অক্ষম লেখকের হাতে পড়িলে গল্পটি মাটি হইয়া যাইত! এই গল্পটির সম্বন্ধে প্রকাশক 'মুখবন্ধে' যথেষ্ট কৈফিয়ৎ কাটিয়াছেন। এ কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মৌখিক-রুচি-বাগীশ অকালপক্ব সমালোচক আছেন, যাঁহারা vulgar বা দুর্নীতির অর্থ না বুঝিয়া যখন-তখন যা-তা বলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠেন,—নারী-হৃদয়ের ক্ষুদ্র একটু চিন্তা, সামান্য একটু ভাবান্তর একেবারে প্রলয়-হুঙ্কারেরই রূপান্তর বলিয়া তাঁহাদের মনে হয়। তাঁহারা চাহেন, পদাহতা উপেক্ষিতা স্ত্রী পদাঘাত খাইয়া পরক্ষণেই অশ্রু মুছিয়া স্বামীর চরণে গরম তৈল মালিশ করিতেছে, শুধু এমনই চরিত্র আঁকো। স্বামী স্ত্রীকে অভদ্র, কটু বা কুৎসিত গালি দিলে, স্ত্রী যদি রাগ করে ত তাঁহারা অমনি বলিবেন, 'খবরদার, চোখ রাঙাইও না, দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইবে।' সৌভাগ্যক্রমে এ শ্রেণীর কাণ্ড-জ্ঞানহীন সমালোচকের সংখ্যা অল্প—এবং তাঁহাদের মতামতে বাঙ্গলা সাহিত্যের কিছুই আসিয়া যায় না—তাঁহাদের ভ্রূকুটি-ভঙ্গকে উপেক্ষা করিবার মত শক্তি ও সাহস, 'পসরার' লেখকের আছে—কাজেই 'মুখবন্ধে' এ ভণিতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। Art ও vulgarismএ প্রভেদ কি, সুধী পাঠকমাত্রেই তাহা বুঝেন।

'স্মৃতির শ্মশানে' গল্পটিতে বেশ বৈচিত্র্য আ[illegible] 'কেরাণী' ও 'জীবন-যুদ্ধে' গল্প দুইটি Realistic, [illegible] চলনসই। 'যশের মূল্য' গল্পটি অস্বাভাবিক, এ [illegible] স্থান না পাইলেই ভাল হইত। 'কপোতীতে, কা[illegible] মাত্রা কিছু বেশী। যাহা হৌক, [illegible]-রচনায় লেখ[illegible] হাত আছে—ভাষাও সরল; দুই-একটি ত্র[illegible] এবার উল্লেখ করিব। গল্পগুলিতে [illegible]সের মাত্রা[illegible] খুবই—সেজন্য বহু স্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে। লে[illegible] এ উচ্ছ্বাসের অস্তিত্ব স্বীকার করে[illegible] প্রকাশক মহা[illegible] 'মুখবন্ধে' তাহার আভাষও দিয়া[illegible] এবং এ কথ[illegible] বলিয়াছেন, "নানাকার্য্যে ব্যস্ত [illegible] জন্য লে[illegible] ইচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সামান্য ত্রুটিটু[illegible] [illegible]ধনের অবক[illegible] পান নাই।" এ ত্রুটির জন্য [illegible] তিনি প্রা[illegible] করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথে[illegible] [illegible] বলিয়া আম[illegible] মনে করি না। দ্বিতীয় ত্রুটি, [illegible] স্থানে মুদ্রাদে[illegible] আছে। তাহার উপর কথোপ[illegible] [illegible] ও বর্ণন[illegible] ভাষায় মধ্যে মধ্যে মিশ খাইয়া [illegible] ঘটাইয়াছে[illegible] আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে [illegible] সংশোধি[illegible] হইবে। বহিখানির ছাপা কা[illegible] ভাল।

শ্রীঅদ্বৈত বিলাস। [illegible] শ্রীমদাচা[illegible] অদ্বৈত প্রভুর পবিত্র চরিতাখ[illegible] প্রথম খণ্ড আদি ও মধ্যকাণ্ড। মূল্য এক [illegible] দুই আনা দ্বিতীয় খণ্ড। উত্তর কাণ্ড। মূল্য [illegible] দুই আনা শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক [illegible] কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। "শ্রী[illegible] প্রভুর চরি[illegible] সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—গদ্যে [illegible] যত প্রকার গ্র[illegible] আছে, তৎসমুদয় হইতে বিবরণ সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।" বিস্তর [illegible] ও গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত এই গ্রন্থখানি লেখকের [illegible] অধ্যবসা[illegible] ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফল। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত, প্রাঞ্জল। বৈষ্ণবদিগের নিকট এ গ্রন্থের মূল্য যথেষ্ট হইবেই; তাই বলিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর নিকটও ইহার মূল্য সামান্য নহে। চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে এখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ-স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। তাহার উপর ইহার আরও বিশেষ মূল্য এইজন্য যে, গ্রন্থে কোনরূপ গোঁড়ামি নাই।

গতি। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible]। কলিকাতা ১০০ নং অপার চিৎপুর রোড, [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে শ্রীহরিপদ বন্দোপাধ্যায় [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। [illegible] উপন্যাস—অর্থাৎ লেখকের কথায় "গার্হস্থ্য [illegible] নিতান্তই বিশেষত্ব-হীন রচনা। লেখক [illegible] বলিয়াছেন, "পুণ্যের জয় পাপের [illegible] পরিণাম প্রদর্শন করাই 'গতির মুখ্য [illegible]।" সেই [illegible]-সাধনের জন্য তিনি এক [illegible] মাতাল [illegible] অবতারণা করিয়াছেন। [illegible] স্ত্রীকে [illegible] প্রহার করিয়াছে, দেখিলাম; [illegible] তাহার আর [illegible] কোন কাজ নাই! আর স্ত্রী [illegible] পড়িয়া [illegible] মার খাইয়াছে। তাহার একটা কথা [illegible]ই, চিত্তবৃত্তিরও কোন আভাষ [illegible] গেল না—[illegible] মৃত্যুর পূর্ব্বে হঠাৎ দেখা [illegible] এই স্ত্রীটি স্বামীর চরণ দেখিবার জন্য [illegible] করিতেছে। দৈবক্রমে স্বামী যেমন [illegible] দাঁড়াইল, অমনি স্ত্রী একবার কাশিল [illegible] বমন করিল [illegible] স্বামীর "দিকে চাহিয়া [illegible] প্রাণত্যাগ [illegible]।" গ্রন্থকার পরে টিপ্পনী [illegible]ছেন, "লীলা সতীলক্ষ্মী, তাই মৃত্যু-সময়ে স্বামী [illegible] বঞ্চিতা হইল না।" চমৎকার! এই একটি [illegible]তেই এক-দম সতীলক্ষ্মী! ইহাকেই বলে, আদর্শ [illegible]। সীতা, সাবিত্রীর দেশে এ কথা লিখিতে [illegible] লজ্জা হয় না। মামুলি জঘন্য রসোদ্গারেই [illegible] আনন্দ, তাহারও উপন্যাস লিখিবার সাধ হয়! [illegible]শ্চর্য্য! এমন অদ্ভুত ভাব লইয়া উপন্যাস-নাটক [illegible] চেষ্টা শুধু ধৃষ্টতা দেখান। দার্শনিক বক্তৃতা ছাড়া [illegible]ন্যাসখানিতে মানুষ-চুরি ডাকাতি আত্মহত্যা খুন, [illegible]তি সবই আছে—অর্থাৎ ফৌজদারী অপরাধের [illegible] ফিরিস্তি বাঙ্গলার বাজে উপন্যাসেও ক্বচিৎ দেখা [illegible]। ভাষাও অবিকল ভাবের অনুরূপ—ইনি বলেন, [illegible] দেখ, উনি বলেন, আমায় দেখ!

কেতকী। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। [illegible]কাশক, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব ভবন, [illegible]। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা, বাঁধাই এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। এ গ্রন্থে "জ্যোতিঃহারা," "মিলন," "নির্ব্বন্ধ," "ট্রেনে," প্রভৃতি তেরটি ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পই পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি বিদেশীয়ের অনুবাদ ও অপরগুলি মৌলিক। 'অপয়া,' 'ট্রেনে,' 'জ্যোতিঃহারা,' প্রভৃতি মৌলিক গল্পগুলি আমাদের মন্দ লাগে নাই—সেগুলির ভাব স্বচ্ছ, প্রাণময়; ভাষাও নির্দ্দোষ, অনাড়ম্বর। বিদেশীয় গল্পগুলির মধ্যে 'বিচারে,' কোন বিশেষত্ব নাই—অপরগুলির নির্ব্বাচন ও রচনা প্রশংসনীয়। অনুবাদ-গল্পগুলির ভাষায় বেশ স্বচ্ছতা আছে, পড়িতে বাধে না, কোনখানে অনুবাদ বলিয়াও মনে হয় না। যাঁহারা বাঙ্গলায় বিদেশীয় গল্পের অনুবাদ করেন, তাঁহাদিগকে এগুলি বিশেষ করিয়া পাঠ করিতে বলি। বহিখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

বারুণী। শ্রীযুক্ত [illegible], এম, এ, বি-এল, সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। 'বারুণী,' 'অনাদৃত,' 'আমার চাকরি,' প্রভৃতি এগারটি ছোট গল্প ইহাতে সংগৃহীত এবং প্রথম গল্প 'বারুণীর' নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলির ভাষা ভাল,— সরল এবং অনাড়ম্বর, তবে ছোট গল্পের আর্টের দিক দিয়া দেখিলে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, গল্পে ত্রুটি আছে, বিস্তর। "আমার চাকরি" গল্পটি ছোট গল্প হিসাবে আমাদের বেশ লাগিয়াছে। অপরগুলি সুখপাঠ্য—ছোট গল্পের রসও অনেকগুলিতে আছে, তবে সে রস তেমন ফুটিতে পায় নাই; তাহার কারণ, গল্পগুলি তেমন স্বাভাবিক বা সুসমঞ্জস হয় নাই। 'বারুণী' গল্পে কন্যা বারুণীকে লইয়া হরনাথ ও নীরদাসুন্দরীর মনোমালিন্যের মাত্রা এতদূর গড়াইয়াছে যে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকে—কারণ নীরদাসুন্দরীর চরিত্রে অভিমানের সহসা এতখানি কাঠিন্য ফুটিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'পুনর্জন্ম

গল্পটিতে ছোট গল্পের উপাদান বেশ ছিল,—তবে শাশুড়ীকে অতখানি রুদ্রাণী সাজাইবার পক্ষে লেখক পূর্ব্ব হইতে কোন আয়োজন করেন নাই। 'অনাদৃত' গল্পের গোপীমোহন কতকটা বেকুব জড়ভরত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—লেখকের লেখনীতেই তাহার অস্তিত্ব পর্য্যবসিত, তাহার যেন স্বতন্ত্র প্রাণ নাই। 'স্মৃতিরক্ষা' গল্পটি একটু অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়াছে। 'রেলযাত্রী'ও অনাবশ্যক ভারে আক্রান্ত। "স্নেহপাশে" বৃদ্ধার বক্তৃতায় ভগবতীর স্নেহাধিক্য না বুঝাইয়া অন্য উপায়ে তাহার পরিচয় দিলে গল্পটি জমিতে পারিত। যেগুলির নাম করিলাম, সেগুলিতে ছোট গল্পের উপাদান আছে; সেগুলি একটু চেষ্টাতেই ফুটিতে পারিত! শুধু লেখকের অবহেলায় ফুটে নাই। লেখকের হাত ভাল, লিখিবারও শক্তি আছে, তাই এত কথা, অপ্রিয় হইলেও, খুলিয়া বলিলাম। আশা করি, লেখক বিরক্ত না হইয়া বুঝিয়া দেখিবেন।

প্যারাডাইস লষ্ট্। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রথম সংস্করণ। প্রকাশক, এস, ঘোষ, মাগুরা বারুই-পাড়া পোঃ আঃ, জেলা খুলনা। কলিকাতা বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত। এখানি মিলটনের প্যারাডাইস লষ্টের প্রথম সর্গের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ পদ্যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে। অনুবাদের নমুনা দিতেছি,

"মানবের অবাধ্যতাপ্রসঙ্গে প্রথম,
নিষিদ্ধ তরুর ফল-বিষম-আস্বাদ
ভূতলে আনিল যার মরণ-সন্তাপ,
নন্দন-বিচ্যুতিসহ—আবার যাবৎ
না স্থাপেন পূর্ব্বভাবে নরোত্তম নর
নিখিল-মানবে, না লভেন সুখাবাস,
গাহ ওহে ঈশসুতে, হোরেব-সিনাই-
নিভৃত চূড়ায়, অনুপ্রাণিলেন যিনি
সে মেষপালকে, শিখালেন পুরাকালে
নির্ব্বাচিত জাতে যিনি প্রথমে আরম্ভে

কারণ-সলিল হতে উঠিল কেমনে
পৃথী-গ্রহ-তারা।"—ইত্যাদি

লেখক অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনরূপ মতামত প্রকাশ [illegible] একটা কথা লেখককেই জিজ্ঞাসা করি—এ কি মূলের চেয়েও কঠিন, [illegible] গ্রন্থের উপক্রমণিকায় মিল্‌টন [illegible] রচনার আলোচনা এবং [illegible] হইয়াছে।

আহ্নিকাচারতত্ত্বাবলী [illegible] জাধিরাজ-কোচবিহারাধিপতি [illegible] প্রসাদ শর্ম্মণা সঙ্কলিতং। [illegible] ভট্টাচার্য্যেণ এম এ বিদ্যারত্নে [illegible] জ্ঞানোদয়স্তু মুদ্রিত প্রথমসংস্করণ [illegible] পরিষদানর্ঘ্যং দ্রিতম্। অর্দ্ধ মূল্য [illegible] খানি সংস্কৃতে বিরচিত, [illegible] জন। এই গ্রন্থে প্রাতঃকৃত্য [illegible] তর্পণ, ও পূজাদির মন্ত্র প্রভৃতি [illegible]

সরল প্রসূতিদর্পণ [illegible] মিসেস পি, দাস প্রণীত [illegible] মূল্য এক টাকা। গৃহস্থ [illegible] জন্য এ গ্রন্থখানি লিখিত [illegible] লেডি ডফরীন্ হাসপাতাল [illegible] অল্পের মধ্যে বিস্তর প্রয়োজনীয় কথা এই [illegible] লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিষয়গুলি বুঝাইবার [illegible] কয়েকটি চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। [illegible] ভিত্তি ইংরাজী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা [illegible] দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। গ্রন্থখানি বিশেষ সতর্কতা সহিত লিখিত। এ গ্রন্থ [illegible] তাঁহারা ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। তবে গ্রন্থের মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে—'আট আনা' হইলে ঠিক হইত।

ডাক্তার।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বিশ্রাম

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২২ [৯ম সংখ্যা

প্রত্যাবর্ত্তন

তৃতীয় খণ্ড

১৩১০ সালের ভারতীতে এই প্রসঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রকাশিত অংশের চুম্বক দেওয়া গেল ঃ—বর্দ্ধমান জেলার বাঁকা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গম উত্তরায়ণে স্নান করিয়া অনন্ত ও জয়রাম প্রভৃতি গ্রামবাসী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে লইয়া স্বগ্রামে ফিরিতেছেন। অনন্ত, সুলক্ষণার স্বামী। অনন্তের চরিত্র-সম্বন্ধে নানা গ্রামে দুর্নাম রটে। এই বিষয় লইয়া একবার শ্বশুরবাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বাদানুবাদ হয়, ফলে অনন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করে। সুলক্ষণা বহির্দ্বারে আসিয়া স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু অনন্ত সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া রাত্রির অন্ধকারে মিশিয়া যায়। সেই হইতে অনন্ত আর শ্বশুরবাড়ী যায় না বা স্ত্রীকে আনিবার নামও করে না। সুলক্ষণার বয়স পনেরো। হেমার বয়স চব্বিশ, চঞ্চল প্রকৃতি। সে যুবতী ব্রাহ্মণকন্যা, বড় ডানপিটে, হাসিতে ও হাসাইতে পটু। হেমা, পাড়ার যুবতী ও কিশোরী বউঝির সঙ্গিনী ও উপদেষ্টা ছিল। পার্ব্বতী ও রক্ষা সহোদরা। তাহারা বিধবা কুলিনকন্যা। যাত্রীদলের মধ্যে কেবল ফণের মা ও হাবুর মা জাতিতে শূদ্র। জয়রামের বয়স ১৮।১৯—গ্রামসম্পর্কে অনন্তের ভাই।

উত্তরায়নে গঙ্গাস্নান শেষ করিয়া এক্ষণে কেবল দলস্থ স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার অপরাহ্নে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যাত্রীগণ গল্প করিতে করিতে চলিল। পথে ঘাটতলা পরিত্যাগ করিয়া আবার গ্রাম্য ভূতোর মা জিজ্ঞাসা করিল, "গিন্নি, তুমি কি পথ ধরিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। অনন্ত ও কিন্‌লে?"

জয়রাম ইতিপূর্ব্বেই অগ্রগামী হইয়াছিল। হাবুর মা বলিল "আমি? আমি

হাবুর নেগে ফুটকলাই মুড়কি আর জিলাপী নিলাম।”

“আর বোয়ের নেগে কি নিলে?”

“বোয়ের নেগে আবার কি নেবো? বুড়মাগী তার আবার কি চাই? বাড়ী যাব কতক্ষণে গো?”

হেমাঙ্গিনী কহিল, “বাড়ী যেতে ঘোগা ডাক্‌বে; এইখানেই ত বেলা গেল।”

আরও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া যাত্রীরা দেখিল তাহাদের পরিচিত আর একদল যাত্রী আসিতেছে। পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের ধূম পড়িয়া গেল। তারপর হেমা ও পার্ব্বতী কহিল, “মাউইমা আমাদের বউ কই বল।”

গৌরবর্ণা স্থূলকায়া একজন প্রৌঢ়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “এই যে আমার বউমার কাছে, ‘আয়গো সুলক্ষণা,’ তোর ননদেরা তোকে খুঁজছে।”

প্রৌঢ়ার কথা শুনিয়া দুইটী অবগুণ্ঠিতা সুন্দরী আসিয়া হেমা ও পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইল। নবাগত যাত্রীদের আর পরিচয় দিতে হইবে কি? স্থূলকায়া গৌরবর্ণা প্রৌঢ়া, অনন্তের শ্বশ্রূঠাকুরাণী। সুলক্ষণা অনন্তের সেই অভাগিনী পত্নী। আর “বৌ”, সুলক্ষণার ভ্রাতা গোবিন্দের স্ত্রী। ইহারাও আজ স্বদলবলে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল। মেলাতলায় জয়রাম ইহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া সে কথা অনন্তের কর্ণগোচর করে, তাহা বোধ হয় পাঠকগণের মনে আছে। বামুনবেড়ের বউ ও কোঁদার বউ এতক্ষণ ঘোমটা খুলিয়া বাজারের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু যেমন কুটুম্ববাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে পা[illegible] অমনি একহাত ঘোমটা টানিয়া আ[illegible] বউ সাজিল। ইহাই পল্লীগ্রামের রী[illegible] ইহাই পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের লজ্জ[illegible] এই প্রকার লজ্জাশীলা পল্লীবাসিনী সহরের মেয়ে-ছেলেকে “বেহায়া” বলি[illegible] কুণ্ঠিত হয় না। একটা কারণও আ[illegible] পল্লীগ্রামের বারয়ারি পূজা অথবা [illegible] প্রভৃতি উপলক্ষে সহর [illegible] বাই-খেম[illegible] মেয়েযাত্রা এবং মেয়েকীর্ত্তন গিয়া থা[illegible] এই সকল নষ্টচরিত্র কুলাঙ্গনাকে দেখি[illegible] পল্লীবাসিনীরা সহরের স্ত্রীলোকের আচা[illegible] ব্যবহার ও লজ্জা-শরমের [illegible]মাণটা আন্দ[illegible] করিয়া লইয়া থাকে। ই[illegible] মেলাতল[illegible] সেই কাঠওয়ালী কলহ[illegible] বৃদ্ধা মে[illegible] শ্বাশুড়ীও তাহাদের সহিত আসিয়া যে[illegible] দিল। তাহাকে দেখিয়া [illegible], পার্ব্বতী কহিল, “দাঁড়া ভাই, [illegible] যখন এ[illegible] জুটেছে তখন একটা কাজ করিয়ে নিই।”

এই বলিয়া সেই বৃদ্ধাকে বলিল, “এই বেয়ান্, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে আমি তোমাকে কত খুঁজলাম”—

বৃদ্ধা বাধা দিয়া কহিল, “তোম[illegible] কোথায় বাসা কোরে ছিলে, আ[illegible] খুঁজে খুঁজে হালাক হলাম। ত[illegible] ভাবলাম যে, যাইতো মোয়ানে বা[illegible] এই বাগ দিয়েত তানারা যাবে ত[illegible] এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। আমি ম[illegible] করলাম—আর জামাইবাড়ী যাব না, [illegible] বেয়ান ঠাকরোন্ বল্লে, তা সে কথা [illegible] ঠিলতে পারি?”

হেমা বলিল, “তা যাবে বইকি সে [illegible]

[illegible]? তোমরা হলে গোতুরে লোক, [illegible]র লোক, যাবে বইকি। দেখ পার্ব্বতী, [illegible]ন বড় কাজের লোক, এই মোটটা [illegible] আমাতে আর তোতে হিম-সিম খেয়ে [illegible], ওনারা কি এসব গেরাজ্জি করে?”

“আর গতর কি আছে বেয়ান ঠাকরোন? [illegible]না পুঁটুলিটে, আমার হাতে খানিক [illegible]”—

বাধা দিয়া হেমা বলিল “ওমা সেকি [illegible]? তুমি কুটুমমানুষ, ভদ্দরলোকের [illegible] (বুড়ী জাতে দুলে) তুমি আমার [illegible] নেবে কেন?”

আর যায় কোথা! ব্রাহ্মণকন্যা একে [illegible]রাছেন “কুটুম্ব” তার উপর আবার “ভদ্দর [illegible]কের মেয়ে” আর কি রক্ষা আছে! [illegible] বিনাবাক্যব্যয়ে হেমার হাত হইতে [illegible] লইয়া নিজে মাথায় করিয়া চলিল।

দেখিয়া পার্ব্বতী সহাস্যে হেমাকে বলিল, [illegible] কর না, মাগী যাচ্ছেত ঘাড়ে করেই [illegible] যাক্।”

এদিকে অনন্তের শ্বাশুড়ী যাইতে যাইতে [illegible]কে সম্বোধন করিয়া বলিল, “হাঁগা [illegible], বল্‌তে পার জামাই আনতে লোক [illegible]লে বিয়ান জামাইকে পাঠায় না [illegible]? লোক ফিরিয়ে দেয়।”

রক্ষা জিভ কাটিয়া বলিল, “বাপরে অমন [illegible] বোলনা মাউই-মা, তোমার বিয়ানের [illegible] মানুষ কি আর আছে? তাকে একটা [illegible] দিচ্ছে লোকে।—”

অনন্তের শ্বাশুড়ী শুনিয়া সবিষাদে [illegible]হিলেন, “হেইমা, কি হবে গা! আমার [illegible] বড় ভয় নাগ্‌ছে।”

“ভয় কি?”

“ভয় আবার কি? তোরা কাঁচা মেয়ে, জানিস না মা ভয় ষোলআনা। একে ছেলেমানুষ, সোমত্ত বয়েস, মাথার উপর বাপ নাই, খুড়া জেঠা মামা কেউ নাই, তাতে বিষয়ওয়ালা লোক, ওর যদি দোষ হয়ে থাকে তাহলে বড় মুস্কিল। যা খুসি তাই কর্ব্বে কাকেও আর মানবে না, আর মান্‌তেই বা আছে কে? মাগীদুটোকে কি আর গেরাজ্জি করবে? এক একটা ধমক দিলেই হল।”

“কয়, এমন কি বয়ে গেছে বাছা, তা ত কিছুই দেখতে পাই না। তবে বেটাছেলে কোথায় কি কল্লে না কল্লে সে আলাদা কথা। এইতো আমরা রাড় হয়েছি, বাড়ীর পাশে বাস করছি কখনও উঁচু নজরটি নাই। বরঞ্চ আমাদিগকে কত মান্যি করে, কত সাহায্য করে, অবিশ্যি আমাদেরই নিয়ে আমাদের করে, তাই-বা আমার করে কে? তাই-বা না করবে কেন? পাড়া পিল্লিবাসী কত্তে হয় বই কি। যদিই তোমার জামাই মন্দ হয়ে থাকে তাতেই বা তোমার দুঃখু কি? তোমার মেয়েকেত আর অনাদর করে নাই। আর করেই যদি? আমরা এই যে কখনও সোয়ামীর মুখ দেখতে পেলাম্ না, তা কি কর্ব্ব সব সহ্যিই কর্ত্তে হয়।”

অনন্তের শ্বাশুড়ী আর রক্ষার কথায় উত্তর দিলেন না। এদিকে সুলক্ষণা প্রিয়সঙ্গিনী হেমাঙ্গিনী ও পার্ব্বতীকে পাইয়া অনেক দিনের পর মনের কবাট্ খুলিয়া ফেলিল। দশমাস বাপের বাটীতে আছে,

কিন্তু একদিনও সুখে কাটায় নাই বরং বিশেষ মনের কষ্টেই আছে, তাহা সমদুঃখিনী-দিগের নিকট প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুলক্ষণা যে নীরবে কাঁদিতেছিল, তাহা বলা বাহুল্য। রাঙা ঠাক্‌রুণ, ভূতোর মা প্রভৃতি গৃহিণীদিগকে দেখিয়া সুলক্ষণা ঘোমটা দিয়াছিল। পার্ব্বতী সকলের দুঃখের দুঃখিনী, সেও সুলক্ষণার দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল এবং একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হে হরি, যে যে কয়দিন বাঁচে সে যেন হাসিমুখে থাক্‌তে পায়। কাকেও কষ্ট দিও না হরি! মেয়েমানুষের এর বাড়া আর কষ্ট নাই। বলে—

আপনার দুঃখে অসংসারী,
পরের দুঃখ দেখতে নারি।

মেয়েমানুষগুলো মরে যায়ত বেশ হয়।"

হেমা বাধা দিয়া কহিল, "বালাই, মর্ব্বে যদি তবে মাসে মাসে গোটা পাঁচ ছয় একাদশী করবে কেলা নেকি? মর্ত্তে হয় তুই মরিস্, আমি তো কখনও মরব না। একাদশীর সংখ্যে দেখে তবে মরবো; নইলে বুঝি মলেই হল?"

সুলক্ষণা সাশ্রুনেত্রে বলিল, "আমার ভাই মর্ত্তেও ইচ্ছা হয় না আর একবার দেখা না করে!"

সুলক্ষণার কথায় হেমা রাগিয়া বলিল, "তোর দুঃখটা কি বল্‌ত শুনি।"

তখন সুলক্ষণা প্রথম হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত খুলিয়া বলিল। তারপর কহিল, "আমি পায়ে ধর্‌তে গেলাম আমাকে নাতি মেরে পাঁচ হাত দূরে ফেলে দিয়ে গেল।"

সদাকৌতুকময়ী হেমাও চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আঃ! এই মোটে পাঁচ হাত, তবেত ভা[illegible] ফেলে দিয়েছে! আমি থাকলে শিখি[illegible] দিতাম, তোকে দশ হাত দূরে ফে[illegible] দিত।"

সুলক্ষণা আবার সারোদনে বলিল, "[illegible] পারে, তাতেই পটু। য[illegible] তোমাদে[illegible] সঙ্গে পথে যাচ্ছি ততক্ষ[illegible] তোমাদিগকে দেখি নিই। বোধ হয় [illegible] আর দে[illegible] হবে না।"

পার্ব্বতী বলিল, "ছি [illegible] একথা বল[illegible] নাই।"

"না হয় না বল্লাম [illegible] ভাই, আর স[illegible] হয় না।"

এইবার হেমা রা[illegible] বলিল, "[illegible] ডেকরা বামুন এমন? [illegible] পে গুরু দ[illegible] কর্‌তে কবে শিখেছে [illegible] বামুন সুদু সুদু তোকে এমন [illegible] করছে কেনে? সে হাড়হা[illegible] লক্ষ্মীছাড়া উড়ুপ্পেয়ে, তাতেই বুঝি গঙ্গাতীরে বসে এত জারিজুরি হচ্ছিল? আমি তখনই বুঝেছি—তোর মাথা খাচ্ছে হতভাগা! কি বলব ভাই হয়!"

পার্ব্বতী কহিল, "আ মরণ! ভেয়ের খাতির ত কত হোচ্ছে।"

"ঐ রকম ভেয়ের ঐ রকম খাতির।"

তারপর সকলে অনেক কথা কহিতে কহিতে অনেক পরামর্শ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ হেমা উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, "ভাই, যদি তোর কালো মাণিককে মিলিয়ে দিই, তা হলে তুই কি দিস্?"

সুলক্ষণা হাসিয়া কহিল, "তা হলে একদিন ভাগ দিই।"

হেমা সুলক্ষণাকে চিমটি কাটিয়া কহিল—"মরলো মর, আপনি শুতে যায়গা পায়না শঙ্করাকে ডাকে।"

অনন্ত, জয়রাম ও অনন্তের সম্বন্ধী গোবিন্দ, তিনজনে একত্র হইয়া অগ্রগামী হইয়াছিল। তাহারা তেমহলার উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। অনন্ত বলিল, "কইরে, তাদের যে দে[illegible] নাই, কোথায় ফেলে এলি তাদিকে?"

জয়রাম বলিল, "যেখানেই থাকনা, তোমার একলাকার ত [illegible]! এই একজন ভদ্রলোকের ভগ্নী।"

গোবিন্দ সহাস্যে কহিল, "শালা আমার।"

জয়রাম বলিল "ঐ রথের ধ্বজা দেখা গিয়েছে। অনন্ত আসুন আমরা এগিয়ে যাই" বলিয়া তিনজনে আগাইয়া চলিল।

যাইতে যাইতে গোবিন্দ কহিল, "আগে আমাদের বাড়ী হয়ে যেতে হবে, তারপর খাওয়া শোওয়ার বিবেচনা।"

অনন্ত করযোড়ে কহিল, "আজকের মত মাপ করুন। দেখছেন ত, এ পল্টন নিয়ে কি কোথাও যেতে আছে?"

"তবে কবে আস্‌বে?"

"এখনও ঢের হাঙ্গামা রয়েছে—মাঠে ধান রয়েছে বওয়া হয় নাই, এই সব ঝঞ্ঝাট ফেলে আমার গঙ্গা নাইতে আসাই অন্যায় হয়েছে।"

"তা বটে ভাই, তবে কি না অনেক দিন যাও নাই তাই বড় মন-কেমন করে, সে যা-হক রাত্রে উঠে পালিয়ে এসেছিলে কেন?"

অনন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "পালিয়ে আসব কেন?"

"পালিয়ে না হয় লুকিয়ে ত বটে।"

অনন্ত আর কোনও কথা কহিল না। জয়রাম আপন মনে গান করিতে করিতে চলিল।

এদিকে স্ত্রীলোকেরা পরস্পর গল্প করিতে করিতে চলিতেছে; প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় হাবুর মা কহিল, "দিদি ঠাকরোণ, মুরি না খেলে ত চলতে নারবো।"

রক্ষা বলিল, "আ মর, এই ভাত খেয়ে এলি, এখনও গলায় ভাত উঠছে এর মধ্যে মুড়ী খাওয়া?"

"ক্ষিদে কি আমার লাগো গা? এই নড়ি গাছটা বেয়ে আমার আরও ক্ষিদে নেগেছে" এই বলিয়া সেই তৈলপক্ক লাঠি গাছটা দেখাইল।

রাঙা ঠাক্‌রুণ বলিল, "তাইত, তুই আবার লাঠি কোথায় পেলি?"

বামুনবেড়ের বউ বলিল, "এই লাঠি যে ঠাকুরপোর, সে ফেলে গেছে বুঝি?"

কোঁদার বউ বলিল, "হাবুর মার পতিভক্তি আছে, দেখ সে ফেলে এসেছে ও ত ফেল্‌তে পারে নাই বাবু।"

হাবুর মা বলিল, "তোমরা গর্দ্দিই কর আর যাই কর আমি ত মুরি না খেয়ে নর্‌তে নার্‌ব।"

সন্ধ্যার আগেই সকলে কর্পূরডাঙ্গার মাঠে উঠিল। সেই কাঠওয়ালি বুড়ী বিধু কহিল, "দিঠাকরুন, সন্ধে হলে আমারও একটু রাত বাদে।"

হেমা কহিল, "এই মরেচেরে পোড়া-কপালী! তা হলে তুই এলি কেন?"

"তুমিইত বল্লে যে তোর নাতনীর বিয়ে, তা তোকে না বলুকগে, তুই চ আমি বলে কয়ে দিব তোর জামাইকে।"

"তবেই হয়েছে! নারদ শেষে ঢেঁকি ঘাড়ে করবে নাকি? তুই বল্লি আমি পুঁটুলি নিয়ে যাব—আর তুই সুধুই চল্‌তে পার্‌চিস না, তা আর পুঁটুলি নিবি কি করে?"

সকলে নিকটস্থ একটা বটবৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল এবং মুড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর অনন্তের শ্বাশুড়ী কহিলেন, "মেয়ে, তোমরা আজ আর বাড়ী যেয়ো না, সবাই আমাদের বাড়ী থাকবে চল।"

রক্ষা কহিল, "সে কি হয় মা, বাড়ী যাব বইকি, সব ঘরকন্না ফেলে এয়েছি দুদিন বাড়ী-ছাড়া।"

"তা একটা রাত বইত নয় কাল সকালে উঠে বাড়ী যেয়ো।"

"আর তোমার জামাইয়ের যদি মত না হয়? সে সঙ্গে থাক্‌লে যা হয় হোত।"

"জামাইও চলুন তিনি না গেলে কি হয়? সেই অবধি বাছা যান নাই আর শ্বশুরবাড়ীর দোর দিয়ে কি রাত্রে বাড়ী যেতে আছে?—"

রাঙা ঠাক্‌রুণ বলিলেন, "আর বউ সোমত্ত? তা তোমরা যা বল বাছা তোমাদের বলবার সম্বন্ধ।"

সহরের পাঠিকারা শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন, যে উদ্যোগ আয়োজন কিছুই নাই, অনন্তের শ্বাশুড়ী এত রাত্রে অকস্মাৎ দশ বার জন কুটুম্ব লইয়া যাইতে চাহিতেছেন কোন্ সাহসে?

অসময়ে একজন কুটুম্ব আসিলে আমরা বিরক্ত হইয়া উঠি আর পল্লীগ্রামের লোকে অর্দ্ধরাত্রে একপাল কুটুম্বকে নিজের গৃহে লইয়া যাইতে উদ্যত! সহরের লোকে পয়সা খরচে কাতর নহেন, কাতর একটু শারীরিক পরিশ্রমে। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কেহ বই অথবা পশম লইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় কুটুম্ব আসিলে সেই বিশ্রামে ব্যাঘাত হয়, রাত্রে কুটুম্ব আসিলে শেষ ছাড়িয়া উঠিতে কষ্ট হয়! সেইজন্যই সহরের স্ত্রীলোকেরা অতিথির উপর বিরক্ত। তাঁহারা বলেন, "পাড়াগাঁয়ের লোক কি অসভ্য! তা না হলে এমন অসময়ে কি কুটুম্ববাড়ী আসতে হয় গা?" কিন্তু তাঁহারা এটুকু বুঝিতে পারেন না যে পল্লীগ্রামবাসিনীরা কুটুম্ব বা অতিথি আসিলে কত দূর আপ্যায়িত হন; তাই তাঁহারা মনে করেন, আমরা যেমন কুটুম্ব পাইলে কৃতার্থ হই, আমাদের সহরবাসিনী বোনেরাও বুঝি সেইরূপ হন, সেইজন্যই পল্লীগ্রামের লোকে সময়-অসময়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কুটুম্ববাড়ী যাইয়া থাকেন। কিন্তু সহরে কুটুম্বের বাটীতে অসময়ে উপস্থিত হইলে, প্রায়ই গৃহিণীর বিরক্তির সহিত দোকানের মিষ্টান্ন উপভোগ করিতে হয়। আর এক কথা; সহরের কুটুম্বিনীদিগের সেবার জন্য নানাবিধ দ্রব্য আয়োজন করিতে হয়, এমন কি, অনেক স্থলে ঋণ করিয়াও। পল্লীগ্রামের কুটুম্বিনীদিগের জন্য সে সকল কিছুই করিতে হয় না।

পল্লীগ্রামবাসিনীরা নিজে যাহা নিত্য খাইয়া থাকেন, কুটুম্বিনীদিগকেও তাহাই দিতে সঙ্কুচিত হয়েন না এবং কুটুম্বিনীও তদপেক্ষা বেশী কিছু আশা করেন না। এটা সকলেই স্বীকার করেন যে, সহর অঞ্চলে মৌলিকতা অধিক আর পল্লীগ্রামে আনুষঙ্গিকতা অধিক। সহরের কোনও রমণী দুই এক দিনের জন্য কুটুম্ববাড়ী গিয়া জলের ঘটি লইয়া জলখাবার আহারের স্থান করিয়া লইয়া আহারে বসিতে অপমান বোধ করেন, কিন্তু পল্লীবাসিনীরা এক বেলার জন্যও কুটুম্ববাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিতে অপমান বোধ করেন। কুটুম্বের বাটী গিয়া যদি তাঁহাদের আপনজনের মত রাঁধিতে, কুটনা কুটিতে, জল তুলিতে, উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে,—এমন কি গোসেবা করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আর আত্মীয় কি?

অনন্তের শ্বাশুড়ী জানিতেন, বাড়ীতে যথেষ্ট মুড়ি আছে, খেজুর গুড় আছে, একটা মহিষ এবং পাঁচ-ছয়টা গরুর দুধ প্রায় ১২।১৩ সের বাড়ীতে মজুত আছে, সুতরাং কুটুম্ব গেলে ভাবনা কি? জামাতা এবং তৎসহচরের জন্য ক্ষীর হইবে ছানা হইবে এবং অন্যান্য সকলের জন্য মুড়ী, দুগ্ধ ও গুড়ই যথেষ্ট, তবে আর অতিথি-সেবায় ভাবনা কি? সহজপুরে অর্থাৎ অনন্তের শ্বশুরবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলে অনন্তের শ্বাশুড়ী আর একবার সকলকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

তখন হেমা চুপে চুপে কহিলেন, "অত জিদ্ করে আমাদিগকে তোমার বাড়ী নিয়ে না গিয়ে যদি আমার একটা পরামর্শ শুন তবে সকল দিক রক্ষা হয়।"

অনন্তের শ্বাশুড়ী আগ্রহের সহিত কহিলেন, "কিমা, বল যদি ভাল হয়, তবে তাই করব।"

"আমাদের বউকে পাঠিয়ে দাও চুপি চুপি নিয়ে যাই, নইলে তোমার জামাই আর সে জামাই নাই, একেবারে বয়ে গেছে! সে পিতিজ্ঞে করেছে নিজে আর কখনও সহজপুরে আসবে না আর বউকেও কখন নিয়ে যাবে না, আর যদি তোমরা রেখেও এসো তাহলেও ফিরিয়ে দেবে! সেইজন্যই ত ওর মামি বউকে নেযেতে পারে না, নইলে অমন বউ কি আবার বাপের বাড়ী ফেলে রাখে গা?"

অনন্তের শ্বাশুড়ি একেবারে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি দোষ আমার মেয়ের?"

"দোষ গুণ আবার কি? আর তার সে বিবেচনা করবার শক্তি রেখেচে গা ভালখাকি!"

অনন্তের শ্বাশুড়ী কহিলেন, "আমি বলি কি জামাইকে একবার বাড়ী নিয়ে গেলে হোত।"

হেমা কহিল, "নিয়ে না-হয় গেলে, কিন্তু একদিন নিয়ে গেলে কি হবে? আবার তার পরদিন বাড়ী ফিরে গিয়ে যে-কে-সেই হবে তখন তুমি কি করবে? তার চেয়ে আমার কথা শুন, বউটিকে পাঠিয়ে দাও আমাদের সঙ্গে, তাহলে সব গোল মিটে যাবে, কি বল পার্ব্বতী?"

পার্ব্বতী সহাস্যে কহিল, "তা বটেত।" পরে হেমার গা টিপিয়া কহিল, "কি কোরে তোর অত মিছা কথা বেরুল, তুই সব পারিস্ ভাই।"

হেমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "যথার্থই আমি সব পারি, ঐরূপ মিথ্যা বলে জুয়াচুরি করতে আমি বড় ভালবাসি।"

অনন্তের শ্বাশুড়ী কহিলেন, "তা বটে, তবে যা আমার ভয় হচ্ছে পাছে লোকে নিন্দা করে।"

হেমা। সে ভার আমার, আমি তার জবাব দিব।

অ-শ্বা। বেয়ান যদি রাগ করে?

হেমা। কে, জেঠাই-মা? সে এমন লোক নয় গো! বউ পেয়ে সে বর্ত্তে যাবে, কেবল ভাগ্নের ভয়ে বউ নিয়ে যেতে পারে না। তা নইলে কি এত দিন বউ বাপের বাড়ী থাকে?"

অ-শ্বা। সবকে পারি, যদি অনন্ত কিছু বলে? সে হয়ত আরও চটে যাবে, আমার সেই ভয় করে বাছা।

হেমা। ওগো সে ভয় তোমার কিছুই নাই।

অ, শ্বা। সব শুনে আমি ত হতবুদ্ধি হয়েছি। যাতে ভাল হয়, নিন্দা না হয়, তাই তুমি কর মা।

হেমা। আমি ভালই বলছি তোমার কোন ভয় নাই।

অ, শ্বা। একবার কর্ত্তাকেও বল না?

হেমা। তাঁকে না বললেও ক্ষেতি নাই।

অ-শ্বা। একবার গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করি কি বলে! হাঁ গা ওর গহনা কা চোপড় সব বাড়ীতে আছে যে।

হেমা। সে সব তোমার ছেলেকে দি পরে পাঠিয়ে দিও।

অ, শ্বা। মনে করেছিলাম তেল প মশলা দিব, আর-বার দিই নাই বলে বেয়া কত রাগ করেছিল।

হেমা। আর বাপু সে দেখে দাও আর এত কর্ত্তে হবে না।

অ, শ্বা। মিষ্টি সঙ্গে দিয়ে পাঠা আছে কি?

হেমা। সে কি না আদায় কর্ব্ব সে তোমার জামাইয়ের কাছ থেকে আদ কর্ব্ব।

এইপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সকলে সহজপুরে প্রবেশ করিলেন। অ লম্বে তাঁহারা অনন্তের শ্বশুরবাড়ীর নিকটব হইলেন। ঐ সেই দ্বার দেখা যাইতেছে যে দ্বারের নিকটে মনুষ্যচেতা সুলক্ষ ক্রুদ্ধ অনন্তের পদদলি হইয়াছিল যে দ্বারের বাহিরে শ্যালকা মায়া দ স্নেহ ভালবাসা পরিত্যাগ করিয়া পাষা হৃদয় নিষ্ঠুর অনন্ত—অনন্ত আঁধারে মিশি গিয়াছিল; কালরাত্রে যে দ্বারের নিক আসিয়া পাষাণহৃদয় ক্রুর হইয়াছি জয়রামের পরিহাস-চীৎকারে আত্মহা অনন্ত যেখানে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি অনিচ্ছায় যে দ্বার পরিত্যাগ করিয়া মু মুগ্ধের ন্যায় চলিতে হইয়াছিল, যে দ্বা দেখিয়া একখানি বিষণ্ণ প্রতিমা অনন্তে স্মরণ হইয়াছিল, এবং প্রস্তরোদ্ভবা পবি গঙ্গাবারির ন্যায়, পাষাণে নির্ম্মিত হৃদ

দূত করিয়া দুইবিন্দু পবিত্র অশ্রু অনন্তের কারিত নয়নপ্রান্তে দেখা দিয়াছিল, ঐ দ্বারদ্বার তেমনই বদ্ধ রহিয়াছে। সেই দ্বার নিকট আসিয়া, তিনজন যুবাপুরুষ করিয়া দাঁড়াইল, প্রথম যুবক গোবিন্দ লেন, "সে কি হয়, যা বলেছ একবার, তীয়বার বলিও না।"

অনন্ত করযোড় করিয়া কহিল, "আজ-র মত ক্ষমা করুন।"

গো। কাল তোমাকে পাব কোথায়?

অ। আপনারই বাটীতে।

গোবিন্দ অনন্তের যুক্তকর ধারণ করিয়া লিলেন, "শালা বদমাস্, এত চাতুরী কোথায় খেছিলে?"

জয়রাম তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বলব? মি বলচি কোথায় শিখেছে। বলব নন্তদাদা?"

অনন্ত একবার জয়রামের দিকে মুখ রাইলেন, জয়রাম হাসিল।

অতিকষ্টে অনন্ত গোবিন্দের হাত হইতে নিজ হাত ছাড়াইলেন, কিন্তু কথা এড়াইতে পারিতেছেন না। আজি গোবিন্দ অনন্তকে আটাকাটিতে জড়াইয়াছেন।

গোবিন্দ কহিলেন, "সেটি হবেনা, আজ তোমায় কিছুতেই ছাড়বনা।

অ। আপনি যে অঙ্গীকার কর্‌তে বলবেন, আমি তাই কর্‌ব, পরশু নিশ্চয় অস্‌ব।

গো। আর তোমাকে বিশ্বাস নাই।

অ। কাল কৃষাণদিগকে কাজ দেখিয়ে দিয়ে পরশু আমি নিশ্চয় আস্‌ব, আর আমাকে বার বার লজ্জা দেবেন না, আমি নিশ্চয়—"

জয়রাম অনন্তের কথায় বাধা দিয়া বাঁকুড়াজেলার সুরে বলিল, "তাত বটেই, ছোক্‌রা বড় ভদ্দর আছে। ঐ যে কালো-পারা মরদটী বড় ভদ্দর, কোত্থোনো মিছে কথা কহেক নাই, জানেক নাই, উহার হাত কোত্থোনো কাহার গায়ে উঠেক নাই, উহার সোকোলি গুণ, কেবল সত্য কথা কহিতে আকটুকু খাট আছে।" বলিয়া জয়রাম দুইবার মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

অনন্ত জয়রামের পরিহাস বুঝিয়া হাসিলেন, সহাস্যে কহিলেন, "তুই থাক্ জয়া, আমি আগে বাড়ী যাই, তোকে একবার পাট কর্ব্বো ভাল কোরে রে। তুই বাড়ী হতে বাহির হয়ে অবধি আমার পিছনে বড় লেগেছিস্। তোর যা মুখে আস্‌ছে তাই বলছিস্। যা মনে অস্‌চে তাই করছিস্।"

জয়রাম কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিল, "ওর খোসামোদে কাজ নাই, চক্রবর্ত্তী তুমি আমাকে নিয়ে চল। ও না যায় নাইবা গেল, ভারি ত জামাই।"

অনন্ত সহাস্যে কহিল, "সেই ভাল। আজ আমি বাড়া যাই জয়রাম, তুই আমার প্রতিনিধি হয়ে শ্বশুরবাড়ী কোরে আয়।"

গোবিন্দ অনন্তের কাণ ধরিয়া কহিলেন, "শালা কাজে নাই কথায় আছে।"

এমন সময় ত্রস্তভাবে অনন্তের শ্বাশুড়ী ঘোমটা দিয়া আসিয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন, তাহাকে দেখিয়া অনন্ত ও জয়রাম তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

গোবিন্দের মাতা সংক্ষেপে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রকে ডাকিয়া লইয়া

গেলেন, যাইবার সময় গোবিন্দ বলিয়া গেলেন, "আমি না আস্‌লে যেন তোমরা যেও না।"

অন্তরালে লইয়া গিয়া মাতা, পুত্রকে হেমাঙ্গিনী প্রমুখাৎ যা কিছু শুনিয়াছিলেন সমস্তই বলিলেন, এবং হেমা যে সুযুক্তি দিয়াছেন তাহাও বলিলেন। গোবিন্দ একটু চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও কথা, কথাই নয়। অনন্ত যে অত বয়ে গেছে ওকথা আমার বিশ্বাস হয় না।"

গো, মা। অতগুলো নোকে কি মিছে কথা বল্‌ছে।

গো। তার আর আশ্চর্য্য কি? সকলেই ত মাগী, ওরা সব পারে।

গো, মা। তা যাই বল সুলক্ষণাকে পাঠাতেই হবে।

গো। তাতে আমার আপত্ত নাই, তবে একবার বাবাকে বোল্লে হোত না?

গো, মা। না বাছা তার দরকার নাই, তিনি তাতে রাগ কর্‌বেন না, তাঁকে বলতে গেলে অনন্ত শুন্‌তে পাবে, হেমা বলেছেন অনন্ত যেন না শোনে।"

গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, "সুলক্ষণা কি বললে, যেতে রাজি আছে?"

গো-মা। তারও বোধ হয় মত আছে, কেননা তার সঙ্গে পরামর্শ করেই হেমা আমাকে বল্‌লে, স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জন্মালে কোন্ রমণী স্বামীর কাছে থাকতে বাসনা করে না বাবা?"

গোবিন্দ আবার হাসিয়া বলিলেন, "অনন্ত সে ছেলেই নয়।"

গো-মা। সুলক্ষণা ছেলেমানুষ তাই আজও অনন্তকে চিন্‌তে পারে নাই, হোক তুমি তাকে বারণ করে দিও যেন অনন্তের সঙ্গে ঝগড়া না করে।

গোবিন্দ মনে মনে কহিলেন, "কোষ্টিপাথর আর সুলক্ষণা সুবর্ণ প্রতি অনন্তের একটী বাক্যরূপ দর্শণে সুলক্ষণা হৃদয় একটু ক্ষয় হইয়াছে ও তাহা সুলক্ষণা অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।"

গোবিন্দের মাতা কহিলেন, "বাড়ী গিয়ে অনন্ত যখন দেখতে পাবেন, ত সুলক্ষণাকে কি বলবেন জানা, হয়ত বা কতই কাঁদবে।"

গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন "তুমিত আ কাঁদ, তারপর তার ভাগ্যে যা হয় হবে বাড়ীতে বোলবে আবার সে এ ক্ষেপেছে কিনা তাই বোলবে।"

চক্ষু মুছিয়া মাতা কহিলেন, "কি বাবা?"

মাতাপুত্রে ফিরিলেন, গোবিন্দ হাসি বলিলেন, "দ্বারে দাঁড়িয়ে কেন?"

অ। (সহাস্যে) আজ্ঞে আমরা অতিথি

গো। এতরাত্রে আমরা অতিথিকে স্থান দিইনা, ফিরে দেখ।

গোবিন্দ দ্বারে আঘাত করিয়া বাবা বাবা, বলিয়া ডাকিলেন। তাহাদের সাড় পাইয়া গোবিন্দের পিতা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

এদিকে জয়রাম ও অনন্ত অবাক হইয়া ক্ষণেক তথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে প্রস্থান করিলেন।

গোবিন্দের ভয়ে তাঁহার মাতা প্রকাশ্যে কাঁদিতে পারিলেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে

অন্তের শ্বাশুড়ী যাত্রীদের দলে যাইয়া মিলিলেন। যাইবামাত্র হেমা জিজ্ঞাসা করিল, কি মত হল গো তোমার ছেলের?"

গো-মা। ছেলের অমত কিছুই নেই— তুমি যা মত কোরেছ তা বুঝেই করেছ। তবে আমি আর বেশী কি বলব? তোমার সঙ্গে পাঠাচ্ছি তুমি একটু নজর রেখো, আমার বাছা আমার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদেনা। হেঁ মা আবুই-মা, তোমাকে সে রাখতে হবে না।

সুলক্ষণার মাতা কাঁদিলেন, মাতার কান দেখিয়া সুলক্ষণাও কাঁদিল। তার পর প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ শেষ হইলে সকলে আবার চলিতে লাগিল, যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ সুলক্ষণার মাতা পথে দাঁড়াইয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সুলক্ষণাও কাঁদিতে কাঁদিতে পিছনে চাহিয়া চাহিয়া যাইতে লাগিলেন।

ক্রমে যাত্রীমণ্ডলী সহজপুরের মাঠে মিলিলেন। যাইতে যাইতে হেমা কহিল, ভাই পার্ব্বতী! আমরা যে বউকে নিয়ে যাচ্ছি তা ভাই কাকেও বলা হবে না।"

পা। সে কি করে হবে, এত পথ কি করে নিয়ে যাবি?

হে। আমরা একটু পেছিয়ে পড়ব।

পা। তা হলে হতে পারে!

অনন্ত ও জয়রাম ধীরে ধীরে চলিতেছেন ও কথা কহিতেছেন।

অ। ব্যাপার বুঝতে পারলেম না।

জ। কি জানি দাদা, মায়ে বেটায় কি পরামর্শ করে এলো, আর অমনি আমাদিগকে ফিরিয়ে দিলে।

অ। ভাল হল—

"যাহারে ডরাও তুমি,
সেই সে যোগাদ্যা আমি॥"

যে ভয়ে অনন্ত বলিলেন, ভালই হইল, সে ভয় আর কতক্ষণ থাকিবে?

হেমাঙ্গিনী যাহা প্রতিজ্ঞা করে তাহা অলঙ্ঘনীয়, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই, হেমার প্রতিজ্ঞা কখনও কাহারও ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট সাধন করে না।

পশ্চাৎ হইতে ভূতোর মা হাঁকিল, "দাঁড়াও গো, আর ফেলে যেও না।"

জররামও সেই সুরে হাঁকিল, "এস এস চলে এস।"

অনন্ত। মাগীরা আদবে চলতে পারে না।

স্ত্রীলোকেরা আসিয়া জুটিল।

অনন্ত কহিলেন, "তোমরা যে অনেকগুলো দেখ্‌ছি, গোলমাল হয়ে দুই একটা বাজে লোক এসে পড়েনি ত?"

হে। আসে যদি তবে তোমার বাড়ী অতিথি হবে।

অ। আমার বাড়ী অতিথি হলে বড় সুখ হবে।

রক্ষা। কেন?

অ। তাহলে আজ রাত্রে বকুলতলে বসিয়ে রেখে দেব, তারপর কাল অতিথি সেবার ব্যবস্থা হবে।

হে। হবে বইকি! তাহলে তোমার নাক কেটে ঝামা ঘসে দোবো, জাননা বুঝি?

দলস্থ সকলে হাসিয়া উঠিল।

রক্ষা কহিল, "মরণ আরকি, তোর না ভাই হয়?

হে। ভাই হল ত বয়ে গেল কি? অন্যায় দেখবো চোটপাট বোলবো, ভাইত কোন ছার, গুরু কেননা হোকনা।

অনন্ত নীরব রহিলেন। ক্ষণেক পরে বিধু কহিল, "দিঠাকরোণ আমি আর চলতে নারবো।"

পার্ব্বতী কহিলেন, "চলতে নারবি ত কোথা থাকবি?"

বি। যাবুনি কেনে! যাবো, তবে আমার রাত বাদে, হাতটা ধর।

রক্ষা। ও জয়রাম, লক্ষি দাদা আমার, ওর হাতটা ধর ভাই।

জ। কে ও মাগী?

হে। মেঘার শ্বাশুড়ী।

বিধুর কথা শুনিয়া অনন্তের অন্যমনস্কতা ভঙ্গ হইল। অনন্ত মনে করিলেন, এ ত দেখছি সেই কাঠওয়ালী মাগী!

প্রকাশ্যে কহিল, "মেঘার শ্বাশুড়ী?"

বা-বৌ। তোমারই "বেয়ান", তোমার কিরসেনের শ্বাশুড়ী।

জ। অনন্তদা, তোমার উচিত বেয়ানের হাতটা ধরা।

অ। আমার সঙ্গে প্রথম চোটে বড় আলাপ হয়েছিল বেয়ানের সঙ্গে।

হে। কোথাও কাট কিনতে গিয়ে নাকি?

ভূ-মা। আলাপটা কি রকম?

অ! তা খুব! আমি যে বলেছি কাঠ, অমনি বেয়ান আমার বলে উঠ্‌ল ঘাট এখানে কোতা রে ডেগোর, ঐ মড়া-ঘাটায় যা।

র। তবেত খুব আদর করেছে তোমাকে।

অ। আমার আর একটা কথায় রাগ হয়েছিল।

জ। তোমার রাগ ত সকলের উপর।

অ। যথার্থ, আমি ওকে খুব ছে বেলায় দেখেচি, তারপর আর দেখি মাগীকে চেন-চেন করচি কিন্তু চি পারচি না, তারপর ওর শ্রেষ্ঠ কথা আর দাঁতের বাহার দেখে অবাক হয়ে মুখপানে চেয়ে আছি, আ তাই মাগী কিনা বলে "আমার নয়রে ডেকরা, তুই কি দে আমি যেন ওঁর বয়েস দেখ্‌ছিলাম।

রাঙ্গা। তা বটেত, মেয়েমানুষ তুমি পুরুষমানুষ ওর দিকে তোমার চা কেন!

অনন্ত কহিলেন, "ডানদিকে একটা খা আছে কেউ যেও না।"

কিন্তু বলিতে না বলিতে বিধু গর্ত্তে পড়িয়া গেল। অনন্ত কহিলেন, "হয়েছে, মাগী কালা নাকি?"

বা-বউ। সত্যই ও কালা, আহা প গেল!

জয়রাম তাড়াতাড়ি আসিয়া বিধুকে তুলিয়া বলিল, "কেন, তোমার হাবুর পড়ুগ না, ও কেন পড়বে।

অ। তবে পড়চে কেন, ধরে রাখনা

জ। না ধরে রাখবে না, এই ত ধ নেযাচ্ছি, আরত পোড়তে দিব না। তোম হাবুর মাকে কি করবে কর।

অনন্ত আর কোন কথা কহিলেন না কেবল হাসিলেন।

হাবুর মা কহিল, "দিঠাকরুণ আমিত তে নারবো, মুরি চাট্টি না খেয়েত পরাণ চে না।"

হে। আ মর মাগী, ডণ্ডে ডণ্ডে মুড়ি তে হয় নাকি?

হা। আমি তখন দুটি খেয়েছেলাম য়ে রেঁধেছেলাম।

রা। ত বেশ করেছ এখন বসে বসে ড়ি খেতে গেলে ত চলবে না, খেতে তে চ।

কাজেই হাবুর মা মুড়ি খাইতে খাইতেই নিল।

জয়রাম কহিল, "অনন্তদা, ও আলোটা কিসের গা? কোথা জ্বলছে বল দেখি?"

অনন্ত হাসিয়া কহিল, "বোধ হয় ীমার ধারে ও যে কিসের আলো তাকি ার বোলতে হয়!"

হাবুর মা মুড়ি খাইতে খাইতে ছুটিয়া আসিয়া অনন্তকে স্পর্শ করিল।

অ। পালিয়ে এলে যে?

হা। ও আলা ত আলা নয়। ও যে পেত্তার আলা।

অ। (কৃত্রিম ভয়ে) তাইত কি হবে? ওটেই ত আমাদের যাবার পথ। হাবুর মা, তুমি এগিয়ে চল আমার বড় ভয় হচ্ছে।

হা। আর গিয়ে কাজ নাই তুমি ফিরে চল।

অ। কোথায়?

হা। সহজপুরে।

অ। বটে, সেই বুঝি সহজ কথা!

হা। হেই মা, আমি কেন মত্তে এসে-ছেলাম গা! আমি আত ঠাঁই থাকতে পেত্তার হাতে মলাম গা। ডবকা পরাণটাকে খোয়াতে এলাম গা? কেনে মত্তে গঙ্গা নাইতে এলাম গা?"

কাল প্রায় সমস্ত রাত মাঠে মাঠে সকলে হিমে হিমে চলিয়াছে, আজিও রাত্রে সকলে হিমভোগ করিতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সর্দ্দি হইয়া নাকের জলে চখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

হাবুর মার ভয় ও পেটের জ্বালা দুই সমান হইয়াছে; সে মনে করিল আজ যদি মরিতে হইবেই তবে মুড়ি কটা না খাইয়া কেন মরিব!

হাবুর মা যেমন এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরিল ওমনি তাহার নাক সস্বড়্ করিয়া হাঁচি আসিল ও হাঁচিয়া ফেলিল, আর যত মুড়ি হাবুর মার মুখ হইতে বাহির হইয়া তার সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িল, কতক অনন্তের গাত্রে, কতক জয়রামের গাত্রে ও কতক-বা বিধুর গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল, অনন্ত তাহার দেশী আলোয়ান তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া ফেলিল।

জয়রাম ও গাত্র-বস্ত্র ঝাড়িয়া ফেলিলেন ও বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিলেন। রক্তনেত্রে কহিলেন "কেন বল্ দেখি মাগী, আমার সঙ্গ নিয়েচিস্, যেতে আস্‌তে কেবল আমার গায়ে লাল দিচ্চিস্? নে মাগী, চিমটে নে, বল মাগী বল্—

সত্ কুকুরে হেঁছে দিলে।
পত কুকুরে চেঁচে নিলে॥

বল্, বোলে চিমটে নে, নইলে দেখাব মজা, মাগী যেন আমাকে আঁস্তাকুড় পেয়েছে" এই বলিয়া জয়রাম বোম্বেয়ে চড়

উঠাইল, কিন্তু অনন্ত তাহার হস্ত ধরিয়া ফেলিল। অগত্যা হাবুর মা হাঁচির প্রতিকার করিল। জয়রাম মুখভার করিয়া বলিলেন, "মহালক্ষী আমার সঙ্গে নাইতে যাবে যদি জানতে, তবে আগে থাকতে সঙ্গে একটা জোলাপ নিতে হয়।"

অ। আঃ, আর বকিস্ নে জয়া।

হা। বলত দাঠাকুর, আমি ওকে আকড়েছি, না ঐ আমাকে আকড়াচ্ছে, এই মাঝ মাঠে আর আত্তির কাল আর ডাইনে বাঁয়ে সদবা বিটি ছেলে, আর এই তোমার নড়িহাতে আর ঐ আগে পাছে বামুন আর হাতে বেতে মা লক্ষী, (মুখে মুড়ি) আমি যদি আগে আ কেড়ে থাকি তবে যেন ঝী-বোয়ের মাতা খাই।

জ। আমি যদি ওকে আগে রাকেড়ে থাকি তবে যেন সেই বুড়ো ভেড়ার মাথা খাই।

হে। আমর! তুই এখনও মা লক্ষীকে জাবর কাট্‌ছিস্?"

জ। তুমি কি রাকেড়েছ, তুমি রাকাড়ার বাবা ঝেড়েছ।

সকলে বিট্‌বে ছাড়িয়া হরিণ-ডাঙ্গায় প্রবেশ করিল।

কোঁদার বউ। "আমিত আর চলতে নারব এই বস্‌লাম" বলিয়া বসিয়া পড়িল।

অ। তবেই হয়েচে, এই রকম চললেই আজ বাড়ী গিয়ে পৌঁচেচ।

বা-বউ। তা বল্লে কি হয়, তোমার পায়েত আমরা চলব না। আমাদের এই রকমই চলন্। বলিয়া সেও বসিয়া পড়িল; তখন একে একে সকলেই বসিল।

অবশেষে অনন্ত ও জয়রামও বসিলে হেমা ও পার্ব্বতী সুলক্ষণাকে অতি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মধ্যপী সুলক্ষণা সভয়ে সকলের পশ্চাৎ প যাইতেছেন, অনন্ত যে হাব মা, বিধু জয়রামকে লইয়া এত রহস্য করিতেছে তাহা কি সুলক্ষণার ভা লাগিতেছে যখন অনন্ত জানিতে পারিবে যে সুল পদব্রজে তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চা আসিতেছে তখন যে তাহার অদৃষ্টে আছে ভয়বিহ্বলা সুলক্ষণা ধার পারিতেছিল না।

হেমা কহিলেন, "আর উঠ"।

ভূ-মা। এরি মধ্যে যেতে হবে আমার যে কান্না আস্‌চে

রা। ওলো আমারে

অ। তাইত ঠাকরুণ তুমি এতক্ষ ছিলে কোথা, তোমার ড়া শব্দ প নাই।

রা। আমি? আমা এতক্ষণ আস্‌ছিল।

অ। চল্‌তে চল্‌তেই না কি?

রা। হাঁ ভাই, চলে চলে পা বেথ করছিল নাকি তাই ঘুম পাচ্ছিল।

জ। বেশ আরামের ঘুম বটে।

হে। আর দেরী করো না উঠ।

ধীরে ধীরে সকলে উঠিল এবং উ আহা করিয়া চলিতে লাগিল,—সকলেরই প ফুলিয়াছে।

রা। উহু মাগো, পা আর বাড়াতে পার্চ্ছিনা লো হিমি! তুই আর এমন কর নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাস্‌নে

জানলে তোমার সঙ্গে আসতাম না!

হে। আমার দরকারে তোমাকে মাচ্ছি কি না? তোর নাকে দড়ি ওয়ায় কাজ কি?

পা। আমরা এত মাগো বাবাগো টি কিন্তু বেটাছেলেরা বেশ চলছে। কেউ কি ত বলে নাই, ধন্নি ওদের যাহোক!

রা। ওদের ভাবনা কি বল, ওরা জিন পায়ে দেচে, জুতো পায়ে দেচে, দের ভাবন ক বল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ অনন্ত চমকিয়া উঠাইলেন এবং পশ্চাৎদিকে চাহিলেন।

ঝী-বৌ। ঠাকুরপো, দাঁড়ালে যে, কি হয়চো?

অ। কিছু নয়।

কৌ। আরত চলতে পারিনা, কেন যে এতে এসেছিলাম।

একটু অগ্রসর হইয়া জয়রাম হাঁকিল, ওগো একটা নড়ার মাথা"।

পশ্চাৎ হইতে স্ত্রীলোকেরা হাঁকিল হুঁস্বো'। দুই একজন 'হুঁস্বো' বলাতে হেমা য়া করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঠে আসিতে সিতে সকলেই হাসিতে হাসিতে গল্প রিতে করিতে আসিয়াছিল, তখন অনন্ত রক্ত হয় নাই, কিন্তু এবার হেমা হাস্য সাতে অনন্ত ধনক দিয়া কহিলেন, "অত হাস্‌চ কেন, চুপ করে কি আসতে পার না?"

রা। ওরে হাসুগ হাসুগ, ওদের এখন হাসবার বয়েস তা হাসবে না?

অ। হাসবার আর কাঁদবার বুঝি আবার বয়েস আছে!

রা। আছে বই কি!

অ। তবে কাঁদবার বয়েস কোন্‌টা?

হে। পনর বৎসর।

অনন্তের গ্রহ, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে কাঁদবার বয়স কোন্‌টা?

হেমার উত্তরে অনন্তের বক্ষে যেন মুষ্ট্যাঘাত হইল; সে ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে রহিল। দশমাস পূর্ব্বের একটা নির্দ্দয় ব্যবহার তাহার মনে পড়িল, সে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিল।

পা। হেমা, তোর শ্বশুড়বাড়ীর হতে গঙ্গা কতদূর?

হে। কি জানি ভাই! ও সব ধার ধারি না।

পা। তোর বিয়ে কিছুই মনে পড়ে না?

হে। কিছুনা, কখনও বিয়েও করি নাই, বরযাত্রও যাই নাই।

পা। শ্বশুরবাড়ী না হয় যাস্ নাই কিন্তু বিয়ের কি কিছুই মনে পড়ে না?

হে। পড়ে একটু একটু। একজনকার টোপর দেখিয়া একদিন কেঁদেছিলাম, তা ভাই টোপরটি আমায় দিলে না, একটা পাতি হাঁস না পাতি ময়ূর কি পরিয়ে দিলে। তাই মনে আছে।

এই সকল কথা পার্ব্বতী ও হেমা চুপে চুপে কহিতেছিলেন। সকলেই কথা কহিতেছেন কেবল অনন্ত নীরবে চলিতেছেন। চলিতে চলিতে অনন্ত আবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন।

বা-বৌ। এতগুলো মেয়ের দিকে বার বার তাকাচ্চ কেন বলত?

অনন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল "তোমাদের দলের মধ্যে কাহার পায়ে মলের শব্দ পাচ্চি? যাবার সময়ত কারো পায়ে মল দেখিনি!"

হেমা তাড়াতাড়ি সুলক্ষণার গা-টিপিয়া বলিলেন, "আমর পোড়ার মুখী, মল গুলোকে গোঁজ,—হেঁটোর উপরে তুলে রাখনা মড়া! টের পেলে এখুনি এই মাঝ মাঠে তোকেও মারবে, আমাকেও বক্‌বে—জানিসনা নেকি?"

ভয়ে ভয়ে সুলক্ষণা মল গুলাকে পায়ের উপর গুজিল।

সুলক্ষণা! আজ তুমি নূতন হইয়া অনন্তের বাটী যাইতেছ নাকি? তুমি কি অনন্তকে চেননা? কোনদিন অনন্ত তোমাকে প্রহার করিয়াছে কি? কিম্বা অনন্ত তোমাকে কোনদিন ধমক দিয়া কোন কথা বলিয়াছে কি? তবে তাহাকে তোমার এত ভয় কেন? যদি বল, তাহা হইলে জানিও সেইদিন তোমারই দোষে তুমি অপমানিত হইয়াছিলে, তোমারই দোষে তুমি পদদলিতা হইয়াছিলে।

"তুমি কি জান না যে, পুরুষ জাতি লেবুর সমান; যে রমণী লেবুর অম্ল রস বাহির করিয়া লয়, সেই রমণী সুগন্ধি অম্ল রসে জিহ্বা পরিতৃপ্ত করে। আর যে রমণী লেবু হইতে অধিক রসের প্রত্যাশা করে সেই তিক্ত রসে পরিপ্লুত হয়। দেখ আট মাস পূর্ব্বে তুমি না হয় বুঝিতেই পার নাই, একটু বেশী নিঙ্গড়াইয়াই ফেলিয়াছিলে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত তুমি তিক্ত রসে প্লাবিত আছ। আজি হইতে জানিয়া রা[খ] ডাবের জল যেরূপ ক্লান্তিনাশক ও শান্তি জনক, লেবুর রস সেরূপ নহে। [যে] হাত উচ্চ হইতে ডাব ভূপাতিত হয়, কি[ন্তু] ডাবের তারতম্যের কিছু প্রভেদ হয় না আর লেবু যদি দ্বিহস্ত উচ্চ হইতেও পতি[ত] হয়, তবে তাহাতে অম্লরস কমিয়া গি[য়া] তিক্ত রস বৃদ্ধি পায়। এক[টি] দুর্ব্বাক্যে পু[রু]ষ হৃদয় যত উত্তপ্ত হইয়া উঠে শত অশ্রা[ব্য] বাক্য শ্রবণেও রমণীর হৃদয় [এতটা] উত্ত[প্ত] হয় না অথবা কর্ত্তব্যপথ [হইতে] বিরত [হয়] না।

সকলে বাঁকা পার [হইয়া] স্বগ্রামে নিকটবর্ত্তী হইলেন।

কোঁদার বউ কহিল [আবার কতদূর] আছে জেঠাই-মা! আ[মরা] আর চল[তে] পারি না।"

রা। বাবা, শাস্তরে [কয় কি—]

নাদাই

পথে বসে কাঁদাই।

তাকি মিথ্যা হবে?

ভূতোর মা কহিল, "উহুঃ মাগোঃ! প[া] ফেটে-চোটে আক্‌সা হয়ে গেছে, উঠি[তে] আমি গঙ্গা নাইতে যাই নাই, তা পাড়[ার] আবাগী রে কি বুঝে গা? ক্যাবোল [ব] গঙ্গা নাইতে যাও নাই কেনে? উহুঃ মাগো পরাণ গ্যাল, এবার ত আগে বাড়ী যা[ই] আর কখন এমন কুকাজ কর্‌বুনি।"

ভূতোর মায়ের মতন আরও দুই [জ]নে কান্না ধরিল এবং প্রতিজ্ঞা করি[ল] এমন কুকাজ তারা আর কখনও করিবে না

হেমা কহিল, "রক্ষে দিদি, সেদিন তোর [বি]য়েটা হতে-হতে হোল না কেন?"

[র]। (সহাস্যে) বর পাওয়া গেল না [ব]র!

বা-বৌ। আজ ত বর আছে, তবে [বি]য়েটা হয়ে যাক্।

কোঁ। [হাঁ] হাঁ সেই ভাল কথা, বর [কই]?

পা। বিধু বর হবে।

হে। [না], বিধু কনে হোক, আর [বর]—

বা-বৌ। (বাধা দিয়া) না, না, বিধু [কনে] হক, আর ঠাকুর-পো, তুমি বর [হও]।

অ। (সহাস্যে) ওরে জয়া! তোর [বে] আবার বিয়ে উপস্থিত।

জ। বিয়ে যদি কর্ত্তেই হয় তবে মেয়ে-মানুষকে ত আর নয়। এ-জনমে বিয়ে? আমার ত আর কখনও নয়ই, বরং যদি দেখি কোন বেটাছেলে কোন মেয়েকে বিয়ে করছে তাহলে তখনি গিয়ে আমি সে বিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেবো।

অ। কেনরে, মেয়েদের উপর তোর এত ঘৃণা কেন?

জ। তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চ? কেন, মনে মনেই ভেবে দেখ না কেন।

ক্রমে ক্রমে সকলে স্বগ্রামে প্রবেশ করিলেন, আর কাহারও মুখে হাসি বা কোন কথা নাই, সকলেই নিস্তব্ধ।

রক্ষা কহিলেন, "হেমার মোটটা দাও বেয়ান, ঐ তোমার জামাইবাড়ী দেখা যাচ্ছে, তুমি বিদেয় হও।"

৩

ক্রমে ক্রমে একে একে ভূতোর মা, রাঙা ঠাকরুণ, হাবুর মা, বামুন-বেড়ের বৌ ও কোঁদার বৌ প্রভৃতি স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পরে জয়রাম বিদায় লইল; তারপর রক্ষে ও পার্ব্বতীও চলিয়া গেল। অনন্ত আগাইয়া গিয়াছে, আপনার বাড়ী ছাড়াইয়া বরাবর চলিয়াছে। সুলক্ষণাও নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে যেন হাড়কাঠে গলা দিতে যাইতেছে! হেমা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

হেমা ডাকিল, "অনন্ত! একটু দাঁড়াও।"

অনন্ত চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন; দেখিলেন হেমা ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি স্ত্রীলোক আসিতেছেন।

হেমা কহিল, "অনন্ত, দাঁড়াও।"

অ। কেন দাঁড়াব?

হে। তোমাকে একটী কথা বল্‌ব।

অনন্ত দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ থাক, কাল কথা বলিও।"

হেমা ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন আর কথা কহিতেছেন। অবগুণ্ঠনবতী সুলক্ষণাও কম্পিত পদে হেমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতেছেন।

অনন্ত সুলক্ষণাকে ভাল চিনিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু সেই অপরিচিত রমণীর দিকে বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছেন আর হেমাঙ্গিনীর সহিত কথা কহিতেছেন।

অনন্ত বলিলেন, "আজ থাক, কাল বোলো।"

হে। আজই বল্‌ব, এখনি তোমাকে শুনতে হবে।

অ। আজ আমার বড় পা ব্যথা করছে, শীতে বড় কষ্ট হচ্ছে। আজ তোমার কথা শুন্‌তে পার্‌ব না।

হে। এখনি বল্‌ছি।

অ। তবে আর এগিয়ে এস না, ঐখান থেকেই বল, কি বল্‌বে।

হে। আর একটু কাছে যাব।

অ। আর না, যা বল্‌বে ঐখান থেকেই বল।

কৌতুকময়ী হেমা সহাস্যে কহিল, "বলি। তেলি হাত ফোস্‌কে গেলি," বলিয়াই সুলক্ষণাকে এক ধাক্কা দিয়া আবার বলিলেন, "তেলি যার ধন সে পেলি" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সরলা সুলক্ষণা চতুরা হেমাঙ্গিনীর মত্‌লব বোঝে নাই, অসাবধান হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, হেমার ধাক্কা খাইয়া সজোরে অনন্তের বক্ষে গিয়া পতিত হইল; এবং সে আঘাত সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনন্তও দুই চারি হাত পিছাইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে আত্মহারা হইল, ক্ষণেকের জন্য উভয়ে বাক্যহারা হইল। উভয়েই অপ্রতিভ। স্পর্শেন্দ্রিয় অনন্তের নিকট সুলক্ষণাকে চিনাইয়া দিল।

হেমা তখন একেবারে অদৃশ্য!

এখন সুলক্ষণা আর যায় কোথা? বড় শীত এবং যাতায়তের পথশ্রমে উভয়েই কাতর হইয়াছে, অনন্ত আর দাঁড়াইতে পারিল না, সুলক্ষণাকে বলিল, "বাড়ী এস!"

সুলক্ষণা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্ত সুলক্ষণার হাত ধরিয়া কহিল, "বাড়ী এস!"

তথাপি সুলক্ষণা নড়িল না। অনন্ত সহাস্যে আবার কহিল, "যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিলেন তবে এ অধমের বাটীতে পদার্পণ করিলে কৃতার্থ হইব।"

সুলক্ষণা অধিকতর লজ্জিত হইল। মনে করিল, আপনি উপযাচিকা হইয়া পদব্রজে আসিয়া ভাল করি নাই।

সুলক্ষণা ভয়ে দুঃখে অপমানে রাগে ও শীতে কর্ত্তব্যহারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবশেষে অনন্ত সুলক্ষণার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

সুলক্ষণা আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাতে অনন্ত মহা বিপদগ্রস্ত হইল এবং হেমার উপর তাহার বড় রাগও হইল।

অনন্ত আবার সুলক্ষণাকে জিজ্ঞাসা করিলেম, "বাড়ীতে আস্‌বে না?"

কম্পিত কণ্ঠে সুলক্ষণা কহিল "না।"

অ। তবে এলে কেন?

সু। তোমাকে একবার দেখতে এসেছি।

অ। দেখা ত হল, এখন ফিরে যাও।

সুলক্ষণা নিরুত্তর, অনন্ত এইবার বাক্‌চাতুর্য্য ধরিল, সহসা কৃত্রিম ভয়প্রদর্শন করিয়া মৃদু চীৎকারে বলিল, "ঐগো! কে বকুল গাছে বসে পা দোলাচ্ছে।" বলিয়াই দৌড় দিল এবং প্রায় বিশ হাত দূরে ছুটিয়া গিয়া একটা দ্বারের নিকট দাঁড়াইল।

সুলক্ষণাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া অনন্তের আলোয়ান ধরিল এবং হাঁপাইতে লাগিল।

অনন্ত সহাস্যে কহিল, "এইবার পথে এস, সোজা আঙ্গুলে ত ঘি ওঠে না, এখন এলে ক্যান?

সু। তুমি যে ভয় দেখালে।

অ। (নাকিসুরে) আমি বুঝি ভয় দেখালাম? তুমিই ত আমাকে বল্‌লে যে আমি তোমার কাছে যাব না, ঐ বকুল গাছে বসে যে পা দোলাচ্চে আমি ওর কাছে যাই।

সু। আমি বুঝি তাই বল্লাম?

অ। (নাকিসুরে) তবে কি বল্লে?

সু। ও!

অ। আচ্ছা ভাই! আমি সে দিন রাত্রে চলে এলে পর তোমার দাদা কি তোমায় বকেছিলেন?

সু। বকা আবার কি বলবেন? তুমি যেমন, আমার উপর তোমার ত দয়া মায়া কিছুই নেই। আমার দুঃখ তুমি যেমন বোঝ না, দাদা তেমন নয়।

অনন্ত আর সুলক্ষণাকে কথা বলিতে দিল না—সেই গভীর রাত্রে জনশূন্য পথে হা-হা করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল এবং সুলক্ষণার শীতবস্ত্র হস করিয়া খুলিয়া দিয়া বলিল, "বেশ, বেশ, তুমি তবে ভাল করে দেখেচ যে আমি যেমন, তোমার দাদা তেমন নয়, আমার চেয়ে—"

সুলক্ষণা অনন্তের মুখ চাপিয়া ধরিল, অনন্ত হস্তাঘাতে সুলক্ষণার হাত সরাইয়া দিয়া উচ্চস্বরে ডাকিল, "ওরে গদা, দোর খুলে দে!"

অনন্তের কৃষাণ গদা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া সুলক্ষণার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "উনি কে গা মশাই?"

অনন্ত কৃত্রিম ভয়ে শিহরিয়া কহিল, "ওকথা আর বলিস্ নে গদা! আমি রূপবান্ পুরুষ কি না! যেখানে যাই সেইখানেই বিপদ! বেনে-পুকুরের পাড় দিয়ে আস্‌ছিলাম, সেখানে একটা চাঁপা গাছ আছে জানিস্ ত?"

গদা। এজ্ঞে হাঁ, জানি বই কি, বল না তুমি, তেনাকে সবাই চেনে।

অ। (হাসিয়া) সেই চাঁপা গাছে বসে উনি পা দোলাচ্ছিলেন, আমি যেই সেখানে এসেছি, অমনি অনুগ্রহ করে উনি আমার স্কন্ধে পদার্পণ কল্লেন! আর রক্ষে নাই, আমি ত গেছিই—তুইও আর এদিকে চাস্‌নে, আবার তোকেও অনুগ্রহ করলে আমার আর মাঠের ধান বাড়ী আসবে না।

গদা মুচি অনন্তের অত কথা শুনে নাই, যেমন শুনিয়াছে "স্কন্ধে পদার্পণ—"অমনি সে "আঁ" করিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথশ্রান্ত দম্পতী অনতিবিলম্বে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে গ্রামে প্রচারিত হইল, গঙ্গাস্নানে গিয়া লম্পট অনন্ত এক যুবতীকে ধরিয়া আনিয়াছে। এ কথা যে কে প্রচার করিল, তাহা অন্য কেহ না বুঝুক, অনন্ত ও সুলক্ষণার কিন্তু বুঝিতে বাকী রহিল না।

সমাপ্ত

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

অতএব

অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে অতি সহজ সহজ কথাগুলি অতএবএর শিকলে বাঁধা পড়িয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায় এবং সকল অর্থব্যয় নিরর্থক করিয়া তর্কের কারাগারে অদৃশ্য হয়। তুমি-আমি হয় ত একটা সামাজিক কথার বিচারের জন্য অনেকগুলি ঘটনা গণিয়া বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি, —সমাজে বিধবার বিবাহ হয় না, অথবা কাহারও কাহারও হয়, কেহ বা দুঃখ পায়, কেহ বা পায় না; তখন হয়ত একজন পণ্ডিত আসিয়া ঐ ছোট-খাট দুচারিটি কথা এমন করিয়া অতএব দিয়া জুড়িতে বসিবেন, যে তাঁহার মতবাদের জ্বালায় তোমাকে উদ্‌ভ্রান্ত হইতেই হইবে। ঘটনা বুঝিবার আগেই সিদ্ধান্ত আসে—গাছে না উঠিতেই আমরা এক কাঁদি পাড়িয়া ফেলি। বহু ভুল-সিদ্ধান্তের অব্যয় পিতাকে আমি একটু সংযম শিখাইতে চাই।

বিদ্যার বড় বড় কথা শুনাইয়া, শ্রোতা-দিগকে তাক্ লাগাইয়া, যে-ভাবে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়, তাহা আমরা কিছু কিছু জানি,—ত্রিভুজের তিনটি বাহু আছে, বৈদ্যুতিক শক্তির একটা খেলা আছে, বিনা-তারে সংবাদ দেওয়া চলে প্রভৃতির সঙ্গে অতএব জুড়িয়া নিত্যই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রলয়কালের পিতৃপুরুষেরা নূতন যুগের বংশ রচিতেছেন। অতএবএর একটা পরিচিত উৎপাতের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মানুষ মরে, এ কথাটা হয়ত দ্বাপর যুগে কেহ কেহ ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং যুধিষ্ঠির সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেদিন হইতে এ পর্য্যন্ত সকলের কথাটাকে সত্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে। তবুও যখন বাউল ফকির, অতি কু[illegible]চিত বীভৎস "বাঁশের দোলাতে উঠে" [illegible]ন, তখন বুঝিতে পারা যায়, যে [illegible]টা মতলব আছে,—ফকিরটি একটা অ[illegible] জুড়িবার ফিকিরে আছেন; পয়সা-কা[illegible] সঙ্গে যাইবে না, অতএব আমাকে কি[illegible]াও, অথবা ঈশ্বর-চিন্তা কর। ফকিরকে [illegible]দিতে রাজি আছি, এবং ঈশ্বর-চিন্তায় [illegible] মন বসাইয়া দিলে সুখী হইব, কিন্তু আমি "মরিব" এই সত্যের সঙ্গে অতএব [illegible]লে কিরূপে দান বা ঈশ্বর-চিন্তা আসে, [illegible]টই বুঝিতে পারা যায় না। আমি হলধরকে এক-গাল মুড়ি দিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার পাখী পড়ে কি না, সে অজুহাতে কি করিয়া দিব? কেহ যদি বলেন :—

সংসারটা ফাঁকি রে
যেন ভোজের বাজী!
জীবাত্মাটা পাখী রে
উড়ে পালায় গাজী!
জমিয়ে টাকা সিন্ধুকে
ফেলে যাবে পিছে;
মাঝি ভব-সিন্ধুতে
বল্‌বে ও সব মিছে।

অতএব ভোজনেই
ভাল ক'রে লাগো।
মেজাজখানার ওজনেই
ঘুমাও এবং জাগো।

তর্কের শিকল সর্ব্বত্রই সমান সবল। [illegible]কে নাও দিন ফুরাল" এবং "হেসে নাও [illegible] বইত [illegible]" একই অর্থ-বোধক। [illegible]কেরা ক্রোধহীন এবং উপহাস-সহিষ্ণু; [illegible]রা আমাকে ধীরভাবেই বলিবেন, যে [illegible]দের আত্মবাদ এবং আমার উদর-[illegible] প্রভেদ আ[illegible]। তাঁহাদের কথা এই,—[illegible]রা যখন মরি এবং সকলই যখন অসার, [illegible] যাহা সার তাহাই ধরিতে হইবে। [illegible]পদ্মলোচন শর্ম্মা তবুও বুঝিতেছেন না। [illegible] মাৎ নয়,—যাহা সার,—যাহা অমৃত,—[illegible] চিরসুন্দর, তাহাকে ধরিতে ত মন [illegible]বই,—এ জীবন এবং সংসার অসার [illegible]লও ছুটিবে, সার হইলেও ছুটিবে। তবে [illegible]র উপযুক্ত নামের অধিকারী পদ্মলোচন [illegible]সে সৌন্দর্য্য দেখিতে না পায়, তবে [illegible]মার তর্কশাস্ত্রের কোন্ যুক্তির বলে [illegible]ণর অন্ধকার দিয়া সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যকে [illegible]ইবে?

আমরা এবং আমাদের এই সংসারটি যে [illegible]র মায়ার ফাঁকি, কিংবা সর্ব্বনিয়ন্তার [illegible]লি-রচিত বিশ্বের সমগ্র পদার্থ অণুতে [illegible]তে সত্য, সে তর্ক তুলিব না। যে ব্যক্তি [illegible]ণর আতঙ্কে এবং সংসার-সম্ভোগে [illegible]জিত অথবা বিতৃষ্ণ হইয়া, অল্পে সুখ নাই [illegible]য়া বৃহৎ ব্রহ্মকে ধরিতে চায়, পদ্মলোচন [illegible]াকে বিলাস-লোলুপ স্বার্থপর বলেন, [illegible]র্ম্মিক বলেন না। তোমার শরীর এমন-ভাবে গড়া,—তোমার মন এমন ছাঁচে ঢালা,—যে আকাশের নীলিমায়,—পাহাড়ের উচ্চতায়, —সাগরের বিস্তারে, তোমাকে মুগ্ধ হইতেই হইবে। তোমার ঘরের কোণের কোন পুতুল বা চিত্রপট ক্ষুদ্র বলিয়াই যে উহারা সুন্দর, তাহা নয়; তোমার রোগ সারাইবার ডাক্তারের প্রয়োজনে নয়,—শূন্য ভাণ্ডারে কুবেরের ধন আনাইবার জন্য নয়,—ডুবু ডুবু লোলুপ আত্মাকে খানিকটা চিরস্থায়ী মধু খাওয়াইবার জন্য নয়, কেবল যদি সুন্দর দেখিয়া সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতে না পার,—সমগ্র শরীর ও মনের বিকাশের স্ফূর্ত্তিতে যদি তাঁহাকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিতে না পার, তবে ভণে পদ্মলোচন—তুমি সারের নামে মাৎ চাটিতেছ।

তপস্বী বলিতেছেন,—যাহারা কাছে ছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাক। এবার ঠিক বুঝিয়াছি। উড়া-খই গোবিন্দকে নিবেদন করিলে, তিনি লইবেন কি? এবং খইয়ের ডালার পরিবর্ত্তে আমার ফাঁকিতে পড়িয়া চিনির মুড়কি দিবেন কি? চোখ্ গেল দেখিতে পাই না,—দাঁত গেল খাইতে পারি না; এবার হয় চোরের উপর রাগ করিয়া বাকি মেজের মাটিটুকুকেই আদর করিব, আর না হয় চোরকে আমার যথাসর্ব্বস্ব ফিরাইয়া দিতে বলিব। চোর যদি আমার ছেঁড়া যথা এবং ভাঙ্গা সর্ব্বস্ব ফিরাইয়া না দেয়, তবে আত্মরতি এবং আত্মক্রীড় হইয়া সাধক সাজিব। পদ্মলোচন! নীলে ভাস্বর সিন্ধু-সরিৎ গিয়াছে,—গাছের হরিৎ গিয়াছে,—আলোক গিয়াছে,—দ্যুলোক গিয়াছে;

কিন্তু তাহা ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া যে মধু তুলিয়াছিলে, তাহা ত যায় নাই। তুমি হাসিতে পার না,—গাহিতে পার না,—তুমি দুর্ব্বল,—এবং অপটু; তোমাকে এখন উৎসবের মন্দিরে,—পরিহাসের মজলিসে যদি কেহ না ডাকে, তবে তুমি,—তোমার রাগ এবং অভিমানকে ভক্তি-বৈরাগ্য নাম দিয়া ঘরের কোণে তপস্বী সাজিয়া বসিবে কেন? যারা তোমাকে চায় না, তুমি কি প্রাণপণে তাহাদিগের সেবা করিতে পার না? তুমি মনে করিয়া দেখ, তোমার জন্ম এই সেবায়,—আত্মক্রীড়ায় এবং পরনিরপেক্ষতায় নহে; তুমি বাড়িয়াছ এই সেবায়,—তুমি প্রতিপদে পরের সাহায্য না লইয়া, পরকে সাহায্য না করিয়া বাড়িতে পার নাই; এই সেবায়,—এই অস্থিমাংসগত প্রাকৃতিক কর্ত্তব্যপালনে জীবন ক্ষয় কর। ঘড়িতে যতক্ষণ দম আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে যেমন টক্‌টক্ করিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য, তেমনি করিয়া তোমার ভাঙ্গা লাঠিখানা ঠক্‌ঠক্ করিয়া অগ্রসর হও। তোমার অতএব নাই,—উদ্দেশ্য নাই। মরিতে হইবেই অতএব আগেই মর,—উপবাস এবং তপস্যা করিয়া শরীর জীর্ণ করিয়া ফেল,—ফাঁসির হুকুমের আগেই দড়ি-কলসী সংগ্রহ কর—এ উপদেশ মানিও না। ভবপারে যাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে না; সিদ্ধটি বিনা ডাকেই তর্জ্জন করিয়া আসিবে, এবং দাঁড়ি-মাঝি না থাকিলেও তোমাকে পার হইতেই হইবে; তবে তুমি আগে গিয়াই অসময়ে না চুবানি খাইবে কেন? পদ্মলোচনের প্রতি সে মরিবে না,—আমি মরিব না।

বড় গোল করিয়াছি; আমি যে না, সে কথাটার বিজ্ঞাপন না দিলে হইত। ভীষ্ম তাঁহার না মরার প্রতি প্রচার না করিলে দশ[illegible] জোট ক তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিত কথাটা মহাভারতে [illegible]—কিন্তু জানি। ভীষ্ম বলিলেন যে, তিনি অগ্র পৌষের দারুণ শীতে [illegible] কম্বল জড় কাঁপিতে কাঁপিতে মরিবেন না; সূর্য্য মাথা তুলিলে অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইলে সুস্থে মরিবেন। এই [illegible] লোকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। বিশ্বাস[illegible]লয়ে যে উ শিশু-বধ করা হয়, স্ত্রীলোক এবং যু প্রভৃতির তাহা জানা ছিল; তাঁহারা উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ভী মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে ব্যাস বৈশম্পায়ন এবং সৌতির নিকট লাভ হ কারণ মহাভারত ফুলিয়া ডবল হইয়া এবং গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হইল; কিন্তু মরিলেন। পদ্মলোচনের চক্ষের দোষ থাকুক, তাহার বুদ্ধির দোষ নাই। প্রবন্ধের জন্য যদি কেহ কৈফিয়ৎ ক বলেন, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক আমার শান্তিভঙ্গ করিয়া শান্তিপর্ব্ব বাড় বলেন, অথবা সম্পাদকদের সুবিধার পত্রিকাগুলি ফাঁপাইয়া তুলিতে বলেন, আমি সে কথায় কর্ণপাত করিব না।

শ্রীপদ্মলোচন শর্ম্মা

লুথার বার্ব্বাঙ্ক ও আধুনিক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ

[illegible]রাহমিহিরের "বৃহৎ সংহিতা" সুপ্রসিদ্ধ। [illegible]গ্রন্থ প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণের [illegible]রূপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ [illegible]তে ভারতবাসীরা জগৎসম্বন্ধে যে [illegible] তত্ত্ব ও তথ্য জানিত, তাহার [illegible]ক কথাই বরাহমিহির ইহাতে লিপিবদ্ধ [illegible]ছেন। ঋতু পরিবর্ত্তন হইতে উদ্ভিদের [illegible]তি-পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ [illegible] নাই।

[illegible]বর্দ্ধমান বৃক্ষকে লতায় রূপান্তরিত [illegible]বার প্রণালী বরাহমিহিরের গ্রন্থ পাঠে [illegible]তে পারি[illegible] অম্লজানযুক্ত ফলের [illegible]র্ত্তে মিষ্ট ফল-সৃষ্টির উপায়ও ইনি [illegible]শ করিয়াছেন। ফলের আঁস, আঁটি, [illegible]া ইত্যাদি বদলাইবার রীতিও বৃহৎ-[illegible]হায় আলোচিত হইয়াছে। এই সকল [illegible] করিবার সময় Harwood প্রণীত [illegible]w Creation in Plant-world [illegible]ক পুস্তক চোখে পড়ে। তাহাতে ক্যালি-[illegible]য়ার লুথার বার্ব্বাঙ্ক-প্রবর্ত্তিত নানাবিধ [illegible]ত কৃষিকৌশল বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য [illegible]ার কোন ইংরাজি রচনায় বরাহমিহিরকে [illegible]he Luther Burbank of Hindu [illegible]dia" রূপে বর্ণনা করিয়াছি। বরাহ-[illegible]হিরের সঙ্কেতগুলি দেখিলে মনে হইবে তিনি [illegible]কগুলি নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য ঐন্দ্রজালিক-[illegible]ত প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন। বিংশ [illegible]ব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা লুথার বার্ব্বাঙ্ককে বাস্তবিকই "Plant-wizard" বা উদ্ভিজ্জগতে যাদুকর বলিয়াই জানেন।

প্রদর্শনীর Horticulture গৃহে লুথার বার্ব্বাঙ্কের উদ্ভাবিত কতকগুলি নূতন জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল উদ্ভিদ্ জগতে আপনা-আপনি জন্মিতে পারে না সেইরূপ বহু উদ্ভিদ ইনি তৈয়ার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নূতন নূতন উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করা, নূতন ধরণের ফল-ফুল সৃষ্টি করা, সকণ্টক উদ্ভিদকে নিষ্কণ্টক উদ্ভিদে রূপান্তরিত করা, রসের পরিবর্ত্তন করা, বীজের আকার বাড়ান বা কমান—ইত্যাদি কার্য্য প্রথমতঃ অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল কার্য্যের জন্য অতি উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য বা দার্শনিকতার আবশ্যক হয় না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ বার্ব্বাঙ্ককে বিজ্ঞান-মহলের অন্যতম ধুরন্ধর বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা ইঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেন মাত্র। যে কোন কৃষক ও উদ্যান-পালকই, বার্ব্বাঙ্কের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়শীল হইলে, এইরূপ বিস্ময়জনক ফল দেখাইতে পারে। "কলম" করা, বীজনির্ব্বাচন করা ইত্যাদি কার্য্যে অন্য কোনরূপ অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন হয় না।

লুথার বার্ব্বাঙ্ক প্রথমে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

আলু প্রস্তুত করিয়া মার্কিন দেশে প্রসিদ্ধ হন। সে আজ ১২।১৪ বৎসরের কথা। বার্ব্বাঙ্কের নামে সেই আলু আজকাল যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র প্রচলিত। উদ্ভিদসমূহকে কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই বার্ব্বাঙ্ক সর্ব্বপ্রথমে মনোনিবেশ করেন। এইদিকে কার্য্য করিতে করিতেই নানা বিষয়ে ইহার দৃষ্টি খুলিয়া যায়। আধুনিক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদে বার্ব্বাঙ্ককে দ্বিতীয় "চরক"রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সেদিন ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপকের নিকট সংবাদ পাইলাম—বার্ব্বাঙ্কের গৃহ স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর অতি সন্নিকটে। প্রায় ৫০ মাইল দূরে "স্যাণ্টা রোজা" বা "গোলাপ-নগর"। সেইখানে বার্ব্বাঙ্কের বাগান ও বাসস্থান।

গোলাপনগরে যাইয়া বার্ব্বাঙ্কের সহিত দেখা করিবার ব্যবস্থা করা গেল। একজন হিন্দু-হিতৈষিণী মার্কিন-রমণীর পত্রে জানিলাম —আজকাল স্যাণ্টারোজা নগরে Rose Carnival বা গোলাপ-উৎসব সুরু হইয়াছে। বার্ব্বাঙ্ক তাহাতেই বিশেষরূপে ব্যস্ত আছেন। অধিকন্তু স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর প্রদর্শনী-উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদা লোকজনের সঙ্গে নানা কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়। কাজেই দেখা করিবার অবসর না হইতেও পারে। কিন্তু একজন কর্ম্মচারীর সাহায্যে বাগান দেখিবার ব্যবস্থা হওয়া সহজ।

বাগান দেখিবার জন্য রেলে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে চলিলেন স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর বেদান্ত-ভবনের স্বামীজি। একজন ইয়াঙ্কি-রমণীর গৃহে মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। ইনি মার্কিনদেশীয় সম্ভ্রান্তবংশে জাত বলি গৌরব করিয়া থাকেন। কথাবা জানিলাম ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ইংরা বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যুদ্ধ ক ছিলেন। এজন্য ইনি "বিপ্লব-ললনা-সমিতি (Daughter of the American R volution) সভ্য। বর্ত্তমান কা ইঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে কেহ উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকর্ম্মচারী হইয়াছেন। খুল্লতাত ওহায়ো প্রদেশের শাসন ছিলেন। একটি আঙটি দেখাইয়া বলিলেন—"আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজব সম্ভূত ছিলেন। যখন তাঁহারা বিলাতে করিতেন—অর্থাৎ আমেরিকায় উপনি স্থাপন করিতে আসিবার পূর্ব্বে—তাঁহাদে একজন ফরাসী-সম্রাটের নিকট হইতে এ উপহার পান।"

এই মার্কিন-রমণী কতুকাল হই নানাবিধ অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনায় কাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। বিবেকানন্দ বেদান্তব্যাখ্যা, বাহামত, থিয়জফি, গীতা ইত্যাদি সকল বিষয়েই ইঁহার "interes (শুনিবার ও জানিবার ইচ্ছা) আছে ইঁহার সঙ্গে আর একজন রমণী ছিলে ইনি স্পেনিশবংশে জাত। ক্যালিফর্ণি দেশে স্পেনিশ জাতির বসতিই সর্ব্বপ্র স্থাপিত হয়। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর স্যা রোজা ইত্যাদি নগরের নাম স্পে জাতীয় লোকেরই উদ্ভাবিত। এই রমণ পূর্ব্বপুরুষগণ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চ আসিয়া প্রথম বাস করেন। সেই স ক্যালিফর্ণিয়ার সোণার খনি প্রথম আবি

য়। তাহার পূর্ব্বে এই প্রদেশে বেশী গোলাপ-নগরের থিয়জফিক্যাল সোসাইটির প্রদর্শক—আমি বেসান্তের ভক্ত।

রমণীদ্বয় বার্ব্বাঙ্কের বাগান দেখিবার জন্য আমাদের সঙ্গে চলিলেন। বাগান দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম না। অতি



লুথার বার্ব্বাঙ্ক ও কণ্টকহীন ক্যাক্‌টাস

ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—ইহার মধ্যে ছোট-বড় নানা ক্ষেত। এক-একটার ভিতর এক এক প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বার্ব্বাঙ্ক গৃহে ছিলেন না। তাঁহার সহকারী বাগানের সকল বিভাগ বুঝাইয়া দিলেন। গ্রন্থপাঠ করিয়া বার্ব্বাঙ্কের কৃষিকৌশল ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদজ্ঞতা যতটা জানিতাম, যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অপেক্ষা বেশী-কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম না।

একটা চেরি বৃক্ষে পাঁচশত চেরি ফল উৎপন্ন করা হইতেছে। একটা নাস্‌পাতি বৃক্ষে একশত পঁচিশ জাতের নাসপাতি উৎপন্ন করা হইতেছে। প্রণালী অতি সরল। কতগুলি নূতন বৃক্ষ হইতে শাখা আনিয়া মূল বৃক্ষের সঙ্গে কলম করা হয়। কতক-গুলি সপুষ্পক চারা গাছ দেখিলাম। প্রদর্শক বলিলেন—"পূর্ব্বে এই সকল উদ্ভিদের ফুলগুলি ডাঁটার একধারে জন্মিত—তাহাতে পুষ্পের শোভা দেখা যাইত না। বার্ব্বাঙ্কের চেষ্টায় ফুলগুলি ডাঁটার দুইধারে জন্মিতেছে। পূর্ব্বে মাত্র একবর্ণবিশিষ্ট ফুল জন্মিত—বার্ব্বাঙ্কের উদ্ভাবিত চারায় একসঙ্গে নানা রঙের ফুল ফুটিতেছে।"

একস্থানে কতকগুলি ক্যাক্‌টাস উদ্ভিদের স্তূপ দেখিলাম। প্রদর্শক বলিলেন—"ঐ দেখুন, বার্ব্বাঙ্কের অদ্ভুত কীর্ত্তি। কাঁটাহীন ক্যাক্‌টাস্ (Caktus) কেহ পূর্ব্বে দেখিয়াছেন কি? কিন্তু দশ-বার-বৎসর-ব্যাপী অধ্যবসায়ের ফলে বার্ব্বাঙ্ক নিষ্কণ্টক

ক্যাক্‌টাস প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে ক্যাক্‌টাস দ্বারা জগতের কোন কার্য্য সাধিত হইত না। এক্ষণে এইগুলি খাদ্য-দ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বার্ব্বাঙ্কের বাগান হইতে এই নিষ্কণ্টক ক্যাক্‌টাসের চারা দুনিয়ার সর্ব্বত্র রপ্তানি হইতেছে।

বার্ব্বাঙ্কের বিশ্বাস ছিল ক্যাক্টাস উদ্ভিদের গাত্রে কণ্টকের উৎপত্তি নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী নয়। কাঁটাগুলি এই উদ্ভিদের ধ্বংসসাধনকারী জীবজন্তু হইতে আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বার্ব্বাঙ্ক ক্যাক্‌টাস সমাজে যৌন-নির্ব্বাচন সুরু করেন। বহুলক্ষ নির্ব্বাচনের পর নিষ্কণ্টক জাতীয় ক্যাক্‌টাসের আবির্ভাব হইয়াছে।

বার্ব্বাঙ্কের বাসগৃহ এই বাগানের সম্মুখেই অবস্থিত। সংবাদ পাইলাম ব্যবসায়ের জন্য বার্ব্বাঙ্কের অন্যান্য বহু ক্ষেত্র আছে। এখানে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চলে মাত্র। পর্য্যটকগণকে এই বাগান দেখান হয়; কিন্তু ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলি দেখান হয় না। বার্ব্বাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে ব্যবসায় চালাইবার জন্য এক বিরাট কোম্পানী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর নাম The Luther Burbank Society, কোম্পানীর বড় আফিস নিউ ইয়র্ক নগরে অবস্থিত। বার্ব্বাঙ্কের বৃক্ষায়ুর্ব্বেদতত্ত্ব সম্বন্ধে এই কোম্পানী কতকগুলি গ্রন্থও প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থ সচিত্র।

বার্ব্বাঙ্কের বাগান দেখা হইল। ইয়াঙ্কি-রমণী বলিলেন, "চলুন, আপনাদিগকে আমার আবাদ দেখাইয়া আনি। সেখানে এ-দেশের অনেক কৃষিক্ষেত্র ও ফলের বাগান ইত্যাদি দেখিতে পাইবেন।" ইংরা মোটরকারে বসিয়া ১০।১২ মাইল যাওয়া গেল। নির্জ্জন পল্লীপথ ও কৃষিভূমির পরিচয় পাইতে পাইতে অগ্রসর হইলাম। রাস্তায় একটা নগর-সদৃশ জনপদ চোখে পড়িল। নাম সেবাষ্টপল। অধিবাসীদের বর্ণনে —"এই অঞ্চল হইতে ইয়োরোপের নানাদেশে নাশপাতি রপ্তানি হয়। এ বৎসর যুদ্ধের জন্য রপ্তানি স্থগিত রহিয়াছে। ফলে বাগানওয়ালাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।"

খানিকক্ষণ সমতল ভূমির উপর চলিয়া ক্রমশ উচ্চতর পার্ব্বত্য ভূমিতে উঠিলাম। কোথা কোন আবাদে মুরগী পোষা হইতেছে। সর্ব্বত্র ফলের বাগানই দেখিতে পাইতেছি। নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া মোটর চালাইয়া অবশেষে যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। এই বাগানে কেবল নাশপাতি আছে। শুনিলাম এই সকল বাগানে জলসেচন করিতে হয় না। জমি চষিয়া দিতে হয় মাত্র। নাশপাতি গাছগুলিকে ছোট ছোট পেয়ারা গাছের মত দেখায়। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ অংশে এই বাগান অবস্থিত। এখান হইতে দূরে স্যাণ্টা রোজা নগর দেখিতে পাইতেছি। ইহার চারিদিকে নানাবিধ ফলের বাগান পাহাড়ের গায়ে সারি দিয়া নামিয়াছে। এই স্তরবিন্যস্ত বাগানগুলি হিমালয় প্রদেশের চা-বাগানের অনুরূপ। এখানকার সমগ্র অঞ্চলই সবুজতৃণপত্রমণ্ডিত। এক্ষণে পুষ্পের শোভা কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু সুশ্রী উদ্যানগুলি দেখিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সের সুষমা স্মরণে আসিল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

নবাব

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম-অভিনয়-রজনী

কার্দ্দেলাকের নূতন থিয়েটারে লোক ধরে না। মারাণের নূতন নাটক 'বিদ্রোহে'র আজ প্রথম-অভিনয়-রজনী। নানা সাজে সজ্জিত দর্শক, দলে দলে আসিয়া জমিতে লাগিল। থিয়েটারের সম্মুখে অনেকখানি স্থান আলোর ঘটায় দিনের মতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ী ও লোকের ভিড়ে সে এক সমারোহ-ব্যাপার! ফলেরই মুখে ব্যস্ত আগ্রহের একটা ছাপ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টিকিট-ঘরের পাশেই কার্দ্দেলাক দাঁড়াইয়া ছিল। আশার আনন্দে দুই চোখ তাহার দীপ্ত, উজ্জ্বল—সস্মিত মুখ। বিস্তর টাকা ধার করিয়া এই শেষবার সে তাহার ভাগ্য পরীক্ষায় উদ্যত হইয়াছে। গৃহটা নবাব এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে —সাজসজ্জা ও সরঞ্জামে কার্দ্দেলাকও প্রায় বড় লক্ষ ব্যয় করিয়াছে! তিনবার দেনার দায়ে তাহার নামে দেউলিয়ার ছাপ পড়িয়াছিল—চতুর্থবার সে জীবন পণ করিয়া দাঁড়াইবার লাগিয়াছে! মনটা সন্দেহে বেশই দোল খাইতেছিল। সময়টাও সুবিধার নহে। পারির থিয়েটারওয়াজ লোকেরা এখন পারি ছাড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়! তাহার উপর নাটকারাট একেবারে নূতন, সাধারণের সম্পূর্ণ অপরিচিত! 'বিদ্রোহ'ই আবার তাহার এই প্রথম নাটক! এমন ক্ষেত্রে আশা করিতে মন সরে না! যাহা হৌক, তবুও সে কপাল-ঠুকিয়া আয়োজনে ধুম বাধাইয়া দিয়াছিল। দলে দলে লোক আসিতেছে শুনিয়া কার্দ্দেলাক আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল—ভিড় দেখিয়া তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল! এবার তবে জয়, জয়, নিশ্চয় জয়!

শঙ্কিত চিত্তে মারাণ কিন্তু ষ্টেজের এক নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া ষ্টেজ-ম্যানেজারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। বুক তাহার এক নৈরাশ্যের অজানা ভয়ে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অসম্ভব ভিড়ের কথা শুনিয়াও বাহিরে আসিতে তাহার সাহস হইল না। এতগুলা লোকের দৃষ্টির সম্মুখে বাহির হইতে প্রাণ তাহার একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তবু সকলের কথায় একবার সে কোনমতে যবনিকার অন্তরাল হইতে উঁকি দিয়া রঙ্গালয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—বিরাট গৃহে লোক একেবারে গিস্ গিস্ করিতেছে। তিল-ধারণের স্থান নাই! এমন লোকারণ্য পূর্ব্বে সে আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়াও তাহার মনে পড়ে না!

আর ঠিক পনেরো মিনিট বাকী আছে। ষ্টেজ-ম্যানেজারের কাজ শেষ হইয়াছে। অভিনেতা অভিনেত্রীর দল সাজিয়া প্রস্তুত! শুধু পট উঠিলেই হয়! দারুণ উদ্বেগে মারাণের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে এখন কি করিবে, কোথায় যাইবে? উপরে—বক্সে? চারিধার হইতে অসংখ্য চোখের নানারূপ

দৃষ্টির শর এখনই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইবে! তবে কি সে ষ্টেজের পাশে দাঁড়াইয়াই অভিনেত্রী অভিনেত্রীর দলকে উৎসাহ দিবে? কিন্তু এ উদ্বেগ লইয়া উৎসাহ দিবার শক্তিই বা তাহার হইবে কি করিয়া! তাহার নিজেরই প্রাণ যে দুই-একটা উৎসাহ-বাণী পাইবার আশায় উন্মুখ অধীর হইয়া আছে! সেটুকু না পাইলে প্রাণটাকে ঠিক রাখাও ভারী সমস্যার কথা! তবে—তবে?

কার্দ্দেলাক আসিয়া মহা-উৎসাহে মারাণের করকম্পন করিয়া কহিল, "যান, আপনি উপরে গিয়ে বসুন—দেখবেন, কেমন হয়।" মারাণ কোন উত্তর দিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। নীচে কাতার দিয়া দর্শকের দল বসিয়া গিয়াছে—অধীর আগ্রহের এক সুনিবিড় গুঞ্জনে সারা নাট্যগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—এসেন্সের বিচিত্র গন্ধে রঙ্গালয় এমনই সুরভিত যে মনে হয় সাজানো বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়া গন্ধে যেন চারিধার ভরপুর করিয়া দিয়াছে! ষ্টলে পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ—বিচিত্র বেশ-ধারী নর-নারী মুখে চোখে তীব্র কৌতূহল মাখিয়া গল্প গুজব করিতেছে, গ্যালারিতে রঙ্গপ্রিয় সাধারণ লোক, উপরে বক্সে সৌখীন নর-নারীর দল! মারাণ আসিয়া একটি বক্সের পিছনে দাঁড়াইল—বৃদ্ধ জুজ এলিস ও আলিনকে লইয়া এই বক্সে সম্মুখের আসনে, আর মারাণের মা তাহাদেরই পিছনে উজ্জ্বল আলো ও লোক-চক্ষুর আড়ালে কোনমতে আপনাকে গোপন করিয়া বসিয়াছিল। উত্তেজনায় এই কয়টি প্রাণীর চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মারাণ আসিয়া তাহার মায়ের কাছে বসিল।

বৃদ্ধ জুজ ঘড়ি খুলিয়া কহিল, "আর তিন মিনিট বাকি—" মারাণের বুকে যেন পাথর ঠুকিতেছিল। আর তিন মিনিট! এই অধীর দর্শকের দল, কি জানি, কি করিবে? নীচে হইতে দর্শকের দল ক্ষণে ক্ষণে এই ষ্টলের পানে সকৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল এ বক্সে ও কাহারা বসিয়াছে! পোষাক নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির মত,—দেখিতে একটুও সৌখীন বলিয়া মনে হয় না। বক্সের মূল্যও যে অনেক তাহা ভুলিলে মনে না—যে ও বক্সের মূল্য দিবার ও উহাতে সামর্থ্য আছে!

সহসা ঝম্ ঝম্ করিয়া অর্কেষ্ট্রায় বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মারাণের বুকে স্পন্দন ছুটিয়া গেল। তারপর একেবারে যবনিকা উঠিল ও নাটকের প্রথম দৃশ্য সজ্জিত মূর্ত্ত বেশে দেখা দিল। মারাণ বিস্মিত দৃষ্টিতে মঞ্চের পানে চাহিল। পাত্র-পাত্রী কথা সুরু করিয়া দিয়াছে—মারাণ শুনিল, তাহার লেখা কথা দিব্য দক্ষতার সহিত ইহারা বলিয়া চলিয়াছে! ধাত্রী-মাতা তাহার শিশুকে প্রথম উড়িতে দেখিলে যে সতৃষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার প্রতি ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করে, মারাণ ঠিক সেই ভাবেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাক ও চলিবার ফিরিবার প্রত্যেক ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করিতে লাগিল।

দর্শকমণ্ডলী স্থির চিত্তে অভিনয় দেখিতে

ল। কোথাও এতটুকু সাড়া-শব্দ নাই! কটা সূচ পড়িলেও তাহার শব্দ শুনা র—বিরাট রঙ্গগৃহ এমনই স্তব্ধ, কোলাহল-ন! সহসা নীচে ষ্টলের এক দর্শক মৃদু ণ্ঠে কহিল, "এ যে পদ্য!" আর একজন ত তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "চুপ, ারী চমৎকার ত।" মারাণের প্রাণের য়া দিয়া আনন্দের একটি বিদ্যুৎশিখা টিয়া গেল। দর্শকদের এই নিস্পন্দ নকহীন দৃষ্টি—এই অধীর কৌতূহল—সে ন নবীন নাট্যকারের কৃতিত্বকে ধ্যান-মানভাবে বরণ করিয়া লইবারই সঙ্কেত!

কবির ছন্দ রঙ্গমঞ্চে তখন নদীর শান্ত তরঙ্গের মত নাচিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল সুদক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর সুখন কণ্ঠে সে ছন্দ বিচিত্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পারির সৌখীন সমাজের মহাসৌখীন ব্যক্তিগুলি হইতে গ্যালারির নিতান্ত ভাবহীন সাধারণ দর্শকের চিত্তটুকুও সে ছন্দের সলীল মৃত তরঙ্গে নৌকার মতই দোল খাইতেছিল!

ওধারের বক্সে বসিয়া হেমারলিঙ, ব্যারণেস ও ব্যারণেসের প্রণয়ী লি মার্কার দীপ্ত কৌতূহলে নাটকের প্রতি ছত্র অনুসরণ করিতেছিল,—তাহার পাশের বক্সে পারির বিখ্যাত বিলাসিনী সুজান্ ব্লক্ সাজসজ্জার দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ষ্টেজের পানে চাহিয়া ছিল—তাহার পাশে এমি ফেরাট। মশার্দ তাহার কুশ্রী নায়িকার সঙ্গে আর-এক বক্সে বসিয়া গল্প থামাইয়া অভিনয় দেখিতেছিল। পেণ্টে নায়িকা তাহার মুখের ধবল দাগগুলাকে ঢাকিয়া আসিলেও পাছে সেগুলা লোক-চক্ষে এত-টুকুও আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে পট উঠিবার পূর্ব্বক্ষণ অবধি সেগুলার পানে সে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল; কিন্তু অভিনয়ে এমনই উত্তেজনা, রচনায় এমনই নূতনত্ব ছিল যে এখন সে কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল! সকলেই নাট্যকারের রচনা-কৌশলে ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়-দক্ষতায় একেবারে যেন তন্ময় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মারাণ স্মিত মুখে কম্পিত চিত্তে দর্শকের মুখের উপর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে আপনার ব্যাকুল দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছিল!

সহসা দর্শক-দলে চাঞ্চল্যের মৃদু তরঙ্গ দেখা দিল। বিপুল জনসঙ্ঘ কিসের সাড়া পাইয়া উপরের দিকে ফিরিয়া চাহিল। কোণের যে বহুমূল্য বক্সটি এতক্ষণ খালি পড়িয়াছিল, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিল। অমনি সকলের মুখে চোখে একটা সঙ্কেতের ঢেউ ছুটিয়া গেল! মারাণ ফিরিয়া চাহিল, শূন্য বক্সে একজন লোক আসিয়া বসিয়াছে। মারাণ মুহূর্ত্তে চিনিল, সে নবাব।

দশ দিনে নবাবের বয়স যেন কুড়ি বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। চুলে অসম্ভব পাক ধরিয়াছে। অত বড় দুর্ঘটনার পর নবাবকে এ কয়দিন কেহ পথে বাহির হইতে দেখে নাই। ক্ষুব্ধ, আশা-হত নবাব আপনাকে নিরাপদ গৃহ-দুর্গে বন্ধ রাখিয়া-ছিল। দিনের আলো, মুক্ত আকাশ, মুখরিত পথ,—এ সবের মায়া নবাব দৃঢ় চিত্তে ত্যাগ করিয়াছিল। বাহিরে তাহারই নাম লইয়া পারির লোক কিরূপ তর্জ্জন করিতেছে,

তাহার আভাসমাত্রও নবাবের কাণে পৌছায় নাই। ধ্বংসের একটা ভীষণ ছায়া নবাবের দীপ্ত প্রাণটাকে রাহুর মতই গ্রাস করিতেছিল। মাদাম জাঁতুলে এ সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া নিগ্রো বাঁদী-বান্দা লইয়া হাওয়া খাইতে দেশান্তরে গিয়াছিল—বোকাম্প তহবিলের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রতিক্ষণেই দারুণ দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। নবাবের বৃদ্ধা মাতা শুধু আসন্ন ধ্বংসের মুখে পুত্রকে আগুলিয়া বসিয়াছিল। নবাব একেবারে বাক্‌হীন ক্ষুব্ধ বেদনায় এক মহা-সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাহিরের সহিত তাহার সব সম্পর্ক আজ চুকিয়া গিয়াছে!

এমন সময় মার্শেল হইতে গেরির টেলিগ্রাম আসিল, নবাবের দশ লক্ষ টাকা কোনমতে আদায় করিয়া সে ঘরে ফিরিতেছে। নবাবের মনে নৈরাশ্যের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, মুহূর্ত্ত কে যেন তাহা ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। আশার সূর্য্যালোক আবার মৃদু কিরণে জাগিয়া উঠিল। দশ লক্ষ টাকা! আঃ,—দেনাপত্র তবে শোধ হইবে; দেউলিয়া নামের কলঙ্ক হইতেও মুক্তিলাভ ঘটিবে! আবার নূতন করিয়া জীবনটাকে গড়িবারও সুযোগ মিলিবে! নবাব উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা খবরের কাগজ টানিয়া লইল। এ দশ দিন নবাব খবরের কাগজও খুলিয়া দেখে নাই! কাগজ খুলিতেই কার্দ্দেলাকের থিয়েটারের বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। মারাণের নূতন নাটক লইয়া থিয়েটার খুলিতেছে! ভারী সমারোহ ব্যাপার! নবাবেরই টাকায় তৈয়ারি থিয়েটার, তাহারই বুকের রক্তে রাঙানো থিয়েটার। নবাব ভাবিল, একবার ঘুরিয়া আসা যাক! পারিষদ লোকগুলাকে দেখুক, তাহাদের বর্ব্বর নিষ্ঠুরতা নবাবকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই।

মা আসিয়া পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া নিষেধ করিলেন—পুত্র হাসিয়া মার সে উদ্বেগ কাটাইয়া দিল। মা শিহরিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

বক্সে ঢুকিয়াই নবাব উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তাহার চোখে পড়িতে বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না। দর্শকমণ্ডলী সে ভাব বুঝিল। তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা নির্লজ্জ তাহারা দুই-চারিটি কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়িল না।

একজন কহিল, "নবাব, ছ্যা!"

"তাই ত নবাবই যে!"

"ইস্, কি বেহায়া হে!"

"মুখ দেখাতে লজ্জা হল না! ডাকাত বেটা—"

নবাবের একবার মনে হইল, উপর হইতে এই দণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এই সব অসভ্য বর্ব্বর জানোয়ারগুলার টুঁটি সে চাপিয়া ধরে। কিন্তু না, উহাদের মন্তব্য কানে শুনিয়াও না শুনার ভাব দেখাইয়া উহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া দিতে হইবে! ভিতরে ভিতরে নিষ্ফলতার দুঃখে ইহারা গুমরিয়া মরুক!

কিন্তু হায় রে—এমন করিয়া আপনাকে অবিচল রাখাও যে অনেকখানি শক্তির কাজ! নবাবের এ দুর্ব্বল হাড়ে অতখানি শক্তি যে আজ নাই! নবাব প্রাণপণে আপনাকে

বরণ করিল। বর্ব্বরগুলা তবুও তাহাদের ব্যঙ্গ-প্রকাশে ক্ষান্ত হইল না। নবাব আর কারও পানে ফিরিয়া চাহিল না! পথে কুর চীৎকার করিলে সাহসী পথিক যেমন দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া অটল গাম্ভীর্য্যে আপনার পথে চলিয়া যায়, সে-ন নীচ মন্তব্যে নবাবও ঠিক তেমনই াসীন থাকিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিল।

এমন সময় প্রথম অঙ্কের শেষে পট পড়িল। ন সকলে ঠাঁই ছাড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া নাবিধ মিশ্র কোলাহলের সৃষ্টি করিল। কগুলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা শুধু নবাবের নে গেল। আপনার বক্সে অটলভাবে বসিয়া সব কথার শর নবাব ঔদাসীন্যের দুর্জ্জয় র্ম রোধ করিতে লাগিল।

"চমৎকার বই! এরা প্লেও করচে খাসা—"

"একেবারে নতুন ধরণের বই!"

"নবাব কি বলে এল, এখানে? বুকের টাও ত কম নয়!"

"দেখা যাক—আগাগোড়া বইখানা কেমন ায়!"

"এইটিই প্রথম বই! নতুন নাট্যকার!"

"লি-মার্কেটা একেবারে ব্যারণেস হেমার ডের খপ্পরে পড়েছে।"

"তাই হেমারালডের এত পসার!"

"আরে ছ্যা! বড়লোকের সবই াপ!"

"হেক্সিসটা গেল কোথায়?"

"টিউনিসে আছে। ফেলিসিয়াও তার সঙ্গে ট গেছে। বের কাছে দুজনেরই ভারী তির! বে'কে ঠেসে পার্ল খাওয়াচ্ছে! খুব ার জমিয়েছে, সেখানে"।

"একের নম্বর—একেবারে, বুঝলে কি না!"

সহসা নবাবের বক্সের পিছনে মৃদু কোমল কণ্ঠে কে কহিল, "নাই বা আলাপ থাকল, বাবা,—তুমি যাও আলাপ করগে! আহা, উনি নেহাৎ একলা পড়েছেন—"

"কিন্তু আলিন, আমায় যে উনি মোটেই চেনেন না, মা—"

"নাই চিনুন, নিজে থেকে চেনা করে নাও গে! তুমি একটু কথা কওগে—উনিও জানবেন—ওঁর তবু একজন বন্ধুও এখানে আছে—"

পরক্ষণেই নবাব ফিরিয়া দেখেন, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহার বক্সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বৃদ্ধ জুজ। সে কি আরাম—কি আশ্বাস পাইয়া নবাব সাগ্রহ বাহু বাড়াইয়া বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করিল! বৃদ্ধের তপ্ত কর আপনার করে ধরিয়া নবাব এক অপরূপ স্নেহের সংস্পর্শে মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার সেই বর্ব্বর গ্লানির কথা ভুলিয়া গেল! তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে দুইজনে কত কথা কহিল। এমন স্নেহ-আশ্বাস-ভরা স্বর নবাব এ সহরে পূর্ব্বে আর কখনও শুনে নাই! আহা, এতদিন কোথায় তুমি ছিলে, বন্ধু! এই লুঠের আড্ডা, বর্ব্বরতার মজলিসের আন্তরালে এমন একখানি সুন্দর প্রাণ লইয়া লুকাইয়া তুমি কোথায় বসিয়াছিলে! এখানে যশের জন্য, টাকার জন্য দিবারাত্রি শৃগাল-কুকুরের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে—এই কদর্য্য রক্তাক্ত ক্ষেত্রের পশ্চাতে এমন একখানি স্নেহের নির্ম্মল নিরাময় নীড় আছে, জানিলে নবাব যে কবে সেখানে গিয়া মাথা গুঁজিয়া বাঁচিত!

ঘণ্টা বাজিল। দর্শকের দল যে যাহার আসনে স্থির হইয়া বসিল। পট উঠিল। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় সুরু হইল। দর্শকের দলে আবার সেই চোখে চোখে সঙ্কেতের বাণ ছুটিল।

নবাব ভাবিল, আমি ইহাদের কি করিয়াছি—যে ইহারা এমন বর্ব্বরের মত আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে! পারি কি আর আমায় চাহে না? আমার সহিত সব সম্পর্ক তাহার চুকিয়া গিয়াছে?

কিন্তু ছয়-মাস! শুধু ছয়মাস নবাব পারিতে আসিয়াছে। ছয়মাসেই রাক্ষসের মত নবাবকে তাহার লুব্ধ গ্রাসে পুরিয়া চিবাইয়া হাড়-জর-জর করিয়া পারি আজ পথে মাংসের হাড়ের মতই তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে! ছয় মাসেই সব নিঃশেষ হইল! নবাবের মাথার মধ্যে আগুন ছুটিতেছিল। দর্শকের দলে তখন অভিনয়-তারিফের সঘন করতালি-নাদ উঠিতেছিল। নবাব চিন্তার সূত্র কাটিয়া অভিনয়ে মনঃসংযোগ করিল। রঙ্গমঞ্চে নায়ক তখন বক্তৃতায় শ্লেষের পরাকাষ্ঠা তুলিয়াছে! এই যে সহরের বুকে বসিয়া রক্তপিপাসু বাঘের মতই সম্ভ্রান্ত সমাজ গরিবের রক্ত অহরহ শুষিয়া ফিরিতেছে—গরিবের রক্তে দেহ স্ফীত করিয়া সেই গরিবেরই ঘাড়ে পা দিয়া জুলুমের একশেষ করিতেছে, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

মুগ্ধ দর্শকের দল নবাবের পানে ঘন ঘন চাহিয়া দেখিতেছিল। যেন এই বিস্তীর্ণ সহরের মধ্যে নবাবই শুধু একমাত্র রক্তপিপাসু ব্যাঘ্র, আর উপরে ঐ হেমারলিঙ, লি-মার্কার, ঐ সজ্জিত বক্সে অপরূপ সাজে সজ্জিত বড় লোকগুলা সকলেই নিরীহ মেষ! [illegible] তরাজের উহারা কিছুই জানে না। ক্রো নবাবের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, শরীর অসহ্য তাপে [illegible] দর্শকের সে দৃষ্টি নির্ব্বাক হইলেও বলিতেছিল, "চলিয়া যাও, চলিয়া নবাব, এখান হইতে তুমি চলিয়া যাও আমাদের সহিত একগৃহে [illegible] যোগ্যতাও তোমার নাই।"

নবাবের চোখের সম্মুখে কাহারা নৃত্য করিতেছিল। তাহারাও যেন সকল দর্শকের সহিত [illegible] কহিতেছিল, "তুমি চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, নবাব, এখান হইতে চলিয়া যাও।"

নবাবের মন ঝড়ের মতের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"কি, অযোগ্য আমি লক্ষ্মীছাড়া রাক্ষসের দল, তোদের চেয়ে হাজার গুণে আমি শ্রেষ্ঠ; আমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিস—কিন্তু আমার এ ঐশ্বর্য্য, এ মাসে, লুটিয়া লইয়াছে, কাহারা? তোরা তোরা কাপুরুষ বর্ব্বর, [illegible] মনের ফুর্ত্তি পাতিয়া, ভণ্ডামির ঝুলি লইয়া, ভিখারীর বেশ ধরিয়া, নানাভাবে আমার এ ঐশ্বর্য্য তোরাই ত লুণ্ঠন করিয়াছিস্! ঘৃণ্য পশুর কুকুরের মত আমার এক কণা প্রসাদ পাইবার আশায় আমার ভারী জুতা মাথায় বহিয়াছিস্—আমার এতটুকু উচ্ছিষ্ট পাইবার লোভে আমার দোরের মাটি চাটিয়াছিস্, আর আজ এখানে তোরা সাধুর খোলস

[illegible]য়া আমার পানে বর্ব্বর দৃষ্টিতে চাহিয়া [illegible]তেছিস—আমি ডাকাত, আমি চোর, [illegible]ধি লুঠেরাজ! ঐ যে মার্কুইস জরির [illegible]া গায়ে আঁটিয়া, এক চরিত্র-হীনা [illegible]কে পাশে বসাইয়া অহঙ্কারে ধরাকে [illegible] দেখিতেছিস, তুইই ত সেদিন আমার [illegible]রে ধরিয়া সাধিয়া এক লক্ষ টাকা ভিক্ষা [illegible]য়াছিলি! না দিলে ক্লাব হইতে অপমান [illegible]রিয়া তোকে তাড়াইয়া দিবে! আর তুই, [illegible]াসিনী নারী, যে সব মণিমুক্তা আঁটিয়া [illegible]খানে আজ তোর ঐশ্বর্য্যের বহর [illegible]খাইতে আসিয়াছিস, ও ঐশ্বর্য্য ত আমারই [illegible]দামোদ করিয়া আমারই হাত হইতে [illegible] ভিক্ষা লইয়াছিলি! আর তুই [illegible]জ্জ মশাদ—মাথায় শুধু কালো কালি-[illegible]া, তুই ত আমারই উচ্ছিষ্টে শরীরটাকে [illegible]দিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিস্; তারপর [illegible]া বন্ধ করিয়াছি বলিয়া আমায় [illegible]ছ কুকুরের মত দংশন করিয়া ফিরিতে-[illegible]ন—তোকে কি মানুষ বলিয়া ভাবি? [illegible]দিন পথে আমার হাতের চাবুক [illegible]য়াও তোর লজ্জা হয় নাই, তাই তুই [illegible] ধবল-রোগী গণিকাটাকে লইয়া এখানে [illegible]সিয়া বসিতে পারিয়াছিস্! আর এই [illegible]াদের পারির সমাজ তোদের মত পাষণ্ড-[illegible]র মাথায় তুলিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে! [illegible]মাকে পরিহাস করিস, তোরা? আমার [illegible]া খুলিবার যোগ্যতাও যদি তোদের [illegible]কিত! তোরা আমার কুৎসা করিস? [illegible]াদের চেয়ে আমার আসন অনেক, [illegible]নক উপরে, তা তোরা জানিস্?"

ক্ষুব্ধ প্রাণের মধ্যে কথাগুলা বিরাট চীৎকারে গর্জ্জন করিতেছিল! একটা অস্থির উত্তেজনায় নবাবের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিতেছিল। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, আর না, আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। এখনই একটা বিরাট জলোচ্ছ্বাসের মত ঐ হতভাগা জনতার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে সে আহত, বিধ্বস্ত করিয়া দেয়! দারুণ উন্মাদনায় নবাবের সারা চিত্ত মাতিয়া উঠিয়াছিল। শুধু নখ দিয়াই এই বর্ব্বর দর্শকদের একটি একটি করিয়া টুঁটি ছিঁড়িয়া ঐ নির্লজ্জ মুখগুলাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবার বাসনা মুহুর্মুহু তাহার প্রাণখানাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। নবাব ত গিয়াছেই! সঙ্গে সঙ্গে এ লোকগুলারও অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়া যাইতে হইবে!

নবাবের চোখের সম্মুখে রঙ্গালয়ের উজ্জ্বল আলোগুলা চকিতে সহসা ম্লান হইয়া গেল—অভিনেতার উচ্চ চীৎকার ক্ষীণতায় মিলাইয়া পড়িল। নবাবের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, দেহ দুলিয়া আসিল। নবাবের মনে হইল, সহসা যেন পৃথিবীখানা ভীষণ ভূমিকম্পের বেগে দুলিয়া উঠিয়াছে—আসনে বসিয়া মাথাটাকেও আর খাড়া রাখা যায় না—কে যেন জোর করিয়া টানিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতে চাহিতেছে। বুকের কাছে কি যেন ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। সহসা পরক্ষণেই চোখ তাহার মুদিয়া আসিল। নবাবের শির হেলিয়া পড়িল।

চকিতে অমনি কে আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল, "নবাব, মস্যুঁ—"! এ যে বড় পরিচিত স্বর—বড় স্নেহ-কোমল! কিন্তু

বড় দূর হইতে এ সাড়া আসিতেছে না? মার্শেল—মার্শেল—সে যে বহুদূরে!

নিরুপায় মজ্জমানের মত নবাব শূন্যে হাত বাড়াইল—কাহার তপ্ত স্পর্শ উত্তেজিত শিরায় মুহূর্ত্তে অমনি স্নিগ্ধতার প্রলেপ সিঞ্চন করিল। তারপর ক্ষীণ, অতি-ক্ষীণ কণ্ঠে কে কহিল, "আমি এসেছি, নবাব, আমি—আমি গেরি!" নবাব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গেরি দুই হাতে টানিয়া নবাবকে বুকে তুলিয়া পাশের জনহীন অন্ধকার বারান্দায় লইয়া আসিল। অধীর দর্শকের দল উল্লাসে মাতিয়া তখন "সাবাস! সাবাস!" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। আলোর লহরে রঙ্গালয় একেবারে হাসিয়া সারা হইয়া যাইতেছিল।

* * * *

রক্ত-ক্ষরণ, ক্যাপিং-গ্লাস, পুলটিস কিছুতেই আর সে অচেতন শরীরে স্পন্দন ফুটাইতে পারিল না। দুইজন ডাক্তারও সুদক্ষ শুশ্রূষাকারী হিমসিম খাইয়া গেল, গেরি তাহার সকল শক্তি লইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিল; কিন্তু নবাবের চৈতন্য ফিরিবার কিছুমাত্র আশা দেখা গেল না। কার্দ্দেলাক নিজে দেখিতে আসিতে পারিল না; সে তখন ভারী ব্যস্ত, তবে লোক পাঠাইয়া দিল, সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়! আরও সে লোকের মুখে বলিয়া পাঠাইল, পঞ্চম অঙ্কের যবনিকা পড়িলেই সে ছুটিয়া আসিবে!

বারাণ্ডার এককোণে থিয়েটারের যত কিছু পরিত্যক্ত আসবাব পড়িয়াছিল, ছিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপট, কাঠের বড় বড় বাক্স, কাঠের ভাঙ্গা সিঁড়ি, ফুটা বাল্‌তি, পায়া-হারানো অকেজো টেবিল—আবর্জ্জনার স্তূপ তাহারই মধ্যে গেরি কোথা হইতে এ খানা সোফা টানিয়া আনিয়া নবাবের তাহার উপর শোয়াইয়া দিয়াছিল। যেন জল-গিরিশৃঙ্গে চূর্ণ একখানা জাহাজ ডাঙ্গার এক ধারে কাহারা টানিয়া তুলিয়াছে তেমনই বিশাল দেহ, সর্ব্বাঙ্গে তাহার বিয় হৃদয়ভেদী ধ্বংসের তেমনই চিহ্ন!

কপালে হাত দিয়া গেরি নবাবে মুখের পানে চাহিয়াছিল। তাহার চো জলে ভরিয়া গিয়াছে! একটু দে হইয়া গিয়াছে—আর যদি কয়মুহূর্ত্ত পূ সে পৌঁছিতে পারিত! ক্ষসের গ্রা হইতে কিছুও যে সে গ্রহ করি পারিয়াছে, এ খবরটা নিজের মু নবাবকে দিতে পারিলে য়ত এতখা কাণ্ড নাও ঘটিত।

বাহিরে আবার করত বজ্রনাদ উঠি সারা রঙ্গগৃহ সে নাদে কাঁপিয়া উঠি তাহার পরক্ষণেই বাহি গাড়ী-ঘোড় শব্দ ও লোকের কোলাহ মুহূর্ত্তে জানাই দিল, অভিনয় শেষ হইয়াছে—বিভ্রম-দী দর্শকের দল দারুণ সুখের উচ্ছ্বাসে মাতি গৃহে ফিরিতেছে! নবীন নাট্যকারে ললাটে প্রশংসার জয়টীকা পরাইয়া, তাহ প্রাণে নব-জীবনের উন্মেষ-রাগ ফুটাই দলে দলে যখন সব গৃহে ফিরিয়াছে তখ ও-ধারে এই থিয়েটারেই এক পরিত্য নিভৃত কোণে—কি এক শোচনীয় কর নাটকের অভিনয় সুরু হইয়াছে! কে জানে না, কেহ তাহার সন্ধানও রাখি চাহে না। হৃদয়-হীন বর্ব্বর সহর!

অথচ এই রাত্রিটিরই আগমন-কল্পনায় কতদিন অধীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে! আলো, হাসি ও গানের সমারোহ-দৃশ্য রিয়া কতখানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! ঘুণাক্ষরেও সে ভাবে নাই, একদিন এ লো জ্বলিবে, তবে সে তাহাকে পুড়াইবার —হাসিও উটবে, কিন্তু হায়, সে তাহারই শান্ত সহায়ভূতিকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিবার !

সহসা নবাবের দেহ একবার কম্পিত হইল—ওষ্ঠ একবার নড়িল, মুদিত চক্ষু একবার গেরির মুখ লক্ষ্য করিয়া পল্লব মেলিল—মৃত্যুর পূর্ব্বে সে চাহনি গেরিকে যেন পারির এই নিষ্ঠুর বর্ব্বর ষড়যন্ত্র, এই দারুণ শোচনীয় হত্যা-ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষ্য থাকিবার করুণ মিনতি হানিয়া পরক্ষণেই আবার চিরকালের জন্য মুদিয়া গেল!

সমাপ্ত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

শিক্ষা

পূর্ব্বে যে নবপ্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে সেই বিধিব্যবস্থা অধিকাংশ লোকে তেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করে নাই বরং কতকটা বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিয়াছিল; কেননা, তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কারাদি অন্য প্রকারের ছিল। কিন্তু শিক্ষার প্রভাবে যখন এক নব্য-বংশের লোক গড়িয়া উঠিল তখন তাহাদের নিকট এই শিক্ষা খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। ঊনবিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, শিক্ষা-পদ্ধতিকে এমন সুন্দর করিয়া চালাই করা হইল যে, ভারতীয় সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা—এই উভয় সভ্যতারই অংশ এই পদ্ধতির মধ্যে স্থান পাইল।

*
* *

প্রথমে, প্রাথমিক-শিক্ষা সমস্তই দেশীয় ভাষায় দেওয়া হইয়া থাকে। দুই রকমের পাঠশালা। এক রকম পাঠশালায় ছাত্রদিগের কোন প্রকার পরীক্ষা দিতে হয় না এবং সে সকল পাঠশালার কোন বিবরণ লেখা হয় না। ব্রাহ্মণেরা, গ্রাম্য গুরুরা প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকে।

আর এক রকমের পাঠশালা আছে যাহার ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় এবং যে-পাঠশালাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথাঃ—গবর্ণমেণ্টের পাঠশালা; রাজসরকার হইতে সাহায্য পায় এইরূপ স্বাধীন পাঠশালা; এবং রাজসরকার হইতে সাহায্য পায় না এইরূপ স্বাধীন পাঠশালা। এই সকল পাঠশালার বালকেরা পড়িতে শেখে, লিখিতে শেখে, অঙ্ক কষিতে শেখে। ১৯০০ অব্দে, এই প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রসংখ্যা ছিল সাড়ে-ত্রিশ লক্ষ, তন্মধ্যে চারি লক্ষেরও কম —বালিকা।

*
* *

তারপর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা ইংরাজিভাষা, জ্যামিতি বীজগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, ভৌতিক-বিদ্যার কতকগুলি স্থূলতত্ত্ব, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে।

কোন কোন স্কুলে ইংরাজি পড়ান হয় এবং কোন কোন স্কুলে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু এই শেষোক্ত বিদ্যাগুলি ক্রমশই দৈন্যগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৯০০—০১ অব্দে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছিল—৫৪৫,০৫৪।

উচ্চশিক্ষা। এই বিভাগে, য়ুরোপে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয় এইখানেও সেই সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলিকাতা, বোম্বাই, আলাহাবাদ ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন "কালেজ" গুলিতে এই উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল লাহোর-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি শিক্ষকমণ্ডলী আছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই সাহিত্য, আইন, চিকিৎসা, শিল্পকলা ও ব্যবসায়-আদির জন্য পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞান-ব্যাচিলারের উপাধি এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচ্য-শিক্ষার ডিগ্রী প্রদত্ত হয়। ১৯০০—১৯০১ অব্দে উচ্চশিক্ষার ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১,৮২০ (১৮৯৯—১৯০০ অব্দে ছিল ২০,৭৪৪; ১৮৯৮—৯৯ অব্দে ছিল ২১,০০৬); প্রায় ৬০০০ উপাধি-পত্র বিতরণ করা হয়।

১৮৯৯—১৯০০ অব্দে, সরকারী শিক্ষার আয়ব্যয়ের পরিমাণ ছিল, ৩৭,৭৫৩,০ টাকা, এবং ১৯০০—১৯০১ অব্দে আ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮,৪৪৬,০০৯।

* * *

ভারত-গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভারতী লোক-শিক্ষার এইরূপ কার্য্যফল। এই কা ফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ক আবশ্যক।

প্রাথমিক পাঠশালায় চারি লক্ষ, প্রা পাঠশালায় চারি লক্ষ ছা শিক্ষা প্রা হয়। অতএব দেখা যা ছে শত দশজনেরও কম ভারতবাসী লিখিতে পড়িতে জানে। ইহা নিশ্চয়ই যথে নহে। গ মেণ্টের আরও বেশী স্বীকার ক উচিত এবং বাধ্যতামূলক প্রণালী অ অল্প করিয়া ক্রমশ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

যে সকল ছাত্র স্কুলে যায় তা সংখ্যা অল্প; প্রায় ৩॥০ ল ; এবং যা কালেজে শিক্ষা লাভ করে তাহাদের সং ৫ লক্ষ। যে সময়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল সেই সময়েরই মত এই শিক্ষা এ শ্রেণীর যেন বিশেষাধিকার হইয়া দাঁড় ইতেছে। চীনের মান্দারীনদিগের ন্যা শিক্ষিত লোকের একটা বিশেষ শ্রেণী হই না দাঁড়ায় তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রা আবশ্যক।

যে হেতু মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনি এবং যেহেতু জমির খাজনাই রাজ অতএব মধ্যমশ্রেণীর শিক্ষায় যে ব্যয় হ সে ব্যয়ভারের অধিকাংশ কৃষকদিগকে বহন করিতে হয়।

কতকগুলি বিশেষ জাতি, প্রায় সমস্ত কিত লোকের যোগান দিয়া থাকে। া:—বাঙ্গালী, গুজরাটি, তামুল ও লুগু। ইহা আর একটা আশঙ্কার য়; কেন না, প্রতিযোগিতার পরীক্ষা রিয়া তবে লোকদিগকে সরকারী কাজে যুক্ত করা হয়।

অধিকাংশ ছাত্র শাসন-বিভাগের পদ, কীল-কৌশুলি পদ ও সংবাদপত্রের সম্পাদক দের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহারা হাতে বিজ্ঞানের দিকে, বিশেষতঃ বসায়িক বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগী হয় ংগক্ষে গবর্ণমেণ্টের প্রযত্ন আবশ্যক। ারতে উকীল কৌশুলির সংখ্যা, সংবাদ-ত্র সম্পাদকের সংখ্যা খুবই বেশী; ভারতের ার—চিকিৎসকের, পশুবৈদ্যের, ইঞ্জি-য়ারের, কৃষি-বিশেষজ্ঞের, কলকারখানা-ালার ও বণিকের। ভারতের মন পনিষদের স্বপ্ন-কল্পনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ারবেরা যেরূপ শিক্ষা দিতে আরম্ভ রিয়াছিল, সেই শিক্ষা য়ুরোপীয়দিগেরও ান উচিত; ভারতবাসীদিগের স্বপ্নদর্শিনী দ্ধিকে তথ্যদর্শিনী বুদ্ধিতে,—কার্য্যকরী দ্ধিতে পরিণত করা কর্ত্তব্য।

ভাষা সম্বন্ধেও অনেক প্রতিবন্ধক আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ছাত্রেরা দেশীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি ব্যবহার রে। এই প্রবণতা ক্রমে বাড়িবে বৈ মিবে না। কেন না, যদিও দেশীয় াষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত ইয়াছে, তাহার কোনটাই রীতিমত ধর্ম্ম-ীতিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অথবা গণিত-শাস্ত্র শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। পক্ষান্তরে, লোকসংখ্যার হিসাবে যাহারা শতকরা ৯০ সেই কৃষিজীবীরা ইংরাজি কহিতে চেষ্টাও করে না। হয়ত এমন সময় আসিবে যখন প্রাথমিক পাঠশালাতেও এই ইংরাজি ভাষার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

* * *

ইংরাজের ভারতবিজয়ে ইংলণ্ডের যে নৈতিক সভ্যতা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার স্থূল রেখাগুলি উপরে প্রদর্শিত হইল। অবশ্য এই কার্য্যটি আমাদের নিকট অনিশ্চিত ও অসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কেন না, যে জাতি আর এক জাতির অন্তরাত্মাকে বুঝিতে ও জয় করিতে চেষ্টা করে তাহার কার্য্য এইরূপ হওয়াই সম্ভব। ইংরাজের সম্পাদিত সকল কার্য্যই এইরূপ হইয়াছে। কেজোবুদ্ধি ও দৈনিক প্রয়োজনের উপযোগী বুদ্ধি ইংরাজের চরিত্রে সমধিক থাকায়, ইংরাজ সূক্ষ্ম তত্ত্বাদিতে বিশ্বাস করে না, আস্‌মানের উপর নিখুঁত গন্ধর্ব্বনগর নির্ম্মাণ করিতে ভালবাসে না। এই সকল অভাব সত্ত্বেও হিন্দ-ব্রিটানীয় রাজসরকার ভারতে সভ্যতা প্রচাররূপকর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি করে নাই। সুশৃঙ্খলা ও শান্তির দ্বারা ইংলণ্ড এই সভ্যতা ভারতে আনয়ন করিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী কাল হইতে ভারত, বিদেশীর আক্রমণ হইতে, যুদ্ধবিগ্রহ হইতে, কিংবা অন্য গুরুতর উৎপাত-উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। বিশেষতঃ ইংলণ্ড, স্বাধীনতার

দ্বারা ভারতকে সভ্য করিয়াছে। ভারতবাসীর সামাজিক প্রথা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না ইহাই রক্ষণশীল রাজনৈতিকদিগের মূল নিয়ম; আবার উদারনৈতিকেরা ভারতকে সমস্ত পৌরজনিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যাহা স্বয়ং ইংরাজেরা ইংলণ্ডে উপভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্রোতের ফুল

(৪৪)

মালতী গঙ্গায় ডুবিতে গিয়া যাহাকে দেখিয়া ফিরিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সে বিপিন। বিপিন আর আপনার দ্বন্দ্ব লইয়া গুহার মধ্যে বন্ধ থাকিতে না পারিয়া সেইদিন প্রত্যূষে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছিল। দেখিল মালতী সেই প্রত্যূষে গঙ্গার ঘাটে যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এত ভোরে মালতী গঙ্গায় যাইতেছিল কেন? তাহাকে দেখিয়া মালতী অমন করিয়া পলায়ন করিল কেন?

আশ্রমে ফিরিয়াই বিপিন শুনিল গুরু তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিতেছেন। বিপিন যে তপস্যা ভঙ্গ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এই লজ্জায় সে আর গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। গুরু তীর্থযাত্রা করিলেন—ওয়েলার জুড়ি ফীটন গাড়ী টানিয়া আশ্রমের উদ্যানের ফটক পার হইয়া গেল।

সূর্য্য উঠিল; বেলা চড়িল। বিপিন স্তব্ধ হইয়া তখনও আপন ঘরে বসি আছে। এমন সময় শা[illegible] ছুটিয়া আসি বলিল—রাধারাণীকে আ[illegible] পাওয়া যা না! আপনি চট কর[illegible] ষ্টেসনে গি গুরুদেবকে খবর দিন!

বিপিনের মাথার মধ্যে [illegible]ক্ষধারা নাগ দোলায় চড়িয়া আকাশ [illegible] একাক করিয়া ঘুরিতে লাগিল, [illegible]াখের সাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাতাণ্ডবে [illegible] হইয়া উঠি কানের মধ্যে হাজার [illegible] ঝঙ্কার বাজি লাগিল; সকল গণ্ডগোলের ম একটি ধ্বনি শুধু সুস্পষ্ট ছিল—মাল আশ্রমে নাই! নাই নাই, সে আশ্র নাই! বিপিনের দৃষ্টি যেখানে তাহা ধরিতে পারে হয় ত সে তেমন জায়গ কোথাও নাই! পৃথিবীতেই আছে কি কে জানে!

বিপিনের মনের মধ্যে আত্মগ্লানি ধিক দিয়া তাহাকে বলিতেছিল—কেন সে সে মালতীর যাহা বলিবার ছিল তাহা শু নাই। কেন সে তাহাকে পদে পদে আঘাত করিয়াই আসিয়াছে। মাল

[illegible]খায় গেল, কেন গেল এ সমস্যার [illegible]াসা কে করিয়া দিবে। জীবনে আর [illegible]নো তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিনা [illegible]বলিবে।...মালতী বাঁচিয়া আছে কিনা [illegible]ারই বা [illegible]ক কি? অমন কূলে কূলে [illegible]জল দীঘি, অমন উচ্ছল-তরঙ্গা জাহ্নবী [illegible]এদের লো[illegible]া গ্রাসের কাছে মালতীর [illegible]র কোমল জীবনটি কতটুকু? এক [illegible]মেষে হয় ত সব শেষ হইয়া গেছে! [illegible] যেন শত[illegible] মালতীকে দেখে নাই। [illegible]হার যুগযু[illegible]রের সঞ্চিত বিরহব্যথা আজ [illegible]কস্মাৎ তা[illegible] অন্তরের মধ্যে ঠেলিয়া [illegible]ঠিয়া তাহার হৃদয় ফাটাইয়া অশ্রুজলে [illegible]হির হইবা[illegible] জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে [illegible]াগিল।

আজকার [illegible]ই দুঃখদারুণ দুর্দ্দিনে তাহার [illegible]াল্যের বন্ধু, পরম নির্ভর নবকিশোরকে [illegible]নে পড়িল, [illegible]র মনে পড়িল তার সেই [illegible]দুঃখী মাকে। আজ তাহার নিরাশ্রয় [illegible]াণ সেই দুটি স্নেহের বন্দরে আশ্রয় [illegible]ইয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য আকুল হইয়া [illegible]ঠিতে লাগিল। যে-সমস্ত আচরণে [illegible]াহাদের স্নেহকোমল প্রাণে সে আঘাত [illegible]রাছে আজ তাহারা সূচীর মতো তীক্ষ্ণ [illegible]তি দিয়া তাহার মনকে বারবার বিদ্ধ [illegible]রিতে লাগিল। আজ সে বুঝিতে লাগিল [illegible]াহার জন্য যে সান্ত্বনা তাহা গুরুর চরণে [illegible]াছে, শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য পুঁথির মধ্যেও [illegible]ছে, তাহা আছে কেবল তাহার বন্ধুর স্নেহ-উদার বক্ষে আর মাতার স্নেহশীতল [illegible]কোড়ে! যে কৃত্রিম গুরুভক্তির উত্তেজনা [illegible]ঠিতরকার মানুষটাকে বন্দী করিয়া তাহার সম্মুখে ধর্ম্মের সঙ্গীন চড়াইয়া পাহারা দিতেছিল, তাহা সরিয়া পড়িবামাত্র ভিতরকার মানুষটা বিপিনকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্ধত হইয়া উঠিল; রাশি রাশি বচন-চাপা হৃদয় আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ ছিল, আজ চরম দুঃখের আঘাতে তাহা অপসৃত হইবামাত্র মুক্ত হৃদয় আপনার চিরকালের সকল সন্তাপহরণ স্নেহ-আশ্রয়ের দিকে ধাবিত হইল। তাহার আর তখন গুরুর রক্তচক্ষু, বা আশ্রমবাসীদের কৌতূহলী দৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ রহিল না, সে তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন সময় তারক তাহার দাঁতগুলি বাহির করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন তাহাকে লক্ষ্যও করিল না। কিন্তু তারক খুব টেঁকসই মানুষ, সে উপেক্ষা অবহেলায় দমিবার পাত্রই নয়। সে হ্যাঁই হ্যাঁই করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিতে লাগিল—কিহে ভায়া? আমরা মনে করছিলাম তোমার বাপ মা তোমাকে বনবাস দিলে, বাস, ঐখানেই দাঁড়ি। তা নয়, মহাকাব্যের কোনো অংশ বাদ পড়বে না; ··· লক্ষ্মণবর্জ্জনটা ত আগেই হয়ে গেছে, এবার সীতা হরণও হল! তারপর আর বাকী কি?

বিপিন একলম্ফে গিয়া তারকের টিকি ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিল—তারপর তাড়কা রাক্ষসী বধ আর হনুমানের মুখ পোড়ানো বাকী আছে।··· বেরো বাঁদর, নইলে তোকে দিয়েই বাকী অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয়ে যাবে।

বিপিন এক ধাক্কায় তারককে ঘর

হইতে বাহিরের দালানে ফেলিয়া দিল। বিপিনের কথা ও কাজের বায়না-স্বরূপ তারক যাহা পাইল তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া ফাউএর প্রত্যাশা না রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়নের উপক্রম করিল।

বিপিন দেখিল তারকের হাত হইতে বারান্দার মার্ব্বেল মেঝের উপর তাহারই একখানি ফটোগ্রাফ পড়িয়া গেল। এই ফটোগ্রাফ তাহার মথুরাপুরের ঘরে ছিল। ইহা এখানে কেমন করিয়া আসিল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বিপিন তাড়াতাড়ি উহা কুড়াইয়া লইয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল, —এ তুমি কোথায় পেলে?

তারক কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল—ঐটেই ত তোমায় দিতে এসেছিলুম। গুরুদেব তীর্থে যাচ্ছেন শুনে সকাল-সকাল তাঁকে প্রণাম করতে এসেছিলুম। এসে দেখলুম গুরুদেব চলে গেছেন, তাঁর ঘরে এইটে পড়ে আছে। শুনলুম এই ছবিখানি বুকে করে নাকি মালতী কাঁদছিল, তাই গুরুদেব তিরস্কার করেছেন, আর সেই রাগে মালতী আজ বেরিয়ে গেছে!

বিপিনের চোখের সম্মুখ হইতে বিশ্ব-চরাচর লুপ্ত হইয়া গেল··· চোখের সম্মুখে কালো অন্ধকারের মধ্যে সবুজ নীল হলদে লাল আলোর কণা বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোল-গোল ডোরা কাটিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার মনের ভিতর এমন একটা বিরুদ্ধ বিপ্লব জমিয়া উঠিল যে সে শূন্যদৃষ্টিতে তারকের দিকে চাহিয়া মর্ম্মর-খোদিত পাগলমূর্ত্তির মতো নিস্পন্দ নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪৫)

ক্ষণেক পরে চেতনা পাইয়া বিপি ছুটিয়া ষ্টেশনে গেল। গিয়া দেখিল ষ্টেশ প্রেমানন্দ বা মালতী কেহ নাই—ভ আছে আফিস-যাত্রী ডেলী-প্যাসেঞ্জার বাবুর ভিড়।

বিপিন নবকিশোরের কাছে যাইবা জন্য টিকিট কিনিয়া গাড়ির আগমনে প্রতীক্ষায় অধীর পদক্ষেপে প্ল্যাটফরমের এ মুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ী আসিল। বিপি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় কামরা হইতে যোগানন্দ নামিয়া আসিয়া বিপিনে কাঁধে হাত দিল। বিপিন পিছন ফিরি যোগানন্দকে দেখিয়া স্তম্ভিত কুণ্ঠিত হই গেল—সে যে অসময়ে তাহার গুহা ছাড়ি আশ্রম হইতে অন্যত্র শান্তির সন্ধা চলিয়াছে। যোগানন্দ তাহাকে সে বিষ কিছুমাত্র প্রশ্ন না করিয়া বলিল—গুরুদে তীর্থে গেলেন, আমি তাঁকে আগিয়ে দি এলাম। রাধারাণী কলকাতা চলে গেছে ·····তুমি যাও, তাঁকে ফিরিয়ে নি এসগে।

বিপিন গাড়ীর পা-দান হইতে পা নাবাইয়া লইল, গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল

যোগানন্দ আর কিছু বলিল না বিপিনের হাত ধরিয়া লইয়া আশ্রমে ফিরিল। বিপিন গম্ভীর নির্ব্বাক; সে আপনার ঘরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন সে মাথা তুলিয়া দেখিল তাহার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া

ছে নবকিশোর ও তাহার পশ্চাতে ঢাকা মালতী। বিপিনের হৃদয় আনন্দে ভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ও মালতীকে এমন অপ্রত্যাশিত রকমে কটে পাইয়া তাহাদিগকে বাহুবেষ্টনে ক চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা হইলেও দারুণ ভিমানে সে স্থির হইয়া বসিয়াই রহিল। নবকিশোর প্রথম কথা কহিল—মালতীর আশ্রমে থাকা বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে; ই খুড়িমার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে আমার কাছে গিয়েছিল—তুমি তখন ায় বসে সন্ধ্যা করছিলে। কিন্তু ওকে শ্রমে এনে তুমি, তোমাকে না বলে ওয়া ওর উচিত নয়, তাই আমি ওকে খতে এসেছি। তুমি ত গুহা থেকে রিয়েছ—তোমার গুরুর অত্যাচার থেকে মালতীকে রক্ষা করতে না পার ওকে ড়িমার কাছে রেখে এসো।

নবকিশোর বিপিনের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মালতী চমুখে অসহায় দাঁড়াইয়া রহিল—সে না ারে থাকিলে, না পারে কোথাও সে াইতে, সে যে এ আশ্রম হইতে পলাইয়া য়া ইহা হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিপিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে াবিতেছিল এই অনুপমা সুন্দরী তাহারই প্রতি অনুরক্ত বলিয়া সে গুরুর শাসনে াঞ্ছিতা। সে আনন্দ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল —মালতী, তুমি দাঁড়াও, আমি শান্তিকে ডেকে দিচ্ছি।

মালতী আসিয়াছে খবর পাইয়াই শান্তি তাড়াতাড়ি আসিতেছিল। বিপিন ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল শান্তি তাড়া-তাড়ি আসিয়া মালতীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এস দিদি এস। আমি আর কখনো তোমায় চোখের আড় করব না। তুমি এস।

মালতী নত হইয়া শান্তিকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল—এমন স্নেহ সে ত মা ছাড়া আর কাহারো কাছে পায় নাই। মালতীর চোখে জল পড়িল।

শান্তি মালতীর চোখ মুছাইয়া তাহাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল; মুগ্ধ বিপিন প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মালতীর মনের মধ্যে জলতরঙ্গের সুরে বিপিনের কথার স্নেহ করুণা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল; যাহার জন্য সে এত সহিতেছে সে তাহার প্রতি একেবারে উদাসীন নহে, এই আশ্বাসে মালতীর অন্তরে প্রণয়প্লাবন দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। গুরুদেব আশ্রমে নাই; পরম নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মনে মালতী শান্তির সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুর ও আশ্রমবাসীর সেবা যত্নে আপনাকে একেবারে নিযুক্ত করিয়া দিল; এতকাল নিশ্চেষ্টতার পরে অকস্মাৎ তাহার নারীপ্রকৃতি ছাড়া পাইয়া নিপুণ সেবা-যত্নে সকলকে পরমাত্মীয় মুগ্ধ করিয়া তুলিল।

বিপিনও বাদ পড়িল না। মালতী নানান কাজের মধ্যে কতবার বিপিনের কাছাকাছি হইত; মালতীর চঞ্চল গতি, কর্ম্মে ব্যস্ততা, কর্ম্মে নিবিষ্ট তাহার সুকুমার কপোলের একটি অংশ, তাহার বসিবার বিশেষ ভঙ্গী, তাহার কপালের উপরকার

কুঞ্চিত স্ফুরিত চুলগুলি—যাহা বিপিন দেখে তাহাতেই তাহার ব্যাকুল চিত্তের মধ্যে তুফান উঠে। কিন্তু বিপিন নিজের হাতে তাহার ও মালতীর মাঝখানে একটা এমন অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছিল যে তাহারা কিছুতেই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছিল না। যেমন একখানা বড় ষ্টিমার যাত্রী লইয়া ঘাটের কাছে আসিয়াও ডাঙায় ভিড়িতে না পারিয়া একবুক আগ্রহ লইয়া ডাঙার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, বিপিনও তেমনি করিয়া মালতীর দিকে তাকাইয়া থাকিত।—কে সে সেতু, কে সে খেয়া নৌকা যে স্রোতের মধ্যগতকে ডাঙার সহিত মিলন করাইয়া দিবে! বিপিন ও মালতীর এখন বহুবার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু দৃষ্টি একবার সম্মিলিত হইয়াই নত হইয়া পড়ে, দুজনেরই চক্ষু কি জানি কিসের অভিমানে ছলছল করিয়া উঠে।

মালতী আশ্রমের পরিচর্য্যার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত আশ্রমের গৃহিণীপনা সম্পন্ন করিয়াও তাহার সময় কাটিতে চাহিত না। আর এই আশ্রমে তাহার থাকিবার হেতুই বা কি? যাহাদের সেবা করিতেছে তাহারা তাহার সেবার কাঙাল নহে; দেবতা বলিয়া যে বিগ্রহের সেবা হয় তাহার প্রতি তাহার ঈশ্বরপ্রত্যয় নাই; সুতরাং এখানে থাকার সার্থকতাই বা কি? মালতীর মনে হইতেছিল এর চেয়ে কোনো দীন আতুরের আশ্রমে সেবিকা হইলে জগতেরও উপকার হইত, তাহারও জীবনের একটা অর্থ মিলিত। এই-সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার কল্পনায় গার্হস্থের এক মোহিনী ছবি ফুটিয়া উঠিত—যেখানে বিপিনকে আর তাহার সন্তানগুলিকে প্রা মন দেহ দিয়া সেবা করিতে পারে এ একখানি প্রণয়পবিত্র স্নেহসরস গৃহে স্থা পাইবার প্রলোভন তাহার বুকের ভিত হইতে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া বাহির করিত।

(৪৬)

এমনই সুখদুঃখ কল্প নিরাশাতে তাহাদের আরো কত দিন কাটি পারিত।

হঠাৎ উৎসব আসিয়া সকলের নিজে ভাবনা ভুলাইয়া দিল। আ দোলপূর্ণিমা তাহার উপর অকস্মাৎ গু তীর্থ হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছে তাই আজ সমস্ত দিন আশ্রমে উৎ চলিয়াছে। আবিরের ধূলায় পথ ঘাট দুয়ার আজ লালে লাল; শ্বেত পাথরে স্বচ্ছ মেঝের আবিরের ছোপ যেন উষার আকাশের মতো সুন্দর দেখাইতেছিল। আজ সকলের গৈরিক বাসের উপর আবিরের লালিমা দিবস-প্রারম্ভের ন্যায় লোহিতপীত শোভা ধারণ করিয়াছিল। সব চেয়ে সুন্দর দেখাইতেছিল আজ মালতীকে। রক্তচন্দন-লিপ্ত শ্বেতপদ্মকোরকের ন্যায়, নবোদ্গত-কিশলয়শোভিতা লতার ন্যায়, কন্দর্পের কুসুমকার্ম্মুকের ন্যায় সেই কুশমধ্যমাকে আজ চমৎকার দেখাইতেছিল। আবিরের রক্তরাগ লোহিততর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার লজ্জার অরুণিমায়। আজ তাহার ও বিপিনের দৃষ্টি আবিরভরা কুমকুমের মতো কতবার

লিত হইয়াছে, প্রাণের মধ্যে তাহাদের গ্র বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, যে ড়ে রঙে প্রিয়জনকে রঙাইয়া তোলা যায় য়া ফাটিয়া পড়িতে চাহিয়াছে, কিন্তু জ্জায় বাধিয়াছে, শুধু নিজেরাই নিজেদের াণের রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে।

এমনি করিয়া সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যা ইতে না হইতে পশ্চিমদিকের আকাশে াবির ছড়াইয়া সূর্য্য আকাশের অপর প্রান্তে সহস্রকর বুলাইয়া চুম্বন করিল, মনি সে একটার আকাশও জাফরান-ড়ায়-মেশানো আবির মাখিয়া কমলারঙে রিয়া উঠিল।

যখন বিতায়মান জ্যোৎস্না আকাশ রিয়া সোনারূপায়-বোনা চন্দ্রাতপ ছড়াইয়া ল, যখন কোকিল পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া ন্ধপরশ দক্ষিণা হাওয়া মথিয়া তুলিল, খন বকুল চাঁপার গাছগুলি ফুলের নেশায় াতিয়া উঠিল, তখন তালীকুঞ্জের পাশে পক্ষেত্রে অবিররাঙা লালজলের ফোয়ারার ারে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে লইয়া প্রেমানন্দ োলির গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সে গান প্রথমে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে চিত্ত উদ্বোধিত করিয়া প্রকৃতির ভাষার মতো ধ্বনিত হইতে লাগিল—

কুসুম ভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবে মধুকরী মধুকর বোল॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
দুঁহুজন আরতি চন্দন-বায়॥
পুণমিক রাতি মোহন ঋতুরাজ।
বিদগধী বিদগধ মিলন সমাজ॥

তার পর বাহির হইতে আনন্দহিল্লোল যখন হৃদয় স্পর্শ করিল, তখন গুরু অন্তর-ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন—

আবিরে অবশ সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়।
বন্ধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহ না দেখিতে পায়॥
চপল নয়ন পিচকারি যেন
নিরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগ ফাগু ভরল
তনু মন করি ভোর॥

গানের উত্তেজনায় ভাব যখন আকার পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল তখন সেই সুদূর বৃন্দাবনের চিরন্তন নরনারীর প্রণয়-লীলার ভিতর দিয়া বৈষ্ণব কবির কণ্ঠস্বরে নিজের হৃদয়ভাব ঢালিয়া দিয়া গুরু গাহিতে লাগিলেন—

খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ-মনমথ ছান্দ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী-নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে॥

এইরূপে মানবহৃদয়ের সুপ্ত লালসার পিঠে গানের চাবুক মারিয়া মারিয়া গুরুজীর উৎসব-রথ খুব বিজয়গর্ব্বেই অনেক রাত পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল।

গুরু ক্লান্ত হইয়া থামিলে শিষ্যগণ গান ধরিতেছিল, শিষ্যগণ থামিলে গুরু গান ধরিতেছিলেন, আসর জুড়াইতে পাইতেছিল না। সকলেই আজ যেন মধুমত্ত।

মালতী সেখানে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। যখন সকলে কীর্ত্তনে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে সকলের অজ্ঞাতসারে সেখান হইতে উঠিয়া নির্জ্জনে আসিল। সে একবার

মাথার উপর চাহিল, তাহার মনে হইল আকাশখানি যেন প্রকাণ্ড একখানি মুক্তা-জননী শুক্তিপুটের মতো গোলাপি নেশায় বিভোর হইয়া আছে। আকাশে যেন হিমস্পর্শ আগুন লাগিয়াছে। একটা বাদুড় মাথার উপর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছিল, যেন মাধবী যামিনীর ফুলশয্যার জন্য রূপালি-সোনালি জ্যোৎস্নার টানায় অন্ধকারের পোড়েন বুনিতেছিল, যেন নিশার অন্ধকার সঙ্কুচিত হইয়া ঝোপ ঝাড়ের আড়াল হইতে একটুকরা দূতকে আজিকার এই আলোক-উৎসব দেখিতে পাঠাইয়াছে। তরুলতাও আজ প্রবালকান্তি কিশলয়ে সাজিয়া, ভ্রমর-গুঞ্জনে প্রলাপ বকিয়া, দক্ষিণা হাওয়ায় টলিয়া টলিয়া উৎসবমত্ত মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

আজকার উচ্ছল জ্যোৎস্না, আম্রমুকুলের মদিরগন্ধ, আর উতলা-করা দক্ষিণা হাওয়া যেন তাহার প্রাণের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার অন্তর বাহির রসাবেশে আপ্লুত করিয়া তুলিতেছিল। আজকার এই রাত্রিটি যেন তাহার সমস্ত জীবনের আনন্দঘন মূর্ত্তি ধরিয়া অমৃতনির্য্যাসের মতো দেখা দিয়াছে... আজকার রাত্রি ব্যর্থ যাওয়া যেন সমস্ত জীবনটার ব্যর্থতা। তাহার মনে হইতেছিল আজকার এই মধুনিশা নেশার মতো ভালবাসায় ডুবিয়া যাইবার রাত···এরাত শুধু প্রাণ খুলিয়া ভালো বাসিবার আর প্রাণভরা ভালোবাসা পাইবার। এই নিঃশব্দ শুভরাত্রি যেন কিংখাবের ফরাশ বিছাইয়া তাহারই মতো বিরহিনীর বেশে জাগিয়া জাগিয়া কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—মাধবী নিশার এই পরিপূর্ণ বাসকসজ্জা মাঝখানে যেদিনে কাঠেরও প্রাণ করিয়া শোণিত-রাঙা পল্লবের রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিতেছে, গন্ধপাগল ফুলের ঠিকঠিকানা থাকিতেছে না, সেদিনে মানুষের প্রাণ করিয়া প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। মালতী নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না তাহার অন্তর ভেদ করিয়া রক্তচোয়ানো অশ্রু চোখ চিরিয়া বাহির হইবার আকুলিবিকুলি করিতেছিল। সে আস্তে আস্তে গঙ্গার ঘাটে গেল। সেখানেও পাথরের উপর জ্যোৎস্নার সোনালি গঙ্গার অভ্ররজত স্রোতের উপর চন্দ্রবিম্বে সোনালি প্রতিচ্ছায়া, ওপারে অদৃশ্য নৌকা সোনালি আলোক-বিন্দুর স্পন্দন, তাহার প্রাণের সমস্ত সৌন্দর্য্যরসকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। তাহার ব্যর্থ যৌবনশ্রী আজ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে তাহার ললিত অঙ্গে তাহার ভ্রমর-কালো চোখের আড়ালে তাহার সদাস্মিত শান্ত দৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়া উঠিল—এবং মালতী এই আকস্মিক আবির্ভাব অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। মালতী শ্বেত পাথরের সোপানে সোপানে আবিররাঙা পায়ের দাগ রাখিয়া প্রায় জলের ধারে গিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

আজ বিপিনের চিত্তও নিশ্চিন্ত ছিল না। কোনো কল্পবৃন্দাবনের কল্পিত নরনারীর রসসম্ভোগের মধ্যে সে আপনারই বাঞ্ছিত চরিতার্থতার সম্ভাবনা অনুভব করিতেছিল। উন্মাদনা যখন চরম হইয়া উঠিতেছিল

তখন সে মনে করিতেছিল, আর নয়, এ জীবন আর নয়। আজ সে গুরুকে আপনার অক্ষমতা নিবেদন করিয়া এই প্রবাসের পথ হইতে চিরজন্মের জন্য বিদায় লইবে, মালতীকে আজ গভীর-দুঃখে-যাচাই-করা খাঁটি প্রাণ দান করিয়া সে সুখী হইবে। যে রমণীকে প্রথম দর্শনের দিনেই বরণ করিয়াছিল, যাহাকে প্রত্যেকবারই সে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে এখনই সেই বাঞ্ছিতা বিচিত্র ঘটনাসংঘাতে তাহার দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই দুর্লভ প্রেয়সী নারীকে আজকার এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যরসের মাঝখানে একেবারে আপনার করিবার আনন্দ তাহার বুকের মধ্যে মহোদধির মতো ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আজ সকল সঙ্কোচ ভুলিয়া সেই প্রেয়সীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে এবং এজন্মে কোনো অপরাধের বরণর আর বাধা হইবে না,—এই চিন্তার সুখে ও সুখে, অধৈর্য্যে ও আশায় বিপিনের অন্তর-বীণার সমস্ত তারগুলি বিচিত্র রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এতক্ষণ মাথা নত করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। গান বন্ধ হইবামাত্র সে পুলকপূর্ণ দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিতে গেল, কিন্তু দেখিল মালতী সেখানে নাই, গীতসভার অদূরে দাঁড়াইয়া আছে নবকিশোর ও তাহার দু-পাশে দুহাত ধরিয়া বিনোদ ও বিনি।

বিপিন গুরু ভুলিয়া, গীতসভা ভুলিয়া, আশ্রম ভুলিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া গিয়া বাহুবেষ্টনে বিনোদ ও বিনিকে একসঙ্গে বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বনের পর চুম্বন করিতে লাগিল। তাহার অন্তরে সঞ্চিত যে ভাবরাশি প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দীর্ঘ অদর্শনের পর ভাই-বোনদের বুকে পাইয়া অশ্রুপ্লাবনে মুক্তি পাইয়া বাঁচিল। নবকিশোর বিপিনের কাঁধে হাত রাখিয়া বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—তোমার বাবার খুব অসুখ; মা তোমায় নিতে এসেছেন; বাগানের বাইরে গাড়ীতে আছেন।

বিনোদ ও বিনিকে দুই হাতে দুই কোলে উঠাইয়া বিপিন ছুটিয়া চলিল মায়ের কোলে এতদিন পরে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিতে। বিপিন গাড়ীর দরজা খুলিয়া মায়ের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, গিন্নি দুই হাতে পরিত্যক্ত পুত্রকে তুলিয়া ধরিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া অশ্রুধৌত চুম্বনে এতদিনকার সকল গ্লানি মোচন করিয়া ফেলিলেন।

ক্ষণেক নীরব ক্রন্দনের পর গিন্নি অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—বিপিন, উনি আর এ যাত্রা রক্ষা পাবেন না; তোকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন; যা, বৌমাকে ডেকে নিয়ে আয়, এই গাড়ীতেই আমি তোদের নিয়ে তবে ফিরব।

বিপিন মায়ের আদেশে প্রফুল্ল অন্তরে মালতীকে ডাকিবার জন্য বালকের মতো ছুটিয়া আশ্রমে ফিরিল। কিন্তু গীতসভার কাছাকাছি হইয়া তাহার অত্যন্ত লজ্জা হইতে লাগিল, কেমন করিয়া সে গুরুর নিকটে বিদায় লইবে, কেমন করিয়া সে অপর সন্ন্যাসীদের দৃষ্টির ধিক্কার সহ্য করিবে।

বিপিন যতই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল তাহার গতি ততই মন্থর ও মন ততই কুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

অনেক বাঁকা পথে ঘুরিয়া অনেক ইতস্তত করিয়া বিপিন যখন গীতসভায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল যে গীতসভায় মালতীও নাই, গুরুও নাই। বিপিন আনন্দিত হইল—নির্জ্জনে গুরুর নিকটে বিদায় লইয়া মালতীকে চুপিচুপি ডাকিয়া লইয়া সে মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

বিপিন আশ্রমবাটিকার ঘরে ঘরে খুঁজিল, কোথাও গুরু বা মালতী নাই। তালীবন, লতাবিতান ঘুরিয়া বিপিন গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিল। দূর হইতে দেখিতে পাইল গুরু ধীরে ধীরে সোপানে অবতরণ করিতেছেন। বিপিন লজ্জিত কুণ্ঠিত হৃদয়ে গুরুর কাছে বিদায় লইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির চাতালে আসিয়া দাঁড়াইয়া বিপিন দেখিল মালতী দুই পা জলে ডুবাইয়া সিঁড়ির একটা ধাপে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে, আর ক্রন্দনাবেগে তাহার দেহখানি রূপের ঢেউটির মতন আন্দোলিত হইতেছে; এবং তাহারই চরণস্পর্শে গঙ্গাস্রোত একগাছি বড় রূপালি তাবিজের মতন কুঞ্চিত হইয়া শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। জ্যোৎস্নার আলিঙ্গন-বদ্ধা রূপসীর ক্রন্দন দেখিতে দেখিতে প্রেমানন্দ এক পা এক পা করিয়া ধাপের পর ধাপ নামিয়া ক্রমে ক্রমে একেবারে মালতীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন—গঙ্গার কলধ্বনি ও নিজের ক্রন্দনশব্দে প্রেমানন্দের ধীর পদশব্দ শুনিতে পাই

প্রেমানন্দ নত হইয়া ধীরে ধীরে হাত মালতীর দুই কাঁধে রাখিলেন। চকিত চমকিত হইয়া ঝটিতি দুই হা দৃষ্টির উপর হইতে অশ্রুজাল অপসৃত চাহিয়া দেখিল—প্রেমানন্দ একেবারে মুখের কাছে অবনত হ আসি মালতী চীৎকার করিয়া হাতে ত জোরে ঠেলিয়া দিয়া গঙ্গা জলে হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল দেখিল চাতালের উপ বিপিন নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মতো ড়াইয়া

মালতীর মুখ আনন্দে হইয়া —দেখুক, বিপিন দেখু তাহার আচরণ! কিন্তু পরক্ষ তাহার বিবর্ণ হইয়া উঠিল, বি যদি তা ভুল বুঝে! এই আশঙ্কা তাহার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা কল্পনা এক আঘাতে ভঙ্গুর পাত্রের ঝমঝম করিয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া তাহার প্রাণের মধ্যে শ্মশানের হাহা দারুণ অট্টরোলে তাহাকে বধির তুলিল। আজিকার আকণ্ঠভরা জো কালি ঢালিয়া দিয়া বসন্তরাত্রির সুধারস এক নিমিষে উবিয়া গেল। কেয়ারি-করা বাগান, সেই মার্ব্বেল পা স্বচ্ছ নির্ম্মল ঘাট, সমস্তই আজ অসু গঙ্গার জল শাণিত ইস্পাতের তরব মতো তাহার সমস্ত আশা উদ্যম ছিন্ন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে এতকালের এত অপেক্ষা, এত আকা

ধনা সমস্ত আজ নিষ্ফল। সে ব্যর্থতার মধ্যে আমরণ ডুবিয়া আর নির্ম্মম বিচারক বিপিন ছিল তার চেয়েও দূরে সরিয়া াহাকে ভুল বিচার করিবে! মাল- ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে বুক দিয়া যে পাথর সরাইতে চেষ্টা ছিল, সেই পাথরে বুকের সমস্ত বল পিষিয়া গিয়া শুধু রক্তপাতই সার হইল, সেই কঠিন পাথর পরিমাণও সরিয়া বসিল না। কী র্থতা! ওঃ এ কী ভীষণ পরিণাম! ধরিয়া দুরাশার গোড়াতেই কি য়ের রক্ত সেচন করিল শুধু নিষ্ফ- াইবার জন্য! হায় হায় এ কি এ কি দুঃখ, এ কি নিষ্ঠুর নিয়তি!

প্রেমানন্দ মালতীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল সোপানের উপরে বিপিন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন তিনিও লজ্জায় আড়ষ্ট অভিভূত হইয়া ন। তাঁহার একবার মনে হইল ীর অতল গর্ভে তাঁহার নিতল নীচ- কল লজ্জাগ্লানি ডুবাইয়া দিবেন। কিন্তু অগ্রে ও পশ্চাতে যুগল বিচারকের ণ্ডবিধান না শুনিয়া মরিতেও তাঁহার ফুলাইতেছিল না। তিনি বজ্রাহতের নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিপিন গুরুকে গ্রাহ্যমাত্র না করিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—মালতী, এস, ামাদের নিতে এসেছেন। আজ ের বিবাহরাত্রি!

বিপিনের বাক্যে মালতীর সর্ব্বাঙ্গে মূর্চ্ছা সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এ কি স্বপ্ন, না মোহ, না মতিভ্রম! এ যে বিশ্বাসেরও বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না! এত সৌভাগ্য কি তাহার! স্রোতের ফুল কি এতদিনে কূল পাইল!

মালতীর মনে হইতে লাগিল যেন চন্দ্রলোক হইতে সুরগায়কেরা অমৃতধারা ঢালিয়া গাহিতেছে বিবাহরাত্রির অভিনন্দন। —তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ জল স্থল আকাশ মধুময়! অন্তরীক্ষ বায়ু মধুময়! পত্র পুষ্প মধুময়! পৃথিবীর ধূলি পর্য্যন্ত আজ মধুময়! ভগবান কি দুঃখকে চরমে তোলেন সুখকে এমনি পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগ করাইবার জন্য? মালতী মনে মনে সকল ভয়ের ভয় ও সকল প্রাণীর গতি যিনি অন্তরদেবতা তাঁহাকে একইকালে দুঃখবিধাতা ও সুখবিধাতা জানিয়া মনে মনে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। সে আনন্দবাহুল্যে বিপিনের দিকে চাহিতেও পারিল না। তাহার সমস্ত হৃদয় আনন্দের অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল।

প্রেমানন্দ এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—বিপিনবাবু, মালতী, আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা পেলাম যে গুরু হওয়া মানুষের সাজে না। আমার গুরুগিরির আজ এই শেষ। আমি এখনই আমরণ তীর্থপর্য্যটনে চল্লাম। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সমাপ্ত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবঘুরে

(নাটিকা)

দৃশ্য ঃ—কুটীরস্থ প্রাঙ্গনে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। নিকটেই একটি বালক খেলা করিতেছে।

বালক।—মা, আজকে তুমি এ ঘরগুলো এমন করে সাজাচ্ছ কেন?

মা।—আজকের দিন যে আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন বাবা!

বালক।—কেন মা?

মা।—সাত বছর আগে ঠিক এই দিনে তারা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল,—আমি তাদের বাড়ীর দাসী ছিলুম।

বালক।—সত্যি? সে বাড়ী কোথায় মা?

মা।—সে অনেক দূরে বাবা!—তার কাছেই একটা ছোট পাহাড় ছিল—লোকে সেটাকে সোনার পাহাড় বল্‌ত।

বালক।—সোনার পাহাড়! বাঃ! তা'লে জায়গাটা কি চমৎকার!

মা।—হ্যাঁ বাবা, জায়গাটি চমৎকার বটে। কিন্তু আমি যখন পথে বসলুম তখন শীতের কন্‌কনে হাওয়া বইচে। সেই দারুণ শীতে আমার কোনো আশ্রয় ছিল না। কতকগুলো লোক আমার নামে লাগালে তাইতেই তারা আমাকে তাড়িয়ে দিলে—তুমি তখন খুব ছোট—তোমাকে বুকে করে আমি রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

বালক।—(নিকটে আসিয়া) সত্যি শীতে তোমার খুব কষ্ট হ'ল?

মা।—কষ্ট হয়েছিল বৈকি বাবা! কি কি করব বল? তোমাকে নিয়ে আমি কো ঠাণ্ডায় খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে চল্‌তে লাগলুম। শীতে আমার সর্ব্ব গা একেবারে হিম হয়ে গেল—তোমার ছোট্ট শরীর নী হয়ে উঠল। আমি কত লোকের পায়ে কাছে কেঁদে পড়ে বল্লুম—"আজ আজ রাতে মতন আমার বাছাটিকে একটু থাক্‌বা ঠাঁই দাও, ওর তো কোনো অপরাধ নেই! আমি না-হয় রাস্তায় পড়ে থাকি!" কি কেউ সে কথা কানে নিলে না। আমি ছুটে ছুটে বীরপুর পর্য্যন্ত গেলুম...

বালক। অ্যাঁ, বীরপুর? সে কাছেই। ঐ যে খাবারওয়ালা এখানে খাবার বেচতে আসে, সে বলে তার বাড়ী সেইখানে।

মা।—তা হবে। কিন্তু সেদিন কারু দরজা খোলা পাইনি। রাত্তির অনেক হয়েছে—যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে! আমার পা আর চল্ল না, আমি রাস্তার ধারে পাথরের উপর ঘুরে পড়ে গেলুম।

বালক।—আমিও যে একবার পাথরের উপর পড়ে গিয়েছিলুম...আমার পা ভেঙে গিয়েছিল—এই দেখনা!

মা।—পড়ে গিয়ে আমি তোমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলুম। খানিকক্ষণ পরে

অন্ধকারে দেখ্‌লুম একজন লম্বা লোক আমার দিকে আস্‌ছেন। সেই ভয়ানক অন্ধকারেও আমি তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম। তাঁর হাতে একটি মালা দেখেছিলুম,—সে মালাটি যেন এখনও আমার চোখের সামনে রয়েচে।

বালক।—সে কে মা?

মা।—তা তো জানিনে বাবা! তাঁকে আমি কেবল সেই একদিন মাত্র দেখেছিলুম, তার পর আর কখনও দেখি নি। তিনি আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে তুলে বল্লেন "ঐ সাম্‌নের রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলে একটি বাড়ী পাবে, সেখানে যাও। সেখানে তুমি থাকবার জায়গা পাবে।"

বালক।—তারপর?

মা।—তার পর আমি তাঁকে আর দেখ্‌তে পেলুম না। আস্তে আস্তে উঠে আমি এখানে চলে এলুম। এ বাড়ীতে তখন একটি বুড়ো থাকতেন। তিনি আমাকে আদর করে ঘরে এনে বসালেন...আমি তাঁকে আমার দুঃখের কাহিনী বল্লুম—তিনি সব শুনে আমাকে এই বাড়ীতেই থাকতে বল্লেন...তারপর তিনি মারা যাবার সময় আমাকে এই বাড়ীটা দিয়ে গেলেন।

বালক।—মা, সেই লোকটি আবার কবে আসবে?

মা।—তা তো জানিনে বাবা! তিনি বলেছিলেন আবার দেখা হবে, কিন্তু কবে তা তো ঠিক করে বলেন নি; তাঁর অপেক্ষায় তো আছি। কতবছর ধরে আজকের দিনে ঘর সাজিয়েছি, কতবার রাত্তির বেলা দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখেছি...কিন্তু কৈ তাঁর দেখা তো এখনো পেলুম না!

বালক।—মা, তিনি এলে যদি আমি ঘুমিয়ে থাকি, তবে আমায় জাগিয়ে দিও। আমি তাঁকে দেখব।

মা।—আচ্ছা দেব। কিন্তু এখন তুমি কোথাও যেও না, লক্ষ্মীটির মতন ঘরে বসে থাকো—বুঝেছ, আমি পাশের বাড়ী থেকে এখুনি আস্‌ছি।

বালক।—আমি ঐ গাছটার কাছ পর্য্যন্ত যাব মা? ঐখানটিতে খেল্‌তে আমার বড় ভাল লাগে।

মা।—না বাবা, তুমি ঘর থেকে বেরিও না। আজ সকাল থেকে নদীটা কেমন ডাকছে। আমার কেমন ভয় হয়,—বাইরে বেরিয়ে পাছে তুমি নদীর ধারে গিয়ে পড়! আমি এখুনি ফিরে আস্‌ব।

বালক।—আচ্ছা মা, আমি এখানেই বসে-বসে খেলব। তুমি কিন্তু বেশী দেরী করো না।

মা।—না আমি এখুনি আস্‌ব।

[প্রস্থান]

বালক।—(কতকগুলি গাছের ডাল লইয়া ভাঙিতে ভাঙিতে) একটা...দুটো ...ওঃ এটা কি শক্ত...এটা আবার ভিজে, ...তিন্‌টে...পাঁচটা হলেই চলবে...একটা ছোট কেল্লা তৈরি করতে হবে...এবার ঐ বড় ডালটা ভাঙা যাক্‌...ওঃ কি শক্ত! আমি পারব না...না...

(দরজা খুলিয়া একটি লোকের প্রবেশ। পা খালি, কাপড়ে কাদা মাখা—গায়ে কাপড় নাই। বালক কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।)

বালক।—কে তুমি?

লোক।—আমি ভবঘুরে।

বালক।—ভবঘুরে! সে আবার কি?

লোক।—আমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই।

বালক।—ওঃ তুমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াও? তাহলে তুমি সোনার পাহাড় দেখেছো?

লোক।—দেখেছি বৈকি! সেইখান থেকেই ত আস্‌ছি। তাই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি এখানে একটু বস্‌তে চাই।

বালক।—বেশ বেশ, তুমি এখানে আমার কাছে বোস। আমি তোমার কাছ থেকে সোনার পাহাড়ের গল্প শুন্‌ব।

লোক।—(বসিয়া) বেশ। সোনার পাহাড়? সে একেবারে সোনার পাহাড়! তার মাঝখানটিতে একটি সুন্দর বাগান আছে—সেখানকার গাছে কেবল ফুল আর ফল!

বালক।—আর কি আছে?

লোক।—আর?—কত রঙের যে পাখী! লোকে সেখানে পূজো দিতে যায়। চারদিকে উঁচু উঁচু পাঁচিল দিয়ে বাগানটা ঘেরা।

বালক।—পাঁচিল দিয়ে ঘেরা? তবে লোকেরা কি করে তার ভিতর যায়?

লোক।—বাগানের চারটে বড় বড় দরজা আছে—একটা সোনার, একটা রূপোর, একটা পিতলের আর একটা পাথরের।

বালক।—আচ্ছা আমরা এই কাঠি-গুলো দিয়ে একটা বাগান তৈরি করি এস।

লোক।—আচ্ছা, বেশ।

(উভয়ে কাঠি দিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে লাগিল।)

বালক।—সোনার পাহাড়ের বাগানে আর কি আছে?

লোক।—সেখানে চারটে বড় বড় পুকুর আছে—তার জল পরিষ্কার—তক্‌-তক্‌ করচে—একেবারে তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। কত রকমের রঙিন মাছ সেখানে খেলে বেড়াচ্চে।

বালক।—আমাকে ঐ [illegible] থেকে মাটির পেয়ালাগুলো পেড়ে [illegible] না—আমি ঐগুলো দিয়ে পুকুর তৈরি [illegible]

(লোকের তথাকরণ)

লোক।—বাঃ এখন [illegible] বাগান হয়েছে।

বালক।—আচ্ছা, কি করে আমরা সোনার পাহাড়ের কাছে যাবো?

লোক।—কেন আমার ঘোড়ায় চোড়ে যাবো।

বালক।—আমাদের [illegible] ঘোড়া নেই।

লোক।—আমি তোমাকে ঘোড়া এখনি দেব। এখনকার মতন তুমি আমার পিঠে চড়—আমি তোমার ঘোড়া হই।

বালক।—বাহবা, সে বেশ মজা হবে।

(বালক লোকটির পিঠে চড়িল)

লোক

গান।

আমি তোমায় নিয়ে যাব
কত দূরের সেই অজানা দেশে...

[বালকের মাতার প্রবেশ। লোকটি গান বন্ধ করিল]

মা।—[লোকের দিকে কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ-ভাবে চাহিয়া বালককে কোলে উঠাইয়া লইয়া] তুমি কি রকম লোক গা? এই রকম করে ঘরের ভিতরে এসে ছেলের গায়ে হাত দাও? তোমার আস্পর্দ্ধা ত' কম নয়। যাও—এখুনি বেরিয়ে যাও!

বালক।—ওকে তাড়িয়ে দিও না মা! বেশ লোক। আমাকে কতরকম গল্প বল্লে—আমার ঘোড়া হয়ে কেমন খেল্‌ছিল।

মা।—তোমার সঙ্গে খেল্‌ছিল? ওকি তোমার সমবয়সী লোক বাছা? দেখদিকি, তোমার কাপড় খানায় কি রকম ধূলো কাদা লাগিয়ে দিয়েছে—তোমার কি কিছু আক্কেল নেই বাপু—[illegible], এখনও বল্‌ছি যাও—

বালক।—[illegible] অনেক দূর থেকে আস্‌ছে [illegible], আজকের মতন ওকে ওখানে থাক্‌তে দাও।

লোক।—হাঁ বাছা, আজকের মতন আমাকে থাকতে দাও—আমি বড় ক্লান্ত।

মা।—তুমি কতদূর থেকে আস্‌ছ গা?

লোক।—অনেক দূর, এই নদী যেখানে শেষ হয়েছে—সেইখান থেকে—সোনার পাহাড়ের কাছ থেকে। গ্রামে আমাকে কেউ থাক্‌বার জায়গা দিলে না—তাই ঘুরতে ঘুরতে শেষটা এখানে এসেছি—

মা।—না বাপু, এখানে তোমার থাকা হবে না—আমার এখানে অন্য লোক আসবেন—এখানে জায়গা হবেনা। সহর এখান থেকে ত বেশী দূর নয়। সেইখানে যাও না।

বালক।—মা, দেখ আমরা একটা কেমন বাগান তৈরী করেছি।

মা।—আমার এই সব পেয়ালাগুলো কে নাবালে? আমি তোমাকে বুঝি বসে-বসে এই করতে বলে গিয়েছিলুম?

(বালককে চপেটাঘাত)

লোক।—(অগ্রসর হইয়া) আহা, মেরোনা, ওর কিছু দোষ নেই, ও-সব আমিই ওকে পেড়ে দিয়েছি?

মা।—তুমিই দিয়েছ? ভারি কাজই করেছ! তোমার এসবে কি দরকার ছিল বাপু? এ ভদ্রলোকের বাড়ী—তোমার মতন বদমাস্‌দের তো আড্ডা নয়—এখান থেকে যাও, বেরোও বলছি, এখানে তোমার কিছুতেই থাকা হবে না—

লোক।—আচ্ছা তাই যাচ্ছি বাছা! আমার দুঃখ নেই, আমাকে প্রায়ই রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাতে হয়, লোকের বাড়ীতে আশ্রয় আমার ভাগ্যে খুব কমই ঘটে।

মা।—তার আর আশ্চর্য্যটা কি?—তোমার মত লোককে বাড়ীতে কে আশ্রয় দেবে বল? তোমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাও—যত রাজ্যের মাতাল, বদমাস্‌, চোর—

লোক।—ঠিক বলেছ। যত রাজ্যের মাতাল বদমাস্‌ আর চোরই আমার বন্ধু—আমি তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে থাকি—তোমরা যাদের ঘৃণা কর, যাদের তোমরা ঠাঁই দাও না, না খেতে পেয়ে যারা মরে—যত অভাগা, পতিতা—সকলেই আমার সঙ্গী—যত গরীব, যত পাগল, যত খারাপ লোক, আমারই সঙ্গে তারা থাকে।

মা।—আচ্ছা, খুব বক্তৃতা হয়েছে—এখন

যাও, তোমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাও—যাও বল্‌ছি! এখুনি যাও, নইলে—

(ধীরে ধীরে লোকটি চলিয়া গেল)

কোথাকার হতভাগা লোক এসে আমার সমস্ত জিনিষ একেবারে ওলট্ পালট্ করে দিয়ে গেল। দেখ দিকিনি, ঘরে একরাশ ধূলো জমে গেছে—

(জিনিষগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল)

বালক।—(ভূমি হইতে একটি মালা তুলিয়া লইয়া স্বগত) এটা নিশ্চয়ই সেই ভবঘুরে ফেলে গেছে। ওটাত এখানে ছিল না .....যাই, এটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

(মায়ের অলক্ষ্যে বালক কাপড়ের ভিতরে মালা লইয়া বাহির হইয়া গেল।)

মা।—আমার এই ভাল ভাল চক্‌চকে তক্‌তকে পেয়ালাগুলোকে কি-রকম যাচ্ছেতাই নোঙরা করে দিয়ে গেছে...আমার সব খারাপ করে দিলে—মাগো, দেখে আমার কান্না পাচ্চে!

বালক।—(ফিরিয়া আসিয়া) না, ভবঘুরে চলে গেছে, তাকে খুঁজে পেলুম না।

মা।—কাকে খুঁজে পেলি না?

বালক।—ভবঘুরেকে।

মা।—সে কে?

বালক।—ওই যে ঐ লোকটা, যাকে তুমি এখুনি তাড়িয়ে দিলে! ও বল্লে ওর নাম ভবঘুরে—ও খালি ঘুরে-ঘুরেই বেড়ায়।

মা।—সে হতভাগাকে খুঁজতে গেলি কেন?

বালক।—সে যে এই মালাটা ফেলে গেছে, তাই আমি তাকে ওটা ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলুম! সে বোধ হয় অনেক দূর চলে গেছে মা,—আমি তাকে দেখতে পেলুম না। অন্ধকার হয়ে এল।

মা।—দেখি দেখি, কি মালা!

বালক।—(কাপড়ের ভিতর হইতে মালা বাহির করিয়া) এই!

মা।—অ্যাঁ! এ ত সেই মালা!

বালক।—কোন্ মালা?

মা।—এ সেই মালা—এ সেই মালা! এ মালা আমি ভুলিনি! তবে তিনি এসেছিলেন! আমি অভা[গী] তাঁকে চিন্‌তে পারলুম না—চিন্‌তে পারলুম না! এ আমি কি করলুম—তাঁর-দেবতার ঘর থেকে তাঁকেই তাড়িয়ে দিলুম! আমার দুয়ারে এসে তিনি ফিরে গেলেন—আমি তাঁকে এই ঘরে বসাতে পারলুম না। পোড়া মন আমার এই মাটির জিনিষগুলো নিয়ে মেতে রইল—ওরই পানে চেয়ে রইল—আর মুখের দিকে একবার চাইলে না। দূর হোক্! এ ছাই জিনিষ! দূর হোক্!

(বলিতে বলিতে জিনিষগুলি ভূতলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল)*

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

* বিদেশী নাটিকার ভাবানুসরণে।

হৃদয়ের বিকাশ

হৃদয় কথাটি একদিকে অতি সহজ। কিন্তু অপর দিকে ইহা তেমনই অতীব জটিল। সেই জটিলতার সরলতা সম্পাদনের জন্যই আমাদের উপস্থিত প্রয়াস।

আমাদের শরীরে রক্তের আধার যে একটী যন্ত্র আছে তাহাকেই সাধারণতঃ হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড বলা হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে এই হৃদয়ের বিকাশ হইতে বহু সময় লাগিয়াছে। ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যতেই তাহার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে। ইতর প্রাণীতে যে হৃদযন্ত্র কেবল যে অপরিণত তাহা নহে কোন কোন ইতর প্রাণীতে ইহার সম্পূর্ণ অভাবই পরিদৃষ্ট হয়। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা পতঙ্গ-জাতিতে হৃদযন্ত্রের প্রথম সূচনা-মাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। (১) পশু পক্ষী মনুষ্য মাত্রেই হৃদযন্ত্রের প্রকৃত পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে হৃদযন্ত্রের পরিণতির সঙ্গে যে প্রাণীদিগের বিকাশের একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ নিম্নতম জীব-শ্রেণীতে হৃদযন্ত্রের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি উচ্চতর মেরুদণ্ডী জীব মৎস্য-জাতিতেও ইহার অঙ্কুরাবস্থামাত্র দেখা যায়। (২)

আমরা হৃদযন্ত্রকে রক্তের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। সুতরাং রক্তের পরিণামের সহিতই যে ইহার সম্বন্ধ হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। দেহগঠনে আমরা রস ও রক্তকেই মূল উপাদানরূপে দেখিতে পাই। ইহা হইতে আমরা রসজীবী দেহ ও রক্তজীবী দেহ—দেহের এই দুই প্রকারের বিভাগ প্রাপ্ত হইতে পারি। উদ্ভিজ্জাদি যে রস দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া জীবিত থাকে তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। নিম্নতম জীবের মধ্যেও দেহের প্রধান উপাদানরূপে একমাত্র রসকেই বিদ্যমান দেখা যায়—তাহাতে রক্তের কোনও সম্পর্কই দেখিতে পাওয়া যায় না। কীটাদি ক্ষুদ্রতম জীব এই শ্রেণীভুক্ত। উদ্ভিজ্জাদির সহিত জীবের পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্য হইতে জীব ও উদ্ভিদ যে একই ক্রমবিকাশ-শৃঙ্খলে গ্রথিত তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। উচ্চতর জীবের রক্তও রসেরই পরিণতি। কারণ ভুক্তদ্রব্য প্রথমতঃ রসেই পরিণত হয়; তাহা হইতেই পরে রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জীবদেহের রক্ত আবার শীতল ও উষ্ণ এই দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের রক্ত বিশিষ্ট জীবদিগকে

(1) "The first indication of an organ like the heart is seen in insects. National Encyclopædia.

(2) "Among vertebrate animals the simplest form of heart is found in fish. National Encyclopædia.

আমরা "শীতলশোণিতধারী" ও "উষ্ণ-শোণিতধারী" এই দুই নামে অভিহিত করিতে পারি। রসও শৈত্যগুণবিশিষ্ট বলিয়া শীতল শোণিত অনেকটা রসেরই প্রকৃতিযুক্ত। তাহাতেই শীতল শোণিতজীবী দেহের রসজীবী দেহেরই সহিত অধিক সাদৃশ্য। সুতরাং শীতল শোণিতধারী জীব বিকাশক্রমে রসজীবী অপেক্ষা উন্নত হইলেও উষ্ণ শোণিতধারী জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে শীতল ও উষ্ণ শোণিত যে জীববিকাশের বিশেষরূপ নির্দ্দেশক হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

রক্ত যে এইরূপে বিকাশের লক্ষণ হইয়াছে, তাহার কারণ এই বলিয়াই আমাদের মনে হয় যে রক্তের মধ্য দিয়াই চৈতন্যের প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে। এই জন্যই রসোপজীবী উদ্ভিদ ও নিম্নতম জীবে আমরা চৈতন্য বিশেষরূপে অস্ফুট দেখিতে পাই এবং শোণিতধারী জীবে আমরা চৈতন্যের অধিক সঞ্চার দেখিতে পাই। শোণিতধারী জীবের মধ্যেও আবার শীতল শোণিতধারী জীব অপেক্ষা উষ্ণ শোণিত-ধারী জীবে চৈতন্যের অধিক স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে শোণিত চৈতন্যের প্রকাশক বলিয়া শোণিতের উৎকর্ষই যে বিকাশের উৎকর্ষ হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আমাদের সমাজে বংশোৎ-কর্ষের যে বিচার দেখিতে পাওয়া যায় মূলে তাহা রক্তোৎকর্ষের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

শোণিত চৈতন্যের আধার বলিয়া জীব দেহে শোণিতের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। যে সম জীবে হৃদযন্ত্র নাই তথায় রক্ত নি নির্দ্দিষ্ট আধারে সঞ্চিত হইতে না পার সর্ব্ব দেহেই ব্যাপ্ত হয় সুতরাং ইহা মধ্যে চৈতন্যও সর্ব্ব দেহেই ব্যাপ্ত থা তাহাতেই ইহাদের কোন অঙ্গ ছিন্ন হই তাহাতে চৈতন্যের লক্ষন বহুরূপ পর্য্য বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া য পক্ষান্ত যে সমস্ত জীবে রক্ত হৃদ... সঞ্চিত চৈতন্যও তথায় বিশেষভা কেন্দ্রীভূ হইয়া থাকে। তাহাদের বিশেষরূপে হৃদযন্ত্রে সন্নিবিষ্ট থাকায় দের কো অঙ্গ ছিন্ন হইলে তাহাতে কোন চৈতন্য বিদ্যমান দেখা যায় না। রক্ত হৃদয় পিণ্ডীভূত হয় বলিয়াই ইহা নাম হৃৎপি হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডকে যেম সমস্ত রক্তে কেন্দ্রস্থান বলা যায় তেমন ইহাকে সম চৈতন্যেরও কেন্দ্রস্থান বলা ইতে পারে হৃৎপিণ্ড হইতে যেমন রক্ত সমস্ত দে সঞ্চালিত হয় তেমনই হৃৎপিণ্ডের কা হইতেই সমস্ত ভাবেরও উৎপত্তি হয় বলি আমরা মনে করি। ভাব-রাশের ইন্দ্রিয়ে নাম আমাদের ভাষায় "অন্তঃকরণ"। অন্ত করণ শব্দে আমাদের মনকেই বুঝাইয় থাকে। মনই আমাদের মধ্যে সাধার চেতনতত্ত্ব। হৃদয় বা হৃৎ শব্দেও আমাদে মনকে বুঝাইয়া থাকে। এই প্রকারে হৃদয় বা হৃৎ যেমন রক্তাধাররূপ হৃৎপিণ্ডকে বুঝায়—তেমনই ইহার কার্য্যরূপ মনোব্যাপার-কেও বুঝায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে মন, জড় ও চেতন উভয় প্রকৃতিরূপেই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ড ও ইহার কার্য্যে

আমরা সেই উভয় প্রকৃতির স্পষ্ট ব্যাখ্যাই পাই। সুতরাং হৃৎ ও মন কিরূপে ভিন্ন হইয়াছে তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

হৃৎপিণ্ড ও মনের পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধ হইতে হৃৎপিণ্ডই যে মনের প্রকৃত স্থান এই গূঢ় রহস্যটী আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছি। হৃৎপিণ্ড চৈতন্যতত্ত্ব বা মনের স্থান বলিয়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে চৈতন্য ও জীবন উভয়ই বিলোপ পায়। আমরা এস্থলে হৃদয় ও মনকে যে সার্থক প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহা আমাদের ভাষায় আবহমানকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাতেই অমর-কোষ অভি-ধানে আমরা উভয় শব্দকেই একই পর্য্যায়-ভুক্ত দেখিতে পাই যথা—"চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ।" এখানে চিত্ত ও হৃদয় বা মনেরই নামান্তর তাহাও আমরা পরিষ্কারই বুঝিতে পারিতেছি। এই প্রকারে এক হৃদয়েই যেমন অমরা বৈজ্ঞানিক শরীরযন্ত্র প্রাপ্ত হইতেছি—তেমনই দার্শনিক হৃদয়, মন, চিত্ত প্রভৃতি চৈতন্যতত্ত্বও প্রাপ্ত হইতেছি। এই প্রকারে কায়যন্ত্র যেমন একদিকে মনপ্রভৃতির আধার হইতেছে তেমনই অপরদিকে মন প্রভৃতিও হৃদযন্ত্রেরই ব্যাপার হইতেছে।

হৃদযন্ত্রের সহিত মনোভাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—ভাষায় ও সাহিত্যে তাহা আশ্চর্য্য-রূপেই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। কোন লোকের হৃদ্‌বৃত্তির বিশেষ পরিচয় পাইলে আমরা তাঁহাকে 'হৃদয়বান্,' 'সহৃদয়' বা 'হৃদয়ালু' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। আবার কোন ব্যক্তিতে হৃদ্‌বৃত্তির পরিচয় না পাইলে আমরা তাহাকে 'হৃদয়হীন' বলিয়া অভিহিত করি। ইংরাজীতে এরূপ-স্থলে 'possessed of good heart', 'heartless' প্রভৃতি কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে হৃদযন্ত্রের উৎকর্ষের সহিতই যে উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির যোগ এবং হৃদযন্ত্রের অপকর্ষের সহিতই যে নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির যোগ তাহাই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

কাহারও উদার মনোভাব দেখিলে আমরা তাঁহাকে 'প্রশস্তহৃদয়', 'উদারচেতা', 'মহামনা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকি। আবার তদ্বিপরীত অনুদারভাব দেখিলে 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়', 'ক্ষুদ্রচেতা', 'নীচমনা' প্রভৃতি বিশেষণে তাহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকি। ইংরাজীতেও এতদনুরূপ 'large hearted', 'broad minded', 'high minded' এবং 'narrow minded', 'small hearted,' 'low minded' প্রভৃতি কথার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা হইতে হৃদযন্ত্রের প্রশস্ততার সহিতই যে উন্নত মনোভাবের সম্বন্ধ তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'নীচ' শব্দের মধ্যেও হৃদযন্ত্রের অবস্থানের রহস্যই আবিষ্কার করা যাইতে পারে। মনুষ্যব্যতিরিক্ত প্রাণী সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া চলিতে পারে না বলিয়া—তাহাদের মধ্যে হৃৎপিণ্ড নিম্নমুখে অবস্থিত থাকে। মনুষ্য সোজাভাবে দাঁড়াইতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাহাতে হৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে। মনুষ্যের হৃৎপিণ্ডের এই ঊর্দ্ধমুখ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত

হওয়াতেই মনুষ্যের সম্বন্ধে এই উন্নত ভাবের প্রকাশক, 'উচ্চহৃদয়', 'উচ্চান্তঃকরণ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত মনুষ্যের হৃদ্‌বৃত্তি ইতর প্রাণীর ন্যায় অনুন্নত তাহাদিগের সম্বন্ধে ইতর প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থাজ্ঞাপক "নীচ হৃদয়", "নীচান্তঃকরণ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

হৃদযন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে পদ্মসদৃশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতেই 'হৃদয়কমল' 'হৃৎকমল', 'হৃৎপুণ্ডরীক' প্রভৃতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

হৃদয় ভাবের আধার বলিয়াই অত্যধিক হর্ষস্থলে আমরা বলিয়া থাকি 'হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না' আবার অত্যধিক কষ্টের সময় বলি 'হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।' ইংরেজীতে 'heart-rending' কথাটীও এই অর্থই প্রকাশ করে। আমাদের 'ভগ্নহৃদয়' ও ইংরেজী 'broken hearted' প্রভৃতি কথার যথার্থ অর্থ হৃদযন্ত্রের সহিত যোগের দ্বারাই পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি হইতে পারে।

ইংরেজী 'heart' শব্দ সংস্কৃত 'হৃৎ' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। তাহাতেই উভয় শব্দের মধ্যে অর্থগত এরূপ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের সুহৃদ্ কথাটিতে মিত্রভাবের দ্বারা যে আমাদের হৃদয়ের প্রসন্নতা উৎপাদন হয় তাহাই বুঝিতে পারা যায়। তদ্বিপরীতে 'দুহৃদ্' কথাটিতে অমিত্রভাবের দ্বারা হৃদয়ের অপ্রসন্নতা উৎপাদন হয় তাহাই বুঝা যায়। এই উভয় ভাবই যে হৃদযন্ত্রের স্ফূর্ত্তির ভাব ও অস্ফূর্ত্তির ভ তাহাতে সন্দেহ নাই।

হৃদযন্ত্র রক্তেরই আধার সুতরাং ভা সহিত হৃদযন্ত্রের যেমন সম্বন্ধ রক্তের সহি যে ভাবের তদ্রূপ সম্বন্ধই হইবে তা সহজবোধ্য। আমাদের এক টী কথা আ "রক্তের টান্", তাহাতে রক্ত সম্ব মূলে যে একটী ভাবের বন্ধন ঘটে তাহা বুঝাইয়া থাকে। ইংরাজীতে অসদ্ভা বুঝাইতে 'ill-blood' কথা প্রয়োগ হ থাকে। ক্রোধের ভাব উদিত হই "blood is up" কথার দ্বারা প্রকাশি হয়। ইহা হইতে রক্তের উপর ভাবে কিরূপ প্রভাব তাহারই প্রমাণ পাও যায়।

ইংরাজীতে 'warmth of feeling' 'warmth of love' প্রভৃতি যে সকল ক আছে তাহাতে উষ্ণ শোণিতের সহিত যে এই সমস্ত ভাবের বিশেষ যোগ তাহা যেন প্রমাণিত হয়। আমাদের "অনুরক্ত কথার সহিত রক্ত কথার যে মূলগ সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে তাহাও রক্তের সহি অনুরাগের সম্বন্ধেরই যেন প্রমাণ দি থাকে। রক্ত শব্দ রঞ্জিত অর্থের প্রকাশক অনুরাগের দ্বারা রক্তের বর্ণ বিশেষরূপে উজ্জ্বলতা ধারণ করে—ইহাই রঞ্জনার্থে তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয়। 'বিরাগ' 'বিরক্ত' শব্দের দ্বারা ইহার বিপরীত ভা অর্থাৎ রক্তের বিবর্ণ ভাব প্রকটিত হয়— ইহাই যেন তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক প্রভৃতিতে যে রক্তের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে রক্তের মধ্যে কিরূপে ধর্ম্ম চৈতন্যের অঙ্কুর সঞ্জাত হইয়া রক্তের হৃৎপিণ্ডের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা জড় হৃদযন্ত্র ও চেতন হৃদয়-তত্ত্বে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহা আমরা ভাষা ও সাহিত্যে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারতের খনিজ পদার্থ

আমাদের স্বর্ণ-প্রসূ ভারত চিরকাল রত্নের আকর বলিয়া বিখ্যাত ছিল; আমাদের দেশের সুবর্ণ এবং হীরক সৌন্দর্য্য-ভায় জগৎ আলো করিত। কিন্তু সেই প্রাচীন কালে খনিজ পদার্থ খনি হইতে উপরে তোলা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ছিল। সুবর্ণের বিচিত্র-কান্তি চিরকালই মানব-সমাজকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। সুবর্ণ ব্যতীত লৌহ ইস্পাতের জন্যও বিখ্যাত ছিল। আমাদের গ্রাম্য কর্ম্মকারগণ যে সমস্ত ইস্পাত তৈয়ার করিত, য়ুরোপের কারিকরেরা বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা জানিত না। আমাদের কাঁসার এবং অন্যান্য ধাতুর কার্য্য অনেকদিন অবধি জগতের নিকট আদর্শস্থানীয় ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের নেতৃত্ব বহুদিনস্থায়ী হইল না। য়ুরোপ কাজের সুবিধার জন্য steam power এবং electric power আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ লোকের যাতায়াত এবং বিভিন্ন প্রদেশে জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী সুবিধাজনক করিয়া তুলিল। আমাদের ভারতীয় শিল্পিগণ বহুদিন ভারতের বাহিরের কোন খবর না রাখায় ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটিয়া আসিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি আমরা কোন খনিজ পদার্থ বিদেশ হইতে আমদানী করি নাই; দেশোৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যেই আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্যই বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইয়া লইতে পারিতাম। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডের প্রভুত্ব ভারতে অটুট হইয়া উঠে। ভারতও ক্রমশঃ ইংলণ্ডের সহিত আদান-প্রদান করিতে আরম্ভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কারণ এই সময়েই steam power আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ্ ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। দীর্ঘকালব্যাপী ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লব য়ুরোপের জনসাধারণের প্রাণে নবোৎসাহ ও কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রৎ করিয়া তুলে।

ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ এখানে ইংরাজী সভ্যতার ছায়াও

বিশালতর হইয়া উঠিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড কৃষিকার্য্য প্রায় ছাড়িয়া দিয়া কলকারখানার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। ১৮৪৪ সালে যখন free trade principles গ্রাহ্য হয় এবং Cornlaw একেবারে তুলিয়া দেওয়া হয় তখন হইতেই ইংলণ্ড প্রকৃত পক্ষে কারখানার জীবন গ্রহণ করে।

আমাদের দেশে ক্রমশঃ ইংলণ্ডের কারখানায় প্রস্তুত সুলভ মূল্যের দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল। য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞের উদ্ভাবিত যন্ত্র যেমন আমাদের তাঁতীদের ব্যবসা অচল করিয়া দেয়, সেইরূপ সস্তায় প্রস্তুত য়ুরোপীয় লৌহ ভারতে আসিয়া আমাদের কামারদের ব্যবসায়েও ঘা দিল। কারখানায় একসঙ্গে একেবারে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়। একেবারে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিলে নানা কারণে খরচও খুব কম পড়ে। কাজেই হাতে প্রস্তুত দ্রব্য কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর মহার্ঘ্য হয়।

১৯০১ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের statistical report দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গড়ে প্রতিবৎসর ১০,১৫৮,২৫২ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য আমরা ভারতে আমদানী করিয়াছি। কাঁচের দ্রব্য, মাটীর ও চীনা মাটীর খেলনা ইত্যাদি, লোহার দ্রব্য, ছুরি কাঁচি ইত্যাদি এবং রেলওয়ের কলকব্জা প্রভৃতি একসঙ্গে ধরিলে ৮০ লক্ষ পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, আমরা প্রতিবৎসর প্রায় এক কোটী টাকার খনিজ-পদার্থ আমাদের ব্যবহারের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী করি। আমরা কোন্ কোন্ দ্রব্য আমদানী করি, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল।

খনি হইতে উৎপন্ন তৈল	২৪৫৬৮৭৫ পাউণ্ড
লৌহ	২২৪৪৯০৮ „
ইস্পাত	৫১৭৯৬৯ „
তামা	৮০৯০৮৩ „
হীরা, মুক্তা ইত্যাদি	৮৩৫৩১৯ „
ডাক্তারি ঔষধপত্র	৩৭৭৪৯৭ „
কয়লা ইত্যাদি	৩০২৩১৪ „
মার্‌বেল পাথর প্রভৃতি	১৭৪৯৭০ „
সীসা	১৩৬৪৪৪ „
জারমান্ সিল্‌ভার্	২২৭৬১৪ „
পিতল	৬৬০৮৪ „
অন্যান্য খনিজ পদার্থ	৭১৬৫১ „
দস্তা	৮৭৯৮৯ „
কুইক্ সিল্‌ভার	২৮২৬০ „

উপরিউদ্ধৃত তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা যে জিনিষ আমদানী করিয়াছি তাহার মধ্যে লোহের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লৌহ ও ইস্পাত শতকরা ৩৭, তামা ১০, খনিজ তৈল ২৪·৩, হীরা মুক্তা ইত্যাদি ২৪·২ এবং লবণ ৪·৪ ভাগ।

আমাদের ভারতের খনিগুলিও অনর্থক পড়িয়া নাই। সভ্য-জগতের demand যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, মানবের কার্য্যক্ষেত্রও সেই অনুপাতে প্রসারিত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বে যে পরিমাণ খনিজপদার্থের ব্যবহার করিতাম, এখন

তাহাদের ব্যবহার অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা প্রতিবৎসর ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করি এবং তাহাছাড়া আরও অনেক টাকার দ্রব্য আমাদের দেশেই উৎপন্ন করিতেছি। উপরের তালিকাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমাদের খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ কেমন বাড়িয়া গিয়াছে। *

কয়লা। আমাদের দেশের লোক পূর্ব্বে কয়লার ব্যবহার জানিত না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহার কার্য্যকারিতার বার্ত্তা জন-সমাজে প্রচারিত হইলে, ভারতেও কয়লার খনি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। কয়লা, ভারতের প্রধান খনিজ পদার্থ। মূল্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে, সমস্ত উৎপন্ন কয়লার মূল্য সমস্ত উৎপন্ন সুবর্ণের মূল্যের নীচেই। আমরা যত কয়লা উৎপন্ন করি তাহার শতকরা ৯৪ ভাগ আমাদের দেশেই নানা-কার্য্যে খরচ হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের খনিসমূহ হইতে ১,৩৯৭,৮১৮ টন্ কয়লা পাওয়া যায়; ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৭,৪৩৮,৩৮৬ টনে গিয়া দাঁড়ায়।

কয়লা বহু কার্য্যে লাগে। আমাদের রন্ধনের জন্য, কয়লা নিত্যপ্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে কল-কারখানাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেগুলি চালাইবার জন্যও কয়লার অত্যন্ত আবশ্যক। রেলওয়ে-গুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা খরচ হয়।

ভারতের কয়লার খনিগুলি যখন সুন্দর ভাবে চালিত হইত না, তখন আমরা বিলাত হইতে কয়লা আমদানী করিতাম। যদি আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে কয়লা না মিলিত, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, আজ এ দেশে এত কল-কারখানা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত কিনা! ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের এ বিপদে পড়িতে হয় নাই। জগতে যেমন কল-কারখানার কার্য্যকারিতা প্রতিপাদিত হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকে কয়লারও কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিল। ভারতবর্ষ প্রথমে উপযুক্ত অর্থ এবং চেষ্টার অভাবে কিছু পিছাইয়া পড়ে। ক্রমশঃ যেমন অর্থ এব

* খনিজ পদার্থ

	১৮৯৮ পাউণ্ড	১৯০০ পাউণ্ড	১৯০৩ পাউণ্ড	গড়পড়্‌তা পাউণ্ড
সোনা	১৬০৮৫০৪	১৮৯১৭৬৭	২৩০২৪৯৩	১৯০৪৭১৯
কয়লা	৯৫৭১৬২	১৩৪৩০৮১	১২৯৯৭১৬	১২২৫৬৭৭
লবন	৩৫৮৯৩৩	৩২৫৯৭০	৩৩৬১৪৭	৩৪৭৮৯৭
পেট্রোলিয়ম্	৬৭৮৯৭	১৪৮৭৫৫	৩৫৪৩৬৫	১৮৫৪১০
রুবি	৫৭৯৫০	১০৪৪০৬	৯৮৫৭৫	৮৯৩৪৫
পারদ	৫৩৮৯০	১০৯৫৫৪	৮৬২৭৭	৮০১২০
লৌহ	১২৪০৩	১১১৭১	১৬৯৭০	১১৯৮১
টিন	২৫৫৩	৮৫৩৪	৫৫০	৫১৯

চেষ্টা হইতে লাগিল, তেমনি ভারতবর্ষেও কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা এবং কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে কয়লা-খনির আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশ হইতে কয়লার আমদানী ক্রমশঃই কমিয়া আসিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমরা ৮৪৮৩৬৭ টন কয়লা আমদানী করি, কিন্তু ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমরা মাত্র ১৯২৭২৯ টন আমদানী করি। এখনও আমাদিগকে কিছু কিছু কয়লা বিলাত হইতে আনিতে হয়। তাহার কারণ Welsh coal, navigation এর পক্ষে বড় সুবিধা-জনক। এরূপ উৎকৃষ্ট কয়লা আমরা এখনও ভারতে উৎপন্ন করিতে পারি নাই। যতদিন, Welsh coal এর মত ভাল কয়লার খনি আমরা আবিষ্কার করিতে না পারিব, ততদিন কার্য্যের সুবিধার জন্য বাধ্য হইয়া আমাদিগকে Welsh coal ক্রয় করিতেই হইবে। আবার যেমন কিছু পরিমাণে কয়লা আমরা আমদানী করি, তেমনি কিছু পরিমাণে কয়লা আমরা রপ্তানীও করি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমরা ৪৪১৯৪৮ টন্ কয়লা রপ্তানী করি। আমাদের রপ্তানী কয়লা প্রধানতঃ সিংহল, আন্দামান, জাভা প্রভৃতি ভারত-মহাসাগর-স্থিত দ্বীপ-সমূহে গিয়া থাকে। কিন্তু, সমস্ত উৎপন্ন কয়লার, শতকরা ৯৪ ভাগ আমরা দেশেই ব্যবহার করি। আমাদের রেল-গুলির বাৎসরিক কয়লার খরচ প্রায় ৬,০০,০০০০ টন্।

কয়লার উৎপত্তি স্থল। কয়লার উৎপত্তি স্থল দুই ভাগে বিভক্ত। Gondwana coal-fields এবং Tertiary coal-fields.। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-ভারতবর্ষ, মধ্য-প্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ, Gondwana coal-fields এর মধ্যে পড়ে। বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা এবং আসাম, Tertiary coal-fields এর মধ্যে পড়ে। Gonwdana coal-fieldsই বিখ্যাত। শতকরা ৯৭ ভাগ কয়লা Gondwana কয়লার খনিগুলি হইতে পাওয়া যায় এবং মাত্র ২ ভাগ কয়লা, Tertiary কয়লার খনিগুলি হইতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কয়লার খনি হইতে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৬,২০৮,০০০ টন্ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। ৩২৪০০০ টন্ কয়লা, খনির সত্বাধিকারীগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৫৩২০০০ টন্ কয়লা পাওয়া গিয়াছে।

Gondwana কয়লার খনির মধ্যে দামোদর উপত্যকাতেই শতকরা ৮৬ ভাগ কয়লা উৎপন্ন হয়। রাণীগঞ্জ এবং ঝেরিয়ার কয়লার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, রাণীগঞ্জেই বাঙ্গালার প্রথম কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়। রাণীগঞ্জও যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা উৎপাদন করিয়া ভারতের কয়লার খনি-গুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হইতে রাণীগঞ্জ, ঝেরিয়ার খনিগুলির কাছে হার মানিয়াছে। উৎপাদিকা-শক্তি ধরিতে গেলে, এখন ঝেরিয়াই প্রথম। রাণীগঞ্জ এখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, ঝেরিয়ার খনি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঝেরিয়ার উৎপাদিকা-শক্তিতে রাণীগঞ্জকে পরাস্ত করে। রাণীগঞ্জের খনিগুলি প্রায় এক

শতাব্দী কাল ধরিয়া কয়লা যোগাইয়া আসিতেছে। সুতরাং, এখনও রাণীগঞ্জ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

সুবর্ণ। প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে প্রচুর সুবর্ণের খনি ছিল। ভারতের নদী-সমূহও বালুকার সহিত স্বর্ণ-রেণু বহিয়া লইয়া যাইত। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র হইতে এখনও অনেক আউন্স স্বর্ণ প্রত্যেক বৎসর উৎপন্ন হয়। এই বালুকারাশি হইতে সঞ্চিত স্বর্ণের তালিকা রাখা বড় শক্ত। তাহাদের অধিকাংশ ভাগই স্থানীয় লোক-জনকর্ত্তৃক গহনারূপে ব্যবহৃত হয়। এখন মহীশূরের Kolar gold-fieldই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, ইংরাজ-মহাজনদের নজর এইদিকে প্রথম পতিত হয়। তাহার পর, তাঁহারা বহুমূল্যের কল লইয়া আসিয়া এই সোনার খনিতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। ইংরাজ-বণিকগণের হস্তে যাইবার পূর্ব্বেও, দেশীয় ব্যবসায়ীগণ এই খনিতে কার্য করিতেন। কিন্তু, তাঁহাদের উৎপন্ন স্বর্ণের মূল্য আজ-কালকার তুলনায় নগণ্য ছিল। ১৮৮০ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া তাঁহারা মাত্র ১৯,৮০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদন করেন। আর এদিকে ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াই, ইংরাজ-কোম্পানী তাঁহাদের অংশীদারগণকে ৮,২৫০,০০০ পাউণ্ড ভাগ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, মহীশূররাজও ১,০০,০০০ পাউণ্ড loyalty পাইয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই কোলার ফিল্ডএ ৫৫৯,১৯৮ আউন্স সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। উহার মূল্য ৩২২৫২৯০৩ টাকা। Kolar gold-field-এর পরই হায়দ্রাবাদের হুতি প্রদেশের খনি উল্লেখযোগ্য। গত বৎসরে, এই খনি হইতে ১১৫৮৪১৮ টাকা মূল্যের, ২০০১২ আউন্স সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটী ছাড়া, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোনার খনি আছে। সেগুলি হইতেও অল্পবিস্তর সুবর্ণ পাওয়া যায়।

লৌহ। য়ুরোপ হইতে সস্তা লৌহ আমদানীর সহিত, ভারতের লৌহ-ব্যবসায় এক প্রকার নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের খনিসমূহে প্রচুর পরিমাণে লৌহ নিহিত আছে। এই লৌহের খনিসমূহ ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। মান্দ্রাজ প্রদেশের সাতুই ষ্টেট এবং বেলারী জেলায়, মধ্য প্রদেশের রায়পুর এবং জব্বলপুর জেলাতেই অধিক পরিমাণে লৌহখনি বিদ্যমান। বর্দ্ধমানের উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং মানভূমের মাটির সহিত যথেষ্ট লৌহ মিশ্রিত আছে। বরাকর iron-works-এ এই মাটী বিশ্লেষণ করিয়া iron-ore তৈয়ারী করা হয়।

এতদিন, বরাকর লোহার কারখানায় pig-ironই তৈয়ারী হইয়া আসিতেছিল। এখন, basie steel তৈয়ারী করিবারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কালী-মাটিতে টাটার লোহার কারখানা বেশ কাজ করিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, এই কারখানা হইতে ৩০০,০০০ টাকা দামের ৩০০,০০০ টন্ লৌহ উৎপন্ন হয়। ১৯১২ সালে, ৪৭১২৩২ টন্ টাকা দামের ৪৭১২৩২ টন্ লৌহ উৎপাদিত

হয়। টাটার এবং বরাকরের লোহার কারখানা বাঙ্গালা বা ছোটনাগপুর হইতেই কাঁচা লৌহ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই সমস্ত কারখানা, কাঁচা মাল সস্তায় পায় বলিয়া সুবিধামত কার্য্য করিতে পারে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ একটন্ লোহার দাম ১।/০, কিন্তু ভারতের অন্যত্র উহার মূল্য ৪৲ টাকা। এইজন্য, যুক্ত-প্রদেশে, মধ্য-ভারতবর্ষে, মান্দ্রাজে, হায়দ্রাবাদে, মহীশূরে, রাজপুতানায়, ব্রহ্মে এবং পাঞ্জাবে, লোহার কারখানাগুলি নগণ্য অবস্থায় আছে। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও যৎ-সামান্য।

পেট্রোলিয়ম। এখন আর রেড়ীর তেল আমাদের ঘরে আলো জ্বালায় না। এখন হয় আমরা কেরোসিন তৈল ব্যবহার করি, না-হয় ব্রহ্মদেশে প্রস্তুত মোমবাতি ব্যবহার করি। ১৯০০-০১ খৃষ্টাব্দে আমরা মাত্র ৭৯,০০০,০০০ গ্যালন কেরোসিন তৈল পুড়াই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, সেই জায়গায় ১৭৪,০০০,০০০ গ্যালন তৈল পুড়াইয়াছি। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কেরোসিন তৈলের ব্যবহার আমাদের দেশে ধীরে ধীরে কেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কেরোসিন তৈলের কতক আমরা আমেরিকা এবং রুশিয়া হইতে আমদানী করি এবং বাকি ভাগটা আমাদের দেশ হইতেই প্রাপ্ত হই। পশ্চিমে বেলুচিস্থান ও পাঞ্জাবে, এবং পূর্ব্বে, আসাম ও ব্রহ্মে কেরোসিন তৈলের খনি আছে। আসাম এবং ব্রহ্মের তৈলের খনিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইংরাজকর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের খনিগুলি হইতে দেশীয়গণকর্ত্তৃ বৎসরে ২,৩০০,০০০ তৈল উত্তোলিত হইত সত্ত্বাধিকারীর অধীনে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খনিগুলি, য়ুরোপীয় প্রথায় চালি হইতে থাকে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, এই খনিগু হইতে ১০,০০০,০০০, গ্যালন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪০,০০০,০০০ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, ২০০,০০০,০০০ গ্যালন তৈ পাওয়া হইয়াছে।

লবণ। মধ্য-আফ্রিকায় লবণের অভা হইতে পারে, মধ্য-রুশিয়ায় লবণের অভা সম্ভব, কিন্তু সাগর-বলয়িত ভারত-ভূমিতে কখনও লবণের অভাব হইতে পারে না আমাদের বাৎসরিক লবণ-৩০ ১,৪০০,০০ টন্। ইহার শতকরা ৪৪ ভাগ ভারত-সমুদ্রে জলরাশি হইতে প্রস্তুত ৬০ ৪৩৫,০০ টন্ ভারতের বাহির হইতে আমদানি করা হয়। অবশিষ্ট লবণ রাজপুতানা এ পাঞ্জাবের লবণের পাহাড় হইতে সংগৃহী হয়।

পারদ।—ভারতবর্ষে পারদ যথে পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আমরা প্রত্যে বৎসর ৭৮,৮৮৮ পাউণ্ড মূল্যের পার ইংলণ্ডে পাঠাই। ইংলণ্ড আবার এ পারদ, জর্ম্মানি এবং আমেরিকাকে বিক্র করে।

পূর্ব্বোক্ত জিনিষগুলি ব্যতীত আরও বহু প্রকার খনিজ পদার্থ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। সেগুলির কথা সকলের তেমন ভাল লাগিবে না বলিয়া এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

ভেইয়া

নন্দবেহারা যখন রাগারাগি করিয়া গেল খোকাকে লইয়া ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। খোকা নন্দর বড় ন্যাওটা; এমন কান্নাকাটি আরম্ভ করিল যে বাড়িসুদ্ধ-সকলে অস্থির হইয়া উঠিলাম। মনও মনে হইতে লাগিল দূর-হক ছাই, দুহয় হাতে পায়ে ধরিয়া নন্দকে রাখিয়া আসি। কিন্তু সে যে কোথায় গাও হইয়া গেল কোনো সন্ধানই পাইলাম না। খোকাকে লইয়া বিষম আতান্তরে পড়িয়াছি এমন সময় ছোট্টু বেহারা তার গ্রাম-সম্পর্কে এক সাত-বছরের ভাই-পোকে লইয়া হাজির। বলিল—"হুজুর! একে আপনার খোঁকার নকর রাখুন।"

আমি তো অবাক! এতটুকু বাচ্ছা চাকরী করিবে কি! নিজেকে সামলাইতে পারে কিনা সন্দেহ, খোকার হেপাজৎ করিবে! আমি অমত করিলাম; কিন্তু খোকা দেখি বাড়ির কর্ত্তার উপরও কর্ত্তৃত্ব করে। সে নিজেই তার চাকর পসন্দ করিয়া লইল। মন্নুকে দেখিবামাত্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তার বড় বড় চুলের গোচ্ছা লইয়া দিব্যি খেলা সুরু করিয়া দিল।

মন্নু খোকার ভারে একেবারে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে বোঁকিয়া পড়িয়াছিল—খোকাকে ভালো করিয়া তুলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, —পড়ে পড়ে এমন অবস্থা! কিন্তু খোকার তো তাতেই মজা—সে কিছুতেই মন্নুকে ছাড়িবে না; জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে গেলে কান্নাকাটি করে। কাজেই তখনকার মতো মন্নুকে রাখিতে হইল। মনটা খুৎখুৎ করিতে লাগিল—ছেলেমানুষ, খোকাকে লইয়া কখন্ কি-একটা কাণ্ড করিয়া বসে! কিন্তু নন্দর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকার অসুখে পড়িবার যো হইয়াছিল, এখন সে ভাবনা দূর হইল বলিয়া মনটাকে প্রবোধ দিলাম।

মন্নু ছেলেমানুষ। চোখদুটি বড় বড়, মাথাটি একরাশ কোঁকড়া চুলে ভরা। মুখ-খানির উপর এমন-একটি কোমলতা মাখানো যে মায়া করে। বেচারার মা বাপ নাই। থাকিলে কখনই এই ননীর পুতুলকে বিদেশ বিভূঁয়ে এমন করিয়া ছাড়িয়া দিত না—এই মনে করিয়া তার উপর একটা স্নেহের আকর্ষণ আপনা হইতেই জন্মায়।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম—মন্নুকে লইয়া বেশিদিন চলিবে না, ছেলেমানুষ কাজ কিছু পারিবে না কেবল পয়সাই গণিতে হইবে, এখন দিনকতক যাক্, পরে একটা ভালো দেখিয়া বেহারা রাখিয়া উহাকে বক্‌শিস দিয়া বিদায় করিলেই চলিবে। কিন্তু কাজে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। খোকা তো এক দণ্ড মন্নুকে ছাড়িবে না, গৃহিণীও আপত্তি করিতে লাগিলেন। আমি একবার জোর করিয়া তাহাকে তাড়াইতে গিয়াছিলাম কিন্তু তার মুখের সামনে গিয়া আর সে কথা বলিতে পারিলাম না।

(২)

মন্নু প্রায় এক বছর আমাদের বাড়িতে আছে। বেচারার কোনো গোল নাই সারাদিন যেন ভয়ে-ভয়েই থাকে—সর্ব্বদাই মুখটি নীচু করিয়াই আছে, কাহারো সামনে পড়িলে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে যেন বাঁচে। বাড়ির কাহারো সঙ্গে তার বড় ঘনিষ্ঠতা দেখিতাম না, একা-একাই কাটাইত, কেবল খোকার সঙ্গে সে খুব জমাইয়া লইয়াছিল।

আমার চোখে সে বড় পড়িত না,—সে যে কোথায় থাকে, কি করে তাহা আমি ভালোরকম জানিতাম না। এতদিন পরে একদিন আমি তাহার গলা পাইলাম। বাহির-বাড়ি হইতে ভিতরে আসিতেছি, চাকরদের ঘরের ভিতর কে যেন ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে, আর ছোট্টু মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে। আমি ছোট্টুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কিরে ছোট্টু?"

ছোট্ট বলিল—"বাবুজি! আমি দেশ যাবো শুনে মন্নু কাঁন্‌তে লেগেছে—বলে আমিও দেশ যাবো।"

আমি বলিলাম—"আহা ছেলেমানুষ! যাক না।"

ছোট্টু বলিল—"কার কাছে যাবে বাবু, ওর তো কেউ নেই!"

আমি ডাকিলাম—"মন্নু!"

মন্ন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

আমি বলিলাম—"তুই বাড়ি যাবি?"

সে বলিল—"হ্যাঁ!" কিন্তু তার গলা হইতে যেন স্বর বাহির হইল না!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কার কা যাবি?"

মন্ন একটা ফোঁপানির বেগ বুকের ম আটকাইয়া বলিল—"ভেইয়ার কাছে।"

—"ভেইয়া কে রে?"—জিজ্ঞা করিতেই ছোট্ট বলিয়া উঠিল—"ও ঠাকুর্দা! বুড়ো মারা যাবার সময় আমা হাতে ওকে দিয়ে যায়।"

আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম "তবে যে বলে ভেইয়ার—?"

ছোট্টু বলিল—"বাবু, হাবা ছে কিছুতেই বুঝবে না ওর ঠাকুর্দা মরেছে!

আমি মন্নুর পিঠের উপর হাতখা বুলাইয়া বলিলাম—"তুই কা কাছে যা মন্নু! তোর ভেইয়া তো নে

মন্নু ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বায়না সুরে কেবলই বলিতে লা —"ভেইয়া কাছে যাবো।"

ছোট্টু চক্ষু রক্তবর্ণ করি বলিল—"ও তাই যা তোর ভেইয়ার আছে!"—বলি একটা প্রচণ্ড কীল তুলি

মন্নুর মুখ দেখিয়া আমা মায়া করিতে ছিল, আমি বলিলাম—"আহা, নিয়ে একবার ওকে দেশে।"

ছোট্টু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"সে হবে না বাবু, আমি ঐ হতভাগাটাকে ঘাড়ে করে নিতে বাড়ি-সুদ্ধ লোক যেন আমায় মারতে এল--এখানে পালিয়ে এসে বাঁচলুম।"

কৃপণ বলিয়া ছোট্টুর খ্যাতি ছিল,বোধ হয় সেটা ওর বংশেরই ধারা এই ভাবিয়া আমি বলিলাম—"তোর কিছু ভাবনা নেই, আমি

র সব খরচ-পত্র দেব—তুই ওকে নিয়ে ।"

টাকার কথাতেও ছোট্টুর তেমন উৎসাহ খা গেল না, সে একটা ঢোক গিলিয়া লিল—"আচ্ছা বাবু!"

বলিল—'আচ্ছা বাবু!' কিন্তু হতভাগা ট্টু এমন পাজি, যাইবার দিন গাপনে লিয়া গেল মন্নকে সঙ্গে লইল না।

মন্নু চাকরদের ঘরে তক্তাপোষের নীচে ড়িয়া সমস্ত দিনটা ফোঁপাইতে লাগিল!

(৩)

মন্নু সেদিন খোকাকে লইয়া খেলা রিতেছিল। একটা লাল-রঙের কাঠের লা সে খোকার হাতে তুলিয়া দিতেছিল, খোকা সেইটা লইয়া তাকে ছুড়িয়া মারিতে ছিল। গোলাটা একবার মন্নুর কপালে য়া ঠক্ করিয়া লাগিল। শুনিলাম মন্নু লিতেছে—"খোকাবাবু দুষ্টুবাবু, মন্নুকে রে। আমার ভেইয়াবাবু ভালোবাবু, মাকে মারে না। ভেইয়া কেমন পাখীর ছা ধরে দেয়, কাঁধে উঠিয়ে কেমন ড়া চড়ায়—আমি ঘোড়াকে চাবুক মারি, চাবুক ভেইয়ার গায়ে লাগে না। ভেইয়ার কেমন কালো ভৈঁস্ আছে—তার পিঠে ভেইয়া আমায় চড়িয়ে দেয়—খোকাবাবুর ভৈঁস নেই। ভেইয়ার বকরী আছে, তার য়ে আমি হাত বুলিয়ে দিই;—বকরী ানায় না, আমার হাতে ঘাস খায়। ভেইয়া আমায় রোটি দেয়। খোকাবাবু রোটি পায় না, খোকাবাবু দুধ খায়, ভাত য়। আমার ভেইয়ার কাছে যাবে খোকা বু? ভেইয়া রোটি দেবে!"

খোকা বলিল—"হু!"

আর-একদিন দেখি মন্নু আমার বড় ছেলেকে ধরিয়াছে। কোথা হইতে একটুকরা কাগজ ও একটা পেন্সিল জোগাড় করিয়া বলিতেছে—"দাদাবাবু, তুমি চিঠি লিখতে পার?"

দাদাবাবুর উৎসাহ দেখে কে! সে বলিয়া উঠিল—"হুঁ পারি!"

মন্নু বলিতে লাগিল, সে মাথানীচু করিয়া বড় বড় হরফে উচ্চকণ্ঠে বানান করিয়া লিখিতে লাগিল—"ভেইয়া তুমি জল্‌দি এস। খোকাবাবু তোমার ভৈঁস্ দেখবে, বকরী দেখবে। খোকাবাবু বলে ভৈঁস্ দেখলে ডর লাগবে না।"

মন্নুর আরো অনেক কথা লিখিবার ছিল কিন্তু ঐ কথাগুলিতেই দাদাবাবু কাগজ ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন, কাজেই চিঠি শেষ করিতে হইল। মন্নু চিঠিখানা সযত্নে মুড়িয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল। খোকাকে বলিল—"খোকাবাবু তোমার জন্যে ভৈঁস্ আস্‌ছে। ভৈঁস্ দেখে ভয় করবে না ত? আমার কিছু ভয় করে না।"

একটু পরে আমার বড় ছেলে কোথা হইতে একখানা খাম জোগাড় করিয়া আনিয়া বলিল--"মন্নু! ঠিকানা লিখতে হবে। ইংরিজিতে লিখব, জানিস্! বল্ কি লিখব?"

মন্নু বলিল—"লেখ ভেইয়া!"

বড় খোকা খানিকক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া বিড়বিড় করিয়া বানান ঠিক করিয়া লইল, তারপর বড় বড় বাঁকা অক্ষরে

লিখিতে লাগিল— VA ভে E ভেই AA ভেইয়া VAEAA

—"তারপর ?"

মন্নু বলিল—"তারপর আবার কি ?"

—"দূর ! এতে কখনো চিঠি যায় ! তোদের বাড়ি কোথায় বল্।"

মন্নু বলিল—"আমাদের বাড়ি ? সে দরিয়া কিনারে ! ও ভারী দরিয়া ! ও দরিয়ায় আমি চান্ করি, ভেইয়া চান্ করে, আমাদের ভৈঁস্ চান্ করে—ভিখ্খু পারে না ;—সে কাঁদে।"

বড় খোকা ইংরাজি অক্ষরে "দরিয়া" লিখিতে মাথা চুলকাইতে লাগিল ! শেষে নিরুৎসাহ হইয়া বলিল—"মন্নু ও কথা ইংরিজিতে লেখা যায় না, বুঝলি ? তুই ইংরিজি করে বল্।"

মন্নু বলিল—"দাদাবাবু, আমি তো তোমার মতো ইংরিজি পড়িনি।"

—"তবে তোর চিঠি যাবে কেমন করে ?"

মন্নু বলিল—"ঠিক যাবে। ডাঁকওয়ালা ভেইয়াকে চেনে—সে কত চিঠি ভেইয়াকে দেয়। আমার চিঠি ঠিক ভেইয়াকে দেবে। তুমি দাওনা আমাকে—আমি ডাঁকে দেব।"

খবর পাইয়াছিলাম মন্নু সে চিঠি ডাকে দিয়াছে কিন্তু তার গতি কি হইল জানিনা।

প্রায়ই শুনিতাম খোকা কাঁদিলেই মন্নু তাকে সান্ত্বনা দিতেছে— "চুপ কর খোকাবাবু, তোমার জন্যে ভৈঁস্ নিয়ে ঐ ভেইয়া আসচে।"

(৪)

পূজার সময় সপরিবারে কাশী বেড়াইতে আসিয়াছি। মন্নু সঙ্গে আছে। দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া যে দিন কয়টা কাটিয়া গেল বলিতে পারিনা। ফিরিবার সময় কাছে আসিয়াছে। গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ির সকলেই এখন জিনিষ কিনিতে ব্যস্ত—দেশে গিয়া উপহার বিলাইতে হইবে। কেনার হেঙ্গাম আর কিছুতেই শেষ হয় না ;—উপহারের সামগ্রী বাক্সবন্দী করিয়া হঠাৎ মনে পড়ে ঐ যাঃ অমুকের জন্য কিছুই লওয়া হয় নাই। অমনি ছুটি দোকানে ! বাচবিচার রহিল না—নিকট দূর, পাড়াসম্পর্কে সকল-প্রকার আত্মীয়ের জন্যই কিছু-কিছু লওয়া হইল। বাড়ির চাকর-নফররাও বাদ রহিল না। কাশী ক্ষেত্রের মানচিত্র, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ, হরি নামের মালা, তার ঝুলি প্রভৃতি গম্ভীর জিনিষও রহিল, আবার পালার চুড়ি, কাঁচপোকার টিপ, পানের ডাঁট, বিশকোটা প্রভৃতি চুটকি জিনিষেরও অভাব রহিলনা ;—খুলিয়া সাজাইলে একটা রীতিমত মনোহারীর দোকান পাতা যায়।

এই সব দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল, জিনিষ-কেনার বাতিকের একটা এপিডেমিক বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি, গরীব চাকরদাসীরাও নিস্তার পায় নাই। ছোট্টু যে অতবড় কৃপণ সেও নগদ দুই টাকা খরচ করিয়া এক লোটা কিনিয়াছিল। কেবল মন্নুকে কিছুই কিনিতে দেখি নাই—আহা, কার জন্যই বা কিনিবে ? সে কেবল অবাক হইয়া এই কেনা-কাটার ধূম দেখিত। কখনো কখনো দেখিতাম ফিরিওয়ালার এক

একটা জিনিষ সে হাতে করিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া দেখিতেছে, তারপর ধীরে ধীরে আবার রাখিয়া দিতেছে।

যাইবার দিন সকালে মন্নু আসিয়া বিরস বদনে বলিল—বাবুজি, আমার তো কিছু কেনা হল না।"

আমি বলিলাম—"তোর জন্যে কি নেব বল।"

সে বলিল—"আমার জন্যে কিছু চাই না ;—ভেইয়ার জন্যে—"

আমি বলিলাম—"এইনে টাকা, তোর খুসী কিনে নিয়ে আয়।"

মন্নু টাকা হাতে লইয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া দিল।

তাড়াতাড়ির সময়—যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত, এমন সময় দেখি ছোট্টুর সঙ্গে মন্নু বাজার হইতে ফিরিয়া আসিল—হাতে একটা ঝুলি। কি জিনিষ আনিল দেখিবার অবসর হইল না।

(৫)

কলিকাতায় ফিরিয়াছি। দাসী চাকর-দের কেমন রোগ বিদেশ হইতে ফিরিলেই তারা বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সকলেই সমস্বরে ছুটি চাহিয়া বসিয়াছে। গৃহিণী বাছিয়া বাছিয়া ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন ;—একসঙ্গে সবাই গেলে চলিবে কেন ?

ছোট্টু ছুটির দলে। সে বাড়ি যাইতেছে শুনিয়া মন্নুও বায়না ধরিল। আমি বলিলাম—"তা যাক।" কিন্তু ছোট্টুকে বিশ্বাস নাই, এবার তাকে একটু কড়া শাসন করিয়া দিলাম।

গোল বাধাইলেন গৃহিণী। তাঁর আপত্তি, মন্নু গেলে কিছুতেই চলিবে না, খোকাকে লইয়া ভারি মুস্কিল হইবে। এত লোক একসঙ্গে ছুটিতে যাইতেছে এ সময় মন্নুকে কিছুতেই ছাড়া যায় না। এবং কি করিতেই বা ও দেশে যাইবে ? ওর সেখানে কে আছে ?

আমি মন্নুর পক্ষ লইলাম কিন্তু হাকিমের হুকুম টলাইতে পারিলাম না। শেষে আমার সহিত তর্কে না পারিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"ও যদি যায় তো জন্মের মতো যাক—যেন আর এ বাড়ি-মুখো না হয় !"

মন্নু যাইবার হুকুম পাইয়া আহ্লাদে ছুটিয়া গিয়া ছোট্টুকে খবর দিতে গেল। হুকুমের সব অংশ সে তলাইয়া বোঝে নাই।

ছোট্টু আসিয়া বলিল—"মাইজি ! মন্নুর কি ছুটি মঞ্জুর ?"

ছোট্টুর মাইজি উত্তর দিলেন—"হাঁ একেবারে ছুটি !"

ছোট্টু মন্নুকে ধমকাইয়া বলিল—"যা ! তোর যেতে হবে না !"

মন্নু খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—তারপর তার চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

আমি গোপনে ছোট্টুকে ডাকিয়া বলিলাম—"যা, তুই চুপি-চুপি মন্নুকে নিয়ে যা। আমি সব ঠিক করে দেব।"

মন্নু চলিয়া গেলে খোকাকে লইয়া সত্যই গোল বাধিল। আমি একটা ঠিকা লোক রাখিলাম—কিন্তু তার গোঁফের বহর দেখিয়া খোকা তার দিকে কিছুতেই ঘেঁসিল না। গৃহিণীর গর্জ্জন বাড়িয়া উঠিল—আমারই শয়তানীতে যে এমনটা ঘটিল

একথা দিনের মধ্যে পাঁচশ বার আমায় শুনিতে হইল। আমি বলিলাম—"আমার হাতে তো কোনো কাজ নেই—দাওনা আমিই ছেলের চাকরী করি।"

গৃহিণী ধপ্ করিয়া আমার কাছে ছেলেটাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"এই নাও, তাই কর!"

আমি ঘণ্টাকতক ছেলের পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। তার পর ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। জাগিয়া দেখি খোকা কাছে নাই। তার পর কি হইল জানিনা—খোকার পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আর কোনো নালিশ শুনিতে পাইলাম না; খোকাকেও আমার কাছে পাঠানো হইল না,—বুঝিলাম, চাকর-নফরদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা আমাকেও চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

(৬)

সপ্তাহ না ঘুরিতেই দেখি মন্নু ফিরিয়া আসিয়াছে। ছোট্টু তো রাগিয়া অস্থির! সে বলে—"হতভাগা ছোঁড়ার জন্যে এক দণ্ডও দেশে থাকা হ'ল না, কেবল পয়সা নষ্ট, কান্নাকাটি করে ফিরে এল—কিছুতেই রইল না। রোসোনা আমি মজা দেখাচ্চি!"

গৃহিণীর রাগ বোধ হয় পড়িয়াছিল, মন্নুকে দেখিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল। কাজেই মন্নু খোকাকে লইবার হুকুম পাইল না। হুকুম হইল বাবুর যা-খুসী মন্নুকে লইয়া করিতে পারেন, আমার এবং আমার ছেলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই। মন্নু এ সব কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিল কি না জানিনা। সে দেখি একবার [illegible] পাইয়া ধাঁ করিয়া খোকাকে লইয়া একেবারে বাহির-বাড়িতে ছুট্ দিল। তার পর তার সঙ্গে রীতিমত জমাইয়া লইল তখন খোকাকে তার কাছ-ছাড়া করে কার সাধ্য! গৃহিণী নিরুপায়ের ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন —"হতভাগা ছেলেটা বাপেরই ধার পেয়েছে। নিজের গোঁ কিছুতে ছাড়বে না!

আমি সেই দিন বৈক[illegible] ইসিচেয়ারে হেলান দিয়া তামাক টানি[illegible] মন্নু ধীরে ধীরে আমার কাছে আসি[illegible] ঘুরপাট করিয়া দাঁড়াইল। আমি বলি[illegible]—"কি মন্নু?"

মন্নু একটা উৎকণ্ঠার [illegible] বলিল—"আমার ভেইয়া কোথায় গেল বাবুজি?"

ভেইয়ার কথা মন্নুর [illegible] হঠাৎ একটা উত্তর দিয়া [illegible] দিতে ইতস্তত করিতেছিল[illegible]। এমন সময় সে আবার বলিল—"কোথায় গেল বাবুজি?"

আমি বলিলাম—"কেন বল দেখি?"

সে বলিল—"ভেইয়ার জন্যে নৌকা কিনেচি, সে তো তাকে দেওয়া হয়নি ভেইয়াকে যে দেখতে পেলুম না!—ভৈঁসও নেই, বকরীও নেই। দরিয়ায় গেলুম সেখানে তো ভেইয়া চান করতে যায়নি, মাঠে গিয়ে ডাকলুম সেখানেও তো জবাব পেলুম না। তবে কোথায় গেল বাবুজি।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

মন্নু বলিতে লাগিল—"ভেইয়াকে একটা চিঠি দিয়েছিলুম—খোকাবাবুর জন্যে ভৈঁস

[illegible]তে। ভেইয়া তাই দেশ থেকে ভৈঁস [illegible]য়ে আসচে—না?"

আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম [illegible]—গম্ভীরভাবে শুধু বলিলাম—"হুঁ।"

মন্নু দৌড়িয়া গিয়া লোটাটা লইয়া আসিল, বলিল—"বাবুজি! তবে এই লোটা তোমার কাছে রেখে দাও, নইলে ছোট্টু নিয়ে নেবে। ভেইয়া এলে দিয়ো!"

বলিয়া সে খোকাবাবুর কাছে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাষা-সংস্কার

ভাষা নি[illegible] আমাদের পাঁচজনের বাদ-প্রতিবাদটি [illegible] পুরোনো তেমনি একঘেয়ে [illegible]য়ে আসছে। এ তর্ক করবার ধৈর্য্য [illegible]নবকদের থাকতে পারে—কিন্তু শোনবার ধৈর্য্য পাঠকদের সম্ভবতঃ আর নেই। অতএব এ তর্কে ক্ষান্ত দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে যে আমি আবার এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি তার কারণ—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতামত আমি উপেক্ষা করতে পারিনে, কেননা তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ্। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, এমন কি ছন্দ নিরুক্তেরও তিনি সন্ধান রাখেন। তাঁর মতামতসকল ভাষা-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমার মতামত ভাষাজ্ঞানের উপর। এ বিষয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ অধিকারী, আমি কনিষ্ঠ অধিকারী। এ সত্ত্বেও মৌখিক ভাষার উপর তাঁর আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

মজুমদার মহাশয় আমাদের নাম দিয়েছেন—ভাষা-সংস্কারক। আমরা এ নামের যোগ্য নই। কেননা, আমরা বাংলা ভাষা মুখে মুখে যেমন চল্‌ছে Bookএ Bookএও তেমনি চালাতে চাই। সংস্কারক হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা মৌখিক ভাষাকে সংস্কৃত করে সাধুভাষা রচনা করেছেন। আমরা সাধু ভাষার সংস্কার করতে চাইনে, ও বস্তু আমরা ত্যাগ করতে চাই। এ কথা মজুমদার মহাশয়েরও অবিদিত নেই। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি শুনেছিলেন যে আমরা হুতুমি বাংলা চালাবার প্রস্তাব করেছি এবং নিজেরাও ঐ রীতিতে রচনা প্রকাশ করছি। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝেছেন—যে আমাদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ মিথ্যে। অর্থাৎ তিনি আলাপে বুঝেছেন যে আমরা প্রলাপ বকিনে। হুতুমি বাংলা—ভাষা নয়—Slang, সে উপাদানে standard prose গড়বার চেষ্টা বাতিকগ্রস্ত নয়—বিকারগ্রস্ত লোকেই করতে পারে। ইয়ারকির ভাষায় যে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, ইতিহাস লেখা চলে না—এ জ্ঞানটুকু যার নেই, তার সঙ্গে জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিরা কখনই ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন না। সুতরাং বাংলাদেশের এত

গুণী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র এবং শাস্ত্র ধারণ করেছেন, তখন মজুমদার মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল যে, ভাষাকে সংস্কার করে আমরা তা slang-এ পরিণত করতে চাইনে। সাধুভাষার উপর আমার অশ্রদ্ধার কারণই এই যে, ও বস্তু—ভাষা নয়—slang ;—ইয়ারকির slang নয়, পাণ্ডিত্যের slang। হুতুম পেঁচার ভাষা এবং লক্ষ্মী পেঁচার ভাষায় যে প্রভেদ, এ দুয়ের ভিতরও সেই প্রভেদ। এ ভেদ জাতিগত নয়,—সম্প্রদায়গত।

মজুমদার মহাশয় বলেন যে, সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে আমরা যে ব্যবস্থা করতে চাই—তাই নিয়েই মতভেদ। এ কথা সত্য। "করিয়া" এবং "করে"র ভিতর যে ব্যবধান, বইয়ের ভাষা এবং মুখের ভাষার ভিতর ঠিক সেই ব্যবধান, তার চাইতে এক চুল কমও না, একচুল বেশীও না। এই "ইয়ার" স্পর্শে ভাষা যে কেন এত সাধু হয়ে ওঠে তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা কঠিন, এবং যেখানে সহজ বুদ্ধিতে কুলোয় না, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। মজুমদার মহাশয় তাই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যে নিয়ম অনুসারে "করিয়া" কালক্রমে "ক'রে"তে পরিণত হয়, তার ইংরাজি নাম, phonetic decay। তথাস্তু! কিন্তু ভাষার এই স্বাভাবিক অক্ষরচ্যুতি ক্ষয়-রোগ নয়—বরং অনেক ক্ষেত্রে তা উন্নতিরই লক্ষণ। "করিয়া" এই ক্রিয়াপদের "করে"তে পদোন্নতি হয়েছে—এই হচ্ছে আমার মত। "বাংলা ভাষা বনাম সাধুভাষা ওরফে বাবু-বাংলা" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি—এ স্থলে সে তর্কের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তার পর সর্ব্বনামের কথা। সর্ব্বনাম খর্ব্ব হলে যে তার সর্ব্বনাশ হয় এর কোনরূপ প্রমাণ নেই। মজুমদার মহাশয় বলেন যে—"আমি, আমরা, তোমাকে, তোমাদের... প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই [illegible] গিয়াছে। "সে" এবং "তিনির" বহুবচনে এবং কর্ম্মাদি কারকের রূপে যে "হা" এবং "হাঁ" আসে, তাহা লোপ করিলেই [illegible] গায়ের জোর অধিক হইবে এবং [illegible] গাম্ভীর্য্য বাড়িবে, তাহা বুঝিয়া উঠা [illegible]"

এর নাম,—বাংলায় য[illegible], উল্টো চাপ। আমরা ত ক[illegible] কোন শব্দের কোনও অঙ্গের হানি [illegible] চাইনি। আমরা বলি—সর্ব্বনামের [illegible] পুরুষের দেহ হতে যে "হা" কালবশে [illegible] পড়েছে—তাকে কুড়িয়ে নিয়ে জুড়ে [illegible] সে পুরুষের গায়ের জোর বাড়ে না—শুধু [illegible]-ভারি হয়। ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য, [illegible] প্রভৃতি শব্দের স্মরণমাত্র যাঁদের লেখনী [illegible] স্বতঃই মসী-ক্ষরণ হয়, তাঁরাই উক্ত লু[illegible] "হা"কে রচনায় যুক্ত করবার পক্ষপাতী। শব্দের অক্ষর-সংখ্যার বেশি-কমের উপর যে ভাষার ব্যক্তি-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে—এ সত্যের পরিচয় আমরা কোন সাহিত্যেই পাইনি। যাঁদের সাহিত্যে লম্বাই-চৌড়াই করবার অভিপ্রায় আছে—কেবলমাত্র তাঁরাই লম্বা-চৌড়া কথার পক্ষপাতী। আর যদি শব্দে বর্ণাধিক্যে ভাষার গৌরব বাড়ে, তাহলে সাধুভাষায় "আস্তার" "তুম্ভার"ও লেখা উচিত; তাতে যে ভাষার ভার বাড়বে, তার আর কোনও সন্দেহ

[illegible]ই। হিন্দি ভাষার উপর একটু কৃপাদৃষ্টিপাত [illegible]লেই মজুমদার মহাশয় দেখতে পাবেন [illegible] তাঁর প্রিয় হকারের সংসর্গে সর্ব্বনাম [illegible] ভাষায় গ্রাম্যতারই পরিচয় দেয়। [illegible]কো" ভদ্র[illegible]—কিন্তু "উন্‌হিকো" দেহাতি [illegible] এবং [illegible]নানা বুলি। অবলীলাক্রমে [illegible] উচ্চারণ করবার ক্ষমতা মানুষে যুগ-[illegible]ন্তরের [illegible]নার ফলে লাভ করেছে। [illegible]রা "উন্‌[illegible]কা" বলে, হিন্দুস্থানীদের [illegible] তাদের [illegible]ান্ দুরস্ত" হয় নি। তার [illegible]রণ ঝোঁক [illegible]রে শব্দ উচ্চারণ করবার [illegible]তর রসনা[illegible]শের পরিচয় পাওয়া যায়। [illegible] দেশেও [illegible]জাতির নিকট সর্ব্বনামের [illegible]থম পুরুষ [illegible]রবে "ওনারা" "তেনারা" [illegible]মে পরিচি[illegible] সাধুভাষায় যদি "হা" গ্রাহ্য [illegible], তাহলে [illegible] গ্রাহ্য হবে না কেন? এর [illegible]রে সাধু[illegible] হয়ত বলবেন, যে "হা" [illegible]বালি এবং "না" মেয়েলি। তা হলেই [illegible]ল, জো[illegible]র, সাহিত্য তার। এই [illegible]া-সমস্যার [illegible] গায়ের জোরে মীমাংসা [illegible] হয়, তাহলে অবশ্য আমাদের কিছু [illegible]ব্য নেই। সাধু ভাষার আক্রমণ থেকে [illegible]তৃভাষাকে রক্ষা করতে আমরা যুক্তি-তর্ক [illegible]য়োগ করা ব্যতীত অন্য কোনও উপায় [illegible]নিনে।

মজুমদার মহাশয় আসলে আমাদের এই [illegible]ক্ত-তর্ক-করা-স্বরূপ ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধেই [illegible]হস্ত হয়েছেন। তাঁর শেষ কথা এই—

"তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা যায় [illegible] চৌধুরী মহাশয় যে পন্থা অবলম্বনীয় মনে [illegible]রেন, তাহাই প্রশস্ত, তাহা হইলেও দশজনের [illegible]বলম্বিত পন্থা তিনি একাকী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যেখানে চরিত্রনিষ্ঠার কথা নাই, জীবন-মরণের কথা নাই, সেখানে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজের মতটি গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার মত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রচলিত প্রথাই মানিয়া চলিতে হইবে।"

অর্থাৎ অপরকে মৌখিক ভাষায় লিখ্‌তে উপদেশ দিয়ে নিজে সাধুভাষায় লেখাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য, কেন না সাহিত্যে "চরিত্র-নিষ্ঠার কথা নেই।" চরিত্র-নিষ্ঠা শব্দের অর্থ কি, তা আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ এটি হচ্ছে ইংরাজি character শব্দের সাধু-অনুবাদ। কিন্তু এ কথা কি ঠিক যে সাহিত্য-সমাজে character বলে কোনও পদার্থ নেই? সাহিত্য কি sincerity বঞ্চিত? যদি তাই হয়, তাহলে যে insincere লেখক সাহিত্য সম্বন্ধে মুখে বলবেন এক, এবং কাজে কর্‌বেন আর, তাঁর প্রচারিত মত সাহিত্যে সত্বর গৃহীত হবার কি কোনরূপ সম্ভাবনা আছে? মজুমদার মহাশয় বলেছেন, এ স্থলে জীবন-মরণের কথা নেই। এ কথা ঠিক। যদি জীবন-মরণের কথা থাক্‌ত, তাহলে বাঙ্গালী লেখকেরা ভাষা সম্বন্ধে এত যথেচ্ছাচারী হতেন না। জোর করে বঙ্গ সরস্বতীর ধাৎ বদলে দেবার অভিপ্রায়ে তাঁকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করায় যদি যথেচ্ছচারিতার পরিচয় দেওয়া না হয় ত কিসে হয়, তা জানি নে। এবং সাধু-পন্থীরা আজ একশ' বৎসর ধরে সেই কাজ করে আস্‌ছেন। ভাষার উপর অত্যাচার করায় বাঙ্গালী জাতির দৈহিক জীবন-মরণের কোনও কথা অবশ্য নেই,

কিন্তু মানসিক মরণ-বাঁচনের কথা আছে। বাংলা শব্দের যে একটা বিশেষ রকম ঝোঁক ও টান আছে, সেই কথাটা আমাদের জানিয়ে দেবার জন্য মজুমদার মহাশয় অনেক বাক্যব্যয় করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের যে সে জ্ঞান নেই আকারে ইঙ্গিতে তাও জানিয়ে দিয়েছেন! রবীন্দ্রনাথের যে ছন্দের কান নেই, এ অবশ্য বড়ই দুঃখের বিষয়; কেন না তিনি হচ্ছেন, বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু এও কম দুঃখের বিষয় নয়, যে, মজুমদার মহাশয়ের এ জ্ঞান নেই যে বাঙ্গালীর মনেরও একটা বিশেষ রকম ঝোঁক এবং টান আছে। সে ঝোঁক এবং সে টানের পরিচয় পাওয়া যায়—বাঙ্গালীর ভাষায় অর্থাৎ যে ভাষায় তাঁরা কথা কন, সেই ভাষায়। ভাষা শুধু কানের জিনিষ নয়, প্রাণেরও জিনিষ। বাঙ্গালী-মনের গড়নের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর ভাষা গড়ে উঠেছে। কি ভাব আমরা প্রকাশ করতে চাই এবং কি ভাবে তা প্রকাশ করতে চাই, তার পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের মুখের ভাষায় এবং প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্যে;—এই সাধু ভাষা নামক "এক-পুরুষে বনেদি বড়মানুষ" ভাষায় নয়। এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, এ ভাষা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকদের হাতে তৈরি হয়েছে; বঙ্গভাষার স্বাভাবিক ইভলিউসনে তা এ-হেন সাধু আকার ধারণ করে নি। স্বাভাবিক ইভলিউসনে ভাষার কি রকম পরিবর্ত্তন হয়, তার পরিচয় কবি-কঙ্কণ চণ্ডীর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের যোগাযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত ক্‌র দেখ্‌তে পাবেন। সুতরাং দশজনেই লি আর বিশজনেই লিখুন, এই সাধু অবলম্বন করতে আমি অপারগ, সে ভাষা যেমন আড়ষ্ট, তেমনি অশুদ্ধ। কৃত্রিম ভাষা লিখতেই হয়, তাহলে উনবি শতাব্দীর প্রথম-ভাগের পণ্ডিতি বাং ফিরে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। সাহি আমার ব্রাহ্মণ-ভক্তি আছে। মৃত্যু তর্কালঙ্কার, রামমোহন রায়, আনন্দ বেদান্তবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি রচনায় সংস্কৃত শব্দের দুষ্ট প্রয়োগ নে সংস্কৃত শব্দ যদি ব্যবহার করতেই হ তাহলে সে শব্দের অর্থ জানা আবশ্য তার লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা দুইই জা আবশ্যক এবং তার যথাযথ প্রয়োগ ক আবশ্যক। সাধু ভাষায় এ সকলই উপে হয়। যদি কেউ বিভক্তিহীন সংস্কৃত লিখ পারেন এবং সে রচনাকে বাংলা চালাতে পারেন, তাহলে তিনি তা কর আমার আপত্তি—এই হঠাৎ-নবাব ভাষার বিরুদ্ধে। কেননা সে ভাষার বিশি বিভক্তি-হীনতা নয়, ভক্তিহীনতায় উ প্রতিষ্ঠিত। বাংলা এবং সংস্কৃত এই ভাষার প্রতি সমান অভক্তি থেকেই ভাষা জন্মগ্রহণ করেছে।

মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে, অ অর্থ শব্দরাশি নয়। Vocabulary structure-এর উপরই সকল অ প্রতিষ্ঠিত। এই কথা আমি অন্তত বার বলেছি। বাংলা এবং সংস্কৃত এ ভাষার গঠনের পার্থক্য এত বেশী

একটির ছাঁচে আর-একটিকে ঢালা না। সুতরাং বাংলা ভাষা অপর ার ছাঁচে ঢালাই করে নিতে গিয়ে পন্থীরা সে ভাষাকে সংস্কৃত নয়, বিকৃত রে ফেলেছেন। আমি প্রবন্ধান্তরে দেখিয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রেরও সাধুভাষা শুদ্ধ ভাষা নয়। ং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেও যখন সাধুভাষা কারগ্রস্ত হয়েছে, তখন আমাদের হাতে র অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তা ছাড়া তিভার সাত খুন মাপ, কিন্তু তোমার-ামার কলমের আঁচড়টুকুও সরস্বতীর য়ে অসহ্য।

শব্দরাশি ভাষা নয়—কিন্তু সেই শব্দরাশির র্ব্বাচন ও প্রয়োগের গুণেই style ণগ্রহণ করে। সুতরাং বাংলা গদ্যে তদিন style দেখা দেবে না, যতদিন ামরা লেখায় নির্ব্বিচারে একরাশ শব্দ ড় করবার লোভ সম্বরণ করতে না ারব।

মৌখিক ভাষার অনুরূপ ক্রিয়াপদ এবং র্ব্বনামপদ লেখায় ব্যবহার কর্‌লে সকলেই খতে পাবেন, যে, খাঁটি বাংলার কাঠামোর তর শব্দাড়ম্বের অবসর অতি বিরল। ন না, সর্ব্বনামের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের ঝোঁক রে গিয়ে ভাষা অতিরিক্ত ঝরঝরে হয়েছে ং ক্রিয়াপদের অতিরিক্ত স্বরের টান মে গিয়ে ভাষা অতিরিক্ত সচল হয়েছে। -সরস্বতী যে তন্বীশ্যামাশিখরদশনা,— লানীলাপ্রকটদশনা নন,—এ কথা তিনিই ানেন, যিনি তাঁর বীণাও শুনেছেন, াকে চোখেও দেখেছেন। আমি প্রবন্ধা-রে দেখিয়েছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য অবশেষে বাংলায় এসে উপনীত হয়েছিল। তিনি বাংলা গদ্যকে যেখানে এনে পৌঁছে দিয়েছেন, আমরা সেখান থেকে ক্রিয়াপদে আর-একটু অগ্রসর হতে চাই।

(২)

কিন্তু মাতৃভাষার দিকে ঐ আর এক পা অগ্রসর হতে গেলেই এত পণ্ডিত ব্যক্তি যে আমাদের পথ আগলে দাঁড়ান, তার একটি গূঢ় কারণ আছে। মানুষের মনে কোনও একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেলে, হাজার তর্ক-যুক্তিতে তার উচ্ছেদ করা যায় না। রোগ যেখানে psychologyর সেখানে logic-এর চিকিৎসা খাটে না। বাংলাভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা থাকাটাই আমাদের মনের পক্ষে স্বাভাবিক। এ অবজ্ঞা আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট উত্তরাধিকারী-সূত্রে লাভ করেছি। এই যুগ-সঞ্চিত সংস্কার বাংলার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে এতই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, প্রায় একশত বৎসরের নব-শিক্ষার বলেও সে সংস্কার আজও একেবারে নির্ম্মূল হয় নি। বাংলার পূর্ব্ব ইতিহাসের দিকে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করলেই এ সংস্কারের মূল কারণ আমাদের চোখে পড়্‌বে। প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বাংলার একমাত্র শিক্ষিত-সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁদের সকল শিক্ষা-দীক্ষার ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং তাঁরা চিরকাল বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করেছেন এবং নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছেন। বাংলা যে একটি ভাষা, এ কথাও তাঁরা কখন স্বীকার করেন নি, কেন না তাঁদের মতে ও বস্তু শুধু সংস্কৃতের অপভ্রংশ। গৃহসূত্রে দেখ্‌তে

পাই যে, সেকালে আর্য্যেরা বাংলা দেশে পদার্পণ করবা-মাত্র তাঁরা ব্রাত্য হতেন, অর্থাৎ তাঁদের জাত যেত,—যেমন একালে বিলেত গেলে আমাদের জাত যায়।

সম্ভবতঃ ঐ একই কারণে সংস্কৃত ভাষার বাংলা দেশের মাটিতে পা ঠেকবা-মাত্র তা পতিত হয়েছিল এবং এই পতিত ভাষার নামই বাংলা ভাষা। এই কারণেই এ ভাষা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিকট চিরকাল অস্পৃশ্য ছিল। চৈতন্যদেব যে এ ভাষাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তার কারণ, তিনি পতিতকে উদ্ধার করবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যিনি আপামরচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে বাংলাভাষাকে কোলে তোলা ত অতি সামান্য কথা। এ যুগে আমরাও ইংরাজি শিক্ষার গুণে ব্রাত্যকে ফের জাতে তুল্‌তে চাই, কিন্তু তা শুদ্ধ করে। আমরাও বাংলা ভাষাকে সাহিত্যে টেনে তুলতে চাই, কিন্তু সে তার গলায় পৈতে দিয়ে। এই হচ্ছে সাধুভাষার জন্ম-বৃত্তান্ত। অপর পক্ষে যাঁরা বাংলা ভাষা যেমনটি আছে তেমনিটি ছাপার অক্ষরে তুলে নিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সাহিত্যকে পতিত করবার অভিযোগ আনা শুচিবাতিকগ্রস্ত সাহিত্যিকদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এ দু'দলের মধ্যে কোন্ দলের মত ঠিক, তা ফলেন পরিচীয়তে। এস্থলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি বাংলা ভাষা এতই অবজ্ঞার বস্তু ছিল, তাহলে প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগে বাংলা সাহিত্য কি করে রচিত হয়ে ছিল? সংক্ষেপে তার উত্তর দিচ্ছি।

প্রথমতঃ সে যুগে বাংলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যে টীকা-ভাষ্যের বিপুল সাহি রচনা করে গিয়েছেন, সে-সবই সংস্কৃত ভাষা কৃত্তিবাস প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভার অনুবাদকেরা অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছি কিন্তু তাঁরা কেউ আর স্বেচ্ছায় ব লেখেন নি, সকলেই রাজ-আজ্ঞায়। নসর হুসেনশা প্রভৃতি গৌড়ের পাঠান বাদশা এবং ছুটি-খাঁ, পরগল খাঁ প্রভৃতি পা সেনাপতিদের দৌলতেই বাঙ্গালী রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতির পরিচয় লাভ করেছে। চৈতন্য-মতাব কোনও কোনও পণ্ডিত অবশ্য ভাষায় রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের অতি স্বল্প, দু'চার জনের অধিক হবে চৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন কি আমাদের জানা নেই। অপর-পক্ষে চৈ চরিতামৃতের রচয়িতা কবিরাজ গোস্ব মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু ব্রা ছিলেন না। জাতিতে ইনি বৈদ্য; সম্ভ সেই কারণে তাঁর গুরু জীব গোস্ব কবিরাজ মহাশয়কে চৈতন্যের জীবন-চ ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে আদেশ কর কেন না জীব গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, কিন্তু সে সংস্কৃত ভাষায়।

তা ছাড়া, যে বৈষ্ণব সাহিত্যের যুগে এত গৌরব করি, সে সাহিত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কতদূর অবজ্ঞার ছিল, তার প্রমাণের জন্য আমাদের দূর যেতে হবে না। বাংলা গদ্যের গুরু স্বয়ং রামমোহন রায়ও এ কুসংস্কা

ভূত ছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখে ছেন যে, চৈতন্য-পন্থীরা ধর্ম্মবিচারে অধিকারী ; কেননা তাদের শাস্ত্র ভাষায় লেখা। এরূপ মনোভাবের মূলে অবশ্য একটি কারণ ছিল—এবং সে কারণ এই বাংলা ভাষা সেকালে বিদ্যাশিক্ষার ষা ছিল না। বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, অলঙ্কার, ইতিহাস প্রভৃতি ছুই ছিল না; ছিল শুধু ছড়া আর চালি, গান আর পদাবলী। রামমোহন য় যে বাংলার বৈষ্ণবশাস্ত্রকে মোটে ামলেই আনেন নি, তার কারণ সে স্ত্র পয়ার লাচাড়িতে লিখিত। তিনি এ াস্ত্রকে বরাবর "চৈতন্য মঙ্গলাদি পয়ার" লেই উল্লেখ করেছেন। এ পয়ার যে র্শন বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষে নিতান্ত নুপযোগী ছিল তার বিশিষ্ট উদাহরণ চৈতন্যচরিতামৃত।" এই কাব্য হচ্ছে লমান-যুগের একমাত্র গ্রন্থ, যাতে দর্শনের াখ্যা এবং বিচার আছে। পাঠকের কথা র থাক্, স্বয়ং গ্রন্থকারও স্পষ্ট বুঝে-ছলেন যে, ভাষায় তিনি নিজের বক্তব্য থা মোটেই স্পষ্ট করে বল্‌তে পারেন নি, কননা একালের ইংরাজি শিক্ষিত অধ্যাপক হাশয়েরা যেমন কথায় কথায় ইংরাজি quote করেন কবিরাজ মহাশয়ও তেমনি াতায় পাতায় সংস্কৃত quote করছেন। াগবত, উজ্জ্বল নীলমণি, কর্ণামৃত এবং াব্যপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোক তিনি তাঁর াংলার টীকা স্বরূপে ব্যবহার করেছেন। রূপ ব্যবহার যে অসঙ্গত তা তিনি নিজেও ানতেন। কারণ তিনি লিখেছেন—

যদি কেহো ঐছে কয়ে গ্রন্থ কৈলে শ্লোকময়ে
ইতর জনে নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যে আচরণ সেই করি বর্ণন
সেই চিত্ত নারি আরাধিতে।

এই একই কারণে ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাও মাতৃভাষাকে প্রথমে অবহেলা করতেন, আবার সেই ইংরাজি শিক্ষার গুণেই বঙ্গভাষা আমাদের সুনজরে পড়েছে। দেশ-ভাষায় যে কি অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-শালী সাহিত্য রচিত হতে পারে—তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, ইংরাজি সাহিত্য আমাদের চোখের সুমুখে অষ্ট প্রহর রয়েছে। আমাদের নূতন শিক্ষার প্রসাদেই আমরা মাতৃভাষাকে ভক্তি করতে না হোক্ চর্চ্চা করতে শিখেছি। আমরা যে বঙ্গ-ভাষার ক্রিয়াকর্ম্মগুলি করায়ত্ত করতে চেষ্টা করছি, বর্ত্তমানের পক্ষে এই যথেষ্ট। ভক্তি পরে আস্‌বে তখন, যখন এ ভাষায় জ্ঞানের সাধনা করা যাবে। অর্থাৎ যখন এ ভাষা শুধু সাহিত্যের নয়, শিক্ষারও ভাষা হয়ে উঠবে। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই ত্রিমার্গ অবলম্বন না করলে ভাষাও মুক্তিলাভ করে না।

যে ভাষা শুধু কাজের ভাষা তা অপভাষা; যে ভাষা কাজের এবং হৃদয়ের ভাষা তা উপভাষা, যে ভাষা জীবন মন এবং জ্ঞান এ তিনেরই ভাষা, তাই হচ্ছে পূর্ণাবয়ব ভাষা। যতদিন না বাংলা, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হয়ে উঠবে, ততদিন বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে না। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি যতদূরসম্ভব

অল্পকথায় এবং পরিষ্কার করে লেখা উচিত। যেখানে বিষয় কঠিন সেখানে ভাষা সহজ হওয়া একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানের রাজ্য সকলের পক্ষে সুগম কর্‌বার জন্য একটি standard prose গড়ে তোলা দরকার, এবং আমার বিশ্বাস সে গদ্য মুখের কথা দিয়েই গড়তে হবে নচেৎ দর্শন বিজ্ঞান সুখপাঠ্যও হবে না, সহজ বোধ্যও হবে না। সাধুভাষায় লিখিত দর্শন বিজ্ঞানের পুস্তক পুস্তিকা প্রবন্ধ নিবন্ধাদি পড়ে দেখবেন যে, সে পাঠে না আছে কোনও আনন্দ, না আছে কোনও শিক্ষা। ভাষার শক্তি ও গতি তার পদের দীর্ঘতার উপর নয়, তার দেহগ্রন্থির উপর নির্ভর করে। মৌখিক ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল যে-কব্জায় যে-ভাবে গাঁথা আছে লেখার ভাষাও সেই কব্জায় সেই ভাবে গেঁথে নিতে হবে। সাধুপন্থীরা বাংলাভাষার পদমর্য্যাদা বাড়াতে গিয়ে তাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছেন। মৌখিক ভাষা যে সাহিত্যে চল্‌বে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু ভাষা জীবন্ত সে কারণ চলৎ-শক্তি একমাত্র তারই আছে। প্রতি জীবন্ত ভাষার একটি বিশেষ ঝোঁক্‌টান্ নয়, একটি বিশেষ রোখ্‌ও আছে; সেই রোখেই তা এগিয়ে যাবে, কেউ তার উন্নতির পথ আট্‌কাতে পারবে না;—এর জন্য শোক বৃথা নিষ্ফল।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

চয়ন

রোমা রোলাঁ

এ-বছর সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছেন, ফরাসী ঔপন্যাসিক রোমা রোলাঁ।

ফ্রান্সের মধ্যস্থলে ক্লেমেন্সি নামক স্থানে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রোমা রোলাঁ জন্মগ্রহণ করেন। প্যারি ও রোম সহরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে তিনি মালউইজ ভন্ ওয়েসেন্‌বার্গ নামক একজন জার্মান রমণীর সঙ্গলাভ করেন। এই রমণী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবের পর হইতে ইংলণ্ডে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিদুষী মহিলা মাজিনি, সঙ্গীত-রচনা-কুশল ওয়াগনার, বিখ্যাত লেখক নিট্‌শে, মহাবীর গ্যারিবল্ডী, নাট্যকার ইব্‌সেন প্রভৃতি সেকালের বিশ্ব-কলা ও কর্ম্মরাজ্যের অনেক প্রতিভাবানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে রোলাঁর যখন প্রথম আলাপ হয় রোলাঁ তখন টলষ্টয়ের শিষ্য ছিলেন। তারপর জার্মান মহিলাটির অসাধারণ কর্ম্ম ও অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসিয়া বিশ্ব-

যাঁহার নিজের স্বাধীন হৃদয়-ভাবটি শীঘ্রই বিকার করিতে পারেন। উক্ত মহিলা আপনার স্মৃতি-পুস্তকে রোলাঁ'র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :— "এই ফরাসী-যুবকের ভিতরে ঠিক তেমনি ভাববাদ, তেমনি উচ্চাকাঙ্খা, তেমনি প্রগাঢ় জ্ঞানের ধারণা-শক্তি দেখিতে পাইতেছি, যাহা আমি স্বজাতীয় মহাপুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি।"

রোলাঁ'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক "জন ক্রিষ্টোফারে"র বীজ, তাঁহার মনে এই সময়েই অঙ্কুরিত হয়। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া

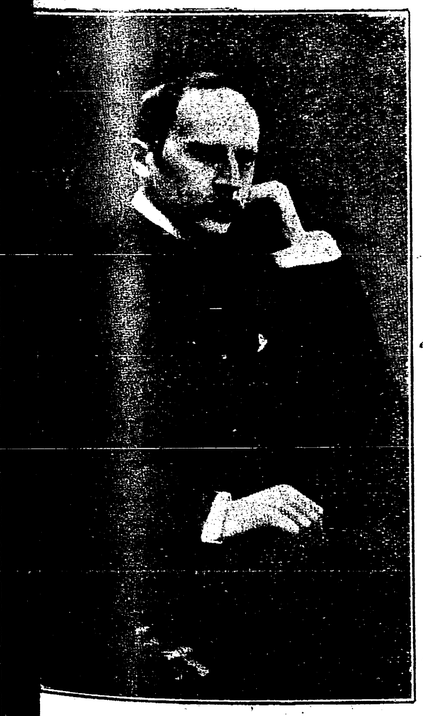

রোমা রোলাঁ

'সামাজিক যন্ত্র'-রূপে রঙ্গালয়ের পুনর্গঠনের দিকে তিনি মনোযোগ দেন ও কয়েকখানি নাটকও রচনা করেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি তিনি সঙ্গীত-সমালোচক এবং সঙ্গীত-কলাসম্বন্ধে বক্তারূপে সোর্বান নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

তিনি বীথ্‌হোভেন, মাইকেল এঞ্জিলো ও হুগো উল্‌ফের জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। রোলাঁ বীরত্বের একান্ত ভক্ত। তাঁহার চোখে মহাপুরুষেরা পূর্ণ-সত্যের অবতার। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র ক্রিষ্টোফার পরম সত্যবাদী;—সর্ব্ব অবস্থায়, এমন-কি, জীবন বিপন্ন হইলেও তিনি মিথ্যা-কথা কহিবেন না। ইহাই রোলাঁ'র নীতি। "জন ক্রিষ্টোফার" নামক উপন্যাসের সর্ব্বত্রই সঙ্কীর্ণ সামাজিক নীতিজ্ঞান ও ক্রিষ্টোফারের পবিত্র চরিত্রের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাত অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে,—ক্রিষ্টোফার সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত ও জাতীয় অসত্যের ভিতর গিয়া পড়িতেছেন এবং সমাজে যে কিরূপ মিথ্যাচারের প্রভাব, ক্রিষ্টোফার তাহাও সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

"জন ক্রিষ্টোফার" উপন্যাসের মধ্যে সাহিত্য-সৃষ্টির কোন-রকম কল-কৌশল, এমন কি একটা নির্দ্দিষ্ট ঘটনা-সংস্থান পর্য্যন্ত নাই। পদ-যোজনার সকল নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দগুলি একীকৃত হইয়া আছে এবং কোনরূপ সুশৃঙ্খল দার্শনিকতার ধার না ধারিয়া ইহার প্রত্যেক ভাব, অপর ভাবের ধারাকে ঠিক স্বাভাবিক রূপেই অনুসরণ করিয়া

চলিতেছে। সত্যের প্রকাশ হইলে জীবন যেমন সরল বলিয়া বুঝা যায়, এই উপন্যাসখানিও তেমনি সহজ, তেমনি পরিষ্কার। নায়ক ক্রিষ্টোফারের নিজের জীবনে যাহার পরখ হয় নাই, জীবন লইয়াও এমন কোনকিছু এই উপন্যাসে কথিত বা চিন্তিত হয় নাই। ক্রিষ্টোফারের নিকটে যাহা অসত্য, লেখকও তাহার অস্তিত্ব দেখাইতে যান নাই; মানবীয় উন্নতি-অবনতির এমন কথা খুব কমই আছে যাহা এই পুস্তকে আলোচিত হয় নাই,—বর্ত্তমান যুগের সকল পুস্তক অপেক্ষা 'জন ক্রিষ্টোফারে' আধুনিক জীবন লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ভাব-জগৎ হইতে 'জন ক্রিষ্টোফার' একটি বিশাল সেতুর মত বিংশ শতাব্দীর ভাব-জগতের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সকল ভাব ও কল্পনা যেখানে পুঞ্জীভূত ক্রিষ্টোফার ঠিক সেইখানটি হইতেই ভবিষ্যতে পানে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিষ্টোফারে জীবন সরল ও সম্পূর্ণ বাস্তব; যাঁহার সুস্থ আছে, এই পুস্তক তাঁহাকে আনন্দ শিক্ষাদান করিবে এবং ক্রিষ্টোফারের স যাত্রা করিয়া পরিণামে তিনি বুঝিতে পারিবে যে, পৃথিবীতে কান্নার পিছনেও হাসি ধারা আছে, দুঃখের মধ্যেও সুখের ছ আছে।

'জন ক্রিষ্টোফার' বিংশ শতাব্দীর প্রথ প্রধান গ্রন্থ। ইহাতে বিংশ শতাব্দীর আবাহ সঙ্গীত আছে। আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াই ইহা তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছে। ই অতীত ও বর্ত্তমানকে প্রকাশ করি আমাদের চোখের সামনে ভবিষ্যতের মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

সারা বার্ণাড্

সারা বার্ণাড্ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। গত অর্দ্ধশতাব্দী-কালের মধ্যে আর কোন অভিনেতা তাঁহার প্রতিভাকে মলিন এবং জনসাধারণের উপরে তাঁহার মত এত প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই। আজ তাঁহার বয়স সত্তর বটে; কিন্তু বৃদ্ধ কালও তাঁহার চির-যৌবনের কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও সারার মুখে যুবতীর লাবণ্য এবং কণ্ঠস্বরে যৌবনোচিত কোমলতা আছে।

জনসাধারণে তাঁহার নাম দিয়াছে 'স্বর্গীয় সারা'। কিন্তু কেবলমাত্র অভিনেত্রী বলিয়া সারা সুপরিচিত নন, মানসিক শক্তি ও আদর্শ-চরিত্রের জন্যও তিনি সকলকার শ্রদ্ধা-ভক্তির অঞ্জলি পাইয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু যুগের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। সারার আলাপ আলোচনা ক্ষমতাও বড় অল্প নহে।

আমরা এখানে তাঁহার আত্ম-উক্তি তর্জ্জমা করিয়া দিলাম:—

"সকলেই আমাকে আজকাল জিজ্ঞাসা করেন যে, 'কিরূপে আমি আমার যৌবন রাখিতে পারিয়াছি'"—

কিরূপে? হৃদয়ে সর্ব্বদাই আমি যৌবনের

পা পাই বলিয়া। মানসিক যৌবনই আমার দেহকে জরাগ্রস্ত হইতে দেয় নাই। তারপরে, কাজের দিকে আমার টান বড় বেশী। আমার ডাক্তার যদি আমাকে কিছু করিতে বলেন, তবে আমি কিছুতেই তা করি না!

প্রতিদিন আমাকে যথেষ্ট খাটিতে হয়। সকালটা চিঠিপত্রের উত্তর দিতে দিতে কাটিয়া যায়। এই সেদিনে আমাকে সারা সকালটায় আমার সেক্রেটারীকে লইয়া একশত আটত্রিশ খানা পত্র পাঠ করিয়া উত্তর দিতে হইয়াছিল।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে দু-চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমি আহার করিতে বসি। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে রঙ্গালয়ে যাইতে হয়; সেখানে আমিই সর্ব্বেসর্ব্বা। রঙ্গালয়ে আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকি। যবনিকা পড়িলে সেখান থেকে বাহির হইয়া হোটেলে যাই। তাহার পর মধ্যরাত্রে শ্রমক্লান্ত দেহ লইয়া আমি স্বপ্নহীন নিদ্রায় অচেতন হই।

কৃত্রিম উপায়ে বার্দ্ধক্যকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। যৌবন বাহির হইতে আসে না; আসে মনের ভিতর হইতে। মনকে তরুণ রাখ, কঠোর পরিশ্রম ও মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম কর, সৎসাহিত্য ও সুচিন্তা দ্বারা প্রাণের খোরাক যোগাও, দেখিবে অচির-যৌবন সুচির হইয়া উঠিয়াছে।

ত্রিশ বৎসর আগে যখন আমি সব-প্রথমে লণ্ডনে আসি, তখন এ-সহরটির আর এক রূপ ছিল। এখন এখানে যত রঙ্গালয় ও সঙ্গীতশালা (variety house) হইয়াছে তখন ইহার দশাংশের এক অংশও ছিল না। শুনিতে পাই, প্রমোদ-ভবন অসংখ্য হইলেও তাহার সকলগুলি জনতায় একেবারে পরিপূর্ণ থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বিলাতের বাসিন্দারা আগেকার চাইতে এখন বেশী আমোদ-প্রমোদ করিতে ভাল বাসে।

বিলাতি রঙ্গালয়গুলির আদর্শ বরাবরই উন্নত; সুতরাং এদিকে আমি বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি না।

কিন্তু, বিলাতে কোন জাতীয়-রঙ্গালয় নাই কেন? সাধারণের চাঁদায় অবিলম্বে এখানে একটি জাতীয়-রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের সঙ্গে আমার অনেকবার সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য হইয়াছে;—তাঁহারও ঠিক এই মত ছিল।

সুধু জাতীয়-রঙ্গালয় নয়,—বিলাতে নাট্যকলা শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়েরও অভাব আছে। বিদ্যালয় না থাকিয়াও এতদিন যে অভিনেতাদের কি-করিয়া চলিতেছে, সেকথা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হই। এরূপ বিদ্যালয় যথেষ্ট সুফল প্রসব করে।

বিলাতি অভিনেতাদের আসল দোষ এই, তাঁরা সকলেই আপন আপন খেয়াল-মত অভিনয় করেন। ফলে, অভিনয়ের সাধারণ গুণটি একেবারে মাটি হইয়া যায়। অবশ্য সকলেই এ দলের নন; এমন অনেক বিলাতি অভিনেতা আছেন, যাঁহাদের শক্তি অসামান্য।

নাট্যকলার বিদ্যালয়, কোন অভিনেতার উপরে তাঁহার ব্যক্তিগত নিজস্বের ছাপ্

মারিয়া দিতে পারে না বটে, কিন্তু এখান হইতে অভিনেতারা সৌন্দর্য্য ও নির্দ্দোষ আবৃত্তি



হ্যামলেটবেশে সারাবার্ণাড্

সম্বন্ধে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারে। সর্ব্বোপরি এখনকার ছাত্র তাঁহার সহযো অভিনেতাগণের সহিত স্বর করিতে শিক্ষিত হন। আবৃত্তি স্বরমিলশূন্য কোন কণ্ঠ, ঐক্যতানবা কোন বেসুরা যন্ত্রের মত শ্রোতা কাণে একটা বেখাপ্পা আওয়া করিতে থাকে।

সকল রকম চরিত্রেই কাহা কতটা সমদক্ষতা, সেটা বিচার ক দেখিলে কোন্ অভিনেতা কে শ্রেণীর, তাহা বেশ বুঝিতে পা যায়। আমার নিজের কথাই ব ধরি, তবে আমাকে বলিতে হ আমার নিজের কোন বিশেষরক প্রিয় ভূমিকা নাই। যদিও এ ঠিক যে, রমণীর চেয়ে পুরুষের ভূমিকা আমি বেশী পছন্দ করি। কি সেক্সপিয়ারের পোর্সিয়ার মত ভূমি ছাড়া আর কোন রমণীচরিত্রে ভূমিকায় সাধারণত চিন্তা করিবা মত বড়-একটা-কিছু থাকে না।

কিন্তু হ্যামলেট ও L'Aiglon এ চরিত্র! বাস্তবিক, এ দুটি চরিত্রে ভূমিকা বিচিত্র! হ্যামলেটের ব্যক্তি আমি সর্ব্বদাই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া থাকি। যে অপূর্ব্ব ভাবে ধারা তাঁহার ভিতরে থাকিয়া তাঁহার সকল কার্য্যে বাধা দেয়, আমি সর্ব্বদা তাহা আলোচনা করিতে ভালবাসি। সেক্সপিয়ার এই চরিত্রে, একটি দুর্ব দেহে মহান আত্মার আসন রচনা

রিয়াছেন। কারণ, আমার বিবেচনায় মলেটের মত ক্ষুদ্র চরিত্রের পক্ষে তাঁহার বেগের ধারা অতিশয় বিশাল। অনেকে মলেটকে পাগল বলিতে চান; কিন্তু ামার মতে তিনি পাগল নন।

অনেকদিন আগে আমি ভারি রোগা লাম আর আমার স্বাস্থ্যও ততটা ল ছিল না। সকলে ভাবিয়াছিলেন, ামার ক্ষয়রোগ হইয়াছে। একদিন এক ন্ধু আমাকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে কছু উপহার দিতে চাই।'

আমি বলিলাম, "বটে, তবে তুমি ামাকে একটি কফিন পাঠিয়ে দিও।"

কফিন আসিল। আমি সেটিকে আমার শয়ন-গৃহে রাখিয়া দিলাম। হঠাৎ আমার এক বোনের অসুখ হইল। তিনি আমার শয়ন-গৃহে ঘুমাইতে আসিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে শুইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু ডাক্তার আমাকে মানা করিলেন। অতএব আমি কফিনের ভিতরে গিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম!

এই শেষ কথার পর আর একটি কথা সকলকে আবার স্মরণ করাইয়া দিয়া আমি বিদায় লইব। যৌবনকে যিনি আমার মত চিরস্থায়ী করিতে চান, তিনি যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন কঠোর শ্রম, সবল ইচ্ছাশক্তি ও সৎচিন্তার ভাবনার মধ্যেই অক্ষয় যৌবনের মধুর উৎস আছে।

জাপানী রঙ্গিন ছাপা

জাপানের অনেক শিল্প-নিদর্শনের প্রতি ইউরোপীয়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জাপানী রঙ্গিন ছাপা যেমন সকলকার মনোহরণ করে তেমন আর কিছুই নহে। জাপানীদের কাঠের উপরে খোদাই-করা ছবিতে রঙ্গের যেমন ললিত লীলা, খোদ্-কারীর যেমন বিচিত্র হস্তচাতুরী দেখা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। য়ুরোপ ও আমেরিকার কলাবিদ্‌গণ তাই জাপানী রঙ্গিন ছাপাকে ললিত-কলার মধ্যে একটি উঁচু আসন দিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের কথা এই, জাপানী শিল্পের এ বিভাগটি য়ুরোপ ও আমেরিকায় নাম কিনিলেও জাপানে তার তেমন আদর নাই। এ বিভাগের ছবিগুলিকে জাপানে 'বাজারে ছবি' বলিয়া তাচ্ছীল্য করা হয়।

মানুষের দৈনন্দিন জীবন লইয়া ছবিগুলি আঁকা। নামজাদা অভিনেতা ও সহরের মেয়েরা পটুয়ার আদর্শ হন; কারণ তাঁহাদের বর্ণবিচিত্র অঙ্গচ্ছদ চিত্রার্পিত হইলে সকলেরই চিত্তরঞ্জন করে।

আগে জাপানী কলার প্রধান বিভাগ ছিল দুটি,—Kano ও Tosa চিত্রমালা। তখন সাধারণত রাজসভার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, ছাত্রের দল ও পুরোহিত-শ্রেণীর লোকেরা চিত্রাঙ্কন করিতেন। জাপানের মন্দিরে মন্দিরে যে-সকল প্রাচীন পট দেখা যায়, তাহার অনেকগুলিই পুরোহিত-শ্রেণীর



'সামুরাই'-পুত্র
(প্রাচীন চিত্র)

শিল্পিগণের অঙ্কিত। উক্ত বৌদ্ধ পুরোহি
গণের মধ্যে শদেংস্থ ও সেসু (১৫০
নামে পটুয়া-দুজনই প্রধান। এই সম
Kano-চিত্রকরেরা টাকা-কড়ি কি
পাইতেন না। তবে, তাঁহাদের পৃ
পোষকদের কাছ হইতে তাঁহারা পারিতোষি
হিসাবে চাউল বা অন্য-কিছু জিনিষ গ্র
করিতেন। সেকালে জাপানে টাকার ব
কদর ছিল না। শিল্পীরা টাকা নে
একটা অপমান বলিয়া ভাবিতেন।

তারপর Ukiyo-e চিত্রমালার চ
হইল। জাপানীরা পূর্ব্বকথিত র
ছাপারই নাম দিয়াছে Ukiyo-e
উকিয়ো-ইয়া।

কিন্তু সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জাপানীরা এ
নবীন শিল্পকে তখন একেবারেই আমো
দেন নাই। য়ুরোপ ও আমেরিকা
প্রশংসাবাদ শুনিয়া সংপ্রতি জাপানী
তাহাদের রঙ্গিন ছাপার কিছু-কিছু আদ
করিতে সুরু করিয়াছে বটে,—কিন্তু আস
শুভমুহূর্ত্ত এখন কাটিয়া গিয়াছে; কার
প্রাচীন রঙ্গিন ছাপার ভাল ভাল নমুনা এখ
পাশ্চাত্য দেশে লইয়া যাওয়া হইয়াছে

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ইয়োসা মাতাহেই নাম
একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় শিল্পী এই উকিয়ো
ইয়া বা রঙ্গিন ছাপার আবিষ্কার করেন।
পুরাতন কলা-পদ্ধতির অনুসারীগণ পুরানের
কাহিনী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মমূলক চিত্রাদি
অঙ্কন করিতেন। মাতাহেই সে চিরাচরিত
প্রথা ছাড়িয়া জাপানী চিত্রকলায় এক অপূর্ব
বৈচিত্রের সঞ্চার করিলেন। সকলেই
যাহাতে সহজে সব বুঝিতে পারে, সাধারণকে

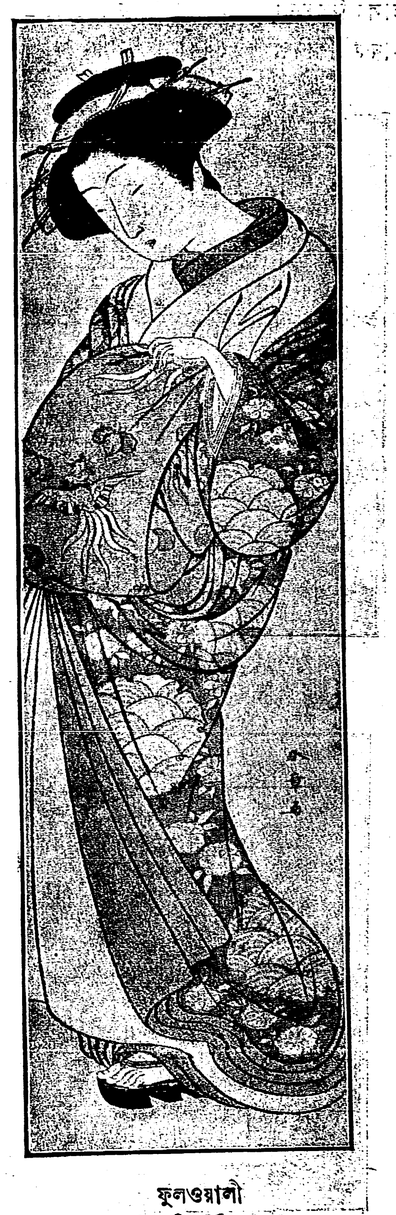

ফুলওয়ালী
(প্রাচীন চিত্র)

ন এমন একটা আটপৌরে জিনিষ
ন।
মাতাহেই রঙ্গিন ছাপার আবিষ্কারক
ও এদিকে প্রথম ও প্রধান ওস্তাদ
তেছেন হিষিকাওয়া মোরোনোবু। সম্ভবত
নি ১৬২৫ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ
নপটুতা ছিল; তিনি বইয়ের জন্য
দা ও কালো রঙ্গে ছবি আঁকিতেন।
সকল ছবিকে Sumi-e বা সুমি-ইয়া
র্থাৎ 'কালো কালির ছবি' বলা হইত।
ঝে মাঝে কেহ কেহ হাতে করিয়া
খলির উপরে নানান্ রঙ্গের তুলি
াইতেন। কিন্তু সে বর্ণরঞ্জনে চিত্রগুলির
াদর্য্য কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হইত না।
রোনোবুর হাতে আঁকা ছবি এখন
ারে বড় মেলে না। জাপানের অন্যান্য
ল শিল্পের মত, তাহার ছবি-ছাপার
তিও চীনদেশ হইতে আসিয়াছিল।

উকিয়ো-ইয়া-শিল্প-পদ্ধতির ওস্তাদগণের
াসল বিশেষত্ব হইতেছে, পরিকল্পনার
তি খুঁটিনাটিতে, আখ্যান-বস্তুতে এবং
র্ণবিন্যাসে তাঁহাদের অপূর্ব্ব কল্পনার খেলা।
াপানে এই শ্রেণীর হাজার হাজার রঙ্গিন
াপার পট দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের
কলগুলিরই বিষয় নূতন নূতন,—একখানি
বির সঙ্গে আর একখানি ছবির কোন
াদৃশ্য দেখা যায় না।

অভিনেতা ও সহুরে অন্যান্য লোকজনের
বি ছাড়া চিত্রকরগণ চায়ের দোকানের
ালনা, অপরূপ রূপবতী নর্ত্তকী ও সপ্ত
াগ্যদেবতা প্রভৃতির ছবি আঁকিতেও

ভালবাসিতেন। হোকুসাই ও হিরোষিগ যুরোপ ও আমেরিকার সকলের চেয়ে
নামক শিল্পিদ্বয়ের চমৎকার নিসর্গ-চিত্রগুলি আদর পাইয়াছে।

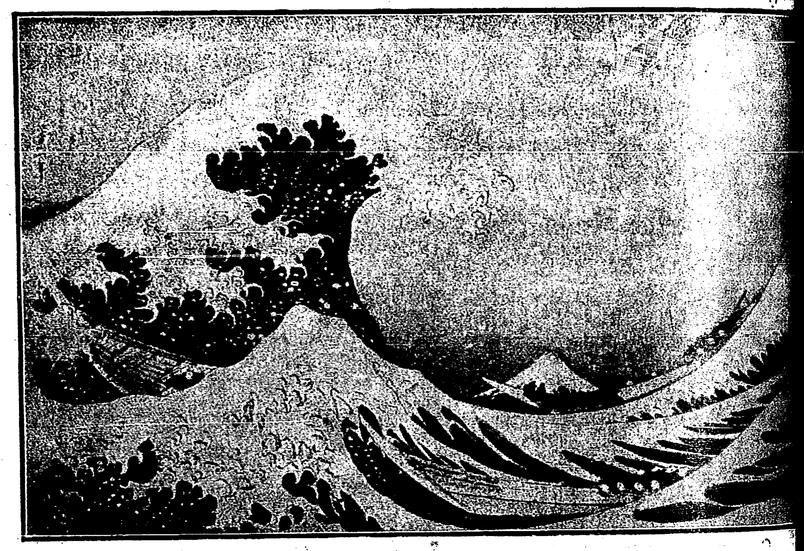

উত্তাল তরঙ্গ (হকুসাই অঙ্কিত)

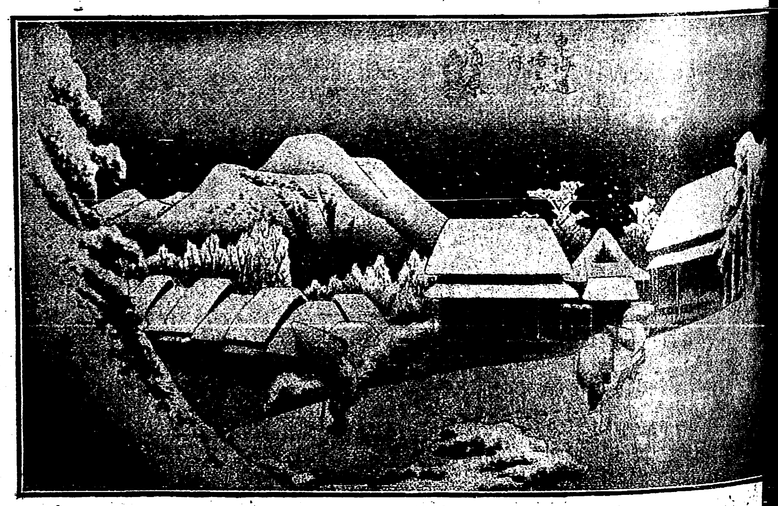

হিরোষিগের আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য

হিরোষিগ হাতপাখার জন্য অনেক
সুন্দর পরিকল্পনা করিয়াছেন। সেকালে
জাপানের সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকেরা যখন
প্রেমাভিসারের সহিত কোন ভোজের আয়োজন
করিতেন, তখন উৎসবের সচিত্র তালিকা
প্রস্তুতের ভার শিল্পিগণের উপরে অর্পিত
হইত। অতিথিরা সেই সচিত্র তালিকা
তাঁহার স্মরণচিহ্নস্বরূপ উপহার লাভ
করিতেন। হোকুসাই ও গাকুতেই নামে
দুজন শিল্পী এইরূপ অনেক প্রসিদ্ধ সচিত্র
তালিকা বা 'সুরিমোনো' অঙ্কন করিয়াছেন।
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হোকুসাই
অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তখনকার
ইতিহাস-লেখকগণ আপনাদের পুস্তক
সচিত্র করিতে হইলে হোকুসাইএর সাহায্য
লইতেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মাঙ্গোয়া'
নামে একখানি পট-পুঁথি প্রকাশ করিয়া
বিখ্যান হইয়া উঠেন। হোকুসাই রসিক
চিত্রকর ছিলেন; কোন জিনিষেরই সরস

অংশটি তাঁহার খরচোখ এড়াইয়া যাইতে
পারিত না। প্রতি ছবিখানির উপরেই
তাঁহার তুলি লইতে যেন তরল হাস্যরসের বিন্দু
ঝরিয়া পড়িত। তিনি কখনও একটা
আদর্শ খাড়া করিতে যাইতেন না, বাস্তবতা
তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিল। অনেক ছবির
তলায় তিনি এই বলিয়া নিজের নাম
লিখিতেন—"চিত্রপাগল বৃদ্ধ লোক"!

হোকুসাই ও হিরোষিগের মৃত্যুর পর
হইতে জাপানী রঙ্গিন ছবি-ছাপার কাজ
খারাপ হইতে সুরু হয়। তাঁহাদের আগে
আরও অনেক ওস্তাদ-পটুয়া ছিলেন,—সকল-
কার পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব।

প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের শিল্পিগণের মত
জাপানী চিত্রকরেরাও, দর্শককে কর্ম্মকঠোর
পৃথিবীর হৈ-চৈ ভুলাইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের
স্বপ্নলোকে লইয়া যাইতে চাহিতেন,—
প্রাচ্য তথা জাপানী কলার এইখানেই
বিশেষত্ব।

কাইসারের চরিত-চিত্র

স্পেনের রাজকুমারী ইন্‌ফান্তা য়ুলেলিয়া
বিদেশী সাহিত্যে অল্পবিস্তর নাম করিয়া-
ছেন। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ
হইবার পূর্ব্বে তিনি জার্মান-সম্রাটের একটি
চরিত-চিত্র লিখিয়াছিলেন; সংপ্রতি তাহা
প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার
কয়েকটি স্থান তুলিয়া দিলাম:—

"রাজকীয় শোভাযাত্রার সঙ্গে আমি
প্রাসাদের ঘরের ভিতর দিয়া বেশ প্রফুল্ল
প্রাণেই যাইতেছিলাম। আমার বয়স তখন
বেশী নয়। উপস্থিত জনতাকে প্রতি-
নমস্কার করিবার জন্য যখনই আমি মাথা
তুলিতেছিলাম, শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে
জমকালো পোষাক-পরা কাইসারকে তখনই
সমুজ্জ্বল রৌপ্যমূর্ত্তির মত দেখিতে পাইতে-
ছিলাম। তাঁহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ আলোক-
পাতে যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল।
সম্রাটের সম্মুখে মধ্যযুগের পরিচ্ছদধারী

চারিজন তেরীবাদক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

সম্রাট যখন চন্দ্রাতপের তলায় সিংহাসনের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া বিশাল সভার দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন, আমি তখন তাঁহার নীল চক্ষুতে রাজার স্বর্গীয়ত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসের চিহ্ন পরিস্ফুট হইতে দেখিলাম।

সেদিন সকালে কাইসারকে দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের ছাপ্ পড়িয়াছিল, তাহা নূতন নহে। বহুবৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন কুমার উইলহেল্‌ম্ রূপে পরিচিত ছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে সাদাসিধে একটি যুবার বেশে দেখিয়াছিলাম। তারপর যেদিন হইতে তিনি 'ক্রাউন প্রিন্স' হইলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার স্বভাব বদলাইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার আচার-ব্যবহারে কেমন গর্ব্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার ভাব আসিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর যতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, ততবারই আমার মনে হইয়াছে যে, তিনি যেন আপনাকে স্বয়ং বিধাতার হস্তচালিত, সাম্রাজ্য-শাসনের একটি স্বর্গীয় যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন।

বার্লিন নগরকে সম্রাট ঠিক তাঁহার সন্তানের মত ভালবাসেন। একদিন সকালে তিনি আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ বড়ই বৃষ্টি হচ্ছিল, এই সবে থেমেছে। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে একটি চমৎকার ব্যাপার দেখাব।"

আমাদের জন্য নীচে যে রাজশকট অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল।

সম্রাট আমাকে এমন-কি-আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইবেন, বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ! রাস্তার দিকে একবার চেয়ে দেখ! এমন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল —এই মিনিট-কতক আগে আকাশ সবে ফরসা হয়েছে—কিন্তু তবু তুমি রাস্তায় এক ছিটে কাদা দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?"

বাস্তবিক, রাস্তাগুলি আশ্চর্য্যরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সম্রাট বলিলেন, "রাস্তা ঝাঁট দেবার জন্যে আমি মস্ত ফৌজের মত একদল লোক পুষ্‌ছি। বার্লিনকে আমি রোজ পরিষ্কার রাখি, তোমাকে তাই দেখাতে এনেছি।"

—"কেবল এই দেখাতে এনেছেন—আর কিছু নয়?"

"আর কিছু নয়।"

আমরা দুজনেই হাসিতে লাগিলাম।

সম্রাট আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। নিচের ঘটনাটিতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

আমি তখন স্বদেশে। প্যারিতে একটি তুর্কী মহিলার সহিত আমার আলাপ হয়, —একদিন তিনি আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তুরুস্কের সুলতান আবদুল হামিদ, ইজ্জত্ পাসা নামে একজন লোকের প্রাণদণ্ড দিতে চান। জার্মান-সম্রাট শীঘ্রই কনস্তান্তিনোপলে যাইবেন, আমি যদি বন্দীর মুক্তিপ্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে এক

নি পত্র লিখি, তবে তাঁহার অনুরোধে লতান প্রাণদণ্ড রদ্ করিতে পারেন।

ইজ্জত্ পাসা যে কে, আমি কোন সে তাহা জানিতাম না। কিন্তু তুর্কী হিলাটির কাতর প্রার্থনায় সম্রাটকে আমি রখানি পত্র না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম ।

পত্রের উত্তর আসিল। কাইসার মার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। কাইসারের নুরোধে সুলতানও বন্দীকে মুক্তি য়াছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ ইয়া গেল না। দুই বৎসর পরে এক-দ আমি ভ্রমণের পরে মাদ্রিদে ফিরিয়া াসিতেছিলাম। গাড়ী হইতে নামিবামাত্র খিলাম, রাণী-মা ও আমার বোন রাজ-মারী ইসাবেলা আমাকে লইয়া যাইবার ন্য ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

আমাকে দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, য়ুদেলিয়া, তুমি যে তুর্কী লোকটিকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ, তিনি ক?"

—"তুর্কী? আমিত কোন তুর্কীকে নি না!"

ইসাবেলা বলিল, "এঁকে তুমি তোমার াছে রাখ্‌তে চাও, তাই ইনি এখানে সেছেন।"

আমি চটিয়া বলিলাম, "কি সব বাজে বাকচ, তার ঠিক নেই! তোমরা দুজনেই পাগল হয়ে গেছ?"

রাণী বলিলেন, "উহু, পাগল হতে র কেন? তুরুস্কের সুলতান চিঠি লিখেছেন যে, তোমাকে খুসী রাখবার জন্যে তিনি এই লোকটিকে তুর্কী মন্ত্রীরূপে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন!"

এতক্ষণে সব কথা বুঝিলাম। আবদুল হামিদ নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন আমার প্রার্থনা-তেই জার্ম্মান-সম্রাট ইজ্জত্ পাসার মুক্তির জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। নারী-চরিত্র সম্বন্ধে সুলতানের যতটুকু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বন্দীর এই মুক্তিকামনার মধ্যে নিশ্চয়ই আরব্যোপন্যাসের মত একটি প্রণয়-কাহিনী লুকানো আছে; অতএব আমার হৃদয়কে প্রসন্ন করিবার জন্য সুলতান তাঁহার কল্পিত রোমান্সের নায়ককে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন!

ফরাসীরা ভাবিয়া থাকেন, কাইসারের হৃদয়ে কেবল জার্মান আদর্শের স্থান আছে। এ ধারণা ভুল। কারণ, ফরাসী সাহিত্যে তাঁহার রুচি অত্যন্ত অধিক। ফরাসী ভাষার ভাল ভাল বইগুলি তিনি সব পড়িয়া ফেলিয়াছেন। ফরাসী ভাষা, কলা ও নাট্যে তাঁহার কতটা ভক্তি, তিনি একদিন আমাকে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

পোট্‌সডামের প্রাসাদে যে বিস্তৃত কক্ষে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের লাইব্রেরী আছে, সম্রাট একদিন আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। ফ্রেডারিকের বন্ধু ভলটেয়ারের স্মৃতিচিহ্নগুলি আগে দেখিয়া আমি পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলাম। আমার পিছনে যখন ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল, তখন দেখিলাম আমার চারিদিকে অনন্ত পুস্তকের

শ্রেণী রহিয়াছে। বইগুলি সব ফরাসী ভাষায় লেখা।

আমি বড়ই ফরাসী-ভক্ত ছিলাম। তাই আমার দিকে চাহিয়া কাইসার হাসিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "এখানে এলে তোমার মনে হবে, তুমি তোমার প্রিয় ফ্রান্সে ফের ফিরে এসেছ।"

কাইসার, তাঁহার সাম্রাজ্যমধ্যে সামরিকতাকেই প্রাধান্যদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রবল সৈন্যদল ও নৌশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়াস, সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যেও যে একটা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজাকে ভক্তি করিতে শিখিয়া জার্মান প্রজাগণ কাইসারের সমস্ত কাজেই সায় দিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। বণিজ্য-বিস্তারের জন্য জার্মান-সম্রাট সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রজারাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, সম্রাটের চেষ্টায় তাহারা কতটা উপকৃত হইয়াছে। কাইসার নৌশক্তি ও সৈন্য বৃদ্ধি করিতে চান; অতএব, তাঁহার প্রজাগণও কোন কারণ জিজ্ঞাসা করে না অথবা বৎসরে বৎসরে বর্দ্ধিতহারে টেক্স দিতেও বিদ্রোহ প্রকাশ করে না। সম্রাট উইলিয়মের মত এই, যে, শান্তিরক্ষায় বাহুবলই শ্রেষ্ঠ বল।

শ্রী প্রসাদদাস রায়।

সমালোচনা

ভিনাস্‌চিত্র ও অন্যান্য গল্প। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। প্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্যরসিক মার্ক টোয়েনের কয়েকটি রচনা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ভূমিকায় মার্ক টোয়েনের সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় আছে—সেটুকু বেশ উপভোগ্য। তদ্ভিন্ন 'ভিনাসচিত্র' 'অপ্রস্তুত' প্রভৃতি কয়েকটি লেখা আছে। সেগুলি কৌতুকরসে পূর্ণ—তবে ভাষা সব জায়গায় সমান ঝরঝরে হয় নাই, অনুবাদের কটু গন্ধ রহিয়া গিয়াছে। একটু নমুনা দিতেছি, "হ্যারিস কতকগুলি অভিমত ব্যক্ত করিল —তারপর তাহার শয়ন ঘরের দিকে গেল। কতকগুলি আসবাবপত্র চুরমার করিতে যাইতেছে বলিয়া গেল ("অপ্রস্তুত")।" লাইন ধরিয়া অনুবাদ করিলে এ দোষ অপরিহার্য্য—লেখক এইটুকু বুঝিয়া ভবিষ্যতে সতর্ক হইলে আমরা সুখী হইব। যাহা হৌক মোটের উপর গ্রন্থখানিতে বৈচিত্র্য আছে।

কার্ত্তিক-চরিত। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি,এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীপাঁচুগোপাল ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। বিনামূলে বিতরিত। এ গ্রন্থে শান্তিপুর-সুতরাগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবনী-পরিচয় ও তৎ-প্রসঙ্গে উক্ত গ্রা ও তত্রস্থ মোদকজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুলিখিত, জীবনীটি সুখপাঠ এবং ইতিহাসটুকুও কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকে উদ্দেশ্য সাধু—সঙ্কলনেও তিনি যথেষ্ট অধ্যবসায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

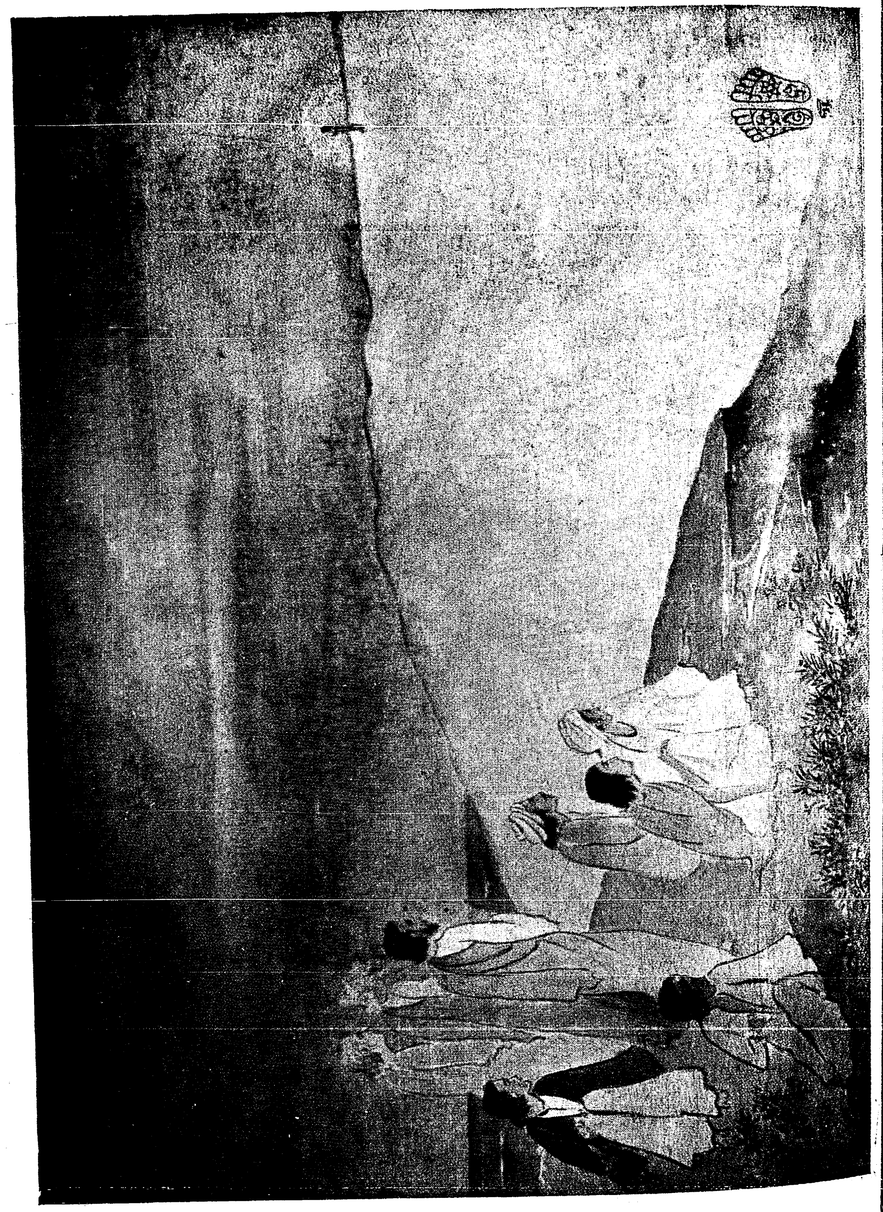

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২২ [১০ম সংখ্যা

আধুনিক ভারত

সরকারী কোষ ও পূর্ত্তকর্ম্ম

নৈতিক সভ্যতা ও ভৌতিক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি একই সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত; তাছাড়া, ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপ যে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছিল দ্রুত ধনবৃদ্ধিই তার বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। তাই ৫০ বৎসর হইতে ভারত-সরকার ভারতের ভৌতিক উন্নতির পরিবর্দ্ধনে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিবার দুইটি উপায় আছে:—রাজস্ববৃদ্ধি ও বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান।

সরকারী কোষ

কোম্পানী ভারতকে মুস্কিলের অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন:—লর্ড ডেলহৌসির বিজয়-সাধন ও সিপাহিবিদ্রোহ দমনের ফলে ভারত-সরকারকে বহুল ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছিল, এবং ইহার দরুন ভারত সরকার করস্থাপন করিতে ও ঋণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই করবৃদ্ধির জন্য পুরামাত্রায় কোষের সংস্কারসাধন আবশ্যক হইল। "কেন্দ্রী-করণ" ও "নিষ্কেন্দ্রীকরণ" একযোগে এই দুই প্রণালী অনুসরণ করিয়া এই সংস্কার সাধিত হইল। স্বাধীনকল্প বোম্বাই ও মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সী সিপাহী-বিদ্রোহের খর্চ্চা দিতে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে জোর করিয়া খর্চ্চা আদায় করা হইল। ভারতের একটি রাজস্ব-বিভাগ ছিল এবং একজন রাজস্ব-সচিব ছিল। রাজস্ব-সচিব—মন্ত্রিপরিষদের শাসন-বিভাগের সদস্য। এইরূপ দুরূহ অবস্থায় সুপরীক্ষিত প্রবীন ইংরাজ কোষাভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

নিষ্কেন্দ্রীকরণ। একটা সাম্রাজ্যের মতই বৃহৎ ও লোকাকীর্ণ ভারত-প্রদেশগুলি স্বরাজশাসনের অনেকটা অংশ লাভ

করিয়াছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আয়ব্যয়ের পৃথক বজেট নাই কিন্তু ভারত-সরকার তাহাদের প্রত্যেকের জন্য যে আয়ব্যয় ধরিয়া দিয়াছেন তাহা তাহাদের আদায়ী রাজকরের অনুপাতী।

রাজস্বপ্রণালীও নূতন করিয়া গঠিত হইল। অনেকগুলি প্রদেশে, সমগ্র রাজস্ব একটি নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। পর্মিটের শুল্কহার নূতন করিয়া বন্দোবস্ত হইল। প্রথমে ভারত-সরকার শুল্ক সম্বন্ধে রক্ষিণী নীতি—পরে অবাধ বিনিময়ের নীতি অবলম্বন করে; শেষে সীমাবদ্ধ রক্ষিণী নীতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অনেকবার পরিবর্ত্তন হইবার পর, আজকাল সুরা-দ্রব্য ছাড়া আর কিছুরই উপর অপ্রত্যক্ষ কর বসান হয় নাই এবং বিবিধ পরীক্ষার পর, এক্ষণে প্রত্যক্ষ করের হিসাবে আয়-কর আদায় করা হইয়া থাকে। এইরূপ ইতস্তত করা হইতেই বুঝা যায়, কোন এক দেশের রাজস্ব-প্রণালী স্থির করা ও নূতন করের কার্য্য-ফল নির্ণয় করা কত কঠিন। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি য়ুরোপীয় সভ্যতার দ্বারা ভারতের রূপান্তরীকরণ কেন এত বিলম্বে সংসাধিত হইয়াছে।

এইরূপ ইতস্তত করা সত্ত্বেও, যে জায়গায় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২১ ক্রোড় টাকা ছিল, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪০ ক্রোড় টাকা রাজস্ব ছিল, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেই জায়গায় উহা ৭১ কোটি টাকায় উঠিয়াছিল। তাই অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা, ও রাষ্ট্রপরিচালক রাজনৈতিক পুরুষেরা বলেন যে ভারত-রাজকোষের বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপকতা আছে। দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও, কৃষকশ্রেণীর দারিদ্র্যসত্ত্বেও, প্রতি বৎসর প্রভূত রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এই রাজস্বের স্থিতিস্থাপনতা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, কতকগুলি বিপরীত বাহ্য লক্ষণ সত্ত্বেও, ভারত স্বাভাবিক নিয়মে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

*
* *

যে দেশ রূপান্তরিত হইতেছে, সে দেশ রাজস্ব-প্রসূত মূলধনেই কখন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। দেশের ভিতরকার ও বাহিরের প্রয়োজনের দরুন পূর্ব্বেই অনেক টাকার ঋণ হইয়াছিল,—সিপাহী-বিদ্রোহের পর আবার এই ঋণ আরো বাড়িয়া গেল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ঋণ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে:—কোম্পানী-দত্ত মূলধনের পরিশোধার্থ ঋণ, ১৮৫৭ অব্দের পূর্ব্বেকার ঋণ এবং দেশবিজয়ের খর্চ্চার হিসাবে ঋণ এবং সিপাহী-বিদ্রোহের খর্চ্চা বাবৎ ঋণ। মনে হইতে পারে, অন্য জাতির কোষসংক্রান্ত ইতিহাসে এরূপ ঋণের দৃষ্টান্ত ত দেখা যায় না। কিন্তু সেটা শুধু বাহ্য অবভাস মাত্র। বহির্যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও বহুব্যয়সাপেক্ষ সংস্কারাদি ব্যতীত কোন জাতি গড়িয়া উঠে নাই; হাজার হাজার উপনিবেশ-বাসিদের খর্চ্চা, উচ্চবংশীয় জাপানীদিগের ও ভূসম্পত্তি-চ্যুত আইরিশ ভূস্বামীদিগের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সকল দেশেরই জাতীয় ঋণের কিয়দংশ, উহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক একতা সাধনের মূল্যস্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

ইংরাজকৃত দেশজয়ের খর্চ্চা ও ভারতীয় ঋণের পরিমাণ এই উভয়ের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। কারণ ভারতের শত্রু-জাতিও শত্রু-রাজ্য হইতেই ইংরাজেরা একটা সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

পক্ষান্তরে নিজের দোষপ্রমাদ হইতে, এবং অনাবশ্যক যুদ্ধ বিপ্লবাদি হইতেও, দেশ ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে। ১৮৭৭ অব্দের সাম্রাইদের বিদ্রোহের ন্যায়, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহ—বর্ত্তমান রীতিনীতির বিরুদ্ধে অতীত-ভক্তদিগের একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। বুদ্ধির-ভুলই ইহার কারণ। এই সকল ঘটনায় উত্তরবংশীয় লোকেরা বিপুল ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়াছে।

আর দুই কারণে ভারতের ঋণ আরো বাড়িয়া গিয়াছে। একটা কারণ:—সকল সভ্য জাতির মধ্যেই সামরিক ব্যয় একটা প্রধান ব্যয়ের বিষয়। তবে তাহাদের সহিত ভারতের এই প্রভেদ যে, ভারতের বৈদেশিক সৈন্য এবং ভারতের সামরিক রাষ্ট্রনীতি, প্রায়ই ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা, ইংলণ্ডের স্বার্থসাধনেই ব্যাপৃত। ঋণের দ্বিতীয় কারণ:—পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব। য়ুরোপীয়-শাসিত দেশে এইরূপ দুর্ভিক্ষ অতীব বিরল; ইহা হইতেই বুঝা যায়, ভারতের সভ্যতা কতটা অক্ষুব ও অনিশ্চিত।

ভারতের অধিকাংশ ঋণের টাকা উৎপাদক কাজে খাটান হইয়া থাকে। দেশের ধনবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ভারত-সরকার বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ভারতের বেশী মূলধন নাই, অনুন্নত সভ্যজাতিদিগের ন্যায় ভারতের মূলধন নিধির আকারে স্থাবরভাবে পড়িয়া থাকে। কাজেই ভারত-সরকারকে ইংলণ্ডীয় বাজারের শরণাপন্ন হইতে হয়। এই উদ্দেশে দুই প্রণালী অনুসৃত হয়। একপক্ষে সরকারী কোষ হইতে মূলধন বাহির করা হয়; এবং পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে যাহার মূল-পত্তন—সেই সব রেল-কোম্পানী একটা ন্যূনতম হারের সুদ নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া ভারত-সরকার তাহার প্রতিভূ থাকেন। সুপরিচালিত আয়ব্যয়ের গুণে, ভারত কতক-গুলা সুবিধামত ধার পাইয়াছিল এবং অনেক বার তাহা লভ্যজনক কাজে খাটাইয়াছিল। ভারত এখন শতকরা ২½ হইতে ৪ পর্য্যন্ত হারে সুদ দিয়া থাকে, তাহার বেশী নহে। খাল ও রেল হইতে ভারতরাষ্ট্রের প্রভূত আয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু পূর্ত্তকর্ম্মের দ্বারা কৃষি, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তৎপ্রতিও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

*
* *

ভারত যে ইংলণ্ডের নিকট লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করিয়াছে, তাহাতে ভারতের বিশেষ অবস্থাটা বেশ বুঝা যায়। যে জাপান য়ুরোপীয় প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সভ্য করিয়াছে,—ভারতের অবস্থা সেই জাপানের মত নহে; ভারতকে য়ুরোপ বলপূর্ব্বক সভ্য করিয়াছে। ইংরাজকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ভারতের ঋণ-ধন ইংলণ্ডে ব্যয়িত হয়, এবং উহা এরূপ কাজে নিয়োজিত হয় যে-কাজ কেবল ইংলণ্ডকর্ত্তৃকই স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত কারণে এই সকল বড় বড় কাজে কখন-কখন ভারত অপেক্ষা

ইংলণ্ডেরই উপকার হয়, অথবা ঐ সকল কাজের মতলবগুলা ভারত অপেক্ষা ইংলণ্ডেরই বেশী মনোমত ও অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়োক্ত কারণে, অনেক সময় দেশের সাধারণ উন্নতি হইবার পূর্ব্বেই এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার দরুন কয়েক বৎসর ধরিয়া উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। জাপানীরা রেল-পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে, কেন না, তাহারা উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝে, এবং তাহার দ্বারা লাভও করিয়াছে। ভারত রেল পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই, ইংরাজ ভারতকে রেলপথ দিয়াছে; সেইজন্য উহা হইতে যতটা লাভ আদায় করা উচিত ভারত তাহা করে নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা, এই অনুযোগ করিয়া থাকে যে, রেলপথ ভারতবাসীদিগের উপর বিপুল ঋণভার চাপাইয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে, কি আর্থিক হিসাবে, কি রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে, ভারতের এই ঋণ ভারতকে ইংলণ্ডের করদ করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ পরাধীনতা কতটা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে পারে একটা তথ্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। সে তথ্যটি রৌপ্য-মূল্যের অবনতি প্রযুক্ত বিনিময়ের অধঃপতন। রৌপ্য-আদর্শ-মুদ্রাই ভারতের আদর্শ-মুদ্রা এবং যে ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রাই আদর্শ মুদ্রা সেই ইংলণ্ডকে ভারতের দিতে হয় প্রতি বৎসর ১৫ হইতে ২০ কোটি পৌণ্ড। তাই, যে স্থলে এক টাকার বিনিময়ে দুই শিলিং পাওয়া যাইত, সেই স্থলে প্রায় এক শিলিং পাওয়া যায়, কাজেই ভারতের ব্যয়ভার দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বিপরীতে, টাকার ঘাটতি ভারতের রফ্‌তানী বৃদ্ধির পক্ষে কতকটা সহায়তা করিয়াছে।

ভারত সরকার বিবেচনা করিলেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, পুনর্ব্বার ভারতীয় মুদ্রার চলাচল (circulation) প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আনা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, টাকশালে অগাধ রৌপ্যমুদ্রার মুদ্রণ বন্ধ করা হইল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকার স্বর্ণমুদ্রার আদর্শ গ্রহণ করিলেন। ইংরাজি পৌণ্ডের মূল্য ১৫ টাকা স্থির নির্দ্দিষ্ট হইল। তথাপি ভারতের মুদ্রাপ্রণালী, ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের মুদ্রাপ্রণালীকেই বেশী স্মরণ করাইয়া দেয়। কেননা, ভারতে রূপার টাকাই মুদ্রাসংক্রান্ত পূর্ণমাত্রিক একত্বের আদর্শ।

বজেট্

ভারতীয় বজেট্ হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিবার উদ্দেশে, প্রথমে বজেটের স্থূল রেখাগুলির নির্দ্দেশ করিব।

প্রথম, আয়ের হিসাব। তিনটি বিষয় বিশেষ করিয়া দেখান আবশ্যক। ফলত অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন পল্লীগ্রামে বাস করে। ইহা আর একটা প্রমাণ যে, এ পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপর আধুনিক সভ্যতা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা অতীব ক্ষীণ।

ভারতীয় রাষ্ট্র, এসিয়িক রাষ্ট্রসুলভ পিতৃশাসনের প্রকৃতিটাই বজায় রাখিয়াছে। সমস্ত ভূমিতেই রাষ্ট্রের সত্ত্বাধিকার; এবং ভূমির খাজনা ও রাজস্ব এক সামিল হইয়া গিয়াছে। আয়ের একটা বৃহৎ অংশ, ভূসম্পত্তি অথবা

[illegible]টিয়া দ্রব্য হইতে উৎপন্নঃ—বন জঙ্গল, [illegible]ম ইত্যাদি; ইহার সহিত আর একটা [illegible] করিতে হইবে—সামন্ত রাজ্যাদি [illegible]তে প্রাপ্ত বার্ষিক কর। কিন্তু রুষিয়ার [illegible] ভারতেও, আধুনিক রাষ্ট্রের আদর্শ-[illegible]না, ও এসিয়িক রাষ্ট্রের আদর্শ-কল্পনা [illegible]ই দুইকে একত্র মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। [illegible]বর, টেলিগ্রাফ, অধিকাংশ খাল এবং [illegible]পথের লাইনগুলা—এ সমস্ত রাষ্ট্রের [illegible]য়।

[illegible] যে সকল রাজকর য়ুরোপীয় বজেটের [illegible]ভিত্তি সেই সব রাজকর ভারতে প্রতিষ্ঠিত [illegible]া বড়ই কষ্টকর। অপ্রত্যক্ষ করের মধ্যে [illegible]করটি আর সমস্ত য়ুরোপীয় দেশ হইতে [illegible]কৃত হইয়াছে,—ভারতে সেই লবণ-কর [illegible]তে প্রভূত আয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারত [illegible]নো এরূপ দরিদ্র যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সেই একমাত্র খাদ্যের উপরেই কর [illegible]পন করিতে হইয়াছে। অন্যান্য খাদ্যের [illegible]পর যদিও নগর-শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু সরকারের কোষাগার পূর্ণ করিবার [illegible]ন্য কেবল সুরা দ্রব্যাদির উপর কর স্থাপিত হইয়াছে। যদিও উক্ত করের [illegible]কার একপ্রকার নিষেধক বলিলেও হয় তথাপি ঐ করোৎপন্ন বার্ষিক আয়ের অঙ্ক দেখিলে বুঝা যায় কতটা সুরাসেবনের বৃদ্ধি হইয়াছে। অনুন্নত জাতিরা, উন্নত সভ্যতার ভাল ফল গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই মন্দ ফলগুলা গ্রহণ করিয়া থাকে।

[illegible] প্রত্যক্ষ করগুলাও সহজে স্থাপিত হয় না। ঐ করের আকারটা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়ঃ—যথা, দানসাহায্য, পেটেণ্ট, লাইসেন্স, পরিশেষে আয়ের উপর কর। এই আয়করের ভাগবাটোয়ারা হইতে ভারত সমাজের অনুন্নত আদিম অবস্থা আমরা অবগত হই। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে, কেবল ৪৮২,০০০ জনের ৫০০ টাকার এবং ৭০ হাজার লোকের দু হাজার টাকার অধিক আয়। সমস্ত আয়ের অঙ্ক ৫০০৫০০০০০ পৌণ্ড। তথাপি যাহাদের উপর আয়কর ধরা হয়, ১৮৮৬ হইতে তাহাদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা একটা উত্তম সূচনা বলিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত মোটের উপর বেতন ও পেন্‌শান—শতকরা ২৯½। কেবল বণিক কোম্পানীদিগের বিবিধ আয়—শতকরা ১২। চতুর্থ তালিকার মধ্যে (ব্যক্তি বিশেষের আয়) উৎপন্ন আয়ের তৃতীয়াংশ বেঙ্কওয়ালা ও কুসীদব্যবসায়ীরা যোগাইয়া থাকে। অতএব মোটের উপর ধরিতে গেলে, আদায়ী টাকার বজেট—এসিয়া ও য়ুরোপীয় এই দুই সভ্যতার প্রভাবই প্রাপ্ত হইয়াছে।

*
* *

ইহার বিপরীতে খরচের বজেট্‌টা সমস্তই য়ুরোপীয় ধরণের।

বনের চাষ, আফিম প্রস্তুত করা, খাল কাটা ও খাল রক্ষা করা—এই সকলের খরচ ছাড়া আর কোনো বিষয়ের খরচে এসিয়িক রাজ্যসুলভ অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কিন্তু বজেটের এই একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে, ১৪ হইতে ১৬ লক্ষ পৌণ্ড

প্রতিবৎসরে ইংলণ্ডে ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হয়। উহার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী, ঋণের সুদ পরিশোধার্থ নিয়োজিত হইয়া থাকে। যে সকল রাষ্ট্র বাহির হইতে ধার করে তাহাদের যে অবস্থা, এই বিষয়ে ভারতেরও সেই অবস্থা। যে সকল উৎপন্ন দ্রব্য ভারত-সরকার ভারতে সংগ্রহ করিতে পারে না, সেই সকল দ্রব্য খরিদের জন্য একটা আনুমানিক অঙ্ক লিখিয়া রাখা হয়।

যে সময়ে রেলপথ নির্ম্মাণ ও পরিচালনের সমস্ত উপকরণ ইংলণ্ডে খরিদ করিতে হইত, সেই সময় এই ভারতের খরচ আরো অনেক বেশী পড়িত। অতএব এই খরচের লাঘবে ভারতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতি সূচিত হয়।

এছাড়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মচারীদিগকে অবসরবৃত্তি দিতে হয়, ভারতীয় ইংরাজ সৈন্যদের বেতনের খরচ দিতে হয়। অতএব এই বজেট হইতে আমরা জানিতে পারি, ইংলণ্ড ভারতের কি কি উপকার করিতেছে এবং আরো জানিতে পারি, ভারতের অধীনতা হইতে ইংলণ্ডের কি সুবিধা হইয়াছে, ইংলণ্ড কিরূপ লাভবান্ হইয়াছে। ভারতের অধীনতার এই একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ইংলণ্ডের ভারতীয় মন্ত্রণা-সভার খর্চ্চা ভারতকে দিতে হয়।

সরকারী পূর্ত্তকর্ম্ম

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পূর্ত্তকর্ম্মও বিস্তার লাভ করে। য়ুরোপীয় দেশে, শত শত বৎসর ধ[রি] এই সকল পূর্ত্তকর্ম্মের উন্নতি ক্র[মে] সংসাধিত হয়, এবং সরকারের স[হি]ত ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টাও চলিতে থা[কে] অথবা সরকারী চেষ্টার পূর্ব্বেও ব্য[ক্তি] বিশেষের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ভারতে, স[ে] বণিক্-সমাজের ন্যায় কোম্পানী উপ[নি] স্বার্থ লইয়া এরূপ ব্যাপৃত ছিল [না] বহুসময়সাপেক্ষ ও বহুঅর্থসাপেক্ষ এই স[ব] বৃহৎ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে পা[রি] না। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রো[হে] ভারতের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা হ[ঠা]ৎ ইংরাজের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ি[ল] ইংরাজ দেখিতে পাইল, অষ্টাদশ শতা[ব্দী] অরাজকতা-জনিত ধ্বংসকার্য্যের প্র[তি] বিধান করিবার কোন চেষ্টাই হয় ন[াই] য়ুরোপীয় সভ্যতায় ভৌতিক সু[খ] ও উপকারের কিছুই বিস্তার হয় না[ই] ভারত-সরকার বুঝিলেন, যে-দেশে ব্য[ক্তি] বিশেষের নূতন কোন অনুষ্ঠানের [চে] অজ্ঞাত, সেদেশে সে কাজ সরকারে[র] করিতে হইবে, শীঘ্র করিতে হইবে, এ[ই] সকল বিভাগেই করিতে হইবে।

*
* *

প্রথমে ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ। ১৮[৫৬] খৃষ্টাব্দে ১৭ লক্ষ পত্র; ১৯০০ অব্দে [৭৬] ৪ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পত্র ও পোষ্টকা[র্ড] ১৮৫৭ অব্দে ৮৩ হাজার টেলিগ্রাফ-লাই[ন] ১৯০০ অব্দে ৫৩,০০০ লাইন, ১৭১,[০০০] তার।

তাহার পর বন্দর, রাস্তা, রেলপ[থ]

ডেলহৌসি ভবিষ্যতে কিরূপ রেল-পথের বিস্তার করিতে হইবে তাহার একটা [না] স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে [বো]ম্বাই ও কলিকাতার সহিত, পরে লাহোর [পে]শোয়ারের সহিত বোম্বাইকে যুক্ত করা। [এই] মুখ্য পথগুলি তৈয়ার হইলে পর, [এই] হইতে ছোট ছোট পথ প্রতিবৎসর [বি]স্তার করা হইতে লাগিল। উহার মধ্যে [অধি]কাংশই বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের সুবিধার [জন্য] গঠিত। কতকগুলি কেবল সামরিক [অভি]প্রায়ের সংলবে গঠিত। যথা:— [পে]শোয়ারের প্রান্তসীমা অনুসরণ করিয়া [সিন্ধু] পথ মুল্‌তান ও করাচিতে গিয়াছে এবং [তাহা]রই একটা শাখা বেলুচিস্থানের ভিতর [দিয়া] চমন্ পর্য্যন্ত গিয়াছে, কান্দাহারের দ্বার [পর্য্যন্ত] গিয়াছে। একটা রেলপথ রেঙ্গুন [হইতে] ভামো পর্য্যন্ত—সমস্ত ব্রহ্মদেশের [মধ্য] দিয়া গিয়াছে। এখনো বড় বড় [দুই] পথ মাত্র খুলিতে বাকী আছে:— [মাদ্রা]জ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত, [আর] একটা ব্রহ্মপুত্র নদী অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মদেশীয় রেলজালের সহিত [মিলিবে]। তার পর এমন সময় আসিবে [যখন] ভারতীয় রেলপথ পারস্যে, আফ্‌গানিস্থানে, তিব্বতে, চীনে ও শ্যামে প্রবেশ করিবে। ১৫০০ বৎসরের অবনতির পর আবার ভারত সমস্ত এসিয়াকে সভ্য করিয়া তুলিবে।

*
* *

ভারতের সমস্ত অঞ্চলে গতিবিধির সুবিধার জন্য কতকগুলি পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল—সেই সঙ্গে দেশ যাহাতে স্বাস্থ্যকর ও উর্ব্বর হয় তাহারও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইল। যথা:—নদীতে বাঁধ দেওয়া, জলাভূমির জল শোষণ করা এবং খাল কাটা।

কেবল নদীর বদ্বীপগুলিই সম্যকরূপে জলসিক্ত। অন্য সব অঞ্চলের ফসল বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু বর্ষার জল অনিশ্চিত। এখন দেখা যায়, দশ-অংশের নয়-অংশ লোকের কৃষিই জীবিকা; খারাপ ফসল হইলে, শত সহস্র লোকের দৈন্য-দুর্দ্দশা—অথবা দুর্ভিক্ষ। তাছাড়া কৃষিজাত-দ্রব্যের রফ্‌তানীর জন্য ভারত একটা মহাবিপণী। ইহা হইতেই খালের আবশ্যকতা।

সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীর অববাহিকা-ভূমিতেও অনেকগুলি খাল কাটা হইয়াছে। এই খাল হইতে প্রভূত আয় হয়। এইরূপ জলসিক্ত প্রদেশগুলিতে আর দুর্ভিক্ষ হয় না। সুবৎসরে ঐ জমিতে অনেকগুলি ফসল হয়।

আরও নূতন নূতন খাল কাটা আবশ্যক। এই সকল খাল কাটা হইলে, পঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ বাঙ্গালারই মত সমৃদ্ধ হইবে; রাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্যের অনুর্ব্বর প্রদেশগুলিও দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা পাইবে। ভারতীয় কোম্পানীরা, মূলধন খাটাইয়া যাহাতে লাভ করিতে পারে এইরূপ বড় বড় কাজে তাহাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু ভারতবাসীদিগের সেরূপ নূতন কিছু করিবার উদ্যম চেষ্টা নাই—সেরূপ কার্য্যবুদ্ধি নাই। সুতরাং সমস্ত কর্ম্মভার গভর্ণমেণ্টকে বহন করিতে হয়।

গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট করিতেছেন না বলিয়া গভর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করা অন্যায়। অত বড় বড় কাজের ভার একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও রুসিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখ-দৈন্যগ্রস্ত, অজ্ঞ, দুর্ব্বল-প্রকৃতি, ধর্ম্মোন্মত্ত ভারতীয় প্রজাদের সহিত কি যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের তুলনা হয়? তাছাড়া রুস্-গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মানুষ্ঠান ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে।

এক্ষণে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের ইতিহাসের আবার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া উপসংহার করা যাক। তিনটা বড় বড় বড় কালবিভাগ। প্রথম কালবিভাগ:— এক বণিক-কোম্পানী ভারতে কুঠী স্থাপন করে; কালক্রমে সেই কুঠীর এলাকাগুলি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য রাজ্যে পরিণত হয় এবং সেই বণিক-সমাজ একটা রাষ্ট্র-শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। দেশের সাধারণ অরাজকতা ঐ কোম্পানীকে দিগ্বিজয়ের দ্বারা রাজ্য বিস্তার করিতে বাধ্য করে। অবশেষে কোম্পানী সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি হইয়া দাঁড়ায়। এই কৃতিত্বে রাজধানী-ইংলণ্ডের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় ইংলণ্ড স্বয়ং রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত ভারত জয় করিলেন।

দ্বিতীয় কালবিভাগ:—ভারতবিজয়ে দুই সভ্যতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। স্বকীয় ধ বিশ্বাস, ও লৌকিক প্রথাদির উপর হস্ত হইবার ভয়ে হিন্দু মুসলমান উভয়ই বি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠি কিন্তু তাহাদের কোন একটা বাঁধাবাঁধি ম ছিল না, এমন কি, বিশেষ কোন লক্ষ ছিল না। কতকগুলা হতাশ "মরি লোকদের যেরূপ কাজ, তাদেরও কা ভাব সেইরূপ ছিল। ঐ বিদ্রোহের দ য়ুরোপীয় সভ্যতার জয় ধ্বনিভিত্তির উ প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয় কালবিভাগ:—কোম্পানি জায়গায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হই এতদিন যে কাজ অজ্ঞাতসারে হইতেছি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এখন হইতে তাহা এ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে করিতে লাগিলে একটা শাসন-কর্ত্তৃত্ব-শক্তি, একটা ব্য কর্ত্তৃত্ব-শক্তি, একটা প্রবল অথচ রূঢ়তাবর্জি রাজকার্য্য-পরিচালনপদ্ধতি সৃষ্ট হই আইনের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা উত্তরো রীতিনীতির উন্নতি, এবং বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্ম দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইল; এ এই পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রাজকোষের সং ও জন-সাধারণের মধ্যে সরক ঋণ-ধনের চলাচল (circulation) সম্ভব হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণিরাজ্যে মনুষ্যের স্থান

প্রাণিজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জাতিকেই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ দেখা যায়। যে পথে চলিয়া আধুনিক মানুষরূপে লাভ করিয়াছে, সে পথটি ত্যাগ রূপে প্রাণিরাজ্যের সিংহাসনে কোন্ তি বসিত তাহা অনুমান করা কঠিন। হউক, অভিব্যক্তির যে ধারা অবলম্বন য়া মানুষ প্রাণিশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তাহা ষ্কার করা আধুনিক প্রাণিবিদ্‌গণের ট প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই ধরাতলে ণের লীলা চলিতেছে; এই সুদীর্ঘ কালে ত প্রাণী নব নব মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ য়া ও জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ণ পাইয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব হয় গভীর মৃত্তিকাস্তরে, সমুদ্রতলে এবং ভাস্তরে এই শ্রেণীর অনেক লুপ্ত ণীর দেহাবশেষ দেখা যায়; কিন্তু ইহাতে ভিব্যক্তির ধারা ঠিক বুঝা যায় না। দের অস্তিত্বের একটুও চিহ্ন না ধিয়া যে সকল প্রাণী লোপ পাইয়া য়াছে, তাহাদের আকৃতিপ্রকৃতি জানা না থাকিলে অভিব্যক্তির ধারা সম্পূর্ণ তে পারে না। যে সকল বৈজ্ঞানিক উৎকৃষ্টতম প্রাণী হইতে মানুষের অভিব্যক্তির স্থান করেন, তাঁহারা সকল লুপ্ত প্রাণীর পরিচয় একত্র না পাইয়া অনুসন্ধানের খেই হারাইয়া ফেলেন, কাজেই তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না; মাঝে মাঝে কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্তির ধারা রক্ষা করিতে হয়।

কাল এবং স্থান উভয়ই অনাদি এবং অনন্ত। বর্ত্তমান সময়ে যে মানবজাতি কাল ও স্থানের উপরে আধিপত্য করিতেছে, তাহাও আদি-অন্তহীন; চিন্তা করিলে এই কথাটাই যেন মনে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-গণ ইহারি ঠিক উল্টা কথা বলেন। তাঁহাদের মতে অনাদি ও অনন্তকাল ধরিয়া যে সৃষ্টি চলিতেছে, আমাদের পৃথিবী সেই সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার বয়স অধিক নয়। তারপরে, জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথিবী জীবের বাসোপযোগী হয় নাই; লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া নিজের দেহের উত্তাপ ত্যাগ করিয়া শীতল হইলে ভূতল জীবদিগকে আশ্রয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে জীব, সৃষ্টি-পর্য্যায়ের নিয়তম স্থানে রহিয়াছে। তার পরে যেদিন ধরাতলে প্রাথমিক জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, মানুষ তাহার পূর্ণ মূর্ত্তি লইয়া সেদিনই জন্মগ্রহণ করে নাই; জড়প্রায় প্রাথমিক জীবই ক্রমোন্নত হইয়া অতি-আধুনিক কালে মানুষের সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, মানুষই জীব-পর্য্যায়ের সর্ব্বনিম্ন ধাপে অবস্থিত।

প্রোটোজোয়া (Protozoa) নামক যে জলচর প্রাণী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যে প্রাণিমাত্রেরই পিতামহ, এ-সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ নাই। সাধারণ প্রাণীর ন্যায়

প্রোটোজোয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই, বিশেষ পাকযন্ত্র বা শ্বাসযন্ত্রও নাই। সেগুলি প্রায় জড়বৎ জলে ভাসিয়া বেড়ায়। এই অস্থি-মজ্জাহীন প্রাথমিক প্রাণীর বংশধরদিগের মধ্যে কতকগুলি কি-প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া ক্রমোন্নত হইয়াছিল, তাহা ঠিক্ বলা যায় না। কিন্তু প্রোটোজোয়ার বংশধরগণই যে, এখন অতিকায় হস্তী বা বুদ্ধিমান মানবের আকারে ভূতলে বিচরণ করিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া ভেকশাবক "ব্যাঙাচি"র আকার গ্রহণ করিয়া কিছুদিন জলে বিচরণ করে। "ব্যাঙাচি"র আকৃতি-প্রকৃতি দেখিলে সেই প্রাণীই যে পরে স্থলচর হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কল্পনা করা যায় না। "ব্যাঙাচি"র ফুস্‌ফুস্ থাকে না; কঠিন খাদ্য গিলিয়া খাইবার ব্যবস্থাও তাহাদের দেহে দেখা যায় না। জলে সাঁতার কাটিবার জন্য বড় বড় লেজ থাকে, জল হইতে বায়ুশোষণ করিয়া জীবনধারণ করিবার জন্য মৎস্যের ন্যায় "কান্‌কা" (Gill) থাকে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লেজ খসিয়া গিয়া চারিখানি পা গজাইয়া উঠে এবং "কান্‌কা"র স্থানে ফুস্‌ফুস্ জন্মিতে থাকে। তারপরে "বেঙাচি" যখন জল ছাড়িয়া স্থলে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহারা যে কোনো কালে মৎস্যের ন্যায় জলচর প্রাণী ছিল তাহা বুঝাই যায় না। ভেকগণ শৈশব-জীবনে এই প্রকারে পূর্ব্ব জীবনের কতকটা পরিচয় প্রদান করে; ইহা হইতে ভেকের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ যে মিছক জলচর প্রাণী ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন হয় না। প্রোটোজোয়ার ত্যাগ করিয়া ভেকজাতি যে পথে উন্ন সোপানে উঠিয়াছে, মানুষ সে পথ উন্নত হয় নাই; এজন্য মানব-দি দেহে তাহার প্রাচীন জলচরত্বের পাওয়া যায় না। কিন্তু মানবদেহ তাহার প্রাচীন অবস্থার চিহ্ন একে লোপ পায় নাই। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কি-প্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় আধুনিক শরীরবি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া প্রা তাহাদের বর্ত্তমান আকৃতি-প্রকৃতি পাইয় প্রত্যেক ভ্রূণের পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময়ে সকল পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া মানব-ভ্রূণ যখন হস্তপদাদিযুক্ত মান আকৃতি গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে হইতে থাকে, তখন তাহাতেও একে পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস প্রকাশ পা থাকে। মানুষের অতি বৃদ্ধ পিত যে সত্যই এককালে জলচর প্রাণীর আ সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইত ভ্রূণ-পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে। মানব-ভ্রূণে প্রথমেই ফুস্ জন্মে না, মৎস্যাদি জলচরেরা যে "কান্ দিয়া জল হইতে বায়ু গ্রহণ করে, প্রথমে তাহাই জন্মে। পরে ঐ "কান রূপান্তর গ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুসে পরি হয়। সুতরাং মানুষ তাহার বর্ত্তমান আ পাইবার অনেক পূর্ব্বে যে মৎস্যাদির খাঁটি জলচর প্রাণী ছিল, তাহা অনু করা কঠিন হয় না।

যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of fittest) প্রাণীর অভিব্যক্তির মূল ব্যাপ

প্রায় প্রোটোজোয়ার জন্মের কতদিন তাহার বংশধরগণ পরস্পরের সহিত মারি হানাহানি করিয়া নিজেদের ক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তা নির্ণয় করা যায় না; সম্ভবত বহু লক্ষ বৎসর পরে যখন অস্থিমজ্জাহীন প্রোটো-প্লাজমীয় সন্তানদিগের দেহে অস্থিময় মেরু-দণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখনই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়া-ছিল। তখন কেহ নিজের দেহ কঠিন বর্ম্মে আবৃত করিয়া শত্রু-জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিচরণ করিত, কেহ দেহটিকে তীক্ষ্ণ কাঁটায় আচ্ছাদিত রাখিয়া দুর্ব্বল প্রতিবেশীদের উপরে অত্যাচার করিত। এই প্রকার সংগ্রামে যাহারা জয়লাভ করিত, তাহাদেরই বংশ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া ক্রমোন্নতির ধাপে উঠিত, এবং পরাজিত দুর্ব্বল প্রাণীর অস্তিত্ব চির-দিনের জন্য লোপ পাইয়া যাইত।

জলে যখন এই প্রকার সংগ্রাম চলিতে-ছিল, তখন বৃশ্চিক-জাতীয় এক শ্রেণীর প্রাণী তাহাদের তীক্ষ্ণধার হুল লইয়া স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারাই আধুনিক স্থল-চর বৃশ্চিকের আদিপুরুষ। ইহা ছাড়া, আর একদল জলচর জীব সম্ভবত এই সময়েই স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক মেরুদণ্ডজাতীয় প্রাণীগণ এই স্থলচরদিগেরই বংশধর।

প্রাণি-জগতের এই পরিবর্ত্তনের পরে বহুদিন আর উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া মনে হয়। জলচরগণ জলের মধ্যে থাকিয়াই ক্রমাগত তাহাদের দেহের উন্নতি সাধন করিতেছিল এবং পতঙ্গগণ স্থলে বিচরণ করিয়া ক্রমে তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিকসিত করিতেছিল। এই সময়ে কাঁকড়া এবং কুম্ভীরাদির ন্যায় কঠিন দেহ-বিশিষ্ট অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পতঙ্গগণও তখনকার প্রাণী-দিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

প্রাণীর ইতিহাসের এই যুগের পরবর্ত্তী কালকে উভচরের যুগ বলা যাইতে পারে। সমুদ্রের গভীর প্রদেশ সেই সময়ে তিমি মাছের ন্যায় বৃহৎ জলচর প্রাণী দ্বারা পূর্ণ ছিল। যে সকল স্থানে জল অগভীর ছিল, সেখানে ভীমকায় উভচর প্রাণিগণ বাস করিত। ইহারাই কিছুকাল জলে এবং স্থলে ইচ্ছানুরূপ বাস করিয়া শেষে একবারে স্থলচর প্রাণী হইয়া পড়িয়াছিল। স্থলের প্রাধান্য লইয়া বোধ হয় এই সময়েই প্রাণীর সহিত প্রাণীর এবং ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার প্রথম বিবাদ আরম্ভ; তখন হইতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে শোণিতপাত আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আজও নিবৃত্তি হয় নাই। যাহা হউক, সেই অতি প্রাচীন যুগে স্থল-ভাগে বৃক্ষ-লতাদির অভাব ছিল না,—বড় বড় বনস্পতি এবং নানাজাতীয় তৃণগুল্ম পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত। জল হইতে উঠিয়া যে সকল প্রাণী স্থলচর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের খাদ্যের অভাব হয় নাই; ইহারা বেশ স্বচ্ছন্দেই ভূতলে বিচরণ করিত। কিন্তু এই সুখের জীবন দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই,—তাহাদের নিজেদের জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কয়েক শ্রেণী মাংসাহারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কাজেই

উদ্ভিজ্জাহারী প্রাণীদিগকে সর্ব্বদাই মাংসাহারীদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইত এবং সময় সময় উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইত। টিকটিকি প্রভৃতি সরীসৃপের আকারবিশিষ্ট ডাইনোসর্ (Dinosaur) জাতীয় প্রাণীই তখন স্থলভাগে আধিপত্য করিত। ইহাদের যে সকল কঙ্কাল মৃত্তিকার গভীর স্তর হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় সেগুলির কোনোটি ৫০ হাত, কোনোটি ৬০ হাত লম্বা ছিল এবং উচ্চতায় কেহই ২০ হাতের কম ছিল না। এই বিশাল দেহ লইয়া যখন ডাইনোসর্-জাতীয় প্রাণীরা উদ্ভিজ্জভোজী ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদের আক্রমণ করিত,—তখন ডাইনোসর্গণই জয়ী হইত। এই প্রকারে এককালে পৃথিবীর এই বিশাল ভূভাগ ডাইনোসর্-দিগেরই করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাইনোসর্ এত পরাক্রমশালী হইয়া দাঁড়াইলেও উন্নত প্রাণীর পর্য্যায়ে তাহারা স্থান পায় নাই। মুখের কাছে প্রচুর খাদ্য পাইয়া তাহারা নিজেদের দেহগুলিরই উন্নতি করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটুও উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। বিপুল দেহের অনুপাতে তাহাদের মস্তিষ্কগুলি যদি বৃদ্ধি পাইয়া যাইত, তাহা হইলে হয়ত তাহারাই দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীতে আধিপত্য করিত এবং ইহার ফলে মানুষের জন্মই হইত না। জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা আছে কি না জানি না, কিন্তু দেহের বিস্তারের যে একটা সীমা আছে ডাইনোসর্ জাতীয় প্রাণিগণ তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে হস্তীই সর্ব্বা বৃহৎ প্রাণী; কিন্তু ইহাদের দৈহিক চরমসীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি ইহাদের শরীর স্থূলতর হইতে চায়, চারিখানি পায়ে ইহারা আর দেহের ভার করিতে পারিবে না। কাজেই প্রকৃ নির্দ্দেশে হস্তীর দৈহিক উন্নতি পাইয়া গিয়াছে। ডাইনোসর্দিগের হস্তীদিগের মতই হইয়াছিল, চারি পায়ের উপরে যতটা ভার রাখা স তাহাদের দেহ ঠিক ততটা ভারবি হইয়াছিল এবং তারপরে তাহাদের দৈ ও মানসিক উভয় উন্নতিই বন্ধ পড়িয়াছিল। যে জাতির উন্নতি অবরে প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু তাহাকে গ্রাস ক ডাইনোসরের অবস্থাও অবিকল তা হইয়াছিল, তাহাদের দেহের বিশালতা বিপুল দৈহিক বল অপেক্ষাকৃত বুদ্ধি প্রাণীদিগের নিকটে পরাভূত হইয়াছি কাজেই ইহারা একে একে পৃথিবী হই লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

প্রকৃতির ন্যায় নিরপেক্ষ দাতা দুর্ল তাঁহার বিশাল শক্তি-ভাণ্ডারের দ্ব চিরদিনই উন্মুক্ত থাকে, যে জাতি ভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত পাথেয় সং করিতে পারে, কেবল সেই জাতি উন্নতি পথে নিরাপদে অগ্রসর হইবার সুযোগ পা যায়। ডাইনোসর কেবল দৈহিক উন্নতি দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছুদূর অগ্র হইয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ ইহাদেরি যে দুই ক্ষুদ্রকায় জ্ঞাতি পৃথ পথ অবলম্বন করিয়া বংশবিস্তার করি

তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রাণিরাজ্যে পত্য করিবে, ইহাই বিচার্য্য হইয়া াইয়াছিল।

এই দুই শ্রেণীর একদলকে আধুনিক স্তন্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে র। টিক্‌টিকি গিরগিটির আকারবিশিষ্ট হে ইহাদের এক এক জোড়া ডানা াইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ডানায় পালক ল না, তাহা বাদুড়ের ডানার ন্যায় াচ্ছাদিত থাকিত। জলস্থলে ও আকাশে ায়া অনায়াসে বিচরণ করিতে পারিত; ানো শত্রুই ইহাদিগকে পরাভূত করিতে ারিত না। এই প্রাণীই এককালে াণিজগতের রাজপদে বসিবে বলিয়া আশা য়াছিল। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই; ক্ষুদ্রকায় হইলেও ইহারা ডাইনোসর্দিগেরই ধর। পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভুল করিয়া াংগাতে গিয়াছিল, ইহারাও সেই প্রকার া করিতে লাগিল। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির কে ইহারা মন দিল না, কি প্রকারে ায়ের চর্ম্মে পালক গজাইবে এবং সহজে ড়িয়া বেড়াইবে ইহাই তাহাদের সাধনার ষয় হইল। সাধনায় সিদ্ধি হইল,—বিচিত্র বর্ণের পালকে দেহ আচ্ছাদিত হইয়া ড়িল, কিন্তু বুদ্ধি একটুকুও উন্নত হইল া; পূর্ব্বপুরুষদের মস্তিষ্কটি যেমন ক্ষুদ্র ছিল, াহাদেরও মস্তিষ্ক ঠিক সেই প্রকার ক্ষুদ্রই হিয়া গেল। কাজেই প্রাণিরাজ্যের সিংহাসন লাভ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ইয়া পড়িল। ডাইনোসরের আর এক া বংশধর খেচর হইবার আকাঙ্ক্ষা না রিয়া স্তন্যপায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর সহিত আধুনিক কোনো স্তন্যপায়ীরই তখন ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। তাহারা সরীসৃপ ও আধুনিক পশুর এক কিম্ভূতকিমাকার প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক স্তন্যপায়ী হইতেই যে, আধুনিক যুগের ব্যাঘ্র-ভল্লুক গো-মহিষ বানর-মানুষ সকলেই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত।

এই সময়ে নবজাত স্তন্যপায়ীদিগকে বিনষ্ট করার মত প্রাণী ভূতলে ছিল না। তখন সেই ভীমকায় ডাইনোসর্দিগের বংশ প্রায় লোপ হইয়া ছিল। যাহারা দুইখানি সুন্দর ডানা পাইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইত তাহারা ভূমির খবর বড় রাখিত না। জলে যে-সকল অতিকায় জলচর প্রাণী ছিল, তাহারাও ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিতেছিল। কালক্রমে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, প্রাচীন প্রাণীদিগের মধ্যে কেহই সেই সকল পরিবর্ত্তনের সহিত যোগরক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই; কাজেই ইহাদের সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন স্তন্যপায়ী প্রাণিগণ এই শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া সম্ভবত অল্পকাল মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট বহু বংশধর ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের দেহে আধুনিক ভেক ও সরীসৃপাদির ন্যায় শীতল রক্তের ধারাই প্রবাহিত হইত; উষ্ণ-শোণিত এবং উষ্ণ

দেহ কোনো প্রাণীরই ছিল না। নবজাত স্তন্যপায়ীদের মধ্যে হঠাৎ এক জাতি উষ্ণ-শোণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণের পরেই স্বাবলম্বী হইত না। মাতার তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল পালিত হইলে পর তাহারা কার্য্যক্ষম হইত। যে সন্তান-স্নেহ মানুষের হৃদয়ে স্থান পাইয়া এই দুঃখ-দৈন্যময় জীবনকে মধুময় করিয়াছে, তাহার অঙ্কুর এই সময়েই দেখা গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের চিন্তা, পরার্থপরতা এবং করুণা প্রভৃতি উচ্চ ধর্ম্মগুলি একে একে পশুহৃদয় অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল উচ্চবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিলে মস্তিষ্ক অপরিপুষ্ট থাকিতে পারে না। কাজেই নব নব ভাবের জাগরণের সহিত স্তন্যপায়ী বংশধরদিগের মস্তিষ্কও পুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রকৃতি দেবী তাঁহার অপরিমেয় শক্তির ধারায় জল স্থল আকাশ প্লাবিত করিয়া, সেই শক্তি কোন্ ক্ষেত্রে কি প্রকার ফল উৎপন্ন করে, তাহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। স্তন্যপায়ীরা যে পথ অবলম্বন করিয়া জীবনক্ষেত্রে নামিয়া ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই প্রাণিজাতিরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কিন্তু জীবন-সংগ্রামে সার্থকতা-লাভের জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন স্তন্যপায়ীরা তাহা সহজে লাভ করিতে পারে নাই। যে পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বের প্রাণিগণ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, ইহাদের কতকগুলি সেই পথে চলিয়া নিজেদের দৈহিক বল বৃদ্ধি করিতেই মনোনিবেশ করিয়াছিল। ইহারা আকারে খুবই হইয়াছিল এবং বলও যথেষ্ট সঞ্চয় আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের দন্তনখ প্রভৃতি সহজ অস্ত্রের নিকটে স্তন্যপায়ীরা পরাভব মানিত। আধুনি তিমি মাছ পূর্ব্বে স্থলচর প্রাণী ছি বলশালী অপর স্তন্যপায়ীদিগের সহিত প্র যোগিতায় টিঁকিতে না পারিয়া এই সম তাহাদিগকে সমুদ্র-জলে আশ্রয় গ্রহণ করি হইয়াছিল। তখন স্থলে নিয়তই ভয়ানি সংগ্রাম চলিত। বিচিত্র আকৃতি-স সহস্র সহস্র স্তন্যপায়ী দেহে বিচিত্র অস্ত্র লইয়া জন্মিত এবং পরস্পর সংগ্রামে লি হইয়া শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করি এইপ্রকার পশুবলে কোনো জা পৃথিবীতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করি পারে না; ইহারাও পারে নাই। আ পৃথিবী খুঁজিয়া সেই সকল ভয়ানক জ দিগের সন্ধান পাওয়া যায় না,—প্রাকৃতি পরিবর্ত্তনের সহিত ইহারা যোগর করিয়া চলিতে পারে নাই; কাজেই ব লোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। এ ভূস্তরে লুকায়িত কঙ্কালগুলিই তাহাদে অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাশব শক্তি লীলায় ধরাতল রুধিরপ্লাবিত হইতেছি তখন সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রজ কয়েক জাতী প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির অদ্ভুত বিকাশ দে গিয়াছিল। পিপীলিকা ও মৌমাছি এ সময়ে যে প্রকার সুশৃঙ্খলায় নিজেদে সমাজগুলিকে নিয়মিত করিতে আর করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইতেছি

বিষ্যতে এই প্রাণিগণই পৃথিবীর অধিপতি য়া দাঁড়াইবে। ইহারা ভবিষ্যতের ব্যব-রের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত, াজের অকল্যাণকারীদের দণ্ড দিত, ানন্তপরায়ণ স্বজাতিবর্গকে সমাজচ্যুত রিত। প্রাণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান ধিকার করিবার জন্য যে সকল সদ্‌বৃত্তির প্রয়োজন, তাহা ইহারা একে একে সংগ্রহ রিয়াছিল, কিন্তু সংগ্রহ করিতে পারিল া কেবল দৈহিক শক্তি এবং শারীরিক উন্নতি। ক'জেই প্রাণিজগতের নেতৃত্বের াসনপ্রাপ্তি ইহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। পর কোন্ সৌভাগ্যবান প্রাণীর অদৃষ্টে াজ্যলাভের সম্ভাবনা আছে, প্রকৃতি বী অন্তরালে বসিয়া তাহাই দেখিতে াগিলেন।

প্রাণীর পরে প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়া রাতল হইতে লোপ পাইতে লাগিল। তিমি মৎস্য জলে আনন্দে বিচরণ করিতে াগিল; দৈহিক শক্তির ক্রমোন্নতি করিয়া প্রাচীন ক্ষুদ্র স্তন্যপায়িগণ মহাকায় গণ্ডার ও জলহস্তীর আকার গ্রহণ করিল। স্তীরও জন্ম হইল। এই অতিকায় প্রাণী দেহের উন্নতির সহিত বুদ্ধির উন্নতিও দেখাইল। বুদ্ধির সাহায্যে ইহারা যে নিজেদের বংশকে স্থায়ী করিতে পারিবে, তাহারও লক্ষণ দেখা গেল; কিন্তু প্রাণি-জগতের সিংহাসনে বসিবার সকল গুণ ইহারা পাইল না। যে প্রকৃতি দেবী জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তিনি বুঝিলেন, দন্ত নখর প্রভৃতি সহজ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কোনো প্রাণীই প্রাণিজগতে রাজত্ব করিতে পারিবে না। পশুদিগের মধ্যে যাহারা পশ্চাতের দুই পদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের দুই অঙ্গে কৃত্রিম অস্ত্রশস্ত্র বুদ্ধির সহিত চালাইতে পারিবে, জগৎ তাহারই অধিকারে আসিবে। প্রাথমিক প্রাণীর সৃষ্টিকাল হইতে বিচিত্র আকার গ্রহণ করিয়া যে সকল বিচিত্র প্রাণী ভূতলে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোনটিই বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল না, কাজেই নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবাব একটুও চেষ্টা তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত না। প্রাথমিক মানুষ যখন তাহার নিভৃত গুহা হইতে বাহির হইয়া স্বহস্তনির্ম্মিত শিলাময় যন্ত্রাদির সাহায্যে ভীষণ বন্যজন্তুদিগকে বধ করিতে লাগিল, তখনি প্রকৃতি দেবী বুঝিলেন, এই পরিণত-মস্তিষ্ক বুদ্ধিমান প্রাণীই জগতের রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। সৃষ্টির সমগ্র প্রাণিসঙ্ঘের মধ্যে কনিষ্ঠ হইয়াও মানুষ এই প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

আহ্বান

(জালালুদ্দীন রুমী হইতে)

১

ডঙ্কা বাজিয়াছে ঐ পশেনি কি আত্মার শ্রবণে ?
চলিয়াছে চালকেরা সুসজ্জিত উষ্ট্রশ্রেণী সনে,
কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিতেছে কিনি কিনি কিঙ্কিনী ঘুঙুর
ভিজা'তেছে শুষ্ক জিহ্বা, ওগো কা'রা নিঙাড়ি আঙুর ?
সুরাপানে জ্ঞানহারা তরুতলে পড়েছ ঢুলিয়া,
অহিফেন-নিদ্রাগত যাত্রাপথ কে গেছ ভুলিয়া ?
জাগো সবে, জাগো সবে জলে ঐ মশাল-অনল !
এখনো চেতনা-হারা,—চারিদিকে এত কোলাহল ?
মরুর ভীষণ দাহে, পিপাসায়—কণ্টকের বনে
কে কোথা লভিল মৃত্যু কৃচ্ছ সহ যুঝি প্রাণপণে,
মহামিলনের রাজ্যে তবু সেই অনন্ত বিভব—
পথের ক্ষণিক মোহে কে ভুলিবে মহা মহোৎসব ?

২

লোহার পিঁজরে বদ্ধ পিপাসিত ওগো বুলবুল,
প্রিয়ের গোলেস্তাঁ ভরা গন্ধ তোমা করেনি আকুল ?
কোণ হতে কোণান্তরে ঝটপটি বেড়াইবে কত,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেল কেন আছ পেচকের মত ?
নয়নে কি পড়েনিক নৃপতির উচ্চতম তাজ
তাহার উদ্দেশে যেতে এখনও তবু ভয় লাজ ?
অস্ত্রত্রান চর্ম্মসম বুক দিতে হবে অসি মুখে ;
সামান্য বাজের ভয় এখনও বাজিছে কি বুকে ?
কে কোথা করেছে ভুল, কুসুমের মধুর তৃষায়
কণ্টকে দিয়াছে প্রাণ,—তাহে তর কিবা আসে যায় ?
প্রেমোৎসবে হে অতিথি, হে অমর গগননিবাসী,
উঠ তবে পক্ষভরে যদি প্রিয়-পরশ-পিয়াসী !

শ্রীকালিদাস রায়।

ভারতের শিল্প

প্রাচীন যুগে ভারতের শিল্প-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল কি না, এবং ভারতবাসীরা সমকালীন সভ্যজাতিকে স্বদেশোৎপন্ন শিল্প দেখাইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত কি না ইত্যাদি গবেষণামূলক আলোচনা পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের বর্ত্তমান শিল্পের বিষয়ই আলোচনা করিব। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেও ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখনও শতকরা প্রায় আশিটি জন লোক জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কৃষিকার্য্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে। তবে আজকাল দেশের হাওয়া বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নবযুগের সূচনায় ভারতবর্ষেও কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে সন ১৮৮৯—১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের দেশের কারখানা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা ১০·১ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কাঁচা মালের রপ্তানিও শতকরা ২৮ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে ভারতের শিল্প ও ব্যবসা ক্রমশই উন্নতির পথে চলিয়াছে। এই শিল্পের গতি ও বাণিজ্য ইত্যাদির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় হইলেও প্রথমেই ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতকে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ একটি মহাদেশের সহিত তুলনা করেন। এ-সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে। তবে একথা আমরা স্বীকার করি যে, আর কোন দেশে এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি-বৃদ্ধ ভারত শত শত ধর্ম্মের উত্থান-পতনের স্মৃতি ধারণ করিয়া আছে। নানা কারণে ইহা একটি রহস্যবিশেষ; এইজন্যই হয়ত অনেকে ইহাকে একটি মহাদেশ বলিতে চান। কিন্তু বিচিত্র ও রহস্যময় ভারতের সর্ব্বত্রই একটা সামঞ্জস্য ও বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতেই তাহার অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য।

আমরা শান্তি-প্রিয় জাতি। পল্লী-জীবনই আমাদের আদর্শ। দ্বন্দ্ববহুল নাগরিক জীবন আমাদের দেশে একান্ত বিরল না হইলেও, কোনদিনই তাহা ভারতে প্রাধান্য লাভ করে নাই। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বিস্তৃত জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া, আপনার সহিত তাহার কোন সংযোগের প্রত্যাশামাত্র না করিয়া অতি সহজে আপনার সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আপনিই উৎপন্ন করিয়া লয়,—ইংরাজিতে বলিতে হইলে এককথায় ইহা Self-sufficient। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের পতন হইল, আক্রমণকারীর পর আক্রমণকারী ভারতকে শোণিত-সাগরে ভাসাইয়া গেল, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আপনার সমস্ত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেমন নির্ব্বিবাদে আপনার সহজশান্ত

দিনগুলি কাটাইয়া চলিয়াছে। বাহিরের কোন সংবাদও তাহার কর্ণে পৌঁছায় না, বাহিরের সহিত আলাপ করিবার জন্যও সে বিন্দুমাত্র চঞ্চল নহে। কথিত আছে, পলাশী-যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কথা সুদূর পল্লীসমূহে পৌঁছাইতে সুদীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর লাগিয়াছিল। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। একটি ক্ষুদ্রপল্লীও বৃহত্তর জগতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বিশেষ। কুম্ভকারগণ কেবলমাত্র গ্রামবাসিগণের জন্য পরিশ্রম করে, তাহাতেই সমস্ত পল্লীর সকল অভাব দূর হয়; এইরূপ কর্ম্মকার ও স্বর্ণকার প্রভৃতি সমস্ত শিল্পীর লক্ষ্য গ্রামের অভাব দূর করা মাত্র। এই division of labour পল্লী-জীবনের ভিত্তি; ইহাই আবার বংশ-পরম্পরানুক্রমে চলিয়া সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া দেয়। পল্লীগ্রামে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে হীন চক্ষে দেখে না; সেখানে ভ্রাতৃত্বের স্নেহ-পাশে সকলেই আবদ্ধ; সেখানে শান্তিময় জীবন মূর্ত্তিমান হইয়া কুটিরে কুটিরে বিরাজ করে। এইজন্য পল্লী-শিল্পই ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে-যে আমাদের নাগরিক শিল্প একেবারেই নাই বা ছিল না, এ-কথা বলি না। আগ্রার তাজমহল, সাজাহানাবাদের মতি-মসজিদ, ঢাকার মসলিন প্রভৃতি এখনও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে।

ভারতের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে "ব্যবসা-সমাজ" বলিয়া কোন সম্প্রদায় কোনদিন স্থান পায় নাই। য়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, একসময়ে ঐরূপ সমাজ-গঠনের চেষ্টা য়ুরোপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেখানে মধ্যযুগে এক-একটি নগরে কয়েকটি করিয়া "ব্যবসা-সমাজ" থাকিত, কোন নূতন ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহা অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রকৃতির ছিল; এক-একটি ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় এক-একটি ব্যবসায় এক-চেটিয়া করিয়া তাহার ক্রয়-বিক্রয় আপনাদিগের ইচ্ছাধীন করিয়া লইত। কোন ব্যবসায়েই নূতন লোকের সমাগম হইতে পারিত না; ফলে সমস্ত ব্যবসায়গুলিই কেবলমাত্র নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগের হস্তে থাকিত। এই প্রকারের ব্যবসায়-সমিতি ভারতে কোন দিন ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ব্যবসানুসারে জাতিভেদ হইয়াছিল কিনা জানি না; তবে এ-কথা সত্য যে, ভারতে এক-একটি জাতি যদিও এক-একটি ব্যবসায়েরই অনুশীলন করিত, তথাপি অন্য জাতির পক্ষে তাহা গ্রহণ করিতে কোন অন্তরায় ছিল না। তন্তুবায়গণ তাঁতের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইলেও, যুগী, জোলা ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ অনেক স্থলে এখনও তাঁত চালাইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মকারগণ লোহার কাজ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু সমাজের অন্যশ্রেণীর লোকের তাহাতে একেবারে প্রবেশ অধিকার ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। এখনও আমরা তাঁতিকে কর্ম্মকারের ব্যবসা এবং কর্ম্মকারকে তন্তুবায়ের ব্যবসা গ্রহণ করিতে দেখি।

ভারতের তৃতীয় বিশেষত্ব, তাহা মুসলমান জন-সংখ্যা। ৩৩ কোটি লোকের মধ্যে ৭ কোটি লোক মুসলমান। হিন্দু

মুসলমানের মধ্যে জাতিগত বহু প্রভেদ বিদ্যমান। হিন্দু আর্য্যবংশীয়, মুসলমানগণ কেহ সেমেটিকবংশসম্ভূত, না-হয় মোঙ্গলীয়। কিন্তু এই মুসলমানগণও একাদিক্রমে দুইশত বৎসর কাল ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতের উপর তাহাদিগেরও যথেষ্ট দাবী জন্মিয়াছে; অতএব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে মুসলমানগণকে বাদ দিয়া বলা চলে না। এইজন্যই ভারতের শিল্প-প্রসঙ্গে মুসলমান-শিল্পকে সেমেটিক-শিল্প বলিয়া বাদ দেওয়া সমীচীন নহে। ভারতবর্ষ মুসলমানেরও স্বদেশরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং তখন তাহাদের শিল্পও ভারত-শিল্পের অংশে পরিণত হইয়াছে।

তাহা হইলে ভারত-শিল্পের শ্রেণী-বিভাগ কিরূপে সম্ভব? জাতিদ্বারা ভারতের শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর নয়, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। ভারতীয় শিল্পের শ্রেণী-বিভাগ করিতে হইলে, শিল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে হয়। যে সমস্ত শিল্প কাঁচা মালের উপর নির্ভর করে, তাহা প্রথম স্তরের শিল্প। দ্বিতীয় স্তরের শিল্প কাঁচা মালকে একটি আকার প্রদান করে। তৃতীয় স্তরের শিল্প তাহাকে কারুকার্য্যে মণ্ডিত করে। নিম্নে শিল্প-স্তর-গুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল:—

প্রথম স্তর। ক্ষেত্রজাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন গ্রাম্য শিল্প।

দ্বিতীয় স্তর। কারখানা সমূহে প্রস্তুত দ্রব্যাদি।

তৃতীয় স্তর। খনিজ পদার্থ।

চতুর্থ স্তর। বন-জাত পদার্থ।

ভারতের প্রত্যেক গ্রামের চারিধারে ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে ফসল জন্মে। গ্রাম্য শিল্পিগণ এই সমস্ত ফসল কাঁচা মালের আকারে গ্রহণ করিয়া, তাহা ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত করে। এই প্রকার শিল্পে বড় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খনিজ পদার্থ লইয়া যে শিল্প গঠিত, তাহাতে বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গ্রাম্য শিল্প গ্রামে চলে, নাগরিক শিল্পের কেন্দ্র নগর, সেইরূপ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার ব্যতীত তৃতীয় স্তরের শিল্প বৃদ্ধি পায় না। ভারতের এক-একটি প্রদেশ এইরূপ এক এক জাতীয় শিল্পে অলঙ্কৃত। এমন দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে সমস্ত স্তরের সমস্ত শিল্প সমভাবে বর্ত্তমান। আবার প্রয়োজনীয়তার ন্যায় নিয়ামকও আর কিছু নাই। যে শিল্প যে প্রদেশের উপযোগী, সেই প্রদেশেই সাধারণত সেই শিল্প বৃদ্ধি পায়। কোন্ শিল্প কোন্ প্রদেশের উপযোগী, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব:—

বাঙ্গালা ও আসাম—প্রথমে বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক। রবার (Indian Rubber), নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীচি, লঙ্কা, নীল, পাট, কয়লা, কাগজ, গরুর চামড়া (Hide), ছাগল ইত্যাদির চামড়া (Skin), আফিম, চা, তামাক, চিনি, লৌহ, পারদ এবং নানাপ্রকার মাটীর খেলনা বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তর ভারতবর্ষ—উত্তর ভারতবর্ষ বলিতে, আমরা আগ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ,

পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশকে বুঝিব। রেসিন, লাক্ষা, নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীচি, তামা, শীষা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, বাতি, সাবান, তুলা, রেশম, পশম, চামড়া, কারপেট, মাদুর, গম, আটা, বিস্কুট, নানা প্রকার মদ, চা, চিনি ও লবণ ইত্যাদি দ্রব্য তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কাঁচা মাল ব্যতীত এই দুই প্রদেশে চীনা মাটীর নানাপ্রকার দ্রব্য, লাক্ষার নানা প্রকার দ্রব্য, পিতল-কাঁসারের নানাপ্রকার বাসন, সোনারূপার নানাপ্রকার দ্রব্য, হাতির দাঁতের নানাপ্রকার দ্রব্য, নানা প্রকার কাষ্ঠে প্রস্তুত কারুকার্য্যবিশিষ্ট দ্রব্য ও নানারূপ মাটীর খেলনাও প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ মাল কাঁচা, এবং উত্তর ভারতের পণ্যদ্রব্যগুলির মধ্যেও কতকগুলি কাঁচা মাল এবং কতকগুলি তৈয়ারি জিনিস। (manufactured articles)

পশ্চিম ভারতবর্ষ—ইহার মধ্যে বৃটীশ বেলুচিস্থান, বেরার এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকেও ধরা গেল। গঁদ, নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থ, তুলা, পশম, গরুর চামড়া, ছাগল ইত্যাদির চামড়া, নানাপ্রকার ঔষধপত্র গম ও লবণ এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। সোনা, রূপা, চামড়া ও তুলা প্রভৃতির শিল্পকার্য্যও এখানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই-প্রদেশে ধোলাই মালের (manufactured articles) সংখ্যা অধিক।

ব্রহ্মদেশ—এখানে কাঁচা ও ধোলাই উভয়বিধ মালই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের কারুকার্য্যও খুব বিখ্যাত। গঁদ, বার্ণিস, তামাক চা, চুরুট, কেরোসিন তৈল ও কাষ্ঠ প্রভৃতি কাঁচামাল ব্যতীত সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাষ্ঠ ও কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্যে প্রস্তুত দ্রব্যাদিও তথায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কলিকাতার যাদুঘরে ভারতের উৎপন্ন কাঁচা ও ধোলাই মালগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

১। গঁদ, রেসিন ইত্যাদি।

২। তৈল ও নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থ, ঘৃত, চর্ব্বি প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাণীজ পদার্থ এবং নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য।

৩। নানাপ্রকার চামড়া ও নানাপ্রকার রং।

৪। নানাপ্রকার প্রাণীজ পদার্থ।

৫। সুতা প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষেত্রজ এবং লৌহ প্রভৃতি নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ।

৬। নানাপ্রকার ঔষধপত্র।

৭। নানাপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য।

৮। বরগা, কড়ি প্রভৃতি কাষ্ঠ।

৯। নানাপ্রকার ধাতু ও নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং কোন্ কোন্ দ্রব্যই বা কত পরিমাণে আমদানি রপ্তানি হয়, তাহার সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশ ভাগই দেশেই ব্যবহৃত হয়। কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে আমদানি-রপ্তানি করা হয়, Indian

...eer-এ তাহার একটি তালিকা ...। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত ...ন :—

...মালের (Raw material) হিসাব

...র	আমদানি লক্ষমুদ্রা হিঃ	রপ্তানি লক্ষমুদ্রা হিঃ
...—৭৭	২০·৮২	৯১·২০
...—৮৭	২৮·৩১	১.০২·৮১
...—৯৭	৪০·৯৬	১৮৯·৯৩
...—০২	৫১·৪৭	১১৬·৩৬
...—০৩	৪৯·৮৯	২০২·৯১

...নাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীচি ও ...্য প্রভৃতির হিসাব—

...—৭৭	২৫·৭৬	৫৮৩·২৫
...—৮৭	৫৮·৮২	৯০০·৯৮
...—৯৭	৭৯·৭৩	৮৯০·৬৫
...—০২	৯৬·১০	১৭৯১·০৬
...—০৩	৭৭·০৯	১৬২৮·৬৫

...রং এবং চামড়ার হিসাব

...—৭৭	১২·৬৬	৩৫৩.১১
...—৮৭	২৬·১৩	৪৩৩·৫৬
...—৯৭	৭৩·১৩	৫০০·৯
...—০২	৭৯·০৫	২৪০·৮৫
...—০৩	৮১·০৬	১৮৩·২

প্রাণীজ পদার্থের হিসাব

...—৭৭	৪৭·৯৫	৩১৬·৮৭
...—৮৭	৮৫·০৭	৫৩৩·২৮
...—৯৭	৮১·১৬	৭১৫·১৮
...—০২	৮৬·৪২	৮৬০·১২
...—০৩	৯৮·৪৮	৮৯৩·৩০

তুলা, পশম, রেশম, মাদুর ইত্যাদি নানা প্রকার কাঁচা মাল ও পাকা মালের হিসাব।

১৮৭৬—৭৭	১৮৪·৭০	১৮৫৭·৯১
১৮৮৬—৮৭	৩৫৮৮·৭৭	২৬০৭·২৮
১৮৯৬—৯৭	৩৬৩৯·৫১	৩৯০৮·৯০
১৯০১—০২	৪০১২·০৭	৪৮৭২·৪৮
১৯০২—০৩	৫৭০২·৩৫	৪৮৩৫·১১

চা, কফি ইত্যাদি নানাপ্রকার পানীয় জিনিসের হিসাব।

১৮৭৬—৭৭	৩৩১·৯০	২৫৮৪·৭১
১৮৮৬—৮৭	৬৫১·৬৪	৩৭০৭·০৬
১৮৯৬—৯৭	৮৪৮·৩৮	৩০৫৪·৩১
১৯০১—০২	১১৪২·৮৬	৩৮১৮·৩৯
১৯০২—০৩	১০৩০·১৭	৪৪১৮·৯১

নানাপ্রকার ধাতু এবং খনিজ পদার্থের হিসাব।

১৮৭৬—৭৭	২০২২·৮২	৪৬২·৭৩
১৮৮৬—৮৭	২৫০৯·৫২	৩২৯·৯০
১৮৯৬—৯৭	৩৭২৮·৩১	৩১৪·৫১
১৯০১—০২	৪৭৮৪·৪৫	১৩০১·৭৩
১৯০২—০৩	৫৮৮২·৮০	১১৩১·৭৪

যাদুঘরে শিল্পদ্রব্য যেরূপভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক :—

প্রথম স্তর—গঁদ রেসিন প্রভৃতি কাঁচা মাল প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত। লাক্ষা ও লোম ব্যতীত এই শ্রেণীর সমস্ত দ্রব্যই ক্ষেত্রজাত। ইহাদের অধিকাংশভাগ এ-দেশেই ব্যয়িত হয়। এই শ্রেণীর দ্রব্যগুলির যে অংশ আমরা আমদানি করি, তাহার আবার এক-তৃতীয়াংশ আমরা বিদেশে রপ্তানি করি।

আরব ও পারস্যের মধ্য দিয়া য়ুরোপের গমনাগমনের বেশ সুবিধা না থাকায়, এই সমস্ত দ্রব্য আমরা ধোলাই মালরূপে সেখান হইতে আমদানি করিয়া তাহার একাংশ আবার য়ুরোপে রপ্তানি করিয়া থাকি। পারস্য-উপসাগরের এবং লোহিত-সাগরের বন্দরগুলির উন্নতি সাধিত হইলে, মাঁলগুলি আর বোম্বায়ে আসিবে না, বন্দর হইতে একেবারে য়ুরোপে প্রেরিত হইবে।

লাক্ষা—ইহার রং গাঢ় লোহিতবর্ণ বলিয়া সংক্ষেপে ইহাকে "লাক্ষা" বলে। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে একজন ভ্রমণকারী ইহার উপকারিতার কথা য়ুরোপে প্রথম প্রচার করেন। লাক্ষা পোকা বৃক্ষে বাস করে; মাদী পোকার মৃত্যু হইলে, তাহার উদর ফাটিয়া যায় ও বহু শিশু পোকা বাহির হয়। তাহারা গাছের পাতায় লাগিয়া থাকে এবং তথায় বৃদ্ধি পায়। মে ও জুন মাসে বা অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা নানাজাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও বর্ণ গভীর লাল, কাহারও বা ফ্যাকাসে লাল। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল গাছের গুণানুসারে ইহার বর্ণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু গবেষণার পর এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহাদের নানা জাতি আছে। পূর্ব্বে ভারতে এই লাক্ষার কাজ একচেটিয়া ছিল, কিন্তু জাপান ও ব্রহ্মদেশে এই ব্যবসা এখন ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা বহু কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পিগণ লাক্ষার প্রস্তুত বার্ণিশ ব্যবহার করিয়া থাকে।

কাঁচের দ্রব্য—কাঁচের কারুকার্য্যের জন্য ব্রহ্মদেশ বিখ্যাত। ব্রহ্মের পাগোডা নানা কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। গায়ে থিসটী নামক একপ্রকার আবরণ (coating) দিয়া, তাহার উপর চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

মোম—ভারতবাসী কখনই আ সহিত মোমের কারবার করে নাই। এ যাহা করা হয়, তাহার পরিমাণও সামান্য। বন্য লোকেরাই এ শিল্পের করে। এই শিল্প হইতে আমরা মোম ও পাই। মধু পানীয়বস্তুরূপে অধিক পরি উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বৎসর কয়েক টাকার মোম ভারত হইতে বিদেশে প্রে হয়। এই ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি অবনতি ঘটে নাই।

দ্বিতীয় স্তর—নানাপ্রকার পদার্থ:—ভারতবর্ষে যে বিবিধপ্রকা তৈল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে মোট তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা খনিজ, প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ। ভারত প্রত্যেক বৎসরে নানাপ্রকার তৈলের সতেরো কোটী টাকার ব্যবসা হয়। বা প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্যে তৈল ব্য হয়। ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সক গাত্রে তৈল মর্দ্দন করে। তৈল ন আমাদের একেবারে চলে না; কেননা সা ব্যবহার ভারতের অধিকাংশ লোকে না বলিলেই হয়। একপ্রকার খনিজ হইতে বাতি প্রস্তুত হয়। এই প্র তৈলের খনি ব্রহ্মদেশে যথেষ্ট আ ভারতবাসীও দিন দিন বাতির ব্যব

হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে বৎসর অনেক টাকার তুলার বীচি, তিল, রেড়ী ও পোস্ত বিদেশে চালান কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ১৯০৯ হইতে আমাদের দেশে তেলের কল হইতে আরম্ভ হওয়ায়, কাঁচা মালের ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

ঘৃত। ঘৃত হিন্দুদিগের প্রধান ভোজ্য হিন্দুগণ কর্ম্ম-কার্য্যের জন্য এশিয়ার ক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জাভা, া ও সিংহল প্রভৃতি ভারত-মহা- রের দ্বীপসমূহ অনেক হিন্দু দেখিতে া যায়। কাজেই তাহাদের ব্যবহারের ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসরেই ক্ষ টাকার ঘৃত প্রেরিত হয়। র্ষ প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে ক্ষ টাকার চর্ব্বি ইত্যাদি ক্রয় া।

গন্ধতৈল। ভারতবর্ষ গন্ধতৈলের জন্য াল বিখ্যাত। আজিও জৌনপুর, ুর এবং গাজিপুরে প্রচুর পরিমাণে ব্য প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য , অমৃতসহর এবং লাহোরের বাজারে হইয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত । বিদেশ হইতে আনীত গন্ধ-দ্রব্যের ান আড়ৎ বোম্বাই। গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত বার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ব্যবহৃত । গোলাপফুলের পাতা, লেবু, মৃগনাভি, েঠলি ও চন্দন ইত্যাদি।

রং। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার গাছ- য়া হইতে রং প্রস্তুত হইত। সেই র রং স্থায়ী হইত সত্য, কিন্তু তাহাদের জ্যোতি তত উজ্জ্বল ত ছিলই না, বেশীর ভাগ দামেও খুব চড়া ছিল। য়ুরোপ হইতে আনীত সস্তা রং আসিয়া ভারতের রংএর ব্যবসা নষ্ট করিয়া দেয়। য়ুরোপ হইতে আনীত রং, চাকচিক্যে ভারতীয় রংএর চেয়ে উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু ততটা স্থায়ী নহে। দামে সস্তা বলিয়া ইহা অত্যন্ত জন-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের নীল-চাষও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। জর্ম্মানি কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায়, ভারতের একচেটিয়া নীলের ব্যবসায় ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা প্রত্যেক বৎসর প্রায় এক কোটী টাকার রং বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি করি।

প্রাণীজ পদার্থ। চামড়া ইত্যাদি। আমাদের চামড়ার আমদানি এবং রপ্তানির পরিমাণ এক; অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর যত টাকার মাল আমরা ভারত হইতে বিদেশে চালান দি, ঠিক তত টাকার মালই আবার বিদেশ হইতে ভারতে আনিয়া থাকি। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর দশ কোটী টাকারও অধিক চামড়ার দ্রব্য যেমন বিদেশে প্রেরিত হয়, সেইরূপ দশ কোটীরও অধিক টাকার চামড়ার দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আসে। চামড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এখন ৪৩টী ট্যানারি আছে এবং সেই ট্যানারি-গুলিতে প্রায় ৭,৯০০ জন লোক খাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। পূর্ব্বে লিখিত ট্যানারিগুলির মধ্যে সাঁইত্রিশটী, এক মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই আছে। কানপুরের

ট্যানারি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সকল ট্যানারিতে জুতা ব্যতীত, ঘোড়ার লাগাম, জিন ও রেকাব ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে আনীত Boot এবং shoe এর পরিমাণও ভারতে দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এখন আমরা প্রায় ২৭৯ লক্ষ টাকার বুট ও সু বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করি। কারুকার্য্যবিশিষ্ট সৌখীন জুতাও ভারতে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। কটক, সারাণ, রামপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, ঝান্সি, সাহারাণপুর দেরাগাজীখাঁ, রাওলপিণ্ডি, বেসহাট, জয়পুর, বিকানীর প্রভৃতি স্থানগুলিতে জুতার উপর নানারকমের কারুকার্য্য করিবার জন্য অনেক নিপুণ কারিগর আছে। পেশওয়ার, বান্নু, বেসহাট, ডেরাজাট প্রভৃতি স্থানে তরওয়ালের উপর চামড়ার বিবিধ কারুকার্য্য করা হয়।

হাতীর দাঁত। হাতীর দাঁতের শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ ভুবনবিখ্যাত। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতেই সমস্ত সভ্য-জগৎকে এই শিল্প যোগাইয়া আসিতেছে। দিল্লী, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং মৌলমেন প্রভৃতি স্থানগুলি দন্ত-শিল্পের পীঠস্থান। হাতির দাঁত হইতে নানাপ্রকার খেলনা, চিরুণী, বাক্স, টেবিল ইত্যাদি প্রস্তুত হয়; তা ছাড়া হাতীর দাঁতে ছাপা ছবির জন্য দিল্লী খুব নাম কিনি হস্তীদন্তের এই ছবিগুলি দেখিতে সুন্দর। ছবিগুলি প্রায়ই মোগল অঙ্কিত।

শিং। ভারতবর্ষে কিছু পরিমাণে কার্য্যও হয়। কটক, সাতক্ষিরা, প্রভৃতি স্থানগুলিতে শৃঙ্গ-শিল্পের আছে।

মণি-মুক্তা। মণিমুক্তা প্রভৃতি দ্রব্যগুলির কতকাংশ ব্রহ্ম ও সিংহল দেশের নিকটে ভারত-মহাসাগর উত্তোলিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারাই ভারতের অভাব পূরণ হয় না। এইজন্য লক্ষ টাকার মুক্তা, ইতালী, আরব আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আইসে। সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য ভারতের ধনীলো অলঙ্কারাদিতে ব্যবহার করে। গরিব ঘরে মণি-মুক্তার চলন নাই বলিয়া আমদানি-রপ্তানিরও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

তুলা, কাগজ, সিল্ক, ইত্যাদি ও প্রাণীজ পদার্থের এবং লৌহ, প্রভৃতি খনিজ পদার্থের আলোচনা 'ভারতী'তে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া কাজেই উহাদের বিষয়ে বলিবার আর কিছুই নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মি

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম (হিরাতা) অধিবেশনের ইতিহাস-শাখায় ড প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন, ালার ইতিহাস-সেবকগণকে দুই তে বিভাগ করা যাইতে পারে;—এক ী পৌরাণিক, আর এক শ্রেণী াসিক।" চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত সকলের মনোমত নাও হইতে পারে, এদেশের ইতিহাস-সেবকগণের মধ্যে া মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করা তে পারে। উভয় শ্রেণীর মতভেদের কি, তাহার আলোচনা করা উচিত, পাঠক-সমাজকে এই বিষয়ে মধ্যস্থতা ার অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। আমার ন শ্রদ্ধেয় বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, অগ্রহায়ণের তী" পত্রে প্রকাশিত "বাঙ্গালার ইতিহাস লোচনা)" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার হাস" উপলক্ষ করিয়া, এক শ্রেণীর সম্বন্ধে ার যে অভিযোগ আছে, স্পষ্টাক্ষরে তাহার রণ করিয়াছেন। আমি বিদ্যাবিনোদ াশয়ের উক্তি পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া রস্বরূপ এইশ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের সমর্থনে া বলিবার আছে, তাহা নিবেদন করিব।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মহাভারতের এবং পুরাণের ঐতিহাসিকতা, ভেদের একটী কারণ। এই বিষয়ে দ্যাবিনোদ মহাশয়ের অভিযোগ—

"যে মহাগ্রন্থ উল্লেখ করিয়া 'ইতিহাস' শব্দটী সংস্কৃত অভিধানে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই মহাভারতেরই ঐতিহাসিকতা তর্কের বিষয় মনে করিয়া রাখালবাবু উহা পরিহার করিতেছেন।" (৭৭৫ পৃঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে 'ইতিহাস'-শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মহাভারতই বা কোন্ হিসাবে ইতিহাস, তাহার অবধারণ করিতে হইলে, 'ইতিহাস'-শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ক্ষীরস্বামী ইতিহাস-শব্দের এই প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন—"ইতি হ আসীদ্যত্রেতিহাস, ইতিরেবমর্থে, হঃ কিলার্থে।" এইরূপই ঘটিয়াছিল (ইতি—হ—আস) যেখানে, অর্থাৎ যাহাতে অতীত ঘটনার বৃত্তান্ত থাকে, তাহা ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বা পূর্ব্বচরিত। অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ যে ইতিহাসের বিষয়, 'ইতি'র সহিত "হ"র যোগ তাহা সূচিত করিতেছে। সুতরাং ব্যুৎপত্তির হিসাবে 'ইতিহাস'-শব্দকে history-শব্দের প্রতিশব্দরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, ঠিক সেই অর্থে ইতিহাস-শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই।

বৈদিক যুগ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস-শব্দের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ব-বেদ-সংহিতায় (১৫।৬।৪) "পুরাণ", "গাথা", "নারাশংসী", এবং "ইতিহাস" একত্র উল্লিখিত

হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে (১১।৫।৬) পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত "ব্রহ্মযজ্ঞ" প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—"স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ", 'স্বয়ং (বেদ) অধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞ।'

তৎপরে বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়নের ফল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"পয়-আহুতয়োহবা এতা দেবানাম্ যদৃচঃ",—'ঋক্‌গুলি (ঋগ্বেদ) দেবগণের উদ্দেশ্যে দুগ্ধাহুতিস্বরূপ।' এইরূপ যজুস্‌-গুলিকে (যজুর্ব্বেদ) আজ্যাহুতি (ঘৃতাহুতি), সামগুলিকে (সামবেদ) সোমাহুতি, অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্রগুলি (অথর্ব্ববেদ) মেদ-আহুতি বলা হইয়াছে। তৎপরে বলা হইয়াছে—

"মধ্বাহুতয়োহবা এতা দেবানাম্ যদনুশাসনানি বিদ্যাবাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণং গাথা নারাশংস্যঃ স য এবং বিদ্বাননুশাসনানি বিদ্যা বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণং গাথানারাশংসীরিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মধ্বাহুতিভিরেব তদ্দেবাং স্তর্পয়তি।"

'অনুশাসন, বিদ্যা, বাকোবাক্য—(কথোপকথন), ইতিহাস, পুরাণ, গাথা এবং নারাশংসী দেবগণের উদ্দেশ্যে মধু-আহুতিস্বরূপ। যিনি এই তথ্য জানিয়া প্রতিদিন অনুশাসন, বিদ্যা, বাকোবাক্য, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা এবং নারাশংসী অধ্যয়ন করেন, তিনি মধু-আহুতি দান করিয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন করেন।'

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।১।৪) "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণ শ্চতুর্থ ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো" ইত্যাদি বচনে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদের পর ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের আরও অনেক স্থানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে। এই সকল অংশ আলোচনা করিলে মনে হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈদিক আর্য্য-সাহিত্যে "ইতিহাস" নামক একটি অঙ্গ প্রচলিত ছিল এবং তাহার অধ্যয়ন বা আবৃত্তি পুণ্যকর বলিয়া গণ্য হইত। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্য বলিয়াছেন (১।১।৩), "সামর্গ্যজুর্বেদাস্‌ত্রয়ী। অথর্ব্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ।" 'সামবেদ, ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, এই তিন বেদ ত্রয়ী। অথর্ব্ববেদ এবং ইতিহাসবেদও বেদ।' পুনশ্চ (১।৫) কৌটিল্য এই ভাবে ইতিহাসের বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্ম্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ।" অর্থাৎ, ইতিহাস বলিলে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র, এই সমস্ত বুঝায়। পুরাণাদি ইতিহাসের অঙ্গ। ইতিহাসের এই ষড়ঙ্গের মধ্যে, এখন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিলে যাহা আমরা বুঝি, তাহা ইতিবৃত্ত নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতে যাহা "ইতিহাসবেদ" নামে পরিচিত ছিল, ইতিহাস শব্দের বুৎপত্তি-অনুসারে বা এখনকার পাশ্চাত্য 'হিষ্টরি'শব্দে যাহা বুঝায়, সেই রূপ বিবরণ-পরিরক্ষণ তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তৎকালে ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং অর্থশাস্ত্রের অনুশাসনগুলির প্রচার। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঐতিহাসিকগণ পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ প্রভৃতি নানাবিধ প্রকৃত এ

কৃত ঘটনার বর্ণন করিতেন। প্রকৃত ঘটনার বর্ণনসময়েও উহা হইতে যে উপদেশ বা শিক্ষা লাভ করা যায়, ঐতিহাসিকগণের লক্ষ্য থাকিত সেই দিকে; সুতরাং প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল প্রকৃত ঘটনার বিবরণ বিবৃত বা লিখিত করিত, কালক্রমে তাহাদের বিকৃতি সাধনের যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

কৌটিল্য ইতিহাসের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই লক্ষণাক্রান্ত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া কথিত, এবং পঞ্চমবেদ বলিয়া এখনও পূজিত হয়। এই গ্রন্থ আমাদের 'মহাভারত'।

মহাভারতের সূচনায় ঋষিগণ সৌতিকে অনুরোধ করিয়াছেন—

বেদব্যাসেন যৎ প্রোক্তং, পুরাণং পরমর্ষিণা।
সূতৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতম্॥
কৃতাখ্যান রবিষ্টস্য বিচিত্রপদপর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈ র্ভূষিতস্য চ॥
ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্॥
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
যথাবৎ স ঋষিস্তুষ্ট্যা সত্রে দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া॥
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাং॥

আদিপর্ব্ব, ১।১৭—২১॥

'পরমর্ষি দ্বৈপায়ন (ব্যাস) যে পুরাণ বলিয়াছেন, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ শ্রবণ করিয়া যাহার পূজা করিয়াছেন, মনোরম এবং বিবিধ পর্ব্বে পূর্ণ, সূক্ষ্মার্থ-প্রতিপাদক-যুক্তিসংবলিত, বেদার্থ-সম্মত, অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাসবিরচিত সেই শ্রেষ্ঠ আখ্যান ভারত (মহাভারত) নামক ইতিহাসের (যে) গ্রন্থার্থযুক্ত, বুৎপত্তিমত, সর্ব্বশাস্ত্রানুগত, চতুর্ব্বেদ-সংযুক্ত, সংহিত, পুণ্যকর, পাপভয়-হর কথা, যাহা দ্বৈপায়নের আজ্ঞানুসারে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে ঋষি বৈশম্পায়ন যথাবৎ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।'

এখানে 'মহাভারত' পুরাণ আখ্যান এবং ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং মহাভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ শান্তি পর্ব্বে এবং অনুশাসন পর্ব্বে, ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নিবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে "ইতিবৃত্তং, নরেন্দ্রাণাং ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্"ও যথেষ্ট আছে। "বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং" এই বিশেষণ হইতে এবং অন্যান্য কারণে পণ্ডিতগণ মনে করেন, বৈদিক সাহিত্যে যে সকল ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ অবলম্বনে মহাভারত রচিত হইয়াছিল। মহাভারতই আর্য্যগণের ইতিহাসবেদ, বা পঞ্চমবেদ। কৌটিল্য ইতিহাসের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, সেই হিসাবে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা তর্কের বিষয় নহে। কিন্তু গ্রীন (Green) বা ফ্রীম্যানের (Freeman) গ্রন্থ যে হিসাবে ইতিহাস, মহাভারত সেই হিসাবে ইতিহাসপদবাচ্য কি না, ইহাই তর্কের বিষয়।

মহাভারতে নানাপ্রকার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরাণ বা সৃষ্টি-প্রলয়-মন্বন্তরের কথা; কতকগুলি আখ্যায়িকা; কতকগুলি উদাহরণ এবং কতকগুলি ইতিবৃত্ত। মহাভারতে "অত্রাপ্যুদা-

রন্তিমমিতিহাসং পুরাতনম্” এই প্রকার মুখবন্ধ করিয়া, অনেক পশুপক্ষীর গল্পও বলা হইয়াছে। পুণ্যকর, পাপভয়হর, উপদেশ-পূর্ণ ঘটনার বর্ণন করাই মহাভারতকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আদ্যোপান্ত মহাভারতকে এখনকার হিসাবে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত নহে; কিন্তু ‘মহাভারতে’ যে ইতিহাসের অনেক “উপাদান” আছে, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু মহাভারতকে ইতিহাসের উপাদানের আকররূপে ব্যবহার করিবার প্রধান অন্তরায়, মহাভারত-বর্ণিত বৃত্তান্তের মধ্যে কোন্‌গুলি যে আখ্যায়িকা, কোন্‌গুলি যে উদাহরণ, এবং কোন্‌গুলি যে ইতিবৃত্ত, তাহা নির্ব্বাচনের দুরূহতা। কেহ কেহ বলিতে পারেন—“এই নির্ব্বাচন আর কঠিন কি? যে বৃত্তান্তে অলৌকিক ঘটনার সংস্রব নাই, এবং যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা সত্য ইতিবৃত্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।” কিন্তু উদাহরণার্থে যদি অলৌকিক ঘটনা কল্পিত হইতে পারে, তবে উদাহরণার্থ যে লৌকিক ঘটনা কল্পিত হয় নাই, এ কথা কে বলিবে? সুতরাং মহাভারতের ঐতিহাসিক স্তরের আবিষ্কার এখন একান্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। স্বতন্ত্র বাহ্য প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়া, এই কার্য্য কখনও সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। ঐতিহাসিক উপাদানের রত্নাকর ইতিহাসবেদ মহাভারত হইতে আমরা যে ইতিহাস বাছিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়; কিন্তু তজ্জন্য পরিতাপে সময় নষ্ট না করিয়া ভাব, ভাষা এবং ছন্দের সূত্র ধরিয়া মহাভারতের কোন্ অংশ কখন রচিত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ নিরূপণে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্যগণ তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের অন্তর্নিহিত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য যেমন Higher Criticism প্রবৃত্ত হইয়া, অনেকটা সফলকাম হইয়াছেন, আমাদেরও মহাভারতের এবং পুরাণের সেইরূপ Higher Criticism (১) করিতে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। তবেই পঞ্চমবেদের প্রতি সম্যক্ সম্মানপ্রদর্শন করা হইবে এবং ইতিহাসবেদের অন্তর্নিহিত ইতিহাস উদ্ধারের পথ সহজ হইবে।

২। কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা

কুলশাস্ত্রের, বিশেষতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কুলজ্ঞগণের রক্ষিত কুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইতিহাসসেবক-সমাজে মতভেদ লক্ষিত হয়। এই বিষয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভাষায় অপর পক্ষের অভিযোগ এই—

“কুলশাস্ত্রের উপর রাখালবাবু,

(১) Criticism বা সমালোচনা শব্দের সাধারণ অর্থ দোষগুণবিচার। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে Criticism শব্দ অন্যরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই Criticism দুই প্রকার, Lower এবং Higher Criticism। Lower বা Textual criticism-এর উদ্দেশ্য প্রকৃত পাঠোদ্ধার; Higher Criticism-এর উদ্দেশ্য গ্রন্থবিশেষের রচনাকাল, রচনাকারী এবং রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে বিচার।

...বাবু প্রভৃতি অনেকেই বীতরাগ; ...এগুলি একেবারে ফেলিয়া দিবারও ...নিষ নহে।.....অতএব শাসন বা মুদ্রা-...মাত্রেই যে গ্রহণীয় এবং কুলগ্রন্থমাত্রেই যে ...নীয় তাহা বলা যায় না (৭০৩ পৃঃ)।” ...কুলশাস্ত্রগুলি যে একেবারে ফেলিয়া ...বার জিনিষ, এ কথা কেহ কখনও বলে ...াই, এবং বলিতেও পারে না। পক্ষান্তরে, ...কুলশাস্ত্র তাম্রফলকে বা শিলাফলকে ...োদিত লিপির তুল্য মূল্যবান, এইরূপ মনে ...রাই সঙ্গত। তাম্রশাসনে এবং শিলা-...লিপিতে রাজকুলের প্রশস্তি লিপিবদ্ধ থাকে ...লিয়াই ঐতিহাসিকের নিকট উহাদের এত ...াদর। সুতরাং তাম্রশাসন এবং শিলা-...লিপিও কুলপঞ্জিকা ভিন্ন কিছুই নয়—...াতার কুলের কুলপঞ্জিকামাত্র। তাম্রপট্টে ...বা শিলাফলকে ক্ষোদিত হউক, আর ...কাগজে বা তালপত্রে লিখিত হউক, সকলপ্রকার কুলপঞ্জিকাই ঐতিহাসিকের আদরের সামগ্রী। কিন্তু সকল প্রকার কুলপঞ্জিকাই ঐতিহাসিকের আদরের সামগ্রী হইলেও, কোনপ্রকার কুলপঞ্জিকারই সকল অংশ সমান আদরের সামগ্রী নয়। তাম্রপট্টে বা শিলাফলকে ক্ষোদিত অধিকাংশ কুলপঞ্জিকাতেই দুইটী অংশ লক্ষিত হয়। প্রথম অংশে চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি দেবতা এবং রাম-লক্ষ্মণ যদু প্রভৃতি পৌরাণিক নৃপতি হইতে দাতার বংশোৎপত্তির বিবরণ থাকে; এবং দ্বিতীয় অংশে দাতার বংশে যিনি রাজপদের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার সময় হইতে ধারাবাহিক বংশাবলী থাকে।

ঐতিহাসিকেরা এই দ্বিতীয় অংশ যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন, প্রথম অংশের প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধা কখনও প্রদর্শন করিতে পারেন না। তুলট-কাগজে লিখিত কুলপঞ্জিকারও তদ্রূপ দুইটী অংশ আছে। প্রথম অংশে আদিশূর-আনীত রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা-লাভকারীর পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণ নিবদ্ধ হয়; দ্বিতীয় অংশে কৌলীন্য-প্রথার প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পুরুষের করণ-কারণের এবং মেল পঠি মত প্রভৃতির উৎপত্তির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হয়। কৌলীন্যের রক্ষার জন্যই কুলজ্ঞের অভ্যুদয়, এবং কুলজ্ঞের স্মৃতিশক্তির সহায়তার জন্য কুলপঞ্জিকার সঙ্কল্প। সুতরাং কুলপঞ্জিকার কৌলীন্যের বিবরণ অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশ যেরূপ আদরণীয়, প্রথম অংশে নিবদ্ধ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বিবরণ ততটা আদরণীয় হইতে পারে না। কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন,—“আদিশূর বা আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ চন্দ্রসূর্য্যের মত দেবতা বা রাম-লক্ষ্মণ-যদুর মত পৌরাণিক ব্যক্তি নহেন; সুতরাং তাম্রশাসনের কুলপ্রশস্তির প্রথম অংশ অপেক্ষা কুলজ্ঞের কুলপঞ্জিকার প্রথম অংশের প্রতি অধিকতর আস্থা-স্থাপনের অন্তরায় কি?” কিন্তু একই উদ্দেশ্যে, রাজকুলের প্রশস্তিতে রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার রাজপদে অধিকার যে পুরুষপরম্পরাগত, এবং কুলীন ব্রাহ্মণের বংশাবলীতে প্রথম কৌলীন্য-মর্য্যাদাভাগীর কৌলীন্য-মর্য্যাদার দাবীও যে পুরুষপরম্পরাগত, তাহা প্রতিপাদনের জন্য উভয়ে এই প্রথমাংশ সংযোজিত হইয়াছে; এবং উভয়েই কল্পনার অবকাশ তুল্যরূপ।

কৌলীন্যমর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের এবং পরের বংশাবলীর যে ঐতিহাসিক মূল্য সমান নয়, তাহার একটি প্রমাণ এই—কৌলীন্য-প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী বংশাবলীতে পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণের পুরুষ-পর্য্যায়ের সংখ্যায় অসঙ্গত পার্থক্য লক্ষিত হয় না; পক্ষান্তরে, তৎপূর্ব্বের বংশাবলীতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। কান্যকুব্জাগত বীজপুরুষ হইতে কৌলীন্য-মর্য্যাদাভাগীর ব্যবধান বাৎস্যগোত্রে আট পুরুষ, এবং শাণ্ডিল্যগোত্রে পনর পুরুষ। এই সকল কারণে কেহ যদি তাম্রশাসনের বংশাবলীর প্রথমাংশের মত কুলশাস্ত্রের বংশাবলীর প্রথমাংশ সন্দেহের চক্ষে দেখেন, তবে তাঁহাকে সমগ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বীতরাগ বলা যাইতে পারে না। রাঢ়ীয় সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য কুলগ্রন্থ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী"তে এই প্রথম অংশটি বাদই দেওয়া হইয়াছে। রাখালবাবু প্রভৃতি যাঁহারা কুলশাস্ত্রের প্রতি বীতরাগ বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ এ-যাবৎ ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং সমগ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে মত-প্রকাশের তাঁহাদের অবকাশই উপস্থিত হয় নাই।

গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে, ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে, চতুর্ভুজের "হরিচরিত কাব্যে", শীলিমপুরের শিলালিপিতে, এবং অন্যান্য প্রাচীন লিপিতে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাসের যে উপকরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহার সহিত কুলশাস্ত্রের ব্রাহ্মণা-গমনকাহিনীর অবিরোধ লক্ষিত না হওয়ায়, আমরা কেহ কেহ এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু এই ব্রাহ্মণাগমনকাহিনীও একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিষ, এ কথা কোথাও বলা হয় নাই। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তির অনুসন্ধানই চলিতেছে। কিন্তু আমরা কুলশাস্ত্রের একশ্রেণীর বচন-প্রমাণকে একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিষ বলিয়া মনে করিতেছি। এই বচনগুলি আদিশূর কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়নের প্রতিপাদক প্রমাণরূপে পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যসভায় পঠিত "আদিশূর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই শ্রেণীর কতকগুলি বচনের মৌলিকতার আলোচনা করিয়াছিলাম। এই বিষয়টির আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়া, এই প্রবন্ধে ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

লঘুভারত-কারের মতে, ৪২৩০ কলি-গতাব্দে অর্থাৎ ৯৫১ শকাব্দে আদিশূর রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। "সম্বন্ধ-নির্ণয়"-কারের মতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে উল্লিখিত আদিশূরের আহ্বানে কান্যকুব্জের পঞ্চব্রাহ্মণ-আগমনের কালজ্ঞাপক "নবনবত্যধিক-নবশতী শকাব্দ" বচনকে সংবৎ পাঠ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণডাঙ্গানিবাসী ৺ বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের উপদেশ-অনুসারে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-কার বেদবাণাঙ্কশাকে "তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" বচন প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই তিন জন লেখককে আমরা প্রাচীন কুলশাস্ত্রপন্থী বলিতে পারি। ইঁহাদের মধ্যে কার্য্যতঃ দুই প্রকার মত দেখা যায়! এক মতে, ব্রাহ্মণ-আগমনের

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দ (অর্থাৎ ৯৫১, বা ৯৯৯ শকাব্দ), এবং অপর মতে, শতাব্দীর মধ্যভাগ (৯৪২ খৃষ্টাব্দ)।

ইদানীং যাঁহারা কুলশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া ইতিহাসের রচনা করিতেছেন, তাঁহারা কেবলই প্রাচীন কুলশাস্ত্রপন্থিগণের উভয়প্রকার মত এবং তদনুকূল বচন-প্রমাণ একেবারে ফেলিয়া দিতে চাহেন, এবং নবাবিষ্কৃত বচন-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আদিশূর "সম্বন্ধ-নির্ণয়"-কারের নিরূপিত সময়েরও দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের মাঝামাঝি, ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই মতের প্রধান পোষ্টা তিন জন;—৺ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং প্রত্নবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। এই সকল পণ্ডিত যে সকল বচনপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একে একে তাহার বিচার করিব।

১। ১৩০৪ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় প্রকাশিত "কৃত্তিবাস পণ্ডিত" শীর্ষক প্রবন্ধের একটী পাদটীকায় (১১৯ পৃঃ) লেখক ৺ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে,—"শাকে বেদকলম্বষট্ক-বিমিতে" অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হয়েন, এবং এই প্রমাণের বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, "রাঢ়ীয় কুল-পঞ্জিকার "বেদবাণাঙ্ক" শাকের স্থানে নিশ্চয়ই "বেদবাণাঙ্গ শাকে" ছিল, কালবশে এবং নকলকারের দোষে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে।" কিন্তু যখন কুলশাস্ত্রের এবং "ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে"র সময়জ্ঞাপক সকল বচন উড়িয়া যাইতেছে, তখন "বেদকলম্বষট্ক-বিমিতে" বচন কেন যে বেদবাক্যবৎ অবিচারে গৃহীত হইবে, তৎসম্পর্কে বন্দ্যো-পাধ্যায়ের একমাত্র যুক্তি,—ব্রাহ্মণবংশাবলীতে আদিশূর হইতে বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত যে পুরুষপর্য্যায়ের ব্যবধান কথিত হইয়াছে, তাহাতে "অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসর" ধরিতেই হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনও গোত্রের বংশাবলীতে আদিশূর ও বল্লাল সেনের মধ্যে আট পুরুষের ব্যবধান, এবং কোনও বংশাবলীতে পনর পুরুষের ব্যবধান। আট পুরুষে এবং পনর পুরুষে সামঞ্জস্য বিধান যেমন দুষ্কর, এই দুইয়ের গড় করিয়া সাড়ে তিন শত বৎসর ব্যবধানের কল্পনা করাও তেমনই অসঙ্গত।

প্রফুল্লবাবুর আর একটি ত্রুটী,—তিনি বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার একটিমাত্র বচনের বলে চিরপ্রচলিত "বেদবাণাঙ্ক"কে "বেদবাণাঙ্গ" পাঠের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকামাত্রেই বল্লালসেনের সহিত শূর-রাজবংশের সম্বন্ধসূচক যে বচনপ্রমাণ আছে, তৎপ্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। আমার মনে হয়, কুলপঞ্জিকায় নিবদ্ধ সময়-জ্ঞাপক পরস্পরবিরোধী বচনের অপেক্ষা এই প্রকার ঐতিহ্য অধিক মূল্যবান। "গৌড়রাজমালা"য় (৫৮ পৃঃ) পুঠিয়া-নিবাসী ৺ মহেশচন্দ্র শিরোমণির ঘরের কুলগ্রন্থ হইতে এই সম্পর্কে একটি বাঙ্গালা বচন উদ্ধৃত হইয়াছিল। যথা—

"এহি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন

করিয়া আদিসূর রাজার সর্গারোহণ : তদন্তে কিছুকালানন্তর তত দৌহিত্রকুলেত উদ্ভব হইলেন বল্লাল সেন।"

উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের ঘরের কুল-গ্রন্থের আর একটি ছিন্ন পত্রে আদিশূর ও বল্লালসেনের সম্বন্ধ এই ভাবে সূচিত হইয়াছে—

"রাজ্ঞঃ সপ্তমসন্তানস্য দৌহিত্রোভূদ্ব-[ত্বাখ্যঃ]." "সপ্তম সন্তানে"র অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এই বচনটি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু বিগত বৎসর মাঝগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিশেখর সিদ্ধান্ত এবং শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মুকুটমণি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকে যে সকল কুলগ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কথা নানা আকারে পাওয়া যায়।

(ক) "ইত্তবকালে আদিসূর রাজা পঞ্চ-গোত্রেতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাঅন করেন [পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র] আনাঅন করিআ আদিশূর রাজার শর্গারোহণঃ সপ্তম পুরুষান্তরে দইত্রকুলে জন্মিলেন॥ বল্লালসেনঃ।"

(খ) "এই সকল ক্রিয়া করিয়া আদিসূর রাজার সর্গারোহণঃ॥ ব্রাহ্মণ দ্বিগের সপ্তম পুরুষ জায়ঃ রাজার সপ্তম পুরুষ জায়ঃ রাজা জুগ্য পাত্র পায় না জে য়বিসেক করিয়া রাজা করেঃ॥ কিছুকাল অন্তর দহিত্র সন্তানেত জর্ম্মিলেন বল্লালসেন।"

ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের বাড়ী হইতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি যে "কুলদোষ" গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে "ক্রমশঃ সুতবর্ণিত" সপ্তজন শূর রাজের নাম আছে। যথা,— আদিশূর, ভূশূর, ক্ষিতিশূর, অবনীশূর, ধরণীশূর, ধরাশূর এবং অনুশূর। সুতরাং এখানেও আদিশূরের সপ্তম পুরুষ যে শূর-বংশের শেষ নৃপতি, তাহা সূচিত হইয়াছে। বিজয়সেনের ৩৩ রাজ্য সংবতের একখানি তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে,—বিজয়সেনের মহিষী এবং বল্লালসেনের জননী বিলাসদেবী শূরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রমাণও উপরোল্লিখিত বচনপ্রমাণের একাংশ সমর্থন করে। সুতরাং বারেন্দ্র-কুলজ্ঞগণের রক্ষিত আদিশূর এবং বল্লাল-সেনের নয় পুরুষের ব্যবধান-বিষয়ক ঐতিহ্য অমূলক নাও হইতে পারে। যদি এই কথা অমূলক না হয়, তবে আদিশূর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের মধ্যভাগে, পালবংশীয় দ্বিতীয় গোপালের বা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সমসময়ে, "সম্বন্ধ-নির্ণয়"কারের অনুমতি ৯৯৯ সংবতের কিছুকাল পরে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ অনুমানও করা যায়। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপি হইতে জানিতে পারা যায়,—একাদশ শতাব্দের প্রথম পাদে, গৌড়াধিপ মহীপালের সময়ে, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর নামে একজন নরপতি ছিলেন। আদিশূর যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে দশম শতাব্দের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তবে হয় ত তিনি রাঢ়বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। কাম্বোজ-আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, এবং বারেন্দ্র যখন কাম্বোজগণের পদানত, তখন রাঢ়ে, এবং বঙ্গে কোনও পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতির অভ্যুত্থানের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। আদিশূর কি সেই সুযোগে অভ্যুত্থিত হইয়াই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া, কোনও

চিরোৎসন্ন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন? এইরূপ অনুমানের প্রলোভন সংবরণ করা সুকঠিন। কিন্তু কেবল আন্দাজের উপর এত কথা কোনও মতেই বলা যাইতে পারে না।

২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মা আদিশূরের অনুরোধে পঞ্চব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২) কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকার উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

Thirty years ago the theory was that Brahmans were brought to Bengal by Adisura either in 999 Samvat i.e. 954 A.D. or in বেদবেদাঙ্কশাক, i.e. 954 Saka or 1032 A.D. But since then careful study of all manuscripts of earlier genealogists has given more correct information on the subject. Hari Misra was a contemporary of Danauja-Madhava, who again was a conremporary of Ghiyatuddin Bulban (1265-1268 A. D.)...Hari Misra says,—that the Palas got ascendency in Bengal shortly after the coming of the five Brahmans, and it is now very nearly settled that they became rulers of Bengal between A.D. 760 and 770. So Adisura brought the Brahmans not in the eleventh century but in the eighth. —J. A. S. B. Vol. VIII. New Series, 1912. pp. 347-398.

শাস্ত্রী মহাশয় এবং নগেন্দ্রবাবু হরিমিশ্রের এই কারিকার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা মহামূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-আনয়নের পরে পালরাজগণের অভ্যুদয়ের কথা আছে, পালরাজ দেবপালের কথা আছে, সেন-রাজগণের কথা আছে। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন এই গ্রন্থ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র দনুজমাধবের সভায় প্রায় ৫৫০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত (রাজন্যকাণ্ড ৯৯ পৃঃ)। লক্ষ্মণ সেন অন্যূন ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং লক্ষ্মণসেনের পুত্রের সভাপদ হরিমিশ্রের রচনাকাল "প্রায় ৫৫০ বর্ষ" না বলিয়া, মোটামুটি ৭০০ বৎসর বলাই কর্ত্তব্য। বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে নাকি "এই প্রাচীন পুথির দুই শত বর্ষের হস্তলিপি" আছে (রাজন্যকাণ্ড, ১৫৮ পৃঃ, ৪৬নং টীকা)। দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত, সাত শত বৎসরের পূর্ব্বে রচিত, শূর, পাল এবং সেনবংশের এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস-সংবলিত এই মহাগ্রন্থ কেন যে শাস্ত্রী মহাশয় এবং নগেন্দ্রবাবু এতদিন প্রকাশ করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। শুধু যে কুলশাস্ত্রানভিজ্ঞ নবীন ঐতিহাসিকেরাই হরিমিশ্রের এই বচনগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা নহে; প্রাচীন কুলশাস্ত্রাভিজ্ঞ সম্বন্ধ-"নির্ণয়"-কারও আদিশূরের ব্রাহ্মণ-আনয়নকাল সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বতন মত, ৯৯৯ সংবৎ, পরিহার করিয়া; নগেন্দ্রবাবুর ধৃত হরিমিশ্রের

বচনানুসারে কোনও নূতন মতের প্রচার করেন নাই, এবং "ভাষাপরিচ্ছেদে"র ভূমিকায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর "ভাষাপরিচ্ছেদ"-কারের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ৯৯৯ সংবৎই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু হরিমিশ্রের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে দনুজ-মাধবের বিবরণ উদ্ধৃত করিব:—

"তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ।
রতিং চাপ্যকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ॥
ন পরু বন্তি তে বিপ্রা স্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥
প্রাদুরভবদ্ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনোজমাধবঃ সর্ব্বভূপঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥
এতৎসভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তাঃ দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ॥
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া।
সম্বন্ধং কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ॥"

নগেন্দ্রবাবুর অনুবাদ—'লক্ষ্মণ-পুত্র কেশবসেন যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া তাঁহাদের সহিত (কিছুদিন) দ্বন্দ্ব চালাইতেছিলেন। এ সময় ব্রাহ্মণেরাও তথায় তিষ্ঠিতে পারে নাই! অনন্তর সেন-বংশে দনৌজমাধব প্রাদুর্ভূত হন। সকল নৃপতিই তাঁহার পদসেবা করিত। এই মহারাজের সভায় দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভব নানাগুণসমাযুক্ত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। পিতামহকেও হারাইবার অভি-প্রায়ে তিনি ধন দ্বারা ও রাজসম্মান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধনির্ণয় করিয়াছিলেন, কেশব সেনের প্রসঙ্গের পরে, "অনন্তরং সেনবংশাৎ দনৌজামাধবঃ প্রাদুরভবৎ" বলায়, উভয়ের মধ্যে কালব্যবধান সূচিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণা নরাঃ" শুধু ব্রাহ্মণ বুঝাইতে পারে না, অন্য প্রকার নরও বুঝায়। শেষ শ্লোকটির অনুবাদ একে-বারেই মূলানুগত নহে। "কৃতবন্তঃ" ক্রিয়ার কর্ত্তা "ভূধরপুঙ্গবাঃ"। অনুবাদ এইরূপ হইবে,—সকল নৃপশ্রেষ্ঠগণ পিতা-মহকে জয় করিবার জন্য দানের দ্বারা-এবং রাজসম্মানের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। এই শ্লোক দনোজমাধবের ব্রাহ্মণের কোনও উল্লেখ নাই, কেননা ভূধর অর্থ ব্রাহ্মণ নহে, রাজা।

এইরূপ অসম্বন্ধ রচনাকে বাঙ্গালায় সংস্কৃতচর্চ্চার সেই গৌরবময় যুগের লক্ষ্মণ-সেনের উত্তরাধিকারীর সভাকবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। নবীন ঐতিহাসিকেরা ঊনবিংশ শতাব্দের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের উদ্ভাবিত Critical Method বা ঐতিহাসিক বিচাররীতি অবলম্বনে সত্যোদ্ধার করিতে চাহেন। বিচারশীল ঐতিহাসিক বা Critic কোনও বৃত্তান্তই অসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। "For the critic is one who, when he lights on an interesting statement, begins by suspecting it." যতক্ষণ না ঐতিহাসিক আলোচ্য বৃত্তান্তের মূল অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন, ততক্ষণ তাঁহার সন্দেহমোচন হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই পন্থা অবলম্বন করিলে, অতি অল্প তথ্যই আবিষ্কার করা যাইতে পারিবে, ধারাবাহিক ইতিহাসগঠন অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ইতিহাসসেবক অধিকতর লাভবান হইতে পারেন কোন্ পথ অবলম্বন করিলে—পরিমাণে বেশী তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, না যথারীতি তথ্যোদ্ধারের শ্রমের ও সাধনার ফলে? লর্ড অ্যাক্টন বলিয়াছেন—

"For our purpose, the main thing to learn is not the art of accumulating material, but the sublimer art of invastigating it, of discerning truth from falsehood, and certainty from doubt. It is by solidity of criticism more than by the plenitude of erudition, that the study of history strengthens, and straightens, and extends the mind." পুনরপি, "For us then the estimate of authorities, the weighing of testimony, is more meritorius than the potential discovery of new matter."

আমাদের এদেশের নবীন ঐতিহাসিকেরাও ধারাবাহিক কাহিনী গড়িয়া সৌখীন পাঠকের কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে চাহেন না, পরন্তু যে বিচাররীতি মানুষের চিত্তকে প্রসারিত করিতে পারে, মানসিক শক্তি বিকশিত করিতে পারে, ইতিহাস-অনুরাগী জন-সমাজে সেই বিচাররীতি প্রচলিত করিতে চাহেন। তাঁহারা কুলগ্রন্থের উপর বীতরাগ নহেন, কুলশাস্ত্রের নামে প্রচারিত এই প্রকার উদ্ভট বচনের উপর বীতরাগ। কুলশাস্ত্রাভিজ্ঞ প্রবীণগণের নিকট নব্য সম্প্রদায়ের সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা হাতের পুথিগুলি যথারীতি প্রকাশ করিয়া, ঐগুলির বিচারের অবকাশ দিন। যদি হরিমিশ্রের গ্রন্থের বিচার করিলে, ইহার ভিতর এমন সকল তথ্য পাওয়া যায়, যাহা নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক, তবে তাহার ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবার কোনও অন্তরায় থাকিবে না।

৩। গত বৎসর বড়দিনের অবকাশে সাহিত্য-সভায় "আদিশূর" নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—

নগেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণডাঙ্গার ৮ বংশী বিদ্যা-রত্নের বাড়ী হইতে যে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নকল করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা হইতে ১৩২১ সালে প্রকাশিত "রাজন্যকাণ্ড" নামক গ্রন্থে (১০০ পৃঃ) এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"

অর্থাৎ, ৬৫৪ শাকে আদিশূর রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; এবং ৬৬৮ শাকে ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি "ব্রাহ্মণকাণ্ড" নামক পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থে আদিশূরের সময় লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন; উক্ত ব্রাহ্মণডাঙ্গার পুস্তক হইতে "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, অথচ "রাজন্যকাণ্ড"-ধৃত এই অত্যাবশ্যক বচনটি উদ্ধৃত করেন নাই কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন।—আমরা উক্ত বিদ্যারত্ন ঘটকের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া যে পুথি সাহিত্য-সভায় উপস্থিত করিয়াছিলাম,

তাহাতে নগেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক "রাঢ়ীয় কুল-মঞ্জরী" হইতে উদ্ধৃত সকল বচন অবিকল দৃষ্ট হয়, কেবল তিনটি পংক্তি বিকল অবস্থায় দৃষ্ট হয়। নগেন্দ্রবাবু যেখান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ", সেই প্রসঙ্গে আমাদের পুথিতে আছে,—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর-সুতেন চ।" আমাদের পুথিতে "বসুকর্ম্মাঙ্ককে (৮৯৮) শাকে" আদিশূরের রাজ্যলাভ এবং "বেদবাণাঙ্ক (৯৫৪) শাকে" গৌড়ে ব্রাহ্মণ-আগমন কথিত হইয়াছে। এইরূপ পাঠান্তরের কারণ কি?

প্রথম প্রশ্নের কোনও উত্তরই এ-যাবৎ আমরা পাই নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্রবাবু সাহিত্য-সভায় বলিয়াছেন, আমাদের সংগৃহীত পুথি এবং তিনি যে পুথি নকল করিয়া আনিয়াছেন, তাহা এক পুথি নয়, দুইখানি ভিন্ন পুথি। আমরা নগেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার নকল করা পুথিখানি আদ্যোপান্ত প্রকাশিত করুন।

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কোন কোন কুলশাস্ত্রের কতকগুলি বচন কেন যে ফেলিয়া দিবার জিনিষ মনে করি, তাহার কৈফিয়ৎ দিলাম। নগেন্দ্রবাবুর ব্যবহৃত আরও কতকগুলি কুলশাস্ত্রের বচনের প্রতি আমরা বীতরাগ। দৃষ্টান্তস্বরূপ টালা-নিবাসী ৺ গুরুচরণ বিদ্যাসাগরের বাড়ী হইতে সংগৃহীত ঈশ্বর-কৃত "বৈদিক কুলপঞ্জিকা" হইতে তিনি যদুবংশীয় সামলবর্ম্মার যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন (রাজন্যকাণ্ড ২৯১ পৃঃ), তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাখালবাবু "বাঙ্গালার ইতিহাসে" (১৩৫—১৩৬ পৃঃ), এই বিষয়টি বিশেষ দক্ষতার সহিত খুব সংযত ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ সন্দেহজনক আর একখানি গ্রন্থ—বটুভট্টের "দেববংশ"। যে "ক্ষত্রপ" শব্দ কোনও সংস্কৃত অভিধানে বা আর কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই, এই গ্রন্থের আরম্ভেই সেই "ক্ষত্রপ" শব্দটি আছে। সন্দেহের আর যে সকল কারণ আছে, রাখালবাবু তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ("বাঙ্গালার ইতিহাস"—১৩০-১৩২ পৃঃ)। এই কয়েক-খানি কুলগ্রন্থ হইতে প্রকাশিত কতিপয় বচনের প্রতি আমরা নির্ভর করিতে পারি না বলিয়াই, বাঙ্গালার মুষ্টিমেয় ইতিহাস-সেবকগণের মধ্যে একটা অনর্থক দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। পাঠকগণগকে এই দলাদলিতে মধ্যস্থতা করিতে আহ্বান করিবার জন্য এই প্রবন্ধ উপস্থিত করিলাম।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

মার্কিনের জাপানী "ম্লেচ্ছ"

ইয়োরোপ ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ অতিপুঞ্জ এসিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ বিদ্যা, শিল্প ও কার্য্য দখল করিয়া বসিয়াছেন। সমগ্র প্রাচ্য জনপদে শ্বেতাঙ্গেরা প্রায় ও গৌণ ভাবে প্রভুত্ব করিতেছেন। White Peril বা "শ্বেতাঙ্গ-বিভীষিকা" একটা কল্পনামাত্র নয়। এসিয়া ও আফ্রিকার জনগণ ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকে।

আজকাল ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এক একটা উল্টা সুরের কথা শুনা যায়। কোথাও জনপদের শ্বেতাঙ্গেরা কেহ কৃষ্ণাঙ্গ-বিভীষিকা দেখিতেছে, কেহ পীতাঙ্গ-বিভীষিকা দেখিতেছে, কেহ মুসলমান-বিভীষিকা দেখিতেছে। শ্বেতাঙ্গদিগের পরস্পরের ভিতরেও আবার এইরূপ বিভীষিকা দেখার বৈচিত্র্য আছে। ইয়াঙ্কিস্থানের শ্বেতাঙ্গেরা ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গসমাজকে দূরে রাখিতে চাহে। ইহাদের এই শ্বেতাঙ্গ-বিভীষিকার সূত্র Monroe Doctrine (মেন্‌রো-নীতি)। মার্কিন-দেশীয় লোকের দ্বিতীয় বিভীষিকার নাম Yellow Peril বা পীতাঙ্গ-বিভীষিকা। পীতাঙ্গ জাপানের ক্রমিক উন্নতি দেখিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জাপানীদের অভ্যুদয়ে চীনের পীত-জাতি এবং সমগ্র এসিয়ায় লোক-সমাজ ক্রমেই ভাল ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং জাপানের উন্নতিতে বাধা দেওয়া মার্কিনের বিশেষ লক্ষ্য।

১৯১৩ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে যুক্ত রাষ্ট্রের "রেপ্রেজেণ্টেটিভ" গৃহে একজন সভ্য, ইয়াঙ্কিস্থানের পীতাঙ্গ-বিভীষিকা প্রচার করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিকট কল্পনা শ্বেতাঙ্গ-সমাজের মহলে মহলে সুপ্রচলিত। বিশেষত ইয়াঙ্কিদের ভিতর ইহা একপ্রকার বদ্ধমূল। ইয়াঙ্কি-সমাজে ইয়োরোপ বিভীষিকা যতটা আছে তাহার অপেক্ষা এসিয়া-বিভীষিকা অনেক বেশী। পীতাঙ্গ-বিভীষিকা, প্রাচ্য-বিভীষিকা ইত্যাদি শব্দে ইহারা মোটের উপর জগতে এসিয়ার প্রভুত্ব বিস্তার বুঝিয়া থাকে। এই প্রভুত্ব বিস্তারে জাপানীরাই পথ-প্রবর্ত্তক—জাপানকে নবীন এসিয়া তাহার জন্মদাতা ও দীক্ষাগুরু বলিয়া বিবেচনা করে। এই কারণে জাপানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতই মার্কিণ দেশে প্রাচ্য-বিভীষিকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সোজাসুজি জাপানী-বিভীষিকা বলিলেই ইয়াঙ্কিদের মনের কথা যথাযথ বিবৃত হয়।

ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে আসিয়া দেখিতেছি—জাপানীদের প্রভাব মার্কিন দেশে নিতান্ত নগণ্য নয়। রেলে, দোকানে, বাজারে, রাস্তায়, হোটেলে, প্রদর্শনীতে সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই জাপানীরা ঘর জুড়িয়া বসিয়াছে। বিশ্ব-মেলার যে-কোন সৌধে প্রবেশ করিলেই জাপানের কীর্ত্তি দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া জাপানী বাগান, জাপানী হোটেল, জাপানী কুস্তী-কছ্‌রত, জাপানী নাচ-গান-বাজন,

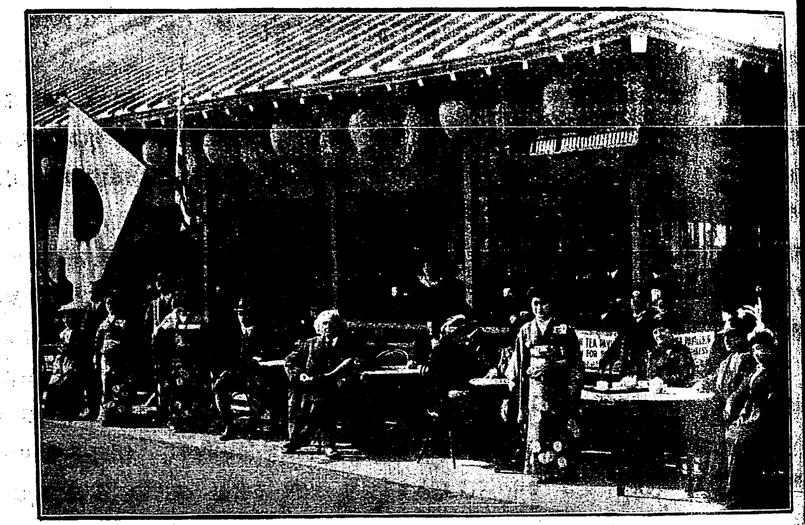

জাপানী চা-গৃহ

জাপানী যাদু ইত্যাদি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো সহরের বড় বড় মহাল্লার আগাগোড়া সবই জাপানী লোকজনে পরিপূর্ণ। জাপানী দোকান-হোটেলের বিজ্ঞাপনপত্র এবং নাম ও বিবরণ জাপানী ভাষাতেই প্রচারিত হইয়া থাকে! জাপানী ব্যবসাদারেরা প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের নানা-রূপ সচিত্র পোষ্টকার্ড এবং চিত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। এইগুলিতে ইংরাজী বিবরণের সঙ্গেসঙ্গে জাপানী বিবরণ দেওয়া আছে। ফলত বুঝিতে পারিতেছি যে, মার্কিণের জাপানী-সমস্যা সত্যসত্যই গুরুতর।

ভারতবাসীরা যাহাদিগকে পছন্দ করে না তাহাদিগকে "ম্লেচ্ছ" বলিয়া থাকে। বর্জ্জনীয়, বহিষ্কারযোগ্য সকল বস্তুই হিন্দু-সমাজে ম্লেচ্ছ নামে পরিচিত। বর্জ্জনের কারণ যাহাই হউক না, ম্লেচ্ছ জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি সমস্তই অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। খৃষ্টানেরাও এইরূপ অখৃষ্টানদিগকে "হীদেন" (heathen) বলিয়াছে। ইহাদের বিবেচনায় হিদেনেরা দুশ্চরিত্র, বুদ্ধিহীন, নীতিহীন, ধর্ম্মহীন অসভ্য। আজকাল Asiatic বা "এসিয়াবাসী" শব্দটা ইয়োরোপীয় ও আমেরিকানদিগের নিকট "হিদেন" শব্দেরই নামান্তর রূপে ব্যবহৃত হয়। ম্লেচ্ছ বলিলে হিন্দুরা যা বুঝে, কাফের বলিলে মুসলমানেরা যা বুঝে, "এসিয়াটিক" বলিলে প্রাচ্য-জগতে খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গেরা ঠিক সেইরূপ বুঝে। অভিধানের ভিতর যতগুলি অকথ্য গালাগালি থাকিতে পারে, "এসিয়াটিক" শব্দে বর্ত্তমান যুগে ঠিক তাহা বুঝায়।

...১০২ খৃষ্টাব্দে চীনাদিগকে ইয়াঙ্কিস্থান ...ম্লেচ্ছজ্ঞানে বহিষ্কার করিবার আইন ...বিত হয়। সেই উপলক্ষে যুক্ত দরবারের ...একজন সেনেটার বক্তৃতা করেন। তাহাতে ...বাসী" শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি।

...ম্লেচ্ছ চীনা, ম্লেচ্ছ জাপানী, ম্লেচ্ছ হিন্দুস্থানী, ...ই ইয়াঙ্কিস্থান হইতে বহিষ্কার করা ...ক। ইহা মার্কিন দেশের দ্বিতীয় ...নীতি।

...চীনেরা বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ...য়গণকে স্বদেশের বাহিরে রাখিতে ...ী হইয়াছিল। হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা ...দ্ধ করিয়া ম্লেচ্ছদেশের সঙ্গে ভারতবাসীর ...দান-প্রদান অবরুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। ...রিয়াও এইরূপ বিদেশীয় বর্জ্জন-নীতি ...লম্বন করিয়াছে। দুনিয়ার প্রত্যেক ...ই একটা করিয়া "চীনের প্রাচীর" ...যায়। সকল জাতিই প্রায় একই ...ণের যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিদেশীয়-...র সঙ্গে স্বদেশীয় লোকজনের সংশ্রব ...করিতে চাহে। আজকাল ইয়াঙ্কিরা ...সকল যুক্তি দেখাইতেছে, প্রাচীন কালে ...রা সেই যুক্তিই দেখাইত, মধ্য যুগে ...রাও ঠিক সেই যুক্তিই দেখাইত।

...ইয়াঙ্কি-মতে জাপানীরা ধর্ম্মজ্ঞানহীন ...চরিত্র জাতি। ইহাদের সমাজে পারি-...রিক বন্ধন অতিশয় শিথিল। ইহাদের ...ার কোন মূল্য নাই। ইহাদের সঙ্গে ...-দেন করা বড় কঠিন।

...জাপানী-সমাজে নাকি বারবনিতার সংখ্যা ...শয় অধিক। জুয়াখেলায় আসক্তিও ...পানীদের একটা বিশেষ দোষ।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আজকাল প্রায় ৭৫,০০০ হাজার জাপানী বাস করে। ইহাদের অধি-কাংশই ক্যালিফর্ণিয়ার অধিবাসী। জাপানী ছাত্র, অধ্যাপক, পর্য্যটক, প্রচারক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইত্যাদি লোকের সংখ্যা বেশী নয়। ক্যালিফর্ণিয়ার শতকরা প্রায় ৯৫ জন জাপানী হয় কৃষক, না-হয় মজুর, না-হয় দাস-দাসী। এইখানেই ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে জাপানীর বিশেষ বিরোধ।

মার্কিনের নরনারীগণ বলে যে, জাপানীরা নিতান্ত অল্পবেতনে কর্ম্মগ্রহণ করে। ইহারা অনাহার সহ্য করিয়াও কর্ম্ম করিতে পারে। দিনের ভিতর বহু ঘণ্টা খাটিবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই সকল কারণে শ্বেতাঙ্গেরা ইহাদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় জয়ী হইতে অপারগ। তাহার ফলে আমেরিকার লোক-জনের আর্থিক অবস্থা হীন হইবার সম্ভাবনা এবং বৈষয়িক ও সাংসারিক আদর্শেরও অবনতি ঘটিতে বাধ্য। ইহা নিবারণ করিবার জন্য জাপানী বহিষ্কার-নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

জাপানীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জানে না বলিয়া একটা অপবাদ মার্কিন-সমাজে রটিয়াছে। ইহারা একবার যে গৃহে বাস করে সেই গৃহে ভবিষ্যতে কোন শ্বেতাঙ্গ আসিতে চাহে না। এমন-কি সেই মহাল্লা হইতেও শ্বেতাঙ্গেরা সরিয়া পড়ে। কালে পাড়াটা খাঁটি জাপানীটোলায় পরিণত হয়। ইহা আমেরিকার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

জাপানী কৃষকদিগের একটা দোষ সর্ব্বত্র প্রচারিত। ইহারা নাকি ভূমি-কর্ষণ সম্বন্ধে

প্রথম প্রথম বড় অমনোযোগী থাকে। তাহার ফলে ভূমির উৎপাদনী শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা ভূমি বেচিয়া ফেলে। তখন জাপানীরা ইহা ক্রয় করিয়া লয় এবং মনোযোগের সহিত ভূমির উন্নতিবিধান করে।

ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র স্যাক্রামেণ্টো নগরে। ইহার অতি সন্নিকটে ফ্লোরিণ নগর। কৃষিকার্য্যের জন্য এই অঞ্চল সুবিখ্যাত। এখানে জাপানী সংখ্যাও খুব বেশী। জাপানী-বিদ্বে এই অঞ্চলে অতি ঘোরতর আকারে দে দিয়াছে।

পরজাতি-বিদ্বেষ কাহাকে বলে, তা বুঝিবার জন্য ইয়াঙ্কিস্থানের ক্যালিফর্ণি প্রদেশে আসা আবশ্যক। ইয়াঙ্কিদের নি বিদ্বেষও বোধ হয় এতটা তীব্র নয়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকা

মহর্ষির কথা

একবার যখন মহর্ষিদেব একাকী বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন, তখন আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দ মোহন বসু ও আমি পরামর্শ করিলাম যে মহর্ষিদেবকে সংবাদ না দিয়া শান্তি নিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইব। তদনুসারে একদিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১০টার পরে শান্তি নিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চাকরের হাতে আমাদের নাম উপরে প্রেরণ করিলে দেখিতে পাইলাম যে মহর্ষি সিঁড়ির উপরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদিগকে উপরে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমরা উপরে উঠিলে বলিলেন—"আমি খেতে যাচ্চি, এস তোমরাও আমার সঙ্গে খেতে বসো।" আমি বলিলাম—"খাবার ত একজনের মত হয়েছে, আপনি আহার করুন, আমরা একটু অপেক্ষা করি, পরে খাব।" শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা কি মনে একজনের মতই খাবার প্রস্তুত হয়েছে এস না, বসে দেখ না, কিছুরই অভ হবে না।" আমরা গিয়া তাঁর স আহারে বসিলাম। তিন জনে বেশ আহ চলিল, কিছুরই অভাব হইল না। প ভৃত্যদের মুখে শুনিলাম যে, কে ক আসে তাহা স্থির না থাকাতে প্রতিদি দুই একজনের মত অধিক রান্না হয়।

আহারান্তে মহর্ষি মুখ হাত ধুইতেছে ইতিমধ্যে আমরা দুজনে তাঁর বসিবার ঘ গেলাম। গিয়াই দেখি যে ভূতত্ত্ব-বি বিষয়ে একখানি নব-প্রকাশিত প্রসিদ্ধ তাঁহার টেবিলের উপরে রহিয়াছে। গ্রন্থখানির প্রশংসা আমরা সংবাদপ পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থখানি দেখিয়া আ মোহন বাবু বলিলেন—এই বইখা অনেক প্রশংসা কাগজে পড়েছি, মহর্ষি

খানা আনায়ে পড়ছেন?" আমি বলিলাম —তাই ত মনে হয় কারণ বৈএর ভিতর াড়ের কাগজ-কাটা রয়েছে, দেখলে মনে য় কাটছেন ও পড়ছেন।" ইতিমধ্যে হর্ষি আসিয়া উপস্থিত; সে বৈখানা আনন্দ-মোহন বাবুর হাতে দেখিয়া বলিলেন—"কি আনন্দমোহন, বৈখানা কি আগে দেখেছ?"

আনন্দমোহন।—না দেখিনি, তবে াগজে অনেক প্রশংসা শুনেছি। এখানা কি আপনি পড়ছেন?

মহর্ষি। হাঁ, আমিও প্রশংসা শুনে ানিয়ে পড়ছি।

আনন্দমোহন। (বিস্ময়াবিষ্টভাবে) আপনি Geology পড়ছেন?

মহর্ষি। (হাসিয়া) সে কি আনন্দ-মোহন, অমন করে জিজ্ঞাসা করছ যে! Geology কি অপাঠ্য? তোমরা কি ান না Geology আমার বহুদিনের পাঠ্য বিষয়; Geology বিষয়ে আমি একটা authority বল্‌লে হয়; বহু বৎসর পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরেছি ও Geology অনুশীলন করেছি।"

মহর্ষি যখন তাঁর পর্ব্বত ভ্রমণের ও Geology পাঠের কথা বলিতেছেন তখন আমি আনন্দমোহন বাবুর কানে কানে বলিলাম,—"আপনি কি মহর্ষির কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর "পৃথিবী" নামক গ্রন্থের ভূমিকা পড়েন নাই? তাতে দেখবেন স্বর্ণ কুমারী বলেছেন যে মহর্ষির ক্রোড়ে বসেই তিনি ভূতত্ত্ব-বিদ্যাকে ভালবাসতে শিখেছেন।"

ইত্যবসরে মহর্ষি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে বলিলেন, "কথাটা কি বুঝলে না? আমার যাবার সময় হচ্চে কি না, তাই মনের জাহাজে যত মাল বোঝাই নিতে পারি তার চেষ্টা করছি।"

মহর্ষির সেই হাসি ও সেই উক্তি কখনো আমি ভুলিব না। এই বার্দ্ধক্যে সেই মনের জাহাজ-বোঝাইয়ের কথা মনে হয় এবং আমাকে জ্ঞানালোচনাতে উৎসাহিত করে।

পরে রাত্রিকালের আহারের পর আমরা মহর্ষির বসিবার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত নানা আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কথা কহিতে কহিতে রাত্রি যখন সাড়ে নয়টা বাজিল তখন মহর্ষি আমাদিগকে বলিলেন—"আমি এখন একলা থাকব, তোমরা গিয়ে শয়ন কর।" আমরা নামিয়া আসিলাম, এবং শয়নগৃহে শয্যাতে গিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল, আমরা শুনিতেছি যে উপরকার বারাণ্ডায় মহর্ষি বেড়াইতেছেন। শুনিতে শুনিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি তিনটার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, চাহিয়া দেখি সেই পূর্ণিমার রাত্রে শান্তি-নিকেতনের বাগান মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছে। বাগানে বেড়াইবার জন্য আমি আনন্দমোহন বাবুকে জাগাইয়া তুলিলাম। বলিলাম, "উঠুন উঠুন, চলুন একবার পূর্ণিমার রাত্রে বাগানে বেড়াই।"

আমরা দুজনে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, মহর্ষিদেব তখনও উপরের বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন। আমি আনন্দ মোহন বাবুকে বলিলাম, "মহর্ষির ধ্যান-পরায়ণতার বিষয়ে যে শুনিয়াছেন, ঐ

তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখুন। এই পূর্ণিমার রাত্রে আনন্দ-সাগরে মগ্ন আছেন।”

একবার মহর্ষিদেব দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে বাস করিতেছিলেন। তখন আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে যাইতাম। একদিন আমি গিয়া বসিয়াছি, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি গতবারের ‘ভারতী’ পড়েছ?” আমি বলিলাম—“না, এখনও পড়িনি”। তখন মহর্ষি তাঁহার টেবিল হইতে একখানা “ভারতী” তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—“এই দেখ গত বারের ভারতী।” আমি পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখি, মহর্ষি প্রবন্ধগুলির পাশে পাশে নিজের হাতে নিজের অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। স্বর্ণকুমারীর লিখিত একটি প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “স্বর্ণ, তোমার হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক।” কোনও প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “বালকের ন্যায় যুক্তি”। কোনও প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “রুচি-সঙ্গত নহে” ইত্যাদি। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে নিজ পরিবারের ব্যক্তিদের প্রবন্ধ বিষয়েই এরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বলিলেন—“আমার কাছে দুখানা ‘ভারতী’ আছে—একখানা আমার কাছে রাখি; আর একখানাতে আমার পরিবারের লোকদের লেখা সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করে ফেরত পাঠাই; সেখানা তাদের কাছে পাঠান হয়।” আমি বলিলাম, “ওঃ, আমি এতদিনের পর বুঝতে পারলাম কেন আপনার সন্তানেরা সাহিত্য চর্চ্চাতে দেশের অগ্রণী,—আপনি তার মূলে। স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার পশ্চাতে যে আপনি তা বুঝতে পারছি। “স্বর্ণ! তোমার হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক” যে বলেছেন, এ কি সামান্য কথা।” শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—“স্বর্ণের লেখা ত তুমি পড়েছ, তার লেখার শক্তি দেখে তোমার কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না?”

আমি বলিলাম, “তাতে সন্দেহ কি? তাঁর প্রতিভা দেখে আমিও চমৎকৃত!”

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারী

(উপন্যাস)

প্রথম অধ্যায়

১

পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হওয়া অনেক রকমেই অপ্রার্থনীয়। বাপ-মা এবং ছেলে—উভয়ের পক্ষ হইতেই এ কথা বলা চলে। কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্মের মাসছয়েক পরে অন্নপ্রাশনের সময় পিতা-মাতার মধ্যে তাহার নাম-করণ লইয়াই মস্ত একটা মতভেদ ঘটিয়া গেল। পিতা নাম রাখিলেন, হরিদাস; মাতা রাখিলেন, কার্ত্তিকচন্দ্র।

এবং কালক্রমে তাহার মাতার জোর-জবরদস্তি ও কান্নাকাটিতে পুত্রের কার্ত্তিকচন্দ্র নামই বাহাল রহিয়া গেল। পিতা যদিও আপনার পিতৃ-সত্ব জাহির করিবার জন্য পুত্রকে মাঝে মাঝে হরিদাস বলিয়াই ডাকিতেন, তথাপি কোন দিক হইতে কোনরূপ সাড়া না পাইয়া তিনিও শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার মাতৃদত্ত নামেই ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

বিরোধের মধ্যেই যাহার জন্ম, তাহার পুষ্টিও সেই বিরোধের মধ্যেই হইতে লাগিল। কার্ত্তিকের মাতার উক্ত নাম রাখিবার নানা প্রকার কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে কার্ত্তিকচন্দ্র দেখিতে ঠিক কার্ত্তিকেরই মত। অথচ এই পুত্রের নাম রাখা হইবে কি না, হরিদাস! হরে! ছি, ও যে চাকর-বাকরদের নাম! কার্ত্তিক কি বাবুদের বাড়ী তামাক সাজিবে, না, ভাত রাঁধিবে যে তাহাকে হরি নামে ডাকিতে হইবে? ছি, কার্ত্তিকের বাপের কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই! যে ছেলে পরে হাকিম-সদরালা হইবে, তাহার নাম হইবে কি না, হরিদাস! বামুন যেন কি!

কার্ত্তিকের পিতা শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন একজন সৎকুলীন অথচ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গ্রামের জমিদার মুখোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর পৈতৃক টোলের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরের উপর নির্ভর করিয়া এবং দুই-এক ঘর শিষ্য-সেবকের বার্ষিকের আয়ে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পূজা-পাঠেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া থাকে। তথাপি তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য গ্রাম্য এণ্ট্রান্স্ স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া না দিয়া স্বয়ংই তাহার অধ্যয়নাদির ভার লইলেন। ইহাও কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতার সহিত তাঁহার মতদ্বৈধের আর একটি কারণ।

এইরূপ বিরোধের মধ্যে যাহার জন্ম ও বৃদ্ধি, বুদ্ধিও যে তাহার প্রথম হইতেই একটু ‘বিরোধী’ রকমের হইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেইজন্য কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রকৃতিতে প্রথম হইতেই কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী গুণের বিকাশ দেখা দিল। সে তাহার পিতার টোলের ছাত্রদের সহিত সযত্নে ও তীক্ষ্ণ মেধার সহিত অধ্যয়নাদি করিত বটে, তথাপি সে তাহাদের দলে প্রথম হইতেই একটি মূর্ত্তিমান বিপ্লবের ন্যায় বিরাজিত ছিল। কিন্তু তাহার মুখের পরম গম্ভীর ভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শাসন করিতেও পারিত না। উপরন্তু অধ্যাপকের একমাত্র সন্তান বলিয়া সে অনেক গুরুতর অপরাধ করিয়াও মার্জ্জনা পাইত। বিশেষতঃ তাহার মাতাঠাকুরাণীর ভয়ে ছাত্রদিগকে কার্ত্তিকের বিষয়ে অনেক খানি সঙ্কুচিত থাকিতে হইত।

টোলের ছাত্র সর্ব্বানন্দের ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষার সময় অতি সন্নিকট। সে রাত্রি জাগিয়া ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছে এবং অনেক রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়া প্রত্যূষে উঠিয়াই তাহার ব্যাকরণখানির জন্য হাতড়াইতেছে,—ইচ্ছা, প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিয়াই পড়িতে বসিবে। কিন্তু দেখা গেল, তাহার মাথার শিয়রের পুস্তকরাশি বিপর্য্যস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত;

সর্ব্বোপরি সেই অতি-যত্নের মুগ্ধবোধখানি যে কোথায় গিয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

কে করিল? কে করিল? আর কে?—কার্ত্তিকচন্দ্র। কিন্তু সে কোথায়, তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পিতা বিরক্ত হইয়া বিস্তর অনুসন্ধানে তাহাকে নিতাই ঘোষের দাওয়া হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন, তুমি এ কাজ করলে?" কার্ত্তিকচন্দ্র পরম গম্ভীরভাবে বলিল, "সারা রাত্রি পড়ে সর্ব্ব দাদার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, পরীক্ষায় ফেল হবে, তাই ওর বইখানা সরিয়ে রেখেছি।" পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "শীঘ্র এনে দাও! আর যদি এ রকম কর, তা হলে তোমায় বিশেষ শাস্তি দেব।" কার্ত্তিকচন্দ্র নির্ব্বিকার চিত্তে সর্ব্বানন্দেরই একটা ভাঙ্গা বাক্স হইতে সেই প্রার্থিত পুস্তকখানি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "সর্ব্বদাদা, সারাদিন গ্যাজর-গ্যাজর করো না, বলছি, আমার শুদ্ধ মাথা খারাপ হয়ে যাবে।" সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তুমিও যখন পরীক্ষা দিতে যাবে, তখন এমনি করেই গ্যাজর গ্যাজর করবে।" কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞা-ভরে একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য যে শীতকালেই গরম জামা-কাপড় গায়ে দিতে হয়, কিন্তু আমাদের কার্ত্তিকের নিকট সে সত্য একেবারে বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায়ই মিথ্যা। বৈশাখের রৌদ্রে সকলে যখন ঘামিয়া অস্থির হইতেছে, তখনই তাহার প্রাতর্ভ্রমণের সময়। সে মধ্যাহ্নে আহারাদি সারিয়া মাতুলালয় হইতে প্রাপ্ত লাল মোজা ও গরম কোটে শোভিত হইয়া ছত্রহীন মস্তকে ঐ সময় সমস্ত গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। কেহ আপত্তি করিলে সে বলে, "সবাই যা করবে তাই যে করতে হবে, এর কি মানে? সব জিনিষেরই যখন দুটো দিক আছে, তখন সব কাজেরই বা দুটো দিক না থাকবে কেন?" সে যে একজন নৈয়ায়িকের পুত্র, এ কথা নানাপ্রকারে প্রমাণ করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র এই অল্পবয়সেই ন্যায়ের মূর্ত্তিমান ফক্কিকার-স্বরূপ ঘুরিয়া বেড়াইত। এবং তাহার অকালপক্ক মুখের নিকট কাহারও কোনরূপ আপত্তি টিঁকিত না বলিয়া তাহার মাতা মনোরমা ঠাকুরাণী প্রতিবেশিনীদিগকে মাঝে মাঝে গর্ব্বিত হাস্যে বলিতেন, "বামুন আমার এমন ছেলেকে টোলে ভর্ত্তি করতে চায়!" তাঁহার কথায় কেহ যদি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কিছু বলিত, অমনি তিনি বলিতেন, "ছেলে যদি আমার বাঁচে, তাহলে ও নিশ্চয় একটা হাকিম টাকিম হবেই। তবে যে ওর শরীর!" অবশ্য কার্ত্তিকচন্দ্রের ভগ্ন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীদিগের সহিত হয়ত তাহার মাতার আন্তরিক অমিল থাকিতে পারে,—কারণ, কার্ত্তিকচন্দ্রের দিব্য নধর গৌর কান্তি,—তথাপি মনোরমা দেবীর মুখের সম্মুখে সকলেই তাঁহার কথায় সায় দিয়া যাইত।

কার্ত্তিকচন্দ্রের এইরূপ বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা বিশেষ দোষ ছিল এই যে সে পড়াশুনায় অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। ইহারই মধ্যে সে ব্যাকরণ ও কাব্যে তাহার পিতার অনেক বর্ষীয়ান ছাত্রকেও

[illegible] করিতেছিল; এবং ন্যায় শাস্ত্রেরও একটা বুকনি তাহার অবিদিত ছিল না। অপরাহ্ণে দেবায়তনের নাট মন্দিরে [illegible] অধ্যাপক শিবচন্দ্র তাঁহার কতকগুলি [illegible]ত্রের সহিত ন্যায়ের "অভাব" বস্তু সম্বন্ধে [illegible]লোচনা করিতেছিলেন। একজন বুদ্ধিমান [illegible], নাম ব্রহ্মপদ, অধ্যাপকের সহিত ঐ [illegible]য়ে মৃদুভাবে তর্ক করিতেছিল। নিকটে [illegible]য়া কার্ত্তিকচন্দ্র একটী পারাবতের [illegible]দেশে ঘুঙুর ও গলদেশে বিচিত্র বর্ণের [illegible]া জড়াইতে ব্যস্ত ছিল। অধ্যাপক [illegible]দ ছাত্রের তর্কে কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে উত্তর [illegible]ত্তর করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় [illegible]র্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ পারাবতটীকে তুলিয়া [illegible]য়া একেবারে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের [illegible]মণ্ডলে ফেলিয়া দিয়া সশব্দে হাসিয়া [illegible]দা। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে [illegible]রিবামাত্র সে গম্ভীর স্বরে বলিল, [illegible]আপনি অভাব বস্তু বোঝাতে পারছেন না, [illegible]আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রহ্মদাদা, তোমার [illegible]ঘি নেই। এই অভাব বস্তুর দরুণই [illegible]দি বুঝতে পারছ না। অতএব অভাব [illegible]র অস্তিত্ব স্বীকার কর কি না? এই [illegible]খ, এই রমু (পক্ষীটীর নাম) কেমন [illegible]ভাব বস্তু বোঝে। ও বেশ বুঝেছিল যে [illegible]র পায়ে ঘুঙুরের অভাব আছে, তাই [illegible]ক্ষণ চুপ করে তাই পরছিল, তোমার [illegible]ত তর্ক করেনি। কিন্তু তুমি এমনি [illegible]দা, তোমার বুদ্ধি নেই, এই অভাব [illegible]টা পর্য্যন্তও তুমি জান না।"

ছাত্রেরা অনেকে মুখ ফিরাইয়া হাস্য [illegible]রণের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রহ্মপদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ন্যায়রত্ন মশায়, চিরদিন কি আমাদের এইরকম অত্যাচার সইতে হবে?" অধ্যাপক স্বয়ংও বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া তিনিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রহ্মপদ ক্রুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কার্ত্তিকচন্দ্র তখন তাহার পৃষ্ঠ-দেশে মৃদু একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এঃ, তোমায় অভাব বস্তুতেই পেয়ে বসেছে—বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে হাসিরও অভাব হয়েছে—হাসতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছ! ছি!"

কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিতে হাসিতে পারাবত-টীকে লইয়া প্রস্থান করিল। অধ্যাপক তখন নানা কথায় ছাত্রকে শান্ত করিয়া পুনরায় অধ্যাপনায় মন দিলেন।

২

শিবরামপুরের কালিকামোহন মুখোপাধ্যায়ের বয়স যাহাই হউক, তাঁহার গুরু গম্ভীর চাল-চলনের জন্য কেহই তাঁহার বয়স অনুমান করিতে সাহস করিত না। বনিয়াদী জমিদারী চালের সমস্ত খুঁটিনাটিই সযত্নে তিনি পালন করিয়া চলিতেন। প্রাতঃকৃত্য-সমাপনের সময় সেই যেমন বহু বৎসর পূর্ব্বেও জলচৌকিতে বসিয়াই পাইকদের ডাকিয়া নিকটে আনিতেন, আজও তাঁহার সে চালের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেই বেলা দেড়টার পর কাছারি হইতে উঠিয়া দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় আহারে উপবেশন আজিও অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। নিদ্রার সময়, উদ্যান পরিদর্শনের সময়, পিতামহের আমলের

সেই হলদে রঙের মোটা লাঠিটি লইয়া ভ্রমণের সময়—এ সব কিছুরই একচুল নড়চড় হয় নাই। এমন কি কেহ কেহ বলে, বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর প্রথম পুণ্যাহের দিনে যে বস্ত্রখানি যে-ভাবে পরিধান করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ বস্ত্র সেই ভাবে সেই তাঁতিদের নিকট হইতেই ক্রয় করিয়া পরিধান করিয়া থাকেন। অধিক কি, এই চাল বজায় রাখিবার জন্য তিনি সহরাদিতে গমনাগমনও একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার ভয়ে ব্যাঘ্র ও ছাগশিশু একত্র জলপান করিত কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে অনেক নরব্যাঘ্র অর্থাৎ ভোজপুরী পাহাল-বানকে তিনি পুষিতেন; এবং বহু দরিদ্র আত্মীয়-অনাত্মীয় শ্রেণীর লোক তাঁহার আশ্রয়ে পালিত হইত। তাঁহার প্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা বহু লোক-লস্কর ও জীব-জন্তুর কলরবে মুখরিত থাকিত। অশ্ব-শালায় অশ্ব, গোশালায় গাভী, অতিথিশালায় অতিথি, স্তম্ভের শিখরে পারাবত, কড়ি বরগার ফুকরে ফুকরে চড়ুই তালচঞ্চু,—পাকশালায় পাচকের কলরব, দাস-দাসী-গণের বচসা, অন্তঃপুরে বিধবার দল—তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না। তথাপি কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেন যে কালিকাবাবু পুত্র-সন্তান-অভাবে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ছিলেন। অবশ্য এ কথা বাহিরের কেহ বুঝিতে পারিত না। কারণ কালিকাবাবুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী অন্ততঃ বাহ্যতঃ তাঁহার পুত্রের অভাব পূর্ণ ক বরং তাহার অধিক হইয়াই, বি করিতেছিলেন।

এই শৈলজাসুন্দরী যখন মাত্র বৎসরের, তখনি ইহাঁর নামে একটী মৌজা ক্রয় করা হয় এবং এতাবৎক পর্য্যন্ত বহু পত্তনি, দরপত্তনি, সেপত্তনি মা পিতা ইহার নামে ক্রয় করিয়াছে এমন কি ইহার সমস্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধা জন্য পৃথক সেরেস্তা স্থাপন করিয়া পাইক নিযুক্ত করিয়া কালিকামোহন "গার্জ্জেন" নাম স্বাক্ষর করতঃ ই বিষয়-কর্ম্ম চালাইতেছিলেন। কন্যার ন পৃথক "বিষয়-আশয়" করা তাঁহার অ স্নেহের যতখানি নিদর্শন, তদপেক্ষা কন্যাকে ইতিমধ্যেই জমিদারী করিয়া দেও একটা অহঙ্কারকেই বিশেষভাবে প্রকা করিয়াছিল। শৈলজাসুন্দরী যদিও এখ অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করেন নাই, তথ ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম বড় মকদ্দমায় বাদী অথবা প্রতিবাদীরূপে জ সমক্ষে প্রচারিত হইতেছিল। এমন ইহাঁর নামীয় একটা মকদ্দমা প্রি কাউনসিল পর্য্যন্ত গিয়া একটী "লি কেসের মূর্ত্তিতে বর্জ্জয়েস অক্ষরে I. L. এর অঙ্ক শোভিত করিয়াছে। যদিও শৈলজাসুন্দরী উক্ত মকদ্দমায় পরা হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার পি পিতৃপিতামহগণের প্রসিদ্ধ নামকে শ্বেতদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া কালি বাবুর জমিদারীর প্রজাগণের হৃদয়ে জলাত স্থায় বিরাজ করিতেছিলেন। এরূপ কন্

হইয়া কালিকাবাবু আপনাকে ধন্যই করিতেছিলেন।

এহেন কন্যার বিবাহ দিতে হইলে চিন্তা, অনেকখানি সতর্কতার ন, শৈলজাসুন্দরীর পিতাও এ কথা ভাবে বুঝিতেন। অবশ্য এরূপ সম্বন্ধ বা প্রস্তাবের অভাব হইতে পারে না, কারণ শৈলজা পিতার ধনী সন্তান। বহু দিক নানা প্রকার প্রার্থনীয়-অপ্রার্থনীয় ইতিমধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া হইতেছিল। কিন্তু পিতা কালিকা-নের এ পর্য্যন্ত কোনটিই মনঃপূত হয় । কালিকামোহনের বৃদ্ধা মাতা এখনও বিতা আছেন; এবং তিনিই গৌরী-দানে পুণ্য য়ের লোভে এখনও ৺ কাশীধামে যাইয়া করিতে পারেন নাই। তবে ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে গৌরী ত র কথা, কন্যকা-দানও সন্দেহজনক হইয়া য়াছে।

শৈলজার বিবাহ-বিষয়ে ইনিও ইহার ের চিন্তার অংশ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। ারণ বিবাহ দিয়া এই একমাত্র কন্যাকে কেবারে পর করিয়া দিতে কালিকামোহনও নন অনিচ্ছুক, তাঁহার মাতা জগদম্বা বীও তদ্রূপ। কিন্তু শৈলজাসুন্দরীর া অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তায় যাঁহার ম "বৌরাণী" লেখা হইয়া থাকে, তাঁহার া কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ছিল বলিয়াই প্রকাশ। া যায়, তিনি না কি ঘরজামাই করার ায় বিরোধী। তিনি তাঁহার কোন ান অন্তরঙ্গের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি বিবাহই দিতে হয়, তাহা হইলে একেবারে দান করিয়া ফেলাই উচিত। কন্যার পরিবর্ত্তে একটী পুত্র লাভ করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ তাহাতে কন্যাই স্বামীর স্থান অধিকার করিয়া দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া ফেলে। স্ত্রীলোক যদি একেবারে স্বামীতে মিশিয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হইয়া যায়। অবশ্য তাঁহার মত যে গৃহের বধূর মত বলিয়াই যথাবিধি উপেক্ষিত হইয়াছিল, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

একমাত্র কন্যার উপর যে মাতার এতখানি স্নেহ-হীনতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মাতা যে তাঁহার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী ও স্বামী মহাশয়ের নিকট ইহার জন্য কিঞ্চিৎ লাঞ্ছিত হইবেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; তথাপি ইঁহার দুর্বুদ্ধি যে ইনি স্বীয় মতের এক চুলও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। স্ত্রী-বুদ্ধি (অর্থাৎ পত্নীর বুদ্ধি) চিরদিনই প্রলয়ঙ্করী! শাস্ত্র কি মিথ্যা হয়!

জমিদার মহারাজ ও তাঁহার মাতা এইভাবে চিন্তাযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময় একদিন কালিকা-মোহনের দৃষ্টি অকস্মাৎ কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল।

কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার মধ্যাহ্ন-ভ্রমণের সময় কখনও কখনও জমিদারী কাছারী, এমন কি জমিদারী প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত শুভাগমন করিত। তাহার অদ্ভুত

চাল-চলন ও বেশভূষা সদর গোমস্তা হইতে পাঁইক দরোয়ান ঝাড়ুদার ফরাশ পর্য্যন্ত সকলের নিকটই পরিচিত ছিল; এমন কি অন্তঃপুরের দাস-দাসী, পাচিকা ও অন্যান্য "দীনাঃসমাশ্রিতা" বিধবাগণের নিকটও সে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র-রত্ন বলিয়া সমাদৃত, পরিচিত এবং সর্ব্বদোষে উপেক্ষিত হইত। তবে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সে বাবু মহারাজ অথবা তাঁহার মাতা "বুড়ী রাণীমার" মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু জমিদারী কাছারীর দালানের পারাবত-লের সহিত ইহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতম ছিল। এবং সেই সামান্য কারণ হইতে সহসা কার্ত্তিকচন্দ্র একদিন "বাবু মহারাজের" রাজকীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

স্থান জমিদারী কাছারীর সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড নাটমন্দির—অর্থাৎ যেখানে নানা উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ সার্দ্ধ দ্বাবিংশবার যাত্রা, নাচ, গান হইয়া থাকে। কাল মধ্যাহ্ন; এবং পাত্র আমাদের কার্ত্তিকচন্দ্র ও কতকগুলি বাগ্দী, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক। উপলক্ষ দ্বিবিধ,—কার্ত্তিকচন্দ্রের পক্ষে "মুক্ষি" নামক এক প্রকার পারাবত-বংশের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের বংশধরগণের দুই-একটীকে পিনাল কোডের এব্‌ডাক্‌সন ধারানুযায়ী কার্য্যের দ্বারা বে-আইনি স্থানান্তর-করণ, এবং বাগ্দীগণের পক্ষে জমিদার মহারাজের নিকট হইতে পথ-করের দায় হইতে মুক্তি লাভ করা।

কার্ত্তিকচন্দ্র একজন উক্ত শ্রেণীর লোককে আদেশ করিল, "রামু, মৈখানা চেপে ধর ত, আমি উঠব।"

রামু ওরফে রামা বাগ্দী ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, মহারাজের সামনে কেমন করে এ করব?"

কার্ত্তিকচন্দ্র একবার অবজ্ঞার দৃষ্টি কাছারীর কক্ষের দিকে চাহিয়া বলি "কেউ কিছু বলবে না, তুমি ধর।"

রামু তখন কাতর হইয়া বলিল, "দা ঠাকুর, আমরা দরবার করতে এসেছি, এ যদি দেওয়ানজী কোন কারণে বিরক্ত তা হলেই সর্ব্বনাশ!"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলি "দরবার! সে আবার কি? দরবার নবাব-বাদশারা করতেন, তোমরা তা করে করবে?"

রামু কহিল, "আজ্ঞে, মিছিমি আমাদের ওপর পথ-কর চাপানো হয়ে সেই কথা মহারাজের কাছে নিবেদন ক এসেছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা করলে কি হবে

এই প্রশ্নে সেই বিষণ্ণ জোড়া ব্যক্তিগণের মুখেও একটা অস্ফুট হা রেখা দেখা দিল। রামু ভাবিল, কার্ত্তিকচন্দ্রকে দিয়াই হয়ত তাহাদের বিষয়ে কিছু উপকার হইতে পা মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের ন্যায় রাম ইহাকেই অবলম্বন করিতে মনস্থ ক বলিল, "দাদাঠাকুর, আপনি যদি আমা হয়ে দু'কথা বলে দাও, তাহলে নিজেই কবিতোর ধরে দেব।"

কার্ত্তিক কহিল, "কাকে কি বল্‌তে হবে, , আমি এখনই বলছি।"

রামু কহিল, "দেওয়ানজীকে আর রাজকে বলতে হবে—"

কার্ত্তিক কহিল, "মহারাজ! সে আবার ?"

রামু কহিল, "আজ্ঞে, বাবু মহারাজ—"

কার্ত্তিক কহিল, "ওঃ, বুঝেছি। আচ্ছা, বলতে হবে?"

রামু কহিল, "বলবেন যে এরা গরীব, দের উপর আবার পথ-কর বসানো কেন? মাদের যে চাকরান জমি আছে, তার ত আমরা তাঁবেদার হামেহাল হাজির ছি। রাত-বিরেত মানিনে, যখনই ডাক ড়ে, হুজুরে হাজির হয়ে কাজ করে দি। র ওপরও যদি আবার খাজনা দিতে , তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা? ই সব কথা একটু গুছিয়ে কাকুতি নতি করে যদি বলতে পার, তাহলে াদাঠাকুর, আমরা আপনার কেনা হয়ে াকব।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খানে শিবরামপুরের জমিদার কালিকা-মোহন ও তাঁহার প্রবল-প্রতাপ দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর বসিয়া কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন, কবারে সেইখানে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর খে বলিল, "আপনার কাগজপত্র রাখুন, ওয়ানজী, আপনি রামু বাগ্দীদের খাজনা াপ করে দিন। ওরা গরীব, ওরা খাজনা বে কোথা থেকে?"

হঠাৎ জমিদারী কাছারির মৃদু গুঞ্জন-নি থামিয়া গেল। যুগপৎ সকলেরই দৃষ্টি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল। দেওয়ান মহাশয়ের চক্ষু তাঁহার চশমার উপর দিয়া তেজ উদ্‌গীরণ করিয়া এই নির্ভীক বালকের উপর স্থাপিত হইল। দেওয়ানজী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি বলছ, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি বলছি, কেন আপনারা এই গরীব রামুদের ওপর অত্যাচার করছেন? আমি ওদের অবস্থা জানি, ওরা খাজনা দিতে পারবে না।"

গোমস্তা মুহুরী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কারণ এই দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ানকে ভয় করে না, এরূপ ব্যক্তি দশ-বারো ক্রোশের মধ্যে একটিও ছিল না। এমন কি স্বয়ং জমিদার মহাশয়ও ইঁহার মান্য রক্ষা না করিয়া কথা বলিতে সাহস করিতেন না। ইঁহার হাঁক-ডাকে বড় বড় ভোজপুরী দরোয়ানদেরও কলেবর কম্পিত হইত। আর সামান্য প্রজারা ত ইঁহাকে দেখিলে বাত্যা-তাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় সুদূরে পলায়ন করিত—কিম্বা যদি নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহার রোষ-দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে বাত্যাহত কদলীর ন্যায় ভূমি ভিন্ন তাহাদের অপর আশ্রয়-স্থান আর কোথাও থাকিত না।

এ-হেন দেওয়ানের চশমা ও পিঙ্গল চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক যখন প্রভুর ন্যায় আজ্ঞা প্রদান করিল, তখন সকলেরই হৃদয়ে একটা আশু বিপদ-পাতের আশঙ্কা দেখা দিল। কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "দেওয়ানজী, আপনি গোমস্তাদের

বলে দিন, ওরা যেন আর এদের ওপর অত্যাচার না করে!"

দেওয়ান আপনার গাম্ভীর্য্যের শিখর হইতে না নামিয়া বলিলেন, "যাও কার্ত্তিক, এখন বিরক্ত করো না। অন্য সময় তোমার আর্জী শোনা যাবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্য সময় আবার কি? এই ত সময়! এখনই ত' কাছারি হচ্ছে। এখনই ওরা এসেছে, যা হয় এখনই হুকুম দিয়ে দিন। ওরা আবার কতবার হাঁটাহাঁটি করবে?"

দেওয়ান সিংহ-গর্জ্জনে বলিলেন, "কে আছিস্ রে, ঐ বাগ্‌দি হারামজাদাদের দূর করে দে ত! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যা কার্ত্তিক, এখন গোল করিস্‌নে, বলছি, নইলে—"

কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "দেওয়ানজী, আপনি রাগই করুন আর যাই করুন, ওদের খাজনা মাপ না করলে আমি এখান থেকে উঠছিনে। বাবু, আপনি ত রয়েছেন, আপনিই একটা হুকুম দিন না!"

দেওয়ানজীর আর সহ্য হইল না; তিনি জমিদারি-চালে হুকুম দিলেন, "ঘনবরণ সিং, এই ছোঁড়াটার কান ধরে ওর বাপের কাছে রেখে আয়তো।"

ঘনবরণ সিং নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "চলিয়ে ঠাকুরজী।"

কার্ত্তিকচন্দ্র সহসা কাছারির চৌকির উপর উঠিয়া তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় কসাইয়া বলিল, "ছাতুখোর, তুই আমার গায়ে হাত দিতে আসিস্!"

কালিকামোহন এতক্ষণ সকৌতুকে বালকের অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার প্রসিদ্ধ পাইককে এই ভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ঘনবরণ, বাইরে যা। কি ব্যাপার কার্ত্তিক, তুমি কি দরবার করছ—আমার কাছে কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "দরবার! কে দরবার করছে? দরবার নবাব-বাদশা এরাই করে, আর কে করতে পারে! আমি এই কথা বলতে এসেছি যে, যারা আপনার কাজ করে, তারাই আপনার কাছ থেকে মাইনে দাবী করতে পারে! তা না হয় আপনি তাদের কাছ থেকে খাজনা নেবেন কি হিসেবে?"

কালিকামোহন বেগতিক দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওদের খাজনা মাপ করে দেব। যাতে কেউ ওদের খাজনা না নেয়, তা করে দেব। তুমি যাও, এই রোদ্দুরে ঐ গরম কোটটা খুলে ফেলো।"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিজয়-গর্ব্বে গম্ভীর মুখে ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "গরম জামা খোলা না খোলা, সে আমার ইচ্ছে।"

কার্ত্তিকচন্দ্র নাট-মন্দিরে নামিয়া দেখে তাহার বাগ্দি বন্ধুরা বেগতিক দেখিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। তখন সেই বিজয়-সংবাদ স্বয়ং সে তাহাদিগকে দিবার জন্য উন্নত মস্তকে দেউড়ীর মধ্য দিয়া দরোয়ানদের জ্বলন্ত দৃষ্টি উপেক্ষা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৩

মধ্যাহ্নে দেবায়তনের কূপে স্নান করিতে করিতে ব্রহ্মপদ ও আর একটি ছাত্র, নাম শ্যামাপ্রসন্ন, এই দুইজনের মধ্যে গভীরভাবে তর্ক চলিতেছিল। শ্যামা প্রসন্ন বলিল, "কাব্য পড়বার জন্য ব্যাকরণ বা অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন নেই। কবিতার ভাব বোঝা সহজ বুদ্ধিতেই হয়।"

ব্রহ্মপদ ন্যায়ের ছাত্র, তথাপি সে ব্যাকরণের উপাধিও লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কখনই নয়, ব্যাকরণ আর অলঙ্কার শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই কাব্য, নইলে সে কাব্য কাব্য নামেরই যোগ্য হতে পারে না।"

"অর্থাৎ তোমার মতে আগে ব্যাকরণ তৈরি হয়েছিল, তার পর কাব্য-সৃষ্টি! আগে রাস্তা তৈরি, তারপর লোক-চলাচল! কি বুদ্ধি!"

"ব্যাকরণের সৃষ্টি যে আগে হয়েছিল, এ কথা জোর করে বলা যায় না, তবে—"

"আর তবেতে কাজ নেই। তোমার ন্যায়ের ফক্কিকার এখানে খাটবে না। যাঁরা কবি হন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, এ সব তাঁদের কাব্যকেই অনুসরণ করে। জীবের মাঙ্গুলের জন্ম দেহটার আগেই হয় না।"

"আগেই হয় না, কিন্তু একসঙ্গেই হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়ম-অনুসারেই সাহিত্য গড়া হতে থাকে। কবি আর লেখকেরা, জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, সেই নিয়ম-অনুসারেই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে থাকেন। পরে যখন কেউ সে সাধারণ নিয়মগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন, তখন তিনিই হন বৈয়াকরণিক, আলঙ্কারিক ইত্যাদি।"

তাহাদের তর্ক চলিতেছে, ইতিমধ্যে টোলের আরও কয়েকটি ছাত্র গামছা ও কাপড় লইয়া স্নানার্থে সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইল। নিকটেই একটা দড়ি টাঙ্গানো ছিল, তাহাতে কাপড়গুলি ঝুলাইয়া তাহারাও ব্রহ্মপদ ও শ্যামাচরণের তর্কে যোগ দিল। যে লোকটি এই সকল ছাত্রদের জল তুলিয়া দিতেছিল, সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরতি শেষ হয়ে ভোগ সরেছে, আপনারা শীগ্‌গির শীগ্‌গির চান করে নাও, মাঠাকুরণ রাগ করেছেন যে।" কিন্তু সে কথা কে শোনে! তাহারা তখন তর্কের মধ্যস্থলে উপস্থিত! এ সময় কেহ জল মাথায় ঢালিতে পায়ে ঢালিতেছে, কেহ পায়ে ঢালিতে ঘাসের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। এমন সময় হঠাৎ একজন ছাত্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটা "তার" আসিয়াছে এবং ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার অর্থোদ্ধারের জন্য হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গিয়াছেন। সকলেই তখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্নান সারিয়া লইল এবং পরে টোলের দিকে প্রস্থান করিল।

শিবচন্দ্র অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া ম্লান মুখে সংবাদ দিলেন, সর্ব্বানন্দ পরীক্ষা দিতে গিয়া বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়াছে এবং কলিকাতার এক "মেসে" সে পড়িয়া আছে,—অতএব একজনের সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কে যাইবে! সকল ছাত্রই শঙ্কিতভাবে এ উহার পানে ও ইহার

পানে চাহিতে লাগিল। অধ্যাপক কাতর ভাবে বলিলেন, "সর্ব্বানন্দ বিদেশী, এখানে কেউ ওর আত্মীয় নেই বলে কি ওর চিকিৎসা বা সেবা হবে না?"

কেহই কোন উত্তর দিল না দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবা আমি যাব।"

পুত্রের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি করবে? তা হলে আমাকেই যেতে হয়, দেখচি। সর্ব্বানন্দর ত শুনেছি, নিকট আত্মীয় কেউ নেই, এমন অবস্থায় কে-ই বা যাবে? যাক্, কার্ত্তিক, তোমার গর্ভ-ধারিণীকে বলে এস, আমার ব্যাগটা ঠিক করে রাখতে।"

ব্রহ্মপদ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "রোগটা ছোঁয়াচে, আর কাউকে—"

কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ভয়টাও ছোঁয়াচে, আমারও ভয় কচ্চে। ভাগ্যিস আমার ঐ রোগ হয়নি, তা হলে তোমাদের মত আগেই মরে বসে থাকতাম। আর সর্ব্ব দাদাই ত মরছে, তোমরা ত মরনি, খুসি হয়ে হরির লুট দাওগে।"

বিদ্রূপের তীরটা ঠিক স্থানে পৌঁছিল কি না, সে সংবাদ না লইয়াই কার্ত্তিকচন্দ্র চলিয়া গেল। শিবচন্দ্র তাড়াতাড়ি স্নানাহ্নিক সারিয়া লইয়া গো-যানযোগে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গ্রাম হইতে ক্রোশখানেক অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন, কার্ত্তিকচন্দ্র গামছায় একখানা কাপড় বাঁধিয়া তাঁহারই অপেক্ষায় পথের ধারে এক বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতেছে। পুত্রের মুখের সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া পিতা আর কোন আপত্তি করিলেন না, উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

মেসের দুই একজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে এবং শিবচন্দ্র ও তৎপুত্রের সেবায় সর্ব্বানন্দ সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। পরে সর্ব্বানন্দ কতকটা সুস্থ হইলে কার্ত্তিকচন্দ্র একদিন তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, আমি বাড়ী যাব।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "আর চার-পাঁচ দিন পরেই আমি সর্ব্বানন্দকে নিয়ে বাড়ী ফিরব, তখন যেও।"

কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "এই মেসের একজন আজই বাড়ি যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেই আমি যাব। তিনি টিকিট করে দেবেন, তারপর ষ্টেশন থেকে আমি বাড়ী যেতে পারব। আমার মন কেমন কচ্ছে।" শিবচন্দ্র পুত্রকে চিনিতেন। তিনি আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রভাতে কার্ত্তিকচন্দ্র যখন টোলে প্রবেশ করিতেছিল, তখন কয়েকজন ছাত্র তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খপর কি, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক বিষণ্ণ মুখে বলিল, "খপর আর কি! কাল সব শেষ হয়ে গেছে।"

সমবেত ছাত্রদের সকলের মুখ হইতে যুগপৎ একটা বিস্ময় ও ভয়সূচক শব্দ বাহির হইল। কার্ত্তিক তীব্র দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মপদ বলিল, "এই যে

[illegible] পত্র পেয়েছি, সর্ব্বানন্দের অবস্থা [illegible]নেক ভাল।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর কোন উত্তর না দিয়া [illegible]তৃসন্নিধানে চলিয়া গেল। কিন্তু [illegible]হার ওষ্ঠে সে সময় যে তীব্র ব্যঙ্গের [illegible]ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সকলেই তাহা [illegible]খা করিল। ব্রহ্মপদ গম্ভীর মুখে বলিল, [illegible]র্ত্তিককে আমার বিশ্বাস হয় না। [illegible]য়রত্ন মশায় এলেন না কেন? নিশ্চয়ই [illegible]-সব ওর দুষ্টামি।"

দুই একজন মাথা নাড়িয়া বলিল, [illegible]এত বড় মিথ্যা কথাটা কি ও বলবে! [illegible]র এতে ওর লাভই বা কি হবে?"

ব্রহ্মপদ কহিল, "লাভ-অলাভ নিয়ে [illegible]র দুষ্টুমির পরিমাপ হয় না। এত [illegible]ম বয়সে এতখানি দুষ্ট বুদ্ধি আমি ত [illegible]র দেখিনি।"

কার্ত্তিক তাহার মাতার নিকট কোন কথা গোপন করিল না, সেই জন্য কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সত্য সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ ব্রহ্মপদ মনোরমা ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের দুষ্টামির কথা নিবেদন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র ততক্ষণে একটা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া বলিল, [illegible]রা রাত্তির ঘুমুই নি, এখন আমায় [illegible]কিয়ো না।" মাতা তখন হাসিয়া ঘরের [illegible]রি-জানালা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, [illegible]কি করব বাবা, ওঁর আদরেই ও ক্রমশ [illegible]এমন দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছে। যাক্, উনি [illegible]আসুন, এলে ওর যা-হয় একটা [illegible]বিশেষ শাস্তি করব। এখন একটু ঘুমুক।"

তারপর কিছুদিন পরে সশরীরে সর্ব্বানন্দ ও শিবচন্দ্র গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশও শুনিলেন; কিন্তু ইহাতে মৃদু হাস্য ব্যতীত কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইল না দেখিয়া ব্রহ্মপদ হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল।

৪

সর্ব্বানন্দ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, তথাপি এখনও পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার অনুমতি পায় নাই। প্রত্যহ সকালে বৈকালে তাহাকে বেড়াইয়া আসিতে এবং যথাসময়ে আহারাদি করিয়া শয্যা গ্রহণ করিতে হয়। এই ভ্রমণের সময় কার্ত্তিক-চন্দ্রও কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে থাকে।

আজ সে তাহার চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইবামাত্র কার্ত্তিকচন্দ্র এক-খানা পিচের ডাল চাঁচিতে চাঁচিতে তাহার অনুসরণ করিল। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, তুমি আজ দুপুরে বেড়াতে যাও নি কেন?"

"তুমি ত' আজ-কাল পড়তে পাও না—তাই তোমার পড়া, আমার পড়া, দু'জনের কাজই আমি সেরে রাখছিলাম।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "ঐ রে, তাহলে আমার মাথাটি খেয়েছ, বোধ হয়,—সমস্ত বই, পুঁথিপত্র ঘেঁটে ঘুঁটে—"

"বেশ খিচুড়ি তৈরি করে রেখেছি, চমৎকার হজম হবে'খন। এখন যে কাজে যাচ্ছ, চল। সব সময় বই, বই। কি যে হয় তার ঠিক নেই।"

উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন

সময় দূরে একটা পরিচিত টমটমের ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ শুনা গেল। জমিদার কালিকাবাবুর কন্যা শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী তাঁহার খাস দাসী ও দরোয়ানের সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইহা তাহাদের প্রতিদিনের অভ্যাস, তাই কার্ত্তিক বা সর্ব্বানন্দ কাহারও তেমন লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল না। তাহারা পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাড়ীটাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু গাড়ীটা সবেগে অগ্রসর হইতে না হইতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।

অপর দিক হইতে একখানা গরুর গাড়ী কার্ত্তিকদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পল্লীগ্রামের গোজাতীয় জীবগণ যে কখন কি কারণে ভয় পায় তাহা বলা যায় না। সেই গাড়ীর বলদদ্বয় সহসা সেই গাড়ী-সমেত সশব্দে পার্শ্বস্থ নালার মধ্যে নামিয়া পড়িল। গাড়ীতে দুই একজন স্ত্রীলোক আরোহী থাকায় একটা ভয়ানক হৈ-চৈ ও আর্ত্ত শব্দ উত্থিত হইল। শুনিয়া সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকচন্দ্র ছুটিয়া ঘটনাস্থলে গেল।

দুর্ঘটনায় কাহারও তেমন আঘাত লাগে নাই বটে কিন্তু স্ত্রীলোকদের বাহিরে আনিতে ও গাড়োয়ানকে শকটের তলদেশ হইতে বাহির করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইল। ইতিমধ্যে মহামহিমান্বিতা শৈলজাসুন্দরী তাঁহার টমটম থামাইয়া গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে ছিলেন। গো-শকটের তলদেশ হইতে গাড়োয়ানকে যখন অদ্ভুতভাবে টানিয়া বাহিরে আনা হইল, তখন তিনি হাসিয়া তাঁহার টমটম হইতে প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গাড়ীটাকে টানিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়া উঠিয়া যখন দেখিল, টমটমের উপর উর্দ্দি পাগড়ি দরোয়ান ও কোচম্যান চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তখন ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল; তদুপরি ঐ হাস্যোচ্ছ্বসিতা বালিকার সহানুভূতিহীন হাস্যে শব্দে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক লম্ফে টমটমের উপর উঠিয়া বিরাশী শিক্ষা ওজনের এক চড় উঁচাইয়া সে বলিল, "দেখ যদি তুমি হাসবে, তাহলে বুঝতে পারবে ওদের নালায় ফেলে দিয়ে বসে বসে হাসি! চড় খেয়ে হাসতে পার ত' বুঝি।" দাসী দরোয়ান ও কোচম্যান তিনজনে অবাক এবং ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ে সম্পত্তিশালিনী শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী ভীত ত্রস্তভাবে বসিয়া পড়িয়া তাহার দাসীকে চাপিয়া ধরিলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি টমটমের নিকটে আসিয়া কার্ত্তিককে নামাইয়া আনিল। কার্ত্তিক গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে বলিল, "হারামজাদা, ফের যদি বসে বসে এই রকম করে মজা দেখিস, তাহলে তোদের ছড়ি পেটা করব।" কোচম্যান আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। কিন্তু শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরীর দিন আর সান্ধ্য ভ্রমণ হইল না; কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে সর্ব্বানন্দ মহাতীতভাবে কার্ত্তিককে বলিল, "এ তুমি কি করলে! ছেলে মানুষের ওপর রাগ

বিয়েই বা তোমার কি লাভ হল? ছাড়া এই রকম করে একটা বিপদকে ক এনেই বা কি লাভ হল? ওরা ত নি গিয়ে বাবুকে বলে দেবে, তারপর হবে, কে বলতে পারে?"

কার্ত্তিকচন্দ্রের রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল, ই সে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আমার পর কেউ রাগ করে না, তোমার ভয় ই।"

সর্ব্বানন্দর ভয় কমিল না; তাই সে ড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু র্ত্তিক সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী নয়। সে বলিল, "না, এখনও বেড়ানো হয় নি। মি কিছুতেই তোমায় ফিরতে দেব না।" সর্ব্বানন্দ অগত্যা আরও খানিক বেড়াইতে বাধ্য হইল। কিন্তু বিপদ সেই খানেই শেষ হইল না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে জমিদার মহাশয়ের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। কালিকাবাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কিরে কার্ত্তিক, তুই শৈলকে মেরেছিস কেন?"

কার্ত্তিক গম্ভীরভাবে বলিল, "ও তাহলে মিছে কথা বলেছে। আমি কেবল চড় উঁচিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি, মারাই উচিত ছিল।"

"কেন? মারা উচিত ছিল, কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "মানুষের এ রকম বিপদ ঘটলে দাঁড়িয়ে যে হাসতে পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা আর কি আছে! তার ওপর আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। আপনারই ওকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া উচিত।"

কালিকাবাবু সমস্তই শুনিয়াছিলেন এবং কি কারণে যে তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার অনুসরণকারী দরোয়ান ঘনবরণ সিং কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধৃষ্ট বালকের নিকট যে চপেটাঘাত-লাভ তাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাহার অনুভূতি এখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাই অদ্যকার অপরাধের সংবাদ শুনিয়া প্রতিশোধের আশায় তাহার হস্তদ্বয় নিস্‌পিস্ করিতেছিল। কিন্তু ফলে যখন কিছুই হইল না, উপরন্তু বাবু মহারাজ যখন কার্ত্তিককে আদর করিয়া বলিলেন, "ছি বাবা, ছোট মেয়ের ওপর অত রাগ করতে নেই। ওর কতটুকু বুদ্ধি!" তখন সে তাহার গালপাট্টা চুমরাইতে চুমরাইতে ভাবিল, "মহারাজ বাওরা হো গয়ে হেঁ।"

কালিকাবাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিস্মিত সর্ব্বানন্দের দিকে চাহিয়া কার্ত্তিক বলিল; "দেখলে সর্ব্বদাদা, আমায় কেউ বকতেই পারে না।"

কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতা এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ওর মামাও একদিন এক সাহেব মেরেছিল। কেমন লোকের ভাগ্নে!" কিন্তু তাহার পিতা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ সব তোমার কি হচ্চে, কার্ত্তিক? পড়া শোনা করে কোথায় শান্ত প্রকৃতি হবে, তা না এ সব কি আবার? সেদিন ঘনবরণ সিংকে মেরেছ, আজ আবার একটি ছোট মেয়ের ওপর বীরত্ব ফলিয়েছ। এ সব ত

ভাল নয়। এমন করলে আমায় এখানকার বাস উঠোতে হবে, দেখছি।"

পরদিন হঠাৎ একজন পাইক আসিয়া যখন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সন্ধ্যার পর জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেল, তখন সকলেই বুঝিল, আজ একটা কিছু হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই ঘটিল না। কালিকাবাবু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পরম সমাদরে বসাইয়া নানাবিধ সদালাপ করিয়া সহসা একটা অদ্ভুত অনুরোধ করিলেন। বাবু বলিলেন, "আপনার ছেলেটীর বিষয় যা দেখছি-শুনছি, তাতে সংস্কৃতর সঙ্গে সঙ্গে ওকে ইংরিজি শিখুলে ও পরে একজন মহাপণ্ডিত লোক হতে পারে। সে জন্য আমার অনুরোধ, আপনি ওকে আমাদের এণ্ট্রেন্স্ ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিন। আমি হেডমাষ্টার মশায়কে বিশেষ করে বলে দেব, যাতে ওর ওপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা হয়।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন, "কার্ত্তিকের গর্ভধারিণীরও অনেক দিন থেকে তাই ইচ্ছে, কিন্তু ইংরিজি শিখলে ছেলে ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, হয়ত পিতৃপিতামহের সুনাম নষ্ট করে ফেলবে! তা ছাড়া ভবিষ্যতে এই টোলের ভার ত ওকেই নিতে হবে, তা হলে আর ইংরিজি পড়ে ফল কি?"

কিন্তু কালিকাবাবু ছাড়িলেন না। তিনি নানাপ্রকারে বুঝাইলেন যে ইংরাজী পড়িলেই কেহ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয় না; এবং বিদ্যা বা জ্ঞান জিনিষটার কোনরূপ জাতি-গোত্র নাই। যে কোন স্থান হইতেই বিদ্যালাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একে গ্রামের একচ্ছত্র সম্রাট, তাহাতে তাঁহার পুত্রের ভালর জন্যই যখন কালিকাবাবু এতখানি চেষ্টিত, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় আর বেশী আপত্তি করিতে পারিলেন না। কেবল এইটুকু বলিলেন, যে ছেলে তাঁহার কিঞ্চিৎ একগুঁয়ে ধরণের, উহাকে এ বিষয়ে মত করাইতে কিঞ্চিৎ সময় লাগিতে পারে। এ কথার উত্তরে কালিকাবাবু বলিলেন যে সে বিষয়ে তিনি স্বয়ংই ভার লইতে প্রস্তুত; তিনি স্বয়ং কার্ত্তিকচন্দ্রকে বুঝাইয়া সম্মত করিবেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, সে ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছুক নয়। তাহার মাতা মনোরমা ঠাকুরাণী সগর্ব্বে বলিলেন, "তোকে সবাই এত ভালবাসে, আর তুই সে ভালবাসার এই রকম প্রতিদান দিবি? আমি ওঁকে যে কাজে এতদিন ধরে রাজী করাতে পারি নি, আজ সেই তিনিও রাজী হয়েছেন, তবু তুই আমার কথা শুনবি নে?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবা রাজী হয়েছেন তুমি কেমন করে জানলে? তুমি ছিলে জোঁকের মত লেগে তাঁর মত করিয়েছ তার ওপর তিনি জমিদার মশায়ের ভয়ে রাজী হয়েছেন। আমি যে কারও ভয়ে কোন কাজ করব, এ হতেই পারে না। বাবু যে ভয় দেখিয়ে, আমার বাবাকে অপমান করে আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নেবেন, তা আমি কিছুতেই সইব না। তুমি বাবাকে এ কথা সাফ বলে দাও।"

মনোরমা দেবী চোখ কপালে তুলিয়া ধিক্কার করিয়া বলিলেন, "তুই ওঁর মান অপমান দেখছিস, আর আমি যে তাদের কাছে পাঠিয়েছি, তুই নিশ্চয়ই পড়বি,—তার কি হবে? এখন আমার কথাটা কোথায় দাঁড়াবে? আমার মান-অপমান কি কিছুই নয়?"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি নিজে বড় লোকের মেয়ে, টাকাকড়ি ধনদৌলতের ওপর চিরদিনই তোমার লোভ। তোমার সব বিকারের রুগীর মত কাজ; তাই এ বিষয়ে তোমার কথা না রাখলেই তোমার মান বাড়ানো হবে।"

মনোরমা দেবী কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সমস্ত তেজটুকু নিরীহ শিবচন্দ্রের উপর ব্যয়িত করিয়া বলিলেন, "এমন ছেলেতে আমার কাজ নেই, তোমার ছেলের যা হয় কর, আমি ওর হাতের জলগণ্ডুষ যদি নি—"

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "থাম, থাম, মিছি মিছি একমাত্র বংশধরের ওপর এত বড় অভিশাপ দিয়ো না। আমিই ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি!"

কার্ত্তিকচন্দ্রকে অবশেষে বুঝিতে হইল বটে, কিন্তু সেও একটা সর্ত্তে। সর্ত্ত এই যে সর্ব্বানন্দকেও ইংরাজি পড়াইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বানন্দ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহার পড়াশুনার খরচের ভার কে লইবে? কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, জমিদার মহাশয় কি আর ইচ্ছা করিলে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের এইটুকু উপকার করিতে পারেন না? শিবচন্দ্র বলিলেন, এ বিষয়ে কে তাঁহাকে অনুরোধ করিবে? তখন কার্ত্তিকচন্দ্র নিজেই সে ভার গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার বদলে না হয় সর্ব্বদাদা পড়বে, তা হলেই হবে।"

শিবচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তোমার পড়াশুনার খরচ ত আর তিনি দিচ্ছেন না। তিনি কেবল ব্যবস্থা করে দেবেন মাত্র। খরচ-পত্র সবই আমার। সর্ব্বানন্দকে যদি পড়াতেই হয়, তাহলে সে খরচ আমাকেই বহন করতে হবে। তুমি সব বুঝছ, আর এটুকু বুঝছ না কেন? আর সর্ব্বানন্দই বা ইংরিজি পড়তে স্বীকার করবে কেন? তুমি ছেলেমানুষী করো না, আমি যা বলছি, তাই কর।"

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল বটে কিন্তু মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইহার দুই-একদিন পরে সকলেই সবিস্ময়ে শুনিল, বাবু সর্ব্বানন্দর পড়ার সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিতত্ত্ব

বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কাজেই হিন্দুধর্ম্মের সহিত আদিতে ইহার যোগ ছিল না এরূপ ধারণাই বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদিতত্ত্বের আলোচনা করিলে হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার যোগেরই প্রমাণ যে কেবল পাওয়া যায় তাহা নহে, পরন্তু হিন্দুধর্ম্মই যে ইহাকে মূলগঠন প্রদান করিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম শাক্যসিংহ। কিন্তু "বৌদ্ধ" নামের মূলার্থের অনুধাবন দ্বারা "বুদ্ধ"কেই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই বুদ্ধ নামের মূলানুসন্ধান করিলে শাক্যসিংহ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার এই নাম হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। "বুদ্ধ" শব্দ বুধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বুধ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। সুতরাং "বুদ্ধ" শব্দ তত্ত্বজ্ঞানীর অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। "বুদ্ধ" শব্দের এই তত্ত্বজ্ঞানীর অর্থ যে শাক্যসিংহই ইহাকে প্রথম প্রদান করেন, তাহা নহে, পরন্তু বেদান্ত-দর্শনে আত্মার সম্বন্ধে প্রাগুক্ত অর্থে "বুদ্ধ" শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। বেদান্ত-দর্শনে "বুদ্ধ" শব্দ যেমন আত্মার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে—তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত শাক্যসিংহেরও ইহা প্রথম বিশেষণ-রূপেইপ্রযুক্ত হইত। শাক্যসিংহ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দেবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই "বুদ্ধ" বিশেষণ যুক্ত হইয়া তাঁহার নাম "বুদ্ধদেব" হইয়াছি এই প্রকারেই বিশেষণ হইতে "বুদ্ধ" ক্রমে বিশেষ্যে পরিণত হইয়া, "ব শাক্যসিংহের প্রধান নাম হইয়া পড়িয়াছে "বুদ্ধ" শাক্যসিংহের ধর্ম্মসাধনার নাম বলিয় তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তাঁহার এই "বুদ্ধ" হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়াছে

শুধু "বুদ্ধ" নামেই যে আমরা বেদা সহিত শাক্যসিংহের ধর্ম্মের সংযো প্রমাণ দেখিতে পাই তাহা নহে, তাঁহ অপর একটী নামে তাহার আরও পরি প্রমাণ দেখিতে পাই। সেই নামটী "অ বাদী"। এই নামটী অমরকোষ অভিধা ধৃত হইয়াছে; যথা,—

ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তথাঃ।"

ইহা হইতে এইটী যে তাঁহার এ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নাম তাহাই বুঝি পারা যায়। "অদ্বয়বাদী" এই নামের দ্ব বুদ্ধদেব যে বেদান্তের অদ্বৈত মতাব ছিলেন, তাহাই নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হ

বেদান্ত মতে মুক্তিতে পরমা জীবাত্মার লয় হইয়া কেবলমাত্র পরমাত্ম বিদ্যমান থাকায় এই মুক্তির নাম "কেব হইয়াছে। সাঙ্খ্য মতেও এই মুক্তির অব "কেবল জ্ঞানে"রই স্ফুরণ হইতে থাকে:—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্তি নমেনাহ
মিত্য পরিশেষ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।"
সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।

মুক্তির এই "কেবলজ্ঞানে"র অনুষ্ঠান তেই বৌদ্ধ সাধকের নাম "কেবলজ্ঞানী" "কেবলী" দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নির্ব্বাণেও এই "কেবলজ্ঞানে"র ভাবই নিহিত। তাহাতেই অভিধানে আমরা কৈবল্য" ও "নির্ব্বাণ" একই পর্য্যায়ভুক্ত দেখিতে পাই; যথা :—

"মুক্তিঃ কৈবল্যং নির্ব্বাণম্"—ইত্যমরঃ।

বুদ্ধের বহু নামের মধ্যে একনাম বোধিসত্ত্ব" ও অপর নাম "মহাসত্ত্ব"। তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা সত্ত্বগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইতেই যে বুদ্ধের এই দুইটী নাম হইয়াছে, তাহাই এই উভয় নামের অর্থালোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ "বোধি", বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানেরই বোধক এবং "সত্ত্ব" সত্ত্ব-গুণেরই দ্যোতক। সত্ত্ব ও সত্য উভয় শব্দ একই প্রকৃতিমূলক। উভয়ই একই সৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং মূলে উভয় শব্দ একই নিত্যার্থের প্রকাশক।

এই প্রকারে বুদ্ধের বিভিন্ন নামের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বেদান্তে আমরা মূলাত্মা বা পরমাত্মার যে সমস্ত গুণের বর্ণনা প্রাপ্ত হই, ঐ সমস্ত অর্থ দ্বারাও তৎ-সমস্ত গুণই উপপাদিত হয়।

এস্থলে তুলনা করিবার জন্য আমরা আত্মার লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"তত্তদ্ভাসকং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাবং
প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বম॥"

আত্মতত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ হইতে ইহার 'বুদ্ধ', 'শুদ্ধ', 'সত্য' প্রভৃতি এক-একটী লক্ষণই যে বুদ্ধের 'বুদ্ধ', 'বোধিসত্ত্ব', 'মহাসত্ত্ব' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে পরিণত হইয়াছে তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এই প্রকারে 'বুদ্ধভাব' আত্মতত্ত্বেরই লক্ষণান্বিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে "বুদ্ধত্ব" প্রাপ্তি যে পরমাত্মাতে সম্পূর্ণ লয়, প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মারই সারূপ্য পরিগ্রহ তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। গীতাতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় লয় যে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" * বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহাতেও বৌদ্ধ নির্ব্বাণের অর্থ যে পরমাত্মায় লয় তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বেদান্তের "সোঽহং" তত্ত্ব এই লয়তত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত। পরমাত্মাতে যখন সমস্ত বিশ্বতত্ত্ব অন্তর্ভূত, তখন স্বতন্ত্র পরমেশ্বর তত্ত্ব স্বীকারের আর আবশ্যকতা থাকে না। ইহা হইতেই বুদ্ধদেব কেন যে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

কেবল যে বুদ্ধদেবের নামেই বেদান্তের নিদর্শন বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে—তাঁহার পিতামাতার নামেও সেই নিদর্শন বর্ত্তমান দেখা যায়। তাঁহার মাতার নাম "মায়াদেবী" ও পিতার নাম "শুদ্ধোদন"। "মায়া" বেদান্তের একটী প্রধান তত্ত্ব। সংসার-প্রবৃত্তি বা সৃষ্টি এই মায়ারই কার্য্য। সুতরাং "মায়া" যে মাতারূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। বেদান্তের "শুদ্ধআত্মতত্ত্বই" শুদ্ধোদন। আত্মতত্ত্বই বিশ্বের মূলতত্ত্ব। সুতরাং ইহা পিতারূপে বর্ণিত হওয়াই স্বাভাবিক। "বুদ্ধ" নাম যেমন বেদান্ত-দর্শন হইতে উপকল্পিত

* গীতা, ২য় অধ্যায়।

নাম—তাঁহার মাতা-পিতার নামও তেমনই বেদান্তানুযায়ী উপকল্পিত নাম বলিয়াই স্পষ্ট অনুমিত হয়। এই সমস্ত নাম যে ঐতিহাসিক নাম নহে, বুদ্ধ-পিতার যে পৌরাণিক "অঞ্জন" নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকারে বুদ্ধকে অঞ্জন-সুতরূপে বর্ণিত দেখা যায় :—

"বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ঃ।

বুদ্ধদেব যে কেবল বেদান্তের সাধনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে—বেদান্তের "ব্রহ্মনির্ব্বাণ"ও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার এই "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" ভাব হইতেই অনুপ্রাণনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—

"জনসাধারণের জন্য ইনি কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমি ব্রহ্মতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব। এ ধর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করিবে।" জীবনীকোষ।

তাঁহার ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনে আবার তাঁহাতে আমরা বিষ্ণুরই প্রতিরূপ দেখিতে পাই। তিনি যেমন "ধর্ম্মচক্রভৃৎ"—বিষ্ণুও তেমনই "চক্রধর"। বিষ্ণুর চক্র আবার সূর্য্যেরই রূপক।

বিষ্ণু "সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী" রূপে যে ধ্যাত হইয়া থাকেন—তাহাতেই সূর্য্য বিষ্ণুর চক্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। বুদ্ধের সহিত বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যেরও সম্বন্ধ হইয়াছে—তাহাতেই তাঁহার আর এক প্রসিদ্ধ নাম "অর্কবন্ধু"বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় ; যথা :—

গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ—ইত্যমরঃ

বুদ্ধদেবের "অমিতাভ" নাম এই সূর্য্য-সম্পর্ক হইতে হইয়াছে অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

অভিধানে বুদ্ধদেবের যে "শ্রীঘন" নাম আমরা পাইয়াছি, বিষ্ণুর "শ্রীগর্ভ" ও "শ্রীমূর্ত্তি" নামের সহিত উহাকে সম্পূর্ণ একার্থক বলিয়াই বোধ হয়। বুদ্ধদেবের সুপ্রচলিত "জিন" নাম বিষ্ণুর "জিষ্ণু" নামেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ।

বুদ্ধ নামে বিষ্ণু-সম্পর্কের নিদর্শন যেমন আবিষ্কৃত হয়, তেমনি শিব-সম্পর্কের নিদর্শন তদপেক্ষাও অধিকতর স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত হয়। বুদ্ধদেবের সুপ্রসিদ্ধ আর এক নাম "মারজিৎ"; শিবেরও প্রসিদ্ধ নাম "স্মরহর"। বুদ্ধদেবের 'মার'-জয়ের যেমন আখ্যান আছে—শিবের মদন-ভস্মেরও তেমনই আখ্যান আছে। বিশেষতঃ মার, কাম বা মদনেরই বাচক; যথা—"মদনো মন্মথোমারঃ।"

এইখানেই যে শিবের সহিত বুদ্ধের সাদৃশ্য শেষ হইল তাহা নহে, শিব যেমন শ্রেষ্ঠসংযমী ও যোগিপ্রবর, বুদ্ধকেও আমরা তেমনই যোগীশ্বররূপে স্তুত হইতে দেখি ; যথা :—

"শান্তং সদা প্রাণিবধাতিভীতম্।
বৃহজ্জটাজুট ধরোত্তমাঙ্গম্
তনুল্লসদ্ গৈরিক গৌরবস্ত্রম্
যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্ ॥"

বুদ্ধদেবে এই সমস্ত নিদর্শন দর্শন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাবের মধ্যেই যে তাঁহার জন্ম এবং তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এই প্রভাবেরই দ্বারা যে সমনুপ্রাণিত, তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন *

রাজসাহী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম্ এ, এফ্, সি, এস্, মহাশয় ছয়-সাত বৎসর ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ "ভারতী," "প্রবাসী," "বঙ্গ রিভিউ," প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, সেইগুলি সম্প্রতি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য— প্রথমতঃ, প্রত্যেক ধাতু ও তাহার যৌগিক সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা ; দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ধাতুর শোধন মারণ প্রক্রিয়ায় কি রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা ; এবং তৃতীয়তঃ আধুনিক কবিরাজ মহাশয়গণের দ্বারা ব্যবহৃত জারিত দ্রব্য, মকরধ্বজ প্রভৃতির রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা তাহাদের স্বরূপ-নিরূপণ।

গ্রন্থখানির প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে জানা যায় আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বৈদিক কালে। অথর্ব্ব বেদই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিস্থল। আমরা অথর্ব্ব বেদে ভেষজ সমূহের বাহ্য ধারণে হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে উল্লেখ দেখিতে পাই। যে সকল ভেষজের (যথা অশ্বত্থ, খদির, হরিদ্রা, অপামার্গ, মুঞ্জ, শমী, পলাশ ইত্যাদি) বাহ্য ধারণ অথর্ব্ব বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে সেই সকল ভেষজই ঔষধরূপে সেবনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতু সকলের মধ্যে সীসক স্বর্ণ দেহে ধারণ করিবার ব্যবস্থা অথর্ব্ববেদে আছে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে ঐ দুই এবং অন্যান্য ধাতুর ভস্ম ঔষধ-রূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রথমে ঔষধ-সমূহের বাহ্য ব্যবহার (external application) এবং পরে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত তাহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ (internal administration) হইয়া থাকে। প্রথমে হস্ত বা গলদেশে ধারণ, পরে মালিস বা প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং শেষে ঔষধরূপে অতি সূক্ষ্ম মাত্রার সেবন. এই রূপেই ঔষধ-সেবনের ক্রম বিকাশ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। অথর্ব্ববেদ হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎপত্তি-স্থল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহা অমূল্য গ্রন্থ। কেহ কেহ অথর্ব্ববেদকে ভূত-প্রেত ঝাড়ান মন্ত্রের সমষ্টি মাত্র মনে করিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রাচীন মিশর দেশেও মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়াই চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদে এতগুলি রোগের মন্ত্রতন্ত্র আছে যে উহার "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যাণি" মন্ত্রগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিলে পৃথিবীর মধ্যে তাহা একখানি আদি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অথর্ব্ববেদের কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের সহিত ভারতের রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার একটি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিষয়টি এই যে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ (এবং রসায়ন শাস্ত্র) গ্রীক, রোমীয় বা আরব জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত কি না ; এবং তাহা না হইলে প্রাচীন গ্রীক, রোমীয় বা আরব চিকিৎসা শাস্ত্র ভারতের আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী কি না? এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ

---

* আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন, প্রথম ভাগ, শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম্, এ, এফ, সি, এস্, রসায়ন-অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ প্রণীত, মূল্য ১।০, বাঁধাই ১৷৷০ টাকা।

আছে। বহু গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে যে কয়টি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গ্রন্থকার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম। আয়ুর্ব্বেদ ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সৌসাদৃশ্য এবং তাহার জন্য গ্রীকগণই আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী। অধ্যাপক ওয়েবার (Weber) তাঁহার History of Indian Literature এ লিখিয়া গিয়াছেন যে সুশ্রুত গ্রীকগণের চিকিৎসার নিকট ঋণী হইতে পারে না, পরন্তু বিপরীত মতই সঠিক বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে বিদেশীয় পারিভাষিক শব্দ নাই। ভারতীয় অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার হার্সবার্গ (Hirschberg) বলিয়া গিয়াছেন যে হিন্দুদের কঠিন কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা গ্রীকগণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এবং ইউরোপীয়গণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সকল অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছেন। অধ্যাপক ডায়াজও (Dias) বিস্তর গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে গ্রীক চিকিৎসা-প্রণালী হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

দ্বিতীয়। মিশর দেশ (Egypt) পুরাকালে ভারতীয় আর্য্যগণের উপনিবেশ ছিল। গ্রীকগণ তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য মিশরবাসীগণের নিকট ঋণী।

তৃতীয়। গ্রীক ভেষজ নির্ঘণ্টতে নানাবিধ ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ ও গুণ বর্ণনা আছে।

চতুর্থ। অষ্টম শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় বৈদ্যগণ বোগদাদের বাদশাহের চিকিৎসক ছিলেন; এবং অনেক সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ এই সময় আরবীভাষায় অনূদিত হয়। এইরূপে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ আরবী ভাষায় স্থান পায়। পুনরায় এই সকল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষা হইতে লাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল এবং এই সকল অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ ছিল।

পঞ্চম। ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ সম্বন্ধে গ্রীকগণ হিন্দুদিগের নিকট ঋণী।

ষষ্ঠ। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরবীয়গ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত এবং দক্ষিণ ভা হইতে তাহারা নানাবিধ ভেষজ আফ্রিকা ইউরোপে রপ্তানি করিত।

সপ্তম। অষ্টম শতাব্দীতে আধুনিক সিন্ধুপ্রদে বোগদাদের বাদশাহ খালিফ মনসুরের করা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বাদশাহের দরবা ভারত হইতে অনেক পণ্ডিত আমন্ত্রিত হইতেন। এইর আরবীয়গণ ভারতের উন্নত দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎ ও রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হ আব্‌বাস বংশীয় মনসুর ও হারুণ প্রভৃতি বাদশাহ যাবতীয় বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, চরক, সুশ্রু পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভা অনূদিত হয়। বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত মু আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সকল বিশ্লেষণ ক দেখাইয়াছেন যে চরক সুশ্রুত ভিন্ন মাধবকা নিদান ও বাগভটের অষ্টাঙ্গ এ আরও কয়েকখ সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূ হইয়াছিল। মুলার সাহেব আরও প্রমাণ করিয়া যে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়িগণ বোগদাদের রাজ চিকিৎসকও ছিলেন।

অষ্টম। ভারতের সহিত আরবীয়গণের প হইবার পর অনেক মুসলমান পণ্ডিত ভারতে শিক্ষা করিতে আসিতেন। ভারতের আয়ুর্ব্বেদও অ আরবীয় পণ্ডিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আরবীয় চিকিৎসা সমূহে 'সরক' (চরক), 'সুশ্রুদ' (সুশ্রুত), ' (নিদান), 'অসঙ্কর' (অষ্টাঙ্কর, অষ্টাঙ্গ) আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহের উল্লেখ বহুস্থানে আছে।

নবম। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগে যখন ধাতু- ঔষধ সকল বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদে ব্য হইত, তখন পর্য্যন্ত ইউনানি হাকিমেরা ধাতু- ঔষধ ব্যবহার করিতে ভীত হইতেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আয়ু ক্রমবিকাশের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ

আছে। আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কাল মূলতঃ তিনটী—(১) বৈদিক যুগ, (২) আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ ও (৩) তান্ত্রিক যুগ।

বৈদিক যুগের প্রধান গ্রন্থ অথর্ব্ববেদ ও কৌশিক সূত্র। এই যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, এপু ও সীস এই পঞ্চ ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীস ধাতু রোগ-বিনাশ-কল্পে "পরিহস্ত" রূপে ব্যবহৃত হইত।

অথর্ব্ববেদের পর "ব্রহ্মসংহিতা," "অশ্বিনীকুমার সংহিতা," ও "আত্রেয় সংহিতা" এবং অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত-কৃত সংহিতা সকল চরকের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। চরকসংহিতা ভিন্ন অপর সংহিতাগুলি এখন লুপ্ত হইয়াছে। এই আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ খ্রীষ্টপূর্ব্ব কয়েক শতব্দীর প্রাক্কালে আরম্ভ হইয়াছিল। "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়নের" তৃতীয় পরিচ্ছেদ-পাঠে এই আয়ুর্ব্বেদীয় যুগের কতক গুলি স্থূল কথা জানিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় যুগে দেখিতে পাই মদ্যবর্গের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। নানাপ্রকার আসব, শীধু, মদ্যের উল্লেখ চরক ও সুশ্রুতে পাওয়া যায়। সৌবীর-কাঞ্জিক, ধান্যাম্ল, অম্লযোনক (Vinegar) আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ছয় ধাতু ধাতুবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত ও স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি রত্নগুও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। গন্ধকের ব্যবহারও চরক ও সুশ্রুতে আছে। পঞ্চলবণ ও দুই ক্ষার এবং সোহাগা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যবক্ষার (Carbonate of potash) এবং সর্জ্জিকাক্ষার (Carbonate of Soda) বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুশ্রুতে মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষারের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া বেশ বিশদভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুশ্রুত ও বাগভটে পারদেরও উল্লেখ আছে। চরকেও ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুশ্রুতে ধাতুর অয়স্কৃতি পরবর্ত্তী কালের ধাতু মারণের পূর্ব্বাভাষ দিতেছে।

তান্ত্রিক যুগে ভারতের প্রাচীন রসায়নের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। নাগার্জ্জুনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তির্য্যকপাতন, উর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন, ধাতুর শোধন, জারণ মারণ প্রভৃতি বিবিধাপ্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিবিধ ধাতুর অনেকগুলি নূতন নূতন যৌগিক (Compound) এই সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। কালো সাল্‌ফাইড অব মার্কারি (কজ্জলী) লোহিত সাল্‌ফাইড অব মার্কারি (Red sulphide of mercury), রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দুর, কেলোসেল (রসকর্পূর), ফেরিক অক্সাইড (ferric oxide ; পুটিত লৌহ), সাল্‌ফাইড অব কপার (sulphide of copper ; মারিত তাম্র), অক্সাইড অব জিঙ্ক (oxide of zinc ; মারিত যশদ), অক্সাইড অব লেড (oxide of lead ; মারিত সীসক) আর্সেনাইট অব পটাশ (arsenite of potash ; হরিতাল ভস্ম), প্রভৃতি বিবিধ যৌগিক এই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নাইট্রো—হাইড্রো ক্লোরিক অম্ল (nitro hydrochloric acid সর্ব্বজারণ, বিড), সলফিউরিক এসিড (গন্ধক বা তেজাব) প্রভৃতি অজৈব অম্লও আবিষ্কৃত এবং ঔষধার্থ সেবিত হইত। জৈব অম্লের মধ্যে এক ধান্যাম্ল (vinegar) ভিন্ন অন্য অম্ল আবিষ্কৃত হয় নাই। ধাতু সকলের প্রস্তুত প্রক্রিয়া (metallurgy) বেশ বিশদভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রন্থকার চতুর্থ হইতে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রত্যেক ধাতুর প্রাচীন ইতিহাস, প্রস্তুত-প্রক্রিয়া, শোধন ও মারণ-প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ক্রিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে আমাদের রসায়ন জ্ঞানের অতীত গৌরব-কথা স্মরণ করিয়া, হৃদয়ে শ্লাঘা, আবেগ ও আনন্দের সঞ্চার হয়। আমাদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তির কথা বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া পঞ্চানন বাবু আমাদের ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

সুচরিতা

(উপন্যাস)

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমরা কে ?

ঐখানে সে শুইয়া আছে,—আগেকার মত এখনও তেমনি রূপসী! মাঝে মাঝে আমি দুই পা আগাইয়া যাইতেছি আর মৌন যাতনায় তার মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছি। কাল তাহাকে আমার কাছ হইতে এ-জন্মের মত ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, আর আমি একাকী পড়িয়া থাকিব, একাকী! আজ সে আছে ঘরের ভিতরে, মেজের উপরে; কিন্তু, কাল সে থাকিবে তুহিন-শীতল কবরের আঁধারে, শাদা কাপড়ে ঢাকা।

এমন অঘটন কেমন করিয়া ঘটিল, কে জানে! ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য এই কথাটা লইয়াই ক্রমাগত মনে মনে নাড়াচাড়া করিতেছি। বেলা ছয়টা হইতে ক্রমাগতই ভাবিতেছি আর ভাবিতেছি, কিন্তু এ-ভাবনার ত কোন কূল-কিনারা পাইলাম না! সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া আর-একবার ঠিক পরে-পরে সাজাইয়া গেলে বোধ হয় একটা কিনারা হয়!—কিন্তু এ কথা যতই ভাবি, ততই যে থেই হারাইয়া ফেলি! তবু একবার গোড়া হইতেই সুরু করিয়া দেখি।.....

প্রথম দিন সে আমার কাছে যে সহজভাবেই আসিয়াছিল।

জিনিষ বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা ধার লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর-আর সকলকার সঙ্গে তাহার যে কোন তফাৎ আছে, প্রথমবারেই আমি তা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু, ক্রমেই তাহার স্বভাবের বিশেষত্ব অল্পে-অল্পে বুঝিয়াছিলাম।

সে সময় তার চুলগুলি রেশমের মত চিকণ ও সরু, গড়নটি বেশ পাতলা ছিপ্‌ছিপে ছিল। দেখিলেই বুঝা যাইত মেয়েটি বড় লাজুক। টাকা পাইলে সে আর পিছন-পানে চাহিত না—মাথাটি হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইত। বেশী কথা সে একটিও কহিত না; বন্ধকী জিনিষের দাম বাড়াইবার জন্য অন্য লোকে আমার সঙ্গে দর-দস্তুরি করিত বিলক্ষণ, সে কিন্তু অল্পেই তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত।

যে জিনিষগুলি সে বাঁধা দিতে আনিত, সেগুলি এমনি খেলো ও কম-দামের যে আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম। আমার বিশ্বাস, জিনিষগুলি যে খেলো, এটা সেও জানিত; কিন্তু তার মুখের করুণ ভাব দেখিয়া মনে হইত, সেগুলি যেন তার বুকের নিধি। পরে শুনিয়াছিলাম, মৃত্যুর সময় তার বাপ-মা এগুলি তাকে শেষ-উপহার দিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন সে পুরাণো খরগোশের লোমের একখানি কম্বল লইয়া আসিল। জিনিষটার চেহারা দেখিয়া আমার মেজাজ চটিয়া গেল, দু-চারিটা কড়া কথা না শুনাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার কথায় তার সেই বড় বড় নীল চোখদুটি একবার জ্বলিয়া উঠিল! সে একটিও কথা কহিল না—কম্বলখানি লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেই প্রথম—তার চরিত্রের একটা দিক দেখিলাম।

কিন্তু সব-চেয়ে আমাকে বেশী মোহিত করিয়াছিল, এই অপরিচিতা সুন্দরীর তরুণ যৌবনশ্রীটুকু; তার বয়স তখন ষোলর কিছু বেশী—কিন্তু দেখিতে সে ছিল চৌদ্দ বৎসরের কিশোরীর মত।

এই ঘটনার পর দিনেই সে আবার আমার দোকানে ফিরিয়া আসিল। পরে জানিয়াছিলাম, আমার দোকান থেকে বাহির হইয়া আরও দু-জায়গায় তার পুরাণো কম্বলখানি সে বাঁধা দিতে গিয়াছিল; কিন্তু কোনই ফল হয় নাই; কারণ, যাদের কাছে গিয়াছিল তারা কেবল সোনা-রূপারই কারবারী।

আজ সে কাঠের একটি পাইপ আনিয়াছে। জিনিষটি দেখিতে দিব্য বটে, কিন্তু আমি সোনা-রূপার কারবারী,—কাঠের পাইপে আমার কাজ কি?

তবু, জিনিষটি আমি লইলাম। কিন্তু একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম, "আমি শুধু—তোমার জন্যেই—এটা নিলাম জেনো। যাদের সোনা-রূপার কারবার, তাদের আর কেউ এটা নিত না।"

"তোমার জন্যেই"—এই কথাদুটির উপরে বিশেষ করিয়া জোর দিলাম।

আমার কথা শুনিয়া তাহার চোখদুটি আবার তেমনি জ্বল্‌জ্বলে হইয়া উঠিল! তবে, সেদিনকার মত আজ সে আমার টাকা ফিরাইয়া দিল না। রুদ্ধ আবেগে ফুলিতে ফুলিতে টাকাগুলি লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। কারণ?—কারণ আর কি, দারিদ্র্য! আমার কথায় সে যে বড়ই আহত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

সে চলিয়া গেলে আমি নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "থামকা দু-দুটো টাকা খরচ হয়ে গেল বটে—কিন্তু আজ যে বাহাদুরিটা করা গেল, তাতে এ খরচটা কি সার্থক হবে না?" আমি খুব একচোট হাসিয়া লইলাম।

এমনি করিয়াই আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। ইহার পর, আবার সে কবে আসিবে, অত্যন্ত অধীরভাবে সেই আশায় রহিলাম।

তারপর যেদিন সে আসিল, এমন ঘনিষ্ঠতার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিলাম যে, নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

লেখাপড়া ও আদব কায়দায় আমি তৈরি ছিলাম। দেখিলাম, মেয়েটি বেশ ভদ্র। সেদিন সে আমার কাছে বিশেষ কিছু প্রকাশ করিয়া বলে নাই; কিন্তু পরে তার মুখে শুনিলাম, সে কোন ভদ্র পরিবারে গৃহ-শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে। তার সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়। সে মাহিনা চায় না, খাইখরচ ও বাসা

পাইলেই একরকম কষ্টেসৃষ্টে তার চলিয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া আজ পর্য্যন্তও সে কোন কাজের যোগাড় করিতে পারে নাই।

আমি আর-একবার তাহাকে বুঝিয়া লইবার জন্য তাচ্ছীল্যের সহিত বলিলাম, "তার চেয়ে তুমি কেন দাসীপনার চেষ্টা কর না! তাহলে ঠিক কাজ পাবে।"

আবার তাহার চোখে বিদ্যুৎ ঝকিল, —আবার সে আমার ঘর ছাড়িয়া নীরবে চলিয়া গেল।—যাক্‌গে, ভয়টা কিসের? আমি বৈ তার ত আর গতি নাই, ঘরের কড়ি বাহির করিয়া তাহার অকেজো, রদ্দী মালগুলো আর কেহই রাখিবে না। তাহাকে আমার কাছে আবার আসিতে হইবেই!

তাই! তিনদিনের মধ্যেই ফের সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেদিন তার চেহারা যেন কালি-মাড়া! বুঝিলাম একটা কিছু ঘটিয়াছে।

আজ সে একটি রূপার গিল্‌টি-করা দেবী-মূর্ত্তি বন্ধক রাখিবার জন্য আনিয়াছে। জিনিষটির আসল দাম বড়-জোর ছয় টাকা মাত্র।

মূর্ত্তিটি তাহার হাত হইতে লইয়া বলিলাম, —"এর জন্যে আমি তোমাকে দশ টাকা দিতে পারি।"

—"না, আমি দশ টাকা চাই না—আমাকে পাঁচটি টাকা দিন, মূর্ত্তিটি আমি আবার টাকা শোধ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

—"সে কি! দশ-দশটা টাকা, নেবে না কি বল! আর, ওর দাম ত দশ টাকার কম হবে না!"

আবার তাহার নয়নে বিদ্যুৎ! সে কোন উত্তর করিল না। আমি তাকে পাঁচটি টাকাই দিলাম।

বলিলাম, "গরিব বলে কারুকে আমি ঘৃণা করি না। আজ আমি এই ব্যবসা করছি বটে, কিন্তু একদিন আমিও গরিব ছিলাম— এমন-কি, তোমার চেয়েও।"

সে একটু তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ এই ব্যবসায়ে নেমে তাই বুঝি আপনি গরিবের উপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছেন?"

আমি মনে মনে বলিলাম, "হু, পথে এস,—তুমি যে কেমন মেয়ে, ক্রমেই তা বোঝা যাচ্ছে"—প্রকাশ্যে বলিলাম, "না, তা কেন? যারা ভাল হবে ভেবে লোকের মন্দ করতে যায়, আমি হচ্ছি সেই দলের মানুষ।"

সে কহিল, "আপনার কথা বোঝা ভার; কিন্তু আপনি যে কথাগুলি বল্লেন, আমি যেন এর আগে অমনি কথা আর কোথাও শুনেছি।"

"তুমি কি 'ফষ্ট' পড়েছ?"

—"পড়েছি, তবে খুব মন দিয়ে নয়।"

"কথাগুলি 'ফষ্টে' আছে। বইখানি ভাল করে পড়ো। হু,—তুমি যে হাস্‌ছ? ভাবছ বুঝি, নিজেকে আমি বিদ্বান বলে জাহির করছি? এ তোমার ভুল।"

"আপনি ত বড় ফ্যাসাদে লোক দেখছি! আমি ওসব ভাবতে যাব কেন?"

আমি বলিলাম, "সব কাজেই সকলে

দের ভাল কর্ত্তে পারে। আমার নিজের বুদ্ধা ধরছি না—আচ্ছা, মনেই কর, আমি খালি পরের মন্দই করি, তবু—"

আমাকে বাধা দিয়া, তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে একবার চাহিয়া সে বলিল, "তবু সবসময়ে সব জায়গায় লোকের ভাল কর্ত্তে পারা যায়।"

হায় রে, সেদিনের সব কথা ছবির মত আজ আমার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। সেদিনকার প্রতি মুহূর্ত্তটি আমার স্মৃতির উদ্যানে ফুলের মত ফুটিয়া আছে।

যখনি সে চলিয়া গেল, তখনি মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। খোঁজখবর লইয়া তাহার জীবনের কোনো কথা জানিতে বাকি রাখিলাম না।

কি দুঃখের জীবন তাহার! এমন শোচনীয় দারিদ্র্য গোপন রাখিয়া কি-করিয়া যে হাসিমুখে সে আমার সঙ্গে আলাপ করিত, কিছুতেই তা ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। হাঁ, তাহার একটি আশা আছে—যৌবনের সামর্থ্য তাহার সহায়। অভাগীর আঁধার জীবনের সামনে যৌবনই আলোর প্রদীপ ধরিয়া আছে।

আমি তার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সে আমার—একান্তই আমার! তাকে আমার মুঠার মধ্যে পাইয়াছি!

কিন্তু—এসব ছাইভস্ম কি বলিতেছি? আমি যদি এমনি আজে-বাজে কথা ভাবিতে থাকি, তাহা হইলে চিন্তার ত কোন অন্ত পাইব না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ-প্রস্তাব

তাহার জীবন-কাহিনী দু-কথায় শেষ করা যায়।

আজ তিনবছর হইল, তার বাপ-মা পরলোকে। সে এখন দুই গরিব খুড়ীর সংসারে আছে। খুড়ীদের একজন ছয়টি সন্তান লইয়া বিধবা; আর-একজন কুশ্রী, বৃদ্ধা, চিরকুমারী। তাহার পিতা ছিল কেরাণী।

দেখিতেছি, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার সহায়। আমি তাদের চেয়ে ভাল ঘরের ছেলে। ভদ্রবংশে আমার জন্ম, সংপ্রতি কাপ্তেনের পদ হইতে অবসর লইয়া স্বাধীন ব্যবসা করিতেছি।

গত তিন বৎসর এই অসহায়া বালিকা তাহার খুড়ীদের সংসারে দাসী-বাঁদীর মত কায়ক্লেশে আছে। অথচ এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ভিতরেও সে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। সংপ্রতি খুড়ীর মেয়ে-ছেলেদের লেখাপড়া শেখানো, কাপড় শেলাই করা, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করা—সংসারের যত কাজ সব তার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে। চিম্‌টা দিয়া তাহার উপর মার-ধরও করা হয়। আবার খুড়ীরা তাহাকে বিক্রয় করিতেও চায়! তাহার নিজের মুখেই আমি এ-সব ব্যাপার জানিয়াছি, শুনিয়াছি।

তাদের পাশের বাড়ীতে একটা মোটা দোকানী থাকিত। পর পর দুই-দুইটা স্ত্রীকে কবরে পাঠাইয়া সে যখন তৃতীয় শিকার

খুজিতেছিল তখন এই অভাগীর উপর তাহার নজর পড়ে।

পঞ্চাশ বছরের সেই বুড়ো দোকানীটা বালিকার খুড়ীদের কাছে গিয়া বিবাহ-প্রস্তাব করিল। ভয়ে বালিকার প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সময়েই সে অন্যত্র চাকরির আশায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। বিজ্ঞাপনের খরচের জন্যই সে তাহার সামান্য জিনিষগুলি আমার কাছে বন্ধক রাখিতে আসিত।

সন্ধ্যার সময় আমি তাদের বাড়ীতে গিয়া ঝী লুকেরিয়াকে ডাকিলাম। এই দাসীর কাছ হইতেই আমি বালিকার সব খবর পাইয়াছিলাম। লুকেরিয়ার মুখে শুনিলাম, সেই মোটা দোকানীটা বাড়ীর ভিতরে বালিকার পাশে বসিয়া আছে।

লুকেরিয়াকে বলিলাম, "মেয়েটির কাছে গিয়ে কাণে কাণে বলে এসগে, একটা দরকারি কথা জানাবার জন্যে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।"

লুকেরিয়ার সঙ্গে বালিকা বাহির হইয়া আসিল। আমি কোনরকম ইতস্তত না করিয়া স্পষ্টাস্পষ্টি বালিকাকে বলিয়া দিলাম যে, যাহাতে তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ হয় সর্ব্বদাই আমার সেই চেষ্টা। আমি খুব চালাক-চতুর লোক নই, হয়ত তেমন সৎও নই—আর লেখাপড়াতেও আমাকে মস্ত একটা দিগ্‌গজ বলিতে পারা যায় না। আমার সঙ্গে বিবাহ হইলে হয়ত সে তেমন খুসী হইতেও পারিবে না; কারণ, আমি তাকে ভাল কাপড়-চোপড়ও দিতে পারিব না, বা থিয়েটার ও বলনাচেও লইয়া যাইতে পারিব না—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আসল কথা, আমি যে নিজে একজন মস্ত ওস্তাদ লোক, বিবাহ-প্রস্তাবের ভিতরে এমন ভাব আমি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করি নাই।

সে যে আমাকে খুব-বেশী পছন্দ করিত না, তা আমি বেশ বুঝিতাম। কিন্তু সেই মোটা দোকানদারটাকে সে যে আমার চেয়েও ঢের-বেশী অপছন্দ করে, ইহাও আমার জানিতে বাকি নাই। সুতরাং আমাকে সে নিশ্চয়ই তাহার মুক্তিদাতা বলিয়া ভাবিবে!

কিন্তু আমাকে বিবাহ করিলে যে তাহার সুখের সীমা থাকিবে না, এ কথাটা আর কোন্ মুখে বলি? তাই সোজাসুজি বলিলাম, "এ বিবাহে আমারই বেশী লাভ—তোমার নয়।"

যাহা হউক, শেষ-বরাবর আমারই জিৎ হইল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ভাবিতে লাগিল; তারপর আনমনে মৃদু, অস্ফুটস্বরে আপনা-আপনি বলিল, "হুঁ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বল?"

স্বপ্নোত্থিতের মত মাথা তুলিয়া দীর্ঘস্বরে সে বলিল, "অ্যাঁ?—কি?.....হুঁ, দাঁড়ান, আমাকে ভাবতে দিন।"

তার ছোট মুখখানি গম্ভীর;—এত গম্ভীর যে, আমার সম্ভ্রম হইতেছিল! তবু মনে একটা আঘাত পাইলাম। সে কি তুলনা করিয়া দেখিতেছে আমি ভাল, কি ঐ দোকানদারটা ভাল?—হায়, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, ভুল বুঝিয়াছিলাম! আজও সে ভুল বুঝি ভাঙ্গে নাই!

...র,—আমি তার মত পাইলাম।

...ন পড়ে, আমি যখন চলিয়া ... লুকেরিয়া তখন রাস্তায় ছুটিয়া ...া উল্লাসে আমাকে বলিয়াছিল, ...দি আমাদের দিদিমণিকে বাঁচালেন, ...ন আপনার ভাল করবেন ...! কিন্তু দিদিমণিকে কোনদিন যেন ...কথা বল্‌বেন না—বড় অভিমানী ...।"

...অভিমানী? বেশত, অভিমানী রমণীকেই ...মি বেশী পছন্দ করি। রমণীকে বশে ...তে না পারিলে রাগ হয়,—কিন্তু ...সময়ে রমণীর অভিমান বড় মধুর!

...াঁ, আজও আমার ভুল ভাঙ্গে নাই। ...সে স্তব্ধ, চিন্তান্বিত হইয়া দরজার ...দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে ভাবিতেছিল ..."দেখছি, এ-দুজনের যার সঙ্গেই ...র বিবাহ হোক, আমি ত সুখী ...পারবই না। বরং ঐ দুষ্‌মন ...া দোকানদারটাকে আমি যদি বিয়ে ..., তাহলে ও মাতাল হয়ে এসে হয়ত ...দিন আমার গলা টিপে ধরে এই দুঃখের ...া থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই দিতে ...র।—দুদিকেই দুঃখ, তবে কোন্ ...কে আমি বরণ কর্‌ব?"

...আমাদের দুজনের ভিতরে ভাল কে,—...ও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই!—...ই কি? না—না, প্রশ্নের জলন্ত ...া এই যে আজ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া ঘরের ...ঘরে মেজের উপরে পড়িয়া আছে! ...আমি কোন্ মুখে বলিতেছি, ...ও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই'?

এখন আমার কি হবে?—কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না যে! বড়ই মাথার যাতনা—এখন ঘুমাইতে যাই, ঘুমাইতে যাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবিশ্বাসের ম্লান হাসি

আমি ঘুমাই নাই। এই নীচতা, এই ঘটনার কথা যখনি আমি ভাবিতে গিয়াছি, তখনি মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কি মলিনতার মধ্য হইতে তাহাকে আমি উদ্ধার করিয়াছি, অন্তত সেটা ভাবিয়াও আমার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল। যদিও, তখন আমার বয়স একচল্লিশ, তার ছিল ষোল।

বিবাহে কোন ঘটা হইল না। ঠিক করিলাম, বিবাহের পর আমার কর্ম্মস্থল মস্কোয় যাইব। কিন্তু আমার স্ত্রী তাতে বাধা দিল। সে বলিল, বিবাহের পর আমি তার খুড়ীদের—যে খুড়ীদের গ্রাস হইতে তাকে আমি উদ্ধার করিলাম—সেই খুড়ীদের কাছে গিয়া থাকিব। তাকে বিস্তর বুঝাইলাম, সে কিছুতেই বোঝ মানিল না। শেষটা আমি তার খুড়ীদের হাত করিবার ফিকিরে রহিলাম। কিন্তু যতক্ষণ-না সেই ধড়িবাজ বুড়ীদুটোর হাতে নগদ একশোখানি টাকা গুঁজিয়া দিলাম, ততক্ষণ অবধি তারা কোনমতেই বাগ্ মানিতে চাহিল না। যাহা হউক, এ ব্যাপারটা আমার স্ত্রীর কাছে আর ভাঙ্গিলাম না; কারণ আমার নীচতার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে আমাকে ঘৃণা করিত।

প্রথম হইতেই ফুলভারনত লতার মত প্রেমভারে সে আমার উপরে একেবারে নুইয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা আমি যখন দিনের কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতাম, তখন সে পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিত। তারপর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে তাহার শৈশবের, তাহার যৌবনের, তাহার পিতামাতার, তাহার ঘর-বাড়ীর কত কাহিনীই সে অনর্গল বলিয়া যাইত। হায়, সরল নিষ্পাপ প্রেমের সে অর্দ্ধস্ফুট ভাষা কি মধুর!

কিন্তু এ আনন্দের ভাষাকে আমি আমোল দিতাম না।—আমার স্বভাবটা এমনি আশ্চর্য্য ছিল!

আপন-মনে সে কথার পর কথা কহিয়া যাইত, আমি কিন্তু একেবারে চুপচাপ থাকিতাম। শীঘ্রই সে বুঝিল, আমরা দুজনে দুই ধরণের লোক—আমার ভিতর সহজ সরলতা নাই।

সকল বিষয়েই আমি কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু কেমন সহজেই সে আমার সমস্ত কঠোরতা ভাসাইয়া দিত! আমি কিন্তু কিছুতেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারিতাম না; আমি চাই, শৃঙ্খলা!

কিন্তু কি-করিয়া আরম্ভ করি? আমাদের সংসারের জীবন কেমন ছিল, তাহা বুঝানো বড় কঠিন।

আমার স্ত্রী বলিত, টাকাকে সে ঘৃণা করে। আর আমি বলিতাম, টাকাই সব। যতক্ষণ-না সে বাধ্য হইয়া চুপ করিত, ততক্ষণ আমি তাহার কথার প্রতিবাদ করিতাম। সে তার বড় বড় চোখদুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া আমার অর্থের গুণগান শুনিত। তার প্রাণটি উদার; কাজেই আমার মত সংসারী লোকের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা তাহার পক্ষে

এখন, এমন নারীকে কেমন করি আমার লেন্-দেনের ব্যবসার কথা খুলি বলি? কাজেই আমাকে সব চাপিয়া যাই হইত। পেটের কথা সহজে আমার জি আগায় আসে না—এটা আমার মস্ত এই গুণটির জন্য জীবনের অনেক ঝড়-ঝা আমি হাসিমুখে সহিতে পারিয়াছি।

এদিকে ষোল বৎসরের এই ছে বালিকাটি লোকের কানাঘুষা শুনিয়া আ দুই-চারিটা গুপ্তকথা কিরূপে আবি করিয়া ফেলিল!—সে স্থির করি আমার জীবনের সকল রহস্যই ধরিয়া ফেলিয়াছে! তবু আমি কিছু মৌনব্রত ভাঙ্গি নাই—আজ অবধি-নয়!

মানুষ কি দেমাকী জীব!

আমার চরিত্র যদি সে বুঝিতে চাহে বুঝুক না! কিন্তু বদ্‌লোকের কানাকানি কেন?—নিজের বুদ্ধির জোরেই তাহা বুঝিতে হইবে! বুঝিয়া, আমাকে চিনুক!

তাকে একদিন বেশ সপ্রতিভ-ভা সোজাসুজি বুঝাইয়া দিলাম, "যে যৌবনের গর্ব্বে মাধুর্য্য আছে বটে, কিন্তু দাম একটি কানাকড়িও নয়!"

যৌবন ত বিনাক্লেশে অর্জ্জন যায়! তাহাতে তো জীবন-মর লড়াই নাই। কিন্তু অর্থলাভের আমাকে সারাজীবন যুদ্ধ করিতে হইয়া

প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে খুব তেজেই তর্কবিতর্ক করিত। তারপরে ক্রমেই মাথা নামাইয়া আনিল—আমার মুখের দে চোখ তুলিয়া সে শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিয়া যাইত। কেবল, তাহার ওষ্ঠাধরে নাসের একটা ম্লান হাসি মাখানো থাকিত—সে-রকম হাসি আমি দু-চোখে দেখিতে পারিতাম না। মুখে এমনি হাসি লইয়াই সে ঘরকন্না করিতে আসিয়াছিল। আমার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও তাহার দাঁড়াইবার ঠাঁইও ছিল না!

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চয়ন

ফেডর ডোষ্টোয়েভ্‌স্কি

রুশ ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে বাস্তব উপন্যাস রচনায়, ফেডর ডোষ্টোয়েভ্‌স্কির স্থান সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাস্তবতা রুশ ঔপন্যাসিকগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও; ডোষ্টোয়েভ্‌স্কির মতন এত নিবিড়ভাবে আর কোন রুশ-লেখক বাস্তবতাকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

টলষ্টয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন, গুরুমশায়ের সাজে; কিন্তু ডোষ্টোয়েভ্‌স্কি সে ধার দিয়াই যান নাই। তাঁহার সহযোগী ঔপন্যাসিক শেখভ (গত আশ্বিনের ভারতীতে শেখভের একটি গল্পের মর্ম্ম বাহির হইয়াছে), রঙ্গ-ব্যঙ্গে মস্ত ওস্তাদ ছিলেন; ডোষ্টোয়েভ্‌স্কির লেখায় সে-রকম হাস্যরসও নাই—অথচ তাঁহাকে নিরাশাবাদীও বলা চলে না। কারণ, অন্ধকার যেখানে সূচীভেদ্য, সেখানেও তিনি আশার জ্যোতী দেখিতে পান; তাঁহার সৃষ্ট অধঃপতিত মানব-আত্মার ভিতরেও পুনরুত্থানের একটা মধুর সম্ভাবনা পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, জীবনের সকল জ্বালাযন্ত্রণা প্রেমের স্নিগ্ধ প্রলেপে জুড়াইয়া যায়; প্রেমগুণে মহাপাপীও উদ্ধার লাভ করে—ডোষ্টোয়েভ্‌স্কির রচনার পরতে পরতে স্বর্গীয় প্রেমের এমনি মহামহিমার অজস্র ধারা বহমান। তাঁহার Crime and Punishment ও Letters from the Underworld নামক উপন্যাস-দুখানিতে এই সকল গুণ সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিবে।

টলষ্টয় ছবি আঁকিয়া সকলের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেন যে, ছবির কোথায় কি নৈতিক উপদেশ আছে; কিন্তু ডোষ্টোয়েভ্‌স্কির কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তিনি কেবল চিত্রাঙ্কন করিয়াই ক্ষান্ত হন—চিত্র ও দর্শকের মধ্যে শিক্ষকের মত মধ্যস্থতা করিতে চান না, —যাঁহার ইচ্ছা তিনিই তাঁহার ছবি দেখিতে, নিজের খুসিমত যেমন বুঝিয়াছেন

তেমনি ভাবিতে পারেন। দর্শককে তিনি স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যবহারের সুযোগপ্রদান করেন।

ডোষ্টোয়েভ্স্কির প্রেমবাদেও একটু আলাদা ধরণ আছে। সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা বিচরণ করে, যাহারা মাতাল, যাহারা রোগী, যাহারা কৃপণ, যাহারা বারবনিতা —ডোষ্টোয়েভ্স্কির প্রাণ সর্ব্বদাই তাহাদের জন্য ব্যথিত, তাহাদের জন্য কাঁদিয়া আকুল। পরন্তু, তাঁহার সৃজিত চরিত্রগুলি বাহিরে ছোট হইলেও ভিতরে বড়,—তাহাদের অনেকেরই চিত্তে অতৃপ্ত প্রেমের ক্ষুধা সকলের অলক্ষ্যাতে বহিয়া যাইতেছে —তাহাদের কেহ প্রেম-বিনা পাগল, কেহ প্রেমের আস্বাদ পাইয়া পাগল! তাহাদের কেহ বলে, "শৈশবে আমি যদি বাপ-মায়ের ভালবাসা পেতাম আজ তাহলে আমার এমন দুর্দ্দশা হোত না!"—তাহাদের কেহ পিতা,—"দেহে তিনি ছেঁড়াখোড়া ময়লা, পুরাণো কাপড় ছাড়া আর কিছু পরেন না, অথচ নিজের মেয়ের সুখের জন্য তিনি অম্লানমুখে রাণীর পোষাক কিনিয়া দিতে পারেন.....মেয়ের মুখ চাহিয়া তিনি ভিখারী হইতেও প্রস্তুত.....প্রতিদানে তিনি যদি কন্যার ওষ্ঠ হইতে একটুখানি প্রেমের হাসি পান!"—তাহাদের কেহ বলে, "যেখানে প্রেম নেই সেখানে জ্ঞানও নেই"—কেহ বলে, "ধীর হয়ে যে ভালবাস্‌তে পারে, জীবন তার কাছে আনন্দের মত",—কেহ বলে, "প্রেম হচ্ছে সকল রত্নের সেরা রত্ন, নিখিল বিশ্ব এই প্রেমের ভিতরেই কেন্দ্রীভূত.....প্রেমের জন্যই মানুষ আত্মদান করবে—প্রেমের পায়েই সে হাসিমুখে [illegible] বিকিয়ে দেবে!"—ডোষ্টোয়েভ্স্কির এক[illegible] উপন্যাসে, এক নরদেবী লম্পট [illegible] একজন সমাজত্যক্ত হতভাগ্যকে সম্বো[illegible] করিয়া বলিতেছে, "মনে একবার [illegible] দেখি, তুমি যদি তোমার বুকের [illegible] একটি নাছোড়বান্দা ছোট্ট খোকাকে পে[illegible] তাহলে কি তোমার আজ এমনি[illegible] হাল হোত?.....স্বামী, স্ত্রী আর খো[illegible] এই তিনে যখন এক হয়ে—একেবারে এ[illegible] প্রাণ হয়ে যায়, তখন যেমন সুখ পা[illegible] যায়, তেমন সুখ কি আর আছে?"

অনেক ঔপন্যাসিক, কেতাবী বাস্তব[illegible] অনুরক্ত। পৃথিবীর নিত্য-নৈমিত্তিক [illegible] ঘটনাগুলি তাঁহারা কল্পনায় দেখিয়া [illegible] করেন; ডোষ্টোয়েভ্স্কি সে-শ্রেণীর লেখক [illegible] সংসারে নরক যাহাকে বলে,—ডোষ্টোয়েভ্[illegible] তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন;—সে [illegible] কেবল নির্লিপ্ত দর্শকের দেখা নয়—অ[illegible] এক নরকে বন্দী বাসিন্দা হইয়া, শত [illegible] সমাজত্যক্ত নষ্টাত্মার সঙ্গে তিনি দৈহি[illegible] ও মানসিক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলে[illegible] নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে নি[illegible] করিয়া, উচ্চাসনে উপবিষ্ট সমাজপতিগ[illegible] সম্মুখে তিনি নরকের উজ্জ্বল চিত্র আঁকি[illegible] জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"এ ছবি দেখি[illegible] সমাজ কি বলিতে চায়?" সমাজের কে[illegible] বিশেষ শ্রেণীর উপরে তিনি দোষারো[illegible] করেন নাই;—তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছে[illegible] দর্শককে ডাকিয়া আনিয়া তাহাই দেখ[illegible] এবং দেখাইয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞা[illegible] করেন। সভ্যতার যে কত অপরাধ, [illegible]

[illegible], কত ক্ষুদ্রতা, সমাজের যে কত [illegible]পূর্ণতা, কত ত্রুটি-বিচ্যুতি, কত অবহেলা, [illegible]সারের পিচ্ছল পথে অভাবের তাড়নায়, [illegible]র অত্যাচারে, মানুষের হীনতায় মানুষ [illegible] কত নীচে ধাপে-ধাপে নামিয়া যায়, [illegible]ষ্টোয়েভ্স্কির অঙ্কিত মানব-প্রকৃতির বাস্তব [illegible]লেখ্যে নিখুঁতরূপে তাহা চিত্রিত। [illegible]ার ছবিগুলিকে বিদেশের ছবি, রুশিয়ার [illegible]বি বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিলে চলিবে [illegible]—কারণ সেগুলি কেবল রুশিয়ার চিত্র [illegible]—সেগুলি সমস্ত পৃথিবীর আধুনিক [illegible]মাজিক জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি—[illegible]ার ভিতরে একটা বিপুল সার্ব্বত্রিকতা [illegible]ছে। তিনি যে মানুষগুলির হৃদয় [illegible]চ্ছেদ করিয়াছেন, সে মানুষগুলিকে [illegible]ধুনিক সভ্যতার কল্যাণে সকল দেশে, [illegible]ল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া [illegible]। এই সার্ব্বজনীনতা ডোষ্টোয়েভ্স্কির [illegible]ন্যাসের একটা প্রধান লক্ষণ।

'ভারতী'র বর্ত্তমান সংখ্যায় ডোষ্টোয়েভ্স্কির [illegible]ক্ষুদ্র উপন্যাসখানির অনুবাদ ("সুচরিতা") [illegible]রম্ভ হইল, লেখক তাহাতে দেখাইতে [illegible]য়াছেন, একজন মদ্যপ, কর্কশ-স্বভাব [illegible]ষও প্রেমের মহিমায় কিরূপে সদাশয় হইতে [illegible]য় করিতেছে। প্রাণ দিয়া সে তাহার [illegible]কে ভালবাসিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনার [illegible]ওঁয়েমি ও কড়া মেজাজ কিছুতেই [illegible]তে পারে নাই। ফলে, না-জানিয়া [illegible]-বুঝিয়া আপনার প্রেমবতী পত্নীর বক্ষেই [illegible]দুঃখ-যাতনার শূল বিদ্ধ করিয়াছিল।

পুস্তকের ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন:—

"এই গল্পটিকে যদিও আমি "কাল্পনিক গল্প" বলিয়াছি, তথাপি ইহার মূলে সম্পূর্ণ বাস্তব উপাদান আছে।

মনে কর, একজন লোকের পাশে তাহার স্ত্রীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় লোকটির হৃদয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; কি করিতে কি হইয়াছে সে তাহা ভাবিতে চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না বরং মাঝে মাঝে আপনার চিন্তাসূত্রের খেই হারাইয়া ফেলিতেছে। একবার মনে করিতেছে, তার স্ত্রীই সকল দোষে দোষী,—এ দুর্ঘটনায় তার কোন হাত নাই। কিন্তু এই আত্মপ্রবোধে তাহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিতেছে না—তাই পর-মুহূর্ত্তেই আবার সে বিপরীত চিন্তা-ধারায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। দুঃখে ও উত্তেজনায় সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অবশেষে, ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ হইয়া সে যথার্থ সত্য বুঝিতে পারিল। এইজন্যই তাহার আত্মউক্তি আরম্ভে যেমন বিশৃঙ্খল ছিল, শেষকালটায় আর তেমনধারা রহিল না।

এইরূপ দীর্ঘ আত্মউক্তি ঠিক স্বাভাবিক না হইলেও, কলা-রাজ্যে ইহার ব্যবহার নূতন নহে। ভিক্টর হুগো তাঁহার "The Last Day of Condemned Criminal" নামক পুস্তকে (ইহার বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে "বন্দী" নামে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে) ঠিক এই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির পক্ষে যদিও তাহার জীবনের শেষদিন, শেষঘণ্টা —এমন-কি শেষ মিনিট পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ ও মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ

লিখিয়া রাখা সম্ভব নহে,—তথাপি, ভিক্টর হুগো যদি এই বিশেষ পদ্ধতিটি অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব ও স্বাভাবিক এই উপন্যাসখানি লিখিবার কোনই সুযোগ পাইতেন না।"

আল্‌বার্ট বেস্‌নার্ডের ভারতীয় চিত্র

আল্‌বার্ট বেস্‌নার্ড আধুনিক ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত চিত্রকর। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে —তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন তিনি prix de Rome নামক স্কলারশিপ লাভ করেন। সেইদিন হইতে অদ্যাবধি কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি কলারাজ্যে অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ ওস্তাদ-চিত্রকরগণ, রমণীর পট আঁকিতেই জীবনের বেশীভাগ কাটাইয়া দিতেন। বেসন'র্ডও এই পথ ধরিয়াছেন। নিসর্গ চিত্রেও তিনি সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার অঙ্কিত বিবিধ আলেখ্যে কেবল প্রতীচ্যের বহিঃপ্রকৃতিই বিকাশলাভ করে নাই—তাঁহার তুলিকার মায়া-স্পর্শে সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রাচ্যের অনেক বিচিত্র দৃশ্যও প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকার বিরাট মরুভূমির জ্বলন্ত বর্ণ-কাব্য তাঁহার পরিকল্পনায় যেমন ফুটিয়াছে, তেমন আর কোথাও বড়-একটা দেখা যায় না।

গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বেস্‌নার্ড সস্ত্রীক ভারত-ভ্রমণে আসিয়া এখানে ছয়মাসকাল কাটাইয়া গিয়াছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষকে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন :—

"ভ্রমণকারীদের উজ্জ্বল বর্ণনা পড়িয়া ভারতভূমিকে কল্পনায় যে উচ্চাসন দিয়া ছিলাম, এখানে আসিয়া দেখিলাম, তা চেয়েও বিচিত্রসুন্দরী সে!"

চিত্রকরেরা সাধারণত সাহিত্যক্ষে আসিয়া কলম ধরেন না; কিন্তু বেস্‌ন একসঙ্গে চিত্রশিল্পী ও শব্দশিল্পী—তাঁহা রচনা-ভঙ্গী অতিশয় চিত্তহারী। ভারত দর্শন করিয়া তাঁহার মনে যে-সকল ভা ছাপ্ পড়িয়াছে, একই হাতে তুলি কলম ধরিয়া তিনি পটে ও খাতায় সে সকল ভাবের রূপ চিরস্থায়ী করিয়াছে আমরা তাঁহার শব্দ-চিত্রের দু-এক জায় তুলিলাম :—

"পাহাড়ের উপরে যে নদীটি শান্তভা বহিয়া যাইতেছিল, এখানে সেই নদী ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে বিদ্যুৎবেগে গিরিমাল চরণোদ্দেশে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। উপ দাঁড়াইয়া নিচের দিকে চাহিলে মনে হ ওখানে যেন একটি বৃহৎ জলপাত্র রহিয়াছে —রাশি রাশি ফেণার ভিতরে সেখা আমি স্নানকারীগণকে দেখিতে পাইলা তাহাদের অঙ্গভঙ্গি দেখিলে সন্দেহ হ বুঝি তাহারা কোনরকম ধর্ম্মবিধি পা করিতেছে! জলপ্রপাতের আশপাশের উ পর্ব্বত এবং পত্রবহুল বৃক্ষমালার স্নিগ্ধ ছায়

লকেই যেন কি-একটা রহস্যের মত বোধ হইতেছে। পাহাড় যেখানেই একটু ঘুরিয়া পড়িয়াছে, গাছের ডাল যেখানেই একটু সরিয়া গিয়াছে, সেইখানেই ফাঁক পাইয়া সূর্য্যকর প্রবেশলাভ করিয়া কোথাও কোন স্নানার্থীর মস্তক, কোথাও স্কন্ধ, আবার কোথাও-বা একটা কবন্ধ ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তিকে কিটুকু-পায়ে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।"

"ঐ দেখ, মন্দিরের দ্বারপথ! আমরা ক্রমেই নিকটস্থ হইতেছি; মরণোন্মুখ দিবালোক বাড়ীর ছাদে ছাদে ও গাছের মাথায় মাথায় যেন বেগুণিরঙ্গের কুঙ্কুম ছড়াইয়া দিতেছিল। বিপুল দ্বারের ভাঁজ-করা কপাটের খানিকটা খুলিয়া যাইবামাত্র এমন একটা আকস্মিক শব্দ উঠিল যে, হৃদয় আমার স্তম্ভিত হইয়া গেল। দাস্তে যখন ক্রুদ্ধ আত্মাগণের পুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারও মনের ভাব বোধ করি, এমনিধারা হইয়াছিল!"

বেস্‌নার্ড সর্ব্বপ্রথমে সিংহলে উপস্থিত হইয়া সেখানকার বৌদ্ধ মঠ-মন্দির পরিদর্শন করেন। তারপর একে একে কাশী, আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর, আমেদাবাদ, বোম্বে দেখিয়া মাদুরায় গিয়া উপস্থিত হন। এখানে ষোলদিন থাকিয়া তিনি অনেকগুলি ছবি আঁকেন। তারপর তিনি ত্রিচিনাপল্লী, তাঞ্জোর, পণ্ডিচারী, মান্দ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও কলিকাতা দর্শন করেন।

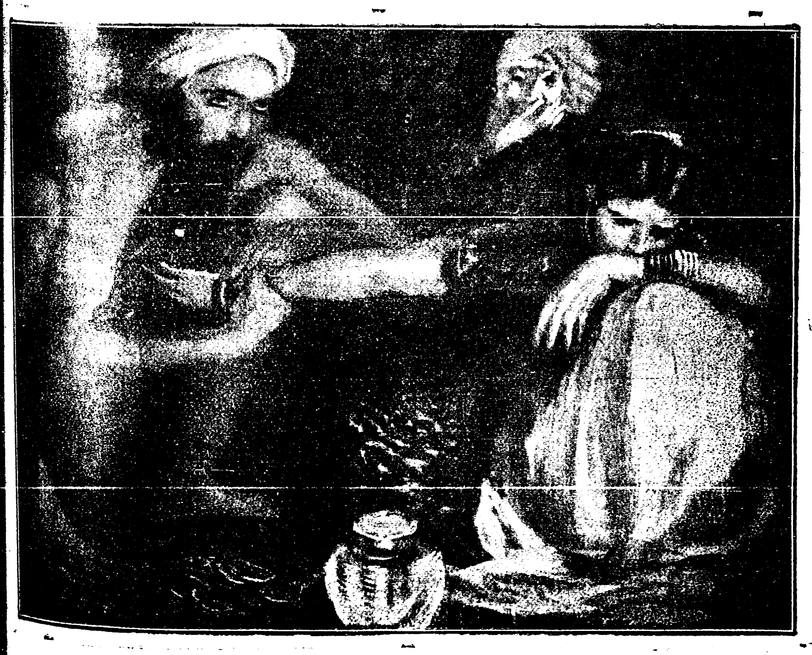

চুড়িওয়ালা



নর্ত্তকী

এই ভ্রমণের ফলে বেস্‌নার্ড যে-সকল ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতর বেশীর ভাগই দক্ষিণ দেশের। ভারতের উত্তরাংশে অবরোধ-প্রথার কড়াকড়ি বড়ই অধিক। এমন-কি, বেস্‌নার্ডের সহধর্ম্মিনী পর্য্যন্ত সহজে উত্তর-ভারতের গোপন অন্তঃপুরে ঢুকিতে পারেন নাই।

বেস্‌নার্ডের আঁকা চিত্র-মালায় সেইজন্য আমরা যে-সকল নারীমূর্ত্তি দেখি, সাধারণত তাহারা নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় রমণীর আদর্শে

ঙ্কিত; কিন্তু মূর্ত্তিগুলি যে শ্রেণীরই হোক বেস্‌নার্ডের ছবিতে ভারতের সাধারণ র-নারীর বাহিরের রূপ যে ঠিকমত টিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক-একখানি ছবি আবার এতটা বাস্তব , দেখিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। যমন "চুড়িওয়ালা"। এক রূপসী খরিদ্দারের রিপুষ্ট সুডৌল হাত হইতে চুড়িওয়ালা ু-কয়া একগাছা চুড়ী জোর করিয়া খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সুন্দরীর মুখে সলজ্জ ব্যথার ভাব, ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুড়িওয়ালাকে বাধা দিবার ভঙ্গীটি ছবিতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর-একখানি ছবিতে 'নর্ত্তকী'র চেহারা নিপুণতার সহিত আঁকা হইয়াছে। এ-রকম নর্ত্তকী আমরা ভারতের সব জায়গাতেই পথে-ঘাটে যখন-তখন দেখিতে পাই।

রোশেনারার ভারতীয় নৃত্য

রোশেনারা যখন নাচেন, বিলাতী য়েটারে তখন আর তিলধারণের ঠাঁই াকে না—তাঁহার নাচের তালে তালে র্শকের মনও নাচিতে থাকে!

কলাবিদেরা বলেন, "কোন দেশের াচে ও গানে সেই দেশের, সেই জাতির নিজস্ব ভাবটি ধরা পড়ে—যেমন, প্রজাপতি রা পড়ে জালের ভিতর!"

রোশেনারার নাচেও তাই ভারতবর্ষের ায়া জাগিয়া উঠে;—একালের ট্রাম-রেল-াইনে ভরা ও টেলিগ্রাফের তারে-ঘেরা ভারত য়—সেকালের সেই বিস্মৃত দিবসের রূপ-থার ভারতবর্ষ রোশেনারার নাচের তালে ও গানের তানে স্বপ্নের মত আত্মপ্রকাশ রে।

রঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণ যবনিকার আড়াল হইতে াগে একখানি ধবল হস্ত সাপের ফণার ত ভঙ্গীতে বাহির হইয়া উপরে-নীচে ডাইনে-বামে উঠিতে নামিতে হেলিতে দুলিতে থাকে; তারপর হঠাৎ যবনিকা সরিয়া যায় এবং সর্প-নৃত্যের অপূর্ব্ব পোষাক পরিয়া রোশেনারা দর্শকদের সামনে আসিয়া দাঁড়ান —তখন তাঁহার হাতদুখানি দেখিলে প্রাণে চমক লাগে, সে-যেন দুটি জীবন্ত সর্প!

এই সর্প-নৃত্য ভারতেরই নিজস্ব। দেবতার সম্মুখে এই নৃত্য-ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। সর্প-নৃত্য শিখিবার জন্য রোশেনারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নাচ যাহাতে স্বাভাবিক হয়, সেজন্য তিনি সাপুড়ে ডাকাইয়া জীবন্ত সর্পের নৃত্য-ভঙ্গি মনোযোগের সহিত অনেকদিন ধরিয়া পরখ করিয়াছিলেন।

রোশেনারা ভারত-মহিলা নন—একেবারে খাঁটি য়ুরোপীয় বংশে তাঁহার জন্ম। কিন্তু ভারতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব ও আদব-কায়দায় তিনি এমনি কেতাদুরস্ত যে,

তাঁহাকে কিছুতেই কেহ ইংরাজ বলিয়া ঠাহর করিতে পারে না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, রবিবর্ম্মার চিত্রপট ছাড়িয়া কোন মূর্ত্তি যেন কার যাদু-মন্ত্রে হঠাৎ সজীব ও নৃত্যানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নাট্যমঞ্চের উপরে আবির্ভূত হইয়াছে!

রোশেনারার আর-একটি বিখ্যাত নৃত্য আছে। দাক্ষিণাত্যে ফসলের সময়ে, কৃষক-বালারা কুলা লইয়া ময়দানে যায়। সেখানে কুলা নাড়িয়া কাল্পনিক শস্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে বাতাসে যেন তুষ উড়াইয়া দিতেছে, এমনি ভান করিয়া সকলে একসঙ্গে একতালে নৃত্য করিতে থাকে। কৃষক-কন্যাদের ঐ সমবেত নৃত্যের অনুকরণেই রোশেনারার বিখ্যাত "স্বর্ণশষ্য-নৃত্য"। এই নাচে রোশেনারাকে কি-রকম চিত্রার্পিতের মত সুন্দর দেখায়, "স্বর্ণশষ্য-নৃত্যে"র ছবি দু খানি দেখিলেই সকলে তাহা কত আন্দাজ করিতে পারিবেন।

রোশেনারা বলেন, "য়ুরোপের ঐ তানের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া ভারতীয় সঙ্গীত শ্রবণোপযোগী করিতে গিয়া আমাকে ব বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইংরাজ শ্রোতা কিছুতেই ভারতীয় গান শুনিতে রাজি না—সে গানে যে কি মাধুর্য্য তাও তাঁ বুঝিতে পারেন না। একবার আমি এক ভারতীয় টুলিকে বিলাতে আনিয়াছিলা সে কিন্তু ইংরাজী ব্যাণ্ডের সঙ্গে কোনমতে বাজনা বাজাইতে চাহিল না; আর ব্যাণ্ডের লোকেরাও বলিল, 'এ বাজনদার গানের কিছুই জানে না, বুঝে না!' কাজেই আমি বাধ্য হইয়া মতলব ধরিলা

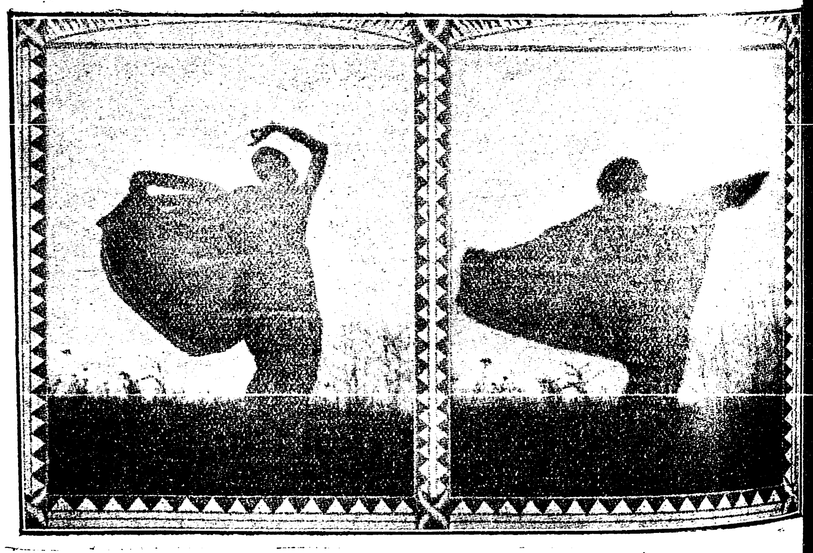

"স্বর্ণ-শস্য-নৃত্য"



প্রেতাত্মা-বেষ্টিত ডাঃ হস্‌ম্যান

বিলাতী গায়কদের দ্বারা ঐক্যতানের উপযোগী করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতেই আমি সুরসংযোগ করাইলাম।

ভারতীয় নৃত্যকলা আমি অত্যন্ত পছন্দ করি—বাস্তবিকই তাহা অপূর্ব্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের নানাপ্রকার নৃত্যের অধিকাংশই অযত্ন-অনাদরে হয় একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নয় যায়-যায় হইয়া আছে।"

ভারতবাসী হইয়াও ভারতীয় নৃত্য বলিতে আমরা বাঈজীদের জঘন্য নাচ বা থিয়েটা সখীদের না-ফিরিঙ্গি না-দেশীয় নগণ্য ছাড়া আর-কিছু বুঝি না। কিন্তু এ ইংরাজ-মহিলা যে আমাদেরই অনাদৃত কলাকে স্বদেশে পরিচিত ও সমাদৃত তাহার অবনতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করি ছেন, ইহা দেখিয়াও কি আমাদের লজ্জায় হেঁট হইয়া যাইবে না?

মরণের পরপারে

"মৃত্যুই চিরনিদ্রা" নহে—এ-যুগের পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা বিধি-প্রকারে তাহা প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন। দেহ-নাশের সঙ্গে-সঙ্গেই যে সব শেষ হয় না, এ কথা অনেক দিনের পুরানো কথা। মৃত্যুর পর অস্তিত্বের বিশ্বাস চিরকালই সব দেশে আছে, অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই তাহা অন্ধবিশ্বাসের মত; কিন্তু আজকাল আধুনিক জ্ঞানের সীমাকে অস্বীকার করিয়া নহে, স্বীকার করিয়াই এই মতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। এই কাজে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় নামজাদা পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রাণপণে লাগিয়াছেন। সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটির সভ্যগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরলোকের রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন—তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের প্রকাশিত বিবরণী পড়িলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। সহজে বিশ্বাস হয় না কিন্তু এমন সব নামজাদা লোক এই সব আশ্চর্য্য ঘটনার সাক্ষী যে তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসও করা যায় না। এমন সব ঘটনা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে মরণের পরপা দেহমুক্ত আত্মার একটা সজীব অস্তিত্ব থাকে এমন-কি অনেক সময়ে তাঁহারা পৃথিবীর বান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করি আসেন। প্রফেসর সার উইলিয়ম ক্রুক্স্ Kt O. M , F,R.S., D. Sc , সার অলিভা লজ Kt., F. R. S. D, Sc., এ, আ ওয়ালেশ, সার জেমস পাগেট, সার ডু এফ, ব্যারেট, সি, এফ, ভারলে প্রভৃতি অনেক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মৃত্যুকে এখন নবজীবনের সোপান বলিয়া মনে করেন

আমরা এখানে পণ্ডিতদের তর্কবিতর্ক না তুলিয়া একখানি ফটোর প্রতিলিপি দিলাম এ-খানি ডাঃ থিয়োডোর হস্‌ম্যানের ছবি এই আশ্চর্য্য ফটোখানি তুলিবার পরে দেখা গেল, হস্‌ম্যানের মূর্ত্তির উপরে চারিপাশে কবি দান্তে, রাজনৈতিক গ্ল্যাডষ্টোন, প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট, প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে প্রভৃতির সঙ্গে হস্‌ম্যানের তিনজন মৃত আত্মীয়ের ছায়ামূর্ত্তির মুখ রহিয়াছে!

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

বিনা নাবিকে জাহাজ-চালনা

বিনা তারে সংবাদ-প্রেরণের কথা এখন নূতন নহে। সম্প্রতি তার চেয়ে আশ্চর্য্য র সম্ভব হইয়াছে—বিনা নাবিকে জাহাজ নানো যায় তাহাও দেখিতেছি।

জাহাজে জনপ্রাণী নাই—অথচ অতি ার সহিত উহা পর্ব্বতসঙ্কুল সমুদ্র-মধ্য আঁকিয়া-বাঁকিয়া নিরাপদে ছুটিয়া াছে; তীরদেশে উপবিষ্ট প্রভুর দি-সঙ্কেতে জাহাজে হাজার তড়িতের জ্বলিয়া উঠিতেছে—শক্তিশালী ইঞ্জিন উঠিতেছে; এমন-কি রাত্রির জমাট ারের ভিতরেও এই অপূর্ব্ব পোতখানি নিয়মিতভাবে তীরবেগে অগ্রসর হইতে । জগতে বিজ্ঞানের নূতন শক্তির ই ঘোষণা।

সমুদ্র-উপকূলে পর্ব্বতোপরি ৩৬০ ফিট দুইটি স্তম্ভ স্থাপিত। সেই স্তম্ভের রে একটি মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া আবিষ্কারক হেমণ্ড Radio-Dynamics এর শক্তিতে া তারে সমুদ্রে জাহাজ চালাইয়া থাকেন। শেফিল্ডের বিদ্যালয়ে হেমণ্ড ১৯১০ াব্দে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। একদিন নি গণিতের কোন অধ্যাপকের সহিত া বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। ক্রমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা লে হেমণ্ড সহসা বলিয়া উঠিলেন—দিন আমি কোনো চলন্ত জিনিষকে দূর তে আমার নিজের ইচ্ছায় চালিত করিব।" হেমণ্ড যথার্থ অন্তর হইতেই কথাগুলি লিয়াছিলেন। কারণ আপন বাক্যের সত্যতা তিনি কতদূর প্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহা বুঝা যাইবে।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে হেমণ্ড স্থির করিলেন, তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই জীবন কাল অতিবাহিত করিবেন।

তিনি অধ্যবসায়ের সহিত Gloucester-এ —Radio Dynamics লইয়া নানারূপ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত কতকগুলি বিচিত্র আবিষ্কারের তথ্য লোকমুখে শুনা যাইতে লাগিল। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের ময়দানে একটী স্তম্ভের উপর আলোক-রশ্মি ফেলিয়া অনেক আশ্চর্য্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইত। আলোকরশ্মি-পাতে কখনও স্তম্ভের উপরে আপনা-আপনি একটী বাঁশী বাজিয়া উঠিত, কখনও "ডিনামাইট" বিস্ফোরিত হইত, এবং কখনও-বা স্তম্ভের বাতিগুলির লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি বর্ণ-পরিবর্ত্তন ঘটিত।

স্তম্ভটীর সহিত হেমণ্ডের তার বা অন্য কোনপ্রকারের সংযোগ ছিল না। স্তম্ভে একটী ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক যন্ত্র সংযুক্ত থাকিত, আলোক-রশ্মিপাতে তাহাই শক্তিসম্পন্ন হইয়া, —বিজ্ঞানের সহজ নিয়মেই এই সকল আশ্চর্য্য কার্য্যসাধন করিত।

প্রফেসার জেকব লোয়েবের একটী 'থিওরি' এই যে, পতঙ্গ-দেহে কোনো রাসায়নিক পদার্থ আছে বলিয়াই উহারা আকৃষ্ট হইয়া আলোয় উড়িয়া পড়ে। এই 'থিওরি'টি অবলম্বন করিয়া হেমণ্ড

আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রথম-প্রথম উপকূল হইতে সমুদ্র-বক্ষে জাহাজে আলোক ফেলিয়া উহাকে চালিত করিতেন। জাহাজে কতকগুলি Solenium cell থাকিত। আলোক-রশ্মিপাতে Solenim শক্তিসম্পন্ন হওয়াতে জাহাজের সমস্ত যন্ত্রগুলি আপনা-আপনি সচল হইত। কিন্তু কেবল এই উপায়ে দূর হইতে জাহাজ পরিচালনা-কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া হেমণ্ড এক নূতন প্রণালীতে, অর্থাৎ বিনা-তারে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তৎসাহায্যে ইচ্ছানুরূপ জাহাজ চালাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

আপনার নব আবিষ্কারের প্রথম ফল-পরীক্ষার দিনে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে তিনি স্বভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বিজ্ঞানাগারের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠের ছাদ হইতে একটি Wireless transmitter যন্ত্র লম্বিত ছিল; নিম্নে একটী টেবিলের উপর জাহাজ-চালন-যন্ত্রের মত একটী যন্ত্র রক্ষিত এবং দুইটী চুম্বক-যন্ত্রের মধ্যে জাহাজের হাইলটী ঝুলানো ছিল। হেমণ্ড একটী চাবি টিপিয়া উপরের যন্ত্র হইতে এই চুম্বক-যন্ত্রদ্বয়কে শক্তিসম্পন্ন করিলেন। তাহার ফলে হাইলটী তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণে ও বামে সরিয়া আসিতে লাগিল।

হেমণ্ড তাঁহার অভিনব আবিষ্কারের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন যে, আপনার ক্ষুদ্র বিজ্ঞানাগারের সহিত পৃথিবীর প্রশস্ততর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের আকাশ-পাতাল প্রভেদ! প্রতিদিন নূতন নূতন বাধা-বিপত্তি তাঁহার পরীক্ষা তাই বহুকাল সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকর হইতে পারে

অনেক বিফলতা, অনেক পরীক্ষা অবশেষে হেমণ্ডের একান্ত সাধ "Rabio" নির্ম্মিত হইয়া সাগরজলে হইল। এই জাহাজ ৪০ ফিট দীর্ঘ অশ্বশক্তি-সমন্বিত এবং ঘণ্টায় ৩০ বেগবান।

"Rabio" এবং এই অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এই

"কিছুদিন হইল, এক রাত্রিতে পর্ব্বতের মঞ্চোপরি উপবিষ্ট "Ra পরিচালক-মহাশয়ের পার্শ্বচর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ইনি বহু একখানি জাহাজকে এখানে অন্ধকার রাত্রে আট মাইল ব্যাপী বাঁকা শৈল-সঙ্কুল দুর্গম সাগর-পথে চা তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আবার বন্দরে ফি আনেন।

"এই জাহাজ নিজের এঞ্জিনের চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু বহুদূরের হইতে পরিচালক ইহার গতি ও নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহার সাহায্য জলযানটী একটুও নড়িতে চড়িতে পারে

"পরিচালকের কানে একটী দূর যন্ত্র (Telephone) লাগানো থাকে। সাহায্যে তিনি বিনা-তার-যন্ত্রের বায় শুনিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পা

"পরিচালক-মহাশয় একটী চাবি ধরিবামাত্র এক অলৌকিক ঘটনা লাগিল। একটী আলোক-স্ফুরণ ও

হি' শব্দ ভিন্ন আমি আর কিছুই বা শুনিতে পাইলাম না; অথচ, প্রভাবে নীচে, অনেক তফাতে উৎপাদন-গৃহে এক তুমুল শক্তির হইয়াছে এবং সেই শক্তিতে জাহাজটী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাহাজটী এতক্ষণ নীচে যাত্রার প্রস্তুত হইয়া চালকের আদেশ-য় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। দের একটী বৃহৎ "সার্চ্চলাইট" হইতে ক-রশ্মি পড়িয়া বাষ্পাচ্ছাদিত টীকে তুষার-ধবল দেখাইতে ছিল। যুদ্ধ জাহাজেও আজ পর্য্যন্ত এত ও প্রখর আলোক দেখিতে পাওয়া না। সমুদ্রের সাত মাইল দূর ইহা ১৮৬,০০০,০০০ মোমবাতির বিচ্ছুরিত করিয়া থাকে।

হইতে পরিচালক অতি সহজেই "সার্চ্চলাইট"টীকে ইচ্ছামত উপরে-নীচে ণে-বামে ঘুরাইতে পারেন। কিছু একটী গৃহে বাতিটী রক্ষিত। এই প্রস্তুত আলোক নিকটে থাকিলে পরিচালককে অন্ধ করিয়া দেয়, ভয়ে বাতি-গৃহটী দূরে অবস্থিত; পরিচালক একরূপ অন্ধকারে ই (একটী ক্ষীণ আলোকমাত্র মঞ্চের জ্বলিয়া থাকে) আপনার কাজ রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারই তার উপর জাহাজটীর নির্ব্বিঘ্নতা নির্ভর করে। "সার্চ্চলাইটে" তিনি -বক্ষের অনেকদূর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে —তাই অতি সামান্য বাধা-বিপত্তিও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না।

"বন্দর ছাড়িয়া জাহাজখানি এইবার খোলা সমুদ্রে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ "সার্চ্চলাইট"টী একপাশে খানিকটা ঘুরাইয়া পরিচালক বলিলেন, "এই দেখুন, আর একটু হলেই, জাহাজটি ঐ বোট্‌খানার উপর গিয়ে পড়েছিল! কি, দেখতে পাচ্ছেন না?—ওই—ওই যে একখানা প্রকাণ্ড বোট্! কোনো আলো নেই—কিছু নেই—ওরা এই রকমেই চলাফেরা করে থাকে, অনেক সময় তাই বড় উৎপাতেই—যাক্। আমি আমার জাহাজখানাকেই সরিয়ে নিচ্ছি।" বলিয়া তিনি একটী চাবি টিপিয়া ধরিলেন—দেখিতে দেখিতে জাহাজখানা বাঁ-দিকে ঘুরিয়া গেল।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমাদের জাহাজখানা এখন কতদূর গেছে?'

'প্রায় ৩ মাইল।—এই দেখুন, বোট-খানাকে ডান দিকে ২০০ গজ তফাৎ রেখে আমাদের জাহাজখানা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।'

"মধ্যে মধ্যে পরিচালক-মহাশয় একটী নক্সায় (chart) উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি লিখিয়া লইতেছিলেন।

"সার্চ্চলাইটটী এবার তিনি বাঁ-দিকে ঘুরাইয়া বলিলেন—'মাল-জাহাজটার মৎলব কি?—আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে নাকি? ওর সঙ্গে আবার দু-পাশে দশ-বারো-খানা মাল-বোঝাই নৌকা বাঁধা আছে দেখছি! আমাদের জাহাজখানাকে ৩০০ গজ ডানদিকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।—ব্যস্, ঠিক চলেছে!'

"এখন জাহাজখানা কতদূরে ?"

'পাঁচ মাইলের কম হবে না।—আপনি জাহাজখানা খানিক চালাতে চান ?'

'আমি ?'

'হাঁ—কেন ?—এই নিন্! ডানদিকে আরো সরাতে চান ?—তা বেশ!—এই ভাবে চাবিটা টিপে দিন্।—আস্তে।—

হয়েছে! এখন বসে বসে দেখুন দেখি, আপনার ইচ্ছামত যাচ্ছে কি না ?'

"চাহিয়া দেখিলাম—কি আ কেবল আমার অঙ্গুলি-স্পর্শে, পাঁচ দূরবর্ত্তী ৬।৭ টন ওজনের একখানা জা জানি না, কোন্ দৈবশক্তিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছানুরূপ পথেই ভাসিয়া চলিয়াছে!"

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধু

"তালপাতার সেপাই"

(ফরাসী গল্প)

আমার বাড়িতে সেদিন ছোটোখাটো একটা সান্ধ্যসম্মিলন ছিল। অতিথিদের মধ্যে আমার বন্ধু শ্রীমতী ভবেয়ার ও তাঁর জাঠতুতো ভাই রেনি—এঁরা দুইজনেই উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ঘরের এককোণ হইতে শুনিলাম, রেনি বলিতেছে—"আমার বিশ্বাস, এ দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে বুক-ফুলিয়ে বলতে পারে যে জীবনে কখনো কারুর প্রতি অন্যায় বা নির্ম্মম ব্যবহার করিনি।"

আমি শ্রীমতী ভবেয়ারের কাছেই বসিয়াছিলাম। দেখিলাম, একটা চম্‌কানি তাঁর সমস্ত দেহের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল, কেমন-একটা বিবর্ণতা তাঁর সেই সুন্দর দেহশ্রীর উপর ছড়াইয়া পড়িল এবং সেই উজ্জ্বল চোখ দুটির উপর একটা দুঃখের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মনে হইল, যেন একটা মর্ম্মান্তিক করুণ স্মৃতিকে মুছিয়া লইবার জন্যই তাঁর হাত একবার কপালের উপর বুলাইয়া লই —এবং যে কয়েকটি অকাল-পক্ক চূর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তুলিয়া দিলেন। তারপর, হঠাৎ এ অনুশোচনার উত্তেজনায় বলিয়া উঠিলেন "সত্যি! কথাটা খুবই সত্যি! হয় বিশ্বাস করবেন না—আমাকে এখন যে দেখচেন এমন আমি চিরদিন ছিলুম না একটা কঠোর অভিজ্ঞতায় আমি এই শি লাভ করেছি যে আগাগোড়া তলিয়ে দেখে কারো সম্বন্ধে কোনো-একটা ধা করা ভয়ানক অন্যায়। উঃ, আমি নিষ্ঠুরতাই করেচি।"

বলিয়া তিনি করুণ কণ্ঠে এই গ আরম্ভ করিলেন—"আমরা সমুদ্রতী বেড়াতে গিয়েছিলুম—ফ্রাঙ্কো প্রুসি যুদ্ধ তখন পাঁচ বছর হল শেষ হয়েছে

মি, মা ও রেনি—এই তিন জনে রা এক হোটেলে ছিলুম। তখন আমার য়স অল্প—রূপের গর্ব্ব প্রচণ্ড। আমি শা করতুম—আশা কি, দাবীই করতুম আমার আশ-পাশের সকলে দিবারাত্র আমার রূপের বন্দনা করুক—আমার পায়ে দের মুগ্ধ হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি ঢেলে দিক।

হোটেলের মধ্যে বড়-কাউকে আমি গ্রাহ্যে নানতুম না, কিন্তু একটি লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বয়স তার ত্রিশের াছাকাছি—সুশ্রী, সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। খে-চোখে একটা উদ্দাম উৎসাহ, একটা তেজ,—কিন্তু কেমন-একটি দারুণ দুঃখে যেন রমাই অভিভূত। সৈনিকপুরুষের মতো ার ধরণটা। তার এক চাকর প্রতিদিন ার খাবার বয়ে নিয়ে যেত—খাবার-ঘরে ে কখনো আসত না। একলা আপন-নে নির্জ্জনে সে ঘুরে বেড়াতো—কারুর ঙ্গে সে আলাপ করত না, তার দিকেও কেউ ঘেঁসত না। দেখতুম, সেনাধ্যক্ষেরা যেমন লম্বা কালো কোট পরে—তেমনি একটা জামা দিনরাত গায়ে ঝুলচে।

আমার ভারি অদ্ভুত লাগতো—একটা কৌতূহল ক্রমেই আমার মনে জমে উঠতে লাগলো। আমি একদিন ফন্দি করে তার সামনে গিয়ে পড়লুম; যা-হোক-একটা অছিলা করে কথা পাড়লুম—উত্তর পেলুম বটে কিন্তু তা তাচ্ছিল্যতায় পরিপূর্ণ—শুধু "হাঁ।" আর "না!" কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই দেখলুম তার সেই গম্ভীর বিষাদমাখা মুখখানি এক একবার আনন্দের স্ফুলিঙ্গে যেন জ্বলে-জ্বলে উঠতে লাগল।

আমি অন্যমনস্কতার অভিনয় করে হাতের দস্তানাটা মাটিতে ফেলে দিলুম। কী ছেলেমানুষি আমার! তার মুখে একটা ব্যস্ততা, একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু আমার দস্তানা না তুলে দিয়েই সে চলে গেল।

সেই দিন থেকে আমার সঙ্গে ভদ্রতা করে দূরে থাকুক—আমাকে দেখলেই সে যেন ভয়ে পালিয়ে যেত—আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। রেনি এই নিয়ে খুব একচোট হাসিঠাট্টা করে নিলে। সে তার নাম দিলে—"তালপাতার সেপাই"। তার এই হাসিতে আমিও যোগ দিলুম বটে কিন্তু সত্যি বলতে কি, সেপাইয়ের সেই রূঢ় অনাদরে আমার আত্মঅভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে কেঁদে উঠছিল।

দুটি ঘটনায় আমার এই আহত অভিমান শেষে দারুণ ঘৃণায় পরিণত হয়ে পড়ল। একদিন সকালে আমি সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরচি পথে জনমানব নেই, কেবল এক রোগশীর্ণ বুড়ী মোট-মাথায় ধীরে ধীরে আসছিল। এমন সময় দেখি "সেপাই" একটা ঝোপে-ঢাকা ব্যাঁকের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। জানিনা কি কারণে—সেপাইকে আচমকা দেখেই হোক, কিম্বা মোটের ভারেই হোক, বুড়ীটা মোট-সুদ্ধ ধপ করে পড়ে গেল। বেচারা মাটিতে পড়ে কাতর ভাবে এ-দিক ওদিক চাইতে লাগল। আমি তাকে তুলতে ছুটে গেলুম এবং তার মোটটাও উঠিয়ে দিলুম কিন্তু "সেপাই" একেবারে অচল—সে এতটুকু সাহায্যও করলে না।

আমি রাগ দেখিয়ে তার দিকে কটমট করে চাইলুম, বল্লুম—"এমন অভদ্র তো আমি কোথাও দেখিনি—মানুষের চামড়া যার গায়ে আছে সে যে এমন ব্যবহার করতে পারে জানতুম না। আমার কাছে পয়সা নেই—কী আপশোষ! মশায় কি দয়া করে এই বুড়ীকে কিছু দান করবেন?"

সে কেমন ইতস্তত করতে লাগল। একটা তীব্র বেদনার ছায়া তার চোখের উপর ঘনীভূত হয়ে এল। মনে হল সে যেন কি বলতে চাচ্ছে—বোধ হয় তার এই অভদ্র ব্যবহারের অর্থ কি তাই, কিম্বা ক্ষমা-প্রার্থনা। কিন্তু দেখলুম বলবার চেষ্টাটুকুই তার পক্ষে মর্ম্মান্তিক। তার ঠোঁট একবার কাঁপলো—কিন্তু কোনো বোধগম্য কথা বার হল না। তার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল, তার সেই একঘেয়ে অবিচ্ছিন্ন নীরবতা আবার ফিরে এল। সে আমার দিকে আর না চেয়ে, আমার কথা উপেক্ষা করে চলে গেল।

জীবনে এই প্রথম, আমি-হেন যে সুন্দরী সেও অনুরোধের অবহেলা পেলে—সে যে কী মর্ম্মান্তিক বলতে পারি না! রাগে ক্ষোভে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলছিল। হোটেলে ফিরে এসে রেনিকে সব বল্লুম—সেও চটে আগুন। সে বল্লে, একবার দেখা হোক না সেপাইয়ের সঙ্গে, ভালো করে বোঝা-পড়া করে নেব। তার এই রাগের আগুনে, আমার সেই তখনকার ছেলেমানুষীর উৎসাহে, খুব কসে ইন্ধন দিতে লাগলুম।

সপ্তাহখানেক আর তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। আমি বল্লুম, "তালপাতার সেপাই" ভয় খেয়েছে, তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। রেনিও এই কথায় সায় দিলে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জেটির উপর বেড়াতে গেছি—তখন ঝড় উঠেছে—পায়ের তলায় সমুদ্র কেবলই দুলে-দুলে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে। হঠাৎ নীচে থেকে একটা আর্ত্তনাদ উঠল। আমরা কিনারার দিকে ছুটে গেলুম—দেখি সেপাই দাঁড়িয়ে—তার সমস্ত মুখখানা একটা দারুণ ভয় ও উৎকণ্ঠায় কম্পিত হয়ে উঠেছে—সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল—"দেখ দেখ একটা লোক জলে ডুবলো!"

আমি অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। আমার ভাব বুঝে রেনি আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে গিয়ে বল্লে—"মশাই কি মজা দেখছেন—একটা লোক ডুবছে!—মেয়ে মানুষের মতো চীৎকার করা ছাড়া কি আর কিছু করবার নেই!"

এই বলে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। দুজন নাবিক ছুটে এসে তার হাত ধরলে, তৃতীয় নাবিক জলে নেবে গেল।

"ঐ যে! ঐ যে জলে ভাসছে!—ঐ উঠিয়েছে।" বলে সেপাই সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটাকে উদ্ধার করে নাবিকেরা নিয়ে এল, আমাদের সামনে দিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে চলে গেল। আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

তার পর, লোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে ভেঙে গেল—শেষে কেবল আমরা দুজনে ও সেপাই সেইখানে রইলুম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, তার সেই উন্নত সুদৃঢ় চেহারার সঙ্গে, তার সেই মুখের উপরকার তেজস্বিতার সঙ্গে, তার এই শিশুর মতো অসহায়তার ভাবটা কী বেমানান!

রাগে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলুম। আমার কাছ থেকে ইসারা পেয়ে রেনি সেপাইয়ের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে উঠল—"কাপুরুষ কোথাকার!"

তার একটি কোমল কাতর দৃষ্টি আমার মুখের উপর এসে পড়ল—হঠাৎ মনে হল, আমার প্রতি তার হৃদয়ের একটি প্রীতি যেন সঞ্চিত আছে, কিন্তু আমাকে সে সহ্য করতে পারচে না। রেনির এই অবজ্ঞার অপমানে তার চোখের পাতাগুলি কাঁপতে-কাঁপতে একেবারে নুয়ে পড়ল—এবং একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা তার সমস্ত মুখখানিকে আঁধার করে ফেল্লে। তার ঠোঁট দুখানি একেবারে নীল হয়ে গেল। সে একটি কথাও কইলে না।

তার এই অসহ্য নীরবতায় আমার মেজাজ আরো রুখে উঠলো! রাগে, ঘৃণায়, কৌতূহলে—এবং তার পক্ষে অশোভন এই কাপুরুষতার প্রতি কেমন-একটু অবিশ্বাসে—আমি যেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম। আমার শেষ-আঘাত আমি তাকে ছুঁড়ে মারলুম, বল্লুম—"রেনি, তুমি যদি ওকে ওকথা চড় কসিয়ে দাও তাহলেও ওর এমন সাহস হবে না যে সেই অপমানের তাড়নায় তোমার উপর হাতটুকু পর্য্যন্ত তুলবে! এমন পৌরুষ ওর নেই!"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমি বুঝতে পারলুম, তার আঘাত কী সাঙ্ঘাতিক, কী ভয়ঙ্কর! তার বিবর্ণ মুখের প্রত্যেক শিরাটি কুঞ্চিত হয়ে গেল—মনে হল, একটা ভয়ঙ্কর মানসিক বিপ্লব তাকে চেপে ধরেছে। রুদ্ধ-কণ্ঠে—তার এই কণ্ঠস্বর আমি ইহজীবনে কখনো ভুলতে পারবো না—হতাশায় রুদ্ধ, কাতরতায় ভগ্ন সেই কণ্ঠস্বরে—সে আমার দিকে চেয়ে—গুমরে বলে উঠল—"আমি কাপুরুষ নই কিন্তু দেবী, তুমি বড় নিষ্ঠুর! তোমার এই কঠিন নিষ্ঠুরতায় আমার হৃদয়ের একটি গোপন ব্যথাকে আজ খুলে ধরতে হল। সে কোনো সত্যিকার ঘৃণ্য লজ্জার কথা নয়, কিন্তু আমার দেহের শক্তি নিয়ে যে আমার চিরদিনের গর্ব্ব—তাই সে আমার লজ্জার কথা! তাই আমি সেই লজ্জা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। আমার দুঃখের কথা বলে আমি যে লোকের কৃপাপাত্র হব—বিশেষত তোমার—সে আমার পক্ষে নিদারুণ! তাই আমার এই গোপন কথাটি আমি মর্ম্মের মাঝখানে বহন করি। কিন্তু কী নিষ্ঠুর তুমি! আমার সেই প্রাণের বেদনা গোপন রাখতে দিলে না—আমার মর্ম্মস্থল ছিন্ন করে তাকে বার করে আনলে তবে ছাড়লে!"—বলে সে বলতে লাগলো—"তবে শোনো আমার গোপন কথা:—ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে আমি গোলন্দাজ ছিলুম। একটা পুল তোপ দিয়ে ভেঙে

দেবার সময় শত্রুদের এক গোলায় আমার দুটো হাতই উড়ে যায়। আমি কাপুরুষ নই!—হাত তুলে সে কথা তোমার সামনে প্রমাণ করবার উপায়ও ভগবান রাখেন নি।"

অনুশোচনার একটা তীব্র শিহরণ আমার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল। আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সামলে উঠে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইবার আগেই দেখি সে চলে গেছে।"

শ্রীমতী ভবেশের কথা শেষ করিয়া একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, মনে হইল যেন সেই অতীতের মধ্যেই তিনি তখনো ঘুরপাক খাইতেছেন।

আমি বলিয়া উঠিলাম—"বাস্তবিকই—অনুতাপের কথা। তার সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হয় নি?"

—"না!" বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সমালোচনা

পূজা ও সমাজ। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ, হেডমাষ্টার, হাই স্কুল, ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম। শিলচর, এরিয়েন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা, কাপড়ে বাঁধা দেড় টাকা মাত্র। লেখক "নিবেদনে" বলিয়াছেন, "এই গ্রন্থে শারদীয় দুর্গাপূজার স্থূলতাৎপর্য্য সহকৃত আমাদের জাতীয় চরিত্র ও সমাজ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।" পূজার ব্যাখ্যায় কিন্তু তিনি যথেষ্ট মৌলিকতা ও উদার চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন—সে ব্যাখ্যায় গোঁড়ামির নাম-গন্ধ নাই। পূজার সহিত সমাজের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। বঙ্গের দুর্গাপূজা, লেখকের মতে, শক্তিপূজা; ইহা সার্ব্বজনীন উৎসব। হিন্দু আচার্য্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির মতের সহিত শাস্ত্রাদি মিলাইয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন "ব্রহ্ম আর ভগবতী দুর্গা এক বস্তু।" তিনি আরও বলেন, "ভক্ত আরাধ্য দেবতাতে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার জন করিয়া লইতে ভালবাসেন। ঈশ্বরকে যিশু পিতা, মহম্মদ প্রভু, অর্জ্জুন সখা, যশোদা পুত্র, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ মা বলিয়া জানিতেন ও ডাকিতেন। ভগবতী দুর্গা বিশ্বজননী আমাদের সকলেরই জননী। দুর্গা পূজা মহাশক্তির পূজা, বিশ্বমাতার পূজা। *** দুর্গোৎসবে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই চারি দেবতার মূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে; বলদেবতা কার্ত্তিক, জ্ঞানদেবতা গণেশ, ধনদেবতা লক্ষ্মী এবং হৃদয়োৎকর্ষবিধায়িনী কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, এই শক্তিচতুষ্টয়ের উপাসনা বিহিত হইয়াছে।" কারণ সমাজ-শক্তির বৃদ্ধিতেই সুখসমৃদ্ধি এবং উন্নতি। সকল সভ্য সমাজেই দেখা যায়, এই চারিটি শক্তির বিকাশেই উন্নতি—দেহশক্তি, জ্ঞানশক্তি, হৃদয়শক্তি এবং ধনশক্তি। "সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এই চারিটি শক্তির সমবায়েই ঘটিয়া থাকে। সমাজ সম্বন্ধে এই মূলতত্ত্ব দুর্গোৎসবে দেখিতে পাওয়া যায়।" তাহার পর লেখক ঐ শক্তিচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া 'ভাষা', 'স্ত্রীশিক্ষা,' স্বাস্থ্যতত্ত্ব কলাবিদ্যা, চরিত্রবল প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদক্ষ আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মত আগাগোড়া নিরপেক্ষ, উদার এবং তাহাতে চিন্তাশীলতাও যথেষ্ট। 'স্ত্রীশিক্ষা' নিবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন। বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকদল, বোধোদয়ের

বিদ্যাবতী, পত্রলিখনে কথঞ্চিৎ অভ্যস্তা যুবতী সংসর্গে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন কি? *** লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকই রমণী; ইঁহাদিগকে ফেলিয়া পুরুষগণের আলোক-ভোগের আশা বিড়ম্বনামাত্র। * * অশিক্ষিতা জননী শিশুকে কি শিক্ষা দিতে পারেন?" "গুণের পূজা", "চাটুতা", "চতুরি", "ভীরুতা ও সাহস", "সংস্কার", "শিক্ষা", "আত্মসংস্কার" প্রভৃতি সকল সন্দর্ভগুলিতেই লেখক স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেমন, সুদৃঢ়, স্পষ্ট, তেমনই সতেজ ও নির্ভীক। এমন সুলিখিত সন্দর্ভ-পুস্তক বহুদিন আমাদের চোখে পড়ে নাই। গ্রন্থ প্রতি বিদ্যালয়ে পাঠ্যস্বরূপ নির্ব্বাচিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। এ গ্রন্থ ছাত্রগণের মনুষ্যত্ব-বিকাশে সহচর হইবে, আদর্শের পথ-নির্দ্ধারণে সহায়তা করিবে।

আদর্শ জননী। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি জীবন-চরিত নহে; শিশুসন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চরিত্র-গঠন-ব্যাপারে আদর্শ জননীর কর্ত্তব্য কি, তাহাই এ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সন্তান-জনন এবং শরীর-পালন-বিষয়ক বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রমতের সহিত সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমন্বয়ও লেখক সুনিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। চরিত্র-গঠন ও সন্তানের মানসিক উন্নতির আলোচনাতেও উদার যুক্তি এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্যর শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, মাতার হাতেই সন্তানের জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভাবী উন্নতি ও সেই সঙ্গে দেশেরও ভবিষ্যৎ ন্যস্ত। সকল প্রকার নীচতা ও হীনতা বর্জ্জন করিয়া সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে, উদার সত্যের পথে সন্তানকে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ করাইতে হইবে, নহিলে সন্তানের ভবিষ্যৎ মাটি হইয়া যাইবে। মাতৃত্বের সেই উচ্চ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রবীণ গ্রন্থকার এ গ্রন্থে মাতার কর্ত্তব্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বাঙলার গৃহে গৃহে পঠিত হৌক্।

ক-কারের অহঙ্কার। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ কর্ত্তৃক প্রকটিত। কলিকাতা, বঙ্গবাসী কলেজ বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত। কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। নিষ্ক্রয় এক শিকি ও এক আনা। মুখবন্ধে গ্রন্থকার একটু "কৈফিয়ত" কাটিয়াছেন, "ককারের অহঙ্কার প্রকৃতপক্ষে 'অনুপ্রাস' নামক পুস্তকের ক্রোড়পত্র বা জের। ** ভাষা-তত্ত্বের কোন প্রশ্নের আলোচনা ইহার বিষয়ীভূত নহে। * বিষয়টি নির্দ্দোষ আমোদ প্রদান করিবার জন্য কল্পিত।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বইখানি পড়িতে বেশ মজা লাগে—কথার ফাঁকে ফাঁকে একটা হাসির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। লেখক গোড়া হইতেই এমনই তীব্র কৌতূহলের সঞ্চার করিয়াছেন যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ করিতে হইবে। কোথাও গবেষণার প্রয়াস নাই, বিষয়টি যেমন লঘু, তেমনই স্বচ্ছ, সরল ইহার বর্ণনাভঙ্গী। বিশ্রাম-ক্ষণটুকুকে আনন্দ-মুখর করিবার পক্ষে পুস্তিকাখানি উপাদেয় হইয়াছে।

ভালবাসা। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহিরণ্ময় বিশ্বাস, ৪৫ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। অবসর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বাধাই এক টাকা, আবাঁধা বারো আনা। এখানি উপন্যাস। লেখকের বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস লিখিবার শক্তি আছে—ভাষায় স্থানে স্থানে গ্রাম্যতাদোষ থাকিলেও তাহা স্বচ্ছ—তাহাতে প্রবাহ আছে—প্রাণ আছে। চরিত্র-সৃষ্টি করিবার শক্তিও লেখকের মন্দ নহে। তবে ইহার প্লটটিতে কয়েকটি বিষম দোষ রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ নায়ক দেবব্রতের চরিত্রে সহসা এমন তরলতা দেখা দিয়াছে, যাহার জন্য লেখক পূর্ব্বাহ্নে কোনরূপ আয়োজন করেন নাই, যাহা পাঠকের কাছে একেবারেই অদ্ভুত, বিসদৃশ; দ্বিতীয়তঃ উপনায়ক মোহিতের চরিত্রের প্রথম দিকটা থিয়েটারী ঢংয়ে ভরা—শেষে যদিও লেখক মোহিতের পরিণামটুকু

খুব সাবলাইয়া লইয়াছেন। তৃতীয়তঃ কাঞ্চনের চরিত্রে লেখক শেষ রক্ষা করিলেও তাহার কতকগুলা ব্যবহার শিক্ষিতা মহিলার পক্ষে একেবারেই অমার্জ্জনীয় —বিলাসিনী রূপ-ব্যবসায়িনীর মতই হইয়াছে! তদ্ভিন্ন ছোট-খাট অসঙ্গতি প্রচুর। আর একটি দোষ,—ভাষায় লেখক এতখানি কাব্য ঢালিয়াছেন যে, স্থানে স্থানে তাহা নিতান্তই 'গা-জুরি' এবং 'বেখাপ্পা' হইয়া উঠিয়াছে! সেজন্য চরিত্রগুলিও মাঝে মাঝে কৃত্রিমতার মুখোস করিয়া ভাণ-অভিনয় করিতেছে বলিয়া মনে হয়। লেখকের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস আছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম। আজকাল অতি অল্প লেখকের উপন্যাসেই আমরা এরূপ রচনা-শক্তির আভাষ পাই। "ভালবাসা"-র লেখক ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া লিখিলে তাঁহার নিকট হইতে কালে যে আমরা সুন্দর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পাইব, এ আশা একান্ত দুরাশা বলিয়া মনে হয় না।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক, এম, এ, বি,এল প্রণীত। কলিকাতা, সেন রায় এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস বিলডিং হইতে প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এখানি রস-রচনা—ইহাতে সর্ব্বসমেত সাতাশটি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে—তন্মধ্যে তেরোটি পদ্যে ও অপরগুলি গদ্যে। রহস্যই রচনাগুলির প্রাণ। "আমার কর্ম্মভূমি",—৺দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসিদ্ধ 'আমার জন্মভূমি'র parody (লালিকা)—'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং অচিরেই এ লালিকাটি মূল গানের মতই সাধারণ্যে সমাদর লাভ করে। 'হাসি' গদ্য নিবন্ধ —সুন্দর। লেখক এই নিবন্ধে হাসির দর্শন লিখিয়াছেন—নিবন্ধটিতে লেখক রহস্যে ও চিন্তাশীলতায় বেশ মিশ্‌ খাওয়াইয়াছেন। "গরুর গাড়ী" "পঞ্জিকা," "ঢেঁকি", "নোলক", "আরসি", "টাকা". "শঙ্খ", ও "অলঙ্কার" আমাদের ভাল লাগিয়াছে—এগুলির রহস্য উজ্জ্বল,—বিচিত্র—কোনখানে 'কাতুকুতু' দিয়া' হাসাইবার অক্ষম নির্লজ্জ চেষ্টা নাই—অথচ সেই সঙ্গে প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই চিন্তাশীলতার একটি সূক্ষ্ম সুশৃঙ্খল ধারা বহিয়া চলিয়াছে। এইরূপ রহস্যই শিক্ষিত সমাজের প্রকৃত উপভোগ্য। লালিকাগুলির মধ্যে 'সোনার বড়ি', 'আমার প্রিয়ে' ও 'দুর্ব্বুদ্ধি' রহস্যে ম্লান। "মশকবধ কাব্য" চলনসই। এ শ্রেণীর রস-রচনার দিকে বাঙ্গালা বহু লেখক ঝুঁকিয়াছেন—লালিকাও ছায়গোরা বাড়ের মত মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় নিত্য কত দেখা যাইতেছে—কিন্তু সেই সব অক্ষম লেখ রহস্য ও ভাঁড়ামির মধ্যে পার্থক্য কি, তা জানেন না। সে সকল রচনার রস্তে (?) তা খানার উপযুক্ত—ভদ্র বা শিক্ষিত সমাজ তাহা আমোল দিবে না। "রঙ্গ ও ব্যঙ্গের" রহস্য-রস শ্রেণীর নহে। এ রহস্যে ঔজ্জ্বল্য আছে, বৈচি আছে, রস আছে—কোন আবিলতা নাই। তবে এ কয়েকটি রচনাও এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, যাহা দিলে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়িত বৈ কমিত না! দুইখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভা

ধারা। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণী প্রকাশক, শ্রীঅনাথবন্ধু সেন "নিরাম", রায়শা কলিকাতা, সিদ্ধেশ্বর মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। সর্ব্বসমে ৪৯টি খণ্ড কবিতা এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে "কবিতাগুলির অধিকাংশই * * বিবিধ মাসিক-প গত পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল কবিতাগুলি নানা ভাবের, নানা রসের। ছাপা কা ভালো।

রামায়ণ। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যা বি, এ, বি, এল প্রণীত। প্রথম খণ্ড (আদি ক হইতে সুন্দর কাণ্ড)। প্রকাশক, সেন ব্রাদার্স কোং, ৮ ও ৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কুন্তল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এ 'মহর্ষি বাল্মীকির আদি কাব্যের পদ্যে মর্ম্মানুবাদ লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, অধ্যবসায়ও অসাধার ভাষা সরল, সহজ,—কোনরূপ আড়ম্বর নাই ছন্দও বিচিত্র। স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে। পড়িতে একঘেয়ে লাগে না। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁ ভালই হইয়াছে।

দেবী-পূজায় জীব বলি। শ্রীযুক্ত মহীন্দ্র নারায়ণ কবিরত্ন সঙ্কলিত। কাঞ্চরাকোলা, 'গৌরগদাধর সমিতি' হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, নগেন্দ্র-ষ্টীম প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য-সাহায্য চারি আনা। গ্রন্থকার বহুকাল ধরিয়া দেবীপূজায় জীববলির অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন সে আন্দোলনের ফলে 'কতিপয় বারোয়ারি কালীপূজা হইতে ছাগ বলি উঠিয়া গিয়াছে।' এই রক্তস্রোত নিবারণ-কল্পেই তিনি শাস্ত্রাদির মত সঙ্কলন করিয়া প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ দেশে শুধু Sentimentএর দ্বারা অন্যায় প্রথা নিবারণ করা অসম্ভব—প্রতিপক্ষ শাস্ত্রের দোহাই চাহে, সংস্কৃত শ্লোক খোঁজে। তাই লেখক শুধু হৃদয়-বৃত্তি দিয়া নহে, শাস্ত্রীয় শ্লোক দিয়াই প্রতিপক্ষের মত-খণ্ডনে চেষ্টা করিয়াছেন। "দেবীপুরাণ", "খণ্ডপুরাণ", "বৃহন্নারদীয় পুরাণ", প্রভৃতি ও "গীতা" সমস্তই এ বিষয়ে লেখকের স্বপক্ষে। গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া লেখক নিখিল জীব-জগতের উপকার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসার্হ।

জল-চল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ, 'আয়ুর্ব্বেদ শান্তিকুটীর' হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, প্রতিভা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। অস্পৃশ্য পতিত জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে লেখক তাহাদিগকে সমাজভুক্ত করিবার পক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এ দেশের প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, উক্ত জাতিবর্গকে সমাজ হইতে ঠেলিয়া ফেলিবার মূলে অধিকাংশ স্থলেই ছিল শুধু নীচ স্বার্থ বা বিদ্বেষ! শাস্ত্রাদি হইতে লেখক আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন, চরিত্র এবং বিসদৃশ আচার-ব্যবহারেই লোকের সমাজচ্যুত হওয়া উচিত, জন্ম-পরিগ্রহের উপর দিয়া নহে। দৈবাৎ ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইয়াছে বলিয়া পাপাচারী ব্যক্তি পূজার্হ থাকিবে, আর চণ্ডালের বংশে জন্মিয়া কোন ব্যক্তি যদি হৃদয়-বৃত্তিতে বড় হয়, তথাপি তাহাকে পায়ের নীচে চাপিয়া রাখো, এ ব্যবস্থায় সমাজ দুর্ব্বল হয়, টিকিতে পারে না। লেখক নির্ভীকভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার যুক্তিও নিপুণ। এ দুর্দ্দিনে তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

গোলাকার

জন্ম-পরিগ্রহের পরে খেয়ে পরে' বেড়ে ওঠা,
ঠেলাঠেলি মারামারি করে' দুটি পয়সা লোটা,
মাঝে মাঝে রোগে ভোগা এবং শেষে শিঙ্গা ফোঁকা,
সবাকার-ই ভাগ্যে ঘটে, হোক্ সে জ্ঞানী কিম্বা বোকা।
জীবন-তত্ত্বের সহজ অর্থের চল্‌ছে তবু দীর্ঘ টীকা;
গজিয়ে ওঠে কাঁটার বনে সরু মোটা প্রহেলিকা।
ঘুরে ফিরে তত্ত্ব-জাহাজ লাগে আবার ঘাটের তটে!
প্রমাণিত হচ্ছে কেবল—ধরা গোলাকার-ই বটে!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমাদের প্রশ্ন

ভারতীর সম্পাদনভার হাতে লইয়া অবধি এই কথাটা আমাদের কেবলই মনে উঠিতেছে যে যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভারতীর গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত এবং ভারতীর উপকার করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছি কি না। দুঃখের বিষয়, কোন গ্রাহকই ভালো-মন্দ, হাঁ-না—কোন কথাই বলেন না। কাজেই তাঁহাদের মনোভাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যাই। আমাদের মনের মতো করিয়া আমরা ভারতীকে সাজাইবার চেষ্টা করি কিন্তু তাহা গ্রাহকবর্গের মনস্তুষ্টি করে কি না জানিতে পারিলে আশ্বস্ত হই। তাঁহাদের চোখে যে ত্রুটি পড়ে এবং যাহা তাঁহাদের মনের-মত হয় না তাহা জানিতে পারিলে আমরা সংস্কারে চেষ্টিত হইতে পারি। এই উদ্দেশ্যে আমরা গ্রাহকবর্গের নিকটে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা এগুলির প্রতি অবহেলা না করিয়া, তাঁহাদের উত্তর পাঠাইয়া ভারতী পরিচালনে এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আমাদের সাহায্য করিবেন।

প্রশ্ন

১। ভারতীতে এখন মাসিক যত পাতা দেওয়া হয়, তার চেয়ে বেশী চান কি না?

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভালো আজ কাল বাংলা মাসিকপত্রের সংখ্যা এবং পত্রাঙ্ক যত বাড়িয়াছে, ভালো লেখকের সংখ্যা তদুপযোগী বাড়ে নাই। কাজেই আকার বৃদ্ধি করিলে বাজে মাল না চালাইয়া উপায় নাই।

২। প্রবন্ধের ভাগ বেশী চান, না গল্প, উপন্যাস, নক্সা ইত্যাদি?

৩। কোন্ শ্রেণীর প্রবন্ধ বিশেষ মুখ-রোচক—ঐতিহাসিক? প্রত্নতাত্ত্বিক? বৈজ্ঞানিক? সামাজিক? না সাহিত্য, শিল্প-কলা সম্বন্ধীয়?

৪। ছোট গল্প এবং ধারাবাহিক উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌টার পক্ষপাতী?

৫। বিদেশী ছোট গল্প এবং উপন্যাসের অনুবাদ ভালো লাগে কি না?

৬। কোন্ লেখকের ছোট গল্প এবং উপন্যাস পড়িতে বেশী উৎসুক?

৭। কোন্ কোন্ কবির কবিতা ভালো লাগে?

৮। বিদেশী ছবির প্রতিলিপি, না, ভারতীর চিত্রের প্রতিলিপি চান?

সমস্ত জিজ্ঞাস্য কথা প্রশ্নের মধ্যে বাঁধা যায় নাই, অনেক কথা নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে, সেজন্য আমাদের প্রশ্নের বাহিরের কথাও ইচ্ছা করিলে গ্রাহকবর্গ আমাদিগকে জানাইতে পারেন। আমরা তাহাতে খুসীই হইব।

সম্পাদক।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

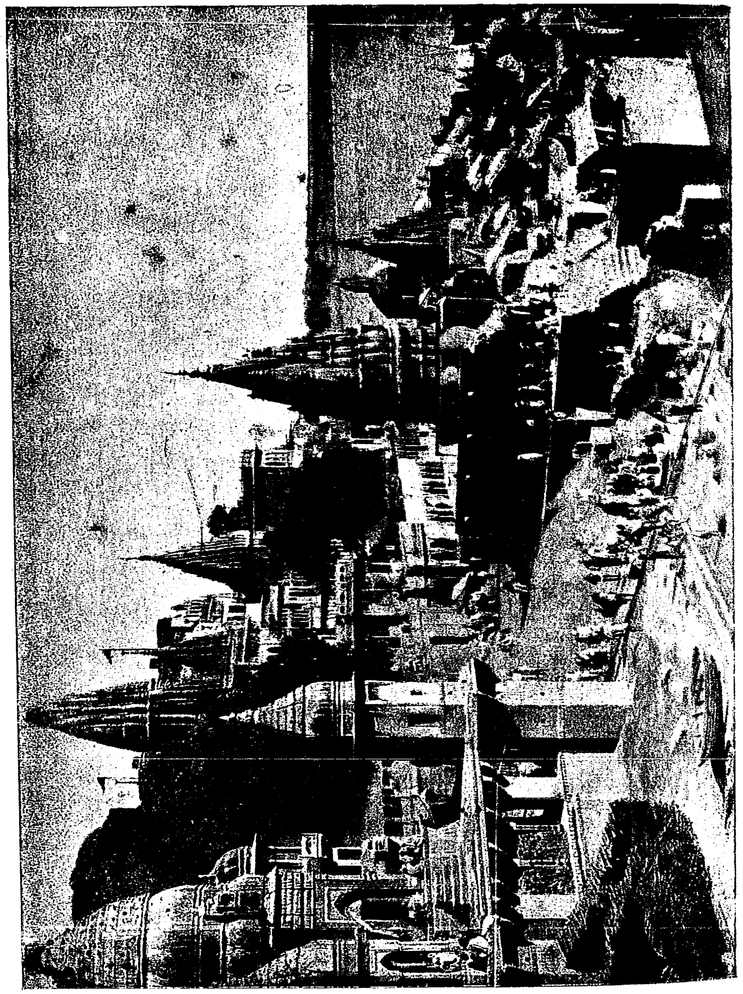

দশাশ্বমেধ ঘাট—কাশী।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২২ [১১শ সংখ্যা

স্বেচ্ছাচারী

(উপন্যাস)

৫

শিবরামপুরের দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স যদিও পঞ্চাশের উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তথাপি তাঁহার মতি-গতি এ পর্য্যন্ত বন-গমনের দিকে ঢলিয়া পড়িবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। ইহার মুখ্য গৌণ সমবায় প্রভৃতি নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে তাঁহার পুত্র মণিশঙ্কর এখনও অবধি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ নামক বৃহৎ বিচরণ-স্থানে কিছুতেই প্রবেশাধিকার পাইল না। জমিদার মহাশয়ের দেওয়ানের পুত্র বলিয়া অবশ্য কোনবারই সে নির্ব্বাচন-পরীক্ষায় "বারিত" হয় নাই, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মূর্খ পরীক্ষকগণ কেহই তাহার জ্ঞানের গভীরতা ও বিদ্যার বিস্তৃতি বা অভিব্যাপ্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না। এই সমস্ত সমবায় কারণে মণিশঙ্কর এক বার সংস্কৃত বিদ্যার গহন বনে প্রবেশের কল্পনাও করিয়াছিল। কিন্তু "সহর্ণেৰ্ঘঃ" প্রভৃতির রেফাদি-কণ্টকে প্রথমেই তাহার মনের রেশমী চাদরখানি আটকাইয়া যাওয়ায় বিরক্ত হইয়া সে-কল্পনা সে ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পিতার দুর্দ্ধর্ষ পাইক গণের অতন্দ্রিত চেষ্টাতেও যখন বিদ্যা-পথের কণ্টক দূর হইল না, তখন সে অগত্যা একটা কন্‌সার্ট ও থিয়েটার পার্টী খুলিবার সঙ্কল্প করিল।

দেওয়ান মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার পুত্র বিদ্যালয়ের সব-কয়টা ডিগ্রি আদায় করিয়া শেষে আইনের মুকুট মাথায় চড়াইয়া কালিকাবাবুর বিস্তীর্ণ এষ্টেটের পরামর্শ-দাতা বা অন্য কোন প্রকার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে। কিন্তু মণিশঙ্কর কোন প্রকারেই প্রবেশিকার সিংহ-দ্বার পার হইতে পারিল না; উপরন্তু দেওয়ানজী দেখিলেন, দুইটী অখ্যাত অজ্ঞাতনামা মনুষ্য-শিশু তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে দিব্য অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশে যুগপৎ এই যুগল ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া দুর্গাশঙ্কর পূর্ব্বাহ্ণেই সতর্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পরগণে কমবখ্‌ৎপুর ও তরফ পয়জার-ডেঙ্গার নিকাশ সারিয়া হিসাবানা ও নজরানার কয়েক শত টাকা সঙ্গে করিয়া দুর্গাশঙ্কর রাত্রি আটটার সময় গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী ইতিমধ্যে মহা উৎকণ্ঠায় কাল-যাপন করিতেছিলেন; কারণ, পুত্র মণিশঙ্কর বৈকালে মাতার নিকট তাহার কনসার্ট-পার্টীর জন্য দুইটা বাঁশীর আব্দার লইয়া বিস্তর কান্নাকাটি করিয়া গিয়াছে। এমন কি, দুই একবার তাহার মূর্চ্ছার উপক্রমও দেখা গিয়াছিল। মণিশঙ্কর না কি বাল্যকাল হইতে বুদ্ধিশক্তির প্রাচুর্য্যের জন্য ঐ রোগে ভুগিতেছিল; তাই তাহার মাতা যখন-তখন দেওয়ান মহাশয়কে উক্ত বিষয়ে সতর্ক করিয়া মণিশঙ্কর যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহাই করিতে উপদেশ দিতেন;—অবশ্য উপদেশের সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য শক্তি প্রয়োগ করিতেন কি না, সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ কেহ বলিতে পারে না। তবে দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দুর্গাশঙ্করকে কেহ সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে দেখে নাই। এমন কি, দুষ্ট লোকে এ কথাও বলে যে দেওয়ানজীর "স্বকৃত" তালুকগুলির মুনাফার টাকাও কিস্তি কিস্তি ইহারই সিন্দুকজাত হইয়া থাকে। নিস্তারিণী দেবী অনেক সময়েই স্বামী মহাশয়কে কৃপা করিয়া "স্বকৃত" বিষয়-চিন্তার ভার হইতে নিস্তার দিয়া থাকেন,—অন্ততঃ ইহাই বাজার-গুজব। কিন্তু বাজারে যাহা রটে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক নয়।

দুর্গাশঙ্কর অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওগো, কোথায় আছ?" নিস্তারিণী দেবী অবশ্য অতি নিকটেই ছিলেন, কিন্তু অন্তরের উৎকণ্ঠা পাছে মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই কক্ষ হইতেই একজন দাসীর উপর হুকুম-জারী হইল, "ওরে রাজু, জল-চৌকি আর গাড়ুটা এগিয়ে দে—বাবু এসেছেন।"

দুর্গাশঙ্কর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টাকার তোড়াটা ধপাস করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "উঃ, বেটারা কম হায়রাণ করেছে। কোন বেটার যদি বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে! শোন, ওগুলো লোহার সিন্দুকে তুলো না, আলমারিতেই রেখে দাও। কাল আমার টাকার বিশেষ দরকার।"

নিস্তারিণী দেবী আলমারি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আমারও একশ' টাকার বিশেষ দরকার। কত টাকা আছে এ তোড়ায়?"

"সাত শ' বাইশ।"

"তুমি কাল কত নেবে?"

"দরকার ত প্রায় এগার শ' টাকা। ঐ সাত শ' আর চার শ' কাল জোগাড় করে

আমায় সলিমপুরের খাজনা শোধ করে দিতে হবে, তারা তাগাদা লাগিয়েছে।"

"এক শ' টাকা আমায় কাল দিতেই হবে। বাদ-বাকি তুমি নিও।"

"হঠাৎ এত টাকা কি হবে?"

"মণির জন্যে দুটো বাঁশি কিনে দিতে হবে।"

"বাঁশি! বাঁশি কি হবে?"

"কি হবে, তা জানি নে। না পেলে আবার হয় ত সে মূর্চ্ছা যাবে। আজ অনেক কষ্টে তাকে সামলেছি।"

পুত্রের বিষয় কোন কথা বলিতে গেলে এখনই একটা বিপদ ঘটিতে পারে, সেই ভয়ে দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি মুখাদি প্রক্ষালন করিতে বাহিরে গেলেন। এবং পরে জলযোগ সারিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। বাহিরে গ্রামস্থ দুই একজন উমেদার তহশিলদার মোসাহেব তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

দেওয়ানজী আসন গ্রহণ করিতেই বৃদ্ধ পার্ব্বতীনাথ সরকার বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনি মণিশঙ্করের হারমোনিয়া বাজানো শুনেছেন? কি সুন্দরই সে বাজাচ্ছে! আমি আসতে আসতে পথে পোড়া বাঙলায় ওর বাজনা শুনে এলাম।"

রাজীব জোয়াদ্দার বাঁধানো হুঁকাটা আর একজনের হাতে চালান করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "এই ত' মোটে মাসখানেক হল হারমোনিয়াটা ও কিনেছে, এরই মধ্যে এত শিখলে কবে?"

পার্ব্বতীনাথ কহিলেন, "পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, ভায়া! পূর্ব্বজন্মের সাধনা!"

পার্ব্বতীনাথের উপর সরকারি দুইটা ডিক্রি এখনও ঝুলিতেছিল। এবারে সেটার পরিশোধের কোন আশা ছিল না, তাই তিনি স্বীয় নাতিটীকে মণিশঙ্করের থিয়েটারে জুটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলের থার্ড মাষ্টারটী এ বিষয়ে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া দেওয়ানজীকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। দেওয়ানজী তাই গম্ভীর মুখে বলিলেন, "সরকার মশায়, আপনার নাতিটীকে এরই মধ্যে পড়াশুনা ছাড়িয়ে দিলেন? থার্ড মাষ্টার ত খুব দুঃখ করছিল। সে বলছিল, আপনার গিরিজা-নাথের বেশ ধার আছে, সে এন্‌ট্রন্স্ পাশ করবেই। এরই মধ্যে ওকে পড়াশুনা ছাড়ানো ভাল হল না।"

পার্ব্বতীনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আজ্ঞে দেওয়ানজী, মণিই যখন পাশ করতে পারলে না, তখন গিরিজার আর কতটুকু ধার! তাই মনে করছি, আমার যা কিছু আছে, তাই দেখবে-শুনবে আর মণির সঙ্গে থেকে যদি—"

রাজীব জোয়াদ্দারের উচ্চ হাস্যে সরকার মহাশয়ের বাকি কথাটুকু শুনিতে পাওয়া গেল না। দেওয়ান মহাশয়ও সেই হাস্যে যোগ দিয়া বলিলেন, "না, না, সরকার মশায়, এরই মধ্যে তা করবেন না। মণির সঙ্গে জুটলে ওর ইহকালও যাবে, পরকালও যাবে। মণিটাকে নিয়ে যে কি করব, তা আমিই ঠিক করতে পারছি না। তার ওপর আপনারা পাঁচজনে লাগলে ওকে আর সামলানো যাবে না। দেখুন দেখি,

ন্যায়রত্ন মশায়ের ছেলেটীকে আর সর্ব্বানন্দকে। এরই মধ্যে ওরা কেমন এগিয়ে যাচ্ছে। আহা, ছেলে দুটীকে বুকে ধরতে ইচ্ছা করে!"

উপস্থিত বন্ধুগণের মধ্যে, রাজীব জোয়াদ্দার ব্যতীত, সকলেই দেওয়ানজীর এই দেবোপম করুণায় গলিয়া গিয়া "আহা তা বটে!" "তাতে আর সন্দেহ কি?" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার কথার পোষকতা করিল। কিন্তু জোয়াদ্দার মহাশয়ের কোটর-গত ভ্রূ-সমাচ্ছন্ন দুই চক্ষু হইতে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি বাহির হইয়া দেওয়ানের অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষুর সহিত সঙ্গত হইল। এবং মুহূর্ত্তেই এই দুই বন্ধুর চোখে-চোখে একটা নীরব কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। তাহার পর, দুই এক 'দান' দাবা খেলা ও তাম্রকূট ধ্বংসের পর সকলেই যখন উঠিয়া বাড়ী গেল, তখন জোয়াদ্দার মহাশয়কে একা পাইয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "কি করি বল ত, রাজীব? মণির যে কি করব, কিছু বুঝতে পারছি না।"

রাজীবলোচন তাঁহার শ্বেত-কৃষ্ণ মস্তকটী আন্দোলিত করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তখনই বলেছিলাম তোমায় যে, এ ভাল হচ্ছে না, তুমি ন্যায়রত্নটাকে টোল-শুদ্ধ গঙ্গাপার করে দিয়ে এস,—তুমি ত তা শুনলে না। যেদিন কার্ত্তিক ছোঁড়াটা কাছারিতে বাবুর নাকের ওপর তোমায় অপমান করলে, সেই দিনই বুঝেছিলাম, তোমার মণির ভাগ্যে কাঁচকলা!"

দেওয়ানজী কহিলেন, "এখন আর তা হয় না। বাবু ঐ দুটো চ্যাঙড়াকে কি নজরে যে দেখেছেন, তা বলতে পারিনে। স্বয়ং হেডমাষ্টার ওদের মাষ্টার হয়ে শেখাচ্ছে। ন্যায়রত্ন এখন পরামর্শ-দাতা, হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধেতা। কি করি!"

দেওয়ানজী মুখের নলটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "হরে, তামাক দিয়ে যা না। বেটা এরই মধ্যে ঘুমুচ্ছে!"

ভৃত্য হরিদাস কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "খাবার হয়েছে মা ঠাকরুণ—"

"যা, যা, এখন গোল করিস্ নে।"

হরিদাস গড়গড়ায় কলিকা বসাইয়া দিয়া বলিল, "ঠাকরুণ, বল্লে খেতে এস।"

"যাচ্ছি, তুই যা না, কথাটা সেরে যাচ্ছি, বল্‌গে।"

হরিদাস নাছোড়বান্দা; আপন-মনে বকিতে লাগিল, "রামে মারলেও মারে, রাবণে মারলেও মারে। এখন যাই কোথা? রাজীব বাবু, বাড়ী যান না, রাত হয়েছে। মা রেগেছে,—বাবু ওঠো—আমার যেমন কপাল—খাটতে খাটতে প্রাণটা গেল—ওঠো বাবু—"

দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রাজীব, কাল দুপুর বেলা এস।"

রাজীবলোচন অগ্রেই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ মা-ঠাকুরাণীর রাগের অর্থ তিনি ভাল রকমই বুঝিতেন। তাই পরদিন আসিতে স্বীকৃত হইয়া তিনি প্রস্থান করিলে দেওয়ানজীও হরিদাসকে বকিতে বকিতে অন্তঃপুরে চলিলেন।

৬

মণিশঙ্কর লোকটী চিরদিনই কবি।

তেরো বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি বন্ধু ও গ্রামস্থ বহু বৃদ্ধের মহলে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন; এবং ঊনবিংশ বর্ষ গত হইতে না হইতেই তিনি "মকরাক্ষের মোক্ষ" নামক নাটক ও "গঙ্গার গোষ্পদ লাভ" নামক মহাকাব্যের তিন সর্গ লিখিয়া যশ-গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছিলেন।

আজ কোন এক অপূর্ব্ব খণ্ড-কাব্যের 'উদ্দীপনা' তাঁহার মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠায় তিনি দ্বিপ্রহরে তাঁহাদের বাগানের একটা আমগাছের তলায় বসিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্শ্বে হেরম্বের বাড়ীর ফুটটি অনাদরে পড়িয়াছিল। কবিবর মণিশঙ্কর এক-মনে এক রাখালের গোচারণ-কালীন গীতি শুনিতেছিলেন এবং তাঁহার মস্তিষ্কে সেই সঙ্গে কাহার কমল চরণের রিণিকি ঝিনির মধুর রাগিণী ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, কে জানে!

রাখালের গানটীও অতি চমৎকার, অতি করুণ। বিশেষতঃ তাহার গলায় অশিক্ষিত পটুত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিয়া আমাদের কবিবর তাহাকে তাঁহার থিয়েটারে কোনও একটা পার্ট দিতে পারেন কি না, ঐ সঙ্গে তাহাও ভাবিতেছিলেন। রাখালের গানটিতে বেশ মধুর ও করুণ রসের সমাবেশ ছিল। রাখাল গাহিতেছিল,—

"ছোট মামু গো। ভেব্যা মনু গো!
দুনিয়া পোড়ালে আল্লা!
ম্যাঘ কইরে সদা পানী নাহি হয়,
মাটী 'ফাইটা' হল চাল্লা চাল্লা।
হ্যাদুর বামুন যত হয়্যা হ্যাতজ্ঞ্যান
'শিবির' মাথায় তাঁরা পানি ঢেইল্যা দ্যান,
কাঁইদা ভ্যাকুল হইল য্যাত মোছলমান,
কোরাণ পইড়্যা মল চ্যারানে মোল্লা।"

কবি মণিশঙ্কর রাখাল-বালকটীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে গানটী লিখিয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী নবতর সুরের গুঞ্জন-ধ্বনি তাঁহার মগজে জাগিয়া উঠায় তিনি রাখাল-বালকের সঙ্গে বাঁশীতে তান ধরিয়া দিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সুরটি তাঁহার বন্ধুর মহলে "শঙ্কর-সাহি" নাম ধারণপূর্ব্বক প্রচারিত হইয়া গেল।

কিন্তু এইরূপে আমাদের মণিশঙ্কর নব সুর, নবতর গান এবং নবতম কাব্যের জন্ম দিয়াও মনে স্বস্তি পাইতেছিলেন না। কারণ তাঁহার মানস-প্রতিমার মূর্ত্তি তাঁহাকে শয়নে স্বপনে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই মানস-প্রতিমাটী হঠাৎ এক শীতের সন্ধ্যায় দশম বর্ষীয়া এক বালিকার রূপ ধরিয়া বহু জামা-জোড়া শ্রী-অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক সবুট পদক্ষেপে কবিবরের মানস-আম-দরবারে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাণীর মহিমায় চিত্ত-সিংহাসনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। ইনি আর কেহই নন, আমাদের পরিচিতা শ্রীযুক্তা শৈলজাসুন্দরী। যদিও কবিবর ইঁহাকে বহুবার দেখিয়াছিলেন, তবুও কে জানে কেন, কোন্-এক অপূর্ব্ব সন্ধ্যালোকে অপরূপ লগ্নে টম্‌টমোপরি উপবিষ্টা ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি-শালিনী এই মহিম-ময়ী কুমারী এক-লম্ফে

তাঁহার সান্ধ্য-ভ্রমণের টমটম হইতে একেবারে কবির চিত্ত-শতদলের উপর চড়িয়া বসিয়াছিলেন, তাই কবি মণিশঙ্কর উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত, উৎক্ষিপ্ত-হস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মাতা নিস্তারিণী দেবী বলেন যে তাহার পরিপাকের গোল-মাল হইতেছে; বন্ধুরা বলেন, কবিতা দেবী ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শত্রুরা বলে—না, সে কথায় আর কাজ নাই! শত্রুর কথায় কান দিতে গেলে জগতের কোন শক্তিমান পুরুষের সম্বন্ধেই কোন কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে—গঞ্জিকা-সেবনে বা ধান্যেশ্বরীর সেবায় কবিতার উৎস খুলিয়াই যায়, হজমের গোল করে না, শত্রুরা যাহাই বলুক, মণিশঙ্করের "শঙ্কর-সাহি" সঙ্গীত গঞ্জিকার ধূমে অথবা সময়ান্তরে ধান্যেশ্বরীর চক্রে অধিকতর জমিয়া উঠে। শত্রুর কথায় কর্ণপাত নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু প্রকৃত কবির মনোভাব কখনই গোপন থাকিতে পারে না, তা সে কথা যত গোপনীয়ই হোক। যে কথা শুনিলে লোকে কর্ণে অঙ্গুলি দান করিবে, তাহাও যদি প্রকৃত কবির জীবনে ঘটিয়া থাকে, তবে কবিতা দেবীর কৃপায় তাহাও জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত হইবেই; এবং নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ মন্ত্রানুসারে তাহা প্রকৃত কবিত্ব-শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া লোকে হজম করিবেই। চিরদিনের এই নিয়মানুসারে কবি মণি শঙ্করের গোপন কথাটি স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে প্রচারিত হইয়া পড়িল; এবং ক্রমশঃ সেই কথা কবির "শঙ্কর-সাহি" যোগে কোন্ এক বিশেষ মুহূর্ত্তে মাতা নিস্তারিণী দেবীরও শ্রুতিগোচর হইল; পরে সে স্থান হইতে যথারীতি পিতা দুর্গাশঙ্করের কর্ণেও সে কথা উঠিতে বাকী রহিল না। দুর্গাশঙ্কর তখন চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "এঁ্যা! হারামজাদা কোন্ দিন আমারও সর্ব্বনাশ করবে, দেখছি! আরে চুপ, চুপ, কি বল, তার ঠিক নেই! আমার ছেলে শৈলর জন্য পাগল! মা দুর্গে, এ আমায় কি বিপদে ফেল্লে! তোমাদের জ্বালায় কি দেশ ছেড়ে পালাব না কি!"

নিস্তারিণী কহিল, "তা তুমি রাগই কর, আর যাই কর, এর একটা বিহিত করতে হবে। মণি আমার খায় দায় না —শৈলর নামে কি একটা গান বেঁধেছে, তাই গেয়ে বেড়ায়।"

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, "আরে, থাম, থাম, চাকর-বাকরে শুনতে পেলে সর্ব্বনাশ ঘটবে। হতভাগাটার মাথা তুমি এমনি করে খাচ্ছ? আপন ছেলের ইষ্ট বুঝছ না? এ সব কি হচ্চে তোমার?"

নিস্তারিণী দেবী চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হবে আবার কি! তোমারই মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নিজের ছেলের ভাল দেখতে পাচ্ছ না। বাবু ত ঘর-জামাই নেবার চেষ্টায় আছেন। আমার মণি কি তাঁর ঐ রূপের ধোচন মেয়ের অযুগ্যি? কেন, তুমি চেষ্টা কর না! চেষ্টা করে দেখলে এত দিন কোন্ কালে দেখতে, আমার মণি তোমার মনিব হয়ে তোমার ওপর হুকুম চালাচ্ছে।"

পত্নীর পতিভক্তির এই সুমধুর পরিচয় পাইয়াও দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ কমিল না।

তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "বাবু ঘরজামাই রেখেন বলে কি হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেবেন! কে তোমার ঐ লাতাল গেঁজেল ছেলেকে মেয়ে দেবে?"

নিস্তারিণী দেবীর আর সহ্য হইল না, তিনি মাটীতে পড়িয়া "ওগো, এমন স্বামীর হাতেও পড়েছিলুম গো, ওগো—"ইত্যাদি নানাবিধ সকরুণ উক্তির সহিত বহুবিধ রাগ-রাগিণী-সংযোগে আপনার মর্ম্মবেদনা জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। দুর্গাশঙ্কর তখন বে-গতিক দেখিয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে এবং নিস্তারিণী দেবীর কথা-মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সে যাত্রা নিস্তার লাভ করিলেন।

৭

দুই-তিন বৎসর ধরিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের গৃহে যাতায়াত করিয়া সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকচন্দ্র যখন এন্‌ট্রান্‌স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশের অনুমতি পাইল, তখন শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র দাস একেবারে অপমানে প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ প্রধান শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দুই এক বৎসরের মধ্যে কেহই তৃতীয় শ্রেণীর যোগ্য ইংরাজী ও অঙ্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না; ছাত্র দুইটীকে আরও নিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হউক। প্রধান শিক্ষক রামরতন হাজরা হাসিয়া বলিলেন, "আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, যদি অনুপযুক্ত বোধ করেন, নামিয়ে দেবেন।"

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের স্পষ্ট-বক্তৃত্ব নামক একটী সর্ব্বজন-বিদিত গুণ ছিল। তিনি যখন তখন সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিয়া যশ অর্জ্জন করিতে ছাড়িতেন না। সেই কারণেই এমন উপযুক্ত অবসরকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন না,—তাঁহার টেরা চক্ষুর একটী অন্য একজন শিক্ষকের উপর এবং অপরটী গবাক্ষের গরাদের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি নিজে পড়িয়েছেন বলেই যে ওরা উপযুক্ত হবে, তার কোন অর্থ নেই। আমি নিজে পরীক্ষা করে নেব, আর অখিলবাবুও (অঙ্ক-শিক্ষক) পরীক্ষা করবেন।" অখিলবাবু সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে, আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আপনিই পরীক্ষা করুন।"

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাহার দিকে তাঁহার টেরা চক্ষুর এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহার অর্থ বিচক্ষণ চক্ষুতত্ত্ববিদ ডাক্তার সাহেব তিন হাজার বৎসরের সুগভীর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারাও উদ্ধার করিতে পারিতেন না। তবে উক্ত শিক্ষক মহাশয় সেই দৃষ্টি যে অতি ঘৃণার দৃষ্টি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত; কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর হ্রস্ব ও ঋজু পদের উপর ভর দিয়া স্বাভাবিক পদটা কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উক্ত মহানুভব শিক্ষক তাঁহার রাজাসনে আসীন হইয়া যখন সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "ওহে ছোকরা, কি নাম তোমার? এ দিকে এস" তখন ঐ শ্রেণীর সমস্ত তরুণ হৃদয়গুলি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কারণ, শিক্ষক মহাশয়ের স্বরের বহুবিধ ভঙ্গীর

অর্থ তাহারা অস্থি-মজ্জায় অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। সর্ব্বানন্দ যখন সলজ্জভাবে তাঁহার সিংহাসনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ওহে, এত ধেড়ে বয়সে এতটুকু-টুকু ছেলের সঙ্গে পড়তে তোমার লজ্জা করবে না?" সর্ব্বানন্দ অধিকতর লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে চটী জুতা দিয়া প্লাটফর্ম্মের পায়ায় আঘাত করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় উক্ত কার্য্যকে "ধেড়ে ছেলের" ধৃষ্টতা মনে করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন? বল না!" সর্ব্বানন্দ তখন অতি মৃদু স্বরে বলিল, লজ্জা করিবে।

শিক্ষক বলিলেন, "কিন্তু সাবধান, যা জিজ্ঞাসা করি, যদি তার ঠিক জবাব দিতে না পার, তা'হলে তোমায় এদের চাইতেও ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে।"

সর্ব্বানন্দর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিক্ষক তাহাকে রয়েল রিডার নম্বর ফাইভ নামক অতি অপূর্ব্ব ও গুরুগম্ভীর পুস্তক হইতে একটী গুরুতম স্থান বাহির করিয়া বলিলেন, "পড়।" সর্ব্বানন্দ কম্পিত হৃদয়ে উহা পাঠ করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাহার উচ্চারণ তেমন সুবিধাজনক হইল না, তবে কোন স্থানে আটকাইল না। পূর্ণবাবু তাঁহার চক্ষু দুইটিতে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, ফুটিল কি না সে সংবাদ কেহ রাখে না, তবে তাঁহার দন্তপংক্তি সহসা বিকশিত কুন্দবৎ সমস্ত মৌন ও ভীত হৃদয়গুলির ভয়ের অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূরীভূত করিল। তিনি তাঁহার দংষ্ট্রময়ুখ প্রীতির পাত্র কোন এক বালকের উপর পুঞ্জীভূত করিয়া বলিলেন, "কেমন নিধে, পড়া ঠিক হয়েছে?" নিধে ওরফে নিধিরাম এক-লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ও কিছু হয় নি।" শিক্ষক তাহাকে আদেশ করিলেন, "একবার শুনিয়ে দে ত, হেড মাষ্টারের ছাত্র হলেই রিডিং পড়া শেখা যায় না।" নিধিরাম পরম পুলকিত চিত্তে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় উক্ত শিক্ষক মহাশয় যে ভাবে যে স্থানে মাথা নাড়িতেন, থামিতেন, বা সুর টানিয়া ছোট-বড় করিতেন, অবিকল তাহার অনুকরণ করিয়া ঠিক সেই ভাবে পাঠ করিল।

তাহার পাঠ-ক্রিয়া শেষ হইলে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "That's all right. শুনলে হে ছোকরা, দু'বছরে এ রকম রিডিং পড়া শেখা যায় না।"

পরে তিনি সর্ব্বানন্দকে ঐ স্থানের অর্থ করিতে আদেশ দিলেন। সর্ব্বানন্দ ভয়ে ও লজ্জায় দুই-এক স্থানের অর্থ বলিতে ভুল করায় আবার তাহার উপর শ্রেণীস্থ সমস্ত বালকবৃন্দের বিদ্রূপাত্মক কলরব ও সর্ব্বোপরি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের বিরাট হাস্যের তীব্র বিষ বর্ষিত হইল।

এদিকে কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বানন্দর অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে গুমরাইতেছিল। হঠাৎ শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি হে, অমন করে তাকাচ্ছ কেন? এদিকে এস ত দেখি, তোমারই বা কতদূর দৌড়!"

কার্ত্তিকচন্দ্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সমবেত বালকমণ্ডলীকে দেখিয়া লইয়া এক-পার্শ্বে সম্মুখস্থ একটা ডেস্ক ডিঙাইয়া একেবারে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। শিক্ষক মহাশয় তাহার প্রচণ্ড মুখভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ থতমত খাইয়া বলিলেন, "ও কি! অমনভাবে লাফিয়ে এলে যে? কেবল লাফালাফি শিখেছ, বুঝি?"

কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "যেখানে যেমন রীতি, সেখানে তেমনি করতে হয়।"

শিক্ষক মহাশয় অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে কি বাঁদর-লাফ শিখতে আসে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "এখানে ত তাই শেখানো হয় দেখছি। যাক, কি জিজ্ঞাসা করবেন, করুন।"

শিক্ষক কহিলেন, "কি! হুকুম চালাচ্ছ যে! আমি ভোজপুরী ছাতুখোর দরোয়ান নই যে আমায় ভয় দেখিয়ে সারবে! যা জিজ্ঞাসা করব, তা বলতে না পারলে বিতিয়ে লাল করে দেব।"

কার্ত্তিক কৃত্রিম বিনয়ে হাত জোড় করিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে! এখন জিজ্ঞাসা করুন।"

শিক্ষক মহাশয় বজ্র-নিনাদে বলিলেন, "Rascal! bloody fool!"

কার্ত্তিকচন্দ্র টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "এদের অর্থ চান? এদের অর্থ,—a squint-eyed lame man. বাঙলা মানে, টেরা-চোখো, দেড়-ঠেঙ্গো মানুষ।"

স্যর রবার্ট বল বলেন যে ক্রাকাটোভা নামক আগ্নেয়-গিরির বিকট গর্জ্জন না কি বহুশত ক্রোশ দূরস্থিত মালয় উপদ্বীপেও শুনা গিয়াছিল এবং তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশি সুদূর ইংলণ্ডের সান্ধ্য আকাশকেও রঞ্জিত করিয়াছিল। কার্ত্তিকচন্দ্রের ভীষণ বিদ্রূপে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় যে প্রচণ্ড শব্দে আপনাকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা সুদূর লাইব্রেরী ও দরোয়ানের টীনের ছাদেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ শব্দের নানা কারণের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ নামক দুর্বিনীত শক্তির যোগ থাকায় ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া অন্যান্য শিক্ষক-গণের অনুমান। প্রত্যক্ষ যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারাও বলে যে, তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া তাঁহার চেয়ারখানি চৌকি হইতে তাঁহাকে লইয়াই পতিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর বেদনার কারণ হইয়াছিল, কার্ত্তিকচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক হাস্যপরিপূর্ণ বাক্য! —উক্ত শিক্ষক মহাশয় যখন ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুনিলেন, কার্ত্তিকচন্দ্র পরিষ্কার কণ্ঠে উক্ত বচনটি উদ্ধৃত করিতেছে, তখন তিনি ক্রোধে দুঃখে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং ব্ল্যাক বোর্ডের বেঞ্চের উপর আহত পাখানি তুলিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অন্যান্য শিক্ষকগণ সেই কক্ষে সমবেত হইলেন এবং প্রধান শিক্ষক সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "কার্ত্তিক, তুমি এঁর অপমান করেছ?"

কার্ত্তিকচন্দ্রের ক্রোধ অনুশোচনায় পরিণত হইয়াছিল। সে বিনীত স্বরে বলিল, "উনি মিছামিছি সর্ব্ব-দাদাকে সকলের সামনে অপদস্থ করেছিলেন, তাই আমি সে অপমানের শোধ নিয়েছি। তবে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।" কার্ত্তিকচন্দ্র জোড়-করে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের আঘাতের জ্বালা তখনও কমে নাই; তাই তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "আগে ও কান মলুক, নাক-খৎ দিক, তবে ক্ষমা করব।" কার্ত্তিকচন্দ্র বিনাবাক্য-ব্যয়ে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিল। তথাপি উক্ত শিক্ষক মহাশয় মুখ বক্র করিয়া রহিলেন দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "ওর আর কি শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, করুন। ও প্রস্তুত আছে।" পূর্ণবাবু আজ্ঞা দিলেন, উহাকে সাতদিন বেঞ্চের উপর দাঁড়াইতে হইবে। হেডমাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে; তথাপি তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর সেই আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কার্ত্তিকও বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাহার নিজস্থানে গিয়া বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু কোন বালকই সাহস করিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না।

হেডমাষ্টার মহাশয় তখন তৃতীয় মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি কার্ত্তিকের পিছনে বেশী লাগবেন না। কারণ এর মধ্যেই ও আমার ফাষ্ট ক্লাশের সেরা ছাত্রের চাইতেও অনেক শিখে ফেলেছে। এত বড় মেধাবী ছাত্র আমার হাতে কখনও পড়ে নি ওকে ফাষ্ট ক্লাশেই একেবারে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই সর্ব্বানন্দ সঙ্গ ছাড়তে রাজী নয়, তাই ওকে আপনার ক্লাশে দিয়েছি। আর মনে থাকে যেন, কালিকাবাবুর দৃষ্টি ঐ ছেলেটার উপর সর্ব্বদা পড়ে আছে। ওকে যে ঘাঁটালে কারও রক্ষা থাকবে না। আর এই বয়সে এত মাইনের এমন চাকরী যে আপনার অন্য কোথাও জুটবে, তার বড় ভরসা দেখি না। সাবধান!"

৮

একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া শৈলজা যখন দেখিল, তাহার সহোদরা নিষ্ঠাকনিষ্ঠা বা সমবয়স্কা সরলা, কমলা প্রভৃতি বহু আত্মীয়া অনাত্মীয়া বালিকার বিবাহ হইয়া গেল, তাহার হইল না, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার ঠাকুরমার উপর আবদার আরম্ভ করিয়া দিল। ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "তুই কি রকম বর নিবি?" শৈলজা সগর্ব্বে বলিল, "কেন, মণিদার মত!" মণিশঙ্কর ইতিমধ্যে মাতৃ-উপদেশে জমিদার-গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহার "মানস-প্রতিমাকে" ভুলাইবার জন্য বহুবিধ জাল বিস্তার করিতেও সে কোন ত্রুটি রাখে নাই।

ঠাকুরমা চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কিরে, ঐ হতভাগাটার মত?"

শৈলজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "গাল দিস্ না আমি ওকে বলে দেব।"

"তা দিস, কিন্তু ওকে তোর পছন্দ হল কেন?"

"ও কেমন থিয়েটারে রাজা সাজে, গান করে, আবার আমায় সেদিন কেমন খরগোস করেছে, তুমি দেখনি?"

"দেখেছি, কিন্তু রাজা সাজলে, খরগোস সাজলেই কি বিয়ে হয়!"

"ও আমায় কত আদর করে! বাঃ, আমার জন্যে সেদিন কেমন মস্ত একটা ফুলের তোড়া এনেছিল, আমি মণিদাকেই বিয়ে করব, ঠাকুমা, তুমি বিয়ে দাও।"

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া, তোর বাবাকে বলে বিয়ের বন্দোবস্ত করছি। কিন্তু মণির সঙ্গে নয়।"

"তবে কার সঙ্গে?"

"কার্ত্তিকের সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, আমি ওকে বিয়ে করলে ত। ও যে দুষ্টু!"

"দুষ্টু! সে কি রে, কি দুষ্টুমি করলে?"

"ও সবাইকে মারে। আমায় ত একবার মারতে গিয়েছিল, মনে নেই?"

"সে কিরে! সে কথা এখনও তোর মনে আছে?"

"মনে নেই আবার! তা ছাড়া মণিদা তার কত নিন্দে করে, বলে, ইস্কুলে ছেলেদের সঙ্গে ও ভারী মারামারি করে, মাষ্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করে। না ঠাকুমা, তার চেয়ে সর্ব্ব-দা ভাল, না হয়, ওরই সঙ্গে বিয়ে দাও। কার্ত্তিকদাকে বিয়ে করব না,—ও তাহলে কোন্ দিন আমায় মেরে ফেলবে।"

ঠাকুরমা উচ্চ হাস্য করিয়া তাঁহার বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও বৌমা, তোমার মেয়ের কথা শোনো।"

শৈলজার মাতা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি বলছিস, শৈল?"

শৈল কহিল, "ঠাকুমা আমায় কার্ত্তিক-দাকে বিয়ে করতে বলছে। আমি বলছি, অত দুষ্টুকে আমি বিয়ে করব না।"

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "তা না করিস, না করবি! এখন যা, তোকে সরলা ডাকছে, তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কত খেলনা এসেছে, দেখ্ গিয়ে।" শৈলজা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শৈলজার মাতা তখন শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বলিলেন, "মা, ও সব কথা শৈলকে না বলাই ভাল। উনি ওতে রাগ করেন, বারণ করেন।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি, মা। কিন্তু তোমার মেয়েই যে এদিকে পাকা বুড়ী হয়ে উঠেছে, তার খবর ত' রাখ না। ওই বল্লে, সরলার বিয়ে হল, কমলার বিয়ে হল, আর আমার বিয়ে হবে কবে? আমি তাই জিজ্ঞেস করছিলুম, কেমন বর নিবি? তাতে কি বল্লে, জান? বল্লে, মণিদাকে বিয়ে করব। এমনি তোমার মেয়ের পছন্দ!"

শৈলজার মাতাও চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কি মা, মণিশঙ্কর! দেওয়ানজীর ছেলে!"

"হ্যাঁ, ওই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা। ছোঁড়াটা না কি ওকে কি-কি দিয়েছে।"

"আর ওকে এখানে আসতে দেওয়া নয়। ও ভারী বদ ছেলে।"

"তা কি আর আমি জানিনে?"

শৈলজার মাতা চিন্তিত মনে প্রস্থান

করিলেন; এবং সময়-মত সমস্ত কথা কালিকাবাবুর নিকট খুলিয়া বলিলেন। কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এতেই এত ভাবনা! আমি বলি, মেয়ের বুঝি সর্দ্দি লেগেছে! তা নয়, সে মণিটাকে বিয়ে করতে চেয়েছে! তাই বল। ডাক ত' শৈলকে।" শৈলজাকে ডাকিতে আদেশ দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। ও বয়সে মেয়েমানুষের যখন বিয়ে হয়ে যায়, তখন শৈলর কথা হেসে ওড়ানো চলে না।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "যাদের চলে না, তারা অমন করে বলতে পারে না যে, 'আমার বিয়ে দাও'। তা আবার কার সঙ্গে, না, যে দুটো খরগোস দিয়েছে, কি দুখানা ছবি দিয়েছে, তারই সঙ্গে! আমার শৈল চিরদিন খুকীই থাকবে, তোমার ভয় নেই, ইন্দিরা। তবে তোমাদের একটা অনুরোধ, ডেঁপো মেয়েদের সঙ্গে ওকে মিশতে দিয়ো না, এইটুকু করো, তা হলেই দেখবে, সব ঠিক থাকবে।"

গৃহিণী কহিলেন, "কিন্তু মা যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আর কতদিন অপেক্ষা করবে? কার্ত্তিককেই যদি তোমার এত পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আর দেরী করছ কেন? ওর বাপকে বলে সব ঠিক করে ফেল না। কিন্তু আমার মত যদি নাও, তা হলে সমান ঘরে বিয়ে দাও, অমন গরীবের ছেলে এনে শেষে ও বেচারার এ কূল ও কূল দুই মজাবে!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তুমি কার্ত্তিককে এখনও চিনতে পার নি, তাই ঐ ভয় করছ। ঘর-জামাই হলেই যা হবার সম্ভাবনা আমি তাই দূর করবার জন্য কার্ত্তিককে যথাসাধ্য শিক্ষিত করে নিতে চাই। যাতে মনে করতে পারে যে, ইচ্ছা করলে ও স্বাধীন, এই রকম বিদ্যা-সাধ্য ওর করিয়ে দিয়ে তবে ওকে মেয়ে দেব। তাই এত যত্ন করে পড়াচ্ছি!"

গৃহিণী ইন্দিরা দেবী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মেয়ের যদি ওকে পছন্দ না হয়?"

"তা হলে আজীবন কষ্ট পাবে। আমি কিন্তু আর কারও হাতে আমার মেয়ে তুলে দিতে পারব না। কার্ত্তিককে দেব, তারপর মেয়ে যদি নিজের বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করে, বুঝব, মেয়ের কপালে সুখ নেই। নইলে কার্ত্তিককে যে জানে, সে ওকে ভাল না বেসে থাকতে পারে, তা ত আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না।"

"তুমি যে কার্ত্তিককে কি চোখে দেখেছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমি ত ওর খুব বুদ্ধি-শুদ্ধি ছাড়া আর কোন গুণ দেখতে পাইনে।"

"পাও না! আশ্চর্য্য। ওর ঐ গম্ভীর মুখখানায় কি একটা প্রচণ্ড শক্তি আপনাকে বিপদে ফেলেও পরকে ভালবাসবার ক্ষমতা ও রাখে! তা ছাড়া আরও যা আছে, তা তোমায় কি বোঝাব? তার সুমুখে দাঁড়ালে হয় ত রাজা-মহারাজের মাথা নীচু হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে, নির্ভিক তেজস্বিতা! দেখেছ কোন দিন, ওর তেজ? ওকে দেখলেই আমার মনে পড়ে, সেই পূর্ব্বকালের তপোবনের ঋষি-

বালকদের কথা। ইন্দিরা, আমি যে কেন ওকে ভালবাসি, একদিন ওকে তোমার কাছে বসিয়ে কথা কয়ে দেখো, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।"

তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় শৈলজা সেখানে আসিয়া বলিল, "কি বাবা, ডাকছ কেন?"

পিতা তাহাকে খাটের নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "কি করছিলি?"

"কিছু না। একটা মজা দেখছিলুম।"

"মজা দেখছিলি? কোথায়, কি মজা?"

"কার্ত্তিকদা এসে তোমার আলমারি খুলে বই ঘাঁটছিল। যে বইখানা ও রোজ কেবলই-কেবলই ঘাঁটে, আমি সেখানা লুকিয়ে রেখেছি, ও তাই খুঁজছে আর রামচরণকে বকছে। আমি লুকিয়ে তাই দেখছিলুম, আর সরলাকে দেখাচ্ছিলুম।"

"তুই ত ভারি দুষ্টু। যা, গিয়ে বের করে দিয়ে আয়।"

"না, দেব না। কেন দেব? ও কেন রোজ রোজ আমাদের বই ঘাঁটবে! ওর নিজের বই ঘাঁটুক না গিয়ে।"

"পাগলি, ও যে আমার বই নিয়ে পড়ে। ও বই না পেলে ওর পড়া হবে না, শেষে স্কুলে মার খাবে।"

"ও যেমন দুষ্টু, ওর মার খাওয়াই উচিত। বাবা, তুমি ইস্কুলের মাষ্টারদের বলে দিয়ো যে, ওর নিজের বই নেই, পরের বই নিয়ে পড়ে, তাই ও পড়া বলতে পারে।"

ইন্দিরা কহিলেন, "তুই যেমন ওকে দেখতে পারিস নে, আমরা যে তেমনি ওকে খুব ভালবাসি।"

শৈল কহিল, "তাইতেই ত ওর আস্কারা আরও বেড়ে গিয়েছে, নইলে যখন-তখন সবাইকে ও বকে কেন? আমি কিছু করলে ধমকায় কেন?"

ইন্দিরা কহিলেন, "তুই ওর পেছনে লাগতে যাস্ কেন?"

শৈল কহিল, "বেশ করব, লাগব। যে আমায় মারতে আসে, বকে, তাকে আদর করবে! বাবা, তুমি ওকে কেন এখানে আসতে দাও? রোজ রোজ কেন ও তোমার লাইব্রেরী ঘাঁটবে?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, কাল থেকে ওকে এখানে আসতে মানা করে দেব। তা হলেই ত হবে? ও বেচারার তাহলে কিন্তু খুব কষ্ট হবে।"

শৈলজা কিছুক্ষণ বিছানার উপর মাথা রাখিয়া চিন্তা করিয়া বলিল, "খুব কষ্ট হয় ত এক-একদিন আসতে দিয়ো, কিন্তু রোজ নয়। তার চাইতে মণিদাকে বলে দেব, ও এসে রোজ রোজ তোমার বই পড়ে যাবে।"

ইন্দিরা দেবী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "খবদ্দার শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিসনে। ও ভারী পাজী। ফের যদি কোন দিন ওর কাছ থেকে কিছু তুমি নাও—"

গৃহিণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কালিকাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "কি মিছি-মিছি যা-তা বকছ! না রে শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিস্। তবে তাকে সবাই মন্দ বলে, সেজন্য সে কিছু দিলে নিয়ো না।

নিলে সবাই আমায় বকবে, তোমাকেও বকবে।”

শৈলজাসুন্দরী এইবার চটিয়া গেলেন। তিনি মহারাণী-অধিরাণীর মত তার ক্ষুদ্র মস্তকটী উন্নত করিয়া বলিলেন, “আমি তোমাদের কারও কথা শুনব না। কেন, তোমরা মণিদাকে বকবে? কি করেছে সে?”

কালিকাবাবু কন্যার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ওরে না, না, সে আমাদের কিছু করে নি। কিন্তু তুই যদি তার কাছ থেকে কিছু নিস্, তাহলে সবাই আমাদের বকবে।” শৈলজার সে কথা বিশ্বাস হইল না, কারণ তাহার পিতাকে তিরস্কার করিতে পারে, এমন লোক সে চোখে দেখেই নাই, কল্পনাও করিতে পারে না! সেই কারণে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, “তোমাকে কেউ বকবে না। তোমরা তাকে দেখতে পার না বলে এই কথা বলছ।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “যে জন্যই বলি, তুমি তার কাছ থেকে কিছু নিয়ো না। নিলে আমার খুব দুঃখ হবে, তোমার মার কষ্ট হবে।”

শৈলজা এইবার নরম হইয়া বলিল, “আচ্ছা, তোমরা কষ্ট পাও ত’ নেব না। কিন্তু মিছিমিছি তোমরা মণিদার উপর রাগতে পাবে না। আমি কিন্তু মণিদার খরগোস ফিরিয়ে দেব না।”

কালিকাবাবু অগত্যা সেই সর্ত্তে সম্মত হইয়া কন্যাকে বলিলেন, “যাও, এখন খেলা করগে।” কন্যা অমনি বলিয়া উঠিল, “খেলা করব কি? কার্ত্তিকদা কি করছে, দেখে আসি। বই না পেয়ে নিশ্চয়ই [illegible] এতক্ষণ লাইব্রেরী মাথায় করেছে।”

কার্ত্তিকচন্দ্র ওদিকে তাহার ওয়েবষ্টার ডিক্সনারীখানা খুঁজিয়া না পাইয়া যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছিল এবং শেষে অগত্যা আর একখানা পুরাতন অভিধান খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া কাজ চালাইয়া লইতেছিল। তাহার সম্মুখে বসিয়া সর্ব্বানন্দ একখানা খাতায় কতকগুলা ইংরাজী idiom এর বাংলা তর্জ্জমার চেষ্টায় বারবার মাথা চুলকাইয়া পেনসিল কামড়াইয়া ক্ষণে ক্ষণে কার্ত্তিকচন্দ্রের দিকে চাহিতেছিল—ইচ্ছা, সে একটু সাহায্য করে। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আপন মনে কাজ করিতেছিল, অন্যদিকে চাহিবার তাহার অবসরমাত্র ছিল না!

এমন সময় দ্বারের নিকট একটা সুমধুর হাস্যধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বানন্দ চমকিয়া ফিরিয়া দেখে, শৈলজা দুই হাতে সেই অভিধানের দুই অংশ লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, “কার্ত্তিক, ঐ দেখ তোমার ওয়েবষ্টার।”

কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া শৈলজার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র, শৈলজা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, “দেব না, কথখ্‌নো দেব না ত।” তখন কার্ত্তিকচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, “দিয়ে যাও বলছি, শৈল, নইলে—”

শৈলজা কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মাথা নাড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিল, “দেব না—কথখ্‌নো দেব না।” তখন

কার্ত্তিকচন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া তাহার দিকে সবেগে ছুটিতে গিয়া আর-একখানা চেয়ারে কাপড় আটকাইয়া পড়িয়া গেল; এবং একটা আলমারির কোণে লাগিয়া তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তবুও কার্ত্তিকের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় শৈলজাকে ধরিতে গেল। শৈলজা কিন্তু কিছু দূরে ছুটিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা, কার্ত্তিক যদি বাহিরে না আসে, তাহা হইলে আবার গিয়া তাহাকে ঐ বই দুইখানা দেখাইবে। কার্ত্তিকচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শৈলজার সমস্ত দুষ্টামি মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বই দুইখানা ফেলিয়া দিল এবং কার্ত্তিকের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “ও কার্ত্তিক-দা, রক্ত যে! তোমার কপাল কেটে গেছে। ও রামচরণ, জল আন্। ও সর্ব্ব-দা, শীগ গির এস।”

কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথমটা ঝোঁকের মাথায় বাহিরে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বাহিরে আসিয়াই আঘাতের গুরুত্ব অনুভব করিল। কারণ কপাল কাটিয়া রক্তের ধারায় তাহার মুখ ও বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, শৈলজা কাঁদিতে কাঁদিতে লাইব্রেরীর বাহিরে যে এক-কলসী জল ছিল, তাহাই একটা প্রকাণ্ড মগে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছে, আর কার্ত্তিক এক হাতে ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

লাইব্রেরীর খানসামা রামচরণ দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা দিতেছিল। শৈলজার চীৎকারে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ জল ঢালিয়া কার্ত্তিকের কপালে জলপটী বাঁধিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিতে গেল। কার্ত্তিক ধীরে ধীরে উঠিয়া যখন লাইব্রেরীর একখানা চেয়ারে বসিল, তখন শৈল চোখ মুছিয়া ম্লান মুখে তাহার কাছে গিয়া বলিল, “কার্ত্তিক-দা, বাবাকে বলো না, আর আমি দুষ্টুমি করব না!”

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, “তোমার দোষ কি! আমি ত আপনি পড়ে গিয়েছি।”

“না কার্ত্তিকদা, আমারই দোষ। আমি মাপ চাচ্ছি। সর্ব্ব-দা, ঐ দেখ, আরও রক্ত পড়ছে! কি হবে?”

সর্ব্বানন্দ বলিল, “ভয় কি! ডাক্তারবাবু আসছেন। এখনই সেরে যাবে।”

“যদি রক্ত বন্ধ না হয়, আমার বড় ভয় করছে, আমি বাবাকে ডেকে আনি।”

শৈলজা চলিয়া গেল। তারপর ডাক্তার বাবু আসিয়া বাঁধা-ছাঁদা করিয়া বলিলেন, “এখন নড়ো না, বিকেলে বাড়ী যেয়ো, এখন খবরদার নড়ো-চড়ো না।”

(ক্রমশ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

মফস্বলের হাকিম ও মোক্তার

বেলা তিনটার সময় রামদীনের রান্না করা আলুর তরকারি এবং ভঁয়সা ঘিয়ে ভাজা মোটা আটার লুচি যথাসাধ্য গলাধঃকরণ করিয়া নৌকায় আসিয়া শুইয়াছি, এমন সময় থানা হইতে শ্যামলালবাবু ডাক হাঁক্ করিতে লাগিলেন, "আরে ভায়া, আর কত খাবে?—একবার এপারে এসনা,—আমার যে একটু জরুরী কাজ আছে।" লোকটার বেহায়াপণা দেখিয়া একবার মনে হইল কোন উত্তর দিব না,—কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া আবার থানার ঘাটে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্যামলালবাবুর "একাদশী" করা বোধ হয় তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল, কারণ তাঁহার মুখখানি তাম্বুলরাগে রঞ্জিত দেখা গেল। বামহাতে একটী থোলো হুঁকা লইয়া তিনি ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া এক-একটী টান দিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক-একটি ঢেকুর তুলিয়া "একাদশী"টা যে একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই করা হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ভায়া, মনে বড় কষ্ট দিয়ে গেলে, আমার বাসায় একটু জল পর্য্যন্ত খে'য়ে গেলে না,—আমি কতবার তোমার ওখানে গিয়ে জামাই-আদরে খেয়ে আসি,—কত ত্যক্ত করি,—আর আমার এমনি কপাল যে, তোমাকে একটু মিষ্টিমুখও করাতে পারলুম না! তা' এবার যা' হবার তা' হয়ে গেল, আবার যদি কখনও এদিকে আগমন হয়, তবে পাঁজি দেখে এস,—সেবারও যেন এমনি একাদশীতে এসে আমাদের ক্ষুণ্ণ করে যেও না,—আমার স্ত্রী তোমাকে দু'টী খে'তে দিতে না পে'রে ভারি আপশোষ করছিল,—তা আমি তাকে অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এসেছি,—তুমি ত আমাদের ঘরের লোক—"!

আমি বহুকষ্টে বিদ্রূপের হাসি সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "তা'ত বটেই, তা'ত বটেই,—আমি কি আর আপনার পর? এখানে খেলেও আপনারই খেতেম, ওপারে গিয়েও আপনারই খে'য়ে এলেম,—এ'তে আর আপনাদের ক্ষুণ্ণ হবার কি আছে? আত্মীয়তার ত লক্ষণই এই—"!

শ্যামলাল বাবু এই কথাতে যেন বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া বলিলেন, "তা ভাই, বেশ,—তোমাদের মত ইংরেজীনবিশের সঙ্গে আমাদের মত মুখ্যোসুখ্যো লোকের ত আর কথায় এঁটে উঠবার যো নেই,—তা বেশ,—এখন ভাই, যদি আমার একটু কাজ ক'রে দিয়ে যাও, তাহলে বড় উপকার হয়।"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত নৌকা হইতে ডাঙ্গায় নামিলাম। শ্যামলালবাবু আমাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া নিজে অদূরে আর একখানা চেয়ারে গিয়া বসিলেন। তার পর হাতের হুঁকাটী দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া বলিলেন, "দুঃখের কথা আর কি বলব ভায়া,—তেত্রিশ বৎসর চাকুরী হল, পয়সা

ড়ি কিছুই কর্‌তে পারলাম না,—খরচ-পত্র আমার বেজায়! ভাগ্যে ভগবান্ আমাকে কোন পুত্র কন্যা দেন নাই,—সংসারে শুধু আমি আর গৃহিণী,—তাতেই ব্যয়বাহুল্যে আমার প্রাণান্ত! Retire কর্‌তে আর বড়জোর তিনমাস কি সাড়ে তিনমাস বাকী,—একটা extension-এর জন্য সাহেবকে অনেক পীড়াপীড়ি করে-ছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই নরম হলেন না,—আজকাল ত আর সেকালের মত দয়ালু মনিব পাওয়া যায় না,—থাক্‌ত যদি Boswell সাহেব, তবে, দেখ্‌তে পেতে আমার কত খাতির,—Boswell সাহেবের মত "মা-বাপ" মনিব আর হবে না! এই ত সাম্‌নে পূজা আসছে,—জীবনে কখনও পূজা করা হয় নাই,—কোথায় পাব টাকা-পয়সা? এবার গৃহিণী বড়ই পীড়াপীড়ি করে-ছেন, চাকরী ছেড়ে বাড়ী গিয়ে এবার দুর্গোৎসবটা করতে হবেই হবে। মেয়েমানুষে ত বুঝে না, কি কষ্টে একটা পয়সা রোজগার হয়! আমি ভাই, এলাকার চৌকিদার, দফাদার, পঞ্চায়েত, প্রধান প্রভৃতি সকলের কাছে চেয়ে-চিন্তে কষ্টেসৃষ্টে কুড়ি দুই পাঁঠা আর হাজারখানিক নারিকেল যোগাড় করে রেখেছিলাম,—তা আমার ছোট ভাই চুনিলাল এসে সে-সব ফিরিয়ে দিয়ে গেছে! হতভাগা আমার মুখের উপরই বলে কিনা,—'দাদা, কোনদিন ত কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম করলে না,—এবার যদি বৌদিদির তাড়নায় একটা শুভকাজ করবার সঙ্কল্প করেছ, তবে সেটা আর এইভাবে অঙ্গহীন করো না! তোমার যদি সাধ্যে না কুলোয়, তবে পূজা না কর ক্ষতি নেই,—তবু ভিক্ষা করে পূজার পাঁঠা সংগ্রহ কর্‌তে পারবে না! তুমি কর্‌বে পূজা, আর তার ফলভাগী হবে এই সব চৌকিদার দফাদার,—আমি বেঁচে থাক্‌তে তা কোনমতেই হতে পারবে না দাদা!—তোমার পয়সা কার জন্যে আর জমাচ্ছ বল দেখি? বয়স ত আর কম হলো না,—আর কতকাল বাঁচবে? সারা জীবন ত কেবল রোজগারই কর্‌লে,—এখন কিছু-কিছু দেবধর্ম্মের কাজে ব্যয় কর। না-হ'লে পরলোকে গিয়ে কি জবাবদিহি করবে বল দেখি—?' দেখ্‌লে ভায়া, আক্কেলটা দেখলে একবার!—ছোট ভাই হ'য়ে আসে কিনা আমাকে উপদেশ দিতে! আমার বলে কিনা 'কত কাল বাঁচবে?' কেন, আমার আর এমন-কি জেয়াদা বয়স হয়েছে,—আমার বয়সে অনেকে তৃতীয়পক্ষে বিবাহ করেও ত ছেলে মেয়ের বাপ হয়! ভাইটীও আমার তোমাদেরই মত ইংরেজীনবীশ কিনা,—তা বোধ হয় কথার ধরণেই বুঝতে পেরেছ,—আমরা হচ্ছি সেকেলে বাঙ্গলানবীশ, 'মহিমার্ণবেষু'র দল,—কাজেই আমাদের Old fool ব'লে অশ্রদ্ধা করবে বৈ কি! ও'রা মনে করে, আমার হাতে না-জানি কত টাকাই আছে,—তা পরের ধন আর নিজের পরমায়ু, এ কি আর কেউ কম দেখে! Extension যখন পেলেম না, তখন পেন্সন নিয়ে যাওয়াই স্থির,—কোন মতে চোক-কাণ বুজে এই কয়টা মাস কাটাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু বিধাতা

বোধ হয় আমার সে সাধেও বাদ সাধলেন, —কপাল আমার এম্‌নি পাথর-চাপাই বটে! আমার ছোট দারোগা ছিলেন নরেশবাবু,—তিনি পরাণগঞ্জে বদলী হয়ে গেছেন,—তাঁকে ত তুমি চেনই,—তোমরা দুজনে ত এক বৎসরেই ভাগলপুর থেকে পাশ ক'রে এসেছ,—তিনি ভারী লায়েক, —ইংরেজীতে বি, এ, ফেল, সর্ব্বদাই মুখে লেড্‌ মেড্‌ বুলি,—আমাদের ত তৃণ বলেও গণ্য করেন না। তিনি এর মধ্যে একদিন যেন কার কাছে খবর পেয়েছিলেন, নাথের আবাদের শ্যামভদ্র নাকি চোরাই মাল রাখে। শুনেই আর যাবি কোথায়! —আমার কাণে সে কথা এলে পাছে বাহাদুরীটা আমিই নিই,—এই ভেবে তিনি আমার কাছে সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করেই অন্য কাজের উপলক্ষ্য করে থানা থেকে দুজন কনেষ্টবল নিয়ে নাথের আবাদে চলে গেলেন। পথে জন দুই তিন দফাদার চৌকীদারকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন, শুন্‌লাম। ভোরবেলায় শ্যামভদ্রের বাড়ী ঘেরাও করে তিনি খানাতল্লাসী করতে উদ্যত হলে শ্যামের নিদ্রাভঙ্গ হয়, —সে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করেও নরেশবাবুর মন ভিজাতে না পেরে অবশেষে রেগে একবারে "মরিয়া" হয়ে উঠে! তারপর নরেশবাবু যখন আবার শ্যামের অন্দরমহলে ঢুক্‌তে গেলেন, শ্যাম তখন তার ছেলে, জামাই আর চাকরবাকরের সাহায্যে তাঁকে বেশ করে চেপে ধ'রে একবারে আষ্টেপৃষ্টে এঁটে বেঁধে ফেল্‌লে! তারপর যা হ'ল, তা'ত বুঝ্‌তেই পাচ্চ ভায়া,—কনেষ্টবল আর দফাদার-চৌকীদারেরা সেনাপতির বিপরীত দশা দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে একবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে থানায় এসে উপস্থিত! আমি এই খবর পেয়ে বিনোদকে নরেশবাবুর উদ্ধারের জন্য পাঠাব বলে মনে মনে ভাবছি —(আমার নিজের শরীরটা সেদিন বড়ই অসুস্থ ছিল কিনা!—) এমন সময় দেখ্‌লাম, নরেশবাবু হাড়গোড়ভাঙ্গা "দু,"-এর মত খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার দিকেই আসচেন! তিনি এসেই আমার উপর ত নানাপ্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করলেন, যেন তাঁর ধনঞ্জয়-প্রাপ্তির জন্য আমিই অপরাধী,—আমিই নাকি এতকাল শ্যামভদ্রকে আইনের মুখ থেকে বাঁচিয়ে আসছি,—আমি নাকি মাসে মাসে শ্যামের কাছে মাসহরা খাই,—এবার পুলিশ-সাহেবের কাছে তিনি সবই প্রকাশ করে দেবেন,— এইরূপ অনর্গল কত কথাই যে তিনি বলতে লাগলেন, তার আর ইয়ত্তা নাই। বুঝ্‌লাম, অতিরিক্ত গাত্র-জ্বালাতেই নরেশবাবু ঐ সব আবোল-তাবোল বক্‌ছেন; তখন উত্তর দিতে গেলে হয়ত একটা লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে যাবে, কাজেই আমি আর কোন উচ্চবাচ্য করলাম না। কিছু ক্ষণ পরে তিনি একটু সুস্থির হলে, আমি তাঁকে এই ব্যাপার নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করলাম, কারণ শ্যামের বাড়ী খানাতল্লাসী করবার জন্য তিনি কোন ওয়ারেণ্টও পান নাই, গুরুতর সন্দেহের কোন কারণও তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না। তার চেয়ে শ্যামকে তলব দিয়ে আনিয়ে যাতে সে নরেশবাবুর

পায়ে ধরে ক্ষমা চায়, আর কিছু নজর-সেলামীও দেয়, সেই ব্যবস্থা করতে চাইলাম। কিন্তু নরেশবাবু আমার কথা একেবারেই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি সোজাসুজি পুলিশ-সাহেবের কাছে এক রিপোর্ট দিয়ে শ্যামের বিরুদ্ধে ৩৫৩ ধারা-মত (সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে আক্রমণ করা) মোকদ্দমা রুজু কর্‌বার অনুমতি প্রার্থনা কর্‌লেন। ওদিকে শ্যামও নরেশবাবুর নামে বেআইনী জনতা, অনধিকার প্রবেশ, মানহানি প্রভৃতি নানাবিধ চার্জ্জ দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত দাখিল কর্‌ল। মাজিষ্ট্রেট-সাহেব পুলিশের কাগজপত্র তলব কর্‌লে পুলিশ-সাহেব নরেশবাবুর রিপোর্টটী মাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মাজিষ্ট্রেট-সাহেব কোন পক্ষেরই মোকদ্দমা গ্রহণ না করে প্রথমে আমার উপর তদন্তের ভার দিয়েছেন। আমার ভাই, এখন উভয় সমস্যা,— "না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ!" সত্যকথা বল্‌তে গেলে নরেশবাবু মারা যান, অথচ বুড়া-বয়সে (?) মিথ্যা রিপোর্টাই বা কেমন করে দি? অনেক ভেবে চিন্তে আমি "সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে" গোছের একটা রিপোর্ট বাঙ্গলায় লিখে রেখেচি। তুমি যদি দয়া করে সেইটা ইংরাজী করে দেও, তবে বড় ভাল হয়। গ্রেক্‌ সাহেব বাঙ্গলা ভাল জানেন না, আমারও ত ইংরাজী বিদ্যা "Who is you" পর্য্যন্ত! শুন্‌লে বরং কোনরকমে দুই এক কথা বুঝতে পারি, কিন্তু লিখ্‌তে গেলে ইংরেজী বিদ্যায় আদোপেই কুলিয়ে উঠে না। তুমি যদি দয়া ক'রে রিপোর্টটার ইংরেজী তরজমা করে, তারপর সেটা পরিষ্কার ক'রে নকল ক'রে দেও, তবে আমি নিচে নিজের নামটা কোনমতে ইংরেজীতে সই ক'রে সাহেবের কাছে পাঠাতে পারি। ছেলেমানুষ তোমরা, এই ত খাট্‌বার বয়স,—তোমাকে আমি চিরদিনই ছোট ভাইএর মত দেখি, তাই এইটুকু কষ্ট করতে অনুরোধ কর্‌লাম, আর কেউ হ'লে এ ভরসা হ'ত না।"

শ্যামলালবাবুর উপরোধ রক্ষা করতে আমার অন্তরে ইচ্ছার লেশমাত্রও ছিল না, সেজন্য বলিলাম, "ইংরেজীতে আমার দখল খুব কম,—আর আমার হাতের লেখাও অতি জঘন্য,—আমার মতে ইংরেজী না করে রিপোর্টটী বাঙ্গলাতেই দেওয়া ভাল"।—কিন্তু এই "রোজা-মরা ভূতকে" ভোগা দিয়ে ভুলান সহজ নহে,—তাঁহাকে নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে সম্মত হইতে হইল।

অনেকদিনের কথা,—সেই অদ্ভুত রিপোর্টের সব কথা এখন আর আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না,—কিন্তু মুখবন্ধটুকু তার এমন মধুর ছিল যে, একবার পাঠ করিয়াই তাহা আমার হৃদয়ে একেবারে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। মুখবন্ধটুকু এইঃ— "মহিমার্ণবেষুঃ—

দারোগাবাবু ইংলিশমেণ্ট, নূতন ধনী শ্যামভদ্র, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল, অধীন তাবেদার সজ্জেমীনে গিয়া সমুদায় হাল ওয়াকিব হইয়া হুজুরের

আদেশ অনুযায়ী দারোগাবাবুর অঙ্গসেবার বিবরণ নিম্নে নিবেদন পাইতেছিঃ—”

সৌভাগ্যবশতঃ আমাকে এই মধুর ভাব এবং ভাষাসংবলিত রিপোর্টটীর অনুবাদের কষ্টস্বীকার করিতে হইল না। রিপোর্টখানা আগাগোড়া পাঠ শেষ হইতে না হইতেই কেদারবাবু আসিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি বলিলেন, “আর বিলম্ব কর্‌বেন না, এইবার চলুন তারাপুর যাত্রা করি, —সাহেব যে কখন আসবেন, তার কোন স্থিরতা নাই। আমাদের একটু আগে যাওয়াই ভাল।”

আমি বিপদ্-সমুদ্রে কূল পাইয়া দ্বিরুক্তি-মাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলাম। শ্যামলালবাবু তখনও তাঁহার রিপোর্টের তর্জ্জমার জন্য অনুরোধ করিতে থাকায় আমি বলিলাম, “দেখুন, অমন পাকা রিপোর্টের ইংরেজী করা আমার সাধ্যের অতীত,—ইংরেজী অনুবাদ করতে গেলে অমন সুন্দর রিপোর্টটী একেবারে মাটি হয়ে যাবে,—তার চেয়ে কাল আপনি তারাপুরে রিপোর্টটী সঙ্গে নিয়ে যাবেন, সেইখানে ওটি সাহেবের নিকট পেশ করলেই হবে’খন।”

শ্যামলালবাবু তাঁহার রিপোর্টের প্রশংসা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—সেজন্য আমার প্রস্তাবে আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। আমাদিগকে বিদায় দিবার সময় শ্যামলালবাবু বলিয়া দিলেন, “তোমরা যাও, বিনুকে আমি আজই তারাপুরে পাঠাচ্ছি,—আমিও কাল “পারণ” করে যত শীঘ্র পারি ওখানে গিয়ে হাজির হব। যদি সাহেব-বাহাদুর আগেই এসে পড়েন, তবে দয়া করে বলো, যে আমার অসুখ হয়েছে।”

ডেকলতলা হইতে তারাপুর অনুমান দশ মাইল ব্যবধান। উহা মুসলমান-প্রধান গ্রাম; দুই তিন ঘর হিন্দু আছে বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা অতি হীন। এই গ্রামে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের একটী ক্ষুদ্র বিশ্রামাগার আছে, সেইখানেই সকালে কাছারী হইবে। গ্রামে এই বাড়ীটি “ডাক-বাঙ্গলা” নামে খ্যাত, আমরাও সেই নামেই ইহার উল্লেখ করিব। গ্রামে হাটবাজার দূরে থাকুক, একটা মুদীর দোকান পর্য্যন্ত নাই। তারাপুর আসিতে আমাদের রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। মধ্যাহ্নে সেই যে মোটা আটার কয়েকখানা লুচি খাওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তৃপ্তি না হইলেও উদরে অস্থিরতাটা চলিতেছিল যথেষ্ট, সেইজন্য নৈশ ভোজনে আর তেমন রুচি হইতে ছিলনা,—আর রুচি হইলেও এখানে সে সাধ পূর্ণ হইবার কোন উপায় বা সম্ভাবনা ছিল না। পূর্ব্ব-রাত্রিতে স্থানাভাববশতঃ নৌকায় নিদ্রার বড় ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল, আজ সেজন্য কেদারবাবুকে নৌকায় রাখিয়া আমি নিজের বিছানাপত্র ও মোটমাট সঙ্গে লইয়া “ডাকবাঙ্গলায়” আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভালকরিয়া একবার পাঠ করিবার জন্য মোকদ্দমার নথিটীও কেদার-বাবুর নিকট হইতে চাহিয়া লইলাম। আমি যখন নৌকা হইতে নামিয়া আসি, তখন ভাটার প্রায় শেষ অবস্থা, নৌকাখানা তাই একেবারে খালের তলায় গিয়া পড়িয়া ছিল।

আমি একটা আমগাছের গুঁড়ির নিকট নৌকার গলুইটী লাগাইয়া কোনমতে জুতা বাঁচাইয়া ডাঙ্গায় নামিলাম। মাল্লারা সেই গাছের শিকড়ের সঙ্গেই নৌকা বাঁধিয়া নৈশভোজনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। রামদীন কনেষ্টবলও আমার সঙ্গে ডাঙ্গায় আসিয়া “ডাকবাঙ্গলার” মেজেতে “কম্‌লী” পাতিয়া শয়ন করিল।

তখন অনেক রাত্রি, আমি গভীর নিদ্রায় অচেতন,—এমন সময় মনে হইল, কে-যেন বাহির হইতে ডাকিতেছে, “দারোগাবাবু, ও দারোগাবাবু, শীঘ্র উঠুন, আমরা প্রাণে মারা গেলুম।”

ঘুম আমার ভাঙ্গিয়াও যেন ভাঙ্গিতে ছিলনা। বাহিরের ডাকাডাকি আমার কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে রামদীনের ঠেলাঠেলিতে ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল,—আমি ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম। বালিশের নীচে ভাগ্যে একটা দিয়াশলাই ও একটী মোমবাতি রাখিয়া ছিলাম, তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দেখি, কেদারবাবু ভিজা গায় ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। ‘ব্যাপার কি’ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, “ব্যাপার কি এখনও বুঝতে পারছেন না?—নৌকা ডুবে গেছে!”

কি করিয়া নৌকা ডুবিল জানিতে চাহিলে পিছনদিক হইতে করিমবক্স মাঝি উত্তর করিল, “বাবু, আপনি যখন নেমে আসেন, নৌকাখানা তখন আমরা আম গাছের শিকড়ের সঙ্গেই বেঁধে রেখেছিলাম। আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে আমি পীরমামুদকে বল্‌লাম, ‘পীরমামুদ, একটা পাড়া পুঁতে নৌকাখানা তার সঙ্গে বেঁধে রাখ, কারণ গাছের যে শিকড়টায় নৌকা বাঁধা আছে, সেটা প্রায় খালের তলায়, জোয়ারের সময় ওখানে নৌকা বাঁধা থাক্‌লে নৌকার গলুই ভাস্‌তে পারবে না।’ পীর মামুদ আমার কথামত একটা পাড়া পুঁতে নৌকাখানা সেই পাড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখলে—কিন্তু বুদ্ধি করে নৌকার গলুইটাও সেই সঙ্গে শিকড়ের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে নি। জোয়ারের সময় জলের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা যখন উঁচু হচ্ছিল, তখন গলুইটা কোনরকমে আমগাছের শিকড়ের নীচে আটকে গিয়েছিল। আমরা সারাদিন খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়াতে এ-সব কাণ্ড কিছুই টের পাই নি। হঠাৎ গায়ে জলের ঝাপটা লাগাতে হুড়মুড় করে যেমন উঠ্‌তে যাব, অমনি নৌকাখানা জলের মধ্যে তলিয়ে গেল! গলুইটা তখনও গাছের শিকড়ে আট্‌কে থাকাতে ব্যাপার বুঝতে বিলম্ব হল না। তাড়াতাড়িতে আমরা নৌকার কোন জিনিসই বাহির করতে পারি নি, কেবল পেস্কার-বাবুকে কোনমতে ছাপ্পড়ের নীচে থেকে টেনে হিচ্‌ড়ে বাইরে আন্‌তে পেরেছি। তাঁর বিছানা-বালিশ, আমাদের কাঁথা কাপড় হাঁড়ী-কুঁড়ি সব ডুবে গেছে হুজুর, সব ডুবে গেছে!”

আমার গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগে শুক্‌নো কাপড় ছিল, কেদারবাবুকে তাহারই এক-খানা বাহির করিয়া দিলাম, তিনি সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আমার শয্যাসহচর হইলেন। এত দুঃখের মধ্যেও ‘নথিটী রক্ষা

পাইয়াছে' বলিয়া কেদারবাবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মাঝিদের সাহায্যের জন্য রামদীনের সঙ্গে গ্রামের চৌকীদার এবং ডাক-বাঙ্গলার পাহারাওয়ালাকে পাঠাইয়া দিলাম। ভাটার সময় জল সেঁচিয়া উহারা নৌকাখানা উদ্ধার করিলে দেখা গেল, জিনিসপত্র বেশী কিছু ভাসিয়া যায় নাই,—কেবল ভিজিয়া গিয়াছে মাত্র। আমার বড় সাধের দাবাবোড়েগুলি ছাপ্পড়ের মধ্যেই পাওয়া গেল, তবে পেষ্টবোর্ডখানা একেবারে গলিয়া যাওয়াতে উহাকে খালের জলে বিসর্জ্জন দিতে হইল। কেদারবাবুর তোষক ও বিছানার চাদরখানা নিকটেই একটা ঝোপের মাথায় পাওয়া গেল,—কিন্তু তাঁহার মাথার সামলা এবং শিয়রের বালিশটির কোনই সন্ধান হইল না। মাঝিরা পরের দিন সকালে "পান্তা" খাইবে বলিয়া "সুঁটকি" মাছের ঝোল রাঁধিয়া রাখিয়াছিল, নোনা জলে সে ঝোলের আর চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই,—হাঁড়ীর তলায় কেবল মাছকয়খানা কাদামাখা অবস্থায় পাওয়া গেল। সোনাউল্লা কাতর দৃষ্টিতে মাছ কয়খানা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর "নসীবে না থাক্‌লে ভোগে আস্‌বে কেন!" —বলিয়া মাছকয়খানা খালের জলে ফেলিয়া দিয়া হাঁড়িটি ধুইয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখিল।

তাড়াতাড়ি সকল জিনিস ডাঙ্গায় তুলিয়া শুকাইতে দেওয়া হইল,—কারণ, আর কিছু না হোক্, চোগা চাপকান না শুকাইলে ত কেদারবাবুর এজলাসে যাওয়াই হইয়া উঠিবে না।

বেলা সাড়ে-নয়টার মধ্যে সকল সাক্ষীকে ডাকাইয়া ডাকবাঙ্গলায় জমা করা হইল, এবং যাহাতে তাহাদের কেহ উঠিয়া না যায় সেজন্য রামদীন কনেষ্টবল, এবং দুইজন চৌকিদারকে সেখানে মোতায়েন রাখা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিনোদ জমাদার বা শ্যামলালবাবু দারোগার তখনও কোন খোঁজ-খবর নাই! থানা হইতে একটী কনেষ্টবল পর্য্যন্ত তারাপুরে পদার্পণ করে নাই! একেই বলে "যার বিয়ে তার মনে নেই"।

গতকল্য আমাদের একপ্রকার অনাহারেই কাটিয়া গিয়াছে, আজও কাহাকেও খাওয়া-দাওয়ার কোন যোগাড়-যন্ত্র করিতে দেখিলাম না! এখানে কোন দোকান-পাট না থাকাতে কিছু কেনাও গেল না। নৌকায় মাঝিমাল্লারা একে একে গ্রামের মধ্যে স্বজাতির বাড়ীতে গিয়া যাচিয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়া আসিল,—রামদীনও চৌকিদার পাঠাইয়া গোটা-দুই ডাব-নারিকেল আনাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিল,—আমি আর কেদারবাবুই কেবল খালি পেটে বোকা বনিয়া মুখ চুণ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বেলা এগারটার পর শ্যামলালবাবু সশরীরে দর্শন দিলেন, এবং "পারণ" করিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হঠাৎ একটা অপঘাত-মৃত্যুর সংবাদ পাওয়াতে তিনি নাকি বিনোদ-জমাদারকে কালই অন্যত্র পাঠাইয়াছেন। স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত শ্যামলালবাবু আমাদের খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়াছে কিনা

জানিতে চাহিলে আমি কোন কথা বলিলাম না, কিন্তু কেদারবাবু গাত্রজ্বালা নিবারণ করিতে না পারিয়া শ্যামলালবাবুকে কড়া-মিঠা দুকথা শুনাইয়া দিলেন। অন্যলোক হইলে বোধহয় লজ্জায় অধোমুখ হইত—কিন্তু শ্যামলালবাবুর সে সব বালাই নাই, তাঁহার কোনই ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি গ্রামের চৌকিদার দফাদার পঞ্চায়েত মৃত সকলকে ডাকিয়া তাহারা আমাদের আহারের কোন বন্দোবস্ত করে নাই কেন জিজ্ঞাসা, খুব একচোট গালাগালি করিয়া লইলেন, এবং তখনই যেখান থেকে পারে, ডাল ডাল, মাছ দুধ, তেল নুন, মশলা তরকারী সব যোগাড় করিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। হুকুমপ্রাপ্তিমাত্র শ্যামলালবাবুর সঙ্গী থানার দুইজন কনেষ্টবল, চৌকিদার দফাদারকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের মধ্যে ছুটিয়া গেল, এবং একঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র আনিয়া শ্যামলালবাবুর নৌকায় তুলিয়া দিল।

শ্যামলালবাবু রন্ধনের ব্যবস্থা করাইতেছেন,—এমন সময় একদিক দিয়া প্রেক্ সাহেব ঘোড়ায়, আর একদিক দিয়া আসামীদের মোক্তার নাজিরালী মিঞা পাল্কীতে চড়িয়া "ডাকবাঙ্গলায়" শুভাগমন করিলেন। ধড়া-চূড়া আমার আগেই পরা ছিল,—কাজেই সাহেব আসিবামাত্র সসম্ভ্রমে একটা সেলাম দিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম,—কেদারবাবু ও শ্যামলাল-বাবু হাঁশফাঁশ করিতে করিতে দৌড়িয়া পোষাক পরিতে গেলেন। সাহেব ঘোড়া হইতে নামিয়াই, "বিলাসপুর সাঁকোমে বিচাল কাঁহে নেহি দিয়া,—হামারা ঘোড়াকা গোড় মাট্টিমে বৈঠ্ গিয়া থা"—বলিয়া শ্যামলালবাবুকে বড়ই জোরতলব করিলেন। শ্যামলালবাবু তখন ধুতি খুলিয়া সবে পেণ্টুলানটি পরিয়াছেন, তখনও বোতাম আঁটা হয় নাই,—সাহেবের ডাকা-ডাকিতে তিনি কোনমতে কোটটী গায় এবং টুপিটি মাথায় দিয়া পেণ্টুলানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে দৌড়াইয়া আসিলেন। সাহেবের মূর্ত্তি দেখিয়া শ্যামলাল বাবুর যেন মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না,—বার দুই তিন কেবল "Yes sir," "No sir," "হুজুর মা-বাপ" বলিয়া বলিদানের পাঁটার মত থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। প্রেক্ সাহেব ছোকরা সিভিলিয়ান হইলেও লোক নেহাৎ খারাপ ছিলেন না,—তিনি সাধারণের সম্মুখে শ্যামলালবাবুকে আর কিছু না বলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া তখনই সেই সাঁকোর দুইধারে বিচালি পাতিবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন,—যেন ফিরিবার সময় ঘোড়ার আর কোন কষ্ট না হয়। শ্যামলালবাবুর নিকট শুনিলাম, বর্ষার জলে বিলাসপুরের কাঠের পুলের দুইপার্শ্বের কাঁচা-মাটী সব ধুইয়া যাওয়াতে সাহেব-বাহাদুর আগেই সেখানে মাটী ও বিচালি বিছাইয়া দিতে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন,—শ্যামলালবাবু স্বয়ং সেখানে না গিয়া একজন কনেষ্টবলকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সেই কনেষ্টবল যে কি দিয়া কি করিয়াছে,

সে বিষয়ে আর তিনি কোন সন্ধান করেন নাই। যাহা হউক, আমি তখনই একজন দফাদার, চারিজন চৌকিদার এবং থানার একজন কনেষ্টবলকে বিলাসপুর সাঁকোয় পাঠাইয়া দিলাম, এবং অবিলম্বে সমুদায় মেরামত করিয়া, সাহেব ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলাম। উহারা গ্রাম হইতে দুই-তিনখানা কোদাল এবং প্রত্যেকে একএক বোঝা বিচালি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল। সাহেবের সহিস তখনও আসিয়া উপস্থিত না হওয়াতে একজন চৌকিদার সাহেবের ঘোড়াটী এদিক ওদিক টহলাইতে লাগিল।

আমি কেদারবাবুর বিপদের কথা সাহেবকে বলিবামাত্র তিনি হোহো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বটে, তাই নাকি? আমি বড় দুঃখিত হলাম বাবু! আচ্ছা, পেস্কার-বাবুকে সামলা না পরেই আস্‌তে বলুন,—সামলার সঙ্গে বাবু যে তাঁর মাথাটিও খোয়াননি,—এইটুকুই সৌভাগ্যের বিষয়!"

সাহেব ডাকবাঙ্গলার হলঘরে সবে গিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় তিনটী নব্য ছোকরাবাবু কোথা হইতে আসিয়া দুয়ারে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে সুরু করিলেন। চাপরাশী তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, কাজেই সাহেবের স্বচ্ছন্দতার জন্য কেদারবাবু এবং আমিই দায়ী। আমরা বাবু-কয়টীকে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা সে কথা আমোলেই আনিলেন না। শুনিলাম, ইঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একজন তালুক-দারের ভাগিনেয়, শ্যালক ও পোষ্যপুত্র। অল্পসময়ের মধ্যেই প্রেক্ সাহেবের দৃষ্টি এই বাবু-তিনটীর উপর পড়িল। একে সাহেব পিপুলবাড়ী ষ্টেশন হইতে ঘোড়ায় প্রায় ১২।১৩ মাইল কাঁচা রাস্তা কাদামাটী ভাঙ্গিয়া আসিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—তাহাতে আবার সাঁকোর নিকট ঘোড়ার পা আট্‌কাইয়া যাওয়াতে তাঁহার মেজাজটাও তত প্রসন্ন ছিল না,—কাজেই ছোকরা-বাবু কয়টীর এইরূপ উঁকিঝুঁকি মারা তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবু, এই ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করুন, এঁরা এখানে কি চান?"

আমি বাবু-কয়টীকে তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সাহেবকে দেখিতে আসিয়াছি।"

প্রেক্-সাহেব বাঙ্গলা ভাল না জানিলেও মোটামোটি একরকম বুঝিতে পারিতেন,—অন্ততঃ "দেখিতে আসিয়াছি" এই কথাটা বোধহয় ভালই বুঝিয়াছিলেন,—কারণ বাবুদের মুখের কথা শেষ না হইতেই তিনি চাবুক হাতে লাফাইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! ওরা আমাকে দেখ্‌তে এসেছে? আমি কি সং? এখনি ওদের দূর করে দাও!"

সাহেবের মূর্ত্তিদর্শনেই বোধহয় বাবু-কয়টীর দর্শন-পিপাসা শীতল হইয়া গিয়াছিল,—কারণ তাঁহারা সেখানে আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব না করিয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ পদক্ষেপে দৃষ্টি-পথের আগোচর হইয়া পড়িলেন!

বেলা একটার সময় সাহেব মোকদ্দমা

আরম্ভ করিলেন। তখন চাপরাশীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই "হানিফগাজী আসামী হাজির হ্যায়,—হানিফগাজী আ—সা—ম! নেহারদ্দি মোল্লা আসামী হাজির হ্যায়,—নেহারদ্দি মোল্লা আ—সা—ম!"—ইত্যাদি ডাকে-হাঁকে ডাক-বাঙ্গলা একবারে সরগরম হইয়া উঠিল। একটা গাছতলায় কয়েকটা নেংটিপরা বালক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, চাপরাশীর শ্মশ্রুবহুল মুখমণ্ডল এবং মেঘমন্দ্রবৎ কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারা আর উহার অপেক্ষা করিতে সাহস না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের ভিতরে অদৃশ্য হইল।

নাজিরালী মোক্তার আ-ভূমি নত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া আসামীগণের পক্ষ-সমর্থনে দণ্ডায়মান হইলেন। মোক্তার সাহেবের মূর্ত্তিটী তেমন মনোরম ছিল না। মোক্তারীতে তাঁহার পশার প্রতিপত্তিও তেমন বেশী নয়। তবে সে-সময়ে সহরে আর কোন মুসলমান মোক্তার না থাকায় স্বজাতি-মহলে তাঁহার কিছু কিছু মক্কেল জুটিয়া যাইত, এবং তাঁহাতেই কোনমতে তাঁহার দিন-গুজরাণ হইত। মোক্তার-সাহেবের বাড়ী এই তারাপুরেরই সন্নিকটে; শুনিলাম, একজন আসামী নাকি তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়,—এবং সেইজন্যই এই মোকদ্দমায় তাঁহার শুভাগমন হইয়াছে। ১৮৯১ সালের সেন্সাসের সময় নাজিরালী মিঞা বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য সহরে গিয়াছিলেন। পরীক্ষার পর সেন্‌সাসের ডেপুটী কামিনীবাবুর পেস্কার আতাউল রহমান মিঞাকে ধরিয়া সেন্সাস-আপিসে তিনি একটী চাকুরী লাভ করেন। মাসিক বেতন ছিল বারো টাকা, আহারের ভারটা আতাউল রহমান সাহেবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চাকুরী উপলক্ষে কাছারীতে ঘুরিবার সময় নাজি-রালী মিঞার মনে মোক্তারী পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প উদিত হয়। সে সময় বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিলেই মোক্তারী পরীক্ষা দেওয়া যাইত। আতাউল রহমান সাহেব দয়া করিয়া এর-তার কাছে চাহিয়া-চিন্তিয়া মোক্তারীর পাঠ্য বহি-কয়খানা সংগ্রহ করিয়া দেন। নাজিরালি মিঞা তাহা বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে থাকেন। দুই মাসের পর ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল নাজিরালী মিঞা তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছেন। খোদার দয়ায় মোক্তারী পরীক্ষাতেও তিনি একবারেই উত্তীর্ণ হইলেন, এবং সনন্দ পাইবামাত্র সদরে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না,—তবে শুনিয়া শুনিয়া "yes sir," "no sir," "very good sir," "poor man sir," প্রভৃতি গোটাকতক বাঁধা গৎ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যেখানে-সেখানে সেই কয়টা কথার তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন। সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় নাজিরালী-সাহেব সর্ব্বদাই অতি বিশুদ্ধ ভাষায় কথা কহিতেন। একবার ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারাপদবাবুর এজলাসে একটী হাঙ্গামা মোকদ্দমায় ইয়ারমামুদ নামক জনৈক আসামীর পক্ষসমর্থনের জন্য নাজিরালী মিঞা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী ভজহরি গোয়ালাকে জেরা করিবার সময় নাজিরালী

মিঞা বলিলেন, "দেখ ভজহরি, এই বিচারপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মাধিকরণ, এখানে প্রবঞ্চনা করিলে নিরয়গামী হইতে হইবে,—তুমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া সত্য কথা বলিতে শপথ গ্রহণ করিয়াছ,—সে কথা যেন বিস্মৃত হইও না,—একবার বিচারপতির দিকে চাহিয়া বল দেখি, এই আসামী ইয়ার-মামুদ একজন "প্রতিভাশালী" লোক কি না? অধিক কথা বলিয়া আদালতের মহামূল্য সময় নষ্ট করিও না,—এককথায় বল, "হাঁ," কি "না"—।" ভজহরি ত অবাক্,—মোক্তারবাবুর এই সাধু ভাষার বিন্দুবিসর্গও তাহার মাথায় ঢুকিয়াছিল কি না সন্দেহ,—কাজেই সে হতভম্ব হইয়া চারি-দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে চাহিয়া দেখিতে এবং ঘন ঘন মাথা চুলকাইতে সুরু করিল। নাজিরালী মিঞা সোৎসাহে সাক্ষীর এইরূপ বিব্রতভাব হাকিমকে নথিতে নোট করিয়া লইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। মোক্তার-সাহেবের বিদ্যা-বুদ্ধি তারাপদবাবুর অবিদিত ছিল না,—কাজেই তিনি বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"আপনার প্রশ্নটা কি মোক্তার-সাহেব?"

নাজিরালী মিঞা বলিলেন, "হুজুর, আমার প্রশ্নটা অতি সহজ, আমি সাক্ষীর নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, আমার এই মক্কেল ইয়ারমামুদ একজন "প্রতিভাশালী" লোক কি না?"

মজা দেখিবার সময় তারাপদবাবুর একটু চিবাইয়া চিবাইয়া কথাবলা অভ্যাস ছিল,—তার উপর তাঁর কি-যেন একটা ব্যারাম ছিল,—সম্মুখে চাহিয়া কথা বলিলে তাঁহার কণ্ঠ হইতে সহজ সুরেই বাহির হইত,—কিন্তু বাম বা দক্ষিণ দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া কোন কথা বলিতে গেলেই তাঁহার গলার সুর বেহালার মত অত্যন্ত সরু হইয়া যাইত!—তিনি ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া সরু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্র—তি—ভা—শা—লী—কা—কে—বলে—মো—ক্তা—র—সা—হে—ব?"

নাজিরালী মিঞা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "প্রতিভাশালী" মানে এই হচ্ছে হুজুর, যে ইয়ারমামুদের জমী, জমা, টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে কিনা—?"

হাকিম আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া লেন,—সঙ্গেসঙ্গে এজলাসে উপস্থিত উকীল মোক্তার, আমলা মক্কেল, এমন-কি সাক্ষী ভজহরি পর্য্যন্ত সকলেই হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। সেই দিন হইতে নাজিরালী-সাহেব সকলের নিকট ঘোরতর "প্রতিভাশালী" মোক্তার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল,—সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিয়া একবাক্যে আসামীগণকে চোর, বদমায়েস ও দাগী বলিয়া প্রমাণিত করিয়া গেল। "প্রতিভাশালী" মোক্তারের সমুজ্জ্বল প্রতিভাপূর্ণ কূটপ্রশ্নেও কোন সাক্ষী টলিল না,—হেলিল না,—কাহারও মুখ হইতে আসামীগণের সাপক্ষে একটিও কথা বাহির হইল না। গতিক ভাল নহে দেখিয়া মোক্তার সাহেব জেরার পরিমাণ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিতে আরম্ভ

লেন,—কারণ, মহীলতার অন্বেষণ করিতে রিতে প্রায়ই অহি নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িতে-ল,—অনেক কথা, যাহা আমাদ্বারা বাহির বার কোন সম্ভাবনা ছিল না, মোক্তার হেবের জেরার মুখে সাক্ষীরা সে-সব ও বলিয়া ফেলিতেছিল। জেরা দীর্ঘ হওয়াতে জবানবন্দীর পরিমাণ অত্যন্ত হইয়া গেল, কাজেই অতি অল্প সময়ের যেই পুলিশ-পক্ষের সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী াপ্ত হইল!

এইবার "সাফাই" সাক্ষীর পালা। প্রেক্ হেবের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আরও দুই-বার মফস্বলে আসিয়া আমি লক্ষ্য রিয়াছিলাম যে, Leading question জ্ঞাসা করিলে সাহেবের বড় ক্রোধ য়। কোনমতে বিপক্ষের দুই-একটা leading বলিয়া বুঝাইয়া দিতে লেই সেদিনের মত নিশ্চিন্ত!

নাজিরালী মিঞা তাঁহার সাক্ষী-দিকে, "কেমন হে বাপু, হানিফের তিন লের জমী আছে কি না?—নেছারদ্দি ারে ২৫।৩০ মণ গুড় বিক্রয় করে কি ?"—এমনি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা রিবামাত্র আমি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলাম, হুজুর, আমি মোক্তার-সাহেবের এই সব Leading question-এর দিকে আপনার আকর্ষণ করছি।"

আর যায় কোথা!—সাহেব তো চটিয়া র! সিংহের ন্যায় বিকট গর্জ্জন করিয়া প্রেক্ সাহেব মোক্তারকে ডাকিয়া লেন, "চুপ—চুপ! এরকম করে তুমি প্রশ্ন তে পাবে না! তুমি যদি আইনমত জেরা করতে না পার, তাহলে চুপচাপ বসে পড়!'

মোক্তার-সাহেব অমনি "হুজুর, হুজুর, poor man, poor man—" বলিয়া হাত কচ্‌লাইতে আরম্ভ করিলেন!

কিন্তু কে কার কথা শুনে,—সাহেব আর মোক্তারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়া, নিজেই সাফাই সাক্ষীগণকে তাঁহার অদ্ভুত হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী মিশ্রিত ভাষায় দুইচারি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া একে একে বিদায় দিতে লাগিলেন। আমার আর জেরা করিবারও আবশ্যক হইল না। মোক্তার-সাহেবের জড়সড় ভাব দেখিয়া আসামী এবং সাফাই সাক্ষীদের কেহই কোন উচ্চবাচ্য করিতে সাহস পাইল না। উহারা মনে করিল মোক্তার-সাহেব না জানি কি একটা বেফাঁশ কথা বলিয়া সাহেবকে চটাইয়া দিয়াছেন।

মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া মোক্তার-সাহেব বেশী সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করিতে সাহসী না হইয়া বলিলেন,—"হুজুর, আমরা আর সাক্ষী ডেকে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না,—আমার মক্কেলগণ যে নির্দ্দোষ, তা বোধ হয় হুজুর ভালরূপেই বুঝ্‌তে পেরেছেন,—এখন আমার প্রার্থনা এই যে, ধর্ম্মাবতার দয়া করে একবার আসামীদের ঘর-বাড়ীর অবস্থা দেখ্‌তে আজ্ঞা হয়। ওদের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, আর বাগান-ভরা গাছপালা দেখ্‌লেই হুজুর বুঝ্‌তে পারবেন যে, কোন্ দুঃখে,—কোন্ অভাবে ওরা চুরি করতে যাবে?"

Bad livelihood মোকদ্দমার আসামী

যদি হাকিমকে নিজ বাড়ী-ঘর দেখিতে অনুরোধ করে, তবে সে প্রার্থনা নামঞ্জুর করিবার নিয়ম নাই,—কাজেই প্রেক সাহেবকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মোক্তারের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল।

সাহেব কাছারী ভাঙ্গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে টিফিন্ খাইতে প্রবেশ করিলেন, এবং আর্দ্দালীকে অবিলম্বে ঘোড়া প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। ইংরেজ জাতি জলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, রণক্ষেত্রে যেখানেই যাক্‌না কেন, শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও পেটটা কখনও খালি রাখে না। তাই জল-কাদা ভাঙ্গিয়াও একজন খানসামা সাহেবের জন্য প্রচুর ফল, মূল, রুটী, মাখন, ডিম্ব, মাংস, সোডা, হুইস্কি প্রভৃতি লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সাহেব তৃপ্তির সহিত সেই সব দ্রব্যের সৎকার আরম্ভ করিলেন, আর বাহিরে আমি ও কেদার বাবু—হীন, অধম বাঙ্গালী,—দুইদিনের উপবাসী,—পেটের জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছিলাম!

প্রায় কুড়ি মিনিট পর সাহেব জলযোগ শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন,—কিন্তু তখনও আর্দ্দালির দেখা নাই। সাহেবের ঘোড়া প্রস্তুত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য আমি ডাকবাঙ্গলার পিছনদিকে একজন চৌকিদারকে পাঠাইয়া দিলাম, সে ব্যক্তিও আর ফিরিয়া আসে না দেখিয়া শেষকালে একপা-দুইপা করিয়া আমি নিজেই সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, ইহজীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। দেখিলাম, সাহেবের আর্দ্দালি ঘোড়াটীর গলার দড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর একপার্শ্ব হইতে একজন লোক, (তাহাকে "শালপ্রাংশু" বলিলেও "মহাভুজ" বলা যায় না,—কারণ তাহার গায়ে চামড়া ও হাড় ভিন্ন মাংস নামক পদার্থটার বড়ই অসদ্ভাব ছিল)—মাছ ধরিবার জন্য "খেপ্‌লা" জাল যে-ভাবে ছুঁড়িয়া মারে, সেই ভাবে রেকাবসমেত জিনটী ঘোড়ার পিঠে ছুঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে! ঘোড়াটী খুব তেজীয়ান্, যেমন উচু, তেমনই লম্বা। অশ্ব-জীবনে এইভাবে জিন পরার আরাম সে বোধ হয় আর কখনও ভোগ করে নাই,—কাজেই এই নবীনত্বের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া চারি পা তুলিয়া অশ্বিনীকুমারটি কেবল লম্ফ ঝম্প করিয়া বিশেষরূপে নিজের আপত্তি জানাইতেছিল। ঘোড়ার লাফানির সঙ্গেসঙ্গেই ঐ ক্ষীণকায় লোকটীও "এ দাদা, জান্ গিয়া,—জান্ গিয়া—" বলিয়া "শত হস্তেন বাজিনা" এই নীতি-বাক্যের অনুসরণ করিয়া তফাতে সরিয়া পড়িতেছিল।

ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম, প্রেক্ সাহেব চাবুক হাতে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! ঘোড়া এবং জিনের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাহেবের আপাদ-মস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, এবং "কোন্ হ্যায় তোম্,—হামারা সহিস্ কাঁহা গিয়া"—বলিয়া তিনি সেই ক্ষীণকায় লোকটির প্রতি চাবুক আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন! সে বেচারা ত ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—তাহার সুদীর্ঘ জঙ্ঘা-দুইটি ঐ ক্ষীণদেহের ভার

নেও অশক্ত হইয়া নুইয়া পড়িতে লাগিল! সাব দিতে বিলম্ব করাতে সাহেবের ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল,—তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "কোন্ হ্যায় তোম্ উল্লু? হামারা সহিস কাঁহা গিয়া, জল্‌দি বলো!"

সে বেচারা যোড়হাতে বলিল,—হুজুর, ধর্ম্মাবতার,—মাই-বাপ—হামারা কুছ্ কসুর নেহি,—আপ্‌কা সহিস বোখার হোকে পিপুলবাড়ী টিশনমে গিরা হ্যায়,—হাম্‌কো জোর কর্‌কে ভেজ্ দিয়া,—বোলা কি, তোম্ নেহি যাওগে, তব্ সাহেব তোম্‌কো ফাঁশী চড়াওয়ে গা,—তা করে হুজুর, সরকারকা হুকুম,—হাম জানুকা ডরসে হিঁয়া চলা আয়া,—হামারা শরিরৎ আচ্ছা নেই,—হাম্ জাত ধুনকর,—পেশা তোষক গদ্দি তৈয়ারী কর্‌না হামারা কাম হ্যায়,—ঘোঁড়া হাত্তীকা কাম হাম্ কভি নেহি কিয়া জনাব—"!

এত ক্রোধের মধ্যেও সাহেব আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাজেই বেচারা সেদিনকার এ যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিল। সহিসের হাতে পড়িয়া জিনটীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রেকাবের সঙ্গে লাগাম,—রাশের সঙ্গে পেটি,—নামদারের সঙ্গে জিনের ঢাক্‌নি সব জড়াইয়া আট্‌কাইয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল! সাহেব নিজ হস্তে সেই সব খুলিতে খুলিতে, উদ্দেশে সেই অনুপস্থিত সহিসের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। বহুকষ্টে যখন জিন লাগাম ছাড়াইয়া ঘোড়াকে প্রস্তুত করা হইল, তখন সাহেবের সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিয়া গিয়াছে।

লাফ দিয়া ঘোড়ায় উঠিয়াই সাহেব মোক্তারকে বলিলেন, "চল বাবু, কাঁহা তোমারা মক্কেল লোগ্‌কা ডেরা হ্যায়—।" মোক্তারসাহেব আসামীগণকে লইয়া সাহেবের ঘোড়ার পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন, আমরাও একটু পিছনে-পিছনে চলিলাম। খালিপেটে কাদাজল ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে পথ-ভ্রমণ ব্যাপারটা যে আমাদের পক্ষে তেমন সুখজনক হয় নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। খানিক দূর গিয়াই মোক্তার সাহেব ডাহিনে বাঁয়ে হাত তুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন, "হুজুর, এই সব জমী হানিফ গাজীর,"—"ঐ বাগান নেছারদ্দির,"—"ঐ যে গরু চরিতেছে ওগুলো সব ইব্রাহিমের।" —সাহেব এই সব কথা শুনিতে-শুনিতে ক্রমেই যে চটিয়া উঠিতেছিলেন, সেকথা আমরা পিছন হইতে বুঝিতে পারিলেও, "প্রতিভাশালী" মোক্তার সাহেব উৎসাহাতিশয্যে উহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আরও একটু পথ অগ্রসর হইয়া সাহেবকে শুনাইয়া শুনাইয়া মোক্তার-সাহেব তাঁহার অন্যতম মক্কেল জনাবালী ফকিরকে যেমন বলিয়াছেন যে, "কই হে জনাবালি, তোমার সেই বাঁধাঘাটওয়ালা পুকুরটা কোন্‌দিকে, দেখাও না সাহেবকে!"—অম্‌নি সাহেব ঘোড়ার রাশ ধরিয়া ডানদিকে হঠাৎ এমন-এক হেঁচ্‌কা টান দিলেন যে, ঘোড়াটা মুহূর্ত্তমধ্যে তড়াক্ করিয়া ঘুরিয়া পড়িল। মোক্তার-সাহেব তাড়াতাড়িতে তাল সামালাইতে না পারিয়া পিছনের একটা ছোট খানার ভিতরে একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন,—তাঁহার চোগা চাপকান

সমস্তই জল-কাদায় একেবারে বিচিত্র হইয়া গেল! সাম্‌লাটা মাথা হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল; ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিতে গিয়া মোক্তার-সাহেবের একপাটি জুতা কাদাতেই প্রোথিত হইয়া গেল, এবং মুখকমলও পঙ্কলিপ্ত হইল। মোক্তার-সাহেবের এই আকস্মিক দুরবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই বড় ব্যথিত হইলাম বটে, কিন্তু সাহেবের মনে ততটা সম-বেদনার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না!

"তোম্ পহিলা বোলা ইয়া সব্ জমীন্, বাগান, গরু ভৈঁষ্ সব তোমারা মক্কেলকা হ্যায়,—আভি বোলতা কি উস্ লোগ্‌কা ঘাটবান্ধা তালাও (পুকুর) হ্যায়,—থোড়া বাদ তোম্ বোলগে কি দুনিয়া ভর্ ওহি লোগ্‌কা এলাকা হ্যায়,—তোমারা সব বাৎ ঝুঁটা হ্যায়,—নেহি যাগা হাম্ তোমারা সাথ,—যাও, হাম্ সব্ সম্‌ঝ্ গিয়া,—সদর যায়কে মাম্‌লাকা হুকুম দেগা,—"এই কথা বলিতে বলিতে সাহেব পিপুলবাড়ী ষ্টেশনের দিকে সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। সুতরাং আমরাও অগত্যা ডাকবাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এতগুলি লোকের সম্মুখে এইভাবে অপ্রস্তুত হওয়াতে মোক্তার-সাহেবের মেজাজটা বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল। "আচ্ছা, থাক্ বেটা সাহেব, আমি সদরে গিয়েই হাইকোর্টে মোশন কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ব,—প্রেক্ সাহেবের কাছে এই মোকদ্দমার বিচার কোন মতেই হতে দেব না।"—বলিয়া তিনি মক্কেলদিগকে অবিলম্বে টাকার যোগাড় করিতে বলিলেন। মক্কেলেরা কিন্তু সুবোধ বালকের মত সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল না।

তাহারা সমস্বরে বলিল, "যান, যান, সাহেব, আপনার জন্যই আমাদের এই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল,—আপনিই সাহেবকে যা' তা' সাত সতের বলে চটিয়ে দিলেন। আপনার মত জল-জ্যান্ত মিথ্যাকথা আমরাও বলতে পারি না,—কার জমী, কার বাগান, কার গরু বাছুর সব আমাদের বলে দেখাতে গেলেন, তাতেই ত সাহেব অত রেগে উঠ্‌লো। জনাবালীর কোন্ পুরুষে কবে বান্ধা ঘাটওয়ালা পুকুর ছিল যে, আপনি সে কথা বল্‌তে গেলেন? অত বড় মিথ্যা কথাটা যে বল্‌লেন, যদি সাহেব সত্য-সত্যই পুকুর দেখতে চাইত, তবে কি উপায় হোত? চারিদিকে তিন ক্রোশের মধ্যেও যে কোন পুকুর নাই! ধোঁকা দিয়েই যদি সাহেবকে ভুলান যেত, তবে কি আর সাহেব হাকিমী করতে পারত? আপনাকে আনাই আমাদের ঝক্‌মারী হয়েছে,—সদরে গিয়ে আমরা অন্য মোক্তার দেব।"

মোক্তার-সাহেব গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা যা, তাই দিগে যা।—তোদের মত চোর মক্কেল আমার অনেক জুট্‌বে,—যা, অন্য মোক্তার দিয়ে জেলে পচে মর্‌গে যা! 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর'—তোদের বাঁচাবার জন্যেই আমি সাহেবকে এত করে বোঝাতে গিয়ে শেষকালে আছাড় পর্য্যন্ত খেলুম,—আর তোরা বেটারাই বলিস্ কিনা, আমি মিথ্যুক!—বেইমান নিমকহারাম বেটারা—জানিস্, এ-সব কথা

...লে মানহানির Case করা যায়? ...কেই ত ঘাড়ে চেপেছে এই বদমায়েসী ...কদ্দমা, তার উপর আবার মানহানির ...রি চড়া'লে যে দ্বীপান্তরে যেতে হবে, ...খোঁজ রাখিস্ ত? থাক্, তোদের সঙ্গে ...কে বকে আমি আর সময় নষ্ট করতে ...ই না,—দে আমার চুক্তির টাকা, ...দে আমার পাল্কী-ভাড়া,—আমি চলে ...ই,—তোরা তোদের পথ দেখ,—আমি ...খাস্ত করে এখনি তোদের জামীন ...রা করে দিচ্ছি, যা এখন হাজতে!"

কিন্তু মোক্তার-সাহেবের তর্জ্জন-গর্জ্জন ...গ্রাহ্য ত করিলই না—বরং—উল্টাইয়া ...ভ্যাংচাইয়া তাহারা বলিল,—"যাও যাও ...হেব,—টাকা যা পেয়েছ তাই ঢের,—...র এক-পয়সাও আমরা তোমাকে ...না। পাল্কী-ভাড়া কিসের? এলে ...পাল্কী ভাড়া করে? তোমার কোন্ ...ষে কে কবে পাল্কী চড়েছিল? এখনও ...গিয়ে তোমার ভায়েরা সব রোদে বৃষ্টিতে লাঙ্গল ঠেল্‌ছে,—অন্যখানে যা কর তা কর, এখানে পাল্কী চড়ে আস্‌তে তোমার একটু লজ্জাও কর্‌ল না? দেব না পাল্কী-ভাড়া,—যা পার তাই কর গিয়ে—!"

এই সময় শ্যামলালবাবু একটু অগ্রসর হওয়াতে আসামীদের বাক্যস্রোতঃ বন্ধ হইয়া গেল। মোক্তার-সাহেবের এই অপমানে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কনেষ্টবল-গণকে বলিলাম, "লাগাও হাতকড়ী সব বেটাকে,—মোক্তার-সাহেব যখন জামিন এব্‌রা করছেন, তখন সব বেটাকেই হাজতে যেতে হবে।"

হাজতের কথা উঠিবামাত্র বাছাদের মুখ আবার ছোট হইয়া গেল। একটু আগেই যে মোক্তারকে তাহারা যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া অপমানিত করিতেছিল, হাজতের নাম শুনিয়া আবার সেই মোক্তার-সাহেবেরই পা জড়াইয়া ধরিয়া সকলে অনুরোধ করিতে লাগিল, তিনি যেন তাহাদের জামিন এব্‌রা না করেন!

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

বিদেশে "আর্য্য সমাজ"

গুজরাতের স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত "আর্য্য সমাজ" ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই "সমাজের" আদর্শ অনুসারে ...প্রচার ও সমাজ সংস্কার পঞ্চনদেই বিশেষ ...প অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের প্রভাব যুক্ত-...দেশেও বিস্তৃত হইতেছে। বাঙ্গালী মারাঠা ও মান্দ্রাজী শিক্ষিত জনগণ ইঁহাদের কার্য্য প্রণালী অবগত আছেন। আর্য্য সমাজের "গুরুকুল", য়্যাংগ্লোবৈদিক কলেজ, বালিকা-বিদ্যালয়, "শুদ্ধি" বিধান, হিন্দী প্রচার ইত্যাদি সম্বন্ধে ভারতবাসীর নিকট নূতন পরিচয় দিতে হয় না। ইঁহাদের কার্য্য-

বিবরণ বাঙ্গালা, মারাঠি ইত্যাদি সকল প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। Modern Review, Indian Review Vedic Magazine ইত্যাদি ইংরাজী মাসিক পত্রেও আর্য্য সমাজের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুই এক জন ইংরাজ এবং ইয়াঙ্কি পর্য্যটক আর্য্য সমাজের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকালকার দিনে বিদেশীয় মুখে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতে থাকিলে দেশীয় সমাজে শীঘ্রই প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। আর্য্য-সমাজও সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ কয়েকজন বিদেশী বন্ধু পাইয়াছেন।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা কেন্দ্রে বিবেকানন্দ-পন্থী "স্বামী"রা বেদান্তভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দয়ানন্দপন্থীরা এখনও ভারতবর্ষের বাহিরে কোন কেন্দ্র স্থাপন করিতে অগ্রসর হন নাই বোধ হইল। যুক্ত-প্রদেশের স্বামী রামতীর্থের ভক্তসংখ্যা এক্ষণে অতি অল্প মাত্র। ভারতবর্ষেই এখনও তাঁহার কীর্ত্তি সুপ্রচারিত হয় নাই। অল্প দিন হইল ৺লালা বৈজনাথ রায় বাহাদুরের উদ্যোগে হরিদ্বারে "রামাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই রামতীর্থ পন্থী-দিগের একমাত্র কেন্দ্র। বিদেশে ইঁহাদের অভিযান সুরু হইতে দেরী আছে।

লণ্ডনে থাকিতে দেখিয়াছিলাম আর্য্য সমাজপন্থীরা একটা ধর্ম্ম মন্দিরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে ইঁহাদের নিয়মিত রূপে যাওয়া-আসা আছে। অন্যান্য মতা-বলম্বী ভারতীয় ছাত্রেরা, পর্য্যটক এবং ব্যব-সায়ীগণও এই মন্দিরের উপাসনা কার্য্যে যোগদান করিতেন। ইংল্যাণ্ড-প্রবা আর্য্য-সমাজ-পন্থীদিগের উদ্যোগে অন্যা ভারতীয় উৎসবও বিলাতে অনুষ্ঠিত হই থাকে। দয়ানন্দের জন্মতিথি, গুরুকু প্রতিষ্ঠা, য়্যাংগ্লোবৈদিক কলেজ স্থাপন ইত্যা উপলক্ষে সভাসমিতি আহ্বান করা অথ ভোজপানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সক উৎসবে বিলাতের অধ্যাপক, পার্লামেণ্টম সম্পাদক প্রভৃতিও যোগদান করেন। এ উপায়ে বিলাতী শিক্ষিত সমাজের মহ মহলে আর্য্য সমাজের নাম প্রবেশ করিতেছে

আমেরিকায় আসিয়া দেখি কা "নবজীবন"-সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশ দেব শাস্ত্রী মহাশয় বৎসরকালাবধি ইয়া স্থানে নানাপ্রকার বক্তৃতা করিতেছেন কেশবদেব আর্য্যসমাজের একজন করিৎক প্রচারক। ইনি পঞ্চনদের শেষ প্রা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সকল প্রদে পর্য্যটন করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং পাঞ্জাবী ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাস করেন কাশীতে এবং বহু বাঙ্গালী কেজোলোকের স ইহার বন্ধুত্ব আছে। কাজেই মার্কিনদে ইনি ভারতবর্ষের অনেক কথা প্রচা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রী সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের এ বিশেষভাবে আর্য্যসমাজের বিরুদ্ধে মত প্রচ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এইজন্য আ সমাজের সঙ্গে পাদ্রী মহাশয়গণের ঝগ লাগিয়াই আছে। আমেরিকায়ও কেশ দেবকে পাদ্রীগণের সঙ্গে যথেষ্ট বাক্‌ করিতে হইয়াছে।

বিলাতে এবং ইয়াঙ্কিস্থানে পাদ্রী

ারতবর্ষসম্বন্ধে মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিয়া কেন। তাঁহাদের বক্তৃতার সারমর্ম্ম ানত এইরূপ :—"ভারতবর্ষের নরনারীগণ দভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য; ইহাদের ধর্ম্ম-ন নাই—পারিবারিক জীবন অতিশয় ীতিহীন; জীবনের সকল কার্য্যে সংস্কারের আবরণ আছে। একমাত্র ষ্টধর্ম্ম-প্রচারের ফলে ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ তি হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে ারতবাসীরা মানুষ হইবে না। আমরা শেষ স্বার্থত্যাগ করিয়া এই অধর্ম্ম ও ধর্ম্মের দেশে বিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্মপ্রচারে ঠী হইয়াছি। আপনারা যদি প্রকৃত ষ্টান হন, তাহা হইলে আমাদিগকে লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া ভগবানের শীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।" এইরূপ বক্তৃতার সঙ্গে পাদ্রী-মহাশয়গণ ভারতবর্ষের নানা-কার কুৎসিত চিত্র দেখাইয়া থাকেন। দের কোন-কোনটা হয়ত সত্য, কোন-কোনটা হয়ত কাল্পনিক। এই সকল দেখিয়া-নিয়া শ্রোতারা দয়ার্দ্র হইয়া পড়ে—যাহার নিকট টাকা-পয়সা আছে সে তাহা দিয়া পাদ্রীসমাজের সাহায্য করে। এই কারণে ারতবর্ষের নীতিহীনতা, ধর্ম্মহীনতা, অসভ্যতা ইত্যাদির কাহিনী প্রচার করা পাদ্রীদিগের একটা ব্যবসায়বিশেষ! ভারতবর্ষের লোকেরা শিক্ষিত, সচ্চরিত্র কিম্বা ধার্ম্মিক, এ-কথা মাণ হইলে ইয়াঙ্কিরা অথবা য়ুরোপীয়েরা পাদ্রী-প্রচারকগণকে সাহায্য করিবে কেন? এইজন্যই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের কোন লোক বিদেশে কোন তত্ত্ব প্রচার করিতে আসিলেই, পাদ্রীরা প্রথম হইতেই তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। এইরূপ বাধা না দিলে যে তাঁহাদের "ভাত মারা" যাইবে! বিবেকানন্দ-পন্থীরা এ-কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন। পাদ্রীরা যে কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রচারক-গণের প্রতিকূল, তাহা নয়। সেদিন আই-ওয়া নগরে ঐতিহাসিক শ্যামবগের কথা-বার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুধীন্দ্র নাথ বসুকে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে পাদ্রী মহাত্মারাই অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা রাষ্ট্রের নায়কগণকে লিখিয়া পাঠান, "যদি একজন হিন্দু আমাদের খৃষ্টান-সমাজের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পুত্রগণকে শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে আমাদের খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারতীয় হিন্দুরা আমাদিগকে আর ভয় ও সম্মান করিবে না। দেশীয় ইয়াঙ্কিরাও বুঝিবে, যে ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত লোক ইয়াঙ্কিস্থানে অধ্যাপক হইতে পারে, সেই ভারতবর্ষে আমাদের প্রচার-কার্য্য অনাবশ্যক। সুতরাং আমরা স্বদেশে অর্থসাহায্য পাইব না।"

কেশবদেব ইয়াঙ্কিস্থানের কতিপয় নগরে বক্তৃতা দিয়াছেন। দু-একখানা পুস্তকও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে ক্যালি-ফর্ণিয়া প্রদেশের কোন কলেজে উচ্চঅঙ্গের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহা ব্যতীত আমেরিকার হিন্দুস্থান পরিষদের কার্য্যে ভারতীয় ছাত্রগণকে ইনি সাহায্য করিতেছেন—বর্ত্তমানে ইঁহাকে পরিষদের সভাপতির পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবারকার বিশ্বমেলায় যাহাতে ভারতীয় দ্রব্য-নিচয় প্রদর্শিত হয় তাহার জন্য কেশবদের

কয়েক মাস যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। নানা কারণে শ্রম বিফল হইয়াছে। প্রদর্শণীতে ভারতের কথা প্রচারিত হইতে পারিল না। কিন্তু আগামী আগষ্ট মাসে "বিশ্ব-হিন্দুস্থানী-পরিষদে"র সম্মিলন (International Hindusthanee Student's Convention) আহুত হইবে। সেই সময়ে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো-নগরে নানা সভা-সমিতি-সম্মিলন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইবার কথা। তখন যাহাতে ভারতের কথা সুপ্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। কেশব-দেবের উৎসাহ এবং ভারতীয় ছাত্রগণের উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

কয়েকদিন হইল, "আর্য্যসমাজ" সম্বন্ধে



লাজপত রায়

একখানি সুলিখিত ইংরাজী গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহা বিলাতের লংম্যান্‌স্ গ্রীণ কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত। লেখক শ্রীযুক্ত লাজপত রায়। ইনি বিলাতে এবং আমেরিকায় পর্য্যটন ও বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। লাজপত রায়ের নাম বিলাতের অনেক মহলেই পরিচিত ছিল—ইয়াঙ্কিস্থানেও এইবার ইনি পরিচিত হইলেন। কোথাও বৈদিকধর্ম্ম, কোথাও হিন্দুর নীতিজ্ঞান, কোথাও আর্য্যসমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিবার সুযোগও ইহার জুটিয়াছিল। কতিপয় অধ্যাপক ইহার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া বুঝা গেল। ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিদেশীয় শিক্ষিত জনগণের শ্রদ্ধা-অনুরাগ যত বৃদ্ধি পায় ততই আমাদের মঙ্গল। এ সকল দেশের সংবাদপত্রে কোন ব্যক্তির চিত্র প্রকাশিত হওয়া অতিশয় মামুলি কথা। সুতরাং কেশবদেব ও লাজপত রায় প্রভৃতির ফটোগ্রাফও বিভিন্ন দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণও মাঝে মাঝে মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছেন। এই উপায়েই বর্ত্তমান যুগে কার্য্য প্রচার ও মতপ্রচার ইত্যাদি হইয়া থাকে। বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের এবং দুনিয়ার সকল ব্যক্তিই এইরূপে প্রচারিত হইয়াছেন। দুঃখের কথা—অধিকসংখ্যক ভারতীয় নরনারী দুনিয়ার বাজারে প্রচারিত হইতেছেন না। জগতে ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক লাগিয়া যাউন। সহস্র সহস্র ভারতবাসীর চিত্র বিলাতী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, ইয়াঙ্কি, মেক্সিকান, ব্রেজিলিয়ান, চীন ও জাপানী পত্রসমূহে প্রকাশিত হউক। দুনিয়ার রিপোর্টারগণ সহস্র সহস্র ভারতবাসীর মত ও কার্য্যের আলোচনা নানাপত্রে প্রকাশিত করিবার সুযোগ লাভ করুন।

লাজপত রায়ের গ্রন্থ সচিত্র। এই গ্রন্থে লিখিত সকল তথ্য এবং চিত্রগুলি ভারতবাসীর সুপরিচিত। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক সিডনি ওয়েব।

সিডনি ওয়েব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এই বারকায় তাঁহার নিজচোখে দেখা নানা বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'নবীন ভারতে'র উত্থান হয়। তাহার পর হইতে নানাদেশীয় বিলাতী লেখকগণ ভারতীয় নবযুগের চাক্ষুষ পরিচয় লইবার জন্য ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নেভিন্সন তাঁহার The New Spirit in India গ্রন্থে, র‍্যাম্‌সে মুয়ের তাঁহার The Awakening of India গ্রন্থে এবং পাদ্রী য়্যাণ্ড্রুস্ তাঁহার The Indian Renaissance গ্রন্থে আর্য্য-সমাজের প্রশংসা করিয়াছেন। একমাত্র বিরল, তাঁহার The Unrest in India গ্রন্থে আর্য্যসমাজের সঙ্গেসঙ্গে 'নবীন ভারতে'র সকল প্রতিষ্ঠানকেই তিরস্কার করিয়াছেন।

লাজপত রায়ের ন্যায় বিচক্ষণ অন্যান্য লেখকগণের দ্বারা বর্ত্তমান ভারতের অনেক তথ্য ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও জাপানী ভাষায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। অবিলম্বে তাহা আরব্ধ হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হইতেছে। বিদেশে অতীত ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, চিত্র, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদির প্রচার কিছু-কাল হইতে চলিতেছে। কিন্তু 'নবীন ভারতে'র কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর এবং অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনসমূহ এখনও জগতে প্রচারিত হয় নাই। লাজপত রায়ের গ্রন্থ 'নবীন ভারতে'র প্রচারকল্পে পথপ্রদর্শক।

লাজপত রায়ের গ্রন্থ দেখিয়া আর এক কথা মনে হইল। রাণাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্তের পর আর কোন প্রবীন নেতৃস্থানীয় ভারত-সন্তান ভারতসম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ-রচনায় বিশেষভাবে অগ্রসর হন নাই। লাজপত রায় তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া অনেকের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট করিলেন।

য়ুরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রবন্ধুগণ সকলেই সুলেখক। এমন-কি, সেনাপতি এবং অর্ণবযানাধ্যক্ষগণও তাঁহাদের বক্তৃতা মাসিকপত্র ও গ্রন্থাদিতে প্রচার করিয়া থাকেন। উড্রো উইলসন, মর্লে, বার্ণাডি ইত্যাদির নাম লেখক-মহলে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের জননায়কগণ প্রধানত বক্তৃতা

দান করিয়া থাকেন। বক্তৃতাগুলি দৈবক্রমে দোকানদারগণের খেয়ালমত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এমন-কি গোখ্‌লেও বীজগণিত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন নাই। এই অবস্থায় লাজপত রায়ের দৃষ্টান্তে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। শুনিতেছি সুবক্তা শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ মজুমদার ভারতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসে ইতিহাস-প্রণয়ণে নিযুক্ত আছেন। অতএব বলিতে হইবে যে দেশে অল্প-অল্প সুবাতাস বহিয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ভারতের মুদ্রা

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আধুনিক ভারতের মুদ্রা-সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের মুদ্রা বলিলে,প্রধানত আমরা সিক্কা-টাকা এবং আক্‌বরী মোহর বুঝিতাম। কিন্তু ভারতে তখনও মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট হয় নাই; অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ছিল। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সিক্কা-টাকা বা আক্‌বরী মোহরের বড় একটা প্রয়োজন হইত না। কড়ি এবং তামার গোলাকার পয়সাই একটী ক্ষুদ্র পল্লীর সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য সম্পাদন করিত। সিক্কা-টাকা বা আক্‌বরী মোহর বড়লোকদের ব্যবহারে লাগিত। তদ্দ্বারা তাঁহারা ঢাকাই মসলিন এবং মুর্শিদাবাদের সিল্কের ন্যায় বহুমূল্য বিলাসের দ্রব্যসকল ক্রয় করিতেন। বণিকগণও বহির্বাণিজ্য চালাইবার জন্য সিক্কা-টাকা বা আক্‌বরী মোহর ব্যবহার করিত।

এখন আমরা মুদ্রাস্বরূপ নানাপ্রকার জিনিষ ব্যবহার করি; যথা, গভর্মেণ্ট প্রমিশরী নোট, টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী, আনী, ডবল পয়সা, আধ পয়সা এবং পাই। ইংরাজী সভরিন্ আমাদের ব্যবহারে আসিলেও ইহা এখনও সুপ্রচলিত হয় নাই।

রৌপ্যমুদ্রা।—প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের সময় টাকা বিদ্যমান ছিল কি না বলিতে পারি না, তবে বর্ত্তমান টাকা পশ্চিমওয়ালারা যাহাকে তঙ্কা বলে ঐতিহাসিক যুগ হইতেই তাহার প্রচলন হইয়াছে। দিল্লীর সম্রাট শেরসাহ নানা কারণে ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। বঙ্গোপসাগর হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ম্মিত বিস্তৃত রাজপথ এখনও তাঁহার অতুল কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই মোগল-সম্রাট শেরসাহ তঙ্কা নামক রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলন করেন। এই রৌপ্য-মুদ্রার আর-একটী নাম রূপিয়া। তঙ্কা নামটীর অপভ্রংশ টাকা।

মুসলমানদের নিকট হইতে ইংরাজগণ রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর, প্রথম-প্রথম মুসলমানী মুদ্রাই তাঁহারা প্রচলিত রাখেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। সিক্কা-টাকা এবং আক্‌বরী মোহর দুইই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ভারতের বাহিরে রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল না। সোনা বা রূপার বাজার-দর অনুসারে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। ভারতেও রৌপ্য মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট কোন মূল্য ছিল না। লণ্ডনের রৌপ্যের বাজার-দর অনুসারে উহা নির্দ্ধারিত হইত। লণ্ডনের রৌপ্যের দর যাহা হইত, তাহার উপর লণ্ডন হইতে ভারতে পাঠাইবার খরচ, mint charge এবং অন্যান্য ব্যয় যোগ করিয়া, ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার দাম ঠিক করা হইত। তখন প্রতি রৌপ্য মুদ্রায় একআনা মাত্র খাদ মিশান হইত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, সোনার বাজার-দর নামিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। তখন ভারত-গভর্মেণ্ট, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যাপারে ভারতকে লাভবান করিবার জন্য সোনার মোহর আর প্রচলিত মুদ্রা (legal tender) রূপে গৃহিত হইবে না; এইরূপ ঘোষণা করেন।

সোনার মোহরের চলন তখন হইতে কমিয়া যাইতে থাকিলেও, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দেশে সোনার মোহরের চলন একেবারে বন্ধ হয় নাই। কিন্তু, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে, একমাত্র রৌপ্য মুদ্রার চল হইয়া যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণের খনি আবিষ্কৃত হয়। তখন হইতে রূপার দাম পড়িয়া যাইতে থাকে। পূর্ব্বে ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য সাধারণত দুই শিলিং ছিল। দশটি টাকা দিলে ইংরাজী একটী সভরিন্ পাওয়া যাইত। কিন্তু রূপার দাম পড়িয়া যাওয়াতে রূপার কদরও কমিয়া যায়। কাজেই অনুপাত-হিসাবে দাম কষিতে গেলে, রূপার দাম সোনার দামের অনুপাতে অনেক কমিতে থাকে। শেষে, এক টাকার দাম ১৪ পেন্স পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়।

মুদ্রা-জগতে এইরূপ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায়, অন্তর্বাণিজ্য বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। রূপার মূল্য তুলনায় পড়িয়া যাওয়ায়, এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যও কমিয়া যায়; কিন্তু যে সমস্ত দেশ তখন সুবর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করিত, সেই সেই দেশে দেশোৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও চড়িয়া যায়। কাজেই, ভারতের ব্যবসায়ীগণ রপ্তানী-ব্যবসায়ে খুব লাভবান হইতে লাগিলেন; কিন্তু য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতে দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লাভবান হইতে না পারায়, ভারতের আমদানী-ব্যবসায় একবারে বন্ধ হইয়া যায়। ভারত-গভর্মেণ্ট এই মুদ্রা-বিপ্লবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। ভারত-গভর্মেণ্টকে প্রত্যেক বৎসর ছাব্বিশ কোটী টাকা Home charge রূপে বিলাতে প্রেরণ করিতে হয়। এই Home charge বিলাতে সভরিন-রূপে দিবার নিয়ম। পূর্ব্বে যখন ১০ টাকায় একটী সভরিন্ কিনিতে পারা যাইত, তখন যে পরিমাণে টাকা খরচ হইত, এখন একটী সভরিন্ ক্রয় করিতে ১৫।১৬ টাকা দিতে হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা দেড়া খরচ হইতে

লাগিল। এই সমস্ত গোলমাল মিটাইবার জন্য, ভারত-গভর্মেণ্ট, রৌপ্য এবং স্বর্ণের মূল্যের অনুপাত নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আমেরিকা, ফ্রান্স ও জর্ম্মনি তখন রৌপ্য এবং স্বর্ণ উভয়বিধ মুদ্রাই প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিত; ভারত-গভর্মেণ্টের অনুরোধে উক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ একটী কংগ্রেসে, এই মুদ্রা-বিপ্লবের সমস্যা করিতে বসেন। এই কংগ্রেস হইতে ইংলণ্ডকেও রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রাকে প্রচলিত মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ইংলণ্ড সম্মত না হওয়ায়, আমেরিকা, জর্ম্মনি, ফ্রান্সও অসম্মত হন। তাহার পর আমেরিকা, জর্ম্মনি এবং ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই একমাত্র সুবর্ণ মুদ্রাকেই প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করেন। উক্ত দেশসমূহে যে-সমস্ত রৌপ্য-মুদ্রা ছিল, তাহা গলাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হয়। রূপার বাজার তখন একবারে পড়িয়া যায়।

ফলে ভারত-গভর্মেণ্ট নিরুপায় হইয়া পড়েন। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য জুয়াখেলার মত হইয়া উঠে। Home chargeএর মাত্রাও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ এবং প্রাদেশিক গোলোযোগে সরকারের খরচ নানাদিকে আরও বাড়িয়া উঠে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুন, ভারত-গবর্মেণ্ট ভারতে অবাধ মুদ্রা-করণ বন্ধ করিয়া দেন (The mint was closed to the public)। ভারত-গভর্মেণ্ট এখন হইতে প্রত্যেক টাকায় খাদের ভাগ বাড়াইয়া দেন। এখন প্রত্যেক টাকায় বা আধুলি-সিকি-দুয়ানীতে কত পরিমাণ খাদ মিশানো হয়, নিচে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

	প্রকৃত অংশ	খাদ	প্রকৃত ওজন
টাকা	১৬৫	১৫	১৮০
আধুলি	৮২½	৭½	৯০
সিকি	৪১¼	৩¾	৪৫
দুয়ানী	২০⅝	১⅞	২২½

পূর্ব্বোক্ত তালিকাটীতে দেখা যাইবে, প্রত্যেক টাকা হইতে ১৫ গ্রেণ, প্রত্যেক আধুলি হইতে ৭½ গ্রেণ, প্রত্যেক সিকি হইতে ৩¾ গ্রেণ এবং প্রত্যেক দুয়ানী হইতে ১⅞ গ্রেণ, বিশুদ্ধ রৌপ্য বাহির করিয়া লওয়া হয়। এখন একটী টাকায় ১৬৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকে। একটী ইংরাজী সিলিংয়ে ৮০⅝ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকে। সুতরাং একটী টাকা ২·৪৩৯ সিলিং বা দুই সিলিং চারি পেন্সের সমান। এই অনুপাতে হিসাব করিলে একটী ইংলিশ সভরিনের দাম ১৫ টাকায় দাঁড়ায়। সাধারণত রূপার বাজার-দর সোনার অনুপাতে ১৫·১। এইজন্য ভারত-গভর্মেণ্ট নিয়ম করিয়া দিলেন যে, গভর্মেণ্ট ১৫টী রৌপ্য মুদ্রা লইয়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে একটী ইংলিশ সভরিন দিবেন। রূপার বাজার-দর যাহাই হউক, ভারত-গভর্মেণ্ট ১৫·১ অনুপাতে সোনা-রূপার দর বাঁধিয়া দিলেন। এই নিয়ম অনুসারে কোন বৈদেশিক ব্যবসাদার, কতকগুলি টাকা লইয়া ভারত-সরকারের কাছে যাইলে, ভারত-সরকার তাহাকে

একটী টাকার পরিবর্ত্তে একটী ইংরাজী সভরিন্ দিতে বাধ্য হইলেন।

এই নিয়ম প্রচলিত হইবার পর হইতে, বহির্বাণিজ্যের অবস্থা সুবিধাজনক হইয়া আসিল এবং কত টাকা Home charge দিতে হইবে, তাহাও ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু ভারত-গভর্মেণ্ট নিজে একটী গুরুতর দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। আইন করিয়া, সোনারূপার একটী কৃত্রিম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু জগতের বাজারে ঐ আইন মানিতে বাধ্য নয়। জগতের বাজারে রূপার দাম যদি প্রচলিত দর হইতে কম হয়, তাহা হইলে, ভারত-গভর্মেণ্টকে তাহা পূরাইয়া দিতে হইবে। এইজন্য ভারত-গভর্মেণ্ট টাকার integral value উহার face value অপেক্ষা কম রাখিয়া, প্রত্যেক টাকা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা রহিল, যখন রৌপ্যের বাজার-দর, কৃত্রিম অনুপাত অপেক্ষা কম হইবে, তখন এই সঞ্চিত অর্থ হইতে, তাহা পুরাইয়া দিবেন।

তাহার পর গভর্মেণ্ট প্রচলিত বিশুদ্ধ মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ২৫ গ্রেণ খাদ মিশাইয়া নূতন টাকা তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ, এই প্রকারে অতিবাহিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আর কোনপ্রকার টাকা মুদ্রিত হয় নাই।

ভারতের দেশীয় নৃপতিবর্গ দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলিরও আপন আপন রৌপ্যমুদ্রা ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে রূপার বাজার দর নামিতে আরম্ভ হয়, তখন ঐ-সব দেশীয় টাঁকশালগুলিতে প্রয়োজনীয় টাকার সংখ্যা অপেক্ষা, অধিক টাকা মুদ্রিত হইত। কাজেই টাকার প্রচলন অধিক হওয়ায়, দ্রব্যাদির মূল্য চড়িয়া যায়; এবং এইরূপে দেশীয় রাজ্যগুলিতেও ইংরাজ-শাসিত ভারতের ন্যায়, মুদ্রা-বিপ্লব উপস্থিত হয়। ভারত-গভর্মেণ্ট টাকা এবং সভরিণের মধ্যে একটী কৃত্রিম অনুপাত বাঁধিয়া দিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে ভারত গভর্মেণ্টের মুদ্রাশাল হইতে মুদ্রিত মুদ্রা লইতে অনুরোধ করেন। কাশ্মির এবং ভূপাল এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, মুদ্রাঙ্কণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠায়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য আরম্ভ হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে, ভারত-গভর্মেণ্টের মুদ্রাশালাগুলি হইতে, বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্বোক্ত দেশীয় রাজ্য-গুলির ব্যবহারের জন্য ১৭ কোটি টাকা মুদ্রিত হয়। এই টাকাগুলিতে, প্রত্যেক টাকায় ১৫ গ্রেণ করিয়া খাদ থাকায়, ভারত-গভর্মেণ্টের আয় যথেষ্ট বাড়িয়া যাইতে থাকে। ঐ অতিরিক্ত আয়ের নাম Gold Reserve Standard রাখা হয়; রূপার মূল্য পড়িয়া স্বর্ণ-রৌপ্যের কৃত্রিম দর বজায় রাখিবার জন্য, যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে, এই সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে তাহা দেওয়া যাইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। পরে রূপার বাজার-দর একভাবেই রহিয়া যায়, কাজেই এই খাদমিশ্রিত টাকা মুদ্রিত করিয়া, ভারত-গভর্মেণ্ট প্রত্যেক বৎসরেই যথেষ্ট লাভবান হইতে লাগিলেন।

আয় ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ অল্প সুদে টাকা পড়িয়া থাকে দেখিয়া গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, লর্ড কার্জ্জনের ব্যবস্থাপক সভায় এই উদ্বৃত্ত টাকাগুলি দেশের শিক্ষাপ্রচার বা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভারত-গভর্মেণ্ট দেখিলেন, শিক্ষাদান এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারও বেশ চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু দেশের উন্নতি করিতে গেলে, রেলওয়ের একান্ত প্রয়োজন। তখন পর্য্যন্ত, পর্য্যাপ্ত অর্থাভাবে ভারতে যথেষ্ট রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-গভর্মেণ্ট, 'সেক্রেটরী অফ্ ষ্টেট'র সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এখন হইতে উদ্বৃত্ত অংশের অর্দ্ধেক, সঞ্চিত অর্থ-ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হইবে এবং অপর অর্দ্ধেক রেলপথ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে।

এক আকস্মিক দুর্ঘটনা ভারত-গভর্মেণ্টের এই ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেয় নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে, আমেরিকার নিকট হইতে ভারতবর্ষ যত টাকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকার দ্রব্য আমেরিকায় রপ্তানী করে। কাজেই ভারতের হুণ্ডিগুলির সংখ্যা আমেরিকার হুণ্ডির সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হওয়ায়, ভারতীয় হুণ্ডির দাম বাড়িয়া যায়। এই বিপ্লবের সময় ভারত গভর্মেণ্টকে সঞ্চিত অর্থভাণ্ডারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ভারত-গভর্মেণ্ট দেখিলেন যে, আন্তর্জাতিক-বাণিজ্য ব্যাপারে মাঝে মাঝে এইরূপ আকস্মিক বিপদ ঘটিতে পারে; সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে গেলে, Gold Reserve Fundএর একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য স্থিরীকৃত হইল যে, যতদিন পর্য্যন্ত না স্বর্ণ-ভাণ্ডারে ২৬,০০০,০০০ পাউণ্ড জমিবে, ততদিন পর্য্যন্ত উহা হইতে আর এক কপর্দ্দকও খরচ করা হইবে না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, এই অর্থ-ভাণ্ডারে ১৯,৭৫৬,০৯৭ পাউণ্ড সঞ্চিত হয়।

ভারত-গভর্মেণ্ট খাদমিশ্রিত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হইয়া যাইবার পর, একে একে নিম্নলিখিত দেশীয় রাজ্যগুলি বৃটিশশাসিত ভারতের মুদ্রাকে নিজেদের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বরোদা, কোটা, যোধপুর, রাধনপুর, ঝলওয়ার, ইন্দোর, কাম্বে, সিরোহী, ডুনগাপুর, বানস্‌ওয়ারা, প্রতাপগড়, কারুলি এবং টঙ্ক। বৃটিশ ভারতের ন্যায় উক্ত দেশগুলিতে পূর্ব্বপ্রচলিত মুদ্রাগুলিকে গলাইয়া পুনর্মুদ্রিত করা হয় নাই। সেই-সমস্ত মুদ্রারই সহিত বর্ত্তমান মুদ্রার একটী অনুপাত ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আন্দামান এবং Strait Settlement-এ প্রচলিত রৌপ্য ডলার ভারতের মুদ্রাশালা হইতেই মুদ্রিত হইত। কিন্তু, Colonial Government মুদ্রাসম্বন্ধে নূতন আইন জারি করায়, Colonial dollar এখন একমাত্র বোম্বায়ে মুদ্রিত হয়।

তাম্র ও ব্রোনজ্ মুদ্রা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেনা-বেচা এবং দৈনন্দিন আদান-প্রদান ব্যাপারে, অল্পদামী মুদ্রা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় এই

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ভারত-গভর্মেণ্ট তাম্র-মুদ্রার প্রচলন করেন। ভারতে প্রচলিত তাম্র-মুদ্রাকে চারিভাগে ভাগ করা যায়,—ডবল-পয়সা, পয়সা, আধ-পয়সা এবং পাই। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কেবল অলওয়ার এবং বিকানীরই ভারত-গভর্মেণ্টের প্রচলিত তাম্র-মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র তাম্র-মুদ্রা আছে। কোন্‌প্রকার তাম্র-মুদ্রায় কত অংশ তামা আছে, নিম্নে তাহার একটী ফর্দ্দ দেওয়া গেল।

	গ্রেণ, ট্রয় ওজন।
ডবল-পয়সা	২০০
পয়সা	১০০
আধ-পয়সা	৫০
পাই	৩৩½

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি আইনে তাম্র মুদ্রার ব্যবহার উঠিয়া গিয়া ব্রোনজ্ মুদ্রা প্রচলিত হয়। এই বৎসর হইতেই ডবল-পয়সায় মুদ্রাকরণও তুলিয়া দেওয়া হয়। কোন্‌প্রকার ব্রোনজ্ মুদ্রার ওজন কত এবং তাহাদের আকারই-বা কত, নিচে তাহার একটী ফর্দ্দ দেওয়া গেল।

মুদ্রা—ওজন, ট্রয় গ্রেণ	আয়তন মিলিমিটারে
পয়সা ৭৫	২৫.৪
আধপয়সা ৩৭½	২১.১৫
পাই ২৫	১৭,৪৫

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি আইন দ্বারা ভারতে নিকেল মুদ্রা প্রচলনেরও ব্যবস্থা হয়। ডবলপয়সার মুদ্রাকরণ বন্ধ হওয়ায় সরকার নিকেল আনী চালান। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, নিকেল ডবলপয়সা চালাইবারও কথা উঠে। কিন্তু প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা ভারত-গভর্মেণ্টকে বলেন যে, আগে প্রজাপুঞ্জ নিকেল আনী ব্যবহারে অভ্যস্ত হউক, তাহার পর নিকেল ডবল-পয়সা চালান হইবে।

গভর্মেণ্ট প্রমিশরী নোট। নোট সমস্ত দেশেই প্রচলিত। য়ুরোপে, সাধারণত ব্যাঙ্কারগণই নোট ছাপাইয়া থাকেন, গভর্মেণ্ট কোনপ্রকার নোট ছাপান না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আমাদের ভারতবর্ষেও বাঙ্গালা, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক হইতেই নোট বাহির হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ভারত-গভর্মেণ্ট এক আইন জারি করিয়া ব্যাঙ্কগুলির হস্ত হইতে নোট ছাপিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লন। তারপর হইতে ভারতে একমাত্র গভর্মেণ্টেরই নোট ছাপিবার ক্ষমতা আছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Currency Act অনুসারে বৃটিশ-শাসিত ভারতের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও নোট চলিবে, এইরূপ হুকুমজারি হয়।

ভারত-গভর্মেণ্ট যে-সমস্ত নোট তৈয়ারি করেন, তাহার জন্য সম মূল্যের স্বর্ণ ট্রেজারীতে জমা রাখিতে হয়। পূর্ব্বে এই অমুদ্রিত স্বর্ণ-পিণ্ড সমস্তই ট্রেজারীতে পড়িয়া অনর্থক পচিত। তাহারপর গভর্মেণ্ট নিয়ম করেন যে, এই সঞ্চিত অর্থ হইতে ৬ কোটী মুদ্রা খাটানো হইবে। এই খাটানো টাকা ক্রমশ বাড়িয়া এখন ৪০ কোটী টাকাতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গভর্মেণ্ট প্রমিশরী নোট, সোনা-রূপা টাকার ন্যায় আইনত প্রচলিত। গভর্মেণ্টও যত-ইচ্ছা প্রমিশরী নোট বাহির করিতে

পারেন। টাকার বদলে এরূপ নোট চালাইবার একটু হেতু আছে। ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা, হাতে হাতে ঘুরিয়া ক্ষইয়া যায়, কাজেই তাহাতে প্রত্যেক বৎসর অনেক টাকা অনর্থক নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা, সংখ্যায় অধিক হইলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। একখানি দশহাজার টাকার নোট যেমন সহজে লইয়া যাওয়া যায়, দশহাজার টাকার বা সভরিণের তোড়া তেমন অনায়াসে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায় না। এইজন্যই ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা অপেক্ষা নোট অধিকতর সুবিধাকর। কেহ কেহ বলেন ইংলিশ সভরিণের প্রচলন হওয়ায়, নোটের কদর কমিয়া আসিতেছে। এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেননা অন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে ৫০০, ১০০০ এবং ১০০০ টাকার নোটেরই অধিক প্রয়োজন; কিন্তু দেশের মধ্যে, ৫০ টাকার নিচের নোটগুলিরই অধিক দরকার। ৫০০, ১০০০ বা ১০০০০ টাকার নোটেরও ব্যবহার গত বারো বৎসরের মধ্যে শতকরা ১১ হইতে ৩৭ অংশ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে, কিন্তু ৫০০ টাকার নিচের নোটের ব্যবহার শতকরা ১০০ ভাগেরও অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; নিম্নের অঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বৎসর		দশলক্ষ মুদ্রা হিঃ
১৯০০—০১	...	২৫৬·৩৯
১৯০৫—০৬	...	৩৬১·৪০
১৯১০—১১	...	৪৮১·৯৭
১৯১১—১২	...	৫৭৩·৬৫

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কোন্‌প্রকারের কত টাকার নোট ছিল, এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা কত হয়, নিম্নের অঙ্কগুলি দেখিলে তাহা বুঝা যায়।

	১৮৯৩	১৯১২
৫ টাকার নোট	২,৪৭৭২৮০	১২৯৯৯৩৮৫
১০ „	৩৯,১৭৩৩৬০	১৫০৯০৭৪০
২০ „	৬,৬০১৬৬০	১৩১২৬৬০
৫০ „	১১৬২৪১০০	১৮৯৬২৭৫০
১০০ „	৫৬৮০৬৮০০	১৬৫২২০৯০
৫০০ „	২৫৩২৪০০০	২৮০৫১০০০
১,০০০ „	৬৭৯৮১০০০	৯২৯৭১০০০
১০,০০০ „	৫৪০৩০০০০	১৪৩২০০০০

১৯০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, পাঁচ টাকার নোট ছিল না। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কারেন্সি আইনে পাঁচ টাকার নোটকে ব্রহ্মদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত করা হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি-আইনে, পাঁচটাকার নোটকে ইংরাজ-শাসিত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন ব্যতীত, কানপুর, লাহোর ও করাচীতেও নোট বাহির করা হইত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি আইনে, করাচী, লাহোর এবং কানপুরের নোট তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা বন্ধ হয়। পূর্ব্বে যে-সমস্ত নোট যে-প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইত, কেবল সেই প্রদেশেই তাহা ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন নিয়ম করা হইল, ৫,১০,৫০ ও ১০০ টাকার নোট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই চলিবে। ১০০ টাকার বেশী যে-সমস্ত নোট—অর্থাৎ ৫০০, ১০০০, এবং

...০ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে হইলে, যে ...ান হইতে বাহির হইয়াছে, সেই প্রদেশের ...কোন ট্রেজারীতে সেগুলি ভাঙ্গান যাইতে ...রে। কোন ছোট ট্রেজারী অত দামী ...োটের টাকা না দিতে পারিলে, প্রধান ট্রেজারীতে গেলে নোটের ভাঙ্গানি টাকা ...লিবে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি-আইন ...য়া ২০ টাকার নোট তুলিয়া দেওয়া হয়, ...র যে-সমস্ত নোট পূর্ব্বে মুদ্রিত করা ...য়াছিল, সেগুলিকে আর নষ্ট করা হয় ...াই। এখন কেবল নিম্নলিখিত সংখ্যার ...োটগুলি মুদ্রিত হয়ঃ—পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ, ...শ, পাঁচশ, হাজার, এবং দশহাজার ...কার। হাজার এবং দশহাজার টাকার ...োট ধনীগণ ব্যবহার করেন। নগদ টাকা ...াটীতে রাখা শ্রেয়স্কর নয়, এইজন্য তাঁহারা ...কারের ঘরে নিরাপদে টাকা জমা রাখেন। ...ন যে-যে স্থান হইতে নোট বাহির হয়, সেই সমস্ত স্থানের, নোট বাহির করিবার ভার যে-সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর উপর অর্পিত, তাঁহাদের উপাধির এবং যে-সমস্ত নোট সর্ব্বত্র প্রচলিত নয়, সেই সমস্ত নোট যেখানে-যেখানে চলিতে পারে, সেই সেই জায়গার একটী ফর্দ্দ দেওয়া গেল।*

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক নোটের জন্য সমান মূল্যের সুবর্ণ গভর্মেণ্টের ট্রেজারীতে জমা থাকে। এই-সমস্ত সুবর্ণ ট্রেজারী না পচাইয়া তাহার মধ্য হইতে ১৪০ কোটী মিলিয়ন, গভর্মেণ্ট সুদে খাটান। তাহা হইতে গভর্মেণ্ট প্রতি বৎসর ৪৪৯০৪৫০ টাকা সুদ পান। এই বিভাগটি চালাইবার জন্য গভর্মেণ্টের বাৎসরিক খরচ হয় ১৮৫৭১৯০ টাকা। সুতরাং খরচ বাদে, প্রতি বৎসর ২৬৩৩২৬০ টাকা সরকারের লাভ হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

নোট বাহির হইবার ...স্থান	যে-সমস্ত রাজকর্ম্মচারী নোট বাহির করেন তাঁহাদের নাম	যে যে প্রদেশে ৫০০, ১০০০ এবং ১০০০৯ টাকার নোট চলিবে সেই সেই প্রদেশের নাম।
...কাতা	কনট্রোলার জেনারল	বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, পোর্টব্লেয়ার ও আন্দামান।
...পুর	উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল, পঞ্জাব একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল	আগ্রা এবং অযোধ্যা
...য়ার		পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ
...রাজ	ঐ	মান্দ্রাজ এবং কুর্গ
...ম্বে	ঐ	বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বেরার এবং হায়দ্রাবাদ
...াচী	Agent to the Indian Government একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল, বর্ম্মা	সিন্ধুপ্রদেশ
...ন		বর্ম্মা

সমসাময়িক ভারতের সভ্যতা

আমরা ইতিপূর্ব্বে, সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে, মধ্য-এসিয়ার লোকদিগের প্রভাবে, মুসলমান-সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় সভ্যতার কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল আলোচনা করিয়াছি। এইরূপে রূপান্তরিত ভারতের উপর ইংরাজেরা কিরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতা স্থাপন করিলেন তাহাও পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাদের চেষ্টার ফলাফল আলোচনা করা আবশ্যক; কি পরিমাণে ভারতবাসীরা ইংলণ্ড ও য়ুরোপের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াছে এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা যাক্।

এই সম্বন্ধে প্রথমেই দুইটি কথার উল্লেখ করিব:—

প্রথম কথা। মোটামুটি ধরিতে গেলে, এসিয়ার সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা পৃথক নহে। অসমান পরিমাণে, উহাদের ক্রমবিকাশের মিল আছে; আরও এই কথা বলা যাইতে পারে, এসিয়ার উন্নতি স্থগিত হইয়া যাওয়ায় এসিয়ার আংশিক অবনতি ঘটিয়াছে। সুতরাং, কতকগুলি সামাজিক ব্যাপার আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহাদের উভয়ের মূল-উৎপত্তির প্রভেদ নির্ণয় করা দুষ্কর। কখন কখন, যাহার বাহ্য আকার য়ুরোপীয়, আসলে তাহা এসিয়ার প্রাচীন প্রতিষ্ঠানাদির অনুবৃত্তি মাত্র। কখন কখন দেখা যায় য়ুরোপীয়েরা কোন এসিয়িক আইন বা প্রথার ভিতরকার ভাবটি একটু পরিবর্ত্তন করায় উহা একেবারে য়ুরোপীয় হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় কথা। য়ুরোপীয় সভ্যতা হইতে ভারত উহার একটা বিশিষ্ট রূপ অবগত হইয়াছে—সেটি অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাকশন সভ্যতা। ভারতে, এসিয়িক সভ্যতা খুবই একটা বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছে—সেটি ভারতীয় সভ্যতা। যেমন এসিয়া ও য়ুরোপের সভ্যতা—এই দুই একত্র মিলিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে একই ক্রমবিকাশের পরিচয় দেয়, সেইরূপ আচার, জাতি, আর্য্য হাওয়া, ইতিহাস, এই সমস্ত—ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় সভ্যতাকে এমন-সকল গুণে অনুরঞ্জিত করিয়াছে যাহাকে "স্বজাতীয়" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অন্য অবস্থায় পড়িলে হয়ত ভারত ভারতীয় হইতে বিরত হইয়াও, উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হইতে পারে। ইংলণ্ড-কর্ত্তৃক বিজিত, ইংলণ্ডকর্ত্তৃক হঠাৎ রূপান্তরিত ভারতের কিয়ৎপরিমাণে ইংরাজি ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবারই কথা; যেমন গল্ (Gaul) রোমীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিল, যেমন ইংলণ্ড এখনো নিজ বক্ষের উপর নর্ম্মান আধিপত্যের ছাপ্ ধারণ করিয়া আছে। পক্ষান্তরে ভারতের জলবায়ু, জাতিবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ও প্রতিষ্ঠানাদি ইঙ্গ-ভারতীয়দিগের মর্ম্মভাব অল্প-স্বল্প বদ্‌লাইয়া দিবে। বর্ত্তমানে ভারতের সভ্যতা ও ইংলণ্ডের সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবে পাশাপাশি রহিয়াছে, এখনো মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই, কিন্তু উহাদের সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

এখন অনুসন্ধান করা আবশ্যক, কোন্ কোন্ স্থলে এই দুই সভ্যতার মর্ম্মভাব পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার পর দেখিতে হইবে, কিরূপে ইহাদের মধ্যে অভেদ ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে, এবং উহা সংঘটিত হইতে কতটা সময় লাগিবে এবং উহা হইতে কিরূপ সভ্যতা প্রসূত হইবে।

প্রথমে, সমসাময়িক ভারত-সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১৯০১ অব্দের আদম-সুমারের পর, লোকসংখ্যা ২৯৪,৩৬০,৩৫৬তে উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতের জনসংখ্যা ২৩১,৮৯৮,৮০৭ এবং সামন্তরাষ্ট্র-সমূহের জনসংখ্যা ৬২,৩৬১,৫৪৯।

ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যার এইরূপ বিভাগ করা যাইতে পারে:—

মাদ্রাজ	...	৩৮,২০৯,৪৩৬
বোম্বাই ও সিন্ধুদেশ (এডেন ইহার অন্তর্ভুক্ত)	...	১৮,৫৫৯,৫৬১
বাঙ্গলা	...	৭৪,৭৪৪,৮৬৬
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা		৪৭,৬৯১,৭৮২
পঞ্জাব	...	২০,৩৩০,৩৩৯
ব্রহ্মদেশ	...	১০,৪৮৯,৯২৪
মধ্যপ্রদেশ	...	৯,৮৭৬,৬৪৬
আসাম	...	৬,১২৬,৩৪৩
বেরার	...	২,৭৫৪,০১৬
আজ্‌মীর মেরওয়ার	...	৪৭৬,৯২১
কুর্গ	...	১৮০,৬০৭
ব্রিটীশ বেলুচিস্থান	...	৩০৮,২৪৬
এডেন	...	৪৩,৯৭৪
অ্যাণ্ডামান ও নিকোবর		২৪,৬৪৯
উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত দেশ	...	২,১২৫,৪৮০

এই সংখ্যায় মধ্যে কেবল ১৬৯,৬৭৭ য়ুরোপীয়; উহার অন্তর্ভুক্ত—সৈন্য ও রাজ-কর্ম্মচারী।

১৮৯১ অব্দে, সহস্রাধিক লোক ৪১ ভাষায় কথা কহিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভাষাগুলির অধিকতর প্রসার:—

হিন্দীভাষী লোক	..	৮৫,৬৭৫,৩৭৩
বাঙ্গলা „	...	৪১,৩৪৩,৭৬২
তেলুগু „	...	১৯,৮৮৫,১৩৭
মারাঠি „	...	১৮,৮৯২,৮৭৫
পঞ্জাবী „	...	১৭,৭২৪,৬১০
তামিল „	...	১৫,২২৯,৭৫৯
গুজ্‌রাটি „	...	৯,৭৫১,৮৮৫
উড়িয়া „	...	৯,০১০,৯৫৭
বর্ম্মী „	...	৫,৯২৬,৮৬৪

ধর্ম্মমত-অনুসারে ভারতবাসীদিগের এইরূপ বিভাগ, যথা:—

আদিম ধর্ম্ম	...	৯,২৮০,৪৬৭
হিন্দুধর্ম্ম	...	২০৭,৭৩১,৭২৭
মুসলমান-ধর্ম্ম	...	৫৭,৩২১,৩৬১
শিখ্	...	১,৪১৬,৬৩৪
পার্শী	...	৮৯,৯০৪
ইহুদী	...	১৭,১৯৪
খৃষ্টান	...	২,২৮৪,৩৮০
অন্যান্য ধর্ম্ম	...	৪২,৭৬৩

ব্যবসায়-অনুসারে মোটামুটি জনসংখ্যার বিভাগ যথা:—

নাগরিক লোকসংখ্যা	...	২৭,২৫১,১৭৬
গ্রাম্য লোকসংখ্যা	...	২৫৯,৯৭২,২৫৫

এই সময়ে ৩,৬৪৫,৮৪৯ পশুপালক এবং

১৭১,৭৩৫,৩৯০ কৃষক ছিল। ভৃত্যের সংখ্যা ছিল ১১,২২০,০৭২; রাজকর্ম্মচারী ও ম্যুনিসিপ্যাল-কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল—৫,৬০০, ১৫৩। স্থল-বিভাগের ও নৌ-বিভাগের সৈন্য ছিল—৬৬৪,৪২২ (ইংরাজ সৈন্য উহার অন্তর্ভূত); যাহারা উদার-শিক্ষাশ্রিত (liberal) ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা —৫,৬৭২,১৯১। ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারে বর্ণবিভাগের সংখ্যা ছিল ২,৮৮৯; উহাদের মধ্যে আবার উপবিভাগ ছিল। একই বর্ণের বিভিন্ন বিভাগ অনেক প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না।

১৮৯১ অব্দে কোম্পানী-কাগজ ও "শেয়ার" প্রভৃতির অধিকারীর সংখ্যা—১৯৩,২৯১। ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে ৪৮২,৪৮২ লোকের আয় ছিল ৫০০ টাকা। যাহার উপর আয়-কর আদায় হইত এরূপ আয়ের পরিমাণ ৫০,৬৩০,০০০ পৌণ্ড অতিক্রম করে নাই

নিম্নলিখিত সংখ্যাঙ্কের হিসাবও ঔৎসুক্য জনক;—পুরুষ-সংখ্যা (১৮৯১ অব্দে):—১৪৬,৭২৭,২৯৬; তন্মধ্যে ৬২,১২০,৩০০ বিবাহিত পুরুষ। (১৯০১:—১৪৯,৯৫১, ২৪০)।

স্ত্রীলোকের সংখ্যা:—১৪০,৪৯৩,১৩৫; তন্মধ্যে ৬২,৪৪৮,৯৪৬ বিবাহিত স্ত্রী। (১৯০১: —১৪৪,৪০৯,১১৬)।

পাঁচ বৎসর বয়সের নীচে:—২০,৬৩১, ৩৮০ পুরুষ; ২১,৪১০,১১৯ স্ত্রীলোক।

পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত:—পুরুষ ৩৭,৫৮৮,৯০৫; রমণী ৩২,৮৪৪,০৪৫।

২৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত:—৪৩, ৪৬৭, ৬৫০; ৪১, ১০২, ৪৩৬ রমণী।

৪৪ হইতে ৫৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত:—১৩, ৯৮৯, ৬৯১ পুরুষ; ১২, ৮৭৬, ৩৪১ রমণী।

৬০ বৎসরের অধিক বয়স:—৬, ৭৬৯, ৪৩৩৫ পুরুষ; ৪,০৩২, ৪৪৮ রমণী।

এই সকল গোড়ার তথ্য হইতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, যথা:—

বহুসংখ্যক ভাষা, ধর্ম্মমত, ও বর্ণভেদ হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক একতাসাধন করা অতীব কঠিন কার্য্য। দশ ভাগের নয় ভাগ লোক কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত; বহুসংখ্যক শিশুসন্তান এবং লোকের পরমায়ু স্বল্পস্থায়ী। কতকগুলি লোক ধনশালী, তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রভূত ধনশালী; মধ্যশ্রেণীর লোক সংখ্যায় খুবই কম; কেবল রাজকর্ম্মচারী এবং যাঁহারা "উদার" শিক্ষাশ্রিত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন—তাঁহারাই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের বশবর্ত্তী। কিন্তু জনসাধারণের উপর রাজকর্ম্মচারী ও শিক্ষিত লোকদিগের এখনো তেমন প্রভাব দেখা যায় না। এইরূপে গত আদম-সুমারীর মোটামুটি পরীক্ষা হইতেই আমরা জানিতে পারি,—য়ুরোপীয় সভ্যতা ভারতে কতটা বাধা পাইয়াছে এবং এই বাধা অতিক্রম করিতে আরো কতকাল লাগিবে।

*
* *

এক্ষণে অনুসন্ধান করা যাক্,—কিরূপে

ভারতের মুখ্য জাতিগণ ইংরাজপ্রবর্ত্তিত অভিনব প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে, এবং ঐ-সকল জাতি য়ুরোপের আচার-ব্যবহার ও শিল্প আত্মসাৎ করিতে কতটা পটুতা দেখাইয়াছে।

বাঙ্গালী।—দৌর্ব্বল্যজনক আব্-হাওয়ার মধ্যে, এবং অতীব সমৃদ্ধিশালী ভূমির উপর ৭০ লক্ষ মনুষ্যের বাস (১)। বাঙ্গালী মিশ্রজাতি, শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ, অর্দ্ধ আর্য্য ছাঁচের, অর্দ্ধ মোগলীয় ছাঁচের। নম্র-প্রকৃতি, বুদ্ধিমান, প্রবল স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট, নূতন জিনিস আত্মসাৎ করিবার প্রভূত শক্তি-সমন্বিত, সৌম্য-প্রকৃতি ও তোষামোদের বশীভূত; বাঙ্গালীর সরলতার অভাব, সাহসের অভাব ও নছোড়বন্দা-দৃঢ়তার অভাব। উহাদের মধ্যে হাজার হাজার ধনী। জঙ্গলের শিকারী ও নৌকার মাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারক ও কলিকাতার খবরের কাগজ-ওয়ালা পর্য্যন্ত সকল ব্যবসায়ই উহাদের মধ্যে আছে।

ধনীদিগের মধ্যে, দরিদ্রদিগের মধ্যে, কতকগুলি লোক য়ুরোপীয় সভ্যতার ধরণে গঠিত; ইংরাজেরা এই সভ্যতা দেড় শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীর উপর চাপাইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সরকারী রাজকর্ম্ম পাইবার জন্য ও "উদার" ব্যবসায়গুলি অবলম্বনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে দোকানদার আছে, মহাজনী কুঠীওয়ালা আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি লোক খুব ধনী। জমিদারদিগের বহুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি; ঐ ভূমি কৃষিপ্রজা কর্ত্তৃক কর্ষিত হইয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্র ও সাহিত্য বেশ পরিপুষ্ট। সকল রকমের পোষাক:—বাবুর পোষাক য়ুরোপীয় ধরণের; শিক্ষিত লোকের ও শিক্ষার্থীর চাপকান ও হল্‌দে চোগা; দোকানদারের সাদা পরিচ্ছদ, ইতর-সাধারণ প্রায় নগ্ন বলিলেই হয়। উচ্চবর্ণের রমণীরা ঘোম্‌টা না দিয়া বাহির হয় না। ইতর-সাধারণ রমণীরা শুধু একখানি শাড়ী পরিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে এক তৃতীয়াংশ ও নীচ জাতের সকলেই মুসলমান। প্রধান ভাষা—বাঙ্গলা।

অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এখানকার আবহাওয়া বঙ্গদেশ অপেক্ষা স্বাস্থ্যজনক, ভূমি ততটা সমৃদ্ধ নহে, ততটা আর্দ্র নহে। গাঙ্গেয় উপত্যকার নগরগুলি:—আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলাহাবাদ, বেনারস। জাতি প্রায় অমিশ্র:—হিন্দুস্থানী শ্যামবর্ণ, ক্ষুদ্র ডিম্বাকার মুখ; লম্বা, পাতলা, প্রায়ই শীর্ণ, খুব গর্ব্বিত (বিশেষতঃ উচ্চবর্ণদিগের মধ্যে)। ইহারাই পূর্ব্বকার যোদ্ধৃ-জাতি; ইহারাই ইংলণ্ডের হইয়া ভারত জয় করিয়াছে; খুব গোঁড়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, (বিশেষতঃ বেনারস অঞ্চলের লোক), কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায়, উহাদের মধ্যে সেরূপ জঘন্য কুসংস্কার নাই। উহারা অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকে; কেন না, গাঙ্গেয় উপত্যকাই সেই প্রকৃত ভারতভূমি, যেখানে প্রাচীন সভ্যতা ও মধ্যযুগের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল:—তাই, হিন্দুস্থানীরা আক্ষেপ-

(১) আসলে, যাহারা বাঙ্গলা বলে তাহাদের সংখ্যা ৪১ লক্ষ মাত্র। অন্য ত্রিশলক্ষ লোক বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভূত।

সহকারে য়ুরোপীয় সংস্কার ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া থাকে। উহারা সরকারী কাজের জন্য বা "উদার" ব্যবসায়াদির জন্য বড় একটা চেষ্টা করে না। উহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ধীরে ধীরে হইতেছে। উহাদের মধ্যে দোকানদার ও বড় জমিদার তেমন বেশী নাই। ১% অধিবাসী কৃষিজীবী; নগরের মধ্যে, ছোট ছোট বেনিয়া ও কতকগুলি নিপুণ কারিগর আছে। পোষাক বিচিত্র ধরণের। শতকরা ১০জন মুসলমান। উহাদের মধ্যে হিন্দীর বিভিন্ন "ভাখা" বা উপভাষা প্রচলিত।

পঞ্জাবে ভারতের সকল জাতি ও মধ্য এসিয়ার লোক দেখিতে পাওয়া যায়:— পাঠান বা ভারতপ্রবাসী আফগান, হিন্দুস্থানী, জাট্ (শকজাতীয়), রাজপুত, গুজ্‌রাটি, পারস্যদেশীয়, তুর্ক, মোগল। কোথাও, অর্দ্ধনগ্ন ও মুণ্ডিতমস্তক হিন্দু, কোথাও পশমী চোগা ও দীর্ঘ পরিচ্ছদপরিহিত শ্মশ্রুধারী মুসলমান; সীমান্ত-প্রদেশের লোকেরা স্বকীয় অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষা করিয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি সুন্দর ছাঁচের লোক দেখিতে পাওয়া যায় (বিশেষতঃ শিখদের মধ্যে);—উহারাই পূর্ব্বকালের যোদ্ধৃজাতি; এখনো উহারা সৈন্যমণ্ডলীতে অনেক সৈনিক যোগাইয়া থাকে; মেজাজ্‌টা কড়া, আভিজাত্যমূলক কুসংস্কারে পরিপূর্ণ:— রাজপুত ও বেনিয়াদিগের মধ্যে একটা বিধবাবিবাহ হইলেই সেই পরিবারের জাত যায়। অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী; তথাপি অনেকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়। দরিদ্র কৃষকেরা কুসীদজীবীর কবলে পতিত। ইতরসাধারণ—অনক্ষর। অধিকাংশ লোকই মুসলমান। পশ্চিম ভাগে হিন্দু কম। ভাষা পাঞ্জাবী;—হিন্দীর একটা উপভাষা।

সিন্ধুদেশ।— বেলুচী-প্রধানদিগের অধীনে কতকগুলি কৃষক ও পশুপালকের বাস। এই বেলুচীরা গোঁড়া মুসলমান— সামন্ত-তন্ত্রের রীতিনীতি-সমন্বিত যোদ্ধৃপুরুষ; কৃষকেরা শান্তপ্রকৃতি, সকল বিষয়ে উদাসীন ও অনক্ষর। কিন্তু যে-অবধি অনুর্ব্বর মরুভূমি ও জলাভূমিসকল জলসেচন-প্রণালীর দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে, সেই অবধি উহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

রাজপুতনা।—কতকগুলি সামন্ত-তান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাজারা রাম ও কৃষ্ণের বংশধর এইরূপ তাহাদিগের অভিমান। রাজপুতেরা দীর্ঘকায়, ছিপছিপে, মুখাকৃতি চওড়া, রং কতকটা ফর্সা, নাসা শুকচঞ্চুবৎ, চোখ শ্যামবর্ণ; উহাদের মধ্যে অনেকে গালপাট্টা রাখে, কাহারও-বা উহা মাথার চুলের সহিত বাঁধা থাকে; একপ্রকার পরিচ্ছদ, যাহা কতকটা হিন্দুধরণের, কতকটা মুসলমানি ধরণের এবং কতকটা য়ুরোপীয় ধরণের। উহারা উত্তম সৈনিক, উত্তম ঘোড়সোয়ার, সুন্দর অস্ত্রশস্ত্রের অনুরাগী, দাসত্বে পরিণত জনসমূহকে উহারা অবজ্ঞা করে। যাহারা বেশী বুদ্ধিমান তাহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়। গোঁড়া হিন্দু। মুসলমান খুবই কম। উহাদের ভাষা গুজরাটী অথবা হিন্দীর কোন উপভাষা।

যেখানে ভাল ভাল বন্দর আছে সে

গুজরাটে, সকল জাতিরই বংশধরেরা বিশেষতঃ গুজ্‌রাটীরা বাস করে। গুজরাটীরা সুনম্য-প্রকৃতি, কার্য্যদক্ষ, বাণিজ্য-ব্যাপারে তাহাদের স্বাভাবিক পটুতা আছে। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত রাজধানী বোম্বাই। গুজরাটের উর্ব্বর ক্ষেত্র বহু-সংখ্যক কৃষককে পোষণ করে। পরিচ্ছদে বেশ বৈচিত্র্য। চাষারা শুধু সাদা ধুতি পরে, এবং বেনিয়ারা দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও পাগ্‌ড়িবিশিষ্ট পাগ্‌ড়ি ব্যবহার করে। অধিকাংশ লোকই হিন্দু। ১২ ভাগের এক ভাগ মুসলমান। কতকগুলি বিশেষ-ছাঁচের লোক আছে যথা, মারোয়াড়ী—মারোয়ারের মৌলিক কুসীদজীবী। (মারওয়ার রাজপুতানার অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র)। তার পর ওয়াকীল,—মাম্‌লা-মোকদ্দমা চালাইবার লোক—ইহারা চাষা ও বেনিয়াদিগের অর্থ শোষণ করে।

৮০ হাজার পার্শী। ইহারা জোরোয়াষ্টার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বংশধর। মুসলমান কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া উহারা প্রথমে অর্মজ্‌দ্ দ্বীপে পরে সুরাটে বাস স্থাপন করে। উহাদের অধিকাংশই এক্ষণে (১০ হাজারের মধ্যে ৬০ হাজার) বোম্বায়ে। ইহাদিগের য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রভূত ধন সম্পত্তি আছে, মৃত সর্ জাম্‌শেদজি জিজিভাই— যিনি সার্ব্বজনিক কাজে কত লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। কি শ্রমশিল্প, কি বেঙ্ক, কি তুলার কল্, কি বাণিজ্যের কুঠী, কি জাহাজসংক্রান্ত কোম্পানী—এই সমস্ত কাজের শীর্ষস্থানে উহারা। সাধারণ লোকেরা পরিশ্রমী, সূক্ষ্মরুচি, ছোট ছোট ব্যবসায়ে নিযুক্ত, অন্তরে সাম্যনীতির ভাব, ধর্ম্মসংক্রান্ত কুসংস্কারাদিতে উহাদের দৃঢ় আসক্তি। পুরুষদিগের এক প্রকার ধুচ্‌নী টুপি ও কালো ঢিলা কোর্ত্তা। স্বতঃ-নির্ব্বাসিত হইয়া উহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বেলুচিস্থানে, ব্রহ্মে, চীনে বাণিজ্যব্যবসায় ও কুসীদবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এডেন-উপনিবেশে এমন-কি লণ্ডনেও উহাদের বাণিজ্য-কুঠী আছে। পার্শী-সমাজ একটি পঞ্চায়েতের দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। উহার ২০ জন সদস্য। উহার মধ্যে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ও গৃহস্থ লোকের প্রতিনিধি আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সভার নিষ্পত্তি মঞ্জুর করেন না। কাজেই উহার প্রভুত্ব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী সকলেই গুজরাটি ভাষা ব্যবহার করে।

যে পার্ব্বত্য প্রদেশ অনুর্ব্বর সেই দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিজীবী মারাঠ্‌ঠাদের বাস। ভারতের উত্তরাংশের লোকেরা এই মারাঠাদের উচ্চবর্ণকেও বড় একটা শ্রদ্ধা করে না। উহাদের দৈহিক উচ্চতা মাঝামাঝি, খুব শ্যামবর্ণ, আসলে দ্রাবিড়ীয়দিগের ন্যায় চওড়া-মাথা ছাঁচের হইলেও হিন্দুদের সহিত যৌন-মিলনের ফলে উহা কতকটা সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। উহারা দাড়ী রাখে। যদিও এখনও গর্ব্বিত ও লড়াকা-মেজাজ, তথাপি য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে উহারা এখন বাণিজ্য-ব্যবসায় ও কুসীদ কর্ম্মে নিযুক্ত। কেবল মধ্যভারতের মারাঠা-রাজ্যে যে রাজবংশ

আছে ও রাজকর্ম্মচারীদের যে পরিবারবর্গ আছে তাহারা আদৎ মারাঠা। লোক-সাধারণ—হিন্দু, দ্রাবিড়ীয় ও অপেক্ষাকৃত অসভ্য পাহাড়ী। কিন্তু তাহাদের ভাষা ও রীতিনীতি বিজেতাদিগেরই ভাষা ও রীতি নীতি।

মধ্যভারতে অল্প মুসলমান; নিজামের রাজধানী হৈদ্রাবাদে বিস্তর মুসলমান। হৈদ্রাবাদে, বহির্দ্দেশ হইতে আগত আরব, পারসিক, এমন-কি কাফ্রি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত মধ্যদেশে মারাঠা ভাষা প্রচলিত।

দক্ষিণে, জাতিসমূহের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। আদিমনিবাসী, উত্তর হইতে সমাগত বিদেশীগণ, সমুদ্রপথে আগত প্রবাসার্থী-গণ। তথাপি দ্রাবিড়ীয় ছাঁচেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। উপকূলগুলি, বিশেষত মালা-বারের উপকূল-ভূমি উর্ব্বরা। আভ্যন্তরিক দেশটি মরুবৎ অনুর্ব্বর। অধিবাসীগণ নগ্ন-প্রায়, শীর্ণকায় ও কদাকার।

বিশেষরূপে কেবল দুই জাতির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়;—টেলুগু ও তামিল। ভারত-উপদ্বীপে বা দাক্ষিণাত্যে তামিল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল জাতি:—ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, চওড়া-মাথা, মোটা-ঠোঁট, জ্বল-জ্বলে চোখ। নছোড়বন্দা ও একগুঁয়ে। অসভ্য চাষা। ইহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মনির্ব্বাসিত হয়। সিংহলে উহাদের সংখ্যা ছয় লক্ষ; উহারা নিম্ন ব্রহ্মদেশে, শ্যাম ও মারিচ দ্বীপে এবং আণ্ডিল দ্বীপপুঞ্জেও প্রবাস-স্থাপন করে। অষ্ট্রেলীয়রা ভারতবাসীর অষ্ট্রেলীয়ায় উপনিবেশ-যাত্রা রহিত করিয়াছে। কুলীরা যেখানেই বাস স্থাপন করে, সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বর লইয়া আসে।

একটু প্রাক্‌কালে ইংরাজগণ হইতে সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়ায়, বঙ্গদেশের ন্যায় মাদ্রাজেও শিক্ষার উন্নতি হইয়াছে। সহরের রাস্তায়, মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা সায়াহ্নে একত্র সমবেত হইয়া তর্কবিতর্ক করে। এইরূপ দৃশ্য তাঞ্জোরের শুভ্রবর্ণ মঠেও দৃষ্ট হয়। যুবকের দল, নগ্নবক্ষ, সাদা-জামা, সাদা চাদর-কাঁধে-ফেলা। সূর্য্যের শেষ-রশ্মি, উচ্চ "বিমান"কে (মন্দিরের চূড়া) কনকরঞ্জিত করিয়া খোদাই-করা ময়ূরের পাখার উপর খেলা করে; স্তম্ভ, কুট্টিম, ও মঠের প্রাচীর এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরীয়, ছায়া আলোকে অঙ্কিত হইয়া উঠে। স্তম্ভবদ্ধ বহিঃপ্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শিক্ষার্থীরা উচ্চকণ্ঠে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে, দর্শন সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করে। যদি কোন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী মঠ দেখিতে যায় অমনি ছাত্রেরা তাকে আক্রমণ করে! বিশ্বব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে, আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে, শিব ও বিষ্ণুর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহে। বিশেষত মানবজাতির উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার কি মত উহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে। স্বকীয় পৌরাণিক ধর্ম্মমতের শিক্ষায় বর্দ্ধিত হওয়ায়, বিশ্বমানবের অধঃপতন হইয়াছে—এই সংস্কারটী এই প্রাচ্য দেশীয় ছাত্রদিগের মন হইতে কিছুতেই অপনীত হয় না। সূর্য্য অস্ত হইল, একটা গরম দম্‌কা বাতাস আসিয়া নিবিড় ধূলা উড়াইয়া দিল; আকাশে কাকেরা, বৃক্ষশাখায় টিয়া-পাখীরা খুব চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল।

ছাত্রেরা তখনও তর্ক করিতেছে; কিন্তু য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন:—ভবিষ্যতে এই জাতির কি-দশা হইবে? যে জাতির লোকেরা এরূপ কঠিন প্রশ্ন সকল এত আবেগ ভরে সমাধানের চেষ্টা করিতেছে—এই সাদাসিধা সুবক্তার জাতি, এই প্রকৃত মানুষের জাতি যাহারা য়ুরোপীয় মধ্যযুগের মত' এই সব দুরূহ প্রশ্নের আলোচনায় এত আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইতেছে, না-জানি তাহারা অনুকূল দিন আসিলে এই আগ্রহ ও উৎসাহ, জীবন-সংগ্রামে ও জীবনের কাজে কিরূপ প্রয়োগ করিবে।

উর্ব্বর ব্রহ্মদেশে সুবিশাল অরণ্য; এই অরণ্যভূমি ইরাবতী ও তাহার শাখা-নদী গুলির দ্বারা পরিসিক্ত। বর্ম্মাজাতির অনন্য প্রকৃতি ও অবাধ বুদ্ধি, উহারা স্বেচ্ছাক্রমে য়ুরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। পুরুষেরা ভবিষ্যৎ-চিন্তাবিরহিত, অলস। রমণীরা খুব উদারপ্রকৃতি, মনোমোহিনী, নিপুণা, প্রভাবান্বিতা, কাজকর্ম্মে সুদক্ষা। সকলেই বৌদ্ধ, কেবল প্রবাসী ভারতবাসীরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী (২৮৪,৮৮০) ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী (৩৩৯,৪৩০)। বর্ম্মীরা তাহাদের কেবল আমোদ প্রমোদের মধ্যেই একটু সৌন্দর্য্যরস ঢালিয়া দেয়। ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ার উপর স্বর্ণাচ্ছাদিত মন্দির; বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে খোদাই কাজ-করা মণ্ডপগৃহ, তাহার চারিধার তক্তা দিয়া বদ্ধ; মণ্ডপের তিনটি পিরামিড-আকারের চূড়া, ক্রমে সূচাগ্র হইয়া উঠিয়াছে; মণ্ডপের বাহির মণ্ডপের গা হইতে ঝুঁকিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রতিমা, প্রাচীর-গাত্রে অল্প-উত্তোলিত ভাস্করকার্য্য দেবদেবীর মূর্ত্তি, নাগ-মূর্ত্তি, জড়াও কাজের গহনা, রংকরা অথবা সোনালী বা রূপালী পাত মোড়া। একটা দীর্ঘ সোপান দিয়া মন্দিরে উপনীত হওয়া যায়; সোপানের ধারে ধারে কাঠের দোকান ও খুব উজ্জ্বল রঙ্গের বিকট মূর্ত্তিসমূহ। দিবসের সকল সময়েই, বিশেষতঃ সায়াহ্নে বর্ম্মীরা মন্দিরে গমন করে; ইহাই—সাধারণ মিলনের স্থান।

দেবালয়—ছত্রতলে, পুষ্পরাশির মধ্যে, অগণ্য বুদ্ধপ্রতিমা;—কোনটা শোয়া, কোনটা দাঁড়ান, কোনটা উবু-হইয়া-বসা। হাজার হাজার মোম্‌বাতী—বাতীর আলো ধূপের ধোঁয়ায় মিশিয়া গিয়াছে। দ্বারদেশে মাথা কামানো, হল্‌দে ধুতি-চাদর-পরা বৌদ্ধভিক্ষু গণ। চারিদিকেই আনন্দোৎফুল্ল জনতা। পুরুষদের চওড়া ধুতি, খাঁদা নাক; উহারা পীতবর্ণ, উহাদের রঙ্গিন পাগড়ী, সাদা ঢিলা-আস্তিন্ জামা, কোমরে জড়ান পাঁচরঙ্গা ধুতি, জঙ্ঘা ও পা অনাবৃত। শিশুরা নগ্নপ্রায়, উহাদের উরু ও পাছায় উল্কি। রমণীদের দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি; উহারা পাতলা, ছিপছিপে, মনোমোহিনী। চিরুণী-দেওয়া উঁচু-বাঁধা চুল পুষ্পভূষিত; উহাদের খোলা কপাল, ডিম্বাকার মুখ, পাতলা নাক; ছাড়া-ছাড়া ভ্রূ, টানা ও বাঁকা চোখ, মধুর ও চতুর দৃষ্টি; ওষ্ঠদ্বয় ভোগ-বিলাসী, জেদালো থুতি। পরিচ্ছদ:—"থামেইন্"—এক রকম পাঁচরঙ্গা রেশমী শাড়ী; তাহার সঙ্গে সেলাই-করা একটা

মার্জ্জনী এবং একটা সাদা ঢিলা-চওড়া-আস্তিন্ জামা। একটা ওর্না। পুরুষ ও রমণী উভয়ই রেশমী কাপড় পরে। বয়স অনুসারে কাপড়ের রং :—যুবকদের জন্য লাল, প্রৌঢ়দের জন্য বেগনী, বৃদ্ধদের জন্য সবুজ। ওরনার রং উজ্জ্বল কিন্তু অকৃত্রিম নহে :—নারাঙ্গি, গোলাপী, নীল-সবুজ। এবং সূর্য্য ঐ সকল বিচিত্র বর্ণের প্রতিবিম্ব উহাদের পীতবর্ণের উপর নিঃক্ষেপ করায় উহাদিগকে যেন আরো সজীব করিয়া তুলে, উহাদের চোখ যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এইরূপে বিবিধ জাতি-সমন্বিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে, বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন লোক, য়ুরোপ হইতে প্রাপ্ত শিল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ ভাবের অনুরূপ ও প্রয়োজনের অনুরূপ রূপান্তরিত করিয়াছে। এই প্রকারেই উহারা পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়ার, পারস্যের ও আরবের শিল্প ও প্রতিষ্ঠানাদিকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। অতএব, সমসাময়িক ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে, প্রথমে নিরূপণ করা আবশ্যক—কোন্ কোন্ জিনিস সমস্ত ভারতের নিজস্ব এবং কোন্ কোন্ জিনিস বিশেষ বিশেষ প্রদেশের নিজস্ব; সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোন্ কোন্ জাতি এই নব সভ্যতার উপর নিজ নিজ ছাপ অঙ্কিত করিয়াছে। একটা সাধারণ ভাব হইতেও এই সমস্তের আলোচনা করা যাইতে পারে। মোটামুটি বলিতে গেলে—সমস্ত ভারত সমাজে, একটা গোল যোগ, অনিশ্চিততা, চেষ্টাপ্রযত্ন, এবং য়ুরোপীয় প্রবণতা ও এসিয়িক প্রবণতার মধ্যে যুঝাযুঝি; সেই সঙ্গে, বিরুদ্ধ প্রবণতাসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর আপোস ও মিলন সংস্থাপন—ইহাই সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞান-সম্মিলন

গত বৎসর জানুয়ারী মাসে 'সায়েন্স কংগ্রেস' বা বিজ্ঞান-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছিলাম। এতদুপলক্ষে গভর্মেণ্ট শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার পি, সি, রায় ও ডাক্তার ডি, এন্, মল্লিক মহাশয়কেও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

'সায়েন্স কংগ্রেস' বা বিজ্ঞান-সম্মিলন ব্যাপারটা যে কি, তাহা জানিবার জন্য হয় অনেকের আগ্রহ হইবে। বিলাতে British Association for the Advancement of Science নামক একটি বিজ্ঞান-পরিষৎ আছে। এই পরিষৎ বিলাতের সকল প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। বৎসর বৎসর গ্রেট ব্রিটেন

আয়র্লণ্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই পরিষদের অধিবেশন হয়। পরিষদের নানা শাখা আছে—যথা, রসায়ন-শাখা, ভূবিদ্যা-শাখা, প্রাণিবিদ্যা-শাখা ইত্যাদি। প্রত্যেক শাখায় একজন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন। এখনকার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন যেই 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে'র আদর্শেই গঠিত হইয়াছে। এই সকল শাখার অধিবেশনে কেবল মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধই পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। ফলে এই পরিষৎ বৎসর বৎসর বৈজ্ঞানিকগণের পরস্পর মিলনের ও ভাববিনিময়ের সুযোগ করিয়া দেন। সঙ্গেসঙ্গে, যে-স্থানে পরিষদের অধিবেশন হয়, সেখানকার নবীন বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘ সম্মিলিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পান এবং তাঁহাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির আলোচনায় যোগদান করিয়া বিশেষরূপে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে'র অধিবেশন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হইয়া থাকে। গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় অধিবেশন হয়। সেই সময় ইউরোপে মহাসমর উপস্থিত হইয়াছিল এবং 'এডেন' নামক জার্ম্মান রণতরি ভারত-মহাসাগরে ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীসকল ডুবাইয়া চারিদিকে মহাভয়ের সঞ্চার করিতেছিল। অধিবেশন শেষ হইলে যখন বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী স্বদেশে ফিরিতেছিলেন তখন তাঁহাদের জাহাজের খালাসীরা ভারত-উপকূলে আসিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া পলায়ন করে। তাহার ফলে স্যর অলিভার লজ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকগণ স্বহস্তে ঝাঁটা ও ব্রুশ দিয়া জাহাজের ডেক ও ক্যাবিন প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়াছিলেন। সকলে দেশে ফিরিলেন—যুদ্ধ না বাধিলে অনেকেই ভারতে আসিতেন এবং আমরা তাঁহাদের সাহচর্য্যে ধন্য হইতাম। কেবল সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক Armstrong সাহেব কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারত-বর্ষে 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশানে'র অধিবেশনের প্রস্তাব দুই-একবার হইয়াছিল বটে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অধিবেশনের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গবেষণা বা শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের পরস্পরে মিলন ও ভাববিনিময়ের কোনও সুবিধা নাই দেখিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার সাইমন্‌সেন ও লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক মিষ্টার ম্যাক্‌মোহন ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহে একখানি চিঠি ছাপিয়া Indian Science Congress-এর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কলিকাতার 'বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি' এই প্রস্তাব সাগ্রহে অনুমোদন করাতে গতবৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং বঙ্গের মাননীয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল পেট্রনরূপে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল তিনদিন এবং সভাক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধ

পঠিত হইয়াছিল। সম্মিলনের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, যাহাতে সম্মিলিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ভালরূপে মেলামেশা হইতে পারে সেইজন্য প্রতিদিন সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সকল সান্ধ্যসম্মিলনে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরও যোগদান করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজে গত জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞান সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। এই বিলাতী-ধরণের সম্মিলন ও আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মধ্যে তফাৎ এই যে, যাঁহারা বিজ্ঞান সম্মিলন আহ্বান করেন তাঁহাদিগকে প্রতিনিধিগণের "ভরণ-পোষণে"র জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হয় না; প্রতিনিধিগণকে কংগ্রেসের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয়, তাহা হইতেই কংগ্রেসের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তাহার উপর প্রতিনিধিগণ যাতায়াতের ব্যয় নিজেরাই বহন করেন, এবং থাকিবার ও আহারাদির বন্দোবস্তও নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। কংগ্রেসের জন্য বিচিত্র পটমণ্ডপেরও প্রয়োজন হয় না।

"দীয়তাং ভূজ্যতাং"এর কোনও ব্যবস্থা না থাকাতে এখানে বাজে লোকের ভিড় ও গোলমাল হয় না। সেইজন্য যে-কোনও সাধারণ গৃহই কংগ্রেসের অধিবেশনের পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল—'বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সভাগৃহে। মাদ্রাজে অধিবেশন হইয়াছিল মাদ্রাজ 'প্রেসিডেন্সি কলেজে'র বিভিন্ন ক্লাসের ঘরে। এক-একটি ঘরে এক-একটি শাখার অধিবেশন হইয়াছিল। ক্লাসে যেখানে অধ্যাপক-মহাশয় বসেন, সভাপতি মহাশয় সেই আসন গ্রহণ করিলেন; এবং প্রতিনিধিগণ ছাত্রদের বেঞ্চের উপর সুখাসীন হইলেন। প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদাতেই কংগ্রেসের সমস্ত খরচ মায় সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহিত হইয়াও কিছু উপরি থাকে। আর আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রাতেও ব্যয়-সঙ্কুলান হয় না। শুনিলাম বর্দ্ধমানের সম্মিলনের জন্য অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল! এই ব্যয়ের অনুপাতে যতটুকু সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছিল, সেটুকু পর্য্যাপ্ত কি না জোর করিয়া বলা বড়ই শক্ত। শুনিলাম বর্দ্ধমানে প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র হইয়াছিল অথচ দ্বিতীয় দিনে শাখাসমূহের অধিবেশনকালে প্রত্যেক শাখায় পাঁচ-সাত-দশজনের বেশী লোক দেখা যায় নাই। এ-ক্ষেত্রে বলিতে হয় আসল কাজের জন্য নয়, কেবল আমোদ-প্রমোদ ও তামাসা দেখিবার জন্য অথবা রসনাতৃপ্তির জন্যই এই দুই সহস্র প্রতিনিধি বর্দ্ধমানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন! সাহিত্য-সম্মিলন এখন যে-ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপরে সেখানে প্রকৃত রসের আস্বাদ পাইবেন না। এক্ষেত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কিছু কমাইয়া যাহাতে বিনা আড়ম্বরে প্রকৃত কার্য্যের ব্যবস্থা হয় সম্মিলন কি তাহাই করিবেন না?

আর একটা কথা বলা দরকার। এই বিজ্ঞান-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের মধ্যে

অধিকাংশই সাহেব। মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্থানীয় দর্শক ও প্রতিনিধি এবং আমরা দুএকজন বাঙ্গালী ভিন্ন অধিকাংশ প্রতিনিধিই সাহেব ছিলেন। তাহার দুইটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, পদার্থবিদ্যা (Physics) ও রসায়ন শাস্ত্রে (Chemistry), বিশেষত দ্বিতীয়টিতে, গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালা দেশে যত বহুল পরিমাণে জাগিয়াছে, ভারতের অন্যত্র এখনও সেরূপ জাগে নাই। সেইজন্য বিজ্ঞান-সম্মিলনে অন্য প্রদেশবাসীর অপেক্ষা বাঙ্গালীর সমাগমই বেশী হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র ভিন্ন বিজ্ঞানের অন্য-অন্য বিভাগে যে-সকল বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই সাহেব। আমাদের কলেজসমূহে প্রধানত পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রই পড়ান হয়, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভারত-সরকারের অধীনে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা (Geology), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বহু বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদেরও মধ্যে অধিকাংশই সাহেব। সেইজন্য এই সকল বিভাগে যাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতবাসীর সংখ্যা কম বলিবারই কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের 'মেডিক্যাল কলেজ' সমূহের অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই সাহেব, এবং বাঙ্গালী ডাক্তারদের মধ্যে যাঁহারা মেডিকেল কলেজে কাজ করেন, তাঁহারা অনেকেই Demonstrator প্রভৃতি নিম্নতন পদে অধিষ্ঠিত। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী অনেক বড় বড় ডাক্তার আছেন ("বড় ডাক্তার" মানে যাঁহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন) বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গবেষণায় ডাক্তার রায়, ডাক্তার স্যার লিওনার্ড রোজার্স প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত ডাক্তারদের মত একজন লোকও নাই। মেডিকেল কলেজে কাজ করিবার কতকটা সুবিধা পাইয়াছেন বলিয়াই বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Bactriology সম্বন্ধে কিছু-কিছু গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেইরূপ, ভারতের উদ্ভিদ-সমূহের তথ্যসংগ্রহ করিবার জন্য কলিকাতা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'বোটানিকেল গার্ডেন' আছে। সেই-সকল স্থানের ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয় অনেক বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ-বিদ্যাবিষয়ক গবেষণায় যশস্বী হইয়াছেন। তাহা ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্থানে মিউজিয়ম আছে। এই-সকল মিউজিয়মে ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের অনেক শাখা দেখা যায়। এই-সকল মিউজিয়মে কর্ম্ম করিয়া ডাক্তার এনান্‌ডেল প্রাণিবিদ্যায় ও সার টমাস হলাণ্ড, ভূবিদ্যায় গবেষণার দ্বারা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ত বাটীতে বাসিয়া গবেষণা করিতে পারেন না। তাঁহার জন্য 'লেবরেটরী' চাই, মিউজিয়ম চাই, যন্ত্র চাই, সরঞ্জাম চাই। কলিকাতার মিউজিয়মে প্রাণিবিভাগে চাকরি পাইয়াছিলেন বলিয়াই বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বি, এল, চৌধুরী

মহাশয় প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের কলেজসমূহে বহুদিন হইতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হইতেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ভিন্ন অন্য কোন কলেজে কোনও 'ল্যাবরেটরী' ছিল না—সেইজন্য এই দুই শাস্ত্র লইয়া অন্য কোনও কলেজে গবেষণাও হইত না। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-আইন পাশ হইবার পর ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষায় এক নবীন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এখন প্রত্যেক কলেজে 'ল্যাবরেটারী' আছে এবং যে কলেজে বি, এস্, সি অনারস (B. Sc. Honours) পর্য্যন্ত পড়ান হয়, সে কলেজের 'ল্যাবরেটারী' এত উন্নত হইয়া থাকে যে, তাহাতে অধ্যাপকেরা ইচ্ছা করিলে গবেষণায় ব্যাপৃত হইতে পারেন। সেইজন্য এখন আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেবল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আবদ্ধ নাই; 'সায়েন্স এসোসিয়েসন' ঢাকা কলেজ, রাজসাহী কলেজ প্রভৃতি অনেক কলেজে উহার বীজ উপ্ত হইয়াছে। আশা করা যায়, কালে প্রত্যেক কলেজে উহার বীজ ছড়াইয়া পড়িবে এবং ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার ক্রমশ বর্দ্ধিত হইলে অদূর-ভবিষ্যতে এই বিজ্ঞান-সম্মিলনে ভারতবাসীর সংখ্যাই ক্রমে অধিক হইয়া উঠিবে।

আগামী বারে মান্দ্রাজের বিজ্ঞান-সম্মিলনীর অন্যান্য কথার আলোচনা করিব।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

কথা ও কাজ

আমরা মুখে যা' বলি কাজে তা' করি না। এ অনুযোগটা এত বেশী শুনিতে পাই যে আমার মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম। যেখানেই যে কথা সেই কাজ, সেইখানেই কোন অস্বাভাবিক কারণ ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মানুষ একটা বিরাট ইঞ্জিন নয় যে Whistleএর সঙ্গেসঙ্গেই চলিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং যদিই আমাদের কথার সঙ্গে কাজের সকল-সময়ে মিল না হয় তাহা হইলে সেই কারণেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল এমন মনে করিবার বিশেষ কারণ দেখি না।

আমাদের জীবন-সমস্যা এতই জটি যে তাহার মধ্যে প্রত্যেক কথা কা পরিণত করিতে বিস্তর ব্যাঘাত ঘ সে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা সকল স সহজও নহে। আবার অনেক সময়ে অ অসম্ভবও বটে। কিন্তু কাজটা যখন তখন শুধু কথা বা চেষ্টার জন্য—আই ভাষায় বলিতে গেলে শুধু attempt জন্য—শাস্তি দিবার ব্যবস্থা অনেক পণ্ডিতে

মুখে শুনিতে পাই, অথচ ভাল কাজের বেলায় আমরা শুধু কথা বা চেষ্টার কেবল যে কোনও মূল্য দিতে সম্মত হইনা তাহা নহে, অধিকন্তু তাহাকে ব্যঙ্গের দ্বারা পরিহাস করিয়া নির্য্যাতিত করি।

সকলপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কথাকে কার্য্যে পরিণত করাই যে সকল সময়ে মনুষ্যত্ব, এমন কথাও বলা যায় না। যিনি দানের নামে পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন, অথবা যিনি পিতৃ-ভক্তি দেখাইতে মাতৃহত্যা বা বারবার নিরীহ বহুজনের প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাদের স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি মনের কোমল বৃত্তি-নিচয়ের স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করার জন্য বাহাদুরি দিতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে এ কাজের জন্য তাঁহাদের কৃতীত্বের দাবী যে খুব-বেশী, এমন কথা ত মনে হয় না। আবার যদি কেহ পিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিসত্ত্বেও তাঁহার আদেশে মাতাকে মারিতে না পারেন, যাহা সাধারণের অর্থাৎ কাহারো নহে, তাহার জন্য যদি কেহ তাঁহারই উপর যাহা বিশেষ করিয়া নির্ভর করে তাহাতে সকলসময়ে জলাঞ্জলি দিতে না পারেন, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে কেন যে তাঁহাকে ছোট করিয়া গণ্য করা হইবে সে-কথাটাও ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

দেখা যাইতেছে, কাজের সঙ্গে মিল হয় না বলিয়াই যে, কথা নিন্দনীয়, তাহা নহে। কথা নিন্দনীয় তখনই—যখন তাহা মনের কথা নয়—প্রাণের কথা নয়, যখন তাহা মুখের শব্দমাত্র—শুকের মুখস্থ বুলির মত ভাবশূন্য, অর্থশূন্য—কেবল পরকে প্রতারিত করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। কিন্তু যে কথার পশ্চাতে কল্পনা ও সঙ্কল্প আছে তাহা কার্য্যে পরিণত না হইলেও প্রশংসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য। সকলসময়ে তাহা ফলবান্ না হইলেও potential energyর মত বজ্রগর্ভ মেঘের ন্যায় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ বলিয়াই নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। তবে, বজ্রপাতের দ্বারাই যেমন মেঘের মধ্যে বজ্রাগ্নির অস্তিত্ব জানা যায়, কার্য্যের দ্বারা, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা তেমনি সঙ্কল্পের অস্তিত্বও জানা যাইতে পারে। কাজে কথার যাচাই হয়, কাজ কথার কষ্টিপাথর। তাই যে-কথার পশ্চাতে কাজ নাই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণও সম্ভবপর নহে। এইজন্যই আমরা প্রত্যেক প্রাণের কথাকেই কাজে সার্থক দেখিতে চাই। পশ্চাতে কাজ না থাকিলেও কাজটা যে প্রাণের হইতে পারে, এটা আমরা অনেক সময়ে স্বীকার করিতে চাই না। বীজ নিষ্ফল হইলে তাহা বীজেরই দোষ, ইহাই আমরা ধরিয়া লই। কিন্তু তাহার সফলতা যে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি আরো বহু পারিপার্শ্বিক কারণের উপর নির্ভর করে, এই সোজা সত্যটা অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। অনেক সময়ে আবার বীজের প্রাচুর্য্যকেই আমরা নিষ্ফলতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বাক্‌পটুত্বের জন্য বাঙ্গালী আত্ম-পর সকলের নিকটেই গঞ্জনাভাজন হইয়া আসিতেছে। সেখানে কথার জন্য উচিত-মূল্য আদায়ের প্রয়াস করিয়া হয় ত ভাল কাজ করিতেছি না।

কিন্তু আমরা কার্য্যবীর বলিয়া যাঁহাদিগকে তারিফ করিয়া থাকি, বাক্যবীর তাঁহারাও যে খুব কম, এমন কথা বলা যায় না। আমাদের রসদ-সচিব Lloyd George-এর কথা মনে করুন। কাজে তিনি 'পোষাক-পরা ঘূর্ণি বাতাস' (a perfect Tornado in Trousers) বলিয়া উল্লিখিত হন দেখিতে পাই। কথায়ও তিনি ঘূর্ণি বাতাসের মতই ধূলি উড়াইয়া মাথা ঘুরাইয়া অনেক সময়েই আঁধি লাগাইয়া দেন। তাঁহার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া সাধারণ লোকে কূল-কিনারা দেখিতে পায় না। ইহার কারণ, কথা ও কাজের মধ্যে একটা ভেদ চিরকালই থাকিবে। এই ভেদ থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কথা, কাজের চেয়ে আগে চলিবেই। কাজ কথাটাকে সার্থক করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইরূপে, ব্যক্তি—গৃহ—সমাজ—রাষ্ট্র অগ্রসর হইতে থাকে। কথা যেখানে ছোট হইয়া গেছে, চিন্তাও সেখানে খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে হইবে। যদিচ কাজ সেখানে কথামত হইয়া কথাটাকে আপাতত সার্থক করিয়া লইতেছে, তথাপি তাহার নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া সে ক্রমশ কলের কাজের মত নির্জ্জীবতা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাণের অভাবে উৎসাহ মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং আপনা হইতে কাজও যে সেখানে পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

কেবল কথার জন্য একটি অভ্রভেদী সিংহাসন তৈরি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহাও হয় ত অনেক পরিমাণে সত্য, আমরা কথা এত-বেশী বলিয়াছি যে, তাহাতে বিকারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। আমার কথা—এই আদর্শকে আমাদের কাজের চেয়েও কতকটা উচ্চ করিয়া রাখিতেই হইবে। আদর্শকে নামাইয়া ধরিলে কাজও সেই পরিমাণে নামিয়া পড়িবে। এবং কাজেও আমরা যে-পরিমাণ অগ্রসর হইতে থাকিব আদর্শকেও ঠিক সেই পরিমাণেই আগাইয়া ধরিতে হইবে। এ আদর্শ প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক গৃহ—প্রত্যেক সমাজের পক্ষে হয়ত বিভিন্ন হইবে, এবং বিভিন্ন হওয়াও হয়ত কতকটা বাঞ্ছনীয়। আদর্শের বিষয়ে absolute standard—একটা চরম মাপ কাঠি—আমার মনে হয়, সোনার স্বপ্নের মত সম্ভাবনার রাজ্যের পরপারে অবস্থিত। অনেক সময়ে এই absolute standard নির্দ্ধারণ করিতে আমরা মারামারি করিয়া অনেকটা কাজের শক্তির অপব্যয় করি।

দর্শনের রাজ্যে দেখা যায়, পরমাণুবাদী যখন অসংখ্য পরমাণুকে নিত্যতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন উহাই জগৎ-সৃষ্টির চরম কারণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ক্রমে দেখা গেল, এতগুলি পরমাণু ও জাতি-সমবায় প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার জঞ্জাল জগৎসৃষ্টি বিষয়ে নিতান্তই অনাবশ্যক। ভাষায় তাহাদের ব্যবহারে কিছু সুবিধা হইলেও বস্তুত তাহাদের স্বীকারে সত্যানুসন্ধিৎসুর অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তখন এগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন দর্শনের সৃষ্টি হইল। প্রকৃতি-পুরুষবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি কত মতেরই প্রচার হইয়া গেল।

কিন্তু এ-বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। যাহা শেষ কথা, তাহা আপেক্ষিক শেষ কথা, ইহা সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি ও অবস্থানুসারে এই শেষ কথা অনবরতই পরিবর্ত্তিত, কোথাও শোধিত আবার কোথাও-বা বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে-দিন প্রচারিত হয় সে-দিন যজ্ঞিয় পশুর আর্ত্তনাদে যে করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল, সে হৃদয়ে একদিনও বোধকরি এ-কথা স্থান পায় নাই যে, তাহার এই মহামন্ত্র মৃত-জীবভক্ষণের প্ররোচনায় নিয়োজিত হইবে। কিন্তু চীন ও ব্রহ্মদেশে এইরূপই ঘটিয়া গেল। শঙ্করের কর্ম্মসংন্যাসেও ভারতবাসী এইরূপে একদিন বসিয়া গেল। যে সাঁতার দিতে পটু সে যখন জলের উপর নিশ্চেষ্ট হয়, তখন তত উদ্বেগের কারণ না থাকিলেও, যে এ-বিষয়ে অপটু তাহার নিশ্চেষ্টতা যে ডুবিবার লক্ষণ ইহা ভাবিয়া দেখিবার অবসরও তাহার ঘটিয়া উঠিল না, বুদ্ধিমান্ বলিবেন এইসকল মতের মধ্যে যে ত্রুটি ছিল তাহারই জন্য এমনটা ঘটিতে পারিয়াছে। ত্রুটি অবশ্যই ছিল। আধুনিক কান্ত্, হিগেল, সোপেনহাওর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের লীলাক্ষেত্রে যে বীভৎস অভিনয় চলিতেছে তাহার মধ্যেও কোথাও-না-কোথাও ত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ত্রুটি ইহাই আমি মনে করি যে এইসকল কথা বা আদর্শকে চূড়ান্ত বলিয়া স্থির করা—ইহাদের চূড়ান্তত্ব যে আপেক্ষিক এই কথা ভুলিয়া যাওয়া। বুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে—অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কখনই চূড়ান্ত থাকিতে পারে না। তাই বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের দেশে চূড়ান্ত কথা শুনাইতে পারে নাই, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াও রাজার সহায়তা, ভারতবাসীর স্বাভাবিক নিরীহতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি অনুকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও তাহা মরিয়া গেল। এইখানটাতে হয়ত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয়ের মতের সহিত আমার মতের কিছু বিরোধ বাধিয়া যাইতেছে। আমি কিন্তু বিষয়টাকে প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখি নাই। দর্শনের দিক্ দিয়া দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, দর্শনহিসাবে ব্রাহ্মণের মেধার নিকট বৌদ্ধ দর্শন পরাজিত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া আমার ত মনে হয়ই না বরং উহাকে আমি বৌদ্ধ দর্শনের মৃত্যুর পরওয়ানা বলিয়াই দেখিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের মেধার উপর হয়ত আপনাদের ততটা শ্রদ্ধা নাই—শ্রদ্ধা থাকিতেও পারে না—কারণ, আপনারা এক পাচক ব্রাহ্মণ অথবা বড়-জোর আমার মত ব্রাহ্মণের সম্পর্কে আসিয়াছেন—কিন্তু আজ যে মেধার কথা বলিতেছি তাহা নিতান্ত অবজ্ঞেয় নহে, তাহা শঙ্করাচার্য্য, রামানুযাচার্য্যের মেধা—তাহার নিকট বৌদ্ধ দর্শনকে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। তাই বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা কাজ যে বড় কম হইয়াছে, তাহাও নহে। দর্শনের শেষ কথা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সেও আজ সহস্রাধিক বৎসর হইয়া গেল। তাহা

লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিয়াছি, কথাটাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টারও ত্রুটি করি নাই। কিন্তু নূতন কথা আর বড় বেশী বলি নাই। এ-দেশীয় দর্শন-রাজ্যে ইহা কখনই শুভ লক্ষণ নহে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'এ পৌঁছিবার যে-সকল দার্শনিক গোঁজামিল আছে—মায়া, লীলা প্রভৃতি যে-সকল কথা সদুত্তর না যোগাইলে ব্যবহৃত হয়, সেগুলার মীমাংসার জন্য অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক আমরা ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর মস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কল্পনা ও যুক্তির নির্ব্বাসন-দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি, আমরা কথাকে বাদ দিয়া কাজে লাগিয়াছি। অনেকের মতে এইটাই শুভলক্ষণ; কিন্তু আমি বলি যখন কাজের চেয়ে কল্পনা কমিয়া আসিয়াছে তখন তাহা মৃত্যুর লক্ষণ —জীবনের লক্ষণ নহে। সুতরাং কাজ যদি-বা সকল সময়ে না হয় সেজন্য কল্পনাকে বা আদর্শকে খাটো করা আমার পরামর্শ নহে। কথাকে যদি প্রাণের সংকল্পে বরণ করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে কাজ একদিন আপনা-হইতেই তাহার অনুগামী হইবে। সেজন্য বসিয়া থাকিব না। কথাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে উত্তরোত্তর অগ্রগামী করিবারই চেষ্টা করিব। সেজন্য যদি পরিহাস সহ্য করিতে হয়, তবে তাহাতেও সম্মত আছি। তাহাতে যদি আমার কপালে কেবল দুঃখই থাকে, তবে সে দুঃখ যেন আমায় মাথার মণি হইয়া উঠে।*

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমাদের শিক্ষা

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের সকল শিক্ষা মায় উচ্চ, বাঙ্গলাভাষাতেই হওয়া উচিত। কথাটা অদ্ভুত নয়, কেননা এক ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অপর সকল দেশে, দেশভাষাতেই দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা নূতনও নয়, কেননা আর কেউ না হোক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ কথা পূর্ব্বেও বলেছেন; —একবার নয়, বহুবার। মাতৃভাষার স্বপক্ষে এক কথা যে একশোবার করে বল্‌তে হয় সে দোষ বক্তাদের নয়, এর জন্যে দোষী হচ্ছেন সেই শ্রোতার দল যাঁরা এক কানে বিলেতি আর-এক কানে সংস্কৃত তুলো দিয়ে বসে আছেন। বাঙ্গলার কথা বাঙ্গলায় বল্‌লে সে কথা শিক্ষিতসম্প্রদায় কানে তোলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য কথা যদি ইংরাজি ভাষায় বল্‌তেন তাহলে বাঙ্গালীর তা মনে বস্‌ত। আমাদের কাছে যে খাঁটি বাঙ্গলার চাইতে মেকি সংস্কৃত ও ভাঙ্গা-ইংরাজির মূল্য ঢের বেশি তার

* শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে ৭ই মাঘের উৎসবে পঠিত।

পরিচয় ত আমাদের সাহিত্যে সংবাদপত্রে সামিতিতে দু'বেলা পাওয়া যায়। সে যাই হোক, শিক্ষিতসম্প্রদায় যে রবীন্দ্রনাথের কথায় মনোযোগ দেন্‌নি তার প্রমাণ—তাঁরা অনেকেই বল্‌ছেন—ও-সব কবিত্বের কথা, কাজের কথা নয়। অনেকের বিশ্বাস যাঁর কবি-প্রতিভা আছে তাঁর বিষয়বুদ্ধি নেই। এ কথা যদি সত্যও হয় ত একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে যাঁর কবি-প্রতিভা নেই তাঁরই বিষয়-বুদ্ধি আছে। কোনও একটি মানসিক-শক্তির অভাব থেকে অপর একটি মানসিক-শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ হয় না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মতে কবির মন আকাশে ওড়ে, মাটির খবর রাখে না। একথা সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এ দেশের ইউনিভার্সিটি-ফেরৎ লোকের মনের গতি আকাশের দিকেও নয়, মাটির দিকেও নয়,—বাটীর দিকে। আমাদের সকল ভাবনা সকল চিন্তা পরিবারের গণ্ডীর ভিতরই আবদ্ধ। আমরা আকাশের খবর দূরে থাক্, দেশের খবরও রাখিনে; কেননা আমাদের মনের পক্ষে ঘর হতে আঙিনা বিদেশ। দেশের দিকে, দশের দিকে একটু ফিরে চাইলে আমরা প্রকাশ্যে এ কথা বলতে লজ্জিত হতুম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-বিদ্যা আমরা লাভ করি তা অর্থকরী বিদ্যা। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পবিত্ত এ ত প্রত্যক্ষ সত্য অথচ একমাত্র এই সম্প্রদায়ই উচ্চ শিক্ষিত। এবং এই উচ্চ শিক্ষা যত প্রসার লাভ করছে উচ্চশিক্ষিত দলের পশার তত কমে আস্‌ছে; এক বিয়ের বাজার ছাড়া আর সকল বাজারেই বি-এর দর পড়ে যাচ্ছে। এরূপ হবার প্রধান কারণ এই যে,—যে-বিদ্যা আমরা শিখি তা অর্থকরী অর্থাৎ তা wealth producing বিদ্যা নয়। আমাদের সকল শিক্ষিত লোকের সমবেত বিদ্যার ফলে এই ভূভারতে ধানের একটি শিষও বাড়েনি। আমাদের স্বার্থকরী বিদ্যা হচ্ছে আসলে অর্থ-হস্তান্তরকরী বিদ্যা। এ বিদ্যার গুণে এর পকেটের টাকা ওর পকেটে যায়। আসল ঘটনা এই যে, আমরা দেশে বিদেশে কোরে খাইনে; আপিসে আদালতে চোরে খাই। যাঁরা শিক্ষার সংস্কার কর্‌বার প্রস্তাব করেন তাঁরা এ কথাটিও মনে রাখেন যে যে-দেশে যথার্থ শিক্ষা আছে সে দেশে জাতীয়-শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধনেরও বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে—জাতীয় শিক্ষার গুণে তদ্দেশবাসীরা এক দাসদাসী ব্যতীত অপর সকল ধনে অপূর্ব্ব ধনী হয়ে উঠেছে। দেশের বিষয় কবি হয় ত দিবাস্বপ্ন দেখেন আমরা কিন্তু নিশাস্বপ্নও দেখিনে— কেননা আমাদের নব শিক্ষার প্রভাবে আমরা স্বার্থের নেশায় দিবারাত্র বেহোঁস হয়ে থাকি।

(২)

কাজের লোকেরা বলেন যে, অন্তত পেটের দায়ে আমাদের ইংরাজি শেখা দরকার, অতএব বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। ভাবুক লোকেরা এর উত্তরে বল্‌বেন, শুধু পেটের দায়ে নয়, মনের দায়েও আমাদের পক্ষে শুধু ইংরেজী

নয়, জর্ম্মান ফ্রেঞ্চও শেখা আবশ্যক ; অতএব বাঙ্গলা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেননা যার কোন একটি ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার নেই তার পক্ষে অপর কোনও ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমরা তাই অর্দ্ধেক জীবন ইংরাজির সঙ্গে কুস্তাকুস্তী করেও সে ভাষাকে কায়দা করতে পারিনে—ফলে অধিকাংশ সময় বি-এ এবং এম-এর মুখ এবং হাত থেকে যা বেরোয় তা ইংরাজি নয়, তার অপভ্রংশ—ইংরাজেরা যাকে বলেন Babu English. আমরা যদি পৃথিবীর যত জ্ঞান বিজ্ঞান বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা করি তাহলে দুটি তিনটি ইউরোপীয় ভাষা কেবল মাত্র ভাষা-হিসেবে শিক্ষা কর্‌বার সময় আমাদের হাতে যথেষ্ট থাক্‌বে। বাঙ্গলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা হলে আমরা অবশ্য বক্তৃতায় Burke Bright-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পার্‌ব না কিন্তু ইংরাজিতে কেরাণীগিরি এবং ওকালতী কর্‌তে পার্‌ব। সাংসারিক হিসেবেও তাতে আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না, কেননা ইতিমধ্যে এদেশে এত Burke Bright জন্মগ্রহণ করছেন যে তাঁদের আর বংশবৃদ্ধির দরকার নেই। দেশ উদ্ধার যদি কথায় না হয় ত সে ইংরাজি কথাতেও হবে না। মুখস্থ বাক্য মাত্রেরই অন্তরে যে মন্ত্রশক্তি আছে—এ ভুল আমাদের এতদিনে ভাঙ্গা উচিত ছিল।

(৩)

আমাদের নবশিক্ষার ফলে আমরা যে জাতীয় অভ্যুদয় সাধন কর্‌তে পারিনি তার প্রমাণ আমাদের দেশহিতৈষীরা নিজের ছেলেকে কথার জাল বুন্‌তে শিখিয়ে আর-সকলের ছেলেকে তাঁতের কাপড় বুন্‌তে শিখতে বলেন। আমরা যদি স্বজাতির বাইরের না হোক মনের দৈন্যও দূর করতে পারতুম তাহলেও নয় আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে কতকটা অহঙ্কার করতে পারতুম। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা কিছু কর্‌তে অক্ষম বলেই এই ধুয়ো ধরেছি যে আমাদের জাতীয় মনের কোনরূপ দৈন্য নেই। যদি চিকিৎসা কর্‌তে না জানি তাহলে কারও রোগ নেই এই কথাটা বলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। এবং বিদ্যার অভাবে বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই আমরা দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আত্মার ঐশ্বর্য্যে আমাদের সমতুল্য জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই,—অতএব উপোস করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ কেননা খালি পেটের ভিতরই আত্মা বাড়বার স্থান পায়।

এ সব কথা বলায় আমরা এই সত্যেরই পরিচয় দেই যে, আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনকে আমাদের নবশিক্ষার ভাগ দিতে পারিনে, আমরা বিদ্যা-ধনে নিজেরা ধনী হইনি বলে, অপরকে তা দান কর্‌তে পারি নে। দেশের শিক্ষিত লোকেরা যে দশের শিক্ষক হননি তার কারণ আমরা এ শিক্ষা আনন্দসহকারে লাভ করিনি। বি-এ পাস করা আমাদের পক্ষে একটা দায় এবং কায়ক্লেশে সেই দায় হতে উদ্ধার লাভ কর্‌তে পারলেই আমাদের

মাথার উপর থেকে একটা ভার নেমে যায় এবং আমরা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঐ পাস-করার ফাঁড়া কেটে গেলে আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুমাত্র বিদ্যার চর্চ্চা করি—তার বাদবাকী অংশের সঙ্গে মনের মত রোকশোধ হই।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লেখাপড়া শিখতে যে কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়েছে তার হাত থেকে একবার অব্যাহতি পেলে আমরা লেখাপড়ার দিক্ দিয়েও আর ঘেঁস্‌তে চাইনে। পঠদ্দশায় আমরা যে, সরস্বতীকে নিত্য বলি—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—তার কারণ তিনি বিদেশিনী। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ কর্‌তে হয় বলেই আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটে এত নিরানন্দ। যার ভিতর আনন্দ নেই সে আমরা নিজের মন থেকেই দূর করতেই যখন ব্যস্ত তখন অপরের মনে তা প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। এবং যাঁদের এরূপ সাধুসংকল্প আছে তাঁরাও সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত কর্‌তে অক্ষম। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ইংরাজির সাহায্যে আরোহণ করি বলে বাঙ্গলায় অবরোহণ কর্‌তে পারিনে। ইংরাজি সরস্বতী আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের আগ্‌ডালে চড়িয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেন্। ফলে আমরা কেউ বা আইনের কেউ বা ডাক্তারির শাখায় বসে ফল পাতা যা পাই তাই খেয়ে জীবন ধারণ করি, অথচ দেশের মাটি নীচে পড়ে রয়েছে, যার আবাদ কর্‌লে ফলত সোনা। নবশিক্ষিত মনের যে কৃষিকাজ আসে না তার একমাত্র কারণ এই যে সে-মনকে মাতৃভূমির কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, মনের মাতৃভূমি হচ্ছে মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের প্রতিই দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে চেয়েছেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সুচরিতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার উদ্দেশ্য

প্রেমের নেশায় আমি বিভোর হই নাই; তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, আমার সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য,—এটুকু ভাল করিয়া আমার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলাম। সে তাহাতে কোনঁ উচ্চবাচ্য করিল না। —এম্‌নি চুপচাপ থাকাই তাহার স্বভাব। তবে, বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সে ঘর-সংসারের কাযকর্ম্মে লাগিয়া গেল।

বিবাহ করিয়া আমি বাড়ী বদ্‌লাইলাম না। আমার বাড়ীতে ঘর ছিল দুখানি। বড় ঘরটির একধারে আপিশ-ঘর। মাঝখানে

বেড়া। ছোট ঘরটিতে আমরা শুইতাম; বন্ধুবান্ধব আসিলে এই ঘরেই অভ্যর্থনা হইত। আমার আসবাব-পত্র সামান্য—এমন-কি, সুচরিতার সেই পিসীদের চেয়েও খেলো।

স্ত্রীর সঙ্গে লুকেরিয়াও আমার সংসারে আসিয়াছিল।

দিন দু-টাকার বেশী সংসারের খরচ দেওয়া আমার পক্ষে যে অসাধ্য, এ কথাটা আগে থাকিতেই জানাইয়া রাখিলাম।—"আর, তিন বছরের ভিতরে আমি ষাট হাজার টাকা জমাতে চাই, এই আমার সংকল্প—বুঝেছ?"

সে কোন আপত্তি তুলিল না।

কিন্তু আমি আর-যা-হই অবিবেচক নই। প্রতিদিন হাতখরচের জন্য আরও আনা-কতক পয়সা তাকে দিতাম; যাতে তার টানাটানি না হয়, সেদিকে আমার নজর ছিল না এমন নয়।

সে থিয়েটার দেখিতে ভালবাসিত। আমি বলিলাম, "দেখ, ফি-মাসে একবার করে আমি তোমাকে থিয়েটারে নিয়ে যাব। তার বেশী আর তুমি যেতে পাবে না।"

"মনে হচ্ছে, সবসুদ্ধ বার-তিনেক থিয়েটারে গিয়াছিলাম। আমরা 'পিটে' বসিতাম। আমরা দুজনে একসঙ্গে থিয়েটারে যাইতাম, অভিনয় দেখিতাম, বাড়ী ফিরিতাম,—কিন্তু সে সবই নীরবে। হায়, কেন এ নীরবতা?—তখনও আমাদের দুজনের ভিতরে ঝগড়া-ঝাঁটি কিছুই হয় নাই—তবুও এই নীরবতা!

মনে পড়ে, মাঝে মাঝে আমার দিকে সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিত;—সেই চুরি-করা চাহনি দেখিলে আমি বেশী করিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিতাম। আমারই ভয়ে সে মুখ খুলিত না—এ-জন্যে দায়ী আমিই! আবেগভরে আমাকে যখন-সে দুহাতে জড়াইয়া ধরিত, তখন দু-একটা সোহাগের কথা তার মুখ দিয়া উপ্‌চিয়া উঠিত। কিন্তু পাছে আমার স্বভাবের গাম্ভীর্য্য তরল হইয়া পড়ে এই ভয়ে আমি তার সেই চটুলতার প্রশ্রয় দিতাম না। প্রেমের প্রলাপ শুনিয়া তন্ময় হইবার বয়স আমার গেছে; তার সঙ্গে ছেলেখেলায় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আমি ও-সব ভালবাসি না, আমি তার গুরুজন, আমি চাই তার শ্রদ্ধা, তার সম্ভ্রম!

আমাদের ভিতরে ক্রমে মন-কষাকষি আর ঝগড়াঝাঁটির সূত্রপাত হইল। তবে বিবাদ-বিসংবাদ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না—কারণ ঝগড়ার আরম্ভেই আমরা কথাবন্ধ করিতাম। লক্ষ্য করিলাম, তার সেই কোমল মুখখানির উপরে দিন-দিন কেমন একটা ঔদ্ধত্যের কঠোরতা ঘনাইয়া আসিতেছে। আমিও ক্রমে অভদ্র হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

সে গরীবের মেয়ে হইলে কি হয়! তার মনটা ছিল বেগমের মত। তাই, আমার সংসারের টানাটানিতে সে যখন-তখন নাক বাঁকাইত। না প্রিয়ে, আমি গরীব নই—সংসারী মানুষ মাত্র! বাজে খরচ আমার অসহ্য! এই সোজা কথাটা বুঝিলে না?

এতটা কড়াকড়ি সে পছন্দ করিত না। শেষটা আমার সঙ্গে থিয়েটারে যাইতেও আপত্তি করিত। কিন্তু তাহার বিমুখতা আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতাম না। ফলে, সেও যত বাঁকিয়া বসে, আমিও তত চুপ হইয়া যাই!

সবই কি আমার দোষ?—ভেবে দেখা যাক্! হ্যাঁ, ষোড়শী বালিকার সঙ্গে প্রৌঢ় পুরুষের মনের মিল হওয়া শক্ত বটে! রমণীর নিজের মধ্যে নিজস্ব বলিয়া কোন-কিছু নাই, তাইতো আমাদের এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। তবে, রমণী প্রেমরূপিণী বটে। সে যাকে ভালবাসে, তার নিষ্ঠুরতাকেও পূজা করে। এতে তার প্রেমের ও মহত্বের লক্ষণ পাওয়া যায় স্বীকার করি, কিন্তু—নিজত্ব কোথায়? সেই কারণেই ত তারা কেবল দুঃখই পায়। তা যদি না হইবে তবে কি আমার এই মৃতদেহ আজ এখানে পড়িয়া থাকে! তার প্রেমের উপর আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সেই আন্তরিক, নিবিড় আলিঙ্গন কি ভুলিবার? হ্যাঁ, আমাকে সে ভালবাসিত বটে, কিন্তু সে চাহিত প্রতিদানে আমাদিও তাকে তেমনি ভালবাসি—যেমন করিয়া আমায় সে ভালবাসে। আর এ কথাও বলি, মৌখিক ভালবাসা জানাইতে না পারিলেও আমি তাকে এমন-কিছু দুঃখ দিই নাই—যার জন্যে—যার জন্যে—না, থাক্—সে কথা আর তুলিয়া কাজ কি?

সমাজের লাঞ্ছনায় আমার মন জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। সমাজে আমি একঘরে। তাহি আজ আমি তেজারতীর কারবারী!

ষাট হাজার টাকা জমাইয়া এ-দেশ ছাড়িয়া যাইব। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের ছায়ায় আঙ্গুরের ক্ষেতে ঘর বাঁধিয়া শেষ ক'টা দিন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া দিব। সেখানে সমাজের চোখ-রাঙ্গানি নাই। আমার অন্তরটিকে যে ভালবাসিবে, আমার সন্তানকে (ভগবান যদি দয়া করেন) যে ভালবাসিবে—এমন-কোন প্রেমবতী, স্নেহময়ী গৃহিণী সেখানে সেই নির্জ্জনে আমার সঙ্গের সঙ্গিনী থাকিবে।

এ-সব মনের কথা মনে-মনেই ভাঙ্গা-গড়া ভাল।—কিন্তু বোকামি করিয়া তাকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম।

ষোড়শী রমণী সে,—তরুণ প্রাণটি তাহার নবীন যৌবন-শ্রী-তে পরিপূর্ণ ছিল; আমার জীবন-সংগ্রাম, আমার দুঃখযন্ত্রণা, আমার আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া সে বুঝিবে বল? জীবনের অভিজ্ঞতা তার কতটুকু?

আমার সেই অবিবেচনার ফল?—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই অসহ মৌনব্রত!

সব-চেয়ে সে বেশী গোলমাল করিত, আমার পোদ্দারী ব্যবসায় লইয়া। আমি কি এতই অর্থ-পিশাচ? যা প্রাপ্য তার বেশী একটা কাণাকড়িও যে আমি লইতাম না, এটা কি তার চোখে পড়িত না? হায়, এ পৃথিবীর অবিচার!

অনেক গুণে গুণী হইলেও সে কি নির্দ্দয়া, আমার প্রাণে সে কি ব্যথাই না দিয়াছে! কে বলিতে পারে, তাকে ভালবাসি নাই?—কে বলিতে পারে এ কথা? আমরা—মানবেরা অভিশপ্ত,

আমাদের জীবন অভিশপ্ত, আত্মা অভিশপ্ত। এই অভিশপ্ত পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশী অভিশপ্ত কে? আমি—আমি! দেখ, আমার জীবন লইয়া প্রকৃতি ও নিয়তি কি নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়াছে!

এখন বুঝিতেছি, আমি কোথাও একটা গলদ করিয়া বসিয়াছি। এখন বুঝিতেছি —তখন বুঝি নাই।

আপনমনে বড়াই করিয়া বলিতাম, "আমি হচ্ছি দর্পী, কড়া মেজাজের লোক। আমার কোন নৈতিক পরিবর্ত্তনের দরকার নেই; যদি যাতনাই পেতে হয়, তবে সকলের অগোচরে, নিজেই মুখ বুঁজে সব সহ্য কর্ব্ব।"—সেই একগুঁয়েমির ফল, এই। এতে আর কোন ভুল নাই।

ভাবিতাম, "এখন বুঝছে না বটে, কিন্তু সময়ে সে আমার কদর বুঝবে। তখন আমার চরিত্র তার কাছে আর হেঁয়ালি বলে ঠেক্‌বে না, তখন সে নিচু হয়ে আমার দু পা জড়িয়ে ধর্‌বে।"—এই ছিল আমার মতলোব। তবু, এর মাঝে বোধ করি কিছু ভুল-চুক্ করিয়া ফেলাতে, আমার সব মতলোব ফাঁসিয়া গিয়াছে!

—থাক্, আর না—আর না! বিধাতার বিধান কে বদ্‌লাইবে? হা মানব! এ সংসার-পাথারে তুমি ক্ষুদ্র তৃণমাত্র—ভাসিয়া যাইতেই তোমার জন্ম!—কিন্তু সাহসী হও, দর্পী হও!

এস, এইবারে সব বলি শুন। সত্য প্রকাশ করিতে আর আমার ভয় নাই। এ তার দোষ—এবং, সব দোষ তার একলার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুচরিতার বিদ্রোহ

ঝগড়াটা কি-করিয়া বাধিল জান?

একদিন একটা বুড়ী আমার কাছে একটি সোনার পদক আনিল,—সেটি তার পরলোকগত স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন। আমি পদকটি একেবারে কিনিয়া নিতে চাহিলাম। বুড়ী কিন্তু হাপুস নয়নে ভাঙ্গা গলায় কান্না ধরিল; তার ইচ্ছা পদকটি আপাততঃ আমার কাছে বাঁধা থাকে—তাহা হইলে পরে সে জিনিষটি আবার উৎরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে। তাহাই হইল।

দিন-পাঁচেক পরে, একগাছা বালা লইয়া বুড়ী আবার আসিল। পদকটির বদলে সে আমাকে বালাগাছা রাখিতে বলিল। কিন্তু সেই কমদামের বালাগাছা পদকের বদলে রাখিতে আমার মন সরিল না।

আমাকে লুকাইয়া বুড়ী আমার স্ত্রীর কাছে গেল। তাহার স্বভাবটা বোধ করি বুড়ী বুঝিতে পারিয়াছিল। স্ত্রীকে বলিয়া-কহিয়া বালা রাখিয়া সে পদকটি লইয়া গেল।

সেইদিনই ব্যাপারটা জানিতে পারিলাম।

আমার স্ত্রী একলাটি মেঝের দিকে চাহিয়া বিছানায় বসিয়া আপনমনে পা দুলাইতেছিল। তাহার মুখ অপ্রসন্ন—ওষ্ঠে একটা তিক্ত হাসির রেখা।

খুব আস্তে-আস্তে শান্তস্বরে বলিলাম, "দেখ, টাকা আমার। আমি নিজের খুসিমত সংসার চালাব। বিয়ের আগে এ-সব কথা তোমাকে ত খুলেই বলেছিলাম —রেখে-ঢেকে কিছু বলি নি।"

হঠাৎ সে সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তারপর,—স্বপ্নেও যা ভাবি নাই, তাই হইল।—বাঘিনীর মত আমার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমাকে সে দুই-হাতে গদাপাতাড়ি মারিতে লাগিল!! বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

একটু পরেই আপনাকে সামলাইয়া লইলাম। তেমনি শান্তভাবেই বলিলাম, "আজ থেকে সংসারের কোন কথায় তুমি থাক্‌তে পারবে না।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

সারাদিনের ভিতরে সে বাড়ীতে আসিল না। বিবাহের সর্ত্ত ছিল, আমার হুকুম ছাড়া সে বাড়ীর বাহিরে পা বাড়াইতে পারিবে না।—যাক্; সন্ধ্যা-নাগাৎ আমার স্ত্রী বাড়ীতে ফিরিল।

পরদিনও সেই ব্যাপার। সকালে সে চলিয়া গেল, বৈকালে ফিরিল।

দোকানপাট বন্ধ করিয়া আমি তার পিসীদের কাছে গেলাম। আমার স্ত্রী সেখানে নাই। তাহাদের কাছে সব খুলিয়া বলিলাম। তারা দুজনে ভঙ্গিভরে হাসিয়া চলিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি তাহলে দেখছি রীতিমত জব্দ হয়েছ।"—আমিও এমনি উত্তরের আশা করিয়াছিলাম।

যাহা হউক, পিসীদের একজনকে ঘুষ দিয়া হাত করিলাম। দুদিন পরে তার মুখে জানা গেল, এই ব্যাপারের সঙ্গে কর্ণেল এফিমোভিচের সংশ্রব আছে।

কর্ণেল এফিমোভিচের সঙ্গে আমি এক সেনাদলে কাজ করিয়াছিলাম। আমাদের দুজনে একটুও বনিবনাও ছিল না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কিসের সম্পর্ক তার? রাগে আমি কাঁপিতে লাগিলাম।

মাসখানেক আগে একটা কাজের অছিলায় কর্ণেল আমার দোকানে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-মস্করা করাতে সেইদিনই তাকে বারণ করিয়া দিয়াছিলাম, সে-যেন ফের আমার দোকানে না আসে।

পিসী বলিল, "ও-পাড়ার জুলিয়াকে চেন ত? তোমার স্ত্রী তার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। কর্ণেল, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে জুলিয়াকে হাত করেছে।"

আচ্ছা,—আমার চোখে ধুলা দেওয়া বড় সোজা কথা নয়! জুলিয়া যে ঘরে থাকে, গোপনে তার পাশের ঘরখানি ভাড়া লইলাম। ইতিমধ্যে আর-একটা ঘটনা ঘটিল।

রাত্রির আগেই আমার স্ত্রী ফিরিয়া আসিল।

বিছানায় বসিয়া পা দুলাইতে-দুলাইতে আমার দিকে সে গর্ব্বিতভাবে চাহিয়া রহিল!

আজ মাসখানেক হইতে সে-যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে! যেন সে সর্ব্বদাই ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত!

হঠাৎ তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে আমাকে বলিল, "তুমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাওনি বলে তোমাকে নাকি ফৌজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?"

—"হ্যাঁ, আমাকে অন্য এক সেনাদলে কাজ করতে বলা হয়েছিল। তাই আমি কাজে জবাব দি।"

—"তাহলে ভীরু বলে তুমি কর্ম্মচ্যুত হয়েছ?"

—"লোকে তাই বলে থাকে বটে। কিন্তু আমি যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিনি—কাপুরুষতা তার আসল কারণ নয়।"—আমি তখন সবিস্তারে সমস্ত কথা বর্ণন করিলাম।

ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "শুন্‌লাম, ফৌজ ছেড়ে তুমি নাকি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে মেগে বেড়াতে?"

—"হ্যাঁ, আমার মাথার উপর দিয়ে অনেক দুঃখের ঝড় বয়ে গেছে! সে ঝড়ে আমি একটু টলেছিলুম বটে,—কিন্তু একেবারে নরকে গিয়ে পড়ি নি! আজ আবার সে পুরোণো কথা কেন?—সেদিন ত আমার চলে গেছে!"

—"হুঁ, এখন যে তুমি টাকার মানুষ,—মস্ত পোদ্দার!"

আমার ব্যবসার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সে আমাকে ছোট করিতে চায়!—তার যা-খুসি করুক্-গে,—স্ত্রীলোকের কথায় অধীর হওয়া উচিত নয়!

ঘণ্টাখানেক পরে সে সাজ-গোছ করিয়া আসিল। আমার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "বিয়ের আগে এ-সব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও তুমি ত আমাকে বল নি!"

আমি তার কথায় কাণ দিলাম না,—সেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা লুকাইয়া-লুকাইয়া জুলিয়ার বাড়ীতে গেলাম। যে ঘরখানা ভাড়া লইয়াছিলাম, তার পাশেই জুলিয়াদের বৈঠকখানা; মাঝে দেওয়াল,—তাহাতে একটি দরজা। আমি সেই দরজায় কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার পকেটে একটা গুলি-ভরা পিস্তল ছিল।

দরজার আড়ালে দুইঘণ্টাকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিলাম।

সেই লম্পট কর্ণেলকে যে কথাগুলি সে বলিল, তাহা কি সহজ, কি সরস, কি সতেজ! কর্ণেলের প্রেম-জানানো ভাব-ভঙ্গি হা-হুতাশ, মিনতি, সে দু-কথায় হাসি-টিটকারির চোটে উড়াইয়া দিল। শেষকালে মরিয়া হইয়া কর্ণেল আমার স্ত্রীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িল।

আমার মনের ধোঁকা তখনও যায় নাই; ভাবিলাম—এ-সব হচ্ছে মেয়েলি ঢং! সে তার কদর বাড়াইতে চায়, কর্ণেলের কাছে, তাই সে সহজে আত্মসমর্পণ করিতে রাজি নয়!

কিন্তু, একটু পরেই আমার ভ্রম বুঝিলাম; না, তাহার চরিত্র দিনের আলোর মত পরিষ্কার, তাহাকে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই,—সে সতী, ফুলের মত নির্ম্মল!

সংসারে অনিভজ্ঞা, এই সরলা বালিকা, মনে-মনে আমাকে ঘৃণা করে; তাই এ হাঙ্গামার সঙ্গে না-জানিয়া আপনাকে সে জড়াইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু ব্যাপারটা সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইবামাত্র তাহার চোখ খুলিয়া গিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল, আমাকে কোন রকমে অপদস্থ করিবে।—কিন্তু যখনি সে বুঝিয়াছে, আমাকে আহত করিতে আসিলে তাহার অমল স্বভাবও অনাহত থাকিবে না, তখনি সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কর্ণেলের কাকুতি-মিনতিতে তার মন একটুও ভিজিল না। বরং চোখা-চোখা বাক্যবাণে, কর্ণেলকে সে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

তখন সবদিকে হতাশ হইয়া, এই অসভ্যটা এমনি রাগিয়া উঠিল যে, আমার ভয় হইতে লাগিল, এইবারে বুঝি-বা সে আমার স্ত্রীকে মারধর করিয়াই বসে!

বন্ধুর মত সহজভাবে, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম। আমার মনের সব ময়লা ধুইয়া গিয়াছে; আমাকে ঘৃণা করিলেও সে যখন অসতী নয়—তখন বরুক্ আমাকে ঘৃণা—কি তাতে আসে যায়?

হঠাৎ তাদের ঘরের দরজা খুলিয়া গিলাম। কর্ণেল তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। আমি সোজা গিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "এস, বাড়ী এস।"

কর্ণেল ততক্ষণে বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাইয়াছে। সে চেঁচাইয়া বলিল, "নিয়ে যাও বাবা, নিয়ে যাও! যদিও কোন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে চাইবে না—তবু—"

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই আমরা ঘর থেকে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার স্ত্রী কোন আপত্তি করিল না,—সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া সে-যেন একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছে! কিন্তু তার এ ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না।

বাড়ীতে আসিয়া সে একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িল। তারপর স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

তার মুখ খড়ির মত শাদা। কিন্তু, তখনও তাহার চক্ষে সেই দর্পিত দৃষ্টি এবং ওষ্ঠে সেই নিষ্ঠুর হাস্যের আভাস! সে-যেন ঠিক করিয়াছে, আমি তাকে গুলি করিয়া মারিব!

পিস্তলটা পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিলাম। সেইদিকে সে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। আমার কাছ থেকে সেও পিস্তল ছুঁড়িতে শিখিয়াছিল।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। রাত তখন এগারোটা। আমার শরীরটাও কেমন এলাইয়া পড়িয়াছিল।

আরও ঘণ্টাখানেক সে যেখানে ছিল, সেইখানেই মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। তারপর পোষাক পরিয়াই সোফার উপরে শুইয়া পড়িল। এই প্রথম সে আমাকে ছাড়িয়া একলা ঘুমাইল।—এ-টুকু মনে রাখিবার কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুঃস্বপ্নের স্মৃতি

তারপর সেই ভীষণ ঘটনা!

আমার ঘুম যখন ভাঙ্গিয়া গেল, ঘরের ভিতরে তখন ভোরের আলো ঢুকিয়াছে।

একেবারে সজ্ঞানে জাগিয়া উঠিলাম। চোখ চাহিয়াই দেখি, আমার স্ত্রী টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া—তাহার হাতে পিস্তল। আমি যে জাগিয়াছি, সে তা দেখে নাই। হঠাৎ সে আমার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। আমিও অমনি চোখ মুদিলাম।

বিছানার পাশে আসিয়া আমার উপরে

সে ঝুঁকিয়া পড়িল। আমি সব শুনিতে পাইতেছি। নীরবতা যেন থম্‌থম্ করিতেছে —সে নীরবতাও যেন কাণ পাতিয়া শোনা যায়!

সে একটু নড়িল; ভয়ে-বিস্ময়ে আচম্‌কা আমার চোখের পাতা খুলিয়া গেল! সে-ও আমার চোখের দিকে চাহিল,—পিস্তলের নলী তখন ঠিক আমার রগের উপর! চকিতে দুজনের চাহনি মিলিল! প্রাণপণে আবার আমি চোখ মুদিলাম। যা-থাকুক কপালে,—আর চোখ চাহিব না, আর নড়িব না,—না, কিছুতেই না!

প্রথম ঘুম ভাঙ্গিলেই লোকে প্রায়ই একবার মাথা তুলিয়া চোখ চাহিয়া দেখে, —আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমাকে চোখ মুদিতে দেখিয়া আমার স্ত্রীও ভাবিল, আমি নিশ্চয়ই ঘুমাইতেছি। নহিলে, এমন ব্যাপার দেখিয়াও কেউ কি কখনো চোখের পাতা মুদিতে পারে?

কথায় আছে, গভীর খাদের ধারে, খুব উঁচু পাহাড়ের টঙ্গে গিয়া দাঁড়াইলে, নিচে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য লোকের মনে একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে।

আমার নিজেরও বিশ্বাস, সঙ্গিন মুহূর্ত্তে কেবলমাত্র অস্ত্র হাতে লওয়ার দরুণই, পৃথিবীতে নিত্য এত হত্যা ও আত্মহত্যা ঘটে।—ঠিক সময়টিতে যদি লোকের মতি অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তবে অনেক দুর্ঘটনা নিবারণ করা যায়। আমি যে সব দেখিয়াছি এবং দেখিয়াও তাহার হাতে যে মরণের অস্ত্র প্রস্তুত হইয়া আছি, আমার স্ত্রী যদি এমন অনুমানও করে, তবে সে গুলি না চালাইতেও পারে।

সেই নিষ্ঠুর স্তব্ধতা!—হঠাৎ আমার চুলের তলায় ইস্পাতের শীতল স্পর্শ অনুভব করিলাম। আর কি আমি বাঁচিব? সে আশা খুব কম। আর, যে নারীকে প্রাণের মতই ভালবাসি, সেই নারীই যদি আমার প্রাণ নিতে চায়, তবে কি কাজ সে ছার প্রাণে?

সে যদি বুঝিয়া থাকে যে আমি ঘুমাইয়া নাই, তবে বুঝুক, কাপুরুষতার অপবাদে ফৌজে আমার কাজ গেলেও, আমি কাপুরুষ নই।

আচ্ছা, আমি তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করি নাই কেন? কি-জানি! তারপরেও যতবার কথাটা ভাবিয়াছি, ততবারই আমার বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে। আমার আর কি আছে, যা বাঁচাইতে চাহিব?—আমার আত্মা তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।—কি বাঁচাইব, কিসের জন্য? আমার সে ভগ্নহৃদয়ের ব্যথা বুঝিবে, এমন মরমী কে আছে?

—পলকের পর পলক যাইতেছে, কিন্তু ঘরের সে নীরবতা মৃত্যুর মত স্থির হইয়া আছে! আমার প্রাণের তলে তলে চেতনা যেন উথলিয়া উঠিতেছিল! কপালের উপরে পিস্তলটা তখনও মরণাগ্নি উদ্গারের জন্য প্রস্তুত!

চকিতে প্রাণে আশার চমক লাগিল। হঠাৎ চোখ মেলিয়া দেখি,—আমার

আর ঘরে নাই! একলাফে শয্যা ছাড়িয়া উঠিলাম। আমারই জিৎ! তাকে আমি চিরকালের তরে হারাইয়া দিয়াছি!

পাশের ঘরে গিয়া নীরবে টেবিলের সামনে বসিয়া পড়িলাম। এবং চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলাম।

খানিকপরে তাহার দিকে চাহিলাম। তার মুখ যেন মড়ার মুখ! খরচোখে তাহার দিকে তাকাইয়া আছি দেখিয়া আপনার পাণ্ডুর ওষ্ঠে সে একটু মৃদু হাস্য আনিবার চেষ্টা করিল। তার ভাব দেখিলে বোধ হয়, সে-যেন মনে-মনে নাড়াচাড়া করিতেছে যে, সেই ভয়াবহ দৃশ্য আমি দেখিতে পাইয়াছি কিনা?

খাওয়া-দাওয়ার পর বাজার হইতে একখানা লোহার খাট ও একটা পর্দ্দা কিনিয়া আনিলাম। শয়ন-কক্ষের পাশের ঘরে সেই লোহার খাটখানা পাতিয়া উপরে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দিলাম। আজ থেকে আমার স্ত্রী এইখানে শয়ন করিবে,—যদিও কথাটা তাকে মুখ ফুটিয়া আর বলিলাম না।

এই নূতন বন্দোবস্ত দেখিয়া সে বুঝিল যে, আমি সব দেখিয়াছি, সব জানিয়াছি। সে রাতেও টেবিলের উপরেই পিস্তলটা তেমনি ফেলিয়া রাখিলাম।

সে তার নূতন বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। আমাদের বিবাহের বাঁধন আজ থেকে টুটিয়া গেল। তাকে জয় করিলাম বটে, কিন্তু ক্ষমা করিলাম না। রাত যত ঘনাইয়া আসে, সে-ও তত ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। সকালে তাহার খুব জ্বর আসিল। এইভাবে সাতটি সপ্তাহ জ্বরের ঘোরে সে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

(ক্রমশ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

দাঁড়িপাল্লা

তুলাদণ্ড—সাদাকথায় যার নাম দাঁড়িপাল্লা, সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই তুলাদণ্ড যে কত-রকমের আছে এবং দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে ইহার যে কত বৈচিত্র্য তাহা আমাদের সকলের জানা না থাকিতে পারে। সেইজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

হাটে বাজারে দোকানী পসারীর কাছে সাধারণত যে দাঁড়িপাল্লা থাকে তার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার গঠন, তাহার ওজনপ্রণালী মোটামুটি আমাদের সকলেরই জানা আছে। এবং যাঁহার জানা নাই তাঁহার যে এ ভবের হাটের ষোলো-কড়াই কাণা তাহাতে সন্দেহ নাস্তি।

যেখানে সাহিত্য, শিল্পকলা লইয়া আলোচনা চলিতেছে সেখানে হঠাৎ দাঁড়িপাল্লার কথা তোলাতে অনেকে আশ্চর্য্য

হইতে পারেন এবং আমাকে বেরসিক ঠাওরাইতে পারেন। কিন্তু ওজন জিনিষটা সাহিত্য-ব্যাপারীদের কাছে কি নিতান্তই তুচ্ছ? আজকাল তো সাহিত্যসমালোচকদের মুখে শোনা যাইতেছে যে সাহিত্যে আমাদের ওজন-জ্ঞানের ভারি অভাব।

কোন্ ওজনে সাহিত্যের মাপ হয় সেই গূঢ় সন্ধানটি দিতে পারিলে খুসী হইতাম। কিন্তু আপাতত যখন তাহা পারিতেছিনা তখন এই স্থূল জিনিষের ওজন লইয়াই আলোচনা করা যাক।

দুপাশে দুই পাল্লা দিয়া দাঁড়ির দুইধারে তাহা ঝুলাইয়া এবং দাঁড়ির ঠিক মাঝখানে একটা মাপকাঠি রাখিয়া সাধারণত জিনিষ ওজন করা হয়। ছোট জিনিষ ওজন করিবার জন্য হাতে-ধরা দাঁড়িপাল্লা এবং বড় ভারি জিনিষের জন্য কোন শক্ত জিনিষ হইতে ঝোলানো দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয়। একপাল্লায় ওজন, আর-একপাল্লায় জিনিষ রাখিয়া, দুই পাল্লা সমান হইলে ঠিক ওজন হইল ধরা হয়। অবশ্য এই সহজ ব্যাপারটার মধ্যেও ছল-চাতুরী চলিতে পারে। একটা আঙুলের টিপনি কিম্বা পাল্লাকে দোল খাওয়াইয়া ওজন চুরি চলে। সে সব কথায় আমাদের কাজ নাই, যাঁহারা এই ছল-চাতুরীতে ঠকিতেছেন এবং যাঁহারা এই দুনিয়া হইতে ছলচাতুরী দূর করিতে চান তাঁহারা ঐ কথা লইয়া আলোচনা করুন; আমি কেবল দাঁড়িপাল্লার গঠন লইয়াই ব্যাপৃত থাকিব।

মোটা জিনিষের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ মোটারকমের দাঁড়িপাল্লায় চলে কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিষের জন্য সূক্ষ্ম-গড়নের দাঁড়িপাল্লা অর্থাৎ নিক্তির দরকার। এই নিক্তির ওজনে তিল পরিমাণ, এমন কি তার চেয়েও কম, এদিক-ওদিক না হয় তার জন্য অনেক কৌশল করা হইয়াছে। আশপাশের বাধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে এই সব নিক্তি তৈরি হইয়াছে। দাঁড়িপাল্লার দাঁড়িতে যে তিনটি (দুই পাল্লার দুই এবং মাঝের মাপকাঠির এক) বন্ধন আছে তাহাতে ঐ তিন স্থানে আটক খাইয়া দাঁড়ির নড়াচড়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া ওজনের দোষ হইতে পারে, সেইজন্য দাঁড়ির একমুখে ধারাল ইস্পাত (wedge) 'ওএজে'র আকারে এবং আর-এক মুখে মসৃন অথচ শক্ত কোনরকম পাথর দিয়া উহার গতি সহজ করিয়া দেওয়া হয়; আর হাওয়াতে নড়া বন্ধ করিবার জন্য কাচের বাক্সের মধ্যে ওজন করা হয়; এমন কি ভ্যাকুঅমের মধ্যে, অর্থাৎ হাওয়া সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া কোন-কিছুর মধ্যেও ওজনের ব্যবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য এইরূপ সূক্ষ্ম ওজনের দরকার। এইরূপ তুলাদণ্ডের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়। নয়ত তাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পাল্লা দুইটি শূন্যে ঝুলিতে থাকিলে ক্রমাগত উঠিতে-নামিতে থাকে, কাজেই ওজন ঠিক করা শক্ত হয়, সেইজন্য পাল্লাদুটিকে সমতল স্থানে রাখিয়া তাহার উপর একসঙ্গে ওজন ও জিনিষ চাপাইয়া তারপর পাল্লাদুটিকে শূন্যে তুলিবার ব্যবস্থা করিলে ওজনের সুবিধা হয়।

যদপি সূক্ষ্ম ওজন নির্ণয় করিবার জন্য এইরূপ অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে।

টাকশালে একপ্রকার অদ্ভুত রকমের তুলাদণ্ড আছে। তাহাকে আটোমেটিক বলে অর্থাৎ স্বাধীন বা স্বতশ্চল তুলাদণ্ড বলা যাইতে পারে। রূপার পাত প্রস্তুত করিয়া একটা কলে ঢালিয়া দেওয়া হয়; সেখানে ছাপ খাইয়া গোল গোল টাকা প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে থাকে; যদি কোনকারণে কোন টাকার কিছু দোষ থাকিয়া যায়, কিম্বা ওজন যদি কম-বেশি হয় তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক টাকার পরীক্ষা হইয়া থাকে। ওজনের জন্য একটা চোঙের মধ্যে অনেক টাকা একটির উপর একটি এইভাবে সাজান হয়। কলের মধ্যে একটি একটি করিয়া টাকা আপনা-হইতে পাল্লার উপর গিয়া পড়ে। যদি ওজন ঠিক হয় তবে টাকাটি ঠিক নিচে একটি পাত্রের উপর পড়ে; যদি বেশি ওজন হয় তাহা হইলে দক্ষিণ দিক দিয়া গড়াইয়া একটি চোঙের মধ্য দিয়া অপর এক পাত্রে পড়ে। সেইরূপ হাল্কা টাকাগুলি বাম ধারে পড়িয়া আর এক পাত্রে জড় হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা এই কলে একটি-একটি করিয়া টাকা তুলাদণ্ডের পাল্লার উপর আসিয়া পড়ে, অল্পক্ষণ তাহার উপর থাকে এবং ওজন হইয়া যে-ধারে পড়া উচিত, সেই ধারে গিয়া পড়ে। কলে ওজন ঠিকমত হইতেছে কিনা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, কলের কোন প্রকার দোষ হইলেই ওজন ভুল হইবে না। অত্যেক কল একঘণ্টা বা দুইঘণ্টা অন্তর পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার পদ্ধতি এই:— অল্প দাঁড়ি-পাল্লায় কয়েকটি টাকা আগে ওজন করিয়া দেখা হয়; তারপর সেই টাকাগুলি কলের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হয় যে ভারি টাকা ভারির দিকে, আর সমান টাকা সমানের দিকে আর হাল্কা টাকা হাল্কার দিকে যাইতেছে কিনা। কলের দোষ হইলে তাহা শুধরাইবার উপায় আছে। এই কার্য্যের জন্য শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার মিস্ত্রি আছে।

তুলাদণ্ডের অনেক প্রকার আকার আছে। স্প্রিংএর সাহায্যে একপ্রকার তুলাদণ্ড নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কোন প্রকার ধাতুনির্ম্মিত সরু বা মোটা তারকে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া এক বা কয়েক ফের করিলে স্প্রিং তৈয়ারি হয়। কোন-একটি স্প্রিংকে চাপিয়া ছোট করিতে বা টানিয়া বাড়াইতে ভার লাগে। নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ওজনের ভার চাপাইয়া বা টানিয়া স্প্রিং কতটা চাপিয়া বা কতটা বাড়িয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া স্প্রিং-সংযুক্ত একটি প্লেট বা পাতে তাহার চিহ্ন করা হয়। সেই চিহ্নের পাশে সেই ওজন লেখা থাকে। এইরূপ তুলাদণ্ডের সাহায্যে চিঠিপত্র বা ডাকের পার্শেল ওজন হইয়া থাকে! অনেক সময় ডাক্তারেরাও এইরূপ তুলাদণ্ডের সাহায্যে রোগীর বা যে-কোন মানুষের দেহের ওজন নির্ণয় করিয়া থাকেন। এইরূপ তুলাদণ্ডের দোষ এই যে, স্প্রিং আল্‌গা হইয়া গেলে আর ঠিক ওজন পাওয়া যায় না।

দুইপাশে দুইটা নয়, কেবল একপাশে

একটা পাল্লা দেওয়া একরকম তুলাদণ্ড আছে। এইরূপ তুলাদণ্ডের ব্যবহার উড়িষ্যা-প্রদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ডক্টর বি; এল, চৌধুরি মহাশয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গঞ্জাম জিলায় রম্ভা নামক স্থানে এবং পুরীর এলাকাধীন চিল্কাহ্রদের নিকটবর্ত্তী বকুল নামক স্থানে এইরূপ তুলাদণ্ডের ব্যবহার দেখিয়া আসিয়া তাহার বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণল নামক মাসিকপত্রের ১১।১ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি রম্ভার এইরূপ দুইটি তুলাদণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। সে-দেশে ইহার নাম বিশাডাঙ্গা। ইহা ভারি ও শক্ত শালকাঠের তৈয়ারি। কাট অর্থাৎ দণ্ডটি গোল; একদিকে মোটা হইতে ক্রমশ অপর দিকে সরু হইয়া আসিয়াছে। সরু দিকের প্রায় শেষভাগে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে একটি পাল্লা ঝুলান থাকে। বেত বা কঞ্চি বা বাঁখারি দিয়া পাল্লাটি তৈয়ারি হয়। দড়িটির উপরে ১৭টি গোল দাগ কাঠকে বেষ্টন করিয়া কোঁদা আছে। ৬, ১১, ১৩, এবং ১৬ নং দাগে একটি করিয়া × এইরূপ চিকা দাগ আছে। কোন জিনিষ ওজন করিতে হইলে পাল্লাতে তাহা রাখিয়া কাঠিটি অর্থাৎ দণ্ডটি একটি দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া ধরিতে হয়। দড়িটি সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে হয় কোন্ দাগের উপর রাখিলে দণ্ড ঠিক সোজা থাকে। প্রত্যেক দাগের একটা ওজন নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

নং১	প্রথম দাগ—	কোন ওজন হয় না। ইহা পাল্লার পাষাণস্বরূপ।		
২	দ্বিতীয় দাগ	১ পল অর্থাৎ	৬ তোলা	
৩	তৃতীয় „	২ „	বা ১২	„
৪	চতুর্থ „	৩ „	১৮	„
৫	পঞ্চম „	৪ „	২৪	„
৬	ষষ্ঠ „	× ৫ „	৩০	„
৭	সপ্তম „	৬ „	৩৬	„
৮	অষ্টম „	৭ „	৪২	„
৯	নবম „	৮ „	৪৮	„
১০	দশম „	৯ „	৫৪	„
১১	একাদশ „	× ১০ „	৬০	„
১২	দ্বাদশ „	১১ „	৭২	„
১৩	ত্রয়োদশ „	× ১৫ „	৯০	অর্থাৎ আধবিশ
১৪	চতুর্দ্দশ „	১৮ „	১০৮	„
১৫	পঞ্চদশ „	২০ „	১২০	„
১৬	ষোড়শ „	২৫ „	১৫০	„
১৭	সপ্তদশ „	৩০ „	১৮০	বা ১ বি

দণ্ডে দাগ করিবার পূর্ব্বে নির্দ্দি ওজনের জিনিষ পাল্লায় রাখিয়া পরীক্ষ করা হয় এবং দণ্ডের যে স্থানে দড়ি ধরিলে সেই ওজনের জিনিষ লইয়া দ ঠিক সোজা থাকে সেই স্থানে দাগ ক হয়। উপরে যে ওজনের পরিমাণ দেও হইল তাহার। দাগ দণ্ডের মোটা দি হইতে আরম্ভ। কোন কোন বিশা ডাঙ্গা ২০ পল (অর্থাৎ ১২০ তোলা) বা ১৮ প (অর্থাৎ ১০৮ তোলা) অবধি মাপ থাকে চৌধুরী-মহাশয় অনুমান করেন যে, যে-স দেশে উড়িয়া ভাষার অধিকার সেই-স দেশে বিশা ডাঙ্গার ওজন প্রচলিত আছে

এই ধরণের তুলাদণ্ড ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। ইহার কয়েকটি নমুনা কলিকাতার যাদুঘরে আছে। ছোটনাগপুরের একটি তুলাদণ্ড সেখানে আছে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা এক ফুটের চেয়ে কিছু-বেশি লম্বা। ভারি শাল-কাঠের তৈয়ারি। দণ্ডটি দুইভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ গোল ও মোটা, অপর ভাগটিও গোল কিন্তু সরু, এবং সেই ভাগ শেষের দিকে আরও সরু হইয়া গিয়াছে। এই সরু ভাগটিকে বেষ্টন করিয়া ছয়টি গোল দাগ আছে। সরু ভাগের শেষদিকে এক ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের মধ্যে দড়ি ঢকাইয়া তাহাতে পাল্লা ঝুলান হয়। পাল্লাটি পাতলা চেপটা কাঠের তৈয়ারি, তাহার চারি কোণে চারিটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলির মধ্যে সুতা প্রবেশ করাইয়া সেই সুতাগুলি একত্র করিয়া দণ্ডের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া আটকানো আছে। ছয়টি যে দাগ আছে তাহার প্রথম দাগে দড়ি দিয়া দণ্ডটি ঝুলাইলে পাল্লার ওজনে দণ্ড সোজা থাকে। দ্বিতীয় দাগে ধরিলে দুই তোলা ওজন খাওয়াইলে দণ্ড সোজা থাকে। এইরূপ তৃতীয় দাগে চারি তোলা, চতুর্থ দাগে ছয় তোলা, পঞ্চম দাগে আট তোলা, ষষ্ঠ দাগে বার তোলা ওজন হয়। এই দণ্ডের গঠন বড় মোটা, অপরিষ্কার।

ঢাকা হইতে এইরূপ এক তুলাদণ্ড পাওয়া যায়; তাহা কলিকাতায় যাদুঘরে আছে। তাহার মাপের চিহ্ন ঠিক ছোট-নাগপুরের দণ্ডের মত। কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলে উচুদরের কারিগরি দেখা যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উড়িষ্যা দেশে প্রচলিত বিশাডাঙ্গা নামক তুলাদণ্ডের অনুরূপ তুলাদণ্ড অক্রি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ফেরো দ্বীপের অসভ্য জাতিদের ভিতর প্রচলিত আছে। নিকটবর্ত্তী স্কাণ্ডিনেভিয়ার অপর অপর প্রদেশেও এইরূপ তুলা-দণ্ডের ব্যবহার চলে। সেখানে ইহার নাম বিশ্‌মের বা বিশ্‌মার। উড়িষ্যার বিশাডাঙ্গা নাম এই নামের অনুরূপ। পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে কি না জানিবার উপায় নাই। বিশাডাঙ্গা এই শব্দের উৎপত্তি সন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, ২০ পলে এক বিশা হয়, এই পল উড়িষ্যার মধ্যে সর্ব্বত্রই ছয় তোলা; সংস্কৃত ভাষায় বিংশ শব্দের অপভ্রংশ বিশা শব্দ হইতে পারে কিন্তু উড়িষ্যার সর্ব্বত্রই সংস্কৃত বিংশের পরিবর্ত্তে বিশ না বলিয়া কুড়ি বলা হইয়া থাকে। কাজেই বিশাডাঙ্গার 'বিশা' বিংশের অপভ্রংশ না হইতেও পারে।

উড়িষ্যা-প্রদেশের যে বিশাডাঙ্গার কথা বলা হইল, সামান্য দোকানদার ও গ্রামের লোকেরাই তাহার সাহায্যে ওজন করিয়া থাকে। মহাজন ও বড় ব্যবসাদারেরা এখানকার প্রচলিত দাঁড়িপাল্লার মত তরাজুতে করিয়া সকল জিনিষ ওজন করিয়া থাকে। গ্রামবাসীদের মধ্যে আর-একপ্রকার ওজন প্রচলিত আছে। ইহাতে দাড়িপাল্লার প্রয়োজন হয় না। কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট মাপের পাত্র থাকে ও সেই পাত্রে সেই

মাপের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মাপ দাগ দিয়া চিহ্নিত করা থাকে। এইরূপে মাপ করিয়া চাল, দাল, ধান, গুড়, ঘি, দুধ, আটা ইত্যাদি খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে। এই মাপের নাম অদ্ধা বা ওদ্ধা। সচরাচর ফাঁপা বাঁশের এক টুকরা লইয়া এই অদ্ধা তৈরি করা হয়। গাঁটের কাছে একমুখ বন্ধ থাকে, আর-এক মুখ খালি থাকে। ইহা আমাদের দেশের কুন্‌কের অনুরূপ। উড়িষ্যা দেশে মহাজনেরাও অদ্ধা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের অদ্ধা লোহার তৈরি। এক অদ্ধার মাপ ৮৮ তোলা। সরকারি কারখানায় ইহার মাপ পরীক্ষা করিয়া মাপের সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ ছাপ মারিয়া দেওয়া হয়। এইগুলি ১/০ (সতের আনা) দামে কারখানায় বিক্রয় হয়। গ্রামবাসীরা যে অদ্ধা ব্যবহার করে তাহার মাপ আলাদা। ঘি, দুধ, চাল, ইত্যাদি মাপিবার জন্য যে অদ্ধা ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম সিকা-অদ্ধা ও তাহার ওজন ৭৪ তোলা। কিন্তু ধান, তেল, গুড় ইত্যাদি দ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য যে অদ্ধা ব্যবহার হয়, তাহার নাম বিক্রা-অদ্ধা অথবা পুলুসা-অদ্ধা; তাহার ওজন ৬৪ তোলা। অদ্ধার কম ও বেশি ওজনের মাপও আছে। রম্ভা ও বালুগাঁতে নিম্নলিখিত মাপ চলিত ঃ—

৪ অদ্ধা (বাঁশের)—১ তুম্বার সমান। এই তুম্বা কাঠের তৈয়ারি।

৪ তুম্বা—১ লউটির সমান। এই পাত্র মাটি বা তামার হয়।

২০ লউটি—১ ভরন

৩ ভরন—১ গাড়ি

২ পে—১ প

২ প—১ অদ্ধা সোলা

২ সোলা—১ বুদ বা বোরা

২ বোরা—১ অদ্ধা ৬৪ বা ৬৮ তোলা

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দাঁড়িপাল্লা বাঙ্গলার কোন কোন গ্রামেও ব্যবহৃত হয়।

রেলওয়ে-ষ্টেসনে বা বড় বড় কারখানায় মাল ওজন করিবার জন্য যে 'প্লাটফর্ম স্কেল' নামক তুলাদণ্ডের ব্যবহার হয় তাহার নির্ম্মাণ-প্রণালী কতকটা জটিল। কিন্তু ইহার ওজনের বন্দোবস্ত কতকটা পূর্ব্বোক্ত গ্রাম্য দাঁড়িপাল্লারই অনুরূপ। 'প্লাটফর্ম স্কেলে'র একটা 'ফ্রেম' আছে। ফ্রেমটা এইরূপ ঃ—চৌকা একটা লোহার তলায় চার কোণে চারটা চাকা। সেই চাকার সাহায্যে 'স্কেল'কে সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। যেখানে নাড়ানাড়ি করিবার আবশ্যক নাই থাকে সেখানে চাকা থাকে না। সেই চৌকা লোহাটার সঙ্গে একটা নলের মত লোহা খাড়া করা থাকে। পূর্ব্বোক্ত চৌকা লোহাটার ঠিক নিচে তাহার সঙ্গে ঠেকান আর একটা লোহা থাকে সেইটা পাল্লার কাজ করে। সেই নিচের লোহাটার একপাশে একটা শিকলি বা দড়ির মত কিছু দিয়া, সেটা খাড়া লোহাটার মাথায় একটা আঙটায় ঝুলান থাকে; দড়ি বা শিকলিটা আঙটা হইতে খাড়া নলটির মধ্য দিয়া গিয়া নিচের লোহার সঙ্গে লাগান থাকে। নলের মত খাড়া লোহাটার মাথা থেকে বাঁকাইয়া সেটাকে পাশের

দিকে রাখা হয়। এই অংশটুকু নলের মত নয়,—যেন একটা পুরু লোহার পাত নলের সহিত যুক্ত। ইহা 'ফ্রেমে'র অঙ্গ। যে আঙটার কথা বলা হইয়াছে সেই আঙটার সঙ্গে লাগান দুটা 'রড' আছে। প্রথম 'রড'টি রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা চাপিয়া ফ্রেমের শেষভাগে একটা আঙটায় আটকাইয়া দিলে নিচের পাল্লাটা উঁচু হইয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকে, তখন তাহাতে ওজন করা যায়। চাপিয়া ও আটকাইয়া না দিলে সে 'রডে' যুক্ত শিকল বা দড়ি ঝুলিয়া পড়ে ও পাল্লাটি মাটিতে বা মাটিসংলগ্ন লোহায় ঠেকিয়া পড়ে, তখন ওজন করা যায় না। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন ওজন করিতে না হইবে তখন পাল্লাকে ঝুলাইয়া রাখিলে পাল্লা জখম হইয়া যাইতে পারে; সেইজন্য পাল্লাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। দ্বিতীয় 'রড' বা দাঁড়িটিতে কি কাজ হয় এইবার বলা যাক। যে পাল্লার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক উপরের লোহার পাতের সঙ্গে ঠেকিয়া থাকিলে তাহার উপর মাল রাখিলে পাল্লাতে ভার পড়ে। সেই ভারে এই দ্বিতীয় 'রড'টি উঁচু হইয়া পড়ে; কারণ পাল্লার সহিত ইহা দড়ি বা শিকলি দিয়া আটকান থাকে। এই দ্বিতীয় রডটীর শেষদিকে ওজন চাপাইলে উহা ফের নামিয়া পড়ে। পাল্লার ওজন ও এই ওজন দুই সমান হইলে 'রড'টি সোজাভাবে থাকে, উঁচু বা নিচু হয় না। 'রডে'র শেষ ভাগে ওজন ঝুলাইয়া দিলে ওজন জানা যায়। তাহা ছাড়া 'রডে'র উপরে একটা ছোট ওজন থাকে, সেটাকে 'রডে'র উপর সরাইয়া সরাইয়া দিলে ওজনের কম-বেশি বুঝা যায়। 'রডে'র উপর চিহ্ন করা থাকে, সেই চিহ্ন হইতে ওজন বুঝা যায়। পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া এই ওজনের দাগ করা হয়। মাত্র এই দাগগুলিই পূর্ব্বোক্ত গ্রাম্য দাঁড়িপাল্লার দাগের অনুরূপ; অন্য কোন বিষয়ে এই দুই দাঁড়িপাল্লার মিল নাই।

সাধারণ ও গ্রাম্য দাঁড়িপাল্লার সহিত তুলনা করিলে এই 'প্লাটফর্ম স্কেলে'র প্রধান প্রভেদ দেখা যায় যে, সাধারণ দাঁড়িপাল্লা দাঁড়ির ঠিক মাঝখানে ঝুলান থাকে এবং দুই পাশে দুই পাল্লা ঝুলে, আর 'প্লাটফর্ম স্কেলে' দাঁড়ির এক প্রান্তে একটি পাল্লা ঝুলান থাকে, অপর প্রান্ত-ভাগটি বাটখারা রাখিবার পাল্লার কার্য্য করে। এবং দাঁড়ির উপরে একটি বাটখারা বসাইয়া সরাইয়া সরাইয়া ওজনের তারতম্য জানা যায়। যে গ্রাম্য দাঁড়িপাল্লার বিষয় লেখা হইয়াছে, তাহাতে দাঁড়ির এক প্রান্ত ভারি থাকার দরুন এবং দাঁড়ির নিজের ভারেও অপর প্রান্তে ঝুলান পাল্লায় জিনিষের ওজন প্রকাশ করে। ঝুলাইবার দড়িটি সরাইয়া সরাইয়া বাটখারার কার্য্য পাওয়া যায়। সুতরাং পৃথক বাটখারার প্রয়োজন হয় না।

দরদী

(আন্তন শেখভের গল্প হইতে)

সন্ধ্যা হয়-হয়। দেওয়ালী পোকার মত তুষারকণাগুলি সদ্যজ্বালা আলোক-স্তম্ভের চারিদিকে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং শাদা তুলার মত চারিদিকের ঘর-বাড়ী, ঘোড়ার পিঠ, মানুষের কাঁধ ও টুপির উপর পুরু হইয়া জমিতেছিল।

গাড়োয়ান আইওনার মুখ-চোখ আজ যেন পাণ্ডাসপানা হইয়া গিয়াছে; কুঁজো হইয়া অচল পাথরের মূর্ত্তির মত সে গাড়ীর উপর বসিয়া আছে—তাহার ভাব দেখিলে বোধ হয়, যেন সে চিন্তা-সাগরে একেবারে তলাইয়া গিয়াছে। ঘোড়াটার অবস্থাও তথৈবচ, সেও যেন ভাবনায় বিভোর। আহা, বেচারীরই-বা দোষ কি? এই দিনকতক আগেও সে মনের খুসিতে মাঠে লাঙ্গল টানিত। নীল আকাশ—ধূ-ধূ মাঠ—দূর বন,—প্রকৃতির শ্যামল শোভা তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া থাকিত—কিন্তু এখন? চারদিকে পৃথিবীর চঞ্চলতা, নরনারীর গণ্ডগোল ও হুড়াহুড়ি—উজ্জ্বল আলোর অজস্র সমাবেশ—তারই মধ্যে তাকে দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতে হইতেছে!

দুপুর হইতে আইওনা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে—এ-পর্য্যন্ত তাহার একটীও ভাড়াটিয়া জোটে নাই। ক্রমে সন্ধ্যা তাহার ধূসর পক্ষপুটে সারা সহরটিকে ঢাকিয়া ফেলিল। এই কর্ম্মহীন শান্ত সন্ধ্যায় আইওনা মনে-মনে যে কি চিন্তা-জাল বুনিতেছিল, তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

"কিরে গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি?"

আইওনা চমকিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি চোখের পাতা হইতে তুষারের টুকরাগুলো ঝাড়িয়া দেখিল,—একজন সৈনিকপুরুষ গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

"বেটা, কথা শুনতে পাচ্চিস না—শীগগীর চল্—এক সেকেণ্ড দেরি নয়—চল্, চল্"—বলিতে বলিতে লোকটি একেবারে গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

গাড়োয়ান কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া ঘোড়ার পিঠে এক চাবুক বসাইয়া দিল; চাবুকের আঘাতে ঘোড়ার পিঠ হইতে শুভ্র তুষার-কণাগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঘোড়াটা একটা অনিচ্ছা ও বিরক্তির সহিত গলাটা সামনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া পা টানিয়া-টানিয়া কোন গতিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ী যে কোথা দিয়া চলিয়াছে আইওনার সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ নাই, হাতে সে কেবল লাগামটী ধরিয়া আছে মাত্র! এমন সময় রাস্তার পাশ হইতে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"কোথাকার হতভাগা গাড়োয়ান রে! আর-একটু হ'লেই চাপা দিয়েছিল আর কি—আরে মোলো! ডানদিকে ঘেঁসে যা বল্‌ছি!"

সৈনিকপুরুষটিও চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ডানদিক ঘেঁসে যাও"—

আইওনা একবার সৈনিকপুরুষের মুখের দিকে তাকাইল, সে যেন তাঁহাকে কিছু বলিতে চায়, কিন্তু তাহার গলা হইতে একটা অস্ফুট কর্কশ স্বর বাহির হইল মাত্র।

সৈনিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌চিস্?"

জোর করিয়া মুখে একটু হাসির ছায়া টানিয়া আনিয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় আইওনা বলিল—"মশায়, গেল হপ্তায় আমার ছেলেটী মারা গেছে—তাই—"

"হুঁ; কি করে?"

"কি করে ঠিক বলতে পারবো না—বোধ হয় জ্বরে,—তিনদিন সে হাঁসপাতালে পড়েছিল·····তারপর সব শেষ...ভগবানের ইচ্ছে..."

আবার রাস্তার অন্ধকার হইতে শব্দ আসিল, "কোথাকার সৃষ্টিছাড়া গাড়োয়ান রে; একেবারে চোখের মাথা খেয়েছে—ওর মুখপোড়া! কোন্ চুলোয় যাচ্ছ দেখতে পাও না—"

সৈনিকপুরুষটী বলিয়া উঠিলেন, "জোরে চল্ বাপু জোরে—এমন ঢিমে চালে চল্‌লে সময়মত পৌঁছুতে পারবো না! লাগাও ঘা কষে চাবুক!"

ঘোড়াকে বার-দুই চাবুক কষাইয়া দিয়া সৈনিকের দিকে সে আবার ফিরিয়া চাহিল। তার ইচ্ছা, তার মন হইতে যাহা উথলিয়া উঠিতেছে সেই দুঃখের কাহিনীটা সমস্ত একবার খুলিয়া বলে!

সৈনিক ততক্ষণে চোখ বুঁজিয়া পরম আরামে গাড়ীর দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়াছেন—গল্প শুনিতে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।

কিছুক্ষণ পরে সে আরোহীটিকে যথা-স্থানে নামাইয়া দিয়া একটী গাড়ীর আড্ডার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহার উপরে আবার তুষারের শ্বেতপ্রলেপ জমিতে লাগিল।

রাস্তার পাথরে ও জুতায় খটাখট্ শব্দ তুলিয়া তিনটি যুবক গাড়ীর সামনে আসিয়া থামিল। একজন যেমন লম্বা, আর এক জন তেমনি বেঁটে।

একজন বলিল, "পলিস্কি-পুলের সামনে যেতে হবে—সোয়ারী আমরা তিনজন, ২০ কোপেক ভাড়া, রাজি থাকত' চল।"

নীরব ইঙ্গিতে তাহাদিগকে গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিতে বলিয়া সে আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পলিস্কি-পুলে যাইতে হইবে—মোটে ২০ কোপেক ভাড়া,—হায়রে! আজ যদি তাহার ছেলেটী বাঁচিয়া থাকিত!

গাড়ীতে উঠিয়া তিনজনে ঝগড়া সুরু করিয়া দিল—কে বসিবে আর কে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এই লইয়া শেষটা মারামারি হইবার উপক্রম! শেষে ঠিক হইল বেঁটে লোকটাই দাঁড়াইয়া থাকিবে—কেননা সে মাথায় খাটো। বেঁটে মানুষটি তখন অপ্রসন্ন মনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গাড়োয়ানের ঘাড়ে হাত দিয়া—"জল্‌দি চল্, জল্‌দি"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

এমনসময়ে একজন বলিল, "কাল আমি আর এক বন্ধুর সঙ্গে চার-চারটে বোতল মদ একদমে সাবাড় করেছি!"

লম্বা লোকটা হাতের উপর হাত ঠুকিয়া বলিল, "নিছক্ মিথ্যাকথা—গাঁজাখুরি—চুপ!"

সে লোকটি আবার বুক ঠুকিয়া বলিল—"আলবৎ সত্যি—একশোবার সত্যি!"

এই-সব শুনিয়া আইওনা একটু হাসিয়া মনে মনে ভাবিল, "আ কপাল, এরাই হচ্ছে ভদ্রলোক!"

এদিকে কিন্তু বেঁটে লোকটা গালাগালির চোটে তাহাকে একেবারে নাস্তানাবুদ্ করিয়া তুলিল! তাহার ভারগ্রস্ত দেহ থর্‌থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চোখের সাম্‌নে চারিদিক অস্পষ্ট—চারিদিকে নিরাশা!

ইতিমধ্যে আরোহীরা তাহাদের পরিচিত এক সুন্দরীর রূপের তারিফ্ করিতে করিতে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। আইওনা তাহাদের দিকে একবার তাকাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "আমার ছেলেটি গেল হপ্তায় মারা গেছে।"

বেঁটে লোকটা বলিয়া উঠিল, "সেজন্যে দুঃখ কি,—আমাদেরও একদিন যেতে হবে হে! আরে জল্‌দি চালাও, জল্‌দি! আচ্ছা বেতো ঘোড়া ত! দাওনা ঘাকতক চাবুক!"

আর-একজন মদের নেশায় ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বিয়ে হয়েছে ত?"

আইওনা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "বিয়ে না হলে কি ছেলে হয় হুজুর!"—একটু থামিয়া, নিশ্বাস টানিয়া সে আবার বলিল, "বিয়ে ত হয়েছে, এখন মরণ হবে কবে, তাই ভাবছি! যম যে আমাকে একেবারে ভুলে বসে আছে—নইলে আমি থাকতে কি আমার বুকের বাছাকে বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়!"

আইওনা খুব আগ্রহের সঙ্গে সবে তাহার ছেলের মৃত্যু-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনসময়ে বেঁটে লোকটি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচা গেল! ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি—থামাও গাড়ী!"

আবার সে একাকী—আবার সেই নিস্তব্ধতা—সেই নিরাশা!

সে একজন দরদী খুঁজিতেছিল! সেই লোক-তিনটার কাছে নিজের ব্যথার কথা বলিয়া অশ্রুভরা বুকখানা সে একটু হাল্‌কা করিয়া লইবে ভাবিয়াছিল,—কিন্তু তাহার কথায় কেউ ত কান পাতিল না!

বাধা পাইয়া দুঃখের বেদনায় সে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল! রাস্তায় নর-নারীর স্রোত চলিয়াছে। তাহার চোখদুটী তন্ন তন্ন করিয়া সেই জনতার মধ্যে এমন একটী লোককে খুঁজিতে লাগিল, তাহার দুঃখের কথা শুনিতে যাহার আপত্তি নাই! কিন্তু হায়রে কপাল, সেই নিষ্ঠুর জন-স্রোত ক্রমাগতই আসিতে আর যাইতে লাগিল—তাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল না। তাহার হৃদয়-তটের বন্ধনে আবদ্ধ এই যে সাগর-সমান অগাধ বেদনা জমা হইয়া আছে, এ যদি একবার উপছাইয়া পড়ে, তবে সারা পৃথিবীটাই বুঝি ভাসিয়া যায়!

মাথায় খড়ের বোঝা লইয়া একটা লোক যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া আইওনা বলিল, "ভায়া, কটা বেজেছে বল্‌তে পার?"

"রাত দশটা হবে—এত রাতে এখানে! —এগিয়ে পড়—" বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

আইওনা ঘোড়া হাঁকাইয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া পড়িল। এখনও তাহার আশা আছে একটা লোক পায় তো তাহাকে মনের দুঃখটা বলিয়া একবার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে! কিন্তু হায়, এ জগতে দুঃখের কথায় কান দেয় এমন লোক কই! তাহার মাথাটা একবার ঘুরিয়া উঠিল, গাড়ীর উপর থেকে পড়িয়া যায় আর-কি! কিন্তু কোনরকমে আপনাকে সামলাইয়া সে গোয়ার দিকে গাড়ী ফিরাইল।

ঘোড়াটাও যেন তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল; দেড়ঘণ্টার মধ্যে সে আস্তাবলে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া ঘরের এককোণে গিয়া সে বসিয়া পড়িল এবং একটা পুরানো উনুনের উপর দুইখানা হীমশীতল বাহু বাড়াইয়া দিল। ঘরটি খুব ছোট। কত বৎসরের ঘামা ও আবর্জ্জনা যে ঘরের চারিদিকে জমা হইয়া আছে, তাহা বলা দায়। ঘরের ভিতর অনেক লোক পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছে—তাহাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঘরটী যেন একেবারে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় একটী লোক ঘরের এক কোণ্ হইতে উঠিয়া জলপূর্ণ বালতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

আইওনা অতি করুণস্বরে বলিল, "ভায়া, খুব জল-তেষ্টা পেয়েছে বুঝি—আচ্ছা, খাও ভাই খাও—তেষ্টা মেটাও! ভগবান তোমায় রক্ষা করুন—বন্ধু, আমার ছেলেটি গেল হপ্তায় মারা গেছে, জানত?—ভাই, কিছু কি? গেল হপ্তায় হাঁসপাতালে—আহা, সে কি খেদের কথা—"

একবার চোক্ গিলিয়া সে তাহার দিকে চাহিল; মনে করিয়াছিল তাহার ছেলের মৃত্যুর কথা শুনিয়া লোকটার মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লাইয়া যাইবে। সে কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না; জলপান করিয়া, আবার সে সোজা নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আইওনা চুপ করিল। লোকটা যেমন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে আসিয়াছিল, ছেলের মৃত্যুর কাহিনী বলিবার জন্য সে-ও তেমনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনে করিয়াছিল, একেএকে সব কথাই সে বলিয়া যাইবে। কি করিয়া তাহার ব্যারাম হইল, মরিবার পূর্ব্বে সে কি বলিয়াছিল, ছেলের পরিত্যক্ত কাপড়গুলি কি করিয়া সে হাসপাতাল হইতে আনিয়াছিল—এই সব!

ভাবিতে ভাবিতে সে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এবং ছেঁড়া কোটটা খুলিয়া ফেলিয়া আস্তে আস্তে আপনার ঘোড়ার কাছে আগাইয়া গেল।

ঘোঁড়াটি তখন নিশ্চিন্তমনে ঘাস চিবাইতেছিল। ঘোড়াকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "ঘাস খাওয়া হচ্চে, বেশ, সেই ভাল; কি করবো বল; দানা কিনে আনবার সময় পাইনি—ছেলেটি থাকলে সেই ত সব কোরত!"—তারপর ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "হায় বন্ধু, আমার ছেলেটি ত আর নেই! তোমার যদি আজ একটি ছোট্ট বাচ্চা থাকত—আর, তুমি যদি তার মা হতে—আর, সে যদি বেশী দিন না বাঁচতো, বল দেখি বন্ধু, তাহলে

তোমার মনে দুঃখ হোত কিনা?" এই বলিয়া সে দুইহাতে স্নেহভরে ঘোড়ার গলা জড়াইয়া ধরিল।

ঘোড়াটি তাহার হাতের উপরে মুখ রাখিয়া বড় বড় চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে ঘাস চিবাইতে লাগিল। আইওনার মনে হইল, ঘোড়াটি যেন তাহার কথা সব বুঝিয়াছে।.....সারা প্রাণ ঢালিয়া এই মূক শ্রোতাটিকে সে আপন পুত্রের মৃত্যুকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল.....।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

চয়ন

ভাবাত্মক নাটক

বৈশাখমাসের চয়নে আমরা রুশলেখক লিওনিড আণ্ড্রীভের একটুখানি পরিচয় দিয়াছিলাম। সেবারে আণ্ড্রীভের গল্প লিখিবার ক্ষমতার কথা বলা হইয়াছিল।

কিন্তু আণ্ড্রীভ সুধু গল্পলেখক নন;—রুশিয়ার নাট্যসাহিত্যেও তিনি একজন প্রতিভাধর সুপরিচিত লেখক। নাট্যকার অস্ট্রোভস্কি, রুশদেশে আধুনিক নাটকের জন্ম দেন। টলষ্টয় ও শেখভ প্রভৃতি লেখকেরা সেই আধুনিকতার ভিতরে আপন-আপন নিজস্বের পরিচয় দিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রুশলেখকেরা সাধারণত ব্যক্তিগত মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধ,—তাঁহারা গতানুগতিকতার একান্ত বিরোধী। আণ্ড্রীভের রচনাতেও এই স্বাধীন ভাব ও ভঙ্গির স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। তাঁহার রচিত নাটকগুলি অস্ট্রোভস্কি প্রভৃতির লিখিত আধুনিক নাটকাবলী হইতেও অধিকতর আধুনিক!

আণ্ড্রীভ স্বদেশী নাট্যসাহিত্যে এক নূতনতর রসসৃষ্টি করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের Maski নামক রঙ্গালয়সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রে "Letter on the Theatre" নামে তাঁহার-রচিত একটি লেখা বাহির হয়। ঐ রচনায় তিনি রঙ্গালয়ের অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া একটি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ভবিষ্যতের রঙ্গালয় বলিতে আণ্ড্রীভ্ কি বুঝেন, আমরা এখানে তাহাই বলিব।

নাট্যসমালোচনায় দেখা যায়, সমালোচকেরা সর্ব্বদাই Dramatic action বা 'নাটকীয় ক্রিয়া' বলিয়া একটা কথা তুলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায় এই যে 'action',—ইহার অভাবে নাটকের মর্য্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কথাটা অতি পুরাতন,—এবং ছোট-বড় সকল সমালোচকই এই পুরাতন কথাটাকে নিশ্চিন্ত-ভাবে মানিয়া আসিতেছেন। ইহার বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠিতে পারে, এ-কথা এতদিন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

কিন্তু, আপত্তি উঠিয়াছে। বেলজিয়ামে মেটারলিঙ্ক, রুশিয়ায় আণ্ড্রীভ এবং বাঙ্গলা-দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নানাদেশীয় প্রতিভাশালী লেখকেরা উক্ত আপত্তিকারি-গণের মধ্যে অগ্রগণ্য।

আণ্ড্রীভ অসমসাহসে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছেন, "নাটকীয় ক্রিয়া কি রঙ্গালয়ের পক্ষে একান্তই আবশ্যক?" তারপর তিনি নিজেই এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন,—"না।"

"কেন?"

একালের মানুষ যত-বেশী আঘাত পায়, বাহিরে তত-কম চাঞ্চল্য প্রকাশ করে এবং যত যন্ত্রণা তাহার অন্তরের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তাহার নিভৃত অন্তরের অশান্তি বাহিরেও তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতে পারে না। দুঃখ পাইলে শিশু যত চপল হয়, বড় লোকেরা ততটা হয় না। সভ্যতার গৌরবে মানুষও এমনি ছিল। অনেক শিখিয়া, অনেক শিখিয়া বহুযুগব্যাপী অভিজ্ঞতায় মানুষও এখন বাহ্য চঞ্চলতা-পরিহারে অভ্যস্ত হইয়াছে; বালুগুপ্ত ফল্গুর মত দুঃখ এখন হৃদয়-কুহরে আশ্রয় লইয়াছে। এই কারণে অতীতের সেই বীরত্বপ্রধান আদি ও মধ্যযুগের খুব-কম লক্ষণই একালের ভাব-প্রধান নর-সমাজে দেখা যায়।

এইখানেই আণ্ড্রীভের সঙ্গে সেক্‌স্‌পিয়ার, হুগো, ডুমা, শিলার ও হুগো প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকারের প্রভেদ। আণ্ড্রীভ, মানুষের বাহিরের স্থিরতার উপরে অস্থির, গোপন হৃদয়ের কাহিনী লিখিয়া যান, এই পরস্পর-বৈপরীত্যে দরদী আত্মা স্পষ্ট-রূপে ফুটিয়া উঠে।

স্বমতপোষণের জন্য আণ্ড্রীভ, বেন্‌ভে-নুটো শেল্যিনি ও ফ্রেডারিক নিট্‌শে নামে দুই ভিন্নযুগের ও সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী পণ্ডিতের জীবন লইয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

শেল্যিনি মধ্যযুগের লোক। তাঁহার একটিমাত্র জীবনে কত বিপদ, কত উদ্ধার, কত হত্যা, কত বিস্ময়, অজ্ঞাত আবিষ্কার, প্রেম, ও শত্রুতা দেখা যায়! এক-একদিন কেবল সহরতলী হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে শেল্যিনির জীবনে যত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সাধারণত আধুনিক কোন লোকের সারাজীবনেও তত-বেশী ঘটনা ঘটে না। সে-যুগের মানব-জীবনই ছিল ঘটনাবহুল। তাই, তখনকার নাট্যকার-গণের সৃষ্ট চরিত্রেও চিত্তোত্তেজক ঘটনার সমাবেশ না হইয়া উপায় ছিল না। তাই শেল্যিনির জীবনে গতযুগের রঙ্গালয় যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।

—আর, ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখি নীট্‌শের জীবনে। নীট্‌শে কোন আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে পড়েন নাই। যৌবনে যখন তিনি সৈনিক ছিলেন,—যখন তাঁহার পক্ষে ঘটনাবহুল জীবন যাপন করাই স্বাভাবিক —তখনও তিনি একান্ত সাধারণভাবেই কাল কাটাইয়া দিয়াছেন। তারপর, যখন তিনি পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া নিষ্কর্ম্মার মত ভাব-সাধনায় বসিলেন, তখন হইতেই তাঁহার জীবনে প্রকৃত নাটকত্বের সূত্রপাত হইল। তাঁহার হৃদয়ের আড়ালে সৃষ্টির যে রহস্য এতদিন গোপন ছিল,

সেইদিন হইতে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। নীট্‌শে যেন আধুনিক রঙ্গালয়ের মূর্ত্তি!

একালের গতানুগতিক নাট্যকারগণ নীট্‌শের জীবন-নাট্য ফুটাইবার শক্তি রাখেন না। কারণ, যে-পদ্ধতিতে তাঁহারা নাটক লিখেন, তাহা শেলির্যনির মত ঘটনাবহুল জীবনের পক্ষেই উপযোগী; তাই নীট্‌শের মত ঘটনাহীন ও ভাবপ্রধান চরিত্র বিকাশ করিতে গেলে তাঁহারা অক্ষম হইবেন। অথচ, সেই মান্ধাতার আমোলের শেলির্যনিকে লইয়া ত একালের সাহিত্য, শিল্প ও জীবনযাত্রা চলিতে পারে না!—আমাদের মধ্যে চাহি এখন নীট্‌শের মত মহামানব—যাঁহার জীবন আমাদের এত কাছে-কাছে, এত আবশ্যকীয়, এবং আমাদের পক্ষে এত উপযোগী! এইজন্যই এ-যুগের নাট্যবিভাগকে যথার্থ কাজে খাটাইতে হইলে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন প্রয়োজন।

সমালোচকেরা পাছে আপত্তি তুলেন, তাই আণ্ড্রীভ্ বলিতেছেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, পৃথিবীতে আর ঘটনা ঘটে না বা মানুষের জীবনে এখন ক্রিয়ার অভাব। সংবাদপত্র পড়িলেই জানা যায়, চারিদিকে নিত্য কত আত্মহত্যা, রক্তপাত ও বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিতেছে। কিন্তু নাট্যকলার হিসাবে এ-সব ঘটনার মূল্য এখন কমিয়া গিয়াছে; জীবনের উপরে মনোবিজ্ঞানের দাবি এখন অত্যন্ত অধিক। আগে যেখানে নাটকের তরবারিধারী বীরেরা প্রেমের আবেগে মাতিয়া উঠিত, এখন সেখানে এক নূতন অভিনেতার আবির্ভাব হইয়াছে,—তাহার নাম বিচার-শক্তি। প্রেম নহে, বলবতী স্পৃহা নহে, গৌরব-লালসা নহে—কিন্তু সুখ, দুঃখ, জীবনযুদ্ধের ভাবনাই আধুনিক জীবন-নাট্যে প্রধান অভিনেতার স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং নাটকেও ইহাদের জন্য প্রথম স্থান নির্দ্দেশ না করিয়া উপায় নাই। আণ্ড্রীভ, এই শ্রেণীর নাটক রচনায় এত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, তাঁহার এক নাটকখানির নাম দিয়াছেন, "চিন্তা"। নাট্যজীবনের আরম্ভে "মানব-জীবন" ও "কৃষ্ণ-ছদ্মবেশীগণ" নামে তিনি যে দুখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহাদের ভিতরেও এই ভাবের ধারাই বহমান।

আণ্ড্রীভের ভাবাত্মক নাটকগুলিতে প্রায়ই রূপকের সাহায্যে মানব-জীবনকে বুঝান হইয়াছে। ফলে তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচকেরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। "কৃষ্ণ-ছদ্মবেশীগণ" যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখন খুব অল্পলোকেই তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল। আণ্ড্রীভ বলেন, "সমালোচকেরা হচ্ছে অদ্ভুত জীব। কতগুলি বিষয়কে আমি যে কেন বিশেষভাবে প্রকাশ করেছি, এটা বুঝতে না পেরে মিছেই তারা মাথা ঘামিয়ে মরে। এর খুব একটা সোজা জবাব আছে। প্রত্যেক বিষয় তার উপযোগী ভঙ্গিতেই দেখা উচিত। অমন-যে বুদ্ধিমান লোক শেখভ, কথাবার্ত্তায় যিনি অত সাবধানী, তিনি একদিন ইব্‌সেনের নাম শুনে বন্ধুবান্ধবদের মাঝখানে বলে ফেলেছিলেন, 'ইব্‌সেন হচ্ছেন মস্ত এক নির্ব্বোধ!'—ইব্‌সেন

দুই রূপক যখন শেখভের মত লোকও বুঝে উঠতে পারেন-নি, তখন আমার লেখা বোঝেন-নি বলে, সমালোচকেরা যদি আমাকে গালাগালি দেন, তবে সে-সব সুবুদ্ধির মত উড়িয়ে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। গেল দশবছর আমি যেমন বুঝেছি, তেমনি লিখেছি। কি রূপক, কি বাস্তব—আমি কারুর অধীন নই; তারাই আমার গোলাম; যখন যেমন বিষয়, তখন তেমন ভাবেই রূপক বা বাস্তবকে আমি কাজে খাটিয়েছি। ভবিষ্যতেও আমি ঠিক এই নিয়মমতই চল্‌ব।"

পাঠকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন, বাঙ্গলাদেশেও রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ভাবাত্মক ও রূপকপ্রধান নাটকগুলির গূঢ় অর্থ ধরিতে না পারিয়া, নির্ব্বোধ সমালোচকেরা "দুর্ব্বোধ! দুর্ব্বোধ!" বলিয়া কিরূপ চীৎকার করিতেছেন! রুশিয়া ও বাঙ্গলা-দেশের সমালোচকদের মধ্যে ভেদ এইটুকু যে, সেখানকার 'ক্রিটিকে'রা আজকাল আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছেন; আর এখানকার 'ক্রিটিকে'রা এখনও 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই পড়িয়া আছেন!

ভারতীয় চিত্রকলা

সংপ্রতি কলিকাতায় ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় চিত্রকলার এই নূতন পদ্ধতিটির দিকে আজকাল সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। জগতের সকল দেশের কলাবিদেরাই বলিতেছেন, এই নব ভারতীয় পদ্ধতিটি চিত্রকলায় এক অভিনব প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করিয়াছে।

কিছুদিন আগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনীর চিত্রমালা দেখিয়া উক্ত দুই দেশের শিল্পরসিকগণ মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেখানকার প্রধান-প্রধান পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় চিত্র-কলার বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। স্থানাভাবের জন্য আমরা সেই বিবিধ আলোচনার কিছু-কিছু উদ্ধার করিয়া দিলাম মাত্র।

বিলাতের The Daily News and Leader বলিতেছেন:—

"প্রসিদ্ধ ভারতীয় কবির ভ্রাতুষ্পুত্র ও আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রধান পুরোহিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত যাটখানি চিত্র এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রাজ্ঞী মেরী ও শ্রীযুক্ত হ্যাভেল কর্ত্তৃক দত্ত "অশোকের রাণী" ও ওমর খইয়ামের ছবিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণরঞ্জক। প্রদর্শনীতে অন্যান্য যে-সকল শিল্পীর চিত্র আছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, ঈশ্বরীপ্রসাদ ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামই উল্লেখযোগ্য;—ইঁহারা অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। য়ুরোপীয় চিত্রকলায়

"একটি রমণী আলুর খোসা ছাড়াইতেছে" বা "একটি যুবতী বাসন মাজিতেছে"—প্রভৃতি নামের যে-রকম-সব বাজে রাবিশ ছবি দেখা যায়, ভারতীয় চিত্রকলায় সে-রকম কোন-কিছু একেবারেই নাই—অধিকাংশ চিত্রই ভারতীয় ইতিহাস, পুরাণ এবং কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্য প্রভৃতি অতিমানবগণের জীবনী অবলম্বনে অঙ্কিত হইয়াছে। যাঁহারা, ভারতবাসীর গোপন হৃদয় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুভূতি লাভ করিতে চান, তাঁহারা এই প্রদর্শনীতে আসিলে আনন্দের সহিত অনেক শিক্ষা পাইবেন।

শ্রীযুক্ত হ্যাভেল যখন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ে"র প্রধান অধ্যক্ষের পদলাভ করেন, ছাত্রেরা তখন ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি অত্যন্ত বিমুখ হইয়া ছিল। বিদ্যালয়-সংলগ্ন চিত্রশালাটি প্রতীচ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পট দেখিয়া নকল-করা ছবিতে পরিপূর্ণ থাকিত—ছাত্রদের আদর্শ ছিল সেই-সব রাবিশ। শ্রীযুক্ত হ্যাভেল অসমসাহসে সেই রদ্দী মালগুলো চিত্রশালা হইতে বিদায় করিয়া দেন এবং তাহাদের স্থানে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য্যের ভাল ভাল নমুনা আনিয়া রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ফলে, কলিকাতায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ছাত্রেরা একসঙ্গে বিদ্যালয় ছাড়িয়া যায়। কিন্তু সে-সকল নিন্দা-গালাগালিতে তিনি একটুও টলিলেন না। ছাত্রেরা আবার একে-একে ফিরিয়া আসিল এবং প্রতিভাবান নবীন কলাবিদ অবনীন্দ্রনাথ সহযোগীরূপে হ্যাভেল-সাহেবের সঙ্গে যোগদান করিলেন। হ্যাভেল-সাহেবের কার্যকাল সমাপ্ত হইলে অবনীন্দ্রনাথই শিল্প-বিদ্যালয়ে উপদেষ্টার পদগ্রহণ করেন।

হ্যাভেল-সাহেব বলেন, "আমরা যখন ভারতবর্ষের শাসনভার পাই, ইংরাজদের ভিতরে রুচিবোধ তখন একরকম ছিল না বলিলেই চলে—ভারতের পক্ষে এটি গভীর দুর্ভাগ্যের কথা। যাহা য়ুরোপ হইতে আমদানি নহে, তাহার কোন আদর ছিল না। অনাদর-অপযশে ভারতীয় কলার দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। ভারতের রাজামহারাজ ও ধনীরা দেশীয় রাজমিস্ত্রীর বদলে 'পাবলিক ওয়ার্কসে'র কর্ম্মচারীদের ডাকাইয়া আধা-ফেরঙ্গ আধা-দেশীয় আদর্শে প্রাসাদাদি তৈয়ারি করিতে লাগিলেন। ভারতের নিজস্ব ও অপূর্ব্ব ভিত্তি-চিত্রের বদলে কুৎসিত বিলাতি 'ওয়াল-পেপার' ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কোন-জাতীয় ললিতকলা স্থাপত্যের মধ্য দিয়াই প্রধানত আত্মপ্রকাশ করে; সুতরাং কোন দেশের স্থাপত্যকলার অবনতি দেখিলে বুঝিতে হইবে, সে দেশের রুচিও অবনত হইয়াছে।

এদিকে ভারতে যাহারা বংশানুক্রমে শিল্প-ব্যবসায়ী, দেশব্যাপী অবহেলায় তাহাদের দুর্গতির আর অবধি রহিল না। জীবিকাসংগ্রহের জন্য বাধ্য হইয়া, তাহারা ছোটখাট সখের জিনিষ তৈয়ারিতে লাগিয়া গেল;—এ-সব কাজগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম হইত, কারণ এ কাজের সঙ্গে শিল্পীদের প্রাণের মিল থাকিত না। আমি একজন ছাত্র পাইয়াছিলাম, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা

রাজশিল্পী ছিলেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার আগে কলিকাতার কোন সাহেব-ব্যবসায়ীর কাছে ইনি ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের পাড় আঁকিতেন। চিত্রশালায় কতগুলি দামী মোগল-চিত্র আছে, সেগুলি আমি এক দোকানীর ঘরে পোকা-খাওয়া ও ধূলামাখা অবস্থায় পাইয়াছিলাম। ছবিগুলির প্রতি দোকানদারের একটুও দরদ ছিল না। পাশ্চাত্য ছবির আদর হওয়াতে প্রাচীন পটগুলি ছেলেদের খেলনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত হ্যাভেলকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, ভারতের শিল্পীরা যে 'অ্যানাটমি' ও 'পারস্পেক্‌টিভ' জানে না বলিয়া নিন্দা আছে, সেটা কি ঠিক?"

—"হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা মস্ত ভুল করা হয়। 'অ্যানাটমি' ও 'পারস্পেক্‌টিভ'-এ ভারতীয় শিল্পীর জ্ঞান একটু আলাদা-রকমের! তিনি দৈহিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সুন্দরতর ও সূক্ষ্মতর একটা-কিছু প্রকাশ করিতে চান; তাঁহার কল্পনা ও ধ্যান-ধারণায় দৃশ্য ও অদৃশ্যের মোহন মিলন সাধন হয়—আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন এমন অপূর্ব্ব মিলন অসম্ভব। য়ুরোপীয় কলায় অপার্থিবতা যেখানে চরমে উঠিয়াছে, সেখানেও তাহা পার্থিব পদার্থের সহিত একেবারে সংস্পর্শ-বর্জ্জিত নহে। ভারত-শিল্পী সর্ব্বদা স্বর্গ-সৌন্দর্য্যকে মর্ত্তে নামাইয়া আনিতে চান। যখন তিনি পার্থিব দেহ আঁকিতে বসেন, তখন তিনি 'অ্যানাটমি'র খুঁটিনাটি এড়াইয়া আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন; এইজন্যই যাহারা কেবল চামড়ার চোখ লইয়া দেখে, কেবল তাহারাই ভারতীয় পটে 'অ্যানাটমি'র খুৎ ধরিতে বসে। একজন প্রাচীন সংস্কৃত লেখক বলিয়াছেন, পরম রূপবান মানুষের মূর্ত্তি আঁকার চেয়ে অ-রূপ দেবতার মূর্ত্তি আঁকাও শ্রেয়স্কর।—ইহাই হইল ভারত-শিল্পীর আদর্শ।

"ভারতীয় পটে যে-সকল বর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহাদেরও এক-একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। ললিতকলা, ভারতের জাতীয় জীবনেরই অংশবিশেষ; এবং ইহার সঙ্গে দার্শনিকতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। ভারতবাসী মাতৃক্রোড় হইতেই দার্শনিক।"

"আধুনিক য়ুরোপীয় কলায় Post Impressionism-এর যে আন্দোলন চলিতেছে, ভারত-শিল্পের সঙ্গে তাহার কোন সাদৃশ্য আছে বলিয়া কি আপনার মনে হয়?"

শ্রীযুক্ত হ্যাভেল হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এদেশে যাঁহারা ভাবাত্মক কলার পক্ষপাতী, তাঁহাদের উপরে যে প্রাচ্য শিল্পের ছাপ্ পড়িয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস, য়ুরোপীয় শিল্পের উপরে ভারত-শিল্পের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। য়ুরোপকে শিখাইবার জন্য ভারতের অনেক নূতন জিনিষ আছে। কিন্তু য়ুরোপের ভাবাত্মক চিত্রশিল্পীরা ভারত-শিল্পীর মত ছবির প্রতি খুঁটিনাটির উপর প্রাণমন সমর্পন করিতে পারেন না,—দুজনের মাঝে এইখানেই তফাৎ।

"তবে, এখানকার প্রদর্শনী দর্শনকালে এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, "কলিকাতা শিল্প-বিদ্যালয়" এখনও শৈশবদশা পার হয়

নাই। ভারতের প্রাচীন আদর্শ ইহার প্রধান অবলম্বন হইলেও এই নব-পদ্ধতি প্রতীচ্যের ভাল-দিকটা গ্রহণ করিতেও আপত্তি করে না। ভারতবাসীরা যে রক্ষণশীল, এ ধারণা ভুল। নূতন ভাবের ধারাকে অনুসরণ করিতে তাহারা সর্ব্বদাই আগ্রহবান। "ভারতীয়-চিত্রকলা'র পুরোহিত-গণ, ইংলণ্ড ও ভারতকে একত্রে মিলিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও কার্য্য করিতেছেন।"

আগামীবারে ফ্রান্সে "ভারতীয় চিত্র-কলা"র সমাদর-সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইবে।

শ্রী প্রসাদদাস রায়।

কৈসর-প্রাসাদের কাহিনী

জার্ম্মাণ-সম্রাটের "ওল্ডপ্যালেস্" নামক প্রাসাদ প্রাচীনতা ও বিপুলতার জন্য জগদ্বিখ্যাত। ছয়শত কক্ষ বিশিষ্ট এই বৃহৎ প্রাসাদ 'উটারডেন্ লিন্ডেন্' নদীর তীরদেশে অবস্থিত। বার্লিনে এরূপ প্রকাণ্ড প্রাসাদ আর একটীও নাই। সৌন্দর্য্যেও ইহা অতুলনীয়। এসিয়ার আদি রাজা ফ্রেডারিক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার প্রস্তরময় দেহের বিপুল-শ্রীর তুলনায় ফ্রান্সের তৎকালীন সৌন্দর্য্যশালিনী 'ভার্সেলিস্' নগরীকে হীনপ্রভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য তাঁহার সফল হইয়াছিল কিনা বলা কঠিন নয়। এই প্রাসাদসম্বন্ধে 'ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে' এক অদ্ভুত কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

এই অতিকায় প্রাসাদের মধ্যভাগে সবুজ রঙ্গের একটী 'টাউয়ার' আছে। প্রবাদ এই যে, এখানে স্ত্রীলোকের এক প্রেতাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেতাত্মার আবির্ভাব জার্ম্মাণ-রাজবংশীয়গণের পক্ষে অতিশয় অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, ইহার আবির্ভাব হইলে অচিরেই রাজবংশধরগণের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তি নিশাকালে আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রাবৃত হইয়া ধীরপদবিক্ষেপে প্রাসাদের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। রাজবাটীর ছয়শত কক্ষের কোনটীই তাহার অগম্য নহে। কেবল যে-অংশে রাজা বা রাজবংশীয়গণ অবস্থান করেন, সেই অংশে সচরাচর সে পদার্পণ করে না; কিন্তু রাজবংশধরগণের কাহারও মৃত্যু-কাল ঘনাইয়া আসিলে সে মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই সকলের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া দেয়।

এই প্রেত-রমণীটী কে, সে-সম্বন্ধে কয়েকটী কিম্বদন্তী আছে। দ্বিতীয় 'ইলেক্টার জোকিম্' নামক কৈসারের এক পূর্ব্বপুরুষ 'অ্যানা সিডো' নাম্নী এক রমণীর প্রেমে আসক্ত হন। এই রমণীর বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। তিনি অনন্যোপায় হইয়া এক রাসায়নিকের শরণাপন্ন হন এবং পরশপাথরের সাহায্যে প্রভূত ধনলাভের প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিষ্ফল হয়। অবশেষে তিনি প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন করিয়া অর্থ-শোষণ করিতে থাকেন। এই দুর্ভাগ্য নরপতি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার হতভাগিনী প্রণয়িণী নব-নৃপতি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ হন, এবং অবশেষে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। লোকের ধারণা যে, এই বিলাসিনী রমণীর অতৃপ্ত আত্মা তাহার প্রণয়াস্পদের গৃহে আবদ্ধ আছে, এবং রাজবংশধর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল বলিয়া সে রাজাদের মৃত্যুকালে আত্ম-প্রকাশ করিয়া মুমূর্ষুর মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই:—অতি প্রাচীন-কালে এই বংশের এক রাজা কোন এক বিধবা কাউণ্টেসের প্রেমে মুগ্ধ হন। এই রমণীর দুইটী সন্তান ছিল। রূপবান রাজার রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া কাউণ্টেস্ তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে রাজা বলিয়াছিলেন, "এই সুন্দরী বিধবাকে পত্নীরূপে পাওয়া অতিশয় লোভনীয়। কিন্তু আমার অভিষ্টসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় তাহার মাত্র চক্ষু। নহিলে সানন্দে এই রমণীকে বিবাহ করিতে আমার কোনই আপত্তি ছিল না।"

উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী কাউণ্টেস্ রাজার এই উক্তির অন্যরূপ অর্থ করিলেন। তিনি যখন রাজার প্রেমে অন্ধ, হিতাহিতজ্ঞান-

শূন্য। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দুটী সন্তানের প্রতিই রাজা ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই হতভাগ্যেরাই তবে তাঁহাদের সুখের পথের কণ্টক—অতএব তাহারা অপসারিত হউক। এই ভাবিয়া কাউণ্টেস্ তাঁহার সন্তানদুটীর মথায় আল্‌পিন্ বিঁধাইয়া স্বহস্তে তাহা-দিগকে মারিয়া ফেলিলেন। বস্তুত, রাজার সেরূপ কোনও অভিপ্রায় ছিল না। তিনি নিজের পিতামাতাকেই উদ্দেশ করিয়া ঐকথা-গুলি বলিয়াছিলেন। হতভাগিনী কাউণ্টেসের যখন ভ্রম ঘুচিল, তখন তিনি আর এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার পাপগ্রস্ত আত্মা সেইদিন হইতে রাজপ্রাসাদে দারুণ অশান্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তৃতীয় কিম্বদন্তী আরও ভয়াবহ এবং তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত "টাওয়ার"-টীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ফ্রেডারিক প্রুশিয়ার আদি রাজা ছিলেন এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি "Iron tooth" অর্থাৎ লৌহদন্ত নামে অভিহিত হইতেন। এক অতি নৃশংস উপায়ে তিনি অপরাধীগণকে শাস্তি দিতেন। তাঁহার প্রাসাদে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি স্ত্রীমূর্ত্তি থাকিত। এই মূর্ত্তির ভিতরটা ফাঁপা এবং তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রবেশ-দ্বার ছিল। ইহার ভিতরে অনেকগুলি তীক্ষ্ণ বর্শা সাজানো থাকিত। যে-সকল লোক সামরিক অপরাধে দণ্ডিত হইত, তাহাদিগকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া এক গুপ্ত কল ঘুরাইয়া সুতীক্ষ্ণ বর্শায় হত্যা করা হইত। এই কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তিটী উক্ত 'টাওয়ারে'ই প্রথমে স্থাপিত হয়। ইহার

নাম ছিল 'মেডেন্' অর্থাৎ কুমারী। এই কুমারী-মূর্ত্তিটী এখন 'নূরনবার্গে'র প্রাসাদে দেখা যায়। কথিত আছে, এই তীক্ষ্ণশূল-গর্ভা কুমারীর নির্ম্মাণ-পরিকল্পনায় একটী জীবন্ত কুমারীকে আত্মপ্রাণ বলি দিতে হইয়াছিল। সেই কুমারীর প্রেতাত্মাই না কি এই 'টাওয়ারে' স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছে, এবং নিষ্ঠুর রাজার বংশধরগণের প্রতি দণ্ডবিধানার্থ পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের অমঙ্গলস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রেত-রমণী নিশব্দে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যখন ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন কোন অসীমসাহসী ব্যক্তিও তাহার সম্মুখীন হইতে বা তাহাকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সাহস করে না। কারণ, সেরূপ চেষ্টা করিলেই বিষম অনর্থ ঘটিবে।

একরাত্রে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছিল। রাজবাটীর এক বালক ভৃত্য কৌতূহলবশে ইহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে এরূপভাবে কোথায় চ'লেছেন"? প্রেতিনী কোনও উত্তর করি না। তাহার আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদি এবং হস্তে একটী চাবি থাকিত। এই চাবি সাহায্যে সে না কি রাজবাটীর যে-কো কক্ষে যাতায়াত করিতে পারিত। ভৃত্যে কথায় সে যে অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এমন বোধ হইল না; কেবল তাহার হস্তি চাবি দ্বারা সে ভৃত্যের মস্তকে এক আঘা করিল। আঘাত পাইবামাত্র ভৃত্যের মৃতদে কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। পরদিবসই 'ইলেক্টো জন্ সিগিস্‌মণ্ড' হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইউরোপের জনসাধারণের দৃঢ় ধার যে, এই প্রেতরমণী অদ্যাপি জর্ম্মাণ-সম্রাটে গৃহে বাস করিতেছে। বার্লিনবাসীগণ অদ্যাবধি এই ভৌতিক ব্যাপারে অবিশ্বা করে না। রাত্রিকালে রাজপ্রাসাদসংলগ্ন অতিক্রম করিবার সময় প্রেতমূর্ত্তি দর্শনাকাঙ্ক্ষী নগরবাসীগণ এখনও সবুজ 'টাওয়ারে' প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

শহরে "ফাল্গুনী"

"এ সেই পালা যা' জ্যোৎস্নায় হ'লে জমে ভালো,—বুল্‌বুল্-বোস্তাঁ যার প্রধান গায়ক,—ঝিঁঝি যার তান্‌পুরা,—জোনাকী যার রঙ্গ-প্রদীপ;—যা' কেবল মুক্তাশুক্তির আরাম-কেদারায় বসে কল্পনা-কুশলী কবিরা শুন্‌বেন,—আর যার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করতে না পেরে পাণ্ডিত্যাভিমানী হস্তীমূর্খেরা গোড়াগুড়ি শুঁড় আস্ফালন সুরু করে দেবে।"

—ফরাসী কবি গতিয়ে।

বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষাক সেদিন স্যার রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকে বাড়িতে তাঁর অলোকসামান্য কবি-প্রতি ও সঙ্গীত-প্রতিভার যুক্তবেণী "ফাল্গুনী নামক একটি দৃশ্যকাব্য অভিনয় হ'য়ে গে এই নাট্যকাব্যের অভিনয়ে নেমেছি স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ; সঙ্গে ছি

নাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথপ্রমুখ সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-নিপুণ সুরসিক বুধ-মণ্ডলী এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আনন্দ-মুকুল শিশু ও বালকবৃন্দ। এই অভিনয়ের টিকিট-বিক্রীর টাকায় যে শুধু পাঁকুড়া-বাসীর অন্ন-দুর্ভিক্ষের কতকটা শমন হবে তা' নয়, এর শিল্প-সৌন্দর্য্যে অনেক রসপিপাসু বঙ্গবাসীর অনেক-দিনের রসের তৃষ্ণা এবং অন্তরের দুর্ভিক্ষেরও মোচন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই, করলে মিছে কথা বলা হয়। কারণ, এ সম্বন্ধে আমরা অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি,—তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন "যিনিই সৌভাগ্যক্রমে সেদিনকার এই অভিনয়ে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন তিনিই এই রস-মাধুর্য্য-সম্ভোগের শুভ দিনটিকে জীবনের একটি স্মরণীয় দিন ব'লে মনে করেন। তা কি প্রবীণ উকীল ব্যারিষ্টার আর কি নবীন বি-এ, বি-এস-সি, এম্-এ, এম্-এস-সির ছাত্র, কি কারবারী পয়সা-ওয়ালা কয়লা-খনির মালিক আর কি দরিদ্র স্বল্প-বেতন স্কুলের মাষ্টার—সকলেই সুখী,—সকলেই বল্‌ছেন, যে, সেদিন যা পেয়েছেন তা তাঁদের আশাতিরিক্ত।" অবশ্য দু'একজন খবরের কাগজের কাগুজী সাহিত্যিক ভোঁতা পাণ্ডিত্য প্রকাশ ক'রে দশের মুখে হাত চাপা দিয়ে সত্য-গোপনের ব্যর্থ চেষ্টাও করেচেন। দশের মুখে হাত চাপা দিতে হ'লে অন্ততঃ রাবণের মত দশমুণ্ড কুড়ি হাত থাকা দরকার, তা' যখন তাঁদের নেই তখন তাঁদের দুশ্চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। ওদিকে এক-আধজন মেকী দার্শনিক নাকি গভীর দার্শনিকতার ভাণ ক'রে বল্‌ছেন, কবির যথার্থ কাজ হ'চ্চে কাব্য-কমলের কমলে-কামিনীকে দিয়ে হাতী গেলানো, তা' যখন হয়নি তখন ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যাই হোক্, তাঁরা যাই বলুন আর খবরের কাগজে যতই কালি ছড়ান্, দু'-একটা মলিন কাগজের বাদুড়ের ডানায় সূর্য্য ঢাকা পড়বে না। বেশীর ভাগ লোকের মতে "ফাল্গুনী" আনন্দের মহাসমুদ্র, উৎসবের চিরন্তন উৎস।

ধোঁয়া আর কুয়াসায় আচ্ছন্ন আমাদের এই কল্‌কাতার শহরে দক্ষিণা হাওয়ার মতন এই ফাল্গুনী! হঠাৎ এসে মধ্য-শীতের সন্ধ্যাবেলার সমস্ত ধোঁয়া আর হিম যে কোথার উড়িয়ে নিয়ে গেল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই; আকাশের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আবার মুখভরা হাসি, বুকভরা আলো নিয়ে ঝক্‌ঝকে হ'য়ে উঠ্‌ল! অনেক অসাড় মনে সাড়া জাগ্‌ল! বেণু-বনের মত অনেকেরই প্রাণ এর প্রভাবে আনন্দে স্পন্দমান। এ যে "কানে কানে একটি কথায় সকল কথাই" ভুলিয়ে দিয়ে গেল। এ যে যাদুকর! এ যে আশ্চর্য্য!

প্রথমে ভাবা গিয়েছিল, শহরে ফাল্গুনী অভিনয় বুঝি ফাল্গুনের হাওয়ায় কড়ি-বরগায় ফুল-ফোটানোর মতন অসম্ভব। কিন্তু অভিনয়ের রাতে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়েই মনের সে ভাবটা কেটে গেল। দেখ্‌লুম কল্পনাদেবীর কল্প-কুঞ্জ-চারী শিল্পী-দের তপস্যার প্রভাবে শহরের ধূলোতেই ফুলের ধূলোট সুরু হয়েছে। কল্পলতার

ডাল নুইয়ে ধরে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য চয়ন ক'রে রঙ্গমঞ্চটি সাজানো হয়েছে। রঙ্গ-তোরণের একদিকের স্তম্ভে আঁকা রয়েছে জলাভাবে শুষ্কপ্রায় "পাপ্‌ড়ি-ঝরা পুরা-তনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী।" অন্যদিকের স্তম্ভে লীলা-হিল্লোলিত দিঘির নীল জলে সদ্য-ফোটা শতদল পদ্ম। তোরণের মাথায় মরালের শ্রেণী, শুষ্কতার দিক পরিহার ক'রে পরিপূর্ণতার দিকে সোৎসাহে ছুটে চলেছে। সারদার কৃপায় ঐ সারগ্রাহী মরালের দল আসল জিনিসটুকুই চয়ন ক'রে ফিরবে;—

"সুধী ওরা ত্যজি নীর
গ্রহণ করিবে ক্ষীর।"

আর, যে-পুকুরের তলাকার পাঁক পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে সেদিকে দৃষ্টি রইল বস্তুতন্ত্র বকের,—সে মাছ না নিয়ে নড়বে না। সে যে আমিষের গন্ধ পেয়েছে।

যবনিকা উঠ্‌ল।

প্রথমেই ফাল্গুনীর প্রস্তাবনা স্বরূপ রবীন্দ্র নাথের নূতন লেখা "বৈরাগ্য-সাধন" অভি-নয় সুরু হ'ল। বৈরাগ্য-সাধনের গল্পটি হচ্ছে এই—

এক রাজার মাথায় পাকা চুল দেখা দেওয়ায় তাঁর মন অত্যন্ত খারাপ হয়েছে; তিনি মৃত্যু আসন্ন ঠাউরে রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম্ম, আমোদ আহ্লাদ, গান-বাজনা এমন কি জরুরি কাজে দেখাশুনা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। মন্ত্রী বেচারা ক্রমাগত চেষ্টা করেও রাজাকে ঠিক বাগ মানাতে পারচেন না; প্রত্যন্তদেশে ভয়ানক যুদ্ধ বেধেছে, সেনাপতি রাজার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে চান, কিন্তু মহা রাজের মনে এম্‌নি গেরুয়া রঙের ছো ধরেছে, যে তিনি কিছুতেই এই ম বৈষয়িক ব্যাপারে কর্ণপাত করতে পারচে না। ওদিকে চীন-সম্রাটের দূত এসেচে তাঁকেও অম্‌নি-অম্‌নি ফিরতে হবে, কার মহারাজের মন খারাপ হয়েছে। কবি শেখর কাব্য-মঞ্জরী শোনাতে চান, কি মহারাজ ঐহিক প্রেমের গান শুন একান্ত নারাজ। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার রাজার দেউড়িতে ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকা করছে, কিন্তু চেঁচালে কি হবে? চেঁচি ফল নেই, কারণ মহারাজের মন খারা হয়েছে।

তিনি এখন চান্ একমাত্র শ্রুতিভূষণকে আর তাঁর সেই বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি শ্রুতিভূষণ যাজক-ব্রাহ্মণের নিখুঁৎ ছবি তিনি অমূল্য উপদেশের পরিবর্ত্তে মহারাজে কাছ থেকে মূল্যবান একখানি তালু আদায় ক'রে নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের বৈরাগ্য সাধনের জন্যে একখানি মর্ম্মর প্রস্তরে বাড়ীর আবদার জানিয়ে, মহারাজে রুদ্রাক্ষের মালা ধরিয়ে বৈরাগ্য-সাধন করতে উপদেশ দিয়ে গেলেন। এমন সময় রাজার সভাকবি কবিশেখর এসে উপস্থিত ফাল্গুনের হাওয়ার মত হঠাৎ এসে ইনি সমস্ত ওলোট-পালট ক'রে দিলেন। তিনি বল্‌লেন "চুল শাদা হ'য়েছে? তাতে ভাবন কি? শাদা আলোর ভিতরে রামধনুকের সকল রঙ লুকিয়ে থাকে, শাদাই তো সকল রঙের বাসা। যারা ভোগবতী পার হ'য়ে এসেছে তারাই তো আনন্দ-লোকের

ডাঙ্গা দেখ্‌তে পেয়েছে, এই তো আনন্দের বয়েস।"

রাজা খুসী হ'য়ে উঠ্‌লেন, কবির সঙ্গ তাঁকে "অকূল প্রাণের সাগর তীরে" পৌঁছে দিলে, তাঁর আর "ক্ষয় ক্ষতির ভয়" রইল না। তখন আবার নহবতের বাঁশী বাজ্‌ল, সেনাপতিকে যুদ্ধের পরামর্শের জন্যে ডেকে পাঠানো হ'ল, নিরন্নদের অন্নের ব্যবস্থা হ'ল। ফাল্গুনের হাওয়ার মত কিছু-একটা করবার জন্যে তাঁর মন প্রাণশক্তির উল্লাসে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। স্ফূর্ত্তির আতিশয্যে রাজা কবিশেখরকে বল্‌লেন "তোমার নূতন লেখা কোনো নাটক, কি ত্রোটক, কি প্রহসন, কি হল্লীশ, কি আর-কিছু তৈরী আছে? যদি থাকে তো অভিনয় লাগিয়ে দাও।" তাতে কবিশেখর তাঁর লক্ষ্মীছাড়ার দলটিকে রাজোদ্যানে হাজির ক'রে যে নাটক রাজাকে দেখালেন সেটি হ'চ্ছে এই ফাল্গুনী।

ফাল্গুনী আবার দুটি নাটকের সমষ্টি,—একটি বহিঃপ্রকৃতির, অপরটি অন্তঃপ্রকৃতির। একদিকে বৃদ্ধ শীত চলে যেতে চাইছে, নব বসন্তের নূতন প্রাণের চরেরা তাকে বলছে "যাবে কি? তোমাকে যে আমাদের খেলার সাথী হ'তে হবে!" তাদের উৎসাহের আতিশয্যে এবং টানা-হ্যাঁচড়ায় হুড়াহুড়িতে শেষে কম্বলবস্ত শীতের বরণ এবং পাকা দাড়ি খসে পড়ল, দেখা গেল, সে প্রকৃত বুড়ো নয়, সে তরুণ—সে স্বয়ং পুষ্পকিরীটী ঋতুরাজ বসন্ত। ছেলেরা গেয়ে উঠ্‌ল—

"সাম্‌নে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি!"

তখন, হিমের বাহুর বাঁধন টুটে পাগ্‌লা ঝোরা ছুটি পেয়ে গেল, উত্তরে হাওয়া উজান বইল। প্রমাণ হ'য়ে গেল চির-পুরাতনের বুকের ভিতর থেকেই চির-নূতনের স্ফূর্ত্তি। বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় কুৎসিত গুটিপোকার ভিতরেই সুন্দর প্রজাপতি তৈরী হ'য়ে ওঠে। "Evil is good in the making" শীত হচ্ছে বসন্ত-সম্ভব কাব্যের খস্‌ড়া-খাতা। মৃত্যু নেই, আছে পরিবর্ত্তন; জীবন চঞ্চল হ'লেও, নশ্বর নয়, তার নিত্যনূতন মূর্ত্তি, নিত্য নূতন বেশ। শীত-বসন্তের এই ব্যাপারটি গীতি-ভূমিকা নামে ফাল্গুনীর চারটি অঙ্কের বিরাম স্থানে কন্‌সার্ট বা অর্কেষ্ট্রার বদলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, পর্দ্দা না ফেলে এই গান-গুঞ্জন-ময় ভোম্‌রার ডানার যবনিকা কল্পনা করা হয়েছে। এটি "ফাল্গুনী"র একটি বিশেষত্ব এবং ফাল্গুনীকারের নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভার একটি নূতন পরিচয়।

এদিকে বহিঃপ্রকৃতিতে যখন এই সব অঘটন ঘট্‌ছে তখন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, চুপ ক'রে নেই। নব-যৌবনের দল, বনে বনে ফাগুন লেগেছে দেখে একেবারে দক্ষিণের হাওয়ার মতন উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। তারাও আজ অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না। তারা তাদের প্রবীণ দাদার উপদেশপূর্ণ চৌপদী-গুলির প্রতি কর্ণপাত না ক'রে ছুটির দিনের ছেলের দলের মত প্রাণের প্রাচুর্য্যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। বিশ্ব-সংসারে তারা

জীবনকেই শুধু সর্দ্দার বলে মানে, সেই সর্দ্দারই তাদের "মিত্র, মন্ত্রী, মনীষী এবং মশালধারী পথপ্রদর্শক"। তাকেই নেতা করে নব-যৌবনের দল মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা ঠিক করেছে যে, যে-বুড়োটা যৌবনের হাসি ম্লান করে দেয়, দুনিয়ার পাঁজরের মধ্যে যার বাসা, যে ধুলো উড়িয়ে রথ হাঁকিয়ে চ'লে যায়, জীবনে কেউ কখনো যার মুখ দেখেনি অথচ যাকে সবাই ভয় করে সেই আদ্যি-কালের বুড়োটাকে ধরে এনে এবার বসন্ত-উৎসবের খেলা খেল্‌তে হবে, ভয়-ভাঙা আনন্দে উৎসবকে সম্পূর্ণতা দান করতে হবে। যেমন সঙ্কল্প অম্‌নি সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। যে ক্ষ্যাপামির তালে সাগরের পাগল ঢেউ নাচে সেই ক্ষ্যাপামির তালে পা ফেলে এরা চল্‌ল,—রাস্তা ঘাট ঠিক না করেই চল্‌ল—কারণ নব-যৌবনের দলের ধ্রুববিশ্বাস চলার বেগেই পায়ের তলায় রাস্তা জেগে উঠবে।

পথে তারা মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে কোটালকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ বুড়োর ঠিকানা বল্‌তে পারে না; কারণ মাঝির দৌড় ঘাট পর্য্যন্ত, ঘর পর্য্যন্ত নয়; কোটালের এলাকা রাস্তা, তার বেশী নয়।

বেলান্ত ঘুরে ঘুরে নব-যৌবনের দল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্বন্ধে একটু যেন সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ল। হয় তো বুড়োকে ধরতে পারবে না, প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। এমন সময়ে এই দলের সদানন্দমূর্ত্তি চন্দ্রহাস কোথা থেকে একজন অন্ধ বাউলকে নিয়ে হাজির হ'ল। বাউল চোখে দেখতে পায় না, সে গান গেয়ে বিজনের মধ্যে পথ আবিষ্কার করে। কিন্তু সে তো নিজে অন্ধ, কি সাহসে সে অপরকে পথ দেখাতে উদ্যত হ'ল? অন্ধতার অন্ধকারে সে যে পরম বন্ধুকে লাভ করেছে তাঁরই চরণ-শব্দ সে আপনার হৃৎ-স্পন্দনে শুন্‌তে পায়, সেই চরণ শব্দ বরণ করে সে চলে—এই তার সাহসের কারণ—এই তার ভরসার মূল। সে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে। দুঃখের সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথে ঢোকবার সময় তাকে রিক্ত হাতেই ঢুক্‌তে হয়েছে, সেই জন্যে তার মনের-পাওয়াই এখন তার সর্ব্বস্ব। সেই মনের রত্ন-প্রদীপের আলো সম্বল ক'রে সে চির-জ্যোতির রাজ্যে চলেছে। জীবনে প্রথম যারা সংশয়ের ধাক্কা পেয়েছে এই আত্মপ্রত্যয়বান্ অন্ধই তাদের একমাত্র পথের সাথী। কারণ এই অন্ধ দুঃসহ দুঃখের আঘাত সহ্য ক'রে অটল নিষ্ঠা লাভ করেছে, চিত্ত-সাগর মথন করে চিন্তা-মণির আলোয় ওর অন্ধ-করা অন্ধকার জন্মের মত তিরোহিত হয়েছে। এই অন্ধের নির্দ্দেশমত যৌবন-নিঃশঙ্ক চন্দ্রহাস চির-রহস্যময় গুহার মধ্যে দুঃসাহসের ভরে ঢুকে পড়ল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দলের লোক তার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়ল, তারা বাউলের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু বাউলের কোনো ভয় নেই, সে গাইতে লাগল—

"হবে জয়! হবে জয়! হবে জয় রে
ওহে বীর! হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ চির প্রাণ
জয়ী রে আনন্দ গান
জয়ী প্রেম জয়ী ক্ষেম জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়! হবে ক্ষয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
ত্যজ ঘুম মেল চোখ
অবসাদ দূর হোক্
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে।"

সত্যিই অবসাদ দূর হোল, চন্দ্রহাস ফিরে এসে বল্‌লে সে বুড়োর দেখা পেয়েছে, অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে সে ঐ আসছে।—সে আর কেউ নয়—সে আমাদের জীবন—আমাদের সর্দ্দার, বারে বারেই সে নূতন। এইবার পুরোদমে উৎসব আরম্ভ হ'ল। অন্তঃপ্রকৃতিও বুঝলে যে, যাকে চিরকালের বুড়ো বলে মনে করে আসা হয়েছে সে চির-তরুণ—সে জীবন;—জরা তার ছদ্মবেশ, মৃত্যু তার মুখোস্। সংশয়ের ভিতর দিয়ে সন্ধানী নব-যৌবনের দল এই সত্যকেই আবিষ্কার করলে, চির-যৌবনের দলীল পাকা হ'ল, তাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হল, বুড়োকে চির-তরুণ ক'রে নিয়ে বসন্ত-মহোৎসবে তারা ছেলে-বুড়োসকলকেই আহ্বান ক'রে গেয়ে উঠল—

তোরা আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে
যা' আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

কবিশেখর নব-যৌবনের দলকে দিয়ে যে বুড়োকে বন্দী করে এনে জগতের সাম্‌নে তার আসল চেহারা বার ক'রে দিলেন একদিন শাক্যসিংহ সেই বুড়োর সম্বন্ধে লোকের ভয় ভেঙে দেবার জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। বুড়ো বড় সোজা মানুষ নয়। নব-যৌবনের দল আজ যে সিদ্ধি লাভ করলে তা সিদ্ধার্থের সিদ্ধি নয়, আনন্দের সিদ্ধি। এ আনন্দ আরামের নামান্তর নয়, আরামকে যাবার পালা শুনিয়ে এর আরম্ভ। এ আনন্দের খেলা হচ্চে বাঁচামরা, লড়াই করা, ভাঙাগড়া। এর খেলাই কাজ, আবার কাজই খেলা এ বলে—

মোদের যেমন খেলা তেম্‌নি যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।

এ আনন্দ ভয়ডর জানে না, ক্ষয়ক্ষতি মানে না। এই আনন্দ থেকেই "খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" এই আনন্দ সম্বল করেই "জাতানি জীবন্তি" আর যারা শেষ চলা চলেছে তারাও এই আনন্দে "অভিসংবিসন্তি।"

ফাল্গুনীর আনন্দ-অভিব্যক্তির চারটি স্তর। প্রথম স্ফূর্ত্তি বা সঙ্কল্প; দ্বিতীয় সন্ধান; তৃতীয় সংশয়; চতুর্থ আবিষ্কার বা পরম সিদ্ধি।

স্ফূর্ত্তি অঙ্কে কবি যে নূতন নূতন সুরের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, যে আনন্দের উৎস উৎসারিত ক'রেছেন তাতে মন এবং চোখ পলকহারা হ'য়ে যায়। সন্ধানের অঙ্কে উদ্দাম নির্ভীক যুব-হৃদয়ের "শূন্য ব্যোম অপরিমান মদ্যসম পান" করবার

ইচ্ছাটা সংক্রামক হ'য়ে ওঠে, পঙ্গুদের মনেও গিরিলঙ্ঘনের আশা জাগতে থাকে। সংশয়ের অন্ধ অবসাদের অতলে ডুবিয়ে ধরে, কাউকে মাথা তুল্‌তে দেয় না। কিন্তু সংশয়ের অন্ধকার তেমন জমাট নয়; মেটারলিঙ্কের "দৃষ্টিহারা" নাটকের অন্ধদের সংশয়ের মত এ সংশয় একেবারে কুলহারা নয়; এ নাটকে দৃষ্টিহারা বাউল মনের মধ্যে আশার মণি-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে, তাই সংশয় এখানে হৃদয়কে একেবারে হতাশ ক'রে ফেলবার অবকাশ পায়নি। আরো বোধ হয় যে, যে-কবি আনন্দলোকের সংবাদ পেয়েছেন তাঁর কাছে সংশয় জিনিসটা আর তেমন মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে না। সংশয় তাঁর কাছে মানুষের অধ্যাত্ম ইতিহাসের একটা কৌতুক-কর পরিচ্ছেদ মাত্র—বড় জোর একটা দুঃস্বপ্নের মত। ফাল্গুনীর সংশয়ের অঙ্ক বোধ হয় কতকটা সেইজন্যে তেমন ঘনিয়ে উঠতে পারে নি। তা' ছাড়া—এ যে নবযৌবনের সংশয়, এ যে মেঘের ছায়া, বড় জোর সূর্য্য-গ্রহণের ফিকা অন্ধকার—এতো জমবার কথা নয়—এতো স্থায়ী হবার কথা নয়—এর পিছনে তীব্র হাস্যের প্রচণ্ড রশ্মিচ্ছটা যে সংহত হ'য়ে রয়েছে—আশ-পাশ দিয়ে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

এর পর হচ্ছে আবিষ্কারের অঙ্ক, এই অঙ্কে যার হাসি চন্দ্রের মত উজ্জ্বল সেই মূর্ত্ত যৌবনানন্দ নির্ভীক চন্দ্রহাসকে অন্ধ বাউলের ধ্রুববিশ্বাস পাথেয় স্বরূপ দিয়ে, কবি দুর্গম পথে প্রেরণ করেছেন। সে গুহার ভিতর থেকে—যা চিরকালের অথচ চিরনূতন—তাকে আবিষ্কার ক'রে এনেছে; নব-যৌবন-দলের প্রতিজ্ঞা রেখেছে, মৃত্যু-রহিত আনন্দরূপের জয় গান করেছে।

ফাল্গুনীর কবি সুরের আলোয় রাশি রাশি সৌন্দর্য্য কলাপের মত বিকাশ ক'রে অন্তরের আনন্দে চিরসত্যকে চিরসুন্দর ক'রে তুলেছেন। "ফাল্গুনী" বিশ্ব-সাহিত্যের একটি মহামূল্য রত্ন। এর আদর জগতের সর্ব্বত্র হচ্ছে, হবে এবং হ'তে বাধ্য। কবির মানস-সরোবরের কমলে-কামিনী হাতী হয়তো গিল্‌তে পারবেন না, কারণ তা হ'লে জগৎ থেকে দিগ্‌গজ পণ্ডিত দিঙনাগের বংশ লোপ হয়ে যাবে; হস্তী-মূর্খদের শুঁড় আস্ফালন এবং "খড়্গিণঃ লাস্যনৃত্যম্" দুর্লভ দর্শন হ'য়ে পড়বে। কিন্তু যা' ক'রেছেন তা' অতুলনীয়, পুলকাঞ্চিত পদ্মের মধ্যে বজ্রমণি দেখিয়ে দিয়েছেন।

এইবার অভিনয়ের এবং রঙ্গ-সজ্জার কথা। সাজ-সজ্জায় বিশেষ কোনো যুগের বা বিশেষ কোনো জাতের হুবহু অনুকরণ করা হয় নি, আর দৃশ্যপট যা' দেখানো হ'য়েছে তা ভূগোল-পরিচয়ের কোনো পর্য্যায়ের সঙ্গেই মেলে না। তা' হ'লেও বেশ সুন্দর এবং ভাবদ্যোতক। নীল রঙের পর্দ্দায় সবুজের আভা—আকাশে এবং অরণ্যে মিলে-মিশে যেন নিবিড় হ'য়ে উঠেচে। গোটা কত তারা দেখা যাচ্চে। হর-শিরস্থিত চন্দ্রকলার মত একটুখানি চাঁদও দেখা দিয়েচে। দু-একটা গাছের ডাল মাথার উপর ঝুঁকে রয়েছে, তার একটাতে একটি ঝুল্‌নো বাঁধা দু'একটি লতা লতিয়ে উঠ্‌চে, উঁচুনীচু



"ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে"—অন্ধ বাউল



"সময় কাজেরই বিঘ্ন, খেলা তাহে চুরি"
দাদা ও নবযৌবনের দল
[শ্রীজগদিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটোগ্রাফ হইতে]



"সবাই যারে সব দিতেছে"
অন্ধ বাউল
[শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটো হইতে]



ফাল্গুনীর রঙ্গ-সজ্জা
[শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটোগ্রাফ হইতে]

জায়গায় ফাঁকে-ফাঁকে তৃণমঞ্জরী বসন্তের হাওয়ায় রঙীন্ হ'য়ে উঠেচে। এর বেশী আর কিছু নয়। এই তো রঙ্গ-সজ্জা;—এরি আবেষ্টনের মধ্যে তিন চার ঘণ্টা-ব্যাপী আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। পাঁচ ছ' বছরের ছেলেমেয়েগুলি পাখীর মত সহজ আনন্দে গান গেয়ে উল্লাসে নৃত্য করে হেসে-খেলে চলে গেল। কেউ হয়েছে পারুল, কেউ বকুল, কেউ আমের মুকুল, কেউ নীড়ের পাখী, কেউ শালের কিশলয়। ঝরনার গতির মত সহজ ওদের নৃত্য, দোয়েল শ্যামার মত সহজ এদের গান! যখন এরা গাইছিল—

"আমরা ডাকি পাখীর গলায়"
"আমরা নাচি বকুলতলায়"

তখন সত্যিই মনে হচ্ছিল সেই জন্যেই পাখীর গান এত মধুর, সেই জন্যেই বকুলের গন্ধ এত চমৎকার।

এই পাঁচ-ছয়ের দলের উপরে একটি দশ-বারোর দল আছে। এই দলেরও সমস্ত অনিন্দ্য; এদের মধ্যে অনেকেই এমন চমৎকার স্বাভাবিক অভিনয় করে যে তা দেখ্‌লে শহরের অনেক নামজাদা অভিনেতার অভিনয়-কাণ্ডে অরুচি জন্মে যায়। এই ছেলেগুলি ঠিক আশ্রম-মৃগ, এদের ছোটগুলি আশ্রমের বুল্‌বুল্। আনন্দ-চাঞ্চল্যে এদের দুটি দলই ওতঃপ্রোত।

এদের উপরকার দল বিশ-ত্রিশের দল, দু-একজন চল্লিশ-ঘেঁষাও আছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই দলের চাঁই—কবি ও সঙ্গীতবিশারদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-



"যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস"
রাজা ও শ্রুতিভূষণ
[শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটোগ্রাফ হইতে]



"কে গো তুমি ?—কামিনী ফুল"
বসন্তের জাগরণ
শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ফটোগ্রাফ হইতে]

প্রতিভার ইনি ভাণ্ডারী, এ বিষয়ে এঁর দ্বিতীয় নেই। এঁর পরেই অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিজ্ঞান-বিদ্ জগদানন্দ রায়, শিল্পী অসিতকুমার হালদার, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এবং বোলপুরের বিদেশী ডাক্তার নরভূষণ রাও। শীত ও বসন্তের ভূমিকায় প্রিয়দর্শন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বেশ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া বোলপুরের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী যে গানটি গেয়েছিলেন সেটিও এবার বেশ উৎরেছিল। সর্দ্দার চলনসই, মাঝি মাঝারি, অনাথ কলুর অংশ বেশ ভালো। কোটাল আরও ভালো।

এইবার সব চেয়ে বড়র দলের কথা। এই দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অধ্যাপক উইলিয়ম্ পিয়ার্সন।

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েছিলেন; তাতে তিনি ধীর গম্ভীর রাজমন্ত্রীর যে ছবিটি দেখিয়েছেন তা মনে রাখবার মতন। এঁর পোষাক হল ভারতবর্ষের মন্ত্রীবর্গের শীর্ষস্থানীয় বিলাতি পেশোয়াদের ধরণের।

রাজার ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁর চাল, চলন, হাসি, এমন কি প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত সুআলোচিত হয়েছিল। এঁর রঘুবংশের রাজাদের মত লীলাকমল ঘোরানো, এঁর মুখদর্পণে বারবার পাকাচুল দেখা, লক্ষ্মী-ছাড়ার দলের অভিনয়-কালে আনন্দে অধীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'সাধু' 'সাধু' ব'লে এঁর ফুল বর্ষণ করা যে দেখেছে,—জীবনে কখনো সত্যিকারের রাজা না দেখ্‌লেও তার সেদিন রাজা দেখা হয়েছে। রাজার পোষাকও চমৎকার হ'য়েছিল, অজন্তার প্রাচীন চিত্রপট যেন জীয়ন্ত হ'য়ে দেখা দিয়ে গেল।

ভারত-শিল্পের নবীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজ-গুরু শ্রুতিভূষণের অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হাস্যরসের ভূমিকায় এঁর অদ্ভুত ক্ষমতা এঁর অভিনয়-কালে অনেক জমাট গোঁফের চির-কুজ্ঝটিকা হাসির আলোয় পুলকিত হয়ে উঠেছিল।

এইবার স্যার রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের কথা। তরুণ কবিশেখর এবং বৃদ্ধ বাউল এই দুটি বিচিত্র ভূমিকায় ইনি স্বয়ং অবতীর্ণ হন। এঁর অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যাওয়া বাচালতা মাত্র। এ শুধু চোখে দেখবার নয়, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে উপভোগ করবার এবং চিরজীবন স্মরণ করবার জিনিস। এই মাত্র কবিশেখরের মূর্ত্তিতে লীলা-চপল অভিনয়ে যিনি চঞ্চল জীবনের এবং চঞ্চলতর যৌবনের জয় গান ক'রে রাজার নিরেট বৈরাগ্যকে আবীরের গুঁড়োর মতন দুই হাতে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে গেলেন, পর-মুহূর্ত্তেই তিনি অন্ধ বাউলের বেশে অশ্রু-সরস অটল নিষ্ঠার মূর্ত্তিতে সংশয়ের বিজন দেশে অন্ধকারের তীরে তীরে দুর্গমচারী যাত্রীদের দৃষ্টিহীন পথপ্রদর্শক হ'য়ে দেখা দিলেন। নব-যৌবনের দলের সুপ্তবিশ্বাসকে নিজের বিশ্বাসের দ্বারা আবার জাগিয়ে দিতে এলেন। দুঃখের মূল্যে অমৃত ক্রয় ক'রে সেই অমৃত হাটে মাঠে ছড়িয়ে দেবার মানুষ এই বাউল। এই বাউলের ভূমিকা

গ্রহণ করা যার-তার কর্ম্ম নয়। জীবনে যে অন্ততঃ একদিনের জন্যও অমৃতের আস্বাদ পেয়েছে কেবল সে-ই এ ছবি আঁকতে পারে; শুধু সে-ই এ বাউল সাজ্‌তে পারে। যে ধ্যানরসিক ধ্যানের এই মূর্ত্তি জগৎকে আজ দেখিয়েছেন তিনি জগতের নমস্য। চিরবসন্তের বীণা তাঁর হাতেই শোভা পায়, কারণ চির-উৎসবের উৎস তিনি উৎসারিত ক'রে দিয়েছেন।

চির-বসন্তের বীণ
বাজাও যামিনী দিন
চির-যৌবনের ওগো চির-পুরোহিত।
শীতে ম্লান দুনিয়ায়
লাগালে ফাল্গুনী বায়
সবুজ পাতায় তুমি জাগালে সঙ্গীত।
চির-প্রাণে প্রাণ-বান
অফুরাণ তব দান
অমৃত তোমার গান নবীয়ান্ নিতি;
তোমারে কী পারি দিতে—
পারিজাত অবনীতে—
নাই কবি, দিনু তাই অন্তরের প্রীতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দ

সরস্বতী

ডুবারে যে সর পড়েছে মানস-সরের ফটিক জলে
কে ফোটালে শ্বেত শতদল সহসা সেই তুষার-তলে।
কে জেগেছ আদিম উষা
কে জেগেছ জ্যোতির্ভূষা
শুভ্র আলোর মৃণাল-সূতায় বিশ্ব-হিয়ার কৌতূহলে
কে রেখেছ অমল চরণ গোপন প্রাণের পদ্মদলে।

মুকুট তোমার উজ্জ্বল রাজে শিশু-আঁখির শশী-কলায়,
মুক্ত মনের লাবণ্যেরি মুক্তামালা তোমার গলায়;
সত্য স্বপন দ্বন্দ্বহারা
জড়ায় পায়ে নূপুর পারা
ঘুরে ফিরে ছন্দ-মরাল ভিড়ায় ডানা পায়ের তলায়
তিমির গলায় কাঁকন তোমার—তৈরী সে যে থির-চপলায়।

চাঁদের আভা নিছিয়ে নেওয়া তোমার বীণার চাঁদির তারে
চকোর-লোভন উথ্‌লেছে সুর তিতিয়ে ভুবন সুধার ধারে;
ধবল-গিরির পৈঠা পরে
মর্ম্মরে আর স্ফটিক স্তরে
বরফ-চুরের বিম্বে শাদা ঝর্ণা ঝরে হীরার হারে
শুভ্র সুরের গান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে সে ঝঙ্কারে।

চতুর্ম্মুখের হাস্য-রুচি যশঃ-শুচি জ্যোতির্ম্ময়ী।
দেবি! তোমার দিব্য আঁখির দীপ্তি-পাতে উজল ত্রয়ী!
জ্যোৎস্না জরির সুতায় বোনা
ছন্দ-কলির চন্দ্র-কোণা—
গগন তোমার ভাব-তনুটি বেড় দিয়ে ওই স্পর্শে মহী
সত্য-সূর্য্য নেত্র তোমার তুমি স্বয়ম্প্রভা অয়ি!

তুমি সকল প্রকাশ-করা সকল-শুভ্র মূর্ত্তি তব,
নিখিল-চিত্ত-নবীন-করা প্রখর তুমি—জীবন নব;
সত্য তুমি নিত্য তুমি
লক্ষ্মীছাড়ার বিত্ত তুমি
যে বর হাতে নাই বরদার দাও যে তুমি সে দুর্লভও
মর্ত্ত্য-লোকের অমরতা—তোমার কৃপা-সমুদ্ভব।

পুণ্য-শুভ্র অধর তোমার স্মিত-হাসির পুলক তা'তে,
প্রজ্ঞা তোমার চোখের কাজল সৃজন-প্রাতে প্রলয়-রাতে;
নীহারিকার নিতল বুকে
শীতল চরণ রাখলে সুখে
ভায় ছায়াপথ শূন্যে—তোমার শুভ্র পায়ের আল্‌পনাতে,
চন্দনে শ্বেত পরশ তোমার হরষ চন্দ্র-মল্লিকাতে।

মন্-গহনের শ্বেত হরিণী। মহাশ্বেতা সরস্বতী!
মন্-মানসের ফুল-কমল অমল তোমার ওই মূরতি।
অমল তোমার অভ্র-পুঁথি
ধবল শঙ্খ তোমার স্তুতি
অমল তপের লও আহুতি চিত্তলোকের উষা-জ্যোতি
কর্পূরেরি শুভ্র প্রদীপ তারায় তোমার সন্ধ্যারতি।

আশিস তোমার মৃত্যুঞ্জয়ী, হাসি সে শুকতারার ভায়ে ;
মন্দারেরি অমল মালা বিলাও দেবী ! ডাহিন বাঁয়ে।
মরাহ রথে মনোজবে
ফিরছ তুমি ভাবের ভবে
গন্ধরাজ আর পারিজাতের অঞ্জলি ওই শুভ্র পায়ে,
পায়ের আভায় ঘাম দিয়েছে চন্দ্রকান্ত-মণির গায়ে।

সদ্য-গলা বরফে ফুল ফুটিয়ে হঠাৎ লাখে লাখে
চেতন-লোকের মগ্ন-তটে জাগে তোমার প্রসাদ জাগে,
দ্বাদশ রাশির আলোয় ঝামর
চাঁচর মেঘে দুলায় চামর
লুটায় কবি, সিদ্ধ অমর তোমার পদ্মাসনের আগে
উজল তোমার কিরীট-হীরা ধ্রুব-তারার কিরণ- রাগে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা নব্য ভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং তাহাতে শূদ্রের কতটা শাস্ত্র-সম্মত অধিকার আছে, তাহাই শাস্ত্রাদির সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র চিরদিনই উদার মত প্রচার করিয়া আসিয়াছে, শুধু স্বার্থের জন্য পরে শাস্ত্রের মধ্যে বিস্তর নীচ মত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—সেটুকু লেখক সুদক্ষভাবে ধরাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্য ক্রমে শিক্ষার ফলে সকলেরই এখন এদিকে দৃষ্টি পড়িতেছে—সমাজের কতকগুলা অশিক্ষিত ব্যক্তি যথেচ্ছাচার করিয়া সব ভাঙ্গিবে গড়িবে, শিক্ষিত সম্প্রদায় আর তাহা সহ্য করিতেছেন না। ফল দাঁড়াইতেছে, অতিরিক্ত গোঁড়ামির আশ্রয় লইয়া সব-ঠেলিয়া-ফেলার দল ক্রমশই হীন-বল হইতেছে। উন্নততর উদারতর হিন্দুর অভ্যুত্থান ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। দৈবা কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষং—সমাজ ক্রমে পৌরুষের মূল্য বুঝিতেছে এবং তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সে সম্বন্ধে আশাও আমাদের বি আছে। বর্জ্জন-নীতি অধঃপতনের পূর্ব্বলক্ষণ, এ দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকে এখনও বুঝিতেছেন না—তাঁ এখনও গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসান্ দিয়া চলিয়াছে বুঝিতেছেন না, ক্রমশঃ কোন্ অন্ধকারের গহনে গিয়া পৌঁছিবেন। এ ব্যাপারে চৈতন্য করিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়ো শিক্ষা (culture) ব্যতিরেকে সমাজের শক্তি অসম্ভব। দেশবাসী সকলেরই এদিকে সবিশেষ উ হওয়া প্রয়োজন। লেখকের এ গ্রন্থ সেদিকে ইঙ্গিত করিয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বসন্ত

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২২ [১২শ সংখ্যা

দেনা-পাওনা

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তারো বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে' ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন,
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি ;
সুখস্বপ্নরসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছাসি।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

তুমি ত গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে—
সিংহাসন হতে নেমে
হাসি-মুখে তাই তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪ মাঘ, ১৩২১
পদ্মাতীর

সেকেলে কথা

শ্রীযুক্ত মণিলাল গাঙ্গুলির সহিত ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকার সম্বন্ধটুকু অম্ল-মধুর। ইনি সম্পর্কে আমার নাতিনীজামাই। যখন অন্নব্যঞ্জন মুখে রোচেনা তখন অম্ল-ব্যঞ্জনে অরুচি দূর করে। ইনি আমাকে ধরিয়া পড়িয়াছেন—"আপনি সেকালের কথা লিখুন।" নব সম্পাদকের এই মিষ্ট অনুরোধে লিখিবার তিক্ত পরিশ্রমও আজি সহজসেব্য হইয়া উঠিয়াছে, লেখনীর ভারও আজ লঘু বোধ করিতেছি।

লিখিতে হইবে আমাকে সেকালে কথা? তাই ত! ইহার মধ্যেই সেকে হইয়া পড়িলাম! পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিলে কিন্তু কথাটা ভুলিয়া যাইতে হ এই ত সে সেদিন—যেদিন দিদিমা বেচারী আমাদের একেলে-পনার জ্বালায় অ হইয়া উঠিতেন, আর নব্য নারী আম তাঁহাদের সেকেলে-পনার গঞ্জনা অকাত সহ্য করিয়া নায়িকা-দর্প অনুভব করিতা গঞ্জনারূপ সে ব্রহ্মাস্ত্র যদিও প্রথ

মিলারসূত্রে আজি আমাদিগেরই হস্তগত তথাপি বিনা প্রয়োগে তাহা পেটিকাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছি।

ইভলিউসনের হাওয়া যেরূপ প্রবলভাবে বহিয়াছে—তাহাতে কেবল ইংলণ্ডে সফরি-ষ্টদল নহেন বিশ্বের মেয়ে-মহল স্বাধিকার-প্রাপ্ত বাসনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালীর মেয়েও যে আর অবলা নহেন, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এক্ষেত্রে আমার হাতের অস্ত্র কাড়িয়া সহজেই যে তিনি আমাকে নিরস্ত করিবেন এ ভয়টুকু বিলক্ষণ আছে। বেশ জানি তাঁহাকে দোষী করিলেই তিনি বলিবেন—"একেলে"কে ত গঠন করিয়াছে "সেকেলে"ই, অতএব তাহার কাজের জন্য দায়ী ত তোমরাই।" কথাটা সত্য বটে, কিন্তু তবুও উঃ কি আস্পর্দ্ধা! আমাদের কালে কি আমরা এরূপ উত্তর দিতে পারিতাম! বুক ফাটিলেও তখন মুখ ফুটিত না! তবেই দেখ একালের মেয়েদের যে পরিমাণে বলিবার বুঝিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে সেই পরিমাণে সহিবার বহিবার শক্তিও কমিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইহাই এযুগের স্থূল এবং মূল লক্ষণ। সুস্থশরীর, শারীরিক পরিশ্রম, সুপ্রসব প্রভৃতি সকল যেন এখন সেকেলে-ফ্যাসানের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া বলিবার মত নূতন কথা কিছু ত খুঁজিয়া পাই না। আমাদের কালে যাহা ছিলনা, এখন পাওয়া হয় নাই। তখনকার অঙ্কুর এবং চারা গাছই এখন পত্রপুষ্পে সুশোভিত। বরঞ্চ যে ফুল শুকাইয়াছে, যে ফুল ঝরিয়াছে তাহার ফল এখনও পুরে নাই।

স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে, এখনকার দিনের মত বি.এ, এম-এ তখন না থাকিলেও বিদুষীর আদর তখনও যথেষ্ট ছিল। অন্ততঃ আমাদের বাড়ীর দৃষ্টান্ত ত এইরূপই দেখি। আর আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতিরও মূল-পত্তন হইয়াছে আমাদের কালেই।

বহু বৎসর পূর্ব্বে অন্তঃপুর-শিক্ষাসম্বন্ধে আমি "প্রদীপ" নামক মাসিক পত্রিকায় যে কথা লিখিয়াছিলাম—সম্ভবতঃ তাহা অনেকের পক্ষেই এখন নূতন হইবে। এই আশা বিশ্বাসে সেই কথাই এখানে পুনরাবৃত্তি করিয়া আজি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন সে প্রায় শতাব্দি-কালেরই কথা। তখন আমাদের প্রপিতা-মহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ সকলেই তখন সপরিবারে এক বাড়ীতেই বাস করিতেন। শুনিয়াছি এই বহু পরিবারের মধ্যে কোন নারীই তখন মূর্খ ছিলেন না, বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তখনো তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন।

এই ত গেল আমার পক্ষেও যাহা সেকাল সেই কালের কথা। আর আমাদের কালেও তাহারি জের চলিয়া আসিয়াছে। আমি দেখিয়াছি আমাদের দূর-সম্পর্কে এক আত্মীয়া ভগিনী, মাতার বয়স্যা,—চমৎকার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতেন। সংস্কৃতও তিনি কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন।

সেই জন্য মেয়েমহলে শুধু নয়, পুরুষ-মহলেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইহা-দিগের পৌত্রী দৌহিত্রীদিগের মধ্যে বরঞ্চ লেখাপড়ার এরূপ আদর দেখি নাই, কাহাকে কাহাকেও মূর্খ দেখিয়াছি। বৃদ্ধা-গণ প্রৌঢ়াগণ আমাদের বাড়ীতে যেরূপ বিদ্যানুশীলনের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবংশীয়া নবীনাগণ অন্যত্র গিয়া শিক্ষালাভের সম্ভবতঃ সেরূপ সুবিধা পান নাই।

আহার, বিরাম, পূজা-অর্চ্চনার ন্যায় সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়া-নুষ্ঠান ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞঠাকুর পাঁজি-পুথি-হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী-ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনা-শক্তি ছিল, কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবীঠাকুরাণীর দেবদেবী-বর্ণনা, প্রভাত-বর্ণনা শুনিতে কুতুহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবীঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার বর্ণনাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু কাকিমার নিকট ইহার প্রভাত-বর্ণনার অনুকরণ যাহা শুনি-য়াছি, নব্যবংশের প্রীতির জন্য তাহা সযত্নে স্মৃতিরুখিত করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"যামিনী চতুর্যামে লগ্না হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছেন না; প্রভাত পূর্ব্বদিগন্তের নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু প্রকাশ হ'তে পার্‌ছেন না। কেননা শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচেতন হ'য়ে রয়েছেন। আহা, সারানিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। মরি, মরি! আহা প্রাণ-স্বরূপ শ্রীহরি, প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বিহঙ্গবিহঙ্গীর কল-রব নাই; নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নর-নারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্ব্বাকাশ হ'তে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না, সূর্য্যদেব অরুণ-রথে সমাসীন হয়ে উদয় হ'তে ভয় পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয় আসে-আসে। সূর্য্যদেব চিন্তাকুল হৃদয়ে রথ ফিরিয়ে ভগবান ব্রহ্মার সদনে উপনীত হলেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে এই সমূহ বিপদের কথা অবগত করালেন। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা ক'রে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গে অন্যোপায় না দেখে কৃষ্ণপক্ষীর (রামপক্ষী) স্মরণ কর্‌লেন, পক্ষী আগত হলে বল্লেন "হে কৃষ্ণভক্ত বিহঙ্গম, তুমি না রক্ষা কর্‌লে এ বিপদে পরিত্রাণ নাই। হে অগতির গতি, ভক্তচূড়ামণি, তুমি ভিন্ন ভগবান বিষ্ণুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে এমন সাধ্য আর কা'র? অতএব দেবদানব নররাক্ষস সক-

লের প্রতি কৃপাবান্ হয়ে তুমি গিয়ে তাঁকে জাগরিত কর;—নচেৎ সৃষ্টি এখনি লোপ পায়! পক্ষীবর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্ভয় প্রদান ক'রে, বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদ্বারে এসে ডাক্‌লেন—কুক্‌কুহুকু অর্থাৎ উঠ হে উঠ,—কুক্‌কুহুকু! কুক্‌কুহুকু! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উন্মীলন করে দেখলেন প্রভাত হয়েছে।"

যতদূর স্মরণ হচ্ছে তাতে লজ্জিত বোধ না করে এই সুখের মিলনভঙ্গ-জনিত অপরাধে তিনি পক্ষীবরকে যে অভিশাপ প্রদান কর্‌লেন সেই শাপেই তখনকার পূজ্য পবিত্র কুক্কুট-পক্ষী এখন হিন্দুর অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছের খাদ্য।

আমি যে গল্পটি হুবহু আমার খুল্লতাত-পত্নীর ভাষায় আবৃত্তি করিলাম এমন নহে; ভাষার রূপান্তর হইয়াছে সন্দেহ নাই। সে এত ছেলেবেলার কথা যখন কাকিমার মুখ হইতে পীড়াপীড়ি করিয়া এই বর্ণনা শুনিতাম। সমস্ত কৌতূহল সমস্ত প্রাণ তখন কুক্‌কুহু কথাটির উপর পড়িয়া থাকিত। কখন্ পাখী ডাকিয়া উঠিবে সেই আগ্রহে প্রথমাংশের প্রতি তেমন মনো-যোগই হইত না। তবে এতবার এই গল্পটি শুনিয়াছি, তাই এখন মনে করিয়া ভাষা রচনা করিতে পারিলাম।

বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃ-সীমাবদ্ধা মহিলাগণের জন্য; বালিকা নববধূ ও বিবাহিতা বালিকা কন্যাগণ ইঁহার কাছেই শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর অবিবাহিতা কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্রে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর কিছু না হউক, বালকবালিকার শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই গঠিত হইত।

তখন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হয় নাই। বৈষ্ণবীঠাকুরাণী যে পুস্তক হইতে বর্ণবোধ করাইতেন, তাহার নাম শিশুবোধক। পুস্তকখানি আমি বড় হইয়া দেখিয়াছি। অক্ষরমালা, বানান, দেবদেবী-বন্দনা, যাম-বর্ণনা, লিপিলিখন-প্রণালী—এ সমস্তই এই একখানি পুস্তকের মধ্যে স্তূপীকৃত। বন্দনা ও বর্ণনার ভাষা এত কঠিন দুর্ব্বোধ্য যে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলেই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা এক রকম শেষ হইয়া যায়। তাঁহারা লেখা অভ্যাস করিতেন প্রথমে তালপাতে, তাহার পর কলাপাতে। বালির কাগজে কঞ্চী কলমের মক্‌স সর্ব্বশেষে।

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধান খানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের "তত্ত্ববিদ্যা'র

সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিঃা অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলানা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত। বড় হইয়া সে-কালের বইগুলি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিয়াছি;—মানভঞ্জন, প্রভাসমিলন, দূতীসংবাদ, কোকিলদূত, রুক্মিণীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, চাহারদরদেশ, হাতেমতাই, গোলেবকাওলী, লয়লামজনু, বাসবদত্তা, কামিনী-কুমার ইত্যাদি। পাঠক দেখিতেছেন এতগুলির মধ্যে একখানি কেবল নামকরণে সামাজিক; কামিনী-কুমার কাব্যে লিখিত উপন্যাস। তখন পর্য্যন্ত গদ্যে উপন্যাস লিখিত হয় নাই। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের শৈশবে রামনারায়ণ তর্করত্ন গদ্যে সংস্কৃত নাটকাদি অনুবাদের পর, 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' 'বহুবিবাহ নাটক" প্রভৃতি সামাজিক নাটক রচনা করেন। কালী সিংহের হুতোমপ্যাঁচার নক্সা, প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাসাবলী ইহারও পরে রচিত। অথচ সাহিত্যনামাবলীতে কামিনীকুমারের নাম কেন দেখিতে পাই না? 'কামিনীকুমার' পদ্যে লিখিত উপন্যাস, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, বিদ্যাসুন্দরের ঠিক অনুকরণ নহে। পূর্ব্বে কাব্য লিখিতে হইলেই ভারতচন্দ্র রায় তাহার আদর্শ হইত। শুনিয়াছি মদনমোহন তর্কালঙ্কার "বাসবদত্তা" লিখিবার সময় পণ করিয়া লিখিতে বসেন, যে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুকরণে কাব্য লিখিয়া ভারতচন্দ্রকেও হারাইবেন। কিন্তু পুস্তক বাহির হইলে, তখনকার সমজদারদের বিচারে তাঁহাকে ভগ্নচেতা হইতে হয়, ক্ষোভে সাধের বাসবদত্তা তিনি অগ্নিসমর্পণ করেন। দুই-চারিখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই যাহা বাহিরে প্রচার হইয়াছিল, তাহাতেই মাত্র মদনমোহনের মহিমা আবদ্ধ থাকে।

কবিত্বে বা ঔপন্যাসিক রহস্যে কামিনীকুমারের মূল্য অধিক, এরূপ বলিতে পারি না—তথাপি সাহিত্যসমাজে ইহার নাম রক্ষা হওয়া উচিত। চলিত বঙ্গসমাজের স্ত্রীপুরুষ লইয়া নায়কনায়িকা রচনার ইহা সর্ব্বাদি পুস্তক। যতদূর মনে পড়িতেছে, কামিনীকুমারের গল্পটি এইরূপ—প্রথমে নায়কনায়িকার জন্মবিবরণ, রূপবর্ণনা, পরে বয়ঃপ্রাপ্তে উভয়ের দর্শন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, মিলন-আশায় উভয়ের দেশভ্রমণে নির্গমন; স্থান বর্ণনা, কোন কোন স্থানে উভয়ের সন্দর্শনলাভ; কামিনী ছদ্মবেশী পুরুষ, অতএব কুমারের নিকট অপরিচিত, কিন্তু কুমারকে কামিনী চিনিয়া তাহার

সহিত রহস্যালাপে রত, অবশেষে উভয়ের গৃহে প্রত্যাগমন, মিলন ও বিবাহ। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার মধ্যম খুল্লতাত।

পিতৃদেবকে ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন। এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার পৃথক বস্তু নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্ম্মসংস্কারের সহিত যে-পরিমাণ সমাজ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সেই-পরিমাণে গৌণভাবে তিনি সমাজসংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, ধর্ম্মসংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইহার দ্বারাই যে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্য-বিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের সুসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন সংকল্পেও যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পারি। ধর্ম্মসংস্কারে রামমোহন রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে, কিন্তু সমাজসংস্কারে যে পিতৃদেব বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

বেথুনস্কুল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যে দুই-একটী মহোদয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শিশু কন্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষাসংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উন্নতি আরম্ভ। তখন হইতে ধর্ম্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ, এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মবৃত্তি সমভাবে সম্মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, সমস্ত ভারতব্যাপী বহুকাল প্রচলিত হীন স্ত্রী-আচার দুই একটি করিয়া নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশববাবু পিতামহাশয়ের শিষ্য হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয়

লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন। অনেকে এই ঘটনাটিতে অসমসাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হন। কিন্তু মহর্ষি পিতৃদেব, যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় বান্ধব, সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য অবাধে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণাপরাধে গৃহতাড়িত, শিষ্যরূপে সমাগত, শরণাগত সস্ত্রীক কেশববাবুকে দেশাচার তুচ্ছ করিয়া পুত্রস্নেহে গৃহে গ্রহণ করিবেন, ইহা কি বড়ই আশ্চর্য্যের কথা?

যদি আশ্চর্য্য হইতে হয়—তবে ইহার পরবর্ত্তী আর একটি কার্য্যে। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজদাদামহাশয় বিলাত যাইবার পূর্ব্বেকার কথা। তাঁহার বিলাত গমনের দুই-তিন বৎসর পরে একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না। আদি-ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।

বঙ্গমহিলার সাধারণ-প্রচলিত একখানি মাত্র সাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল। দিদি আমাদের মাতুলানী এবং বৌঠাকুরাণী-গণ একরূপ সুশোভন পেসোয়াজ এবং উড়ানী পরিয়া পাঠাগারে আসিতেন। বাঙ্গালী মেয়ের বেশের প্রতি আজীবন পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা, এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাঁহার শিশুকন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ত্রুটি করেন নাই। আমাদের বাড়ীতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক-বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্ত্তে নিত্য নূতন পোষাকে সাজিয়াছি। পিতামহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাস করিয়াছেন; দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও। কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই বেশ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেজ-বধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জ্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁহার ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলনে, এ পরিচ্ছদ তিনি যেমনটি চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম মনের মতনটি হইয়া, বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাবমোচনে তাঁহার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করিল।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর হইতে

স্ত্রীজাতির উন্নতি-সংকল্পে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন আমার পূজনীয় মেজদাদা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এতদিন যে তিনি এ সম্বন্ধে নীরব, নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়াছিলেন এমন নহে, তবে এতদিন পিতার নেতৃত্বে পুত্র তাঁহার সহায়তা করিতেছিলেন, এখন স্বাধীন ও উপযুক্ত হইয়া পিতার বিশ্রামাবসরে নিজে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। আশৈশব ইনি মহিলা-বন্ধু; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ-পাতী। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই উক্ত বিষয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পিতৃদেব অন্তঃপুরের বন্ধনের জন্য যে-সকল আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, অধিকাংশই ইঁহার পরামর্শে, ইঁহার প্ররোচনায় সম্পাদিত। ইনি এ সকল কার্য্যে পিতার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। অন্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য মাতাকেও ইনি ক্রমাগত ভজাইতেন। আজন্ম যে উদ্দেশ্য ব্রতরূপে হৃদয়ে ধারণ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, নিজে সকর্ম্মা স্বাধীন হইয়া অদম্য অটল উৎসাহে তাহার উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে আমাদের বাড়ীতে—কেবল তাহাই নহে, সমগ্র বঙ্গসমাজে তাঁহার যুগ আরম্ভ। পিতা মহিলাদিগের উচ্চ-শিক্ষার মূলপত্তন করিয়াছিলেন, পুত্র তদুপরি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন; পিতা তাঁহার অন্তঃপুরে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহা সযত্নে ফলবন্ত করিয়া সে ফল সমাজে বিতরণ করিলেন; পিতা ঘরের সংস্কারে বাহিরের নেতা, পুত্র ঘরের দৃষ্টান্ত পরকে সমর্পণে ধন্য। একজন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জনয়িতা, একজন স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক।

মেজদাদামহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে এবং তাঁহার সার্ভিস আরম্ভ হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। তখন অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখন মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এবাড়ী হইতে ওবাড়ী যাইতে হইলে ঘেটাটোপ-মোড়া পাল্‌কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখন নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্‌কী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে। স্ত্রীকে মেজদাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই—সমুদ্র-পথে, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নূতন এতই লজ্জাজনক যে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্‌কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল। একজন ফ্রেঞ্চ মহিলা তাঁহার বহির্গমনের উপযোগী নূতন বেশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু অদম্য ইচ্ছার স্রোতে দৈব পর্য্যন্ত গা ঢালিয়া দেয়—মানুষের কি কথা! দুই বৎসর পরে মেজদাদা যখন সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিলেন, তখন আর কেহ বধূকে পাল্‌কী করিয়া গৃহে আসিতে বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত।

বাড়ীতেও এই সময় ইঁহারা একরূপ

একঘ'রে হইয়া রহিলেন। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সহিত অসঙ্কোচে খাওয়া-দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয়-বার যখন মেজদাদা বোম্বাই হইতে বাড়ী আসিলেন তখন বাঁধাবাধি অনেকটা শিথিল হইল। তখন সবে মাত্র আমার বিবাহ হই-য়াছে। স্বামী স্ত্রীশিক্ষানুরাগী, উন্নতিপ্রবর্ত্তক। বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহাকেও জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, তিনি মেজদাদার সঙ্গে পূর্ণপ্রাণে মিশিয়া তাঁহার দলপুষ্ট করিলেন, এবং বাড়ীর আর-সকলেরও মতামত অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃ-ক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানিনা বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম। বৎসরান্তে সকলে একত্রে ফিরিলাম।

ভাঙ্গনধরা তীর অনেক দূর পর্য্যন্ত খসিল। কলিকাতায় ফিরিয়া মেজদাদা আর নিজের ঘরে একঘরে নহেন, দলে পুষ্ট। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে বাড়ীর আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

এইখানে বলা আবশ্যক, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচারক না হইলেও, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সেজদাদা পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও চিরকাল উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে অনেক সময় আমাদের নিজে শিক্ষাদ করিতেন। বিবাহের পরে তাঁহার শিক্ষাদা কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন তাঁহার পত্নী। সে দাদাই প্রথমে দেশাচার কুলাচার ভাঙ্গি তাঁহার পত্নীকে আমাদের, বাড়ীর গায় বিষ্ণুর নিকট গান শিখাইতে আরম্ভ করেন মহর্ষিদেব ইহাতেও আপত্তি করেন নাই শ্রীমতী প্রতিভা দেবী যিনি সঙ্গী বিদ্যায় বঙ্গমহিলাগণের অধুনা নেত্রীস্বরূ তিনি হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই কন্যা।

বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসি স্বামীর সহিত স্বতন্ত্র আবাসে বাসকালী তিনিও আমার সেতার শিক্ষার জন্য ওস্ত নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে ক্রম আমাদের বাড়ীতে শিক্ষার স্রোত বে বহিতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গান বাজনা, লেখাপড়া সর্ব্ব রকমে ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগি দিদিরা পর্য্যন্ত ঘরে কাঁচিয়া ইংরাজী শিখি আরম্ভ করিলেন। গাড়ী করিয়া যাতায় ত আর লজ্জার বিষয়ই নহে, পাল্‌কী চলন একরকম উঠিয়াই গেল। আজ প্র অর্দ্ধশতাব্দি কাল মেজদাদামহাশয় ইংলণ্ড হই ফিরিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাঁহার দৃষ্টা তাঁহার যত্নে আমাদের অন্তঃপুরে আকা পাতাল প্রভেদ। কেবল আমাদের গৃ কেন? তাঁহার দৃষ্টান্ত সমস্ত বঙ্গে অ পরিব্যাপ্ত। এ দেশের কোন সম্ভ্রান্ত মহিল পক্ষেই এখন বাহিরে যাওয়া সেরূপ নূ নহে, সেরূপ লজ্জাজনক নহে। বাহি যাইতে হইলে সুসভ্য পরিচ্ছদেরও অ ভাবনা নাই। এখন স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীন

বিস্তৃত। যে কণ্টকাকীর্ণ পথ বহুযত্নে পরিশ্রমে তিনি মুক্ত প্রসারিত করিয়া-ন, বঙ্গবালা-মাত্রেরই নিকট তাহা এখন ত, সুগম। উন্নতিশীলা মহিলাদিগের কথা ড়িয়া,—অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যেও উন্নতির ই স্রোত প্রবাহিত। এখন কন্যাকে র্শিতে আসিয়া বরপক্ষীয়গণ প্রথমেই জ্ঞাসা করেন কন্যার লেখাপড়া কিরূপ। তিমত বিদ্যাচর্চ্চা, শ্বশুর শাশুড়ীর নিকটও কন্যাভাব, গাড়ী চড়িয়া যাতায়াত, বোম্বাই ক্যাসানে পরিচ্ছদ পরিধান—এ রকল এখন হিন্দু-সমাজনীতির অঙ্গীভূত। ার এ সকলের যিনি প্রবর্ত্তক ৫০ বৎসর র্পূর্ব্বে তাঁহাকে শত বাধা একাকী এক ন্ত উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রগামী ীতে হইয়াছে। নিজের বাড়ীর লোকে র্শান্ত তাঁহার সহিত যোগ দিতে ভয় াইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতিতে ইনি নই অটলসংকল্প ছিলেন, মহিলাদিগের ল-কল্পনায় ইনি এমনি আনন্দলাভ রিতেন যে, এ সাধনার জন্য তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই; কোন অপমানেই তাঁহাকে নত করিতে ারে নাই। আজকাল যাঁহারা সমাজে ীকে লইয়া বহির্গত হন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই বহু পুরুষের মাঝে দু-একটি হিলাকে লইয়া গিয়া অন্যের অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট ইতে লজ্জা-বোধ করিবেন, কেবল তাহাই হে, যাঁহারা ইহাদের দলভুক্ত নহেন, র্থাৎ যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান া, তাঁহাদের সঙ্গে স্ত্রীকে পরিচিত করিতেও াপত্তি করিবেন। কিন্তু মেজদাদার সেন্টিমেণ্ট, মেজদাদার যুক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহার নিকট এ কথা পাড়িলে তিনি রাগিয়া বলিবেন, একরাশ পুরুষের সভায় কেন দু-একটি মেয়ে লইয়া যাইব না? যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের নিকট স্ত্রীকে বাহির না করিলে তাঁহাদের শিক্ষা হইবে কিসে? অভ্যাস পরিবর্ত্তন হইবে কেমন করিয়া? কেবল কথায় নহে, কার্য্যতঃ চিরদিন তিনি এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন। বিদেশে সভা-সমিতিতে বা 'পান সুপারী'তে তাঁহাকে একা নিমন্ত্রণ করিবার যো ছিল না। বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত না হইলে তিনি কোথাও যাইবেন না, সকলেই জানিয়াছিল। মেজদাদার স্বভাবে স্ত্রী-সম্মান এতই ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান যে, কোন ভদ্র পুরুষে স্ত্রীজাতির প্রতি অসম্মান দৃষ্টিতে চাহিতে পারে, ইহা তিনি অন্তরে ধারণা করিতেও অক্ষম।

মেজদাদার কাছে যদি বল,—বুদ্ধিতে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি বল—পুরুষের ন্যায় তাহাদের উচ্চশিক্ষা অনাবশ্যক, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা পুরুষের অসমকক্ষ, অমনি তিনি গরম হইয়া উঠিবেন, মেয়েদের পক্ষ হইয়া তর্কপরায়ণ হইবেন। বাড়ীর মেয়েরা মিউজিয়াম বা পশুশালা বা কোন বক্তৃতা শুনিতে যাইতে চাহে—সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার পুরুষ মিলিতেছে না; মেজদাদা জানিতে পারিলেই অমনি শত অনিচ্ছা শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইবেন। কর্ত্তার নিকট মেয়েদের যদি কোন আবেদন

থাকিত ত, মেজদাদাই তাহাদের মুরুব্বি; বাড়ীর মেয়েরা সকলেই জানিত মেজদাদার মত সহায়, বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই, তাঁহার উপর সকলেরি বিশ্বাস ছিল অসীম। বাস্তবিক পক্ষে মহিলাদিগের সর্ব্বতোভাবে এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও নেতার উপযুক্ত, এমন উদার মহদন্তঃকরণব্যক্তি সংসারে কম দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ভ্রাতা মনে করিলে এ কথা আমি সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন আমি তাঁহার কার্য্য সমালোচনায় বিচারাসীন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে সম্মুখে রাখিয়া অপক্ষপাতীরূপে তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে দান করিতেছি মাত্র।

সুখের বিষয়, তাঁহার প্রাণপণ উদ্যম এখন সার্থক, আশৈশব জীবনের উদ্দেশ্য সফল, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মহিলোন্নতিতে বঙ্গদেশ আজ সর্ব্বপ্রধান।

এইখানে একটি কথা না বলিলে সত্যের অবমাননা ঘটে। যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এতদূর উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। অন্ততঃ তিনি যে অনেক পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নিষ্ক্রমণ

মায়ের পরশ! আলোয় ধূলোয় লোকে-লোকাকীর্ণ সহরের কিনারা দিয়েই এই নির্ম্মল পরশখানি একটুখানি নদীর বাতাস হয়ে বহে চলেছে। এপার থেকে ওপারে যাবার, পার থেকে ঘরে আসার সেতু-পথে চকিতের মত এই পরশ,—গঙ্গাজলে ধোয়া এই পরশ!

এই শান্ত সুস্নিগ্ধ পরশখানির একপারে দেখছি পরিচিত পুরাতন দেশ, আরপারে দেখা যাচ্ছে প্রবাস-বাসের সিংহদ্বার—হিম-রাত্রির অন্ধকার মাখা!

বিপুল জনস্রোতের সঙ্গে একত্রে ছুটে চলেছি, ঠেলে চলেছি—নিঃশব্দে নীরবে; আর নদীর উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত বহে আসছে কাজল আকাশ—কালো-জলের সমস্ত স্নেহমাখা মায়ের পরশ!

অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটা তীব্র বাঁশি দিক্‌দিগন্তের সুনীল পরিসর হঠাৎ ছিন্ন করে দিয়ে চীৎকার করে উঠল আবার আলো, আবার ধূলো, আবার জনকোলাহল! এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে যখন পৃথিবী-জোড়া প্রকাণ্ড রাত্রি ভেদ করে চলেছি, তখন কেবল শুনছি পায়ের তল দিয়ে একটা ঝন্‌ঝনা, লৌহ নির্ঝরের মত ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।

গাড়ির দুই সারি জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র দুই ফালি আস্‌মানি পর্দ্দা, তার মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝকে এক একটি তারা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছিনা; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝন্‌ঝনার ধাক্কা আস্‌ছে আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা গাছের ঝাপ্‌সা মূর্ত্তি চোখের উপরে এসে আঘাত করেই সরে যাচ্ছে।

বিরাট রাত্রির এই প্রকাণ্ড বৈচিত্র্য-হীনতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি বল্লে ভুল হয়। নিশাচর পাখীরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলিয়ে নিঃশব্দে যেমন ভেসে যায় এ তেমন করে যাওয়া নয়, এ যেন একটা উন্মত্ত দৈত্য চাকা-দেওয়া লোহার খাঁচায় আমাকে বন্ধ করে পৃথিবীর উপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে; তার চলার প্রচণ্ড বেগে লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর বুক আঁচ্‌ড়ে চারিদিকে অগ্নিকণা ছিটিয়ে অন্ধকুহরের ভিতর ঝমাঝম্‌ শব্দে এগিয়ে চলেছে।

সুদীর্ঘ অনিদ্রা, অফুরন্ত অস্থিরতা, তার পরে বিরাট অবসাদ! নির্জ্জীব প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা জন্তুর মত চুপ করে পড়ে আছে—অপার অন্ধকারের মুখে দুই চোখ মেলে।

একটুখানি আলোর আঘাত,—নিশীথ বীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন! ঊষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝ-খানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নূতন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর পূর্ব্বপার-পর্য্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্ম্মের মত একটি কোমল অন্ধকার, তারি উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে! সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে;—যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

পথিক যেমন পথ চল্‌তে ক্ষণিকের মত পথপ্রান্তে দেবতার দেউলটিতে একটি নমস্কার দিয়ে পুনরায় চলতে আরম্ভ করে, আমরা তেমনি এই প্রাতঃসন্ধ্যাটিকে প্রণাম করেই যেন আবার অগ্রসর হচ্ছি।

একটা কূলকিনারা-হারা বালুচরের ঠিক আরম্ভে রাত্রি প্রভাত হয়েছে। আকাশের বর্ণ দূরে দূরে নদীর ক্ষীণ ধারাগুলিকে সুতীক্ষ্ণ ছুরির মত উজ্জ্বল করে তুলেছে। পৃথিবীর শেষপ্রান্ত-পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে—পরিষ্কার ফিরোজার একটি মাত্র প্রলেপ; তার উপরে একঝাড় কুশ আর কাশ। নূতন সূর্য্যালোক কাশফুলের শ্বেত-চামরের উপরে আবীর ছড়িয়ে সমস্ত ছবিটিকে রাঙিয়ে তুলেছে। নির্জ্জন এই নদীর পার, নিঃশব্দ নিশ্চল এই নদীপারের বালুচর,—এর ভিতর দিয়ে জলের ক্ষীণধারা আমাদেরই মত মন্দগতিতে চলেছে।

নদী থেকে শত শত হাত ঊর্দ্ধ দিয়ে সেতুপথ বেয়ে চলেছি। একটি মৃদুমন্দ দোলা, গতির একটা শিহরণ মাত্র,—এছাড়া আর কিছু অনুভব হচ্ছেনা। চলেছি, চলেছি—দিনের মনভোলানো সবুজের মাঝ দিয়ে রাতের ঘুমপাড়ানো নীলের দিকে।

অশেষ পথ—সুদীর্ঘ প্রহর-পলের ভিতর

দিয়ে ক্রমাগত চলেছে; দিন ও রাত্রি এই পথের দুইধারে নিরাবরণ ও আবরণের দুইখানি মায়াজাল রচনা করতে-করতে আমাদেরই সঙ্গে চলেছে।

বারানসী—মন্দির-মঠের একটা প্রকাণ্ড অরণ্য; দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোকে তার সমস্তটা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,—জনশূন্য স্নানের ঘাটে সোপানের কোলে-কোলে—নদীজলে বিজলী রেখাটি থেকে, তপ্ত পথে নিঃশব্দে যে যাত্রীরা চলেছে তাদের গাঢ় ছায়াটি পর্য্যন্ত। এ যেন একটা মায়াপুরীর দিকে চেয়ে রয়েছি! পাষাণ প্রাচারগুলো থেকে একটা উত্তাপ মুখে এসে লাগছে, নাগরিকদের সমস্ত গতিবিধি কার্য্যকলাপ আমাদের চোখে পড়ছে স্পষ্ট, কিন্তু তাদের কোনো সাড়াশব্দ আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছেনা। এ যেন একটা মূকের রাজত্ব পেরিয়ে চলেছি। আর শব্দের সীমার বাহিরে তাদের এই প্রকাণ্ড নগরী ঊর্দ্ধ আকাশে পাংশু দুইটা পাষাণ-বাহু তুলে একটা ভাষাহীন নিবারণের মত দূর-দূরান্তরের দিকে চেয়ে রয়েছে—দুইপ্রহর বেলার শব্দহীন আলোকের গায়ে চিত্রার্পিত।

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের উপরে বেলা-শেষের তাম্র আভা। আম্রবনের ছায়ায়-ছায়ায় রাত্রি আপনার আশংসা নিয়ে এখনি দেখা দিয়েছে! বনরেখার উপরে অযোধ্যার শেষ-নবাবের বহুকালের পরিত্যক্ত প্রাসাদের একটা অংশ আকাশের পরিষ্কার নীলের গায়ে শুষ্করক্তের গাঢ় একটা বিমলিন ছাপ ফেলেছে। বাঁধভাঙা গোমতীর জল প্রকাণ্ড একটা ছিন্ন কন্থার মত পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে—অনেক দূর পর্য্যন্ত সমস্ত সবুজকে আচ্ছাদন করে।

পশ্চিম-দিগন্তব্যাপী শোণিমার নীরব একটি নির্ঝর আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পর্য্যন্ত নেমে এসেছে; রাতের পাখী এরি উপর দিয়ে কালো ডানা মেলে উড়ে আস্‌ছে।

রাত্রি তৃতীয়-প্রহরে বৃষ্টি নেমেছে, পাহাড়ের হাওয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মুখে এসে লাগছে,—বরফের মত! দূর-দূরান্তরে একটিমাত্র ঝিল্লি অন্ধকারে শব্দের একটা উৎস খুলে দিয়ে ক্রমান্বয়ে গেয়ে চলেছে। একটা পান্থশালার প্রদীপ জলে-ধোয়া পৃথিবীর মসৃণতার উপরে আপনার আলোটি অনেক-দূর-পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়ে অনিমেষে রাত্রির দিকে চেয়ে রয়েছে।

নিরন্ধ্র অন্ধকারকে ধাক্কা দিতে-দিতে গাড়ি চলেছে—হিমালয়ের যেদিক বেয়ে গঙ্গা নামছেন সেই দিক হয়ে।

এখানে মেঘ কেটে চাঁদ দেখা দিয়েছে —অন্ধকার গিরিশ্রেণীর চূড়ায়। অদূরে স্নানের ঘাট, নহবৎখানা, মন্দির-চূড় জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়ে আছে; গঙ্গার বাতাস সমস্তটির উপরে স্নিগ্ধতা ঢেলে দিয়েছে। আমাদের যাত্রা-পথের শেষে, সুদীর্ঘ রাত্রির অন্তিম প্রহরে এই গঙ্গাদ্বার! এরি ওপারে সূর্য্য দেবের হরিতাশ্বসকল অপেক্ষা করে —নূতনকে অদৃষ্টপূর্ব্বকে জগতে বহন করে আনবার জন্য।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের আয়-ব্যয়

ভারতের আয়-ব্যয় বলিতে আমরা ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষেরই আয়-ব্যয় বুঝিব। ভারতবর্ষের আয় গত কয়েক-বৎসরের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; নিম্নের তালিকাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বৎসর	কোটী মুদ্রা হিঃ
১৮৪৫	২১
১৮৬০-৬১	৪৩
১৮৮০-৮১	৭০
১৯০০-০১	১১৩

বাঙ্গলা অধিকারের পর ইংরাজগণ ক্রমশ ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়েন। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারত-সরকারের আয়-ব্যয় উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় ছিল না। অধিকৃত রাজ্যরক্ষা এবং ভারতে বৃটিশ-সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, তৎকালীন শাসন-কর্ত্তাগণকে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য রাখিতে হইত। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজ-কোষ হইতে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় হইত। ১৮১৪ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, ২৮ বৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হয়,—ব্যয় অপেক্ষাআয় অধিক হইয়াছিল কেবলমাত্র ১৫ বৎসর। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায়, সরকারকে অনবরত কর্জ্জ করিতে হইত, সুতরাং ঋণের মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সরকারের ঋণ ৪০ কোটী হইতে ৬০ কোটী টাকাতে গিয়া দাঁড়ায়। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া, সরকারকে আবার ৩০ কোটী টাকা ধার করিতে হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে।

এই সময় অর্থ-সচিবের পদ সৃষ্ট হয়। জেমস উইলসন নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অর্থ-সচিবের পদ দিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়। উইলসন সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া, সৈন্য-বিভাগে ব্যয়ের আতিশয্য দেখিয়া উক্ত বিভাগের প্রায় ৬½ কোটী টাকার খরচ কমাইয়া দেন। ভারত-সরকারের অন্যান্য বিভাগেও তিনি আবশ্যকীয় ব্যয়গুলি মাত্র রাখিয়া অপরাপর ব্যয় কমাইয়া দেন। তাহাতেও আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও আয়-কর (income-tax) বসাইতে হয়।

পাঁচবৎসরের মধ্যে ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আয়-ব্যয় সমান হওয়ায়, আয়-কর তুলিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বহুদিন উন্নত অবস্থায় থাকে নাই। এই সময়ে উড়িষ্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। রেলওয়ে-গুলির উন্নতির জন্যও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইয়া উঠে; তাহার উপরে সীমান্ত-প্রদেশে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায়, সামরিক বিভাগের

খরচও বৃদ্ধি পায়। কাজেই ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আবার খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই গবর্মেণ্টকে বাধ্য হইয়া Provincial rates বৃদ্ধি করিতে হয়। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে আয়-ব্যয় আবার সমান হয়। আমরা "ভারতী"তে পূর্ব্বপ্রকাশিত "ভারতের মুদ্রা" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, মেক্সিকোয় রূপার খনির আবিষ্কার হওয়ার দরুণ, ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে মুদ্রা-বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই মুদ্রা-বিপ্লব আরম্ভ হওয়ায় ভারত-সরকারের Home-Chargeও অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়; তাহার জন্যও ভারত-সরকারকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে আয়-কর স্থাপিত হয়। লবণের শুল্কও মণ-করা ২ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২৷৷০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, সরকারের ব্যয়-বাহুল্য কমাইবার জন্য একটী পরামর্শ-সভারও প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের 'Currency reform' হইয়া যাইবার পর, ভারত-গভর্মেণ্টের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ আশাপ্রদ হইয়া আসে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক বৎসর ৭।৮ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইতে থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত-সরকারের অবস্থা এইরূপ সচ্ছলই ছিল। তাই ভারত-সরকারের ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেক বৎসর কয়েক কোটী মুদ্রা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত হইবে, স্থিরীকৃত হয়। ইহাই ভারত-সরকারের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এই প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতসরকারের আয় আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার কারণ কি? ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারকে দেশীয় রাজন্য-বর্গের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হয়। কাজেই দেশের প্রজাগণের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে সরকার দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। এখন আ-সমুদ্র ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করায়, ভারতবাসীগণের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। এখনকার শাসন-প্রণালীও অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। এই সমস্ত কারণে, যদিও ভারত-সরকার জমির কর এবং আয়-কর পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে ধার্য্য করিয়াছেন, তথাপি মোট রাজস্বের মাত্রা এখন বাড়িয়াই গিয়াছে।

প্রত্যেক বৎসর মার্চ্চমাসে ভারত-সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাহির হয়। এই আয়-ব্যয়ের তালিকা তিন বৎসরের গড়-পড়তা-হিসাব মাত্র। ১৯১৬-১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিতে গেলে, পূর্ব্ব বৎসরের ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে কত খরচ হইল, তাহা দেখাইতে হইবে; ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দের খরচ হইতে কত উদ্বৃত্ত ছিল বা ঋণ ছিল তাহাও দেখাইতে হইবে। এই সমস্ত অঙ্ককে ভিত্তি করিয়া একটা আন্দাজ হইতে ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বজেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারত-সরকারের রাজস্ব খরচ

করিবার অধিকারী কেবল তিন শ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তি। সেক্রেটারী অফ ষ্টেট, গভর্ণর-জেনারল ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ।

হোমচার্জ্জ :—ভারতবর্ষ দরিদ্র লোকের দেশ। কিন্তু বিধাতা এই দরিদ্রের দেশকে নানাপ্রকার খনি দ্বারা রত্নগর্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজ ধনীগণ, নিজেদের অর্থবলে ভারতবর্ষের এই খনিগুলিতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। রেলওয়ের উন্নতির জন্য ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। এই টাকার সুদ ভারতকেই দিতে হয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষে আসিয়া, ভারতের রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাদের বেতনের উদ্বৃত্ত অংশ স্বদেশে প্রেরিত হয়। বৃদ্ধবয়সে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া দেশে ফিরিলে, ভারতবর্ষই তাঁহাদিগকে পেন্সনের টাকা যোগায়। বিদেশীয় বণিকগণ, ভারতবর্ষে আসিয়া আফিস প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর তাঁহাদের অর্জ্জিত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ স্বদেশে প্রেরিত হয়। ইহা ব্যতীত, সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের অফিসের সমস্ত খরচ ভারতবর্ষকে দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী, ভারতবর্ষকে প্রত্যেক বৎসর কয়েক কোটী মুদ্রা, ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়। তাহারই নাম Home charge। ভারতের সেক্রেটরী অফ ষ্টেট এই টাকা রিসিভ করেন।

সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে একজন Banker বা 'শ্রেষ্ঠী' বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইংরাজ বণিকগণ, ইংলণ্ডে স্বর্ণ-মুদ্রাই ব্যবহার করেন; কিন্তু ভারতবর্ষে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত। ভারতবর্ষ হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে, তাঁহাদের রৌপ্য-মুদ্রার প্রয়োজন হয়। সেক্রেটারী অফ ষ্টেট, হোম-চার্জ্জে স্বুবর্ণ-মুদ্রাই দিয়া থাকেন; ভারতের মুদ্রা কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা। এইজন্য সেক্রেটারী অফ ষ্টেট হুণ্ডির ন্যায় কতকগুলি নোট প্রত্যেক বৎসর বাহির করেন, তাহাদিগকে council bills বলে। ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার হোম-চার্জ্জ তিনি আশা করেন, সেই টাকাকে সভরিণে (এক সভরিণে পনেরো টাকা) পরিণত করেন। বিলাতী বণিকগণ, সভরিণ দিয়া এই council bill ক্রয় করেন। সেক্রেটারী অফ ষ্টেট বণিকগণের প্রদত্ত অর্থে, ভারতের নিকট হইতে ইংলণ্ডের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করেন। বিলাতী বণিকগণ, তাঁহাদের প্রয়োজনানুসারে council bill খরিদ করিয়া তাঁহাদের ভারতবর্ষস্থিত এজেণ্টগণকে পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষস্থিত এজেণ্টগণ এই council bill, ভারত-সরকারের নিকট লইয়া গিয়া, আপনাদের প্রাপ্য মুদ্রা রৌপ্য-মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করে। এই সুন্দর প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, ভারতবর্ষ হইতে হোম চার্জ্জ পাঠাইবার খরচ এবং বিলাতী বণিকগণের ভারতবর্ষস্থিত এজেণ্টগণকে টাকা পাঠাইবার খরচ বাঁচিয়া যায়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বিলাতী বণিকগণ যদি হোম-চার্জ্জের প্রাপ্য টাকার অপেক্ষা অধিক টাকা ভারতে পাঠাইতে চায়, তাহা হইলে কি তাহারা বাকী টাকাটা ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে পাঠায়?

বিলাতী বণিকগণের হোম-চার্জ্জ অপেক্ষা অধিক টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে, তাহারা council bill-ই ক্রয় করে। সেক্রেটারী অফ ষ্টেটও সে বৎসর, হোম-চার্জ্জ অপেক্ষা, অধিক মুদ্রার council bill বাহির করেন। বিলাতী বণিকগণ সেই council bill ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলে, ভারতগভর্মেণ্ট নিজের দেয় অংশ অপেক্ষা যত টাকা অধিক দিতে হইবে, তত টাকা সঞ্চিত ভাণ্ডার (Gold-reserve fund) হইতে বাহির করিয়া দেন। সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটও হোম-চার্জ্জের চেয়ে যত অধিক টাকা পান, তাহা হয় বিলাতের সঞ্চিত ভাণ্ডারে জমা দেন, না-হয় আবার ভারতে পাঠাইয়া ভারত-সরকারের ব্যয়িত অংশ পূরণ করেন।

Council bill-এর পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে বৎসর বিলাতী বণিকগণ হোম-চার্জ্জ অপেক্ষা অল্প মুদ্রা ভারতে প্রেরণ করে, সে বৎসর council bill বিক্রয় করিয়া, হোম-চার্জ্জের সমস্ত দেয় অংশ পূরণ না হওয়ায়, সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটকে বিলাতের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে বাকী টাকাটা ধার করিতে হয়। পরে, ভারত-সরকার, ভারতবর্ষ হইতে উক্ত বাকী টাকা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলে, সেই টাকায় ভাণ্ডারের ধার শোধ করা হয়।

১৯০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে সেক্রেটারী অফ ষ্টেট ৩৩,৪৩২,১৯৬ পাউণ্ডের council bill বিক্রয় করেন। এত-বেশী বিক্রয় আর কখনও হয় নাই। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে, ভারতের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-বিপর্য্যয় হওয়ায় Exchange-এর মূল্য কমিয়া যায়; তাহাতে council bill-এর পরিমাণ মাত্র ১৫৩০৭০৬১ পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়ায়। বাজার একইভাবে থাকায়, ১৯০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে council bill-এর পরিমাণ আরও কমিয়া মাত্র ১৩৯১৫৪২৫ পাউণ্ড হয়। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের অবস্থা আবার আগেকার মত হয়। সুতরাং council bill-এর পরিমাণও ২৭৪১৬৫৮৬ পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়ায়। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে council bill-এর পরিমাণ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ন্যায়ই ছিল।

বিলাতী বণিকগণ সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের নিকট হইতে council bill ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঠান। এই council bill কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজেই বিক্রয় হয়। কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুদ্রার council bill বিক্রীত হয়। ১৮৯৮-৯৯ এবং ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বায়েই অধিক মুদ্রার council bill বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে সমুদয় council bill-এর শতকরা ৫১ ভাগ কলিকাতায় এবং ৪৪ ভাগ বোম্বায়ে। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শতকরা ৪৫ ভাগ, বোম্বায়ে ৩৯ ভাগ, এবং ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শতকরা ৫৫ ভাগ এবং বোম্বায়ে ৩৮ ভাগ বিক্রয় হয়।

হোম-চার্জ্জের পরিমাণ গড়পড়তা বার্ষিক ৬২ কোটী টাকা মাত্র।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে একমাত্র ভা

সরকারই ভারতের রাজস্ব খরচ করিবার অধিকারী ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে সামান্য খরচের জন্যও ভারত-সরকারের কাছে হাত পাতিতে হইত।

Sir Strachey, তাঁহার India নামক পুস্তকে একটী হাস্যকর বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সামান্য একটী চাপরাসী বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে, সেই চাপরাসীর বেতনের জন্য ভারত-সরকারের কাছে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে আবেদন করিতে হইত। একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সামান্য আট টাকা বেতনের একজন চাপরাসী পর্য্যন্ত স্বয়ং নিযুক্ত করিতে পারিতেন না। ইহা যে হাস্যকর, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই নিয়মের ফল কিন্তু ভাল হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণকে আয়-ব্যয়ের কোন অংশ ছাড়িয়া না দেওয়ায় ভারত-সরকারের ব্যয়ের উপর তাঁহাদের কোন দরদ ছিলনা। তাঁহারা বে-পরোয়া খরচ করিতেন। স্বনামধন্য গোখ্‌লে, আর-একটী অসুবিধা দেখান। ভারতের প্রাদেশিক আইন ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে, বেসরকারী সভ্যগণের কাজ করিবার কিছু ছিলনা। ভারত-সরকার প্রত্যেক বৎসর ব্যবস্থাপক সভায়, আয়-ব্যয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করায়, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া, ভালমন্দ দেখাইতে পারেন; কিন্তু ভারত-সরকারের বজেটের ন্যায়, প্রাদেশিক কোন বজেটের বন্দোবস্ত না থাকায়, সভ্যগণ কেবলমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিবৃত্ত হইতেন। গোখলে বলেন যে, প্রাদেশিক বজেট হইলে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সদস্যগণেরও কতকটা দায়িত্বের সৃষ্টি হইবে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, লর্ড মেয়ো Strachey সাহেবের সাহায্য লইয়া প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব এবং ভারত-সরকারের রাজস্ব পৃথক করিয়া দেন। ইহাই ইতিহাসে, Provincial decentralisation নামে কথিত হয়।

এখন হইতে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের হস্তে রাজস্বের কতক অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই রাজস্ব হইতে তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত-সরকার তাঁহাদের আয়-ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে উপদেশ দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থাও হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, উদ্বৃত্ত অংশ, সেই প্রদেশের স্বাস্থ্য এবং বিদ্যার উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন; কিন্তু প্রয়োজন হইলে, ভারত-সরকার আপনার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঐ উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন, এইরূপ নিয়মও করা হইয়াছে। Provincial decentralisationএর পর হইতে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, আয়-ব্যয়ের অধিকারী হওয়ায় সংযমী হইয়াছেন এবং রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত অংশ প্রত্যেক বৎসর স্বাস্থ্য ও বিদ্যা-দানকল্পে ব্যয়িত হওয়ায়, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ও বিদ্যারও উন্নতি হইতেছে।

যে-সমস্ত রাজস্ব, ভারত-সরকারই আদায়

করিতে পারেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ যাহা আদায় করিতে গেলে গোলমাল হইতে পারে, সেই সমস্ত রাজস্ব আদায়ের ভার এখনও একমাত্র ভারত-সরকারের হাতেই আছে; যেমন, লবণ-শুল্ক, বাণিজ্য-শুল্ক (Custom), আফিম বিক্রয় ও দেশীয় রাজন্য-বর্গের নিকট হইতে প্রাপ্য নজর। কতক রাজস্ব ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ একযোগে আদায় করেন; যেমন, জমির খাজনা, ষ্টাম্প, আব্‌কারী, আয়-কর, বন-কর ও রেজিষ্ট্রেশন। আর-কতক রাজস্ব প্রাদেশিক-শাসনকর্ত্তার দ্বারা আদায় করাই সুবিধা-জনক বলিয়া, তাহার আদায়-ভার একমাত্র প্রাদেশিক-শাসনকর্ত্তা-গণের হস্তেই রাখা হইয়াছে; যেমন, 'Provincial rates' নামে স্থানীয় টাক্স-গুলি (Local taxes)।

ভারতের ঋণ ঃ—পূর্ব্বোক্ত রাজস্বের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, ভারতের ঋণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন।

সমস্ত দেশেই, সমস্ত গভর্মেণ্টকেই, রাজ্য-শাসনের জন্য মধ্যে মধ্যে ঋণগ্রহণ করিতে হয়। এই ঋণের সুদ যতদিন সেই গভর্মেণ্ট দিতে পারেন, ততদিন সেই গভর্মেণ্টকে সচ্ছল-অবস্থাপন্ন বলিয়া ধরা হয়, না দিতে পারিলে দেউলিয়া বলা হয়। ভারতবর্ষ একটী বিশাল প্রদেশ। শাসনের জন্য মধ্যে মধ্যে অর্থের প্রয়োজন হয়, বার্ষিক রাজস্ব দিয়া, সেই অভাব না মিটাইতে পারিলে, সরকারকে কর্জ্জ করিতে হয়। আমাদের ভারত-সরকারের গৃহীত ঋণের কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে, এমন অনেক সময় আসিয়াছে, যখন বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট রাজস্বে ব্যয় সংকুলান না হওয়ায়, ভারত-সরকারকে বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হইয়াছে। এই প্রকার ঋণকে ইংরাজীতে Unproductive debt বলে। এই ঋণ জোঁকের মত দেশ-বাসীর গায়ে লাগিয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ভারত-সরকারের এই প্রকার Unproductive ঋণ অধিক নয়। কারণ ভারত-সরকার রেলওয়ে-নির্ম্মাণে এবং খাল-খননের জন্য যত অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন তাহা মোটের উপর লাভজনক; উক্ত অর্থে নির্ম্মিত রেলওয়ে এবং খাল হইতে যাহা বার্ষিক আয় হয় তাহাদ্বারা উক্ত ঋণের সমস্ত সুদ চুকাইয়া দিলে কিছু লাভ থাকে। ভারত-সরকারের এই রূপ ঋণই অধিক।

ভারতের ঋণকে দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; উহার কতক অংশ ভারতবর্ষ হইতেই (Rupee loan in India), এবং আর কতক অংশ বিলাত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে (Sterling loan in England)। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, 'রুপি-লোনে'র পরিমাণ ১৩৯৭৯২৫৭০০ এবং ষ্টার্লিং লোনের পরিমাণ ১৭৮৪৭০০১৩ পাউণ্ড ছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ অবধি, ভারত-শাসন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী, ব্যবসাদার রূপে ছিলেন। তাহার পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে বণিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন ভারতের ঋণ মাত্র ৩৩২·৯৫ মিলিয়ন টাকা ছিল।

এই ঋণ, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, ৪৫৩·৩৬ মিলিয়ন টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া, ভারত-সরকারকে আবার বাধ্য হইয়া ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। কাজেই ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে, ভারতের ঋণের মাত্রা ৬৩৫·৫৫ মিলিয়ন টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। এই সময় ভারতের প্রথম অর্থ-সচিব উইলসন্ আসিয়া ভারতের আর্থিক-অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে, রৌপ্যের দাম কমিয়া যাইতে আরম্ভ হওয়ায় ও ভারতের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, এবং শাসনকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য, বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হয়। উইলসন্ সাহেব আয়-কর তুলিয়া দিয়া যাইলেও উহা 'লাইসেন্স-টাক্স'রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। লবণের শুল্ক বাড়িয়া যায়। তথাপি প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান না হওয়ায়, গভর্মেণ্টকে বাধ্য হইয়া আবার ঋণ করিতে হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ঋণের পরিমাণ ৯১১·২৫ মিলিয়ন টাকায় গিয়া দাঁড়ায়।

'Currency reform'-এর পর, ভারত-গভর্মেণ্টের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিলে, গভর্মেণ্ট রেলওয়ে-নির্ম্মাণ এবং খাল-খননের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সমস্ত কার্য্যে, বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। ভারত-সরকার রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া এই অর্থ প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিতে সম্মত হন না; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় ঋণ করিয়াই সরকার রেলওয়ে-নির্ম্মাণ এবং খাল-খনন কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

এই খাল বা রেলওয়ে এখন বেশ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যে টাকা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, নামে তাহা ঋণ হইলেও, ব্যবসায় তাহা খাটানো হইয়াছে সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উহা ঋণ নহে। যাহা হউক, ভারতের ঋণের পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

বৎসর	১০ লক্ষ টাকা হিঃ
১৮৮৭-৮৮	৯৮০·৪
১৮৯৩-৯৪	১০৫২·৪
১৮৯৬	১০৮২·১২
১৯০৩-০৪	১২৫৮·৭৫
১৯১১-১২	১৩৯৭·৯৩

পাঠকগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, উপরে যে তালিকা দেওয়া গেল, উহা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত 'রুপীলোন' মাত্র; উহা ভিন্ন বিলাত হইতে সংগৃহীত 'ষ্টার্লিং-লোনে'র পরিমাণ ১৭৮৪৭০০১৩ পাউণ্ড। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৪ P.c. ৪½ P.c. ৫ P.c সুদের ঋণগুলিকে যথাক্রমে ২ P.c., ৩ P.c., এবং ৩½ P.c. করা হইয়াছে। কতহারের সুদের কত 'Sterling loan আছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

২½ P.c.—	১১৮৯২২০৭ পাউণ্ড
৩ P.c.—	৬৬৭২৪৫৩০ ,,
৩½ P.c.—	১৮২৭৬২১০ ,,

ঋণ করিয়া ভারতের রেলওয়ের উন্নতি করা স্থিরীকৃত হওয়ায়, ভারত-সরকার

শতকরা ৩½ টাকা হার সুদে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৭৫০০,০০০ পাউণ্ড, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ৭৫০০,০০০ পাউণ্ড এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৪০০০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রা গ্রহণ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের ঋণের একটু পার্থক্য আছে। ভারতের অধিকাংশ ঋণই রেলওয়ে-নির্ম্মাণ বা জলাশয়-খনন ইত্যাদি কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। এই প্রকার ঋণের অর্থে নির্ম্মিত রেলওয়ে বা জলাশয়গুলি এখন বেশ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ঋণের মাত্রা সমস্ত ঋণের তুলনায় শতকরা ৮৮ ভাগ। সুতরাং ভারত-সরকারের ঋণের মাত্রা দেখিয়া আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

বজেটে ভারত-সরকারের রাজস্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে:—টাক্স ও টাক্স ছাড়া অন্যান্য আদায়। ভারতবর্ষ হইতে খুব অল্প পরিমাণেই টাক্স আদায় হইয়া থাকে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ অবধি, ভারত-সরকারের সমুদয় রাজস্বের শতকরা ৩৮ অংশ মাত্র টাক্স হইতে সংগৃহীত হইত। ঐ খৃষ্টাব্দের পর, টাক্স হইতে গৃহীত রাজস্বের অংশ বৃদ্ধি পাইয়া, এখন শতকরা ৫০ ভাগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শতকরা ৫০ ভাগও ঠিক নহে। কেননা টাক্সের মধ্যে রেলওয়ে, খাল ইত্যাদি হইতে আয়ও ধরা হইয়া থাকে। ঐ আয় বাদ দিলে, সমস্ত রাজস্বের শতকরা ২৬ ভাগ মাত্র ঠিক টাক্স হইতে সংগৃহীত।

জমির খাজনা:—ভারত-সরকারের সমস্ত রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ একমাত্র জমির খাজনা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। য়ুরোপে, জমির উপর রাজার কোন দাবী-দাওয়া নাই। জমিদারই জমির অধিকারী হওয়ায়, জমির খাজনার একমাত্র ভোগ-দখলকারী—জমিদার। এইজন্য, য়ুরোপের দেশসমূহে জমিকে রাষ্ট্রগত করিয়া লইবার কথা হইতেছে। এখন যাহা য়ুরোপের নিকট স্বপ্নমাত্র, আমাদের নিকট তাহা জলন্ত সত্য। এইজন্যই আমাদের টাক্সের মাত্রা এত কম। সমুদয় জমির কর যদি জমিদারদেরই প্রাপ্য হইত, তাহা হইলে রাজ্যের ব্যয়-বহন করিতে, সরকার প্রত্যেক বৎসর জমির করস্বরূপ যে টাকা পান তাহা পূরণ করিবার জন্য, টাক্সের মাত্রা বাড়াইতে হইত। সে-ক্ষেত্রে, সাধারণের ক্লেশের সীমা থাকিত না।

সরকারী কাগজপত্রে জমির কর বলিয়া যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ প্রকৃত জমির কর, ৩ ভাগ বাকী-খাজনা, ৩ ভাগ ব্যক্তিগত কর ৩ ভাগ মৎস্য-ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত এবং আর ১ ভাগ জমির স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ও বন্দোবস্তী-খরচা আদায় করিয়া সংগৃহীত হয়। প্রকৃত জমির কর (ordinary land-revenue) মাত্র ২৯ কোটী টাকা। মাদ্রাজ হইতে ৬½ কোটী মুদ্রা, বাঙ্গলা হইতে ৩ কোটী মুদ্রা, আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশ হইতে ৬½ কোটী মুদ্রা, পাঞ্জাব হইতে ২½ কোটী মুদ্রা, বোম্বাই হইতে ৪ কোটী মুদ্রা, পূর্ব্ববাঙ্গলা ও আসাম হইতে ২ কোটী মুদ্রা, ব্রহ্মদেশ হইতে ২½ কোটী মুদ্রা এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

হইতে ১½ কোটী মুদ্রা, প্রত্যেক বৎসর প্রকৃত জমির করস্বরূপ সংগৃহীত হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত হয়; তাহার সুফল একমাত্র বঙ্গদেশের জমিদারগণই ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মাদ্রাজের এক-তৃতীয়াংশে এবং আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশের কতকগুলি জেলাতেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। পূর্ব্বে যে বাকী-খাজনার কথা বলা হইয়াছে, উহার শতকরা ৯২ ভাগ, বাঙ্গলা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাব হইতে সংগৃহীত হয়। প্রায় সমস্ত ব্যক্তিগত করই, (Capitation tax) পূর্ব্ব-বাঙ্গলা, আসাম এবং ব্রহ্মদেশ হইতে সংগৃহীত হয়। মৎস্য-চাষ হইতে প্রাপ্যের অর্দ্ধেক অংশ একমাত্র ব্রহ্মদেশেই সংগৃহীত হয়।

অন্যান্য প্রদেশগুলির মৎস্য-চাষ হইতেও কিছু-কিছু টাকা আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মুদ্রার পরিমাণ কোন বৎসরই সমান হয় না। বৃষ্টিপাতের মাত্রাহিসাবে ও নদী-সমূহের অবস্থানুসারে মৎস্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, কাজেই সংগৃহীত করও ঐ হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে বৎসর-বৎসর ওঠে-নামে। পাঞ্জাব এবং আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশ প্রত্যেকটি হইতেই, প্রত্যেক বৎসর ৫ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া থাকে। সেইরূপ পূর্ব্ব-বাঙ্গলা, পশ্চিম বাঙ্গলা, আসাম, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশ হইতেও প্রতি প্রদেশে ১½ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ পর্য্যন্ত মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া থাকে।

জমির কর বলিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয়, উহা আমাদের কৃষকগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত। যে বৎসর বর্ষার অভাবে ফসল ভাল হয় না, এবং দুর্ভিক্ষ মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয়, সে বৎসর ভারত-সরকারকেও রাজস্ব-সংগ্রহকালে দয়া দেখাইতে হয়। কাজেই জমির করের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রজাগণের ভাল-মন্দ অবস্থানুসারে ইহারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায়, ১·৬২ কোটী মুদ্রা কম জমির কর আদায় হয়। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে, ভারতের সর্ব্বত্রই ফসল ভাল হয়, তাই উক্ত বৎসর ২·০৬ কোটী মুদ্রা বেশী জমির কর আদায় হয়।

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশে সামান্যভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায়, ২৯·২ লক্ষ মুদ্রা কম জমির কর আদায় করা হইয়াছিল।

জমির কর আদায় করিতে ভারত-সরকারের কিছু খরচও হইয়া থাকে। জমির কর হইতে যাহা সংগৃহীত হয়, উহার শতকরা ১৭ ভাগ জমির কর-সংগ্রহেই ব্যয়িত হয়। জমির করসংগ্রহে যত অর্থ খরচ হয়, উহার কত অংশ কোন্ কার্য্যে ব্যয়িত হয়, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল:—

জেলার শাসন-খরচ	শতকরা	৪৪ ভাগ
জেলার অন্যান্য খরচ	,,	২৪ ,,
জেলার এবং গ্রামের কর্ম্মচারীদের রাহা-খরচ প্রভৃতি	,,	১২ ,,
জমির জরিপ খরচ	,,	১২ ,,
জমির কর-সংগ্রহের কমিশন খরচ	,,	৫ ,,
গো-চারণ জমি ইত্যাদিতে খরচ	,,	২ ,,

জেলা-শাসনের ব্যয় মাদ্রাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জেলা-শাসনে যে অর্থ ব্যয় হয়, উহার শতকরা ২০ ভাগ মাদ্রাজে, ১৮ ভাগ আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশে, ১৫ ভাগ বোম্বায়ে, ১২ ভাগ বাঙ্গলায়, ১০ ভাগ ব্রহ্মদেশে, ৯ ভাগ পাঞ্জাবে, ৮ ভাগ পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ও আসামে এবং ৫ ভাগ মধ্য-প্রদেশ ও বেরারে ব্যয়িত হয়।

বনবিভাগঃ—ভারতের উত্তর ও দক্ষিণে ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বকাল হইতেই বিশাল অরণ্য আছে। কথিত আছে যে, সুন্দরবন পূর্ব্বে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন অনেক স্থলে বন কাটাইয়া সহর বসান' হইয়াছে। কিন্তু ভারত-সরকার অরণ্যের উপকারিতা বিস্মৃত হন নাই। অরণ্য দ্বারা ভূমি স্নিগ্ধ হইয়া থাকায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। আবার শুনা যায়, বৃক্ষদের মেঘ আকর্ষণ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। ভারতের উত্তরে, হিমালয়ের পাদদেশে যে বিরাট বনানী আছে, বর্ষাকালে বারিপাত হইলে এই বিরাট বনস্থল জলরাশি গ্রাস করিয়া, ভারতের নদীসমূহের জল বারোমাস যোগাইয়া থাকে। এইজন্য ভারত-সরকার উত্তর-ভারতের এবং ব্রহ্মদেশের অরণ্যগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। বন-আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে অরণ্যনিবাসী বন্যলোকেরা কৃষিকার্য্য করিবার জন্য, আগুন লাগাইয়া এক-একটী বন জ্বালাইয়া দিত; তাহার পর বৃক্ষগুলি যখন ভস্মে পরিণত হইয়া যাইত, তখন উহার উপর শস্যের বীচি ছড়াইয়া দিয়া শস্য বপন করিত। এখন বন-আইন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং এই সমস্ত আইনের উপর লক্ষ্য রাখিবার ও অরণ্যের গাছগুলির পরিচর্য্যার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ভারতে যত অরণ্য আছে, ভারত-সরকার সুবিধার জন্য সেগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারত-সরকার হইতে নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ, যে বনগুলির উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছেন সেই বনগুলিকে Reserved forest বলে। এই সমস্ত বন হইতে কোনপ্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিলে কিম্বা বনের ক্ষতিকর কোন কার্য্য করিলে আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। আর কতকগুলি বন আছে, যেগুলিকে সরকার Reserved forest করিবেন, কিন্তু এখনও সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই বনগুলিতে জরিপ ইত্যাদি কার্য্য হইতেছে। এই সমস্ত বনকে Protected forest বলে। এখানেও বনের ক্ষতিকর কোনপ্রকার কার্য্য করা নিষিদ্ধ। আর পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার অরণ্য ব্যতীত, অন্যান্য যে-সমস্ত অরণ্যের উপর এখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই, যে-সমস্ত অরণ্য এখন অসভ্যদের হস্তেই আছে, সেগুলিকে Unclaimed forest বলে। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২৪৩৪৭৮ বর্গ-মাইল বন ভারত-সরকারের অধীনে আছে। উহার মধ্যে ৯৬৩৮৭ বর্গ-মাইল জমা-নেওয়া বা Reserved, ৮৫০৭ বর্গ-মাইল সুরক্ষিত বা Protected এবং অবশিষ্ট অংশ বেওয়ারিশ বা Unclaimed। সরকার কর্ত্তৃক জমা-নেওয়া ও রক্ষিত বনের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ব্রহ্মদেশে, ৩৩ ভাগ

বাঙ্গলায় ও আসামে, এবং অবশিষ্টাংশ আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত।

অরণ্যগুলিকে রক্ষা করিতে যেমন সরকারকে প্রত্যেক বৎসর কিছু-কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হয়; তেমনি উক্ত অরণ্য-সমূহ হইতে ভারত-সরকারের কিছু-কিছু আয়ও হইয়া থাকে। বন-বিভাগে ভারত-সরকারের ব্যয় অপেক্ষা আয়ই অধিক, এইজন্য এই বিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার কিছু টাকা রাজস্ব-হিসাবে পাইয়া থাকেন। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বন-বিভাগ হইতে ভারত-সরকার ২·৭ কোটী মুদ্রা পান। উক্ত বিভাগ পরিচালনা করিতে সরকারকে ১·৫২ কোটী মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। বন-বিভাগ হইতে ১·২২ কোটী মুদ্রা ভারত-সরকার রাজস্ব-হিসাবে প্রাপ্ত হন। বনবিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার যত টাকা পান, তাহার শতকরা ৩৭ ভাগ একমাত্র ব্রহ্মদেশ হইতেই পাওয়া যায়। বন-বিভাগ হইতে উৎপন্ন কোন্-কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, ভারত-সরকার কত টাকা প্রাপ্ত হন, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

সেগুন কাঠ ও
সাহুরী কাঠ ও
জ্বালানী কাঠ —২·১৪ কোটী মুদ্রা।
বাঁশ ও বনজাত ফলমূল—২৫·৯৫ লক্ষ মুদ্রা।
গোচারণ জমির কর —২৪·৭৪ লক্ষ মুদ্রা।

বন-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে, বন-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ মাত্র ৬৭ লক্ষ টাকা ছিল; কিন্তু ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২২২ লক্ষ মুদ্রায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বনবিভাগের রাজস্ব-সংগ্রহকালে, ভারত-সরকার যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়া থাকেন। যে-সমস্ত বন জমা-নেওয়া বা রক্ষিত, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীগণকে উক্ত বন হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিনামূল্যে দেওয়া হয়। বন-বিভাগের রাজস্ব-বৃদ্ধির কারণ, বন-বিভাগের শৃঙ্খলতা। পূর্ব্বে উহা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, এখন উহার শাসন-প্রণালী সংস্কৃত হওয়ায়, রাজস্বের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আফিম ঃ—আমাদের ভারত-সরকার যে-সমস্ত দ্রব্যের এক-চেটিয়া কারবার এখনও নিজের হাতেই রাখিয়াছেন, আফিম তাহার মধ্যে অন্যতম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারত-সরকার আফিমের কারবার হইতে প্রত্যেক বৎসর ৮ কোটী মুদ্রা পাইতেন। এখন চীনে আফিম উৎপন্ন হওয়ায় এবং আফিমের প্রতি চীনের লোকের অনুরাগ কমিয়া যাওয়ায়, চীনদেশ হইতে প্রাপ্ত উক্ত রাজস্বের পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে আফিম উৎপন্ন হয়, উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উহার এক অংশ ভারত-সরকার কর্ত্তৃক আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। অপরাংশের নাম, মালোয়া আফিম। মালোয়া আফিম, দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক মধ্যভারতে, রাজপুতনায় এবং বরোদায় উৎপন্ন হয়।

ভারত-সরকার কর্ত্তৃক উৎপন্ন আফিম।

ভারত-সরকার স্বয়ং যে আফিমের কারবার করেন, উহার অধিকাংশই আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশের ২৯টী জেলায় উৎপন্ন হয়। ঐ-সকল জেলার কৃষকগণকে, ভারত-সরকারের প্রতিনিধিগণ টাকা দাদন দেন। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে আফিম কাটা হইয়া গেলে, প্রত্যেক কৃষক স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য টাকায় ৬ সের হিসাবে, সরকারের প্রতিনিধিগণকে বিক্রয় করে। সরকারের প্রতিনিধিরা ঐ আফিম গাজিপুরের Central fundএ লইয়া গিয়া জমা করে। সেখানে এই আফিমকে দুই-ভাগে ভাগ করা হয়। যে আফিম চীন এবং ষ্ট্রেট-সেটলমেণ্টে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়, তাহার নাম Provision opium ; এগুলিকে বলের আকারে তৈয়ারি করা হয়। প্রত্যেক বলের ওজন ৩·৫ পাউণ্ড। এইরূপ ৭০টি বল একটী সিন্দুকে থাকে।

ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে ব্যবহার করিবার জন্য যে আফিম তৈয়ারি করা হয়, তাহাকে Excise opium বলে। ইহার সঙ্গে Provision opium-এর রীতিমত পার্থক্য আছে।

Excise opiumএর বলগুলিকে ত্রিভুজাকারে তৈয়ারি করা হয়। এই অফিমের এক-একটী বলের ওজন এক সের। এক-একটী সিন্দুকে ৭০টী করিয়া বল থাকে। প্রত্যেক বৎসর জুন মাসে Provision opium কলিকাতায় বিক্রয় হয়। Excise opium হয় কলিকাতায়, না-হয় গাজীপুর ফারম হইতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে বিক্রয় করা হয়, নয়ত গভর্মেণ্টের ট্রেজারীগুলিতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

বৃটীশ-গভর্মেণ্ট প্রত্যেক বৎসর ফরাসী-গভর্মেণ্টকে ৮০০০ টাকা প্রদান করেন এবং ৩০০ সিন্দুক আফিম একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করেন। ফরাসী-গভর্মেণ্ট সেইজন্য যাহাতে তাঁহাদের শাসিত স্থানে বৃটীশ-ভারতে উৎপন্ন আফিমের অন্যায় ব্যবসা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মালোয়া আফিম :—মালোয়া-আফিমের অধিকাংশই মালোয়া এবং আজমীরেই উৎপন্ন হয়। উক্ত রাজ্যদ্বয় ভারত-সরকারের ন্যায় আফিমের কারবার এক-চেটিয়া করিয়া রাখেন নাই। ভারত-সরকার এই আফিমের বাক্স ৫০০ হইতে ৬০০ মুদ্রায় ক্রয় করিয়া বোম্বাই বন্দর দিয়া চীনে রপ্তানী করিয়া থাকেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই হইতে আফিম রপ্তানীর নূতন আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন-অনুসারে, বোম্বায়ের Collector of Revenue আফিমের রপ্তানী করিবার পাস বিলি করেন। যাহারা আফিম রপ্তানী করিতে চাহে, তাহাদিগকে একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া এই পাস ক্রয় করিতে হয়। তাহার পর আফিমের প্রত্যেক বাক্সের দাম করা হইয়াছে ১২০০ টাকা। তাহারা যতগুলি আফিমের বাক্স পাঠাইতে চাহিবে, সেই বাক্সগুলি উক্ত মূল্যে খরিদ করিতে হইবে। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে, আফিম হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের মাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাজস্বের কতক অংশ ভারত-সরকার এবং আর-কতক অংশ দেশীয় রাজন্য-বর্গ পাইয়া থাকেন।

যাহা হউক, মোটের উপর আফিম হইতে গৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে আফিম হইতে গৃহীত রাজস্বের পরিমাণ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ১৬ ভাগ ছিল, কিন্তু, ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া ৭ ভাগ মাত্র হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, চীনে আফিমের বাজার নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, ভারত-সরকার পেনাঙ, সিঙ্গাপুর প্রভৃতির সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া, আফিম হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ আয় আর কতদিন থাকিবে তাহা বলা যায়না।

লবণ। য়ুরোপের আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন যে, রাজ্য-শাসনের জন্য যে টাকা প্রয়োজন, তাহার সমুদয় অংশই যেন কেবল ধনীগণের দ্বারাই প্রদত্ত হইবে, দরিদ্রেরা কিছুই প্রদান করিবে না, ইহা ঠিক নহে। এইজন্য দরিদ্রগণের নিকট হইতেও কিছু টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহারা মানবের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির উপর শুল্ক বসাইতে বলেন। লবণ মানবের প্রয়োজনীয় নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তু। এইজন্য সমস্ত সভ্য-দেশে লবণের উপর শুল্ক বসান' ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। লবণের উপর শুল্ক আমাদের ভারতবর্ষে বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল। ইংরাজগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পর, এই শুল্ক-আদায়ের পরিমাণ অধিক হন। পূর্ব্বে লবণের উপর মন-করা ১৷৷০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক বসান' হইত। এইজন্য একমণ লবণের দাম হইত ৬৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত। গরীবদের তাহাতে বিশেষ কষ্ট-ভোগ করিতে হইত। লর্ড কার্জ্জনের সময় যখন ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়া উঠে, তখন উক্ত শুল্ক কমাইয়া প্রথমে মণ-করা ২ টাকা তাহার পর ১৷৷০ টাকা মাত্র করা হয়। ইহাতে একমণ লবণের মূল্য ২৷৷০ টাকা হইতে ৩৲ টাকায় নামিয়া আসে।

আমরা ভারতবর্ষে যে লবণ ব্যবহার করি, উহার অধিকাংশই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ৩৩০ লক্ষ মণ লবণ আমরা দেশে উৎপন্ন করি এবং ১৬০ লক্ষ মণ লবণ, আমাদের ব্যবহারের জন্য বিদেশ হইতে আমদানি করি। সুতরাং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, আমরা যত লবণ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ ৪৯০ লক্ষ মণ। আমরা প্রত্যেক বৎসর যে-পরিমাণ লবণ ব্যবহার করি, উহার ৯/১০ ভাগ হইতে ১৯/২০ ভাগ পর্য্যন্ত আমাদের দেশেই উৎপন্ন করিয়া থাকি। বিদেশ হইতে আনা লবণ প্রধানত বাঙ্গলা এবং ব্রহ্মদেশে অধিক ব্যবহৃত হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, সেই-সেই প্রদেশের উৎপন্ন লবণই ব্যবহৃত হয়। ভারতের আমদানি লবণ সাধারণত ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, এডেন্, মস্কট, জেডা ও মিশরের লোহিতসাগর-স্থিত কতকগুলি বন্দর হইতে আসিয়া থাকে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ভারতের যে-যে স্থানে যে-যে পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল,

নিম্নে, তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।(১)

লবণ তৈয়ারি করিবার জন্য সরকারের এবং সাধারণ লোকের কারখানা আছে। সরকারের অপেক্ষা সাধারণ লোকের কারখানার সংখ্যাই অধিক। ব্রহ্মদেশে সমুদ্র-জল আগুনে গরম করিয়া, উহা হইতে লবণ বাহির করা হয়। কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং সিন্ধুপ্রদেশে, সূর্য্যের কিরণেই সমুদ্র-জল শুকাইয়া লবণ বাহির করা হয়। রাজপুতনায় হ্রদের লবণাক্ত জলকে সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লবণ বাহির করা হয়। পঞ্জাবে এবং কোটায় অনেক লবণের পাহাড় আছে, সেখানে ঐ-সকল পাহাড় হইতে লবণ সংগ্রহ করা হয়। ভারতের উৎপন্ন লবণের শতকরা ৫০ ভাগ বোম্বাই এবং মাদ্রাজ উপকূলে, সূর্য্যের কিরণে জ শুকাইয়া তৈয়ারি করা হইয়া থাকে।

আমরা কোন্ বৎসর কত পরিমা লবণ ব্যবহার করিয়াছি এবং উহা হই ভারত-সরকার কত টাকা রাজস্ব আদা করিয়াছেন নিম্নে তাহার একটী তালি দেওয়া গেল। (২)

ষ্ট্যাম্প (Stamps)। ষ্টাম্প দু প্রকার। মোকদ্দমা ইত্যাদির জ যে ষ্টাম্প বিক্রয় হয় তাহাকে Judici Stamp বলে; তদ্ব্যতীত অন্যান্য কার যে ষ্টাম্প বিক্রয় হয়, তাহাকে Revenu Stamp বলে। ষ্টাম্প ইংলণ্ডে প্র হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। ভারতব বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুণ এবং করা এই চারিটী স্থানে Central stan

	মণ
(১) বর্ম্মা (সমুদ্রের জল বা কূপ হইত উৎপন্ন লবণ) ...	৭১৪১৮
সম্বর হ্রদ ...	৩৫৪৪৪১
পাঞ্জাব এবং কোহাটের লবণ খনি ...	৩৮৭০৬৮
সম্বর ব্যতীত রাজপুতনার অন্যান্য স্থান হইতে ...	৯৯২৪১
মানদি, সুলতানপুর, গোয়ালিয়র, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের সলপিটার রিফাইনারী হইতে	২০৫৪৯
সিন্ধু প্রদেশ ...	৪৪৬২৩
বোম্বায়ের রন অফ্ কচের উপকূল হইতে ...	১২৩০২৬৩
মাদ্রাজের পূর্ব্ব-উপকূল হইতে ...	৩৩৩৬০৯১

(২) বৎসর	ওজন, মণ হিঃ		রাজস্ব, টাকা হি
১৮৮৮-৮৯,১৮৯২-৯৩	৩৩৪৩১৮৯৬	...	৮০২৬৯৭
১৮৯৩-৯৪,১৮৯৭-৯৮	৩৪২১১৬৭৫	...	৮২৫৮০৯৮
১৮৯৮-৯৯,১৯০২-১৯০৩	৩৫৬৭৮৬০২	...	৮৬৭৫৯৬
১৯০৩-০৪,১৯০৭-০৮	৩৯৫৯৭৩৪১	...	৬১৫৮৯৯
১৯০৮-০৯	৪৩০১৭০২৪	...	৪৩২৬৪১
১৯১০-১১	৪০৫৬৫৯৮৮	...	৪০৮১৭০
১৯১১-১২	৪৭৮৫২৯০৭	...	৪৮১৪২৫

depot আছে। কলিকাতার ডিপো হইতে ষ্টাম্প সমস্ত বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, আগ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-ভারতবর্ষ, মধ্য-প্রদেশ এবং বেরারে (Stamp for copies only) বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। বোম্বায়ের ডিপো হইতে সমস্ত বোম্বাই প্রদেশে, বেরারে এবং (Copy-র ষ্টাম্প ছাড়া অন্যান্য ষ্টাম্প) মধ্য-প্রদেশে ও মধ্য-ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সমস্ত মাদ্রাজ প্রদেশে, কুর্গে, বাঙ্গালোরে এবং ত্রিবাঙ্কুরে ষ্টাম্প প্রেরিত হয়। রেঙ্গুণ হইতে সমস্ত ব্রহ্মদেশে এবং আন্দামানে যায়। করাচী হইতে, সমস্ত পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, রাজপুতনা, কাশ্মীর, খোরাস্থান, পারশ্যউপ-সাগরের উপকূলস্থিত প্রদেশ-সমূহে ষ্টাম্প প্রেরিত হয়।

ষ্টাম্প হইতে কোন্ বৎসর কত টাকার রাজস্ব আদায় হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

	টাকা হিঃ
১৮৭৮-৭৯,১৮৮২-৮৩ ...	৩২৬১৬৮৯৪
১৮৯৩-৯৪,১৮৯৭-৯৮ ...	৪৬৮৯৪৬৮০
১৯০৩-০৪,১৯০৭-০৮ ...	৫৯০২২২৭৩
১৯০৮-১৯০৯ ...	৬৮৪৭৭৫৪১
১৯০৯-১৯১০ ...	৭১৩৩৫২১৩
১৯১০-১৯১১ ...	৭৫৬৪৭৭৬৯
১৯১১-১৯১২ ...	৬৫৮৬২৫৩৭

আয়কর (Income tax)। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আয়-কর বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না। সিপাহি-বিদ্রোহের পর, ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে একজন অর্থ-সচিব প্রেরিত হন। তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম ইন্‌কম-টাক্স বা আয়-কর-প্রথা স্থাপন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিলে, আয়-কর তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষাদি বিবিধ কারণে, ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা আবার মন্দ হওয়াতে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে Licence-tax প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই লাইসেন্স-টাক্স চিরস্থায়ী আয়-করে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জমি হইতে খাজনা গ্রহণ করা হয় বলিয়া, জমি হইতে যে আয় হয়, তাহার উপর কোন কর নাই। আয়-কর যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন বাৎসরিক ৫০০ টাকা হইতে উর্দ্ধতন আয়ের উপর উহা স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড কর্জ্জনের সময় ভারত-সরকারের অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল হইয়া উঠায় বাৎসরিক ১০০০ টাকার আয়ের উপর আয়-কর বসান' হইয়াছে। ভারত-বাসীদের আয় দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় করের পরিমাণ দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রাদেশিক কর (Provincial rates) :—জমির খাজনা ব্যতীত, পথকর প্রভৃতি প্রজাদের নিকট হইতে যে কর গৃহীত হয়, তাহাকে Provincial rates বলে। ইহা হইতে উদ্ধৃত্ত সমুদয় অংশ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ ব্যবহার করিতে পারেন। কৃষকদিগের নিকট হইতে এই কর সংগৃহীত হয় বলিয়া, দুর্ভিক্ষ

হইলে বা বারিপাত না হইলে, জমির খাজনা যেমন কম হয়, ইহারও সেইরূপ হ্রাস হয়। ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৫৪ লক্ষ রাজস্ব আদায় হয় কিন্তু ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে, উহা ৪০৫ লক্ষ মুদ্রায় গিয়া দাঁড়ায়।

ভারত-সরকারের ব্যয়ও যথেষ্ট। একমাত্র Civil Department-এ-ই ১৫½ কোটী মুদ্রা ব্যয়িত হয়। কোন্ বিভাগে কত মুদ্রা ব্যয় হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বিভাগ	লক্ষ মুদ্রা হিঃ
সাধারণ শাসন-বিভাগ ...	২২৭
বিচারালয় ...	২৯৫
জেল ...	৭৪
পুলিশ ...	৪০৭
সমুদ্র-বিভাগ (Marine) ...	৫১
যাজকীয় (Ecclesiastical) ...	১৭
অন্যান্য বিভাগসমূহ ...	৬১

ইহা ভিন্ন, পেনসন্, কাগজপত্র, ছাপাই খরচ ইত্যাদিতেও কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে সরকারের যাহা খরচ হয়, তাহার অপেক্ষা আয়ই অধিক; সুতরাং ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে ভারত-সরকারের প্রত্যেক বৎসর কিছু-কিছু লাভই হইয়া থাকে।

টাঁকশাল হইতে খাদ-মিশ্রিত টাকা মুদ্রিত করায়, ভারত-সরকারের প্রত্যেক বৎসর যথেষ্ট লাভ হয়। কিন্তু উক্ত মুদ্রা Gold Standard Reserve Fundএ জমা দেওয়ায়, উহা রাজস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেনা। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে এবং পুরাতন মুদ্রা-গুলিকে গলাইয়া নূতন মুদ্রা তৈয়ারি করাইতে, প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকারকে কিছু কিছু খরচ করিতে হয়।

রেলওয়ে।—ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ভারত-সরকারের সাহায্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে। রেলওয়েগুলিতে পূর্ব্বে ভারত-সরকারের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইত। কয়েক বৎসর হইল, রেলওয়েগুলি বেশ আশাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৎসর	মোটক্ষতি লক্ষ মুদ্রা হিঃ
১৮৭৬-৭৭—১৮৮০-৮১ ...	১২০
১৮৮১-৮২—১৮৮৫-৮৬ ...	৭৪
১৮৮৬-৮৭—১৮৯০-৯১ ...	১৬২
১৮৯১-৯২—১৮৯৫-৯৬ ...	১৫৩
১৮৯৬-৯৭—১৮৯৮-৯৯ ...	১৬৮
১৮৯৯-১৯০০—১৯০৪-১৯০৫	
মোট লাভ ...	১১১

কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য, ভারত-সরকার খাল কাটাইয়াছেন ও কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। কিন্তু, এই বিভাগে সরকারের খরচ অপেক্ষা আয়ই অধিক। এই বিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার এক কোটীরও অধিক মুদ্রা প্রাপ্ত হন। জেলার ও প্রাদেশিক সরকারী বাটী এবং সরকারী রাস্তা ইত্যাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কার-কার্য্যে সরকারকে প্রত্যেক বৎসর ৪ কোটীরও অধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। যে বৎসর সরকারের আর্থিক অবস্থা মন্দ হয়, সেই বৎসর এই বিভাগের খরচও কমাইয়া দেওয়া হয়। ভারতের

ঋণের জন্য কত টাকা সুদ দিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে।

সৈন্য-বিভাগ। ১৯১১-১৯১২ খৃষ্টাব্দের report-এ প্রকাশিত যে, ভারত-সরকার সৈন্যবিভাগে ২০০½ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন। ঐ মুদ্রার ২৩·২১ কোটী ভারতবর্ষে এবং ৫০·০৬ লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডে খরচ করা হয়।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিভাগ (effective), পরোক্ষ ফলপ্রদ বিভাগ (non-effective), সমুদ্র-বিভাগ (marine) এবং স্বতন্ত্র রক্ষা-বিভাগ (special defence works);—সৈন্য-বিভাগে, এই চারিটি শাখা আছে। কোন্ শাখায় কত খরচ নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল। (৩)

এখানে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা শান্তির সময়ে সৈন্য-বিভাগে যে টাকা খরচ হয়, তাহারই তালিকা। হঠাৎ যুদ্ধ বাধিলে যে টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা extra-ordinary charges বলিয়া ধরা হয়। সে টাকার কতক্ অংশ অতিরিক্ত সাময়িক কর ইত্যাদি হইতে এবং আর-কতক্ অংশ ঋণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

পরিচয়

কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয়?
সে কি সুখের ফুল বুকে?
ভেবেছি ভুলে, এখন খালি চিরদিনের মনে হয়।
সে কি দুঃখে যাতনায়?
মেঘের তড়িৎ বনের হরিৎ
কহে তারা নিজের কথাই; তবে সেথা নয়রে নয়।
সিন্ধু সরিৎ মাঝে কি?
কবে কোথায় পরের ব্যথায়
ধবল নিশায় বিমল উষায়
আকুল হয়ে কেঁদেছি?
দিবায় কিম্বা সাঁঝে কি?
মন ভুলায়ে, হাত বুলায়ে,
শুদ্ধ তারা কয়না কথা; তবে সেথায় নয়রে নয়।
কোথায় কাকে সেধেছি?
কি ধ্যানে? সে কি জ্ঞানে?
সেথায় বুঝি আমার খোঁজে এসেছিলে প্রেমময়!
সে কি গভীর সাধনায়?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

(৩) প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিভাগ	কোটী মুদ্রা হিঃ
সৈন্যদিগের বেতন ও ভাতা এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের খরচ তাহাও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত	১৪
Supply, transport including firms, ইহাও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত	৩·১৮
Ordinance establishment, supplies and services	১
পরোক্ষ ফলপ্রদ বিভাগ	
পেনসন্ গ্রাযুইটী ইত্যাদি এই শাখার অন্তর্গত ...	৪·৭৮
Military works ঐ ...	১·৪৪
সমুদ্র-বিভাগ ...	৫০ লক্ষ
স্বতন্ত্র-রক্ষা-বিভাগ ...	৫ লক্ষ

চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্তচন্দ্র মেঘান্তর হ'তে সমুজ্জ্বল,
যজ্ঞ-ভস্মরাশি হতে দীপ্ত তব দৃপ্ত তেজোবল।
মানববিধান রাজ্যে হে বিদ্রোহী বিধাতৃ-প্রেরিত,
পঙ্ক হ'তে জনমিল পদ্মসম তব ছত্র সিত।
প্রকৃতি তোমার মাঝে, ক্রুদ্ধা হয়ে—মানবের পরে
নিল তার প্রতিহিংসা আভিজাত্য পদে চূর্ণ করে'।
রাষ্ট্র নহে লীলাক্ষেত্র, প্রজা নহে খেলার পুত্তল,
রাজনীতি নহে শুধু প্রমোদের কল-কোলাহল,—
এ সত্য জানালে তুমি ধ্বংস করি অগ্নিবর্ণ কুল,
ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব যত ব্যসনীরে করিয়া নির্ম্মূল।
আর্য্যত্ব-গৌরবী যত শূদ্রাধর্ম্মে করিয়া সংহার,
অযোগ্য, অসত্য, তমে ওগো চন্দ্র, করি অপসার—
জাগো তুমি দাসী-পুত্র ক্ষত্রোত্তম, বীরেন্দ্র-কেশরী;
অক্ষত্রিয় ক্ষত্রে ত্যজি আর্য্যাবর্ত্তে তোমারেই বরি।
বসুমতী বীরভোগ্যা; ন্যায় সত্যে দিবে বরমালা,
বিচার করেনা সে যে অট্টালিকা আর পর্ণশালা।
তুমি পূর্ব্ব পশ্চিমের ঘটাইলে প্রথম মিলন,
শর্ম্মিষ্ঠারে এনে তুমি অঙ্কলক্ষ্মী করিলে রাজন্,
যবনীরে চুম্ব দিলে যবনেরে বক্ষে নিলে তুমি,
হে আদর্শ মহারাজ, তুমি মহা মিলনের ভূমি।
ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম— ভগবান্ নহে পক্ষপাতী
সবাই সন্তান তাঁর—ভেদ নাই—সবি এক জাতি—
তোমার জীবনে যাহা একদিন হলো অঙ্কুরিত
চৈতন্য-নানক-বুদ্ধ-মন্ত্রে তাহা পূর্ণ বিকশিত।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্বেচ্ছাচারী

৯

কবিবর মণিশঙ্করের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার 'মানস-প্রতিমা' হঠাৎ সান্ধ্যভ্রমণ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সেদিন তিনি স্পষ্ট তাঁহাকে বলিয়াছেন যে আর তিনি তাঁহার সম্মুখে বাহির হইবেন না। মণিশঙ্করের কাতর দৃষ্টি, অভিমান-ভরা মধুর বচন, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "বাবা বলেন, তুমি মদ খাও, খারাপ লোকের সঙ্গে থাক, তোমার সঙ্গে কথা বলতে নেই।" হায় নিষ্ঠুরে! তুমি ত' জান না, কেন সে মদ খায়! তোমার নিষ্ঠুরতা, তোমার উপেক্ষাই যে তাহার কারণ। তুমি যদি দয়া করিয়া তাহার পানে একবার চাহিয়া দেখ, তাহা হইলে যে সে রাজার রাজা হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক হইতে পারে, ভীষ্মের মত শরশয্যায় শয়ন করিতেও তাহার বাধে না! তুমি যদি বল, তাহা হইলে সে পিতা ত্যাগ করিতে পারে, এমন কি এমন যে হিতৈষিণী মাতা, তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া তোমার চরণে সে আপনাকে বলি দিতে পারে। হায়, তুমি তোমার ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তির উপর উন্নত হইয়া বসিয়া রহিলে, আর সে রহিল কোথায়?

কবিবরের দুঃখ-সাগর মথিত হইয়া আজ-কাল যে সমস্ত উচ্ছ্বাস বাহির হইতেছিল, তাহাদের অমানুষিক বা আনুনাসিক রসাত্মকতায় অনেক নিশাচর সাহসী ব্যক্তিও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। এমন কি তাঁহার "শঙ্করসাহি" কবিতাগুলি "পল্লী-সাহিত্যানুসন্ধান-সমিতির" সভ্যগণের কৃপায়, মণিশঙ্কর নামটিকে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দী হইতে একেবারে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উপনীত করাইয়া পল্লী-সাহিত্যের গতাসু মহাপুরুষগণের সঙ্গে তাঁহাকে একাসনে বসাইয়া দিতেছিল।

গৃহে তাঁহার সঘন মূর্চ্ছা, বন্ধু-মহলে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণোন্মাদকর শঙ্করসাহি গীত এবং পথে ঘাটে তাঁহার চপল মন্থর গতি গ্রামের চিত্তটিকে একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মাতা ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার আসিয়া ব্যবস্থা করিলেন, দুই বেলা ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল আর ভাত এবং দিবারাত্রি গৃহে আবদ্ধ থাকা। বন্ধুরা ব্যবস্থা করিলেন, "পোড়া বাঙ্গলা" ছাড়িয়া তাঁহারই বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখা। মণিশঙ্কর স্বয়ং ব্যবস্থা করিলেন, প্রতিদিন চারি বোতল করিয়া ধান্যেশ্বরীর সেবা। কিন্তু মূর্খ পিতা দুর্গাশঙ্কর ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার নিজ সলিমপুর মহালের নায়েবী—না হয়, জমিদার-মহাশয়কে বলিয়া-কহিয়া নিকটস্থ কোন এক তালুকের ম্যানেজারী।

পিতার এই ব্যবস্থা শুনিয়া পুত্রের উদ্ভাবনশীল মস্তিষ্কে এক অপূর্ব্ব ভাব গজাইয়

উঠিল। তিনি তাঁহার পিতাকে ধরিয়া বসিলেন যে শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরীর নামে যে সুবর্ণ-গোলা নামক তালুক আছে, তাহার ম্যানেজারিটা তাঁহাকে দেওয়া হউক। উহার ম্যানেজার না কি এই সময় হিসাব দিবার জন্য সদর কাছারিতে আসিয়াছে; উহাকে এই সময় বরখাস্ত করিয়া পিতা তাঁহাকে ঐ পদটী প্রদান করুন, তাহা হইলেই কবিবরের সমস্ত রোগ সারিয়া যাইবে। পিতা সেই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকেও ঐ সময়ে তড়িৎগতিতে একটা অভিসন্ধি জাগিয়া উঠিল; এবং দৈবের কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "ম্যানেজার বেটাকে হিসেব নিকেশে ফেলতে হবে।"

দুর্গাশঙ্কর চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া এক অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন। শুনিয়া বন্ধুগণ একেবারে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কবিবরের তখন বাক্যের উৎস খুলিয়া গিয়াছে; তিনি জ্বলন্ত গদ্য-পদ্য বর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধুগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টার উদ্যোগে স্থির হইল, যেমন করিয়াই হউক সুবর্ণ গোলার ম্যানেজারের কাগজ-পত্র সরাইয়া ফেলিতে হইবে। ম্যানেজার রাত্রে ঠাকুরবাড়ী-সংলগ্ন একটা কুঠরীতে নিদ্রা যায়। রাত্রি বারোটা-একটার সময় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে! মহাশক্তির প্রভাবে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উক্ত কার্য্যে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল।

কিন্তু কার্য্যকালে সমুৎপন্নে দেখা গেল, তিন-চারিজন ছাড়া আর কেহই মণিশঙ্করের সঙ্গে নাই। তথাপি কি ভয়, কি ভয়! তাহারা এক-একজনেই এক একশত। Forward! March! No fear!

সেনাপতি মণিশঙ্কর বলিলেন, "সাবধান! কোন শব্দ করো না। চুপি চুপি ওখানে ঢুকে যদি দেখি দরজা বন্ধ, তাহলে কাঠের জানলাটা এক টানে খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে তার পর দেশলাই জ্বালা যাবে। পাপিষ্ঠ ম্যানেজার যদি বাধা দেয়, তাহলে—" মণিশঙ্কর কলোসিয়ম্-স্থিত রোমান সম্রাটের ন্যায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, কি করিতে হইবে।

মণিশঙ্কর নিঃশব্দতার আদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একজন প্রিয়তম শিষ্য যিনি শঙ্করসাহি সঙ্গীতে এবং ধান্যেশ্বরীর সেবায় গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই তাঁহার হৃদয়স্থ শঙ্কর সাহির সুরকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাই অন্যান্য সকলে যখন ম্যানেজারের কক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া জানালা-দরজা বন্ধ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিল, তখন তাঁহার শঙ্করসাহি হঠাৎ সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল, "একবার বেরোও হে নরেশ!"

"আরে, চুপ চুপ।"

"আমরা তোমায় দেখে নেবো;
বেরোও হে নরেশ! একবার বেরোও হে—এ।—"

"সর্ব্বনাশ করলে! আরে চুপ!"

কিন্তু কে শোনে? পুনরায় দ্বিগুণ জোরে বাহির হইল, "বেরোও হে—এ—এ—একবার।"

এমন সময় দ্বার খুলিয়া ম্যানেজার নরেশচন্দ্র মহালনবীশ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কে হে তোমরা?"

আর পিছানো চলে না! মণিশঙ্করের সেই গায়ক শিষ্য গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া গাহিল, "আমরা তোমায় দেখে নেবো—হে!" নরেশবাবু ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ডাকাত—ডাকাত—" এবং কোনরূপে আপনাকে মুক্ত করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার চীৎকারে কিছুক্ষণের মধ্যেই টোলের কয়েকটী ছাত্রসমেত সর্ব্বানন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মুখে কাপড়-বাঁধা কয়জন লোক দরজা ঠেলিয়া নরেশবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তিনি কক্ষমধ্য হইতে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন। তাহারা আসিয়া মণিশঙ্করকে সদলে ঘিরিয়া ফেলিল। মণিশঙ্কর বেগতিক দেখিয়া হুকুম দিলেন, "চালাও লাঠি।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "আর লাঠি চালিয়ে দরকার নেই। পালাও বলছি, নইলে এক-কটী মাতালকে ঐ কুয়োয় চোবাব।"

মণিশঙ্কর হুকুম দিলেন, "মারো শালা সর্দ্দারকে।" কিন্তু সর্ব্বানন্দ ও অন্যান্য ছাত্রগণ কিল, চড় ও দুই-চারি লাথিতে সকলকে ভূতলশায়ী করিল। পরে ঠাকুরবাড়ির দরোয়ানগণ পৌঁছিলে বলিয়া দিল, বাঁধো এদের।" দরোয়ানেরা সঙ্গে আলো আনিয়াছিল। তাহারা আলোর সাহায্যে যখন চিনিল, কাহাকে বাঁধিতে হইবে, তখনই সকলে পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে ইনি মণিবাবু! ই কেয়া হুয়া? আপ্ কাহে ডাকু বন্ গিয়া?" মণিশঙ্কর তখন সাহস পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঁধো ঐ শালাকো।" কে কাহাকে বাঁধে?

ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিল, "বটে! আরে সর্ব্ব-দা, করেছ কি! মণিবাবু এসেছেন, ওঁর অভ্যর্থনা করনি? ছি ছি, কি করছ, শীগ্‌গির কুয়ো থেকে একঘড়া জল তুলে এনে ওঁর মাথায় দাও।" সর্ব্বানন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এই সারলে! ওহে মণি, পালাও, কার্ত্তিক ক্ষেপেছে। আমার হাতে তবু রক্ষা আছে, ওর হাতে নেই।"

মণিশঙ্কর কার্ত্তিকচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়াই সসম্মানে পলায়নের পথ খোলসা কি না তাহাই দেখিতেছিল। ইত্যবসরে কার্ত্তিকচন্দ্র কূপ হইতে একঘড়া জল তুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মণিশঙ্করের অন্যান্য বন্ধুগণ পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল, কিন্তু সে তখনও সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্ত্তিক আসিয়া যেমন তাহার গলায় হাত দিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে মাটিতে ফেলিল, অমনি সে সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্ব, ভাই, রক্ষে কর।" সর্ব্বানন্দ তখন কার্ত্তিককে টানিয়া বলিল, "আঃ, কি কর, কার্ত্তিক? দেখছ না, বেচারা মদের ঝোঁকে এ কাজ করে ফেলেছে। যাও মণি, পালাও।"

মণিশঙ্কর তখন একেবারে তাঁহার "আড্ডা" পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার যে কয়টী সঙ্গী যুদ্ধাভিযানে যাইতে সাহস করে নাই, তাহারা উপস্থিত ছিল। মণিশঙ্কর ফরাশের উপর গিয়া আছাড় খাইয়া বলিলেন, "ভাই দেবেন, ভাইরে, আমার বড় অপমান হয়েছে!"

"কি, কি, কি হল?"

"উঃ, বড় অপমান! জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল!"

একজন বন্ধু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ষ্টিমুলাণ্ট্ আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিতেই, তৎক্ষণাৎ সে তাহা উদরসাৎ করিয়া বলিল, "উঃ, ভাইরে কি অপমান! আমার মূর্চ্ছা যাবার ইচ্ছে হচ্চে!" তাহার অবস্থা দেখিয়া একজন তাড়াতাড়ি তাঁহার মাতার নিকট সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল, এবং অন্যান্য সঙ্গীগণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দেবেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি!"

মণিশঙ্কর কহিল, "প্রিয়নাথ, বাপ! আর এক গ্লাস দাও, ভাই!"

প্রিয়নাথ তাহার আজ্ঞা পালন করিলে মণিশঙ্কর উঠিয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কি হয়েছে? বরং বল, কি হয়নি? সেই পাপিষ্ঠ পরান্নভোজী কুকুরগুলোর ভয়ে আমায় পালিয়ে আসতে হল! সেই পাতচাটা হারামজাদা সর্ব্বা আর কার্ত্তিকে! সেই দুটো চ্যাংড়া আমায় লাথি মারলে! এ প্রাণ আমি আর রাখব না!"

দেবেন কহিল, "থাম, থাম, ও কি করছ? গলা টিপছ কেন?"

মণি কহিল, "আমি মরব। সত্যি আমি মরব।"

দেবেন কহিল, "প্রিয়নাথ, তুই আরও মাটি করলি। এ সময়ে আবার মদ দিতে গেলি কেন? এখন একটু তেঁতুল-গোলার জোগাড় দেখ্।"

দেবেন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল লইয়া মণির মাথায় দিতে লাগিল। মণিশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি ঠাণ্ডা করছিস, দেবেন? এ প্রাণ আ ঠাণ্ডা হবে না। যেদিন সর্ব্বার মুণ্ডু এ হাতে, আর কার্ত্তিকের মুণ্ডু এই হা ঝোলাতে পারব, সেদিন ঠাণ্ডা হব নইলে বন্ধু, তোমরা বন্ধু-হারা হবে।"

প্রিয়নাথ তেঁতুল-গোলা আনিবামা দেবেন বলিল, "এই তেঁতুল-গোলাটু খাও।"

মণি কহিল, "কি এনেছ? তেঁতু গোলা! যদি এই বাটিতে করে পাপিষ্ঠদের গরম রক্ত আনতে পার তাহলে তাই খেয়ে আমি ঠাণ্ডা হতু কি মিছে তেঁতুল-গোলা খাওয়াচ্ছ? চাই—রক্ত চাই—রক্ত—রক্ত!"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি তা রক্ত এনে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ এই খাও—"

"তাদের মুণ্ডু—দু-দুটো মুণ্ডু—"

দেবেন কহিল, "আমি এখনি কে এনে দিচ্ছি। তুমি এটুকু খেয়ে দেখি।"

তাহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় নিস্তারিণী দেবী "ওরে মণিরে, বাপ্‌রে" বলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন মাতৃভক্ত সন্তান টলিতে টলিতে উঠিয়া মাতাকে ধরিয়া বলিল, "মা—গর্ভধারিণী—জগৎজননী—"

বাকীটুকু আর শুনা গেল না। কারণ পুত্রের নিবিড় আলিঙ্গনে মাতা সপুত্র ভূমিসাৎ হইলেন।

১০

দেওয়ান দুর্গাশঙ্করের গর্ব্বোচ্চ শির নত হইয়া যাওয়ায় তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। এমন কি যাহারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টির জন্য সতত সতৃষ্ণ নয়নে জোড়-করে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত, তাহারাও আজকাল তাঁহাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাছারির আমলা-ফয়লা হইতে আরম্ভ করিয়া উমেদার পাইক এমন কি ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইয়া হাসে। দেখিয়া শুনিয়া তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে একদিন জমিদার মহাশয়কে বলিলেন, "আমার বয়স হয়েছে, এখন আর আমি পারি না, আমার কাছ থেকে সব বুঝে সুঝে নিয়ে আমায় ছুটী দাও।"

কালিকাবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছেলের দোষে নিজেকে দোষী করা নিজের উপর অন্যায় অত্যাচার! আপনি কেন ব্যস্ত হচ্চেন? মণিশঙ্করের জন্য আপনি কেন শাস্তি ভোগ করতে যাবেন? আপনি আমার পৈতৃক দেওয়ান, আপনাকে আমি এত সহজে ত্যাগ করতে পারি না।"

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, "না বাপু, এ আমারই পাপের শাস্তি। যেখানে আমি মাথা উঁচু করে সবার ওপর হুকুম চালিয়েছি, সেখানে মাথা নীচু করে কাজ করতে পারব না। তোমার এষ্টেট হতে আমি যা কিছু করেছি, তাতেই আমার বাকি কটা দিন বেশ চলে যাবে। আর কেন আমায় ধরে রাখছ?"

কালিকাবাবু বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া কিছুতেই দেওয়ানজীকে রাখিতে পারিলেন না; তবে দুর্গাশঙ্কর আরও কয়েক মাস থাকিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

দেওয়ান মহাশয়ের কর্ম্মত্যাগের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কেহ দুঃখিত হইল, কেহ মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি দুঃখবোধ করিলেন। পুত্রের পাপে পিতার শাস্তি-ভোগ তাঁহার নিকট বড়ই দুঃসহ বোধ হইল, তাই তিনি কার্ত্তিককে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্যই দেওয়ানজী এ রকম ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তোমরা যদি মণিশঙ্করের সেদিনকার ব্যাপার চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করে না দিতে, তাহলে কখনই এ ব্যাপার ঘটত না। সেদিন থেকে মণি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে, দেওয়ান মশায়ের স্ত্রীও শুনলাম, সেদিন থেকে শরীরে আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়েছেন, তার ওপর উনি আবার কাজ ছেড়ে দিচ্চেন। তোমাদের উচিত, ওঁর পায়ে ধরে যাতে উনি আবার কাজ নেন, তাই করা।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সময়-মত দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করিল। দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন তোমরা বাপু আবার আমার পিছনে লাগলে? কাজ করা না করা আমার ইচ্ছে। এতে পরের এত মাথা-ব্যথা কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমাদের জন্য যদি আপনার ক্ষতি হয়ে থাকে, বলুন, যেমন করে হোক, সে ক্ষতি পূরণ করবার চেষ্টা করব। রামকে তীর মারলে সে তীর যদি শ্যামকে লাগে, তাহলে যে তীর ছুড়েছিল, সকলে তাকেই দোষ দেবে। কি হলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, বলুন, আমার সাধ্যাতীত না হলে আমি তাই করব।"

দুর্গাশঙ্কর গড়গড়ায় ভীষণভাবে দুইটা টান দিয়া বলিলেন, "বিপদে কোথায় সহানুভূতি পাব, না, এই রকম একটা চ্যাংড়ার কাছে অপমান হতে হচ্চে! যারা আমার সামনে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস করত না, তারা এখন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, সাহায্য করব। ওঃ, এর চাইতে মরণ ছিল ভাল!"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমার কোনরকম অসদভিপ্রায় নেই। যে শপথ করতে বলেন, তাই করে বলছি, যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়, আমি তা করতে রাজী আছি।"

দুর্গাশঙ্কর কহিল, "কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! আচ্ছা, দেখি, টোলের ভাত খেয়ে তোমার মনটা কতখানি বড় হয়েছে! বাবুকে বলে-কয়ে মণিশঙ্করের সঙ্গে শৈলজার বিয়ে দিয়ে দিতে পার?"

কার্ত্তিকচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি! তা আমি কেমন করে পারব? শৈলজার বিয়ের ওপর আমার কি হাত? বাবু আমার কথা শুনবেন কেন? তবে আমায় যদি এ প্রস্তাব করতে বলেন, আমি আজই করব।"

"না, না, অতখানি দয়া তোমায় করতে হবে না। তবে তুমি যদি ইচ্ছে কর, তা হলে তা হতে পারে।"

"কি করে, বলুন। আমি তাই করব।"

"তোমাদের এখানকার বাস তুলতে হবে।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমরাই তা হলে আপনার শত্রু! বেশ, তাহলে বাবাকে এ কথা বলছি যে, আমরাই আপনার পথের কাঁটা; কিন্তু বাবা এখান থেকে যাবেন কি না, সে কথা বলতে পারিনে। যদি একা আমি গেলে হয়, বলুন, আমি এখনই সরে পড়ছি। আর যখন ইংরিজিই পড়ছি, তখন এ বিদ্যার শেষ না দেখে আমি ছাড়ছি না। চার মাস পরেই আমাদের এণ্ট্রেন্স্ একজামিন, তারপর হয় কলকাতায় নয় অন্য কোন জায়গায় আমায় যেতে হবে। তখন অনায়াসেই আমি আপনার পথ থেকে দূর হব। এই চার মাস অপেক্ষা করতে পারবেন না? এখন যেতে হলে হয়ত বাবু আমায় যে-রকম ভালবাসেন তাতে আপনার সুবিধে না হয়ে অসুবিধে হতে পারে।"

দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ ক্রমশ বিস্ময়ে পরিণত হইল। এই অষ্টাদশ বর্ষ

লকের এতখানি বুদ্ধি! দুর্গাশঙ্করের মনে বার আশা দেখা দিল। তিনি বিলেন, ইহার বুদ্ধি যথেষ্ট বটে, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি কম, নহিলে নিজের ভবিষ্যৎকে কি কেহ এতখানি উপেক্ষা করিতে রে?

তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "আপনার ভয় হচ্ছে , এত বড় লোভ আমি কি করে সম্বরণ রব? হয়ত পারব না? কিন্তু ঠিক নবেন যে আপনার কাছে যেটা খুব বড়, মার কাছে হয়ত সেটা খুবই ছোট! পনি টাকা-কড়ি, ধন-দৌলতকে বড় রে দেখতে শিখেছেন, আর আমি গরীব াহ্মণের ছেলে, নিজের মানটাকেই বড় রে দেখতে শিখেছি। বাবু হয়ত মাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ঙ্গে শৈলজাকে আমার হাতেই সঁপে বেন, মনস্থ করেছেন। কিন্তু আমি নি, ভিখিরীর ছেলে রাজপদ পেলেও ই ভিখিরীই থাকে। আপনার মণি ই এত বড় লাখ-দেড় লাখের সম্পত্তি লেও সেই মণিই থাকবে। আমি দূর থেকে তাই দেখে হাসব। কিন্তু বাবু মায় ভালবাসেন, ঠিক জানবেন, সে ভাল-াসার অপমান আমি কখনও করব না। মি বড়ই হব, ছোট হব না। বাবা যদি দিন পর্য্যন্ত আমার ভার বহন করতে রে থাকেন, আরও কিছুদিন তিনি পারবেন, বোধ হয়।"

দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া লেন, "বাবা, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন তুমি ব্রাহ্মণের ছেলেই থেকো। তোমায় কিছু করতে হবে না। কপালে থাকে, মণি বড় হবে, ভাল হবে, কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্য নেব না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করগে। আমি অধম, তাই তোমায় সন্দেহ করেছিলাম।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু আমি যখন বলেছি যে আপনার পথে দাঁড়াব না, তখন নিশ্চয়ই সরে যাব, কেউ আমায় নিবারণ করতে পারবে না। তবু এও বলে রাখছি, আপনার মণিকে বাবু যদি মেয়ে না দেন তাহলে আমি আবার আসব। তখন যদি তিনি আমাকেই সমস্ত দেন, ত আমায় নিতেই হবে, কারণ তিনি আমায় ভাল বাসেন। তবে ভয় নেই, এখন যদি তিনি প্রস্তাব করেন যে তোমায় শৈলজাকে বিয়ে করতে হবে, তাহলে আমি কিছুতেই তা করব না। আপনি আপনার মণির জন্য যথেচ্ছা চেষ্টা করুন।"

কার্ত্তিকচন্দ্র আর দাঁড়াইল না, দেওয়ানজীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গাশঙ্কর নীরবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি যে বাপ, কি করি!"

১১

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার কিছুদিন পরে দেখা গেল, কার্ত্তিকচন্দ্র কুড়ি টাকার বৃত্তি পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দ পাশ হইয়াছে মাত্র। এই দুই সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার পিতা যখন

প্রস্তাব করিলেন, সে ঐ স্কলারশিপের টাকায় কলিকাতা বা অন্য কোন স্থলে পড়িতে যাইতে পারে, তখন সে বলিল, "সর্ব্ব-দার কি হবে?"

পিতা বলিলেন, "যিনি এতকাল ওর খরচ বহন করে আসছেন, তিনি যদি এখন অস্বীকৃত হন, তাহলে নিরুপায়!"

"তাঁর কাছে এখন এ প্রস্তাব করে কে?"

"ইতিপূর্ব্বে যে করেছিল, সেই করবে।"

"কোন কারণবশতঃ আমি আর সে প্রস্তাব করতে পারব না।"

"কি কারণ?"

কার্ত্তিকচন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনার কাছে গোপন করা উচিত নয়। দেওয়ানজীর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা থেকে এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, কেন বাবু আমায় এত স্নেহের চক্ষে দেখেন। বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার ইচ্ছা করেছেন। এখন সেকথা জেনে-শুনে তাঁর উপর জোর-জুলুম আর আমি করতে পারিনে। যদিও আপনিই এতদিন আমাদের খরচ-পত্র চালিয়েছেন, কিন্তু অন্য জায়গায় পড়বার খরচ চালানো আপনার পক্ষে অসম্ভব। অতএব এ অবস্থায় আমি ত কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। এখন জেনে শুনেও যদি অজ্ঞের ভাব দেখিয়ে আমি তাঁকে গিয়ে বলি যে সর্ব্ব-দার খরচ আপনাকে দিতে হবে, তাহলে সেটা মিথ্যে কথা বলার মতই হবে। এক উপায়, যদি সর্ব্ব-দা গিয়ে বলে। কিন্তু—"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কালিকাবাবু ক লোকের ছেলে-পিলের খরচ-পত্র দিচ্ছেন সর্ব্বানন্দর মত গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে খরচ দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু তোমা সঙ্গে যে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন, সংবাদ ত আমিও জানতাম না। আ মনে করতাম, তিনি যেমন সকলকেই দ করেন, তোমাকেও তেমনি। তবে তোমা যে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এটা আমি খু জানি! কিন্তু এর মধ্যে যে ঐ-রকম ভ লুকানো ছিল, তা ত কৈ ঘুণাক্ষরেও পাইনি। ছি ছি, কি লজ্জা! এখন সকলেই মনে করবে যে, আমি টাক লোভে ছেলে বিক্রী করেছি। কার্ত্তি আর তোমার ইংরিজি লেখাপড়ার প্রয়োজ নেই।"

"আমার লেখা-পড়ায় ত এত কোনরকম আর্থিক সাহায্য বাবু ক নি, আজও করতে হবে না, কারণ আ যা স্কলারশিপ পেয়েছি, তাতেই আম চলবে।"

"আর্থিক সাহায্য পাওনি, তাই কেমন করে বলব! হেড মাষ্টার মশায় নি তোমায় পড়াতেন। তোমাদের যখন বইয়ের দরকার, বাবুর লাইবেরী থেকে তখ তা পেয়েছ। স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লাইবেরীতে থাকে না, তবু তোমরা দুজ তা পেয়েছ। এখন ত সবাই বু পারবে যে, কেন ওখানে তোমার প্রতিপত্তি! না, না, কার্ত্তিক, তুমি ইং পড়ার আশা ছেড়ে দাও।"

"আমি না হয় ছেড়ে দিলুম,

দাদাকে তাহলে গাছে চড়িয়ে মৈ কেড়ে নেওয়া হবে!"

"তার উপায় আমি কি করব? সর্ব্বা-নন্দকে বল, সে নিজে গিয়ে বাবুকে বলে-কয়ে যা হয় করুক। আমরা আর তার কোন সাহায্য করতে পারব না।"

"বাবা, আপনি ব্যস্ত হচ্চেন, কেন? আমাদের কার্য্যোদ্ধার নিয়ে কথা! আমি নিজে বিবাহ না করলে ত আর তাঁরা জোর করে আমার বিয়ে দিতে পারবেন না।"

"কি! তুমি আমায় এত নীচ মনে কর যে এতদিন এত উপকার নিয়ে আজ এই রকম মিথ্যাচারের দ্বারা তাঁর প্রত্যুপকার করব? এতদিন অজ্ঞানে যা করেছি, করেছি, আর তা কিছুতেই পারব না। তুমি আর পড়তে পাবে না, আমার পৈতৃক যা আছে, তাই নিয়ে তোমায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

"বাবা, আপনি এ রকম ব্যস্ত হলে আপনার পৈতৃক সম্পত্তিই বা রাখবেন কি করে?"

"না পারি, ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করলে কেউ দোষ দিতে পারবে না। তবু এ কথা ত কেউ বলতে পারবে না যে, হরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের সন্তান পুত্র বিক্রয় করেছে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবা, আপনার প্রতি কোনরকম অসম্মান হয়, তা করতে দেব না। কিন্তু বিপদকে আগে থেকে ডেকে আনা কোনরকমেই উচিত হবে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্ব-দাদার যদি কোন উপকার করতে পারি, করব কি?"

"আমাদের উঁচু মাথা নীচু না করে যদি পার, তাহলে কর। কিন্তু, সাবধান, কালিকাবাবুর মত উদার-হৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনরকম চালাকি করতে পাবে না। সব কথা স্পষ্ট বলার পরও তিনি যদি তোমার আর সর্ব্বানন্দর উপকার করতে রাজি হন, তাহলে তা তুমি করতে পার।"

"বেশ, সেই কথাই স্থির।"

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া সর্ব্বানন্দকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। সর্ব্বানন্দ ম্লান মুখে বলিল, "কাজ কি ভাই, আমার ইংরিজি পড়ায়? ইংরিজি পড়ে বড় জোর কেরাণী হব। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলের ভাগ্যে সেই দাস্য বৃত্তি ছাড়া যখন আর কিছুই জুটবে না, তখন যা দু'দশ বিঘে জমি শিষ্যসেবক আছে, তাই নিয়ে দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটানো মন্দ কি!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি যদি এম্, এ পাশ করতে পার, তাহলে প্রোফেসর হতে পারবে, অন্য কোনরকম বড় কাজও মিলতে পারে। সেই জন্যেই বলছি, তুমি এ সুবিধা ছেড়ো না। চল, গিয়ে বাবুকে সব কথা বলি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এতদিন তোমার স্কন্ধে ভর করে চালিয়েছি, আর আমার তা ইচ্ছে নয়।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমায় সে কথা আর বল্‌তে পারব না, কার্ত্তিক। আমায় ক্ষমা কর ভাই, আমায় ছেড়ে দাও। আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হোক।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ সর্ব্বানন্দর মুখের

পানে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বানন্দ সহসা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, মানুষকে বেশী ভালবাসতে নেই, বেশী বিশ্বাসও করতে নেই। আমি তোমার কাছে একটা কথা এতদিন গোপন করেছি বলে লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি তোমার অকৃতজ্ঞ বন্ধুকে ত্যাগ কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমায় সব কথা খুলে বলতেই হবে। কি হয়েছে বল,—হয়তো আমা হতে তোমার উপকার হতে পারে।"

"তা জানি, তুমি তা পার বলেই তোমায় তা বলব না। তোমার দ্বারা এ উপকার আমি নেব না।"

"নিতেই হবে, বল, নইলে জান আমাকে?"

সর্ব্বানন্দ কাতর হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই আমায় এত ভাল বাসিস নে, আমি তোর এতখানি ভালবাসার মোটেই উপযুক্ত নই।"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি ভালবাসার উপযুক্ত কি না, সে বিচার আমি করব। এখন তুমি যে আমায় ভালবাস, তার পরিচয় দাও। বল, কি হয়েছে?"

সর্ব্বানন্দ ছল ছল নেত্রে বলিল, "আমায় যদি মেরে ফেলতে পারিস, তা হলে বলতে পারি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তাহলে বলবে না?"

"কিছুতেই না।"

কার্ত্তিক কহিল, "সর্ব্ব-দা, তাহলে বলে রাখছি, আর তুমি আমায় দেখতে পাবে না। এ জন্মে এই পর্য্যন্ত।"

কার্ত্তিকচন্দ্র চলিয়া যায় দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, আমায় দয়া কর। তুমি মুখ ফিরিয়ো না। তুমি যদি মুখ ফেরাও, তা হলে ভগবান মুখ ফিরুবেন। দয়া কর ভাই!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি কৈ আমায় দয়া করলে? তুমি যে দয়া আমায় করতে পার না, আমিও তোমায় সে দয়া করতে পারি না।"

সর্ব্বানন্দ সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, শোন; যদি তোমায় এ কথা বলি, তা হলে এই মুহূর্ত্তে তুমি সে কাজ করতে যাবে। অথচ তাতে ফল হবে এই যে তোমাদেরও ক্ষতি হবে—আর আমার? ন্যাংটার আবার গাঁটকাটার ভয়? আমি যে সর্ব্ব সেই সর্ব্বই থাকব।"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে। হয় সব কথা খুলে আমায় বল, নয় আমার আশা ত্যাগ কর।"

সর্ব্বানন্দ তখন নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কার্ত্তিককে বলিল, "ঐ দরজাটা তাহলে বন্ধ করে দাও।" দরজা বন্ধ করিয়া দুই বন্ধুতে যে কথা হইল, তাহাতে কার্ত্তিকচন্দ্র অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে বলিল, "যাই হোক, আমিও যা তুমিও তাই। আমি গরীবের ছেলে, তুমিও গরীবের ছেলে। কালিকাবাবু আমাকে যদি মেয়ে দিতে উদ্যত হয়ে থাকেন, তোমাকেই বা তিনি না দিতে পারবেন কেন?"

"তোমাকে যে বাবু কতখানি ভা

াসেন, তা তুমি জান না, তাই এ কথা লছ। তার উপর শৈল?"

"শৈল ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে াও। যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকেই ওর ালবাসতে হবে। ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।"

"কি ভয়ঙ্কর! যার বিয়ে হবে, ার কথাই ধর্ত্তব্য নয়! শৈল আর ছেলে ানুষটি নেই। এখন ওর মুখ-চোখ দিয়ে ওর মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তুমি অন্ধ, তাই কিছু দেখতে পাওনি। আমি আজ কতদিন লক্ষ্য করে আসছি, তোমাকে দেখলে ওর সমস্ত মুখখানির ওপর দিয়ে—"

কার্ত্তিক বাধা দিয়া কহিল, "থাম, থাম, তুমিও কি মণিশঙ্কর হয়ে উঠলে না কি? কি বল তার ঠিক নেই! আমার মত হোঁৎকারামকে যদি, তুমি সামনে থাকতেও, শৈল পছন্দ করে থাকে, তাহলে ওর ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি আছে। যাক, তোমার আমার মধ্যে মেঘ কেটে গেল! এই সামান্য কথা তুমি যখন আমায় বলছিলে না, তখন বুঝছি তোমার যথেষ্ট পাপ সঞ্চয় হয়েছে। সেই পাপের শাস্তির জন্য তোমাকে আমার সঙ্গে কলকাতায়, কিম্বা যেখানেই যাই পড়তে যেতে হবে। আর তোমার সঙ্গে যেমন করে পারি, শৈলজার বিয়ে আমি দেওয়াব। এতে যত চালাকি খাটাতে হয়, খাটাব।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি! তুমি নিজের নাম করে টাকা নিয়ে আমার পড়ার সাহায্য করবে? আর মনে করেছ, সেই টাকা আমি নেব?"

কার্ত্তিক কহিল, "আরে থাম না, তুমি বাবুকে একটুও চেন নি। আমি না চাইলেও তিনি তোমায় সাহায্য করবেন। এখনও ত কোন কথা হয়নি। সবই যখন উড়ো-ভাসার ওপর চলছে, তখন তাই চলুক না!"

"না, আর তা হতে পারে না। তুমি না চাইলেও তোমারই জন্য তিনি আমায় সাহায্য করবেন।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেখ সর্ব্ব-দা, বাবুর এতখানি অপমান করো না, বলছি, তাহলে তোমার পাপ হবে! বাবু এতদিন আমার জন্য তোমায় সাহায্য করেন নি, এ তোমায় বলে রাখছি। তার প্রমাণ চাও, আজ আমার সঙ্গে যেয়ো, দেখতে পাবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা যদি প্রমাণ করতে পার, তা হলে তোমার সঙ্গে যেখানে যেতে বল, রাজি আছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "যেতে রাজি না হলেই ব তোমায় ছাড়ত কে? আমি যা মতলব করেছি, তার জন্য তোমায় সরিয়ে দিতুমই। আমি আজ পাঁচ মাস আগে দেওয়ানজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তাঁর মণির জন্য পথ খোলসা করে দেব, সে কথা ত তোমার মনে আছে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ছি ছি কার্ত্তিক, শৈলর সঙ্গে ঐ জানোয়ারটার নাম এক সঙ্গে করতে তোমার বাধে না?"

কার্ত্তিক কহিল, "আচ্ছা সর্ব্ব-দা, জিজ্ঞাসা করি, মানুষ ত মানুষই! আত্মায় ত সবাই এক! তাহলে একজনের নাম করলেই বা তোমাদের মুখে জল আসে কেন, আর একজনের নামেই বা খড়্গহস্ত হয়ে ওঠ কেন? মানুষ মানুষই, অবস্থা

শিক্ষা ইত্যাদির গুণে নানা রকম হয়। কে জানে? কে জোর করে বলতে পারে যে আমরাই খুব উঁচু জীব, আর মণিশঙ্কর খুব নীচু! শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী তাঁর নিজের ত্রিশ হাজার আর তাঁর বাপের দেড় লাখ টাকার সম্পত্তির দরুণই বা এত প্রার্থনীয় বস্তু হয়ে উঠলেন কেন? আর সর্ব্বানন্দ শর্ম্মার চল্লিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর মাত্র সম্বল হওয়াতে তিনিই বা এত হেয় হলেন কেন? সমস্ত জগতের উপর যদি কারও আধিপত্য থাকে ত সেই রাজরাজেশ্বরের অফুরন্ত ধন-দৌলতের কাছে তোমার মাসিক পাঁচ টাকাই বা কি, আর মহারাজাধিরাজের লাখ লাখ টাকাই বা কি! One divided by infinityও যা, আর one million divided by infinityও তাই।"

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের যুক্তি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে হাসিতে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, "ঐ হাসিটেই হচ্ছে একমাত্র দামী জিনিষ। সংসারের দু'এক টুকরো মাটি, কাঠ, জল-বাতাসের জন্য কামড়া-কামড়ি দেখে যে হাসতে পারে, সেই ঠিক বস্তু লাভ করেছে। অন্য সবাই গড্ডলিকা-প্রবাহের দলে পড়ে ভেসে যাক, আর আমরা দুজনে কেবল হাসি এস।"

১২

সন্ধ্যার সময় লাইব্রেরীর সম্মুখস্থ উদ্যানে একটা বেদীর উপর বসিয়া কালিকাবাবু তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি আগেই সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু দুপুর বেলায় তোমরা আসনি কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবার সঙ্গে একটা পরামর্শে আমরা ব্যস্ত ছিলুম, তাই আসতে পারি নি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমারও যে একটা কথা আছে—তিনি এখনও আসছেন না কেন? ওরে রামচরণ, বিষ্ণুকে ডাক্ ত।"

কার্ত্তিক কহিল, "বাবা আসবার আগে আমাদের দুটো কথা আছে—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাই না কি? বসো, বসো, ঐ বেঞ্চে বসো।"

কার্ত্তিক আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার কথা এই যে আমার কলেজে পড়তে যাওয়ায় একটু গোলমাল উপস্থিত হয়েছে। কি গোলমাল, বাবা তা নিজে বলবেন। সেই গোলমালের দরুণ হয়তো আমার ইংরিজি পড়া আর নাও হতে পারে। কিন্তু—সর্ব্ব-দা তাহ'লে কি করবে?"

কালিকাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছ, তবু তোমার পড়ার গোলমাল হবে? আশ্চর্য্য! তোমার বাবাকে আবার নতুন করে সেই সব পুরোনো কথা বোঝাতে হবে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "কোন একটা নতুন কারণ ঘটায় তিনি আমাকে আর ইংরিজি পড়াতে অনিচ্ছুক। কি কারণ, তিনিই তা বলবেন। এখন সর্ব্ব-দার কি হবে, তাই জানতে চাচ্ছি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "ওর যদি সে

[ন] কোন কারণ না ঘটে থাকে, তাহলে [প]ড়াশোনায় কোন রকম বাধা ত দেখতে [পা]চ্ছি না। এতদিন ওর খরচ দিতে যদি [এ]ষ্টেটের না আটকে থাকে, তাহলে [ওর]ও আটকাবে না। তোমার বাপ [কি] তোমার মঙ্গল না চান, তা বলে [সর্ব্বা]নন্দ কেন নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে? [সর্ব্বা]নন্দ, তুমি কি বলতে চাও?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আজ্ঞে, আমার আর [কি]ছুই বক্তব্য নেই, তবে কার্ত্তিক জোর করে [আমায়] ইংরিজি পড়া ধরিয়েছে। এখন [ও] যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে আমারই [বা] এত প্রয়োজন কি! আমি যে বরাবর [সব] একজামিনই পাশ করতে পারব, [তারও] কিছু ঠিক নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "তাই বলে কেউ [কা] করে থাকতে পারে না। যখন তোমার [জন্যে] খানি সুবিধে করে দিতে আমরা সম্মত [আছি], তখন তুমিই বা সে সুবিধে ছেড়ে [দিচ্ছ] কেন? হয়ত যদি ভাল করে [বারের] পাশ করে যেতে পার, তাহলে পরে [গভর্ণমেণ্ট] সার্ভিসে কোন ভাল পোষ্ট [পাওয়াও] তোমার পক্ষে কঠিন না হতে [পারে]।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু কার্ত্তিক যদি [পড়তে] না চায়—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাপু, অতখানি [সেণ্টিমেণ্টাল] হলে সংসার চলে না। আমি [বলি]লাম, তোমাদের দুটিতে খুব ভাব। তাই [বলে] একজন যদি নিজের ভাল-মন্দ না বোঝে, [তাই] বলে যে অপরকেও বিবেচনা-শক্তি [বিসর্জ্জন] করতে হবে, এর কোন অর্থ নেই। তোমার যদি আর কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে প্রস্তুত হওগে। তোমার যা কিছু খরচ-পত্র হবে, আমি তা বহন করব। কার্ত্তিক, তোমার আর কিছু বলবার আছে?"

কার্ত্তিক কহিল, "আর যা আছে, তা বাবাই বলবেন। তবে আমার কিন্তু সর্ব্ব-দার সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আপনি বাবাকে বুঝিয়ে যদি রাজি করাতে পারেন, তাহলে আমিও যাব।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাবা কার্ত্তিক, তোমার কিসে ভাল হবে, সে কি আমি বুঝিনে? তুমি জান না—"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। আপনার দয়া যদি আমি এ জীবনে ভুলি, তাহলে আমার সমস্ত জীবনই একটা অভিশাপ বলে জ্ঞান করব। যেন চিরদিন আপনার আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাকতে পারি, আমায় এই আশীর্ব্বাদ করবেন।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আমার ভালবাসাটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়, পরে জানতে পারবে। এখন যাও, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাওগে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমরা গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিলেন। কালিকাবাবু জ্যোৎস্না-বিধৌত একটী কামিনী বৃক্ষের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ন্যায়-

রত্ন মহাশয় বলিলেন, "আপনি আমায় ডেকেছিলেন?"

কালিকাবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "এই যে আপনি এসেছেন। আজ এত দেরী হল যে?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কার্ত্তিক আমাকে বলেছিল, আজ একটু পরে যাবেন, আমার একটা কথা আছে, বাবুর সঙ্গে; তাই সে চলে গেলে, আসছি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আপনি না কি কার্ত্তিককে আর পড়াশুনা করতে দেবেন না?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "পড়াশুনা করতে দেব না, এ কথা বলিনি; তবে অন্য কোথাও গিয়ে ওর পড়াশুনার আর প্রয়োজন নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কেন, এ-রকম ইচ্ছা হল?"

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন; তারপর পদতলস্থ চটী জুতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আজ এমন একটা কথা শুনেছি, যাতে আপনার দয়ার ওপর নির্ভর করে তাকে বিদেশে বিদ্যার্জ্জনের জন্য পাঠাতে আমার ইচ্ছা চলে গিয়েছে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কি কথা আর কার কাছেই বা তা শুনলেন, শুনি!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কথাটা শুনেছি, কার্ত্তিকের কাছে, তবে সে কার কাছে শুনেছে, সে কথা বলতে পারব না। কারণ তাতে সে ব্যক্তির হয়ত অনিষ্ট হতে পারে। তবে কি কথা, তা যদি শুনতে চান ত বলতে পারি। কিন্তু পরের মুখে শোনা কথা, আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "সঙ্কোচ বো হয় ত' বলে কাজ নেই, কিন্তু আমা বক্তব্য যা আছে, তা বলে নি। কার্ত্তিকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি যতখানি চিন্তি আমাকেও ততখানি জানবেন।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে, সে ক অবিশ্বাস করবার তাহলে আর কিছুমা কারণ নেই। আপনি যে কার্ত্তিককে নিজে সন্তানের মত দেখেন এ কথা আপন অতি-বড় শত্রুতেও বলবে। কিন্তু য বুঝতে পারি যে একমাত্র স্নেহ হতে আমি যে কথা শুনেছি, সেই কথা উঠে তাহলে সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে কা আমি কার্ত্তিককে কলেজে পড়তে পাঠি দেব।"

কালিকাবাবু ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "অ যদি এই অতিস্নেহের অন্য কোন গূঢ় কা থাকে, তাহলে আপনি ওকে আম কাছ থেকে কেড়ে নেবেন? আপন ছেলেকে যদি কেউ একটু বেশী ভালবা —তা সে ভালবাসা যে কারণেই হো —সেটা আপনার কাছে মস্ত অপরাধ ব গণ্য হবে?"

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপ যদি এতখানি ক্ষুণ্ণ হন, তাহলে এবি আলোচনা ত্যাগ করতে বাধ্য হব, কা আপনার দয়ার উপর, স্নেহের উপর, নি করেই আমাদের এখানে বাস ক আপনি দুঃখিত হলে আমাদের—"

কালিকাবাবু কহিলেন, "আপনি হবেন না। ক্ষুণ্ণই হই, আর রাগই ক আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ

পনার মত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করব, খানি নীচ আমি নই। তবে কার্ত্তিককে বার বিশেষ প্রয়োজন আছে, ন্যায়রত্ন য়। বহুদিনের একটা আশা তিলে তিলে ত হয়ে এখন পর্ব্বতাকার ধারণ রেছে। এখন যদি আপনি নিষ্ঠুরের মত আশাকে ধূলিসাৎ করেন তাহলে সে রাখবার আমার আর স্থান থাকবে । ন্যায়রত্ন মশায়, এত দিন এ কথা প্রকাশ ন বলিনি, তার কারণ, কি জানি, যদি সংবাদ শুনে কার্ত্তিকের কোন অনিষ্ট হয় আপনি প্রথমেই তাতে বাধা দেন, পনার মধ্যে যে একটা ব্রাহ্মণোচিত ত ভাব আছে, তার প্রমাণ আমি দিন পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম, সেইজন্যই সাহস এ বিষয়ে কোন কথা বলতে পারি । আমার চিরকালের ইচ্ছা যে যদি র্ত্তিককে নাও পাই, তবুও তাকে বড় মহৎ হতে আমি সাহায্য করব। কিন্তু সঙ্গে আমার যে আশা ছিল, সেটাও বড় হয়ে উঠে এখন আমার সমস্ত মনোবাক্যের একমাত্র চেষ্টা হয়ে য়েছে। আপনি যদি আমার সে বাসনা না করেন, তাহলে—"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কি বাসনা, স্পষ্ট বলুন! কার্ত্তিককে আপনার কি য়োজন!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "এ জীবনের বাসনা পূর্ণ করব, আমার শৈলজাকে হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্তহব। ন্যায়রত্ন য়, আমায় আপনি দয়া করুন, এ ইচ্ছায় দেবেন না। তবে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে কার্ত্তিককে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন করে দিয়ে, শৈলজা আর তার মধ্যে যেন কোনরকম অসাম্য না থাকে, তাই করে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ হবে।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "বুঝতে পারলাম না, শৈলজার যাই করুন, তবু সে আপনার কন্যাই থাকবে, আর কার্ত্তিকের যাই করুন, তবু সে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলেই থাকবে। তাকে যদি আপনার সমস্ত সম্পত্তির উপর বসিয়ে দেন, তবু সে জানবে যে সে সমস্তই তার পাওয়া জিনিষ, এবং সে পরের গচ্ছিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক মাত্র। যেমনই করুন, আপনার শৈলজার সঙ্গে আমার পুত্রের যে আন্তরিক প্রভেদ, চিরদিন তা থেকেই যাবে। এমন স্থলে বিবাহ দিলে বিবাহের যা ফল তা মিলবে কি না সন্দেহ। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি সাহসে এক ভিখারীর সন্তানের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে সাহস করছেন? আমার কি সাধ্য যে আপনার মত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে সমানভাবে কুটুম্বিতা রক্ষা করে চলি!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "একমাত্র টাকাতেই যে মানুষ বড় হয়, এ কথা আপনার মুখে শুনে আশ্চর্য্য হচ্চি। আপনাকে যদি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ না মনে করব, তাহলে আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের জন্য এত ব্যস্ত হব কেন? আমার শৈলজার ত' সম্বন্ধের অভাব ছিল না, বড় বড় লোকের বাড়ী থেকেও সম্বন্ধ এসেছে, আর আমি ইচ্ছা করলে যে কোন দরিদ্র সৎকুলীনের

সন্তানকে এনে ঘরজামাই করে রাখতে পারি। ও দুটোর একটা ইচ্ছেও আমার নেই। আমি চাই ব্রাহ্মণের সন্তান, আমি চাই যার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, সেইরকম মানুষ, পুরোপুরি মানুষ। কলের পুতুল বা খেঁকী কুকুরের যদি দরকার হত তাহলে তা এত দুর্লভ হত না। আপনার পুত্র বলেই কার্ত্তিক দুর্লভ, আপনার পুত্র বলেই কার্ত্তিকের মানুষ হবার আশা আছে, তাই ওকে এমন করে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হচ্চে।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু সকলেই ত' বলবে যে আমি পুত্র বিক্রয় করেছি। যতই কেন আপনি করুন না, লোক-নিন্দার মুখ থেকে আমার নিস্তার নেই। এমন অবস্থায় কি করে আমি এ বিষয়ে সম্মতি দেব?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "সামান্য একটু লোক-নিন্দার ভয়ে আপনি এক নিরীহ ব্রাহ্মণ-কন্যার সৎপাত্রলাভে বাধা দেবেন? ভুলে যান যে সে ধনীর সন্তান; মনে করুন, সে কেবল এক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ-কন্যা। মনে করুন, তার বাপ আপনার হাত চেপে ধরে বলছে, "মশায়, আমার কুল রক্ষা করুন, আমার কন্যার বিনিময়ে আপনার পুত্রটীকে দান করুন।" তারপর বলুন, আপনি কি করবেন? এর পরও যদি আপনি চান যে আমি সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলি, আপনার কাছ থেকে জোড়-হাতে এই কার্ত্তিককে আমি ভিক্ষা করে নিয়েছি, তাতেও আমি প্রস্তুত!"

শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এতখানি বিনয়ের সম্মুখে তাঁহার সমস্ত গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তিনি অ কিছু করিতে না পারিয়া নত নেত্রে হস্তে তলদেশ খুঁটিতে লাগিলেন। কালিকাবা সহসা নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত চাপি ধরিয়া বলিলেন, "বন্ধু, আপনি আমা বয়োজ্যেষ্ঠ, বলুন, আমায় কি করতে হ কি করলে আপনার মন পাব?"

শিবচন্দ্রের মস্তক হইতে তর্ক-যুক্তি, ন্যা সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তাদি সমস্তই এ নিমেষে উড়িয়া গেল। তাঁহার যত গ যত অহঙ্কার যত ব্রাহ্মণত্ব ছিল, সমস্ত বাসাংসি জীর্ণানির ন্যায় খসিয়া পড়িয়া গেল তিনি দেখিলেন, কালিকাবাবুও মানু তিনিও মানুষ—উভয়ের মধ্যে কোন ভে নাই। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলে "কালিকাবাবু, আপনারই জয়! আমি আ তর্ক করব না। আপনাকে আর কি করতে হবে না। কিন্তু এ সংবাদ উভয়ে মধ্যেই আবদ্ধ থাক্। এখন কর্ণাক্ত করার প্রয়োজন নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বৈবাহি আপনাকে নমস্কার! এই সন্ধ্যার আকাশে নীচে বসে ঐ চন্দ্র আর তারাদের সাক্ষ্য রে আমাদের কথাবার্ত্তা স্থির করে নিলা আপনার কার্ত্তিককে যখন উপযুক্ত বিবেচ করবেন, তখনই অনুমতি দেবেন, আ বিবাহের উদ্যোগ করব। কিন্তু মনে থা যেন, আমার কন্যা বাগ্‌দত্তা হয়ে রৈ এর এখন অন্য পাত্রে সম্প্রদান অসম্ভব

শিবচন্দ্র কহিলেন, "ভয় নেই, আপ নিশ্চিন্ত থাকুন।"

শিবচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে দিলেন, "তোমার কলেজে পড়তে যাওয়াই ব্যর্থ হল।"

কার্ত্তিকচন্দ্র মনে মনে হাসিল; প্রকাশ্যে বলিল, "তাহলে একটা ভাল দিন দেখে দিন, আমি গিয়ে মাকে খবর দি।"

যাত্রার দিন সর্ব্বানন্দকে কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে লুকাইয়া বেড়াইতে দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সে হচ্চে না, দাদা, সিন্নি খেতে এগিয়ে এখন ফাঁৎকা দেখে পেছুলে চলবে না। আমি যা মনে করেছি, তা করবই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "নিজের বুদ্ধিকে বা ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দেখা তোমার ক্রমশঃ একটা রোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাবধান, হয়ত এই রোগেই তোমার সমস্ত মহত্ত্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "সে ভয় নেই, কারণ শেষ পর্য্যন্ত তুমি আছ। নিতান্তই যদি পড়ি, তুমি আমায় টেনে তুলবে। কিন্তু তুমি যা মনে করেছ, আমার plan of operation এ বাধা দেবে, তা হচ্ছে না। আমি সমস্ত কাজের ভার নিজের উপর নিয়েছি, কারও মুখাপেক্ষী হয়ে কাজ করব, তেমন লোক আমি নই। এ বিয়ে আমি দেবোবই, তাতে যা হয় হবে। তুমি আমার ওপর নির্ভর কর।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার কাছেও যেমন স্বর্গমাত্মবশং সুখং", আর কারও কাছে যে তা নয়, তা তুমি কেন মনে করছ? আমিও অভিজ্ঞ করছি যে যদি বুঝি, শৈলজা আমায় চায় না, তাহলে স্বয়ং ভগবান এলেও এ বিয়েতে কেউ আমায় সম্মত করাতে পারবে না।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি পারব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কেন?"

"কারণ! কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিথ্যে কথা! এর কারণ আমি বলব,—শুনবে? এর কারণ, তুমি নিজেকে সব-চাইতে ভালবাস। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথার বিরুদ্ধে কিছু হবে, এ তোমার সহ্য হয় না! আমার সঙ্গে শৈলর বিয়ে দিতে যখন তোমার ইচ্ছে হয়েছে, তখন সে ইচ্ছার সুমুখে তুমি আর কারও ইচ্ছেকে দাঁড়াতে দিতে চাও না! তোমার সূক্ষ্ম অথচ প্রচণ্ড গর্ব্বই তোমার সব। সাবধান কার্ত্তিক, পতনের এই হল প্রথম সোপান।"

কার্ত্তিক কহিল, "এঃ, সমস্ত সৎকার্য্যই দেখছি বিরোধের মধ্য দিয়েই ঘটে থাকে। আমার জীবনের প্রথম সৎকাজের দেখছি প্রথম থেকে তুমিই বিরোধী হয়ে দাঁড়ালে। তা হওগে, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত যখন আমায় কোন কাজেই হারাতে পারনি, তখন এ কাজেও পারবে না—এ'ও বলে রাখলুম, দেখে নিয়ো।"

বৈকালে দুইখানি গো-শকট সজ্জিত হইয়া আসিল এবং সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক টোলের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জমিদার-গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সেখানে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুইজনে যেমন বাহিরে আসিবে,

অমনি দেখিল, লাইব্রেরীর দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষে শৈলজা দাঁড়াইয়া আছে। যুগপৎ উভয় বন্ধুর দৃষ্টিই শৈলজার উপর পতিত হওয়াতেই হউক বা যে কারণেই হউক শৈলজা গবাক্ষ হইতে সরিয়া গেল। কার্ত্তিকচন্দ্র তাড়াতাড়ি সর্ব্বানন্দর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "সকলেরই সঙ্গে দেখা করলুম, শৈল কেন বাকি থাকে! ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, চল।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তুমি অতি পাষণ্ড!"

কার্ত্তিক বলিল, "যে আজ্ঞে, আপনি না যান, আমার ত যেতে বাধা নেই! আমি চল্লুম।"

সর্ব্বানন্দ কোন কথা না বলিয়া গো-শকটে গিয়া উঠিল। কার্ত্তিকচন্দ্র লম্ফে লম্ফে সোপান অতিক্রম করিয়া এক নিমেষে শৈলজার নিকটে গিয়া বলিল, "শৈল, আমরা যাচ্ছি। বোধ হয় দু'এক বছর আসতে পারব না। সবাই কত উপদেশ দিলে, তুমি কিছু বলবে না?"

শৈল ধীরে ধীরে তাহার পায়ের গোড়ায় একটা প্রণাম করিয়া একটু যেন ম্লান মুখে বলিল, "আমি আর কি বলব?"

কার্ত্তিক কহিল, "কিছু না? একটা কথাও বলবার নেই? সর্ব্ব-দাও আসতে পারবে কি না, ঠিক নেই, ওকেও কিছু বলবার নেই?"

শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "ওঁকে আমার প্রণাম দিয়ো!"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি এই ক'বছরের মধ্যে বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছ, দেখছি! এত-দিনের জন্য আমরা যাচ্ছি, আর একটা কথাও আমাদের জন্য জুগিয়ে রাখনি? ছিঃ! যদি তোমার আপন ভাই এমনি করে দূরদেশে চলে যেত, তাহলে কি তুমি তাকে একটা কথাও বলতে না, শৈল?"

শৈল সহসা কাঁদিয়া ফেলিল এবং একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের পানে চাহিয়া ছুটিয়া সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল। কার্ত্তিক-চন্দ্র সে দৃষ্টির কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া অগত্যা হাসিতে হাসিতে আসিয়া সর্ব্বানন্দর অনুসরণ করিল।

(ক্রমশ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

"ফাল্গুনী"

ফাল্গুনে যখন প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য-পটের পরিবর্ত্তন হয়, তখন জীবনের অনেকখানি রহস্য চোখের সম্মুখে ধরা পড়ে। সুষুপ্তির মধ্যে জাগরণের, ভ্রান্তির মধ্যে সত্যের, বিলয়ের মধ্যে প্রাণের লীলার আভাস পাওয়া যায়। যা একটা বিভীষিকার মত কুয়াসা ও অন্ধকারের পক্ষ বিস্তার করে' জগৎকে ঢেকে ফেলে, সে যে কেবল প্রাণের শক্তিকেই নতুন করে' জাগিয়ে তুলে

আসে,—এই সত্যই ফাল্গুনের নবপল্লবদলে আর রঙিন আকাশে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রাণকে জাগাতে হলে' আগে ঘুম পাড়াতে হয়, তাই শীত আসে তার লেপ আর কাঁথা নিয়ে, তার ঠাণ্ডা নিশ্বাস নিয়ে, আর সাতসাগরের কথা নিয়ে।

আমরা যে বার-বার ঘুমিয়ে পড়ি, সে ঘুমিয়ে-পড়ার মধ্যে জাগরণের সুরটিই কেবল বাজে। জাগরণকে নতুন করে' আন্‌বার জন্য, সত্য করে' জানবার জন্যই ঘুমের আয়োজন। ঘুমের যে নিশ্চেষ্ট ভাব, সে কেবল জাগরণকে উদ্যত করবার জন্য, প্রাণের চেষ্টাকে প্রবুদ্ধ রাখবার জন্য।

আর এই আনন্দই সব-চেয়ে বড় আনন্দ—এ ঘুমিয়ে-থাকার আনন্দ নয়, এ কেবল জেগে-থাকার আনন্দও নয়। এ আনন্দ জেগে-উঠ্‌ব বলেই ঘুমিয়ে পড়ার আনন্দ, ঘুমের মধ্যে জাগরণের আনন্দ, ঘুম থেকে নতুন করে' জেগে ওঠার আনন্দ। এ খেলার আনন্দ, কারণ এ প্রাচীন হয়ে নবীনতার মধ্যে ফেরবার আনন্দ। ফুলের কুঁড়িটা যদি চিরকাল ফুলের কুঁড়িই থাকত, তাহলে তার ভরা যৌবন জগতের মধ্যে সব-চেয়ে প্রাচীন জিনিষ হ'ত। সে জগতের কৃপার পাত্র হ'ত, কারণ সে এক বিপুল আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকত।

সে হাওয়ার আনন্দ। পথ-চলার আনন্দ। নিজেকে হারিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে পাওয়ার আনন্দ, নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে লওয়ার আনন্দ, নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে চলার আনন্দ। এ খেলার আনন্দ, কারণ এ নতুন হওয়ার আনন্দ। এ নবযৌবনের আনন্দ।

পরমেশ্বর মানুষকে বড় আনন্দের অধি-কারী করেছেন। তিনি তাকে চির জীবন দিয়ে অভিশাপগ্রস্ত করেননি, তিনি তাকে চির যৌবন দিয়ে প্রাচীন করে রাখেননি। চিরযৌবনের ঐশ্বর্য্য অসীম অতল ক্ষীর সমুদ্রের মতন হ'ত,—যাতে হাবুডুবু খাওয়া যায়, কিন্তু দাঁড়ানো যায় না। যে সুরটি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অধিক বাজে, যেটি না থাকলে ঐশ্বর্য্যের মূল্য থাকত না, সেটি অভাবের সুর। আমরা অভাবের উপর দাঁড়িয়েই ঐশ্বর্য্যকে উপভোগ করি, দুঃখ থেকেই সুখকে পাই, বিরহের মধ্যে ভালাবাসাকে বাঁচিয়ে রাখি।

আসা-যাওয়ার মধ্যেই জীবনের প্রধান আনন্দ,—এই যে আসি বলে' চলে যাওয়া, এই যে নতুন করে' আসা, এরই মধ্যে জীবনের গৌরব রয়েছে, যৌবনের আনন্দ রয়েছে। প্রাণের ধর্ম্ম—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়া। যে নদী নিঃশেষে আপনাকে ঢেলে দিয়ে চলেছে, পাতায় পাতায় সে সবুজ হয়ে উঠ্‌ছে, ফুলে ফুলে সে সৌরভ হয়ে খেল্‌ছে, মেঘে মেঘে তার সুরটা জমাট হয়ে ভাসছে। এমন করে' সে আপনাকে নিঃশেষ করে' দিয়ে গিয়েছে কিন্তু তার চলা ত ফুরায়নি। সে কেবল তার গভীর চলা গোপনে রেখে চলেছে, সে জগতের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে চলেছে, সে তার পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে দিয়ে চলেছে, কিন্তু তবু তার গতি হারায়নি। নদী শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তবু

নদী ত রয়েছে। সেই নদীই ত রয়েছে, যে তার পাষাণকারা ভেদ করে' বেরিয়ে এসেছিল হাজার হাজার বৎসর আগে, প্রাণের সাড়া পেয়ে ছুটে চলেছিল দুকূল প্লাবিত করে' দুধারের দেশ জাগিয়ে, নিজের আনন্দের মধ্যে সমস্ত বিশ্বকে বরণ করে'।

প্রাণ আমাদের মধ্যে রয়েছে, তবু তাকে বার বার খুঁজে নিতে হবে। এই ত প্রাণের সর্দ্দারি করা। তাকে কাজের মধ্যে খুঁজতে হবে, বিপদের মধ্যে খুঁজতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে খুঁজতে হবে। প্রাণ চায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জেগে উঠতে। সে-ই বার-বার প্রথম। এই আরম্ভের সুরই তার সুর। সে-ই বার বার বিদায় নিয়ে যায় মিলনের আনন্দে জাগবার জন্য। যে বুড়ো মানুষকে চিরদিন ক্ষেপিয়ে বেড়ায় সে এই চিরনবীন প্রাণ। সে আমাদেরই আড়াল করে' লুকিয়ে থাকে, চলার মাঝে ধরা দেয়। আমরা তাকে পাব কি,—সে-ই আমাদের পেয়ে বসেছে।

সেইজন্যই প্রাচীন হবার যো নেই। ভিতরের দৃষ্টি যখন একবার জাগে, তখন আর পথ-হারাবার ভয় থাকে না। দিনের আলোকে পথ দেখাবার জন্য প্রদীপের আলোর দরকার করে না। আমরা যদি একবার সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারি জীবনই আমাদের সর্দ্দার, যদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখের বাণী শুনতে পারি, তবে তার সমস্ত শক্তি,—যার অনবরত লীলা চল্‌ছে সবুজ পাতার মেলায়, তারার আলোর খেলায়, সাগরের জলের উচ্ছ্বাসে, সেই সমস্ত বিশ্বশক্তি আমার মধ্যে জেগে উঠবে। এ বড় আশ্চর্য্য যে এত-বড় জগৎ সে কেবল আমারই চাওয়ার অপেক্ষা করছে। সেই জন্যই ভয় নেই। ভয় কেবল নিজের মধ্যে। পাতাটি যদি মনে করে সে একা সে-ই কেবল শুকিয়ে আসছে, তারই জীবন ফুরিয়ে আসছে, তার বোঁটাটি খসে আসছে, তাহলে সে মরে। সে-ই মরে কেননা মরণের ভয় তারই। তার চারি ধারে যে শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে আসে, সে তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের শক্তিকে বড় মনে করেছে। কিন্তু তার ভাণ্ডার অল্প, পুঁজি ছোট—সেইজন্য সে ভয়েই মরে।

কিন্তু এ জগতে হারিয়ে যাবার ভয় নেই—প্রাচীন হবার অবসর নেই। প্রত্যেক পাতাটি বিশ্বরাজের ছাপ নিয়ে আসে, সে হারায় না। জগতের আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ দিন এসেছে তাদের প্রত্যেকটিতে পরমেশ্বরের শিলমোহর অঙ্কিত ছিল,—কেউ হারায়নি। কিন্তু সে একই ফিরছে। সেই একই পাতা বারে বারে সবুজ হয়ে উঠছে, সেই একই দিন বারে বারে প্রভাত হয়ে ফিরছে, সেই একই ফুল বারে বারে রঙিন হয়ে ফুটছে। প্রাচীন জ্ঞান, প্রাচীন সত্য এমনি করে নবীন হয়ে উঠেছে।

এইজন্যই জীবনকে একটা রহস্য, একটা খেলা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কারণ জীবনের পাত্র ক্রমাগত শূন্য হচ্ছে আসছে নতুন করে' অমৃতে ভরে উঠ্‌বার জন্যে। শেষই বার-বার প্রথম হ

আসছে। মরণের আয়োজনেই জীবনের চেষ্টা। প্রাচীন হবার সব আয়োজনই রয়েছে। শ্বেত শ্মশ্রুরাজি শেষ-বয়সের পরিচয়-পত্র হয়েছে, শরীরটা ভগ্নশাখার মত মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে, মহাপারাবারের মহাগানের মধ্যে পৃথিবীর কোলাহল ডুবে গেছে। কিন্তু এমনি সময়েই কে পিছু ডাকে, তখন হিসাব ভুলের বিষম ফেরে পড়ে যেতে হয়। এই যে দুরন্ত প্রাণ, আমারই উৎসাহে টলমল করছে। এই যে নবযৌবন—আমারই চেষ্টা, আমারই উদ্যম, আমারই অধ্যবসায় নিয়ে জ্বলে উঠেছে। আমার প্রাণ যে এদের মধ্যেই সাড়া দিচ্ছে। এ কি?—আমিই কি যাব বলে' ফিরে এলুম না কি?

দৃষ্টি গভীর হলে এইটেই চোখে পড়ে। আকাশের একটা তারা যখন উঠে বলে—আমি আছি, তখন সে কথা হাজার হাজার তারার মুখে হাজারবার জ্বলে ওঠে। তখন তুমি আকাশেই তলিয়ে যাও, আর আঁধারেই মিলিয়ে যাও, আর অনন্তের মধ্যেই ছুটে বেরিয়ে যাও, তোমার কথাটাই থাকবে, চিরকাল তারার মুখে জ্বল্‌বে। জীবনের মধ্যে সব-চেয়ে প্রাচীন জিনিষ যৌবনের অনতিপূর্ব্ব-কাল। এই বয়সে যা হারায় তা আর ফিরে আসে না। তখন দৃষ্টি থাকে যেটার উপর সেটা কেবল বড় হচ্ছে, নিজেকে হারাচ্ছে। সে চলছে কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায়, দেহের উত্তেজনায়। ভয় বেশি, ভরসা কম, কারণ মন দুর্ব্বল। সেইজন্য নবযৌবন মৃত্যুকে এত ভয় করে এত আর কিছুতে নয়। সে তখনও নিজেকে কেবলি হারাচ্ছে। কালচক্রের যে দিকটা আঁধারের দিকে মাথা নীচু করেছে, সেই দিকটাই সে দেখতে পেয়েছে। যেদিক সোণার আলোর কিরীট পরে' জাগরণের শিখরে উঠে দাঁড়িয়েছে, সেদিকে তার দৃষ্টি জাগেনি। এই নবযৌবনকে মৃত্যুর ভয় থেকে বাঁচাতে গেলে তাকে সামনে অন্ধকারের দিকে, মৃত্যুর গহ্বরের দিকেই চালাতে হবে।

এইটেই হল প্রাণের সর্দ্দারিগিরি। যৌবনকে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। যে কাজে সব-চেয়ে ভয়, সব-চেয়ে বাধা, সেই কাজে তাকে নিযুক্ত করতে হবে। তার পায়ের তলায় পথ জেগে উঠবে, তার 'চরণ ঘায়ে পলে পলে মরণ মরবে।' কিন্তু মৃত্যুকে উপেক্ষা করলেই প্রাণ পাওয়া যায় না। প্রাণকে মৃত্যুর কোলে শিশুর মত জেগে উঠতে দেখবে যখন তখনই মৃত্যুর ভয় দূরে যাবে। যতক্ষণ বাহিরের দৃষ্টিই কেবল সজাগ থাকবে ততক্ষণ প্রাণকে সর্ব্বক্ষণ দেখা যাবে না। যখনই অবসাদ আসবে, ক্লান্তি আসবে, দিক যখন আঁধার করে' আসবে, পথ যখন খেয়াঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হবে, তখন সত্যসত্যই মনে হবে প্রাণ ফাঁকি দিল।

সেই আঁধারে মনের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। এই অনন্ত জগতের বিকাশ, যার মধ্যে ভয় নাই, বিচ্ছেদ নাই, মৃত্যু নাই, এই মনের প্রদীপকে তুলে ধরবে, আর এই নিখিল জীবনের অবিচ্ছিন্ন সুরটি তার মধ্যে আগুন হয়ে জ্বলবে।

তখন দেখা যাবে, যা-কিছু অন্ধকার

বলে মনে হ'ত, সে কেবল আলোর পথ হয়ে পড়েছিল। আজ সে পথ আলো-কে বুকে করে ধন্য হ'ল। যা প্রাণের ভয় হয়ে এসেছিল, তা আজ প্রাণের জয় গেয়ে চলে গেল। যাকে পিছনের দিক থেকে মৃত্যু বলে' মনে হয়েছিল, সে-ই সুন্দর হয়ে নিখিলের প্রাণ হয়ে আমাদের সর্দ্দার হয়ে ফিরে এল। যা ফুরিয়ে যায় তা একটা বড় পাওয়ার মধ্যে ফুরিয়ে যায়;—কাজ ফুরিয়ে যায় শান্তির মধ্যে, আশা ফুরিয়ে যায় বিশ্বাসের মধ্যে, দিনের আলো ফুরিয়ে যায় সন্ধ্যার সুষমার মধ্যে, নিশীথের গভীরতার মধ্যে, রজনীর সৃষ্টির মধ্যে।

এইজন্য শীতের বিদায়ের আয়োজন দেখলে হাসি পায়। সে তার জীর্ণ পাতার পুঁজি নিয়ে অতিপ্রাচীন গলিতনখদন্ত বৃদ্ধের মত চলেছে, তার ভাব দেখে যে হাসি পায়। সে যে নিতান্তই দুরন্ত প্রাণের খেলার সাথী। তার কি প্রাচীন হবার সময় আছে? তার ভিতরে ভিতরে যে নব-জীবনের চাঞ্চল্য হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে!

বিশ্ববিধাতা এ কথাটা অতি সহজ করে' বুঝিয়ে দিয়েছেন পিতামাতার জীবনের মধ্যে দিয়ে।

মৃত্যুর দিকটা সত্য হ'ত যদি আমি একা আমার মধ্যে বেঁচে থাকতুম। কিন্তু আমি যে সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে বেঁচে আছি। যদি আমার প্রাণটুকু আমারই হ'ত তবে বিশ্বের কোন্ আনন্দ আমার প্রাণে আসত? পাখীর গলার যে আনন্দ রোজ রোজ জেগে ওঠে, ফুলের যে আনন্দ সৌরভের মধ্যে ভরপুর হয়ে ওঠে, তাকে একবার আমার জীবনে আন্‌তে গে অনেক সাধনার দরকার হ'ত। যা পরে আনন্দ তাকে কি সহজে আমার মধ্যে পাওয়া যেত?

আমরা সুন্দর জিনিষ দেখে আন পাই। এ দেখা যদি কেবল চোখের দে হ'ত তা হলে সে শুধু দর্পণের ছায়ার ম মিলিয়ে যেত, প্রাণে দাগ পড়ত না কিন্তু সে শুধু দেখা নয়, সে পাওয়া। য সুন্দরকে দেখি তখন নিজেকে সুন্দর ক ফিরে পাই,—সুন্দর শরীরের মধ্যে, সুন্দ জীবনের মধ্যে, সুন্দর পৃথিবীর মধ্যে দেখার আনন্দ—সে কেবল বার-ব ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেকে বড় করে', মে মধ্যে নিজেকে সুন্দর করে' সুখের ম নিজেকে অমর করে' ফিরিয়ে পাওয় তা না হলে আনন্দ এত সহজ হ'ত না

এইজন্যই কবি জোর করে' বল পারেন, যে আমরা মরব না। আমরা দেখছি না যে এই প্রাচীনতম কাল নিজেকে অহরহ নবীন করে তুলছে প্রতে প্রভাতের মধ্যে? আমরা কি দেখছি যে এই প্রাচীন পৃথিবী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হচ্ছে নবকিশলয়ের মধ্যে, ফুলের বিকা মধ্যে, পাখীর কলকণ্ঠের মধ্যে। আ কি বুঝছি না যে আমাদের প্রাচীন প্রাচীন প্রাণ প্রাচীন শরীর প্রত্যেক মু জেগে উঠ্‌ছে কচি মুখের হাল্‌কা হা মধ্যে, তরল চোখের সরল চাহ মধ্যে, তরুণ জ্ঞানের নূতন বিকা মধ্যে।

চাঁদের হাসিটি যখন অমাবস্যার অন্ধক

ঘিরে পড়ে তখন আমরা তার অন্তর্দ্ধান থেকেই তার আবির্ভাবের আভাস পাই—সে ওয়ার সুর আর আসার সুর এক করে' দিয়ে যায়। প্রাচীনতা যখন মৃত্যুর অন্ধকারে ঘিরে পড়ে, তখন সেও যে একদিন চন্দ্রের মত কচি ঠোঁটখানি আকাশের হেলিয়ে দেবে না, তা কে বে?

সেইজন্য প্রাণের ভয় নেই, সে মরণকে না। সে মেঘের থেকে বৃষ্টি হয়ে বীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে ফুলের কে সৌরভ হয়ে দখিণ হাওয়ায় বেরিয়ে , সে আঁধার থেকে বেরিয়ে পড়ে' লোর মত ছড়িয়ে যায়। সে হারায় না। যেন নিত্য বলছে,—

আমরা মরব না,
আমরা অন্ধকারের বুকের আগুন
ঝড়ের কাছে হারব না।
দেখচো না কি তারায় তারায়,
আঁধার কেবল পথই হারায়,
আলোর রেখায় চল্‌ব মোরা
পথের হিসাব করব না।
দেখচো না কি ঝরা ফুলে,
ঘুমের বাতাস উঠছে দুলে,
গভীর ঘুমে জাগছে তারা,
আমরা কেন পারব না?
ফুরিয়ে গেলে হারিয়ে যাওয়া,
জাগবে কেবল ফিরিয়ে পাওয়া,
ফুরিয়ে গেলেও পথ যে বলে,
পা ছেড়ে তোর সরব না।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

বৈষয়িক সভ্যতা হইতে নৈতিক তাকে পৃথক করা আবশ্যক। নৈতিক তার বিভাগে, আমরা বিশেষ করিয়া , সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন দ্ধে আলোচনা করিব। উক্ত প্রত্যেক য় সম্বন্ধে, আমাদের দেখিতে হইবে ন্টা পুরাতন ভারত-সমাজের নিজস্ব কোন্‌টাই বা ইঙ্গ-ভারতীয় নূতন জের নিজস্ব।

ধর্ম্ম

সকল দেশের ন্যায় ভারতেও, মুখ্যরূপে র দ্বারাই অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য প্রতি-ষ্ঠানাদি অপেক্ষা, নূতন রীতিনীতিই ধর্ম্মকে বিশেষরূপে আক্রমণ করে; সমাজের ক্রম-বিকাশ ও বৈদেশিক প্রভাবের দ্বারা এই নূতন রীতি-নীতির সৃষ্টি হয়। তাই ভারতের সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা, রূপান্তরীকরণ ও যুঝাযুঝি পরিলক্ষিত হয়।

*
* *

প্রথমে শাসন-বিভাগের কার্য্যপ্রণালী। তত্ত্বতঃ ইংরাজ-শাসিত রাষ্ট্র, সকল-ধর্ম্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ

দুই প্রকারে উহাদের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এক পক্ষে,—নর-বলি, সতীদাহ, ইন্দ্রিয়-লালসামূলক বীভৎস পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি কতকগুলি নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিজনক অনুষ্ঠান রহিত করিতে হইয়াছে; পক্ষান্তরে কোম্পানী, প্রাচীন রাজবংশাবলীর অধিকার ও অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের ভার নিজ হস্তে লইয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; মঠের, হিন্দুদেবালয়ের, মুসলমান মস্‌জিদের ধনসম্পত্তিসংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহ ও রক্ষণভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশীয় লোকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, ১৮৬৩ অব্দের আইন, গভর্ণমেণ্টকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। যে কাজ গভর্ণমেণ্ট করিতে ছিলেন, সেই কাজের ভার—নির্ব্বাচিত, মনোনীত, বা বংশক্রমাগত ট্রষ্টীদিগের উপর অর্পিত হয়। তাহাড়া ঐ আইনের বলে ভক্তেরা বা উপাসকেরা ট্রষ্টিদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। এই বিষয়ে ভারতীয় আইন, ইংরাজি আইন হইতে খুবই কম তফাৎ। রাষ্ট্র ও ধর্ম্মসমাজের মধ্যে এই পার্থক্যটা অধুনা ভারতে যত কঠোরভাবে রক্ষিত হয় এমন আর কোথাও নহে।

১

প্রথমে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক, কেননা সমস্ত লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা তিনভাগের দুই ভাগ।

আমাদের আলোচনার নির্দ্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিবার জন্য, আমরা প্রথমে যে সকল মত ও অনুষ্ঠান নিছক্ হিন্দু তাহারই প্রাধান্য দিব; তাহার পর আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের উপর য়ুরোপ কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এবং বর্ণভেদ ও গোষ্ঠী সম্বন্ধীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের আদিষ্ট সামাজিক কর্ত্তব্য সকলের ব্যাখ্যা করিবারও সুবিধা হইবে। হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত মতবিশ্বাস, সমস্ত জীবনীশক্তি, সমস্ত সৌন্দর্য্য, হিন্দু সম্প্রদায়গুলির ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যায়; অতএব এই ইতিহাস আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ইতিহাসের অন্তর্ভূত সামাজিক অংশটাই একটা সভ্যতাবিধায়িনী শক্তি। লোক-ধর্ম্মের হিসাবে দেখিতে গেলে, আমাদের মনে হয়, হিন্দুধর্ম্ম শোচনীয় অবনতির অবস্থায় আসিয়াছে। অবশ্য উহার মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন মতামতের স্মৃতি ও ইস্‌লাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু উহা উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই অবনতির প্রধান কারণ—অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদিগের অবজ্ঞা। অন্যান্য ধর্ম্মে, আচার্য্য ও ভক্তের মধ্যে একটা ধারাবাহিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে ধর্ম্ম মতগুলি কলুষিত না হয়, যাহাতে অনুষ্ঠানগুলি পৌত্তলিকতায় পরিণত না হয় তৎপ্রতি আচার্য্যদিগের দৃষ্টি থাকে; লোক-দিগের শ্রদ্ধাভক্তি, জলন্ত উৎসাহ,—স্বকীয় জীবনে ধর্ম্মের বিশ্বাসগুলি ও পূজা অনুষ্ঠানা-

দায় রাখে। ভক্তবিরহিত পুরোহিতেরা পূজা-অনুষ্ঠানকে বাঁধা নিয়মে পরিণত করে, ধর্ম্মমতগুলিকে পাণ্ডিত্যসুলভ কতক-গুলি সূত্রে পরিণত করে। কিন্তু নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণেরা, অর্থ-শোষণের অভিপ্রায়ে ইতর-সাধারণের স্থূল পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ দেয়; আবার কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণেরা ইতর-সাধারণকেও অবজ্ঞা করে, নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ-দিগকেও অবজ্ঞা করে। তাই, উহারা কেবল সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার করিতেই ভালবাসে। ইহাদের লিখিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষ্যে, উহারা কেবল অক্ষর ধরিয়াই তর্ক-বিতর্ক করে, আসল মর্ম্মভাবটি উহারা ধরিতে পারে না। যাহারা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা ধর্ম্মালোচনা হইতে পরাঙ্মুখ; রাজকর্ম্মচারী, বণিক, উদার-ব্যবসায়াবলম্বী, সমস্ত ব্রাহ্মণেতর শিক্ষিত লোক—ইহারা, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-শিক্ষার যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে কোন লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে উহারা এই বলিয়া অভিযোগ করিত যে, ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ভাষাকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে; অধুনা ইংরাজি শিক্ষা ইহাদের বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। প্রতি বৎসরেই সংস্কৃত কালেজের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

একজন স্বদেশী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—য়ুরোপীয় ও মার্কিনেরা, আমাদের ধর্ম্মের আলোচনায় এতটা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, আর আমরা কিনা উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করি,—যেন আমাদের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্কই নাই। স্বধর্ম্মের উন্নত ভাবসমূহের প্রতি এই যে উদাসীনতা, ইহাই হিন্দুজাতির অধঃপাতের মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই। যদি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত বৈদেশিকেরা বিচার করিয়া বলেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মের এই সমস্ত মতগুলি শ্রদ্ধার যোগ্য, গ্রহণের যোগ্য, তাহা হইলে স্বয়ং হিন্দুদিগের কি চোখ্ খুলিবে না, তাহারা কি সংস্কৃত শিখিবে না?—কেননা, যে রত্ন-ভাণ্ডারে হিন্দুধর্ম্মরূপ মহারত্ন বদ্ধ আছে, সংস্কৃতরূপ চাবি ভিন্ন সে রত্ন-ভাণ্ডারের দ্বার কখনই উদ্‌ঘাটিত হইবে না।

তাপস ও মঠবাসী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ। ১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারীতে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ৫২৫০০০০ ধরা হইয়াছে; যোগীদের মধ্যে কতকগুলি লোক একটা মহৎ লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলে, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, যে-সকল তপশ্চর্য্যা শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, মনকে পশুত্বে পরিণত করে, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত শক্তিক্ষয় হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হয় ভণ্ড, নয় অলস; তাহারা ভক্তদিগের অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মঠধারী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কেহবা ধার্ম্মিক ও কৃতবিদ্য, কেহবা অলস ও কুসংস্কারাপন্ন। কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতকগুলি সন্ন্যাসী, দানধর্ম্মের উপদেশ পালন করিয়া থাকে। সমষ্টিভাবে ধরিলে, হিন্দুধর্ম্ম ভয়ের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম নহে।

জনসাধারণের অনেকগুলি প্রথা ও বিশ্বাস কবিত্বময় ও হৃদয়স্পর্শী; উহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ভগবৎ-ভক্তি, এবং একমাত্র চিত্তশুদ্ধিকর যে ভগবৎ-প্রসাদ সেই

ভগবৎ-প্রসাদে বিশ্বাস; সাধারণ লোকের ধর্ম্ম কোন সভ্য দেশের ধর্ম্ম অপেক্ষা কম স্থূল নহে। গাছ-পাথর-পূজার সহিত হিন্দুধর্ম্ম, সকল প্রকার কুসংস্কারকে, অবনতিগ্রস্ত সমাজের সমস্ত রুগ্ন বিকৃত অনুষ্ঠানকে সংযোজিত করিয়া দিয়াছে।

তত্ত্বতঃ তাহাই হিন্দুধর্ম্মের মতবিশ্বাস যাহা রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদি শিক্ষা দেয়; কিন্তু সর্ব্বত্রই উহা স্থানীয় কাল্পনিক কথার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামের, নগরের, প্রত্যেক অঞ্চলের, প্রত্যেক বর্ণের নিজস্ব পৃথক দেবতা আছে। এবং সে-সব দেবতা কিরূপ দেবতা! পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরের দেবতা-গুলা কাষ্ঠনির্ম্মিত অতীব স্থূল ধরণের কদাকার পুত্তলিকা।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত অবস্থা বুঝিতে হইলে, স্মরণ করা আবশ্যক—কুৎসিৎ প্রমোদ-উৎসবময় পূজা-পদ্ধতির এখনো কত সহস্র গুপ্ত ভক্তবৃন্দ, এখনো দেবালয় সকল কত অশ্লীল চিত্রে সমাচ্ছন্ন। এখনো যাদু-বিদ্যার খুব সম্মান; মন্ত্রশক্তিতে লোকের খুব বিশ্বাস। ব্রাহ্মণেরা যে-সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছে তাহা মলদূষিত ও মূঢ়। পাপীরা গোমূত্র পান করে, সকল হিন্দুরাই গোবরের ছাই গায়ে মাখে। (১) কোন রাজা বা ধনশালী লোক যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে তবে তাঁহাকে সোনা বা রূপা গলাইয়া একটা গরুর মূর্ত্তি গড়াইতে হয়। সেই মূর্ত্তির মধ্যে তাহাকে বদ্ধ করা হয় এবং এমন-করিয়া তাহার মধ্য হইতে বাহির হইতে হয় যে লোকে বলিতে পারে তাঁহার পুনর্জন্ম হইল। ১২ বৎসর যাবৎ একটি প্রভাবশালী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—যাহার কাজ গোমাংস-আহার রহিত করা। এই সম্বন্ধে মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করায়, মধ্যে মধ্যে গুরুতর গোলযোগ উপস্থিত হয়। আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও, নর-বলি অজ্ঞাত নহে। ১৯০১ অব্দে, মাদ্রাজ প্রদেশের এক ব্যক্তি শিবলিঙ্গের সম্মুখে নিজ পুত্রের শিরশ্ছেদন করে। তখনই গেরেফ্‌তার হওয়ায়, সে বলিল,—শিব তাহার নিকট স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, তাহার পুত্রের মুণ্ড-বিনিময়ে তাহাকে প্রভূত ধন-ঐশ্বর্য্য দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং বলিয়াছিলেন ঐ মুণ্ড আর এক শিশুর স্কন্ধে বসাইয়া দিবেন লোকটার বিশ্বাস, পুলিশ ইহাতে অসময়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, দেবতা তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিতেন। বেনারসই ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী। যে সময়ে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় সেই শীতকালে বেনারসে গমন করিতে হয়।

মেঘশূন্য ঘোর নীল আকাশ। জ্বলন্ত কিরণ-বর্ষী সূর্য্য। বাতাস লঘু। অনুর্ব্বর ভূমি হইতে যে ধূলি-জাল সমুত্থিত হয় তাহা সূর্য্যকিরণে কনকরঞ্জিত হইয়া উঠে। বিশাল গঙ্গা, জলের রং হল্‌দে, ভাটা পড়িয়াছে, বালুতট দেখা যাইতেছে, তথায় শব-দেহ-গুলা শিকারী পাখীতে সমাচ্ছন্ন। কেবল

(১) অজ্ঞ বৈদেশিকদিগের অতিরঞ্জিত বর্ণনা আমাদের হাস্যোদ্রেক করে মাত্র।—অনুবাদক

মৃত-স্পর্শ জীবদিগকেই গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়:—যথা, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, যোগী, গরু ও বানর। কখন কখন ব্রাহ্মণেরা এই তীরটে মরিবার জন্য শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এখানে তীর্থযাত্রা করে।

দক্ষিণ তটভূমি—হল্‌দে বালুর কাছাড়; যাহার তলদেশে নগ্ন বালকেরা গরুকে জল পান করাইতে আইসে। কালো শাড়ীর অঞ্চলে শিশুসন্তানকে বাঁধিয়া রমণীরা স্থির-ভাবে সোজা হইয়া, ধীরে ধীরে নদীর অভিমুখে গমন করে। মাথার উপর সৌর-করোজ্জ্বল তাম্রঘটসমূহ পিরামিডের মত স্থিত হইয়াছে।

উত্তর দিকে সহর; প্রকাণ্ড নিম্নভিত্তি-ভূমি সমূহ;—ভূমির মাথা জলে ঢাকা—একটা দুর্গপ্রাকারের মত দেখা যায়। প্রাচীরের মধ্যে, কেল্লার দৃঢ়বদ্ধ দ্বারের ন্যায় ঘাট-সমূহ; ঘাটের সোপানাবলী গঙ্গায় নিমজ্জিত।

কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভিত্তি-ইমারৎ, যাহার ধারে ধারে বুরুজ-স্তম্ভ, অসংখ্য বাতায়ন-সমন্বিত প্রাসাদ, অলিন্দ, যাহার উপর হইতে চতুষ্ক সকল সমুত্থিত। কোথাও তৃণশূন্য কাছাড়-ভূমি, তাহার উপর চিতা সজ্জিত;—এইখানে শবদাহ হয়। উপরে ঔরংজেবের মস্‌জিদ, তাহার গোলাকার গম্বুজ, তাহার মিনার-স্তম্ভগুলা বিস্তৃত-মুখ। তাহার আরো উজান্ দিকে যেখানে তটের গায়ে একটা 'কোল' গড়িয়া উঠিয়াছে সেই স্থানে, যেখানে তরু-মুকুট-শোভিত ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া আছে, সেইখানে সারিবদ্ধভাবে কতকগুলি দেবালয় অবস্থিত। পুরাতন হিন্দু গঠন-রীতি, ক্ষুদ্রাকৃতি। আসীরিয় ধরণের ভিত্তিভূমির উপর, পুরাতন পারসীক রীতি-অনুযায়ী গঠিত দ্বার-প্রকোষ্ঠের উপর (থামগুলা অসমান ঢাকের মত ও থামের মাথাগুলা বহিঃ-প্রসারিত) ধুচ্‌নী-টুপি আকারের ছোট ছোট পাথরের গম্বুজ—তাহার গায়ের উপর ঘেঁসাঘেঁসি আরও ১০।১২টা ছোট ছোট গম্বুজ; ঠিক যেন স্ফোটনোন্মুখ শতদল।

এই অসংখ্য গম্বুজগুলি (কোন কোন স্থানে ফাট-ধরা) ভূমির দিকে ঝুঁকিয়া আছে;—তাহার চাপে মাটি যেন পদ-দলিত। এই সকল দেবালয়ের পশ্চাদ্-ভাগে আরো অন্যান্য দেবালয় যেখানে বানর, ময়ূর, গরু পূজিত হইয়া থাকে, এবং সহর, যাহার রাস্তাগুলা অতি সংকীর্ণ। এই সকল রাস্তায় শিবের ষাঁড়গুলা রৌদ্র-তপ্ত জনতাকে ভূ-পাতিত করিয়া বিচরণ করে।

সমস্ত কাছাড়-ভূমি ও ঘাটের ধারে বড় বড় চ্যাপ্‌টা ছাতা বা আতপত্র বরাবর পোঁতা রহিয়াছে। এই সকল ছাতার তলে, সকল রকমের দোকান্‌দার। উহারা কাপড়, পান, আহার্য্যসামগ্রী, ছাই-ভরা থলে, ফুলের মালা, ও পুত্তল বিক্রয় করিতেছে। আর ঐ দেখ কতকগুলি তীর্থযাত্রী ঘাটের প্রকোষ্ঠে সমবেত হইয়াছে; বৃহৎ সোপান দিয়া নীচে নামিতেছে: লোকদের মাথায় টুপি কিংবা লাল পাগ্‌ড়ী, পরণে সাদা ধুতি; স্ত্রীলোকদের সাদা কিংবা লাল শাড়ী; উচ্চবর্ণের রমণীরা অবগুণ্ঠিতা; শিশুরা নগ্ন। কপালে শিবের

ত্রিশূল-রেখা কিংবা বিষ্ণুর রেখা-চিহ্ন অঙ্কিত। গঙ্গার উপর কতকটা স্থান ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু, বরাবর তটভূমির ধারে-ধারে এত লোকের ভিড় যে, জল উহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তীর্থযাত্রীরা নদীতে ডুব দেয়, উহার কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জল শুষিয়া শুষিয়া দীর্ঘ-টানে পান করে। এই জলের উপর মানুষ ও পশুদিগের শব ভাসিয়া বেড়ায়; তটভূমির উপরিস্থিত দগ্ধ চিতার ভস্মরাশি এই জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

তথাপি জ্বলন্ত সূর্য্যের কিরণ গঙ্গার উপর, প্রাচীরের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন সমস্তকে অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছে; অট্টালিকার পাঁচরঙ্গা মুখ-ভাগগুলি, আতপত্র, পাগড়ী, বিচিত্ররঙ্গের পরিচ্ছদ, পতাকা, হল্‌দে মাটী, ধূসরবর্ণ বা রক্তবর্ণ সূচাগ্র-শিখর গম্বুজগুলা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

এই প্রথম চিত্রে আমরা দেখিতে পাই—বহিঃপ্রভাব-নিরপেক্ষ লোক-প্রচলিত ধর্ম্মের অবনতিশীল ক্রমবিকাশ; ইহার প্রতিযোগী আর এক ক্রমবিকাশ আমরা দেখিতে পাই—সেটি ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের উন্নতিশীল ক্রমবিকাশ; এই ক্রমবিকাশের উপর মুসলমানধর্ম্মের, খৃষ্টধর্ম্মের ও য়ুরোপীয় দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অবনতিগ্রস্ত শৈবধর্ম্মের মধ্য হইতে কোন ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব আর দেখা যায় না; কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বরাবরই স্বীয় সুনম্যতা ও জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে (২)।

ইহার রূপান্তরীকরণে ক্রমোন্নতির দুইটি সমান্তরাল ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি—যাহাতে মুসলমানধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণ কম এবং যাহার স্থূল রেখাগুলি খাঁটি হিন্দুই রহিয়া গিয়াছে। একটি নাম বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবার যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভভাগে স্বামী নারায়ণের আবির্ভাব (১৭৮০-১৮২৯) আহমদাবাদে এখনও স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের লোক, গণনায় দুই লক্ষ হইবে। স্বামী নারায়ণ বহু-দেববাদ স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার মতে সকল দেবতাই এক কৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। যোগরহস্যের বদলে তিনি আচরণগত ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দিয়া থাকেন

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীতে নিম্নলিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলি ছিল যথা :—১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে চরণদাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "চরণদাসী" সম্প্রদায় (রাধাকৃষ্ণের পূজা অর্চ্চনা);—আউলে চাঁদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "কর্ত্তাভজা" (১৯ শতাব্দী);—(এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া আরাধনা করে; ইহার মধ্যে সকল বর্ণের লোক, সকল ধর্ম্মের লোক আসিতে পারে)।—রূপরাম কবিরাজ-প্রতিষ্ঠিত "স্পষ্টদায়ক" সম্প্রদায়। "বাউল"—"নয়ারা"—"সহজী"—"সখিভাবক"—"হরিবোলা"; (এই সাতটি সম্প্রদায় কেবল বঙ্গদেশেই দেখা যায়) :—১৮৫০ অব্দে, "দর্ব্বেশ-ফকির" এই মুসলমানী নামে এক যাগী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়—"পণ্টদাসী"—"অপাপন্থী"—"খুসি-বিশ্বাসী"—"বলরামী"—"সৎনামী"—"সাহেব ধনী"—"দেবসমাজ"—(ইহা একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়)—"কুদাপন্থী"—"কুক"।—(Hindu Civilization —Bose)

কৃষ্ণ শুধু বিশুদ্ধ জীবনের পূজা চাহেন; এবং সদনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম্মনিষ্ঠা নিষ্ফল। স্বামী নারায়ণ,—জীব-হিংসা, মদ্যপান, এবং আত্মহত্যা (ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে করিলেও) নিষেধ করিয়াছেন। এবং কঠোররূপে নিষিদ্ধ :—ব্যভিচার, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঈশ্বরাবমাননা, মিথ্যাকথা বলা, বিশ্বাস-ঘাতকতা। স্বামীনারায়ণের ধর্ম্মশাস্ত্র "শিক্ষা-পত্রী"তে এই শ্লোকগুলি আছে, যথা :—

"কৃষ্ণের নাম আবৃত্তি করিবার জন্য আমার শিষ্যেরা প্রতিদিন দেবালয়ে গমন করিবেন।

তাঁহার জীবনের ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে হইবে, এবং উৎসবের দিনে তাঁহার সম্মানার্থ স্তুতিগান করিতে হইবে।

কৃষ্ণের মন্দিরে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথকভাবে থাকিবেন, কখনই পরস্পরকে স্পর্শ করিবেন না।

এই পাঁচ দেবতাকে আরাধনা করিতে হইবে, যথা :—বিষ্ণু, শিব, গণেশ, পার্ব্বতী ও সূর্য্য।

যে অন্তর্যামী প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মাকে পরিচালিত করেন তাঁহাকেই স্বপ্রকাশ পরমপুরুষ বলিয়া জানিবে; তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের জন্য দণ্ডপুরস্কার বিধান করেন।

ধ্যান-ধারণার দ্বারা যখন বুঝিতে পারিবে যে আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র, জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ, তখন প্রত্যেক মনুষ্যই কৃষ্ণকে পরমাত্মারূপে আরাধনা করিবে।

আমার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে যাহারা আমার উপদেশ পালন করিবে, তাহারা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফললাভ করিবে।

পরমহংস রাম-কৃষ্ণের মতবাদ (১৮৩৩-৮৬)। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবশালী শেষ-সংস্কারকদিগের মধ্যে রামকৃষ্ণ অন্যতম। রাম-কৃষ্ণ সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। যোগানন্দে আত্মহারা হইয়া, তিনি দেবতার দর্শনলাভ করিতেন; কালী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন,—নিষ্ঠুর দেবতারূপে নহে, পরন্তু দয়াময়ী ও স্নেহময়ী মাতৃরূপে। পাণ্ডুবর্ণ, শীর্ণকায়, কষ্টের সহিত চলিতে চলিতে, তাঁহার বাগ্মিতার দ্বারা তিনি জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতেন।

তাঁহার রচনাবলী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

যে হোমাপাখী কাহিনী-কথায় সুপরিচিত, সেই হোমাপাখী আকাশের খুব উচ্চস্থানে বাস করিত, অহঙ্কারে পৃথিবীর মাটিতে কখন তাহার পা পড়িত না। যখন সে আকাশে ঝুলিতেছিল, তাহার ডিম্‌গুলি ভারের আকর্ষণে সূর্য্যমণ্ডলের দিকে আকৃষ্ট হইল; কিন্তু পতনের সময় ডিম্‌গুলা ফুটিয়া উঠিল; বাচ্চাগুলা তখনি খাড়া হইয়া আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল। এইরূপ সিদ্ধপুরুষেরাও তাঁহাদের শৈশব হইতেই এই সংসারের সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান ও দিব্যজ্যোতির উচ্চপ্রদেশে সবেগে উত্থান করেন।

জনতাপূর্ণ একটা রাস্তা দিয়া যাইবার সময় একজন সাধক রুষ্টপ্রকৃতির এক ব্যক্তিকে দৈবক্রমে পদাঘাত করায় সে তাঁহাকে এত প্রহার করিল যে তিনি

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, বহুকষ্টে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল: এবং তাহারা তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল:—"গুরুদেব, যে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে তাহাকে আপনি কি চিনিতে পারিতেছেন?" মুনি উত্তর করিলেন:—"হাঁ যে আমাকে প্রহার করিয়াছে।" প্রকৃত সাধকের নিকট, শত্রুমিত্রে কোন পার্থক্য নাই।

শিশুরা কেবল নিজের ঘরেই পুতুল লইয়া খেলা করে। কিন্তু তাহাদের মা তাহাদের পুতুলগুলা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার নিকট দৌড়িয়া আসেন। "মা, মা" এইরূপ তোমরাও যখন ধনমান যশরূপ পুতুল লইয়া সংসারে নিমগ্ন থাক, তখন জগজ্জননী এই সকল পুতুল-খেলায় বিরক্ত হইয়া নিজে তোমাদের নিকট দৌড়িয়া আসেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মণি-প্রদীপ

এই বসন্তকালে একটি বেদনা আমার বুকের মধ্যে অনবরত বাজতে থাকে। পৃথিবীতে এই বসন্ত বারবার আসে, যায় কিন্তু আমার জীবনে একটিবার মাত্র বসন্ত এসেছিল। কোথায় গেল আমার সেই প্রাণের নবীনতা, কোথায় গেল সেই হৃদয়ের গুঞ্জন গান, কোথায় গেল এই বসন্তের মত্ত হাওয়ার মতো আমার মাতলামি! রঙের সেই নেশা, সুরের সেই তন্দ্রা, গন্ধের সেই আকুলতা কেমন করে মরে গেল!

জীবনে সেই একটিবার মাত্র বসন্ত এসেছিল। সে তার কাজ-চুকিয়ে চলে গেছে—তার শেষ-কথাটি আমার কানে কানে গুঞ্জন করে বিদায় নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি কি তাকে বিদায় দিতে পেরেছি? জানি সে আর ফিরবেনা, আশা তার আর রাখিনে, তবু তো তাকে ভুলতে পারচিনে!

আমি তো চিরকেলে একটা নীরস মানুষ—কল্পনার দোলায় দোল খাওয়া তো কখনো আমার স্বভাব নয়—এ ত সবাই জানে! তবে আমার এ কি হল! কেমন করে আমার সমস্তটা এমন ওলট-পালট হয়ে গেল!—কিসে আমায় এমন-তর নূতন করে তুল্লে! আমি যা-নয় শেষে তাই হয়ে গেলুম!

যারা কাব্য নিয়ে থাকে চিরদিন আমি তাদের ঠাট্টা করে এসেছি। কল্পনায় যারা রাজপ্রসাদ নির্ম্মাণ করে বাস করে তাদের দিকে আমি চিরকাল কৃপার চক্ষে চেয়ে এসেছি। গানের যে কোনো মূল্য আছে—এ আমার কোনো দিন বিশ্বাস ছিল না;—কানের তৃপ্তির চেয়ে উদরের তৃপ্তির জন্য সমস্ত বিশ্বমানব আর্ত্তনাদ করচে এ তো প্রত্যক্ষ চোখে দেখচি।—তাকেই আমি বড় করে দেখেচি। সেই-আমার এ কি হ'ল? আমার মনে হচ্চে, আমার এই

...ণের কান্না গান গেয়ে না বলতে পেরে ...মার বুক ফেটে যাচ্ছে। কপালে কি ...ছে জানি না—শেষ-বয়সে হয়ত কবিতা ...খতেই বসে যাবো!

...ছেলেবেলায় যখন কলেজে কবিতা ...ড়ছি তখন জানতুম এই কবিতার অর্থ ...হ্ন করে পাশ করবার জন্যই কবিতার ...ষ্টি। কেন যে এত লোক কবিতা ...খছে সে কথা তখন মনেই হতনা। ...ান্ কবিতাকে কোন্ সমালোচক শ্রেষ্ঠ ...লচে সেইটে স্মরণ রাখাই হচ্ছে দরকার ...আমার কাছে কি ভালো লাগে ...র পরীক্ষা তো কোনো দিন করিনি। ...ন্তু আজ সেই ছেলেবেলার মুখস্থ কবিতার ...য়কটা লাইন কেবলই মনের মধ্যে গুঞ্জন ...রছে। মনে হচ্ছে, সে কোনো কবির লেখা ...বিতা নয়—আমারই মনের কান্না। আজ ...র মনে হচ্ছে একটু-একটু বুঝতে পারচি ...বিরা কেন মাথা-ঘামিয়ে এই সব ...খছিল, এ সব তাদের সৌখীনতা নয়, ...তাদেরও প্রাণের কান্না!

...কান্না! কান্না! এ কেমনতর কান্না! ...জীবনে অনেক কান্না তো কেঁদেছি। ...লবেলায় একবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না ...রে কেঁদেছিলুম, মনে হয়েছিল তার চেয়ে বড় ...ন্না বুঝি পৃথিবীতে নেই—তারপর সংসারের ...নক বিপদে, বিচ্ছেদে জ্বালাযন্ত্রণায় ...নক কান্না কেঁদেছি—কিন্তু এ কী কান্না! ...কান্নার যে শেষ নেই। এ কান্নার ...ষ্টি যে কান্নাতেই। না কাঁদতে পারলে ...নাকে যে তৃপ্তি দিতে পারিচি না।

এই তো আমার আনন্দ—এই কান্নাই যে আমার আনন্দ! এক এক সময় ভাবি—এ আমার পাগলামি নয়তো! যা আমি অবহেলার সঙ্গে একদিন ফেলে দিয়েছি তারই জন্যে কাঁদচি? যা একদিন আমার কাছে তুচ্ছ ছিল তাই এখন এমন মহামূল্য হয়ে উঠল কি করে? এই মহামূল্যের তো দাম দিইনি, তাই কান্না দিয়ে বুঝি এখন সে ঋণ শোধ করচি?

সে যে আমার অত্যন্ত কাছে ছিল, তাই তো কোনো দিন তাকে ভালো করে দেখতে পাই নি। সে দোষ কি আমার? সে যদি হঠাৎ একদিন প্রভাতে এই বসন্তের নব-মল্লিকার মতো তার সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-আনন্দ নিয়ে আমার চোখের সামনে দক্ষিণে-বাতাসে ফুটে উঠত তাহলে নিশ্চয় তার দিকে চেয়ে আমি অবাক হয়ে যেতুম—চোখ আমার ফিরত না। সেই হঠাতের ধাক্কায় সেই একটুখানির মধ্যে তার সবটুকু আমার হৃদয় দেখতে পেত। কিন্তু তা তো হয় নি—তাকে যে আমি রোজই দেখেছি—কোনো এক বিশেষ-মুহূর্ত্তে তো সে আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হয়নি। কবে কখন্ তাকে প্রথম দেখলুম তা মনেই পড়ে না—কোনো স্মরণচিহ্ন তো তার অঙ্কিত হয়ে যায় নি!

লতা! লতা—এই নামটি ছেলেবেলা থেকে কতবার কানের আশেপাশে ভেসে-ভেসে চলে গেছে—ওর কোনো ঝঙ্কার কোনো দিন একমুহূর্ত্তের জন্যেও কানে বাজেনি। কিন্তু আজ দেখি এ কি? ঐ একটি শব্দ যেন একটি সম্পূর্ণ গান!

ওর মধ্যে ছন্দ আছে, সুর আছে, তান-লয় সব আছে। ঐ একটি কথাতেই আমার হৃদয়ের সব গান যেন গাওয়া হয়ে যায়;—আমার সব কথা যেন বলা হয়ে যায়! আমি যতই বলি ততই যেন ওর সুর গভীর হয়ে আসে, ততই যেন নূতন-নূতন ছন্দে ওর ঝঙ্কার উঠতে থাকে।

কিন্তু ছাই কেন এ সব কথা বলচি?—সব কথা তো ঠিক-মতো করে বলবার ক্ষমতা আমার নেই—বলাও যে যায় না। লোকের সহানুভূতি আমি চাই? কি হবে আমার তাতে? কেউ হয়ত বলবে এ আমার প্রলাপ—তা বলুকগে!

আজ ইচ্ছে হচ্ছে লতার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখি—দিনের পর দিন ধরে ধরে তার সবটা—তার চলা বলা, খেলা ধূলা, হাসি কান্না—মনের উপর ছবির মতো এঁকে নিই। কিন্তু কই কিছুই যে মনে পড়চে না। কিছুই তো মনে করে রাখি নি। তার দিকে মন দিলুম কবে যে সে আমার মনে থাকবে? দিনরাত তাকে চোখে-চোখে দেখেছি—মনের কারবার তো তার সঙ্গে কোনো দিন করি নি। মন দিয়ে যে তাকে দেখা যেতে পারত এ কথা মনে উঠবার অবসরই যে পাই নি। ঠিক বলতে পারিনা—এখন মনে হচ্ছে, চোখের আড়াল হলে হয়ত যাকে দিন রাত দেখা অভ্যাস হয়ে গেছে তাকে মনে-মনে না দেখলে মন খুৎখুৎ করতো। কিন্তু সে যে কখনো চোখের আড়াল হোলো না—আমি করব কি?

তার সম্বন্ধে দুটো একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। একদিন সে আমার হাতের লেখার খাতায় একদোয়াত কালি উল্‌টে দিয়েছিল। তাতে আমি তাকে [illegible] মেরেছিলুম। তার সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না এখনও যেন শুনতে পাই হঠাৎ এক বার বাতাসের মধ্যে বেজে উঠল। পরে মেয়েকে মেরেছি বলে মায়ের কাছে আমার শাস্তি হল। মায়ের হাতের মা খেয়ে আমি যত কাঁদলুম সঙ্গে-সঙ্গে লতা তত কাঁদলে। আমার রাগ হল ভয়ানক লতার উপরে—কিন্তু প্রতিশোধ নেবার সাহস হল না—কারণ শাস্তির চিহ্ন তখনো আমার গা থেকে মিলোয়নি। আমি রেগে, পড়বার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইলুম—লতাকে কাছে আসতে দিলুম না। তার পর, অনেকক্ষণ পরে ক্ষিধের তাড়নায় যখন ঘরের দরজা খুললুম তখন দেখি চৌকাঠটিতে মাথা রেখে লতা ঘুমিয়ে পড়েছে—চোখের জলের দাগ তখনো তার গালের উপর আঁকা।

বাবার একটা দামী নতুন ঘড়ি একদিন নেড়ে-চেড়ে দেখতে-দেখতে আমার হাত থেকে হঠাৎ পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল; পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লতা; সে কেঁদেই ফেল্লে। ভাবনা হল আমার এ লতাকে নিয়ে। আমি যে ঘড়ি ভেঙেছি এর কোনো প্রমাণ নেই—এক লতা ছাড়া। এক-একবার মনে হচ্ছিল দোষটা লতার ঘাড়েই চাপিয়ে দিই; কিন্তু জেরায় টিঁকবে কি না সন্দেহ হতে লাগল। এমনি করে

[illegible]র ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে (বোধ হয় [illegible]র ঘাড়েও দিয়েছি) দুই-একবার ভারি [illegible]কছিলুম—শাস্তির পরিমাণ তাতে দ্বিগুণ [illegible]ছিল। সেই জন্যে লতাকে বল্লুম—"ভাই [illegible]া, লক্ষ্মীটি, কাউকে বলিস্ নি—বুঝলি?" [illegible]া সমস্ত-ঘাড়খানা নেড়ে বল্লে—"না"!

মনে মনে অনেক দিন ভয় ছিল—বুঝি [illegible]া কথাটা ফাঁশ করে দেবে। আমার [illegible]ল যে কী আতঙ্ক ছিল তা বলতে পারি [illegible]র। কিন্তু সেই আতঙ্কের পরিণামের হাত [illegible]কে লতা আমাকে বাঁচিয়ে যে কী নিশ্চিন্ত [illegible]রেছিল তা আমি কখনো ভুলতে পারব [illegible]। লতা কতকটা বাচাল ছিল বটে কিন্তু [illegible]কথা তার মুখ দিয়ে ইহজীবনে বার [illegible] নি।

আর-একটা কথা মনে পড়চে। কিন্তু [illegible]কথাটা কেন এখনও ভুলিনি তা ঠিক [illegible]তে পারচি না। এর মধ্যে কি এমন [illegible]ল যাতে এটা স্মরণীয় হয়ে থাকতে [illegible]রে?

লতা তখন ছেলেমানুষটি নয়—বেশ [illegible]কটু বড় হয়েছে। আমি তখন এণ্ট্রান্স [illegible]রীক্ষা দেবার জন্যে ব্যস্ত। পরীক্ষার দিন [illegible]নিয়ে এসেছে। আমি এক বসন্তের বৈকালে [illegible]াদের এক-কোণে নিরালায় বসে পড়া [illegible]ংস্থ করচি, লতা একছড়া মালা হাতে [illegible]রে এসে দাঁড়ালো। বল্লে "শিরিশ-দা, [illegible]তোমার জন্যে এইটে গেঁথেছি—নেবে? [illegible]ই মালা গাঁথায় একটু কায়দা আছে।" [illegible]বলে সে মালা-গাঁথার প্রকরণ সম্বন্ধে এক [illegible]জ্ঞতা সুরু করে দিলে। আমি ধমক [illegible]য়ে উঠলুম—"চোপ!" আমার কেমন রাগ হচ্ছিল—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকার উপর সেই রাগ। আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর আর-সবাই বেশ মনের ফুর্ত্তিতে আছে কেবলমাত্র আমিই এগ্‌জামিনের দায়ে পড়েছি। ছাদের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দুটো ছেলে মনের আনন্দে মার্ব্বেল খেলছে, রাস্তা দিয়ে একদল ছেলে হল্লা করতে-করতে চলেছে—মাথার উপর এক ঝাঁক পাখী মনের আনন্দে অবাধে উড়ে চলেছে! আর আমি যেন কেবল একটা গরাদে-দেওয়া খাঁচার ভিতর বসে তোতা পাখীর মতো বইয়ের বুলি আউড়ে যাচ্ছি;—আমার খেলবার যো নেই, আমার কোথাও ছুটে যাবার যো নেই। লতা যখন এসে ছাদে দাঁড়ালো তখন সঙ্গে করে খাচার বাইরেকার একটু হাওয়া যেন নিয়ে এল। তার সেই সমস্ত দেহখানার উপর কোথাও এতটুকু এগ্‌জামিনের ভাবনা নেই। তার সঙ্গেকার সেই একটুখানি হাওয়া, তার সেই মনের ফুর্ত্তির আলো পেয়ে আমার মনে হল বটে আমি যেন বাঁচলুম কিন্তু একটা হিংসে হতে লাগলো। আমিও তো এম্‌নি থাকতে পারতুম—কিন্তু তা হোলো না কেন? তাই রাগে আমি ধমক্ দিয়ে উঠলুম—"চোপ!"

লতা আস্তে আস্তে মালাগাছটি আমার কাছে রেখে চলে যেতে লাগল। আমি চীৎকার করে বলে উঠলুম—"লতা, নিয়ে যাও তোমার মালা।"

লতা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"কেন শিরিশ-দা, রাগ করচ ভাই! নাও না ওটা।"

আমি বল্লুম—"না, না, আমি নেব না। ফুলের গন্ধ নাকে লাগলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না।—এখন এগ্‌জামিনের পড়া!"

লতা কিছু বল্লে না, শুধু একটু হাসলে।

আমার রাগ তাতে আরো বেড়ে উঠল—আমি মালাগাছটা নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলুম।

মনে হ'ল লতার মনে একটু ব্যথা লেগেছে। তাতে আমি যেন একটু আনন্দ পেলুম। কেবল আমিই এ জগতে কষ্ট পাব;—আর কেউ পাবে না?

লতা ছেঁড়া-ফুলগুলোর দিকে খানিক ক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল, তার পর সেগুলো একটি একটি করে কুড়িয়ে আঁচল-ভরে নিয়ে গেল।

তারপর যখন পরীক্ষায় পাশ করলুম, বাড়িতে আনন্দ-কোলাহল পড়ে গেল তখন লতা বল্লে—"শিরিশ-দা, ইচ্ছে হচ্ছে আজ একটা ফুলের মুকুট গড়ে তোমার মাথায় পরিয়ে দি।"

কিন্তু সে তা দেয় নি।

লতার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ সেটা একটু পরিস্কার করে বলা দরকার। তাদের সঙ্গে আমাদের একটা খুব দূর-আত্মীয়তা আছে বটে কিন্তু সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আসল সম্পর্ক লতার মা আর আমার মা দুই সখী। আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতে লতারা থাকত—কিন্তু লতা সম্বন্ধে ঠিক করে বলা যায় না সে কোথায় থাকত; কারণ আমি তো দেখেচি সে আমার মায়ের কোলে-কোলেই বেড়ে উঠেছে। শুনতে পাই মায়ের কোল নিয়ে ছেলেবেলায় আমাদের দুজনের ভারি ঝগড়া হত। আমি সহজে কোলের দখল ছাড়তুম না। মা আমায় তাই বলতেন, ছেলেটা বড় স্বার্থপর। আমরা প্রায় সমবয়সী; বোধ হয় লতা বছর-দুয়েকের ছোটো হবে। একসঙ্গে আমরা বরাবরই খেলাধূলা করেছি। মায়ের আদর আমিও যেমন পেয়েছি লতাও তেমনি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, আমি বাপ-মায়ের সবে-ধন-নীলমণি!

যদিও আমার কাছে কথাটা গোপন রাখবার চেষ্টা করা হত তবুও আমি জানতুম, মা সখীর সঙ্গে পরামর্শ করে রেখেছেন লতা তাঁর বৌ হবে। আমি জানি, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী কেউ এলে মা লতাকে দেখিয়ে বলতেন—এই আমার বৌ হবে! লতার মাথায় স্নেহের সঙ্গে হাত-বুলোতে-বুলোতে বলতেন—দেখ দিকিন্ কেমন বৌ! কেমন টানাটানা চোখ, কেমন বাঁশীর মতো নাক—ইত্যাদি বলে তিনি লতার গালে চুমু খেতেন, তাকে কোলে নিয়ে বসতেন।

আমি জানতুম, লতা আমার স্ত্রী হবে কিন্তু জেনেও কথাটা তেমন করে কখনো তলিয়ে দেখিনি—বোধ হয় দেখবার ক্ষমতা আমার ছিল না। তখন কিই বা আমার বয়েস? আর কিই বা আমার জ্ঞান? লতাকে গোড়া থেকে যেমন করে দেখে আসছি বরাবর তেমনি করেই তাকে দেখতুম—তার যে অন্য রূপ থাকতে পারে এ আমার কল্পনায় কখনো আসেনি। বোধ হয় কল্পনা

জিনিষটা আমার ধাতে ছিল না। এখন ভেবে দেখচি লতাকে আমি মনে-মনে হিংসা করতুম। মা যে বলতেন আমি স্বার্থপর—কথাটা একেবারে মিছে নয়। আমার বেশ মনে পড়চে ছেলেবেলায় আমার পাণ-থেকে-চুণটুকু-খসবার জো ছিল না। আমি সব নেব—আমি সব পাব—এই ছিল আমার ছেলেবেলাকার বুলি! লতা যে মায়ের স্নেহ দখল করে নিয়েছিল এর জন্যে লতাকে বোধ হয় আমি কালো চোখ দিয়ে কখনো দেখতে পারি নি। কিন্তু এও আবার বলি, আমার বেশ মনে পড়চে, লতার একবার শক্ত অসুখ হতে সবাই যখন বলতে লাগলো বাঁচা লতা বুঝি বাঁচে না! তখন আমার সত্যি কান্না পেয়েছিল।

এক ধরণের মানুষ পৃথিবীতে আছে যারা একেবারে নীরস—কাঠের মতো নীরস—কাটখোট্টা। আমি অনেকটা সেই ধরণের মানুষ। কিন্তু আমার ভিতরে কোথাও বোধ হয় একটি রসের ক্ষীণধারা গোপন হয়ে ছিল নইলে কেমন করে কোথাকার একটা অজানা বাতাসের পরশে একমুহূর্ত্তে এমনতর পুষ্পভূষিত হয়ে উঠলুম!

ছেলেবেলা থেকে এ জগৎ-সংসারটার উপর আমার কি ধারণা ছিল? এ বড় শক্ত ঠাঁই! কেবল প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা মারামারি কাটাকাটি করে সাফল্যের স্থান যে কেড়ে নিতে পারে তারই জয় সেই সত্যকার বীর! এই যুদ্ধের জন্য আমি বরাবর তৈরি হয়েছি, এবং আমাকে তৈরি করা হয়েছে। এরই মন্ত্র আমার পড়া-মুখস্থর সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ফুঁকে দেওয়া হয়েছে—আমি ভক্তিভরে সেই মন্ত্র জপ করেছি। এই সংসারের গোপন বিজনতার ভিতর দিয়ে প্রেম স্নেহ ভালোবাসার যে পুণ্য মন্দাকিনী-স্রোত বহে চলেছে তাতে অবগাহন করে মানুষ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে—এ সত্য তো আমি জানতুম না বল্লেই হয়। জানতুম, সে শুধু কল্পনা—অলস কবির স্বপ্ন মাত্র। জানতুম, সে মায়াবী—তাই ভয়ে তার দিকে কখনো চাইতুম না। কিন্তু কি লাভ করেছি? বহু আস্ফালন করে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলুম—এই জীবন-সাগর মন্থন করে কি সুধা উঠল? একশত টাকার কেরাণিগিরি বই ত নয়!

যাক্ ও সব কথা!

আমি যেম্‌নি এণ্ট্রান্স পাশ করলুম, মা ধরে বস্‌লেন বিয়ে করতে হবে। তাঁর অত্যন্ত তাড়া। তাঁর তাড়ার কারণ এই যে, লতা বড় হয়ে উঠেছে।

আমি মাকে বল্লুম—"তা হবে না।"

মা বল্লেন—"কেন রে?"

আমি তখন সেই-বয়সেই বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছি। আমি বল্লুম—"আমায় এখন জীবনযুদ্ধে প্রস্তুত হতে হচ্ছে—আমার এখন স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি চাই—এ সময় আমার পিঠে গুরুভার চাপিয়ে যদি আমায় পঙ্গু করে দাও তাহ'লে চিরজীবন অকর্ম্মণ্য হয়ে কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করতে থাকব—ইত্যাদি।"

কথাগুলা ঠিক আমার রচনা নয়। তখন পড়া-মুখস্থ করে করে এমন অসাধারণ শক্তি জন্মে গিয়েছিল যে যা শুনতুম তাই মুখস্থ হয়ে যেত। কথাগুলি আমাদের এক প্রসিদ্ধ দেশনায়কের বক্তৃতার মুখে শুনেছিলুম এবং সেই বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে আমরা বিস্তর ছাত্র—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করব না—এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলুম। বাঙালীর একটা নিন্দা শুনতুম, বাঙালী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না। সেই জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল বাঙালীর এই কলঙ্ক মোচন আমি করব। সেই জন্যে মায়ের প্রস্তাবে জোরের সঙ্গে বলতে হল—"না!"

মা সব কথা বুঝলেন কি না জানি না; তবে তিনি এইটুকু বেশ বুঝলেন যে আমি বিয়ে করতে চাই না।

মা ভয়-খেয়ে গেলেন; বুঝলুম, তাঁর খুব ইচ্ছে কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি করতে তাঁর সাহস হচ্ছে না। আমার ন-মামাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিইয়ে ভারি একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে। মায়ের সেই ভয় আছে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

মায়ের অনেক দিনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে, তিনি আশা ছেড়েও ছাড়তে পারচেন না। একদিন তিনি এসে বল্লেন —"শিরিশ, তুই কি সত্যি বিয়ে করবি না?"

আমি বল্লুম—"কে বল্লে করব না। তবে এখন নয়। আগে টাকা রোজগার করি, তবে।"

মা বল্লেন—"আমি আশীর্ব্বাদ করচি তুই অনেক টাকা রোজগার করবি। বলিস তো বিয়ের ঠিক করি।"

আমি বল্লুম—"মা, তুমি ঠিক বুঝছ না!" বলেই আবার সেই জীবন-যুদ্ধের মুখস্থ বুলিটা আউড়ে গেলুম।

মা কথাটা বুঝলেন না বলেই তাঁর সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল।

সেই সময় দেখতুম, মা লতাকে কাছে কাছে রেখে কেবলই তার মুখে মাথায় হাত দিচ্ছেন। এক এক সময় তাঁর চোখে জল এসে পড়ত।

মা লতার মা-বাপকে আশ্বাস দিতে —আরো কিছু দিন রাখো—লতাকে আমি বৌ করবই। কিন্তু লতার বাপ-মা সাহস হল না। মেয়ে বড় হয়েছে বটে ইতিমধ্যেই নিন্দে উঠেছে। শেষে আরো বড় করলে হয় ত বিয়েই হবে না।

লতার বিয়ে হয়ে গেল।

পশ্চিমে চাকরী করে এমন-এক ছেলের সঙ্গে লতার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরই লতা যে-দিন শ্বশুরঘ করতে গেল আমি সে দিন বার্ষি পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত। লতা তার স্বামী সঙ্গে আমার পড়ার ঘরে ঘোমটা-মু আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল। তার একটি প্রণাম করে চলে গেল। আ বইয়ের উপর আবার দৃষ্টি ফেরালুম।

তার সেই বিদায়-বেলাকার মুখখা আমার দেখা হয়নি।

এখন ভাবছি সেই তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা-প খানার কথা। যে একটুকরা কা

টুকটুকি করে এক-ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়—সেই কাগজের টুকরা জগদ্দল পাথরের মতো আমার বুকে চেপে বসে রইল! আর ভাবচি বাঙালীর কলঙ্ক-মোচন! কলঙ্ক-মোচন তো করেছি—কিন্তু কারুর মনের এককোণেও কি সে কথা লেখা আছে? মহা আস্ফালন, মহা লম্ফ-ঝম্প করে তো জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলুম কিন্তু কী জয় করে ফিরেছি?—এই একশত টাকার রাজত্ব? আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা কাগজের মুকুট?

আর বেশি-কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। এতক্ষণ যা বলছিলুম তার সামনে লতা ছিল, সে এতক্ষণ আমার আশ-পাশের আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে আমাকে জড়িয়ে ছিল—আমি তারই উৎসাহে বলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু যেম্‌নি তার বিদায়-গান গেয়েছি, অমনি মনে হচ্ছে আমার সমস্ত যেন শূন্য হয়ে গেছে। সে বিদায় নিয়েছে। আমার মন যেন নিভে আসছে। কিছু বলতে পারচি না।

কিন্তু বলতেই তো হবে। বলব আর কি? এক-কথায় সবটা বলা হয়ে যায়। লতা চলে যাবার পর থেকে খুব-কসে পড়া মুখস্থ করেছি আর পাশ করেছি। বইয়ের পাতা থেকে কখনো মুখ তুলে চাইনি। এত বড় বিশ্ব-সংসারটাকে বইয়ের পাতার আড়াল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। ব্যস, এই তো করেছি! তার পর পয়সার ধান্ধায় ঘুরেচি। অনেক আশা করেছিলুম; ভেবেছিলুম, না জানি কত বড় দিগ্‌গজ আমি! কিন্তু সংসারে বেরিয়ে দেখলুম, ঘা খেয়ে খেয়ে বুঝলুম—কতটুকু আমি! কোথায় বা আমার আশা! কবি ঠিকই বলেছেন:—

"বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না,
কেবল ভস্মে ঘী ঢালা!"

একশত টাকার রাজত্ব যখন এল তখন রাণীই বা কেন না আসবেন? বলা বাহুল্য, এই রাজত্ব-লাভের সঙ্গে রাজকন্যাটিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু সে-সব কথা তুলে নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি?

বিয়ে হল আমার মাঘ মাসের মাঝা-মাঝি। এর মধ্যে বলবার কথা কিছুই নেই। সংসার-ধর্ম্মের একটা অবশ্যকর্ত্তব্য এই বিবাহ—আমি যখন সংসারী জীব—সন্ন্যাসী বৈরাগী নই, তখন বিয়ে তো আমায় করতেই হবে—এবং করলুমও তাই। তাই বলে এটাকে যে একেবারে অবহেলা করে বসে রইলুম তা নয়। সব জিনিষকেই আমার সোজাসুজি দেখা অভ্যাস—এই বিবাহের মধ্যে যেটা সব-চেয়ে সোজা কথা অর্থাৎ সুখে-স্বচ্ছন্দে কি করে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তার উপায়ই বা কি এবং কোথাই বা তার গলদ থাকতে পারে, মনে মনে তাই নিয়ে খুব আলোচনা করতে লাগলুম—তাইতেই একরকম মেতে গেলুম। এর বাড়া অন্য কোনো কথা মনে ঠাঁইই পেলে না।

*
* *

লতা আমার বিয়েতে আসতে পারেনি তাই নিয়ে মা ভারি দুঃখ করছিলেন। বলছিলেন, লতাকে কদ্দিন দেখিনি। * *

মায়ের একটা পোষা পাখী ছিল। তিনি যেমন করে লতা লতা বলে ডাকতেন পাখীটা ঠিক তার অনুকরণ করতে শিখেছিল। অনেক দিন তার ডাক শুনিনি। আজ হঠাৎ শুনলুম সে লতা! লতা! করে চীৎকার করছে। * *

লেখাপড়ার পালা তো চুকে গেছে। পড়ার টেবিলের ভিতর কতদিনকার চোতা কাগজ জমে রয়েছে। অনেক দিন থেকে ভাবছি সাফ করে ফেলব। আজ হাতে কাজ নেই—ছেঁড়া কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে লতার ছেলেবেলাকার হাতের লেখার খাতা একখানা বেরিয়ে পড়ল। * *

কতদিন আগে একটা টক্‌টকে লাল রঙে হাত ডুবিয়ে লতা পথের ঘরের দেয়ালে পাঁচ-আঙুলের ছাপ দিয়েছিল। বাড়ির ভিতর আসতে আজ হঠাৎ দেখি সে দাগ এখনো জ্বল্‌জ্বল করচে।

* *
*

মাঘের মাঝামাঝি আমার বিয়ে হল। ফাল্গুনের প্রথমেই দেখি লতা এসে হাজির। সে বল্লে, "ভারি দুঃখ, শিরিশ-দার বিয়েতে আসতে পারলুম না, এমন ঝঞ্ঝাটে পড়লুম! কৈ দেখি শিরিশদার বৌ?"

এ কথা আমার সামনে হয়নি—আমি তখন আপিসে ছিলুম। মায়ের মুখে শুনলুম।

আপিস থেকে ফিরে বিকেলে ছাদে বসে জলযোগের ব্যবস্থা করচি, লতা আমার স্ত্রীর হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে এসে উপস্থিত হল। এক-ঝট্‌কা বাতাস, একরাশ ফুলের গন্ধ নিয়ে এসে বল্লে—"কি শিরিশ-দা, চিন্‌তে পার?"

বাস্তবিকই আমি তাকে চিন্‌তে পারলুম না।

এই লতা!

তার দিকে চেয়ে মনে হল, এ যেন তাকে প্রথম দেখলুম। এই প্রথম পরিচয়।

লতা আমাকে অবাক দেখে বল্লে—"সে কি দাদা! বৌ পেয়ে ভুলে গেলে বুঝি?"

আমি কি স্বপ্ন দেখলুম? আমি কী দেখলুম? এ কি কোন্ মায়াবী আমার চোখে মায়ার অঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে গেল?

এই লতা!

এ যে সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য জড়ো করে রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। এমন রূপ তো কখনো দেখিনি!

এ কি লতা? এ কি মানুষ?

লতা কি বলছিল আমি শুনতে পাইনি, হঠাৎ তার হাসি শুনলুম—মনে হল সেই হাসিতে সমস্ত বিশ্ব যেন হেসে উঠেছে!

লতা বল্লে—"দাদা, আজ সমস্ত দিন ধরে তোমাদের জন্যে এই মালা গেঁথেছি—তোমাদের ফুলশয্যায় আমার ফুল দেওয়া হয়নি। এই নাও সেই ফুল।"—বলে প্রথমে আমার স্ত্রীর গলায় সে একছড়া মালা পরিয়ে দিলে, তার পর আমার

গলায় পরিয়ে দিতে এসে বল্লে—"দাদা, আজ যদি ফুলের গন্ধে রাত্রে তোমার ঘুম না হয় তাহলে আজ আর আমার উপর তোমার রাগ হবে না; খুসীই হবে জানি!"—বলে সে আমার গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে হাসতে লাগল।

জানিনা হঠাৎ আমার কি হল! আমার গলার মালা নিয়ে লতাকে পরিয়ে দিতে গেলুম।

লতা সরে দাঁড়াল; বল্লে—"ছি দাদা, তোমার গলার মালা কি আমায় পরতে আছে?"

আমি অবাক হয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে রইলুম, লতাও আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর হঠাৎ চোখ নামিয়ে সে একবার চট্ করে চলে গেল।

একটু পরেই আবার ফিরে এসে গল্প জুড়ে দিলে। আমি যেন কেমনতর হয়ে গেলুম। * * *

আমার জীবনে এই একটি মুহূর্ত্তের বসন্ত! কিন্তু ভাবি এই একটা মুহূর্ত্তই বা কার জীবনে কবার আসে? আমার সমস্ত জীবনখানার উপরে এই যে একটি মুহূর্ত্ত জেগে আছে—এ যে আমার জীবনের মণিপ্রদীপ!

আর সেই বাসন্তীর দান?—সেই ফুলের মালা? সে তো কৌটোর ভিতর থেকে শুকিয়ে ধূলো হয়ে কবে এক বৈশাখীর ঝড়ে উড়ে গেছে, কিন্তু তার সৌরভ আজও আমার প্রাণকে ভরপূর করে রেখেছে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বিগত

আমার বসন্ত দিনে অশোক-কুসুমে,
চম্পকের ঊর্দ্ধমুখী ধূপগন্ধধূমে
যে পূজা হইয়া গেছে নির্ম্মাল্য তাহার
কোথা আজি আর?

অবিরাম অবিরাম জীর্ণ পর্ণ ঝরে,
বর্ণ অরুণিমা সুপ্ত শুষ্ক পুষ্পস্তরে;
উদাস প্রসূন মুক্ত ব্যাকুল সুবাস
শুধু দীর্ঘশ্বাস!

আসিয়াছে ধরিত্রীর নবীন যৌবন,
বর্ণে বর্ণে বসন্তের পূর্ণ আবাহন,
অযুত গুঞ্জন গীতে, অজস্রধারায়
প্লাবিত ধরায়!

আমি লুপ্ত গতি শ্রান্ত, আমি বর্ণহীন,
বিরামপ্রয়াসী, স্তব্ধ আমার এ দিন,
বৃন্তচ্যুত ফুলের মতন অসহায়
মৃত্যুপথ চায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পূর্ণের অভাব

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে,
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই ত একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার করে লবে।
এম্‌নি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নবনব।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্য্যোদয়।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপ্‌নি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমেরিকায় ভারতীয় শ্রমজীবী

ইয়াঙ্কিস্থানের মজুরেরা উচ্চহারে মজুরী পায়। মাসিক ৫০।৬০৲ টাকার কম মজুরী এ দেশে নাই বলিলেই চলে। চাকর, দ্বারবান্, গাড়োয়ান, কুলী, কৃষক ও কারখানার মজুর প্রভৃতি সকল-শ্রেণীর শ্রমজীবীই স্বচ্ছলভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে। এই জন্য দুনিয়ার মজুরেরা আমেরিক আসিতে চাহে।

ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলে শুনিতে প বহুসংখ্যক ভারতীয় শ্রমজীবী কা করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্তসাগরোপকূ

া, ১২০০০ ভারতবাসী মজুরী করিয়া কে। নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—হার ফলে ভারত-সন্তানগণ আর এদেশে াসিতে পারিবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, জামেকা, নিড্যাড, গায়েনা ইত্যাদি ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহে ভারতীয় শ্রমজীবীরা খাঁটি গোলামের সমান। তাহারা "দাস-খত" লিখিয়া ঐ সকল দেশে যায়। তাহাদের সম্বন্ধে কবির কথা বর্ণে বর্ণে সত্য—

"নির্ব্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাঠিদের অত্যাচারে
প্রাণ হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ সাগর-পারে,
কেউ বা করে দিন-মজুরী কেউ বা ক্ষুদ্র দোকানদার।"

এইরূপ Indentured Labourer ইয়াঙ্কিস্থানে আসিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথার চুক্তির বিরোধী। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক এদেশে আসিয়াছে তাহারা সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভাবে বুঝিয়াই আসিয়াছে।

একজনকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম —"আচ্ছা, আমেরিকায় ভারতবাসী আসিতে আরম্ভ করিল কি সূত্রে?" ইনি উত্তর করিলেন—"পাঞ্জাবের শিখেরা এই বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। শিখগণ প্রথমে ব্রহ্মদেশে চাকরী করিতে আসে। ব্রহ্মদেশে থাকিতে থাকিতে তাহারা শিঙ্গাপুরের কথা শুনিতে পায়। শিঙ্গাপুরে ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা মজুরীর হার বেশী শুনিবামাত্র ইহারা ঐ অঞ্চলে অগ্রসর হইয়াছিল। যাহারা ব্রহ্মদেশে কার্য্য করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে একদল শিঙ্গাপুরে আসিল—পঞ্চনদ হইতে প্রথমেই কেহ শিঙ্গাপুরে আসিত কিনা সন্দেহ। অগ্রণী দল যখন দেখিল শিঙ্গাপুরে সত্য-সত্যই বেতনের হার বেশী তখন তাহারা পাঞ্জাবে



আঙ্গুরের ক্ষেতে হিন্দুস্থানী কৃষক।

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণকে সংবাদ পাঠাইল। সঙ্গেসঙ্গে শিঙ্গাপুরের প্রবাসীগণের নিকট হইতে পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে টাকা পৌছিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া পাঞ্জাবীরা ক্রমে শিঙ্গাপুরের দিকে ঝুঁকিল।

"আবার কিছুকালের ভিতরেই শিঙ্গাপুরের ভারতবাসীরা চীনের খবর পাইতে থাকিল। হংকং, সাংহাই ইত্যাদি অঞ্চলে ইংরাজ ক্ষমতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-দাস ভারতবাসীরও প্রবেশপথ সহজ হইল। ইংরাজেরা শিখ ও পাঠান সৈন্য লইয়াই চীনে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। এখনও ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশেরাই চীনের বৃটিশ-নগরে শান্তি রক্ষা করিতেছে। চীনারা এই কারণে ভারতবাসীর উপর অসন্তুষ্ট।

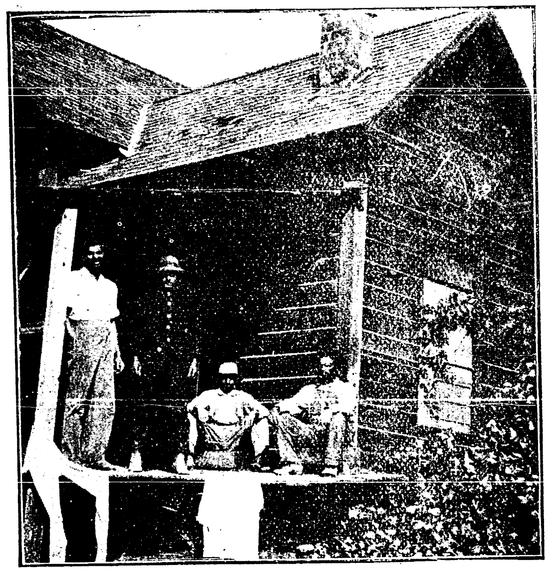

আমেরিকায় ভারতীয় কৃষকের কুটীর।

যাহা হউক ভারতবাসীরা শিঙ্গাপুর কে হইতে চীন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র-স্থাপনে সুযোগ পাইল।"

কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানে ভারতবাসীর অভিযা ব্যাপারটা কিছু বিচিত্র বোধ হইতেছে হয়ত কোন ইংরাজ-প্রভুর সঙ্গে শিখ পাঠান দাস কিম্বা প্রহরী ক্যানাডায় আসি থাকিবে। এইরূপে নব ভূখণ্ডের স ভারতবর্ষের সংস্রব আরব্ধ হয়। প প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলে কৃষকগণের উন্ন অবস্থা দেখিয়া ভারতবাসীরা দলে দলে চী হইতে এখানে আসিতে প্রলুব্ধ হইয়াছে ক্রমশ ভারতবর্ষ হইতেই শত শত লো আমেরিকায় মজুরী করিতে আসিয়াছে।

শুনা যায়, আজকাল চীন, জাপা সুমাত্রা, যব, মালয়, ভারতীয় দ্বী পুঞ্জ, ক্যালিফর্ণিয়া ক্যানাডা ইত্যাদি প্রদে প্রায় দেড় লক্ষ ভার বাসীর অন্ন সং হইতেছে। ইহাদের বি ভারতবর্ষের উচ্চ-শিক্ষি লোকেরা এখন পর্য্যন্ত কে সংবাদ রাখেন নাই। বি ৪।৫ বৎসরের ভিতর দাসথ লেখা চুক্তির বিরুদ্ধে নায়কগণ আন্দোলন তুলি ছেন। সেই উপলক্ষ্যে কৃ উপনিবেশ-সমূহে ভার প্রজার অধিকার সম্বন্ধে আ চনা চলিতেছে। দ আফ্রিকায় গান্ধী—

নেতা তাদের তরুর মত শুষ্ক দৃঢ় দুঃখজিৎ
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন বিজয় তাহার সুনিশ্চিত।

ভারতবর্ষ হইতে গোখ্‌লে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন! কংগ্রেসে অনেকবার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করাও হইয়াছে। Modern Review, Indian Review ইত্যাদি পত্রে কোন কোন লেখক সমস্যাটা বুঝাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টা সত্যভাবে বুঝিবার জন্য এখনও দেশবাসী অগ্রসর হন নাই বলিতে হইবে। এমন-কি ভারতবর্ষের বাহিরে ভারত-সন্তান কোথায় কতজন কি-ভাবে জীবন যাপন করে তাহাই জানিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বর্ত্তমান যুগেও কুলী-মজুরের দ্বারাই দুনিয়ার সর্ব্বত্র একটা ক্ষুদ্রতর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার আকার, পরিমাণ ও মূল্য বুঝিবার জন্য উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর শীঘ্র অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। গোখ্‌লে কয়েকদিনের জন্য মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট কার্য্য সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। তাহার জন্য বহুসংখ্যক উপযুক্ত লোকের জগতে বাহির হইয়া পড়া আবশ্যক। বৃহত্তর ভারতের কেন্দ্রগুলি বুঝিতে চেষ্টা করাই কয়েক জনের একমাত্র কার্য্য হউক।

ইয়াঙ্কিরা চীনাকে আমেরিকায় চাহে না জাপানীকে চাহে না, ভারতবাসীকেও চাহে না। ইহারা ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে অসমর্থ। ভারতীয় মজুরদের মাথায় পাগ্‌ড়ী, হাতে বালা, কানে দুল, লম্বা চুল ইত্যাদির বিষম উৎপাত দেখিয়া ইয়াঙ্কিরা "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সুচরিতা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজয়-গর্ব্ব

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া আমার সাত সপ্তাহ বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহাতে তাহার বিধিমত সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হয়, সে-জন্য হাসপাতাল থেকে আমি একজন ধাত্রী আনাইলাম। তাহার অসুখের এই সাতটি সপ্তাহ আমরা আহারনিদ্রা একরকম ত্যাগ করিয়াছিলাম বলিলেই হয়।

টাকার দরদ আমি করি নাই। যে ডাক্তার ডাকিয়াছিলাম তাঁহার দর্শনী ষোল টাকা।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে একটু একটু করিয়া সে সারিয়া উঠিতে লাগিল, ক্রমে তাহার আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া গিয়া আবার জ্ঞান হইল।

যেদিন রোগ-শয্যা ত্যাগ করিল, সেদিন সে মুখটি বুজিয়া আস্তে-আস্তে আমার শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। আমরা দুজনে

সেদিন সুধু মুখোমুখি করিয়া বসিয়া রহিলাম—কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না।

আর-কিছুদিন পরে আমরা সেই নিরবচ্ছিন্ন মৌন ভঙ্গ করিলাম বটে,—কিন্তু সে-কেবল নেহাৎ চুপ করিয়া থাকাটা ভাল দেখায় না বলিয়া। আমাদের সেই বাধো-বাধো ভাবটা আর গেল না। আমি ইচ্ছা করিয়াই মৌনী থাকিতাম। বোধকরি সে-ও তাহাই চাহিত। মনে-মনে ভাবিলাম, "কিছুদিন এম্‌নি করেই যাক্। এ ধাক্কাটা আগে সে সাম্‌লে উঠুক্, তারপর সময়ের শুশ্রূষায় তার মনের দাগ মনেই মিলিয়ে যাবে'খন। এখন চুপ থাকাই ভাল।"

উঃ! তার অসুখের সময়ে আমার যে কি কষ্ট গিয়াছে তা বলা যায় না!—সে কি যন্ত্রণা!—আমার বুক ফাটিয়া কান্না ঠেলিয়া উঠিত, কিন্তু পাছে কেউ শোনে সেই ভয়ে প্রাণের কান্না প্রাণেই চাপিয়া রাখিতে হইত।

যেটা সত্য সেটা না জানিয়াই যে আমার স্ত্রী মরিবে ইহা আমি মনে আনিতেই পারিতাম না। তাই তার আরোগ্যলাভে আমি যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। "আগে মনের সঙ্কোচটা যাক্—পরের কথা পরে বুঝে দেখা যাবে।" —এমনিভাবে শীতকালটা কাটিয়া গেল। এই সারা শীতটা দিল্‌দরিয়া মেজাজে কাটাইয়া দিলাম। আমারই জিৎ, আমারই জিৎ—কি আনন্দ!

ভবিষ্যতের আশা-প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া ধীরে ধীরে শীত চলিয়া গেল।

আপনমনে বসিয়া-বসিয়া সে সেলায়ের কাজ করিত,—পিছনে বসিয়া তাহার উপরে আমি নজর রাখিতাম। এতদিনে এ বনের পাখী বুঝি বশ মানিল। আমার অমতে সে আর কোন কাজ করিত না। আগেকার মত একলা আর বাড়ীর বাহিরেও যাইত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর তাহাকে লইয়া রোজ একবার বাহিরে বেড়াইয়া আসিতাম। বেড়াইতে-বেড়াইতে আমরা নানাপ্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতাম। আমি যে তাকে ভালবাসি, ঠারেঠোরে এটাও জানাইয়া দিতাম। আমার ইচ্ছা,—অতীতকে সে মন হইতে একেবারে চাঁচিয়া ফেলুক!

তবে, একটা ব্যাপার আমার চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার দিকে আমি গোপনে চাহিয়া থাকি বটে,—কিন্তু তাহার সে চুরি-করা চাহনি আর দেখিতে পাই না কেন? কই, সে ত আর—তেমন চোখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহে না!—এ কি লজ্জা, এ কি সঙ্কোচ?

ভাবিলাম, "ধৈর্য্য ধরে থাকাই ভাল পাখী যখন পোষ মেনেছে, তখন আর ভাবনা কিসের! সে ত আমারই দেখব, হঠাৎ সে কোন্‌দিন বুকের কাছে এসে আমাকে আত্মসমর্পণ করেচে!"

তবু, কেন জানিনা, আমার খালি মনে হইত, আমি যেন কি-একটা লুকোচুরি খেলিতেছি।

যদিও তাহার আলাদা বিছানা করিয়া দিয়াছি, যদিও তাহার সেদিনকার অপরাধ বড় সামান্য নহে,—তবু তাহার যে পাপ আছে, ইহা আমি ভাবিতেও পারিতাম না। সে বশ মানাতে আমি যে খুসি হইয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সময়-সময় তাহার এই অসহায়, করুণ আত্মসমর্পণ দেখিয়া আমার মনটা যেন কেমন-কেমন করিত।

যাহা হউক, এই সময়টুকুর মধ্যে আমি দুইচারিটা ভাল কাজ করিয়াছি। আমি দুজন অক্ষম ঋণীর টাকা ছাড়িয়া দিয়াছি, কোন জিনিষ বাঁধা না রাখিয়াই একটি রমণীকে টাকা ধার দিয়াছি।

স্ত্রীকে আমি নিজে এ-সব কথা বলিলাম না; কারণ তাহার মন রাখিতে ত আমি এ দয়ার মুখোস পরি নাই! কিন্তু একদিন সেই উপকৃত রমণীটি আসিয়া আমাকে তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে জানাইয়া গেল। ফলে, সব কথা জাহির হইয়া পড়িল। শুনিয়া আমার স্ত্রী সত্যই আনন্দিত হইল।

শীতের পর আসিল সবুজ বসন্তের নবীন-শ্রী। তপ্ত সূর্য্যকরে আমাদের বাড়ীর পুরুত ঘরগুলি উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আলোকের পিছনে যে কিসের অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ছিল, তখন তাহা লক্ষ্য করি নাই। সে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বুকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রলয়ের শিখা গুপ্ত ছিল—যেদিন দিব্যদৃষ্টি পাইলাম, সেদিন তাহা দেখিতে পারিলাম।

যাহা ঘটিল, সে কি নিয়তির অমোঘ বিধান? তাহা কি আকস্মিক নহে? বলিতে পারি না।

এত-দৈবাৎ যে এমন ঘটিবে, কে তাহা জানিত? ঘটনাটা ঘটিল সন্ধ্যাকালে, খাওয়া-দাওয়ার পর.....

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিব্যদৃষ্টি

ঘটনাটি খুবই সামান্য। আজ মাসাবধি আমার স্ত্রী কেমন-যেন আন্‌মনা হইয়া আছে। সে আর মৌনী নয় বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই উদাস মনে কি-যেন ভাবিতে থাকে। তার এই বিষণ্ণ ভাবটা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম।

সেদিন সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া শেলাই করিতেছিল। আমি যে তাহার পানে তাকাইয়া আছি, সেদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ আমার মনে হইল, তাহার মুখ কেমন বিবর্ণ, চেহারা কেমন রুগ্ন। আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বিশেষ, আজকাল মাঝে মাঝে সে কাসিয়া উঠে—ভিতরে হয়ত কোন কঠিন রোগ হইয়াছে। তাহাকে কোনকথা না জানাইয়া আমি তখনি ডাক্তারকে খবর দিলাম।

ডাক্তার আসিলেন। সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া একবার ডাক্তারের আর-একবার আমার মুখের দিকে ঘন-ঘন তাকাইতে লাগিল।

তারপর শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার ত কিছু হয় নি!"

ডাক্তার আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনি যদি শীঘ্রই ওঁকে হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে না যান, তাহলে একটা বিপদ ঘট্‌তে পারে। সমুদ্রের ধারে যেতে পারেন ত ভালই, নইলে অন্য-কোন ভাল জায়গায়।"

সেদিন সুধু মুখোমুখি করিয়া বসিয়া রহিলাম—কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না।

আর-কিছুদিন পরে আমরা সেই নিয়বছির মৌন ভঙ্গ করিলাম বটে,—কিন্তু সে-কেবল নেহাৎ চুপ করিয়া থাকাটা ভাল দেখায় না বলিয়া। আমাদের সেই বাধো-বাধো ভাবটা আর গেল না। আমি ইচ্ছা করিয়াই মৌনী থাকিতাম। বোধকরি সে-ও তাহাই চাহিত। মনে-মনে ভাবিলাম, "কিছুদিন এম্‌নি করেই যাক্। এ ধাক্কাটা আগে সে সাম্‌লে উঠুক্, তারপর সময়ের শুশ্রূষায় তার মনের দাগ মনেই মিলিয়ে যাবে'খন। এখন চুপ থাকাই ভাল।"

উঃ! তার অসুখের সময়ে আমার যে কি কষ্ট গিয়াছে তা বলা যায় না!—সে কি যন্ত্রণা!—আমার বুক ফাটিয়া কান্না ঠেলিয়া উঠিত, কিন্তু পাছে কেউ শোনে সেই ভয়ে প্রাণের কান্না প্রাণেই চাপিয়া রাখিতে হইত।

যেটা সত্য সেটা না জানিয়াই যে আমার স্ত্রী মরিবে ইহা আমি মনে আনিতেই পারিতাম না। তাই তার আরোগ্যলাভে আমি যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। "আগে মনের সঙ্কোচটা যাক্—পরের কথা পরে বুঝে দেখা যাবে।" —এমনিভাবে শীতকালটা কাটিয়া গেল। এই সারা শীতটা দিল্‌দরিয়া মেজাজে কাটাইয়া দিলাম। আমারই জিৎ, আমারই জিৎ—কি আনন্দ!

ভবিষ্যতের আশা-প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া ধীরে ধীরে শীত চলিয়া গেল।

আপনমনে বসিয়া-বসিয়া সে সেলায়ের কাজ করিত,—পিছনে বসিয়া তাহার উপরে আমি নজর রাখিতাম। এতদিনে এ বনের পাখী বুঝি বশ মানিল। আমার অমতে সে আর কোন কাজ করিত না। আগেকার মত একলা আর বাড়ীর বাহিরেও যাইত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর তাহাকে লইয়া রোজ একবার বাহিরে বেড়াইয়া আসিতাম। বেড়াইতে-বেড়াইতে আমরা নানাপ্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতাম। আমি যে তাকে ভালবাসি, ঠারেঠোরে এটাও জানাইয়া দিতাম। আমার ইচ্ছা,—অতীতকে সে মন হইতে একেবারে চাঁচিয়া ফেলুক!

তবে, একটা ব্যাপার আমার চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার দিকে আমি গোপনে চাহিয়া থাকি বটে,—কিন্তু তাহার সে চুরি-করা চাহনি আর দেখিতে পাই না কেন? কই, সে ত আর—তেমন চোখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহে না!—এ কি লজ্জা, এ কি সঙ্কোচ?

ভাবিলাম, "ধৈর্য্য ধরে থাকাই ভাল। পাখী যখন পোষ মেনেছে, তখন আর ভাবনা কিসের! সে ত আমারই। দেখব, হঠাৎ সে কোন্‌দিন বুকের কাছে এসে আমাকে আত্মসমর্পণ করেচে!"

তবু, কেন জানিনা, আমার খালি মনে হইত, আমি যেন কি-একটা লুকোচুরি খেলিতেছি।

যদিও তাহার আলাদা বিছানা করিয়া দিয়াছি, যদিও তাহার সেদিনকার অপরাধ বড় সামান্য নহে,—তবু তাহার যে পাপ আছে, ইহা আমি ভাবিতেও পারিতাম না। সে বশ মানাতে আমি যে খুব

খুসি হইয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সময়-সময় তাহার এই অসহায়, করুণ আত্মসমর্পণ দেখিয়া আমার মনটা যেন কেমন-কেমন করিত।

যাহা হউক, এই সময়টুকুর মধ্যে আমি দুইচারিটা ভাল কাজ করিয়াছি। আমি দুজন অক্ষম ঋণীর টাকা ছাড়িয়া দিয়াছি, কোন জিনিষ বাঁধা না রাখিয়াই একটি রমণীকে টাকা ধার দিয়াছি।

স্ত্রীকে আমি নিজে এ-সব কথা বলিলাম না; কারণ তাহার মন রাখিতে ত আমি এ দয়ার মুখোস পরি নাই! কিন্তু একদিন সেই উপকৃত রমণীটি আসিয়া আমাকে তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে জানাইয়া গেল। ফলে, সব কথা জাহির হইয়া পড়িল। শুনিয়া আমার স্ত্রী সত্যই আনন্দিত হইল।

শীতের পর আসিল সবুজ বসন্তের নবীন-শ্রী। তপ্ত সূর্য্যকরে আমাদের বাড়ীর নিভৃত ঘরগুলি উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আলোকের পিছনে যে কিসের অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ছিল, তখন তাহা লক্ষ্য করি নাই। সে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রলয়ের শিখা গুপ্ত ছিল—যেদিন দিব্যদৃষ্টি পাইলাম, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিলাম।

যাহা ঘটিল, সে কি নিয়তির অমোঘ বিধান? তাহা কি আকস্মিক নহে? বলিতে পারি না।

এত-দৈবাৎ যে এমন ঘটিবে, কে তাহা জানিত? ঘটনাটা ঘটিল সন্ধ্যাকালে, খাওয়া-দাওয়ার পর.....

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিব্যদৃষ্টি

ঘটনাটি খুবই সামান্য। আজ মাসাবধি আমার স্ত্রী কেমন-যেন আন্‌মনা হইয়া আছে। সে আর মৌনী নয় বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই উদাস মনে কি-যেন ভাবিতে থাকে। তার এই বিষণ্ণ ভাবটা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম।

সেদিন সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া শেলাই করিতেছিল। আমি যে তাহার পানে তাকাইয়া আছি, সেদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ আমার মনে হইল, তাহার মুখ কেমন বিবর্ণ, চেহারা কেমন রুগ্ন। আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বিশেষ, আজকাল মাঝে মাঝে সে কাসিয়া উঠে—ভিতরে হয়ত কোন কঠিন রোগ হইয়াছে। তাহাকে কোনকথা না জানাইয়া আমি তখনি ডাক্তারকে খবর দিলাম।

ডাক্তার আসিলেন। সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া একবার ডাক্তারের আর-একবার আমার মুখের দিকে ঘন-ঘন তাকাইতে লাগিল।

তারপর শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার ত কিছু হয় নি!"

ডাক্তার আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনি যদি শীঘ্রই ওঁকে হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে না যান, তাহলে একটা বিপদ ঘট্‌তে পারে। সমুদ্রের ধারে যেতে পারেন ত ভালই, নইলে অন্য-কোন ভাল জায়গায়।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আমার স্ত্রী কিছুক্ষণ আমার দিকে গম্ভীরমুখে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সত্যি বল্‌ছি, আমার কিছু হয়-নি।"—কিন্তু বলিতে-বলিতে তাহার মুখ কি-এক লজ্জার বেদনায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমি সমস্ত বুঝিলাম!

সে অতবড় একটা অপরাধ করিলেও, আমি যে তাহাকে ত্যাগ করি নাই, আমি যে তাহাকে ভালবাসি, যত্ন করি,—ইহা ভাবিয়া নিজের প্রতি হয়ত তাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে!

বসন্তের এক রৌদ্ররঙ্গিন প্রভাতে দোকানে বসিয়া কাযকর্ম্ম দেখিতেছিলাম। হঠাৎ পাশের ঘর হইতে মৃদু গীতের সুর উঠিল। আমার স্ত্রী গান গায়িতেছে! কেন জানি না, তাহার গান শুনিয়া আমি যেন কেমন দমিয়া গেলাম। বিবাহের পর প্রথম-প্রথম তাহাকে গান গায়িতে শুনিয়াছি বটে,—কিন্তু প্রথম মিলনের চঞ্চল আনন্দই সে সঙ্গীতের কারণ। ইদানিং ত সে আর গান গায়িত না!

তখনকার সেই আনন্দ-সঙ্গীতে একটা গভীর শান্তি, পরিপূর্ণ আশা, অটুট স্বাস্থ্যের আভাস পাইতাম—কিন্তু,—আজি-কার্ এ সঙ্গীতে, যেন এক পীড়িত, তাপিত হতাশ অন্তরের বেদনা ক্রন্দনের ছন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে! গানের সুর ক্রমে চড়িতে লাগিল,—তারপর, গানের মাঝখানে হঠাৎ সেই বেদনা-করুণ কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া সুরও থামিয়া গেল! শুনিলাম, সে কাসিতেছে। কাসি থামিলে আবার গান সুরু হইল,—এবার বড় ধীরে, মৃদুগুঞ্জনে, শোনা যায়-কি, না-যায়।.....

আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। আমার এ অস্থিরতার কারণ কেহ বুঝিবে না! দুঃখ? তাহার জন্য আমার এতটুকুও দুঃখ হয় নাই! গান শুনিতে শুনিতে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। আর বিস্ময়! বিস্ময় ও সন্দেহ! তাহা যেমনি তীব্র, তেমনি ক্রূর! "সে গান গায়িতেছে! অ্যাঁ! আমার সামনেই গান গায়িতেছে!

আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। তবুও অচল পাথরের মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। উঠিবার শক্তি ছিল না—পৃথিবী চোখের আড়ালে কোথায় সরিয়া গিয়াছিল! খানিক পরে কোনরকমে উঠিয়া পাগলের মত বাহির হইলাম। কোথায় যাইতেছি, হুঁস ছিল না—সহসা লুকেরিয়াকে সম্মুখে দেখিয়া ডাকিলাম, "লুকেরিয়া—"

লুকেরিয়া বিস্ময়ে আমার পানে চাহিল। আমি কহিলাম, "তোমার দিদিমণি গান গাইছে? না?"

লুকেরিয়া কোন জবাব দিল না—কেমন-এক ভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি রোজ এম্‌নি গান গায়, না এই প্রথম?"

লুকেরিয়া কহিল, "দিদিমণি মাঝে মাঝে একলা বসে গান করেন বটে, কিন্তু আপনি বাড়ী থাক্‌লে কৈ তাঁকে ত গাইতে শুনি নি!"

আমি অস্থিরপদে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। পথের লোকগুলা আমার গায়ে ধাক্কা মারিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু

দিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না—আমি তখন একেবারে অসাড়! রাস্তা দিয়া একখানা গাড়ী যাইতেছিল, আমি তাড়াতাড়ি তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। কিন্তু খানিকদূর গিয়াই নামিয়া পড়িলাম। গাড়োয়ানের হাতে একটা টাকা দিয়া অর্থশূন্য হাস্য করিয়া বলিলাম, "এই নাও তোমার ভাড়া!"

তাড়াতাড়ি আবার বাড়ীতে ফিরিলাম।

আমার মর্ম্মের মাঝে সেই তীক্ষ্ণ করুণ সুরটি তখনও তীরের ফলা'র মত বিঁধিয়া ছিল। আমার সাক্ষাতে আমাকেই ভুলিয়া সে যখন গান গায়িতে পারে, তখন আর কি মঙ্গল আছে?

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সে তখনও সেইখানে বসিয়া শেলাই করিতেছে। সে তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু এখন আর গান গায়িতেছে না। হঠাৎ কেহ ঘরে ঢুকিলে লোকে যেমন মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখে, লোকটা কে, —সে-ও তেমনিভাবে একবার আমার দিকে চাহিয়া আবার নিজের কাজে মন দিল।

অভিভূতের মত আমি তাহার পাশে গিয়া বসিলাম। সে ভয়ে-ভয়ে আবার আমার দিকে তাকাইল। আমি তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া দু-চারিটা কথা কহিলাম; কিন্তু আমার আলাপের সে চেষ্টা বিফল হইল;—কারণ, আমি যাহা বলিলাম তাহা যেমন অর্থহীন, তেমনি অসংলগ্ন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শেষে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু এমন করিয়া পুতুলের মত বসিয়া থাকা বড় দায়। কাজেই খানিকপরে মৃদু স্বরে বলিলাম, "এস আমরা গল্প করি। তুমি এমন চুপচাপ কেন?"

সে কাঁপিয়া উঠিল। তারপর একটু তফাতে সরিয়া বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ের একটা চমক খেলিয়া গেল,—মুখে চোখে বিস্ময়ের আভাস!

"তুমি কি এখনো আমায় ভালবাস—এখনো?"—মুখ ফুটিয়া এ-কথা সে বলিল না বটে,—কিন্তু তাহার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই যে জাগিয়া উঠিয়াছে, আমি তাহা বেশ বুঝিলাম।

আর আমি সহিতে পারিলাম না—একেবারে তাহার পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলাম। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল —কিন্তু আমি আগ্রহের সহিত তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিলাম।

এক আকস্মিক আনন্দের উচ্ছ্বাসে হৃদয় আমার ভরিয়া গেল—আমি পাগলের মত তার ছোট ছোট পা-দুখানি বুকের ভিতরে চাপিয়া ঘন-ঘন চুম্বন করিতে লাগিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমার প্রাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখে অশ্রুর বন্যা ছুটিল,—আমি কথা কহিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না।

তাহার মুখের উপর হইতে ভয় ও বিস্ময়ের ভাব সরিয়া গেল। তাহার পায়ে চুম্বন করাতে লজ্জায় সে আকুল হইয়া উঠিল, সলজ্জ মৃদুহাস্য করিয়া আমার আলিঙ্গন হইতে পা দুইখানি সে ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া লইল।

কিন্তু, আমার প্রাণের কপাট তখন একেবারে খুলিয়া গিয়াছে। মেঝের উপর,

যেখানে তাহার পা-দুটি ছিল, সেই জায়গাটি চুম্বন করিয়া উপুড় হইয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম, "আমি তোমায় ভালবাসি—ওগো, তোমায় ভালবাসি!"

—লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া সে তেমনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমি বলিলাম, "অমন নিষ্ঠুরের মত সরে যেওনা সরে যেওনা—কাছে এস, বুকে এস!"

বাতাসে থর্‌থরে ফুলের চারার মত তাহার ছোট দেহখানি কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে-কাঁপিতে শেষটা সে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর সেই সজল, ডাগর চোখদুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া, সেই কম্পমান করে আমার হাতদুটি ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "শান্ত হও—অমন কোরোনা, তোমার পায়ে পড়ি!"—অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠ আবার বন্ধ হইয়া গেল।

কক্ষতলে বসিয়া বসিয়া নিষ্পলকনেত্রে আমি দেখিতে লাগিলাম, আবেগে উত্তেজনায় ধীরে ধীরে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে!

তাহাকে কোলে করিয়া বিছানার উপর লইয়া গেলাম। সেদিন সারাসন্ধ্যা আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া রহিলাম।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, আমি বলিলাম, "দেখ, বেশ বুঝছি তোমার অসুখ হয়েছে। এখানে থাক্‌লে তোমার অসুখ বাড়বে বৈ কমবে না। আমি হয় দোকানপাট তুলে দি, নয় আর কারুকে বিক্রী করে ফেলি; তারপর চল, তোমায় নিয়ে আমি হাওয়া বদ্‌লাতে যাই। সেখানে গিয়ে আবার নূতন করে সংসার পাতব, নূতন করে জীবন গড়ব!"

তখনও সে ভয়ে-ভয়ে আমার কথা শুনিতে লাগিল—কিন্তু উত্তরে একটিও কথা কহিল না, একটিও না।

আবার তাহার চরণতলে আপনাকে লুটাইয়া দিবার জন্য একটা প্রবল আবেগ আমার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

বলিলাম, "আর কিছু চাই না আমি! —সেই নূতন সংসারের এককোণে একটু যদি আশ্রয় পাই, তাহলেই বর্ত্তে যাব। ভক্ত যেমন করে দেবীর পানে চেয়ে থাকে, দূর থেকে তেমনি করে আমি তোমার পানে চেয়ে থাক্‌ব, সুধু চেয়ে থাক্‌ব!"

উত্তরে, তাহার কপোলে অবাধ অশ্রুর ধারা ছুটিল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি ভেবেছিলুম, আমার উপর তুমি আর বুঝি সদয় হবে না!"

একি কথা!—কে-যেন আমার বুকটা ছুরি-দিয়া চিরিয়া দিল! তাহার এই কথায় আমি সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। না জানিয়া তাহার প্রাণে কি ব্যথাই দিয়াছি!

সেদিন সে আমার সামনে তাহার মনের কত কথাই খুলিয়া বলিল! আমি তাহাকে বাধা দিলাম না; কারণ, তাহার এই আত্মপ্রকাশের উপরই আমার সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে! অবশেষে, কথা বলিতে বলিতে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে ঘুমাইতে বলিলাম।

সে শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু

উত্তেজনার ফলে আবার সামান্য জ্বর আসিল।

আমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারিলাম না। সে কেমন আছে, তাই দেখিতে সারারাত ক্রমাগত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, তাহার রোগশান্তির জন্য কতবার ভগবানকে ডাকিয়াছি! কাল হইতে আমাদের নূতন জীবন,—কি আনন্দ! সাগ্রহে আমি প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। —"কাল আমি তার কাছে সব কথা খুলে বল্‌ব, সে-ও সব বুঝতে পারবে, তার সন্দেহ ঘুচে যাবে!"—এই আত্মস্বীকারে আমাদের নূতন জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে। আজ আমার প্রাণ অতীতের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে সুধু চাহে, নূতন প্রভাত—নূতন জীবন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভোরের বেহাগ!

হাসিমুখে সে আমার কথা শুনিতে লাগিল বটে, কিন্তু তবু তার লজ্জা গেল না, ভয় ভাঙ্গিল না।—হাঁ, তাহার ভয় সঙ্কোচ আরও বরং বাড়িয়া উঠিল।—ইহাই ত স্বাভাবিক! এতদিনের 'মনান্তরে'র ফলে পরস্পরের কাছ হইতে অনেক তফাতে গিয়া পড়িয়াছিলাম; একদিনের চেষ্টায় কি এতদিনের ভাঙ্গা মন কখনো যোড়া লাগে? সুতরাং তাহার ভয়সঙ্কোচ আমি ততটা গ্রাহ্য করিলাম না। এইখানেই আমার ভ্রম হইল।

সেদিন সকালে আমি তার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করিলাম, এতদিন তার সঙ্গে সরল ব্যবহার করি নাই বটে; এতদিন তার প্রেমে আমার সন্দেহ ছিল; কেবল তাহাকে কষ্ট দিবার জন্যই বিবাহ করিয়াছি, ইত্যাদি, ইত্যাদি!

সে সকাতরে আমার হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "ওগো, থাম থাম —অমন-করে আর বোলো না!"—আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, "না না—নূতন জীবন চাই, নূতন জীবন! বসন্ত-প্রভাতের নূতন সূর্য্য আমাদের নূতন পথ দেখাবে—নূতন জীবন, নূতন আলো!"

আমার দোকান বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। স্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করিলাম, ভ্রমণের খরচের জন্য নিজেদের হাতে কিছু টাকা রাখিয়া বাদবাকি সব গরীব-দুঃখীদের বিলাইয়া দিব। ফিরিয়া আসিয়া সৎপথে আবার নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করিব।

সে কোন জবাব দিল না, কেবল একটু হাসিল। পাছে আমি বিরক্ত হই, তাই এ হাসি। আমার এই অনর্গল বাক্যস্রোতে মনে-মনে নিশ্চয়ই সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—এত কথার-উপর-কথা তাহার ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু ভবিষ্যতের আনন্দে আমি তখন বিহ্বল, আত্মসংযমের শক্তি আমার ছিল না।

দিন-রাত তার পাছে-পাছে লাগিয়া থাকাটা আমার ভাল হয় নাই। আমার এই উচ্ছ্বসিত আনন্দে বোধ করি সে বড়ই অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করিত। সেদিন অন্ধ আবেগে তাহার পায়ে চুম্বন করিয়া-

ছিলাম বটে, কিন্তু আজ বুঝিতেছি, আমার পক্ষে সেটা অত্যন্ত ছেলেমানুষি হইয়াছিল! তবু, এত বুঝিয়াও আমি আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিলাম না।

একদিন কথায় কথায় তাহার কাছে জুলিয়াদের বাড়ীর সেই ঘটনার কথা তুলিলাম। বলিলাম, "ওঃ, এফিমোভিচকে তুমি আচ্ছা জব্দ করেছিলে যাহোক! তুমি যে এত ভালো, এমন সরল অথচ রসিক, আগে আমি তা বুঝি-নি!"

সে শিহরিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "এ-কথা তুমি বাড়িয়ে বল্‌ছ!"

তারপর দেখিতে-দেখিতে তাহার মুখ যেন কালির মত হইয়া গেল। দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। আবার আমি আত্মহারা হইয়া তাহার পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলাম, তাহার পা-ধরিয়া ঘন-ঘন চুম্বন করিতে লাগিলাম। আবার সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। এটি কালকের ঘটনা—তার পর দিন সকালে—

তার পর দিন সকালে! আমি কি বলিতেছি! এ' ত পরদিনের সকালের কথা নয়—এযে আজ সকালের কথা!—কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই কয় ঘণ্টার মধ্যে যেন কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে!

সকালে যখন তাহার সহিত দেখা হইল, তখন সে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির, রাত্রির মত স্তব্ধ! কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া যোড়হাতে সে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি বড় পাপিষ্ঠা—যে পাপ করেছি, তার মার্জ্জনা নেই, আমার মনের সব শান্তি ঘুচে গেছে! তোমার মহত্ব, তোমার দয়া আমি কখনো ভুল্‌তে পার্‌ব না—আজ থেকে তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাসী! তোমার পায়ের তলায় সারা জীবন দাসীর মতই আমি পড়ে থাকব!"

একলাফে উঠিয়া পাগলের মত আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। এবং তাহার কপোল অধরে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিলাম;—আজ আমি আবার আমার স্বামীত্ব ফিরিয়া পাইয়াছি!

তারপর বিদেশ-যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলাম।—সেই বাহির-হওয়াই আমার কাল হইল। হা পরমেশ্বর, পাঁচ মিনিট—আর পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে যদি ফিরিতে পারিতাম! ওঃ! ফিরিয়া সে কি দৃশ্য দেখিলাম? বাড়ীর দ্বারে সেই জনতা—আমার প্রতি সকলের সেই দৃষ্টি, সেই নিষ্ঠুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি!—হা ভগবান.....

লুকেরিয়ার মুখে সব শুনিয়াছি। আমি ফিরিয়া আসিবার কিছু পূর্ব্বে লুকেরিয়া আমার স্ত্রীর কাছে গিয়াছিল। সে তখন প্রার্থনার ভঙ্গীতে যোড় হাতে দাঁড়াইয়া ছিল।

লুকেরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ দিদিমণি?"

সে বলিল, "কিছু না! তুই এখন এখান থেকে যা। না, না—একটু দাঁড়া দেখি!"—এই বলিয়া আমার স্ত্রী লুকেরিয়ার কাছে গিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিল।

লুকেরিয়া বলিল, "দিদিমণি, এখন বুঝি মনে খুব আনন্দ হচ্ছে!"

"হ্যাঁ, লুকেরিয়া!"

"বাঁচলুম, এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন!"

—"হ্যাঁ,—এখন তুই যা-দেখি লুকেরিয়া!"—এই বলিয়া আমার স্ত্রী এমন ভাবে হাসিল যে লুকেরিয়ার মনে ভয় হইল। ঘরের বাহিরে গিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। খানিকক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিল।

জানালার উপরে হাত রাখিয়া এবং হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে তখন দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন; আপন ভাবে সে এমন বিভোর ছিল যে, ঘরের মধ্যে লুকেরিয়া আসিয়াছে, এটা তাহার খেয়ালও হয় নাই।

নিজের মনে কি-ভাবিয়া হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল। তাহার ভাব-গতিক কিছু বুঝিতে না পারিয়া লুকেরিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। তারপর যখন লুকেরিয়া ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত, তখন জানালা-খোলার শব্দ হইল। সেদিন বড় কন্‌কনে বাতাস বহিতেছিল; জানালা খুলিলে পাছে আমার স্ত্রীর ঠাণ্ডা লাগে, সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ঢুকিল।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই লুকেরিয়ার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! আমার স্ত্রী তখন জানালার আলিসার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে,—হাত-দুটি তার যোড়-করা!

রুদ্ধশ্বাসে লুকেরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদিমণি, দিদিমণি!"

লুকেরিয়ার সাড়া পাইয়া প্রথমটা সে ফিরিয়া দাঁড়াইতে গেল;—কিন্তু ফিরিতে ফিরিতে থামিয়া, হাতদুটি যোড় করিয়াই জানালা হইতে একেবারে বাহিরে লাফাইয়া পড়িল!

আমি আঙ্গিনায় গিয়া দাঁড়াইবা মাত্র প্রথমটা সকলে বিষম গোলমাল করিয়া উঠিল—তারপর, আমাকে পথ ছাড়িয়া দিল। চারিদিক আবার স্তব্ধ।

তখনও তাহার দেহ শীতল হইয়া যায় নাই। তাহার মরণান্ধ চক্ষুদুটি আমার দিকেই ফিরানো ছিল,—সে দৃষ্টি ভুলি নাই, আমি ভুলি নাই!—আর, তার হাতদুটি!—তখনও তাহা যোড়-করা,—যেন-সে প্রার্থনা করিতে করিতেই অনন্ত তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে!

আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি! আমার চোখে পলক নাই—আশেপাশে লোকজনেরা আনাগোনা কানাকাণি করিতেছে,—আমি কিন্তু সেই ভূপতিতা ভগ্নপ্রতিমা ছাড়া আর-কিছু দেখিতে শুনিতে পাইতেছি না!

হঠাৎ শুনিলাম, কে-একজন লোক বলিয়া উঠিল, "এর মুখ দিয়ে ঐ-যে রক্ত বেরিয়েছে দেখ্‌চ, ঐ রক্তের তোড়েই দমবন্ধ হয়ে গেছে!"—লোকটা একখানা রক্তাক্ত পাথরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

তাহার হাতের আঙ্গুলেও রক্ত! নিশ্চয় সে ঐ রক্তাক্ত পাথরখানায় হাত দিয়াছিল! রক্তমাখা আঙ্গুল নাড়িয়া বার-বার সে বলিতে লাগিল, "এই রক্তেই ওর দমবন্ধ হয়ে গেছে, এই রক্তেই দমবন্ধ!"

অভিভূতের মত ঘুষি তুলিয়া লোকটার দিকে ছুটিয়া গেলাম,—"দমবন্ধ হয়ে গেছে! কি বল্‌ছিস্ তুই? দমবন্ধ!"

হাঃ! এ কি ভয়ানক—এ কি ভয়ানক!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচমিনিটের হের-ফের

এ কি অসম্ভব নয়? এই অভাগী আত্মহত্যা করিল কেন?

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝিয়াছি বটে, কিন্তু আত্মহত্যার আসল কারণটা আজও বুঝিলাম না। হইতে পারে আমার আকস্মিক প্রেমোচ্ছ্বাসে সে ভয় পাইয়াছিল। —আমাদের শেষ-দেখার সময়ে সে আমাকে বলিয়াছিল, "আজ থেকে আমি তোমার দাসী হব,"—হয়ত আপনার কথামত কাজ করিতে পারিবে না বলিয়াই ভয় পাইয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। হ্যাঁ, তাই বোধ হয়!—বেশ বুঝা যাইতেছে আমাকে সে বিশ্বাস করিত না। হায়, যদি আগে বুঝিতাম! আমার ভালবাসায় সে ভয় পাইয়াছে, বুঝিলে কখনই আমি এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতাম না!

আচ্ছা, সে কি সত্যই আমাকে শ্রদ্ধা করিত না?—এফিমোভিচের সঙ্গে সেই ব্যাপারের পর হইতে, সে আমাকে আর ঘৃণা করিত কি না, এ-কথাটা ত একদিনও ভাবিয়া দেখি নাই! হায়, আমাকে ঘৃণা করিয়াও যদি সে বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলেও ত আমি সুখী হইতাম!

আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়াও অনায়াসেই হইতে পারিত! আমি তাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলাম, সে-ও তাই! আর দুই-চারিদিন যদি সে অপেক্ষা করিত তবে ত সব ধন্দই মিটিয়া যাইত!

আমি দীর্ঘসূত্রী বলিয়াই এমন অঘটন ঘটিল!—আমি যদি আর পাঁচমিনিট আগে বাড়ী ফিরিতে পারিতাম, তাহা হইলে সমস্ত ব্যাপারটা হাল্‌কা মেঘের মত সরিয়া যাইত, এমন ভয়ানক সংকল্প তাহার মাথায় ঢুকিতনা। পাঁচ মিনিটের হের-ফেরে আজ আমি আবার একাকী! আজ আর এখানে কিছু নাই—আছে শুধু দুঃখ, শুধু যাতনা।

আমি ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, ঘুরিতেছি। কত সময় গিয়াছে, কিন্তু পাঁচমিনিটের হেরফের লইয়া কেন আমি এত মাথা ঘামাইতেছি, তোমরা কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? ভাবিয়া দেখ, যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা নিরীহ নির্দ্দোষকে বাঁচাইবার জন্য মৃত্যুর আগে প্রায়ই লিখিয়া রাখিয়া যায়, "আমার মৃত্যুর জন্য আর কেহ দায়ী নহে!"—কিন্তু এরূপ কিছুই লিখিয়া রাখিয়া যা নাই। মৃত্যুর সময়ে লুকেরিয়া তার সঙ্গে ছিল। সুতরাং লুকেরিয়াকে লোকে দুষিতে পারিত। ভাগ্যে রাস্তার চারজন লো আমার স্ত্রীকে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়া ছিল, বেচারী লুকেরিয়া তাইত এ যা মানে মানে বাঁচিয়া গেল! আমার যে কিছু লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, আত্মহত্যা জন্য পূর্ব্ব হইতেই সে প্রস্তুত ছিল না জানালার ধারে যখন একলা সে দাঁড়াই ভাবিতেছিল, তখনই হঠাৎ তাহার মাথ মৃত্যুর কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ম ঝোঁকে মাথা ঠিক রাখিতে না পারি এ কাজ সে করিয়া ফেলিয়াছিল। পী দুশ্চিন্তায় তাহার জীবনী-শক্তি দুর্ব্বল হ

গড়িয়াছিল, মনের উপর তার কোন জোর ছিল না। তা-নহিলে, এখন হয়ত সে জীবন্ত অবস্থাতেই আমার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি থাকিলে সে মরিত না—কখনই মরিত না! পাঁচ-মিনিটের হের-ফের!

তাহার ঐ মৃতদেহ এখন কি কঠোর দেখাইতেছে! চোখের পাতাগুলি ঠিক তীরের মত তার গালের উপর নত হইয়া আছে। তার মাথা ফাটে নাই, শরীরের কোথাও এতটুকু হাড় ভাঙ্গে নাই। ভিতর হইতে রক্ত ছুটিয়া অভাগীর দমবন্ধ করিয়া দিয়াছে,—সে রক্তও একঝলক মাত্র!

তাহাকে যদি আমি কবরে লইয়া যাইতে না দি? সকলে যদি তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়,—ওঃ, এ-কথা ভাবিতে গেলেও যে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়! কিন্তু তাকে লইয়া যাইবে—লইয়া যাইবেই! —ওগো, আবার আমার বাড়ী পোড়ো-বাড়ীর মত হইয়া থাকিবে, আবার আমার ঘরদুখানা শূন্যতায় হা-হা করিবে, আবার আমাকে দোকানে বসিয়া একা কাজ করিতে হইবে—এ চিন্তাও যে অসহ্য!

প্রিয়তমে, তুমি অন্ধ—তুমি অন্ধ! আজ তুমি মৃত,—আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না! সে-কেমন নন্দনকানন গড়িয়া তাহার মাঝখানে তোমাকে রাখিতাম, তাহা না বুঝিয়াই তুমি চলিয়া গেলে! এ হৃদয়ে ভালবাসার যে ফুল অজস্র ফুটিয়া উঠিত, সে ফুলে আমি তোমারই পূজা করিতাম। হয়ত আমাকে তুমি কখনই ভালবাসিতে না—না-ই ভালবাসিলে? তুমি আমার বুকের কাছে-কাছে সুধু বন্ধুর মতই থাকিতে পারিতে ত! সুধু চোখে চোখ মিলাইয়াই মনের সুখে আমরা দুটিতে ঘরকন্না করিতাম! তোমার পথে আমি আমার ছায়া ফেলিতাম না—দূর হইতে আমি সুধু তোমারই পানে চাহিয়া থাকিতাম, নীরবে চাহিয়া থাকিতাম! একবার যদি আমার পানে তুমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে—তবে, তবে,—সেই এক মুহূর্ত্তের দিব্যদৃষ্টিতে আমার বুকের সব অন্ধকার মিলাইয়া যাইত! আমাকে তুমি বুঝিতে পারিতে!

হায়রে শূন্যতা, হায়রে প্রকৃতি! লোকে বলে, সূর্য্যোদয়ে বিশ্ব জীবন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সে সূর্য্যও কি প্রাণহীন নহে? এ নিখিল যে নির্জ্জীব,—এখানে মানুষের মধ্যেও জীবনের কোন লক্ষণ নাই—কেবল এক গভীর স্তব্ধতা সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে!—এই ত জগৎ! "হে মানব, পরস্পরকে ভালবাস!"—এ-কথা কে বলিয়াছে—এ কার হুকুম?

রাত এখন দুইটা।—মূঢ়ের মত, হিংস্রের মত ঘড়ির দোলকটা দুলিতেছে, ঠক্ ঠক্ ঠক্! এ ঠক্‌ঠকানির বিরাম নেই! বিছানার উপর তাহার গায়ের আলোয়ান-খানি পড়িয়া রহিয়াছে!—ও যেন তার-ই পথ চাহিয়া আছে, ও যেন তাহারই ছোট তনুখানি আলিঙ্গন করিবার জন্য উন্মুখ!

কিন্তু... ... কাল যখন উহাকে কবরে লইয়া যাইবে, তখন আমি কি করিব! আমার দশা কি হইবে?

সমাপ্ত

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাদ্রাজে বিজ্ঞান-সম্মিলন

গতবৎসর (১৯১৫) জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলন উপলক্ষ্যে আমাদের মাদ্রাজ গমনের প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সি, ভি, রমন মহাশয়। ইনি মাদ্রাজবাসী; কলিকাতায় Assistant Accountant General-এর কাজ করেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় ৺মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত Indian Science Associationএ পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করিয়া থাকেন। ইনিই আমাদের মাদ্রাজে থাকিবার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইলেন, এবং ডাঃ পি, সি, রায় ও ডাঃ ডি, এন, মল্লিককেও পাকড়াও করিলেন। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক আমরা তিনজনেই এই সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম।

মাদ্রাজ রওনা হইবার আগে মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ South Indian Association হইতে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান-সম্মিলনের সম্পাদক ডাঃ সাইমনসেনকর্ত্তৃক আমি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম।

যথাসময়ে মাদ্রাজ যাত্রা করিলাম। রাস্তায় দেখিবার জিনিস অনেক, তন্মধ্যে প্রধান চিল্কাহ্রদ। পথে একটা জিনিস চক্ষে বড়ই ঠেকিল, আমরা ক্রমশঃ যতই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে অগ্রসর হইতেছিলাম তালবৃক্ষের



"তালীবনরাজিনীলা"

সারি তত্তই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন, রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনায় কালিদাসের উল্লিখিত "তমালতালীবনরাজি-নীলা" লবণাম্বুরাশির বেলাভূমির কথা মনে পড়িল। তাইত দূরে "বেলা লবণাম্বুরাশি" আর এই তালবৃক্ষের অফুরন্ত শ্রেণী! এই পথেই ত রঘু দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলেন! এত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পথে একটা বড় বিঘ্ন এই ছিল যে আমাদের মধ্যে বটানিষ্ট না থাকাতে তমালবৃক্ষ কেহ সনাক্ত করিতে পারিলেন না।

মাদ্রাজ সহরে পৌঁছিয়াই আমাদের প্রথম কাজ হইল সমুদ্রদর্শন। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ছেলেবেলা হইতে সমুদ্রের একটা অনিন্দ্য-সুন্দর ছবি কল্পনায় মানসপটে অঙ্কিত আছে। বাস্তব জিনিসটা এ ছবির কাছে ম্লান হইয়া যাইবে কি না এ ভয় ছিল, কিন্তু সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া মনে হইল যে, মানসসম্মুখে সমুদ্রের যে বাস্তব ছবি দেখিতেছি তাহার বর্ণনা ভাষায় সম্ভবে না, এ তরঙ্গচঞ্চল অসীম বারিধি-বিস্তারের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য কেবল নয়ন-মনেরই উপভোগ্য।

১২ই জানুয়ারী। প্রথম দিন আমরা সি, ভি, রমন মহাশয়ের বাটীতে তাঁহাদের মেয়েদের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন আহার করিলাম। দেখিলাম, মাদ্রাজের ব্রাহ্মণের পক্ষে মাছমাংস একেবারে নিষিদ্ধ। ব্যঞ্জনে লঙ্কার ঝাল বড়ই বিষম—এমন-কি—পূর্ব্ববঙ্গের লঙ্কা-ভক্ত অধিবাসীরাও এত ঝাল খান না। তেঁতুলের অম্বল মাখিয়া লঙ্কার ঝোল দিয়া অন্নাহার শুনিলাম মাদ্রাজের একরকম প্রশস্ত আহার। মাদ্রাজে অবরোধপ্রথা না থাকাতে মেয়েরাই পরিবেষণ করিলেন। বাটীর বৌ-ঝিদের মাথায় কাপড় নাই। কিন্তু শুনিলাম বিধবারা মাথায় কাপড় দেন, যদিও ঘোমটা দেন না। দেখিতেছি অবরোধ ও জেনানাপ্রথা এক উত্তর-ভারতেই আবদ্ধ; উহা মাদ্রাজেও



সমুদ্রগামী দেশী নৌকা

নাই, বোম্বাই অঞ্চলেও নাই। তবে মাদ্রাজের মুসলমানদের মধ্যে অবরোধ প্রথা খুব প্রচলিত।

বেলা দুইটার সময়ে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিতে গেলাম। কলেজটি সমুদ্রের ধারেই। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী তত ভাল নহে, যথেষ্ট স্থান না থাকাতে বন্দোবস্ত কতকটা এলোমেলো ধরণের। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে একজন মাদ্রাজী রিসার্চ স্কলার, সাইমনসেন সাহেবের সঙ্গে গবেষণা করিতেছেন। তিনি আমার বক্তৃতায় সহকারীর কাজ করিতে স্বতই স্বীকৃত হইলেন। ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী খুব ভালই দেখিলাম। এ ছাড়া বাইও-লজিক্যাল ল্যাবরেটরীও আছে। ল্যাই-ব্রেরীটি অতি সুন্দররূপে সাজান। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জোন্স সাহেব ও অনেকগুলি অধ্যাপকের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ত্রিবাঙ্কুর কলেজের রসায়নের অধ্যাপক গিব্‌সন্ সাহেব আসিয়াছেন। ইনি সাইমনসেন সাহেবের সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর হইতেই গবেষণা করিয়া থাকেন। সাড়ে চারিটার সময় কেমি-ক্যাল ল্যাবরেটারীতে আমার এক বক্তৃতা ছিল। সাইমনসেন সাহেব সভাপতির কাজ করিলেন। সভাস্থলে প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজের অন্যান্য কলেজের বি,-এ ক্লাসের রসায়ন শাস্ত্রের অনেক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এখানে এম,-এ বা এম,-এস,-সি ডিগ্রির জন্য পঠনপাঠন হয় না। তিন বৎসরে, বি,-এ-ডিগ্রির অনারের জন্য ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ-পরীক্ষা দেয়। তবে এই অনার-ডিগ্রির পুস্তকাবলী আমাদের এম,-এর ধরণের এবং অনারপাশ-ছেলেরা দুই বৎসর পরে ২৫৲ টাকা ফি দিয়া এম,-এ উপাধি পাইয়া থাকে। বক্তৃতার পর, ছেলেদের সঙ্গে দেশের বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের সমবায় প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল।

ছেলেদের আগ্রহে প্রেসিডেন্সী কলেজের হোষ্টেল দেখিতে গেলাম। হোষ্টেলটি দেখিতে অতি সুন্দর—ভিতরে একটি বাগান থাকাতে উহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। ছেলেদের সৌজন্য ও ভদ্র অভ্যর্থনায় পরম প্রীত হইলাম। ছেলেরা হোষ্টেল হইতে একখানি সাময়িক পত্রিকা বাহির করিয়া থাকে। পত্রিকাখানি কেবল ইংরাজিতে লেখা। বঙ্গদেশে আজ কাল অনেক কলেজ হইতে এইরূপ College magazine বাহির হইতেছে, কিন্তু সেগুলিতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষাতেই রচনা প্রকাশিত হয়। আমি মাদ্রাজী ছাত্রদিগকে পত্রিকাখানিতে ইংরাজি ছাড়া তাহাদের মাতৃভাষাতেও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় না কেন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, মাদ্রাজে ত একটি ভাষা প্রচলিত নাই; তামিল ও তেলেগু ছাড়া কলেজে "মালায়াম"-ভাষাভাষীও আছেন।

সি, ভি, রমন মহাশয় আমাদের বাসের জন্য একটি বাগানবাড়ী ঠিক করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় সেইখানে পৌঁছিলে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা বাজার

করিয়া দিল। মাদ্রাজের একজন উকিল সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমাদের যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ইঁহার নাম মিষ্টার সুব্রমনিয়াম্। তিনি দেখিলাম বাঙ্গালীজাতির বড়ই ভক্ত। তাঁহার মতে ভারতের জাতিবৃন্দের মধ্যে বাঙ্গালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৩ই জানুয়ারী! সহর দেখিতে বাহির হইলাম। মনে করিয়াছিলাম যে মাদ্রাজ সহরটা কলিকাতার মতই বড়সড়। কিন্তু দেখিয়া বুঝিলাম কলিকাতার সঙ্গে মাদ্রাজের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কলি-কাতার মত এত বড় বড় বাড়ী এত লোকজন, এত রাস্তা ঘাট, এত ভিড় মাদ্রাজে আদৌ নাই। ভবানীপুর মেটে-বুরুজ প্রভৃতি কয়েকটি সহরতল্লীকে একত্র করিলে মাদ্রাজের মত দেখাইবে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রামগাড়ী আছে বটে, কিন্তু তাহা দুই একটি প্রশস্ততর রাস্তাতেই নিবদ্ধ—দেখিতেও ভাল নয়। কলিকাতার ট্রামগাড়ীতে দুইখানা গাড়ী থাকে মাদ্রাজের ট্রামে মাত্র এক খানি গাড়ী। মাদ্রাজের প্রধান দুইটি রাস্তার নাম Sea-beach Road ও Mount Road। প্রথমোক্ত রাস্তাটি অতি সুন্দর, সমুদ্রের ধার দিয়া বরাবর গিয়াছে। ইহারই উপর প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় গৃহ, হাইকোর্ট, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ, লাইট হাউস ও হারবার প্রভৃতি সরকারি গৃহরাজি নির্ম্মিত। একদিকে সমুদ্র ও অপর দিকে এই হর্ম্ম্যরাজিতে এই রাজপথটি অতি রমণীয়। শুনিলাম এইরূপ আর একটি রাজপথ আছে এবং ভেনিসের রাজপথের আদর্শে তাহা নির্ম্মিত। মাউণ্ট রোডের

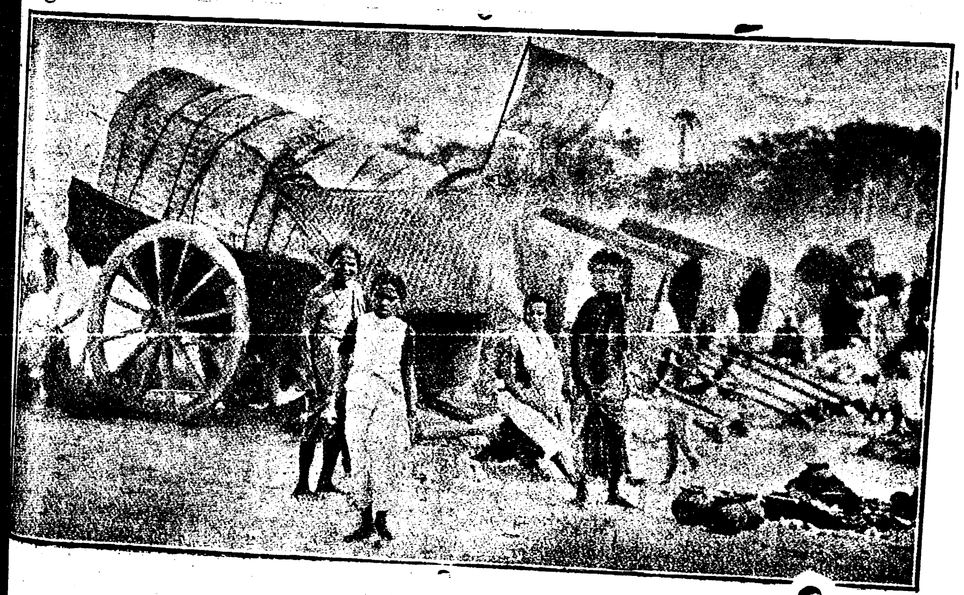

মাদ্রাজের গোযান শ্রেণী

উপর কলিকাতা চৌরঙ্গির সাহেব-দোকানের মত অনেক দোকান আছে।

মাদ্রাজে প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান (অবশ্য সমুদ্র ছাড়া) মৎস্যাগার (aquarium)। সমুদ্রে যত প্রকার ও যত রংএর মাছ পাওয়া যায় তাহাই এখানে জীবন্ত অবস্থায় সংগৃহীত। কাঁচ-নির্ম্মিত চৌবাচ্ছায় মাছগুলি জিয়ানো। অনবরত জলের মধ্য দিয়া বুদ্বুদাকারে বাতাস চালনা করা হইতেছে। সকলে বোধ হয় জানেন না যে, পুকুর ও নদী প্রভৃতির জলে দ্রবীভূত বায়ু (dissolved air) আছে। এই বায়ুর সাহায্যে মৎস্যকুল জীবিত থাকে। সেইজন্য একোয়ারিয়ামে চৌবাচ্ছার জলে অনবরত বায়ু বদলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাছগুলির পাখ্না ও রং দেখিলে চক্ষু ফিরানো যায় না। রামধনুর সপ্তবর্ণের কথা জানি, কিন্তু এই একোয়ারিয়ামে যে কতরকম রংএর মাছই দেখিলাম তাহা বলা যায় না। আবার এই সকল রংএর কমনীয়তাও বর্ণনার অতীত। শুনিলাম সমগ্র এসিয়াখণ্ডে মাদ্রাজের মত সুন্দর 'একোয়ারিয়াম' আর একটিও নাই।

বিকালে আমার Manufacture of Iron in Ancient India সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তৃতার উদ্‌যোক্তা South India Association-এর সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয়। ইনি মাদ্রাজের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন, এখন মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। সভার স্থান ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি বড় হলে। সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্‌সেলার মান্যবর Sir John Wallis মহোদয়। সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। আমরা অধ্যাপক মানুষ, কলেজে ক্লাসে বক্তৃতা করিতেই অভ্যস্ত; এত বড় সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিবার সময় যথেষ্ট হৃৎকম্প হইয়াছিল। তবে সুবিধার কথা এই ছিল যে, ইতিপূর্ব্বে বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে আমি একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। সেই পুস্তকের ছবিগুলি হইতে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি তৈরি করাইয়া সভায় ভারতের অতীত যুগের লৌহশিল্পের অদ্ভুত নিদর্শনগুলি সকলকে দেখাইবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। সভা ভঙ্গ হইলে অনেক বিশিষ্ট মাদ্রাজবাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইল। তাঁহারা অনেকে বলিলেন যে মাদ্রাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা নাই বলিলেই হয়, বিজ্ঞান সম্মিলন উপলক্ষে আমরা যে সুদূর বাঙ্গাল দেশ হইতে মাদ্রাজে আসিয়া বিজ্ঞানানুশীলনে সাহায্য করিতেছি, তাহাতে আমরা মাদ্রাজবাসীদের ধন্যবাদের পাত্র, ইত্যাদি।

১৪ই জানুয়ারী—আজ সম্মিলনের প্রথ দিন। বেলা ১০টার পর সম্মিলন বসিবে প্রাতে খানিকটা সহর ভ্রমণ করিয়া লইলাম মাদ্রাজবাসীদের গায়ের রং কি-রক অনেক বন্ধুবান্ধব আমাকে সে-কথা জিজ্ঞা করিয়া থাকেন। কলিকাতায় যে-সব মাদ্রাজী দেখা যায় তাহাদের অধিকাং কালো। মাদ্রাজে দেখিলাম যে, ই শ্রেণীর লোকেরা খুব কালোই বটে, ভদ্রশ্রেণীর লোকেদের—বিশেষতঃ মাদ্র ব্রাহ্মণদের গায়ের রং বাঙ্গালীদের গা

রংএরই মত। ইহাদের মধ্যে অনেককেই গৌরবর্ণ দেখিলাম। মাদ্রাজে পোষাকের সঙ্গে নেকটাইয়ের বড় চলন। অনেক ছাত্রের পায়ে জুতা নাই, পরনে ধুতি, মাথা অর্দ্ধেক কামানো; কিন্তু সার্টের উপর নেকটাই ঠিক লাগানো আছে! হ্যাটের বড় রেওয়াজ নাই—মাদ্রাজী পাগড়ীই সবিশেষ প্রচলিত।

সম্মিলন বসিয়াছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি ঘরে। সম্মিলনে বহু ইংরাজ ও মাদ্রাজবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়কে উপস্থিত দেখিলাম। কিন্তু সম্মিলনের উদ্‌যোক্তারা একটা মস্ত ভুল করিয়াছিলেন—তাঁহারা ছাত্রদিগের জন্য কোন রূপ বিশেষ বন্দোবস্ত করেন নাই। টিকিটের মূল্য ৫৲ টাকা দিয়া অবশ্য ছাত্রেরা আসিতে পারে না। এবারকার লক্ষ্ণৌয়ের তৃতীয় সম্মিলনে ছাত্রদিগের জন্য এক টাকার টিকিট করাতে অনেক ছাত্র সম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিল! সে যাহা হউক



সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার "কাটামারাণ" নামক নৌকা

সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হইলে মাদ্রাজের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড সম্মিলনের পৃষ্ঠপোষকরূপে একটি সুন্দর বক্তৃতার দ্বারা প্রতিনিধিবর্গকে মাদ্রাজের পক্ষ হইতে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মাদ্রাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তারের জন্য রিসার্চ স্কলারশিপের প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানাইলেন এবং সম্মিলনের বিভিন্ন বিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ একত্রে প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন দেখিয়া তিনি আনন্দজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর সম্মিলনের সভাপতি Sergeon-General Bannermann মহোদয় তাঁহার সম্ভাষণ পাঠ করিলেন। এই সম্ভাষণে চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট এ-বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহাও বিবৃত করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের সম্ভাষণ পঠিত হইলে সম্মিলনের সাধারণ অধিবেশন শেষ হইল। তাহার পর বিভাগীয় অধিবেশন হইবে। অদ্য কেবল কৃষি-বিভাগের অধিবেশন হইল। এই বিভাগের সভাপতি ছিলেন পুনা এগ্রিকালচার্য্যাল কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাঃ হেরল্ড ম্যান। তিনি তাঁহার সম্ভাষণে এই কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের কৃষকের লাঙ্গলাদি যন্ত্র তাহার স্বল্প ভূমি কর্ষণের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তাহার প্রধান অভাব জল। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে ভারতীয় কৃষকগণকে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইতে হয়। অতএব কৃষির উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে ক্ষেত্রের জল সরবরাহের ব্যবস্থা। যেখানে irrigation canal সম্ভবপর নহে, সেখানে artesian wells খনন করিয়া ক্ষেত্রে জলের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এরূপ উপায়ের দ্বারা আফ্রিকার অনেক মরুময় প্রদেশকে শস্য-শ্যামল করা হইয়াছে। কৃষি-বিভাগে অতি অল্পসংখ্যক প্রবন্ধই পঠিত এবং আলোচিত হইল।

বৈকালে আমার বক্তৃতার কথা ছিল। এই বক্তৃতার আয়োজনও South Indian Association-ই করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Development of Synthetic Chemistry & Elucidation of Material Creation। সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সুযোগ্য সদস্য মিষ্টার (এখন Sir) শিবস্বামী আয়ার মহোদয়। বৈকাল হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি হইতে ছিল। বৃষ্টির মধ্যেই সভায় উপস্থিত হইলাম। এ-দিনও যথেষ্ট লোক-সমাগম দেখিলাম এবং অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মাদ্রাজবাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইল।

বক্তৃতায় প্রদর্শনীর অনেকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল—সেগুলি সাইমনসেন সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ধার দিয়াছিলেন। সভার সহকারীর কাজ করিয়াছিলেন রসায়নের রিসার্চ-স্কলার শ্রীমান নায়েক।

পর দিবসে কথা-প্রসঙ্গে শুনিলাম যে এই বক্তৃতায় একটি মন্তব্য সভাপতি মহাশয়ের অপ্রীতিকর হইয়াছিল। আমি একস্থানে হীরকের রাসায়নিক স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম "Also for the vanity of man-kind the chemist has

been able to show that diamond, the most precious of all substances, is nothing but a variety of charcoal, one of the least precious substances in the world. এখন, আমি দেখি নাই যে, সভাপতি-মহাশয় দুই কানে সোনার মাকড়িতে দুই খণ্ড হীরক পরিয়াছিলেন। শুনিলাম এইরূপ মাকড়ি পরা মাদ্রাজে পুরুষ-মহলে প্রচলিত। সভাপতি-মহাশয় বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহারই কানের হীরক লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকেই Vain বলিয়াছি! আমি ব্যাপারটা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না এবং আমার সংবাদদাতা মহাশয়কে বলিলাম, তিনি যেন সভাপতি মহাশয়কে বলেন যে, আমি তাঁহার হীরকের মাকড়ি পরিধানের কথা আদৌ অবগত ছিলাম না।

১৫ই জানুয়ারী—অদ্য Physics, Chemistry, Botany প্রভৃতি বিষয়ে সম্মিলনের বিভাগীয় সভার অধিবেশন। ১০টার পর সভা বসিবে। সভায় গিয়া দেখিলাম যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের এক এক ক্লাসে এক একটি শাখার অধিবেশন হইয়াছে। আমি রসায়ন শাখার অধিবেশনেই উপস্থিত হইলাম। এখানে ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সভায় আমরা তিন চারি জন বাঙ্গালী ও ডাক্তার সাইমেনসেন প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও সহকারী ছাড়া বাঙ্গালোরের Tata Institute of Science হইতে ডাঃ সড্‌বরো, ডাঃ ওয়াটসন, ত্রিবাঙ্কুর কলেজ হইতে অধ্যাপক গিবসন, কলম্বো হইতে অধ্যাপক জোসেফ প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালীর একটি বিষয়ের প্রতি আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিজ্ঞান-সম্মিলনে সকল শাখার পঠিতব্য প্রবন্ধের নাম পূর্ব্ব হইতে মুদ্রিত করিয়া সদস্যগণকে দেওয়া হয়। তাহাতে এই সুবিধা, প্রত্যেক সদস্য জানিতে পারেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে সভায় আলোচনা হইবে এবং সেই সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য সকলে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারেন। বাস্তবিক, আমি দেখিতে পাইতেছি বিজ্ঞান-সম্মিলনে প্রবন্ধপাঠান্তে যে আলোচনা হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। সাহিত্য-সম্মিলনীতে এখন যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে সদস্যগণ সভায় গমনের পরও জানিতে পারেন না যে, কোন্ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ হইবে। সেইজন্য আমার মনে হয়, বিজ্ঞান-সম্মিলনের এই প্রথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত হইলে আলোচনা আরও গভীর ও কার্য্যকরী হইবে।

প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনায় তিন চারি ঘণ্টা কাটিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মৌলিক প্রবন্ধ ভিন্ন অন্য প্রবন্ধ বিজ্ঞান-সম্মিলনে পঠিত হয় না। বলা বাহুল্য রসায়ন শাখায় পঠিত সকল প্রবন্ধই মৌলিকতাপূর্ণ ছিল। সভাপতি-মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে বলিয়াছিলেন, যে-সকল প্রবন্ধ সভায় পঠিত হইল সেগুলি

বিলাতের যে-কোনও বিজ্ঞান সভার উপযুক্ত। ডাঃ সড্‌বরো সভাপতি-মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমি সমস্তক্ষণ রসায়ন-বিভাগে উপস্থিত থাকাতে অন্যান্য বিভাগে যাইতে পারি নাই। তবে সকলের নিকট শুনিলাম যে, প্রত্যেক বিভাগেই উচ্চদরের মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় মিঃ রমন Investigation in accoustics সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড বাহাদুরের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইলাম, এবং সেখানকার সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইলাম।

১৬ই জানুয়ারী—আজ সম্মিলনের শেষ দিন। বক্তৃতা, সভা ও নিমন্ত্রণের দৌরাত্ম্যে মাদ্রাজ সহর দেখা খুব অল্পই হইয়াছে। আজ আবার তিন-তিনটা নিমন্ত্রণ অথচ সহর দেখাও চাই। এদিকে সকাল হইতে ঝুপঝাপ বৃষ্টি। মাদ্রাজে আসিয়াই এখানে কত বাঙ্গালী আছেন সে খোঁজ লইয়াছিলাম। শুনিলাম মাদ্রাজে বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়—গভর্ণমেণ্ট আফিস প্রভৃতিতে দুই-চারজন থাকিতে পারেন কিন্তু উত্তর-ভারতের যেখানেই গিয়াছি সেইখানেই বাঙ্গালীদের এক-একটি ছোট বড় colony দেখিয়াছি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালী বড় আসে নাই। এখানে বাঙ্গালীদের একটি কীর্ত্তির কথা উল্লেখযোগ্য —সেটি রামকৃষ্ণ আশ্রম। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বিবেকানন্দের পথপ্রদর্শিত সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী আজ কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে সেবাশ্রম



"রেকলা" নামক অশ্ব বা গো-যান

আতুরাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দীন-দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত। সুদূর মাদ্রাজেও একটি রামকৃষ্ণ আশ্রম আছে জানিয়া এক দিন দেখিতে গেলাম। সেখানে দুইজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। এক জন আমারই ছাত্র। এই ছাত্রটি রাজসাহী কলেজে বি-এস-সি পাশ করিয়া বিবাহাদি করিয়া এই দলভুক্ত হইয়াছে এবং মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া আশ্রমের কার্য্যে যুক্ত আছে। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া একটি ছাত্রাবাস খুলিয়াছেন এবং সেখানে পঁচিশ-ত্রিশজন দরিদ্র মাদ্রাজী বালককে বেতন ও আহারাদি দিয়া কলেজে পড়াইতেছেন। এই আশ্রম হইতে একখানি পত্রিকাও তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন।

আজ সম্মিলনের শেষ দিন। এ কয় দিন ডাঃ রায়-মহাশয় সকালে বিকালে সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া বেড়াইয়াছেন। ডাঃ মল্লিক আসিয়া অবধি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এখানেও ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা আছে ও দশবার জন মাদ্রাজী ব্রাহ্মও আছেন। আজ সকাল হইতে বাদল নামিয়াছে। সেই বৃষ্টিতেই আমরা সকালে একটি ছাত্রাবাসে ছেলেদের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গেলাম। এই ছাত্রেরা এ কয় দিবস আমাদের বহু পরিচর্য্যা করিয়াছে।

সকালে 'লাইট হাউস' দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে ভূবিদ্যা ও মানব-বিদ্যা বিষয়ক সম্মিলনের শাখা অধিবেশনে যাইতে পারিলাম না। বেলা ২টার সময় সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহ-সভার অধিবেশন ছিল। তাহাতে স্থির হইল, পর বৎসর (১৯১৬) লক্ষ্ণৌয়ে সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে।

বেলা ৪টার সময় বাঙ্গালীভক্ত মিঃ সুব্রমনিয়াম-মহাশয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সেখান হইতে Surgeon-general Bannermann-এর বাটীতে সান্ধ্যসম্মিলনীতে রওনা হইলাম। বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী আনী বেসান্তকে দেখিলাম। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মাদ্রাজের সহরতল্লী আড্ভেয়ার নামক স্থানে এখন তাঁহার প্রধান আস্তানা। এখানে আসিয়া তিনি New India নামক একখানি দৈনিক কাগজ বাহির করিয়াছেন। এই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার সংবাদ-পত্রখানিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার যথেষ্ট ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় যাইবার ট্রেন। সেইজন্য এখানে অল্প সময় থাকিয়াই ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিলাম। ষ্টেশনে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, প্ল্যাটফর্ম্মে বহু ছাত্র ও কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদিগকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত। মাদ্রাজবাসীরা এ কয়-দিবস আমাদের এত যত্ন করিয়াছিলেন যে, আমরা বিদেশে আসিয়াছিলাম সে কথা একবারও মনে হয় নাই। তাঁহাদের আন্তরিক সেবা ও যত্নের কথা ভুলিবার নহে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

দারোগাগিরির একটুকরা

ভাটা আরম্ভ হইয়াছে অনেকক্ষণ, কাজেই নৌকা খুলিয়া দিলাম। খাবার জিনিষগুলি শ্যামলালবাবুর নৌকাতেই ছিল, প্রস্তাব হইল যে, রান্নার সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকা ডেকলতলার দিকে অগ্রসর হইবে। শ্যামলালবাবুর নৌকাখানা আমাদের আগে আগে চলিতে লাগিল।

সে নৌকাখানা ছিল ছোট, কাজেই দেখিতে দেখিতে সেখানা আমাদের চোখের আড়াল হইয়া গেল। আমি ও কেদারবাবু রাত প্রায় নয়টার সময়ে থানার ঘাটে পৌঁছিয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলাম। তখন চারিদিক অন্ধকার—ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্যামলালবাবুর তল্লাস করিলাম, শুনিলাম তিনি একটা জরুরি মোকদ্দমায় ঘাটে না নামিয়াই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন! বাঃ! অত রাত্রে বাজার-হাটও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বাজারেও কিছু মিলিল না। বিরক্ত হইয়া আমরা সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

একে গভীর অন্ধকার রাত্রি,—তার উপর প্রবল বৃষ্টি ও কন্‌কনে বাতাস! জলে নদী ও মাঠ একাকার হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একমিনিটের জন্যও রামদীন মাঝিদিগকে নৌকা বাঁধিতে দিলনা। কিন্তু তবু পথ যেন আর ফুরাইতে চায় না! ডেকলতলা হইতে কল্যাণপুর আসিতে কোনমতেই একরাত্রি লাগিতে পারে না, অথচ ভোর-বেলায় দেখা গেল, কল্যাণপুরের কোন চিহ্নই নাই!

আমাদের মধ্যে কেদারবাবুর এই অঞ্চলের পথঘাট জানা ছিল। ভোরবেলা বৃষ্টি থামিলে তিনি ছাপ্পড়ের বাহিরে আসিয়াই বলিলেন, "এ কিরে মাঝি! এ কোথায় নিয়ে এসেছিস্? এ'ত কল্যাণপুরের রাস্তা নয়,—এ'যে খল্‌সে-মারির বিল! সর্ব্বনাশ করেছিস্,—এখন উপায়?" কোথায় কল্যাণপুর গিয়া স্নানাহার করিয়া তিন দিনের পর একটু পরিতৃপ্তি লাভ করিব,—তা' নয় এই অকূল সমুদ্রে পড়িলাম! চারিদিকে অসীম সমুদ্রের মত জল থই থই করিতেছে,—বহুদূরে দিগ্বিলয়রেখার প্রান্তসীমায় দুই-একটী গ্রামের অস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহার কোনটীই দুই ক্রোশের কম দূর হইবে না! মাঝি-মাল্লারা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল,—রামদীন সিং ত চটিয়াই লাল,—মাঝিকে মারে আর কি!

অনুশোচনা করা বৃথা। কাজেই মাঝিকে একখানি গ্রাম লক্ষ্য করিয়া নৌকা বাহিতে আদেশ করিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় তথায় উপস্থিত হওয়া গেল। নৌকা হইতে নামিয়া সকলকে সাবধান করিয়া বলিলাম, "দেখো, তোমরা কেউ কোন কথা কোয়ো না—আমি যা করি, চুপ করে তাই দেখে যাও।"

ঘাটে পান্‌সী ভিড়িতেই বালক বৃদ্ধ যুবা অনেকে কৌতূহলী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। আমি উহাদের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া সামনের একখানা বাড়ী দেখাইয়া বেশ মুরুব্বি-আনা চালে বলিলাম, "এ বাড়ী কার হে বাপু?" একজন প্রাচীন বয়স্ক লোক সম্মুখে আসিয়া বলিল, "সেবা দেই কর্ত্তা, বাড়ী আমারই।"

কি নাম তোমার?

আজ্ঞে আমার নাম বিশ্বনাথ মণ্ডল। আমরা পোদেরা।

তোমার নাম বিশ্বনাথ? তোমার বাপের নাম কি?

আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম বিশ্বনাথ, আমার ঠাকুরের নাম ছিল গয়ানাথ মণ্ডল।

ওঃ তুমি খল্‌সে কোঠার গয়ানাথ মণ্ডলের পুত্র বিশ্বনাথ মণ্ডল?

বিশ্বনাথ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। রামদীনের "লাল পাগড়ী আর কালো কুর্ত্তা" দেখিয়া আমরা যে "সরকারী" লোক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। "সরকারী-লোক"কে পাড়াগাঁয়ে জ্বর ওলাওঠা প্লেগ বসন্তের চেয়ে কেহ কম ভয় করে না। বিশ্বনাথ ভীতিবিহ্বল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার খোঁজ করছেন কেন কর্ত্তা? আমি কারো সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না, আমি পান্তা ভাত আতাসা দিয়ে খাই! তবে আজ আমার ঘাটে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ল কেন? আমি ত কোন দোষে দোষী নই কর্ত্তা!"

বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "খবর পাওয়া গেছে, তেজারতি ও মহাজনীতে তোমার বিস্তর টাকা আর, এ যাবৎ তুমি কোন ট্যাক্স দাওনি,—এবার সরকার বাহাদুর তোমার পঁয়ত্রিশ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করেছেন। আমি সেই কথা জানাতে এসেছি আর তোমার কোন আপত্তি থাকলে খাতা-পত্র দেখব।"

বিস্তারিত লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সুতরাং সংক্ষেপেই বলি। বিশ্বনাথের দৌলতে সে বেলাটা আমাদের মাছে দুধে বেশ পরিতোষ রূপেই আহার হইয়া গেল! অপরাহ্নে দুইকুড়ি হংসডিম্ব এবং একটী নধর-দেহ অজশিশু আমাদের সহযাত্রীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিলাম।

নির্দ্ধারিত দিবসে প্রেক্ সাহেব মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া আসামীগণের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিলেন। রায়প্রকাশের দিনে আবার শ্যামলাল বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম। বলা বাহুল্য, তিনি অম্লানবদনে আমার গৃহেই আতিথ্য স্বীকার ও গুরু ভোজনে তাঁহার স্ফীতোদরকে অধিকতর স্ফীত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। এবং বিদায় লইবার সময়ে আমাকে ভরসা দিয়া গেলেন যে, পুলিশ-সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া তিনি আমাকে তাঁহার সহকারী-রূপে অবিলম্বে ডেফলতলায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ জীবনে শ্যামলালবাবুর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ।

জর্দ্দাপরী

জর্দ্দাপরী ! জর্দ্দাপরী ! হিরণ-জরির ওড়না গায়
দুপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোদে পাখ্‌না মেলে যাও কোথায় ?
"যাই কোথায় ?—
হায় রে হায় !
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায় ।"

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার ?
"আবার কার ?—
এই আমার !—
কুঙ্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙায় উৎস জ্যোৎসনার ।"

জর্দ্দাপরী ! জর্দ্দাপরী ! জমাট জরীর বোর্কা গায়
রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে দুই পাখ্‌না মেলে যাও কোথায় ?
"যাই কোথায় ?—
হায় রে হায়
দরদ্ দিয়ে বুঝ্‌তে জরদ্ গরদ-গুটির দরদ-দায় ।"

ধনের ঘড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকার হার চুলে,
আলেয়া তোর চক্ষে জ্বলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে !
"চোখ ঢুলে ?—
মন ভুলে ?—
কুবের-পুরীর সোনার কবাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে ।"

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস তায় নিরাশ !
"বাস্‌রে বাস্ !
সোনার চাষ—
অম্‌নি কি হয় ? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দ্যায় কি বাস ।"

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস আঁখির ভায়,
লোভের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্‌নে ধরা [illegible]
"[illegible]
[illegible] ফিরাই পায় ?
হায় গো হায়—
পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায় ।"

জর্দ্দাপরী ! জর্দ্দাপরী ! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চলছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয় ।
"সোনার পায়
মাড়াই যায়
আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায় !"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

সমালোচনা

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ । শ্রীযুক্ত [illegible]ন্মথনাথ ঘোষ, এম, এ, এফ, এস্, এস, এফ, আর, [illegible], এস বিরচিত । কলিকাতা, ১৪৭ নং বারাণসী [illegible]ঘোষের ষ্ট্রীট, ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক [illegible]দ্রিত ও প্রকাশিত । মূল্য এক টাকা মাত্র । [illegible]ঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ [illegible]হাশয়ের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় । যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ রাখিবার ধার ধারেন না, তাঁহারা এটুকু অন্তত জানেন যে কালীপ্রসন্নের উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও অপরিসীম অর্থব্যয়ে সমগ্র মূল সংস্কৃত মহাভারতের উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ সাধিত হয় । কালীপ্রসন্ন যদি এই কাজটুকু ব্যতীত আর কিছু না-ও করিতেন, তথাপি তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল থাকিত । কিন্তু কালীপ্রসন্ন তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অর্থ-বল লইয়া শুধু মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না । "কালীপ্রসন্নের যুগ বাঙ্গালায় প্রকৃতই 'renaissance' এর যুগ ।" ভূমিকা-লেখক যে বলিয়াছেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর প্রতিভা-পুনঃ-প্রদীপ্তির যাহারা প্রবর্ত্তক, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদিগের অন্যতম । বাঙ্গালায় এই দ্বিতীয় মানসিক উদ্দীপ্তির রোশনাইয়ে যাহারা মশাল ধরিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদিগের একজন" এ কথা খুব ঠিক । তখনকার কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা সংঘাতে প্রাচ্যের সকল বিশেষত্ব ভীষণ দোলা পাইয়াছিল—সেই দারুণ দুর্দ্দিনে সর্ব্ব-সুখে সুখী, বিপুল সম্পত্তিশালী কালীপ্রসন্ন তাকিয়ায় ঠেশ্ দিয়া অলস-বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া মনুষ্যত্বের অপমান করেন নাই—তিনি তাঁহার প্রভূত অর্থ, বিশিষ্ট প্রতিভা এবং যৌবনের সকল উদ্যম-অবসর লইয়া বাঙ্গালায় মনুষ্যত্ব-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন ; নানাবিধ সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহা কাজে খাটাইতে ক্ষান্ত ছিলেন না ; সর্ব্ব প্রকার সৎকার্য্যে অকাতরে সাহায্য করিয়াছিলেন ; এবং বঙ্গ সাহিত্যে সেই পণ্ডিতী-ভাষার যুগে অত্যন্ত সহজ ঘরোয়া বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্রূপাত্মক রচনা

প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার তণ্ডামির আবরণ-মোচনে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার "হুতোম-প[illegible] একটি দিক উজ্জ্বল রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, এমন অসাধারণ কর্ম্মবীর তরুণ বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন! বাঙ্গালীর আরও দুর্ভাগ্য যে এই কর্ম্মবীরের পরিচয় লইবার জন্য এতদিন বিন্দুমাত্র উদ্যোগ দেখা যায় নাই! সম্প্রতি গ্রন্থকার বিস্তর পরিশ্রমে এ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি সবিনয়ে কহিয়াছেন, "আমি এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড লইয়া বাণীমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। যে শিল্পিগণ আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসরূপ স্তম্ভ-নির্ম্মাণে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা যদি ইহা ব্যবহারোপযোগী মনে করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ভারবাহীর কার্য্যের সমালোচনা নাই, তাহার কার্য্য প্রশংসা ও নিন্দার বহু নিম্নে।" আমাদের কিন্তু মোটের উপর গ্রন্থখানি ভালই লাগিয়াছে। ইহাতে লেখকের চরিত-রচনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংগ্রহ নিপুণ, সমাবেশ-শক্তি নিপুণতর। রচনায় প্রাঞ্জলতা আছে, লেখার গুণে রচনাটিতে লেখক প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন—শুধু ঘটনার কাঠামোটুকু ধরিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কালীপ্রসন্নের উদার মহান হৃদয়ের পরিচয়ও তিনি দিতে পারিয়াছেন, অথচ তাহারই মধ্য দিয়া বাঙ্গালার অতীত যুগের একটি মনোজ্ঞ ছবি দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনার কোথাও একটা অসংযত উচ্ছ্বাস বা মিথ্যা আড়ম্বর নাই, ইহাই এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব! তবে ভাষা আর একটু সহজ ও সরল হইলে ভাল হইত। বাঙ্গালার বহু মনস্বীর চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—হেমেন্দ্রবাবুর ভূমিকাটি সুন্দর।

শ্রীমাতৃশ্লোক-শতকম্। বঙ্গানুবাদরসোদ্দীপনী-টীকা-সমন্বিতম্। তত্র চ শ্রীশ্রীজগদীশস্তোত্রম। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টরাজেন মুদ্রিতম্। কলিকাতা, হাওড়া, কাদম্বিনী যন্ত্রে জয়দেব মুদ্রাযন্ত্রে চ মুদ্রিতম্। মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়াংশ চারি আনা। সংস্কৃত শ্লোক-রচনায় লেখকের দক্ষতা আছে। ভাবও গম্ভীর।

চন্দন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। কলিকাতা, মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। [illegible]খানি কবিতা-গ্রন্থ—অনেকগুলি খণ্ড কবিতা ইহাতে [illegible]গুলিতে বিষয়-বৈচিত্র্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] আছে—তবে কোন কবিতাতেই কবিত্বের তেমন ছাপ দেখিলাম না—ছন্দও অনেক স্থলে পঙ্গু, আড়ষ্ট।

পুষ্পমঞ্জরী। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনিখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চম্পিও, ব্রহ্মদেশ। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত বারোটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলি নানা দেশের নানা জাতির পাত্র-পাত্রী লইয়া লিখিত—তাহার মধ্যে একটি রূপকও আছে। অনেকগুলি গল্পেরই উপাখ্যানে বৈচিত্র্য আছে—তবে লেখক রঙের উপর রঙ লেপিয়া সেগুলিকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ভাষায় অত্যন্ত মুদ্রাদোষ—কবিত্ব ফুটাইবার চেষ্টায় গল্পের দম অনেক জায়গায় বন্ধ হইয়াছে। শব্দ-চিত্র গড়িবার একটা উৎকট প্রয়াস পাঠককে প্রতি পত্রে কাতর করিয়া তুলে। এই সকল মুদ্রাদোষ ত্যাগ করিয়া সহজ ভাবে লিখিবার চেষ্টা করিলে লেখক গল্প লিখিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে হয়। রোমান্সে তাঁহার শক্তি মন্দ নয়—তবে ভাষার দিকে বিলক্ষণ নজর রাখা প্রয়োজন। এমন 'জ্যাবড়া' করিয়া রঙ লেপিলে সব মাটি হইয়া যাইবে। জাপানী গল্পগুলিতে কয়েকখানি চিত্র আছে।

প্রণয়-প্রলাপ। শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, গৃহস্থ পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা, বাঁধানো দেড় টাকা মাত্র। এখানি ইংরাজ কবি ম্যাকে লিখিত "Love-letters of a violinist" নামক গ্রন্থের অনুবাদ। লেখায় কবিত্ব আছে—তবে ভাষা আরও সহজ এবং সরল হইলে অনুবাদে মূলের প্রাণ-সৌন্দর্য্য বজায় থাকিত। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল।

দরিদ্রের ক্রন্দন। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। বহরমপুর শাখা সাহিত্য

[illegible]র্ত্তৃক প্রকাশিত। কাশীমবাজার সত্যরত্ন [illegible]ত। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় [illegible], "আধুনিক ধনবিজ্ঞানের সহিত দেশের [illegible]দর্শের সামঞ্জস্য রাখিয়া বৈষয়িক উন্নতি সাধনের [illegible]পন্থা ইঙ্গিত করিয়াছি। * * দেশের দারিদ্র্যের সহিত পল্লীর অবনতির যে যোগাযোগ আছে, তাহা দেখাইয়া পল্লীগ্রামের উন্নতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন এখনই না করিলে আর দেরী সহিবে না। * * * দারিদ্র্য লইয়া শুধু কি অভাবক্লিষ্ট শিল্পী, বা ধনবিজ্ঞানবিৎ আলোচনা করিবেন? শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি এমন কি ধর্ম্মের উন্নতি দারিদ্র্য-মোচন না হইলে অসম্ভব। শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক আর কতকাল শুধু কল্পনা-রাজ্যেই ঘুরিবেন? বাস্তবরাজ্যে একবার নামুন, বাস্তবের হাহাকার দুঃখবেদনার মধ্যে শিক্ষার ফল, বা ধর্ম্মের ভাবুকতা পাইবার কেহ কি কখনও আশা রাখেন?" গ্রন্থকার অধ্যাপক। এ বিষয় লইয়া বহুদিন তিনি আলোচনা করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও তিনি দাবী রাখেন। রীতিমত হিসাব ধরিয়া তিনি এদেশের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের জের কাটিয়াছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থার কারণ-নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা নিরাকরণের উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্নসংস্থান," "শিক্ষা ও ব্যবসা-প্রচার," "পল্লীচর্য্যা-বিধান" "বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্যে বণিকের আধিপত্য ও প্রতিকার" প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখক দারিদ্র্য-সমস্যার সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার যুক্তি সুদৃঢ়—ইঙ্গিত সুনিপুণ; গ্রন্থখানির আগাগোড়া কাজের কথায় পরিপূর্ণ, কোথাও বাজে উচ্ছ্বাস নাই। লেখকের সব মতের সহিত সর্ব্বত্র সকলের মিল না হইতে পারে, তবে তাঁহার মতগুলি ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য, কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। পল্লীবিষয়ক প্রবন্ধগুলি চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। এ গ্রন্থ সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মহারাজা সিন্ধিয়া কে ব্যাখ্যান। সংপাদক [illegible]রামজী দাস বৈশ্য। ১৯১৫। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। সম্পাদক মহাশয় সম্প্রতি গোয়ালিয়রের মহানুভব মহারাজা স্যর মাধবরাও সিন্ধিয়া বাহাদুরের অনেকগুলি বক্তৃতা দুইভাগে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতা গুলির অধিকাংশই হিন্দী ভাষায় রচিত—ইংরাজী বক্তৃতাও আছে। বক্তৃতাগুলি নানা বিষয়ে—সকল গুলিতেই মহারাজা বাহাদুরের কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট। মহারাজা বাহাদুর আপনার রাজ্যে সকল ব্যাপারের সহিত যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত এবং সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থার যে তিনি প্রাণ-স্বরূপ—তাহা এ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজ্যের সকল বিভাগেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। নিজের কাজ নিজে দেখিয়া করিলে তাহা যেমন সুসম্পন্ন হয়, এমন আর কিছুতে নহে। মহারাজ বাহাদুর এ নীতির অনুসরণ করেন। প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেন; এবং তাহা সার্থকও হইতেছে! ভারত-সম্রাট ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি মহারাজা বাহাদুরের ভক্তি-প্রীতি অপরিসীম। এই মহাযুদ্ধে আলস্যের মায়া কাটাইয়া সসৈন্যে তিনি জর্ম্মানির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার রাজ্য নানা বিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। এ উন্নতির মূলে যে তাঁহার উদ্যোগ নিহিত আছে, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থখানির ছাপা-বাঁধাই চমৎকার; অনেগুলি চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সমালোচক।

তুফান। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম. এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার; অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, উমা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে লেখকের সাতটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি নানাবিষয়ক—"নাম," "গীতাব্যাখ্যায় প্রলাপ," "প্রোফেসার ও অধ্যাপক," "বাঙ্গালায় চিঠিলেখা," "তিন," "বঙ্গে অকালবার্দ্ধক্য" ও "ডাকঘরের আত্ম কাহিনী।" প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতা ও তথ্যেরথ

বেশ সমাবেশ ঘটিয়াছে—স্নিগ্ধ কৌতুক-রসেরও অভাব নাই। 'নাম' প্রবন্ধে নামের মহিমার কথা বিদ্রূপচ্ছলে কীর্ত্তিত হইয়াছে—প্রবন্ধটি উপভোগ্য। "বঙ্গে অকাল-বার্দ্ধক্য" প্রবন্ধে বাঙ্গালীর অকাল-বার্দ্ধক্যের হেতু নিরূপণ করিয়া লেখক তাহা নিরাকরণের পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—প্রবন্ধটি অনুশীলনযোগ্য। বিজ্ঞান-চর্চ্চার অবসরে লেখক যে লঘু সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে একটি ছোট ত্রুটির উল্লেখ করিব—গ্রন্থ-খানির ছাপা ও কাগজের সুখ্যাতি করিতে পারি না। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক এ ত্রুটিটুকু সংশোধন করিয়া লইবেন।

বঙ্গমহিলার জাপান-যাত্রা। শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা প্রণীত। মাতৃনিকেতনের সাহায্যার্থ কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, ভারত-মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। লেখিকা মল্লিক-কন্যা, জাপানী শিল্পী ওয়েমান তাকেদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ওয়েমান তাকেদা পূর্ব্বে 'বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরিতে' সাবান-নির্ম্মাতার কর্ম্ম করিতেন, পরে নিজে 'ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরি'র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে লেখিকা স্বামীর সহিত জাপান যাত্রা করেন। সেই বৃত্তান্ত এ গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও রচনাটি উপভোগ্য, ভাষায় অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই—পাণ্ডিত্য ও চিন্তা-শীলতা দেখাইবার জন্য কোনরূপ টিপ্পনীও রচনায় স্থান পায় নাই। রচনায় এমন একটি স্বচ্ছ সরল প্রবাহ আছে যে বইখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। জাপানের অন্তঃপুরের যে ছবিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুন্দর ও মনোজ্ঞ। জাপান-সম্বন্ধে আরও দুই-একখানি সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ আমাদের চোখে প'ড়িয়াছে—সেগুলির সহিত ইহার পার্থক্য এই—এ গ্রন্থে জাপানী নারীর অন্তরের পরিচয়টুকু অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার কারণ, লেখিকা জাপানে যে কয়মাস কাটাইয়াছিলেন, তাহা অন্তঃপুরে, জাপানী নারীর দলে—তাহাও আবার খুবই আত্মীয়া-সম্পর্কে! এইটুকুই ইহার বিশেষত্ব।

স্রোতের ফুল। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। ভারতীর পাঠক-পাঠিকাগণকে এ গ্রন্থের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না—কারণ, দীর্ঘ দেড় বৎসরের উপর ধরিয়া এ উপন্যাসখানি 'ভারতী'তে ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল। এখানিকে প্রকৃতপক্ষে 'সামাজিক উপন্যাস' বলা যায়—সমাজের বহুবিধ দোষ, কুসংস্কার, ও অকল্যাণকে কল্যাণ এবং জ্ঞানের সংঘর্ষে আনিয়া বহুবিধ চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখক সুন্দর একখানি চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রচনার কৌশলে উদ্দেশ্য কোথাও উপন্যাসের রসকে ছাপাইয়া উঠে নাই। প্লটটি যেমন সুনির্ব্বাচিত তেমনি সুকৌশলে গ্রথিত। অধিকাংশ চরিত্রই এমন সুগঠিত যে উপন্যাস পড়িবার সময় ভুলিয়া যাইতে হয় যে উপন্যাস পড়িতেছি—মনে হয়, যেন আমাদের চোখে সম্মুখে রক্ত-মাংসে গড়া নর-নারীর জীবন্ত লীলা দেখিতেছি। কর্ত্তা, গিন্নি, জয়াপিসি. রোহিণী ও নিবারণ মুখুয্যে—এ কয়টি চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব নিখুঁত সৃষ্টি—ইহাদের উপর কোথাও এতটুকু উদ্দেশ্যের ছাপ পড়ে নাই! একেবারে গোটা মানুষগুলাকেই যেন সমাজের বুক হইতে টানিয়া আনিয়া গ্রন্থকার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আঁটিয়া দিয়াছেন—এটুকু কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমরা যতদূর জানি, এইখানিই গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস—সে হিসাবে বলিতে পারি, তিনি উপন্যাস-রচনায় সফলতা লাভ করিয়াছেন। ইহার অধিক বলা, বোধ হয়, সঙ্গত হইবে না—কারণ 'স্রোতের ফুল' 'ভারতী'র নিজস্ব সম্পত্তি। তাই সত্যের খাতিরে যেটুকু না বলিলে নয়, শুধু সেইটুকু বলিলাম। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ উৎকৃষ্ট—আকার সুবৃহৎ, ৩৯৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কাজেই মূল্যও বেশী বলিয়া মনে হইল না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

নীল পরী

কানে সুনীল অপ্‌রাজিতা, পাপ্‌ড়ি চুলে জাফ্‌রাণের,
পায়ে জড়ায় নূপুর হ'য়ে শেষ ধীসরের রেশ গানের,
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,
নীল পরী গো নীল পরী!

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্‌টি নীলা কাঁচ-পোকার,
ধূপের ধোঁয়া পাখ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার!
ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিদ্ধনে মেঘ-ডম্বরী,
নীল পরী গো নীল পরী!

চুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় চুলের তুমি ঢল্ বিথার,
তন্দ্রা তোমার সুর্ম্মা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্‌তা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ দু'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'
নীল পরী গো নীল পরী!

স্বপ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল, মূর্চ্ছা নিচোল নীল বরণ,
ঘুম সে তোমার আল্‌গা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আঁখির শর্ব্বরী
নীল পরী গো নীল পরী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আমাদের কথা

বৎসরের শেষে ভারতীর গ্রাহক গ্রাহক এবং লেখকবর্গকে আমাদের রিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভারতীর নিয়মিত লেখকেরা সকলেই ৎসর ভারতীতে লেখা দিয়া আমাদিগকে তা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের য্য পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের সম্পাদন-এত সহজ হইয়াছে এবং ভারতী যে-চলিয়া আসিতেছিল, মোটের উপর সেই ই চলিতে পারিয়াছে। কোথাও একটু-আধটু বদল হইয়া থাকিবে—কিন্তু সে সামান্য। কাজেই এ কথা বলিতে দোষ নাই যে ইতিমধ্যে ভারতীর অবনতির কোন কারণ ঘটে নাই; উন্নতি হইয়াছে কি না পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

এ বৎসর কয়েকটি নূতন লেখককে আমরা পাইয়াছি। তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা অব্যাহত থাকুক—এই কামনা করি।

আগামী বর্ষে ভারতী চল্লিশ বৎসরে পড়িবে। ভারতীর যখন জন্ম হয়, তখন

আমাদের জন্ম হয় নাই। ভারতীকে আমরা গড়িয়া তুলি নাই, ভারতীই আমাদের গড়িয়া তুলিয়াছে; সেই ভারতীর সেবার ভার এখন আমাদের উপর—ইহাতে আমরা কৃতার্থ।

ভারতী বয়সে প্রাচীন হইতে চলিয়াছে বটে কিন্তু ইহার অন্তরে কখনো প্রাচীনতার ছোপ্ পড়ে নাই। চিরদিনই ভারতী সময়ের সঙ্গে তালে তালে পা রাখিয়া চলিয়াছে, কখনো পিছনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে নাই। কাজেই সে চির নবীন।

ভারতীর এই ঊন-চল্লিশ বৎসরের হিসাব বড় কম হিসাব নহে। বঙ্গ-সাহিত্যের গতির ইতিহাস ইহার সহিত জড়িত। এই সাহিত্যের ভয়, আশা, উদ্বেগ, উচ্ছ্বাস, চিন্তা, কর্ম্ম, স্বপ্ন—এ সমস্তেরই ঢেউ ইহার বুকের উপর দিয়া খেলিয়া গিয়াছে। আমাদের জীবন-সমস্যার জটিলতাও ইহাকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত নামজাদা লেখকের জন্ম ভারতী আসন জোগাইয়াছে। ইহার কোলে বসিয়া আমাদের অনেক যশস্বী যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। আগামী বৈশাখ-সংখ্যায় ভারতীর চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আমরা এই সকল কথার আলোচনা করিব।

ভারতীর এই চল্লিশ-বছরটিকে লইয়া একটি ছোটোখাটো উৎসব করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। এই উপলক্ষ্যে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকদের আমরা নিমন্ত্রণ করিতেছি এবং প্রাচীন লেখকদের কাছেও আহ্বান পাঠাইতেছি। এ উৎসব কোনো উৎসব-মণ্ডপের মধ্যে আবদ্ধ উৎসব নয়, উৎসবের আনন্দ আমরা ভারতীর পাঠ পরিবেষণ করিব। মনে ইচ্ছা অনেক আছে কিন্তু তাহা কাজে করিয়া তুলিতে পারিব কি না জানি না। যাঁহারা ভারতী সারথি ছিলেন এবং যে সমস্ত মহা ভারতীর বল, তাঁহাদের অনুগ্রহ পা এ কার্য্য তেমন দুরূহ হইবে না।

এ বৎসর ভারতী আমরা ভয়ে চালাইয়াছি—নূতন ব্রতী বলিয়া প্রতি আশঙ্কা লইয়া আমাদের চলিতে হইয়াছে এই একবৎসরের আশঙ্কার মধ্য হইতে আমরা কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়াছি। জন্য আশা করি আগামী বৎসরে আমা গতি সহজ হইবে এবং আমরা ভারতীর সে বর্দ্ধনে অধিকতর পারদর্শী হইতে পারিব।

আমরা ভারতীর পৃষ্ঠায় গ্রাহকদের কাছে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তরের সংখ্যা গ্রাহক-সংখ্যার তুলনায় নিতান্তই সামান্য; এবং চিঠিগুলি বাহির সাজাইলে মত এই দাঁড়ায় যে ভারতী যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক। কেহ হয়ত কোনো বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু ঠিক সেই জিনিষকেই আর-একজন বাহবা দিয়াছেন। বেশী লোকের মতে এইটি ভালো—এমন কোনো নিষ্পত্তি পাই নাই। কাজেই তাহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়া যায় না। কয়েকখানি চিঠিতে আমরা ভালো পরামর্শ পাইয়াছি। সেগুলি আমরা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে।

কলিকাতা, ২২ মুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।